উদ্বোধন

বর্ষসূচী

৬৭তম বর্ষ

(১৩৭১-মাঘ হইতে ১৩৭২-পৌষ)

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'

সম্পাদক

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩

বার্ষিক মূল্য ৫·৫০ প্রতি সংখ্যা ৫০ প.

বর্ষসূচী—উদ্বোধন

(মাঘ—১৩৭১ হইতে পৌষ—১৩৭২)

লেখক-লেখিকাগণ ও তাঁহাদের রচনা

দিব্য বাণী

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনুভি- র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥

—শান্তিপাঠ, প্রশ্নোপনিষদ্

দেবগণ! কর্ণে যেন শুনি সদা মধুময় কল্যাণ-বচন,
চক্ষু যেন হেরে সদা চিত্তহারা দৃশ্য সুশোভন।
দৃঢ়অঙ্গে সুস্থদেহে গাহি' তোমাদের জয়গান
লভি যেন দেবহিত-রত আয়ু, অকুণ্ঠ, অম্লান।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

—মুণ্ডকোপনিষদ্

বেদান্ত-বেদিত নিত্য পরব্রহ্ম যিনি,
নিখিল জগৎ রূপ ধরেছেন তিনি।
শুভক্ষণে হলে তাঁর স্বরূপ-দর্শন,
টুটে যায় হৃদয়ের সকল বন্ধন।
কর্মফল ক্ষীণ হয়ে চিরলুপ্ত হয়,
চিরতরে ছিন্ন হয় সকল সংশয়।

যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চন॥

—তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

ইন্দ্রিয়-অতীত যেই পরব্রহ্ম-পাশে
যাইতে না পারি মন-বাক্য ফিরে আসে,
আনন্দ-স্বরূপ তাঁর প্রত্যক্ষ করিলে
নাহি ভয় কোন ঠাঁই এ বিশ্বনিখিলে।

কথাপ্রসঙ্গে

আমাদের বর্ষারম্ভ

শ্রীভগবানের কৃপায় 'উদ্বোধন' ৬৭তম বর্ষে পদার্পণ করিল।

স্বামীজী প্রথমবার পাশ্চাত্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া যখন দেশমাতৃকার সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, নারায়ণজ্ঞানে স্বদেশবাসীর পূজার জন্য প্রয়োজনীয় সর্ববিধ উপকরণ পুষ্পপাত্রে সাজাইতেছিলেন, সেই সময় 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রকাশনকেও তিনি একটি উপচাররূপে গ্রহণ করেন।

আমরা জানি, তৎকালীন পরাধীন, দুঃখ-দৈন্য-জর্জরিত, শিক্ষাহীন, আত্মবিশ্বাসহীন ভারতের অগণিত জনগণের দুর্দশা-দর্শনে স্বামীজীর চিত্ত কতখানি বিচলিত হইয়াছিল, তাহাদের দুর্দশার অবসানের জন্য পথের সন্ধানে অশ্রুপূর্ণলোচনে বিদীর্ণহৃদয়ে কত বিনিদ্র রজনী তিনি অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ভারতের অতীত ইতিহাস বিশ্লেষণ করিয়া, এবং হিমাচল হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ঘুরিয়া ভারতের উচ্চনীচ সর্বস্তরের তৎকালীন জীবনধারার সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হইয়া তিনি ভারতবাসীর দুর্দশামোচনের যে নিশ্চিত পথের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহা হইল স্বদেশবাসীর অন্তর হইতে অপস্রিয়মাণ নিজস্ব আধ্যাত্মিকতাকে ও লুপ্তপ্রায় আত্মবিশ্বাসকে ফিরাইয়া আনা; তাহা হইলেই সে তামসিকতা কাটাইয়া উঠিতে পারিবে, তাহা হইলেই যাহা কিছু প্রয়োজন, জাতির জাগরণ ও উন্নতির জন্য যাহা কিছু অনিবার্য, তাহা আপনা হইতেই আসিয়া যাইবে। ইহার জন্য 'অর্ধেক পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া' তিনি আমেরিকা গিয়াছিলেন এবং পাশ্চাত্য মনীষীদের চিত্তে ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতাকে শ্রদ্ধার আসনে বসাইয়াছিলেন; ইহারই জন্য পাশ্চাত্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পর কলম্বো হইতে আলমোড়া পর্যন্ত সর্বত্র ভারতে যুগযুগ-সঞ্চিত প্রাচীন প্রাণপ্রদ ভাবধারার অমৃত-সিঞ্চন করিয়াছেন, তামসিকতা কাটাইবার জন্য অতি প্রয়োজনীয় তেজবীর্যের, স্বদেশসেবায় আত্মোৎসর্গের, আত্মবিশ্বাসের অগ্নিবর্ষণ করিয়াছেন। আর, ইহারই জন্য এই সবকিছুর উপর কিরণবর্ষী আলোকের মূল উৎসটিকে চির-অনির্বাণ রাখিতে তিনি মানবসেবাব্রতী রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আপৎকালে সাহায্য ও শিক্ষাদির মাধ্যমে মানুষকে আপনার করিয়া লইয়া তাহার অন্তরস্থ প্রচ্ছন্ন শক্তির বিকাশসাধনের সহায়তা করা এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বরের পূজাজ্ঞানে এই সেবাকেই সাধনারূপে লইয়া ভগবান লাভ করাই 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' স্বামীজীর চরণে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ সেবকদের প্রধান কার্য।

স্বামীজী বলিয়াছেন যে একটি চারাগাছকে কেহ টানিয়া বাড়াইতে পারে না; উহাকে খাদ্য দিয়া এবং প্রয়োজন হইলে বাহিরের উৎপাত হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়া উহার বর্ধনের উপযোগী পরিবেশমাত্র আমরা সৃষ্টি করিতে পারি;—সে বাড়িবে নিজে নিজেই এবং ভাল পরিবেশ পাইলে তাহার বর্ধনের গতি হইবে দ্রুততর। রামকৃষ্ণ মিশনের এবং তাহার অন্যতম মুখপত্র 'উদ্বোধনে'র কাজ হইল মানুষের দ্বারে দ্বারে তাহার অন্তরস্থ শক্তির বিকাশের উপযোগী সদ্ভাবগুলি পৌঁছাইয়া দেওয়া; কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিস্তারিত সংস্কারসাধন নয়। বিধবা-বিবাহের প্রচলন হওয়া উচিত কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী যাহা বলিয়াছিলেন, রাজনীতি প্রভৃতি সর্ববিধ বিস্তারিত ক্ষেত্রে তাঁহার সেবাপদ্ধতি তাহাই—শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক পুষ্টির

জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহা মানুষকে দিয়া যাও; মানুষ দেহমনে সবল হইয়া উঠুক, নিজের ভালমন্দ নিজেই বিচার করিয়া নির্ধারণ করিতে শিখুক, যাহা ভাল বলিয়া বুঝিবে তাহা জীবনে প্রতিফলিত করিবার মত ইচ্ছা-শক্তির অধিকারী হউক—তাহা হইলেই প্রয়োজনমত সবকিছুর সংস্কার সে নিজেই করিয়া লইতে পারিবে ও করিবে। মানুষের শক্তির মূল উৎসটিকে খুলিয়া দিবার কাজেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন স্বামীজী—করিতে বলিয়াও গিয়াছেন তাহাই—'মূলদেশে অগ্নিসংযোগ কর, অগ্নি ক্রমশঃ ঊর্ধ্বদেশে উঠিতে থাকুক, একটি অখণ্ড ভারতীয় জাতি গঠন করুক।' সুস্থ-সবল-দেহ, অমিত ইচ্ছাশক্তির অধিকারী, দেবতুল্য 'মানুষ' গড়িয়া তোল, তাহা হইলেই ভারতের কল্যাণের জন্য যখন যাহা প্রয়োজন, তখনই সে কাজে অমিত শক্তি লইয়া দুর্দমনীয় বেগে সে আগাইয়া যাইবে। রাজনীতি বা সমাজনীতি বা জাতীয় জীবনের বিশেষ কোন ক্ষেত্রে বিস্তারিত কাজ করার জন্য তিনি প্রয়াসী হন নাই; জাতির 'আমূল সংস্কার' যে সব অমিত শক্তিধর মহামানবদের প্রেরণায় ঘটে, তাঁহাদের পক্ষে এরূপ প্রয়াসের প্রয়োজনও হয় না; তাঁহাদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রের নেতারা, মহাবীরেরা মাথা তোলেন। স্বামীজী সাফল্যের সঙ্গেই 'জাতীয় জীবনের মূলদেশে অগ্নিসংযোগ' করিয়াছিলেন—যে আগুন দেশাত্মবোধ, ভারতীয়তা প্রভৃতি রূপে জাতীয় জীবনের সর্বত্র, এমনকি সাহিত্য, ললিতকলা প্রভৃতিতেও ছড়াইয়া পড়িয়া তাহাকে সর্ববিধ উন্নতির পথে আগাইয়া দিয়াছে। চিকাগো ধর্মমহাসভায় যে শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছিল, তাহার বজ্রনির্ঘোষে দেশের বহু সুসন্তান বিভিন্ন জীবন-পথে চলিতে চলিতে সচকিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং বহুভাবে দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার পথে পা বাড়াইাছিলেন। সেই শঙ্খনিনাদই কলম্বো হইতে আলমোড়া পর্যন্ত ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়া জাতির শেষ তন্দ্রাটুকু ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল।

উদ্বোধনের প্রথমবর্ষের প্রথম সংখ্যার (মাঘ, ১৩০৫ সাল) প্রস্তাবনায় স্বামীজী লিখিয়াছিলেন "ভারতে রজোগুণের একান্ত অভাব; পাশ্চাত্যে সেইপ্রকার সত্ত্বগুণের।…" "এই দুই শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা 'উদ্বোধনে'র জীবনোদ্দেশ্য।"

আজ উদ্বোধনের নববর্ষে যাত্রারম্ভে স্বামীজীর কাছে আমরা এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করি—আমরা যেন তাঁহার নির্দেশিত পথ ধরিয়া চলিতে পারি, আমরা যেন আমাদের বর্তমান সর্ববিধ স্বার্থপরতা, দুর্বলতা ও কাপুরুষতার ঊর্ধ্বে উঠিয়া তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষাদির অভাবহীন আশিষ্ঠ বলিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ মানবকল্যাণকামী অমিতবীর্য মানবসেবাব্রতী দেবতুল্য সন্তানের জননীরূপে ভারতমাতাকে স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হই।

বর্তমান প্রয়োজন

দেশমাতৃকার চরণ হইতে পরাধীনতার শৃঙ্খল আমরা খুলিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছি এবং উন্নতির পথেও বহুদূর আগাইয়া আসিয়াছি। স্বামীজীর বাণী একদিন আমাদিগকে যথার্থ মানুষ হইতে শিখাইয়াছিল, এবং তাঁহারই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কতকগুলি সংযমী, সাহসী, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন, পরার্থে আত্মোৎসর্গকারী 'মানুষ' বাধাবিঘ্নের বজ্রদৃঢ় প্রাচীর ভাঙ্গিয়া আমাদের বিজয়পথের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কাজ এখনও অনেক বাকী—বর্তমানে জাতীয় জীবনের বহুবিধ

দুর্যোগের ভিতর দিয়া আমাদের যাইতে হইতেছে। স্বামীজীর কথাগুলি মনন ও জীবনে রূপায়িত করিবার, খাঁটি মানুষ হইবার ও অপরকে হইতে সহায়তা করিবার ব্যাপক প্রচেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন এখন। আমরা যেন আবার ঝিমাইয়া পড়িয়াছি। অপরের জন্য স্বার্থত্যাগ করা তো দূরের কথা, আজ আমরা অনেকেই স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া বহু লোকের ব্যাপক অসুবিধার সৃষ্টি করিতেও দ্বিধাবোধ করিতেছি না। ইহার প্রতিকারের জন্য বাহির হইতে বহু ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইতেছে, কিন্তু সব সময় তাহা ফলপ্রসূ হইতেছে না। শুধু বাহিরের প্রচেষ্টায় স্থায়ী ফল কিছু হইবে বলিয়াও মনে হয় না, অকল্যাণের একটি দ্বার রুদ্ধ হইলে আর একটি নূতন দ্বার খুলিতে পারে—যতদিন না মূলদেশে, আমাদের অন্তরে পরিবর্তন আসিবে, যতদিন না আমরা 'মানুষ' হইব এবং যতদিন না খাঁটি মানুষ তৈয়ারীর উপযোগী সুষ্ঠু ব্যাপক ব্যবস্থা হইবে। স্বামীজী বলিয়াছেন, 'জগতের সমস্ত ধনরাশির চেয়ে মানুষ হচ্ছে বেশী মূল্যবান।' 'একটা মানুষ যদি তৈয়ারী হয় তো লাখ বক্তৃতার কাজ হবে।' 'বিশৃঙ্খল জনতা শতবৎসরে যাহা করিতে পারে না—মুষ্টিমেয় কয়েকটি অকপট সঙ্ঘবদ্ধ যুবক এক বৎসরে তদপেক্ষা অধিক কাজ করিতে পারে।'

স্বামীজীর কথা একদিন আমরা গভীর মনোযোগ দিয়া শুনিয়াছিলাম; সেদিন তেজ-বীর্যবান, সংযত ও পরার্থপর হইবার জন্য আন্তরিক চেষ্টাও করিতাম। আজ যেন আমাদের ভিতর হইতে কোন কিছুতে গভীর মনোযোগ দিবার প্রয়োজনীয়তা-বোধই চলিয়া গিয়াছে এবং নানা কারণে নানা দিক হইতে মানুষের সহজাত নিম্নাভিমুখী প্রবৃত্তিগুলির অনুগ হইবার সমর্থন পাইয়া ক্রমশই আমরা হালকা হইয়া পড়িতেছি। আঘাত আসিলে একটু সজাগ হই, আবার যেন ঝিমাইয়া পড়ি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় করিতে যাইয়া আমরা প্রাচ্যের সদ্গুণরাজির মূলভিত্তি সংযম ও পরার্থপরতাকে পরিত্যাগপূর্বক পাশ্চাত্যের ভাবগুলিকে—তাহাও তাহাদের শক্তিপ্রদ ভাবগুলি ছাড়িয়া কেবল হালকা ভাবগুলিকে—পাইবার জন্য যেন বেশী ঝুঁকিতেছি। ছেলেদের কাছে, যুবকদের কাছে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের পক্ষে পরম কল্যাণকর আমাদের নিজস্ব ভাবগুলি অন্ততঃ পরিবেশন করার জন্য কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা এখনো হইল না। শুধু নেতি-বাচক কিছু দ্বারা 'মানুষ' গড়িয়া উঠে না, তাহাকে ইতি-বাচক কিছু দিতে হয়। মানুষ যন্ত্র নয়। জীবনের একটা অধিকতর আনন্দময় দৃঢ় অবলম্বন না পাইলে মানুষ ভাল হইতে চাহিবে কেন?

স্বামীজী যাহা বলিয়া গিয়াছেন, সেদিকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইলেই আমরা কার্যকরী পথের সন্ধান সহজেই পাইব। তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁহার ভাবগুলির আলোচনা হইয়াছে যথেষ্ট, কিন্তু সকলে মিলিয়া সেগুলিকে জীবনে রূপায়িত করিবার ব্যবস্থা করিতে আমরা সচেষ্ট হইয়াছি কতখানি? ভারতকে সর্ববিষয়ে উন্নত করার দায়িত্ব কারো একার নয়, যে আমাদের সকলেরই, একথা যেন বিস্মৃত না হই। আমরা কবে সজাগ হইব—যতদূর নীচে নামা সম্ভব, ততদূর নামিয়া বা অপরকে নামিতে দিয়া তারপর?

স্বামীজীর জীবন-দর্শন*

শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী

সেদিন ভারত ছিল রাজনৈতিক পরাধীনতার অভিশাপে জর্জরিত। অথচ সেই অভিশপ্ত দিনেই ভারতে দেখা দিয়েছিল নব সৃষ্টির উন্মাদনা আর সৌভাগ্যবশতঃ সেদিনই দেশের আধ্যাত্মিক সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন স্মরণীয় জননায়কের দল।

স্বামীজী ছিলেন এই সব শীর্ষস্থানীয় নেতাদেরই অন্যতম। তাঁর জীবন ও বাণীই এদেশে এনেছিল আধ্যাত্মিক বিপ্লব। তাঁর বাণী এক অর্থে সর্বব্যাপক। সেই কম্বুকণ্ঠের উদাত্ত আহ্বানেই সারা দেশ জেগে উঠেছিল। সমস্ত জীর্ণতা- ও জড়তা-মুক্ত করে হিন্দুধর্মের শাশ্বত সত্য ও সৌন্দর্যকে তিনিই আমাদের নিকট অবারিত করে দেন।

স্বামীজী ছিলেন একান্তভাবে ধর্মপ্রাণ—ব্যাপকতম অর্থে ধর্মপ্রাণ। কারণ, তাঁর চিন্তাধারা মূলতঃ আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক। তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে হিন্দু। অথচ তিনি কখনই কেবলমাত্র ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও তার বাহ্যিক আড়ম্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী এবং বেদান্ত-দর্শনের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতাদের অন্যতম। তাঁর অনন্যসাধারণ বাগ্মিতা ও বিশিষ্ট জীবন-চর্চা সারা আমেরিকায় আলোড়ন তুলেছিল। সেকেলে পৌত্তলিকতা ছাড়া হিন্দু ধর্মে আর কিছুই নেই—এই ছিল যেদিন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সারা বিশ্বের ধারণা, সেদিন হিন্দুধর্মের নিগূঢ়তম আধ্যাত্মিক সত্য উদ্ঘাটন করে তিনিই সারা বিশ্বকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করে দিয়েছিলেন।

বিস্ময়কর সহজতায় সুগভীর দার্শনিক তত্ত্ব সাধারণের অধিগম্য করে তোলার অনন্য-সাধারণ ক্ষমতা ছিল স্বামীজীর। সেখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠতা। তিনি ছিলেন উঁচুদরের মনীষী অথচ তার যিনি গুরু তিনি সাধারণ অর্থে নিরক্ষর। আমি পরমহংসদেবের কথাই বলছি। স্বামীজী তখনও তাঁর সমস্ত জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধি দিয়েও জীবন সম্পর্কে যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি স্থির করতে না পেরে অন্ধকারেই হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন। কিন্তু পরমহংসদেবের সান্নিধ্যে এসে, ভগবচ্চরণে ঐকান্তিক আত্মনিবেদনের সমাহিত সৌন্দর্য দেখে, স্বামীজীর দৃষ্টি খুলে গেল। উভয়েই উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। এই আকর্ষণের পরিণতিতে স্বামী বিবেকানন্দ পেলেন পরমহংসদেবের মধ্যে তাঁর গুরু ও পথপ্রদর্শককে আর পরমহংসদেব পেলেন স্বামীজীর মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্য ও উত্তর সাধককে। যতদূর মনে পড়ে, পরমহংসদেবই যেন একবার স্বামীজীর প্রতি তাঁর সহজাত আধ্যাত্মিক জ্ঞাতিত্বের কথা স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু এ মিলন কেবল হৃদয়ের মিলন নয়—আত্মার মিলন, মর্মে মর্মে ঐক্যানুভব।

পরমহংসদেবের এই বরেণ্য শিষ্য বহু দেশ পরিভ্রমণ করে তাঁর গুরুদেবের বাণী সারা বিশ্বে প্রচার করে অপূর্ব প্রজ্ঞার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। সেণ্ট পল যেমন প্রভু যীশুর অমৃতবাণী প্রচার

---

* স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৯৬৪ খৃঃ ২০শে জানুআরী তারিখ অমৃতবাজার পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী (বর্তমান প্রধান মন্ত্রী) লিখিত ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত কর্তৃক অনূদিত

করে তাঁকে বিশ্ববন্দিত করে তুলেছেন, স্বামীজীও তেমনি পরমহংসদেবের জীবন ও বাণীকে অবিস্মরণীয় করে গেছেন।

স্বামীজীর মতো দুর্ধর্ষ মনীষী কি করে পরমহংসদেবের প্রতি এমন গভীরভাবে আকৃষ্ট হলেন, তা সত্যই চিন্তনীয়। এই ঘটনা থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে কেবল মানসিক শক্তি ও বুদ্ধি দিয়েই জীবনের গভীর রহস্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা যায় না। বুদ্ধিবৃত্তি সহায়ে অনেক রহস্য উদ্ঘাটন করা গেলেও সবটা যায় না। তাই পুঁথিগত বিদ্যার সীমাবদ্ধতার কথা উপনিষদে স্পষ্ট ঘোষিত। চরমসত্য বা ব্রহ্মজ্ঞানের ধারে-কাছেও বুদ্ধি ঘেঁসতে পারে না। দিব্যানুভূতি বোধে প্রসূত—তা চকিত বিদ্যুৎচমকের মতো অন্তরালোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, মন-বুদ্ধির সীমা ছাড়িয়ে না গেলে সে উপলব্ধি সম্ভব নয়। এই কারণেই দার্শনিক-প্রবর শংকরাচার্য পরব্রহ্মের কথা বলতে গিয়ে 'নেতি'-র পথ অবলম্বন করেছেন। তার অর্থ পরব্রহ্মকে কোনো নির্দিষ্ট সূত্রে কোনো বিশিষ্ট অভিধায় অভিহিত করা যায় না। আমরা কেবল বলতে পারি পরব্রহ্মের স্বরূপ এ নয়, এ নয়, এ নয়। তবু একথা স্বীকার্য যে শংকর-ভাষ্যে অদ্বৈতবাদ যেভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে, তাতে মননশীল চিন্তাধারার চরম প্রকাশ ঘটেছে। পরব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়—সমস্ত 'প্রকৃতি' বা বস্তু-বিশ্ব তাঁরই সৃষ্টি—এই দার্শনিক মতবাদ সহজবোধ্য নয়। নিরাকার, অতীন্দ্রিয়, চেতন সত্তা কি করে আকারবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, অচেতন বস্তু সৃষ্টি করতে পারে, কি করেই বা কেবল চৈতন্য থেকে বস্তুর উদ্ভব হওয়া এবং চৈতন্য বা জীবনের সঙ্গে সেই বস্তুর সহজে মিশে যাওয়া সম্ভবপর হয়—এ চিন্তা মানুষকে বিভ্রান্ত করে তোলে।

দুটি দার্শনিক মতবাদ—ন্যায়-বৈশেষিক এবং সাংখ্যদর্শনে এই তত্ত্ব প্রচারিত হয়েছে যে দুই অথবা তিনটি উপাদান বিশ্বসৃষ্টির মূলীভূত কারণ—ন্যায়-বৈশেষিকে ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি, আর সাংখ্যে জীব ও প্রকৃতি অথবা দ্রষ্টা ও দৃশ্য তত্ত্ব। কিন্তু শংকরাচার্য তাঁর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ন্যায়-বৈশেষিক অথবা সাংখ্যদর্শনে স্বীকৃত দুই বা তিনটি উপাদান মূলতঃ একটি মাত্র সত্তা হতেই সৃষ্ট—সে সত্তাকে শক্তি বা আত্মা যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন। সাধারণ ভাবে একথা বলা যেতে পারে যে প্রকৃতিরূপে যা কিছু আমরা দেখি, তা সবই আমাদের মনের সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়, সেগুলির কোন বাস্তব অস্তিত্ব সত্যই নেই। অনেক সময় জ্যোৎস্নালোকে রজ্জুখণ্ডকে যেমন সর্প বলে ভ্রম হয়, ঠিক তেমনি আমরা সত্য বস্তুকে জগৎ বলে ভ্রম করি এবং জগতের কোন বাস্তব সত্তা না থাকলেও জগৎকে সত্য বলে মনে করি। এই হল শঙ্করের মায়াবাদ।

উদাহরণরূপে বলা যায়, আমরা কিভাবে হাত-পা পেলাম তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে একজন বিশিষ্ট জার্মান দার্শনিক চৈতন্যের শক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। চৈতন্য থেকে একটা ইচ্ছা জাগল কিছু পেতে হবে, ধরতে হবে; এই ইচ্ছাটিই ক্রমে হাতরূপে মূর্ত হয়ে উঠল। একই ভাবে, চলা-ফেরা করার ইচ্ছাটিই আমাদের পদরূপে নিজেকে রূপায়িত করেছে। এই ব্যাখ্যার যথার্থ তাৎপর্য হচ্ছে—আমাদের এই দেহটি আমাদের ইচ্ছারই, বাসনারই মূর্ত প্রকাশ। উপনিষদেও এই কথাই বলা হয়েছে।

কিন্তু এমনই আশ্চর্যের ব্যাপার, আমরা আমাদের দৈহিক সত্তার উপরই সব চেয়ে বেশি আস্থাশীল—এবং তার অন্তর্নিহিত সত্য সম্বন্ধে বিস্মৃতি-পরায়ণ। তবু, বহু বৈজ্ঞানিক আজ এই মতবাদ পোষণ করেন যে বিশ্বে কেবল শক্তি ও গতি ছাড়া আর কিছু নেই—এমনকি পরমাণুও এই শক্তি থেকে উদ্ভূত। শুধু তাই নয়, বস্তু ও শক্তি পরস্পর পরিবর্তনসাপেক্ষ অর্থাৎ শক্তি বস্তুতে এবং বস্তু শক্তিতে পরিণত হতে পারে। তাই বলা যেতে পারে, মূলতঃ সব কিছুই শক্তি থেকে উদ্ভূত।

জড় ও চেতন এই দুই ভাগে বস্তুবিশ্বকে বিভক্ত করে দেখা যে কত ভুল, তা পরমাণু-বিজ্ঞান ও পরমাণু-শক্তি আজ প্রকাশ করে দিয়েছে। কারণ সূক্ষ্মতম পরমাণুর মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ডতম শক্তি ও গতি। বিশ্বের সর্বত্রই এই শক্তির লীলা। ন্যায়দর্শনে তাই যথার্থই বলা হয়েছে—সমস্ত পদার্থই শক্তিসঞ্জাত এবং সবই পরিণামে শক্তিতে বিলীন হয়।

এই বিশ্ব আদ্যোপান্ত চৈতন্যপ্রবাহ মাত্র। বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী তাই আজ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে সৃষ্টির রহস্য, জীবন-মৃত্যুর দুজ্ঞেয়তা, কী করে জীবনের উদ্ভব, কী করেই বা তার লয়—এ সব সমস্যার সমাধান তাঁদের সাধ্যাতীত; তাঁরা আজ উপলব্ধি করছেন—এ এক স্বতন্ত্র জগৎ, স্বতন্ত্র রহস্য—গবেষণাগারের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এই রহস্য-ভেদ অসম্ভব।

স্বামীজী ভগবান বা পরমাত্মার সহিত একাত্মতা উপলব্ধি করেছিলেন—সমগ্র সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু এই উপলব্ধি বড় সহজ নয়। যথাযথভাবে সাধিত হলে কর্ম এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার একটি উপায়। কিন্তু যথার্থ কর্মানুষ্ঠান জাগতিক মানুষের পক্ষে সহজ নয়। গীতা তাই বলেছেন, কোনটি যথার্থ কর্ম, কোনটি অযথার্থ তা নির্ধারণ করা জ্ঞানীর পক্ষেও দুরূহ। এই কারণেই ন্যায্য কর্মানুষ্ঠানে ভক্তির সহায়তা প্রয়োজন। ভক্তির অর্থ অনুরাগ ও আত্মসমর্পণ। মায়াবদ্ধ ও মায়া-পরিবৃত দেহধারী সীমায়িত-শক্তি মানুষ তো শক্তির জন্য অনন্ত শক্তির আধার ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে এবং সেখান থেকে শক্তি সঞ্চয় করতে চাইবেই—এ ছাড়া তার অন্য উপায় আর কি আছে? গান্ধীজীর মত তপস্বীও বলেছেন, রামচন্দ্রই তাঁর সমস্ত শক্তির উৎস—রামচন্দ্রের করুণা না পেলে তাঁর পক্ষে এক পা-ও অগ্রসর হওয়া সম্ভব হতো না। এই জন্যই মানুষের কাছে ভক্তির এত গুরুত্ব। ভক্তি থেকেই বিশ্বাসের উদ্ভব হয়। আর সেই বিশ্বাসই অভীষ্ট-সিদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

তবে ভক্তিকে বাহ্যিক অনুষ্ঠানমাত্রে পরিণত করা যে কোনো ক্রমেই উচিত নয়, স্বামীজীর এই মূল বাণীর কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ভক্তি কামনাপূরণের জন্য নয়। নিষ্কাম সেবাই আমাদের সমস্ত কর্মের লক্ষ্য হওয়া উচিত। কারণ নিষ্কাম সেবাই যথার্থ ভক্তের লক্ষণ।

জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যদি আত্মশুদ্ধি ও আত্মোন্নতিতে ব্যয়িত না হয়, তাহলে আমাদের জপ-তপ বাহ্যিক অনুষ্ঠানই থেকে যাবে। আত্মোৎসর্গই চিরন্তন সাধনা। জনৈক সুফী সাধক তাই বলেছেন—আমার দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরা সূত্রে পরিণত হয়েছে, সুতরাং যজ্ঞোপবীতে আর কি প্রয়োজন? যজ্ঞোপবীত প্রকৃত জিজ্ঞাসুর বাহ্য প্রতীক। সুতরাং

সর্বপ্রকার বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের উর্ধ্বে ওঠার সাধনাই যথার্থ সাধনা। বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান প্রারম্ভিক স্তরে সহায়তা করতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে যথার্থ সত্য বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানেরও বহু উর্ধ্বে।

হিন্দুধর্মের যথার্থ মর্ম গ্রহণে পরাঙ্মুখতার দিনেই হিন্দুধর্মে সব চেয়ে বেশি বিকৃতি দেখা দিয়েছিল।

প্রত্যেক ধর্মেরই মূলতত্ত্ব এক, তবু হিন্দুধর্মের কতগুলি মৌলিক তত্ত্ব যথার্থই গভীরতা ও সামগ্রিকতার দ্যোতক। হিন্দুধর্মে সব কিছুরই স্থান আছে বটে, তবু এর লক্ষ্য ও আদর্শ অত্যন্ত নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট। হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি যে দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক—স্বামীজী এই সত্য উপলব্ধির শিক্ষাই দিয়ে গেছেন।

অদ্বৈততত্ত্বই দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধারণা ; তাই অদ্বৈত ও বেদান্তের উপরই স্বামীজী সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। স্বামীজীর বক্তৃতাগুলি পাঠ করা দেশের যুবকদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। আমার আজো মনে আছে ছাত্রজীবনে তাঁর বাণী ও রচনা আমার অন্তরে কি গভীর রেখাপাত করেছিল, কি ভাবে আমাকে উদ্দীপিত করেছিল। তাঁর বাণী আমার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিই সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। আমি চাই দেশের প্রত্যেক যুবক-যুবতী স্বামীজীর বাণী থেকে প্রেরণা লাভ করুক।

মোহাচ্ছন্ন দেশে তিনি প্রাণবন্যার প্রবাহ বইয়ে দিয়েছিলেন। বৈদান্তিক সন্ন্যাসী হয়েও তিনি ঘুমন্ত দেশে অপূর্ব জাগরণ এনেছিলেন। তাঁর অদ্বৈতবাদ নিষ্ক্রিয়তা ও নিয়তি-নির্ভরতা নয়। তিনি আমাদের কাজ করতে বলে গেছেন। তিনি বুঝেছিলেন ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধন ব্যতীত ভারতের অগ্রগতি ও অভ্যুদয় অসম্ভব ; দেশের পরাধীনতা তাঁর মর্ম স্পর্শ করেছিল। তাই তিনি দেশবাসীর নৈতিক মান উন্নয়নে ব্রতী হয়েছিলেন। তাই তাঁর উপদেশ—কাজ কর, কাজ কর, উন্নততর আদর্শের জন্য নিজেকে বলি দাও। ঐশ্বর্য- ও ক্ষমতা-লোভীদের তিনি কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করেছিলেন। কারণ তাঁর মতে যে দেশের কোটী কোটী মানুষ বঞ্চিত লাঞ্ছিত, সে দেশে নিজের জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ঐশ্বর্য কামনা পাপ—মহাপাপ। ভারতের অগণিত দুর্দশাগ্রস্ত নরনারীর কলাণে আত্মনিয়োগ করার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল সেদিন। তাই দেশবাসীর প্রতি তাঁর সর্বশেষ বাণী—উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। সত্যদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন তিনি। তাই তিনি যথাকালে আমাদের এইভাবে সচেতন করে দিয়ে গেছেন। তাঁর উপদেশ যেন আমাদের স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হয়ে থাকে, এবং তা অনুসরণ করে আমরা যেন যথার্থ কল্যাণের পথে অগ্রসর হতে পারি।

বিবেকানন্দ

শ্রীভবতোষ শতপথী

অমৃতনন্দন জাগো ! মূর্তিমান্ দিগ্বিজয়ী বীর,
শান্ত সৌম্য দিব্যকান্তি বিবেকবৈরাগ্য-সাধনায়,
আলোকতীর্থের যাত্রী, ধ্যানমগ্ন প্রশান্ত গম্ভীর
জ্যোতির্ময় ব্রহ্মচারী, অচঞ্চল দীপ্ত তপস্যায়,
অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন মানবের মুক্তিদাতা গুরু,
ক্ষমা-শৌর্য-বীর্যবান্, প্রতিজ্ঞায় অটল সুমেরু !

এনেছিলে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' নব প্রেমবাণী।
সর্বভাবময়তনু অবতীর্ণ সাক্ষাৎ ঈশ্বর
রামকৃষ্ণ-শৈল-চারী জ্ঞান ভক্তি-ভাব-মন্দাকিনী
এনেছিলে সমভূমে, ভগীরথ ! জাগো পুনর্বার
বিমুক্ত শাশ্বত আত্মা, ব্যথিতের ক্ষুব্ধ মনস্তাপে
করিবারে চিরলীন সত্য-শিব-সুন্দর-স্বরূপে !

উৎকণ্ঠিত মানবের কষ্ট-ক্লিষ্ট আতপ্ত নিঃশ্বাসে
অশ্রুভারাক্রান্ত পৃথ্বী ক্ষুব্ধকণ্ঠে যাচিছে সান্ত্বনা ;
নবজন্ম দাও তারে মৃত্যুহীন বৈদিক বিশ্বাসে,
সঞ্জীবনী শক্তিমন্ত্রে, মুছে দাও নৈরাশ্য-যন্ত্রণা।
দৈন্য-দুর্বলতা-নাশী অগ্নিময় মৃত্যুভয়-ত্রাতা
অভীঃ মন্ত্র দাও প্রাণে, ভারতের মুক্তি-দীক্ষা-দাতা !

বীরসন্ন্যাসী বিবেকের বাণী

শ্রীনরেশচন্দ্র মজুমদার

যখনই মনে কোন দুর্বলতা আসে, তখনই মনে পড়ে স্বামীজীর মহাবাণী: 'The old religions said that he was an atheist who did not believe in God. The new religion says that he is an atheist who does not believe in himself.' ব্যস্! আর কোন শংকা থাকে না তখন। হ'তে পারি এই নিঃসীম বিশ্বে আমি একজন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, তুচ্ছাদপি তুচ্ছ মানব, কিন্তু আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা। এই ক্ষুদ্র ভাণ্ডেই আছে জ্যোতির্ময় পরমপুরুষের স্ফুলিঙ্গ, 'অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য ভাসে।' চিত্তে যখন এরূপ অনুভূতি জাগে, তখন প্রাণে আসে অমিত শক্তির উদ্দীপনা আর সর্বপ্রকার ক্ষুদ্রতা ও দীনতা দূরে পালিয়ে যায়। স্বামীজীর মহামন্ত্র হচ্ছে—শক্তির মন্ত্র।

'সর্বপ্রকার দুর্বলতা পরিহার কর; দুর্বলতাই পাপ, দুর্বলতাই মৃত্যু।' প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে যারা জয়ী হ'তে পারে, তারাই বেঁচে থাকতে পারে। মানুষের সর্বক্ষণের নিশ্বাস-প্রশ্বাস এবং সারা শরীরের ধমনী ও শিরায় রক্ত-চলাচল বিরামহীন জীবন-সংগ্রামেরই পরিচায়ক। ইতিহাসের আদিযুগ থেকে মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে চলেছে। প্রকৃতি একদিকে যেমন তাকে বাঁচিয়ে রাখছে, আর একদিকে তেমনি তার বিনাশের চেষ্টা করছে। তার মানে মানুষকে যদি বাঁচতে হয়, তবে আত্মশক্তি-প্রয়োগে আপন মহিমায় দীপ্তিমান্ হয়েই সে বাঁচতে পারবে, এইটেই স্রষ্টার অভিপ্রায়। মানুষ প্রকৃতির এই 'চ্যালেঞ্জ' গ্রহণ করেছে। তার সাময়িক পরাভব অসংখ্য, কিন্তু পরাজয়ের চাইতে তার জয়ের পরিমাণ অনেক বেশি। ক্ষুদ্র অ্যামিবা থেকে বিবর্তিত হ'তে হ'তে, ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক নিয়মে কয়েক লাখ বছরে মানুষের মতো শ্রেষ্ঠ জীবের উদ্ভব হয়েছে আর মানুষ অব্যাহত গতিতে জ্ঞানবিজ্ঞানের জয়যাত্রায় এগিয়ে চলেছে। স্বামীজী এই দৃষ্টান্ত উল্লেখ ক'রে দেখিয়েছেন যে, লক্ষ লক্ষ বছরের এই ক্রমবিকাশ সৃষ্টির অন্তর্নিহিত অমিত শক্তিরই সার্থক প্রকাশ। এই শক্তি কেবল সেই দিন স্তব্ধ হবে, যেদিন তা সর্বশক্তিমানের সাথে এক হয়ে যেতে পারবে—তার লক্ষ্য এর চাইতে এক চুল নীচেও নয়। স্বামীজীর তিরোধানের অর্ধশতাব্দী পরে আজ মানুষ মহাকাশ-জয়ের অভিযান চালাচ্ছে। মানুষ যতদিন থাকবে, তার দুর্বার অভিযানও ততদিন থাকবে। যদি দৈব দুর্যোগে মানুষজাতি নিঃশেষে লোপ পেয়ে যায়, তাহলেও তার শক্তি লোপ পাবে না—সুপ্ত (dormant) অবস্থায় চরাচরের কোন স্থানে থাকবে আর সময়মতো অন্য কোন সত্তায় প্রস্ফুরিত হবে। স্বামীজী ছিলেন ত্রিকালজ্ঞ, তাই তিনি মানবসমাজকে, বিশেষভাবে যুবসমাজকে উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান করেছেন শুভকর্মপথে নির্ভয়ে অগ্রসর হ'তে আর পৌরুষের দৃপ্ত চরিতার্থতায় স্রষ্টার অভিপ্রায় সফল করতে।

স্বামীজী বলেন যে যুবকদের আকাঙ্ক্ষা হবে আকাশচুম্বী। এ সম্পর্কে অথর্ববেদের একটি শ্লোক আছে। স্বর্গত অধ্যাপক বিনয় সরকার এর বাংলা অনুবাদ করেছেন:

'পরাক্রমের মূর্তি আমি,
সর্বশ্রেষ্ঠ জানে মোরে ধরাতে।
জন্ম আমার দিকে দিকে
বিজয়কেতন ওড়াতে।'

যুবকদের এমন প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকবে যে, তাদের কাছে অজেয় কিছু থাকবে না, বা অসাধ্য ব'লে কোনও কাজ থাকবে না। স্বামীজী বলেছেন, ইচ্ছাশক্তি সর্বশক্তিমান্। চাই সৎকার্য-সাধনে বিপুল উদ্যম ও অপ্রতিহত অধ্যবসায়। ভুল হবে, পদস্খলন হবে, পতনও হবে, কিন্তু তাতে দমে যাবার কোন কারণ নেই। সফলতা আর বিফলতা, উত্থান আর পতন, এগুলো হচ্ছে জীবনরূপ মহাসঙ্গীতের 'অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত'। দুরূহ কাজে নিজের কঠিন পরিচয় দিতে তিনি সকলকে আহ্বান করেছেন। শুধু ভাল লোক হ'লে চলবে না, কাজের লোক হ'তে হবে। গরুতে যে মিছে কথা বলে না, তাতে তার কোন গৌরব নেই। যে-সব গোবেচারা ভাল লোক জীবনের যাথার্থ্যবোধে বঞ্চিত, তাদের সাত্ত্বিক লোক মনে করা উচিত নয়। স্বামীজী বলেন, আমাদের দেশে সত্ত্বগুণ ব'লে অনেক জায়গাতেই যে জিনিস চলছে, তা হচ্ছে তমোগুণ। মানুষ স্বকীয় প্রতিভা ও কর্মোদ্যমের বলে নূতন বস্তু বা নূতন আদর্শ সৃষ্টি করবে অথবা জ্ঞানের রাজ্যে নূতন আলোকপাত করবে, তবেই তার জীবন সার্থক। যারা জাতিকে ও বিশ্বজনকে কিছু দিতে পারে, তারাই বিশ্বজনের অভিনন্দনের যোগ্য।

যে কাজই করতে হয়, তা 'শরবৎ তন্ময়ঃ' হয়ে একাগ্র নিষ্ঠাসহকারে করতে হয়। যতদূর ভাল ক'রে কাজটি করা সম্ভব, তার জন্য চেষ্টার ক্রটি রাখতে নেই। দ্রোণাচার্যের কাছে পরীক্ষা দেবার সময় অর্জুন যখন লক্ষ্যভেদ করেছিলেন, একটি কাঠের পাখির চোখ তীর দিয়ে বিদ্ধ করেছিলেন, তখন তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল শুধু পাখির চোখটিতে। স্বামীজী পওহারী-বাবার দৃষ্টান্ত দিতেন যে, তিনি যেমন তদ্গত হয়ে ধ্যান করতেন, তেমনি তদ্গত হয়ে তাঁর লোটাটি মাজতেন তিন-চারঘণ্টা ধরে। যখন যে কাজ করতে হয়, তখন সেটিকেই সাধনা মনে করতে হয়, ঈশ্বরোপাসনার সমান নিষ্ঠা নিয়ে তা করতে হয়। একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ই সাফল্য অর্জনের উপায়। সকলের পক্ষে মহামানব হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু সাধারণ মানুষ, কৃষক, তাঁতি, কামার, কুমোর, মুটে, মজুর, মুচি, মেথর, দোকানদার, কেরানী, মাস্টার—যারা নতুন ভারত সৃষ্টি ক'রে চলেছে, যারা 'অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্রের তটে, বোম্বাই কর্ণাটে', কাজ ক'রে চলেছে, তারা সবাই যদি যে যার কাজ সৈনিকের শৃঙ্খলা আর সাধকের একাগ্রতা নিয়ে করে, তবেই আমাদের দেশ ধনধান্যে, শ্রী ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে; আর তাদের ব্যষ্টিগত জীবনও ভরে উঠবে উন্নততর মহিমায় ও স্নিগ্ধতর আনন্দের আলোকে।

স্বামীজী দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন যে, বিশ্ব-ব্যাপী শূদ্রজাগরণ আসন্ন। যেমন লক্ষ লক্ষ জলকণা মিলিত হয়ে বিশাল জলপ্রপাতরূপে প্রচণ্ড বেগের সৃষ্টি করছে, তেমনি কোটি কোটি শূদ্রের জাগরণে পৃথিবীতে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটছে। এক টুকরো রুটি পেলে ওরা দুনিয়া উলটে দিতে পারে—বলেছেন স্বামীজী। আমরা আজ যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি
উন্নতিই আজ বড়ো কথা।

স্বামীজী বলেন, 'যখন তোমাদের মাঝে এমন সব খাঁটি মানুষ হয়ে উঠবে, যারা দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত, তখনই জাতি সবদিক দিয়ে উন্নতিশীল হয়ে উঠবে। নেতৃত্বের

উত্তুঙ্গ আসন থেকে নয়, জনসাধারণের স্তরে নেমে এসে, অক্লান্তভাবে তাদের সেবা করলে এবং ভোগবাসনায় জলাঞ্জলি দিয়ে ব্যাকুল হয়ে প্রাণপণে কাজ করলে তবে ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব। স্বার্থের কোন্দল এবং নেতৃত্বের মোহ সমস্ত অনর্থের মূল। হাজার লোকের বাহবা পেলে কাপুরুষও প্রাণ দিতে অগ্রসর হয়, কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে যারা বছরের পর বছর নীরবে কাজ ক'রে যায়, নাম-যশ কিছুই চায় না, তারাই প্রকৃত কর্মী, তারাই প্রকৃত বীর। একজন বুদ্ধকে পরিপূর্ণ সিদ্ধিলাভে সক্ষম করবার জন্য শত শত বুদ্ধকে নীরব সাধনায় দেহপাত করতে হয়েছে।'

তাই দেশের সেবার জন্য স্বামীজী চেয়েছিলেন একদল আত্মত্যাগী যুবক, যারা মানবহিতার্থে জীবন বিনিয়োগ করবে।

পৃথিবীতে মানুষ আছে স্বভাবতঃ দু-রকমের। একদল বাস্তবধর্মী; এরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর একদল আদর্শধর্মী; এরা নিতান্ত সংখ্যা-লঘিষ্ঠ। বাস্তবধর্মীরা যেন তেন প্রকারেণ আরামে বিলাসে প্রাচুর্যে থাকতে চায়। স্বার্থসিদ্ধির জন্য যদিও এরা সময় সময় আদর্শবাদের কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে, কিন্তু তাতে কখনও আস্থা রাখে না। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য এরা আদর্শকে বলি দিতে পারে। আদর্শধর্মীরা যা প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে, তার রক্ষার জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দেয়। এরাই তরুণতপনের মতো উজ্জ্বল। পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর ও মঙ্গলকর, তার সৃষ্টি ও রক্ষায় এদের অবদান অসামান্য। যে জাতির মধ্যে আদর্শধর্মী মানুষের প্রাধান্য, জগতের উপর সেই জাতিরই আত্মিক প্রাধান্য। অন্তরের প্রসার যতই বেড়ে যায়, মহাব্রতে আত্মদান করবার প্রেরণাও ততই বেশী ক'রে আসে। আত্মপ্রসারে এবং ত্যাগস্বীকারে কুণ্ঠা সঙ্কুচিত চিত্তেরই অসুস্থ অভিব্যক্তি। স্বামীজী বলেছেন, 'All expansion is life, all contraction is death.' আমাদের জাতিকে যদি আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু নিয়ে উজ্জীবিত হয়ে উঠতে হয়, তবে সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ ক'রে আদর্শধর্মী যৌবনের মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে হবে। স্বার্থত্যাগ অমর জীবন নিয়ে আসে, ভয়ের কিছু নেই:

'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
ভয় নাই ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান,
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।'

যুবকদের দৈহিক শক্তিচর্চার উপর স্বামীজী বিশেষ জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে গীতাপাঠের চেয়ে ফুটবলখেলায় শ্রেয়োলাভ সহজতর। মাংসপেশী যার লোহার মতো শক্ত আর ইস্পাতের মতো দৃঢ় যার স্নায়ুমণ্ডলী এবং মস্তিষ্ক যার সতেজ, সেই গীতার মর্ম কথা ভাল ক'রে বুঝতে পারে।

জাতির উন্নয়নে শিক্ষার স্থান সকলের আগে। স্বামীজী বলেন—জনগণকে শিক্ষিত করে তোল, তাদের সব সমস্যা সমাধানের পথ তারা নিজেরাই বের ক'রে নেবে। তবে শিক্ষার ধারা ঠিকমতো হওয়া চাই। পূর্ণজ্ঞান প্রতিটি মানুষের মাঝেই অজ্ঞানের আবরণে আবৃত আছে, সেই আবরণ উন্মোচন করার নামই শিক্ষা। শিক্ষক ছাত্রকে সহায়তা করেন, কিন্তু সে শেখে প্রাকৃতিক নিয়মে তার নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিবলে। আমাদের দেশে প্রকৃত মানুষ তৈরী করবার উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা স্বামীজীর সময় ছিল না, এখনই বা কতদূর আছে, তা বলতে পারি না। স্বামীজী বলেন যে, শিক্ষা মানে কতগুলো তথ্য আর শব্দ ঠেসে মাথাটাকে ভারাক্রান্ত করা নয়। বুদ্ধি-

বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে শরীর মন ও চরিত্রের সর্বাঙ্গ-সুন্দর পরিণতি-সাধনই প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য। এরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক স্বাবলম্বী হ'তে শেখে এবং কঠোর জীবন-সংগ্রামে জয়ী হয়। যে শিক্ষা যুবকদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে না শেখায় স্বামীজীর মতে সে-শিক্ষা শিক্ষাই নয়। শিক্ষা হচ্ছে কার্যকর জ্ঞান অর্জন, আর চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ-সাধন। স্বামীজীর মতে ধর্মই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। স্বামীজী বলেছেন, প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে, যার অর্থ চিন্তায় বাক্যে এবং কর্মে সর্বদা শুচিতা রক্ষা করা। ব্রহ্মচর্য-পালনে মনে অমিত বল আসে। শিক্ষার্থীকে নিজের শক্তির উপর শ্রদ্ধা রাখতে হবে। আত্মবিশ্বাস হারিয়েই ভারতের জাতীয় অবনতি আরম্ভ হয়েছে। আচার্যের মহান্ ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে থাকলেই ছাত্রজীবন মহৎ হয়ে গড়ে ওঠে।

স্বামীজী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের একটি পরিকল্পনা করেছেন। তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে থাকবে একটি মন্দির। সে মন্দিরে থাকবে শুধু শ্রেষ্ঠ প্রতীক 'ওঁ'। পরস্পরের সাথে কলহ না ক'রে সেখানে সব সম্প্রদায়ের মত-প্রচারের অবাধ স্বাধীনতা থাকবে, কারণ ধর্মই ভারতের জীবন। যদি ধর্মকে বাদ দিয়ে নিছক বস্তুবাদের উপর ভারতকে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা হয়, তবে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে মন্দির-সংলগ্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত শিক্ষকের দল গড়ে তোলা হবে। সন্ন্যাসীরা যেমন দ্বারে দ্বারে ধর্ম বিতরণ করেন, এরা তেমনি দ্বারে দ্বারে শিক্ষা বিতরণ করবেন। এই গণশিক্ষকের দল সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে বিশাল জনতাকে মানুষের মতো মানুষ ক'রে তুলবে।

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে যে বিপ্লবীরা বুকের রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর ক'রে মাতৃভূমির মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, অগ্নিযুগের সেই বীরদের প্রাণে উন্মাদনা আসতো স্বামী বিবেকানন্দের বইগুলি পড়ে। গীতা, আনন্দমঠ আর বিবেকবাণী এদেশে একদল পুরুষ-সিংহ গড়ে তুলেছিল।

বর্তমান বহুবিধ আবিলতা-ময় পরিবেশ থেকে দেশকে উদ্ধার করতে হ'লে চাই অগ্নি-পরিশুদ্ধ সিংহবিক্রম ও উদ্যমশীল যুবকের দল, স্বামীজী যাদের ওপর সব চেয়ে বেশী নির্ভর করতেন। স্বামীজী বলেছেন, 'উঠ, জাগ, শ্রদ্ধাবান্ হও বীর্যবান্ হও, পরহিতে জীবন উৎসর্গ কর।' 'নামযশ চুলোয় যাক; কাজে লাগ, সাহসী যুবকবৃন্দ, কাজে লাগ। আমার ভেতর যে কি আগুন জ্বলছে, তার সংস্পর্শে এখনো তোমাদের হৃদয় অগ্নিময় হয়ে ওঠেনি। তোমরা এখন পর্যন্তও আমায় বুঝতে পারোনি। তোমরা এখনো আলস্য ও ভোগের পুরাতন রাস্তায় চলেছ। দূর করে দাও যত আলস্য—দূর করে দাও ইহলোক ও পরলোকে ভোগের বাসনা—আগুনে ঝাঁপ দাও এবং লোককে ভগবানের দিকে নিয়ে এস।' 'ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করি, আমার ভেতর যে আগুন জ্বলছে, তা তোমাদের ভেতর জ্বলে উঠুক, তোমাদের মন মুখ এক হোক—ভাবের ঘরে চুরি যেন একদম না থাকে, তোমরা যেন জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মতো মরতে পার—ইহা সদা-সর্বদা বিবেকানন্দের প্রার্থনা।' ভারতের প্রাণপুরুষ স্বামীজীর কম্বুকণ্ঠের ঘোষণায় তারা প্রাণবন্ত হয়ে উঠুক, এই প্রার্থনা নিয়ে স্বামীজীকে প্রণাম জানাই।

উপনিষদের ভিত্তিতে ভারতীয় সংস্কৃতি*

অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী

উপনিষদ্ এবং উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যা ভারতীয় সংস্কৃতির চরম উৎকর্ষ। এই ব্রহ্মবিদ্যা ভারতের অমূল্য সম্পদ। ব্রহ্মবিদ্যার আকরই হচ্ছে আমাদের উপনিষদ্। উপনিষদ্ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে ১০৮ খানি উপনিষদ্ রচিত হয়েছিল। কিন্তু যে কয়খানি উপনিষদ্‌কে আমরা প্রামাণিক বলে গ্রহণ করি, সেগুলির সংখ্যা হচ্ছে দশ। আচার্য শঙ্কর এই দশখানি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেছিলেন। ঠিক কখন উপনিষদ্‌গুলি রচিত হয়েছিল, সেকথা আমরা সঠিকভাবে বলতে পারি না; উপনিষদ্‌গুলি কোন্ ঋষি কখন রচনা করেছিলেন, তা আমাদের জানা নেই। তবে একথা বলা যায়, একথা বলা হয়ে থাকে যে খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী থেকে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত এই উপনিষদ্‌গুলি রচিত হয়েছিল। কতকগুলি উপনিষদ্ নিশ্চয়ই বৌদ্ধযুগের পূর্বের, কতকগুলি বৌদ্ধযুগের পরের।

এই উপনিষদ্‌গুলির মুখ্য বিষয়বস্তু হচ্ছে ব্রহ্মবিদ্যা; তার দুটো দিক—একটা হল তত্ত্বের দিক, আর একটা সাধনার। বিভিন্ন উপনিষদ্‌গুলিতে তত্ত্বের কথা এবং সাধনার কথা, দুই-ই আলোচিত হয়েছে। উপনিষদের সবচেয়ে বড় কথা ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্ম কি? ব্রহ্মের সংজ্ঞা কি? একদিন মহর্ষি ভৃগু তাঁর পিতা বরুণের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন; তৈত্তিরীয় উপনিষদে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এই ব্রহ্মতত্ত্ব বিশদরূপে আলোচিত হয়েছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের কথা—'ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ। বরুণং পিতরম্ উপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি।'—ভগবন্, ব্রহ্ম সম্বন্ধে কথা বলুন! উত্তরে বরুণ ভৃগুকে বললেন, 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি। তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ ব্রহ্মেতি।' বললেন এই কথা—যেখান থেকে এই বিশ্বের উৎপত্তি, যাঁকে অবলম্বন করে, যাঁকে আশ্রয় করে বিশ্বের ভূতবর্গ জীবিত আছে, এবং বিশ্বের সমস্ত ভূত আবার যেখানে বিলীন হয় বা লয়প্রাপ্ত হয়, তাই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নেই। ব্রহ্ম কথার অর্থ হচ্ছে বৃহৎ। এই বৃহতের মধ্যে, এই ব্রহ্মের মধ্যে, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিধৃত। একথা কঠোপনিষদেও আছে। যম নচিকেতাকে বলেছিলেন, 'এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্। এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥' সেই কথা জান নচিকেতা, 'তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি—ওমিত্যেতৎ।' এর মধ্যে সব রয়েছে। সেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা! আমরা জানি যে, বাদরায়ণসূত্র এই উপনিষদ্‌কে অবলম্বন করে রচিত হয়েছিল, এবং আচার্য শঙ্কর বলেছেন যে বাদরায়ণসূত্রগুলি বেদান্ত-দর্শনের পুষ্পস্তবক। সেই ব্রহ্মের কথা ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ভৃগু পিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কেমন করে জানব?' উত্তর পেয়েছিলেন, 'তপস্যা কর।' কিছুদিন তপস্যা করে তিনি ফিরে এসে বললেন, 'অন্নই ব্রহ্ম।' 'অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।' এই material world, এই ভৌতিক জগৎ-ই ব্রহ্ম, এই-ই Reality, এই-ই সত্য। পিতা বললেন, 'না হয়নি; আবার যাও।' আবার তপস্যা

* বেলঘরিয়া বিদ্যার্থী আশ্রমে প্রদত্ত একটি বক্তৃতা অবলম্বনে।

শুরু করলেন। 'প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।' পিতা তখনও বললেন, 'হয়নি।' আবার তপস্যা করে 'বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।' পিতা বললেন, 'না হয়নি।' শেষে এসে বললেন, 'আমি এবার সন্ধান পেয়েছি—আনন্দ!—আনন্দই ব্রহ্ম, আনন্দের সন্ধান পেয়েছি।'

এইটি বড় কথা। এত বিজ্ঞানের এত চর্চা হয়েছে পাশ্চাত্য দেশে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, কিন্তু বিভিন্ন দেশের মানুষ এখনও 'অন্নই ব্রহ্ম' এই কথা নিয়ে পড়ে আছেন, তার ঊর্ধ্বে উঠতে পারছেন না। তাই তো বর্তমান জগতে এত হিংসা, এত দ্বেষ; এত হানাহানি কাটাকাটি! আনন্দ ব্রহ্ম—এই সবচেয়ে বড় কথা, এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই আনন্দ-সংবাদ উপনিষদের পরম জ্ঞাতব্য বিষয়। এই কথাই বিভিন্ন উপনিষদে ছড়ানো রয়েছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আরও আছে যে, যিনি আনন্দ তিনিই রস—'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।' রবীন্দ্রনাথ শেষ রোগশয্যায় একদিন এই মন্ত্র ধ্যান করছিলেন। লিখেছিলেন, যেন সামনে সব শূন্য, কোন আশ্রয় যেন পাচ্ছেন না খুঁজে; সেদিন এই কথা লিখেছিলেন রোগশয্যায়, 'যাহা কিছু চেয়েছিনু একান্ত আগ্রহে, তাহার চৌদিক হতে বাহুর বেষ্টন অপসৃত হয় যবে, তখন সে বন্ধনের মুক্তক্ষেত্রে যে চেতনা উদ্ভাসিয়া ওঠে, প্রভাত আলোর সাথে দেখি তার অভিন্ন স্বরূপ। শূন্য তবু সে তো শূন্য নয়। তখন বুঝিতে পারি ঋষির সে বাণী—আকাশ আনন্দপূর্ণ না রহিত যদি, জড়তার নাগপাশে দেহমন হইত নিশ্চল।' 'কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।' কবি রোগশয্যায়, মৃত্যুশয্যায় প্রেরণা পেয়েছিলেন তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই মন্ত্র থেকে। তিনিই রস, তিনিই আনন্দ। ব্রহ্মই রস, ব্রহ্মই আনন্দ, ব্রহ্মই সত্য। 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম'—তৈত্তিরীয় উপনিষদের আর একটি মন্ত্র।

এগুলি উপলব্ধির কথা। উপনিষদ্ তর্কশাস্ত্র নয়, উপনিষদ্ বিচারশাস্ত্র নয়, উপনিষদ্ Logic নয়। উপনিষদ্ সত্যদৃষ্টি। সেই সত্যদৃষ্টির বা উপলব্ধির কথা উপনিষদের বিভিন্ন মন্ত্রগুলিতে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

আনন্দের কথা বলছিলাম। আনন্দ পাই কই? সত্যকে উপলব্ধি করতে পারি না, সম্মুখে অন্ধকার দেখি। যে কথা বৃহদারণ্যক উপনিষদের ঋষি বলছেন, 'আমি তো খুঁজি আলোক, আমি তো খুঁজি সত্য! আমি তো খুঁজি অমৃত! কিন্তু আমি দেখি না।' তাই উদাত্তকণ্ঠে বৃহদারণ্যক উপনিষদের ঋষি বলেছিলেন, 'অসতো মা সদ্গময়।' নিশ্চয়ই সত্য বলে একটা পদার্থ আছে; আমি সত্যকে দেখতে চাই! 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' —আমার সামনে অন্ধকার, আমি জ্যোতির্লোকে উপনীত হতে চাই। 'মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়' —বারবার মৃত্যু এসে আমার দ্বারে হানা দেয়, আমি মৃত্যুভয়ে ভীত, আমি জীবনের অমৃতত্বের আস্বাদ লাভ করতে পারি না। তাইতো প্রার্থনা, 'মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।' এইটাই তো বড় কথা এবং এই কথা পরবর্তী সাহিত্যে, পুরাণে, মহাভারতে বারে বারে বলা হয়েছে। মহাভারতের এক জায়গার কথা মনে পড়ছে: কুরুক্ষেত্রে সমরপ্রাঙ্গণে শরশয্যাশায়ী কুরুপিতামহ ভীষ্ম স্তব করছেন শরশয্যায় শুয়ে। তখনও তিনি অন্তরে প্রেরণা লাভ করার চেষ্টা করছেন, আত্মস্থ হয়ে স্তব করছেন ভীষ্ম। দেখছেন সামনে অন্ধকার; কিন্তু অন্ধকারকে অস্বীকার

করে উপনিষদের একটি মন্ত্রকে অবলম্বন করে ভীষ্ম বলছেন, 'মহতস্তমসঃ পারে পুরুষং জ্বলনদ্যুতিম্। যং জ্ঞাত্বা মৃত্যুমত্যেতি তস্মৈ জ্ঞেয়াত্মনে নমঃ॥' 'মহতস্তমসঃ পারে'—চারিদিকে অন্ধকার। আমরা প্রত্যেকে জীবনে দেখি এই অন্ধকার। কিন্তু অন্ধকারকে অস্বীকার করছেন পুরুষ। বলছেন, আমি দেখেছি, এই অন্ধকারের পরপারে জ্যোতির্ময় পুরুষকে দেখেছি—'মহতস্তমসঃ পারে পুরুষং জ্বলনদ্যুতিম্। যং জ্ঞাত্বা মৃত্যুমত্যেতি তস্মৈ জ্ঞেয়াত্মনে নমঃ॥' তিনি জ্ঞেয়স্বরূপ। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের কথা—ঋষি ডেকে বলছেন মানুষকে, 'কেন তুমি ভয় পাও, মানুষ? আমি দেখেছি তাঁকে—'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্য-বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাঽতি-মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥' রবীন্দ্রনাথ এই শতাব্দীর প্রথম দিকে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের এই মন্ত্রের ওপর একটি কবিতা লিখেছিলেন। কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল 'কল্পনা'য় ১৩০৬ সালে; সে কবিতাটি—'কল্পনার রাত্রি'। রাত্রি অন্ধকার; তাই কবি লিখছেন, 'মোরে কর সভাকবি ধ্যানমৌন তোমার সভায়, হে শর্বরী, হে অবগুণ্ঠিতা! তোমার আকাশ জুড়ে জপিছে যাহারা, বিরচিব তাহাদের গীতা। কত নিদ্রাহীন চক্ষু যুগযুগ ধরি' খুঁজেছিল প্রশ্নের উত্তর।' এ প্রশ্নের উত্তর তো পায় না মানুষ; তাই কবি লিখছেন, 'কত নিদ্রাহীন চক্ষু যুগযুগ ধরি' খুঁজেছিল প্রশ্নের উত্তর। কত ভক্ত জুড়ি' দুই কর, তোমার নির্বাক মুখে দৃষ্টিপাত করি বসেছিল।' উত্তর পায়নি। হঠাৎ একদিন দেখা গেল একজন বললেন, 'না, না, আমি উত্তর পেয়েছি'—'স্তম্ভিত তমিস্রপুঞ্জ কম্পিত করিয়া অকস্মাৎ অর্ধরাত্রে উঠেছে উচ্ছ্বসি সদ্যস্ফুট ব্রহ্মমন্ত্র আনন্দিত ঋষিকণ্ঠ হতে আন্দোলিয়া ঘন তন্দ্রারাশি—বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।' 'সদ্যস্ফুট ব্রহ্মমন্ত্র আনন্দিত ঋষিকণ্ঠ হতে আন্দোলিয়া ঘন তন্দ্রারাশি।' 'পীড়িত ভুবন লাগি মহাযোগী করুণাকাতর, চকিতে বিদ্যুৎরেখাবৎ তোমার নিখিললুপ্ত অন্ধকারে দাঁড়ায়ে একাকী, দেখেছে বিশ্বের মুক্তিপথ।' তিনি বলে গেলেন, ঘোষণা করে গেলেন, এই তো মুক্তির পথ, এপথে বিচরণ কর, উপনিষদের আলোকে বিচরণ কর, অন্ধকার থাকবে না। এই তো বড় কথা! এই হচ্ছে সত্যদৃষ্টি। সেই সত্যের কথা, সেই ব্রহ্মের কথা, সেই আনন্দের কথা বিভিন্ন উপনিষদে ছড়িয়ে আছে।

আর একটি কথা মনে হচ্ছে—বৃহদারণ্যক উপনিষদের কথা—বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদ! আনন্দ কাকে বলে তা আমরা বুঝতে পারি এই সংবাদ থেকে। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করছেন; তাঁর দুই পত্নী মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীকে ডেকে বললেন, 'তোমরা আমার বিষয়সম্পত্তি ভাগ করে নাও।' ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী বললেন, 'তুমি যা দিতে চাচ্ছ, স্বামিন্, তা দিয়ে আমার কি লাভ হবে, আমি কি পাবো?' যাজ্ঞবল্ক্য হেসে বললেন, 'বিত্তশালী মানুষ যেভাবে জীবনযাপন করে তুমিও সেভাবে জীবনযাপন করবে।' 'আচ্ছা, তোমার এ ধনসম্পত্তি দ্বারা আমি কি অমৃতত্বের আস্বাদ লাভ করিতে পারবো?' যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'না তা হবে না।' তখন ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী উত্তর দিয়েছিলেন, 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিম্ অহং তেন কুর্যাম্।'—যে বিষয়সম্পত্তির দ্বারা, পার্থিব ধনসম্পদের দ্বারা জীবনে অমৃতত্বের আস্বাদ লাভ করা যায় না, আমি তা দিয়ে কি করবো? আমি তা চাই না। উপনিষদের এই মন্ত্রে

আমরা প্রকৃত আনন্দের সন্ধান পাচ্ছি। ঠিক এই কথাই একদিন নচিকেতা যমকে বলেছিলেন। কঠোপনিষদের সেই কথা—ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণবালক নচিকেতা যমের দরজায় উপনীত হয়েছেন। যম তাঁকে বলছেন, 'অন্য প্রশ্ন কোরো না—নচিকেতো মরণং মাঽনুপ্রাক্ষীঃ—মরণকে একথা জিজ্ঞাসা ক'রো না, বরং—শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ। ভূমের্মহদায়তনং । স্বয়ং চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি। এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং বৃণীষ বিত্তং চিরজীবিকাং চ। মহাভূমৌ নচিকেতস্তমেধি। কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি।' কত প্রলোভন দেখিয়েছিলেন যম—তুমি সম্রাট হবে, মহারাজা হবে, সমগ্র পৃথিবীটা তোমার করতলগত হবে। কি বলেছিলেন সেদিন নচিকেতা? 'ধর্মরাজ, তুমি আমাকে যে প্রলোভন দেখাচ্ছো, সেই সম্পত্তি, সেই সম্পদ কদিন থাকে?—শ্বোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ। অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব। তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে।—তুমি যা দিতে চাচ্ছ, তাতো কাল থাকে না; সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ—ইন্দ্রিয়েরও ক্ষমতা থাকে না ভোগ করবার। আমি তা দিয়ে কি করবো? —তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে।' উপহাস করে, পরিহাস করে বলেছিলেন, 'রথ, অশ্ব, দাস-দাসী, অপ্সরা, কিন্নরী—এসব তুমি ভালবাস-এসব তোমারই থাকুক, আমি তা চাই না।' 'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ'—এইটাই বড় কথা। নচিকেতা বলতে পেরেছিলেন সেদিন, 'তুমি বিত্ত দিচ্ছ, কিন্তু বিত্ত দ্বারা মানুষ কি কখনও পরমা তৃপ্তি লাভ করে? আমি যে আনন্দের সন্ধানে এসেছি! আমি যে অমৃতত্বের আস্বাদ লাভ করতে চাই। তুমি আমাকে বিত্ত দিচ্ছ;—ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ—আমি বিত্ত চাই না।' সেদিন যমদ্বারে ব্রহ্মচারী নচিকেতা যমকে এই কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। আর এই কথাই তো বলবার। তত্ত্বের দিক দিয়ে বলা হয়েছে এই কথাগুলি। আবার সাধনার দিকও আছে।

ছান্দোগ্যোপনিষদের সেই ভূমার সংবাদ। চান্দোগ্যোপনিষদ্ একখানি প্রামাণিক উপনিষদ্, নির্ভরযোগ্য উপনিষদ্। সেখানে দেখছি, একদিন নারদ ঋষি সনৎকুমারের কাছে এসেছেন। নারদ-সনৎকুমার-সংবাদ। নারদ শোকগ্রস্ত হয়ে এসেছেন, শোকের হাত থেকে অব্যাহতি তিনি পাচ্ছেন না। সনৎকুমার নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, তুমি কি কি পড়েছো? কি কি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছো?' নারদ একটা প্রকাণ্ড ফিরিস্তি দিলেন—সব কিছু পড়েছেন। 'অনেক কিছু তো পড়েছ দেখছি, তাহলেও বলতে হবে—স্বল্পমেব। এ তো বেশী নয়।' নারদ বললেন, 'মন্ত্রবিদেবাস্মি ভগবন্ নাহমাত্মবিদ্।' আমি মুখস্থ করেছি অনেক মন্ত্র, মুখস্থ করেছি অনেক পুস্তক বা গ্রন্থ—'মন্ত্রবিদেবাস্মি ভগবন্, নাহমাত্মবিদ্।' আত্মবিদ্যা আমার হয়নি—'সোঽহং ভগবঃ শোচামি—তাইতো আমি শোকগ্রস্ত। আমি শোকে মুহ্যমান, আপনি উপদেশ দিন।' এই কথা শুনে অনেক কিছু উপদেশ দিয়ে সনৎকুমার শেষে বললেন, 'ভূমৈব সুখম্। নাল্পে সুখমস্তি।' উপনিষদের চরম কথা—'নারদ, ভূমার উপলব্ধিতেই মানুষের সুখ, যা সান্ত, যা খণ্ডিত, যা পরিচ্ছিন্ন, তাতে সুখ নেই। ভূমৈব সুখম্।' এই থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রথম বয়সে একটি গান রচনা করেছিলেন, 'অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়। কণাটুকু যদি হারায় তা লয়ে প্রাণ করে হায় হায়। নদীতট সম কেবলি বৃথাই, প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই, একে

একে বুকে আঘাত করিয়া ঢেউগুলি কোথা যায়। যাহা কিছু যায়, আর যাহা কিছু থাকে, সব যদি দিই সঁপিয়া তোমাকে, তবে নাহি ক্ষয়, সবই জেগে রয় তব মহা মহিমায়। তোমাতে রয়েছে কত শশী ভানু, হারায় না কভু অণু পরমাণু, আমার এ ক্ষুদ্র হারাধনগুলি রবে নাকি তব পায়? অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়।' অল্পে সুখ নাই, সুখ ভূমার উপলব্ধিতে। যাঁকে বলি ব্রহ্ম, যাঁকে বলি ভগবান, তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত?—নিজ মহিমায়—'স্বে মহিম্নি'। সেই মহিমার উপলব্ধি করতে হবে। তাতেই মানুষের জীবনের সুখ, তাতেই মানুষের জীবনের শান্তি।

মুণ্ডক উপনিষদের কথা; এই আনন্দতত্ত্ব সম্বন্ধেই। মুণ্ডক উপনিষদের সেই অক্ষয় বাণী—পৃথিবীতে যা দেখছি, দুঃখের তো কিছুই নেই, সবই আনন্দের—'আনন্দরূপম্ অমৃতং যদ্‌বিভাতি।' যা কিছু দেখছি, সবই তাঁর আনন্দরূপ, অমৃতরূপ। অমৃতের উৎস থেকেই সব উঠছে। রবীন্দ্রনাথের রোগশয্যার কবিতা, 'অমৃতের উৎসস্রোতে চিত্ত ভেসে চলে যায় দিগন্তের নীলিম আলোতে। কার পানে পাঠাইবে স্তুতি, ব্যগ্র এই মনের আকুতি? অমূল্যেরে মূল্য দিতে ফিরে সে খুঁজিয়া বাণীরূপ—করে থাকে চুপ। বলে, আমি আনন্দিত। ছন্দে যায় থামি, বলে, ধন্য আমি।' সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই আনন্দ, এই আনন্দের উপলব্ধি, আনন্দের আস্বাদ—'আনন্দরূপম্ অমৃতং যদ্‌বিভাতি।' রোগশয্যায় 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' এই মন্ত্রের ওপর লিখেছিলেন, 'জীবনের দুঃখে শোকে তাপে, ঋষির একটি বাণী, চিত্তে মোর দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল—আনন্দ অমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ। ক্ষুদ্র যত বিরুদ্ধ প্রমাণে মহানেরে খর্ব করা সহজ পটুতা। অন্তহীন দেশকালে পরিব্যাপ্ত সত্যের মহিমা যে দেখে অখণ্ডরূপে, এজগতে জন্ম তার হয়েছে সার্থক।' এই আনন্দের উপলব্ধি চাই।

আর একটি কথা তত্ত্বের দিক দিয়েও, সাধনার দিক দিয়েও; ঈশোপনিষদের কথা। ঈশোপনিষদের ঋষি বলছেন, কবিতা করে পূষন্‌কে বলেছেন, 'আমি সত্যকে উপলব্ধি করতে চাই, কিন্তু দেখছি সত্যের মুখ আবরণের দ্বারা আবৃত, সত্যের বোধ আচ্ছন্ন—হিরণ্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তত্ত্বং পূষন্নাবৃণু সত্য-ধর্মায় দৃষ্টয়ে॥ আমি সত্যের পূজারী, আমি সত্যাগ্রহী, আমি সত্যনিষ্ঠ। আমি সত্যকে দেখতে চাই, হে পূষন্, সরিয়ে নাও তোমার আচ্ছাদন!' তাইতো মানুষের চিরন্তন ক্রন্দন—'অপাবৃণু—অপাবৃণু'—সরিয়ে নাও ওই আবরণ, সরিয়ে নাও ওই আচ্ছাদন। শুধু তাই নয়, পরের শ্লোকে বলছেন, 'পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি, যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।' কত বড় স্পর্ধা! পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, তাঁর 'Discovery of India' গ্রন্থে উপনিষদের ওপর যে অধ্যায়টি আছে, তাতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করে বলেছেন, 'What superb confidence of Indian Saints!' কি কথা বলেন, কত বড় স্পর্ধা তাঁদের—Challenge! বলেছেন, যোঽসাবসৌ পুরুষ সোঽহমস্মি'—তুমি আর আমি যে একই! রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছিলেন, 'দেখি তোমার আমার মাঝারে যে পুরুষ, সে এক।' তুমিও যা, আমিও তো তাই। তোমার মধ্যে যে পুরুষ, আমার মধ্যেও সেই পুরুষ। আমি সেটা দেখতে চাই।

আর একটি কথা এই থেকে আসছে। এই যে শক্তি, জগতের এই যে বাহক শক্তি, এ

কল্যাণশক্তি। সত্যই, কল্যাণ-শক্তি উপনিষদের ঋষিগণের ধ্যানদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। সেই কল্যাণ-শক্তিকে জাগ্রত করা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা বা তপস্যা। সে কল্যাণ-শক্তিকে জাগ্রত করতে হবে। তাই সাধনার কথাও বলেছেন উপনিষদের ঋষিগণ বিভিন্ন স্থানে। ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্র— অত্যন্ত প্রিয় ছিল যে মন্ত্র মহাত্মা গান্ধীর, অত্যন্ত প্রিয় ছিল স্বামী বিবেকানন্দের, অত্যন্ত প্রিয় ছিল রবীন্দ্রনাথের—'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনম্‌॥' পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, তাঁর ঐ গ্রন্থে উপনিষদের উপরে যে একটি অধ্যায় আছে, তাতে একটি কথা বলেছেন অনেক দুঃখ করে যে এঁরা ভাল কথা অনেক বলেছেন individual সম্বন্ধে, পুরুষ সম্বন্ধে, কিন্তু সামাজিক চেতনা যেন একটু কম। একথা বলেছেন, social sense যেন একটু কম, individual excellence-এর কথা খুবই আছে। তিনি নিজে স্বীকার করেছেন, 'আমি সংস্কৃত জানি না, আমি অনুবাদ পড়েছি।' সামাজিক চেতনা যেন একটু কম, social sense-এর যেন একটু অভাব—আমি এই মতের সঙ্গে ঠিক একমত হতে পারি না। ঈশোপনিষদের যে কথা বললাম, 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ! তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ॥' তুমি ত্যাগ করে ভোগ কর। 'মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং' পরধনে তুমি লোভ কোরো না। আবার বলছেন ঋষি, মানুষ তুমি বেঁচে থাক, বেঁছে থাকার সাধনা কর। দীর্ঘজীবী হবার চেষ্টা কর। কেন?—জনকল্যাণের জন্য। 'চিকীর্ষু লোকসংগ্রহং'—গীতায় যে কথা। জনকল্যাণের জন্য বেঁচে থাক; 'কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।' ঈশোপনিষদের দ্বিতীয় শ্লোক। কর্ম করবার জন্য এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হবে। একশো বছর বেঁচে থাকতে হবে। একথা বলছেন উপনিষদের ঋষি। কর্ম করতে হবে। আর সে কর্ম—'ন কর্ম লিপ্যতে নরে।' তুমি যদি অনাসক্ত হয়ে কর্ম কর, সে কর্ম তোমাকে লিপ্ত করবে না, সে কর্মের দ্বারা তোমার কখনো অধোগতি হতে পারে না। তাই কর্মের কথা বলেছেন। কোনোপনিষদের ঋষি বলেছেন, পৃথিবীতে এসেছি ব্যক্তিত্বের স্ফুরণের জন্য। পরিচয় দিয়ে যেতে হবে, ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়ে যেতে হবে —'আবিরাবির্ম এধি'—বেদের প্রার্থনা এবং উপনিষদের প্রার্থনা—হে আবিঃ, হে প্রকাশ-স্বরূপ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও—আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ সার্থক হয়ে উঠুক। আবার কেনোপনিষদে ঋষি বলেছেন, 'ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।'—এই পৃথিবীতে, এই ধূলির ধরণীতে, এই মর্ত্যধামে, এই মনুষ্যলোকে মানুষ যদি এই সত্য অবগত হয়, তাহলেই তার জীবন হল সার্থক। যদি তা না হয়, যদি মানুষ এ সত্য উপলব্ধি করতে না পারে তাহলে সেটা হল তার 'মহতী বিনষ্টি' সবচেয়ে বড় সর্বনাশ। তাই কোনোপনিষদের ঋষি বলেছেন, মানুষের 'মহতী বিনষ্টিঃ' বা সবচেয়ে বড় সর্বনাশ দেহের মৃত্যুতে নয়, আত্মার অপ্রকাশে। প্রকাশিত হতে হবে এ পৃথিবীতে। এ কথা উপনিষদের ঋষি বারবার বলছেন। এ সমস্ত উপনিষদ্‌ যদি পর্যালোচনা করি—বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌, ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌, ঈশোপনিষদ্‌, কেনোপনিষদ্‌, কঠোপনিষদ্‌, প্রশ্নোপনিষদ্‌, মুণ্ডকোপনিষদ্‌, মাণ্ডুক্যোপনিষদ্‌-এবং শ্বেতাশ্বত-রোপনিষদ্‌ যদি ভাল করে আমরা আলোচনা করি তাহলে এটাই বারবার দেখবো, এই

সত্যের প্রতিষ্ঠা, এই অভয়বাণী এবং এই জনকল্যাণের কথা ছড়িয়ে রয়েছে উপনিষদের পতায় পাতায়। আর একটি কথা বলতে চাই। যে কথাটি উপনিষদে বারবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সেটি হচ্ছে এই বিশ্ব সম্বন্ধে। আমরা যে বিশ্বে বাস করি—The world around us, man and the world around him—তার সম্বন্ধে উপনিষদের ঋষি বারবার বলেছেন, তুমি মনে করো যে নানা দ্বারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খণ্ডিত ; কিন্তু নানা বলে কোন জিনিস নেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। কঠোপনিষদে যম নচিকেতাকে বলছেন, 'মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন।' আমাদের রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন তাঁর History of Indan Philosophy গ্রন্থে উপনিষদের উপর যে অধ্যায়টি আছে, তাতে একথা বারেবারে বলেছেন, এ মন্ত্রটি উল্লেখ করেছেন। নানা বলে জিনিস নেই, 'নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন।' 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি।' যে মানুষ এই জীবনে পৃথিবীতে নানার ধাঁধায় ঘোরে, সে বারবার মৃত্যু থেকে মৃত্যুর দরজায় উপনীত হচ্ছে। তার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, নিষ্ফল হয়ে যাচ্ছে। 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি।' একত্বই সত্য। Oneness—it is no twoness—twoness বলে কিছু নেই। Oneness of the Universe. আজ বিজ্ঞানও তাই প্রমাণ করে চলেছে ; এই একত্ব উপলব্ধি করতে হবে। ঈশোপনিষদের ঋষিও সেই কথা বলছেন : মানুষ, তুমি শোকগ্রস্ত হও ; মৃত্যুতে, বিরহে, বিয়োগব্যথায় তুমি মুহ্যমান হও—কিন্তু 'তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।' তুমি একত্বটা অনুভব করতে পার না বলেই তো শোকগ্রস্ত হও, মোহগ্রস্ত হও। এর মধ্যেই তো সব—'ওমিত্যেতৎ'। যম বলেছিলেন যে কথা নচিকেতাকে, 'তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি'—সে পদ কি ? 'ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদম্'—সেই বিষ্ণুর পরম পদ। 'ওমিত্যেতৎ।' ঈশোপনিষদের ঋষিও সেই কথাই বলছেন 'তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।' এই একত্বের উপলব্ধি যদি আসে মানুষের মনে, তাহলে শোক থাকে না, মোহ থাকে না। তাই বলছিলাম, নানা দিক থেকে যদি দেখি, তাহলে দেখতে পাবো যে উপনিষদের বাণী সত্যের বাণী, উপনিষদের বাণী অভয় বাণী, উপনিষদের বাণী জ্ঞানের বাণী এবং যা কিছু আমরা দেখছি, যা কিছু আমরা অনুভব করছি তা সবই বিধৃত হয়ে আছে সেই অখণ্ড ব্রহ্মে, অনন্ত ব্রহ্মে। তাই তো উপনিষদের মন্ত্র, 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম।' তাই তো আবার উপনিষদের মন্ত্র, 'শান্তং শিবং অদ্বৈতম্।' সব চেয়ে বড় কথা এই শান্তির কথা, শিবের কথা, মঙ্গলের কথা, এবং অদ্বৈততত্ত্বের কথা। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ একদিন লিখেছিলেন, 'তোর চেয়ে আমি সত্য—এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব ত্যাগ। শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।'

উপনিষদের বাণী, উপনিষদের মন্ত্র সার্থক হয়ে উঠুক আমাদের জীবনে।

'বেদান্তই আমাদের জীবন, বেদান্তই আমাদের প্রাণ।' 'জগতে যত শাস্ত্র আছে, তন্মধ্যে কেবল ইহারই (বেদান্তের) উপদেশাবলীর সহিত বহিঃপ্রকৃতির বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে যে ফল লব্ধ হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে।' 'বর্তমান জড়বাদ নিজ সিদ্ধান্তসমূহ পরিত্যাগ না করিয়া কেবল বেদান্তের সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করিলেই আধ্যাত্মিকতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে।'

—স্বামী বিবেকানন্দ

ভারত-ভগিনী নিবেদিতা

শ্রীতামসরঞ্জন রায়

ধ্যানসিদ্ধ আচার্য বিবেকানন্দের মানসকন্যা, ভারত-ভগিনী নিবেদিতার বিচিত্র-মধুর জীবন-কাহিনী নিয়ে আমাদের এই আখ্যায়িকা।

ঘটনাবহুল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে এক বিপরীত পরিবেশে ও এক অপ্রত্যাশিত পটভূমিতে এ আখ্যায়িকার সূচনা, আর বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কতকটা আকস্মিক ভাবেই এর পরিসমাপ্তি। মধ্যবর্তীকালের স্তর-বিন্যস্ত ক্রম-অভিব্যক্তির যে মাধুর্য ও মহিমা সেটি অনন্য, সেটি সুদুর্লভ। জগতের সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্তে কোন দেশের কোনকালের জীবনেতিহাসের সংগ্রহশালায় এমন বিস্ময়কর অভিব্যক্তি ইতিপূর্বে বড় একটা দেখা যায়নি। নিঃশেষ আত্মোৎসর্গের এবং একান্ত আত্ম-বিলুপ্তির এমন নিদর্শনও অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া খুব সহজ নয়। অসীম সমুদ্রের অন্তহীন বেলাভূমিতে যুগে যুগে—

'খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর।'

রূপকথার বচনবিন্যাসে এমন কাহিনী আমরা শুনতে পেয়ে থাকি। ঐ পরশপাথরের স্পর্শ দিয়ে লৌহপিণ্ডকে সে স্বর্ণখণ্ডে পরিণত করবে, হীনবস্তুকে মহৎ মর্যাদা দান করে পরিতৃপ্ত হবে—এই সে উন্মাদের আশা, এই তার স্বপ্ন-বিলাস। এ-জগতের কোন সম্পদ্ সে চায়নি, কোন বস্তু সে কামনা করেনি—

'রাজসম্পদের লাগি নহে সে কাতর—
দশা দেখে হাসি পায়, আর কিছু নাহি চায়,
একবারে পেতে চায় পরশপাথর।'

মানবজীবনের বিস্তৃত বেলাভূমিতেও ঠিক এমনিভাবেই প্রেমোন্মাদ আচার্যকুল যুগে যুগে সজীব পরশপাথরের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা নিয়ে সন্ধান করেছেন, প্রতীক্ষা করেছেন। আর সে অপ্রাকৃত সন্ধানের অমৃতবার্তা নিয়েই কালে কালে গুরু-শিষ্য-সংবাদের এক একটি বিশিষ্ট অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে—মানুষের ধর্ম-ইতিহাসে, সমাজ-ইতিহাসে।

ভারতের যে সুপ্রাচীন ইতিকথা তার অগণ্য সন্তান-সন্ততির জীবনধারাকে যুগ যুগ ধরে উদ্বুদ্ধ করেছে, তার মধ্যে আবার এই গুরু-শিষ্য-সংবাদের বিশেষ তাৎপর্য ও উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। প্রায় প্রত্যেকটি যুগে বা যুগ-সন্ধিক্ষণেই গুরুশক্তির অমেয় প্রভাব ভারতবর্ষ যেন একান্ত-বাঞ্ছিত দেবাশীর্বাদ-রূপেই গ্রহণ করেছে। 'সম্ভবামি যুগে যুগে'—এ আশ্বাস-বাণীতেও সে অশেষ বিশ্বাস স্থাপন ক'রে এসেছে। সেইজন্য কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের অতি-সংকটময় প্রারম্ভমুখে, 'বিষমে সমুপস্থিতে'—গাণ্ডীবধন্বা মহামতি অর্জুন বিষাদ-ক্লিষ্ট হয়ে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের শিষ্যত্ব প্রার্থনা করেছিলেন। বলেছিলেন:

'হে অচ্যুত, হে পুরুষ-প্রধান—আত্মীয় ও স্বজন বিরোধের এই ভয়াবহ আয়োজনে, এই বিপরীত প্রমত্ততায় আমার স্বাভাবিক বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়েছে, আমি বিভ্রান্ত হয়েছি।... অতএব, তোমার কাছে আমার এই নিবেদন,—এই বিষম মুহূর্তে আমাকে পথনির্দেশ কর, কর্তব্য-নির্ণয়ে শুভবুদ্ধি দাও। আমাকে তোমার শিষ্যত্বে গ্রহণ কর।

'কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।'

মোহগ্রস্ত অর্জুনের এই ছিল সেদিনের আর্ত প্রার্থনা, এবং সে প্রার্থনা পূরণ করেই 'সর্বদেবময়ো হরিঃ' অষ্টাদশ অধ্যায়ে 'সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা' উপদেশ করেছিলেন।

কৃষ্ণার্জুন-সংবাদের সে অনবদ্য কাহিনী আজ শুধু হিন্দুর নয়, শুধু ভারতবর্ষের নয়, পরন্তু সমগ্র মানবজাতির জীবনদর্শনের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়রূপে স্বীকৃত। এর পঠন-পাঠনে অমর জীবন লাভ করা যায়।

'গীতা গঙ্গা চ গায়ত্রী গোবিন্দেতি হৃদি স্থিতে।
চতুর্গকার-সংযুক্তে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥'

বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রবক্তা, মহাঋষি যাজ্ঞবল্ক্য নিজ অন্যতমা পত্নী মৈত্রেয়ীকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেই এক শাশ্বত জীবনকথা বৃহদারণ্যক উপনিষদের পৃষ্ঠায় বিবৃত করেছিলেন—সর্বকালের জন্য, সর্বলোকের জন্য।

অবতার-প্রথিত পুরুষ যাঁরা, যাঁদের আবির্ভাবে যুগে যুগে মানব-সমাজ সমৃদ্ধ হয়েছে, যাঁদের তপস্যা থেকে সে শক্তি সঞ্চয় করেছে—তাঁদের সবারই জীবন গুরু-শিষ্যের অচ্ছেদ্য সম্পর্কের দ্বৈত মহিমায় উদ্ভাসিত।

সেণ্ট পলের যে মহাজীবন, তার সুদৃঢ় ভিত্তির উপরেই যীশুখ্রীষ্টের ভাব-সৌধ নির্মিত।

ভক্তি ও বিশ্বাসের সহস্রদল রক্তকমলের শীর্ষে শীর্ষে পদ স্থাপন ক'রে কর্ম-স্রোতাস্বিনী অতিক্রম করেছিলেন সনন্দন, আচার্য শংকর কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে। সেইজন্য পদ্মপাদ নামে সম্বোধন ক'রে তাঁকে অশেষ সম্মান দান করেছিলেন শংকর নিজে।

আবার, এরও পরে, প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাময় জীবনেও নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গতা যেমনি শিক্ষাপ্রদ, তেমনি বিস্ময়কর ছিল। এমনিভাবে প্রায় প্রতিদেশেই কোন-না-কোন যুগে যুগ্ম-জীবনের সার্থক আবির্ভাব ঘটেছে।

কত বিচিত্র মাধুর্যে, কত নিগূঢ় রহস্যে সে-সকল অপার্থিব গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ যে গ্রথিত—ভাষার অক্ষম লিপিবন্ধনে তার সম্যক প্রকাশ সম্ভব নয়। উত্তর যুগের সাধকগণ, রস-পিপাসু বাণী-উপাসকগণ সে বৈশিষ্ট্যের সুরটি, প্রেম-বন্ধনের সে অদৃশ্য স্বর্ণ-সূত্রটি আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন। কত উন্নত সাহিত্য, কত প্রোজ্জ্বল জীবনাখ্যায়িকা তারই ফলে রচিত হয়েছে, কথিত হয়েছে।

আবার, আমাদের যুগে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের দিকে যদি তাকাই, তবে সেখানেও দেখতে পাব শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যুগ্মজীবন কি বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় পরস্পরকে পরিপূর্ণ ক'রে যুগ-প্রত্যুষে উদয়-দিগন্তে প্রকাশিত হয়েছিল। সে নিষ্কলুষ ও অহেতুক প্রেমাকর্ষণের পূত মহিমা এ-যুগের মহাকাব্যকথার এক অনবদ্য উপকরণ। চন্দ্রের সঙ্গে সূর্যকিরণের মতো, তারা যেন অচ্ছেদ্য যোগসূত্রে গ্রথিত। একটিকে বাদ দিলে অপরটির যথার্থ প্রকাশ ব্যাহত হয়, প্রকৃত মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যায় না। কি ঐতিহাসিক বিচারে, কি আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে সর্বভাবেই উভয়ে উভয়ের সম্পূরকরূপে প্রকাশিত। দীর্ঘ ছয় বৎসরে সে অপূর্ব গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধটি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল এবং আরও কয়েক বৎসরে তার পূর্ণ পরিণতি সাধিত হয়েছিল। অথচ, সেখানেও প্রক্রিয়াটির শেষ হয়নি। কারণ, যুগধর্মের ক্রমবিকাশের পরবর্তী পর্যায়ে স্বামী বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার মধ্যে যে অভিনব, যে অদৃষ্টপূর্ব সম্বন্ধটি গড়ে

উঠেছিল—নিঃশেষ আত্মনিবেদনের সুকঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে, সেটিও ঐ গুরুশিষ্য-সংবাদেরই আর একটি বিশিষ্ট নিদর্শন।

অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্তও সে অনবদ্য সম্বন্ধ-কাহিনী আমাদের কাছে প্রায় অকথিত ছিল। আত্মবিস্মৃত জাতির বহু বিস্মৃতির অন্তরালে ভগিনী নিবেদিতার অসামান্য চরিতকথা, তার অতুলনীয় ত্যাগ-ভক্তির কথা—'কাব্যে উপেক্ষিতার' মতোই যেন উপেক্ষিত হয়ে পড়ে ছিল। সেজন্য ৺মোহিতলাল একদা গভীর দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন—'আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সব কিছুই স্মরণ করি, কীর্তন করি—তাঁদের স্মৃতিমন্দির নির্মাণ ও স্মৃতিকথা রচনা ক'রে এই নিত্য-বিস্মৃতিপরায়ণ জাতির স্মৃতি-ভ্রংশ নিবারণ করি। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে, বিশেষ ক'রে স্বামীজীর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে আছে যে একটি অনন্যসাধারণ নারীচরিত্রের মহিমা, তাকে তেমন ক'রে আর স্মরণ করি না। এমনকি, যে মন্দিরের নব-নির্মিত চত্বরের এক প্রান্তে তিনি তাঁর অন্তরের পূজাপ্রদীপ প্রজ্বলিত ক'রে নিজের সমগ্র দেহ-মন লুটিয়ে দুই করপুটে সেবার পুষ্পাঞ্জলি সাজিয়েছিলেন—মনে হয়, সেখানেও তাঁর নামটি তেমন ক'রে কেউ স্মরণ করে না।'

আমাদের বিশ্বাস, এই সেদিন পর্যন্তও এ-অভিযোগ এবং আক্ষেপ বহুলাংশে সত্য ছিল, আমাদের পক্ষে এক নিদারুণ কলঙ্ক-স্বরূপ ছিল। সৌভাগ্যক্রমে, সে দুর্দিনের অবসান সূচিত ক'রে আজ নিবেদিতার অনিন্দ্য জীবনকথা নানা দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলোচিত হতে শুরু করেছে।

এ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির নব-রূপায়ণে নিবেদিতার যে অমূল্য অবদান ছিল, এদেশের নর-নারীকে মনে-প্রাণে ভালবেসে, এ জাতির ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প, এর নদ-নদী, বৃক্ষলতা, আকাশ-বাতাস, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, এক কথায় সবকিছুর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত হয়ে,—তাদের শিক্ষার জন্য, সেবার জন্য, পরিচর্যার জন্য—নিজের সমগ্র জীবনখানি উৎসর্গ করবার যে অক্ষয় মন্ত্রে নিবেদিতা দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন—তার সুনিপুণ বিশ্লেষণে সে-সব জীবনাখ্যায়িকা ক্রমশঃ সমৃদ্ধি ও সজীবতা অর্জন করতে চলেছে। বর্তমান অপরিসর গ্রন্থ প্রণয়নে আমাদের যে অক্ষম প্রয়াস সেটিও সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত নব-প্রচেষ্টারই সূত্রানুসরণ মাত্র, মহৎজনের মহৎ প্রয়াসের ক্ষীণ অনুকরণ মাত্র। তার অতিরিক্ত কিছু নয়।

*

স্বামী বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা। একদিকে তদানীন্তনকালের পরশাসিত, দুঃখিনী ভারত-ভূমির সন্তান এক ব্রহ্মবিদ্ সন্ন্যাসী আর অন্যদিকে স্বাধীন দেশের প্রগতিশীল সমাজ-ব্যবস্থায় জাত ও বর্ধিত এক তেজস্বিনী নারী। উভয়ের জীবন-বৃত্তান্তই অসামান্য, উভয়ের চরিতকথাই অসাধারণ। কিন্তু তাঁদের পূত, আধ্যাত্মিক সম্মেলনে যে জীবনাখ্যায়িকার উদ্ভব, তার অসামান্যতা অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে মধুর, অনন্য মাহাত্ম্যে উজ্জ্বল। গুরুশিষ্য-সংবাদের বহু-বিচিত্র ইতিহাসেও তেমন অনবদ্য জীবনকথা সহজলভ্য নয়।

বিগত শতাব্দীর শেষ দশকের কথা আমরা বলছি। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর সে-দিন। মহানগরী লণ্ডনের এক বাসগৃহের প্রশস্ত একটি কক্ষতলে, শীতজর্জর এক অপরাহ্ণ-বেলায়—এই দুই যুগ-জীবনের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল।

কবির কথায়—

সেদিন সে দিবসের শেষে
শীতের প্রদেশে,—
সন্ধ্যারবি অস্তে গেলা চলি,
ফেলি স্বর্ণ সহস্র-কিরণ
সদ্য চারিভিতে।

আর সেই বিচিত্র পরিবেশের মধ্যেই নিবেদিতা সবিস্ময়ে—

দেখিল আচার্যে তার প্রথম চকিতে;
বসেছেন পদ্মাসনে অপূর্ব মূরতি,
সমাহিত চিতে।
ধ্যান-শান্ত নেত্র হতে ঝরিছে করুণা,
অপূর্ব ব্যঞ্জনা।
কণ্ঠ হতে উঠিতেছে—শিব, শিব ধ্বনি
মর্তভূমে অমৃতের বাণী—দিব্য উন্মাদনা।

সে এক অভাবিত, স্বর্গীয় দৃশ্য। গৈরিক-মণ্ডিত দেহে ঈষদুন্নত একটি বেদীতে পদ্মাসনে উপবিষ্ট ছিলেন সেই ভারতীয় সন্ন্যাসী। অর্ধ-নিমীলিত বিশাল চক্ষে করুণা ও বৈরাগ্যের এক অলৌকিক তন্ময়তা। কণ্ঠ থেকে ক্ষণে ক্ষণে উত্থিত হচ্ছে এক রহস্যময় ধ্বনি—দূরাগত শব্দের মতো,—'শিব, শিব'। সম্মুখে অর্ধ-বৃত্তাকারে সমাসীন জিজ্ঞাসু এবং পিপাসু এক বিদ্বন্মণ্ডলী। মার্গারেটের সেই প্রথম গুরু সন্দর্শন:

'The time was a cold Sunday afternoon in November, and the place, it is true, a West-end drawing room. But he was seated facing a half-circle of listeners, with the fire on the hearth behind him, and as he answered, question after question, breaking now and then into the chanting of some Sanskrit text in illustration of his reply, ...he sat amongst us, in his crimson robe and girdle, as one bringing us news from a far land, with a curious habit of saying now and again—Shiva! Shiva!'—এই ছিল নিবেদিতার সেদিনের অভিজ্ঞতার নিজস্ব নিখুঁত বর্ণনা।...

সে সাক্ষাতের পরবর্তী পর্যায়ে প্রায় ছয় বৎসর-ব্যাপী বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ একটি কাল ছিল। সেটি দুই সুস্পষ্ট বিভাগে বিভক্ত। সন ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তার প্রথম পাদ, আর ১৮৯৮ থেকে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তার দ্বিতীয় পাদরূপে চিহ্নিত হতে পারে। আবার, এরও উত্তর পর্যায়ে, প্রায় নয় বৎসরের যে দীর্ঘ সময়, অর্থাৎ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই, যেদিন অকস্মাৎ স্বামী বিবেকানন্দ দেহত্যাগ করেছিলেন,—সেদিন থেকে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর—যেদিন নিবেদিতার দেহত্যাগ হয়েছিল সে-দিন পর্যন্ত যে-কাল,—সেটি যেন প্রথম ও দ্বিতীয় পাদের পূর্ণ পরিণতির শুভ যুগ।

নবোদ্গত একটি দৃঢ়মূল কিশলয়ের মহা-মহীরুহে পরিণতি-লাভের মহাবিস্ময়কর সেই কাল। এলিজাবেথ মার্গারেট নোবল, যাঁর শিরা-উপশিরায় উষ্ণ কেল্টিক রক্ত প্রবাহিত ছিল, ইংল্যাণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ডের যুক্ত-সংস্কৃতিতে যাঁর শিক্ষা ও মানসজীবন গঠিত ছিল—সেই তীক্ষ্ণধী, বিদেশিনী নারীর জন্মান্তর-লাভের সম্পূর্ণ ইতিহাস এবং তাৎপর্য এরই মধ্যে নিহিত। সে যাই হোক; সেদিন সেই অপ্রত্যাশিত শুভ-লগ্নটিতে, সেই দৈবচিহ্নিত বিশেষ ক্ষণটিতে ভাবী আচার্যের দর্শনমাত্র মার্গারেটের অবচেতন মনের সর্বস্তর যেন সহসা আলোড়িত হয়েছিল। নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী যেন সচকিত হয়ে উঠেছিল। প্রভাত সূর্যের কিরণ-ছোঁয়ায় সমগ্র পদ্মবন যেমন বহু বর্ণবৈচিত্র্যে বিকশিত হয়ে ওঠে, তেমনি ভাবেই সেদিন মার্গারেটের হৃদিপদ্ম যেন,

অকস্মাৎ ফুটিল চকিতে—
প্রদীপ্ত জ্যোতিতে।
আর তারি সঙ্গে সঙ্গে—
মধুময় হল ধরাতল;
অন্তর ভরিয়া গেল
আশার জ্যোতিতে, স্বর্গীয় ভঙ্গীতে।

শ্রীমা বলতেন,—
'যে যার, সে তার
যুগে যুগে অবতার।'

এ যেন তারই এক সার্থক রূপায়ণ হল বাস্তবের ভূমিতে।

সে ঘটনার দীর্ঘ দশ বৎসর পরে, অতীতের মধু-স্মৃতি রোমন্থন করে সেই প্রথম দর্শনের বিস্ময়-বিমুগ্ধ অনুভূতির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মার্গারেট বলেছিলেন—

'অন্তরের মণিকোঠায় তিনটি মহামূল্য রত্ন-গুটিকা সেই প্রথম সাক্ষাতের অবিস্মরণীয় দিনটিতেই আমি আহরণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। একথাটি নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করেছিলাম যে এই ভারতীয় যোগীপুরুষের ধর্ম ও আধ্যাত্মিক মতবাদ যেমনি স্নিগ্ধ, তেমনি উদার। তার মৌলিকতা এবং প্রাণশক্তি অপরিমেয়। সর্বোপরি, মানুষের অন্তর্নিহিত যে দেবত্ব, তার চেতন-উৎসে তদীয় সুকৌশল অঙ্গুলি-সংস্থাপনও যেন এক মহাবিস্ময়কর প্রক্রিয়া, এক অকল্পিত অভিজ্ঞতা।

…'his call was always sounded in the name of that which was strongest and finest in man,…Man proceeds from truth to truth, and not from error to truth.'

আবার, উত্তরজীবনে—অর্থাৎ বিবেকানন্দের দেহাবসানেরও কয়েকবৎসর অন্তে, ঐ প্রথম দর্শনেরই স্মৃতিকথায় জনৈকা বান্ধবীর কাছে একটি পত্রে লিখেছিলেন নিবেদিতা—

'কল্পনা কর, স্বামীজী যদি সে সময় লণ্ডনে না আসতেন? তবে আমার কি হত? মনে হয়, আমার সমগ্র জীবনটিই ব্যর্থ হয়ে যেত। আমার মনে তখন এ-ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে আমার জীবনে একটি আহ্বান আসবে, নির্দেশ আসবে। সে-কথা নানাপ্রসঙ্গে আমি প্রকাশও করেছি।

যদি নিজ জীবন সম্বন্ধে কোন নিবিড় নিঃসংশয় পরিচয় আমার থাকত, তবে হয়ত সন্দেহ জাগত, দ্বিধা হত যে পরম-লগ্নটি যখন উপস্থিত হবে—তখন তাকে ধরতে পারব কিনা, চিনতে পারব কিনা। সৌভাগ্যক্রমে, সে-পরিচয় আমার ছিল না। তাই, সংশয়ের বেদনা থেকেও আমি নিষ্কৃতি পেয়েছিলাম।

আজ কতদিনের ব্যবধানে এই গ্রন্থখানির [নিবেদিতার অন্যতম রচনা—The Web of Indian Life] দিকে তাকিয়ে কেবলই মনে হচ্ছে—যদি স্বামীজী না আসতেন! তবে কি হত! সে এক বিচিত্র আকৃতি, এক তীব্র আত্ম-বিকাশের আকাঙ্ক্ষা, তাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, করা সম্ভব নয়।'

বৈষ্ণব কবির গানে আছে—
যদি গৌর না হত, কেমন হইত?
কেমনে ধরিতাম দেহ?

ঠিক অনুরূপ ধরনের এক মনোভাব। যা হয়নি, কিন্তু হতে পারত; যা ঘটেনি, অথচ ঘটতে পারত; এম্নি একটি বিগত অতীতের করুণ অভিব্যক্তি।

'সেদিন কত দীর্ঘ সময়, কলম হাতে নিয়ে আমি বসে থাকতাম,—কিছু লিখব বলে, কিছু বলব বলে। কিন্তু কথা আসত না, ভাষা জুটত না, প্রকাশ-ক্ষমতা সক্রিয় হত না। আর

আজ ? আজ মনে হয় কথার যেন অন্ত নেই, অবধি নেই। আজ এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে এ জগতে কিছু কাজ করবার যোগ্যতা আমি অর্জন করেছি এবং সে কাজের প্রয়োজনও রয়েছে প্রচুর।'……

আমরা যখনকার কথা বলছি—মার্গারেটের বয়স তখন আটাশ, স্বামীজীর তেত্রিশ বৎসর।

দেহ ও মনের পূর্ণ স্বাস্থ্যের অধিকারিণী তখন মার্গারেট। বহু বিচিত্র পথে অগ্রসর হয়েছে জীবনের জিজ্ঞাসা এবং অভিজ্ঞতা। তীক্ষ্ণ সংঘাত এসেছে তাঁর জাতীয় জীবন-ক্ষেত্রে, মর্মান্তিক প্রশ্ন উঠেছে নিজ জীবনের আদর্শ নিয়ে, আশা এবং আকাঙ্ক্ষাকে জড়িত করে।… তাদের আশু সমাধান চাই, নিরসন চাই। এমন একটি মানুষের সক্ষম স্পর্শ চাই, যার জীবনে তত্ত্ব ও অভিজ্ঞতা সমন্বিত হয়েছে। যার কথা ও কাজ অনুমান এবং প্রত্যক্ষানুভূতিতে শোভন সামঞ্জস্যে সার্থকতা লাভ করেছে। সে যা দেখেছে শুধু তাই বলতে অভ্যস্ত।

'যৎ তৎ পশ্যসি তদ্‌বদ'—এই উক্তির মূর্ত প্রকাশ হয়ে উঠেছে তার জীবন।…

সুতরাং, গুরু-সন্দর্শনের সেই প্রথম দিনটি, সেই পরম মুহূর্তটি মার্গারেটের পিপাসু মনের অলিখিত ইতিহাসে যে অক্ষয় অক্ষরে চিহ্নিত হয়ে থাকবে তাতে আর বৈচিত্র্য কি ?

আরও একটি রহস্য আছে। একদা তদীয় আচার্যদেবের জীবনেও অনুরূপ একটি বিচিত্র মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছিল, বহুলাংশে একই তাৎপর্য নিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম সাক্ষাতের বিস্তৃত বিবরণ তাঁদের উভয়ের জীবনেতিহাসে সবিস্তারে উল্লিখিত আছে। সেখানেও এক অপ্রত্যাশিত দৈব সংযোগে কলিকাতা মহানগরীর উপকণ্ঠে এক ভক্তগৃহে, দিবাবসানের প্রাক্কালটিতেই গুরুশিষ্যের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেখানেও দুই বহ্নিগর্ভ মহাবৃক্ষ পরস্পরের সান্নিধ্যে মুহূর্তে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। দান ও গ্রহণের, জিজ্ঞাসা ও মীমাংসার সংঘাত সেদিনও এসেছিল শত বিচিত্র পথে, শত বিচিত্র সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে। কালের ব্যাপ্তিও ছিল প্রায় অনুরূপ এবং চরমে গুরুর অপার্থিব প্রেম-প্রভাবে নিঃশেষ আত্ম-বলিদানের যে অনন্য মহিমা তাও ছিল বহুলাংশে সমতুল।

তাই, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সংবাদ আর বিবেকানন্দ-নিবেদিতা-সংবাদ একই গুরু-শিষ্য-সংবাদের দুটি পরিপূরক অধ্যায় মাত্র। একই অদৃশ্য সম্বন্ধ-সূত্রে উভয়ে গ্রথিত, একই অমৃতরসে উভয়ে অভিষিক্ত।

সেই হেতু, উত্তরকালে মার্গারেট যখন 'নিবেদিতা'রূপে নবজন্ম লাভ করে ধন্য হয়েছেন, যখন ভারতবর্ষই তাঁর মাতৃভূমিতে পরিণত হয়েছে তখন তাঁর মনে হত যে পূর্বজন্মে ভারতবর্ষেরই কন্যা ছিলেন তিনি। এবারে নবযুগের আধ্যাত্মিক ভাবধারার সহজ প্রচারের জন্যই পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে তাঁর জন্ম হয়েছে। নতুবা, ভারতবর্ষই তাঁর প্রকৃত মাতৃভূমি, ইওরোপ তাঁর ধাত্রীদেবতা মাত্র।

শ্রীশ্রীমায়ের কাছে নিজমুখেই তাই একদিন নিবেদন করেছিলেন নিবেদিতা।—বলেছিলেন, —'মা, আমি এদেশেরই মেয়ে, আমার পূর্বজন্ম এদেশেই হয়েছিল। তবে, এবার পাশ্চাত্য দেশে ঠাকুরের ভাব-প্রচার সহজ হবে বলেই ওদেশে আমার জন্ম হয়েছে হয়ত।' (ক্রমশঃ)

বিবেকানন্দ

শ্রীশান্তশীল দাশ

তোমার সম্মুখে আসি ; সব ভয়, সকল সংশয়
নিমেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।
বেদনার্ত্ত রিক্ত এ হৃদয়
সহসা যেন সে খুঁজে পায়
কী এক ঐশ্বর্য দিব্য ; ধুয়ে মুছে যায় সব গ্লানি,
নৈরাশ্যের অন্ধকার, ও আলো সম্মুখে দেয় আনি'
কী উজ্জ্বল পথরেখা !
বাধা নাই, বিঘ্ন নাই ; সে-পঁথের প্রান্তে যায় দেখা
জীবনযাত্রীর হাতছানি !
আর কণ্ঠে শোনা যায় কী অমৃত বাণী :
জয় হবে হে পথিক, চলো চলো সম্মুখের পানে,
মুখরিত কর পথ জীবনের গানে।
মৃত্যু অমৃতের কাছে পরাজিত হবে সুনিশ্চয়,
এ মানুষ হবে মৃত্যুঞ্জয়
আপন ঐশ্বর্য নিয়ে তার।

তোমার সম্মুখে এসে এই কথা শুনি বারংবার।

অমৃত-জিজ্ঞাসা

শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত

মানুষ এলো এ-বিশ্বে জন্মের রহস্য নিয়ে সাথে,
সৃষ্টির আলোক-জ্বালা প্রাতে ;
পেলো এসে জীবনের প্রেম-প্রীতি, অমেয় পিপাসা :
পরিশ্রমী জীবনের স্বেদ আর দূরে স'রে-যাওয়া
দিগন্তের দুর্মর নিরাশা।
তারপর একদিন মৃত্যু এসে চকিত প্রহরে,
আকস্মিক হিংস্রতায় অন্তরের প্রিয়জনে
নিয়ে গেল বুক খালি ক'রে :
নিঃসহায় দুটি চোখ চেয়ে রয় উর্ধ্বপানে,
কী যেন হতাশা।
জাগিলো সেদিন হতে মনে তার অমৃত-জিজ্ঞাসা।

স্বামী বিবেকানন্দের চোখে মানুষ

শ্রীভবানীশঙ্কর চৌধুরী

বত্রিশ বৎসর আগের কথা। আমি তখন কলেজের ছাত্র। ১৯৩২ খৃঃ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে একটা সভা হয়েছিল অ্যালবার্ট হলে। সভাপতি অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার। তাঁর আগুন-ছড়ানো বক্তৃতার কথা আজও অনেকেরই মনে আছে। সেদিনও অগ্নিবর্ষণের মতই তিনি গলা ফাটিয়ে বলতে লাগলেন, "আমি স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতার মধ্যে—চিকাগো ধর্ম্মমহাসভা বক্তৃতা—পাঁচ কথার একটি 'বম-শেল' আবিষ্কার করেছি—'Ye divinities on earth! Sinners! তোমরা ধরণীর দেবকুল, তোমরা পাপী?' আর এই বোমা ফাটিয়েই তিনি সেদিন জগৎজয় করেছিলেন।" আজ এতদিন পরে বিনয়বাবুর বক্তৃতার ভাবটি ছাড়া আর বিশেষ কিছুই মনে পড়ছে না। তবে বুঝতে পারছি, অবহেলিত মানবতার সম্মান প্রতিষ্ঠা করতে সেদিন তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। আমরাও তাঁর জ্বালাময়ী ভাষণে স্বামীজীর নরনারায়ণ-ভাব খানিকটা অনুভব করেছিলাম। তবে এর আগেও স্কুলে থাকতেই পড়েছিলাম—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার—
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

আর তাঁর 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব।' ইংরেজী একটা বক্তৃতার কথাও স্মৃতিতে গেঁথে আছে: খৃষ্ট কি সেই একবারই ক্রুশে মরেছিলেন? এই যে চোর খৃষ্ট আমাদের জন্য জেলে যাচ্ছেন, খুনে খৃষ্ট আমাদের জন্য ফাঁসি যাচ্ছেন, যেন আমরা নিজেরা আর অমন কাজ না করি এবং ঐ শাস্তি থেকে রক্ষা পাই—এরাও খৃষ্ট।

কিন্তু এই শিবজ্ঞানে জীবসেবার মধ্যে জীবের অধঃপতিত অবস্থার স্বীকৃতিও ছিল স্বামীজীর মনে। এই যে জীব—এই যে মানুষ এরা 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' হলেও 'দরিদ্র' এবং 'মূর্খ।' তাই তাদের দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতা দূর করার ব্রত তিনি গ্রহণ করেছিলেন এবং অন্য সকলকে গ্রহণ করতে আদেশ করেছিলেন। প্রয়োজন-বোধে মানুষের এই অজ্ঞতাকে তিনি কঠিন কশাঘাত করতেও কুণ্ঠিত হন নাই। মনে পড়ে সেই কাহিনীটি, যখন তিনি এক গোরক্ষিণী সমিতির জনৈক উৎসাহী প্রচারকের সংস্পর্শে আসেন। গো-রক্ষাব্রতীরা সেবারে মধ্য-ভারতের দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক মারা গেলেও তাহাদের সাহায্য করেননি—কারণ মানুষ নিজ কর্ম্মফলে অনাহারে মরে। স্বা বললেন, যখন মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে তখন যে সমিতি সামর্থ্য সত্ত্বেও সাহায্য করে না, তিনি তাদের জন্য আবেদন করতে পারবেন না। উত্তরে গো-রক্ষক বললেন, 'স্বামীজী, গো যে মাতা!' একটু বক্র হেসে স্বামীজী কঠিন তিরস্কারে বলে উঠলেন: গো-মাতার সন্তান না হলে কি এমন বুদ্ধি হয়! এই তো বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মানুষ। ইচ্ছা হয় একে হিউম্যানিজম্ বা মানবিকতাবাদ বলুন, কিন্তু সর্বাংশে এটা তার সঙ্গে খাপ খাবে কি?

কথাপ্রসঙ্গে স্মরণ না করে পারছি না যে, শ্রীশ্রীঠাকুরও মানুষকে এই দুইভাবেই দেখতেন। কখনও: জীব শিব, তুই জীবে দয়া করবার কে, তুই জীবের সেবা কর,

আবার কখনও: লোক না পোক। স্বামীজীর কণ্ঠে ঠাকুরের কথাই জগৎ শুনেছে।

মানুষের এই দ্বৈত মূর্তি স্বামীজী সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর মানুষ ও ঈশ্বরের বর্ণনায়। তার মধ্যে তিনি নিজের ভাবধারাটি পরিপূর্ণ করে ঢেলে দিয়েছিলেন। 'মানুষ যেন একটি অসীম বৃত্ত, যার পরিধির কোন সীমা নেই, কিন্তু যার কেন্দ্র একটি বিশেষ স্থানে নিবদ্ধ। আর ঈশ্বর যেন একটি অসীম বৃত্ত, যার পরিধিরও কোন সীমা নেই, কিন্তু যার কেন্দ্র সর্বত্রই রয়েছে।' সুতরাং মানুষ আর ঈশ্বরে পার্থক্য এই কেন্দ্র-সংখ্যায়। মানুষ এককেন্দ্রিক, ঈশ্বর বহুকেন্দ্রিক। যখন মানুষ মনে করে এই দেহবিশিষ্ট ব্যক্তিটি মাত্রই 'আমি' আর সবাই আমার পর অর্থাৎ আমার বাইরে, তখন হয় সে বদ্ধ; আর যখন সে আপন ব্যক্তিত্বের সীমাকে অতিক্রম ক'রে জগতের সঙ্গে একাত্ম অনুভব করে, তখনই হয় সে মুক্ত; তখনই সে শিবপদবাচ্য। এ যেন নিজেরই বিশ্বরূপ-দর্শন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল অর্জুনকে নিজের বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন তা নয়, তিনি নিজেও নিজের বিশ্বরূপ দেখেছেন।

'অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥' (৯।১১)

তাই নিজেও তিনি নিজের মানুষী তনুটিকে তার স্বস্থানে দেখতে চেষ্টা করেছেন। ওটি একটি বিভূতিমৎ সত্ত্ব—বহু ঈশ্বরবিভূতির একটি মাত্র—

'বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।'

যেমন পাণ্ডবদের মধ্যে তিনি ধনঞ্জয়, তেমনই বৃষ্ণিবংশীয়দের মধ্যে তিনি বাসুদেব। যদিও বক্তা স্বয়ং বৃষ্ণিবংশীয় সেই বাসুদেবই। সুতরাং বক্তা নিজেই নিজের সসীম রূপের বাহিরে আর একটি অসীম রূপ দেখতে পাচ্ছেন। তিনি নিজের ব্যক্তি-সত্তাটি অস্বীকার করছেন না। ওটিকে নিয়ে এবং ওটির বাহিরে আর একটি পূর্ণ সত্তা দেখতে পাচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আর একটি গল্প বলি। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, তুমি পূর্ণ ব্রহ্ম। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমি পূর্ণ কিনা দেখে নাও। এই বলে তিনি অর্জুনকে বললেন, সামনে ওই কি দেখতে পাচ্ছ? অর্জুন দেখে বললেন, বিরাট এক জাম গাছ, গাছে থোলো থোলো কালো জাম ফলে আছে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, আরো এগিয়ে দেখ। অর্জুন আরও এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলেন জামগুলি সব কৃষ্ণ। সচ্চিদানন্দ-বৃক্ষে থোলো থোলো কৃষ্ণ-ফল ফলে আছে। ঠাকুর বললেন, অনন্ত অবতার, অনন্ত কৃষ্ণ। বিশ্বরূপ সমষ্টিব্যঞ্জক, ঐক্যবঞ্জক নহে।

'পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ।
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত॥'

—হে পার্থ আমার শতসহস্রবিধ রূপ দেখ। নানাবিধ দিব্য নানা বর্ণের আকৃতি সব। আদিত্যগণ, বসুগণ (অষ্টবসু), রুদ্রগণ (একাদশ রুদ্র), অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুতগণ, অদৃষ্টপূর্ব বহু আশ্চর্য বস্তুসমূহ দর্শন কর। আমার দেহে আর যাহা কিছু দেখতে চাও, একত্রসন্নিহিত সমস্ত জগৎ-চরাচর দর্শন কর।

আবার সঞ্জয়ও দেখতে পেলেন,—

'অনেক বক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্॥
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥'

এখানেও অনেক মুখ, অনেক চোখ ও অনেক আয়ুধের কথাই বলা হয়েছে। বহুধা-বিভক্ত সমস্ত জগৎকেই অর্জুন দেবদেব বাসুদেবের শরীরমধ্যে দেখতে পেলেন।

বাসুদেবের শরীরমধ্যগত যা কিছু সবই বাসুদেব। অঙ্গাঙ্গিভাব। এরা সব তাঁর দেহাংশ। বাইরে নয়, পর নয়, তিনি ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি নিজেও তাই অনুভব করেন, তাঁর কেন্দ্রবিন্দু সর্বত্র। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই দেহেই অন্য দেহের অনুভূতি গ্রহণ করা যায় দেখিয়ে দিয়েছিলেন। মনে পড়ে সেই গল্প, মাঝি আর একজনের পিঠে চড় বসিয়ে দিয়েছে; দর্শক শ্রীরামকৃষ্ণের পিঠে তার পাঁচ আঙুলের ছাপ ফুটে উঠলো। এই উপলব্ধির কথাই স্বামীজীর 'গাহি গান শোনাতে তোমায়' কবিতায় বর্ণিত হয়েছে:

"আমি বর্তমান।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসি যবে—
প্রলয়ের কালে
জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা লয়,
অলক্ষণ অতর্ক্য জগৎ,
নাহি থাকে রবি শশি তারা,
সে মহা-নির্বাণ, নাহি কর্ম—করণ কারণ,
মহা অন্ধকার ফেরে অন্ধকার বুকে,

* * *

আমি হই বিকাশ আবার।
মমশক্তি প্রথম বিকার,—
আদি বাণী প্রণব ওঙ্কার—
বাজে মহাশূন্য পথে,
অনন্ত আকাশ শোনে মহানাদ-ধ্বনি,
ত্যজে নিদ্রা কারণমণ্ডলী—
পায় নব প্রাণ অনন্ত অনন্ত পরমাণু;

* * *

মম আজ্ঞাবলে
বহে ঝঞ্ঝা পৃথিবী উপর,
গর্জে মেঘ অশনি-নিনাদ;
মৃদুমন্দ মলয় পবন
আসে যায় নিশ্বাস-প্রশ্বাসরূপে;
ঢালে শশী হিমকরধারা
তরুলতা করে আচ্ছাদন ধরাবপু;
তোলে মুখ শিশির-মার্জিত
ফুল্ল ফুল রবি পানে।"

আর এর তুলনা পাই দেবীসূক্তে মহর্ষির কন্যা বাক্‌ও ব্রহ্মশক্তিকে স্বীয় আত্মারূপে অনুভব করে বলছেন,—

'ওঁ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহ-
মাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহ-
মিন্দ্রাগ্নি অহমশ্বিনোভা॥'

আমি রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ এবং সকল দেবতারূপে বিচরণ করি। আমি মিত্র বরুণকেও ধারণ করি। আমি ইন্দ্র অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমার-দ্বয়কেও ধারণ করি।

'অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং
ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে
সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে॥'

আমি শত্রুহন্তা সোমকে ধারণ করি; ত্বষ্টা পূষণ এবং ভগকেও। আমিই হবির্দ্বারা দেবতাদের তৃপ্তি সাধন করি এবং যজমানের যজ্ঞফল বিধান করি।

'অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্॥'

আমিই রাষ্ট্রের ঈশ্বরী, ধনসমূহের প্রাপয়িত্রী, তত্ত্বদ্রষ্ট্রী, যজ্ঞার্হগণের প্রথমা। বহুভাবে অবস্থিতা

সর্বভূতে প্রবিষ্টা সেই আমাকেই দেবতারা সর্বদেশে নানাভাবে আরাধনা করেন।

মানুষের এই কেন্দ্রবৃদ্ধি হয় জ্ঞানে, আবার প্রেমে। যাকে ভালবাসি তার সুখ-দুঃখ আমার হয়ে যায়। সে খেলে আমার খাওয়া, সে পেলে আমার পাওয়া হয়। সে তখন আমারই আর একটি বিকল্প ব্যক্তিত্ব। প্রেম যত গভীর হবে, এই প্রেমাস্পদের সঙ্গে একত্ব-বোধও ততই নিবিড় হবে। তাই সত্যজ্ঞানের কথা গীতা এইরূপ বলেছেন—

'সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্।'
(১৮।২০)

আর এক অবস্থায় একটি বিশেষ দেহ বা প্রতিমাতে ঈশ্বর আছেন এইরূপ বোধ হয়। এই জ্ঞানকে তামসিক জ্ঞান বলা যায়।

'যৎ তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্॥'

ভক্তি বা প্রেমের সাধনায় তাই একজনকে ভালবেসে তার সঙ্গে এক হয়ে যাবার শিক্ষা নিতে হয়। সুন্দর একটা গল্প আছে। এক সাধু দিনশেষে এক মন্দিরে এসে উপস্থিত। কিন্তু মন্দিরের দরজা তখন বন্ধ। সাধু দরজায় করাঘাত করতেই ভেতর থেকে প্রশ্ন এল, কে? সাধু বললেন, আমি অমুক। তখন ভেতর থেকে আবার উত্তর এল, এখানে দুজনের জায়গা হবে না। সাধু ফিরে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি তার ভুল বুঝতে পেরে--ফিরে এসে আবার মন্দিরের দুয়ারে আঘাত করলেন, আবার প্রশ্ন এল, কে? সাধু উত্তর করলেন, তুমিও যে, আমিও সে-ই। অমনি দুয়ার খুলে গেল। সত্যের দুয়ার, ভগবানের দুয়ার এই ভাবেই খুলে যায়, ভক্তের কাছে, জ্ঞানীর কাছে। স্বামী বিবেকানন্দের চোখেও মানুষের যে সত্য-রূপ ফুটে উঠেছিল তা পাশ্চাত্যের মানবিকতাবাদ নয়, তা বেদান্তের 'তত্ত্বমসি'। দারিদ্র্য ও অজ্ঞানতা পীড়িত মানুষকে তিনি দেখতে পেয়েছেন তার আপন প্রচ্ছন্ন মহিমায়। তাকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তিনি সেই জ্যোতির্লোকে—'Ye Divinities on earth! Sinners!' পাশ্চাত্যে এই ভাবটি বেজে উঠেছে কবি Francis Thompson-এর কাব্যে:

'The angels keep their ancient places
Turn but a stone and start a wing;
'Tis Ye 'tis your estranged faces
That miss the many-splendour'd thing.'
—দেবতারা রয়েছে স্বধামে নিত্যকাল যথা,—
গড়ালে পাথরখণ্ড খুলে যাবে পাখা।
তোরা সেই, তোদেরই ও ধূলিমাখা মুখে
লুকায়ে রয়েছে চির জ্যোতির্ময় মহা উজ্জ্বলতা।

ছবিটা বর্ণনা না করে পারছিনে। পথিক যাচ্ছে পাহাড় বেয়ে উচ্চ শৃঙ্গের দিকে। দুপাশে পাথরের খণ্ড অসংখ্য পড়ে রয়েছে। ওর মধ্যে আছে বদ্ধপক্ষ অনেক পাখিও। পথিকের পদাঘাতে স্থানচ্যুত শিলা গড়িয়ে গেলে সেই পতনের শব্দে শিলামধ্য থেকে পাখিগুলো ডানা মেলে উড়ে যায়। জড়প্রকৃতি সাধারণ মানুষের মধ্যেও তেমনি দেবত্ব লুকিয়ে আছে। বিপদ আপদ দুর্যোগের আঘাতে সেই সুপ্ত দেবত্ব জেগে ওঠে, বেরিয়ে আসে মহিমা নিয়ে। শ্রীশ্রীঠাকুরের গল্প দিয়ে বলি, যদিও তিনি এটি বলেছেন অন্য প্রসঙ্গে। ভগবান বরাহ দেহে অবতীর্ণ হয়ে বেশ আরামে আছেন, স্বধামে ফিরতে চাইছেন না। দেবতারা ফিরিয়ে নিতে এলে বললেন, 'আমি এই বেশ আছি।' তখন শিব এসে ত্রিশূলাঘাতে বরাহের বক্ষপঞ্জর ভেঙ্গে দিলেন। তখন হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নারায়ণ। শিব যেমন

শূকরের দেহাবরণে ঢাকা সাক্ষাৎ নারায়ণকে দেখেছিলেন, স্বামীজীও তেমনি দরিদ্র ও অজ্ঞান মানুষের অন্তরস্থিত দেবতাকে সাক্ষাৎ দেখে তাঁর পূজা করেছেন; ছদ্মরূপে ভোলেননি। 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর' কথাগুলি স্বামীজীর প্রত্যক্ষ অনুভূতি থেকেই লেখা।

এবার প্রশ্ন আসে এই হীন পতিতদের সেবা করার কি দরকার? এঁদের পূজা কেন? 'সেবা'র চেয়ে 'পূজা' কথাটাই তাঁর অধিক মনঃপূত। সাধারণতঃ একটা উত্তর শোনা যায়, নিজের কল্যাণের জন্য। কিন্তু কথাটা স্বামীজীর নিজের সম্বন্ধে খাটে কি? তিনি অদ্বৈত অনুভূতির যে উচ্চভূমিতে আরোহণ করে সর্বজীবে ঈশ্বরকে দেখতে পেলেন, সেখান থেকে নিজের কল্যাণ দেখা যায় কি? সম্ভবতঃ নয়। স্বামীজী তো নিজের কল্যাণ, এমনকি মুক্তিরও প্রার্থী ছিলেন না কোনদিন। সকলের মুক্তির জন্যই তো তিনি আত্মদান করেছিলেন। তাঁর কাছে জীবসেবা শুধু শিবপূজাই ছিল। তবে যদি বলেন শিবপূজাই বা তিনি করবেন কেন? উত্তর—তিনি শিবকে ভালোবাসেন বলে। আর কোন কারণ তো দেখা যায় না। ভালোবাসাই ভালোবাসার কারণ, ভালোবাসাতেই ভালোবাসার সার্থকতা। ছেলেকে, প্রিয়জনকে ভালোবাসি কেন—এ প্রশ্নে সব সময় লাভালাভের খতিয়ান থাকে কি? নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় বা সাত্ত্বিক পূজায় অন্ততঃ থাকে না।

সর্বজীবে যদি তাঁর প্রকাশ কেহ প্রত্যক্ষ করেন, তবে মন্দিরে বা মূর্তিতে তাঁর প্রয়োজন কি? সর্বজীবে শিব দর্শন করে স্বামীজী তাই জীবসেবাকেই পরম পূজা বলে গ্রহণ করেছিলেন।

'সর্বভূতে সেই প্রেমময়'-কে প্রত্যক্ষ করে স্বামীজী তাঁর প্রেমাস্পদের কাছে নিজেকে নিবেদন করেছেন—এই হল স্বামীজীর নরনারায়ণ-সেবা।

পরিক্রমা

শ্রীঅটল চন্দ্র দাস

ধারে ধারে চলিতেছি দিগন্তের পানে
ছায়া ফেলে চারিদিক হৃদয়ে আমার—
হারাবার কতশত ব্যথা বুকে হানে,
পাবার আনন্দে কত ভরে চারিধার।
কত দিন-রাত্রি আসে, জন্ম-জন্মান্তর
সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহের খেলা চলে;
দৃশ্যে দৃশ্যে শেষ যবনিকার প্রান্তর
সুমুখে ভাসিয়া ওঠে ধীরে পলে পলে।

পশ্চাতের স্মৃতি ফেলে আলো সম্মুখেতে
পায়ে পায়ে সেই পথে হই অগ্রসর;
স্তম্ভিত চকিত তবু পথে যেতে যেতে
কার প্রেম-আকর্ষণে কাঁপি থরথর।
সেই প্রেম বিচ্ছুরিত হয়ে চারিভিতে
আনন্দের আকর্ষণে টানে বারেবারে;
জীবন সচল তারি সুধাপানে মেতে,
পথও হয় শেষ সেই প্রেম-পারাবারে।

ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের প্রতিভা, বাণী ও রচনা

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর

ডক্টর স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল দর্শনশাস্ত্রের বিগত শতাব্দীর একজন নিপুণ ও খ্যাতিমান ব্যাখ্যাকার। তবে তাঁর মনীষা দর্শন ব্যতীত অন্যদিকেও দৃষ্ট হয়। তার মধ্যে গণিত, বিজ্ঞান ও কবিতার উল্লেখ করা যায়।

পঠদ্দশায় ব্রজেন্দ্রনাথ বিশিষ্ট মেধাবী ছাত্ররূপে অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকমণ্ডলীর এবং সতীর্থবৃন্দের শ্রদ্ধা সমভাবে অর্জন করেছিলেন। তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও মেধা সম্পর্কিত বহু প্রবচনও প্রচলিত ছিল। স্বামীজীর জীবনী-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, নরেন্দ্রনাথ (ভাবীকালের স্বামী বিবেকানন্দ) এবং ব্রজেন্দ্রনাথের মধ্যে তখন উন্নত দর্শনবিষয়ক আলোচনা হত এবং উভয়েই তাতে লাভবান হতেন।

প্রথম জীবনে ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন দার্শনিক হেগেলের মতাবলম্বী। জীবন-সায়াহ্নে অবশ্য তাঁর এই মতবাদ পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রে তিনি হেগেলের মতবাদের সংস্কার-সাধনের প্রয়াস পান 'নিও রোমান্টিক মুভমেণ্ট' শীর্ষক রচনার মাধ্যমে। তৎপরবর্তী নিবন্ধাদিতে এর প্রভাব আরো প্রকট হয়ে পরিপুষ্টি লাভ করতে থাকে এবং ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথের মৌলিক মতবাদ দানা বাঁধতে দেখা যায়।[১] হেগেলের বিচারধারার ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং তার সীমাবদ্ধতা ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথের মত জ্ঞান-তপস্বীর পক্ষেই ধরা ও সংশোধন করা সম্ভবপর ছিল। তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারাকে পৃথক করে দেখাতে তিনি 'সিনথিটিক ফিলজফি' শব্দ প্রয়োগ করতেন। 'ক্যালকাটা ফিলজফিক্যাল সোসাইটি'-র সমক্ষে ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ-প্রদত্ত ভারতীয় দর্শনসম্বন্ধীয় আলোচনাচক্রের স্মরণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম জর্জ অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছিলেন যে, এসবের ভিতর ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথের শুধু মৌলিকত্ব ছিল না, এগুলির ভিতর এমন সব ইঙ্গিত ছিল, যা কৃষ্ণচন্দ্রের সমগ্র চিন্তাধারাকেই প্রভাবিত করেছিল। উক্ত অধ্যাপকের মতে ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথের দর্শনে জ্ঞান শুধু যে ব্যাপক ও খুঁটিনাটি ছিল তাই নয়, পরন্তু মূর্ত চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে রীতিমতভাবে শ্রেণীবদ্ধ ও সুসংগঠিত ছিল। দার্শনিকপ্রবর ব্রজেন্দ্রনাথের দার্শনিক প্রতিভা বিশ্লেষণের বৃথা প্রয়াস পাওয়া এখানে উচিত হবে না। অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রামাণ্য বিবৃতির উপর নির্ভর করা ব্যতীত 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে':

'I found too that his thinking was mainly of a synoptic type which baffled me not because of his abstruseness—for he was no introvert in logic like Kant but because of the rapidity with which it gathered momentum and because of the volume of the material it had to synthesise—material that was already a multitude of syntheses, not yet familiar to his audience.'

প্রথিতযশা দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানসাধকও ছিলেন। অননুকরণীয় ধরণে লিখিত 'দি পজিটিভ সায়েন্স অব দি এ্যানসেণ্ট হিন্দুজ' পুস্তকখানি পাঠে জড়বাদী বিজ্ঞানে প্রাচীন হিন্দুগণ কতদূর অগ্রণী হয়েছিলেন তা জানতে পারা যায়। আসলে এটি ছিল তাঁর পি. এইচ. ডি. থিসিস (পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত), এটি থেকেই ব্রজেন্দ্রনাথের বিজ্ঞানী-মনে মৌলিকতাপূর্ণ অনুসন্ধানস্পৃহা কত প্রবল ও কার্যকরী ছিল

১. New Essays in Criticism, 1903.

তার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থটিতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর প্রামাণ্যের বিষয়ে পাঠক ঘুণাক্ষরেও যাতে অলীক মতবাদ পোষণ না করেন সেজন্য গ্রন্থ-প্রণেতা ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ পুস্তকের প্রারম্ভেই সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছেন—'আমি এমন এক ছত্রও লিখিনি যা অতি-পরিস্ফুট নজিরের দ্বারা সমর্থিত নয়।'[২]

পুস্তকমধ্যে আলোচিত বাস্তববাদী (যা নেতিবাচক বা অধ্যাত্মবাদের বিপরীতধর্মী) বিজ্ঞানের সময় কার্যতঃ খৃঃ পূঃ ৫০০ থেকে ৫০০ খৃষ্টাব্দ অবধি ব্যাপ্ত। পুস্তকের ভিতর বিজ্ঞানের বিবিধ শাখায় প্রাচীন হিন্দুদের জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে; যেমন—পরমাণুতত্ত্ব, জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান ইত্যাদি। এর ভিতর বহু চমকপ্রদ বিবরণের মাত্র দুটি নিয়ে উল্লেখ করা গেল।

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের দৌলতে সেকেণ্ডের কয়েক সহস্র বা লক্ষ ভাগ পরিমাপের কথা শুনতে পাওয়া যায়। প্রাচীন হিন্দুগণের নিকট সেকেণ্ডের চৌত্রিশ হাজার ভাগ পরিমাপ-পদ্ধতি সুবিদিত ছিল। এই পুস্তকের মাধ্যমে দর্শনাচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন মহাভারতের শান্তিপর্বের শ্লোকগুচ্ছের প্রতি, যে সমস্ত শ্লোক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উদ্ভিদের প্রাণশক্তিতে হিন্দুদের দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করেছে।[৩]

বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনায় ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথের অন্যতম মৌলিক অবদান রয়েছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের 'হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রী' গ্রন্থের ভিতর।

ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথের কবি-মনীষার পরিচয় পাওয়া যায় তার 'দি কোয়েস্ট ইটারন্যাল' নামক কবিতা-পুস্তক পাঠে। এর দৃশ্যগত অভিব্যক্তি (mise en sce'ne) সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, 'কোন যুগের আদর্শ অঙ্কিত করতে গিয়ে তিনি (কবি) কল্পনা-চিত্রণের জন্য বেছে নিয়েছেন বহু প্রকাশমান সংস্কৃতির মধ্য থেকে সেই বিশেষ গঠনভঙ্গিমা যা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন জাতিগুলির ও সভ্যতানিচয়ের মিলনক্ষেত্র ও সমন্বয়সাধন হিসাবে কাজ করে এসেছে।'[৪]

এই কবিতা-গ্রন্থের 'প্রথম অংশটিতে (The Ancient Hymn) কল্পিত পটভূমিকা আধা-গ্রীক ও আধা-প্রাচ্য······এবং স্তোত্রটি বাকট্রিয়া (BACTRIA) প্রত্যাগত গ্রীক পুরোহিত দ্বারা উচ্চারিত ব'লে ধরা হয়েছে, যিনি তাঁর দ্বীপের বাড়িতে ফিরে এসেছেন বহু বর্ষ প্রবাসের পর, ধরুন তক্ষশীলা অথবা মথুরায়, যেখানে তিনি ভারতীয় ভাবধারা, ভারতীয় উপাখ্যান ও ভারতীয় কলার সঙ্গে পরিচিতি ঘটিয়েছেন—একটা ধতর্ব্য বিষয় (supposition) যা কোনোক্রমেই অতিরঞ্জিত নয়।

আলোচ্য কবিতা-পুস্তকের উপসংহারে বলা হয়েছে যে, প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক এই বিভাগত্রয়ের সঙ্গে হেগেল-মতবাদের 'থিসিস' 'অ্যান্টিথিসিস' ও 'সিনথিসিস' অথবা হিন্দুদের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কোনো সম্পর্ক নেই।[৫]

ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথের এক বিশিষ্ট রচনাশৈলী ছিল। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ স্যর মাইকেল সাডলারও (যিনি ব্রজেন্দ্রনাথকে অন্যতম গুরুরূপে স্বীকৃতি দেন) ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গীর ভূয়সী প্রশংসা করে গিয়েছেন।[৬] এই

২. The Positive Sciences of the Ancient Hindus, 1915 Foreward (পৃষ্ঠা ৪)।

৩. তুলনীয়—মহাভারত, শান্তিপর্ব, চতুরশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

৪. The Quest Eternal, Preface.

৫. The Quest Eternal.

৬. Sir Michael E. Sadler, Modern Review, January 1936.

অননুকরণীয় ভঙ্গীতে ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথের 'গীতা' বিষয়ক বিশ্লেষণাত্মক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় (জুলাই, ১৯৩০)।

শুধু প্রাচীন হিন্দু-বিজ্ঞানের কার্যাবলীর অনুসন্ধান-কার্যে দর্শনাচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ যে ব্যাপৃত থাকেননি, তার পরিচয় পাওয়া যায় যখন ১৯১১ খৃস্টাব্দে প্রথম Universal Race Congress নামে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত বিশ্বব্যাপী সমাবেশের দায়িত্ববহুল কার্যাবলীর উদ্বোধনের ভার প্রদত্ত হয়েছিল এই বঙ্গ-সন্তানের হস্তে। প্রসঙ্গতঃ তথায় তিনি সাম্প্রতিক কালের মত ব্যক্ত করেছিলেন বলিষ্ঠ ভাষায়—'Modern Science, first directed to the conquest of Nature, must now be increasingly applied to the organisation of Society.'[৭] 'আধুনিক বিজ্ঞান প্রথমতঃ প্রকৃতি-বিজয়কে লক্ষ্য করে প্রযুক্ত হলেও এখন সমাজ-সংগঠনের কাজে তার প্রয়োগকে ক্রমবর্ধমান করতে হবে।'

লণ্ডনের এই মহাসমাবেশের পূর্বেও ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ আর এক বিশ্বসভায় আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেন; এতে ভগিনী নিবেদিতাও উপস্থিত ছিলেন। এটি হল ১৮৯৯ খৃস্টশতকে রোমে আহূত International Orientalist Conference. এই সমাবেশে অন্যান্য কয়েকটি বিষয় ছাড়া উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণবধর্ম ও খৃস্টধর্ম সম্পর্কিত তুলনামূলক পাঠ (Comparative Study of Vaishnavism and Christianity) ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের 'হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়ান শিপিং' গ্রন্থের ভূমিকা ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথেরই রচিত ছিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় ধর্মমহাসভার আয়োজন করা হয়। ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ এর পৌরোহিত্য করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহনের প্রতিও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছিলেন (রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ একাধিকবার অর্পণ করেছিলেন এবং তাঁর রামমোহন-বিষয়ক পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়েছিল)। রামমোহনের নূতন মতবাদের উল্লেখ তাতে ছিল এবং রামমোহন যে বিশ্ববন্দিত, তা তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশদানের সরল ভঙ্গিমা ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল—বিশেষ ভাবে ঠাকুরের রূপক, উপমা ও আখ্যানমালার ভাণ্ডার, যা কখনও নিঃশেষিত হত না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যে বিবিধ মতবাদের (খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি) উপলব্ধির ভিতর দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, সে বিষয়েও তিনি জন-মণ্ডলী ও শ্রোতৃবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং পরিশেষে মন্তব্যস্বরূপ নিছক জাতীয়তার ঊর্ধ্বে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে বিশ্বমানব-প্রেমিক আখ্যা দেন।

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে বিশ্বভারতীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন তার অংশবিশেষ নিম্নে প্রদত্ত হল—'আমাদের জাতীয় চরিত্রে কী কী অভাব আছে, কী কী আমাদের বাইরে থেকে আহরণ করতে হবে? আমাদের মূল ত্রুটি হচ্ছে, আমরা বড়ো একপেশে—ইমোশনাল। আমাদের ভিতরে will ও intellect-এর মধ্যে সবৃজেক্‌টিভিটি ও অবৃজেকটিভিটির মধ্যে চিরবিচ্ছেদ ঘটেছে। আমরা হয় খুব সবৃজেক্‌টিভ নয়তো খুব য়ুনিভার্সাল। অনেক সময়েই আমরা য়ুনিভার্সলিজমের বা সাম্যের চরম সীমায় চলে যাই, কিন্তু differentiation-এ যাই না। আমাদের অবজেক্‌টিভিটির পূর্ণবিকাশ হওয়া দরকার। প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ ও অবজারভেশনের

৭. Race Origino, (পৃষ্ঠা ১)।

ভিতর দিয়ে মনের সত্যানুবর্তিতাকে ও শৃঙ্খলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমাদের intellect-এর character-এর অভাব আছে, সুতরাং আমাদের intellectual honesty-র প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। তাহলেই দেখব যে, কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়েছে। অন্যদিকে আমাদের moral ও personal responsibility-র বোধকে জাগাতে হবে, Law, Justice ও Equality-র যা লুপ্ত হয়ে গেছে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে—এ-সকল বিষয়ে আমাদের শিক্ষা আহরণ করতে হবে। আমাদের মধ্যে বিশ্বকে না পেলে আমরা নিজেকে পাব না। তাই বিশ্বরূপকে প্রতিষ্ঠিত করে আমরা আত্মপরিচয় লাভ করব এবং আমাদের বাণী বিশ্বকে দেব।'

ভারতে ধর্মের স্থান রাষ্ট্রবিষয়ক ব্যাপারে কত মূল্যবান ব'লে গণ্য করা হয়, তা ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ পাঠে জানতে পারা যায়; রাজা বা শাসক ধর্মকেই মানিয়ে চলেন।

ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথের একখানি গণিতের পুস্তক —'Memorial on The Co-efficient of Numbers'। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার গণিত সমিতির (Calcutta Mathematical Society) পত্রে ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথের অবদান ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এ প্রকাশিত ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলী পরে পুস্তকাকারে (New Essays in Criticism) প্রকাশিত হয়। যে যে বিষয়ের বহু ব্যাপক সমালোচনা ও আলোচনা এই পুস্তকে করা হয়েছিল তা সূচীপত্রে ব্যক্ত হয়েছে; সাহিত্যে 'Neo-romantic' আন্দোলন-সম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনা এর বিষয়-সামগ্রীর অন্তর্ভূ'ত ছিল। সেই সঙ্গে ছিল হেগেলের 'philosophy of art' বিষয়ক আলোচনা, ফরাসী বিপ্লবোত্তর সাহিত্যে 'Neo-romantic' আন্দোলন; বাংলা সাহিত্যেও এই আন্দোলনের ধারা সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত যে সব কঠিন কঠিন বিষয়ের আলোচনা এতে সন্নিবেশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে 'Thesis', 'Anti-thesis', 'Self-consciousness', 'Synthesis', 'History of Mind', 'The Myth-Movement in Hyperion' ইত্যাদি।

দর্শনাচার্য ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ অধ্যাপনা ও ফলপ্রসূ গবেষণা-কর্মে আজীবন ব্যাপৃত ছিলেন। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য হিসাবে তাঁর নাম সুবিদিত। জ্ঞান-গরিমার স্বীকৃতিরূপে তিনি ইংরেজ শাসকবর্গের নিকট হইতে 'স্যর' এবং মহীশূর সরকার কর্তৃক 'রাজতন্ত্র প্রবীণ' উপাধিতে ভূষিত হন।

এই মহান শিক্ষাব্রতী ও জ্ঞানীর জীবনাবসানে ডঃ রাধাকৃষ্ণন নিম্নোক্তরূপ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছিলেন—'......শিক্ষাবিদ, দার্শনিক এবং রাজনৈতিক তত্ত্ববাদী হিসাবে তিনি ছিলেন মহান; কিন্তু আরো গভীর রেখাপাত করত তাঁর ব্যবহারে সারল্য এবং হৃদয়ের বিরাটত্ব। এতদ্দেশে এবং তার কৃষ্টিতে স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মহান অবদান পরিমাপ করবার সময় এটা নয়।..... পুরুষানুক্রমিকভাবে বাংলার ছাত্রবৃন্দ তাঁর পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হয়ে তাঁর প্রেরণা লাভ করতেন।'

পরিশেষে ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথেরই উক্তি দিয়ে প্রবন্ধের উপসংহার করব। শান্তির পূজারী ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'ভারতবর্ষে এর আর-একটা ভিত্তি দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে অহিংসা মৈত্রী শান্তি। প্রত্যেক individual-এ বিশ্বরূপদর্শন এবং তারই ভিতর ব্রহ্মের ঐক্যকে অনুভব করা; এই ভাবের মধ্যে যে peace আছে ভারতবর্ষ তাকেই চেয়েছে। ব্রহ্মের ভিত্তিতে আত্মাকে স্থাপন করে যে peace compact হবে, তাতেই শান্তি আনবে।'

স্বামীজীর সন্নিধানে

স্বামী জীবানন্দ ও বন্দ্যোপাধ্যায়

মন্মথনাথ গাঙ্গুলী

১৮৯৭ খৃঃ প্রথম মন্মথবাবু শুনিতে পান—স্বামীজী কলিকাতা পৌছিয়াছেন। পরে তিনি বলরাম-ভবনে স্বামীজীকে দর্শন করিতে যান। স্বামীজীর দর্শন-প্রতীক্ষায় মন্মথবাবু হল-ঘরের মেঝেতে বসিয়াছিলেন, এমন সময় ভগিনী নিবেদিতা উপস্থিত হন। নিবেদিতার নগ্নপদ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, গায়ে আজানুলম্বিত জামা। নিবেদিতাকে দেখিয়া মন্মথবাবুর 'দেবী' মনে হইল। স্বামীজীর ঘরের সম্মুখে গিয়া দরজার চৌকাটের নিকট নতজানু হইয়া যুক্তকরে নিবেদিতা স্বামীজীকে প্রণাম করিলেন, কিন্তু স্বামীজীর ঘরে প্রবেশ করিলেন না। ঐ অবস্থায় থাকিয়া স্বামীজীর সহিত আলাপ করিয়া পুনরায় প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। আলাপের সময় নিবেদিতার কথা এত নম্র ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ছিল যে, মনে হইতেছিল—তিনি যেন গির্জায় প্রার্থনার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন! মন্মথবাবু তাঁহার স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন:

নিবেদিতা-সম্বন্ধে বহু কথা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু আমার প্রথম দর্শনের সময় তাঁহার মুখে যে পবিত্রতা ও শান্তির ভাব দেখিয়াছিলাম, তাহা কুমারী মেরীর আলেখ্যেই দেখা যায়।

কিছু পরে কীর্তনের দল সঙ্গে করিয়া বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঘরে প্রবেশ করিলেন। কীর্তনের দলটি পৃথক্‌ভাবে ঘরের এক কোণে বসিল। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উপস্থিত হওয়া মাত্রই স্বামীজী হল-ঘরে প্রবেশ করিয়া মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন। স্বামীজীকে দেখিয়া বিজয়কৃষ্ণ সদলে তাঁহাকে সম্মান দেখাইতে উঠিয়া দাঁড়ান এবং দুই-এক পা অগ্রসর হইয়া স্বামীজীর পায়ের ধুলা লইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু স্বামীজী তৎপরতার সহিত নীচু হইয়া বিজয়কৃষ্ণের পদ-ধূলি লইতে চেষ্টা করেন। দুইজনই দুইজনের পা স্পর্শ করিতে দেন না, কিন্তু উভয়ের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। শেষে স্বামীজী গোস্বামীজীর হাত ধরিয়া তাঁহাকে নিজের পাশে লইয়া হলের মাঝখানে মেঝেতে বসিয়া পড়েন। গোস্বামী ভাবাবস্থায় আছেন—মনে হইতেছিল। স্বাভাবিক অবস্থায় আসিলে তাঁহাকে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে কিছু বলিতে অনুরোধ করেন। ইহাতে গোস্বামীজী আবার ভাবে গদ্‌গদ হইয়া অতিকষ্টে মাত্র এই কথা বারবার চলিতে থাকেন, 'ঠাকুর আমায় দয়া করেছেন।' তাঁহার ভাবাবেগ এত প্রবল হইয়াছিল যে, তিনি অন্য কিছু বলিতে পারিলেন না, তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইয়া গণ্ডস্থল ভিজাইয়া দিতেছিল। এমন সময় স্বামীজী ও গোস্বামীজীকে মধ্যস্থলে রাখিয়া কীর্তনের লোকেরা খোল-করতালসহ সঙ্কীর্তন আরম্ভ করেন। কিছুক্ষণ পরে গোস্বামীজী দাঁড়াইবার সামর্থ্য লাভ করেন ও সঙ্কীর্তনের দলসহ চলিয়া যান।

এই সময় দূর হইতে আমি স্বামীজীর উদ্দেশে প্রণাম করি। আলাপ না হইলেও তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়াই আমার মনে অপার আনন্দ হয়। আমেরিয়া-বিজয়ী পুরুষসিংহকে দর্শন করিয়া আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। মনে হইতেছিল—স্বামীজী যেন তাঁহার চক্ষু দিয়া সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন। স্বামীজীর সকল অবয়বের মধ্যে সেই বিশাল চক্ষু-দুইটিই ছিল বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। তেমন সুন্দর চক্ষু আর কখনও দেখি নাই! আমি তখন

এলাহাবাদের সমান্য সরকারী কেরানী, ছুটি লইয়া কলিকাতা আসিয়াছি। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কলিকাতায় থাকিয়া ওকালতি করিতেন, আমি মাঝে মাঝে কলিকাতা আসিয়া দাদার বাসায় থাকিতাম ও সাধুসঙ্গ করিতাম।

১৮৯৮ খৃঃ ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে বেলুড় মঠে গিয়া স্বামীজীর সাক্ষাৎ পাই। এই সময় স্বামীজীর মাতা তাঁহাকে দেখিতে বেলুড় মঠে আসেন। ভুবনেশ্বরীদেবীর সুগঠিত দেহ, আয়ত লোচন ও ব্যক্তিত্ব দর্শনে বুঝিলাম— এই সব মায়ের নিকট হইতেই পাইয়াছেন। মাতা ও পুত্র যখন মঠের জমিতে ঘুরিয়া কথা বলিতেছিলেন, তখন মনে হইতেছিল—বিশ্ববরেণ্য বিবেকানন্দ যেন দশ বছরের বালক 'বিলু'।

একদিন কলিকাতার জাপানী কনসালকে স্বামীজীর দর্শনপ্রার্থী দেখি। জাপানের মিকাডো স্বামীজীকে জাপানে যাইয়া হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে অনুরোধ করিবার জন্য তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন।

একবার আমি স্বামীজীর নিকট 'মায়া' কি, জানিতে চাই। প্রথমে তিনি সম্মত হইলেন না; কিন্তু আমি বারবার মিনতি জানাইলে কৃপা করিয়া তিনি আমাকে 'মায়া' কি, বুঝাইয়া দেন। ইহাতে আমার মধ্যে এক আশ্চর্য পরিবর্তন আরম্ভ হয়—চতুর্দিকে শুধু স্পন্দন! কতক্ষণ পরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসি।

আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া স্বামীজী আমাকে দীক্ষা দেন। আমার বহুপূর্বে দেখা অতি গোপনীয় একটি স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিয়া স্বামীজী আমাকে মন্ত্র দেন ও বলেন, 'স্বপ্নে তুমি অন্য মন্ত্র পেয়েছিলে, কিন্তু তোমাকে যে মন্ত্র দিলাম, তাই তোমার মন্ত্র।'

আমি সাক্ষাৎ শিবজ্ঞানে তাঁহার চরণবন্দনা করিলাম। স্বামীজীর প্রসাদ পাওয়ার জন্য খুব ইচ্ছা হইতেছিল; কিন্তু মুখ ফুটিয়া তাহা না বলিলেও তিনি সে ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া দিলেন। দেখিলাম—স্বামীজী অন্তর্যামী, সব জানেন!

১৯০২ খৃঃ জানুআরি পর্যন্ত বহুবার বেলুড় মঠে গিয়াছি এবং স্বামীজীর শ্রীমুখ-নিঃসৃত প্রাণপ্রদ বাণী শুনিয়াছি।

স্বামীজী বলেন: ভারত ভবিষ্যতে অতীত অপেক্ষা অধিকতর গৌরব লাভ করবে।

স্ত্রী-স্বাধীনতার শুধু পরিকল্পনায় বিশেষ কিছুই হবে না। স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন হলেই মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের সব সমস্যার সমাধান ক'রে নেবে বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ এ সব নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। চাই স্ত্রীশিক্ষা, তাহলেই সব কুপ্রথা দূর হয়ে যাবে।

একদিন সাধু নাগ মহাশয় আসেন, তাঁহার ভক্তি-বিশ্বাসের কথায় স্বামীজী বলিলেন: 'নাগ-মশায়ের ভক্তি-বিশ্বাসের তুলনা নেই। এঁর কথা মনে রাখবে, এমনটি আর কোথাও দেখবে না।'

স্বামীজী আমাকে বলেন: 'দু-নৌকায় পা দিও না, গার্হস্থ্য বা সন্ন্যাস—একটা বেছে নাও। সন্ন্যাসী গৃহস্থদের গুরু। সন্ন্যাসীকে প্রণাম করবে, ত্যাগের আদর্শ সর্বদা সম্মুখে রেখো। তিনিই গুরু, যিনি সর্বোচ্চ ত্যাগ ও জ্ঞানের আদর্শ স্মরণ করিয়ে দেন।'

স্বামীজী যেন আসন্ন দেহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তিনি খুব কমই বিশ্রাম লইতেন; মঠের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি ও নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতে সর্বদা ব্যস্ত থাকিতেন।

ইসাবেল মার্গেসন

১৮৯৫ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে স্বামীজী ইংলণ্ডে প্রথম পদার্পণ করেন। সেই সময় হইতেই ইসাবেল মার্গেসন (Isabel Margession)

স্বামীজীর ক্লাসে বক্তৃতা ও ঘরোয়া আলোচনায় যোগদান করিতে থাকেন এবং তাঁহার প্রতিভা ও আধ্যাত্মিকতায় বিশেষ আকৃষ্ট হন। পর বৎসর ১৮৯৬ খৃঃ মে মাস হইতে পুনরায় লণ্ডনে বক্তৃতাদি আরম্ভ হইলে লেডি ইসাবেল তাহাতে নিয়মিত যোগদান করিতেন। ৪০ বৎসর পরে তিনি যে স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করেন, তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত হইল:

আজ প্রায় ৪০ বৎসর অতীত হইয়াছে, আমি স্বামীজীর বন্ধুত্ব লাভ করিয়াছিলাম এবং তাঁহার গুণমুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাঁহার স্মৃতি এখন ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার শিক্ষার সহিত তাহা এক হইয়া রহিয়াছে। আমার অন্তরের গভীর চিন্তার প্রেরণারূপে সেই স্মৃতি জীবন্ত! স্বামীজীর সান্নিধ্যে আমার মনে গভীর ছাপ পড়িয়াছিল, এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, বাস্তবিকই আমি প্রকৃত সত্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম। স্বামীজীর শক্তিময়ী বাণী আমাকে সুখে দুঃখে, দুশ্চিন্তা ও অসুস্থতায় সংসারের যাত্রাপথে নির্ভীক হইতে শিখাইয়াছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, কেহ যদি আত্মোন্নতি করিতে ও সর্ববিষয়ে শক্তিমান্ হইতে ইচ্ছা করে, তবে স্বামীজীর বাণীতে যেরূপ শক্তি পাইবে, অন্যত্র কোথাও সেরূপ পাইবে না।

স্বামীজী ধ্যানের উপরই বেশী জোর দিতেন। প্রতিদিন ধ্যান করিতে বলিতেন। প্রথম যখন তাঁহার নিকট ধ্যানের বিষয় শিক্ষালাভ করি, তখন ইহা আমার নিকট সম্পূর্ণ নূতন এক জিনিস মনে হইল। যে শিক্ষায় সকল বন্ধন ছিন্ন হয় এবং আত্মা নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব জানিতে পারা যায়, সেই শিক্ষাই স্বামীজী আমাদিগকে দিতেন। তিনি বলিতেন, সকল শিক্ষার মূলে ইন্দ্রিয়সংযম ও একাগ্রতা।

ক্রিস্টিনা অ্যালবার্স

১৯০০ খৃঃ স্যানফ্রান্সিস্কোতে স্বামীজী যখন বক্তৃতা দিতেছিলেন, তখন আমেরিকার ক্রিস্টিনা অ্যালবার্স (Christina Albers) তাঁহাকে প্রথম দর্শন করেন ও তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। এই সাক্ষাতের প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে ক্রিস্টিনা অ্যালবার্স তাঁহার যে মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, নিম্নলিখিত বিষয় তাহা হইতেই উদ্ধৃত:

স্বামীজী বক্তৃতার নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় কুড়ি মিনিট পূর্বে উপস্থিত হইয়া কয়েকজন বন্ধুর সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হন। আমি তাঁহার অদূরেই উপবিষ্ট ছিলাম এবং অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। আমার মনে এই ভাবের উদয় হইয়াছিল যে, তিনি আমাকে নূতন কিছু দান করিতে সক্ষম। যদিও সাধারণ আলাপ হইতেছিল, তথাপি আমি অনুভব করিতেছিলাম যে, তাঁহার ভিতর হইতে এক অপূর্ব শক্তি বিচ্ছুরিত হইতেছে!

ঐ সময় তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য; মঞ্চোপরি আরোহণ করা যেন তাঁহার পক্ষে আয়াস-সাপেক্ষ মনে হইতেছিল। তাঁহার চোখের পাতা ফুলা দেখিলাম এবং দেখিয়া মনে হইল তিনি বেদনাক্লিষ্ট।

বক্তৃতা দিবার পূর্বে কিছুক্ষণ তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন। দেখিলাম, তখন তাঁহার মুখাবয়বে এক অপূর্ব পরিবর্তন ঘটিয়াছে; মনে হইল, তাঁহার চেহারাই যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম হইয়া গিয়াছে।

বক্তৃতা আরম্ভ হইবামাত্র সেই মহামানবের আত্মিক শক্তি অনুভূত হইতে লাগিল। তাঁহার বক্তৃতা দিবার শক্তি যে কী বিপুল, তখনই তাহা বুঝিতে পারিলাম; তাঁহার কথাগুলি কানে আসিয়া যতখানি ঢুকিতেছিল, তাহা অপেক্ষা

বেশী ঢুকিতেছিল অন্তরের অনুভূতিতে। একটি সত্তার সাগর, একটি উচ্চতর অস্তিত্বের উপলব্ধি আমাকে আকৃষ্ট করিল।

বক্তৃতা-শেষে মনে হইল—ঐ উচ্চভূমি হইতে অবতরণ করা যেন বেদনাদায়ক। ঐ আশ্চর্য চক্ষু যেন উল্কাসদৃশ! অবিরত সেই চক্ষুদুটি হইতে ঝলকে ঝলকে আলোক বিচ্ছুরিত হইতেছিল। সে আজ বহু বৎসর পূর্বের কথা, কিন্তু সেদিনের কথা আমার স্মৃতিপটে চির-নবীন এবং সর্বদাই সেইরূপ থাকিবে। তিনি বেশী দিন এই ধরাধামে ছিলেন না; কিন্তু জীবনের মূল্য বৎসর দ্বারা পরিমিত হয় না, তিনি অনন্ত জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অন্তরের অন্তস্তল হইতে যে ধ্বনি উঠিয়াছিল, তাহাতে সমগ্র পৃথিবী স্পন্দিত হইয়াছিল। এক ব্যক্তি একাকী অর্ধ পৃথিবীর চিন্তাপ্রবাহ পরিবর্তন করিলেন! এই ছিল তাঁহার কাজ।

দেহ নশ্বর। তাঁহাকে যেরূপ কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হইয়াছিল, তাহাতে দেহের উপর প্রতিক্রিয়া হয়—কিন্তু তাঁহার কার্য সমাপ্ত হইয়াছিল। তিনি ধরাধামে চল্লিশ বৎসরও জীবিত ছিলেন কিনা সন্দেহ, কিন্তু এই চল্লিশ বৎসর একটি শতাব্দী অপেক্ষাও মূল্যবান্। এক মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি উচ্চতর রাজ্য হইতে প্রেরিত হন এবং সেই কার্য সমাপনান্তে পুনরায় স্বধামে প্রত্যাবর্তন করেন।

টি. জে. দেশাই

১৮৯৫ খৃঃ ইংলণ্ডে থাকাকালে শ্রীদেশাই ামস মূলারের আমন্ত্রণে স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৮৯৬ খৃঃ তিনি 'রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি'র সভ্য নির্বাচিত হন। সংস্কৃতে সুপণ্ডিত বিখ্যাত অধ্যাপক রইস্ ডেভিডস্ (Prof. Rhys Davids) তখন সোসাইটির সেক্রেটারি ছিলেন।

স্বামীজীকে প্রথম দেখিয়া ও সেণ্ট জেমস হলে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া দেশাই-এর মনে হয়—স্বামীজী সাধু না হইয়া রাজা হইলেই যেন বেশী মানাইত। স্বামীজীর বাগ্মিতায় শ্রোতাদিগের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। পরদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে, কেশবচন্দ্র সেনের পরে এই একজন ভারতবাসী তাঁহার বাগ্মিতায় ইংরেজ শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছেন। স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

শ্রীদেশাই-এর স্মৃতিকথা হইতে কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

বেলুন সোসাইটিতে আমি দ্বিতীয়বার স্বামীজীর বক্তৃতা শুনি। বক্তৃতার শেষে একজন ধর্মযাজক স্বামীজীকে বক্তৃতা লিখিয়া আনিয়া পড়িলেই ভাল হয়, ইত্যাদি অনেক কথা বলেন। স্বামীজী উত্তর দিতে উঠিলেন, মনে হইল—যেন জাগ্রত পুরুষসিংহ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এমন তেজস্বিতা সহকারে উত্তর দিলেন যে, ধর্মযাজকের সকল যুক্তি ভাসিয়া গেল। স্বামীজী বলিলেন, 'লোকের ধারণা—বেদান্ত অল্প কয়েকদিনেই আয়ত্ত করা যায়। কিন্তু দীর্ঘকাল ধ'রে বেদান্তের চর্চা ও অনুশীলন করলে তবে এই উচ্চতত্ত্বের ধারণা হয়। আমাকে দীর্ঘ ১২ বছরের চেষ্টায় বেদান্ত শিক্ষা করতে হয়েছে।' পরে স্বামীজী সুললিত ছন্দে বেদের একটি শ্লোক আবৃত্তি করেন। আজও আমার কর্ণে সেই আবৃত্তির সুর ধ্বনিত হইতেছে!

রয়েল সোসাইটিতে এক সভায় অধ্যাপক বেইন (Prof. Bain) উপনিষদ্-সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই সভায় স্বামীজী এবং রমেশচন্দ্র দত্ত উপস্থিত ছিলেন। স্যর রেমণ্ড

ওয়েস্ট সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। প্রবন্ধ-পাঠের পরে আমি বলি, 'ইংরেজ চরিত্রের প্রধান দোষ—অহমিকা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, এ-দুটি ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের অন্তরায়।' ইহাতে বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। পরে আমি উপসংহারে বলি, 'কারও মনে আঘাত করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি শুধু এই কথাই ব্যক্ত করতে ইচ্ছা করেছি যে, বেদান্ত-তত্ত্বদর্শী হিন্দুদেরই নিকট বেদান্ত শিক্ষা করা প্রয়োজন, অন্যথা লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার আশঙ্কা আছে।'

এই ভাষণে স্বামীজী আমার উপর খুবই সন্তুষ্ট হন এবং নানা বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে আমাকে তাঁহার বাসস্থানে লইয়া যান।

১৮৯৬ খৃঃ স্বামীজী কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও রাজযোগ বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে লণ্ডনের বিভিন্ন স্থানে বহু বক্তৃতা দেন। আমি তাঁহার অনেক বক্তৃতাতেই উপস্থিত থাকিতাম। স্বামীজী ব্লাভাটস্কী লজে-ও বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রিত হন। ইংরেজ সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেন।

স্বামীজী প্রায়ই বক্তৃতার পরে আমাকে তাঁহার বাসায় লইয়া যাইতেন এবং সেখান হইতে কখনও বা নিকটবর্তী স্থানেও লইয়া যাইতেন। এই সময় মিঃ স্টার্ডি, মিস মুলার ছাড়াও মিঃ গুডউইন স্বামীজীর একজন বিশ্বস্ত অনুরাগী ছিলেন। স্বামীজীর বক্তৃতার সাঙ্কেতিক লিপি গুডউইন গ্রহণ করিতেন, ইহা হইতে পরে বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

১৮৯৬ খৃঃ জুলাই মাসে মণ্টেগু ম্যানসনে লণ্ডন হিন্দু এসোসিয়েসনের কনফারেন্সে স্বামীজী সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং 'ভারতের প্রয়োজন' সম্বন্ধে মর্মস্পর্শী ভাষণ দেন। দাদাভাই নারোজী এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

আমি এক সময় বেদান্ত-সম্বন্ধে প্রশ্ন করি, '! জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব জানতে চাই।' স্বামীজী শুধু বলিলেন; 'তত্ত্বমসি'। আমার আর কোন সংশয় রহিল না, মন যেন ব্রহ্মে নিবদ্ধ হইল!

স্বামীজী বলিতেন, 'বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা ছিল—অহিংসা পরমো ধর্ম। কিন্তু এ শিক্ষা এত দূর পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, ভারতের লোক সব নিবীর্য হয়ে পড়েছে। আমি মানুষ তৈরীর ধর্ম ও শক্তিচর্চার ধর্মই প্রচার করি।'

টম অ্যালান ও এডিথ অ্যালান

টম অ্যালান (Tom Allan) ও তাঁহার পত্নী এডিথ (Edith) ক্যালিফর্নিয়া বেদান্ত সোসাইটিতে 'অজয়' ও 'বিরজা' নামে পরিচিত। টম জাতিতে ইংরেজ এবং ইংরেজ সেনাবাহিনীতে চাকরি করিতেন। নৌ-ইঞ্জিনিয়র টমের চাল-চলন সৈন্যের ন্যায় ছিল। টম একবার স্বামীজীর সম্মুখে দাঁড়াইলে স্বামীজী বলেন, 'মিস্টার অ্যালান, আমরা উভয়ে একই জাতি—আমরা ক্ষত্রিয়।' এই সময় টম স্যানফ্রান্সিস্কোতে এক লৌহ-কারখানায় কাজ করিতেন।

১৯০০ খৃঃ স্বামীজী যখন ওকল্যাণ্ডে আসেন, তখন এডিথ অসুস্থ ছিলেন। পত্রিকায় স্বামীজীর বক্তৃতার বিজ্ঞাপন পড়িয়া টম একাই বক্তৃতা শুনিতে যান। টম বক্তৃতা শুনিয়া অনুপ্রাণিত হইয়া ফিরিয়া আসিলে এডিথ বক্তা ও বক্তৃতার বিষয় জানিতে ইচ্ছা করেন। টম বলেন: এমন একজন মানুষ দেখে এসেছি, যিনি মানুষ নন—দেবতা। তিনি যা বলেছেন, তা খাঁটি সত্য। তাঁর দুটি চমকপ্রদ কথা হচ্ছে—ভাল ও মন্দ একই মুদ্রার দুই পিঠ। একটি ছাড়া অপরটি পাওয়া অসম্ভব। 'হোম অব্ টথ' শেখায়—সবই ভাল, মন্দ কিছুই

নেই। স্বামীজীর অন্য যে কথা আমার খুব মনে লেগেছে তা হচ্ছে, 'গরু মিথ্যা কথা বলতে পারে না, কিন্তু মানুষ পারে। গরু গরুই থাকে, মানুষ কিন্তু দেবত্ব লাভ করতে পারে।'

টম তখন হইতেই স্বামীজীর বক্তৃতায় দ্বাররক্ষকের কাজ শুরু করিয়া দেন। বক্তৃতায় যে অর্থ সংগৃহীত হইত, টম তাহা গুণিয়া রাখিতেন এবং স্বামীজীকে শ্রোতাদের নিকট পরিচিত করাইয়া দিতেন। সুস্থ হইয়া এডিথও স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিতে যাইতে থাকেন এবং শুনিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হন।

প্রথমবার মঞ্চের উপরে স্বামীজীর পার্শ্বে দাঁড়াইলে টমের মনে হইল তিনি স্বামীজীর নিকটে যেন অতি ক্ষুদ্র। ইহার পর হইতে টম মঞ্চের নীচে দাঁড়াইয়াই কথা বলিতেন।

একবার স্বামীজী ভারত-সম্বন্ধে বক্তৃতা আরম্ভ করিবার পূর্বে টমকে বলেন, 'আমি ভারতের কথা শুরু করলে কখন যে থামতে হবে ভুলে যাই, তাই দশটার সময় তুমি আমাকে ইশারা ক'রো।' টম বক্তৃতা-গৃহের পশ্চাতে দাঁড়ান ও দশটার সময় তাঁহার পকেটঘড়ি পেণ্ডুলামের মতো দোলাইতে থাকেন। স্বামীজী সঙ্কেত লক্ষ্য করিয়া বলেন, 'আমি দশটার সময় বক্তৃতা বন্ধ ক'রব ব'লে রেখেছি; তাই ঘড়ি দোলানো আরম্ভ হয়েছে, আর আমি বলা এখনও আরম্ভই করিনি।' বক্তৃতা অবশ্য স্বামীজী বন্ধ করেন। ঐদিন হইতে যতদিন জীবিত ছিলেন, টম ঐ পুরাতন ঘড়িটিই সঙ্গে রাখিতেন।

এক সময় টম জিজ্ঞাসা করেন, 'স্বামীজী কোথায় আপনি শ্রেষ্ঠ শিষ্য লাভ করেছেন?' স্বামীজী তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, 'ইংলণ্ডে। তাদের পাওয়া শক্ত, কিন্তু একবার তাদের পেলে চিরদিনের জন্য পাওয়া যায়

স্বামীজী জলে জাহাজ ভাসানো দেখিতে ইচ্ছা করিলে টম তাহার ব্যবস্থা করেন। সেখানে একটি মঞ্চে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না, দুইজন প্রহরী নিযুক্ত ছিল। স্বামীজী মনে করিলেন, মঞ্চ হইতে ভাল দেখা যাইবে। তিনি প্রহরীদের সম্মুখ দিয়া হাঁটিয়া মঞ্চের উপর চলিয়া গেলেন, কেহ বাধা দিল না।

টম ও এডিথ স্বামীজীর বিষয় এমন জীবন্ত ও আনন্দদায়ক ভাবে বর্ণনা করিতেন যে, মনে হইত—বোধ হয় তাহার পরেই স্বামীজী ঘরে প্রবেশ করিবেন। স্বামীজীর নানা স্মৃতিচিহ্নের মধ্যে তাঁহাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল স্বামীজীর বাগানে তোলা একটি ফটো। এডিথ 'প্রভু মেরে অবগুণ চিত ন ধরো'—এই গানটি (ইংরেজী অনুবাদ) গাহিতে বড় ভাল বাসিতেন; এই গান খেতড়ির রাজদরবারে ১৮৯৩ খৃঃ স্বামীজী শুনিয়াছিলেন।

এডিথের স্মৃতিকথার কিছু উদ্ধৃত হইল:

১৯০০ খৃঃ মার্চ মাসের প্রথম দিকে স্যানফ্রান্সিস্কো ইউনিয়ান স্কোয়ার রেডম্যান্‌-হলে 'ভারতের আদর্শ' সম্বন্ধে স্বামীজী তিনটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতার প্রথম দিনেই তাঁহার কথা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করি। দেহমনে অসুস্থ থাকায় বহু আয়াসে বক্তৃতা-গৃহে উপস্থিত হইয়া স্বামীজীর আগমনের অপেক্ষায় বসিয়া ভাবিতেছিলাম, আসিয়া হয়তো ভুল করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার রাজোচিত চেহারা দেখিয়াই সব সন্দেহ চলিয়া গেল। স্বামীজী প্রায় দুই ঘণ্টা বলেন। তিনি অত্যন্ত উদারভাবের শিক্ষা দিতেছিলেন। আমরা যাহাতে তাঁহার কথা সামান্যও অন্ততঃ বুঝিতে পারি, সেইজন্য বক্তৃতার মাধ্যমে আমাদিগকে যেন তাঁহার দেশেই লইয়া যাইতেছিলেন—মনে হইতেছিল। বক্তৃতার পরে তাঁহার সহিত আমার পরিচয়

করাইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু তাঁহার বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বে সন্ত্রস্ত হইয়া আমি কথা না বলিয়া দূরে বসিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

দ্বিতীয় বক্তৃতার পরেও ঐভাবে বসিয়াছিলাম, স্বামীজী আমাকে নিকটে ডাকেন। আমি নিকটে গেলে বলেন, 'ভদ্রে, যদি আমার সঙ্গে কোন বিষয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছা হয়, টার্ক স্ট্রীটের ফ্লাটে এসো।' আমি সম্মত হইলে স্বামীজী বলেন, 'কাল সকালে এসো।' এই সময় শান্তি (মিসেস এলিস হান্সবরো) ও কল্যাণী (মিসেস এমিলি এস্পিনল) তাঁহার কাজকর্ম দেখাশুনা করিতেন।

পরদিন সকালে আমি গেলে স্বামীজী ছোট টুপি ও আলখাল্লা পরিয়া নিম্নস্বরে স্তোত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমাকে বলিলেন, 'ভদ্রে!' আমি পূর্বরাত্রে কি সব প্রশ্ন করিব—কত চিন্তা করিয়া ঘুমাই নাই, কিন্তু কিছুই বলা হইল না, শুধু কাঁদিতে লাগিলাম। সেকি কান্না, যেন কান্নার বন্যা ছুটিতেছিল! স্বামীজী স্তোত্রপাঠ শেষ করিয়া বলিলেন, 'কাল এই সময় এসো।'

যদিও এইভাবেই প্রথম সাক্ষাৎ শেষ হইল, তবু মনে হইল—আমার প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়াছি এবং সকল সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে। ঐ সাক্ষাৎকারের পর ২৪ বৎসর কাটিয়া গেলেও জীবনের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদরূপে স্মৃতির মণিকোঠায় এই ঘটনা সযত্নে রক্ষিত আছে। মাসাবধিকাল তাঁহাকে প্রত্যহ দেখিবার এবং তাঁহার ধ্যানের ক্লাসে যোগ দিবার অসীম সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম।

ক্লাসের পরে তিনি আমাকে রান্নাঘরে ছোটখাটো কাজ করিতে সুযোগ দিতেন। রান্না করিতে করিতে স্বামীজী বেদান্তের কথা বলিতেন ও স্তোত্রপাঠ করিতেন। এই সময় গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের নিম্নোক্ত শ্লোকটি প্রায়ই আবৃত্তি করিতেন :

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

একদিন বক্তৃতার পর স্বামীজীর সঙ্গে হাঁটার সময় মনে হইল—তিনি সাধারণ লোক অপেক্ষা অনেক উঁচু—যেন রাস্তার লোক সব বামন! স্বামীজীর এমন রাজোচিত চেহারা ছিল যে, লোকে তাঁহাকে দেখিয়াই এক পাশে সরিয়া গিয়া তাঁহাকে রাস্তা ছাড়িয়া দিত।

টার্ক স্ট্রীটে একমাস কাটাইয়া স্বামীজী আলামেডা 'হোম অব ট্রুথে' বাস করেন। আলামেডাতেও আমি তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি এবং তাঁহার রান্না খাইয়াছি। যদিও আমি স্বামীজীর এই দুই স্থানের সব বক্তৃতাতেই উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শই আমার হৃদয়ে গভীর ভাবে অঙ্কিত আছে।

স্বামীজী আমাকে বলেন, 'সাক্ষী হ'তে শেখ। রাস্তায় যদি দুটা কুকুর লড়াই করে আর আমি রাস্তায় বেরুই, তবে আমিও জড়িয়ে প'ড়ব; কিন্তু যদি স্থির হয়ে ঘরের জানালায় বসে লড়াই দেখি, তবে সাক্ষিরূপে দেখব।'

আমরা স্বামীজীকে কতটুকু আর বুঝেছি! তিনি বাস্তবিক কী ছিলেন, আমাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। তাঁহার স্নেহ ও সহিষ্ণুতার তুলনা নাই।

আলামেডায় বক্তৃতা শেষ হইলে তিনি সেখান হইতে 'ক্যাম্প টেলরে' চলিয়া যান, অল্প কয়েকদিন পরে তিনি প্রাচ্যে রওনা হন। আমরা, ক্যালিফর্নিয়ার লোকেরা, তাঁহাকে আর দেখি নাই। তবু তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করার সৌভাগ্য যাহাদের হইয়াছিল, তাহারা ভাবিতেই পারে না যে, তিনি তাহাদের নিকট হইতে একেবারে চলিয়া গিয়াছেন। পবিত্র স্মৃতির মাধ্যমে তিনি আমাদের মধ্যে রহিয়াছেন।

আমাকে তিনি বলিয়াছিলেন, 'দুঃখে পড়লে আমাকে ডাকবে, শত সহস্র মাইল দূরে থাকলেও সে ডাক শুনতে পাবো।' সে ডাক তিনি হয়তো এখনও শুনিতে পান!

স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ

শ্রীমতী বিভা সরকার

স্বামীজী বলেছেন : হে ভারত ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে ; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত।

স্বামীজীর মতে মাতৃত্বের স্থান অতি উচ্চে। তিনি ধন্য, যিনি স্ত্রীলোককে ভগবানের মাতৃভাবের প্রতিমূর্তি ব'লে মনে করতে পারেন। এক জায়গায় তিনি দুঃখ করে বলেছেন :

আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন ?—শক্তির অবমাননা সেখানে ব'লে।··· শক্তির কৃপা না হলে কি ঘোড়ার ডিম হবে! আমেরিকা, ইউরোপে কি দেখেছি ? শক্তির পূজা, শক্তির পূজা।

পাশ্চাত্যে নারী—স্ত্রী-শক্তি। সেখানে নারীত্বের আদর্শ পত্নীত্ব। ভারতে নারীত্বের চরমাদর্শ মাতৃত্ব। হিন্দুর কাছে মায়ের স্থান সর্বোচ্চে, তারপর জায়ার, তারও পর কন্যার। হিন্দুর জননী 'স্বর্গাদপি গরীয়সী'। শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্ত্রীলোককে কি চক্ষে দেখতেন, সে প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন :

সকল নারী আনন্দময়ী মা ব্যতীত কিছুই নহেন—তাঁহারই পূজা। আমি নিজে দেখিয়াছি, সমাজ যাহাদিগকে স্পর্শ করিবে না, তিনি এইরূপ স্ত্রীলোকের সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, শেষে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পদতলে পতিত হইয়া অর্ধবাহ্য অবস্থায় বলিতেছেন 'মা, একরূপে তুমি রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছ আর এক রূপে তুমি সমগ্র জগৎ হইয়াছ। আমি তোমাকে প্রণাম করি, প্রণাম করি।' ভাবিয়া দেখ—সেই জীবন কিরূপ ধন্য যাহা হইতে সর্ববিধ পশুভাব চলিয়া গিয়াছে, যিনি প্রত্যেক রমণীকে ভক্তিভাবে দর্শন করিতেছেন, যাঁহার নিকট সকল নারীর মুখে কেবলমাত্র সেই আনন্দময়ী জগদ্ধাত্রীর মুখ প্রতিবিম্বিত হইতেছে। ইহাই আমাদের প্রয়োজন।

পাশ্চাত্য ধর্মের সঙ্গে বৈদিক ধর্মের তুলনা করে তিনি বলেছেন :

যীশুখৃষ্ট নারীদিগকে পুরুষের তুল্যাধিকার দেন নাই। স্ত্রীলোকেরাই তাঁহার জন্য সব করিল, কিন্তু তিনি য়াহুদীদের দেশাচার দ্বারা এতদূর বদ্ধ ছিলেন যে, একজন নারীকেও তিনি 'প্রেরিত শিষ্য' পদে উন্নীত করেন নাই। বুদ্ধ ধর্মরাজ্যে পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের সমানাধিকার স্বীকার করিয়াছিলেন।

নারী-সম্বন্ধে আর্য ও সেমেটিক আদর্শ চিরদিনই সম্পূর্ণ বিপরীত। সেমাইট্‌দের মধ্যে স্ত্রীলোকের উপস্থিতি উপাসনার ঘোর বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত। তাহাদের মতে স্ত্রীলোকের কোনরূপ ধর্মকার্যে অধিকার নেই। আর্যদের মতে সহধর্মিণী ব্যতীত পুরুষ কোন ধর্মকার্য করিতে পারে না।

স্বামীজী এই সব উদাহরণ দিয়ে দেখাতে চেষ্টা করেছেন, আর্যধর্মে নারীর স্থান কত উচ্চে।

আধুনিক হিন্দুধর্ম বিষয়ে তিনি বলেছেন :

আধুনিক হিন্দুধর্ম পৌরাণিক ভাববহুল, অর্থাৎ উহার উৎপত্তিকাল বুদ্ধের পরবর্তী। দয়ানন্দ সরস্বতী দেখাইয়া গিয়াছেন, যে সহধর্মিণী ব্যতীত গার্হপত্য অগ্নিতে আহুতিদান-রূপ

বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইতে পারে না, তাঁহারই আবার শালগ্রামশীলা অথবা গৃহদেবতাকে স্পর্শ করিবার অধিকার নাই। ইহার কারণ এই যে, এই সকল পূজা পরবর্তী পৌরাণিক সময় হইতে প্রচলিত হইয়াছে।

স্বামীজীর মতে: আমাদের নারী ও পুরুষের মধ্যে অধিকার-বৈষম্যের কারণ সৃষ্টি হইয়াছিল বৌদ্ধধর্মের অবনতির সময়। প্রত্যেক আন্দোলনেই কোন অসাধারণ বিশেষত্ব থাকে বলিয়াই তাহার জয় ও অভ্যুদয় হয়। কিন্তু আবার উহার অবনতির সময়, যাহা তাহার গৌরব তাহাই তাহার দুর্বলতার প্রধান উপাদান হয়। নরশ্রেষ্ঠ ভগবান বুদ্ধের সম্প্রদায়-গঠন ও পরিচালন-শক্তি অদ্ভুত ছিল, কিন্তু তাঁহার ধর্ম কেবল সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের উপযোগী ধর্মমাত্র। তাহা হইতে এই অশুভ ফল হইল যে, সন্ন্যাসীর ভেক পর্যন্ত সম্মানিত হইতে লাগিল। আবার তিনিই সর্বপ্রথম মঠ-প্রথা প্রবর্তিত করিলেন। ইহার জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া নারীজাতিকে পুরুষাপেক্ষা নিম্নাধিকার দিতে হইল। কারণ, বড় বড় মঠস্বামিনীগণ কতকগুলি নির্দিষ্ট মঠাধ্যক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোন গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। ইহাতে উদ্দিষ্ট আশুফললাভ, অর্থাৎ তাঁহার ধর্ম-সঙ্ঘের মধ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছিল, কেবল সুদূর ভবিষ্যতে ইহার যে ফল হইয়াছিল, তাহারই জন্য অনুশোচনা করিতে হয়। বৌদ্ধ মঠে নারীদের নিম্নাধিকার অর্থাৎ মঠ-জীবনে আধ্যাত্মিক অধিকার সবই সমান ছিল। সঙ্ঘের দিক হইতে নিম্নাধিকার ছিল বটে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে সাম্যই বর্তমান ছিল।

এই সমস্ত তুলনার দ্বারা স্বামীজী আর্য-ধর্মে নারীর যথার্থ স্থান কি ছিল তা বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন:

বেদেও সন্ন্যাসের বিধি ছিল, কিন্তু ঐ বিষয়ে নরনারীর কোনও প্রভেদ করা হয় নাই। যাজ্ঞবল্ক্যকে জনকরাজার সভায় কিরূপ প্রশ্ন করা হইয়াছিল, তাহা স্মরণ আছে তো? তাঁহার প্রধান প্রশ্নকর্তা ছিলেন বাক্‌পটু কুমারী বাচক্লবী—এই স্থলে তাঁহার নারীত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ প্রসঙ্গ পর্যন্ত তোলা হয় নাই। আর আমাদের প্রাচীন আরণ্য শিক্ষাপরিষদসমূহে বালক-বালিকার সমানাধিকার ছিল, তদপেক্ষা অধিকতর সাম্যভাব আর কি হইতে পারে?

স্বামীজীর মতে, ভারতীয় নারীর বিভিন্ন আদর্শের মধ্যে মাতার আদর্শই শ্রেষ্ঠ। তিনি আরও বলছেন, মায়ের ভালবাসায় জোয়ার-ভাঁটা নেই, কেনা-বেচা নেই, জরা-মরণ নেই। অর্থাৎ মায়ের ভালবাসা নিঃস্বার্থ; মায়ের ভালবাসা কোনও প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখে না, তাই হিন্দুর কাছে, ভারতবাসীর কাছে, জননী 'স্বর্গাদপি গরীয়সী'। তিনি বলছেন: ভগবৎপ্রেমই কেবল মায়ের ভালবাসা হইতে উচ্চতর, আর সবই নিম্নশ্রেণীর। জননী শক্তির প্রথম বিকাশ-স্বরূপ—মা নাম করিলেই শক্তির ভাব, সর্বশক্তিমত্তা, ঐশ্বরিক শক্তির ভাব আসিয়া থাকে। ভারতে জনকের ধারণা হইতে জননীর ধারণা উচ্চতর বিবেচিত হয়। শিশু আপনার মাকে সর্বশক্তিময়ী মনে করে। আমাদের পার্থিব জননীতে সেই জগন্মাতার যে এক কণা প্রকাশ রহিয়াছে, তাহারই উপাসনাতে মহত্ত্বলাভ হয়।

স্বামীজীর মতে আদর্শ পত্নী সহধর্মিণী, আত্মার সঙ্গিনী, কর্মের প্রেরণা, সে বিশ্বহিতে নিবেদিতা, সীতার মতোই সর্বংসহা নিরভিমানিনী। স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবধারার একটা সুষ্ঠু সমন্বয় করতে চেয়েছেন। সব দেশের যাহা শুভ, যাহা মঙ্গলময় তাহাই যেন

আমাদের জাতীয় জীবনে সমন্বয়ে সার্থক হয়, এই ছিল তাঁর ইচ্ছা।

স্বামীজী সারা পৃথিবী ঘুরে দৃষ্টি প্রসারিত করে কুসংস্কারহীন মন নিয়ে সব কিছুর ভালমন্দ প্রত্যক্ষ করেছেন ও কি করলে ভারতের মঙ্গল হয় তার চিন্তা করেছেন। এক জায়গায় তিনি বলেছেন :

পাশ্চাত্যে নারী—স্ত্রীশক্তি। নারীত্বের ধারণা সেখানে স্ত্রীশক্তিতে কেন্দ্রীভূত। ভারতের একটা সাধারণ মানুষের কাছেও সমস্ত নারী-শক্তি মাতৃত্বে ঘনীভূত। স্বামী ও স্ত্রীর সর্বদা একত্রাবস্থানের আনন্দ ভারতবর্ষে সমীচীন বলিয়া গ্রাহ্য হয় না। এইটি আমাদিগকে পাশ্চাত্য-দিগের নিকট হইতে লইতে হইবে। আমাদের আদর্শকে তাহাদের আদর্শ দ্বারা একটু তাজা করিয়া লইতে হইবে। আর তাহাদেরও আমাদের মাতৃভক্তির খানিকটা গ্রহণ করা আবশ্যক।

স্বামীজী চেয়েছেন আমরা যেন পরস্পরের ভালটুকু বিনিময় করে উভয় জাতিই উপকৃত হতে পারি। তিনি আরও বলেছেন :

আমাদের সমাজে যথেষ্ট দোষ আছে। অন্যান্য সমাজেও তদ্রূপ যথেষ্ট দোষ আছে। এখানে বিধবার অশ্রুপাতে কখন কখন ধরিত্রী আর্দ্র হইয়া থাকে, সেখানে পাশ্চাত্য দেশের বায়ু অনূঢ়া কুমারীগণের দীর্ঘনিঃশ্বাসে বিষাক্ত হইয়া আছে। এখানে জীবন দারিদ্র্য-বিষে জর্জরিত, তথায় বিলাসিতার অবসাদে সমগ্র জাতি জীবন্মৃতপ্রায়

এই ভাবে স্বামীজী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দোষগুণের তুলনা ও বিচার করেছেন তত্ত্বদর্শীর অত্যন্ত সূক্ষ্ম জাগ্রত দৃষ্টি নিয়ে। জ্ঞানের আলোকে সব কিছুরই মর্ম তিনি দেখতে পেতেন। তিনি একান্ত মানব-দরদী সত্যনিষ্ঠ মানুষ। যা তিনি সত্য ব'লে, ন্যায় ব'লে মনে করেছেন, অকুতোভয়ে তার বিরুদ্ধে তিনি বুক ফুলিয়ে পুরুষসিংহের মতো দাঁড়াতে কুণ্ঠিত হননি। বারবার তাঁর উদাত্তকণ্ঠ ঘোষণা করেছে—পাপীকে পদদলিত না করে, আরও নীচে না ঠেলে মনুষ্যত্বের পদে তুলে আনাই মানুষের ধর্ম। পাপকে ঘৃণা করার, পরিত্যাগ করার আপ্রাণ চেষ্টা কর—চিত্তকে জয় করে কামজয়ী হও, সকল চিত্তদৌর্বল্য থেকে মুক্ত হওয়ার সাধনা কর, কিন্তু পাপীকে ঘৃণা কোরো না। তাকেও স্নেহের স্পর্শে ওপরে তুলতে চেষ্টা করাই আসল ধর্ম। তিনি বারবার বলেছেন, 'আত্মানং বিদ্ধি'—অর্থাৎ নিজেকে জান। তুমিও সেই পরমা শক্তির অংশ, এই অনুভূতি জাগলে, এই সত্য উপলব্ধি করতে পারলে জীবনের পথে চলা আপনি সহজ হয়ে যাবে।

প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরকে চিন্ময়ের অংশ ব'লে ভেবে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সহায়ে মানসিক দুর্বলতার ঊর্ধ্বে উঠে যেতে হবে। যে পুরুষ তাঁর স্ত্রীকে পুত্রোৎপাদনের যন্ত্রস্বরূপ মনে করেন, স্বামীজীর মতে তিনি অধম। কামভাব থেকে উৎপন্ন পুত্রকে তিনি অনার্য বলেছেন। আমরা হিন্দুরা সন্তান-কামনায় তপস্যা করি। নৈতিক চরিত্র দৃঢ় হওয়া চাই। জাতির নৈতিক চরিত্র দৃঢ় হলেই জাতি মহান হতে পারবে। হিন্দুমতে মা হওয়াই নারীজীবনের চরম উদ্দেশ্য হলেও বিবাহই যে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, একথাও স্বামীজী বলেননি। তিনি বলেছেন :

যাহারা যথার্থ ধার্মিক তাহারা কখনও বিবাহ করে না—তা স্ত্রীই হউক বা পুরুষই হউক। ধার্মিক স্ত্রীলোক বলেন, ভগবান তো আমাকে উহা অপেক্ষা উচ্চতর সুযোগ

দিয়াছেন। বিবাহ করিয়া কি হইবে? অবশ্য সকলেই কিছু ভগবানে মন সমর্পণ করিতে পারে না। সর্বপ্রথম প্রয়োজন সৎশিক্ষা। স্বামীজী বলেছেন:

এখন ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া স্ত্রীশিক্ষার প্রচার করিতে হইবে। অধুনা-প্রচলিত যৎসামান্য স্ত্রীশিক্ষার জন্যও যাঁহারা প্রথম উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মহাপ্রাণতায় কি সন্দেহ আছে?...ছেলেদের যেমন ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য করিয়া বিদ্যাশিক্ষা, তেমনি মেয়েদেরও করিতে হইবে। কিন্তু আমরা কি করিতেছি? তোমাদের মেয়েদের উন্নতি করিতে পার?-তবে আশা আছে।

জীবনে ব্রহ্মচর্যকে উচ্চস্থান দিতে হবে। বিবাহ হিন্দুর কাছে ভোগের জন্য নয়, সাধনার জন্য, এই কথাই তিনি বারবার বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, বিবাহিত জীবনে সংযমের অভাবই আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ। আমরা তপস্বীর সন্তান, তপস্যাই আমাদের সব কিছুর মর্মমূলে—এই কথাটিই স্বামীজী বারে বারে নানা ভাষায় নানা ভাবে জানিয়ে গেছেন। আমাদের স্মৃতিকার ভগবান মনু 'আর্য' সম্বন্ধে এই সংজ্ঞা দিয়েছেন যে, সৎ সন্তান কামনার ফলে যাঁহার জন্ম হইয়াছে, সেই আর্য। ভগবানের নিকট সন্তানলাভের জন্য প্রার্থনা ব্যতিরেকে যাহাদের জন্ম, স্মৃতিকারের মতে তাহারা অনার্য। হিন্দুধর্মে মায়ের ওপর কতই না দায়িত্ব! নারীর চরম বিকাশ মাতৃত্বে। আবার এই মাতৃত্বলাভের জন্য কতই না তপস্যা, বার-ব্রত। আবার এই মাতৃত্ব ছাড়াও স্বামীজী নারীর কুমারী ব্রহ্মচারিণী ব্রহ্মবাদিনী মূর্তি কল্পনা করেছেন। স্বামীজীর বলিষ্ঠ চেতনা একমাত্র গতানুগতিকতার পথ ধরে অগ্রসর হয়েই ক্ষান্ত হয়নি। জীবনকে তিনি সৎ বলিষ্ঠ চেতনার ওপর প্রতিষ্ঠিত দেখতে ইচ্ছা করতেন। তিনি ছিলেন জন্মতপস্বী, তপস্যাকেই তিনি জীবনের চরম লক্ষ্য ব'লে মনে করেছেন। সৎ সন্ন্যাসী হওয়াও যেমন কঠিন, সৎ গৃহী হওয়াও ততোধিক কঠিন। বিবাহ করলেই সৎ গৃহী হওয়া যায় না। সত্যকার গৃহধর্ম যিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন, তিনিই সৎ গৃহী।

মহাভারতের পতিব্রতা রমণীর উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে স্বামীজী বোঝাতে চেয়েছেন যে, নিষ্ঠার সঙ্গে স্বধর্ম-পালন ও কর্তব্য করাও এক মহা তপস্যা। এই মহীয়সী নারী আজন্ম নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য কর্ম করেই ধর্মলাভ করেছিলেন।

অনাসক্ত হয়ে কর্তব্য করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। কোন বিষয়েই তীব্র আসক্তি হওয়া মঙ্গলজনক নয়। আসক্তি থেকেই হয় আত্মার অবনতি। যথার্থ ভালবাসাই সব শুভের আধার। যথার্থ ভালবাসা, নিঃস্বার্থ ভালবাসা জীবনকে স্নেহসিঞ্চিত ক'রে মধুময় করে; সংসারে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা না থাকলে কেবলই বিবাদ ও অশান্তি আসে।

স্বামীজী বলেছেন: বিবাহ জীবনে ছেলেখেলার বস্তু নয়, এর দায়িত্ব গভীর। জাতির জীবনে পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রথমে বৈবাহিক সম্বন্ধকে পবিত্র করতে হবে। রোমান ক্যাথলিক ও হিন্দুগণ বিবাহকে পবিত্র ও অবিচ্ছেদ্য করে বহু শক্তিশালী স্ত্রী-পুরুষের সৃষ্টি করেছেন। ইহাই স্বামীজীর মত। স্বার্থপরতার, আত্মসুখের স্থান হিন্দুনারীর জীবনে নেই। ক্ষুরধার অসির ন্যায় তার চলার পথ। এই দুর্গম পথ পার হওয়ার জন্য চাই ক্ষমা, সেবা, সহনশীলতা,

তিতিক্ষা ও সবার উপরে অটল ধৈর্য। স্বামীজী এক জায়গায় বলেছেন :

এ সীতা-সাবিত্রীর দেশে, পুণ্যক্ষেত্র ভারতে মেয়েদের যেমন চরিত্র, সেবাভাব, স্নেহ, দয়া, তুষ্টি ও ভক্তি দেখা যায়, পৃথিবীর কোথাও তেমন দেখিলাম না।

আবার আমেরিকান রমণীগণের বিষয় বলতে তিনি প্রশংসামুখর হয়ে বলেছেন যে, সেখানকার রমণীগণ সকল রমণীগণ অপেক্ষা উন্নতা; সাধারণতঃ আমেরিকার নারী আমেরিকার পুরুষ অপেক্ষা অধিক শিক্ষিতা ও উন্নতা।

আমেরিকান মেয়েদের গুণপনায় তিনি এতদূর পর্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে ব'লে গেছেন :

প্রত্যেক আমেরিকান নারী লক্ষ লক্ষ হিন্দু ললনা হইতে অধিক শিক্ষিতা। আমাদের মহিলাগণও কেন না উহাদের মতো শিক্ষিতা হইবেন? ইহারা রূপে লক্ষ্মী—গুণে সরস্বতী—ইহারা সাক্ষাৎ জগদম্বা। এই রকম মা জগদম্বা যদি এক হাজার আমাদের দেশে তৈয়ার করিয়া মরিতে পারি, তবে নিশ্চিন্ত হইয়া মরিব তবে দেশের লোক মানুষের মধ্যে গণ্য হইবে।

পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণকালে আবার তাঁহার সাবধানবাণীও সমান তেজস্বিতার সঙ্গেই উচ্চারিত হয়েছে :

পাশ্চাত্য সমাজ ও ভারতীয় সমাজের মূল গতি ও উদ্দেশ্যের পার্থক্য এই যে, পাশ্চাত্য অনুকরণে গঠিত সম্প্রদায় মাত্রই এ দেশে নিষ্ফল হইবে। যাঁহারা পাশ্চাত্য সমাজে বসবাস না করিয়া, পাশ্চাত্য সমাজের স্ত্রীজাতির পবিত্রতা রক্ষার জন্য স্ত্রীপুরুষ-সংমিশ্রণের যে সকল নিয়ম ও বাধা প্রচলিত আছে তাহা না জানিয়া স্ত্রী-পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণের প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের অণুমাত্রও সহানুভূতি নাই। আমি পুরুষগণকে যাহা বলিয়া থাকি, রমণীগণকেও ঠিক তাহাই বলিব। ভারত ও ভারতীয় ধর্মে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা স্থাপন কর, তেজস্বিনী হও, আশায় বুক বাঁধ; ভারতে জন্ম বলিয়া লজ্জিত না হইয়া গৌরব অনুভব কর, আর স্মরণ রাখিও—আমাদের অপরাপর জাতির নিকট হইতে কিছু লইতে হইবে বটে, কিন্তু জগতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আমাদের সহস্রগুণ দিবার আছে।

এই ভাবে স্বামীজী প্রত্যেকের ভাল-মন্দ দোষ-গুণের বিচার ও তুলনা করেই আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন জীবনের শ্রেষ্ঠ পন্থা কি। যে জতি তার গতি হারিয়েছে, তার সমূহ সর্বনাশ—জ্ঞানের দীপটি জ্বেলে আবার তার সেই হারানো গতিবেগটি, প্রাণধারাটি যদি ফিরিয়ে আনা না যায়, জগতে তার পক্ষে এগিয়ে চলা অসম্ভব। ভারতীয় আদর্শের, মহত্ত্ব ও সতীত্বের দৃঢ়ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ভারতের নারীগণ যদি পাশ্চাত্যের সদ্‌গুণগুলি গ্রহণ করে নিজস্ব করে নিতে পারেন, তাহলেই আমাদের যথার্থ প্রগতি, যথার্থ কল্যাণ হবে।

সমালোচনা

সারদা-রামকৃষ্ণ ও চণ্ডীতত্ত্ব-বিজ্ঞান (প্রথম খণ্ড): শ্রীতারকদাস মল্লিক। ১।১।৪ এ, বেণীনন্দন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ২৫ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৩১৮ + ১২ ; মূল্য ৬৲।

গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে চণ্ডীতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন মূলতঃ অবতারবাদকে আশ্রয় করিয়া। লেখক যেভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই সরল ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন; শ্রীশ্রীচণ্ডীর মাহাত্ম্য ও তত্ত্ব নিজ অভিরুচি অনুযায়ী প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীসারদামাতার জীবন ও বাণী হইতে তিনি যাহা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাই তাঁহার ভাবের সহিত মিলাইয়া লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীসারদামাতা জগন্মাতারূপে অবতীর্ণা হইয়া মানুষের অশুভ নাশ করিয়া সকলের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন। মাতাঠাকুরাণীর এই শক্তিময়ী ভাবটি তাঁহার রচনায় যেন এক উজ্জ্বল মূর্তিরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। ভাবাশ্রিত ভক্তমাত্রকে এই গ্রন্থ আনন্দ দিবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

—সারদারঞ্জন পণ্ডিত

হিন্দুধর্ম ও কমিউনিজম্‌ঃ লেখক ও প্রকাশক—শ্রীঅমূলপদ চট্টোপাধ্যায়, ১৪।৩ সি, বলরাম বসু ঘাট রোড, কলিকাতা ২৫। পৃষ্ঠা ৫৮ ; মূল্য ৫০ পঃ।

হিন্দুধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে পারিলেই আজকাল লেখকরূপে নাম করা অতি সহজ। অধিকাংশ হিন্দু স্বীয় ধর্মমত সম্বন্ধে ভয়াবহ অজ্ঞতার পরিচয় দেয়। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌ ও মানব-বুদ্ধির চরম সিদ্ধান্ত অদ্বৈতবাদের ভিত্তিতে হিন্দুধর্মের প্রতিপাদ্য বিষয় আলোচনা করিয়া লেখক দেখাইয়াছেন যে, কমিউনিজমের অন্তর্নিহিত সত্য বেদান্তবিরোধী নয়। কিন্তু জড়সর্বস্ব কমিউনিজম্‌ যে মানুষের প্রাণে শান্তি দিতে পারে না, তাহা বর্তমান তথাকথিত কমিউনিস্ট মতবাদ-শাসিত দেশমাত্রেই প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। লেখক যুক্তিবিচার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মের উপর ভিত্তি করিলে এবং ধর্ম বা ঈশ্বরের ন্যায় সত্যবস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে কমিউনিজম্‌ স্থায়ী হইতে পারে না। ঈশ্বর-বিহীন অন্যান্য সভ্যতার ন্যায় ইহারও ধ্বংস অনিবার্য। হিন্দুমাত্রেই এই পুস্তকপাঠে নিজ ধর্মের সাধারণ তত্ত্বগুলি জ্ঞাত হইয়া উপকৃত হইবেন।

লৌকিক জীবনে অলৌকিক জগৎ ঃ শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক: এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ১৬৮ ; মূল্য টাকা ২·৫০।

লেখক তাঁহার জীবনের পথে কতকগুলি অলৌকিক ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ দিয়াছেন। পাঠকবর্গ নিজ নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা ও বিশ্বাস অনুযায়ী এই সকল ঘটনা গ্রহণ করিবেন। পুস্তকের ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই অনুসারে মূল্য কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে মনে হয়।

—কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী বিমুক্তানন্দের দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৬৪ খৃঃ, রাত্রি ১২-৫০ মিঃ সময়ে শেঠ সুখলাল কর্ণানি মেমোরিয়াল (পি. জি.) হাসপাতালে স্বামী বিমুক্তানন্দ দেহত্যাগ করিয়াছেন।

গত ৩রা নভেম্বর, ১৯৬৪ খৃঃ, রাত্রে তিনি সহসা করোনারী থ্রম্বসিস রোগে আক্রান্ত হন। আক্রমণ খুব প্রবল বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে উক্ত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। হাসপাতালে তাঁহার অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকেই চলিয়াছিল।

স্বামী বিমুক্তানন্দ মহারাজ ১৯২২ খৃষ্টাব্দে বেলুড় মঠে যোগদান করেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, এবং তাঁহার নিকট হইতে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাসদীক্ষাও পাইয়াছিলেন।

স্বামী বিমুক্তানন্দ বেলুড় মঠ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া বৃন্দাবন সেবাশ্রমে কিছুকাল অক্লান্তভাবে কাজ করিয়াছিলেন। পরে তিনি অদ্বৈত আশ্রমের মায়াবতী ও কলিকাতা উভয় কেন্দ্রেই কয়েক বৎসর কাজ করেন। তিনি সারদাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা-সেক্রেটারী ছিলেন; শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি এই বিভিন্নমুখী শিক্ষাকেন্দ্রের কার্যভার গ্রহণ করেন; জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এই দায়িত্বপূর্ণ কর্মের গুরুভার বহন করিয়া গিয়াছেন ও এই শিক্ষায়তনটির বহু আদর্শকে সুষ্ঠুভাবে রূপদান করিয়াছেন।

১৯৩৪ খৃঃ হইতে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের ওআরকিং কমিটি-র সদস্য ছিলেন। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি বেলুড় মঠের ট্রাস্টী নিযুক্ত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম-শতবার্ষিকী-স্মারকগ্রন্থ 'কালচার্যাল হেরিটেজ অব ইণ্ডিয়া' প্রকাশনে তিনি অকুণ্ঠভাবে ব্রতী ছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকীতে সহকারী কর্মসচিবরূপে তিনি সাফল্যের সহিত দেশব্যাপী উৎসবানুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

সারদাপীঠের পরিকল্পনাকে তিনি যেভাবে বাস্তবে রূপায়িত করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার ধৈর্য ও উন্নত সংগঠনশক্তির পরিচায়ক।

স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ছিল, বেলুড় মঠকে কেন্দ্র করিয়া একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিবে। এই সূত্র অবলম্বনে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্তৃপক্ষ বেলুড় মঠ সংলগ্ন একটি কলেজ খোলা স্থির করেন; এভাবে সারদাপীঠের সূত্রপাত হয়। বিদ্যামন্দির কলেজের ভিত্তি স্থাপিত হয় ১৯৪০ খৃঃ ৩১শে জানুআরি তারিখে, এবং কলেজের উদ্বোধন হয় ১৯৪১ খৃঃ ৪ঠা জুলাই। ক্রমে তত্ত্বমন্দির (দর্শন ও সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র), শিক্ষণমন্দির (বি. টি. কলেজ), শিল্পমন্দির (পলিটেকনিক), শিল্পায়তন (জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুল), শিল্পবিদ্যালয়, সমাজসেবক-শিক্ষণকেন্দ্র (এস. ই. ও. টি. সি.), জনশিক্ষামন্দির প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি সারদাপীঠের অঙ্গরূপে গড়িয়া উঠে। সম্প্রতি স্বামীজীর ইচ্ছানুরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের, 'বিবেকানন্দ ইউনিভারসিটি'র বাস্তব রূপ দিবার জন্য তিনি মনে প্রাণে ব্রতী হইয়াছিলেন। কাজটি অসমাপ্ত রাখিয়াই তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইল। তাঁহার দেহত্যাগে শিক্ষাক্ষেত্রের, বিশেষ করিয়া শিক্ষায়তনটির অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

দৃঢ়-সঙ্কল্পবান, অক্লান্ত-উদ্যম কর্মী ছিলেন তিনি। তাঁহার চরিত্র ছিল ত্যাগ-পূত। তাঁহার স্নেহময় মধুর স্বভাব ও অমায়িক ব্যবহার সকলেরই চিত্তে রেখাপাত করিত। তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে। ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভা

১৯৬৩-৬৪ খৃষ্টাব্দের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী

গত ২০শে ডিসেম্বর বেলুড় মঠে শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে রামকৃষ্ণ মিশনের ৫৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নে সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতির সারানুবাদ প্রদত্ত হইল :

স্বামীজীর শতবার্ষিকী :

১৯৬৩-৬৪ খৃঃ মিশনের কর্মপ্রসার ও ক্রমোন্নতির দিক দিয়া একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বৎসর। এই বৎসর সর্বত্র স্বামীজীর শতবার্ষিকী সাড়ম্বরে ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে; অনেক শাখাকেন্দ্র স্বামীজীর শতবার্ষিক অনুষ্ঠানকে স্থায়ী রূপদানও করিয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা হইল :

বারাণসী সেবাশ্রমে ১,৬০,০০০ টাকা ব্যয়ে স্বামী বিবেকানন্দ সেণ্টিনারি মেমোরিয়েল ওয়ার্ড (৫০টি শয্যা-বিশিষ্ট দ্বিতল ভবন); রহড়া বালকাশ্রমে ৮,০০,০০০ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ত্রৈবার্ষিক ডিগ্রী কলেজ—(স্বামী বিবেকানন্দ সেণ্টিনারি কলেজ) এবং ২,১০,০০০ টাকা ব্যয়ে নির্মিত বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী ছাত্রাবাস; দেওঘর বিদ্যাপীঠে স্বামীজীর আবক্ষ মূর্তি; বেলঘরিয়া ছাত্রাবাসে ৩,৬২,০০০ টাকা ব্যয়ে নির্মিত বিবেকানন্দ শতাব্দী জয়ন্তী ভবন (বক্তৃতা-গৃহ ও গ্রন্থাগার); রেঙ্গুন সেবাশ্রমে ১০,০০,০০০ টাকায় নির্মিত বিবেকানন্দ সেণ্টিনারি মেমোরিয়েল বিল্ডিং (১৫২ শয্যা সমন্বিত হাসপাতাল) ও স্বামীজীর ধ্যানমূর্তি; এবং কনখল সেবাশ্রমে বিভিন্ন আখড়ার মোহন্তদের প্রদত্ত ১২,০০০ টাকা ব্যয়ে নির্মিত স্বামীজীর মর্মর-মূর্তি প্রতিষ্ঠা।

বেলঘরিয়া, কলম্বো, শিলং, রেঙ্গুন সোসাইটি, পেরিয়ানাকেনপালয়ম্ এবং দিল্লী কেন্দ্র কর্তৃক স্বামীজীর জীবন ও বাণী অবলম্বনে বিদেশী ও ভারতীয় নানা ভাষায় গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়াছে।

উপরি-লিখিত কর্মপ্রসার ব্যতীত, মিশনের আর সব শাখাকেন্দ্রে (পাকিস্তানের কেন্দ্রগুলি ছাড়া) এই বর্ষটি সর্বাঙ্গীণ উন্নতির বৎসর। পাকিস্তানের কেন্দ্রগুলি কোন প্রকারে টিকিয়া আছে।

অন্যান্য কর্মব্যাপৃতির মধ্যে নরেন্দ্রপুর আশ্রমে আবাসিক স্কুলের ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস, বেলুড় সারদাপীঠে 'বিশুদ্ধানন্দ বিজ্ঞানভবন' নামে কেমিষ্ট্রি-ল্যাবরেটরি, জামসেদপুরে বিষ্টুপুর ছাত্রাবাসের সম্প্রসারণ ও নিবেদিতা বালিকা-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-ভবন, মাদ্রাজ, ত্যাগারায়া-নগর বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সদস্য-সংখ্যা

আলোচ্য বর্ষে মিশনের ৭ জন সাধু-সদস্য দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১৯৬৪, মার্চ-এর শেষে মোট সদস্য-সংখ্যা ছিল ৭০৯ (সাধু ৩৫৩, ভক্ত ৩৫৬)।

কেন্দ্র-সংখ্যা

বেলুড়ের মূল কেন্দ্র ধরিয়া '৬৪ মার্চ মাসে মিশনের কেন্দ্রসংখ্যা ছিল[১] ৭২; তন্মধ্যে পূর্ব

১ মঠ কেন্দ্রগুলি ধরা হয় নাই।

পাকিস্তানে ৮; ব্রহ্মদেশে ২; ফ্রান্স, ফিজি, সিঙ্গাপুর, সিংহল ও মরিশাসে একটি করিয়া; বাকী ৫৭টি ভারতে। ভারতের কেন্দ্রগুলি রাজ্য-হিসাবে: পশ্চিমবঙ্গে ২৩, মাদ্রাজে ৮, উত্তরপ্রদেশে ৬, বিহারে ৬, আসামে ৪, অন্ধ্রে ২, উড়িষ্যায় ২; দিল্লী, রাজস্থান, পঞ্জাব, বোম্বাই, মহীশূর ও কেরলে ১টি করিয়া।

কার্যবিভাগ

মিশনের কার্যধারার প্রধানতঃ ৫টি বিভাগ: (১) রিলিফ, (২) চিকিৎসা, (৩) শিক্ষা, (৪) সাহায্য, (৫) সংস্কৃতি ও ধর্ম।

(১) রিলিফ: আলোচ্য বর্ষে মিশন কর্তৃক অনুষ্ঠিত সেবাকার্য নিম্নরূপ: ১৯৬৩ খৃঃ ১২ই জুন ত্রিপুরায় বাত্যাবিক্ষুব্ধ জনগণের জন্য সাহায্যকেন্দ্র খোলা হয় এবং মাসাবধি চলে; ২,৮২৪ ধুতি, ১,৮৫০ শাড়ি, ১,২৯৫ পাছড়া (পার্বতীয়দের কাপড়), ১,৩০০ খণ্ড তিনগজী মার্কিন, ১,৪৪৪ শিশুদের পোশাক, ৫০ খানি কম্বল, ২,৪৫২ পাউণ্ড গুঁড়া দুধ, এবং প্রয়োজন-মত ঔষধপত্র ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে বেলোনিয়া ও সাব্রুম মহকুমার ৩২টি গ্রামের ৪,৪৭৮ পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এই সেবাকার্যে ২৫,০০০ টাকার উপর ব্যয় হয়।

১৯৬৩ খৃঃ জুলাই মাসে শিলং শাখাকেন্দ্র কর্তৃক প্রধান কেন্দ্র বেলুড়ের অর্থসাহায্যে আসামের নওগাঁ জেলায় হোজাই অঞ্চলে বন্যার্তদিগের মধ্যে রিলিফ করা হয়।

১৯৬৩ খৃঃ ৩রা নভেম্বর হইতে ১১ই নভেম্বর পর্যন্ত বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটে আসানসোল আশ্রম কর্তৃক প্রধান কেন্দ্র বেলুড়ের অর্থসাহায্যে বন্যাপীড়িতদের মধ্যে অনুষ্ঠিত সেবাকার্যে ৯৭২ জনকে ৪০০ ধুতি ও শাড়ি, ৫০০ কম্বল, ১৫ মণ চাল, ৩০ মণ আটা বিতরণ করা হয়; মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৫,৫০০ টাকা।

১৯৬৪ খৃঃ জানুআরি মাসে প্রাদেশিক সরকারের সহযোগিতায় মিশন কর্তৃক দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে ১৪ই জানুআরি ৫,০০০ এবং ১৫ই ৩,০০০ লোককে রান্না-করা খিচুরি দেওয়া হয়।

প্রধান কেন্দ্রের সাহায্যে নরেন্দ্রপুর আশ্রম কর্তৃক পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ১৩ই হইতে ২২শে জানুআরি '৬৪ পর্যন্ত ৪৮ মণ ১৪ সের চাল, ১৯॥০ মণ ডাল ১১॥০ মণ আলু ও অন্যান্য খাদ্য-দ্রব্য গড়ে দৈনিক ১৪৮ জনকে দেওয়া হয়। কয়েকটি কম্বল ও চাদরও বিতরণ করা হয়।

ইহার পরে পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত অত্যন্ত দুঃস্থ ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের রিলিফ করা হয়। ১৯৬৪ খৃঃ মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে গেদে ও পেট্রাপোলে সেবাকার্য শুরু করা হয়। গেদে অঞ্চলে বস্ত্রাদি ও শুষ্ক খাদ্যদ্রব্য, যথা চিঁড়া গুড় বিস্কুট এবং পেট্রাপোলে রান্না-করা খাদ্য ভাত ডাল তরকারি খাওয়ানো হয়। আসাম-সীমান্তে গারো পাহাড়ে হরিমুরায়, পশ্চিমবঙ্গের হিঙ্গলগঞ্জ ও বাণপুরে এবং মধ্যপ্রদেশে কুরুদ ক্যাম্পে সমবেত উদ্বাস্তদের মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী সেবাকার্য অনুষ্ঠিত হয়। গত নভেম্বর পর্যন্ত উদ্বাস্ত-সেবাকার্যে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২,১৯০০০ টাকা।

(২) চিকিৎসা: ভারত, পাকিস্তান ও ব্রহ্মদেশে মিশনের অনেক কেন্দ্রেই জাতিধর্ম-নির্বিশেষে রোগীদের সেবাশুশ্রূষা করা হয়; তন্মধ্যে প্রধান—বারাণসী, বৃন্দাবন, কনখল ও রেঙ্গুন সেবাশ্রম, রাঁচির যক্ষ্মা-হাসপাতাল এবং কলিকাতার 'সেবাপ্রতিষ্ঠান'। রেঙ্গুন সেবাশ্রমে রেডিয়াম ও এক্স-রে সাহায্যে ক্যান্সার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে মিশনের তত্ত্বাবধানে ৭টি অন্তর্বিভাগযুক্ত হাসপাতালে মোট শয্যা-সংখ্যা (bed) ছিল ১,০৭০; ১৯,৩৫০ জন রোগী

ভরতি করা হয়। ৪৯টি বহির্বিভাগীয় চিকিৎসালয়ে ২৫,৩২,৬৫৬ জন (পুরাতন সহ) রোগী চিকিৎসিত হয়। বহির্বিভাগীয় চিকিৎসালয়গুলির মধ্যে দিল্লী ও রাঁচিতে বিশেষভাবে টি· বি. চিকিৎসা হয়; বোম্বাই, সালেম ও কানপুরে বহির্বিভাগের সহিত কতকগুলি শয্যা আপৎকালীন ব্যবস্থা-হিসাবে রাখা হইয়াছিল।

(৩) **শিক্ষা :** মিশন-পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মপ্রসার নিম্নলিখিত তালিকায় পরিস্ফুট :

প্রতিষ্ঠান	স্থান বা সংখ্যা	ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা	
কলেজ	মাদ্রাজ		
„	রহড়া (২৪ পরগণা)	২,০৮৭	
„ (আবাসিক—বেলুড়, নরেন্দ্রপুর)			
বি. টি. কলেজ	বেলুড়, কোয়েম্বাতুর	২২০	
বেসিক ট্রেনিং কলেজ (পোস্ট গ্রাজুয়েট)	রহড়া	৩০৫	৫৬
বেসিক ট্রেনিং কলেজ (জুনিয়র)	রহড়া, সরিষা, সারগাছি		
বেসিক ট্রেনিং স্কুল	২	৮০	১৭৯
শারীর শিক্ষা কলেজ	১	৯৯	
গ্রামীণ „ „	১	১৪৫	
কৃষি „ „	১	৭১	
সমাজ-শিক্ষা কেন্দ্র	২	২৭২	
ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল	৪	১,৪০০	
জুনিয়র টেকনি. স্কুল	৮	৫৯৩	১১৫
ছাত্রাবাস (অনাথাশ্রম-সহ)	৭২	৬,৪৩৯	৪৪৭
চতুষ্পাঠী	২	৪৪	
বহুমুখী বিদ্যালয়	১২	৪,৮১৭	৩৬৬
উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৮	২,৯৯৯	১,৪২৮
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৪	৬,১৩৫	২,৯৮১
সিনিয়র বেসিক ও মধ্য ইংরেজী	২৯	৫,৪০০	৪,৩৮১
জুনিয়র বেসিক ও প্রাথমিক	৪৮	৬,৬৩৯	২,৭৮৫
নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয় ও অন্যান্য	৪৬	২,৫১৩	১,৫৫৪

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে মোট ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা ৫৪,৫৭৮। কলিকাতার ইনষ্টিট্যুট অব কালচার-এ ৮০০ জন ছাত্র ‘ডে ষ্টুডেণ্টস হোম’-এ থাকার এবং ৬৪ জন ছাত্র কৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষালাভ করার সুযোগ পাইয়াছেন।

কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠানে ও রেঙ্গুন সেবাশ্রমে পরিষেবিকা-শিক্ষণের ব্যবস্থা (Nurses' Training Centre) আছে, আলোচ্য বর্ষে ১৪১ শিক্ষার্থিনী শিক্ষালাভ করিয়াছে।

নিম্নলিখিত স্থানের শিক্ষা-বিস্তার কেন্দ্রগুলি উল্লেখযোগ্য : বেলুড়, বেলঘরিয়া, নরেন্দ্রপুর, মাদ্রাজ, রহড়া, চেরাপুঞ্জি, মেদিনীপুর, মনসাদ্বীপ, জামসেদপুর, অসানসোল, দেওঘর, পুরুলিয়া, পেরিয়ানায়কেনপালয়ম্, কালিকট, কানপুর।

(৪) **সাহায্য :** আলোচ্য বর্ষে প্রধান কেন্দ্র বেলুড় হইতে প্রদত্ত সাহায্য :

	পরিবার	ছাত্র	বিদ্যালয়
নিয়মিত :	১১৫	২৪৫	
সাময়িক :	১৪৫	৮০	২

এই জন্য মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২৯, ৫৪৭ টাকা। ইহা ছাড়া কয়েকটি শাখাকেন্দ্র হইতেও দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত পরিবারকে যে সাহায্য দেওয়া হয়, তাহার পরিমাণ ৬,৯৫৮ টাকা।

(৫) **কৃষ্টি ও সংস্কৃতি :** মিশনের কেন্দ্রগুলি ভারতের কৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক ভাব-বিস্তারের উপর বিশেষভাবে জোর দেন এবং বিভিন্ন কাজকর্মের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের ‘সর্বধর্ম সত্য’ এই শিক্ষাকে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করেন।

জনসভা, আলোচনা-সভা, ক্লাস, পুস্তক- ও পত্রিকা-প্রকাশন প্রভৃতির দ্বারা বিভিন্ন ধর্মের সহিত সংযোগ স্থাপিত হয়। গ্রন্থাগার, পাঠগৃহ ও চতুষ্পাঠীগুলি কৃষ্টি-বিস্তারের সহায়ক। এই প্রসঙ্গে কলিকাতা কৃষ্টিপ্রতিষ্ঠানের (Institute

of Culture) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, প্রতিষ্ঠানটি ভারতের ও অন্যান্য দেশের বিখ্যাত মনীষীদের মধ্যে কৃষ্টিগত সহযোগিতা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছে।

বার্ষিক সভার কার্য শেষ হইলে অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজ তাঁহার ভাষণে বলেন: আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে যে সেবাকার্য প্রতিষ্ঠিত—তাহাই উপাসনা। শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর আদর্শে জীবন-গঠনই গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী—উভয়ের পক্ষেই সবচেয়ে বড় কাজ; তাহা হইলেই ঠিক ঠিক সেবার ভাব লইয়া আমরা কাজ করিতে পারিব। জীবনে আদর্শ রূপায়িত হইলে তবেই অপরের মধ্যে ভাব-সঞ্চারের শক্তি আসে।

শ্রীশ্রীমায়ের উৎসব

বেলুড় মঠ: গত ১০ই পৌষ (২৫. ১২. ৬৪) শুক্রবার শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শুভ ১১২তম জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রত্যুষে মঙ্গলারতি, তৎপরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে বিশেষ পূজা, হোমাদি এবং ভজন-কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। অপরাহ্ণে আয়োজিত সভায় স্বামী চিদাত্মানন্দ (সভাপতি) ও স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। সারাদিনে, বিশেষতঃ বৈকালের দিকে বহু ভক্ত নরনারী বেলুড় মঠে সমবেত হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি: কলিকাতা বাগবাজার পল্লীর যে বাড়িতে শ্রীশ্রীমা জীবনের শেষ একাদশ বৎসর অতিবাহিত করেন, বহু পুণ্য-স্মৃতিজড়িত সেই ভবনে শুভ জন্মোৎসব মহা উৎসাহে ও আনন্দে অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলারতি, ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ ও আলোচনা, ভোগরাগ, ভজন, প্রসাদ-বিতরণ, কালীকীর্তন প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। সহস্র সহস্র ভক্ত শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন। সন্ধ্যারতির পরেও বহু ভক্ত-সমাগম হয়।

মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম:

গত ২৫শে ডিসেম্বর মেদিনীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে ভাবসুন্দর পরিবেশে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মতিথি পূজানুষ্ঠানাদি সহকারে প্রতিপালিত হইয়াছে।

২৭শে ডিসেম্বর রবিবার সকালে আশ্রমের 'আনন্দ ভবন' হলে একটি আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় ধর্মসভা হয়। এই দুই অনুষ্ঠানেই স্বামী শুদ্ধাসত্ত্বানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য-জীবন আলোচনা করিয়া সকলকে অনুভাবিত ও অনুপ্রেরিত করেন।

কল্পতরু-উৎসব

কাশীপুর উদ্যানবাটী: যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ১৮৮৬ খৃঃ ১লা জানুআরি—ভক্তবৃন্দকে দিব্যভাবাবেশে স্পর্শ করিয়া 'তোমাদের চৈতন্য হউক' বলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, সেখানে সেই ঘটনার পুণ্যস্মৃতিতে গত ১লা জানুআরি 'কল্পতরু দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। ঐদিন মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, ভজন, গীতি-আলেখ্য, বাউল সঙ্গীত, কালীকীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সহস্র সহস্র ভক্ত ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন পরবর্তী দুই দিনও বিবিধ অনুষ্ঠান-সূচী সহায়ে উৎসব হইয়াছিল।

কাঁকুড়গাছি: যোগোদ্যানে প্রতি বৎসরের ন্যায় 'কল্পতরু-দিবস' উপলক্ষে যথারীতি

আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বহু ভক্তের সমাগমে ও ভজনকীর্তনে যোগোদ্যান আনন্দমুখর হইয়াছিল।

বক্তৃতা-সফর

১৯. ১. ৬৪ হইতে ২৭. ৬. ৬৪ পর্যন্ত 'বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী'-র সভাপতি স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি দিয়াছেন:

বিষয়	স্থান
স্বামী বিবেকানন্দ	টাউন হল, বর্ধমান
স্বামী বিবেকানন্দের বাণী	লাইব্রেরি হল, বংশবাটী
ভারতের স্বাধীনতায় স্বামীজীর দান	রাণী রাসমণি এম. ই. স্কুল
স্বামীজী যে শিক্ষা চেয়েছিলেন	ভদ্রেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়
বিশ্বমানব বিবেকানন্দ	বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
যুবসমাজের নয়নমণি বিবেকানন্দ	হিন্দু উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
জগতের কাছে বিবেক-বাণী	মহারাজা উচ্চ বিদ্যালয়, কালনা
বিবেকানন্দ— স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী	পলাশীপাড়া, মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল হাই স্কুল
যোগধর্মপ্রবক্তা বিবেকানন্দ	বনফুলহাট, শ্রীরামপুর
তরুণ ভারতের প্রতি বিবেকানন্দ	ওয়েলিংটন কলেজ, সাঙ্গলি
সনাতন ধর্ম	গোপালকৃষ্ণ মন্দির "
কথোপকথন	সাধারণ গ্রন্থাগার "
স্বামী বিবেকানন্দ ও জন্মশতবার্ষিকী	পাবলিক লাইব্রেরি প্রাঙ্গণ বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী উৎসব-সমিতি
আর্ত মানবের সেবা	বিড়লা আরোগ্যনিধি সভাগৃহ, বোম্বাই
বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী উৎসবে সভাপতির ভাষণ	মঙ্গলদাস টাউন হল, আমেদাবাদ
মানুষ তৈরীর শিক্ষা ও সেবাধর্ম	আর, বি, আর, সি. উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, আমেদাবাদ
মনঃসংযম	রামভবন—রামায়ণ প্রচার-সমিতি, আমেদাবাদ
মানবজীবনের উচ্চতম আদর্শ	বনিতা-বিশ্রাম, আমেদাবাদ
উপাসনা	রামভবন, আমেদাবাদ
সনাতন ধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ	ঠাকুরদ্বী, বোম্বাই
স্বামীজীর শিক্ষাদর্শ	রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, খার, বোম্বাই
শ্রীরামকৃষ্ণ	" "
সারা বিশ্বে স্বামীজীর শতবার্ষিকী	ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরি, ২৪ পরগণা
সনাতন ধর্মে স্বামীজীর দান	আমড়াতলা, মগরাহাট
শতবার্ষিকী সমাপ্তি-উৎসব	দুর্গাবাড়ি, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর

বিষয়	স্থান
স্বামীজীর বাণী	মুরলীধর গার্লস কলেজ, কলিকাতা
স্বামী বিবেকানন্দ	বিবেকানন্দ ছাত্রভবন, বর্ধমান
শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য বিবেকানন্দ	পূর্ব রেলওয়ে, ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা
শ্রীরামকৃষ্ণ	শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, কাঁথি
স্বামী বিবেকানন্দ	" "
মানুষ কেমন জীবন যাপন করিবে	রামকৃষ্ণ আশ্রম, সিঁথি
শ্রীরামকৃষ্ণ	নর্থল্যাণ্ড, ইছাপুর, ২৪ পরগণা
নববর্ষের অভিনন্দন	রাণী রাসমণির ভবন
আদর্শ জীবন	শ্রীবি. এল. রায়ের গৃহ, টালিগঞ্জ
শ্রীরামকৃষ্ণ	বিষ্ণুপুর, রাজারহাট, ২৪ পরগণা
স্বামীজীর শতবার্ষিকী সমাপ্তি-উৎসব	নাগর উখড়া, নদীয়া
শ্রীশ্রীমা	বিবেকানন্দ-হল, খার, রামকৃষ্ণ-সারদা সমিতি
শতবার্ষিকী সমাপ্তি-উৎসব	সিটি হল থিয়েটার, দাদর, বোম্বাই
"	বিবেকানন্দ তরুণসঙ্ঘ
স্বামী বিবেকানন্দ	রামকৃষ্ণ-ব্রহ্মানন্দ আশ্রম
নারীজাতির আদর্শ	অনাথ-বালিকাভবন, শিকড়া-কুলীনগ্রাম
সাধুসঙ্গ	ডি. এম. সেনের ভবন, পার্কসার্কাস
বৈদিক ধর্ম	শ্যামপুকুর
শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনালোকে আধ্যাত্মিক জীবন	রামকৃষ্ণ মিশন, চণ্ডীগড় লাইব্রেরি-হল
বেদবাণী	কালীবাড়ি হল, সিমলা
সনাতন ধর্ম	বসিরহাট উচ্চ বিদ্যালয়

ব্রহ্মচারী প্রজ্ঞাচৈতন্যের দেহত্যাগ

আমরা দুঃখের সহিত ব্রহ্মচারী প্রজ্ঞাচৈতন্যের (কৃষ্ণ) দেহত্যাগ সংবাদ জানাইতেছি। গত ১২ই ডিসেম্বর বেলা ৯টা ৩৮ মিনিটের সময় শেঠ সুখলাল কার্ণানি (পি. জি.) হাসপাতালে মাত্র ২৭ বৎসর বয়সে তাহার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। এক বৎসরের অধিককাল যাবৎ তাহার প্লীহার অসুখের চিকিৎসা চলিতেছিল, গত ১১ই ডিসেম্বর উক্ত হাসপাতালে তাহার প্লীহায় অস্ত্রোপচার হয়।

কৃষ্ণ ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করিয়াছিল, ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে তাহার ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা হয়। মধুরস্বভাব,

সদাহাস্যমুখ এই তরুণ ব্রহ্মচারীর দেহত্যাগে একটি ভবিষ্যৎসম্ভাবনাপূর্ণ জীবনের অবসান ঘটিল।

তাহার আত্মা ভগবৎপদে চিরশান্তি লাভ করুক। ওঁ শান্তিঃ! ওঁ শান্তিঃ!! ওঁ শান্তিঃ!!!

স্বামী বিমুক্তানন্দের স্মৃতি-সভা

৩রা জানুআরি, ১৯৬৫ খৃঃ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির ভবনে পরলোকগত স্বামী বিমুক্তানন্দজীর স্মরণে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়; সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন আসিতে পারেন নাই, লিপি পাঠাইয়াছিলেন; উহাতে তিনি উল্লেখ করেন যে, সারদাপীঠের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি স্বামী বিমুক্তানন্দের সুক্ষ্মদৃষ্টি, জ্ঞান, ত্যাগ ও সেবারই অবদান।

সভাপতির ভাষণে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী স্বামীজীর আদর্শের প্রতি স্বামী বিমুক্তানন্দের অবিচল নিষ্ঠার কথা বলেন।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব সংবাদ

বিবেকানন্দ সোসাইটি (কলিকাতা): স্বামীজীর ১০২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নবনির্মিত বিবেকানন্দ স্মৃতি-ভবনে (১৫১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা ৬) গত ২৭শে ডিসেম্বর রবিবার আয়োজিত সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী সভাপতিত্ব করেন।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী বলেন: স্বামীজী শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীই প্রচার করেছেন। স্বামীজীর বাণীর মূলভাব আধ্যাত্মিকতা; আধ্যাত্মিকতাকে ভিত্তি করেই আমাদের জীবন গঠন করতে হবে। স্বামী গম্ভীরানন্দজী বলেন: স্বামীজী শুধু ভারতের নন, তিনি সারা বিশ্বের; তাঁর বাণী বিশ্বজনীন—ধীরে ধীরে তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী বলেন: শতবার্ষিকী উপলক্ষে স্বামীজীর বাণী বহু-প্রচারিত হয়েছে; কিন্তু শুধু প্রচারেই ফল হবে না, জীবনের সর্বক্ষেত্রে ত্যাগ ও সেবার আদর্শ রূপায়িত করলে তবেই আমাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হবে।

আঁটপুর (হুগলী): গত ৩রা ডিসেম্বর রবিবার শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম লীলাপার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের জন্মোৎসব তদীয় জন্মস্থান আঁটপুর গ্রামে সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়। এতদুপলক্ষে পূজা, হোম, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

মাকড়দহ (হাওড়া): শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয়ে গত ২৭শে ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে পূজা, পাঠ, ভজন, নগরকীর্তন, শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাকীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজিত সভায় স্বামী জীবানন্দ সভাপতিত্ব করেন ও বিশিষ্ট বক্তাগণ শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যজীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

গত ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কটকে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ৪০তম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় ৩৫০ জন প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগদান করেন। অধিবেশনের মূল সভাপতি ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, স্বাধীনতালাভের পর ভারতের জাতীয় জীবনে নূতন একটি সঙ্কট দেখা দিয়াছে—ভাষাবিদ্বেষ। ভাষাবিদ্বেষের ঊর্ধ্বে থাকিয়া সকলকে জাতীয় ঐক্যের সংহতি আনিতে তিনি উপদেশ দেন।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ৯ই মাঘ (২৩. ১. ৬৪) শনিবার শুভ কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের শুভ ১০৩তম জন্মতিথি বেলুড় মঠে ও অন্যত্র উদ্‌যাপিত হইবে।

দিব্য বাণী

সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥—কঠ—২।২।১১

আলোকের উৎস সূর্য বিতরি কিরণ
আলোকিত করি দেন নিখিল ভুবন;
সর্বলোক-চক্ষু তিনি, তিনি না রহিলে
দেখিতে না পায় কেহ এ বিশ্ব-নিখিলে।
তবু নয়নের কোন বাহ্যদোষ তাঁরে
কোনরূপে স্পর্শ কভু করিতে না পারে।
সেইরূপ সর্বভূত-অন্তরাত্মা যিনি
চেতনা-আলোক দানে করিছেন তিনি
বিশ্ব-চিত্ত উদ্ভাসিত; তবু কভু তাঁরে
জাগতিক কোন দুঃখ স্পর্শিতে না পারে।
দুঃখ আসি মন-বুদ্ধি করে আলোড়িত,
অদ্বিতীয় অন্তরাত্মা তাহারও অতীত॥

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥—কঠ—২।২।১৫

প্রকাশ-স্বরূপ সেই পরম-আত্মারে
চন্দ্র-সূর্য-তারকাদি প্রকাশিতে নারে।
অগ্নি তো দূরের কথা, বিদ্যুৎ-ও সেথায়
বিপুল বিভায় তাঁর জ্যোতিহীন হয়।
স্ব-প্রকাশ আত্মা হতে তাঁরই বিভা লয়ে
বিশ্বে প্রকাশিত এরা দীপ্তিমান হয়ে॥

কথাপ্রসঙ্গে

'সব চৈতন্যে জ'রে রয়েছে'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, "দেখি কি···, সব চৈতন্যে জ'রে রয়েছে।" "প্রতিমা, আমি, কোশা, কুশী, চুমকী, চৌকাঠ, মার্বেল পাথর—সব চিন্ময়!" বলিয়াছেন, "ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু।"

আমাদের দৃষ্টি যতক্ষণ সীমায়িত থাকে ততক্ষণ এই চৈতন্য-সত্তাকে দেখা যায় না, যেমন সাধারণতঃ দেখি, বিশ্বকে সেভাবেই দেখিতে হয়। সত্যকে প্রত্যক্ষ করিবার পথে যতই আগাইয়া যাওয়া যায়, যতই একটার পর একটা দৃষ্টির বাধা সরিয়া যাইতে থাকে, ততই বস্তুর সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর রূপ দৃষ্টিপথে ভাসিয়া উঠে। দৃষ্টি সর্ববাধা-বিনির্মুক্ত হইলে তখন বিশ্বজগতের সবকিছুর মূল সত্যকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

সাধারণ অবস্থায় আমাদের দৃষ্টিপথে বাধা অসংখ্য—যাহার জন্য আমরা পদে পদে সত্যকে অন্যরূপে উপলব্ধি করিতে বাধ্য হই। এক ফোঁটা রক্তকে আমরা সর্বত্র সমবর্ণ তরল পদার্থ-রূপে দেখি, তাহার ভিতর অন্য আর কিছু দেখিতে পাই না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়া যখন দেখি, যখন যন্ত্রের মাধ্যমে দৃষ্টি-শক্তিকে বাড়াইয়া তুলি, তখন কিন্তু দেখি অন্যরূপ। তখন যাহা দেখি, তাহা সত্য সন্দেহ নাই। খালি চোখে তাহা দেখিতে পাই না, তাহার কারণ দৃষ্টিপথে একটি বাধা রহিয়াছে—একটি সীমা আছে, যাহা অপেক্ষা ছোট হইলে কোন জিনিসকে আমরা আর পৃথকভাবে দেখিতে পাই না, সেরূপ বহু জিনিস মিলিত হইয়া সীমার মধ্যে আসিলে তখন তাহাদের মিলিত রূপটিই দেখি। দেশের দিক দিয়া যেমন এই সীমা, কালের দিক হইতেও তেমনি আছে। একটি আলোক-বিন্দুকে খুব জোরে ঘোরানো হইতেছে; গতির একটি সীমা আছে—যাহা অপেক্ষা অধিক জোরে ঘুরিলে আলোক-বিন্দুটিকে আর চলমান বস্তুরূপে আমরা দেখিতে পাই না, দেখি যে সম্মুখে একটি স্থির আলোক-বৃত্ত রহিয়াছে। এই আলোক-বৃত্তটির যদিও কোন বাস্তব সত্তা নাই, যদিও এইটিই সত্য যে একটি আলোকিত বিন্দু ঘুরিতেছে, তথাপি ইহা জানা সত্ত্বেও আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, আলোর বৃত্তটিকে দেখিতেই বাধ্য হই। আর দৃষ্টির নিজস্ব অন্যান্য শক্তিও সীমায়িত। সূর্যের আলোকে অনেক বর্ণের অনেক রকম আলোক-তরঙ্গ একসঙ্গে আসে; আমরা সেগুলির ভিতর মাঝামাঝি কয়েকটিকে, মাত্র সাতটিকে দেখিতে পাই। সেগুলির চেয়ে ছোট বা বড় তরঙ্গগুলিকে কোনদিনই দেখিতে পাই না, যদিও প্রত্যক্ষ ছাড়া জ্ঞানলাভের অন্য যে সব উপায় আছে তাহাতে আমরা নিশ্চিত প্রমাণ পাইয়াছি যে সেগুলি সত্য। যেমন সত্য হইলেও প্রত্যক্ষ করিতে পারি না পরমাণু ও শক্তিকে।

আমরা জানি, সাধারণ অবস্থায় খালি চোখে দেখিতে পাওয়াটাই সত্যের একমাত্র মাপকাঠি নয়। 'দেখিতে পাই না,' 'ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয়' বলিয়াই সত্যকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই, আমরা করিও না। এখনই প্রত্যক্ষ করিবার মত শক্তি না থাকিলেও অন্য উপায়ে কোন কিছুর সত্যতা সম্বন্ধে ধারণা আমরা করিতে পারি। তবে প্রত্যক্ষের মত

সত্যের অমোঘ প্রমাণ আর নাই প্রত্যক্ষ করিলে 'ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি একাই তাহা করেন নাই; অতি প্রাচীনকালে বহু সত্যদ্রষ্টা, ঋষি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যুগে যুগে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন আরো বহু সত্যদ্রষ্টা। নিজ অনুভূতির কথা বলিয়াও গিয়াছেন তাঁহারা। অতি প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যন্ত বিশ্বের চরম সত্যকে সকলে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন একইরূপে। এই সেদিনও শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়া গেলেন, "প্রত্যক্ষ দর্শনের পর যা যা অবস্থা হয় শাস্ত্রে আছে, সে সব হয়েছিল।...আর শাস্ত্রে যেরূপ আছে, সেরূপ দর্শনও হতো।...তাহলেই হলো, শাস্ত্রের সঙ্গে ঐক্য হচ্ছে।" সত্য-দ্রষ্টাদের প্রত্যক্ষের বাণী-রূপই শাস্ত্র। ইঁহাদের সকলেরই কথা হইল—একটি সীমাহীন আনন্দময় চিরবিদ্যমান চেতন সত্তাই (সচ্চিদানন্দ) বিশ্বের মূল কারণ; তাহা হইতেই আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি তাহা সবই, এমনকি আমাদের দেখিবার ও অন্যান্য অনুভবের সূক্ষ্ম যন্ত্র মন প্রভৃতিও সেই চৈতন্য হইতেই উদ্ভূত; এসব কিছুর ভিতর খুঁজিলে 'বস্তু' বলিতে সেই চৈতন্য ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাইবে না। প্রত্যক্ষের পথে আবরণের পর আবরণ টানিয়া আমরা সেই একই সত্যবস্তুকে বহুবিচিত্ররূপে দেখিতেছি। মনবুদ্ধি যত পবিত্র ও শুদ্ধ হয়, যত সূক্ষ্ম হয়, ততই এই আবরণগুলি সরিয়া যায়; অন্তরে বাহিরে বস্তুর সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর সত্তাকে প্রত্যক্ষ করিবার শক্তি তত বেশী আসে। দেহ প্রভৃতি স্থূল বস্তু অপেক্ষা সূক্ষ্মশরীর—মন প্রভৃতি—সূক্ষ্মতর; তবে এ সবও জড় পদার্থ—জড়ের অতি সূক্ষ্ম সত্তা দিয়া এগুলি গঠিত; সূক্ষ্মতম বস্তু হইল শুদ্ধ চেতনা—বা চরম সত্য যাঁহাকে আমরা ঈশ্বর, ভগবান বা ব্রহ্ম বলিয়া থাকি। সত্যদ্রষ্টারা বস্তুর এই সব অবস্থাগুলিই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা: "অক্ষয় মোলো—...। কেমন করে মানুষ মরে, বেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম। দেখলুম—যেন খাপের ভেতর তলোয়ারখানা ছিল, সেটা খাপ থেকে বের করে নিলে; তলোয়ারের কিছু হলো না—যেমন তেমনি থাকল, খাপটা পড়ে রইল!" "ভগবানকে দর্শন করলে দেহাত্মবুদ্ধি আর থাকে না। দুটি আলাদা। যেমন নারিকেলের জল শুকিয়ে গেলে শাঁস আলাদা আর খোল আলাদা হয়ে যায়।...কাঁচা সুপারি বা কাঁচা বাদামের ভিতরের সুপারি বা বাদাম ছাল থেকে তফাত করা যায় না।" "মা দেখা দিলেন...মার সেই রূপ—সেই ভুবনমোহন রূপ মনে পড়ছে!...চাউনিতে যেন জগৎটা নড়ছে!" "মাকে কেঁদে কেঁদে আমি বলেছিলাম, 'মা, বেদবেদান্তে কি আছে, আমায় জানিয়ে দাও,—পুরাণ তন্ত্রে কি আছে, আমায় জানিয়ে দাও। তিনি একে একে আমায় সব জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি আমাকে সব জানিয়ে দিয়েছেন—কত সব দেখিয়ে দিয়েছেন।" "জড় আবার কি? সবই চৈতন্য।"

ঋষিদের, সত্যদ্রষ্টাদের এই সব কথায় আমরা সকলেই সমভাবে বিশ্বাসী হইতে পারি না; বিশেষ করিয়া আধুনিক যুগের বহু যুক্তি-প্রবণ মনে একটা অবিশ্বাসের ভাবই আসিতে চায় যেন। আজ যাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিতে আমরা বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করি না—সেই জড়-বিজ্ঞানীদের আধুনিক কালের আবিষ্কার-গুলির দিকেই চোখ রাখিয়া, তাঁহাদের চিন্তা-ধারা অনুসরণ করিয়া আমরা যদি যুগে যুগে অসংখ্য সত্যদ্রষ্টাদের প্রত্যক্ষ করা এই সত্য সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করিতে চাই (অবশ্য

বুদ্ধিতে যতটা সম্ভব), তাহা হইলে কি দেখিব ? জড়বিজ্ঞানের আধুনিক আবিষ্কারগুলির নিকট হইতে আনিয়া যুক্তি যে আলোকে আজ আমাদের সম্মুখের অজানা পথ উদ্ভাসিত করিতেছে, নিরপেক্ষ মন লইয়া বিচার করিলে দেখিব—সে আলোকে এখন পর্যন্ত যতদূর দেখা যায়, তাহার মধ্যে সত্যদ্রষ্টাদের কথার বিরোধী কোন কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

ইট-পাথর, জল, বায়ু, আলো প্রভৃতি যে সব জিনিসকে আমরা আকারবিশিষ্ট, স্থান-অধিকার-কারী, রূপবান প্রভৃতি রূপে প্রত্যক্ষ করি—আধুনিক বিজ্ঞান পরীক্ষা-নিরীক্ষার দৃঢ়-ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া দৃপ্তকণ্ঠে আজ ঘোষণা করিতেছে যে, সেই সব কিছুর ভিতর 'বস্তু' খুঁজিতে গেলে একমাত্র শক্তি ছাড়া 'বস্তু' আর কিছুই পাওয়া যাইবে না। এই 'বস্তু'-র, শক্তির কোন আকার নাই, রূপ নাই, সে ঠাঁই জুড়িয়াও থাকে না—অথচ ইহাকেই আমরা নানা আকারের, নানা রূপের বস্তু বলিয়া দেখিতেছি। এগুলির ভিতর সত্তা বলিতে শক্তি ছাড়া আর কিছুই নাই—সত্যই নাই—তবু সেই সত্তাকেই আমাদের নানা বস্তুরূপে দেখিতে হয়। কতকগুলি নিয়মের সমষ্টি, যাহাকে আমরা প্রকৃতি (নেচার) বলি, সে এই শক্তিকে বহুবিচিত্ররূপে দেখাইতেছে, যেন ম্যাজিক দেখাইতেছে। সে যেন এই একমাত্র 'বস্তু' শক্তিকে লইয়া ডেলা পাকাইয়া কতকগুলি ছোট ছোট দানায় পরিণত করিতেছে—(ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, পজিট্রন ইত্যাদি) আর সেগুলিকে লইয়া লীলাচ্ছলে লক্ষ লক্ষ ভাবে সাজাইয়া রাখিতেছে। আর এই বিভিন্ন ভাবে সাজাইয়া রাখিবার সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে বহুবিচিত্র রূপগুণ-আকৃতি যেন উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিতেছে সেখানে—আমাদের স্থূল বিশ্ব ফুটিয়া উঠিতেছে। যদি কোন কারণে কোন উপায়ে আমাদের দৃষ্টিপথের অনেকগুলি বাধা চলিয়া যায়, ইলেকট্রন-প্রোটনগুলিকে আমরা দেখিতে পাই, তাহা হইলে কি দেখিব ? তখন আর এই বিশ্বের এত বিভিন্ন আকার, এত বিচিত্র রূপ কিছুই দেখিব না, দেখিব চার-পাঁচ-ছয়টি মাত্র দানায় জগৎ ভরিয়া রহিয়াছে, শুধু বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারে সেগুলিকে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। যেন তিন চার রকম চিনির দানা দিয়া সব তৈয়ারী—চিনির ঘট, চিনির পট, চিনির মানুষ, এই সব। আর যদি দৃষ্টির বাধা আরো কমে, দেখার শক্তি আরো বাড়িয়া গিয়া শক্তিকে প্রত্যক্ষ করার মত হয়, তাহা হইলে দেখিব সমগ্র বিশ্বে একটি শক্তির সমুদ্র ছাড়া আর কিছুই নাই—ঊর্ধ্ব, অধঃ সব ঠাঁই জুড়িয়া তাহা রহিয়াছে, আর তাহার মধ্যে (স্বামী বিবেকানন্দের কথায়) স্থানে স্থানে কতকগুলি ঘূর্ণি উঠিতেছে যেন। সাধারণ অবস্থায় এই ঘূর্ণিগুলিরই কতকগুলিকে আমরা দেখি আমাদের দেহরূপে, কতকগুলিকে রূপে রসে গন্ধে ভরা আমাদের জগৎরূপে। যখন একটি অবস্থা দেখি, তখন অন্যটিকে দেখিতে পাওয়া যায় না; যখন ঘূর্ণ্যমান আলোক-বিন্দুটিকে দেখি, তখন আলোক-বৃত্তটিকে দেখি না; যখন আলোক-বৃত্তটিকে দেখি, তখন বিন্দুটিকে দেখিতে পাই না। যখন 'বস্তু'কে স্থূল জগৎরূপে দেখিতেছি তখন তাহাকে শক্তিরূপে দেখা যায় না; যদি তাহাকে শক্তিরূপে দেখিতে পারি, তবে তখন তাহার স্থূল জগৎরূপ অন্তর্হিত হইবে।

এ পর্যন্ত সবটাই পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক

সত্য—ধর্ম বা দর্শনের কথা নয়। বিশ্বের মূল উপাদান বা বিশ্বের সবকিছুর ভিতরকার 'বস্তু' বলিতে বিজ্ঞানীরা শক্তি ছাড়া আর কিছুই খুঁজিয়া পান নাই। কিন্তু পান নাই বলিয়াই কি এই অচেতন শক্তিরও ভিতরকার 'বস্তু' বলিয়া কিছু নাই বলা চলে? নাই—একথা কেহ বলেন না, বলিতে পারেন না। একমাত্র বলার কথা—এখন পর্যন্ত জানা যায় নাই। একদিন তো আমরাই, আজ যেমন শক্তিকেই জগতের মূল উপাদান বলিয়া মনে করিতেছি, সেইভাবে বিরানব্বইটি 'এলিমেণ্ট'কে অবিভাজ্য এবং জগতের মূল উপাদান বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু বিজ্ঞানীদের সম্মুখে চির-প্রসারিত সত্যান্বেষী দৃষ্টি আজ আমাদের এতদূরে লইয়া আসিয়াছে।

এদিকে যদি শুনি অসংখ্য সত্যদ্রষ্টা হাজার হাজার বছর পূর্ব হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত একই কথা বলিতেছেন—'আমি দেখিয়াছি, আমি একা নহি, আমার মত আরো বহুজন দেখিয়াছেন এবং আমরা যে পথে চলিয়া দেখিয়াছি সে পথে যাইলে সকলেই দেখিতে পাইবেন - বিশ্বের মূল সত্য এরও পারে—শক্তির চেয়ে সূক্ষ্ম মন-বুদ্ধিরও পারে—এবং তাহা হইতেই বাকী সব কিছু হইয়াছে', যেমন শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, "পঞ্চভূত স্থূল। মন বুদ্ধি অহঙ্কার সূক্ষ্ম। প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি কারণ। ব্রহ্ম বা শুদ্ধ আত্মা (শুদ্ধ চৈতন্য) সকলের কারণ।" "এই শুদ্ধ আত্মাই আমাদের সকলের স্বরূপ",—তাহা হইলে তাঁহাদের সেই কথা যথাযথরূপে পরীক্ষা না করিয়া আমরা আজ উড়াইয়া দিতে পারি কি?

বিশুদ্ধ যুক্তির দিক হইতে নিশ্চয়ই নয়। কারণ দেখিতেছি জড়-বিজ্ঞানীরা সত্যাবিষ্কারের পথে যতই আগাইয়া চলিয়াছেন, ততই সে পথে একত্বের বিজয়ভেরী অধিকতর জোরে বাজিয়া উঠিতেছে। পদার্থের মূল সত্তার দিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, দেখা যায় বৈচিত্র্য ততই কমিয়া আসে। 'বস্তু' আজ কয়েকটি মাত্র ছোট দানায়—শেষে শক্তিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এ ছাড়া মন-বুদ্ধি এবং তার ঘূর্ণীতে সীমায়িত আমাদের পৃথক 'আমি'-বোধ সম্বন্ধে জড়-বিজ্ঞানীরা জোর দিয়া এখনো কিছুই বলিতে পারেন না। প্রাকৃতিক নিয়ম যাহাকে বলি, তাহাও আর একটি আলাদা 'বস্তু' থাকিয়া যাইতেছে। একত্বের দিকে বহুদূর আগাইয়া যাইলেও বিজ্ঞান যতদূরে পৌছিয়াছে, তাহাই যে চরম একত্ব নয়, তাহা সহজেই বোঝা যায়। আমাদের সীমায়িত 'আমি'-বোধ, চিন্তা ও সুখ-দুঃখ-অনুভূতির আধার—এগুলিও এই বিশ্বেরই অন্তর্গত জিনিস; প্রাকৃতিক নিয়মও তাই। সেগুলি সব যেখানে মিশিয়া একটিমাত্র মূল বস্তুতে একীভূত হইয়াছে যুক্তির দিক দিয়া তাহাকেই চরম একত্ব, চরম সত্য বলিতে হইবে।

মন-বুদ্ধি ও তাহাতে সীমায়িত 'আমি'-বোধ - চেতনা বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝি—যাহা ইচ্ছাশক্তির আধাররূপে, অন্য কিছুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজাগতারূপে আমাদিগকে ও সমস্ত প্রাণীকে জড় হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে—তাহা জড় হইতে উদ্ভূত, একথা বলাও আজ যুক্তির দিক হইতে শোভন হয় না। কারণ একথা আজ অতি স্পষ্ট যে সূক্ষ্ম জিনিস হইতেই স্থূল উদ্ভূত হয়। স্থূলের মধ্যে সূক্ষ্মই 'বস্তু'—স্থূল তাহার একটি অবস্থা মাত্র। মন-বুদ্ধি-অহংবোধ যে অচেতন শক্তি অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, সেকথা ধারণা করিতে বেশী কষ্ট হয় না। চরমসত্য-রূপ মহাতীর্থে আমাদের চলার পথ যতদূর অবারিত হইয়াছে, ততদূরের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লইয়া একথা বলাটাও আজ মোটেই

'অযৌক্তিক' নয় যে একত্বের দিকেই আমরা ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি, এবং যদি এপথে আমাদের গতি অপ্রতিহত হয় (?), তবে একদিন না একদিন জগতের সূক্ষ্মতম 'বস্তু' 'চৈতন্য'কেই বা ভগবানকেই বিশ্বের সব কিছুর মূল উপাদান বা কারণ, একমাত্র 'বস্তু' বলিয়া আমরা দেখিতে পাইব।

জড়বিজ্ঞান সবেমাত্র বিশ্বের সব কিছুর মধ্যে একত্বের আভাস পাইয়াছে, আর সত্যদ্রষ্টারা হাজার হাজার বছর পূর্ব হইতেই আরো বহুদূর পরের কথা, চরম একত্বের কথা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন, আর একথাও বলিতেছেন, 'আমরা বলিতেছি বলিয়াই ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে না—নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লও।' তাঁহাদের নির্দেশিত পথে চলিয়া তাঁহাদের কথার সত্যতা যাচাই করিবার পূর্বে সে সম্বন্ধে কোন মতামত দিবার অধিকার কাহারো আসে কি ?

অন্য একটি কথা। জড়বিজ্ঞানের সত্যাবিষ্কার আমাদের ব্যবহারিক জীবনের অনেক প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছে। মনবুদ্ধির ওপারের সত্য প্রত্যক্ষ করিলে আমাদের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে কি ? হইবে। বিশ্বের চরম সত্যকে লাভ করিলে, শুধু বুদ্ধি দিয়া যতটা সম্ভব ধারণা করা নয়, প্রত্যক্ষ করিলে মানুষের সব প্রয়োজনই সিদ্ধ হয়, তাহার সব সমস্যার সমাধান হয়, সর্ববিধ দুঃখ ও ভয় চলিয়া যায়; অসীম আনন্দের অধিকারী হয় সে—জীবনের আর সব পাওয়াকে তখন অতি তুচ্ছ বোধ হয়। চরম সত্য যেমন চৈতন্যস্বরূপ, তেমনি আনন্দস্বরূপও। আদিঅন্তহীন এই আনন্দের সামান্য ছিটে-ফোঁটাই আমাদের দেহ-মন-ইন্দ্রিয়ের আবরণের ভিতর হইতে ফুটিয়া বাহির হয়—যাহাকে আমরা জাগতিক সুখ বলি। শুধু বুদ্ধি দিয়া জানিয়া খুব বেশী লাভ নাই; বুদ্ধি আমাদের বেশীদূর লইয়া যাইতে পারে না। সত্যকে প্রত্যক্ষ করা চাই—ভগবানলাভ করা চাই—তবেই ফললাভ হইবে। উপলব্ধির জন্য প্রয়োজনীয় দেহ-মনের প্রস্তুতির দিকে নজর না রাখিয়া যত পাণ্ডিত্যই আমরা অর্জন করি না কেন, বাঘকে বাঘই দেখিতে হইবে এবং দেখিলে ভয়ও পাইতে হইবে। কেবল জড়-জগতের উন্নতিবিধান করিয়া, বুদ্ধিকে মার্জিত করিয়া মনকে উন্নত করা যায় না। আজ জড়বিজ্ঞানের এত উন্নতি সত্ত্বেও, জড়প্রকৃতিকে আমাদের স্থূল প্রয়োজনে অকল্পনীয় ভাবে প্রয়োগ করা সত্ত্বেও সারা পৃথিবীর মানুষের মনে দুঃখ, কষ্ট, হিংসা, ভয় সবই সমভাবে রহিয়াছে, বরং বিশ্বজোড়া সর্বনাশের ভয় দিন দিন বাড়িতেছে। অন্তর্জগতের দিকে ভ্রূক্ষেপ-হীন হইয়া জড়কে আমরা নিয়ন্ত্রণ করিতেছি; কিন্তু তাহাতে সুখদুঃখ-অনুভূতির, হিংসা-দ্বেষ-ভালবাসাদির আধার মনের কোন উন্নতিই হইতেছে না। বুদ্ধি একত্বের ধারণা করিলেও আমরা সে সত্যকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি না, সাম্যের সুন্দর প্রতিমা নির্মাণ করিয়াও তাহাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেছি না। সত্যদ্রষ্টা-দের নির্দেশিত চরম সত্যকে উপলব্ধি করার পথে, যথার্থ ধর্মপথে পা বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে মনবুদ্ধির প্রত্যক্ষ করিবার শক্তি বাড়িতে থাকে—মন-বুদ্ধি শুদ্ধ হয়। ক্রমে স্থূলের সঙ্গে নিজেকে আর জড়াইয়া না রাখিয়া সে নিজেকে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে থাকে। তখন "দেহের সুখ-দুঃখ তাকে আর স্পর্শ করে না।" একদা যে প্রকৃতির হাতের ক্রীড়নকমাত্র ছিল, সে তখন তার অধীশ্বরত্ব লাভ করে। ক্রমে সে চরম সত্যের সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া যায়।

এই প্রত্যক্ষের পর যাঁহারা স্বেচ্ছায় আমিত্বের একটি অতি সূক্ষ্ম আবরণ টানিয়া

ফিরিয়া আসেন. শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় যাঁহারা "বিজ্ঞানী", সেই নির্বাধ-দৃষ্টি আনন্দময় পুরুষরা তখন জগৎকে আর আমাদের মত জড়রূপে দেখেন না, দেখেন যে ঈশ্বরই সব হইয়া রহিয়াছেন। সবকিছুর মধ্যে তাঁহারা সেই চরম সত্তাকেই দেখেন—কখনো সচ্চিদানন্দরূপে, কখনো বা তাঁহারই কোন সাকার রূপে—

"দেখি কি—যেন গাছপালা, মানুষ, গরু, ঘাস, জল সব ভিন্ন ভিন্ন রকমের খোলগুলো! বালিশের খোল যেমন হয়, দেখিস্‌নি?—কোনটা খেরোর, কোনটা ছিটের, কোনটা বা অন্য কাপড়ের, কোনটা চারকোণা, কোনটা গোল—সেই রকম। আর বালিশের ঐ সব-রকম খোলের ভেতরেই যেমন একই জিনিস তুলো ভরা থাকে—সেই রকম ঐ মানুষ, গরু, ঘাস, দল, পাহাড়, পর্বত সব খোলগুলোর ভেতরেই সেই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ রয়েছেন!"

"ঠিক ঠিক দেখতে পাইরে, মা যেন নানারকমের চাদর মুড়ি দিয়ে নানারকম সেজে ভেতর থেকে উঁকি মারছেন! একটা অবস্থা হয়েছিল, যখন সদাসর্বক্ষণ ঐ রকম দেখতুম।"

"বিজ্ঞানীর অবস্থায় রেখেছে। এ অবস্থায় দেখি মা-ই সব হয়ে রয়েছেন

এই সব 'বিজ্ঞানী'দের, যাঁহারা চরমসত্তার সঙ্গে, ভগবানের সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া যাইবার পরও আবার ফিরিয়া আসেন আমাদের কাছে সেই আনন্দলোকের সংবাদ পরিবেশন করিতে, পথ দেখাইয়া সস্নেহে হাতে ধরিয়া সেই অমৃতলোকে লইয়া যাইতে, তাঁহাদের আমরা কখনো 'জীবন্মুক্ত পুরুষ', কখনো 'আচার্য' এবং বিশেষ ক্ষেত্রে 'অবতার' বলিয়া থাকি। বসন্তের মলয় সমীরণের মত শুধু লোককল্যাণ সাধনের জন্যই ইঁহাদের দেহধারণ। ইঁহারা আমাদের অতি আপনার জন। 'ভাবের ঘরে চুরি না করিয়া,' 'মন-মুখ এক করিয়া' ডাকিলে ইঁহারা সাড়া দেন; অন্তর্যামীরূপে পথ দেখাইয়া, সস্নেহে চালিত করিয়া জীবনের চরম লক্ষ্যে, চরম সত্যের উপলব্ধিতে আমাদের পৌঁছাইয়া দেন।

"যারা ব্রহ্মজ্ঞান চায়, যদি ভক্তির রাস্তা ধরে থাকে, তারা ব্রহ্মজ্ঞানও পাবে।......তাঁকে ভালবাসতে পারলে আর কিছুরই অভাব থাকে না।"

"যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। ......নরলীলায় অবতার। নরলীলা কিরূপ জান? যেন বড় ছাদের জল নল দিয়ে হুড় হুড় করে পড়ছে। সেই সচ্চিদানন্দ, তাঁরই শক্তি একটি প্রণালী দিয়ে—নলের ভিতর দিয়ে—আসছে।"

"নরলীলায় অবতারকে ঠিক মানুষের মত আচরণ করতে হয়—তাই চিনতে পারা কঠিন। মানুষ হয়েছেন তো ঠিক মানুষ। সেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক কখন বা ভয়—ঠিক মানুষের মত। রামচন্দ্র সীতার শোকে কাতর হয়েছিলেন। গোপাল নন্দের জুতো মাথায় করে নিয়ে গিছ্‌লেন—পিঁড়ে বয়ে নিয়ে গিছ্‌লেন।

থিয়েটারে সাধু সাজে, সাধুর মতই ব্যবহার করবে—যে রাজা সেজেছে তার মত ব্যবহার করবে না। যা সেজেছে তাই অভিনয় করবে।......

তেমি ঈশ্বর, যখন মানুষ হন, ঠিক মানুষের মত ব্যবহার করেন।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শরণাগত হও*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

গীতায় আছে "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।" সকলের ভেতর ভগবান রয়েছেন, আর তিনি আমাদের চালাচ্ছেন।...তাঁর শরণাগতি ভিন্ন আমাদের "নান্যঃ পন্থাঃ।" তাই বলছেন, "তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।" শরণাগত হও। তিনি রয়েছেন তোমার ভেতর—কত কাছে, কত নিকটে! এধার-ওধার ছুটোছুটি করতে হবে না, ভেতরে ডুব দাও। বাইরে থেকে মন গুটিয়ে এনে ভেতরের দিকে এগিয়ে যাও। ভেতরে স্বর্গরাজ্য · ভেতরে ভগবান বসে আছেন। ⁻ খুলে যাক, জেগে ওঠ। সবই আমাদের ভেতরে—বৃন্দাবন, কৈলাস, যা কিছু সবই। সবই তিনি। শরণাগত হও—"তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।" 'সর্বভাবেন' শব্দের অর্থ কি? কায়মনোবাক্যে এই ভগবানের শরণাগত হওয়া। এইটিই হবে সাধনা। ভাবের ঘরে চুরি থাকলে হবে না। অন্তর্যামী ভগবান তোমার ভেতরেই রয়েছেন—মন-মুখ এক করে তাঁর চরণে মনপ্রাণ অর্পণ কর। ঠাকুর বলেছেন—বানরছানা হবি না, বেড়ালছানা হবি। কি সুন্দর কথা, কি পরিষ্কার দৃষ্টান্ত! বানরছানা মাকে ধরে থাকে—সে কখনো কখনো পড়েও যায়। গাছে দেখেছ--বানরছানা মায়ের বুক জড়িয়ে ধরে রয়েছে, আর তার মা এ-ডাল ও-ডাল লাফাতে লাফাতে এক জায়গায় গিয়ে বসল। ছানাগুলো তখন মায়ের বুক ছেড়ে দিয়ে নিজেরা এ-ডাল ও-ডাল লাফাতে গিয়ে পড়ে যায়। সেজন্য বলছেন, বানরছানা হবি না। আত্মসমর্পণ, পূর্ণনির্ভরতার ভাব বানরছানার নেই। সেটা আছে বেড়ালছানার। বেড়ালছানা কি করে? বেড়ালছানা চুপ করে বসে থাকে আর মিউ-মিউ করে ডাকে—'মা আয়'। মা তাকে যখন যেখানে নিয়ে গিয়ে রাখে, সেখানেই সে সন্তুষ্ট হয়ে থাকে। আঁস্তাকুর হোক, বিছানার ওপর হোক, হেঁসেলের কোণে হোক—সব জায়গায় সব অবস্থাতেই তার মনে পূর্ণ সন্তোষ। সে শুধু মিউমিউ করে ডাকে—মাকে ডাকা ছাড়া আর কিছুই সে জানে না। তার ভেতর কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব কিছুই নেই। যেখানে 'কর্তা-ভোক্তা' ভাব থাকে, সেখানে আত্মসমর্পণ হয় না; হতে পারে না, পূর্ণ নির্ভরতা সেখানে আসে না। ঠাকুর তাই বলতেন, বানরছানার এটি হয় না।...তাই ভগবান বলছেন—একমাত্র পথ হল শরণাগত হওয়া, আর ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকা। আনন্দধামে পৌছবার পথ এটি।...এর জন্য চেষ্টা কর, এইটিই সাধনা। ভগবান অন্তর্যামী, তিনি তোমার অন্তরে রয়েছেন, নিজেকে তাঁর চরণে বিকিয়ে দাও। 'আমি'কে তাঁর চরণে ঘসে ঘসে ক্ষয় করতে হবে। কোটি জন্মের সংস্কার নিয়ে আমাদের 'আমিত্ব'—যেন পাথরের মত। তবে পাথরও, যত শক্তই হোক না কেন, ঘসতে ঘসতে ক্ষয়ে যায়। এ পর্যন্ত তুমি কর, তারপর তিনি আছেন। তখন 'তৎপ্রসাদাৎ' পরাশান্তি লাভ করবে।

* ডিগবয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ১. ৫. ৬০ তারিখে প্রদত্ত একটি ভাষণ অবলম্বনে।

লোকেশ্বর

শ্রীশিবশম্ভু সরকার

যে কথা কাহিনী নয়
যে কথনে নিশান্ত হয়—
সেই বুঝি রূপ নিল দেবতা-প্রাঙ্গণে
উচ্ছল স্তবনে
পাষাণে পরাণ ফোটে জাগে বিশ্বময়ী
সব স্থূল হোল ভুল, মৃন্ময়ে চিন্ময়ী !

সে ওষ্ঠের ভাষা
ভাসায় তিয়াসা ।—
পান-পাত্র ফেলে চলে যায়
সুদূরের মদির নেশায়
সামান্য মানুষ
পায় মান হুঁশ !
ওঠে ঈগলের মত
কাল হোতে কালান্তরে ব্যক্ত অব্যাহত
মহাকর্ষ-হারা
আকাশের লভিতে কিনারা !

পঙ্গু পায় রথ
বিমূর্ছিত শুনেছে শপথ
আলোর তরঙ্গে নামে নব সঞ্জীবনী
মানুষের আশার সরণি ।
বিভা পায় অপার্থিব ঊষা
রুগ্ন নগ্ন ধরণীরে দানে দিব্য ভূষা—
স্নিগ্ধ সমীরণে
ছেয়ে যায় মেঘে মেঘে স্বননে রণনে
দিক্ দিগন্তর হোতে
কুতুহল আনন্দের স্রোতে
কার নান্দীপাঠ ?
ভিখারীরে করেছে সম্রাট !

মন্দ্র মহাবাণী
ভয়ের তিমির বুকে অভয় পারানি—
মেদিনী অম্বরে
কাল কালান্তরে
অমৃত অশোক ছন্দে দোলে কণ্ঠস্বর—
প্রেমের কৌস্তুভ হাতে, হাসে লোকেশ্বর !

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রথম মর্মর-মূর্তি

স্বামী নির্বাণানন্দ

১৯১৮ খৃষ্টাব্দ, শীতকাল। শ্রীশ্রীমহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) তখন বলরাম মন্দিরে আছেন। আমি সেবক হিসাবে তথায় আছি। ঐ সময় মহারাজের দীক্ষিতা শিষ্যা ভবানীপুর-নিবাসী শ্রীঅচলকুমার মৈত্র (Solicitor) মহাশয়ের ভক্তিমতী স্ত্রী মাঝে মাঝে মহারাজকে দর্শন করিবার মানসে বলরাম-মন্দিরে আসিতেন এবং তথা হইতে উদ্বোধন, শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী যাইতেন। ভক্তিমতী ঐ মহিলাটিকে শরৎ মহারাজ খুবই স্নেহ করিতেন। কিছুদিন পর উক্ত মহিলাটির ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের একটি মর্মর-মূর্তি নির্মাণ করাইবার বিশেষ আগ্রহ হওয়ায় এই বিষয়ে শরৎ মহারাজের পরামর্শ প্রার্থনা করিলেন। উহাতে শরৎ মহারাজ তাঁহাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। কলিকাতার ঝাউতলায় তখন কর্মকার নামে একজন মহারাষ্ট্রীয় বিখ্যাত ভাস্কর ছিল। মহিলাটি সেই ভাস্করের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার ঈপ্সিত মর্মর-মূর্তি নির্মাণে তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। যাহাতে মূর্তিটি সত্বর নির্মিত হয় তাহার জন্য তিনি তাহাকে বিশেষভাবে অনুরোধও করিলেন। মহিলাটি মধ্যে মধ্যে পূজনীয় শরৎ মহারাজের নিকট আসিয়া কাজটি কতদূর অগ্রসর হইল তাহা জানাইয়া যাইতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের মাটির তৈয়ারী ছাঁচের (clay-model) কাজ সম্পূর্ণ হইলে উক্ত ভদ্রমহিলা শরৎ মহারাজকে ভাস্করের নিকট গিয়া মডেলটি অনুমোদন করিবার জন্য নিবেদন করিলেন। উহার অব্যবহিত পরে একদিন সকালের দিকে শরৎ মহারাজ বলরাম-মন্দিরে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের এই মর্মর-মূর্তি নির্মাণের আনুপূর্বিক বিবরণ রাজা মহারাজের নিকট জানাইলেন এবং তিনি স্বয়ং যাহাতে মডেলটি অনুমোদন করিয়া আসেন সেজন্য বিশেষভাবে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। রাজা মহারাজ শরৎ মহারাজের নিকট সমস্ত ঘটনা শুনিবার পর কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলেন—"শরৎ, আমি ঠাকুরের কোন্ মূর্তি অনুমোদন ক'রব? আমি তো একদিনে ঠাকুরের বহু রূপ দেখেছি। কখনো তিনি শীর্ণ রুগ্ন অবস্থায় ধ্যানমগ্ন হয়ে চুপটি ক'রে বসে আছেন, আবার কিছুক্ষণ পরে হাততালি দিয়ে কীর্তন করতে করতে আনন্দে ভাববিহ্বল! আবার কখনো বা গভীর সমাধিতে মগ্ন! সে এক অপরূপ দৃশ্য! মুখ থেকে যেন স্বর্গীয় আনন্দ ঝরে পড়ছে এবং দেহ থেকে দিব্য জ্যোতিঃ বেরুচ্ছে! আবার কখনো দক্ষিণের বারান্দায় স্বাভাবিক অপেক্ষা অধিকতর সবল, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘ শরীরে দৃঢ় পদক্ষেপে একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভাবোন্মত্ত হয়ে পাদ-চারণা করছেন।" শরৎ মহারাজ রাজা মহা-রাজের মুখনিঃসৃত ঠাকুরের বিভিন্ন রূপের অপূর্ব বর্ণনা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং বিনীতভাবে বলিলেন, "মহারাজ, ঠাকুর তাঁর যে মূর্তি দেখে বলেছিলেন, 'ঘরে ঘরে পূজা হবে', সেই মূর্তিটি তোমাকে অনুমোদন করতে হবে।" সহাস্য মুখে মহারাজ বলিলেন, "বেশ যাব, দিন ঠিক কর।" সেইদিনই অপরাহ্ণে ভাস্করের কার্যালয়ে (Studio) মহারাজের যাইবার ব্যবস্থা হইল এবং সকলে যথাসময়ে সেখানে উপস্থিত হইলেন।

মহারাজের সঙ্গে শরৎ মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, যোগিন-মা, গোলাপ-মা এবং কয়েকজন সাধু তথায় গেলেন। স্টুডিওতে প্রবেশ করিয়াই মহারাজ মডেলটি বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিয়া পরে ভাস্করকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, তুমি ঠাকুরকে যেন একটু কুঁজো ক'রে ফেলেছ।" সে কথার উত্তরে ভাস্কর বলিল যে,—এইভাবে বসিলে স্বভাবতই মেরুদণ্ড একটু বাঁকিয়া যায়। ইহাতে মহারাজ বলিলেন, "আমি ঠাকুরকে কখনো শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে বসতে দেখিনি। তুমি যা ব'লছ, তা সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রযোজ্য। ঠাকুরের ছিল আজানু-লম্বিত বাহু, সুতরাং তাঁর পক্ষে ঐরূপ হওয়ার কোন কারণ নেই।" অতঃপর মহারাজ ভাস্করের দৃষ্টি ঠাকুরের কানের দিকে আকর্ষণ করিলেন, "দেখ, সবার কান -ভ্রূর উপর থেকে আরম্ভ। ঠাকুরের কানও তুমি সেইভাবে করেছ। কিন্তু ঠাকুরের কান চোখের নীচ থেকে আরম্ভ হয়েছে।" মহারাজের ভাবময় বর্ণনায় ভাস্করসহ সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। মহারাজের নির্দেশ অনুযায়ী ভাস্কর মডেলটিকে সংশোধন করিতে স্বীকৃত হইয়া বলিল "আপনারা আর সাত দিন পরে আসুন, আমি সব ঠিক ক'রে রাখব।" নির্ধারিত দিনে মহারাজ পুনরায় সদলবলে ভাস্করের স্টুডিওতে উপস্থিত হইলেন এবং সংশোধিত মডেলটি দেখিয়া খুবই আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন—"এবার ঠিক হয়েছে।" সঙ্গিগণও সেইদিন মডেলটি দেখিয়া ঠাকুরের জীবন্ত সত্তা অনুভব করিয়াছিলেন। প্যারিস প্লাষ্টারে ঢালাই হইবার পরও ক্লে-মডেলের যথাযথ ভাবটি ছিল।

সুদক্ষ ভাস্কর তাহার কলাকৌশলে মর্মর-মূর্তিটিতেও মডেলের যথাযথ ভাবটি পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু মূর্তির স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে ফুটকি ফুটকি প্রচুর কালো দাগ বাহির হওয়ায় দিব্যভাবঘন আনন্দময় মুখটি বিকৃত দেখাইতেছিল।

প্রতিকৃতি হইতে কালো দাগগুলি অপসারণ করিবার কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া ভাস্কর নিজেই অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করে। তারপর সে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিল যে, একমাত্র রং ও তুলিকার দ্বারা অঙ্গরাগ করিলে সমুদয় কালো দাগ ঢাকা পড়িয়া মূর্তির যথাযথ ভাবটি পরিস্ফুট হইবে। তবে ২।৩ বৎসর অন্তর অন্তর এইরূপ অঙ্গরাগ করাইতে হইবে। ভাস্করের কথাগুলি উক্ত ভক্তিমতী মহিলাটির একেবারেই মনঃপূত হইল না; উপরন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের এই মর্মর-মূর্তি সুষ্ঠুভাবে নির্মিত হইয়া বেলুড় মঠে প্রতিষ্ঠিত ও নিত্যপূজিত হইবে, এই মহতী ইচ্ছা পূর্ণ হইল না ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন। মূর্তিটি ঐ অবস্থায় ভাস্করের স্টুডিওতেই রহিয়া গেল। পরে অঙ্গরাগ করাইয়া মূর্তিটিকে কাশীধামে লইয়া যাওয়া হয়; ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ২৪শে ফেব্রুআরি কাশীধামে রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের নবনির্মিত মন্দিরে মর্মর-মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ এই প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ঠাকুরই যেন ঠিক বসে আছেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈত সাধনা*

স্বামী নির্বেদানন্দ

(অদ্বৈত সাধনার পূর্বে) শ্রীরামকৃষ্ণ বস্তুতঃ ভক্তিমার্গের বা ভালবাসার পথের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেছিলেন। ধর্মানুসন্ধিৎসার প্রারম্ভে তাঁর কর্ণধারহীন মন এ পথ বেছে নিয়েছিল। কাঁটা-গুল্ম, খানা-খন্দ পার হয়ে পাগলের মত তিনি ছুটে চলেছিলেন, এবং জগজ্জননী কালী ও শ্রীরামচন্দ্র-সহধর্মিণী সীতাদেবীর রক্তসিক্তপদে, ক্লান্তদেহে পৌঁছানোর পূর্বে কোথাও থামেন নাই ভৈরবীর সুযোগ্য পরিচালনাধীনে চলার সময়, ক্রিয়াকলাপ-মণ্ডিত হলেও, এই একই ভালবাসার পথ ধরে তিনি গিয়েছিলেন। বহুবিধ উপলব্ধি ও জীবন্ত দেবীমূর্তি-দর্শন এবং কয়েকটি প্রতীক-ব্যঞ্জক দর্শন তাঁকে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের আদিভূতা মহাশক্তির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে নিয়ে এসেছিল। জটাধারী এবং তাঁর রামলালাও তাঁকে পিতৃস্নেহ-সঞ্জাত দিব্যানন্দের, বাৎসল্য ভাবের চরম প্রদেশে নিয়ে গিয়েছিল এই ভালবাসার পথ ধরেই। মধুরভাবের সু-উচ্চ শিখরে আরোহণের পরই এ পথ কার্যতঃ ফুরিয়ে গেল।

এভাবে দ্বৈতবাদের সবকিছু অনুভূতিরই অধিকারী তিনি হয়েছিলেন, যে অনুভূতি লাভ করে ভক্ত সাধক সাকার ঈশ্বরের সঙ্গে দিব্য-প্রেমের ডোরে নিজেকে বেঁধে ধন্য হয়ে যায়। বিশ্বের সর্বময় অধিনায়ক ঈশ্বর—মাতা, প্রভু, সখা, সন্তান ও প্রণয়ীরূপে সত্য-সত্যই তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন। বহুবিধ মূর্তি ও নাম ধরে এসে ঈশ্বর তাঁকে কত আদর করেছেন, কখনো বা তাঁর সত্তার সঙ্গে মিশেও গেছেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর ধর্মোন্মাদনার শুরু থেকে আরম্ভ করে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত নয় বৎসর কাল ভগবানের কোন না কোন দিব্যভাব অবলম্বনে তাঁকে চিন্তা করা ছাড়া অন্য আর কিছুই করেন নি তিনি; এই কালের অধিকাংশ সময়ই বিভিন্ন নামে ও রূপে সাকার ঈশ্বরের জীবন্ত সান্নিধ্যে তিনি কাটিয়েছেন। ঈশ্বর-প্রেম-সুধার একবিন্দু পান করতে পারলেই সাধারণ পর্যায়ের সাধকের শুষ্ককণ্ঠ রসসিক্ত হয়ে ওঠে, তার দুঃখ ও জাগতিক ক্লেশের চির অবসান ঘটে, এবং অনির্বচনীয় শান্তিতে মন চিরতরে পূর্ণ হয়ে যায়; ঈশ্বর-প্রেম এমনি জিনিস! কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণ কি করে যে এই প্রেমের অকূল সাগরে সত্যসত্যই মগ্ন হয়ে থাকতেন, এবং খুশিমত নির্বাধে এ সুধা প্রাণভরে পান করতেন, তা ভাবতেও শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে।

এত উঁচুতে ওঠা সত্ত্বেও তাঁর 'মহান-যাত্রা'-পথে তাঁকে থামতে দেওয়া হল না। আরো এগিয়ে গিয়ে বিশ্বের মূল কারণ নিরাকার পরমাত্মার সঙ্গে নিজের আত্মার একত্ব অনুভব করে তাঁর অন্তরের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার চির-অবসান ঘটাবার জন্য জগন্মাতা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে চললেন। কিছু কাজ তখনো বাকী ছিল। নিজের সঙ্গে ভগবানের যে বিচ্ছেদের ভাব প্রায়ই তাঁকে অতিমাত্রায় কাতর করে তুলছিল, চরম একত্ব-বোধরূপ জ্ঞানাতীত অনুভূতি লাভ করে তাকে চির-নির্বাসিত করতে হবে। তাঁর 'অহং'-ভাব যদিও পূর্ণ-সংশোধিত এবং ক্ষীণ

* মূল গ্রন্থ "Sri Ramakrishna and Spiritual Renaissance" হইতে অনূদিত।

হয়ে গিয়েছিল, তবু তখনো তা একটা স্বচ্ছ আবরণের মত বিদ্যমান থেকে, অনাদিকাল হতে জ্ঞানের বিষয়রূপে প্রতিভাত বিশ্বের আর সব কিছু হতে জ্ঞানের কর্তারূপে তাঁকে পৃথক করে রেখেছিল। 'অহং'-বোধের এটুকু আবরণও খুলে ফেলতে হবে, দেশ, কাল ও কার্যকারণ-সম্বন্ধের সব বেড়াই ভেঙ্গে ফেলতে হবে, জ্ঞানের কর্তা ও জ্ঞানের বিষয়রূপে প্রতিভাত সমগ্র দ্বৈত-ভূমি ছাড়িয়ে যেতে হবে, যাতে অদ্বৈত-বেদান্ত যাকে নির্গুণ ব্রহ্ম বলে, সেই কারণাতীত অবিকারী চরম সত্তার ও তাঁর মাঝখানে ভেদসৃষ্টি করার মত প্রাতিভাসিক কোনও কিছুর অস্তিত্ব না থেকে যায়। নুনের পুতুল যেমন সমুদ্রের জলে গলে একেবারে মিশে যায়, নিরাকার, অনন্ত সচ্চিদানন্দ-সাগরে নিজের সত্তাকে তেমনি একেবারে মিশিয়ে দিয়ে নির্গুণ ব্রহ্মের সঙ্গে নিজের স্বরূপগত একত্ব অনুভব করতে হবে। জগন্মাতা দৃষ্টি রেখেছিলেন তাঁর ওপর; সাকার ঈশ্বরকে ঘিরে তাঁর যা কিছু আনন্দময় স্বপ্ন, দর্শন ও ভাবসমাধি, সেগুলি পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে যতক্ষণ না তিনি দ্বৈতভূমি ছেড়ে আসছিলেন, ততক্ষণ মা তাঁকে থামতে দিলেন না। ঠিক ক্ষণ বুঝেই একজন বেদান্তবাদী আচার্য এসে গেলেন কালীবাড়ীতে; এই আচার্যের নির্দেশমত চলে নুনের পুতুলের মত ঈশ্বরের নির্গুণ সত্তার সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়তে মা তাঁকে আদেশ করলেন

নতুন আধ্যাত্মিক পথ-প্রদর্শকটি হলেন তোতাপুরী, একজন বেদান্তবাদী পরিব্রাজক সন্ন্যাসী। দীর্ঘ তীর্থভ্রমণের পথে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে একদিন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে এসে উঠলেন তিনি; সেখানে তাঁর আগমনে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, তখনো তা জানতেন না। পঞ্জাব হতে বেরিয়ে গঙ্গা-সাগরে ও পুরীতে তীর্থদর্শন করে তিনি সদ্য ফিরেছেন। অদ্বৈত-বেদান্তোক্ত পদ্ধতি অবলম্বনে ধৈর্য নিয়ে চল্লিশ বছর সাধনার ফলে ইতি-পূর্বেই মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে পরমসত্তার সঙ্গে নিজের স্বরূপগত একত্বের অনুভূতি তিনি লাভ করেছিলেন। বিধাতার আশীর্বাদরূপে প্রাপ্ত সবল শরীর, সুদৃঢ় মন ও বজ্রকঠিন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হয়ে এই মুক্তাত্মা পুরুষ সিংহের মত দেশময় বিচরণ করে বেড়াচ্ছিলেন। তিনি গোঁড়া অদ্বৈতবাদী ছিলেন; নির্গুণ ব্রহ্ম বা চরম সত্তাকেই একমাত্র সত্য বলে বিশ্বাস করতেন, সৃষ্টির আর সব কিছুকে ভ্রম-সঞ্জাত দৃশ্যমাত্র বলেই জানতেন তিনি। এরূপ ছায়াময় কোন বস্তুর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল না মোটেই। এমনকি সগুণ ঈশ্বরের প্রতিও তাঁর মনের কোন কোণে এতটুকু দরদের ঠাঁই ছিল না; তাঁর দৃষ্টিতে এই ঈশ্বরও কল্পনা-প্রসূত, সত্য নন। কাজেই দ্বৈতমতের যে কোন রকম সাধনা দেখলেই তিনি অবজ্ঞার হাসি হাসতেন। দেব-দেবীর প্রতিমার সম্মুখে বৈধ পূজা, প্রার্থনা, স্তবপাঠ ও মন্ত্রজপ করাকে আধ্যাত্মিকতার শিক্ষালয়ে শিশুদের শিক্ষাপ্রণালী পর্যায়ে ফেলতেন তিনি। সাকার ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির আতিশয্যকে ভক্তের বিপথচালিত উৎসাহ বলেই ভাবতেন; ভাবতেন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে উদ্দেশ্য-হীনভাবে মায়ার গোলকধাধায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন এঁরা। যাঁরা আধ্যাত্মিকতার অভিলাষী, তাঁর মতে তাঁদের একমাত্র করণীয় হচ্ছে মায়ার গণ্ডি ভেদ করে বেরিয়ে এসে সমস্ত অজ্ঞানের বিনাশসাধন করা। কাজেই সাধন বলতে সংসারত্যাগ, সদসদ্‌বিচার ও পরব্রহ্মের সঙ্গে নিজের স্বরূপগত একত্বের ধ্যান ইত্যাদিতেই তাঁর বিশ্বাস সীমায়িত ছিল। কারণ নাম-রূপাত্মক মায়ার রাজ্যের পারে গিয়ে নিরাকার

কার্যকারণাতীত পরমসত্তার সঙ্গে নিজস্বরূপের একত্বের উপলব্ধিলাভের পথে কেবলমাত্র এগুলিই সহায়তা করতে পারে। শুধু এই জাতীয় সাধনায়—অদ্বৈতবেদান্ত-নির্দিষ্ট জ্ঞানমার্গে—তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, আর কোন কিছুতেই তাঁর আস্থা ছিল না।

এই ধরনের অসীমসাহসিক জীবন ও চিন্তার আদর্শ নিয়ে তোতাপুরী যখন এসে হাজির হলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ভক্তিপথের শেষপ্রান্তে ওজস্বী মনের গতিবেগ থামিয়ে সবে মাসতিনেক হবে নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। কালীমন্দিরের সামনের চাঁদনীতে তিনি বসেছিলেন, সেই অবস্থায় তোতাপুরীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তাঁর অন্তর্মুখী দৃষ্টি ও আত্মসংস্থ ভাব দেখেই পুরীজী বুঝলেন, আধ্যাত্মিক পথের এরূপ অধিকারী অতি বিরল। কোনরূপ বিলম্ব বা ইতস্ততঃ না করে সেই বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীটি স্বেচ্ছায় গুরুরূপে তাঁকে জ্ঞানমার্গে পরিচালিত করতে চাইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জানালেন, এ বিষয়ে আগে মায়ের অনুমতি না নিয়ে মতামত জানাতে তিনি অক্ষম। মন্দিরে গিয়ে দেখেন অনুমতি দেবার জন্য মা যেন প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। হাসিমুখে ফিরে এসে তোতাপুরীকে মার সম্মতিদানের কথা জানিয়ে আধ্যাত্মিকতার নতুন যাত্রাপথে তাঁকে গুরুরূপে বরণ করলেন তিনি।

তোতাপুরী যে সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে তা দ্বাদশ শতাব্দী ধরে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছিল। এই সম্প্রদায়ের প্রথানুযায়ী জ্ঞানমার্গ অবলম্বনে সাধন করার অনুমতিলাভের পূর্বে শিক্ষানবীশকে সন্ন্যাসরূপ সর্বত্যাগের জীবনে দীক্ষিত হতে হয়। আত্মীয়-সংস্রব পরিত্যাগ করে এসে, সমগ্র অতীত জীবনকে শূন্যলীন স্বপ্নজ্ঞানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, জাগতিক বাধ্য-বাধকতার সব বন্ধন ছিন্ন করে তাকে সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্গে ত্যাগ ও অধ্যাত্মমুক্তির নতুন জীবন শুরু করতে হয়। কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম করণীয় ছিল তাঁর বেদান্তবাদী গুরুর কাছে এই নবজীবনে দীক্ষিত হওয়া।

পঞ্চবটীর কাছে যে কুটীরটিতে এতদিন তিনি সাধন করতেন, শুভদিন দেখে সেখানে গুরুসন্নিধানে উপবিষ্ট হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসব্রতের সমস্ত খুঁটিনাটি ক্রিয়া সমাধা করলেন। ব্রাহ্মণত্বের প্রতীক শিখা-সূত্র সম্মুখস্থ হোমাগ্নিতে আহুতি দিয়ে তার পরিবর্তে নবজীবনের চিহ্ন গুরুপ্রদত্ত কৌপীন ও গৈরিক বস্ত্রে ভূষিত হলেন। প্রয়োজনীয় ক্রিয়া সব সমাধা করে গভীর শ্রদ্ধাভরে তিনি গুরুসকাশে প্রণত হলে তোতাপুরী তাঁকে অদ্বৈতবেদান্তের জ্ঞানালোক-দানে উদ্ভাসিত করতে লাগলেন।

উন্নত, সবলদেহ পঞ্জাবী সন্ন্যাসী কিভাবে মাঝারি গড়নের কোমলকায় বাঙ্গালী শিষ্যকে উপদেশ দান করছিলেন, কিভাবে নম্র, নিরহঙ্কার শিষ্যের হৃদয়ের গভীরতায় এই মুক্তপুরুষ মনের সব সঞ্চয় উজাড় করে দিচ্ছিলেন, কল্পনায় সে দৃশ্য বেশ ফুটে ওঠে। তাঁর বজ্রদৃঢ় মনের শৈলশিখরে যে জ্ঞান-স্রোতস্বিনী আত্মপ্রকাশ করেছিল, সে তখন এভাবে নিম্নে প্রবাহিতা হয়ে সীমাহীন এক সাগরের অতলস্পর্শী গভীরতায় গিয়ে যে প্রবেশ করছে, সেকথা তোতাপুরী তখন ধারণাও করতে পারেন নাই।

যাই হোক, নিজ অনুভূতি সহায়ে অদ্বৈত-বেদান্ত-প্রতিপাদিত যে জ্ঞানকে তিনি প্রাপবস্ত করেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র, একাগ্র, আলোকিত চিত্তে তা সঞ্চার করতে লেগে গেলেন তিনি: "নিরাকার, অসীম, নিত্য,

নিষ্কারণ ও মুক্ত ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। তিনিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। তিনিই একমাত্র সত্যবস্তু; তিনি ছাড়া আর সবই, নিজের দেহ, মন এমনকি অহঙ্কার পর্যন্ত ভ্রমজ দৃশ্য মাত্র। দৃশ্যমান সমগ্র বিশ্বই মূল অজ্ঞান বা অবিদ্যা সম্ভূত মায়ার রচনা। সত্যজ্ঞান সহায়ে এই অজ্ঞান দূরীভূত করা মাত্র দেশ, কাল ও কার্যকারণ-সম্বন্ধ দিয়ে গড়া সমগ্র বিশ্বই শূন্যে বিলীন হয়ে যায়; যা থেকে যায়, তাই হল নির্গুণ ব্রহ্মের অনন্ত অস্তিত্ব; এখানে পৌঁছে জ্ঞানযোগী এই অখণ্ড অস্তিত্বের সঙ্গে নিজের পূর্ণ একত্ব অনুভব করেন। তাঁর দেহ ও মনের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়, জীবনের কোন লক্ষণই তাতে থাকে না; যতক্ষণ এ অবস্থা থাকে, যাঁরা দেখেন তাঁদের সকলেরই চোখে, এমনকি দেহবিদ্যার প্রামাণিক পরীক্ষাতেও, তা মৃতদেহবৎ প্রতীয়মান হয়। জ্ঞানপথ ধরে চলতে চলতে এ অবস্থায় এসে সাধক পরব্রহ্ম বা নিত্যসত্তার সঙ্গে নিজের নিত্য একত্বের অনুভূতিরূপ আধ্যাত্মিক জ্ঞানালোক-উদ্ভাসের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। ইহাই অতীন্দ্রিয় বা জ্ঞানাতীত অবস্থা, ইহারই শাস্ত্রীয় নাম নির্বিকল্প সমাধি। নিজগুরুর নির্দেশাধীনে সদসদ্ বিচার করতে করতে 'জগৎ মিথ্যা' এই বোধ আসা মাত্র, এবং বৈরাগ্য ও ধ্যানসহায়ে ভগবানের নির্গুণ স্বরূপের সঙ্গে নিজের স্বরূপগত একত্বের বিশ্বাস অটল হয়ে ওঠা মাত্র সে এই লক্ষ্য লাভ করে।"

সমগ্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় থেকে মন গুটিয়ে এনে নিজ আত্মার সত্য দিব্য স্বরূপের ধ্যানে নিবিষ্টচিত্ত হতে পুরীজী শ্রীরামকৃষ্ণকে আদেশ করলেন। অতি অল্পকালমধ্যে তিনি জাগতিক বিষয় হতে মন গুটিয়ে আনলেন, কিন্তু জগন্মাতার জীবন্ত মূর্তি সেখানে জ্বলজ্বল করতে লাগল, বহু চেষ্টা করেও মন থেকে তা সরাতে পারলেন না। হতাশ হয়ে অপারগতার কথা গুরুকে জানালেন তিনি, গুরু কিন্তু অটল, ছাড়লেন না তাঁকে। এক টুকরো ভাঙ্গা কাঁচ কুড়িয়ে নিয়ে তৎক্ষণাৎ শিষ্যের ভ্রূমধ্যে তা বিদ্ধ করে দিয়ে, সেই বিন্দুতে মন একাগ্র করতে দৃঢ়কণ্ঠে আদেশ করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আর একবার প্রাণপণ চেষ্টা করলেন; এবারে জ্ঞানকে অসিরূপে কল্পনা করে তার সাহায্যে মা কালীর দিব্যমূর্তি দ্বিখণ্ডিত করে ফেলতে সমর্থ হলেন। তাঁর মনের শেষ অবলম্বন চলে গেল, এবং নির্বিকল্প সমাধির অতলস্পর্শী গভীরতায় মন সোজা ডুবে গেল। "জগৎ মুছে গেল। দেশ আর রইল না। মনের অস্পষ্ট গভীরতায় চিন্তাগুলি ছায়ার মত ভাসতে লাগল। পরে তা-ও লুপ্ত হয়ে 'অহং'-বোধের একটানা স্পন্দন মাত্র রয়ে গেল। শেষে সে স্পন্দনও থেমে গিয়ে শুদ্ধ সত্তা ছাড়া আর কিছুই রইল না। জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হলেন। দ্বৈতভাব মুছে গেল। মনবাক্যের অতীত ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে গেলেন তিনি।"

একটানা তিনদিন তিনরাত্রি এভাবে অবস্থানের পর গুরু তাঁর দেহে প্রাণের স্পন্দন ফিরিয়ে আনলেন। যে উপলব্ধি লাভ করতে তাঁর নিজের চল্লিশ বছরের সাধনার প্রয়োজন হয়েছিল, শিষ্যকে তিনদিনে সেই উপলব্ধিতে পৌঁছুতে দেখে তোতাপুরীর বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। পুরীজী বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী, পর্যটনের পথে তিনদিনের বেশী বাস করতেন না কোথাও; কিন্তু এই অদ্ভুত শিষ্যের আকর্ষণে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সাহচর্যে দীর্ঘ এগারো মাস কাটিয়ে গেলেন।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময়ে তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বর ত্যাগের পরই শ্রীরামকৃষ্ণের ওজস্বী মনে নির্বিকল্প সমাধিতে নিরন্তর মগ্ন হয়ে থাকার ইচ্ছা প্রবল হয়ে দেখা দিল।

শীঘ্রই তাঁর চেতনা জ্ঞেয়-জ্ঞাতার রাজ্য ছাড়িয়ে আরও ওপরে উঠে গেল। পরবর্তী ছ-মাসের মধ্যে এরাজ্যের এলাকায় ক্বচিৎ কখনো তা ফিরে আসত। মহাভাগ্যবান বিরল কোন সাধক একুশদিন মাত্র এ অবস্থায় থাকার সৌভাগ্য লাভ করলে সাধারণ জ্ঞানভূমিতে সাধারণতঃ আর ফিরে আসেন না; এই কালের শেষে তাঁর সত্তা থেকে দেহ চির-বিচ্ছিন্ন হয়—শুকনো পাতার মত আপনি খসে পড়ে যায়। সমুদ্রে নামলে নুনের পুতুল আর ফেরে না। কাজেই ছ-মাস ধরে এই চরম ভাবাতীত রাজ্যে প্রবাসের পর আবার যে তিনি এই পৃথিবীর মাটিতে সত্যই ফিরে এসেছিলেন, একে একটা অভূতপূর্ব অস্বাভাবিক ঘটনাই বলতে হবে। এ সময় দীর্ঘ ব্যবধানে কদাচিৎ তাঁর ঈষন্মাত্র বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসত, তাও অতি অল্পক্ষণের জন্য; তাছাড়া তাঁর দেহে জীবনের কোন লক্ষণই দেখা যেত না এ সময়। বাহ্যজ্ঞান-লাভের এই বিরতিগুলিও আবার আপনা-আপনি আসত না। একজন সাধু সে সময় দক্ষিণেশ্বরে হঠাৎ এসে পড়েছিলেন; শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে আনন্দময় জ্যোতিঃ দেখেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বাহ্যদৃষ্টিতে মৃত বলে প্রতীত এই দেহটির অভ্যন্তরে কি ঘটে চলেছে! ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তেই দেবদূতের মত আবির্ভূত হয়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের জড়বৎ দেহটিকে রক্ষা করার কাজে লেগে পড়লেন। প্রাণে প্রাণে তিনি বুঝেছিলেন, এই পলাতক আত্মা দৈব ইচ্ছায় আবার দেহে ফিরে আসবে, জগতের পরম কল্যাণের জন্য কোন মহাকার্য তাকে সাধন করতে হবে। একথা বুঝেছিলেন বলেই শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ অক্ষত রাখার জন্য তিনি প্রাণপণে প্রয়াসী হলেন। দেহটিকে রক্ষা করতে হলে মুখে কোনরকমে জোর করে কিছু খাবার দিতে হবে; তাই সাধারণ জ্ঞানভূমিতে শ্রীরামকৃষ্ণের চেতনাকে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি তাঁর অঙ্গে বেত্রাঘাত পর্যন্ত করতে দ্বিধা করতেন না। কখনো কখনো এই সাধুর চেষ্টা কিছুটা সফল হত, তখন মুখে কিছু ভাত গুঁজে দিলে পেটে গিয়ে তা পৌঁছুত। এত কাণ্ড ঘটেছিল, তবে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ ছমাসের মরণ-মূর্ছা সত্ত্বেও রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল। এই কালের শেষে মানব-কল্যাণার্থে ভাবমুখে থাকার জন্য তিনি জগন্মাতার আদেশ লাভ করেন। এর অব্যবহিত পরেই তিনি অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক আমাশয় রোগে ভীষণভাবে আক্রান্ত হলেন। একটানা ছমাস এই অসুখে তিনি ভুগেছিলেন। এই কালে ব্যাধির দুর্বিষহ শারীরিক যন্ত্রণা তাঁর মনকে সাধারণ-ভূমিতে নামিয়ে নিয়ে আসে।

এভাবে অতি অল্পসময়ে, মাত্র একদিনে জ্ঞানযোগ-সাধনার গোটা পথটি অতিক্রম করেছিলেন এই অনলস পথ-যাত্রী—প্রায় দৌড়েই গিয়েছিলেন; আর পথের শেষে পৌঁছে প্রায় ছয় মাসকাল জ্ঞানাতীত পরতত্ত্বে লীন হয়ে অবস্থান করেছিলেন। প্রাতিভাসিক অস্তিত্বের শেষ বাধা অতিক্রম করে ও জড়ের কারাগার ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে তাঁর আত্মা যখন পরমাত্মার সঙ্গে একত্বে লীন হল, তখন তাঁর পাবার আর কিছু বাকী রইল না; কার্যতঃ তিনি তখন ধর্মপথের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেলেন। কারণ অদ্বৈত সাধনার শেষ ধাপ নির্বিকল্প সমাধিতে দীর্ঘকাল অবস্থানের ফলে বিশ্বরূপে পরিস্ফুট সমগ্র দৃশ্যটির অন্তস্থলে যে সত্য নিহিত রয়েছে, তার স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল তাঁর কাছে। অজ্ঞেয়বাদীরা যাকে অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় বলে থাকেন, সেই চরম সত্তা তাঁর কাছে জ্ঞাত হওয়ার চেয়েও বেশী কিছু হয়েছিল, কারণ তার সঙ্গে মিশে তিনি এক হয়ে গিয়েছিলেন।

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা অদ্বিতীয় চেতনা-সাগরে মিশে এক হয়ে গিয়েছিল; সীমাহীন অস্তিত্বের কাছে জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যুর কোন অর্থই ছিল না; প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ সব দ্রবীভূত হয়ে এক অসীম, পরম, নিত্য আনন্দে পর্যবসিত হয়ে গিয়েছিল। চিরবিদ্যমানতায় কাল গিয়েছিল লুপ্ত হয়ে; মহাশূন্যতায় দেশ হয়েছিল অদৃশ্য; কার্যকারণ-সম্বন্ধের কোন সঙ্গতিই ছিল না সেখানে। এই উপলব্ধির স্বরূপ যে কি, ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না, তা বাক্য-মনের অতীত। এ শান্তিধামে যিনি গেছেন, একমাত্র তিনিই এর স্বরূপ জানেন। তিনিও কিন্তু মানব-মনের অধিগম্য মায়ার রাজ্যের ভাষায় এই জ্ঞানাতীত অনুভূতি প্রকাশ করতে অক্ষম। এই জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ব্রহ্ম কখনো উচ্ছিষ্ট হয় নাই। বেদ পর্যন্ত ব্রহ্মের বর্ণনা দিতে অপারগ হয়ে তার আভাস মাত্র দিয়ে গেছে।

যাই হোক, সাধারণ অবস্থায় একটু ধাতস্থ হবার পর তাঁর সর্বমায়া-বিনির্মুক্ত মনে প্রকৃতির বৈচিত্র্যের অন্তরালে অবস্থিত মহিমময় একত্বের অনুভূতি জেগেই থাকত; সে মন মগ্ন হয়ে থাকত দিব্যানন্দের অবিরাম প্রবাহে। নিপুণ শিল্পীর মত এখন তিনি হৃদয়বীণায় খুশিমত সুরলহরী তুলতে পারতেন—ভক্তি ও জ্ঞানের তন্ত্রীর যে কোনটিতে। দৃঢ়প্রত্যয়ের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে তিনি এখন বলতে পারতেন, 'পরতত্ত্বকে যখন নিষ্ক্রিয় বলে ভাবি, যখন ভাবি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কিছুই তিনি করেন না, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বা নিরাকার ঈশ্বর—পুরুষ—বলি। আর যখন তাঁকে সক্রিয় ভাবি, যখন ভাবি তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ করছেন, তখন তাঁকে শক্তি বা মায়া বা সাকার ঈশ্বর—প্রকৃতি—বলে থাকি। ভিন্ন নামে অভিহিত করলেও এ দুই-এর মধ্যে কোন ভেদ নেই। দুধ আর তার ধবলত্ব, মণি আর তার জ্যোতিঃ, সাপ আর তার তির্যক-গতির মত সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম অভেদ। একটিকে ভাবলেই আর একটিকে ভাবতে হয়। ব্রহ্ম ও তাঁর শক্তি অভেদ।' তাছাড়া সমান দক্ষতা নিয়েই তিনি যোগ এবং কর্মের তন্ত্রীতেও সুর-লহরী তুলতে পারতেন; তন্ত্রসাধনার সময় এ কাজে নিপুণ হয়েছিলেন তিনি। কাজেই অদ্বৈত-সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর হিন্দুধর্মের কাছে শিখবার মত কিছুই আর তাঁর বাকী রইল না।

"ন্যাংটা উপদেশ দিত,—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম কিরূপ। যেমন অনন্ত সাগর—ঊর্ধ্বে নীচে, ডাইনে বামে, জলে জল। কারণ-সলিল। জল স্থির।—কার্য হলে তরঙ্গ। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়—কার্য।"

"আবার বলত, বিচার যেখানে গিয়ে থেমে যায় সেই ব্রহ্ম। যেমন কর্পূর জ্বালালে পুড়ে যায়, একটু ছাইও থাকে না।"

"ব্রহ্ম বাক্যমনের অতীত।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

হালদার দীঘি

সুজাতা দেবী

কালো থির নীরে প্রভাতসমীর মৃদু কম্পন তোলে,
শষ্পবিছানো মাটির আঁচলে মায়াময় আলো দোলে ;
নিশা অবসানে জাগরণপ্রায় ওঠে অস্ফুট ধ্বনি
হালদারদীঘি-স্মৃতিভরা-বুকে গভীর মর্ম্মবাণী।
দীঘির সলিলে নুয়ে তরুশাখা কান পেতে তাহা শোনে—
কোন্ দেবশিশু চপল চরণে নেচে ফেরে বনে বনে !
উদাসীন তার ভাবে ভরা আঁখি, দীঘির বুকের মত
অসীম শান্তি-সলিলে পূর্ণ অন্তর অবিরত।

চারিদিকে তার ক্রমে জেগে ওঠে দিবসের কোলাহল,
স্নানতরে আসে অগণিত লোক, তোলপাড় করে জল।
বেলা বেড়ে চলে, শান্ত দুপুরে পাখীর উদাস ডাক
মনে হয় যেন অপার্থিব সে—মনাতীত নির্বাক।
গৃহকাজ সেরে বধূ নেয়ে ফেরে কলসে ভরিয়া জল—
ঘোমটায় ঢাকা মা'র সাথে যেন অষ্টসখীর দল।
গোধূলির আলো রাঙা হয়ে ওঠে কাজ শেষে ফেরে চাষী,
নির্ম্মল জলে অঙ্গ পাখালে ধূলির কালিমা নাশি।

ধ্বনিত শঙ্খে জাগে শিহরণ—বাজিল সন্ধ্যারতি
করুণ রোদনে বুদ্বুদ ওঠে মথিয়া গোপন স্মৃতি।
আঁধার পক্ষ নীরবে বিছায়ে গভীর তিমির নামে,
চঞ্চল জল স্থির হয়ে আসে—সব কোলাহল থামে—
স্তব্ধ শান্ত গ্রন্থিমুক্ত বাসনা-উর্ম্মিহীন
নীরব মধুর সঙ্গবিহীন গভীর সমাধিলীন ;
মনে পড়ে তাঁর রাতুল চরণ, আঁখি প্রেমভরে নত—
হালদার দীঘি সেই স্মৃতি লয়ে আজো তপস্যারত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

শ্রীসরসীলাল সরকার

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী অমোঘ-শক্তি। তাঁহার জীবন ও বাণী বিশ্ববাসীর পরম সম্পদ।

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী একদিন এক ভক্তকে বলিয়াছিলেন, 'মানুষ তো ভগবানকে ভুলেই আছে! তাই যখন যখন দরকার, তিনি নিজে এক একবার এসে সাধন করে পথ দেখিয়ে দেন। এবার দেখালেন ত্যাগ।' বস্তুতঃ ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত না হইলে জনসেবাও ঠিক ঠিক হয় না, শ্রীভগবানের দর্শনলাভ তো সুদূর-পরাহত।

ভক্তজননী আর একদিন একজন সাধুকে বলিয়াছিলেন, 'তিনি যে সমন্বয়ভাব প্রচার করবার মতলবে-সব রকম সাধন করেছিলেন, তা কিন্তু আমার মনে হয়নি। তিনি সর্বদা ভগবদ্‌ভাবেই বিভোর থাকতেন। খ্রীষ্টানরা, মুসলমানরা, বৈষ্ণবরা যে যেভাবে তাঁকে ভজন করে বস্তুলাভ করে, সেই সেই ভাবে সাধন করে তিনি নানা লীলা আস্বাদন করতেন ও দিনরাত কোথা দিয়ে কেটে যেত, কোন হুঁশ থাকত না। তবে কি জান বাবা, এই যুগে তাঁর ত্যাগই হল বিশেষত্ব। ও রকম স্বাভাবিক ত্যাগ কি, কখনও কেউ দেখেছে? সর্বধর্ম-সমন্বয় ভাবটি যা বললে, ওটিও ঠিক।'

আমরা দেখি, যখন যে অবতার এসেছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই এক একটি ভাবের আদর্শ; অবশ্য তাঁহাদের মধ্যে অন্যভাব ছিল না, তা নয়; সব ভাবই ছিল, তবে একটি ভাব তাঁহারা প্রকাশ্যে দেখাইয়া গিয়াছেন। এই যেমন মহাপ্রভু প্রেমের ঘনীভূত অবস্থা। যেন তাঁহাতে জড় বলিয়া কিছু নাই; যেন প্রেম জমিয়া শ্রীচৈতন্য হইয়াছে। ঐরূপ মূর্তিমান জ্ঞান যেন শ্রীশঙ্কর, মূর্তিমান ত্যাগ যেন শ্রীবুদ্ধ, মূর্তিমান নিষ্কাম কর্ম যেন শ্রীকৃষ্ণ!

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব ধর্ম, সর্ব দর্শন, প্রথা ও মতের সমন্বয় করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন—কর্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি একই মহাসাধনের এক একটি অঙ্গ মাত্র। কিন্তু কালক্রমে সেই সমন্বয়ের ভাব লুপ্ত হওয়ায় প্রত্যেক মতকে অপর মতগুলির বিরোধী ভাবিয়া আমরা গোঁড়ামির আশ্রয় লইলাম। ধর্মজগতের এই বিরোধ, মিটিল সর্বধর্ম-সমন্বয়কর্তা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের আগমনে। ভারতের যুগযুগব্যাপী অবিরাম সাধন-প্রবাহের মিলন হইল শ্রীরামকৃষ্ণরূপ সমন্বয়-সমুদ্রে। সব অবতারের ভাবের সমষ্টি ও মিলন এই অবতারে পাওয়া যায়—সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণকে 'অবতার-বরিষ্ঠ' বলা হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন দক্ষিণেশ্বরে আবির্ভূত হইলেন, তখন চারিদিকে নানা সম্প্রদায়। খৃষ্টান ডাকিতেছেঃ মন্দির ছেড়ে এস আমাদের গির্জায়—মন্দিরে কিছু নাই মুসলমান ডাকিতেছেঃ আমাদের মসজিদে এসো। শিখরা ডাকিতেছেঃ আমাদের গুরুদ্বারে এসো। যখন চারিদিকে ধর্মের এই প্রকার বিরোধ চলিতেছে—তখন শ্রীরামকৃষ্ণ আসিলেন মায়ের পূজারী হইয়া! তিনি বলিতেছেন, 'মা, দেখা দাও!' সরল ভাবে, ব্যাকুলতার সহিত শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে ডাকিতেছেন। বৎসরের পর বৎসর সাধনা চলিল। সর্বপ্রকার সাধন তিনি করিলেন। ইসলাম ও খৃষ্টধর্মও বাদ গেল না।

বেদে যাহাকে ব্রহ্ম বলে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকেই 'মা' বলিতেন। সর্ব মতের সর্ব প্রকার সাধনা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ উপলব্ধি করিলেন, সর্ব ধর্মের গন্তব্যস্থল একই ঈশ্বর। তিনি এক নূতন আলোক বিশ্ববাসীকে দিলেন। তিনি বলিলেন, 'যত মত, তত পথ। ঈশ্বর অনন্ত—তাঁর ভাবের ইতি করা যায় না।' গীতামুখে (৪।১১) শ্রীকৃষ্ণও এই কথা বলিয়াছেন, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'—যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে, আমি তাহাকে সেইভাবেই অনুগ্রহ করি।

একটি কথা ঠাকুর সর্বদা সকলকে বলিতেন, 'মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বর লাভ। তাঁকে লাভ না করতে পারলে, কেবল দুঃখকষ্ট ভোগ। অতএব তাঁকে পেতে হবে, তা যেমন করেই হোক!' 'এ জন্মেই ঈশ্বরকে পেতে হবে।'—সকলকে এইরূপ দৃঢ়-সঙ্কল্পবান হইতে ঠাকুর উৎসাহ দিতেন। চাই হৃদয়, চাই ব্যাকুলতা, চাই আন্তরিকতা; ঈশ্বরের অদর্শনে যখন প্রাণ যায় যায় হবে, তখন তিনি দেখা দিবেন—এই ছিল ঠাকুরের উপদেশ।

শ্রীচৈতন্য, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীশঙ্কর প্রভৃতি অবতারেরা সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ—এ এক অদ্ভুত ব্যাপার—প্রায় নিরক্ষর, নামে মাত্র লিখিতে-পড়িতে পারিতেন। অথচ বড় বড় পণ্ডিতেরা শ্রীরামকৃষ্ণের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতেন। কেন? ইহার উত্তর হইতেছে, 'উপলব্ধি করা' আর 'তর্কের দ্বারা বোঝা' অনেক তফাৎ। যেমন ম্যাপ দেখিয়া কাশীর কথা জানা বা পরের মুখে শুনা এক, আর নিজে যাইয়া কাশী দেখিয়া আসা আর এক জিনিস। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন যে, ঈশ্বরের দর্শনে—আত্মার উপলব্ধিতে—অনন্ত জ্ঞানের দ্বার খুলিয়া যায়। কারণ তিনি জ্ঞানস্বরূপ।

সব অবতারেই কিছু না কিছু সিদ্ধাই ছিল; এবারের বৈশিষ্ট্য—ভগবদ্-বিভূতির বহিঃপ্রকাশ নাই।

আবার সব অবতারেই 'রূপের ছটায় ভুবন করে আলো'—যেমন গৌরের গানে আছে—'ডুবলো নয়ন, ফিরে না এল। গৌর-রূপসাগরে, সাঁতার ভুলে, তলিয়ে গেল আমার মন'—কিন্তু এবার দৈহিক রূপের অভাব। সেইজন্য ভক্ত-ভৈরব গিরিশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'হ্যাঁ গা, এবার রূপ নেই কেন গা?' তন্ত্র-সাধনার সময় যখন শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ অপরূপ রূপলাবণ্যমণ্ডিত হইয়াছিল, তখন তিনি শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে উহা ফিরাইয়া লইতে বলিয়াছিলেন।

'মূর্তিমান পূর্ণ নিরভিমানের অবতার আমরা স্বচক্ষে দেখেছি'—পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দজী বলিতেন। সর্বভূতে শ্রীভগবানকে দর্শন করিতেন তিনি। জাতি-অভিমান চূর্ণ করিবার জন্য অতি নীচ জাতির পায়খানা নিজের লম্বা লম্বা চুল দিয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন; কাঙালী-ভোজনের উচ্ছিষ্ট ধারণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের এঁটো পাতা মাথায় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন, দীনতার প্রতিমূর্তি। কেহ তাঁহাকে প্রণাম করিবার পূর্বেই তিনি তাহাকে প্রণাম করিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন করুণাঘন মূর্তি। কাশীর পথে যাইবার সময় দেওঘরে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের দারিদ্র্য দুঃখ দেখিয়া মথুরচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন যে, তাহাদের অন্নবস্ত্র দান না করিলে তিনি আর কাশী যাইবেন না, তাহাদের সঙ্গেই থাকিয়া যাইবেন। একদিন ঠাকুর ভাবস্থ হইয়া বলিয়াছিলেন, 'জীবে দয়া কি? শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।'

স্ত্রীজাতিতে মাতৃবুদ্ধি—এই ভাবটি আমাদের ধর্মের নিজস্ব। এই ভাবটি শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনে

অতি উজ্জ্বল। বাল্যে ধনী কামারনীকে তিনি ভিক্ষামাতা করিয়াছিলেন। তারপর ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে গুরু করিলেন। সর্বশেষে নিজ সহ-ধর্মিণী শ্রীশ্রীমা সারদামণিকে সাক্ষাৎ দেবী জ্ঞানে ৺ষোড়শীরূপে পূজা করিয়া ভারতে মহাশক্তির উদ্বোধন করিলেন। পুঁথিকার বলেন—

'প্রভুসঙ্গে এইবার, জগমাতা অবতার,
সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী।
কৃপাময়ী কলেবরে, করুণার ধারা ঝরে,
শান্তিমূর্তি মঙ্গলরূপিণী ॥'

অপরের পাপ-তাপ হরণ করিবার আশ্চর্য ক্ষমতা অবতারদের থাকে। মহাপ্রভু মাধাইকে আলিঙ্গন করিবামাত্র তাঁহার গৌরকান্তি দেহ নীল হইয়া গিয়াছিল। এ যুগেও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে ভক্ত গিরিশচন্দ্র বলিয়ছিলেন, 'মশাই, আমি যেখানে বসি, সেখানকার সাত হাত মাটি অশুদ্ধ হয়। আপনাকে চিন্তা করে আমি কি ছিলুম, কি হয়েছি! আলস্য ছিল সেটা ঈশ্বর-নির্ভরতায় দাঁড়িয়েছে। পাপ ছিল, তাই নিরহঙ্কার হয়েছি।' অবতারের আশ্রয়—মহা আশ্রয়! শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন যে দক্ষিণে বাতাস বহিলে, আর পাখার দরকার নাই। গীতায় আছে,

'তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥'

অর্থাৎ শ্রীভগবান আশ্রিত ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহার্থ—তাহাদের অজ্ঞানজ তমঃ নাশ করেন। যুগাবতারের কৃপা হইলে, কোটি জন্মের পাপ উড়িয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন যে, আলো জ্বালিলে হাজার বছরের জমাট অন্ধকার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায়, একটু একটু করিয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিত্য প্রার্থনা করিতেন। পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম, ভাল-মন্দ—সমস্ত শ্রীশ্রীজগন্মাতার চরণে সমর্পণ করিয়া দিয়া, তিনি শুদ্ধাভক্তি চাহিতেন। তিনি কিন্তু 'সত্য' সমর্পণ করেন নাই। তিনি যদি মুখে বলিয়া ফেলিতেন, 'শৌচে যাব', তাহা হইলে বিনা প্রয়োজনে যাইতে হইত। কিংবা 'খাব না' বলিলে, ক্ষুধা পাইলেও খাইতে পারিতেন না। তিনি সকলকে বলিতেন, 'সত্যে খুব আঁট থাকা চাই।'

শরণাগতি অর্থাৎ ঈশ্বর-নির্ভরতা, অহঙ্কারের লেশমাত্র থাকিলে হয় না। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন যে ঝড়ের এঁটো পাতার মত থাকিতে হয়। সুখে-দুঃখে চিত্ত-চাঞ্চল্য আসিলে শরণাগতি হয় না। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, 'মা যা করেন। আমার বিড়ালছানার স্বভাব। বিড়ালছানা কেবল মিউ মিউ করে ডাকে। মা যেখানে রাখে সেখানেই সে থাকে।' 'চাকরানীর ছেলেও জানে, আমার মা আছে। বাবুর ছেলের সঙ্গে যদি ঝগড়া হয়, তাহলে বলে, আমি মাকে বলে দেব।' তিনি আরও বলিতেন যে, তাঁহার সন্তান ভাব; ছোট ছেলে মাকে চায়। সে জানে, আমার মা আছে, আমার আবার ভাবনা কি? শ্রীশ্রীঠাকুরের—'আমি' বা 'আমার' বোধ ছিলই না। সমস্ত মায়ের ইচ্ছায় হইতেছে—এইটি তাঁহার ভাব। বলিতেন, 'আমি যন্ত্র—তিনি যন্ত্রী'।

শ্রীশ্রীঠাকুর সরলতার বিশেষ আদর করিতেন। তিনি বলিতেন, 'সরল, উদার না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। পূর্বজন্মের অনেক তপস্যা থাকলে সরল হয়।' তিনি আর একটি কথার উপর খুব জোর দিতেন। তিনি বলিতেন যে ঈশ্বরলাভ করিতে হইলে কাম-কাঞ্চন ত্যাগ করিতে হইবে। সংসারের সব কিছু ভোগ করিব, আবার মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য যে ঈশ্বরলাভ, তাহাও হইবে—দুইটি একসঙ্গে হয় না। একটিকে ত্যাগ করিতে হইবে—অপরটিকে গ্রহণ করিবার জন্য। এখানে আপস

চলিবে না। হিন্দীতে একটি কথা আছে, 'যাঁহা কাম, তাঁহা নেহি রাম। যাঁহা রাম, তাঁহা নেহি কাম।' শ্রীশ্রীঠাকুর টাকা ছুঁইতে পারিতেন না। সকল স্ত্রীলোককে, নিজ বিবাহিতা স্ত্রীকেও তিনি সর্বদা সাক্ষাৎ আনন্দময়ী জগন্মাতারূপে দেখিতেন। তাঁহার ত্যাগ ছিল স্বাভাবিক। গৃহস্থ ভক্তদের তিনি বলিতেন যে স্ত্রী, পুত্র, ধন-ঐশ্বর্য লোকমান্য—সংসারে যে-গুলিকে 'আমার' 'আমার' বলা হয়, সেগুলিতে আসক্তিশূন্য হইতে হইবে আর সেগুলিকে শ্রীভগবানের চরণে অর্পণ করিয়া বলিতে হইবে—এসব 'তোমার' 'তোমার' 'তোমার'। সংসারীদের শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন যে দুই একটি সন্তান হওয়ার পর, স্বামী-স্ত্রীকে ভাই-বোনের মত থাকিতে হইবে। সংযম, ব্রহ্মচর্য ধর্ম-জীবনের প্রথম সোপান। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, 'পান-তামাক ছাড়লে কি হবে? কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগই ত্যাগ।'

বিশ্ববরেণ্য আচার্য পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, 'শাস্ত্র ঠিক ঠিক বুঝতে হলে, ঠাকুরকে দেখ!' ধর্মের অতি উচ্চ তত্ত্ব-গুলি সাধন সহায়ে প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধনার ফল বিশ্ববাসীকে দিয়া গিয়াছেন। ভারতের সনাতন ধর্ম-জীবনকে তিনি অপূর্ব মাধুর্যে মণ্ডিত করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা কোন নূতন সম্প্রদায়ের ধর্ম নয়। ইহা ভারতের শাশ্বত সনাতন ধর্ম - বিশ্ববাসীর ধর্ম। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন হইল সর্বধর্মের সমন্বয়ভূমি—তিনি হইলেন 'সর্বধর্মস্বরূপ'।

পরিশেষে প্রেমানন্দজীর আশীর্বাদ স্মরণ করিতেছি—'ঠাকুরের কৃপায় তোরা তাঁতে মগ্ন হয়ে যা—যাকে একেবারে তলিয়ে যাওয়া বলে। ভগবান কথার বস্তু নন—উপলব্ধির বস্তু। তাঁকে আমাদের পেতেই হবে—তা সে যেমন করে হোক। ···ভগবদ্ভক্তিই মরু-হৃদয়ে একমাত্র শীতল বারি!'

হে নির্মল দিব্য জ্যোতি!

শ্রীঅনিলকুমার বিশ্বাস

ভারতের প্রাণশক্তি অমলিন জীবনের শাশ্বত প্রত্যয়,
জড়বাদী দুঃস্বপন অফুরান ভোগলিপ্সা কভু কাম্য নয়—
তোমা হতে লভিয়াছি এই সত্য; ধন্য হোক এদেশের লোক
স্বাধীন ভারতভূমে জীবনের এ আদর্শ সমুজ্জ্বল হোক!

চাহি শিল্প, চাহি কৃষি, চাহি মোরা ধনজন পার্থিব গৌরব,
উজ্জ্বল জীবন চাহি; বিদূরিতে এ জাতির দুর্ভাগ্য-রৌরব
দারিদ্র্যের গ্লানি, চাহি শক্তিদৃপ্ত বীর্যবান সমাজ সংহত;
বলিষ্ঠ নেতৃত্ব চাহি, ক্ষুদ্র ক্লিন্ন স্বার্থ-শিরে বজ্রসম সদা সমুদ্যত।
কুটিরে-প্রাসাদে চাহি দিব্য সত্য জীবনের পুণ্য কোকনদ
বিজ্ঞানের ঋদ্ধি সাথে চাহি মোরা আধ্যাত্মিক জীবন-সম্পদ।

হে বিদেহী মৃত্যুঞ্জয়! হে নির্মল দিব্য জ্যোতি! হে মহাজীবন!
তব পুণ্যাদর্শে হোক অখণ্ড ভারত ব্যাপী নব উজ্জীবন।

'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি'

(মহাপ্রভু-জীবনে রূপায়িত)

[পূর্বানুবৃত্তি—গত আষাঢ় সংখ্যার পর]

শ্রীমতী সুধা সেন

প্রত্যুম্ন মিশ্র নামে এক ব্রাহ্মণ একদিন প্রভুর চরণে প্রণত হইয়া অতি দীনভাবে কৃষ্ণকথা শ্রবণের বাসনা জানাইলেন। প্রভু বলিলেন, 'বিপ্র, তোমার পরম সুকৃতি ও সৌভাগ্য যে কৃষ্ণকথা শ্রবণের বাসনা তোমার হইয়াছে আমি তো কৃষ্ণকথা জানি না। জানেন একমাত্র রায় রামানন্দ—তুমি তাঁহার কাছে যাও, আমিও তাঁহার কাছে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করি।'

মিশ্র রামানন্দ রায়ের গৃহে উপস্থিত হইলেন। রায়ের ভৃত্য সসম্মানে মিশ্রকে আসনে বসাইল। রায়ের দর্শন না পাইয়া মিশ্র ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, রায় দুইজন দেবদাসীকে মন্দিরে শ্রীভগবানের সম্মুখে কিভাবে 'জগন্নাথবল্লভ-নাটক' অভিনয় করিতে হইবে, কিভাবে প্রসাধনাদি করিতে হইবে, তাহা শিখাইতেছেন।

শুনিয়া মিশ্র স্তব্ধ নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। ভাবিতে লাগিলেন—প্রভু কি একথা জানেন না?

কাজ শেষ করিয়া রায় ফিরিলেন, মিশ্রকে দেখিয়া বিলম্বের জন্য লজ্জিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

বেলা অধিক হইয়াছে দেখিয়া মিশ্র বিদায় গ্রহণ করিলেন; কৃষ্ণকথা শুনিবার ইচ্ছা বোধ হয় আর তাঁহার মনে ছিল না। বলিয়া গেলেন—'আপনাকে দর্শন করিবার বাসনায় আসিয়াছিলাম, সে বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, আমি পবিত্র হইলাম।'

মিশ্র চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার মনের দ্বিধা হয়ত গেল না।

পরদিন প্রভুর সম্মুখে মিশ্র উপস্থিত হইলেন। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—'রায়ের নিকট হইতে কেমন কৃষ্ণকথা শ্রবণ হইয়াছে মিশ্র?'

মিশ্র অকপটে প্রভুর কাছে 'রায়ের বৃত্তান্ত' বলিলেন। প্রভু বুঝিলেন, দেবদাসীদের সঙ্গে এভাবে মিশেন বলিয়া রায়ের উচ্চাবস্থা সম্বন্ধে মিশ্রের মনে সন্দেহ জাগিয়াছে। প্রভু তখন মিশ্রকে বুঝাইয়া বলিলেন যে রামানন্দ রায়ের অবস্থা এত উচ্চ, তাঁহার দেহমন এত পবিত্র যে দেবদাসীদের সঙ্গে মিশিলেও তাঁহার চিত্তে বিকারের উদয় কখনও হইবার নয়—

'নির্বিকার দেহমন কাষ্ঠ পাষাণ সম'—চৈঃ চঃ।

রায়ের অসাধারণ উচ্চাবস্থার কথা প্রভু যেন শতমুখে বলিয়াও শেষ করিতে পারিতেছেন না। তবে সাবধান করিয়া দিলেন যে রায়কে দেখিয়া কেহ যেন রায়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে না যায়—তাহাতে বিপদের সম্ভাবনা আছে—'এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।'

তারপর মিশ্রের দিকে ফিরিয়া প্রভু বলিলেন—'মিশ্র! আমি রায়ের নিকট হইতেই কৃষ্ণকথা শ্রবণ করি, তোমার যদি সত্যই কৃষ্ণকথা শ্রবণের বাসনা হইয়া থাকে তবে পুনরায় সেই পরম রসবেত্তার নিকটেই যাও, আমার নাম করিও—তবেই তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে।'

নিঃসংশয় আনন্দিত-চিত্ত মিশ্র এইবার

রায়ের কাছে গিয়া দীনাতিদীন হইয়া বসিলেন, কৃষ্ণকথা শ্রবণের আশায়। রায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি কথা, শ্রীকৃষ্ণের কোন্ মাধুর্যের কথা শ্রবণ করিতে চান ?'

সরল বিপ্র বলিলেন—'রায়! আমি অতি সাধারণ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, ভালোমন্দ কোন প্রশ্নই আমি জিজ্ঞাসা করিতে জানিনা। আপনি কৃপা করিয়া আমাকে ক্রমে ক্রমে লীলারস আস্বাদন করান—ইহাই আমার প্রার্থনা।'

'তবে রামানন্দ ক্রমে কহিতে লাগিলা,
কৃষ্ণকথা-রসামৃত-সিন্ধু উথলিলা।
আপনি প্রশ্ন করি পাছে করেন সিদ্ধান্ত,
তৃতীয় প্রহর হৈল নহে কথা-অন্ত।' চৈঃ চঃ।

কৃষ্ণরসামৃত-বারিধিতে তরঙ্গলহরী উঠিতে লাগিল একের পর এক, বক্তা শ্রোতা উভয়েই সেই সিন্ধুতে নিমজ্জিত হইয়া রহিলেন —আত্মস্মৃতিও যেন রহিল না।

অবশেষে বেলা দেখিয়া ভৃত্য আসিয়া রায়কে ডাকিলে—দুইজনেরই আবিষ্ট চৈতন্য ফিরিয়া আসিল—রায় কৃষ্ণকথা সমাপন করিলেন।

কৃতার্থ ধন্য হইয়া মিশ্র ফিরিয়া আসিলেন, প্রভুর চরণে হৃদয়ের নবলব্ধ আনন্দ উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, "প্রভু! তুমি আমাকে পরম কৃতার্থ করিলে, পরমধনে তুমি আজ আমাকে ধনী করিলে দয়াল! কি বলিব রামানন্দ রায়ের কথা, তিনি তো স্থূল দেহধারী মানব নহেন, তিনি শুদ্ধ কৃষ্ণরসময়! ব্রহ্মারও অগোচর এই রস আজ তুমিই আমাকে পান করাইলে। তোমার চরণে জন্ম-জন্মান্তরের জন্য আমি মাথা বিকাইলাম।

প্রভু! আমি রায়ের মহিমা জানিতাম না, তুমি ছাড়া তোমার ভক্তের মহিমা কে-ই বা জানে? তুমি স্বয়ং কৃষ্ণ; রায় আমাকে বলিয়াছেন, 'মিশ্র, আমাকে তুমি কৃষ্ণকথার বক্তা বলিয়া মনে করিও না। আমি বীণাযন্ত্র, প্রভু সেই বীণাযন্ত্রধারী, প্রভুই জানেন কোন্ সুরে তাঁহার বীণা বাজে'!"

প্রভু হাসিয়া বলিলেন—'না না, মিশ্র, আমি কিছুই জানিনা,—

…রামানন্দ বিনয়ের খনি।'

প্রভু কিছুই জানেন না, 'সন্ন্যাসী', 'ভিক্ষুক'—নিজের সম্বন্ধে ইহাই প্রভু বলেন। সন্ন্যাসের যত কঠোরতা, যত বিধি সমস্তই সযত্নে পালন করেন—এমনকি অন্যের বাক্যদণ্ড পর্যন্ত অম্লানবদনে সহ্য করেন।

যিনি স্বয়ং কৃষ্ণ, যাঁহার বিধানে সমস্ত বিধি নিয়ন্ত্রিত, তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করিতেন সন্ন্যাসের কঠোর বিধানে। অন্তরঙ্গগণের, বিশেষতঃ স্বরূপ, গোবিন্দ, জগদানন্দ প্রভৃতির হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত, তথাপি প্রভুর কঠোর নিয়ম এতটুকু শিথিল হইত না।

গম্ভীরার কঠিন পাষাণ-ভিত্তিতলে সুকুমার তনুখানি লুণ্ঠিত হইত—কৃষ্ণবিরহের অসহ্য যন্ত্রণায় পাষাণে যখন মাথা ঠুকিতে থাকিতেন, আঘাতে আঘাতে রুধিরাক্ত হইত সমস্ত অঙ্গ—তথাপি দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন জগদানন্দের সামান্য সেবার আয়োজন। গৈরিক বস্ত্রাবৃত করিয়া সামান্য একটি তুলার শয্যা পাতিয়া দিয়াছিলেন পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুকে নিষ্ঠুর পাষাণের আঘাত হইতে বাঁচাইবার আশায়। দেখামাত্র শয্যাটি ঠেলিয়া ফেলিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন প্রভু! 'শুধু শয্যা কেন, পালঙ্ক আনো, মর্দনিয়া আনো, ভৃত্য রাখো আমার সেবার জন্য, তবেই না আমার সন্ন্যাসব্রত পূর্ণ হইবে!'

কত কষ্টে কত যত্নে আগ্রহে চন্দনতেল লইয়া পদব্রজে গৌড় হইতে পণ্ডিত নীলাচলে

আসিলেন প্রভুর বিরহতপ্ত মস্তিষ্ক একটু শীতল করিবার আশায়—প্রভু তাহাও প্রত্যাখ্যান করিলেন। সেই তৈলভাণ্ড সবলে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া অভিমানে বেদনায় পণ্ডিত ঘরে দ্বার দিয়া উপবাসী রহিলেন তিনদিন। তবুও প্রভু আপন সঙ্কল্পে অটল হইয়াই রহিলেন। নিজে সাধিয়া পণ্ডিতের ঘরে ভিক্ষা করিয়া পণ্ডিতের উপবাস ভঙ্গ করিলেন, কিন্তু তাঁহার কঠোর নিয়মভঙ্গ হইল না একচুল!

অথচ শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, যিনি কৈশোরাবধি অবধূত—প্রভুর বহু পূর্বেই যিনি সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন—তাঁহার জন্য প্রভুর কি অপরিসীম উদারতা! শ্রীপাদ নিত্যানন্দ আর শ্রীগৌরাঙ্গ বস্তুতঃ একই তত্ত্ব। নিত্যানন্দ অনন্ত, সঙ্কর্ষণ, বলরাম আর প্রভু শ্রীকৃষ্ণ, একই লীলার দুই দেহভেদে দুইরূপে প্রকাশ। কিন্তু নিজের বেলা যেখানে এত কঠোরতা, এত বিধিনিষেধ, নিত্যানন্দের বেলা সেখানেই এত ঔদার্য। কি উদ্দেশ্যে, কি প্রয়োজনে নিত্যানন্দকে গৌড়ে পাঠাইলেন, প্রভুই জানেন —কেনই বা গৃহস্থ-ধর্ম পালনের আদেশ নিত্যানন্দকে দিলেন!

গৌরপ্রেমে পাগল নিতাই নীরবে গৌরের আদেশ মাথায় তুলিয়া লইয়া চলিয়া আসিলেন গৌড়ে, লোকলজ্জা তথা লোকনিন্দাকে অগ্রাহ্য করিয়া। দ্বারে দ্বারে গিয়া, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য-নির্বিচারে দয়াল নিতাই গৌরপ্রেম বিলাইয়া গেলেন দুই হাতে।

কেহ কেহ নীলাচলে গিয়া প্রভুর কাছে অভিযোগ করিতে লাগিলেন—'এ কী অনাচার —অবধূত নিত্যানন্দের অঙ্গে কেন অলঙ্কার, বসন-ভূষণ, কেন তাঁহার যত্র তত্র বিচরণ ও সকলের গৃহে অন্নগ্রহণ?'

পরম নির্ভয় ও বিশ্বাসে প্রভু বলিলেন—

'নিত্যানন্দ স্বরূপ পরম অধিকারী
অল্পভাগ্যে তাঁহারে জানিতে নাহি পারি।
পতিতের ত্রাণ লাগি তাঁর অবতার,
তাঁহা হৈতে সর্বজীবে পাইবে উদ্ধার।
তাঁহার আচার বিধি-নিষেধের পার
তাঁহারে বুঝিতে শক্তি আছয়ে কাহার।'

অন্তরে যিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ—কিন্তু 'রাধাভাবকান্তি-সুবলিত' যাঁহার গৌরতনু, আবার সেই গৌরতনুখানিও আবৃত বৈরাগ্যের গৈরিক বসনে, তিনি বুদ্ধির অগম্য; মন তাঁহার নাগাল পায় না, প্রাণ জানে না কোথায় সেই প্রাণারাম; শুধু চাহিয়া আছে পরম লগ্নের প্রতীক্ষায়—কবে দক্ষিণা বাতাস বহিয়া আনিবে তাঁহার চরণের ধূলি, কবে সেই কৃপার স্পর্শে সফল হইবে জীবন।

(সমাপ্ত)

"তিনি মানুষ হয়ে, অবতার হয়ে, যুগে যুগে আসেন। প্রেম ভক্তি শিখাবার জন্য।...তাঁর অনন্ত লীলা—কিন্তু আমার দরকার প্রেম, ভক্তি। আমার ক্ষীরটুকু দরকার। গাভীর বাঁট দিয়েই ক্ষীর আসে। অবতার গাভীর বাঁট।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ

সেখ সদরউদ্দীন

যুগান্তরের আরাধ্যদেব, তুমি শ্রীরামকৃষ্ণ—
কথনও তুমি রাম-অবতার, কথনও শ্রীকৃষ্ণ !
যুগ থেকে যুগে একক তুমিই বিলায়েছ আপনাকে,
তোমার মাঝেই দেখিলাম কালী জগজ্জননী মাকে।
তোমার মাঝেই দেখিলাম কভু মহম্মদ ও যীশু,
বিরাট তোমার মাঝে দেখিলাম সহজ-সরল শিশু।
সত্য-ত্রেতা ও দ্বাপর-কলিতে—সর্বযুগেই আছ,
মানবের বেশে স্বর্গের দেব, মর্ত্যেতে নামিয়াছ !
কথনও বাজে মুরলী তোমার, কভু বা পাঞ্চজন্য,
রাধাকৃষ্ণের যুগল-মুরতি তুমিই শ্রীচৈতন্য !
সত্য ও শিব-সুন্দর তুমি, তুমি সচ্চিদানন্দ,
তোমারই এক রূপের অঙ্গ স্বামী বিবেকানন্দ !

পাপ-অনাচার দুঃখ-জ্বালার যখনি প্রাদুর্ভাব—
জগৎ-হিতের দেবতা, তোমার হয়েছে আবির্ভাব !
ঘৃণা-বিদ্বেষ দূর করিতেই তোমার অভ্যুদয়,
এই পৃথিবীর মঙ্গল করো, তুমি মঙ্গলময় !
মানুষে মানুষে যখন হেথায় মারামারি-হানাহানি।
ছিটাও তুমিই দিক্-দিগন্তে শান্তির নীর আনি'।
স্বার্থ নিয়েই দ্বন্দ্ব হেথায়, স্বার্থে জগৎ ঢাকা,
শিখালে তোমার বেদের মন্ত্র—টাকা মাটি, মাটি টাকা।
সব ধর্মের সার মর্মটি—নাই কোন ভেদাভেদ,
সব ধর্মের মর্মবাণী যে তোমার জীবন-বেদ।

মাটির সঙ্গে বাস করিয়াও মাটিতে ছিলেনা তুমি,
অনেক ঊর্ধ্বে ঠাঁই লভিয়াছে তোমার মানস-ভূমি।
তাই দেখি তুমি ওপর থেকেই দেখেছ জগৎটাকে,
ছোট বা বড়োর ভেদ-বিচারেতে দেখ নাই কোনটাকে।
স্বর্গের দেব, তাইত তুমিই সর্বধর্ম-সার,
তোমার মধ্যে হল একীভূত সাকার ও নিরাকার।
কথনও তুমি জমাট বরফ, কথনও তুমি জল—
একই বস্তুর দুইটি আকার ভরেছে ভূ-মণ্ডল।
তোমার পুণ্য চরণ-স্পর্শে ধন্য জগৎ-ভূমি—
যুগ-অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ, প্রণাম লহো হে তুমি॥

স্বামীজীর সন্নিধানে

স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজয়নাথ মজুমদার

১৩১২ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'তত্ত্বমঞ্জরী' পত্রিকায় বিজয়নাথ মজুমদার মহাশয়ের নিজের লেখা স্মৃতিকথা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহারই কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল :

১০ই ফাল্গুন ১৩০৩ সালে জানিলাম - গত কল্য সকাল ৮টার সময় স্বামী বিবেকানন্দ কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছেন। ১৪ই ফাল্গুন বুধবার অপরাহ্ণ ৩৷টায় বন্ধু প্রমথ মজুমদার ও অনুকূলচন্দ্র মিত্র সহ নৌকাযোগে গোপাললাল শীলের উদ্যানবাটীতে রওনা হইলাম। গঙ্গাবক্ষ হইতে স্বামীজীর গম্ভীর মূর্তি দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি গঙ্গার ধারে বসিয়াছিলেন। স্বামীজীকে প্রণামপূর্বক নিকটে উপবিষ্ট হইলাম। গুডউইন নগ্নপদে জোড়হস্তে নতজানু হইয়া তাঁহার সন্নিকটে উপবিষ্ট ছিলেন। প্রায় ১৷৷ ঘণ্টাকাল স্বামীজীর কথোপকথন শুনিয়া সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিলাম। পথে স্বামীজীর সুন্দর সুন্দর কথা, তাঁহার তীব্র বৈরাগ্য ও অদ্ভুত শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা চলিল।...

শনিবার পুনরায় গেলাম। স্বামীজী একঘর লোকের মধ্যে বসিয়াছিলেন। স্বামীজী স্বকীয় অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছিলেন।...

পরদিন রবিবার শোভাবাজার রাজবাড়িতে সভায় প্রথম স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণ করি। বহু লোক, কিন্তু সকলেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার কথা শুনিতেছিল। ইহার পরে স্টার, ক্লাসিক, এবং মিনার্ভা থিয়েটারেও স্বামীজীর কয়েকটি বক্তৃতা হয় এবং সকল বক্তৃতাই শ্রবণ করিয়া ধন্য হই।

১৩০৩ সালে ২৫শে ফাল্গুন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে ঠাকুরের জন্মোৎসব। স্বামীজী এই উৎসবে কতই আনন্দ করেন। বালকের ন্যায় স্বভাব। পঞ্চবটীমূলে হাসিয়া হাসিয়া ঘুরিতে লাগিলেন। মাধবীলতায় বসিয়া মাঝে মাঝে দোল খাইতে লাগিলেন। এদিক-ওদিক ঘুরিতে লাগিলেন। মধ্যে দাঁড়াইয়া সঙ্কীর্তন শুনিতে লাগিলেন, প্রফুল্ল হৃদয়, প্রফুল্ল আনন। নগ্নপদ, মুণ্ডিতমস্তক, বিভোরমূর্তি গুডউইন পঞ্চবটীমূলে দাঁড়াইয়া একটি বক্তৃতা করিলেন।

১৩০৪ সালের ফাল্গুন মাস। ১৬ই ফাল্গুন পূর্ণচন্দ্র দাঁয়ের ঠাকুরবাটীতে ঠাকুরের জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। বেলুড় মঠের জমি ক্রয় করা হইয়াছে এবং তথায় হোমাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করা হইয়াছে। ২৩শে ফাল্গুন, রবিবার নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে গেলাম। মঠ তখন সেখানেই আছে। স্বামীজী নূতন মঠের জমিতে গিয়াছেন। তখন সেখানে একটি কুঠি ছিল। তথায় মুলর, বুল, নোব্‌ল্ প্রভৃতি ছিলেন। শিবনারায়ণ পরমহংস ও মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ও তথায় উপস্থিত। অপরাহ্ণে গিরিশবাবুর সহিত ফিরিলাম।

৭ই চৈত্র রবিবার বলরাম-ভবনে মিশনের রবিবাসরীয় অধিবেশন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী আসিলে অধিবেশন আরম্ভ হইল। স্বামী অখণ্ডানন্দ গীতা পাঠ করেন। স্বামীজী নিষ্কামধর্ম সম্বন্ধে কিয়ৎক্ষণ বলিলেন, পরে গান ধরিলেন। প্রায় রাত্রি ৯৷৷ টায় গৃহে ফিরি।

১৩০৮ সাল ৩০শে ভাদ্র রবিবার...হাঁটা পথে মঠে চলিলাম। স্বামীজীকে দেখিয়া প্রণাম করিলাম।

প্রায় ৬টায়……আমাদের ডাকালেন। খগেনবাবু ঐ সময়ের কায়স্থ ও বৈদ্য জাতি লইয়া গণ্ডগোল সম্বন্ধে কথা উঠাইলে স্বামীজী বলেন, 'জাত কি আর আছে? সাহেবদের গোলামি করছে, দুবেলা লাথি খাচ্ছে, আবার জাত কিসের! ম্লেচ্ছরাজ্যে বাস করলে তুষানল করতে হয় বা তপ্ত-ঘৃত পান করতে হয়, কর দেখি বাপু!'……

'আজকাল যে সাহেবদের লাথি দু-ঘা বেশী খায়, সে মনে করে, আমিই বামুন।…সব বর্ণ-সঙ্কর দাঁড়িয়ে গেছে।…কেবল মুখে—প্রভু, আমি দীনহীন—করলে কি হবে? মেথর-ডোমের সেবা কর, তাদের তামাক সাজ, তাদের পা টেপ।'

'বড় লোকের কথা শুনে ধর্মরাজ্যে কাজ করতে গেলেই সর্বনাশ। কাকে ডরাবি? ভয়ের মতো মহাপাপ আর নেই।'

ইহার পর স্বামীজীর সহিত আরও সাক্ষাৎ হইয়াছে, অসুস্থ শরীর, বেশী ঘাঁটানো হইত না। তাঁহাকে দেখিলেই আত্মহারা হইতাম। মনে কোন প্রশ্নও জাগিত না তাঁহার কথা আপনহারা হইয়া শুনিতাম।

এক রবিবার দক্ষিণেশ্বর হইয়া মঠে গিয়াছি। স্বামীজীকে প্রশ্ন করি, 'মহারাজ, মানুষের কর্তব্য কি?' তিনি বলিলেন, 'কিছু না করা।' আমরা বুঝিলাম না। তিনি কহিলেন, 'বুঝলি নে? মানুষের স্বভাব কিছু-না-কিছু না ক'রে থাকতেই পারে না। মানুষের কর্তব্য কিছু না করা, এই জ্ঞান যার হবে, সে নিষ্কাম কর্ম ভিন্ন, সঙ্কল্প ক'রে কোনও কাজ করবে না। ব্রহ্ম-পথে বিচরণ করবি, ব্রহ্ম-ধ্যানে থাকবি। এই মানুষের কর্তব্য।'

১৩০৯ সাল, ২১শে আষাঢ় শনিবার সকাল ১০টায় শুনিলাম স্বামীজী আর ইহধামে নাই। ……স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ ঘুচিয়াছে, কিন্তু এ জগৎ কখনও তাঁহাকে ভুলিতে পারিবে না। এ মহাজীবন চিরকাল ধর্মরাজ্যে পূজা পাইবে। চিরদিনই তাহা আদর্শরূপে জগতে বিরাজিত থাকিবে।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

স্বামীজীর কলেজের সহপাঠী ইংভাষায় সুপণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় কর্ম-জীবনে 'লাহোর ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকেও দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার দলের সহিত স্টীমারে গঙ্গা পার হইয়া নগেনবাবু দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে যান; এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণকে সমাধিস্থ অবস্থায় দর্শন করিবার সৌভাগ্যও তাঁহার হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধিলাভের সংবাদ পাইয়া নগেনবাবু তাঁহাকে দর্শন করিতে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে গিয়াছিলেন।

ইহার পর ১১ বৎসর অতীত হইলে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী লাহোরে নগেনবাবুর গৃহে অবস্থান করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে নগেনবাবু ও স্বামীজী কাশ্মীরে ঝিলাম নদীর বক্ষে পাশাপাশি দুইটি 'হাউস্ বোটে' কয়েকদিন অতিবাহিত করেন। কলিকাতা প্রত্যাবর্তনকালে স্বামীজী লাহোরে নগেনবাবুর গৃহে অল্প কয়েকদিন বিশ্রাম করেন। এই সময় স্বামীজী তাঁহার অকালে দেহত্যাগের পূর্বাভাস দিয়াছিলেন। স্বামীজীর সহিত নগেনবাবুর শেষ সাক্ষাৎ হয় ১৯০২ খৃষ্টাব্দে বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের দিন। ইহার কয়েক সপ্তাহ পরে যেরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, প্রায় সেই সময়েই স্বামীজী দেহত্যাগ করেন।

নগেনবাবুর সহিত স্বামীজীর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। স্বামীজী তাঁহার পরিব্রাজক-জীবনের বহু অভিজ্ঞতা নগেনবাবুকে বলিয়াছিলেন, নগেনবাবু তাঁহার স্মৃতিকথায় সেই সব বিস্ময়কর কাহিনী চিত্তাকর্ষক ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। স্বামীজীর অতুজ্জ্বল দেশপ্রেম, অদম্য সাহস, অসীম ধৈর্য ও উচ্চ আধ্যাত্মিকতা নগেনবাবুর তুলিকায় সুপরিস্ফুট।

নগেনবাবু তাঁহার স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন:

লাহোর স্টেশনে রেলগাড়ি প্রবেশ করিলে দেখিলাম—একজন ইংরেজ কর্নেল একটি প্রথম শ্রেণীর কামরা হইতে অবতরণ করিয়া সসম্ভ্রমে কোনও এক ব্যক্তির অবতরণের অপেক্ষায় কামরাটির দরজা খুলিয়া ধরিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সেই কামরা হইতে স্বামীজী নামিলেন। পরে জানিলাম—স্বামীজী কর্নেলকে চিনিতেন না, গাড়িতেই পরিচয়। কর্নেল বলেন, 'আমি ইংলণ্ডে স্বামীজীর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়েছি।'

ভারত হইতে ইতিপূর্বে অনেকে পাশ্চাত্যে প্রচারকার্যে গিয়াছিলেন। তাঁহারা উচ্চশিক্ষিত, বাগ্মী ও ধর্মবিশ্বাসী, কিন্তু পাশ্চাত্যবাসীর চিত্তে তাঁহারা কেহই স্বামীজীর ন্যায় স্থায়ী রেখাপাত করিতে পারেন নাই। তাঁহারা কমবেশী সকলেই পাশ্চাত্য সভ্যতায় প্রভাবিত এবং পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠতায় নিঃসংশয়। এমন সুরে তাঁহারা কথা বলিতেন, যাহা অনুনয়ভরা ও পাশ্চাত্যের উপর শ্রদ্ধাপূর্ণ। স্বামীজী কিন্তু অন্য সুরে কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'যে বাণী আমি বহন ক'রে এনেছি, তা পাশ্চাত্যের মঙ্গলের জন্য ও অস্তিত্বের জন্য একান্ত প্রয়োজন।'

স্বামীজী জাপানীদিগের দেশপ্রেমের খুব প্রশংসা করিতেন। তিনি বলিতেন, 'জাপানীদের কাছে দেশমাতৃকার স্থান সর্বোপরি। দেশের জন্য কোন কঠিন ত্যাগ স্বীকার করতেই তারা পশ্চাৎপদ নয়। দেশের সম্মান ও স্বাধীনতা তাদের প্রাণস্বরূপ।'

স্বামীজী অস্পৃশ্যতার বিরোধী ছিলেন। শুধু তাহাই নয়, তিনি যে-কোন অস্পৃশ্য জাতির আন্তরিক আতিথ্য সাদরে গ্রহণ করিতেন এবং এমন সব গৃহেও খাদ্যগ্রহণে কুণ্ঠিত হইতেন না, যাহাদিগকে স্পর্শ করা সমাজে অন্যায় বলিয়া গণ্য।

একবার আলমোড়াতে একজন ইংরেজ মহিলা হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে থাকিলে স্বামীজী তাঁহাকে বলেন, 'তোমরা ইংরেজরা আমাদের দেশ নিয়েছ, আমাদের স্বাধীনতা নিয়েছ। তোমরা আমাদের মাতৃভূমিতে আমাদিগকে ক্রীতদাসে পরিণত করেছ। আমাদের দেশের ধন ঐশ্বর্য সব কিছু লুটে নিচ্ছ। কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট না থেকে আমাদের একমাত্র সম্বল আমাদের ধর্মও নিতে চাও!'

স্বামীজীর চিন্তা ভবিষ্যৎ ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রতি নিবদ্ধ ছিল। তিনি দেশের জন্য ও জগতের জন্য নিঃশেষে সব দান করিয়াছেন। জগৎ তাঁহাকে সত্যদ্রষ্টা ও শান্তির দূত রূপে চিরকাল স্মরণ করিবে।

গুডউইন, ওলিবুল, ম্যাকলাউড—স্বামীজীর এই পাশ্চাত্য শিষ্যশিষ্যাদের সহিত নগেনবাবুর সাক্ষাৎ ও আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। ভগিনী নিবেদিতার সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়।

সমাপ্ত

ভ্রম-সংশোধন

১৩৭০ আশ্বিন সংখ্যায় ৪৯৯ পৃষ্ঠার শেষে '২৩শে অগস্ট' স্থলে ২৩শে অক্টোবর পড়িবেন।

১৩৭০ চৈত্র সংখ্যায় ১৩৮ পৃষ্ঠায় ২য় কলমের শেষ লাইনটি এইরূপ হইবে:

শেষ জীবন তিনি বাংলাদেশের বহরমপুরে অতিবাহিত করেন।

১৩৭১ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ৬২৯ পৃষ্ঠায় ২য় লাইনে '১৮৯০ খৃঃ' স্থলে '১৯০০ খৃঃ' হইবে।

ভারত-ভগিনী নিবেদিতা

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীতামসরঞ্জন রায়

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের প্রথম গুরু-সন্দর্শনের কথা বলছিলাম। ঠিক তার আটাশ বৎসর পূর্বে, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে, অক্টোবর মাসের ২৮শে তারিখে নিবেদিতার জন্ম হয়েছিল। আয়র্ল্যাণ্ডের যে-ক্ষুদ্র শহরটিতে তার জন্ম, ভৌগোলিক কিংবা ঐতিহাসিক কোন বিচারেই সে শহর বিখ্যাত ছিল না। কিন্তু যে নোবল-পরিবারে তার জন্ম, আয়র্ল্যাণ্ডের দীর্ঘ স্বাধীনতা-সংগ্রামের রক্তক্ষয়ী ইতিহাসে তার নামের উল্লেখ ছিল, মর্যাদা ছিল। একটি বৈপ্লবিক চিন্তা এবং কর্মধারা যেন সে বংশের রক্ত-প্রবাহের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছিল।

মাতামহীর নামানুসারে তার শৈশবে নাম-করণ হয়েছিল—মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। নোবলই পিতামাতার প্রথম সন্তান। মায়ের অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে তার জন্ম হয়। পিতা এবং পিতামহ উভয়েই স্বধর্মে আস্থাবান ছিলেন। প্রোটেস্ট্যাণ্ট শ্রেণীর ধর্মযাজকের কাজ বৃত্তি-রূপেই তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। অথচ, গভীর দেশপ্রেমেও তাঁরা অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং মাতৃভূমির স্বাধীনতা-আন্দোলনের বৈপ্লবিক কার্যকলাপেও তাঁদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল—পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ উভয় প্রকারে।

ফলে, একটি অকপট দেশাত্মবোধ এবং সহজাত ধর্ম-বিশ্বাসের দুর্লভ সংমিশ্রণেই নোবলের জীবনদর্শনের বুনিয়াদ গ্রথিত হয়েছিল। তাছাড়া, আরও একটি দৈবঘটনা এর পশ্চাতে ক্রিয়াশীল ছিল।

কথিত আছে, নোবলের জননী, মেরী হ্যামিলটন, প্রথম যৌবনে একদিকে যেমন একটি বংশ-গৌরব-সন্তান কামনায় উন্মুখ হয়েছিলেন, তেমনি বয়সের অল্পতাহেতু—সন্তান-সম্ভাবনায় শঙ্কিতও হয়েছিলেন।

মাধুর্য এবং ভীতি, আশা এবং শঙ্কা—দুই বিপরীত ভাবের সে এক মিশ্রিত, জটিল মনোভাবের প্রেরণায় ভগবানের কাছে সংগোপনে তিনি এই প্রার্থনা করেছিলেন যে, তাঁর প্রথম সন্তান নিরাপদে ভূমিষ্ঠ হলে ঈশ্বরের নামে, ঈশ্বরেরই সেবাকার্যে তিনি তাকে সমর্পণ করবেন, এককালে উৎসর্গ করে দেবেন।

জননীর সে প্রাক্-জন্মকালীন ঐকান্তিক নিবেদন মার্গারেটের জীবনে কত শোভন-সৌন্দর্যে, কত সর্বতোভদ্র মাধুর্য ও মহিমায় সার্থক হয়েছিল, কত বিচিত্র পথে ও সাধনায় তাকে ভারতবর্ষের নব-চেতনার বেদীমূলে উৎসর্গ করে দিয়েছিল, তার যথাযথ অনুশীলনই 'নিবেদিতার' অসামান্য চরিতকথার যথার্থ মূল্যায়ন।

মার্গারেটের শৈশবজীবন অতি-সচ্ছলতায় না হলেও, স্নেহ-যত্নের স্নিগ্ধতার মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছিল। বৃদ্ধা মাতামহীর গভীর স্নেহ-ভালবাসা তার শৈশবজীবনের এক অমূল্য সম্পদ ছিল। কিন্তু, মার্গারেটের মাত্র সাত বৎসর বয়সে সে স্নেহময়ী মাতামহীর মৃত্যু ঘটে। শোনা যায়, কিশোরী বালিকার জীবনে সে মৃত্যু একটি মর্মান্তিক আঘাত-স্বরূপ হয়েছিল এবং এও শোনা যায় যে জীবনের সুদীর্ঘকাল সে আঘাতের স্মৃতি মার্গারেটের অন্তরে জাগরূক ছিল।

মাতামহীর মৃত্যুর পর পিতার সঙ্গ ও সাহচর্যই মার্গারেট সমধিক লাভ করে। তারই প্রভাবে মার্গারেটের অন্তরে প্রগাঢ় একটি ধর্মবিশ্বাস জাগ্রত হয় এবং তাঁরই শিক্ষায় নিবিড় দেশপ্রেমেও সে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে।

মাত্র নয়-দশ বৎসর বয়ঃকালেই পিতার অনুবর্তিনী হয়ে মার্গারেটকে নিয়মিত ভাবে গীর্জায় যেতে দেখা যেত। গীর্জায় গমনকালে সে কিশোরী বালিকার মুখে ও ও পাদবিক্ষেপে এক অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য ফুটে উঠত। পিতার পাশে সমান তালে সে হেঁটে চলেছে। চোখের তারায় এক রহস্যময় স্বপ্ন-লোকের সন্ধান বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। মুখ-মণ্ডলে শৈশব-সারল্যের পূত কমনীয়তা, এ দৃশ্য মার্গারেটের কৈশোর জীবনের অনেকগুলি দিনের সঙ্গে যেন জড়িত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মার্গারেটের পিতাও দীর্ঘায়ু ছিলেন না। মাত্র চৌত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যে অবশ্য মার্গারেটের আরও দুইটি বোন এবং একটি ভাই জন্মগ্রহণ করেছে। সুতরাং পিতার মৃত্যুতে—মার্গারেট নোবল আর তার সদ্যোবিধবা জননী, মেরী হ্যামিলটন, তিনটি অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বালক-বালিকার হাত ধরে দুর্গম সংসার-পথে অনিশ্চিত যাত্রায় বের হয়েছিল। মার্গারেটের জীবনে জীবন-সংগ্রামের সেই সূত্রপাত। জীবন-জিজ্ঞাসারও সেই প্রকৃত সূচনা। অর্থ-কৃচ্ছ্রতার সঙ্কটময় কালেরও সেই আরম্ভ বলা যেতে পারে।···মার্গারেট তখন কিশোরী বালিকা, সুতরাং তার শিক্ষাজীবনের কথাও প্রসঙ্গতঃ এখানেই উল্লেখ করতে হয়।

হ্যালিফেক্সের একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রী মার্গারেট। মেধাবী ও উৎসাহী ছাত্রীরূপে মার্গারেটের বিশেষ খ্যাতি ও সমাদর ছিল সে বিদ্যায়তনে। প্রাণশক্তির যে প্রাচুর্য নানাকর্মে, নানাচিন্তা ও সাধনার খরস্রোতে প্রবাহিত হয়ে মার্গারেটের জীবন-মন্দাকিনীকে পরিপূর্ণ করেছিল উত্তরকালে, তারই বহুল প্রকাশ তদীয় বিদ্যার্থী-জীবনকেও বিবিধ প্রয়াসে সক্রিয় করে রেখেছিল। তাছাড়া, পরিবারের অর্থকৃচ্ছ্রতা এবং স্বদেশের বিবিধ সমস্যা সে-বয়সেই তার মধ্যে যেন একটি মৌনস্বাতন্ত্র্য জাগ্রত করেছিল।

তখন হ্যালিফেক্স বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ছিলেন মিস ল্যারেট। নিপুণ শিক্ষিকা হিসাবে মিস ল্যারেটের বিশেষ সুনাম ছিল। তাঁরও খ্যাতি ছিল একটি উচ্চ নীতিবোধের জন্য, ছাত্রীদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা এবং শুভ ইচ্ছার জন্য। মার্গারেটের শিক্ষা-জীবনে এই মনস্বিনী নারীর চরিত্র ও নিষ্ঠা তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। নিজ জন্মগত এবং বংশগত ধর্মানুরাগ এঁরই সাহচর্যে প্রভূত পরিমাণে প্রবুদ্ধ হয়েছিল। এঁরই দৃষ্টান্তে একটি প্রখর মর্যাদাবোধ এবং নীতিজ্ঞানও মার্গারেটের চরিত্রে বিশেষভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল।

ফলে, বিদ্যালয়ের নিয়মানুগ কেতাবী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তরুণী মার্গারেট ক্রমশঃ নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করেছিল। সে দৃষ্টিভঙ্গির স্বকীয়তা যেমন সুস্পষ্ট ছিল তার পশ্চাতে যুক্তি-বিন্যাসও তেমনি সুদৃঢ় ছিল। তবে, পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে কতকটা অপরিণিত কালেই মার্গারেটের শিক্ষাজীবন শেষ হয়েছিল। কারণ, পারিবারিক অর্থকৃচ্ছ্রতা তখন গুরুতর প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং হ্যালিফেক্সের বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করতে হয়েছিল।

প্রথমে কেস্ উইকের একটি বিদ্যালয়ে এবং পরে রাগ্‌বির সমাজ-কল্যাণ প্রতিষ্ঠানে তিনি

শিক্ষয়িত্রীর কাজ গ্রহণ করেছিলেন। দুঃখিনী বিধবা জননী আর ছোট ভাই-বোন দুটির ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বহুলাংশে তখন তাঁরই স্কন্ধে পড়েছে। কাজেই, জীবনের গতি তখন আর সহজ নয়, আরামপ্রদ তো নয়ই।···

বিগত শতাব্দীর শেষ দশকের কথা আমরা বলছি। ইউরোপের শিক্ষাক্ষেত্রে ফ্রোবেল, পেস্তালোৎসির প্রভাব তখন ক্রমবর্ধমান। শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে মানবশিশুর আবির্ভাব এবং প্রাধান্য তখন সূচিত হচ্ছে, স্বীকৃত হচ্ছে। পুঁথি নয়, পাঠক্রম নয়; শিক্ষক-শিক্ষিকা নয়—শিক্ষার মর্মবিন্দুতে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত থাকত শুধু একটি দেবতা—সে দেবতা শিশুদেবতা, নরদেবতা।···

রাজনীতি-ক্ষেত্রেও তখন চিন্তার মোড় ঘুরেছে। 'Greatest good for the greatest number'—এই তখন রাজনীতির লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠতে চাইছে। যুগে যুগে যারা বঞ্চিত হয়েছে, উপেক্ষিত হয়েছে, শোষিত হয়েছে, রাজনীতির পরিভাষায় 'হ্যাভ নট্‌স্' বলে যারা আখ্যাত—তখন তাদের স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার দাবি উঠেছে। কম্যুনিজম্, নিহিলিজম্ প্রভৃতি নানা সাম্যবাদের বিক্ষুব্ধ ঝটিকা তখন আসন্ন এক বিস্ফোরণের মুখে।

ধর্মের ক্ষেত্রেও সেই একই কালান্তরের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

'শোনরে মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।'···

গুরু নয়, পুরোহিত নয়, শাস্ত্র নয়, আপ্তবাক্যও নয়—মানুষ, মানুষ। অমৃতের পুত্র অমৃতময় যে মানুষ, ধর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে তারই প্রথম অধিকার। তারই জন্য মন্দির, মসজিদ ও ও গীর্জার আয়োজন। তারই জীবনজিজ্ঞাসার যথাযথ সমাধানকল্পে শাস্ত্রের প্রয়োজন, ধর্ম-সাধনা ও ধর্মোৎকর্ষের সার্থকতা।

'Ye, children of immortal bliss, Ye sinners! It is sin to call a man so'.—এই ছিল সেদিনের ধর্মজগতের পুরাতন বাণীর নবতম ঘোষণা।···এরই মধ্যে তরুণী মার্গারেট এক স্বপ্ন-জড়িত দৃষ্টি নিয়ে শিক্ষাব্রতীরূপে শিক্ষা-জগতে প্রবেশ করেছিল। বায়ু ছিল অনুকূল, ক্ষেত্রটিও ছিল অতি উর্বর। ফলে, ফ্রোবেল এবং পেস্তালোৎসির চিন্তাধারা অতি প্রবলভাবে মার্গারেটকে আকর্ষণ করেছিল। অফুরন্ত আশা এবং আগ্রহ নিয়ে শিশুমনোরাজ্যের অনাবিষ্কৃত ভূমিতে যাত্রা শুরু করেছিল মার্গারেট! কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই অপরের পরিচালনাধীন বিদ্যালয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করবার নানা অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে—উইম্বলডনে, 'রাস্কিন স্কুল' নামে একটি নিজস্ব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তাকে স্থাপন করতে হয়েছিল। উত্তরজীবনে, অব্ধি-পারের এক দূর অপরিচিত দেশে, প্রতিকূল পরিবেশে শিক্ষাপ্রসারের যে মহাব্রত তাকে গ্রহণ করতে হবে এবং যার সার্থক উদ্‌যাপন-কল্পে নিজের সমগ্র জীবনখানি অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করবার মহা-নির্দেশ তখনও অদৃশ্য নিয়তির হস্তে তার জন্য অপেক্ষমাণ—উইম্বলডনের 'রাস্কিন স্কুল' যেন তারি এক প্রস্তুতি-পর্বের মত। কারণ, এ বিদ্যালয়-স্থাপনের অল্পকাল পরেই লণ্ডন মহা-নগরীতে উপস্থিত হয়েছিল মার্গারেট—স্থায়িভাবে বসবাস করবার উদ্দেশ্য নিয়ে এবং দৈব নির্দেশে সেখানেই ধীরে ধীরে তার বিচিত্র নবজন্মের সূত্রপাত হয়।

এই লণ্ডনবাসের অল্পদিন মধ্যেই তত্রত্য বিদগ্ধসমাজের বহু ব্যক্তির সঙ্গে তার সংযোগ হয়েছিল। একালেই লেডী রিপণের সঙ্গে তার পরিচয় হয়, পরিচয় হয় নির্বাসিত রুশ-বিপ্লবী

পিটার ক্রোপোট্কিনের সঙ্গে। আবার একালেই, পরিচয় ঘটে লেডী ইসাবেল মার্গসনের সঙ্গে, ফ্রোবেল-শিষ্যা মিসেস ডি-লীউর সঙ্গে।

মার্গারেটের মৌলিক চিন্তার সাক্ষ্য বহন করে নানা প্রবন্ধ এবং রচনাও একালেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। আবার এ সকল ঘটনা-প্রবাহের মধ্যে একসময় মার্গারেটের এক বিবাহ-প্রস্তাবও কতকটা অগ্রসর হয়েছিল বলে শোনা যায়। কিন্তু পাত্রের আকস্মিক মৃত্যুতে অতি অপরিণত অবস্থাতেই সে প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়, এবং অপর কোনও প্রস্তাব আর কখনও উত্থিত হয়নি।

তাই মার্গারেট চির-কুমারী, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মানস-কন্যা ব্রহ্মচারিণী নিবেদিতা। সে যাই হোক—

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝিকালে, অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম দর্শন লাভের অব্যবহিত পূর্বে, মার্গারেটের জীবনে শিক্ষা, ধর্ম এবং দেশপ্রেম যেন ত্রিধারায় সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। আর তাদের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে অসংখ্য জটিল প্রশ্ন ও সমস্যা যেন সহস্রফণা বিস্তার করেছিল। সম্মুখের পথরেখা হয়ে উঠেছিল বঙ্কিম, জীবনের সার্থকতা কোন্ পথে তাও যেন দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। জীবনের অপরিসর ক্ষেত্রে আদর্শ ও বাস্তব, ইহকাল এবং পরকাল—যদি পরকাল বলে সত্যি কিছু থাকে, শোভন-সামঞ্জস্যে কি সার্থক হবে? যদি হয়, তবে তাঁর উপায় কি? পন্থা কোথায়? —এই ছিল সমস্যা।

শিক্ষকতায় অন্তরের পিপাসা মেটে না, ধর্মকথা অগভীর এবং অবাস্তব মনে হয়। কোনটির পশ্চাতেই যেন শাশ্বত জীবনের কোন আশ্বাস নেই, প্রেরণা নেই অমৃতত্ব-লাভের। দেশের স্বাধীনতা অবশ্য চাই, সেটি নিঃসন্দেহে এক কাম্য সামগ্রী, কিন্তু নিজ জীবনের দূর-বিসর্পিত যে স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হতে চায়, যে বিশেষ সংস্কার অভিব্যক্তির আকাঙ্ক্ষায় মাথা খুঁড়ে মরে, তাদের সফলতা আসবে কোন্ পথ দিয়ে? —এই সব দুরূহ জিজ্ঞাসার নাগরদোলায় মার্গারেটের চিত্ত তখন নিরতিশয় আন্দোলিত, এবং তাদের আশু-নিরসনের জন্য উৎকণ্ঠা এবং ব্যাকুলতাও কম দুর্বার নয়। মনোজগতের সেই সঙ্কট মুহূর্তের মধ্যেই স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে মার্গারেটের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল,—যার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি।...

শ্রীশ্রীমা অনেক সময় বলতেন,—মানুষের জীবনে কখনো কখনো সুদুর্লভ এক একটি ক্ষণ বা মুহূর্ত দৈবানুগ্রহে উপস্থিত হয়ে থাকে; তখন—

'যা না-হয় ধনে জনে,
তাই হয় ক্ষণের গুণে।'

মার্গারেটের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। সেই দুর্লভ ক্ষণটিতে, সেই একান্ত শুভ-মুহূর্তটিতে এক অপ্রত্যাশিত নবজন্মের সূচনা হয়েছিল তার

* * * *

পুরাকালে ভারতের মাটিতে কিশোর বিদ্যার্থীদল দীক্ষা ও শিক্ষা লাভের বিনম্র আকুতি নিয়ে গুরুগৃহে গমন করত।—গমন করত শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে, সমিধপাণি হয়ে। অন্তরে প্রার্থনা থাকত,—'হে গুরু, আমাদের মন্ত্র দাও, শিক্ষা দাও—নবজন্ম দান কর। দ্বিজত্ব-লাভে আমরা ধন্য হব, সার্থক হব, তার পথ নির্দেশ করে দাও।'

সে-কালে এই ছিল শিক্ষারম্ভ, এই ছিল উপনয়ন।

স্বামী বিবেকানন্দ এবং মার্গারেট নোবলের প্রথম সাক্ষাতের মহেন্দ্র-লগ্নটিও অনুরূপ একটি

উপনয়নের কাল ছিল। মার্গারেটের অন্তরের অনুচ্চারিত প্রার্থনাও ছিল একই ধরনের।—

'আমাকে দীক্ষা দাও। হে আচার্য, আমার সংশয় দূর করে আমাকে নবজন্ম দান কর।' তবে, দেশ ও কালের বিচিত্র পরিপ্রেক্ষিতে সে প্রার্থনার সঙ্গে দ্বিধা-সন্দেহও যথেষ্ট জড়িত ছিল এবং সংশয়ও কম ছিল না। তাছাড়া, সেদিনের স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর উক্তিসমূহই কি মার্গারেটের কাছে খুব সহজবোধ্য কিংবা সুস্পষ্ট ছিল? না, তাও ছিল না। উত্তরজীবনে, এই প্রথম সাক্ষাতের সংশয়-সঙ্কোচের কথায়ই নিবেদিতা লিখেছিলেন,—

'যে সুরতরঙ্গ যত গভীর, তার প্রভাবও মানুষের অন্তররাজ্যে তত ধীরে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। সেজন্য, যথাযথ কালের অবকাশ চাই, প্রচুর উৎকর্ষ চাই। মদীয় আচার্যদেবের মুখ থেকে যে-সকল বাণী বিচিত্র ধ্বনি-মাধুর্যে নিঃসৃত হয়েছিল সেই আমার প্রথম দর্শনের দিনটিতে—সেগুলি সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। আজ দীর্ঘকালান্তরে সেদিনের কথা যখন চিন্তা করি, তখন স্বতই মনে হয়—স্বামীজীর উক্তিসমূহের নিহিতার্থ সেদিন আমি ধরতে পারিনি, উপলব্ধি করতে সক্ষম হইনি।' উদাহরণ উদ্ধৃত করে বলেছিলেন—

সেদিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী যখন বলেছিলেন, —'The Universe is like a cobweb and minds are spiders; for mind is one as well as many.'—তখন সে উক্তির তাৎপর্য আমার বুদ্ধির অগম্য ছিল, আমার উপলব্ধি-ক্ষমতার বাইরের বস্তু ছিল।

তাছাড়া, সেদিন, আর শুধু সেদিনই বা কেন, পরবর্তীকালের অনেকদিন পর্যন্ত—আমার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এমন কিছু মিশ্রিত ছিল যার জন্য তাঁর কথার যথাযথ মূল্যায়ন আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। আমি সাগ্রহে শ্রবণ করেছি, লিখতে চেয়েছি, কিন্তু অন্তরের মণিকোঠায় বিশ্বাসের সঙ্গে তাদের গ্রহণ করতে সক্ষম হইনি।

'I noted what he said, was interested in it, but could not pass any judgment upon it, much less accept it.

And this statement describes more or less accurately the whole of my relation to his system of teaching even in the following year, when I had listened to a season's lecture; even perhaps, on the day when I landed in India.'...

প্রথম দর্শনের এই ছিল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। একদিকে দ্বিধা ও সংশয়ের দ্বন্দ্ব, অপরদিকে এক বিচিত্র অনুভূতির নব উন্মাদনা। একদিকে অস্পষ্ট রহস্যের দুর্জ্ঞেয়তা আর অপরদিকে উদয়শিখরে আলোকশিশুর প্রথম আবির্ভাবের মত এক উদার মহা-আবির্ভাব। দুইটির মিশ্রণে মার্গারেটের জীবনযাত্রায় এক বিরাট বিপ্লবের অপ্রত্যাশিত সূচনা।

জীবনদেবতার সে যেন এক অলঙ্ঘ্য নির্দেশ, —এক অনিবার্য আহ্বান;—বন্দরের বন্ধনকাল এবারের মত শেষ হয়েছে। মহা-সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ তোমার জন্য অপেক্ষমাণ। নূতন দেশে চল, নূতন অভিযানে ব্রতী হও।...

কারণ,

চরৈবেতি, চরৈবেতি,
চরৈবেতি।

চলাই হল অমৃতত্ব-লাভ, চলাই তার স্বাদু অমৃতফল। সূর্য চলেছে, নিজ কক্ষপথে নিরবধি কাল ধরে চলেছে, কখনো থামেনি, কখনো বিশ্রাম করেনি। তাই তো এত আলো, এত ঔজ্জ্বল্যের সমারোহ।...

অতএব, তুমিও চল, এগিয়ে চল।

* * *

এ দর্শনের পর কয়েকটি মাসের একটি সংক্ষিপ্ত বিরতি আছে। সে বিরতির পর স্বামীজীর সঙ্গে তার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ ঘটে, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। তার ফল পরে বলছি।…কিন্তু এ বৎসরেরই শেষভাগে, রোমের পথে, প্রথমবারে পাশ্চাত্যদেশ পরিক্রমা সমাপ্ত করে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে ফিরে এসেছিলেন।…এবং ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাসের এক পরিচ্ছন্ন, শীতস্নিগ্ধ প্রত্যূষে কলম্বো বন্দরে তিনি পদার্পণ করেছিলেন। আর তারও ঠিক এক বৎসর পরে 'বহুজনহিতায়, বহুজন-সুখায়'—আত্মনিবেদন করবার সঙ্কল্প নিয়ে, স্বামীজীর জন্মভূমি, 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' বলে যার বন্দনা তাঁর মুখে নিত্য উচ্ছ্বসিত ছিল, সেই ভারতমাতার সেবাকল্পে নিজেকে নিবেদন করবার দুশ্চর ব্রত গ্রহণ করে মার্গারেটও এসেছিল ভারতবর্ষে। সেও গুরুরই নির্দেশ।

একদিন জনৈক অনুরাগী পাশ্চাত্য শিষ্যা স্বামীজীকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল।… অপ্রত্যাশিত না হলেও প্রশ্নটির মধ্যে যে ভক্তি ও প্রেমের নিবিড়তা ছিল সেটিই প্রসন্ন করেছিল স্বামীজীকে।—

'How best can we serve you, Swamiji?'—এই ছিল জিজ্ঞাসা। আর উত্তর ছিল,—'অন্য কিছু নয়। শুধু ভারতবর্ষকে তোমরা ভালবাস, তাকে সেবা কর—Love India, serve India. তবেই আমার সেবা হবে, আমি সম্যক্ পরিতৃপ্ত হব।'

মহাপ্রাণ ভাবীগুরুর সে আহ্বানই ঘরছাড়া করেছিল মার্গারেটকে। সে অন্তর-কামনাই ধ্যানে ও কর্মে, তপস্যায় ও উৎকর্ষে সার্থকতা-লাভের পথ খুঁজেছিল, এবং তার চিহ্ন-অনুসরণেই মার্গারেটের ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রাশুরু, ভারতের মাটিতে তার প্রথম পাদ-বিক্ষেপ। যেমন,—

'নিঃশব্দ চরণে উষা নিখিলের সুপ্তির দুয়ারে
দাঁড়ায় একাকী,
রক্ত-অবগুণ্ঠনের অন্তরালে নাম ধরি কারে
চলে যায় ডাকি।
অমনি প্রভাত তার বীণা হাতে বাহিরিয়া আসে,
শূন্য ভরে গানে,
ঐশ্বর্য ছড়ায়ে দেয় মুক্ত-হস্তে আকাশে আকাশে—
ক্লান্তি নাহি জানে।'…

তেমনি এক নিঃশব্দ, গম্ভীর, অক্লান্ত জীবন-যাত্রার সেই ছিল সূত্রপাত। কিন্তু সে-কথাও এখন থাক।

দৈবীশিল্পী বিবেকানন্দ

ব্রহ্মচারী গৌরাঙ্গ

ধর্মোপদেষ্টা বলেন, 'জগৎ ত্যাগ করে উচ্চস্তরে মন নিয়ে চল। সব ত্যাগ করে ব্রহ্মচিন্তা কর।' আর কবি বলেন, 'সংসারের ভিতর থাক। সংসারের প্রত্যেক কর্মের ভিতর সত্য-শিব-সুন্দরের ব্যঞ্জনা দেখতে চেষ্টা কর।' স্বামী বিবেকানন্দ এই উভয় দলের দলী এবং সেতু-স্বরূপ।

তাই আমরা দেখি স্বামী বিবেকানন্দ অতীন্দ্রিয় রাজ্যের অধিকারী হয়েও সাধারণ মানবের দৈনন্দিন ব্যবহারিক সত্তাকে অস্বীকার করেননি। এ জগতের ছোটবড় সকল বস্তুকে তিনি ব্রহ্মের অর্থাৎ চৈতন্যের শুধু দ্যোতকরূপেই নহে, প্রকাশরূপেও দেখেছেন এবং দৈনন্দিন জীবন অবলম্বনে অতিলৌকিক সত্যে পৌঁছিবার পথ নির্দেশ করেছেন। তিনি ছিলেন দৈবী শিল্পী। অব্যক্তকে ভাবের মাধ্যমে ব্যক্ত করার মধ্যে রয়েছে শিল্পের উৎকর্ষ। আর এই অব্যক্ত-কে মানুষ প্রকাশ করেছে লেখনীতে, তুলিতে, সংগীতে, স্থাপত্যে—বিভিন্নভাবে, বিভিন্নরূপে। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন যদিও আধ্যাত্মিকতার মূলসুরে বাঁধা ছিল, তথাপি তিনি ছিলেন শিল্পী ও যোগীর সমন্বয়-মূর্তি। তাঁর জীবনের বিভিন্নমুখী প্রতিভার পরতে পরতে ফুটে উঠেছিল অতি-লৌকিক চৈতন্যের বা শক্তির লীলাবিলাস এবং উহাই হচ্ছে প্রাণবন্ত শিল্পের কষ্টিপাথর।

সংগীতে তিনি ছিলেন অদ্ভুত কুশলী। শুধু ভারতীয় সংগীতে নয়, পাশ্চাত্য সংগীতে বিশেষতঃ ফরাসী সংগীতে তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। পাশ্চাত্যের বহু মনীষী তাঁর সুরের সঙ্গে বিঠো-ভেনের সুরের তুলনা করেছেন। একজন উচ্চদরের সংগীতজ্ঞ লিখেছেন, "When the Swami sang, the melodiousness of his voice, harmonising with the out-pouring of his innermost spirit, so powerfully enchanted his hearers, that they were transported, as it were, for the time being, into a higher sphere." মিস্ ম্যাকলাউড বলতেন, "স্বামীজীর কণ্ঠস্বর ছিল ভায়লনসেলো বাদ্যযন্ত্রের মতো; আর বিখ্যাত ফরাসী গায়িকা এমা ক্যালভে বলতেন, "তাঁহার (স্বামীজীর) গলার সুর ছিল চীনাগঙের আওয়াজের মতো—আর উহা কর্ণভেদ করিয়া আত্মা পর্যন্ত পৌঁছাইত।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "নরেন্দ্র গাইতে বাজাতে সব তাতেই ভাল।" তাই আমরা দেখি তাঁর সংগীতের এক কলি শুনেই তাঁর পরমশ্রদ্ধাস্পদ গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিতে মগ্ন হয়ে যেতেন। স্বামীজী কখন কখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা আহার-নিদ্রা ভুলে গিয়ে একটা তানপুরা নিয়ে রেওয়াজের নেশায় মগ্ন হয়ে যেতেন। সেই জগৎজয়ী সন্ন্যাসী যখন 'ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি। গায়ত্রি ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্ম-যোনি নমোঽস্তু তে॥" এই দুই লাইন বিভোর হয়ে গাইতেন তখন তাঁর স্ফীতবক্ষে রক্তিমাভা দেখা দিত আর সমগ্র রজনী অলক্ষ্যে পোহায়ে যেত। যদিও পাশ্চাত্যে এবং প্রাচ্যে ক্রমাগত বক্তৃতার ফলে তাঁর স্বর ক্রমশঃ পড়ে গিয়েছিল, তবুও তাঁর সংগীতের গভীরতা ও মিষ্টতা শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে। তিনি কণ্ঠসংগীতে যেমন, যন্ত্রসংগীতেও তেমনি দক্ষ ছিলেন। তিনি তাঁর এক গুরুভাইকে 'রামধন দাদা ছোলা খায়'

এই বোলের সাহায্যে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে তবলা বাজনা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। যৌবনে তিনি যখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত, তখন তিনি একজন দরিদ্র মুদ্রাকরকে তাঁর সহস্র-সংগীতের একখানি বই-এর সম্পাদনায় দীর্ঘ প্রস্তাবনা লিখে সাহায্য করেছিলেন। তিনি এক সময়ে বলেছিলেন, 'কেউ যদি প্রকৃতির একতানতা উপলব্ধি করতে না পারে তবে কি করে সে ভগবানকে উপলব্ধি করবে—যিনি মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যের সমষ্টি?' ...যিনি প্রথম জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে বৃন্দাবনের গোপীলীলা শুনতে চাইতেন না, তিনিই আবার শেষ জীবনে জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ', ওমরখৈয়ামের অনেক সংগীতের প্রশংসা করতেন। তিনি তাঁর গোটা জীবনের তপস্যার দ্বারা জেনেছিলেন, 'প্রেম, প্রেম—এই মাত্র ধন,' এবং এই জাগতিক ভালবাসা সেই ভগবৎপ্রেমের অংশমাত্র। তিনি আর একসময় বলেছিলেন, 'জেনে রেখ, আমি কোন ব্যক্তিকে একটা খড়কুটা দিতেও রাজী নই—যে কোন প্রেম-সংগীত আস্বাদে সক্ষম নয়।' তিনি একদিন ঐশ্বরিক প্রেম বোঝাতে গিয়ে উদাহরণস্বরূপ একটা পারস্য কবিতা উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, 'আমার প্রিয়তমের মুখের একটি আঁচিলের পরিবর্তে আমি সমরখণ্ডের সমস্ত ঐশ্বর্য বিলিয়ে দিতেও প্রস্তুত।'

বহুমুখী প্রতিভা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনকে মহিমান্বিত করে তুলেছে। সংগীতে, বক্তৃতায়, কবিতায় এবং সামান্য হাসিঠাট্টার ভিতরেও ফুটে উঠেছে শিল্পবোধ, একটি ভাবের স্ফুরণ। অদ্বৈত বেদান্তের মত কঠিন নীরস বস্তুকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন সোজা সরল ভাষায়। তিনি আমেরিকা থেকে তাঁর এক শিষ্যকে লিখেছেন, 'সূক্ষ্ম অদ্বৈত তত্ত্বকে প্রাত্যহিক জীবনের উপযোগী জীবন্ত ও কবিত্বময় করতে হবে; অসম্ভবরূপ জটিল পৌরাণিক তত্ত্বসকলের মধ্য থেকে জীবন্ত প্রকৃত চরিত্রের দৃষ্টান্তসকল বের করতে হবে; আর বিভ্রান্তিকর যোগশাস্ত্রের মধ্য থেকে বৈজ্ঞানিক ও কার্যে পরিণত করবার উপযোগী মনস্তত্ত্ব বের করতে হবে, আবার এগুলিকে এমন ভাবে প্রকাশ করতে হবে যাতে একটি শিশুও বুঝতে পারে। এই আমার জীবনব্রত।' ইহা সেই আদর্শ আচার্যের নিখুঁত কল্পনা নয়;—ইহা প্রমাণিত দর্শন এবং ইহাতে শুধু তাঁর প্রতিভাই ফোটেনি, ফুটে উঠেছে তাঁর তুলনাহীন দৈবীশক্তি।

স্বামীজীর কবিতার ভাব বড়ই গভীর, বড়ই মধুর। তিনি জানতেন ভগবান মহাকবি, সুপ্রাচীন কবি। বিশ্ব তাঁর কাব্য; ছন্দ ও মিলে তার উৎপত্তি, অসীম আনন্দের মধ্যে তা রচিত। পরিব্রাজক জীবনে তিনি একদিন সিন্ধুতটে জীবন-সংগীতের মূল তান শুনেছিলেন—যে সুর কয়েক শতাব্দী পূর্বে আচার্য শংকরের মনকে আন্দোলিত করেছিল। তিনি তন্ময় হয়ে শুনেছিলেন সেই বৈদিক ঋষির বেদগান। তাঁর কবিতা 'মৃত্যুরূপা মাতা'র সঙ্গে বরাভয়করা মাতার, অনন্তের সঙ্গে সান্তের এবং মহাশক্তির সঙ্গে মহানম্রতার যোগসূত্র। সাধারণ মানুষের কল্পনার অগম্য স্থানে বিচরণ করতে করতে একদিন এক শিষ্যকে তিনি বলেছিলেন, 'তুমি দেখছ না, সর্বোপরি আমি একজন কবি।' তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে কবিতা ও শিল্পের পিছনে রয়েছে আধ্যাত্মিকতা। এ জগতে শিল্পী হলেন সৌন্দর্যের স্রষ্টা এবং শিল্পই জগতে আনন্দের সর্বাপেক্ষা স্বল্প সীমাবদ্ধ রূপ। তিনি ব্যক্ত করেছিলেন, "সে লোক কখনই ধার্মিক হতে পারে না যে কি না শিল্পের সৌন্দর্য ও মহিমা বুঝতে অক্ষম।"

ভারতীয় ধর্ম ও শিল্প একই সুরে গাঁথা।

ধর্ম ও শিল্প সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের ধারণা—উহারা পৃথক বস্তু। তাই স্বামীজী একদিন মন্তব্য করেছিলেন যে ভারতের সত্যিকারের ইতিহাস যেদিন উদ্ঘাটিত হবে সেদিন দেখা যাবে ভারত যেরূপ আধ্যাত্মিক রাজ্যের অগ্রদূত, সেইরূপ শিল্পরাজ্যেও। শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অপূর্ব ভাগবত জীবনে তিনি দেখেছিলেন উচ্চতম শিল্পের অভিব্যক্তি। ইতিহাসের ছাত্র হয়ে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে কোন দেশের ধর্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশের কলা, বিজ্ঞান ও সাহিত্যেরও বিকাশ ঘটেছে। যেমন বুদ্ধের সঙ্গে উহার উন্নত স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, চৈতন্যের সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন ও কবিত্ব। তিনি সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করবার সময় সকল দেশের শিল্পের অবনতি অর্থাৎ মৌলিকত্বের অভাব দেখে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি ভারতীয় শিল্পের উন্নতির উপায় প্রসঙ্গে একজন শিল্পী অধ্যাপককে অনেক কিছু বলার পর সেই গুণীব্যক্তি বলেছিলেন, "আপনার নিকটে কিছুকাল শিল্পকলাবিদ্যা শিখতে পারলে আমার বাস্তবিক উন্নতি হতে পারত।"

শিল্প-সমালোচনায় তাঁর অশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের শিল্প-মহামেলায় তিনি একখানি পাথরের অপূর্ব খোদাই দেখেছিলেন। মূর্তিটি এইরূপ: দুইটি মূর্তি—একটি নর অপরটি নারী। মানুষটি একজন স্থপতিবিদ্ বা শিল্পী। সে তার ডান হাতে যন্ত্রপাতি সমেত উহা নারীর পায়ের কাছে রেখেছে আর বাঁ হাতে তার অবগুণ্ঠন মোচন করে দিচ্ছে; শিল্পীর মুখ জ্বলজ্বল করছে। মূর্তিটির পরিচায়ক হিসাবে নীচে লেখা ছিল: Art et Nature. স্বামীজী বলেছিলেন, উহা হওয়া উচিত: Art unveiling Nature অর্থাৎ শিল্প কেমন করে প্রকৃতির নিবিড়াবগুণ্ঠন স্বহস্তে মোচন করে ভিতরের রূপ ও সৌন্দর্য দেখে। মূর্তিটি এমনভাবে তৈরী করেছে যেন প্রকৃতিদেবীর রূপচ্ছবি এখনও স্পষ্ট বেরোয়নি; যতটুকু বেরিয়েছে ততটুকু সৌন্দর্য দেখেই শিল্পী যেন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে।

ইংরেজদের শিল্পের প্রতি স্বামীজীর একটা ভাল ধারণা ছিল। কারণ তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে উহাদের দৈনন্দিন জীবনে শিল্পের ব্যবহার এশিয়াবাসীদের সংস্পর্শে আসার ফলে সম্ভব হয়েছে। ইংলণ্ডে প্রফেসর ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে আলোচনাকালে তিনি গ্রীকশিল্পের উপর ভারতীয় শিল্পের অসামান্য প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন। বর্তমানকালের বহু শিল্পী-মনীষী শিল্পজগতে স্বামীজীর মৌলিক জ্ঞান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বীকার করেন।

শিল্পীর জীবন শিল্পময়। তাঁদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজকর্মের ভিতরেও শিল্পবোধ অব্যাহত থাকে। স্বামী বিবেকানন্দের মহান জীবন-নাটকের প্রকাশিত দৃশ্যগুলি থেকে নেপথ্যের কুহেলিঘেরা দৃশ্যগুলি পর্যন্ত—সেই সত্যম্-শিবম্-সুন্দরম্-এর অভিব্যক্তিতে ভরপুর। আচার্য বিবেকানন্দ, দৈবীবক্তা বিবেকানন্দকে যখন আমরা আমেরিকার রন্ধনশালায় ভারতীয় মশলার মোড়ক খুলে রন্ধনকলা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলাপ-আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে উহার বাস্তব রূপায়ণে ব্যস্ত দেখি, তখন আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে ইনি একজন Out and Out শিল্পী। আদর্শ লোকশিক্ষক বিবেকানন্দের দেশোপযোগী শিক্ষার কি সুন্দর অভিব্যক্তি: হিন্দুরা বিগ্রহধারী দেবতার উদ্দেশ্যে সমস্ত আহার্য বস্তু নিবেদন করে অথবা মনে মনে হৃদয়স্থিত দেবতাকে স্মরণ করে নিবেদন করে এবং তারপর প্রসাদভাবে উহা গ্রহণ করে।

সুতরাং এই সামান্য রন্ধনক্রিয়াকেও ভারতীয়েরা ধর্মের সঙ্গে বিজড়িত করে পবিত্র করে নিয়েছে, স্বামীজীর হাসি-ঠাট্টা এমনকি গালাগালিগুলি পর্যন্ত বেশ একটা ভাবময় এবং সুকুমার বৃত্তিগুলির দ্বারা পরিপুষ্ট।

এক নজরে আমরা পৃথিবীর শিল্পকে এই ভাবে দেখতে পারি:—প্রাচীন মিশরীয় শিল্প ঝোঁক দিয়েছে স্থায়িত্বের দিকে, যেমন পিরামিড; রোমক শিল্পে শরীর-বিজ্ঞান ও বাহ্য সৌন্দর্যের জ্ঞান প্রকাশ পেয়েছে; আসিরীয় শিল্প রূপায়িত করেছে দৈহিক শক্তিকে; জাপান ও চীনের শিল্পী প্রাকৃতিক দৃশ্যকে প্রাণবন্ত করেছেন—আর ভারতীয় শিল্প অরূপকে অপরূপ রূপ দিয়েছে, পারমার্থিক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সত্যম্-শিবম্-সুন্দরম্-কে ফুটিয়ে তুলেছে ধ্যান বা অন্তর্মুখী ভাবের ভিতর দিয়ে। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের এই সনাতন শিল্পকলাকে বেশ একটু গতিময় এবং প্রাণবন্ত করে তুলেছেন তাঁর ব্যক্তিত্ব, সৌন্দর্যবোধ এবং আধ্যাত্মিকতার দ্বারা।

স্বামীজীর জীবন ছিল অতীন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতায় ভরপুর। শুধু এই কারণেই তাঁর গানে, দর্শনে, কবিতায়, শিল্পকলায়, বক্তৃতায় ফুটে উঠেছে চৈতন্যের বিকাশ। তাঁর হৃদয়-তন্ত্রীতে একটি গীত ভেসে উঠেছিল—যা তিনি এভাবে প্রকাশ করেছেন:

'আমি আদি কবি,
মম শক্তি বিকাশ রচনা
জড় জীব আদি যত
আমি করি খেলা শক্তিরূপা মম মায়া-সনে
একা আমি হই বহু দেখিতে আপন রূপ।'

'কুলায়ে ফিরিছে পাখি'

শ্রীব্যোমকেশ মাইতি

কুলায়ে ফিরিছে পাখি
ক্লান্ত পাখা শূন্যে মেলি
　　শ্রান্তিনত আঁখি।

স্বপ্ন গেছে টুটি:
অগ্নিঝরা খরতাপে ম্লান পুষ্পকলি;
দিগন্ত-প্রসারী
কামনার রৌদ্রতপ্ত নীল মরুভূমি,
নাহি মিলে এক বিন্দু তৃষ্ণাহরা বারি

বেদনার গীত গাহি
দিনান্তে ফিরিছে পাখি
হে অমৃত, তোমারেই খুঁজি।

বাহিরে তোমারে খোঁজা
　　গেছে তার থামি,
জেনেছে সে আছ তুমি
আপন কুলায়ে তার—আপন অন্তরে—
　　হে অন্তরযামী!

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ স্মরণে

শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল

"সরল না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। নিরঞ্জন কেমন সরল।" —শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ লীলাপার্ষদ ঈশ্বরকোটী স্বামী নিরঞ্জনানন্দ। ঠাকুর বলেছিলেন, তিনি রামচন্দ্রের অংশে অবতীর্ণ হয়েছেন। সুন্দর, সুঠাম, সরল শিশু; তীর-ধনু, অস্ত্র নিয়েই তাঁর প্রিয় খেলা।

২৪ পরগণা জেলায় বারাসত মহকুমার রাজারহাট-বিষ্ণুপুর গ্রামে ঘোষ-বাড়ীতে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে শ্রাবণ-পূর্ণিমা দিবসে হয়েছিল এই বীর-সন্ন্যাসীর আবির্ভাব। পূর্ব নাম ছিল নিত্যনিরঞ্জন, পিতার নাম ৺অম্বিকাচরণ ঘোষ। বারাসত-নিবাসী পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় ছিলেন তাঁর মাতুল। রাজারহাট-বিষ্ণুপুরের এই ডানপিটে ছেলেটির কথা বলতে তাঁর বুকখানা গর্বে দশহাত উঁচু হয়ে উঠতো।

যৌবনের মুখে নিত্যনিরঞ্জনের আকৃতি ছিল সুদীর্ঘ, বলিষ্ঠ—প্রকৃতি নির্ভীক ও বীরসুলভ। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময় অল্পক্ষণের মধ্যেই আলাপ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো—যেন কতকালের পরিচয়। ঠাকুর বললেন, 'দ্যাখ, তুই যদি সংসারী লোকের নিরানব্বইটি উপকার করিস, আর একটা অপকার করিস, তবে তারা তোকে আর দেখতে পারবে না। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে যদি তুই নিরানব্বইটি অপরাধ করিস, আর একটা তাঁর প্রীতির কাজ করিস, তাহলে তিনি তোর সব অপরাধ মার্জনা করবেন। মানুষের ভালবাসা আর ভগবানের ভালবাসায় এত তফাত জানবি।'

অন্তরে এক অলৌকিক দিব্য স্পর্শ নিয়ে নিরঞ্জন বাড়ী ফিরে এলেন। ঠাকুরের অমোঘ আকর্ষণে দু'দিন পরেই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে দ্বারপ্রান্তে পৌছতেই ঠাকুরের আকুল আহ্বান, 'ওরে নিরঞ্জন, দিন যে যায় রে—তুই ভগবান-লাভ করবি কবে?' এ আতি কেন? কেন এই অহেতুকী কৃপা? যুগে যুগে অবতার-পুরুষ এবং তাঁদের পার্ষদদের অপূর্ব লীলাক্ষেত্রে আমরা পাই এই প্রশ্নের উত্তর।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রের বাগানে মহোৎসব। কীর্তন-শেষে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে মিলিত হয়েছেন—এমন সময় নিরঞ্জন ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। ঠাকুর তাঁকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন। আনন্দে বিস্ফারিত লোচনে বললেন, 'তুই এসেছিস!' মাষ্টার মশাইকে বললেন, 'দেখ, এ ছোকরাটি বড় সরল। পূর্বজন্মে অনেক তপস্যা না করলে সরল হয় না। কপটতা, পাটোয়ারী বুদ্ধি এ সব থাকতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।' নিরঞ্জনকে বললেন, 'দ্যাখ তোর মুখে যেন একটা কালো আবরণ পড়েছে। তুই আফিসের কাজ করিস কিনা, তাই। আফিসের হিসাবপত্র করতে হয়—আরও নানা রকম কাজ আছে, সর্বদা ভাবতে হয়।' 'সংসারী লোকেরা যেমন চাকরি করে, তুইও চাকরি করছিস; তবে একটু তফাত আছে। তুই মার জন্য চাকরি স্বীকার করেছিস। মা গুরুজন, ব্রহ্মময়ী-স্বরূপা।'

প্রথম সাক্ষাৎ থেকেই ঠাকুর নিরঞ্জনের

সরলতা ও সংসারের প্রতি অনাসক্তির জন্য বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ঠাকুর একদিন বললেন, 'ভাবে দেখলাম, যদিও চাকরি কচ্ছে, ওকে কোন দোষ স্পর্শ করেনি। মার জন্য কর্ম করে, ওতে দোষ নেই। নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন এঁদের ব্যাটাছেলের স্বভাব।'

বলরাম-ভবনে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। ভাবের মধ্যে চীৎকার করে উঠলেন, 'আলেখ্ নিরঞ্জন! নিরঞ্জন, আয় বাপ,—খারে, নেরে—কবে তোকে খাইয়ে জন্ম সফল করব। তুই আমার জন্য দেহধারণ ক'রে নররূপে এসেছিস্।' ঠাকুর বলছেন, 'নিরঞ্জন কিছুতেই লিপ্ত নয়, নিজের টাকা দিয়ে গরীবদের ডাক্তারখানায় নিয়ে যায়।' 'বিবাহের কথা ব'ললে বলে—বাপ্ রে! বিশালাক্ষীর দ।' 'ওকে দেখি যে একটা জ্যোতির উপর বসে আছে।'

কাশীপুরে ঠাকুর একদিন ভাবাবেশে বলেন, 'তুই আমার বাপ্, তোর কোলে ব'স্‌ব।'

নিরঞ্জনকে ঠাকুর একদিন ভাবাবেশে স্পর্শ করলেন, ফলে তিন দিন তিন রাত্রি অপলকনেত্রে জ্যোতি-দর্শন—এবং অবিরাম জপ।

দক্ষিণেশ্বরে এক শুভ মুহূর্তে নিরঞ্জন শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা প্রাপ্ত হলেন—ঠাকুর স্বয়ং দিলেন দীক্ষা।

ঠাকুরের অসীম স্নেহ ও শক্তির অন্যতম আধার 'নিরঞ্জন'—অঞ্জনের লেশমাত্র ছিল না তাঁর অন্তরে বা বাহিরে। ঠাকুরের করুণার স্পর্শে তিনি হলেন আত্মহারা। শ্যামপুকুরে একদিন গিরিশচন্দ্র এবং অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে ঠাকুরের দেহে মা-কালীর আবির্ভাব প্রত্যক্ষ ক'রে ঠাকুরের পাদপদ্মে মাথা ঠুকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করলেন। আর একদিন কাশীপুরে ঠাকুরের প্রশ্নের সোজা জবাব দিলেন, 'আজ্ঞে, আগে ভালবাসা ছিল বটে; কিন্তু এখন ছেড়ে থাকতে পারবার জো নাই।'

কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরের অসুখের খুব বাড়াবাড়ি, ভক্তগণ আশু বিচ্ছেদের আশঙ্কায় আকুল। জীব-উদ্ধার-ব্রতে, ঠাকুর স্বীয় জীবন তুচ্ছ ক'রে ভক্তজনকে করুণা-বিতরণে অকৃপণ। চিকিৎসক ও ভক্তগণ প্রমাদ গণলেন,—ঠাকুর তখন কিছু আহার করতে পারেন না, কথা বলতে ক্লেশ বোধ করেন। অসুখের এই চরম অবস্থায় দেখাসাক্ষাৎ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন তখন অত্যাবশ্যক। বীর-ভক্ত নিরঞ্জন যষ্টিহস্তে হলেন দ্বারী। কর্তব্যে অটল, যেন বড় ট্রেজারীর গুরখা পাহারাওলা, 'হল্ট, হু কাম্‌স দেয়ার?' (Halt, who comes there?)। ফ্রেণ্ড বলেও সহজে নিস্তার নেই। দর্শনাকাঙ্ক্ষী ভক্তগণ দর্শন-সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত হয়েও দ্বারীর কর্তব্য-পরায়ণতায় মুগ্ধ হতেন। নিরঞ্জনের এই অপ্রিয় কঠোর কর্তব্যপালনের বিষয়ে গল্প আছে অনেক—ভক্ত 'দানা কালী' নিরঞ্জনের চোখে ধূলি দিয়ে অভিনেত্রী বিনোদিনীকে সাহেব সাজিয়ে ঠাকুরের ঘরে পাঠিয়েছিলেন; এই কাহিনীটি আজও ভক্ত-সমাজে একটি হাসির গল্প হয়ে আছে।

দৈহিক শক্তিধর নিরঞ্জনের অন্তরের মাধুর্যও ছিল অপূর্ব। সেবাপরায়ণতা ও বিপৎকালে কর্তব্যনিষ্ঠার ক্ষেত্রে দেহবুদ্ধি বিস্মৃত হতেন। একবার আঁটপুরে পুকুরে স্নান-কালে দেখতে পেলেন যে, সারদা মহারাজ (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ) তলিয়ে যাচ্ছেন। সন্তরণ-পটু নিরঞ্জন অপূর্ব তৎপরতার সঙ্গে নিজ জীবন বিপন্ন ক'রে রক্ষা করলেন সারদা মহারাজকে। এলাহাবাদে বসন্তরোগে আক্রান্ত স্বামী যোগানন্দের শয্যাপার্শ্বে তিনি ছিলেন নির্ভীক-ভাবে সেবারত। বিভিন্ন সময়ে শশী মহারাজ,

লাটু মহারাজ প্রভৃতির রোগশয্যায় নিরঞ্জন মহারাজ ছিলেন একজন অতন্দ্র প্রহরী।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে বরাহনগর মঠে যোগদানের পরে নিরঞ্জন সন্ন্যাস নিলেন—সেই থেকে তিনি পরিচিত 'স্বামী নিরঞ্জনানন্দ' নামে। দেওঘরে, প্রয়াগে, দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী-তলায় ও পরে কাশী, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে তপস্যারত নিরঞ্জন হতেন ধ্যানমগ্ন, অনিত্য দেহে নিত্যের সন্ধানে। তপস্যার ফাঁকে ফাঁকে তিনি সিংহল এবং দক্ষিণ-ভারতের নানা স্থানে রের বাণী ও মহিমা প্রচার করেছেন। আবার স্বামী বিবেকানন্দের ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরে পঞ্জাব ও কাশ্মীরের বহু স্থানে তিনি স্বামীজীর সঙ্গী ছিলেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দকে পীড়িত অবস্থায় বেলুড় মঠে নিয়ে এলেন স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী নিরঞ্জনানন্দ। এবারেও স্বামীজীর কঠিন পীড়ার সময়ে দ্বারী হয়ে দাঁড়ালেন যষ্টিহস্তে বীরসাধক নিরঞ্জন মহারাজ।

শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি নিরঞ্জন মহারাজের ভক্তি ছিল অসীম। তাঁর মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন জগজ্জননীর আবির্ভাব। সরলতা ও পবিত্রতার প্রতিমূর্তি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে সরল ও পবিত্র-স্বভাব নিরঞ্জন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে অভিন্ন বলে জানতেন—ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ।

পুত্রশোকাকুল গিরিশচন্দ্রকে তিনিই প্রথম জয়রামবাটীতে অব্যর্থ ধন্বন্তরীর সন্ধান দেন—তিনিই প্রথম ভক্তবীরকে চিনিয়ে দিলেন শ্রীশ্রীমাকে। মাতৃচরণাশ্রয়ে প্রায় তিন সপ্তাহ থেকে কলকাতায় ফিরে এলেন গিরিশচন্দ্র অন্তরের ক্ষতের উপর শান্তির প্রলেপ নিয়ে।

স্বামীজীর দেহরক্ষার পরে তাঁর প্রিয় গুরু-ভ্রাতা নিরঞ্জন আর অধিকদিন এই মর্ত্যধামে ছিলেন না।

কলকাতা থেকে অসুস্থ অবস্থায় হরিদ্বার গেলেন। যাবার পূর্বে শ্রীশ্রীমায়ের কাছ থেকে প্রাণভ'রে শিশুর মতন মায়ের স্নেহ ও যত্ন আস্বাদন ক'রে, মায়ের শ্রীপাদপদ্ম অশ্রুসিক্ত ক'রে দিয়ে সন্তান চিরবিদায় নিলেন—পাথেয় সংগ্রহ ক'রে নিলেন মায়ের আশীর্বাদ ও করুণা।

বাংলা ১৩১১ সাল, ২৭শে বৈশাখ, 'অঞ্জন-বিহীন' নিরঞ্জন পুণ্যতীর্থ হরিদ্বারে জাহ্নবীতীরে অন্তিম শয্যায় শায়িত হয়ে চক্ষু মুদে শুনলেন পরপারের সঙ্গীত, যে সঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে নিশিদিন অনন্তের কানে। আমরা মায়াবদ্ধ জীব, কান আছে তথাপি বধির।

মহাগীতি

শ্রীকাজল চৌধুরী

প্রত্যূষের লগ্ন হতে প্রতিক্ষণ শুনি
কী এক অভয়মন্ত্র প্রকৃতির গানে,
দিগ্বিদিকে প্লাবিত সে মহামন্ত্র-ধ্বনি
অসীম অনন্তে মিশে কাহার সন্ধানে!
প্রশ্ন করি ধ্যানমগ্ন কিরীটি-শিখরে,
প্রশ্ন করি সীমাহীন স্তব্ধ নভোলোকে,
প্রশ্ন করি সুবিশাল উর্মিল সাগরে,
প্রশ্ন করি স্পন্দহীন মুগ্ধ আপনাকে।

সেথা শুধু ছন্দময় নিবিড় বিস্ময়
পরম শান্তির স্বাদ সর্ব অঙ্গে ভরা,
নিমীলিত চক্ষুনীরে প্রশান্তি, অভয়
ত্রিতাপ-বিমুক্তি ধ্যানে সমাহিত ধরা।
মুগ্ধ কর্ণে বাজে সেই মহাসত্য-ধ্বনি
হৃদয়ের তন্ত্রী জুড়ে ওঠে অনুরণি
তখন স্তিমিত হয় সকল কামনা
নিস্তরঙ্গ চিত্তে জাগে অনন্ত বন্দনা।

শিক্ষকের ধ্রুবলক্ষ্য

শ্রীমতী রেণুকা সেন

শিক্ষাবিদ্ এবং শিশুদরদী-মাত্রেই এ-কথা স্বীকার করবেন যে শিশু-বয়সের শিক্ষাই মানুষের সারা জীবনের শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ। আজ যে শিশু, কাল সে পরিপূর্ণ মানুষ ; আজকের শিশু আর কালকের মানুষের মধ্যে যে দুস্তর পারাবার তাকে পাড়ি দিতে হলে চাই উপযুক্ত বা সুসমঞ্জস শিক্ষা। শিশুর জন্মের পর থেকেই তার এই জীবন-খেয়া পার হওয়ার শিক্ষা শুরু হয়, আর এই শিক্ষা ঠিকমত না হলে পদে পদে ভরাডুবির আশঙ্কা থাকে। এ সব তথ্য জানা থাকা সত্ত্বেও কিন্তু নানা কারণে আমরা এ বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রসর হতে পরিনি ; বিশেষ করে আর্থিক অসাচ্ছল্যের জন্যই আমাদের দেশ শিশুশিক্ষার ব্যাপারে এখনও অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে !

ভারতবর্ষে পাঁচ বছরের নীচে যে সব শিশুর বয়স তাদের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ ; কিন্তু সে তুলনায় পূর্ব-প্রাথমিক শিক্ষা-কেন্দ্রগুলির (নার্সারি মন্তেসরী এবং কিণ্ডার গার্ডেন) সংখ্যা মোটেই যথেষ্ট নয়। আমরা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার দ্বারা ভারতবর্ষকে কল্যাণকামী রাষ্ট্র (welfare state) তথা ভারতের ভবিষ্যত নাগরিকগণকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখে চলেছি, কিন্তু সেই "ভবিষ্যতের নাগরিক যে শিশুর দল তাদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির প্রতি যথেষ্ট লক্ষ্য রাখতে পারছি না। চোখ থাকতেও এখানে অন্ধের মত আচরণ করে চলেছি—এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আজকের দুনিয়ায় আর কি থাকতে পারে।" এখন প্রশ্ন হোল, তা হলে আমরা কোন্ পথ ধরে চলবো ? দেশব্যাপী এই বিরাট সমস্যার সমাধান কিভাবে হবে ? এখানে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সব কিছু বিচার-বিবেচনা ছেড়ে দিয়ে একমাত্র বলিষ্ঠ উত্তর দেওয়া যেতে পারে একজন শিক্ষাবিদের ভাষায়—"নিজেদের সংশোধন কর, দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধন কর এবং শিশুদের সম্মুখে নত হও।" এই সমস্যার সমাধানে জাতীয় সরকারের ভেতরের অথবা বাইরের প্রতিটি মানুষের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হোল—নিজের নিজের মনোবৃত্তির পরিবর্তন করা এবং শিশুকে কেবলমাত্র নিজেদের আনন্দের খোরাক হিসাবে গণ্য না করে তাকে তার প্রাপ্য সম্মানটুকু দিয়ে সমাজের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এবং প্রধান অংশ হিসাবে মেনে নেওয়া।

শিশু মহান কর্মী ; সদাই কর্মচঞ্চল, শ্রান্তি-ক্লান্তিহীন। শিশু মহান, কেননা শিশুর মধ্যে দেখি বহু গুণাবলীর সমাবেশ, যেগুলিকে যত্ন সহকারে বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ মাদাম মন্তেসরী তাই প্রার্থনা জানিয়েছিলেন—"হে ঈশ্বর ; তুমি আমাদিগকে সাহায্য কর, যেন আমরা শিশুর অন্তরলোকে প্রবেশলাভ করতে পারি। তোমারই ন্যায়-নীতি অনুসরণ করিয়া এবং তোমারই স্বর্গীয় ইচ্ছানুযায়ী আমরা যেন শিশুকে সম্যকরূপে বুঝিতে পারি, তাহাকে ভালবাসিতে পারি এবং তাহারই সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি।" শিশুর সরলতা, পবিত্রতা, প্রতিনিয়ত কর্মব্যস্ততা —তার এই সব মহিমার কথা জানতে পারলে, বুঝতে শিখলে আমরা বড়রাও নিজেদের উন্নত করার প্রেরণা লাভ করে থাকি। শিশু এখানে

মনুষ্য-সমাজের কাছে ভগবান-প্রেরিত উপহার-স্বরূপ, তাই শিশুর কাছে আমরা চিরঋণী, চিরকৃতজ্ঞ।

'বোঝা বা জানা', 'ভালবাসা' এবং 'সেবা করা' এই সমাপিকা ক্রিয়াগুলির একমাত্র কর্ম এখানে 'শিশু'। কাকে বুঝতে হবে ও জানতে হবে? 'শিশুকে'। কাকে ভালবাসতে হবে? 'শিশুকে'। কাকে সেবা করতে হবে? 'শিশুকে'। শিশুকে ভালবাসতে হলে আগে তাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে, তার অভাব অভি-যোগগুলি মনপ্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। আবার কেমন করে শিশুকে ভালবাসতে হবে তার জন্যও চাই জ্ঞান (প্রজ্ঞা), যে জ্ঞান আমাদের ভালবাসার পথে পরিচালিত করবে —বেশীও নয়, কমও নয়, শিশুকে ভালবাসতে গিয়ে একেবারে জড়িয়েও পড়বো না, আবার তাকে অবজ্ঞা-অবহেলাও করবো না। শিশুকে এখানে তার নিজের কাজ নিজেকে করতে দিতে হবে, তার পক্ষে সেটাই মঙ্গলের। এই বিকর্ষণের (detachment) মানে নয় - তাকে পেছনে ফেলে রাখা। ঠিক এই রকম আকর্ষণের (attachment) রীতিও জানা চাই, যাতে করে শিশু তার আপন স্বভাবে আপন পথে বাধা-হীনভাবে এগিয়ে চলতে পারে।

ভালবাসা সম্পূর্ণ নির্ভর করে এই জ্ঞান বা জানার উপরে। শিশুকে ঠিকমত জানতে পারলে তবেই সত্যিকারের নিঃস্বার্থ ভালবাসা (true love) জন্মাতে পারে। আমাদের অবশ্যই জানা দরকার শিশুকে কখন কেমন করে ভালবাসবো, সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসা জানানোর উপায়গুলিও জানতে হবে নিশ্চিতরূপে। আর জ্ঞানও ভাল-বাসার ওপরে নির্ভরশীল। তাকেই আমরা সব-চেয়ে বেশী জানি, যাকে আমরা সবচেয়ে বেশী ভালবাসি। ভালবাসা চোখ দিয়ে দেখার জিনিস (seeing), এ কখনও অন্ধ হতে পারে না। ভালবাসার পদ্ধতিই আস্তে আস্তে স্বাভাবিক ভাবে ভালবাসার বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে চিনিয়ে দেয়। আবার কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারাই ভালবাসার বস্তুকে বোঝা যায় না, জানা যায় না; তার জন্য চাই সহানুভূতি প্রভৃতি সকল কোমল বৃত্তিরই সমন্বয়।

সুতরাং 'জ্ঞান' এবং 'প্রেম' পরস্পর অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ; জ্ঞান ভিন্ন প্রেম অন্ধ এবং বিপথ-গামী। অন্যদিকে যে প্রেম, যে ভালবাসা সত্যিকারের জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা মণ্ডিত, সে ভালবাসা তার প্রিয়তমকে সেবা ও পরিচর্যা করতে প্রেরণা জোগাবেই—সেই প্রিয়তম এখানে আর কেউ নয় 'শিশু'। এইভাবে যদি এই তিনটি বৃত্তির ব্যাখ্যা আমরা করতে চাই তবে দেখতে পাব যে, একমাত্র শিশুকে কেন্দ্র করে এরা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে চক্রবৎ ঘুরে চলেছে—একটিকে বাদ দিলে আর একটির চলে না। যথার্থ ভালবাসা যদি সেবা করার প্রেরণা জোগাতে পারে, তবে জাতিধর্ম, বর্ণ, ধনী, দরিদ্র, সুন্দর, অসুন্দর নির্বিশেষে যে কোন শিশুর প্রতিই সেই ভালবাসা তাকে দুহাত দিয়ে সেবা বা পরিচর্যা করতেও প্রস্তুত থাকবে। কিন্তু এখানে সেবা মানে অন্ধ সেবা নয়—যেমন অপ্রয়োজনে শিশুর জামা-জুতা খুলে দেওয়া, পরিয়ে দেওয়া—এর দ্বারা তার সেবা করা হোল না, কেননা এর দ্বারা তাকে আত্মপ্রত্যয়হীন ও পর-নির্ভরশীল করে তুলতে সাহায্য করা হোল। এখানে শিশুর মঙ্গল না করে অজ্ঞাতে তার ক্ষতিই করা হোল। শিশুমনের রহস্য জানবার জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথেরও কৌতূহলের অন্ত ছিল না। এর প্রমাণ আমরা পাই তার "শিশু" এবং "শিশু ভোলানাথ" বই-দুটির প্রতিটি কবিতার মধ্যে দিয়ে। শিশুকে তার মাতৃক্রোড়ে এবং

প্রকৃতির স্নেহচ্ছায়ায় রেখে তবেই তাকে বুঝতে হবে, চিনতে হবে, ভালবাসা দিয়ে তার মনের চাহিদা মেটাতে হবে, সহানুভূতির সঙ্গে তার সমস্তার সমাধান করতে সাহায্য করতে হবে। তাই বলি, বিশ্বকবির দৃষ্টি নিয়েই শিশুকে আমাদের ভালবাসা প্রয়োজন।

"খোকা বলেই ভালবাসি
ভালো বলেই নয়॥"

এই ভাবে ভালবাসতে পারলে তবেই তার অন্তরের ঐশ্বর্য আমরা দর্শন করতে পারবো; আমাদের বিচার-বুদ্ধিও তখন এই ভালবাসার সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে আমাদেরও ঐশ্বর্যময় করে তুলবে। এটা অত্যন্ত সত্য কথা যে এইরূপে শিশুকে জানা, ভালবাসা এবং সেবার মধ্যে দিয়ে আমরা নিজেদেরই প্রকৃতরূপে বুঝতে, ভালবাসতে এবং সর্বতোভাবে উন্নতি সাধন করতে পারি; বন্ধুপ্রীতি, পরস্পরের তথা প্রতিবেশীর জন্য চিন্তা ও দরিদ্র দেশমাতৃকার সেবায় আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি বৃত্তিগুলির চরিতার্থতা লাভ করতে পারি। শিশুকে ভালবেসে, শিশুর রহস্য জেনে তাকে সুষ্ঠুরূপে পরিচর্যা করার মধ্যে দিয়ে আমরা স্বভাবতঃ এই সুন্দর পৃথিবীর স্রষ্টাকেই উপলব্ধি করতে পারি, ভালবাসতে পারি এবং সেবা করতে পারি। কালক্রমে ভগবৎপ্রেম লাভ করার এই হোল প্রকৃষ্ট পন্থা। তাই আজকের দিনে যদি আমরা প্রকৃত মানুষ হিসাবে বাঁচতে চাই, তবে এই তিনটি উদ্দেশ্যের সমন্বয় সাধন করে তাকেই জীবনের একমাত্র "ধ্রুবলক্ষ্য" করে চলতে হবে। শিশু-প্রেমিক ও মানবদরদী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলতেন, শিশুরাই হোল "রাষ্ট্রনির্মাতা," রাষ্ট্রের ধারক ও বাহকরূপে মনুষ্যসমাজকে যদি শিশুকাল থেকেই গড়ে তোলা না যায়, তবে সে রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি বহুলাংশে ব্যাহত হয়ে থাকে। শিশুসমাজের প্রতি যাতে আমরা আর কখনও অবহেলা বা অবজ্ঞা না দেখাই সেইজন্যই তিনি তাঁহার জন্মদিনটিকে "শিশুদিবস" রূপে পালন করতেন। শিশুদের তিনি ছিলেন পরমপ্রিয় "চাচা নেহরু"। ভারতের সমগ্র শিক্ষাবিদ্ ও চিন্তাশীল মানুষের ওপরেই শিশুসেবার মহান দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে এ-কথা যেন আমরা কখনও ভুলে না যাই।

মা

শ্রীকালীপদ সর্খেল

পরায়ে শুচিশুভ্র বাস প্রভাতবেলা মা গো,
জীবন-পথে যে খেলা দিয়ে ভুলায়ে তুমি রাখো,
কোনটি যদি ভাঙ্গিয়া যায় অক্ষমতা-দোষে,
কিছু বা যদি হারায়ে ফেলি চঞ্চলতা-বশে,
করিতে খেলা অঙ্গে যদি লাগাই মাটি ধূলি,
জানি মা তবু লইবে তুমি আপন কোলে তুলি।
বিপথে যদি চলি মা কভু, মানি না তব মানা
অবোধ শিশু বলিয়া তবু করিবে তুমি ক্ষমা।
জননী তুমি আপন জন—স্মরণে যদি রয়
জীবন নিয়ে করিতে খেলা কিসের তবে ভয় ?

পুষ্কর তীর্থ

স্বামী দিব্যাত্মানন্দ

রাজস্থানের আজমীর প্রদেশ। দিল্লী হইতে বোম্বে যাওয়ার রেলপথে আজমীর স্টেশন। স্টেশন হইতে পুষ্কর সাত মাইল। বাস ও টাঙা যাতায়াত করে। হিন্দুদের একটি বিশেষ তীর্থ।

ব্রহ্মা এই পবিত্র স্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশী হইতে রাসপূর্ণিমা পর্যন্ত এখানে বিরাট মেলা হইয়া থাকে। ভারতের নানা দেশ হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। নানা দেবদেবীর মন্দির আছে। যাত্রীদের থাকার জন্য ধর্মশালা আছে। পাণ্ডাদের বাড়ীতেও থাকা যায়। যাত্রীরা এই তীর্থে পূর্বপুরুষের মুক্তিকামনায় শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন।

এখানে একটি বিশাল হ্রদ আছে। হ্রদে মেছো কুমীর দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েকটি পাকা ঘাটও আছে। যাত্রীরা এখানে স্নানদানাদি ক্রিয়া করেন। নিকটেই ব্রহ্মার মন্দির।

তিন মাইল দূরে সাবিত্রী পাহাড়। পাহাড়ের উপরে মন্দির, মহিলাগণ পূজাদি করেন। ভারতের মধ্যে এই একটি বিশেষ তীর্থ—যেস্থানে কেবলমাত্র মহিলাগণ পূজাদি করিয়া থাকেন।

পুষ্কর অতি প্রাচীনতম তপোভূমি। পঞ্চ-তীর্থের অন্যতম। কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, প্রভাস ও পুষ্কর এই পাঁচটি তীর্থকে পঞ্চতীর্থ বলে।

ব্রহ্মা এই পবিত্র স্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ইহাই এ তীর্থটিকে বিশেষত্ব দিয়াছে।

পুরাণে আছে, ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজও লক্ষ্মীদেবীকে কন্যারূপে লাভ করিবার জন্য এই তীর্থে তপস্যা করিয়াছিলেন।

কিছুদিন পর কুশধ্বজের একটি কন্যাসন্তান জন্মে। জন্মকালে বেদধ্বনি হইয়াছিল। সেজন্য কন্যার নাম রাখা হয় বেদবতী।

বেদবতী ক্রমে বড় হইয়া উঠিলেন। তিনি পুষ্কর তীর্থে কঠোর সাধনা করিতে লাগিলেন। একদিন দৈববাণী শুনিলেন যে জন্মান্তরে তিনি বিষ্ণুকে স্বামীরূপে লাভ করিবেন

ব্রহ্মার তপস্যার কথা এইরূপ :

একদা ব্রহ্মা একটি পদ্মফুল ছুড়িয়া দিলেন, ফুলটি মহাবেগে পৃথিবীতে পড়িল।

ফুলটি পৃথিবীতে পড়িয়া পর পর তিনটি স্থান স্পর্শ করে। ফুলটি যেখানে যেখানে পড়িয়াছিল, সেই সেই স্থানে মাটি ফুঁড়িয়া জল বাহির হইতে লাগিল। এই তিনটি স্থানেরই নাম পুষ্কর।

প্রথম স্থানটির নাম ব্রহ্ম-পুষ্কর, দ্বিতীয় স্থানটির নাম বিষ্ণু-পুষ্কর, তৃতীয়টির নাম রুদ্র-পুষ্কর। এই তিন স্থানেই সদগতি লাভ হয়। ব্রহ্ম-পুষ্করের নিকটই ব্রহ্মার মন্দির।

একদিন ব্রহ্মার ইচ্ছা হইল, এই পুষ্করে একটি হোম করিবেন। বিষ্ণুকে সেকথা জানাইয়া বলিলেন, আপনি ইহার রক্ষার ভার গ্রহণ করুন।

বিষ্ণু বলিলেন, 'আপনি হোম আরম্ভ করুন। কোন ভয় নাই।'

পুষ্করে হোম হইবে শুনিয়া দেবগণ আনন্দে বেদধ্বনি করিতে লাগিলেন।

যথাকালে অগ্নিদেবকে আহ্বান করা হইল। অন্যান্য দেবগণ এবং মুনিগণও আসিয়া সমবেত হইলেন। বিশ্বকর্মা জানাইলেন, যজ্ঞমণ্ডপ

যথোক্তরূপে প্রস্তুত হইয়াছে। বৃহস্পতি বলিলেন, হোতাগণ প্রস্তুত হইয়া আছেন! ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, পবন ও সূর্যকে আপন আপন কাজে নিযুক্ত করিয়া বিষ্ণু নিজে পরিদর্শনে রত হইলেন।

ব্রহ্মা সাবিত্রীকে আনিবার জন্য নারদকে পাঠাইলেন। নারদ আসিলে সাবিত্রীদেবী বলিলেন, 'দেবপত্নী ও মুনিপত্নীগণকে ডাকিয়া সঙ্গে লইয়া যাইতেছি।'

এজন্য সাবিত্রীর আসিতে একটু বিলম্ব হইল।

এদিকে শুভ মুহূর্ত চলিয়া যায়। সাবিত্রী তখনও উপস্থিত হইলেন না দেখিয়া ব্রহ্মা চিন্তিত হইলেন। কি করা যায়? স্ত্রী সঙ্গে না থাকিলে তো যজ্ঞ পূর্ণাঙ্গ হইবে না!

ইন্দ্রকে গায়ত্রীদেবীর সঙ্গে সেখানে উপস্থিত দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ বিধি দিলেন; ব্রহ্মাকে বলিলেন, 'গায়ত্রীকে বিবাহ করিয়া তাঁহার সহিত যজ্ঞ সম্পন্ন করুন।' ব্রহ্মা তাহাই করিলেন।

যজ্ঞ আরম্ভ হইবে, সেই সময় জনৈক ব্রাহ্মণ ভিক্ষাপাত্রহস্তে উপস্থিত। ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিলেন, 'আমি যজ্ঞের সংবাদ পাইয়া আসিয়াছি। আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। আমাকে খাইতে দিন।'

ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, 'রন্ধনশালায় যাও, সেখানে ভিক্ষা মিলিবে।'

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'আমি স্নান করিয়া আসিতেছি।' এই বলিয়া, অন্তর্হিত হইলেন।

এদিকে দেখা গেল, কুণ্ডের পাশে একটি নরমুণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে; কোথা হইতে আসিল, কে জানে।

ব্রাহ্মণগণ সব দেখিয়া মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। যজ্ঞ আরম্ভ হইবার মুখেই অভুক্ত ব্রাহ্মণ-অতিথির আবির্ভাব ও অন্তর্ধান। আবার এই নরমুণ্ড! তাঁহারা স্থির করিলেন, যজ্ঞস্থল অপবিত্র হইয়াছে, অশুভ লক্ষণ দেখা দিয়াছে, কাজেই যজ্ঞ আর হইবে না।

ব্রহ্মা ধ্যান করিয়া বুঝিতে পারিলেন, শিব এই সব করিয়াছেন। তিনি শিবের স্তবগান শুরু করিলেন।

প্রসন্ন হইয়া শিব দর্শন দিয়া বলিলেন, 'নরমুণ্ড ব্যতীত এই যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইবে না, সেজন্য এখানে উহা আসিয়াছে।' ব্রাহ্মণগণ শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন। যজ্ঞ আরম্ভ হইল।

এদিকে সাবিত্রীদেবী দেবাঙ্গনা ও মুনিপত্নীদের লইয়া যজ্ঞস্থলে আসিয়া পৌঁছিয়া দেখেন, যজ্ঞ শুরু হইয়া গিয়াছে, ব্রাহ্মণগণ হোমে আহুতি দিতেছেন। আর ব্রহ্মার বামপার্শ্বে বসিয়া আছেন গায়ত্রী।

দেখিয়া সাবিত্রী খুবই মর্মাহত হইলেন, বলিলেন, 'যজ্ঞস্থলে আমি বসিব না। এমন স্থানে বসিব, যেন এই হোমের কোন মন্ত্রও শুনিতে না হয়।'

যজ্ঞস্থল হইতে কিছু দূরে একটি পাহাড়ে বসিয়া তিনি তপস্যায় রত হইলেন। এই পাহাড়টির নামই 'সাবিত্রী পাহাড়।' ভাদ্র শুক্লা অষ্টমীতে এই পাহাড়ে বিরাট মেলা হয়।

ব্রহ্মার যজ্ঞ সমাপ্ত হইল। পুষ্কর তীর্থ আজিও সেই স্মৃতি বহন করিতেছে, আর পবিত্র করিয়া দিতেছে অগণিত তীর্থযাত্রীর অন্তর।

সমালোচনা

Swami Vivekananda on Himself : প্রকাশক—স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, সেক্রেটারি, স্বামী বিবেকানন্দ শতবর্ষ জয়ন্তী, ১৬৩ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ১৪। ৩১৮ পৃষ্ঠা, মূল্য পাঁচ টাকা।

ইংরেজী ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দের নিজের কথায় তদীয় জীবনী প্রকাশন একটি প্রশংসনীয় মৌলিক প্রচেষ্টা। বহু অধ্যবসায় ও প্রযত্নে এই গ্রন্থটি সঙ্কলিত হইয়াছে। যাঁহারা স্বামীজীর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত তাঁহারা পাঠ করিলে খুবই তৃপ্তিলাভ করিবেন। মানব-জাতির বর্তমান জটিল সমস্যার যুগে শান্তি ও আত্মতুষ্টি লাভ করিতে চাহিলে এই গ্রন্থটি পথ-নির্দেশে সক্ষম হইবে। ছাপা ও বাঁধাই ভাল। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও বেলুড় মঠ প্রভৃতির চিত্র গ্রন্থের আকর্ষণ বৃদ্ধি করিয়াছে।

স্বামীজী-অনুধ্যানে জাতীয় সংহতি : লেখক—মণীন্দ্রচন্দ্র আচার্য ; প্রকাশিকা—বীণাপাণি আচার্য, ২।৪, বিদ্যাসাগর উপনিবেশ, যাদবপুর (পোঃ—গড়িয়া) ; ১৬৮ পৃষ্ঠা, মূল্য তিন টাকা।

তরুণ লেখকের প্রথম প্রয়াস প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই। ভাষা সতেজ ও ভাববিশ্লেষণ মর্মস্পর্শী। রাজনৈতিক ও সামাজিক বহুবিধ জটিল সমস্যা আজ ভারতগগন মেঘাচ্ছন্ন করিয়াছে। লেখক স্বামীজীর বাণী হইতে সেই সকল সমস্যা সমাধানের পথনির্দেশে যত্নবান হইয়াছেন। লেখকের সহিত সর্ব বিষয়ে একমত না হইতে পারিলেও তিনি স্বকীয় দৃষ্টিকোণ হইতে যে বিশ্লেষণ, কারণানুসন্ধান ও স্বামীজীর বাণী ও সূত্রানুসরণে সমাধান উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা তাঁহার দক্ষতার পরিচায়ক। চিন্তাশীল মানুষ-মাত্রেই এই গ্রন্থে বিশেষ চিন্তার খোরাক পাইবেন। ছাপা ও বাঁধাই ভালই।

বিবেকানন্দ-যুগ : লেখক ডাঃ নরেশ-চন্দ্র ঘোষ, প্রকাশিকা—জ্যোৎস্না ঘোষ, সাধনা প্রকাশনী, ৩৬ নং সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনানগর, কলিকাতা ৪৮। পৃষ্ঠা ১০০, মূল্য দুই টাকা।

লেখক স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম- ও কর্ম-জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে নবযুগের নূতন ভাবধারা দার্শনিক ব্যাখ্যা দ্বারা বিশ্লেষণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। স্বামীজীর অভূতপূর্ব প্রতিভা ও বাণীর পরিচিতি পাঠক এই পুস্তকের মাধ্যমে সহজেই অবগত হইতে পারিবেন—সন্দেহ নাই। ছাপা ও বাঁধাই ভালই।

সেই বিশ্ববরেণ্য সাধক— মণি বাগচি। প্রকাশক : সুতপা প্রকাশনী কলিকাতা ২৩। ১৪৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩৲।

লেখকের ভাষা আছে। শ্রদ্ধার সহিত এই যুগাবতারের পূত চরিত্র অঙ্কনে প্রয়াসী হইয়াছেন। তবে পুস্তকটিতে কয়েকটি অসঙ্গতি আছে—মনে হইল। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি : ২৩ পৃষ্ঠায় অগ্রজ রামকুমারের শূদ্রযাজী হওয়া ক্ষুব্ধ গদাধর কোন যুক্তিতর্কে মানিয়া লন নাই। কিন্তু তর্কের পরই ধর্মপত্র করা হয় এবং রাম-কুমারের জয় হয়। আজন্ম সরলবিশ্বাসী গদাধর ধর্মপত্রে অগ্রজের জয় বিধির নির্দেশ বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন। ৩৬ পৃষ্ঠায় গদাধর

শক্তি-দীক্ষা লইবেন স্থির করেন। কিন্তু মথুরবাবুই যে দীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ৮৯ পৃষ্ঠায় সারদাদেবী তাঁর বাবাকে একদিন বলিলেন—'বাবা, আমি দক্ষিণেশ্বরে যাব।' ঐ কালের মেয়ে, বিশেষ সারদাদেবীর ন্যায় লজ্জাশীলা বালিকার পক্ষে পিতার নিকট স্বামী-সন্দর্শনে যাওয়ার কথা মুখে বলা নিতান্ত অশোভন। গঙ্গাস্নানে যাইবার কথা হয়, তাহাও ভানু-পিসির মারফতে।

প্রচ্ছদপটে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধিস্থ মূর্তি সন্নিবেশিত হইয়াছে। বাঁধাই ও ছাপা মন্দ নয়।

পুস্তকের শেষভাগে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী হইতে ২৪টি বাছাই-করা উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে পুস্তকের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুগাবতারের জীবনী-পাঠে সর্বদাই মানুষের উপকার হয়—সন্দেহ নাই।

—কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

A Simple Life of Swami Vivekananda—Brahmachari Amal, Published by Swami Lokeswarananda, Ramakrishna Mission Ashrama, Narendrapur, 24 Parganas. Pp. 60 ; Price Rs. 1·50.

বিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্রসমাজের জন্য সহজ সরল ইংরেজীতে লিখিত পুস্তকখানি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিবে বলিয়া আশা করা যায়। স্বামীজীর অমূল্য জীবন-কাহিনী জন্ম হইতে মহাসমাধি পর্যন্ত এই পুস্তকে বর্ণিত। পুস্তকে ১৫ খানি চিত্র উপযুক্ত ক্ষেত্রে সন্নিবেশিত হওয়ায় বিদ্যার্থীদের মনে স্বামীজী-সম্বন্ধে স্থায়ী রেখাপাত করিবে। ইংরেজী-ভাষাভাষী বালক-বালিকাদের স্কুলে পুস্তকখানি দ্রুতপঠন হিসাবে নির্বাচিত হইতে পারে।

Sanskrit as India's Official Language—By Nakuleswar Banerjee, 34 Mahajati-nagar, Block II, Calcutta 51 Pp. 28.

'ভারতের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা', 'সুপ্রিম কোর্ট ও রাষ্ট্রভাষা', 'ভারত ও ইংরেজী ভাষা' প্রধানতঃ এই প্রবন্ধ-তিনটির মাধ্যমে ভৌগোলিক রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক এবং জাতীয় সংহতির দিক হইতে ভারতের রাষ্ট্রভাষা-রূপে সংস্কৃত ভাষার স্থান ও মর্যাদা কিরূপ হইতে পারে, সে বিষয়ে সুসমঞ্জস চিন্তাধারা ব্যক্ত করা হইয়াছে।

গ্রন্থখানি ভারতের চিন্তাশীল জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে সুধী গ্রন্থকারের পরিশ্রম সফল হইবে।

ভারতের শিক্ষাধারার ইতিহাস (দ্বিতীয় সংস্করণ)—শান্তিময়ী সিংহ। ১০, প্রতাপাদিত্য রোড, কলিকাতা ২৬ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২১৬ ; মূল্য ৬৲।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভ হইতে যুদ্ধোত্তর কাল পর্যন্ত ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার ইতিবৃত্ত এবং স্বাধীন ভারতে শিক্ষা-পরিকল্পনা ও মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের বিবরণী সুন্দরভাবে পরিবেশিত। গ্রন্থখানি শিক্ষাক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে—দ্বিতীয় সংস্করণই তাহার প্রমাণ। আমরা আশা করি—এই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণও সমাদৃত হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

বেলুড় মঠঃ গত ৯ই মাঘ (২৩শে জানুআরি) শনিবার শুভ কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে বেলুড় মঠে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের ১০৩ তম জন্মোৎসব সারাদিন বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনন্দে ও উৎসাহে উদ্‌যাপিত হয়। ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতির দ্বারা উৎসবের শুভারম্ভের পর বেদপাঠ, ভজন, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর ষোড়শোপচারে পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, কঠোপনিষদ্‌ পাঠ, কালীকীর্তন, হোম ও বিশেষ ভোগরাগ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের মন্দির ও তাঁহার ঘরটি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা স্বন্দরভাবে সাজানো হইয়াছিল। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভক্তবৃন্দ মঠে সমাগত হইয়া স্বামীজীর উদ্দেশে অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। সমাগত ভক্তবৃন্দকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়; বেলা ১২টা হইতে বৈকাল পর্যন্ত প্রায় ছয় হাজার ভক্ত নরনারী পরিতৃপ্তি সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

অপরাহ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের পূর্বপার্শ্বস্থ প্রাঙ্গণে আয়োজিত সভায় স্বামী গম্ভীরানন্দ সভাপতিত্ব করেন। শ্রীঅধার মুখোপাধ্যায় স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করিয়া বলেন, স্বামীজী আধ্যাত্মিকতার ও স্বদেশপ্রেমের ঘনীভূত মূর্তি, সাধারণতঃ মহামানব বলিতে যাহা আমরা বুঝি, স্বামীজীর স্থান তাহা হইতে অনেক উর্ধ্বে। স্বামী চিদাত্মানন্দ তাঁহার সাবলীল হিন্দী ভাষণে স্বামীজীর অনন্যসাধারণ জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি পরিস্ফুট করেন। সভাপতির ভাষণে স্বামী গম্ভীরানন্দজী বলেন, স্বামীজীর আবির্ভাব সমগ্র বিশ্বের জন্য; তিনি শুধু ভারতের নন। জীবনে অপরিহার্য সব কর্মকেই তিনি ঈশ্বরের উপাসনাজ্ঞানে করিতে বলিয়াছেন।

ঢাকাঃ গত ২৩শে জানুআরি ঢাকা মঠে স্বামীজীর জন্মতিথি যথারীতি উদ্‌যাপিত হয়। প্রাতঃকালে মঙ্গলারতির পর বৈদিকস্তোত্র পাঠ ও বিবিধ সঙ্গীত গীত হয়।

অপরাহ্ণে স্বামীজীর জীবনচরিত পাঠ ও স্বামীজীর অবদান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়। 'আমার দেশ'-সম্পাদক শ্রীভবেশচন্দ্র নন্দী ও এডভোকেট শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র পাণ্ডে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত শ্রীনরেন্দ্র সোসানিয়া আমেরিকায় স্বামীজীর বেদান্ত-প্রচারের অপূর্ব প্রভাবের কথা ব্যক্ত করিয়া সকলকে আনন্দ দান করেন।

এই উৎসব উপলক্ষে প্রায় পাঁচশত নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করে।

আরাত্রিকের পর উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল।

পুরীঃ গত ২৩শে জানুআরি শনিবার দিবস প্রাতে বেদপাঠের দ্বারা স্বামী বিবেকানন্দের ১০৩ তম জন্মতিথি উদ্‌যাপনের স্চনা হয়। এতদুপলক্ষে কঠোনিষদ্‌-পাঠ, স্বামীজীর জন্মকথা ও বাল্যজীবন আলোচনা করা হয়। পূজানুষ্ঠান ও ভক্তসেবার পর বিকাল ৪টায় ওড়িয়া ও ইংরেজী ভাষায় আশ্রমস্থ ছাত্রগণের মধ্যে আবৃত্তি ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা হয়। সন্ধ্যায় আরাত্রিক ও ভজনের পর দিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

পরদিন বিকাল ৫টায় অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন অধ্যক্ষ

শ্রীকিশোরীমোহন দ্বিবেদী। শান্তিপাঠ ও উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর স্বামী ঋদ্ধানন্দ বাংলায় এবং অধ্যাপক ধল ওড়িয়ায় বক্তৃতা করেন। ইংরেজীতে বলেন অধ্যাপক নন্দী। সভাপতির সংস্কৃত ভাষায় মনোজ্ঞ অভিভাষণের পর সভার কার্য শেষ হয়।

সভার পর চলচ্চিত্র-প্রদর্শনের দ্বারা দিবসদ্বয়ের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

মেদিনীপুর: শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের উদ্যোগে স্বামীজীর ১০৩ তম জন্মতিথি-উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ২৩শে জানুআরি ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতি ও ভজনের পর বিদ্যাভবন-প্রাঙ্গণের পতাকাতলে স্বামীজী ও নেতাজীর বীর্যময় জীবন সম্বন্ধে সাধু-শিক্ষক-ছাত্রদের ভাষণ-কথন-আলোচনা হয় এবং পরে উপস্থিত সকলকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। মধ্যাহ্নে যথারীতি পূজা-পাঠ ও হোমের পর ভক্ত-সেবাদি অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় আশ্রমের আনন্দ-ভবন হলে প্রাঞ্জল ভাষায় স্বামী মহানন্দ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষা-বিষয়ে স্বামীজীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ আলোচনা করেন। ২৪শে জানুআরি বিদ্যাভবনে বার্ষিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় আশ্রমের আনন্দ-ভবন হলে ধর্মসভায় স্বামী মহানন্দ স্বামীজীর জীবনী ও আদর্শ ব্যাখ্যা করেন।

ফরিদপুর: রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ২৫শে ডিসেম্বর ভাবগম্ভীর পরিবেশে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মতিথি-উৎসব ফরিদপুরের মহিলাগণের উদ্যোগে উদ্‌যাপিত হয়। ঐ উপলক্ষে প্রাতে মঙ্গল আরতি, ভজন, মধ্যাহ্নে বিশেষ পূজা, হোম ও চণ্ডীপাঠ হয়। অপরাহ্নে আশ্রম-প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-দর্শন আলোচনার জন্য এক মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মাদ্রাজ (ময়লাপুর) **শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ** দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্যবিবণীতে (এপ্রিল, ১৯৬৩—মার্চ, ১৯৬৪) প্রকাশ:

আলোচ্য বর্ষে হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথি বিভাগে মোট ১,৪৭,৯৫৭ রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। চক্ষুবিভাগে ১৪,০৩০, চক্ষু-কর্ণ ও গল-রোগের চিকিৎসা-বিভাগে ১১,৮৯৪, দন্তবিভাগে ৭,১৪৫ রোগীর চিকিৎসা এবং এক্স রে বিভাগে ৫৩৬ জনের এক্স-রে করা হয়। ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষিত নমুনার সংখ্যা ১,১৮৯। শহরের নানা স্থানে ৪,৬৮৮টি রুগ্‌ণ শিশুকে ঔষধমিশ্রিত দুগ্ধদ্বারা সাফল্যের সহিত চিকিৎসা করা হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত পুষ্টির অভাবগ্রস্ত ৩,৭৫৮টি শিশুকে নিয়মিতভাবে দুগ্ধ দেওয়া হয়। সহৃদয় জনসাধারণের অকুণ্ঠ অর্থসাহায্যে দরিদ্র আর্ত জনগণ অধিকতর সেবালাভে সমর্থ হইবে।

ইহা ছাড়া মাদ্রাজ মঠের কার্যক্রম অনুসারে পূজা, ভজন ও পাঠাদি যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তদুপরি প্রচার-বিভাগে তামিল, তেলুগু, ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় পুস্তক-প্রকাশন ব্যতীতও তামিল, তেলুগু ও ইংরেজীতে তিনটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রবিবার মঠে ও শনিবার ত্রিপ্লিকেনে জনসাধারণের নিকট ধর্ম-আলোচনা করা হয়। মাঝে মাঝে জেলাসমূহেও প্রচার-কার্য করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিক লাইব্রেরিতে মোট ১১,২১৩ খানি পুস্তক আছে।

জর্জটাউনে উক্ত মঠ কর্তৃক একটি বালিকা বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। ছাত্রী-সংখ্যা ৬০০। উক্ত টাউনে 'বিবেকানন্দ শতবার্ষিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়' নামে একটি নূতন বিদ্যালয় আরম্ভ করা হইয়াছে।

মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ময়লাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসের ছাত্র-সংখ্যা :

(ক) আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৪৫,

(খ) কারিগরি শিক্ষায়তনের ১০৩,

(গ) কলেজ বিভাগের ২৮।

ময়লাপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-সংখ্যা ৪৩৯। উট্টিরামেরুর, মাল্লিয়ানকারনাই রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-সংখ্যা ১৬৯। একটি হরিজন ছাত্রাবাস আছে, তাহাতে আবাসিক ছাত্র-সংখ্যা ৪৫।

ত্যাগারায়ানগর রামকৃষ্ণ মিশন সারদা বিদ্যালয়ে ছাত্রী-সংখ্যা ১,৮০৪। অন্যান্য বিভিন্ন স্ত্রী-শিক্ষায়তনগুলিতে ছাত্রী প্রভৃতির সংখ্যাও ২,১০২। ময়লাপুর বিবেকানন্দ কলেজে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১,৪৫৩ এবং হষ্টেলে ছাত্র-সংখ্যা ২৫১।

ময়লাপুর মিশন যখনই প্রয়োজন হয়, নানাপ্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিধ্বস্ত জনসাধারণের সাহায্যার্থ অগ্রসর হন।

বিবেকানন্দ শতবার্ষিক উৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

আসানসোল : রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৬২-৬৩ ও ১৯৬৩-৬৪ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক কার্য-বিবরণীতে প্রকাশিত কার্যধারা নিম্নরূপ :

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে আসানসোলের শিল্পাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত এই কেন্দ্রটি ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম শাখা-রূপে অন্তর্ভুক্তি লাভ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারায় আদর্শশিক্ষা-বিস্তারে গত কয়েক বৎসর যাবৎ এই কেন্দ্রটির প্রাণপণ প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য।

আশ্রমে দৈনন্দিন পূজা-ভজনাদি ব্যতীত শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা, কালীপূজা প্রভৃতি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব বিশেষ নিষ্ঠার সহিত সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

বন্যার্তদিগের সেবাকার্যে এই কেন্দ্র কর্তৃক ৪,০০০ টাকা এবং দুঃস্থ-সাহায্যে ২,০০০ টাকা দেওয়া হয়। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে আশ্রম-পরিচালিত বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ১,০৩২ ও ১,০৬৫; প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল ১০০% উত্তীর্ণ। ১৯৬৩-৬৪ খৃঃ আশ্রমের গ্রন্থাগারে ৫,৪৩০ খানি পুস্তক ছিল এবং ২৬টি পত্র-পত্রিকা লওয়া হইয়াছিল।

আলোচ্য সময়ে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সহযোগিতায় বর্ধমান ও ধানবাদ অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় জনসাধারণের উদ্যোগে স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

বেলঘরিয়া : রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম (স্টুডেণ্টস্ হোম)-এর ১৯৬৩-৬৪ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাচীন গুরুকুল প্রথায় পরিচালিত এই বিদ্যার্থী আশ্রমে দরিদ্র ও মেধাবী কলেজ-ছাত্রদের সম্পূর্ণ বিনা ব্যয়ে রাখিয়া উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। আহার বাসস্থান ছাড়া পোশাক-পরিচ্ছদ এবং পুস্তকাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যও ছাত্রেরা এখানে পাইয়া থাকে। পড়াশুনার সঙ্গে তরুণ বিদ্যার্থীদের বিভিন্ন সদ্‌গুণ বিকাশ করিবার উপযোগী ব্যবস্থা আশ্রমে রহিয়াছে। নৈতিক শিক্ষা গ্রহণেচ্ছু কিছুসংখ্যক ছাত্র আংশিক বা পূর্ণ খরচ বহন করিয়াও এখানে থাকিতে পারে।

আলোচ্য বর্ষে সর্বমোট ৯৪ জন আশ্রমিকের মধ্যে সম্পূর্ণ বিনা ব্যয়ে ছিল ৬৮ জন; বাকী ২৬ জনের মধ্যে ১৩ জন আংশিক ব্যয় ও ১৩ জন পূর্ণ ব্যয় বহন করিয়াছে।

পরীক্ষার ফল সকল বিভাগেই সন্তোষ-জনক।

বিদ্যার্থী আশ্রম একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। স্বভাবতই খরচপত্রের জন্য ইহাকে সহৃদয় জনসাধারণের দানের উপর নির্ভর করিতে হয়। খুবই সুখের বিষয় ইহার প্রাক্তন ছাত্রেরাও তাহাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন। বর্তমান বৎসরে মোট চাঁদার শতকরা ৩৭ ভাগ প্রাক্তন ছাত্রদের নিকট হইতে আসিয়াছে।

বিদ্যার্থী আশ্রমের আর একটি কর্মবিভাগ রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ। সরকার-অনুমোদিত এই পলিটেক্‌নিকে সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ৩ বৎসর ডিপ্লোমা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ এই বৎসর শিল্পপীঠ পশ্চিম-বাংলায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্তমান ছাত্র-সংখ্যা ৬৬০। নিকটবর্তী অঞ্চলের নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের ছেলেদের জন্য বিদ্যার্থী আশ্রমের বিদ্যার্থীরা একটি নৈশবিদ্যালয় পরিচালনা করিয়া আসিতেছে; ইহার ছাত্র সংখ্যা দেড়শত। ইহা ছাড়া সমাজসেবার অন্যান্য কাজও তাহাদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

বিদ্যার্থী আশ্রমের কর্মপ্রচেষ্টায় এ বৎসর আর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন বিবেকানন্দ শতাব্দী জয়ন্তী ভবন। আনুমানিক ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই ভবনের এক তলায় সভাগৃহ এবং দ্বিতলে লাইব্রেরি এবং ফ্রী রিডিং রুমের ব্যবস্থার চেষ্টা হইতেছে।

আমেরিকায় বেদান্ত

নিউইয়র্ক: রামকৃষ্ণ-বেদান্ত কেন্দ্র।

এই কেন্দ্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছে:

সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪: মানুষ কি? হিন্দুধর্ম কি? অতীন্দ্রিয়বাদের মর্ম।

অক্টোবর: বাহিরের কর্মচাঞ্চল্য এবং অন্তরের শান্তি; ঈশ্বর: আমাদের শাশ্বত মাতৃসত্তা; মানবীয় ভালবাসা ও ঐশ্বরিক প্রেম; অমরত্ব।

নভেম্বর: সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শন; জীবনের অপরিহার্য প্রশ্ন-চতুষ্টয়; আধ্যাত্মিক উন্নতির পাঁচটি অঙ্গ; হিন্দুধর্মের মূল ভাব; আধ্যাত্মিক জীবনে খাদ্যের প্রভাব।

ডিসেম্বর: যোগ—প্রকৃত ও অযথার্থ; পাপ ও মুক্তি; অবতারবাদের রহস্য; দেবমানব খৃষ্ট; শ্রীশ্রীমা ও তাঁহার উপদেশ।

ইহা ছাড়া ভাগবত ও গীতা অবলম্বনে কয়েকটি ক্লাসও নিয়মিতভাবে করা হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

কুরুদ ক্যাম্প, রায়পুর (মধ্যপ্রদেশ): রামকৃষ্ণ মিশনের রিলিফ কেন্দ্রে পূর্ব-পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তদের সেবাকার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৫. ৫. ১৯৬৪ হইতে ১৪. ১. ১৯৬৫ পর্যন্ত সেবাকার্যের বিবরণ:

বিতরিত দ্রব্য	পরিমাণ বা সংখ্যা
বার্লি	৫৫৪.৫ কেজি
মিল্ক পাউডার	৫০,৮৩৬ পাউণ্ড
মাল্টি পাউডার ফুড	৭৬৮ কেজি
মাল্টি ভিটামিন ট্যাবলেট	৮০,৮৫০টি
ভিটামিন (লিকুইড)	১,৫১,৭৯৫ এম. এল
হরলিকস	১২০ পাঃ
চিনি	৬০০ কেজি
মুড়ি	৭২ ব্যাগ
বিস্কুট ও লজেন্স (প্রধানতঃ হাসপাতালের রোগী ও প্রসূতিদের জন্য)	৬৭ কেজি
শাড়ি (নূতন)	১০,৭৭৬

ধুতি (নূতন)	৪,৩৫০
কম্বল (বড়দের)	১০,১২০
" (ছোটদের)	১,০০০
পশমী কম্বল	৫০
শিশুদের পোশাক	১২,৪৩১
পুরাতন পোশাক	১৩,১০০
চাদর	৪১৮
ব্লাউজ	১,০৮০
গেঞ্জি	১,৮৫৮
লণ্ঠন	১,০০২
বালতি	৫০৪
এল্যুমিনিয়াম ও পিতলের বাসন	৫৫০
এনামেলের থালা	৯৪৪
সুতার বাণ্ডিল	৪,৬০৮
সূচ	১৭,০০০
সিন্দুর	৬৩ কেজি
সিন্দুর-কৌটা	৯,০৭২
বই	১,৮০০
খাতা	৩২৬
শ্লেট	৪০০
শ্লেট-পেন্সিল	৩০ ডজন
আর্থিক সাহায্য	টাকা ৫৪৯.৭৪

এতদ্ব্যতীত ক্যাম্প হাসপাতালের ডিস্পেন্সারি-গুলিতে ব্যবহারের জন্য ৭৫০ রকমের এলোপ্যাথিক ঔষধ দেওয়া হয়।

চট, টিনের পাত্র, শিশি, বোতল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করা হয়।

একটি ছোট লাইব্রেরি করা হইয়াছে; ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের প্রায় ২০০ খানি বই রাখা হইয়াছে। বইগুলি ক্যাম্পের লেখাপড়া-জানা লোকদের বিশেষ কাজে লাগিতেছে।

রামেশ্বর : গত জানুআরির প্রথম সপ্তাহে মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন সম্প্রতি বাত্যা-বিক্ষুব্ধ জনগণের সেবায় রামেশ্বরে 'রিলিফ' কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। দুইটি সেবাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে —একটি রামেশ্বরে, অপরটি মণ্ডপম্ ও রামনাথপুরমের মধ্যবর্তী উচিপুল্লীতে।

এ পর্যন্ত উচিপুল্লীতে ৩৭টি গ্রামের ৮৬৪ পরিবারের নাম তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। গৃহনির্মাণের জন্য ৪,৪২৫টি বাঁশ, ২০০ বাণ্ডিল কাঠ, ১৪,০০০ তালপাতা বিতরিত হইয়াছে; ১৭৮ খানি ধুতি এবং ১১৯ খানি শাড়িও ৩৬৪ পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে।

রামেশ্বর কেন্দ্রে সেবাকার্যের জন্য ১৭টি গ্রামের তিন শত বাড়ি পরিদর্শন করা হইয়াছে।

প্রধান কেন্দ্র বেলুড় হইতে কর্মী প্রেরিত হইয়াছে এবং উভয় সেবাকেন্দ্রেই সেবাকার্য পুরাদমে চলিতেছে।

ভ্রম-সংশোধন

গত মাঘ সংখ্যায় ৫৫ পৃঃ ১ম কলমে ৬ষ্ঠ পঙ্ক্তিতে 'সভাপতি' স্থলে 'সেক্রেটারি' এবং ৫৬ পৃঃ ১ম কলমে ৩০ পঙ্ক্তিতে '৩রা' স্থলে '১৩ই' হইবে।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

বারাসত: গত ২৯শে ডিসেম্বর হইতে ৩রা জানুআরি পর্যন্ত ছয়দিন মহাপুরুষ মহারাজ স্বামী শিবানন্দের ১০৯ তম জন্মোৎসব তদীয় জন্মস্থান বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূজা, হোম, শাস্ত্রপাঠ, ভজন, কীর্তন, ধর্মসভায় বক্তৃতা, চলচ্চিত্র-প্রদর্শন, শোভাযাত্রা, প্রসাদবিতরণ প্রভৃতি আনন্দোৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। বেলুড়মঠের স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী চিদাত্মানন্দ, স্বামী পুণ্যানন্দ ও স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ, এবং শ্রী কুমার দত্তগুপ্ত শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

কলাইঘাটা (নদীয়া)**:** গত ৩রা মাঘ (১৭ই জানুআরি) রবিবার রাণাঘাট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উদ্যোগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদধূলিপূত চূর্ণী-নদীতীরস্থ কলাইঘাটায় ভক্তবৃন্দ কর্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুরের ১২৯ তম জন্মোৎসব বিভিন্ন পবিত্রানুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয়। চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামগুলির নরনারী ও শিশু সমাগমে উৎসব-প্রাঙ্গণ আনন্দমুখর হইয়া উঠে। সকালে বিশেষ পূজা, হোম, শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদি হয় এবং বেলা দুইটায় সভারম্ভ হয়। স্বামী জীবানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশাবলী পাঠ ও আলোচনা করেন। পরে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনাদর্শ অবলম্বনে বক্তৃতা দেন। সভাশেষে কয়েক সহস্র নরনারায়ণ পরিতোষ সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

খেপুত: শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ১০ই পৌষ শুক্রবার বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদবিতরণ শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও উপদেশ আলোচনা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

সালকিয়া: ৩১শে জানুআরি রবিবার সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকায় সালকিয়া এ, এম, স্কুল ভবনে সালকিয়া তরুণদল কর্তৃক স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন স্বামী আদীশ্বরানন্দ; প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী মাননীয় শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়।

শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণে স্বামীজীর 'অভীঃ' মন্ত্রে দীক্ষিত নতুন যুব-সম্প্রদায় গঠন করিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

কার্যবিবরণী

সিন্ত্রি: শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের ১১শ বার্ষিক বিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। এই আশ্রমের উদ্যোগে স্বামীজীর শতবার্ষিকী নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুন্দরভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। স্থানীয় কলোনীতে এই আশ্রম কর্তৃক একটি ডিস্পেন্সারি পরিচালিত হইতেছে, আলোচ্য বর্ষে ১৩,৭০০ জন রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা দেওয়া হয়। গ্রন্থাগারে বিভিন্ন ভাষায় ৩৫০ খানি বই রাখা হইয়াছে, পাঠকগণ এই বইগুলির সদ্ব্যবহার করিতেছেন।

আজমীর (রাজস্থান)**:** শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের ১৯৬২-৬৩ এবং ১৯৬৩-৬৪ খৃষ্টাব্দের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে আশ্রমের গ্রন্থাগারে মোট ৪,২৪২ পুস্তক ছিল; পাঠাগারে ৫টি দৈনিক, ৪টি সাপ্তাহিক,

৪টি পাক্ষিক এবং ১৮টি মাসিক পত্রিকা লওয়া হয়। আশ্রমের আয়ুর্বেদীয় ও হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে গত দুই বৎসরে ৩১,১৯৮ এবং ১৭,৪৩৩ আর্তনারায়ণ চিকিৎসা লাভ করেন। আশ্রমের ছাত্রাবাসে যথাক্রমে ৭ এবং ১২ জন বিদ্যার্থী ছিল। দরিদ্র বালক-বালিকাদিগকে গুঁড়া দুধ বিতরিত হয়।

আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের দৈনিক পূজা, সাপ্তাহিক শাস্ত্রালোচনা এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব প্রতিপালিত হয়। স্বামীজীর শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন করেন রাজস্থানের রাজ্যপাল ডাঃ সম্পূর্ণানন্দ। এই উপলক্ষে রাজস্থানের নয়টি জেলায় ৯৭টি সভার আয়োজন করা হয়—কয়েকটি সভায় স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ও স্বামী রঙ্গনাথানন্দ স্বামীজীর জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশন

গত ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৬৪ হইতে ৬ই জানুআরি ১৯৬৫ পর্যন্ত কলিকাতার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের প্রাঙ্গণে ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ৫১তম ও ৫২তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনের উদ্বোধক আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেন: এই সম্মেলনের মাধ্যমে আমরা মানবজাতির গৌরবময় ভবিষ্যতের জন্য কাজ করিয়া যাইতেছি। অধিবেশনের মূল সভাপতি শ্রীহুমায়ুন কবীর বলেন, বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য সর্ববিধ প্রচেষ্টা করিতে হইবে। সারা ভারত হইতে ১,৫০০ জন প্রতিনিধি ছাড়াও সমগ্র বিশ্ব হইতে ৩৫ জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানী অধিবেশনে যোগদান করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীর আনুপাতিক হার ২½ : ১। ১৯৬৩-৬৪ খৃষ্টাব্দে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮৫,১৪৬ জন ছাত্র ও ৩১,৯১৬ জন ছাত্রী ছিল। ১৯৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ক্লাসগুলিতে ৬,৬৯৬ জন ছাত্র ও ২,২৬৫ জন ছাত্রী ভরতি হয়। এক্ষেত্রে আনুপাতিক হার ৩ : ১।

আণব ঘড়ি

ওয়াশিংটন, ২৩শে জানুআরি, ১৯৬৫: মার্কিন সেনাবাহিনী সামরিক কাজে ব্যবহারের উপযোগী একটি হালকা আণব ঘড়ি প্রস্তুত করিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

এই ঘড়ির ওজন ৪৪ পাউণ্ড। ক্ষেপণাস্ত্র ও উপগ্রহ-সন্ধানের কাজে ইহা ব্যবহার করা চলিবে।

এই ঘড়ির মাধ্যমে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সময়ের পরিমাপ করা সম্ভব। এক সেকেণ্ডের ১,০০০ কোটি ভাগও ইহাতে পরিমাপ করা যায়।

—ইউ. এন. আই

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২১শে ফাল্গুন (৫. ৩. ৬৫) শুক্রবার শুভ শুক্লা দ্বিতীয়ায় বেলুড় মঠে ও অন্যত্র ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩০তম পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে পূজা, পাঠ ও উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে এবং ২৩শে ফাল্গুন, (৭ই মার্চ) রবিবার এতদুপলক্ষে বেলুড় মঠে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব হইবে।

দিব্য বাণী

নমস্তে পুরুষং ত্বাদ্যমীশ্বরং প্রকৃতেঃ পরম্।
অলক্ষ্যং সর্বভূতানামন্তর্বহিরবস্থিতম্॥ শ্রীমদ্ভাগবতম্—১৮।১৮

নমি তোমা আদিদেব, চরাচর-বিশ্ব-পতি
প্রকৃতির পারে তব ঠাঁই!
অন্তর-বাহির জুড়ি' সর্বভূতে আছ, তবু
কেহ তোমা দেখিতে না পায়।

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্॥ ১।৮।২৫

তোমার দরশ পেলে জগৎ মুছিয়া যায়—
টুটে যায় সব দুঃস্বপন!
অখিল-জগৎ-গুরু! যে বিপদে পাই দেব,
প্রাণারাম তব দরশন
সে বিপদে নাহি ডরি, আসুক তা বারে বারে—
হাসিমুখে করিব বরণ!

ত্বয়ি মেঽনন্যবিষয়া মতির্মধুপতেঽসকৃৎ।
রতিমুদ্বহতাদদ্ধা গঙ্গেবৌঘমুদন্বতি॥ ১।৮।৪২

বাধায় না রুদ্ধ হয়ে গঙ্গা যথা বহি চলে
অন্তহীন সাগরের পানে
অবিরাম অখণ্ড ধারায়,
আমার চিন্তার ধারা বিষয়ে না বদ্ধ হয়ে
তোমার চরণপানে যেন
সেইমত অবিরাম ধায়!

কথাপ্রসঙ্গে

ভারতের জাতীয় সংহতি ও সংস্কৃত ভাষা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ

পাশ্চাত্য হইতে প্রথমবার প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে একজন ইংরেজ বন্ধু স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "স্বামীজী, চার বৎসর বিলাসের লীলাভূমি, গৌরব-মুকুটধারী, মহা-শক্তিশালী পাশ্চাত্যভূমিতে ভ্রমণের পর আপনার মাতৃভূমি কেমন লাগিবে?" এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "পাশ্চাত্য-ভূমিতে আসিবার পূর্বে আমি ভারতকে ভালবাসিতাম। এখন ভারতের ধূলিকণা পর্যন্ত আমার নিকট পবিত্র, ভারতের বাতাস আমার নিকট এখন পবিত্রতা-মাখা, ভারত এখন আমার নিকট তীর্থ-স্বরূপ।"

ভারতের প্রতি স্বামীজীর এই অসীম শ্রদ্ধার কারণ, তিনি জানিতেন, মানবজাতির পক্ষে সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর ভাবগুলির উদ্ভব হইয়াছে এই ভারতবর্ষে, এবং "প্রভাতের কোমল শিশিরকণা যেমন লোকচক্ষুর অন্তরালে মনোরম গোলাপের কুঁড়িগুলিকে ফুটাইয়া তোলে", সেভাবে নিঃশব্দ-চরণপাতে সে সচ্চিন্তাগুলি সারা বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়া মানবজাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে—

"বুদ্ধদেব জন্মিবার অনেক পূর্ব হইতেই ইহা ঘটিতেছে। চীন, এসিয়া-মাইনর ও মালয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যভাগে এখনও তাহার চিহ্ন বর্তমান। যখন সেই প্রবল দিগ্বিজয়ী গ্রীক-জাতি তদনীন্তন পরিচিত জগতের সমগ্র অংশ একত্র গ্রথিত করিয়াছিল, তখনও এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। আর পাশ্চাত্যদেশ যে সভ্যতা লইয়া এখন গর্ব করিয়া থাকে, তাহা সেই মহাবন্যার অবশিষ্ট চিহ্ন মাত্র।" তাহারও পূর্বে, "যখন গ্রীসের জন্ম হয় নাই, রোমের কথা কেহ ভাবে নাই, বর্তমান ইউরোপীয়দের পূর্বপুরুষগণ বিচিত্র অঙ্গরাগে রঞ্জিত অসভ্য অরণ্যবাসী মাত্র ছিল, সেই সুদূর যুগেও ভারত তাহার সংস্কৃতির সাধনায় কর্মমুখর। তাহারও পূর্বে, যে দূর অতীতের সংবাদ ইতিহাসে পাওয়া যায় না, যাহার কুয়াশা ভেদ করিতে কিংবদন্তীও সঙ্কুচিত, সেই সময় হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত কত উচ্চ উচ্চ ভাব শান্তি ও শুভেচ্ছার বাণী বহন করিয়া ভারত হইতে জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।" "জগতের ইতিহাস পর্যালোচনা কর,—যেখানেই কোন সুমহান আদর্শের সন্ধান মিলিবে, দেখিবে উহার জন্ম ভারতবর্ষে।"

নিঃস্বার্থপরতা ও মানবপ্রেমের মূর্তপ্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ (তাঁহার নির্ভুল ভবিষ্যদ্দৃষ্টির কথা ছাড়িয়া দিলেও) জগতের ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া, সারা পৃথিবী ভ্রমণ জনিত অভিজ্ঞতা লইয়া নিজ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সহায়ে বুঝিয়াছিলেন যে ভারতের এই মঙ্গলময় উচ্চচিন্তাগুলিই বিশ্ব-মানবকে যথার্থ নিঃস্বার্থপর ও মানবপ্রেমিক করিয়া স্বার্থসঙ্ঘাতজনিত ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম। আর ভারতবর্ষের সর্ববিধ উন্নতির মূল প্রেরণার উৎসও এই সচ্চিন্তাগুলি—যাহা প্রধানতঃ আধ্যাত্মিকতা। যুগযুগান্ত ধরিয়া এই উৎস হইতেই প্রেরণা লাভ করিয়া ভারতবাসীরা অন্তর্নিহিত শক্তির দ্বার খুলিয়াছিল, রাজনীতি, সমাজনীতি ও জাগতিক উন্নতির অন্যান্য ক্ষেত্রে যে শক্তিকে প্রয়োগ করিয়া উন্নতির শিখরে উঠিয়াছিল। আধুনিক

যুগেও, গত শতকে ভারতবর্ষ সর্ববিধ অবনতির যে চরম প্রদেশে নামিয়া গিয়াছিল, সেখান হইতে যে শক্তি তাহাকে টানিয়া তুলিয়া উন্নতির পথ ধরাইয়াছে, তাহাও ভারতের এই উচ্চচিন্তা, আধ্যাত্মিকতা সম্ভূত। দক্ষিণেশ্বরের উদ্যানে এই মহাশক্তি পুনরুদ্বোধিত হইয়া এবং স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে সর্বভারতে পরিবেশিত হইয়া মৃতপ্রায় জাতিকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল। একথাও সর্বজনবিদিত যে আমাদের মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার জন্য রাজনৈতিক অগ্রগতির পথে সন্ধিক্ষণে যেসব দেশসেবকের জীবনে বিকশিত শক্তির অবদান বিপুল—তাঁহারাও শক্তিসংগ্রহ করিয়াছিলেন নবউদ্বোধিত ভারতের এই চিরন্তন আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস হইতেই। অগ্নিযুগের বীরের দল, মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র—সকলেরই জীবন আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক।

অতি প্রাচীনকালেই মানবজাতির সর্বোচ্চ ও তাহার পক্ষে সর্বাধিক কল্যাণকর ভাবগুলি উদ্ভূত হইয়াছে এই ভারতবর্ষে; সেই ভাবরাশি ভারতীয় চিত্তের স্থির প্রশান্ত অতি গভীর তলদেশ হইতে সূক্ষ্মাকারে উত্থিত হইয়া মানস-সাগরের উপরিভাগে আসিয়া চিন্তা-তরঙ্গাকারে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল সংস্কৃত শব্দরাশির হিন্দোলে। অন্যান্য দেশের মত ভারতেও যুগে যুগে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন আসিয়াছে, মহাদেশতুল্য এই ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষাগত, সামাজিক ও লৌকিক আচারগত বহুবিধ বিভিন্নতা বহির্দেশে বহুবার তাহাকে 'খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত' করিয়াছে; কিন্তু এসব সত্ত্বেও হাজার হাজার বছর পূর্ব হইতে আজ পর্যন্ত ভারতের মর্মবাণী প্রধানতঃ সংস্কৃত ভাষা দ্বারা বাহিত হইয়া সমগ্র ভারতকে একসূত্রে গাঁথিয়া রাখিয়াছে ভারতীয় জাতি হিসাবে। আধ্যাত্মিকতা বা ধর্ম ভারতের শুধু সর্ববিধ উন্নতির প্রেরণার উৎসই নয়, তাহার সংহতি-বিধায়কও, আর সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জাতির মর্মপ্রদেশে এখনো তাহার বাহক সংস্কৃত ভাষা। আজিও প্রভাত-মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যায় ভারতের সর্বত্র অমৃতলোকের সন্ধানপিয়াসী জনগণ প্রার্থনা করে সংস্কৃত ভাষায়। রামেশ্বর-কাশী-কেদারনাথে, দ্বারকা-শ্রীক্ষেত্রে আজিও সমবেত সর্বভারতীয় জনগণের চিত্ত একই ছন্দে দুলিয়া উঠে সংস্কৃত ভাষায় রচিত মন্ত্রগুলির উচ্চারণে; মহাত্মাজীর প্রার্থনাসভায় জনগণের হৃদয় আলোড়িত হইয়া শক্তির মূল উৎসের অভিমুখী হইত এই সংস্কৃত শব্দরাশিরই আবৃত্তিতে; অগ্নিযুগের শহীদদের নির্ভীক করিয়াছিল স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর সঙ্গে 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ'-মন্ত্রগর্ভ গীতার সংস্কৃত শ্লোকরাশি।

জাতির নিজস্ব দেবভাবে প্রতিষ্ঠিত নিঃস্বার্থপর, মানব-প্রেমোজ্জ্বল, তেজবীর্যময় মনুষ্যত্ব অর্জনের পথে ক্লীবতাকে, হৃদয়ের দুর্বলতাকে আমরা কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছি না এখনো; বরং মানবতার অগ্রগতির পথে পশ্চাদভিমুখী হইয়া অন্তরকে শুভসংস্কারবিমুক্ত করিয়া, তাহার উপর বাহিরের চাকচিক্য ও আদর্শের গিলটি লাগাইয়া তাহারই দিকে ঝুঁকিতে চাহিতেছি অনেকেই; অনেকে এখনো ভাবিতেছি, অন্তর-বাহির সর্ববিষয়েই জড়বাদী পাশ্চাত্যের মত হইতে পারিলেই আমরা উন্নতির চরম শিখরে উঠিব; আর সমগ্র জাতিকে টানিতে চাহিতেছি নিজ নিজ পথে।

দেশে ব্যাপকভাবে, এমন কি বহু উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির মধ্যেও অন্তরের দৈন্য আজ আমরা সকলেই দেখিতেছি, জাতির উন্নতির জন্য ইহার প্রতিকার যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা অনুভবও করিতেছি।

জাতির অন্তরের দেবভাবগুলিকে রক্ষা করিয়া ও বাড়াইয়া তুলিয়া সেইসঙ্গে তাহাকে শিক্ষা-সম্পদ-শক্তিতে জগতের উন্নততম জাতি-গুলির সমকক্ষ করিয়া তুলিতে হইলে দেশবাসীর মনে শৈশব হইতেই উচ্চজীবনের প্রতি অনুরাগ আনার, এবং সর্বোপরি উচ্চতর আনন্দের আস্বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তবেই পরজীবনে সর্ববিধ প্রলোভনকে উপেক্ষা করিয়া স্বদেশবাসীর ও বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য সে হৃদয়ের দুর্বলতাকে, স্বার্থপরতাকে বিনা দ্বিধায় ও স্বল্পপ্রয়াসেই বিসর্জন দিবার মত অন্তর্বলে বলীয়ান হইতে পারিবে। মনের উপর গভীর রেখাপাতকারী চিন্তা ও অন্তর্বলই জীবনের প্রধান পরিচালক। ভাসা ভাসা চিন্তা, কতক-গুলি কথার ফুলঝুরি মন হইতে বিপরীত চিন্তাকে সরাইতে পারে না, জীবনকে কোন উচ্চলক্ষ্যের পথেই স্থায়িভাবে পরিচালিত করিতে পারে না।

ভারতের প্রাণশক্তির উৎসের দিকে টানিয়া লইয়া, ভারতের মর্মবাণীর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আনিয়া আমাদের অন্তরে আমাদের জীবনের পক্ষে পরম কল্যাণকর চিন্তাগুলিকে দৃঢ়ভাবে গাঁথিয়া সেখানে শক্তিসঞ্চার এবং জাতীয় সংহতি-সাধন—এই উভয় কার্যে প্রভূত সহায়তা করিবে সর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার।

স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের জাতীয় উন্নতি ও জাতির সংহতি বিধান প্রসঙ্গে সংস্কৃতভাষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা বর্তমানে ভাষা লইয়া যে সব সমস্যা দেখা দিয়া জাতীয় সংহতির প্রতিকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিতেছে, তাহার সমাধানের উপর যথেষ্ট আলোক-সম্পাত করিবে।

সংস্কৃত সম্বন্ধে তিনি কবিত্বময় ভাষায় বলিয়াছেন—

"যুগ-প্রারম্ভে জাতির মনে ছিল কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা। অল্পকাল মধ্যে সেই জিজ্ঞাসাই বলিষ্ঠ বিশ্লেষণে পরিণতি লাভ করে।......"

"এই তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণশক্তির সম্মুখে এবং পশ্চাতে যেন একটি কোমল ও মসৃণ আচ্ছাদন ছিল এবং তাহারই মধ্যে সুরক্ষিত ছিল এই জাতির অপর একটি মানসিক বৈশিষ্ট্য—যাহাকে 'কবির অন্তর্দৃষ্টি' বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। এই জাতির ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র, পৌরবিজ্ঞান প্রভৃতি সবকিছুই যেন কবিকল্পনার পুষ্পবেদীতে স্থাপিত ছিল, এবং সেগুলিকে অন্য যে-কোন ভাষা অপেক্ষা সুন্দরতররূপে প্রকাশ করিয়াছিল এক বিচিত্র ভাষা—যাহার নাম 'সংস্কৃত' বা 'পূর্ণাঙ্গ' ভাষা। এমন কি গণিতের কঠিন সংখ্যাতত্ত্বসমূহ প্রকাশ করিতেও ছন্দোবদ্ধ শ্লোক ব্যবহৃত হইয়াছিল।"

জাতীয় জীবনের শক্তির উৎস আধ্যাত্মিক-তাকে সকলের নিকট পরিবেশনের জন্য আঞ্চলিক ভাষার সাহায্য লইবার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতশিক্ষার প্রসারেরও যে বিশেষ প্রয়োজন আছে, সে বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন—

"ভারতবাসী প্রথমে চায় ধর্ম, তারপর অন্য বস্তু। ঐ ধর্মভাবকে বিশেষরূপে জাগাইতে হইবে।......"

"আমার সঙ্কল্প এই: প্রথমতঃ আমাদের শাস্ত্রভাণ্ডারে সঞ্চিত, মঠ ও অরণ্যে গুপ্তভাবে রক্ষিত, অতি অল্পলোকের দ্বারা অধিকৃত ধর্মরত্নগুলিকে প্রকাশ্যে বাহির করা, ঐ শাস্ত্র-নিবদ্ধ তত্ত্বগুলিকে—শুধু যাহাদের হাতে গুপ্তভাবে রহিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতেই বাহির করিলে হইবে না, উহা অপেক্ষাও দুর্ভেদ্য পেটিকায় অর্থাৎ যে সংস্কৃত ভাষায় ঐ তত্ত্বগুলি রক্ষিত, সেই সংস্কৃত শব্দের শতশত শতাব্দীর কঠিন আবরণ হইতে বাহির করিতে হইবে।

এককথায়—আমি ঐ তত্ত্বগুলিকে সর্বসাধারণের বোধগম্য করিতে চাই; আমি চাই ঐ ভাবগুলি সর্বসাধারণের-প্রত্যেক ভারতবাসীর সম্পত্তি হউক, তা সে সংস্কৃত ভাষা জানুক বা না জানুক। এই সংস্কৃতভাষার—আমাদের গৌরবের বস্তু এই সংস্কৃতভাষার কাঠিন্যই এই সকল ভাব-প্রচারের এক মহান অন্তরায়; আর যতদিন না আমাদের সমগ্র জাতি উত্তমরূপে সংস্কৃতভাষা শিখিতেছে, ততদিন ঐ অন্তরায় দূরীভূত হইবার নহে।··· সুতরাং তাহাদিগকে অবশ্যই চলিত ভাষায় এই সকল তত্ত্ব শিক্ষা দিতে হইবে।"

"সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষাও চলিবে কারণ সংস্কৃতশিক্ষায়, সংস্কৃত শব্দগুলির উচ্চারণ মাত্রেই জাতির মধ্যে একটা গৌরব—একটা শক্তির ভাব জাগিবে।"

তিনি বলিয়াছেন যে রামানুজ, চৈতন্য ও কবীর সর্বসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তারের জন্য চেষ্টা না করায়, ভারতের নিম্নজাতিগুলিকে উন্নত করিবার জন্য তাঁহাদের প্রচেষ্টার ফল দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। বুদ্ধদেবও তাহাই করিয়াছিলেন—"কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার বিস্তার হওয়া উচিত ছিল।" চলতি ভাষায় শিক্ষাদানের ফলে "জ্ঞানের বিস্তার হইল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে 'গৌরববোধ' ও 'সংস্কার' জন্মিল না। শিক্ষা মজ্জাগত হইয়া কৃষ্টিতে পরিণত হইলে ভাববিপ্লবের ধাক্কা সহ্য করিতে পারে, শুধু বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানরাশি তাহা পারে না।···ঐ জ্ঞান মজ্জাগত হইয়া সংস্কারে পরিণত হওয়া চাই। আমরা সকলেই আধুনিক কালের এমন অনেক জাতির বিষয় জানি, যাহাদের এইরূপ অনেক জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহাতে কি? সে সকল জাতি ব্যাঘ্রতুল্য নৃশংস—অসভ্য, কারণ তাহাদের কৃষ্টির অভাব। সভ্যতার ন্যায় তাহাদের জ্ঞানও গভীর নয়, একটু নাড়া দিলেই ভিতরের আদিম অসভ্য প্রকৃতি জাগিয়া উঠে।"

"এইরূপ ব্যাপার জগতে ঘটিয়া থাকে; এই বিপদ সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে হইবে। সাধারণকে প্রচলিত ভাষায় শিক্ষা দাও, তাহাদিগকে ভাব দাও, তাহারা অনেক বিষয় অবগত হউক; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু প্রয়োজন। তাহাদিগকে কৃষ্টি দিতে চেষ্টা কর। যতদিন পর্যন্ত না তাহা করিতে পারিতেছ, ততদিন সাধারণের স্থায়ী উন্নতির আশা নাই। উপরন্তু একটি নূতন জাতির সৃষ্টি হইবে, যাহারা সংস্কৃতভাষার সুবিধা লইয়া অপর সকলের উপরে উঠিবে ও পূর্বের মতোই প্রভুত্ব করিবে।"

জাতির সংহাত-বিধানে সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"ঐশ্বর্যময় পাশ্চাত্যে চার বৎসর বাস করার ফলে ভারতবর্ষকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছি। অন্ধকার দিকগুলি গাঢ়তর এবং আলোকিত দিকগুলি উজ্জ্বলতর হইয়াছে।"

"প্রত্যেক দেশের যে সমস্যা, এখানেও সেই সমস্যা—বিভিন্ন জাতির একীকরণ; কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় এই সমস্যা অন্যত্র এত বিশাল-রূপে দেখা দেয় নাই।"

"ভাষাগত ঐক্য, শাসন-ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি ধর্ম—একীকরণের শক্তিরূপে কাজ করিয়াছে।"

"যে দেশে ঐক্যস্থাপনের জন্য বলপ্রয়োগই যথেষ্ট হইয়াছে, সে দেশে বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিচিত্র উন্নতির পন্থাগুলিকে অঙ্কুরেই নষ্ট করিয়া প্রধান গোষ্ঠীটিই উন্নত হইয়াছে। একটি বিশেষ শ্রেণী জনসাধারণের অধিকাংশকে স্বীয় মঙ্গলসাধনের জন্য ব্যবহার করিয়াছে; ফলে উন্নতির বেশীর-ভাগ সম্ভাবনাই বিনষ্ট হইয়াছে। ইহার ফলে যখন সেই প্রাধান্যপ্রয়াসী গোষ্ঠীটির প্রাণশক্তি

বিনষ্ট হইয়াছে, তখন গ্রীস রোম বা নর্মানদের ন্যায় আপাত-অভেদ্য জাতিসৌধগুলি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।”

“একটি সাধারণ ভাষার বিশেষ অভাব অনুভূত হইতে পারে; কিন্তু পূর্বোক্ত সমালোচনা অনুসারে একথাও বলা যায়, ইহা দ্বারা প্রচলিত ভাষাগুলির প্রাণশক্তি বিনষ্ট হইবে।”

“এমন একটি মহান পবিত্র ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে, অন্য সমুদয় ভাষা যাহার সন্ততিস্বরূপ। সংস্কৃতই সেই ভাষা। ইহাই (ভাষা-সমস্যার) একমাত্র সমাধান।”

“দ্রাবিড় ভাষাসকল সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে বাস্তব ক্ষেত্রে উহারা প্রায় সংস্কৃতই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দিনের পর দিন নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াই এই আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছে।”

যিনি ভারতের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করিয়া তাহার কল্যাণ-সাধনের উপায়গুলি এত গভীর-ভাবে চিন্তা করিয়াছেন যে দিনের পর দিন ঘুমাইতে পারেন নাই, যিনি আমাদের এত ভালবাসিতেন যে পাশ্চাত্য হইতে ভারতে ফিরিয়া বলিয়াছিলেন, “আমি তোমাদের নিকট আমার সমুদয় উদ্দেশ্য বলিতে আসিয়াছি। যদি তোমরা শুন, আমি তোমাদের সহিত কার্য করিতে প্রস্তুত। যদি না শুন, এমনকি আমাকে পদাঘাত করিয়া ভারতভূমি হইতে তাড়াইয়া দাও, তথাপি আমি তোমাদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিব—আমরা ডুবিতেছি।...যদি ডুবিতে হয়, তবে আমরা যেন সকলে একসঙ্গে ডুবি, কিন্তু কাহারো প্রতি যেন কটূক্তি প্রয়োগ না করি,”—তাঁহার সুচিন্তিত কথাগুলি আমরা যেন আজ গভীরভাবে ভাবিয়া দেখি এবং যেভাবেই হউক, প্রত্যেক ভারতীয় বিদ্যার্থীর নিকট সংস্কৃত ভাষাকে অবশ্যপাঠ্য করিবার ব্যবস্থা করি। জাতীয় কৃষ্টিকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়া জাতির সংহতি রক্ষার কাজে ইহা প্রভূত পরিমাণে সহায়তা করিবে।

সর্বভারতের এই চিরন্তন প্রাণের উৎসকে মৃতভাষা ভাবিয়া আমরা যেন উপেক্ষা না করি। সংস্কৃত সাহিত্যে, বিশেষ করিয়া মহাভারতে কিভাবে সমগ্র ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি জাতীয় জীবনের সর্ববিধ দিকগুলিতে উন্নতির পথে সুতীব্র আলোকসম্পাত করা হইয়াছে, উচ্চ-নীচ সব জীবনকেই জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় বিষয়েই উন্নততর করিবার জন্য বিপুল প্রয়াস রহিয়াছে, তাহা প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতবাসী প্রত্যক্ষভাবে জানিবার সুযোগ না পাইয়া ‘ধর্ম আমাদের জাতিকে নির্জীব করিয়াছে’—এখনও এই অতি ভ্রান্ত এবং জাতীয় সংহতিবিধায়ক শক্তির বিরোধী ধারণার বশবর্তী হইবার সুযোগ পাইবে কেন? সংস্কৃত শিক্ষার বহুল প্রচার জাতির ‘মূলদেশে অগ্নিসংযোগ’ করিবার ও ‘একটি অখণ্ড ভারতীয় জাতি গঠন’ করিবার নিশ্চিত পন্থাগুলির অন্যতম। অতীতের আলোচনা দুর্বলতার লক্ষণ, একথাও যেন আমরা মনে না করি—“লোকে আমাকে বলিয়াছে, পূর্ব-গৌরব স্মরণে মনের অবনতি হয় মাত্র, উহাতে কোন ফলোদয় হয় না; সুতরাং আমাদিগকে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য করিতে হইবে। সত্য কথা। কিন্তু ইহাও বুঝিতে হইবে যে অতীতের গর্ভেই ভবিষ্যতের জন্ম। অতএব যতদূর পার পশ্চাদ্দৃষ্টি কর, পশ্চাতে যে অনন্ত নির্ঝরিণী প্রবাহিত, প্রাণভরিয়া আকণ্ঠ তাহার সলিল পান কর; তারপর সম্মুখ-প্রসারিত দৃষ্টি লইয়া অগ্রসর হও, এবং ভারত প্রাচীনকালে যতদূর উচ্চ গৌরবশিখরে আরূঢ় হইয়াছিল, তাহাকে তদপেক্ষা উচ্চতর, উজ্জ্বলতর, মহত্তর মহিমাশালী করিবার চেষ্টা কর।”

শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রম্

স্বামী বিবিদিষানন্দ

(১)

যো হি সাক্ষাল্লোকাভিরামঃ
পতিতপাবনঃ সীতারামঃ ।১
যশ্চ দূর্বাদলশ্যামো রাঘবঃ
জগন্নাথঃ প্রভুঃ শ্রীরামচন্দ্রঃ ।২
যস্তু বৈ বৃষ্ণীনাং নয়নজ্যোতিঃ
অন্তর্জ্যোতিঃ পার্থসারথির্হরিঃ ।৩
যশ্চ ভূয়ো যোগীশ্বরো যজ্ঞেশ্বরঃ
স্বয়ং দেবাদিদেবো বাসুদেবঃ ।৪
তয়োরবতারং পরমেশ্বরম্
হৃদয়গতস্তমো বিনাশকরম্ ৫
করুণাময়ং মঙ্গলনিলয়ম্
মহাশয়ং ব্রাহ্মণতনয়ম্ ।৬
বহুগুণাকরং গদাধরম্
পরায়ণং শ্রীরামকৃষ্ণম্ ।৭
শরণং ব্রজে তং পুরুষশ্রেষ্ঠম্
ভবরোগভেষজং ক্লেশাপহম্ ।৮

(২)

নিত্যধ্যানপরং মগ্নযোগিবরম্
সচ্চিৎসুখং শান্তসমাহিতম্ ।১
নিরীহমচলং ধ্রুবং কেবলম্
উপাধিব্যাধিবিকল্পাদিশূন্যম্ ।২
সততং বিগতরাগভয়ক্রোধম্
সর্বত্র সমং তুল্যনিন্দাস্তবম্ ।৩
রক্ষকাণাং সদা রক্ষাকরম্
পতিতানাং চ পাবনবরম্ ।৪
মুমুক্ষূণাং ভববন্ধবিমোচকম্
শরণাগতনতস্য কল্পপাদপম্ ।৫
ভজনানুকূলং ভাববল্লভম্
ব্রহ্মবিজ্ঞানমূলমচলপ্রতিষ্ঠম্ ।৬
যং লব্ধ্বা মৃত্যুভয়মত্যেতি চিরম্
যস্য ভাসা বিভাতি সর্বমিদম্ ।৭
দিবাকরঃ শশধরস্তারকাবৃন্দম্
নমাম্যহং তং ভবরোগবৈদ্যম্ ॥৮

স্বামী তুরীয়ানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

(স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে লিখিত)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

মঠ
আলমবাজার
৩ জুন, ১৮৯৭

প্রিয়তম গঙ্গাধর,

গতকল্য তোমার একখানি হস্তলিপি পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। তুমি যে মহৎ কার্যের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছ, তাহার আর তুলনা নাই। আমি দুর্বল, তোমাকে আর কি উৎসাহিত করিব। সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি দুর্বলের বল, সকল শুভ উদ্দেশ্যের সিদ্ধিদাতা তোমার উদ্যম সফল করুন এবং তোমাকে অজর ও দীর্ঘজীবী করিয়া এইরূপ ও আরও শত শত জনহিতকর শুভ কার্যের উপযোগী করুন। তোমাকে দেখিবার জন্য বড় সাধ হইতেছে, কিন্তু তুমি এখন উচ্চকার্যে ব্রতী, সুতরাং তোমাকে কোনরূপ অনুরোধ করিব না, পূর্ণমনোরথ হইয়া ব্রত উদ্‌যাপনান্তে মঠে আসিয়া আমাদের মন ও নয়নানন্দ বর্ধন কর—এইমাত্র ইচ্ছা। রাজা তোমার পত্র পড়িয়াছেন এবং যথাযথ উত্তরও লিখিয়াছেন। স্বামীজী এবং তাঁহার সঙ্গীরা আলমোড়ায় অতি আনন্দে আছেন—সংবাদ আসিয়াছে। শশীর নিকট হইতে তুমি পত্রাদি পাইয়া থাক বোধ হয়। শশী ভাল আছেন ও মঠ হইতে একজনকে তাঁহার নিকট পাঠাইতে লিখিয়াছেন। বোধহয় গুকুল মহাশয় শীঘ্রই মাদ্রাজে যাইবেন। রামনাদের রাজা মাদ্রাজের মঠ-খরচের জন্য মাসিক একশত টাকা দিতেছেন। শরতের পত্র আসিয়াছে, সে ভাল আছে ও বেশ কার্য করিতেছে। হরিদাসীরও পত্র আসিয়াছে, শরতের সুখ্যাতি ও যশে পূর্ণ; আর তার শ্রীগুরুদেবের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির কথা কি লিখিব! আমাদের লজ্জা হয়। শরৎ শীঘ্রই Green Acreএ আসিবে। শরৎ তোমাকে ভালবাসা দিয়াছে জানিবে। তুমি কি শরৎ ও কালীকে পত্র লিখিয়াছ? কালী বোধহয় শীঘ্রই আমেরিকা যাইবে। মাদ্রাজ হইতে এখনও কোন টাকা আইসে নাই; আসিলেই পাঠাইয়া দিব। রাজা তিন দিন পূর্বে তোমাকে ৯৫৲ টাকা পাঠাইয়াছেন এবং আজ ১০৲ টাকা পাঠাইতেছেন। প্রাপ্তি-সংবাদ দিবে। এখানে অতিরিক্ত গরম পড়িয়াছে, ইচ্ছামত অধ্যয়নাদি হইতেছে না। স্বামীজীর প্রচলিত নিয়মানুসারে মঠের সমস্ত কার্য সুচারুরূপে নির্বাহ হইতেছে। কলিকাতার সভাও বেশ চলিতেছে। তুমি এ সময় এখানে থাকিলে বড় ভাল হইত। দীননাথ কিছুদিন হইল ৺কাশী যাত্রা করিয়াছে, পঞ্জাব যাইবার ইচ্ছা আছে। Madras-এর Kidi স্বদেশ যাত্রা করিয়াছিল, কাল telegram আসিয়াছে, সে নিরাপদে মাদ্রাজে পঁহুছিয়াছে। নিত্যানন্দ ও সুরেশ্বরানন্দকে আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা দিবে এবং তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা জানিবে। ইতি

তোমারই
শ্রীহরি

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাবের পটভূমিকা

স্বামী গম্ভীরানন্দ

শত শত বৎসর পরাধীন থাকার পরের কথা। বিজিত জাতিসুলভ অনেক দোষই ভারতীয় জীবনের মর্মে মর্মে প্রবেশ করিয়াছিল; তবু ভারতীয় সংস্কৃতি স্বীয় সুকৃতিবলে এবং ভগবানের আশীর্বাদে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই—উহা শত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল, যদিও উহার প্রসার ও গাম্ভীর্য ক্রমেই সঙ্কুচিত ও বিধ্বস্ত হইয়া এক বিকট পরিস্থিতি আনয়ন করিতেছিল। পর পর বহু শক্তিশালী বিদেশীয় ভাবরাশির প্রতিঘাতে ভারতজীবন তখন সন্ত্রস্ত। এইরূপ অবস্থার সম্মুখীন হইয়া সে আত্মরক্ষার্থ অনেক অস্বাভাবিক ও অবাঞ্ছনীয় উপায় অবলম্বনেও বাধ্য হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে বহির্দেশ হইতে ভারতের উপর অনেক কিছু আরোপিত হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভারতের নিজস্ব ধর্মের কোন ভেদসূচক নাম না থাকিলেও বিধর্মীরা যখন ভারতে আগমনের পরও তাহাদের চিরাচরিত প্রথানুসারে স্বীয় পৃথক সত্তার সংরক্ষণে এবং উহাকে অধিকতর মর্যাদাদানে উন্মুখ হইল, তখন বেদসম্ভূত সুপ্রাচীন সনাতন ধর্মকে তাহারা বলিল হিন্দুধর্ম। ইহার ফলে যে ভারতবাসীরা এ যাবৎ ধর্মকে ধর্ম বলিয়াই জানিত তাহারা এখন হইতে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি অবলম্বনে আপনাদিগকে হিন্দু ও অপরদিগকে বিবিধ ধর্মাবলম্বী বলিয়া ভাবিতে বাধ্য হইল। ধর্মাবলম্বনে যে ভারতবাসী শান্তির পথে অগ্রসর হইতেছিল, সে আজ ধর্মকে বিবাদ-বিচ্ছেদের অন্যতম হেতুরূপে দেখিতে শিখিল। ধর্মান্ধতা আধ্যাত্মিকতার আসন কাড়িয়া লইল। আবার বৌদ্ধধর্মের অবস্থানকালে উহার মধ্যে যে সকল অবনতির কারণ অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা হিন্দুধর্মেও অনেকটা অনুসঞ্চারিত হইল। বৌদ্ধদের নেতিবাদ ও নির্বিচারে সন্ন্যাসগ্রহণ-প্রথা ভারতীয় সমাজকে কর্মবিমুখ ও দুর্বল করিল। বৌদ্ধধর্মের দ্রুতপ্রসারের ফলে ভারতের বহির্ভূত যে সকল অনুন্নত দেশবাসী বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়া ভারতের সহিত অধিকতর সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানে প্রবৃত্ত হইল, তাহারা স্ব-স্ব ভাবধারার দ্বারা ভারতকেও গৌণভাবে প্রভাবিত করিল। এইসব কুপ্রথার নিবারণ-কল্পে হিন্দুসমাজ আপনাকে বিবিধ নিগড়ে বন্ধন করিতে লাগিল—বিদেশগমন প্রায় নিষিদ্ধ হইল এবং হিন্দু রাজশক্তির অভাব পূরণার্থ পুরোহিতকুল সমাজপালন-ব্যবস্থা স্বহস্তে তুলিয়া লইলেন। মুসলমানদের বলপূর্বক ধর্মান্তরিত-করণ হইতে আত্মরক্ষাকল্পে হিন্দুর জাতিভেদ-প্রথা দৃঢ়তর আকারে সমাজের স্কন্ধে আরোপিত হইল। আর মুসলমানদের অনুকরণে নারীদের অবরোধ-প্রথা হিন্দুসমাজও স্বীকার করিয়া লইল। ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, সমাজ স্বাভাবিক সবল পন্থাবলম্বনে আত্মবিকাশের অবকাশ না পাইয়া বিকরাল বামাচারাদি গোপন অনুষ্ঠানের আশ্রয় লইল—ধর্মের নামে এক অন্তর্ঘাতী অনাচার ভারতীয় সমাজে আসন পাতিল। বিদেশীরা ভারতীয়দের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অপেক্ষা আপন ঐশ্বর্যবৃদ্ধি ও ভোগব্যবস্থায় অধিকতর মনোনিবেশ করায় দেশে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইল এবং রোগ, অকালমৃত্যু, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি

ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। বস্তুতঃ ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ-ব্যবস্থা, শিল্প, বাণিজ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে ভারত তখন বিব্রত ও পথহারা—বুঝি বা ভারতীয়দের ভারতীয়ত্ব চিরতরে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায়।

এই বিপদের শেষভাগে আবার আসিল পাশ্চাত্য জাতিসমূহ—বিশেষতঃ ইংরেজগণ। তাহাদের ধর্ম, হাবভাব, চলন-বলন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। তাহাদের বাণিজ্য ও সংস্কৃতি-প্রসারের রীতিও অন্যরূপ। মুসলমানদের ন্যায় অস্ত্রমাত্র সহায়ে রাজ্যবৃদ্ধি, অর্থলুণ্ঠন বা ধর্মান্তরিত-করণ তাহাদের উদ্দেশ্য নহে। বাণিজ্য-ব্যপদেশে ধনলুণ্ঠনই তাহাদের প্রধান প্রয়োজন এবং এই কার্যে সহায়তালাভের জন্য পরদেশ-বাসীদের মধ্যে স্বকীয় কৃষ্টির প্রচার করিয়া, প্রাচ্যবাসীর হৃদয়ে প্রতীচ্য-সদৃশ আভিজাত্য-লাভের লালসা জাগাইয়া এবং সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে প্রাচ্যবাসীকে প্রতীচ্যের নিকট হেয়তা স্বীকার করাইয়া শুধু বাহ্যজগতে নহে, অন্তর্জগতেও চিরদিনের মতো আধিপত্য স্থাপন করিয়া সে যুগের ইংরেজগণ ভারতকে অনন্তকাল ধরিয়া শাসন করিবার সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছিল। ইউরোপীয়ানদের আগমনের পূর্বে যে সব বিদেশী ভারতে রাজত্ব বিস্তার করিয়াছিল, সভ্যতার ক্ষেত্রে তাহারা ভারত অপেক্ষা অগ্রাধিকারের দাবি রাখিত না। দৈহিক শক্তি ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতার ফলেই তাহারা স্বাধিকার স্থাপন করিত এবং কয়েক পুরুষ পরে ভারতের সমাজে তাহাদের অস্তিত্ব প্রায় হারাইয়া ফেলিত। মুসলমানদের সম্বন্ধে ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঠিক এতখানি সত্য না হইলেও অর্থ, রাজনীতি, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইহা বহুলাংশে সত্য—তাহারাও শেষ পর্যন্ত ভারতকেই স্বদেশ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু ইংরেজরা ভারতীয়দের দৃষ্টিতে প্রধানতঃ শাসক ও শোষকরূপেই আবির্ভূত হইল। ইংরেজদের সাংস্কৃতিক অভিযানের উদ্দেশ্য এই ছিল যে ভারতবাসীরা স্ব স্ব গৃহে ভাষা ও আকৃতিগত পৃথক সত্তা বজায় রাখিলেও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এবং ইংরেজপ্রভুদের সহিত আদান-প্রদান-কালে সর্বতোভাবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুকরণ করিবে এবং উহারই আনুগত্য স্বীকার করিবে।

ইংরেজরা ভারতবর্ষে যে শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তন করিলেন, তাহা ইংরেজদেরই প্রয়োজন-সাধনের অনুকূলরূপে রচিত হইয়াছিল। ইংরেজ বণিক ও পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসকবর্গের কার্যে সহায়তার জন্য এই শ্রেণীর মসীজীবী সৃজনই ছিল তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই নবীন শিক্ষাপ্রাপ্ত নূতন সমাজ যাহাতে ইংরেজের প্রতি সশ্রদ্ধ হয়, সেদিকেও ইংরেজদের যথেষ্ট দৃষ্টি ছিল। এই সুপরিকল্পিত কার্যধারা বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল। পাঠ্যপুস্তক, সংবাদপত্র ও ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে পরিষ্কার ভাষায় ভারতবাসীকে বলা হইত, ভারতবর্ষের নিজস্ব এমন কোন বিশেষত্ব নাই যাহাকে আধুনিক জগতে বাঁচাইয়া রাখা আবশ্যক; বরং ভারতকে প্রগতিশীল হইতে হইলে সব কিছুই বিদেশ হইতে গ্রহণ করিতে হইবে—বেশ, ভূষা, খাদ্য, আদব-কায়দা, ব্যক্তিগত ধর্ম ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য কৃষ্টির মান অতি উচ্চ। পাশ্চাত্য সভ্যতা উন্নততর বলিয়াই পাশ্চাত্য রাষ্ট্র প্রভাবশালী ও বিজয়মণ্ডিত হইয়াছে; অতএব উচ্চাকাঙ্ক্ষী অপর জাতিকেও স্বীয় উন্নতির জন্য ঐ সভ্যতাকেই নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। পাশ্চাত্য মনীষীরা প্রমাণ করিলেন যে, অতীতকালে ভারতে যে সব চিন্তারাজি প্রকাশ পাইয়াছিল, কিংবা শিল্প-বিজ্ঞানাদির ক্ষেত্রে যে সব উন্নতি সাধিত

হইয়াছিল, তাহা বস্তুতঃ গ্রীক সভ্যতার আনুকূল্যে সম্ভব হইয়াছিল—মৌলিকতা ভারতের নহে —গ্রীসের, মিশর বা আরবের। ভারতের যাহা নিজস্ব বস্তু, তুলনার দৃষ্টিতে তাহার মূল্য অকিঞ্চিৎকর। ভারতের বেদান্ত স্বপ্নবিলাসীর অলীক বৃথা চিন্তা মাত্র; ভারতের বেদ চাষীর সঙ্গীত ব্যতীত আর কিছুই নহে; ভারতের ধর্ম এক নিম্নতর সভ্যতার পরিবেশে উদ্ভূত ও পরিপুষ্ট; উন্নততর সভ্যতামধ্যে উহার আসন অটল থাকিতে পারে না। বিদ্যালয় হইতে এবং অন্যান্য প্রচারের মাধ্যমে ভারতবর্ষে এই প্রকারের যে শিক্ষা বিস্তার লাভ করিতেছিল, স্বামীজী তাহাকে বলিয়াছেন নেতি-মূলক শিক্ষা, আর বলিয়াছেন, এই শিক্ষাবলম্বনে কোন স্বাধীন জাতি গড়িয়া উঠিতে পারে না, আত্মস্থ হইয়া দৃঢ়পদক্ষেপে উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে পারে না। কিন্তু স্বামীজীর আগমনের পূর্বে এই সহজ সত্যটি ভারতীয় মনে উদিত হয় নাই। বরং এই সকল মুখরোচক কথা, ঐশ্বর্যের চাকচিক্য, বিলাস-বৈভবের আকর্ষণ ও অস্ত্রশস্ত্রের অদম্য শক্তির সম্মুখে ভারতপ্রতিভা একান্ত ম্লান হইয়া গিয়াছিল। ভারতীয় সমাজ স্বীয় প্রাচীন কৃষ্টির পটভূমিতে সময়োপযোগী নব নব সবল ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরিবর্তে "পরানুকরণ, পরানুবাদ, দাসসুলভ দুর্বলতার" আশ্রয় লইয়াছিল। শিক্ষিত সমাজ তখন ইংরেজের ন্যায় পান-ভোজন, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি লইয়া ব্যস্ত। প্রকাশ্যভাবে অখাদ্য-ভক্ষণ ও মদ্যপান তখন সভ্যতার অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। ইংরেজের তীব্র সমালোচনায় বিক্ষুব্ধ নবীন সম্প্রদায় তখন হিন্দুসমাজকে ঢালিয়া সাজিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ভারত-সংস্কৃতির তরী তখন কর্ণধারহীন হইয়া পাশ্চাত্য বায়ুপ্রভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ভাসিয়া চলিয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতের বায়ু কতরকম বিরুদ্ধ সমালোচনা, জড়বাদ ও নাস্তিকতার দ্বারাই না বিষাক্ত হইয়াছিল! একদিকে খৃষ্টান মিশনারীরা হিন্দুধর্মের নিন্দায় শতমুখ এবং ছলে বলে কৌশলে ধর্মান্তরিত করিতে কৃতসঙ্কল্প; আর অপরদিকে ধর্মবিমুখ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান স্বীয় সাফল্যে গর্বিত হইয়া ভক্তিশ্রদ্ধা, গুরুপরম্পরা, ঐতিহ্য, রীতিনীতি প্রভৃতিকে নস্যাৎ করিতে কৃতনিশ্চয়। এই পাশ্চাত্য ধর্ম ও বিজ্ঞানের যুগপৎ আক্রমণের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকা বড় সহজ ছিল না। তথাপি ভারতের মতো একটা সুপ্রাচীন দেশ—যে সহস্র সহস্র বৎসর অতীত গৌরব বক্ষে ধারণ করিয়া এবং অতীতের নির্দিষ্ট পথে চলিয়া শত শত বাধাবিপত্তি অতিক্রম পূর্বক যুগোপযোগী অভিনব সাধনপ্রণালী আবিষ্কার করিয়াছে, অপরকে শিখাইয়াছে, এবং চিরকাল আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছে, সে এত সহজে ধ্বংস হইতে পারে না—ভারতের ভাগ্যবিধাতা তাহা হইতে দিতে পারেন না; কেন না তাহা হইলে জগৎ হইতে এমন এক বস্তু চিরবিলুপ্ত হইয়া যাইবে, যাহা অপূরণীয়।

অতএব নৈরাশ্যপূর্ণ বিপর্যয়ের মুখেও প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত হইল এবং জাতীয় আত্মরক্ষাশক্তি ক্রমেই মস্তকোত্তলনে উদ্যত হইল। অবশ্য প্রথমেই উহা স্ব-প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই; বরং উহা পাশ্চাত্য ভাবরাশির সহিত আপস করিয়া চলার পথই বাছিয়া লইয়াছিল, এবং এই প্রকার একটা আংশিক পরাজিততুল্য মনোবৃত্তি লইয়া তদানীন্তন সভ্য-সমাজে অতি উচ্চ না হইলেও নিজের মতো একটু সম্মানের স্থান করিয়া লইতে সচেষ্ট হইয়াছিল।

আত্মরক্ষার পথে যাঁহারা চলিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহাদের অগ্রণী ও পথিকৃৎ

ছিলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪—১৮৩০)। তিনি ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে নিরাকার একেশ্বরের উপাসনারূপে 'আত্মীয় সমাজ' প্রতিষ্ঠিত করেন এবং উহাই পরে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে একটি 'ইউনিটেরিয়ান্ এ্যাসোসিয়্যাসন' (একেশ্বরবাদ-সমিতি) এবং তাহারও পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫) 'ব্রাহ্ম-সমাজ' নামে পরিচিত হয়। অতঃপর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বোম্বে নগরে 'আর্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ঐ বৎসরই মাদাম ব্ল্যাভাট্স্কি থিয়োজফিক্যাল সোটাইটির সূত্রপাত করেন। শেষোক্ত সোসাইটি প্রথমে নিউইয়র্কে স্থাপিত হইয়া ভারতীয় প্রয়োজনানুসারে কথঞ্চিৎ পরিবর্তিতাকারে ভারতে প্রসারিত হয়। এই তিনটি ধর্মান্দোলনই প্রধানতঃ সমাজ ও ধর্মের সংস্কারকে স্বীয় সাম্প্রদায়িক প্রচেষ্টার অন্যতম মূল উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করেন এবং ভগবৎ-প্রেরণার স্থলে বিচারসহ ও বুদ্ধিপ্রসূত সাধনাবলীকে প্রাধান্য দেন।[১]

ব্রাহ্মসমাজ ছিলেন ধর্মক্ষেত্রে একেশ্বরবাদী, মূর্তিপূজাবিরোধী, গুরুবাদে অবিশ্বাসী, ও অবতারবাদ-বিদ্বেষী। সমাজক্ষেত্রে তাঁহারা নারী-শিক্ষার প্রসার, স্ত্রীস্বাধীনতা ও জাতিভেদপ্রথা-নিরোধের প্রতি ঝুঁকিয়াছিলেন। তাঁহারা বাল্য-বিবাহপ্রথাও উচ্ছেদ করিতে চাহিয়াছিলেন; কেশবচন্দ্র স্বীয় দুহিতার বিবাহকালে উহা অমান্য করায় তাহার প্রতিবাদকল্পে শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির নেতৃত্বে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব হয় ও অতঃপর কেশবের নেতৃত্বাধীনে নববিধান সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাজা রামমোহন রায় বহুবিষয়ে নবীন ভারতের পথপ্রদর্শক হইলেও, তিনি ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতিকে সামূহিকভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই; হিন্দুধর্মকেও তিনি সামগ্রিকভাবে সম্মান প্রদান করেন নাই। শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি সংস্কৃতকে প্রাধান্য না দিয়া ইংরেজীকেই উচ্চাসন দিয়াছিলেন। সমাজ-ব্যবস্থায় তিনি সংস্কারের পথে চলিতে চাহিয়াছিলেন, যদিও ঐ জাতীয় চিন্তাধারা তাঁহার সময়ে তেমন প্রাধান্য লাভ না করিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনধারার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য সতীদাহপ্রথা নিবারণে ও সমুদ্রযাত্রা প্রবর্তনে তাঁহার যথেষ্ট অবদান ছিল। গোঁড়া হিন্দুসমাজের দৃষ্টিতে রামমোহনের এই জাতীয় চেষ্টা ধর্মবিরোধী মনে হইলেও রাজা তদানীন্তন ভারতে একটা উদারতাপূর্ণ গতিশীল মনোভাব অনুসংক্রমিত করিতে চাহিয়াছিলেন এবং কথঞ্চিৎ কৃতকার্যও হইয়াছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুষ্টিমেয় ব্যক্তি এই নবীন নেতৃত্ব মানিয়া লইলেও, বিরাট হিন্দুসমাজ ইহাতে সাড়া দেয় নাই। রাজার চিন্তারাজ্যে কেমন যেন একটা পরাজিতসুলভ মনোভাব আত্মপ্রকাশ করিয়া জাতির আত্মশ্রদ্ধায় আঘাত করিল এবং জাতি তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিতে পারিল না। রামমোহন মুসলমান ও খৃষ্টানদেরই মতো প্রতিমাপূজাকে পৌত্তলিকতা বলিয়া জানিয়াছিলেন এবং তাহাদেরই ভাষায় নিন্দাও করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে পৌত্তলিক সমাজে নৈতিকতার অবনতি ঘটে, অবৈধ সম্বন্ধের পথ উন্মুক্ত হয়, এবং আত্মহত্যা, নারীহত্যা, নরমেধ যজ্ঞ প্রভৃতির উদ্ভব হয়; পৌত্তলিক জাতির মধ্যে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হয় না, সেখানে মূর্খতাই

১। 'I have already pointed out that in Debendranath's case, and still more that of his successors, reason had a tendency to be confused with religious inspiration'—Romain Rolland's life of Ramakrishna, Page—112.

প্রশ্রয় পায়।[২] কাজেই বৈদান্তিক ধর্মের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন বোধ করিলেও রাজা উপনিষদ্ অবলম্বনে শুধু সগুণ নিরাকারের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন, নির্গুণ নিরাকারের কিংবা সগুণ সাকারের উপাসনা তাঁহার সুমার্জিত ধর্মমতে স্থান পাইল না।[৩] ইংরেজদেরই ন্যায় রামমোহন স্বীকার করিলেন, জাগতিক অভ্যুদয় লাভের জন্য হিন্দুদিগকে স্বীয় ধর্ম সংশোধিত করিতে হইবে। ফলতঃ রাজনৈতিক জীবনে সুযোগ-সুবিধা লাভ এবং সামাজিক জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের অভিপ্রায়ে রামমোহন ধর্ম-সংস্কারে ব্রতী হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা চলে।[৪] তিনি চাহিয়াছিলেন একটা বুদ্ধিপরি-কল্পিত সার্বভৌম ধর্মাবলম্বনে ভারতীয় সমাজকে সুসংবদ্ধ ও সতেজ করিয়া তুলিতে। গোষ্ঠীর নিষ্পেষণ হইতে মুক্ত করিয়া তিনি ভারতবাসীকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রদানেরও স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়; অন্ততঃ ব্যক্তিগত জীবনে তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। রামমোহন ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার করিয়া স্বদেশকে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে সুসমৃদ্ধ ও এশিয়াখণ্ডের নেতৃপদে অধিষ্ঠিত দেখিতে চাহিয়াছিলেন।[৫]

রাজা রামমোহনের মধ্যে যে সকল ভাবরাশি কখনও ক্ষীণধারায় এবং কখনও প্রবলাকারে প্রবাহিত ছিল, উহাই ক্রমে ব্রাহ্ম সমাজকে অবলম্বন করিয়া প্রকটতর মূর্তি ধারণ করিল। রাজা আপনাকে অহিন্দু বলেন নাই; আদি ব্রাহ্ম সমাজও সনাতন ভাবধারার সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইতে চাহেন নাই—দেবেন্দ্রনাথ মূলতঃ ভারতীয় ছিলেন। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান ক্রমে উগ্র পন্থা অবলম্বন পূর্বক হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বিবাহ ও আহার-বিহারে জাতিভেদ অস্বীকার করিল। নববিধান বিভিন্ন ধর্মের সারাংশ গ্রহণ করিয়া, বিশেষতঃ যীশুখৃষ্টকে প্রাধান্য দিয়া এক নব ধর্মমতের রচনায় প্রবৃত্ত হইল।[৬] যৌবনে কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪) দেবেন্দ্রনাথেরই শিষ্যস্থানীয় ও সহকারী ছিলেন। পরন্তু শিষ্যের মনে এইসব নবীন ভাবের

২। " the source of prejudice and superstition and of the total destruction of moral principles as countenancing criminal intercourse, suicide, female murder and human sacrifice"—মুণ্ডকোপনিষদের ভূমিকা।

"Idolatrous nations have checked or rather destroyed every mark of reason and darkened any beam of understanding."

—কেনোপনিষদের ভূমিকা।

৩। "The Theism of Roy claims to rest on two poles—The 'absolute' Vedanta and the Encyclopaedic thought of the eighteenth century—on the formless God and Reason. It was not easy to define and it was still less easy to realise after he had gone"

—Rolland's *Life of Ramakrishna*, p. 105,

৪। "It is, I think, necessary that some change should take place in their religion at least for the sake of their political advantage and social comfort"

—মিঃ ডিগ্ বীকে লিখিত রামমোহনের পত্রাংশ।

৫। "He went so far as to wish his people to adopt English as their universal language to make India Western socially and then to achieve independence and enlighten the rest of Asia... Far from desiring the expulsion of England from India, he wished her to be established there in such a way that her blood, her gold, and thought would mingle with the Indian, and not as a blood-sucking ghoul leaving her exhausted".—*Life of Ramakrishna*, P 107.

৬। Christ had touched him (Keshav) and it was to be his mission in life to introduce him into the Brahmo Samaj, and into the heart of a group of the best minds in India. When he died the *Indian Christian Herald* said of him, "The Christians looked upon him as God's messenger, sent to awake India to the spirit of Christ. Thanks to him, hatred of Christ died out."—*Ibid.*—p 115.

আলোড়ন দেবেন্দ্রনাথ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। পরিশেষে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ উপস্থিত হইল। তখন কেশব প্রকাশ্যভাবে যীশুখৃষ্টের প্রচার আরম্ভ করিলেন। ইহাতে ব্রাহ্মসম্প্রদায়ে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হওয়ায় কেশব অন্যান্য সম্পদায়ের মহাপুরুষের প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে লাগিলেন, এমনকি বিভিন্ন ধর্মমতের বিশিষ্ট বাণী উদ্ধৃত করিয়া সমাজের উপাসনাকালে ব্যবহার করিতে থাকিলেন। ক্রমে বৈষ্ণবোচিত ভক্তিসাধনার কীর্তনাদি অঙ্গবিশেষও স্বীকার করিলেন।[৭] তদ্ব্যতীত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশাধিকার পাইলেন। এমনকি, তিনি আরও অগ্রসর হইয়া প্রচার করিলেন যে, হিন্দুদের দেবদেবীর রূপ অস্বীকার্য হইলেও প্রত্যেক দেবদেবী এক একটি ভাবের প্রতীক—ইহা অস্বীকার করা চলে না। এইরূপে সকল ধর্মের সহিত একটা বৌদ্ধিক, বাচনিক ও আনুষ্ঠানিক সামঞ্জস্য অবলম্বনে তিনি এক সার্বভৌম ধর্মের প্রবর্তনে প্রয়াসী হইলেও সর্বতোভাবে কোন ধর্মকেই গ্রহণ করিলেন না। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ সে সার্বভৌম ধর্মেও স্থান পাইল না, দেবদেবী সে নবধর্মমন্দিরের বহির্ভাগেই পড়িয়া রহিলেন, সাকারের পূজা এবং যাগযজ্ঞাদিও স্বীকৃতি লাভ করিল না। সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রেও অপর ব্রাহ্মদের দৃষ্টিতে তিনি সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিলেন না—বাল্যবিবাহের বিরোধী হইয়াও তিনি অপ্রাপ্ত-বয়স্কা কন্যাকে কোচবিহাররাজের হস্তে অর্পণ করিলেন। ইহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে তাঁহার বহু প্রধান অনুগামীও তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন। অতঃপর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে নববিধান সমাজ রূপ-পরিগ্রহ করিল।

বলা বাহুল্য এই সকল পরিবর্তন, পরিবর্জনাদি বিষয়ে হিন্দুসমাজও সচেতন ছিল এবং তখনকার সাময়িক সাহিত্য সংস্কারপন্থী ও সংস্কার-বিরোধীদের বাদবিবাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। এবং যুক্তি যাহারই প্রবলতর হউক না কেন, হিন্দুসমাজের জনসাধারণ এই নবীন বার্তায় সায় দেয় নাই, যদিও রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি অনেকে প্রগতির প্রয়োজন স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন ফলতঃ খৃষ্টান মিশনারী-দের ধর্মান্তরিতকরণ প্রচেষ্টা ব্রাহ্মপ্রভাবে কিঞ্চিৎ প্রতিহত হইলেও ব্রাহ্মসমাজের অভিপ্রায় আশানুরূপ ফলপ্রদ হয় নাই; সুবিশাল হিন্দুসমাজ এই নবীন কার্যধারায় পরিচালিত হয় নাই। ব্রাহ্মপ্রভাব উচ্চশিক্ষিতদের স্তর-বিশেষেই সীমাবদ্ধ রহিয়া গেল। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কেশবের দেহত্যাগকালে তিনটি ব্রাহ্মসমাজের সভ্যসংখ্যা ছিল মাত্র ৬,৪০০।

কেশবচন্দ্রেরই সমকালে ব্রাহ্মসমাজের পাশ্চাত্যানুকরণের প্রতিপক্ষরূপে হিন্দুসমাজেরই এক ব্যক্তি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলেন; তিনি

৭। বেলঘরিয়ায় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মিলন হয়—ইহাই লোকপ্রসিদ্ধ। কিন্তু 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে'র কোন কোন স্থল দর্শনে এই বিষয়ে সন্দেহ জাগে—মনে হয় শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে অন্ততঃ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে দেখিয়া থাকিবেন। দেবেন্দ্রনাথের সহিত বিচ্ছেদের পর ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর কেশবচন্দ্র 'ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজ' স্থাপন করেন এবং ১৫ই নভেম্বর 'আদি ব্রাহ্মসমাজ'-এর নামকরণ হয়। ইহার পরে কেশবচন্দ্র আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদিতে বসেন নাই। অথচ 'কথামৃতে' আছে, 'কেশব সেনকে প্রথম দেখি আদি ব্রাহ্মসমাজে' (২।১৯।২); "জোড়াসাঁকোর দেবেন্দ্রের সমাজে গিয়ে দেখলাম কেশব সেন বেদিতে বসে ধ্যান করছে" (৩।১৪।৩)। প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের মতে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে কেশবচন্দ্র বৈষ্ণবদের মতো কীর্তনাদি আরম্ভ করেন (ইংরেজী জীবনী ১৮৭-৮৮ পৃঃ)। 'কথামৃতে' আছে, "কেশবকে বললাম, 'তোমরা হরিনাম করো'…তখন ওরা খোলকরতাল নিয়ে হরিনাম করলে।" (৫।১৫।৪)। শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরের সহিত দেবেন্দ্রভবনে যান—মথুরের দেহ-ত্যাগের তারিখ ১৪।৭।৭১। 'কথামৃত'-কারের মতে কেশব পূর্ব হইতেই খোল লইয়া কীর্তন আরম্ভ করিয়া থাকিলেও হরিনাম কীর্তন আরম্ভ করেন শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাতের পর।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪—৮৩)। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল তারিখে তিনি যে আর্যসমাজ প্রবর্তিত করেন, তাহার সহিত ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন বিষয়ে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, এবং উহা সেই যুগের মনোভাবেরই প্রতিফলন বলিয়া অনুমিত হয়। দয়ানন্দ ছিলেন গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরোধী, জাতিভেদের উচ্ছেদে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, মূর্তিপূজাবিদ্বেষী ও একেশ্বরবাদী। ব্রাহ্মসমাজ প্রথম দিকে উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের আশ্রয় লইয়াছিল, দয়ানন্দ উপনিষদের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়া বেদের সংহিতা অবলম্বনে প্রাচীন যজ্ঞাদির অনুকল্প-রচনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। ব্রাহ্মদেরই ন্যায় এই সমাজও অনেকাংশে সনাতনধর্ম-বিরোধী হইলেও দয়ানন্দের সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি, বিরোধদমনের প্রবল স্পৃহা, নিজমতে ঐকান্তিক সরল বিশ্বাস, জাতীয়তাবোধ ও বীরপ্রতাপে প্রচারাভিযানের ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতের অংশবিশেষে এই সমাজের প্রভাব দ্রুত বিস্তারিত হইল এবং খৃষ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ বিশেষ প্রতিহত হইল। কিন্তু বিরাট হিন্দু-সমাজ এই চিন্তাধারায়ও সম্পূর্ণ উদ্বুদ্ধ হইল না। অধিকন্তু নূতন নাম ও কার্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে গিয়া ব্রাহ্মসমাজ যেমন এক সঙ্কীর্ণ নবীন সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল, আর্যসমাজের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। উভয় সমাজের সভ্যদের মনে এবং তটস্থ দ্রষ্টাদের অন্তরে সন্দেহ থাকিয়াই গেল—এই সম্প্রদায়দ্বয় হিন্দুনামধেয় কি না। ব্রাহ্মদিগের অসবর্ণ বিবাহ ও সিভিল ম্যারেজ স্বীকৃতির ফলে ও আর্যদের জাতিভেদ উচ্ছেদের ফলে এই বিচ্ছেদ আরও সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল। অতএব পাশ্চাত্যের আগমন-সম্ভূত তদানীন্তন পরিস্থিতির সহিত হিন্দুহিসাবে সামূহিকভাবে বুঝাপড়ার সমস্যা ও তাহার সমাধান পূর্বেরই ন্যায় অমীমাংসিত এবং অনারব্ধ বা অসম্পূর্ণ থাকিয়া গেল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ধর্মের সাহায্য না লইয়া আইন অবলম্বনে সমাজসংস্কারের পথে চলিয়াছিলেন। অবশ্য তিনি এই উদ্দেশ্যে স্মৃতি-শাস্ত্রের সাহায্য লইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার এই প্রচেষ্টার সহিত প্রত্যক্ষতঃ ঈশ্বরবিশ্বাস, আত্মার স্বরূপ, প্রতিমাপূজা ইত্যাদি বিষয়ক প্রশ্নের সম্বন্ধ ছিল না। আবার হৃদয়বত্তার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেও তাঁহার বিধবাবিবাহাদি সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলন হিন্দুসমাজের অতি ক্ষুদ্র অংশকেই আলোড়িত বা পরিবর্তিত করিয়াছিল। সসীম উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত এই সকল ক্রিয়াকলাপের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া অল্পসময় মধ্যেই নিস্তব্ধ হইয়া যায়। এই ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। আইন কি বলে, তাহার প্রতি বিশেষ ভ্রূক্ষেপ না করিয়া হিন্দু-সমাজ আপন চিরাভ্যস্ত পথেই চলিতে থাকিল।

এইকালে কোন কোন হিন্দু প্রচারকও হিন্দুধর্মের সংরক্ষণে যত্নবান হইয়াছিলেন। তাঁহারা হিন্দুধর্মের যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিয়া হিন্দুদের মনে স্বধর্মে আস্থার উদ্রেকে কৃতপ্রযত্ন হইয়াছিলেন। পরন্তু এই সর্বপ্রকার উদ্যমই বুদ্ধি ও প্রচারের স্তরে সীমিত ছিল—অপরের হৃদয়ে স্বধর্মাবলম্বনে অধ্যাত্মপথে যাত্রার উদ্দীপনা জাগাইবার উপযুক্ত অনুভূতি উহাতে ছিল না। আবার এই সকল চিন্তার মধ্যে ভারতেতর দেশ স্থান পায় নাই বলিলেই চলে। এই সকল দৃষ্টিভঙ্গির কোনটিই বিশ্বের সকল ধর্মকে কেন, শুধু ভারতীয় ধর্মগুলিকেও উদার সামূহিক দৃষ্টিতে দেখিয়া সব কয়টিকে সমভাবে পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়া বিশ্বময় যথার্থ সৌভ্রাত্র স্থাপনে যত্নপর হয় নাই।

এমন সময়ে হিন্দুর ভগবান হিন্দুসমাজের ও শাস্ত্রের মধ্য হইতেই যথার্থ শক্তিলাভের, অগ্রগতির এবং সামগ্রিকভাবে হিন্দুর নব-জাগরণের পন্থা আবিষ্কারের উপায় স্থির করিলেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ভারতে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ অল্পবয়সেই দক্ষিণেশ্বরের ৺কালী-মন্দিরে সাধনায় রত হইলেন এবং সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রমাণ করিলেন, হিন্দুরা পৌত্তলিক নহে, তাহারা মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ীর উপাসনা করে; ধর্ম কথার কথা নহে, প্রত্যুত অনুভূতির সামগ্রী এবং সে অনুভূতি সামাজিক, আর্থিক, রাজনীতিক বা সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সর্বপ্রকার মানবীয় ব্যবস্থা-নিরপেক্ষ; ভগবান-লাভই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, এবং সকল ধর্মমতই তল্লাভের বিবিধ পথমাত্র; সংসারে থাকিয়াও ধর্মলাভ সম্ভবপর, তথাপি ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সন্ন্যাস-গ্রহণেরও প্রয়োজন আছে; সকল ধর্মেই ধার্মিক ব্যক্তি পাওয়া যায়, এবং তাঁহাদের মধ্যে সদ্ভাবস্থাপন বাঞ্ছনীয়; মানুষকে পাপী বলা অন্যায়, কারণ আত্মা নিষ্পাপ ও এক, অতএব কাহাকেও ভর্ৎসনা বা নিরুৎসাহ না করিয়া সকলকে ধর্মপথে উৎসাহিত করাই উচিত; সরলতা ও বুদ্ধিবিবেচনা সহকারে ভক্তিমার্গের অনুসরণ করা এবং নির্লিপ্তভাবে সংসারের কর্তব্য পালন করাই এই যুগোপযোগী সহজ ধর্মমার্গ; এ যুগের মানুষ অন্নগত-প্রাণ, অতএব তাহাদের পক্ষে প্রাচীন যুগের কঠিন তপশ্চর্যা বা যজ্ঞাদি বিধির অনুসরণ করা অসম্ভব; অদ্বৈতজ্ঞান ধর্মসাধনের শেষ কথা এবং এক ব্রহ্মই জীব জগৎ ও অপর যাহা কিছু সব হইয়াছেন—বিভিন্ন দৃষ্টি অনুযায়ী তিনি মানবীয় ভাষায় বিভিন্ন নাম ধারণ করেন মাত্র। দক্ষিণেশ্বরের পরমপুরুষ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে এই সকল বাণীই প্রচার করিতেছিলেন এবং স্বীয় জীবনে ত্যাগ, বৈরাগ্য, সারল্য, ঈশ্বরানুরাগ, সদসদ্বিবেক ইত্যাদির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া মানবমনকে ঈশ্বরের পাদপদ্মাভিমুখে আকর্ষণ করিতেছিলেন। হিন্দুসমাজের সে এক অতি গৌরবময় সৌভাগ্যের দিন। হিন্দু আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া বাঁচিবার আশা ও অভ্যুদয়লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতে শিখিতেছিল। এমন সময়ে সেই মহাপুরুষের আকর্ষণে তাঁহারই ভাবী বার্তাবহরূপে বাঙ্গলার যুবকসমাজ দক্ষিণেশ্বরে উপনীত হইল।

ভক্তের সহিত ভগবদালাপনের জন্য উৎকণ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ হর্ম্যতল হইতে আহ্বান জানাইতেন ভাবী ভক্তদের প্রতি—যাহাতে তাঁহারা অচিরে দক্ষিণেশ্বরে সমবেত হন। সে আহ্বানে নবযুগের প্রতিনিধিস্বরূপ ব্রাহ্ম ভক্তগণ প্রথমে দলবদ্ধভাবে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন; কিন্তু তাঁহারা দক্ষিণেশ্বরের পরমপুরুষের পূর্ণ পরিচয় লইতে পারেন নাই; তাঁহাদের শিক্ষা-দীক্ষা, সাম্প্রদায়িক বিধি-নিষেধ ও প্রয়োজনাদি ইহার পরিপন্থী ছিল। তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণকে চিনিয়াছিলেন একজন ভগবদ্বেত্তা সাধুরূপে—জগতের অপরাপর ভগবদ্ভক্তদেরই অন্যতম বলিয়া। তথাপি একথা অবশ্যস্বীকার্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে অনেক ব্রাহ্মভক্তের জীবনে বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্যই হউক আর যে কোন কারণে হউক নেতৃস্থানীয় অনেক ব্রাহ্মভক্ত সমাজ-সংস্কার ও প্রচার মাত্র অবলম্বনে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; তাঁহাদের অনেকেরই, বিশেষতঃ কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির মন অনুভূতিমূলক ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং এই কারণেই তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিতে মুগ্ধ হইয়া দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত আরম্ভ করেন। এইরূপে শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া নবজাগ্রত

সনাতন ধর্ম নবীনপন্থী ব্রাহ্মসমাজের উপর এক প্রগাঢ় প্রভাববিস্তারে অগ্রসর হইয়াছিল।

ইহাই কিন্তু নবযুগের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। তাই অতঃপর আসিলেন শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্তবৃন্দ। ইঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া চিনিলেও তাঁহার জীবন ও বাণীর নবযুগোপযোগী কোন নূতন সার্থকতা খুঁজিয়া পাইলেন না। প্রাচীন ধারা, ভাষা ও প্রতীকাদি অবলম্বনে তাঁহাকে বুঝিতে যাইয়া তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হইলেন। অতএব প্রয়োজন হইল ইয়ং বেঙ্গলের—বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকবৃন্দের, যাঁহাদের দেহে আছে বল, মনে আছে অদম্য উৎসাহ, আর যাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গি গতানুগতিক পথ ভিন্ন অন্য পথে না চলিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া যায় নাই, সত্যের জন্য যাঁহারা উন্মুক্ত রাখিয়াছেন তাঁহাদের হৃদয়ের সমস্ত দ্বার। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে সর্বাগ্রণী ছিলেন আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ (তৎকালে শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত)। ইঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু আত্মরক্ষা করা নহে, প্রত্যুত আত্মজ্ঞান, আত্মশ্রদ্ধা ও আত্মসমাধি লাভ করা এবং অপরকেও ঐ কার্যে সাহায্য করা।

শরণাগত

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আনন্দঘন তুমি শাশ্বত
　　আছ, আছ ভগবান।
তোমার চরণে শরণ যে লয়—
　　তুমি তারে করো ত্রাণ!
আমরা মানব অতি দুর্বল;
নামিলে তোমার করুণার ঢল
মরু হয়ে যায় নন্দনবন,
　　শ্মশানে উছলে জ্ঞান!
কামনার জাল বাঁধিয়া রেখেছে,
　　ছিঁড়ে দাও বন্ধন!
তোমার ধ্যানের শিখাটি হিয়ায়
　　জ্বলুক অনুক্ষণ!
ঐ খেয়া-তরী দুলিতেছে কূলে,
বসো প্রিয়তম মরম-দেউলে,
শীতল অঙ্কে সব ক্লান্তির
　　হোক চির-অবসান!

বাণী-বন্দনা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদিত নয়ন 'পরে
　আলোকের রেখাপাতে
　　কে তুমি জাগালে চিত
　　　অপসারি অন্ধকার,
কে তুমি বাজালে বীণা
　বধির শ্রবণ ভরি
　　সারদে শুভদে বাণী
　　　প্রণমি মা বার বার।

করুণা কোমল আঁখি চরণে অরুণ ছটা
শুভ্র বরণা দেবী কেশদাম ঘনঘটা,
নিখিল হৃদয়পুরে
　গাহিছ অমিয় সুরে
　　জীবনের জয়গীতি
　　　মরণের পরপার।

বরাহনগর মঠ

শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

কলিকাতার উত্তরে কাশীপুর। কাশীপুরের উত্তরে বরাহনগর। ৪নং, ৩২নং বা ৩৪নং বাসে চড়িয়া কলিকাতা হইতে বরাহনগর বাজারে পৌঁছান যায়। সেখান হইতে পশ্চিমমুখী পথ পরামাণিক ঘাট রোড। সেই পথ ধরিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলেই দেখা যায়, ১২৩নং তিনতলা বাটীর দক্ষিণ পার্শ্বে বড় বড় দুইটি অতি জীর্ণ থাম এক-টুকরা জমির উপর এখনও দাঁড়াইয়া আছে। কোন্‌দিন ভূমিসাৎ হইবে, স্থিরতা নাই। থাম-দুইটি একদিন টাকীর প্রসিদ্ধ জমিদার কালীনাথ মুন্সী মহাশয়ের বাটীসংলগ্ন উদ্যানের শোভাবর্ধন করিত।

থাম-দুইটির কয়েকশত গজ পশ্চিমে খালি জমিটুকুর প্রান্তসীমায় কয়েকখানি টিনের ও খোলার ঘর আছে। এই ঘরগুলির পশ্চিম গায়ে অনেকগুলি নূতন বাটী উঠিয়াছে। ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫ প্রভৃতি নম্বরের বাড়ীগুলি এখন যেখানে অবস্থিত সেইস্থানে মুন্সীদের বাড়ী ছিল। তাহার উত্তর-পূর্বে মুন্সীদের যে ঠাকুর-বাড়ী ছিল, তাহা আজও বর্তমান। সেখানে এখনও নিয়মিতভাবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ-যুগলের সেবার্চনা হইয়া থাকে।

বরাহনগর মঠের সন্ধান করিতে আসিয়া অনেকেই উক্ত থাম-দুইটি দেখিয়া যান। কিন্তু এই থাম-দুইটির অনেকটা পশ্চিমে মুন্সীদের দ্বিতল জীর্ণ বাড়ীতে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মঠ স্থাপিত হয়।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট রবিবার রাত্রি ১টার পর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দেহত্যাগ করেন। তখন কাশীপুর উদ্যানবাটীর 'লীজ' (Lease) ফুরাইয়া আসিয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা ও চিকিৎসার জন্য যে সকল গৃহীভক্ত নিয়মিতভাবে সাহায্য করিতেন তাঁহাদের অনেকেই আর সাহায্য করিতে চাহিলেন না। কেহ কেহ আবার বলিতে লাগিলেন—গৃহত্যাগী যুবকদিগের গৃহে ফিরিয়া গিয়া পড়াশুনা আরম্ভ করা উচিত; উহাদিগের ভরণ-পোষণের ভার কেহই আর গ্রহণ করিতে পারিবেন না। এই সকল আলোচনা শুনিয়া কেহ কেহ বাড়ী ফিরিয়া গিয়া আবার পড়াশুনা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু যাঁহারা আর বাড়ী ফিরিবেন না সংকল্প করিয়াই শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাঁহারা এখন কোথায় যাইবেন? তাঁহাদের ভরণ-পোষণই বা কি করিয়া চলিবে? তখন ভক্তপ্রবর সুরেন্দ্রনাথ মিত্র নরেন্দ্রনাথকে একটি বাড়ীর অনুসন্ধান করিতে বলেন, যেখানে গৃহত্যাগী যুবকেরা একটু আশ্রয় পাইতে পারে। কথিত আছে শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহাবসানের পরই তিনি মিত্রমহাশয়কে দেখা দেন এবং তাঁহার গৃহত্যাগী ভক্তদিগের একটা উপায় করিতে বলেন! নরেন্দ্রনাথই এই বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করেন এবং উহা মাসিক দশ টাকা ভাড়ায় বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হয়। ইঁহাদের রন্ধন-কার্যে সাহায্য করিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ মাসিক ছয় টাকা বেতনে একজন পাচক নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং সকলের ভরণ-পোষণের ব্যয়ভারও নিজে গ্রহণ করিলেন।

স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ তাঁহার স্মৃতি-কথায় লিখিয়াছেন, "১৮৮৬ সালে শ্রীশ্রীঠাকুর লীলা সংবরণ করেন। ভক্তপ্রবর সুরেশ

মিত্রের[১] আগ্রহে ও পরামর্শে বরাহনগর মঠ স্থাপিত হয়। তিনিই ইহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেন।"

কালীকৃষ্ণ মহারাজের (স্বামী বিরজানন্দ) ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের বরাহনগর মঠের স্মৃতিতে দেখা যায়—"মঠ বরাহনগর পরামাণিক ঘাট রোডে টাকীর মুন্সীদের ঠাকুরবাড়ীর পশ্চাৎ (পশ্চিম) ভাগের ভগ্ন জীর্ণ বাড়ীর ওপর তলার ভিতরের অংশে ছিল। ··· পেছনের দিকে শাক-সবজির বাগান, সজনে গাছ, একটা বেল গাছ, ও কয়েকটি নারিকেল ও আমের গাছ ছিল। ·· এক উড়ে মালী ছিল, তাকে 'কেলো' বলে ডাকতো।"

"নীচের তলাটার ভিতর বাড়ীর দিকে বহুকালের আবর্জনায় ও জঙ্গলে এমন ভরে গেছলো যে তা শেয়ালের ও সাপের বাসা হয়েছিল।···উপর তলায় সিঁড়ি দিয়ে উঠে বামদিকে কালী তপস্বীর ঘর। তারপর ঠাকুরঘর।···সোজা গিয়ে দালান-ঘর দিয়ে সামনে রান্নাঘর, বামহাতে লম্বা হল-ঘর (যাকে দানাদের ঘর বলা হত), তারপরে পাশে খাবার ও মুখ-হাত-পা ধোবার ঘর, তারপর একটি অন্ধকার গলি পার হয়ে পাইখানা, নীচে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পুকুরে যাবার পথ।"* বরাহনগর মঠ-বাড়ীর একটি নিখুঁত চিত্র।

বরাহনগর মঠের সন্নিকটে গঙ্গা। শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলানিকেতন রানী রাসমণির পুণ্যকীর্তি দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দির এবং কাশীপুর উদ্যানবাটীও বেশী দূরে নয়। কাশীপুরের শ্মশান, যেখানে ঠাকুরের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত করা হইয়াছিল, তাহাও অতি নিকটে। দশমহাবিদ্যার প্রাচীন মন্দির এবং তৎসংলগ্ন শিবালয়, এবং প্রামাণিকদিগের কালীবাড়ীও খুব নিকটে। জনশ্রুতি আছে—দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর মূর্তি এবং প্রামাণিকদিগের প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্তি একই সময় একই শিল্পী দ্বারাই প্রস্তুত। তাই বোধ হয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রাচীন সাধুরা এই মূর্তিকে "মাসীমা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি হইতে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে—প্রায় চারি মাসে বরাহনগর মঠ গড়িয়া উঠিল। নরেন্দ্রনাথই এই মঠের অধ্যক্ষ হইয়া উঠিলেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে মে বরাহনগর হইতে স্বামীজী কাশীর প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়কে যে পত্র লেখেন তাহাতে দেখা যায়—"তাঁহার নির্দেশ এই যে তাঁহার দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগিমণ্ডলীর দাসত্ব আমি করিব।···তাঁহার আদেশ এই যে তাঁহার ত্যাগী সেবকমণ্ডলী যেন একত্রিত থাকে, এবং তজ্জন্য আমি ভারপ্রাপ্ত।"† এই গুরুভার বহন করাইবার জন্যই শ্রীশ্রীঠাকুর কাশীপুর উদ্যানবাটীতে নরেন্দ্রনাথের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়া 'ফতুর' হইয়াছিলেন।

গৃহত্যাগী ভক্তেরা বরাহনগর মঠেই বাস করিতে থাকেন। সাংসারিক গোলযোগ মিটাইবার জন্য নরেন্দ্রনাথকে কিছুদিনের জন্য বাড়ী যাইতে হইয়াছিল। তাহার পর তিনি যখন সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া মঠে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারই প্রেরণায় অন্যান্য সেবকেরা মঠে ফিরিয়া আসিলেন। বুড়ো গোপাল, তারক মহারাজ, ও লাটু মহারাজ প্রথম হইতেই স্থায়িভাবে মঠে যোগ দেন।

কাশীপুর উদ্যানবাটী হইতে শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরানী ২১শে আগষ্ট বাগবাজারে বলরাম বসু

১। সুরেন্দ্রনাথ মিত্রকে শ্রীশ্রীঠাকুর 'সুরেশ মিত্তির' বলিয়া ডাকিতেন। সেই কারণে মঠের সকলেই তাঁহাকে সুরেশ মিত্র বলিতেন।

* 'অতীতের স্মৃতি'—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

† স্বামীজীর পত্রাবলী ১ম ভাগ।

মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া উঠিলেন সে স্থান হইতে ৩০শে আগষ্ট তারিখে তিনি বৃন্দাবন ধামে যাত্রা করেন। কালী মহারাজ, তারক মহারাজ, লাটু মহারাজ, যোগীন মহারাজ এবং কয়েকজন মহিলাভক্ত তাঁহার সহিত বৃন্দাবনে যান। রাখাল মহারাজ বলরামবাবুর গৃহেই রহিয়া গেলেন। তাঁহারাও ক্রমে ক্রমে বরাহনগর মঠে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। বাবুরাম মহারাজ, শরৎ মহারাজ, হরি মহারাজ, সারদা মহারাজ এবং সুবোধ মহারাজও মঠে আসিয়া যোগ দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম কীর্তন এবং তাঁহার জীবন ও বাণীর আলোচনা করিয়া মহানন্দে তাঁহাদের দিন কাটিতে লাগিল

কাশীপুর উদ্যানবাটী হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যবহৃত জিনিসপত্র বলরামবাবুর বাড়ীতেই লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। স্বামীজীর নির্দেশে ছোট গোপাল সেই জিনিসগুলি বরাহনগর মঠে লইয়া আসিলেন। এই ছোট গোপাল বা হুটকো গোপালও উদ্যানবাটীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন এবং কাশীপুর মঠের হিসাবপত্র রাখিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নশ্বর দেহাবশেষ অস্থি ও ভস্ম সম্বলিত তাম্রপাত্রটি (আত্মারামের কৌটা) বরাহনগর মঠে আনিয়া রাখা হইল। শশী মহারাজ ও নিরঞ্জন মহারাজ স্বেচ্ছায় উহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতীক হিসাবে উহার পূজার্চনা চলিতে লাগিল। শশী মহারাজই পূজাপদ্ধতি প্রস্তুত করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিছানাপত্র, কাপড়চোপড়, আসবাব ও তৈজসপত্রাদি অমূল্য সম্পদ-রূপেই রক্ষিত হইল।

ভস্মপূর্ণ পাত্র লইয়া দ্বিমত হইয়াছিল। গৃহস্থ ভক্তেরা উহা রামচন্দ্র দত্তের কাঁকুড়গাছির উদ্যানে একটি বেদিতলে প্রোথিত করিয়া তদুপরি একটি মন্দির নির্মাণ করিতে চাহিলেন। সন্ন্যাসী ভক্তেরা চাহিলেন, উহা নিজেদের কাছে রাখিতে। অবশেষে কতক অংশ কাঁকুড়গাছির উদ্যানে সংরক্ষিত হইল, এবং কতক অংশ একটি পাত্রমধ্যে বলরামবাবুর গৃহে রক্ষিত হইল। পরে উহা বরানগর মঠে লইয়া যাওয়া হয়। ১২৯৩ সালের জন্মাষ্টমীর দিনে (১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট) রামচন্দ্র দত্তের কাঁকুড়গাছির উদ্যানে মূল ভস্মাধারটি প্রোথিত করা হইল। তদবধি ঐ বাগান "যোগোদ্যান" নামে প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছে এবং প্রতি বৎসরই ঐ দিনটি স্মরণ করিয়া মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যোগোদ্যান বর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীঠাকুরের দেহাবসানের পর গঙ্গাধর মহারাজ (স্বামী অখণ্ডানন্দ) তিব্বত যাত্রা করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বরাহনগরে যোগ দেন। নিরঞ্জন মহারাজ ১৮৮৭ সালে পুরী যান, এবং ঐ সময়ই বাবুরাম মহারাজ, শরৎ মহারাজ ও কালী মহারাজ পদব্রজে পুরী গিয়া উপস্থিত হন। রাখাল মহারাজও ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর সহিত পুরীধামে যান। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে আর একবার বরাহনগর মঠ ত্যাগ করিয়া তীর্থপর্যটনে বাহির হন, এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মঠে ফিরিয়া আসেন। সুতরাং বরাহনগর মঠে এককালীন বেশীদিন তাঁহারও থাকা হয় নাই। বাবুরাম মহারাজ হয় বরাহনগর মঠে, না হয় কলিকাতায় বেশীর ভাগ সময় থাকিতেন। তারক মহারাজ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রতিবৎসরই তীর্থযাত্রায় বাহির হইতেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে শরৎ মহারাজ দ্বিতীয়বার পুরী যান। পুরী হইতে ফিরিয়া তিনি বরাহনগর মঠেই ছিলেন। আর একবার তীর্থযাত্রা করিয়া ১৮৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে

বরাহনগর মঠে ফিরিয়া আসেন। কালী মহারাজ ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বরাহনগর মঠ হইতে বাহির হইয়া নানা তীর্থ পর্যটন করেন। পরে ১৮৯২ সালে আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসেন। লাটু মহারাজ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর সহিত নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, এবং প্রায়ই মঠের বাহিরে স্বাধীনভাবে বাস করিতেন। হরি মহারাজ ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া ১৮৯৪ সালে মঠে ফিরিয়া আসেন। সুবোধ মহারাজ ও সারদা মহারাজও পর্যটনে বাহির হন। কেবল শশী মহারাজ মঠ ছাড়িয়া কোথাও যান নাই।

স্বামীজী ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া ঐ বৎসরই মঠে ফিরিয়া আসেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি দ্বিতীয়বার তীর্থভ্রমণে বাহির হন এবং পুনরায় মঠে ফিরিয়া আসেন। ভ্রমণকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অদ্বৈতানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, বা স্বামী সদানন্দ কেহ না কেহ স্বামীজীর সহিত থাকিতেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি তিনি তৃতীয় ও শেষবার বরাহনগর মঠ হইতে বাহির হন। এইবার তিনি কাশী, হরিদ্বার প্রভৃতি হইয়া সেখান হইতে একাকী সারা ভারত ভ্রমণ করিয়া ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা যাত্রা করেন। আর বরাহনগর মঠে ফিরেন নাই।

বরাহনগরবাসী অনেকেই মুন্সীদের ভাঙ্গা বাড়ীতে মঠস্থাপন করা বিশেষ ভাল চোখে দেখেন নাই। কালীকৃষ্ণ মহারাজের (স্বামী বিরজানন্দ) স্মৃতি-লেখায় দেখা যায়—"পাড়ার লোকেরা তখন মঠের বিরুদ্ধে ছিল ও নানা মিছে অপবাদ রটনা করতো। যখন সাধুরা গঙ্গা-স্নান করতে যেতেন দুষ্ট ছেলেরা 'বক' দেখাতো ও বলতো, ওরে সব রাজহংস যাচ্ছে। আর প্যাঁক প্যাঁক করতো।"* এরূপ ঘটনার কথা আমরাও বড়াল-মহাশয়ের কাছে শুনিয়াছি।

তবে "মঠের প্রায় গোড়া থেকেই পাড়ার যোগেন চাটুয্যে ব'লে বয়োজ্যেষ্ঠ ও কিছু পৈতৃক বিষয়-সম্পন্ন এক ভদ্রলোক আসতেন,……আগে যখন অনেক সময় মঠে খাবার কিছুই বড় থাকতো না—জানতে পেরে বাজার থেকে জিনিসপত্র নিজে কিনে দিতেন।…১৮৯৭ সালে স্বামীজী পাশ্চাত্য দেশ থেকে ফিরলে তাঁর কাছে সন্ন্যাস-দীক্ষা নিয়েছিলেন। নাম হয়েছিল—স্বামী নিত্যানন্দ।"*

"পাড়ার স্বামীজীর সহপাঠী সাতু (সাতকড়ি লাহিড়ী) ও দাশু (দাশরথি সান্যাল পরে আলিপুরের প্রাচীন নামজাদা উকিল) মাঝে মাঝে মঠে আসতেন। পাড়ার ভুবন[১] ও বড়াল[২] ঘন ঘন আসতেন। নিয়মিতভাবে দুই-এক ঘণ্টার জন্য এসে বাজার করা, জল তোলা, প্রভৃতি অনেক কাজ তৎপরতার সঙ্গে করে দিয়ে যেত।"*

নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যাঁহারা বরাহনগর মঠে যোগ দিলেন তাঁহারা আকাশবৃত্তি অবলম্বন

* অতীতের স্মৃতি

(১) ৺ভুবনমোহন দাস—বরাহনগর বাজারের নিকট পরামাণিক ঘাট রোডে বাড়ী। লোহার ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থোপার্জন করেন। কিন্তু শেষ বয়সে ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাঁহার গোপন দান ছিল অনেক। শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। সুযোগ পাইলেই সাধুসেবা করিতেন। বেলুড় মঠে তাঁহার খুবই যাতায়াত ছিল।

(২) ৺হরিদাস বড়াল—বড়াল পাড়ায় বাড়ী। চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বেলুড় মঠে গিয়া থাকিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ছোট ভাই-এর অকাল মৃত্যুতে বৃদ্ধা মাতা বিধবা ভ্রাতৃবধূ এবং নাবালক পুত্রাদির ভরণ-পোষণের জন্য তাঁহাকে বাড়ী ফিরিয়া আবার স্থানীয় এম. ই. স্কুলে চাকরি লইতে হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রে তিনি বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন।

করিয়া জপধ্যান ও শাস্ত্র-আলোচনায় দিন যাপন করিতেন। জল তোলা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা প্রভৃতি ঘরের সকল কাজই নিজেরা করিতেন। অনেক সময় যখন হাতে সকলে কাজ করিতেন, মুখে শাস্ত্রালোচনা চলিত। এমন অনেক দিন আসিত যখন মঠে কোন খাদ্য-দ্রব্যই থাকিত না, বা রান্না করিয়া খাইবারও কিছু জুটিত না। তখন তাঁহারা দিনরাত্রি ধ্যান-ধারণা ও আধ্যাত্মিক আলোচনা করিয়াই কাটাইতেন। দেহজ্ঞানই তখন তাঁহাদের থাকিত না। বস্ত্রাদিরও ছিল অনুরূপ অবস্থা। প্রত্যেকের নিজ নিজ কৌপীন ও ছেঁড়া কিছু গেরুয়া কাপড় ছিল। একখানি ভাল কাপড় ও উড়ানি দড়িতে ঝুলিত। যাঁহার যখন বাহিরে যাইবার প্রয়োজন ঘটিত তিনি তখন উহা ব্যবহার করিতেন। শুইবার জন্য একখানি করিয়া মাদুর ও একটি করিয়া চাদর ছিল।

সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, ওরফে সুরেশ মিত্তির বরাহনগর মঠ সংরক্ষণের ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী ভক্তদিগের সেবা করিবার এবং তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ গোপনে জানাইবার জন্য তিনি এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যখনই সে ব্যক্তি দেখিত যে সাধুদের সমস্ত দিন উপবাসে কাটিতেছে, তখনই সুরেশবাবুর নিকট গিয়া সকল কথা বলিত। সুরেশবাবুও প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদি কিনিবার উপযুক্ত অর্থ দিতেন এবং সেকথা সাধুদের নিকট গোপন রাখিতে বলিতেন—পাছে সাধুরা মনে করেন যে সুরেশবাবুকে অযথা কষ্ট দেওয়া হইতেছে।

বলরামবাবুও এক একদিন বরাহনগর মঠে আসিয়া উপস্থিত হইতেন, একদিন তিনি সেখানে গিয়া দেখিলেন যে সাধুরা কেবল তেলাকুচা পাতার ঝোল ও ভাত খাইতেছেন। সেখানে তিনি আর কিছু বলিলেন না। বাড়ী ফিরিয়া গৃহিণীকে বলিলেন তিনি সেদিন কেবলমাত্র তেলাকুচা পাতার ঝোল দিয়া ভাত খাইবেন। অন্য কিছু খাইবেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে—আজ সাধুদিগকে শুধু তেলাকুচা পাতার ঝোল দিয়া ভাত খাইতে দেখিয়া আসিলেন; নিশ্চয়ই উহা খুব ভাল লাগে। বুদ্ধিমতী বসুগৃহিণী সেই দিনই মঠে প্রচুর 'সিধা' পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন—"খাদ্যদ্রব্যের অভাব ঘটিলে মঠের পাচক যেন অবিলম্বে তাঁহার নিকট খবর দেয়।" তদবধি বলরামবাবু এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল বলরামবাবু ইহলীলা সংবরণ করেন। সেই বৎসরই ২৫শে মে সুরেশবাবুর মৃত্যু ঘটে। এই সঙ্কট সময়ে ভক্ত-ভৈরব গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সাহায্যে অগ্রসর হন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দও এই সময় কয়েক মাসের জন্য স্থানীয় হাই-স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে মে কাশীর প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়কে স্বামীজী একখানি পত্র লেখেন—"তাঁহার সন্ন্যাসিমণ্ডলী বরাহনগরে একটি পুরাতন জীর্ণ বাড়ীতে একত্রিত আছেন, এবং সুরেশ মিত্র এবং বলরাম বসু নামক তাঁহার দুইটি গৃহস্থ শিষ্য তাঁহাদের আহারাদি নির্বাহ এবং বাড়ী-ভাড়া দিতেন।···পূর্বোক্ত দুই মহাত্মার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল যে গঙ্গাতীরে একটি জমি ক্রয় করিয়া তাঁহার অস্থি সমাহিত করা হয়, এবং শিষ্যবৃন্দও তথায় বাস করেন, এবং সুরেশবাবু তজ্জন্য ১০০০৲ টাকা দিয়াছিলেন এবং আরও অর্থ দিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের গূঢ় অভিপ্রায়ে তিনি কল্য রাত্রে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। বলরামবাবুর মৃত্যুসংবাদ পূর্ব

হইতেই জানেন। এক্ষণে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার এই গদি ও অস্থি লইয়া কোথায় যায়, কিছুই স্থিরতা নাই।"*

বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও দুর্দিনে সাধুদিগের প্রয়োজনমত খাদ্যদ্রব্যাদি দিয়া এবং কলিকাতা হইতে বরাহনগরে আসিবার গাড়ী-ভাড়া দিয়াও যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। পূজনীয় স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁহার স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন—"বটতলার বৈষ্ণব বসাকদের বই-এর দোকানের অনতিদূরে রাস্তার পশ্চিম ধারে উপেন্দ্রের একখানি ছোট্ট বই-এর দোকান ছিল।···ঠাকুরের অন্তর্ধানের অব্যবহিত পরে স্বামীজীপ্রমুখ আমরা কয়জন গুরুভাই যখন অনাথ, অসহায় অবস্থায় ব্যাকুলচিত্তে বরাহনগর মঠ হইতে কোন দিন কাঁকুড়গাছি পর্যন্ত গিয়া 'ওয়া গুরুজী কি ফতে' শ্রীগুরুর এই জয়ধ্বনি করিতে করিতে ঠাকুরের গৃহীভক্তগণের বাড়ী বাড়ী গিয়া রাত্রি প্রায় আটটার সময় ক্ষুধাতুর অবস্থায় উপেন্দ্রের সেই ছোট্ট দোকানটিতে পৌছিতাম, উপেন্দ্র তৎক্ষণাৎ এক চাঙ্গারী নানা প্রকার খাবার ও দোনা দোনা পান খাওয়াইয়া আমাদের তাজা করিয়া দিত। বিডন-গার্ডেনের ধারে ছ্যাকড়া গাড়ীর আড্ডা ছিল, গাড়োয়ানরা 'বরাহনগর! কাশীপুর! চার পয়সা' বলিয়া হাঁকিত। ভাড়া দিয়া উপেন্দ্র আমাদের সেই গাড়ীতে তুলিয়া দিত। এইরূপে কতদিন আমাদের খাওয়াইয়া বরাহনগরের গাড়ীতে চাপাইয়া দিত, তাহা বলা যায় না। জ্ঞানানন্দ অবধূত (নিত্যগোপাল) তখন রামদাদার বাড়ীতে থাকিতেন এবং তিনি প্রত্যহ বৈকালে উপেন্দ্রের দোকানে আসিয়া ভিতরের অন্ধকার কুঠরিতে বসিয়া থাকিতেন, জলযোগ করিয়া একটু বেশী রাত্রে চলিয়া যাইতেন।"

গৃহত্যাগী যুবকদিগের অভিভাবকগণ মাঝে মাঝে বরাহনগর মঠে আসিয়া উপস্থিত হইতেন, এবং তাঁহাদিগকে সংসারে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য কখনও ভয় দেখাইতেন, কখনও বা অনুরোধ উপরোধ করিতেন। নরেন্দ্রনাথকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহারা প্রায়ই বলিতেন—'ছেলেরা তো ঘরে ফিরিয়া গিয়াছিল, নরেন্দ্রই তাহাদের এখানে আবার টানিয়া আনিয়াছে।' নবীন সন্ন্যাসীরা কিন্তু সে সকল কথায় কর্ণপাত করিতেন না। একদিন তো শশী মহারাজ তাঁহার পিতাঠাকুরকে বলিয়াই ফেলিয়াছিলেন, 'যাহারা ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছে, সংসার তাহাদের নিকট বাঘের গুহা মাত্র।' তাহা সত্বেও গৃহত্যাগী যুবকদিগকে ঘরে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য কিছু দিন চেষ্টা চলিয়াছিল।

শশী মহারাজের কঠোর মন্তব্য শুনিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে সাধুরা অবিনয়ী ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন। অধিকাংশ স্থলেই তাঁহারা অভিভাবকদিগের সহিত বিশেষ সদয় ও ভদ্র ব্যবহার করিতেন। স্বামী বিরজানন্দের দৈনিক লিপিতে তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন—"আমি মঠে আসবার পর আমার বৃদ্ধ পিতামহ এই খবর পেয়ে···একদিন হঠাৎ বৈকাল বেলায় মঠে এসে উপস্থিত। আমার সঙ্গে সারদা মহারাজ গিয়ে গাড়ী থেকে তাঁকে নামিয়ে খুব খাতির যত্ন করে বাইরের ঘরে বসালেন এবং তামাক সেজে এনে দিলেন। ঠাকুরদাদা তাঁর ব্যবহারে একেবারে গলে গেলেন, এবং বুঝতে পারলেন যে আমি উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানদের মধ্যে আছি। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন।···

---

* স্বামীজীর পত্রাবলী ১ম ভাগ।

তাঁকে অনেক বুঝিয়ে ও আমি মধ্যে মধ্যে গিয়ে দেখা শুনো করে আসাবো ইত্যাদি বলে তাঁকে গাড়ীতে উঠিয়ে দিলাম।"[১]

বরাহনগরের মঠে সাধুদের দিন এক ভাবেই কাটিতে লাগিল। প্রতিদিন সকালে ধ্যানধারণা করিবার পর সকলে 'দানাদের ঘরে' একত্র হইয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেন। কেবল কালী তপস্বী (স্বামী অভেদানন্দ) অনেক সময় নিজগৃহে আবদ্ধ থাকিয়া সংস্কৃতভাষা চর্চা এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন। সন্ধ্যার পরও সকলে 'দানাদের ঘরে' সমবেত হইতেন। সেখানে গান, বাজনা ও আধ্যাত্মিক আলোচনা করিয়া সমস্ত দিনের দুঃখ ভুলিতেন; কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের ব্রত গ্রহণ করিয়া সর্বদা ঈশ্বরের নিকট তাঁহারা প্রার্থনা করিতেন:

"অসতো মা সদ্গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃতোর্মা অমৃতং গময়॥"

কখনও বা তাঁহারা ক্যাণ্ট, মিল, হেগেল, স্পেন্সার প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের পুস্তকাদি পাঠ করিতেন। চার্বাক প্রভৃতি জড়বাদীদিগের পুস্তক পাঠ করিতে এবং নিরীশ্বরবাদ ও অজ্ঞেয়বাদের আলোচনা করিতে কোন দ্বিধা বোধ করিতেন না। বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন ও উহাদের সম্যক্ আলোচনা করিতেন। অনেক সময় তুমুল তর্ক বাধিত। নরেন্দ্রনাথ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তরপক্ষ অবলম্বন করিয়া পূর্বপক্ষ গুরু-ভ্রাতাদিগকে তর্কে অনায়াসে পরাস্ত করিতেন। অবশেষে সকল বিতর্কের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের অমৃতবাণী উদ্ধৃত করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিতেন। তাহার পর 'গুরুগীতা' হইতে কোন স্তোত্রপাঠ বা সমস্বরে আচার্য শঙ্করের 'মোহমুদ্গর' আবৃত্তি, কিংবা কৃষ্ণকীর্তন বা রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত চলিত।

বাবুরাম মহারাজের পিতৃগৃহ আঁটপুরে। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তাঁহার স্নেহময়ী জননী বরাহনগর মঠের সাধু-দিগকে নিজগৃহে আহ্বান করেন। ট্রেনে ও গরুর গাড়ীতে চড়িয়া যথাসম্ভব অল্প ব্যয়ে তাঁহারা আঁটপুরে গিয়া পৌছিলেন। প্রেমানন্দ মহারাজের পরিবারবর্গ তো বটেই, গ্রামের অধিবাসিবৃন্দও তাঁহাদিগকে সাদরে বরণ করিয়া লইলেন, এবং তাঁহাদের সেবার যথোচিত ব্যবস্থা করিলেন।

সেখানে এক শান্ত সন্ধ্যায় তাঁহারা ধুনি জ্বালিয়া উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ধ্যান-জপ করিতে বসিলেন। নরেন্দ্রনাথ যীশুখ্রীষ্টের জন্মকথা বলিতে শুরু করিয়া তাঁহার ত্যাগ, তপস্যা, ও বৈরাগ্য এরূপ অপরূপ ভাষায় ও ভঙ্গিতে বর্ণনা করিতে লাগিলেন যে সকলের হৃদয়ে উহা চিরজীবনের জন্য গাঁথিয়া গেল।

দৈবক্রমে সেদিন যীশুর জন্মদিন (Christmas Eve) ছিল। যীশুখ্রীষ্টের প্রথম কয়েকজন শিষ্য তাঁহার অমিয়বাণী প্রচার করিয়া যেরূপ জগতের হিতসাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যেরাও আজ সেইরূপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনদর্শন ও তাঁহার অমৃতময় উপদেশাবলী প্রচার করিয়া নিজেদের ও জগতের কল্যাণার্থে আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য অবিলম্বে বাহ্যসন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প দৃঢ় করিলেন।

১ অতীতের স্মৃতি—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ।

২ "শিবের দানা" বলিয়া সাধুরা নিজেদের অভিহিত করিতেন। যে ঘরখানিতে তাঁহারা বেশী সময় থাকিতেন সেই ঘরখানির নাম দেওয়া হইয়াছিল "দানাদের ঘর"।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবধারা ও অধ্যাত্ম-সাধনা নরেন্দ্রনাথের মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম লইয়া এবং শাস্ত্রালোচনা করিয়াই দিনরাত্রি কাটিতে লাগিল। কালী মহারাজ নরেন্দ্রনাথের সহিত বেদান্ত-আলোচনায় যোগ দিয়া তুমুল তর্ক বাধাইয়া তুলিলেন। মানুষের মধ্যে দেবতাকে জাগাইয়া প্রকৃত মুক্তির পন্থা অন্বেষণে সকলেই সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য করিবার সংকল্প তাঁহাদের অজ্ঞাতসারেই এই স্থানে তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পাইল।

আঁটপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া বরাহনগর মঠে স্বামীজী ও তাঁহার গুরুভ্রাতাদিগের আবার তপস্যার জীবন আরম্ভ হইল। অনেক সময় তাঁহারা সমস্ত দিন নামসংকীর্তন করিয়াই কাটাইতে লাগিলেন, তখন স্নানাহারের কথা মনেও আসিত না। ঈশ্বরদর্শনই তখন তাঁহাদের একমাত্র কাম্য।

বরাহনগর মঠেই শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। ঐ স্থানেই নরেন্দ্রনাথ তাঁহার গুরুভ্রাতাদের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানের যুগপৎ উৎকর্ষের জন্য, গিবনের "রোমক ইতিহাস" কারলাইলের "ফরাসী বিদ্রোহ" হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের সামগ্রিক ইতিহাস, আকবরের উদার নীতি হইতে মহাভারতের ধর্মযুদ্ধ পর্যন্ত যেখানে যত ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতির পরিচয় পাইতেন তাহার সামঞ্জস্য সাধন করিয়া এক অপূর্ব শিক্ষার ব্যবস্থাপনা করিয়াছিলেন। ভারতীয় সমাজ-চেতনা ও সংস্কৃতিতে অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি গুরুভ্রাতাদিগকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন।

(ক্রমশঃ)

এসো ওগো পরিত্রাতা !

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

জ্যোতির্ময় দিগন্তের পুণ্যচ্ছবি দূরে স'রে যায়,
দিবসের দীপ্ত রশ্মি গোধূলিতে যায় মিলাইয়া !
নীলকান্ত-মণি-দীপ্তি অন্ধকার খনির তলায়
হারায়ে ফেলেছে শোভা অঙ্গারের আবরণ নিয়া !
আজি প্রাণ-চেতনার উৎস যেন মরুভূমে মিশি',
হ'য়ে গেছে গতি-হারা—সমুদ্রের পথ গেছে ভুলে !
মৃত্যুর চরণ-ধ্বনি মুখরিত করে দশদিশি,
ধ্বংসের আসন্ন দৃশ্য দৃষ্টিতলে কে দিয়েছে খুলে !
এস ওগো পরিত্রাতা, সূর্য হ'য়ে উদয়-অচলে
আর বার জেগে ওঠ—পুণ্য-রশ্মি কর বিকিরণ !
তোমার প্রেরণা-প্রভা জাগাইয়া তোল বক্ষ-তলে,
নিষ্প্রাণ-জড়ের মাঝে দাও ফিরে প্রাণের স্পন্দন !
বধির শ্রবণ মাঝে ঢেলে দাও অমৃতের বাণী,
মঙ্গল-আলোক-পাতে মুছে দাও সর্ব ক্লেদ-গ্লানি !

সাহিত্যিক ও দার্শনিকের চোখে জীবন

অধ্যাপক শ্রীসুজয়গোপাল রায়পোদ্দার

জীবন কি? প্রশ্নটি খুবই পুরনো, অথচ আবার খুবই নতুন;—পুরনো বলছি এজন্য যে জিজ্ঞাসু মানবমন আবহমান কাল থেকেই এ প্রশ্ন করে আসছে—আর নতুন বলার যুক্তি হলো এ প্রশ্ন আজও, এই বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেও মানুষকে ভাবিয়ে তুলছে। আসলে প্রশ্নটা হচ্ছে একান্তভাবে মৌলিক ও শাশ্বত এবং যা কিছু মৌলিক ও শাশ্বত তা কোনদিন পুরনো হবার নয়, পুরনো হয়েও সে থাকে চিরনতুন; এ প্রশ্ন হচ্ছে সকল কালের সকল মানুষের প্রকৃতিজাত স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা।

জীবন নিয়ে এতো বেশী আলোচনা হয়েছে যে জীবনদেবতার মন্দিরে প্রবেশ করতে গিয়ে আজ আমরা প্রায়শই মতবাদের বাঁধা পথে নিজেদের হারিয়ে ফেলি। বর্তমান আলোচনায় আমি সাহিত্য ও দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের একটা ছবি আঁকতে প্রয়াসী হবো।

সাহিত্যিকের চোখ নিয়ে জীবনের দিকে তাকালে যা আমরা দেখতে পাই, জীবনের সে রূপ যে দার্শনিকের চোখে দেখা জীবন থেকে একেবারে ভিন্ন, তা হয়তো বলা যায় না; কারণ কোন মানুষকেই আমরা চূড়ান্তভাবে সাহিত্যিক বা দার্শনিক আখ্যায় অভিহিত করতে পারি না। হরেক রকমের চারিত্রিক অলংকারে ভূষিত হয়েই তো মানুষ নিজের পরিচয় বহন করে—যে একাধারে সাহিত্যিকও হতে পারে এবং যার পক্ষে অন্য দিক থেকে দার্শনিক হতেও কোন বাধা নেই। তবু আলোচনার খাতিরে মানুষের সাহিত্যিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে একটা সাময়িক ভেদরেখা টেনে জীবন সম্বন্ধে একটুখানি তাত্ত্বিক আলোচনা হয়তো খুব একটা বেমানান বা অযৌক্তিক হবে না।

সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী বুঝতে হলে সাহিত্য কি তা প্রথমেই জানা প্রয়োজন। এ ব্যাপারেও বিশেষজ্ঞেরা একমত নন। দৃষ্টিভঙ্গীর বিশিষ্টতা ও স্বতন্ত্রতার জন্যই হয়তো মতের এমন ছড়াছড়ি। তবু সাহিত্য সম্বন্ধে মোটামুটি স্পষ্ট একটা ধারণা রাখবার জন্য আমরা বিখ্যাত অভিধান-রচয়িতা শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিমত এ প্রসঙ্গে গ্রহণ করতে পারি। শ্রীদাসের মতে 'মানবের ব্যক্তিগত বা জাতীয় চিন্তা লিখিত ভাষায় ব্যক্ত হইলে সাহিত্যের সৃষ্টি করে।'* সাহিত্য তাহলে মানুষের ব্যক্তিগত ও জাতীয় চিন্তার একটা সুন্দর ভাষায়িত রূপ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবনদোলার সব ক'টি দোলই সামগ্রিকভাবে সৃষ্টি করে চলেছে সাহিত্যভাণ্ডার। মানুষের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, চাওয়া-পাওয়া, প্রেম-ভালবাসা, মান-অভিমান, বিরহ-মিলন, হিংসা-দ্বেষ, আশা-নিরাশা, এককথায় মানব-মনের প্রতিটি চিন্তা, প্রতিটি অনুভূতি ও প্রতিটি ইচ্ছার একটা হৃদয়গ্রাহী সার্থক রূপায়ণই হলো সাহিত্য; সাহিত্য জীবনকেন্দ্রিক না হয়ে পারে না। জীবনের ছায়াবলম্বন ব্যতিরেকে কোন রচনাই সাহিত্য-পদবাচ্য হতে পারে না। শিশুর জন্ম, তার শৈশবের একান্ত অসহায় পরনির্ভরশীলতা, কৈশোরের চপলতা, যৌবনের উচ্ছ্বাস ও কর্মমুখরতা, প্রৌঢ়ত্বের গাম্ভীর্য ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় এবং বার্ধক্যের জ্ঞান-

* অভিধান—২য় খণ্ড, পৃঃ ২০৫৬

গভীরতা ও স্বাভাবিক নম্রতা এবং অবশেষে মৃত্যুর শীতলতা—জীবনের এ সব-ক'টি পর্যায় জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে সাহিত্যিকের লেখনী-মুখে। তাই দেখা যায় সাহিত্যের প্রতি মানুষের আকর্ষণ স্বাভাবিক। একটা গোটা জীবন যেন চলতে শুরু করে সাহিত্যসৃষ্টির মাধ্যমে। অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে সাহিত্য অনেক সময় আমাদের জীবনের কথা এমনভাবে বলে, যার সঙ্গে দেশ-কালিক এই জগতের জীবনের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না—কল্পনার তুলিতে আমরা জীবনের এমনি ছবি আঁকি শুধু কল্পলোকে এক অমলিন আনন্দ উপভোগের জন্য। অনেক সময় আবার সাহিত্যিক কল্পনাত্মক অন্তর্দৃষ্টির সহায়তায় এমন একটা আদর্শজীবনের ছবি তুলে ধরেন আমাদের কাছে, যা সবসময়ই থাকে মানুষের ধরাছোঁয়ার অনেক দূরে। এ প্রসঙ্গে সাহিত্যজগতের দুটো বিভাগের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে—বস্তুনিষ্ঠ (Realistic) সাহিত্য ও আদর্শনিষ্ঠ (Idealistic) সাহিত্য। সাহিত্যের জগতে যখন জীবনের আলোচনা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয় তখন জীবন বলতে সাধারণতঃ বাস্তব-জীবনকেই মনে করা হয়। সুতরাং একথা এখন বলা যেতে পারে যে সাহিত্যিকের চোখে জীবন হলো তাই, যা মানুষ তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানাভাবে, নানারূপে, নানাছন্দে অবিরাম প্রকাশ করে চলেছে—অবশ্য জীবনের এই প্রকাশকে সাহিত্যিক তাঁর ভাষার লালিত্য, রচনার ভঙ্গী, উপস্থাপনের বৈশিষ্ট্য, ভাব-প্রবাহের সংযম, পরিবেশ-রচনার স্বাতন্ত্র্য, এক কথায় তাঁর স্বকীয় সৃজনক্ষমতা-বলে আরও আকর্ষণীয় করে তোলেন।

এ হলো সাহিত্যিকের চোখ নিয়ে জীবনকে দেখা। এবার আসা যাক্ দার্শনিকের দৃষ্টিতে দেখা জীবনের কথায়। পূর্বপ্রথানুসারে তাহলে দর্শনের সংজ্ঞালোচনা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। মোটামুটিভাবে দর্শন বলতে বুঝি জগৎ ও জীবনের সামগ্রিক ব্যাখ্যায় মূল্যায়নের সাধু প্রচেষ্টা। এই যদি হয় দর্শনের সম্ভাব্য সংজ্ঞা, তাহলে জীবনপ্রসঙ্গে দার্শনিক আলোচনার অর্থ হচ্ছে গতিশীল পরিদৃশ্যমান জীবন-প্রবাহের চরম ও পরম ব্যাখ্যা প্রদান এবং আদর্শের আলোকে তার তাৎপর্য নিরূপণ। জীবনের কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা—জীবনযাত্রার ফলে কোন আদর্শরূপায়ণের চেষ্টা চলে কিনা—জীবনের মাধ্যমে কোন মহতী ও সাধু ইচ্ছা ফলবতী হতে চলেছে কিনা—এমনি অনেক আদর্শমূলক প্রশ্ন করেন দার্শনিক। দার্শনিক তাই সাহিত্যিকের চোখ দিয়ে জীবনকে দেখেই থেমে যান না, দার্শনিকের দৃষ্টি আরও সুদূর-প্রসারী; দার্শনিক জীবনসাগরের গভীর তলে ডুব দেন তার গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটনের আশায়। দার্শনিক জীবনকে দেখেন শুধু দেখার আনন্দে নয়, দেখেন জীবনের মূল্যনিরূপণের গভীর উৎসাহে। সুতরাং জীবনপ্রত্যক্ষ দার্শনিকের কাছে উদ্দেশ্য নয়, উপায় মাত্র। জীবনের মূল্যায়ন ও সত্যোপলব্ধির উপায় হিসাবেই দার্শনিক জীবনকে দু'চোখ ভরে চেয়ে দেখেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

মানুষের পক্ষে এ রকম দার্শনিক জিজ্ঞাসা তো খুবই স্বাভাবিক; কারণ জানবার ইচ্ছা, প্রশ্ন করার তাগিদ, কৌতূহল প্রকাশের তাড়না এ সবই মানুষের প্রকৃতিজাত। মানুষ বুদ্ধিজীবী প্রাণী, সে সবকিছুকেই বুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে চায়; তাই সে প্রশ্ন করে—জীবন কি সত্যই মূল্যবান? বেঁচে থাকার পেছনে কি এমন কোন মহৎ উদ্দেশ্য আছে যার সিদ্ধির জন্য মানুষ জীবনতরী

বেয়েই চলেছে এবং যার জন্য মানবজীবন ও পশুজীবনের মধ্যে এতবড় ব্যবধানের প্রাচীর গড়ে উঠেছে? উত্তর—হ্যাঁ, সে উদ্দেশ্য হলো চরম জ্ঞানলাভ, সর্ববিধ বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ। ভারতীয় দর্শন দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছে একথা। কালজয়ী বিভিন্ন মুনি ঋষি ও সত্যদ্রষ্টা আচার্যেরা একথা বার বার বলে গেছেন এবং সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথ-নিশানাও রেখে গেছেন। আত্মোপলব্ধি বা আত্মজ্ঞানই হচ্ছে মানবজীবনের পরম পুরুষার্থ; আমাদের প্রাচীনেরা তাই উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করেছেন বিশ্ববাসীকে—

'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।'

দার্শনিকের চোখে তাহলে জীবন হচ্ছে একটা বিরাট সম্ভাবনা—সত্যানুসন্ধানের একটা দুর্লভ সুযোগ। জীবন যে একটা রঙীন ফানুসমাত্র নয়, জীবনের পশ্চাতে যে এক কল্যাণী ইচ্ছা আছে, দার্শনিকের চোখে জীবনের এ দিকটাই খুব স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে; দার্শনিক জেনেছেন, জন্মমৃত্যুর মাঝখানে আলো-আঁধারি খেলাই সবকিছু নয়; তবে এ খেলা আবার আকাশকুসুমের মত মিথ্যা বা অলীক কিছুও নয়। এ খেলা হচ্ছে জীবনের পরম পাওয়ার প্রস্তুতির প্রথমমাত্র। জীবনসম্বন্ধে এ ধারণা মনে রেখেই ভারতীয় দার্শনিকেরা জীবনকে একটা বিরাট নৈতিক রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যেখানে প্রতিটি মানুষ নিপুণ পরিচালক ঈশ্বরের আদিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছে। অন্তর্দৃষ্টিতে আমরা (শুধু মানুষ নয়, সব জীবই) নিরন্তর আত্মবিকাশের জন্য সংগ্রাম করে চলেছি, এবং প্রতিটি জীবনেই এগিয়ে চলেছি জীবনের চরম লক্ষ্য আত্মোপলব্ধির দিকে। যতদিন আমরা নিজপ্রয়াসে অভীষ্টলাভে সিদ্ধ না হব, ততদিন আমাদের বাঁচা-মরার এই জগতে ঘুরেফিরে আসতেই হবে—এটা হচ্ছে প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম। আত্মোপলব্ধি-রূপ জীবনের সেই অতি-আকাঙ্ক্ষিত মাহেন্দ্রক্ষণটি যখন মানুষের জীবনে এসে উপস্থিত হবে, তখনই সে পাবে এই পৃথিবীর জন্মমৃত্যু থেকে চিরমুক্তি।

এ কথাও অবশ্যস্বীকার্য যে অনেক সময় আদর্শবাদী সাহিত্যিক তাঁর রচনায় জীবনের এই আদর্শকে স্বীকার করে নেন এবং সে স্বীকৃতি প্রকাশ করেন বিভিন্ন চরিত্র-চিত্রণের মাধ্যমে; সাহিত্যিক যখন সাহিত্যসাধনায় জীবনের এই মঙ্গলব্রতের উদ্‌যাপন করেন, তখন তিনি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে নিজেই নিজের আসন রচনা করেন দর্শনের পবিত্র বেদীমূলে, আর তখনই হয় সাহিত্য ও দর্শনের, দার্শনিক ও সাহিত্যিকের মধুর মিলন।

তুচ্ছ

শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ইন্দ্রজিৎ, চন্দ্রজিৎ, যা-ই তুমি হও,
না হ'লে ইন্দ্রিয়জিৎ, তুমি কিছু নও!

বিবেকানন্দ-স্মৃতি*

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

[অনুবাদক—শ্রীসুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়]

স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধিলাভের পর শতাব্দীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ অবসিত হইয়াছে। একের পর এক বৎসরগুলি অতিক্রান্ত হইতেছে এবং অতিক্রান্ত প্রতিটি বৎসর তাঁহার মহত্ত্বের স্বীকৃতি আনিতেছে, তাঁহার অনুরাগী ভক্তবৃন্দের পরিধিও বিস্তৃততর করিতেছে। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন এবং যাঁহারা তাঁহার কণ্ঠস্বর স্বকর্ণে শুনিয়াছেন, বর্ষগুলি অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারাও একে একে বিদায় লইতেছেন। তাঁহার সমসাময়িক যাঁহারা এখনও জীবিত আছেন তাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের ধারণা ও স্মৃতি-সমূহ উপস্থাপিত করিতে দায়বদ্ধ—যে বিবেকানন্দ ছিলেন সর্বজনীন স্বীকৃতি অনুযায়ী ভারত তথা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবদের অন্যতম। তাঁহার জীবনী লইয়া পুনরালোচনার প্রয়োজন নাই, কারণ চারিখণ্ডে[১] তাঁহার শিষ্যেরা সর্বাঙ্গসুন্দর রূপে সেই কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু আমার মতো যে সকল ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাকে জানিয়াছিলেন, তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন ও তাঁহার স্মৃতি লইয়া তাঁহারা এখনও কিছু আলোচনা করিতে পারেন—স্মৃতির পৃষ্ঠা উল্টাইতে উল্টাইতে তাঁহার জীবনের বাহিরে ক্ষুদ্র অথচ ভিতরে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাসমূহের উল্লেখ করিতে পারেন এবং তাঁহার চরিত্রের সেই সব বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিতে পারেন যাহা তাঁহার চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য সূচিত করিত। যখন তিনি একজন অপরিচিত এবং সাধারণ বালক মাত্র তখনই তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হয়, কারণ আমি কলেজে তাঁহার সহপাঠী ছিলাম; আমেরিকা হইতে যশঃ ও গৌরবের পূর্ণ প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া যখন তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন তখনও আমি তাঁহাকে জানিতাম। তিনি কয়েকদিন আমার সঙ্গে বাস করিয়াছিলেন এবং আমাদের অদর্শনের বৎসরগুলিতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সেই সকল বিষয়ে অবাধে আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগের কয়েকদিন মাত্র পূর্বে কলিকাতার কাছে বেলুড় মঠে তাঁহার সহিত শেষবার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার বিষয়ে আমি যাহা কিছু বলিব সে সকলই তাঁহার নিজ মুখ হইতে শোনা, অপর কাহারও কাছ হইতে শোনা নয়।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন প্রথম সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তখন ভারতবর্ষের অবস্থা বড় বিচিত্র। বিদেশী ঔপনিবেশিক শাসন ও বিজাতীয় সভ্যতা ভারতীয় জীবনযাত্রা ও চিন্তা-ধারার উপর ধ্বংসাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। পাশ্চাত্য বস্তুবাদী সভ্যতার দৃষ্টি-আকর্ষণকারী আড়ম্বরে ও ঔজ্জ্বল্যে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ লুপ্ত অথবা আচ্ছন্ন হইয়াছিল। ভারতের প্রগতিমূলক সকল আন্দোলনের চতুর্দিকে ছিল একটা অবাস্তবতার আবরণ। প্রতিটি কর্মক্ষেত্রেই একটা আত্মতুষ্ট আন্তরিকতা-বিহীন ভাব প্রাচীনকালের একনিষ্ঠ ঐকান্তিকতা ও ভক্তির স্থান দখল করিয়াছিল। পুরাতন আদর্শের সুদৃঢ় নোঙর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া

* 'Reminiscences of Swami Vivekananda' গ্রন্থ হইতে অনূদিত।

১ বর্তমানে কয়েকটি খুঁটিনাটি তথ্য বাদ দিয়া একখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

সকল কিছুই বহিরাগত বাত্যায় বিচ্ছিন্ন ও স্রোতে বাহিত হইয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। প্রাচীন আর্যেরা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, আত্মোৎসর্গ ও আত্মনিবেদন ভিন্ন কোন কিছুই লাভ করা সম্ভব নয়। আধুনিক ভারতীয় নূতন পরিবেশে ভাবিলেন, কোনও কিছু অর্জন করিতে আত্মনিবেদনের কোন প্রয়োজন হয় না। পশ্চিমের দৃষ্টান্তে ভারতীয় সমাজ-সংস্কারকেরা তাঁহাদের সংস্কার-কার্য চালাইবার সময়ে তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনে বিলাস ও স্বাচ্ছন্দ্যকে পরিহার করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন না। যে পদ্ধতি তাঁহারা অবলম্বন করিলেন তাহা সৌখীন সমাজ-সংস্কারকের পদ্ধতি—তাহা বৃহৎ সমস্যাসমূহের উপরিভাগ মাত্র স্পর্শ করে, কদাচিৎ সমস্যার গভীরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে। বাগ্মিতার অধিকারী ব্যক্তিরা তাঁহাদের প্রচণ্ড বক্তৃতার প্রভাবে শ্রোতৃবর্গের মধ্যে ভাবাবেগ সৃষ্টিতে সমর্থ হইতেন সত্য, কিন্তু তাহার প্রভাব ক্ষণস্থায়ী হইত, কারণ তাঁহাদের আবেদনে সত্যকারের প্রাণশক্তির অভাব ছিল।

*

এইরূপ নৈরাশ্যকর পরিবেশে প্রায় অলক্ষিত-ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রশান্ত আবির্ভাব ঘটিল। দীর্ঘদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে ধ্যানে ও সাধনায় তিনি নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন। অতীতের কোন কোন প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের মতো তিনি প্রায় নিরক্ষর ছিলেন, এবং পেশায় ছিলেন একটি মন্দিরের পুরোহিত ; এ কার্যে পরবর্তীকালে তিনি অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন—অজ্ঞ জনসাধারণ ভাবিল তাঁহার বুদ্ধি লোপ পাইতেছে ; কিন্তু তখন তিনি পরমজ্ঞানের সন্ধান করিতেছেন এবং সেই জ্ঞানকে প্রকাশ করিবার জন্য আত্মার সংগ্রাম চলিতেছে। যখন তিনি তাঁহার ঈপ্সিতজ্ঞান লাভ করিলেন, তিনি মানুষের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন না ; পরন্তু তাঁহার উপদেশ শুনিতে ও সেই উপদেশকে নিজ জীবনে কার্যকর করিতে উৎসুক একদল যুবককে নিজের নিকট আকর্ষণ করিলেন। তাঁহার বাণীর অনেকাংশই সংগৃহীত এবং প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু এই সকল লেখায় তাঁহার বিশিষ্টতা অল্পমাত্র প্রকাশিত। শ্রীরামকৃষ্ণ যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দীর্ঘ ব্যবধানে আবির্ভূত নির্বাচিত পুরুষদের অন্যতম—এ কথা অতি সত্য। তাঁহার বাণী শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তখন আমার মনে হইত, এখনও মনে হয় যে, এমন একজন মানুষের কথা শুনিবার বিপুল সৌভাগ্য মানুষের কদাচিৎ ঘটে। ঘরোয়া বাংলায় পরমহংসদেব কথা বলিতেন। তিনি ঠিক সাবলীল ভাবে কথা বলিতে পারিতেন না, কারণ তাঁহার সামান্য একটু তোৎলামির ভাব ছিল ; অবশ্য সেটুকুর জন্য তাঁহার কথাগুলি মিষ্টই লাগিত। অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য, উপমা-অলঙ্কারের অফুরন্ত সঞ্চয়, পর্যবেক্ষণের অসাধারণ শক্তি, তীক্ষ্ণোজ্জ্বল সূক্ষ্ম রসিকতা, সর্বতঃপ্রসারী অপূর্ব সমবেদনা এবং চিরনিস্যন্দী প্রজ্ঞার জন্য তাঁহার বাণী সকলকে চমৎকৃত ও অভিভূত করিয়া রাখিত।

পরমহংসদেবের চুম্বকশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের দ্বারা যে সকল যুবক আকৃষ্ট হইয়াছিল, নরেন্দ্রনাথ—পরে যিনি স্বামী বিবেকানন্দ হন—তাঁহাদের অন্যতম। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে যাঁহারা আসিতেন, তাঁহাদের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের কোন পার্থক্য ছিল না। ক্লাসের পড়াশুনায় তিনি সাধারণ ছিলেন, এক্ষেত্রে বিরাট উন্নতির কোনও সম্ভাবনা দেখা যাইত না ; কারণ তিনি শিক্ষাবিষয়ক বা অন্য কোনও বৃত্তিতে পুরস্কৃত হইবার জন্য নির্দিষ্ট

হন নাই। কিন্তু অপরদিকে গুরুদেব তাঁহাকে অন্যান্যদের ভিতর হইতে বাছিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উচ্চ ধারণা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরমহংসদেব তাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছিলেন—"ও যে সহস্রদল পদ্ম"—ইহার অর্থ এই যে, ঐ বালকটি সেই সব বিরল মানবদের অন্যতম যাঁহারা নেতা হইবার জন্য, বিরাট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পৃথিবীতে পূর্ণ গুণান্বিত হইয়া আবির্ভূত হন। এই কথা বলিবার সময় পরমহংসদেবের লক্ষ্য ছিল আধ্যাত্মিক জগতের দিকে, কারণ পার্থিব কোন সাফল্যকেই তিনি গণ্য করিতেন না।...

বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের একজন দীক্ষিত শিষ্য হইলেন। এই শ্রেণীর শিষ্যের সংখ্যা ছিল নিতান্ত অল্প এবং পরমহংসদেব এই ধরনের শিষ্য-নির্বাচনে খুব সতর্ক ছিলেন। এই শ্রেণীর শিষ্যদের প্রত্যেককেই নিরন্তর 'স্পার্টান'-কঠোরতার চেয়েও কঠোরতর এবং শিথিলতা-হীন শৃঙ্খলার অধীন হইতে হইয়াছিল।... বিবেকানন্দ সম্পর্কে পরমহংসদেবের ভবিষ্যদ্‌বাণী কোথাও বিজ্ঞাপিত করা হয় নাই, তিনি এবং তাঁহার গুরুভাইয়েরা সব সময় পরমহংসদেবের সতর্ক দৃষ্টির তত্ত্বাবধানে ছিলেন। কঠোর সংযম বা কৃচ্ছ্রসাধনের ব্রত তাঁহাদের উপর ন্যস্ত ছিল এবং সে তপশ্চর্যা পরমহংসদেবের নির্বাণ-লাভের পরেও অটুট ছিল। বিবেকানন্দ কাশীধামে গিয়া মন্ত্র ও স্তোত্রাদির বিশুদ্ধ উচ্চারণ[১] আয়ত্ত করেন—যেগুলি স্বর-গম্ভীর পরম আকর্ষণীয় ভঙ্গীতে আবৃত্তি করিতেন। আমি তাঁহাকে বন্ধুদের অনুরোধে সুন্দর উদাত্ত সুরে গান গাহিতে শুনিয়াছি; বাগ্মিরূপে তাঁহার কণ্ঠস্বরে শক্তি ও সঙ্গীত উভয়ই সম্মিলিত হইয়াছিল।...

দারিদ্র্য ও সন্ন্যাসের মন্ত্র লইয়া বিবেকানন্দ আট বৎসর ধরিয়া দক্ষিণ ও উত্তর ভারত বিস্তৃতভাবে পরিভ্রমণ করিলেন[২]; তাঁহার অভিজ্ঞতা যে বিচিত্র ও বহুধাবিস্তৃত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি বহুদিন মাদ্রাজে কাটাইলেন এবং পেশাদারী সাধুদের কু-প্রভাব সম্পর্কে তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিল। তিনি অন্তরঙ্গ ভাবে তেলুগু ও তামিল ভাষাভাষী লোকদের গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে পরিচিত হইলেন। তাঁহার প্রথম গুণমুগ্ধ ভক্ত জুটিল এই মাদ্রাজ প্রদেশেই।

স্বামীজী বিহারও ভ্রমণ করিয়াছিলেন।... ভ্রমণকালে বিবেকানন্দ খুব সকালে উঠিতেন এবং গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড অথবা গ্রাম্য পথ ধরিয়া পদব্রজে ঘুরিয়া বেড়াইতেন—যতক্ষণ পর্যন্ত না কেহ তাঁহাকে কিছু খাদ্যদ্রব্য দিত, অথবা সূর্যের উত্তাপে পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষচ্ছায়ায় তিনি বিশ্রাম লইতে বাধ্য হইতেন। একদিন সকালে তিনি যথারীতি পথে বাহির হইয়াছেন, সহসা পিছন হইতে একটি চীৎকার শুনিলেন—কে যেন তাঁহাকে থামিতে বলিতেছেন। পিছন ফিরিয়া দেখেন, একজন শ্মশ্রুধারী পূর্ণ-সশস্ত্র অশ্বারোহী পুলিস-কর্মচারী একগাছি ছড়ি ইতস্ততঃ দোলাইতে দোলাইতে আসিতেছেন এবং কয়েকজন পুলিস তাঁহার পিছন পিছন আসিতেছে। তিনি নিকটে আসিলে পুলিস অফিসার ভারতীয় পুলিস-জনোচিত সুপরিচিত 'সুমধুর কণ্ঠে' বিবেকানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন

১ অন্যমতে সংস্কৃত উচ্চারণের ব্যাপারে তিনি মারাঠী উচ্চারণ-পদ্ধতিকে পছন্দ করিতেন এবং তাহাই শিক্ষা করিয়াছিলেন।

২ প্রকৃত প্রস্তাবে এই ভ্রমণকাল সময়ে অল্প, কারণ তিনি গুরুর দেহত্যাগের অনেকদিন পরে ভারত-ভ্রমণ শুরু করেন।

—"কোন্ হায় ?" "খাঁ সাহেব, দেখতেই পাচ্ছেন আমি একজন সাধু।"—বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন। "সব বেটা সাধুই বদমাশ।"—পুলিস সাব-ইনস্পেক্টার গর্জিয়া উঠিলেন। আর ভারতীয় পুলিস যেহেতু কখনও সত্য ছাড়া মিথ্যা বলে না—এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যের বিষয়ে দ্বিমত করা চলে না। পুলিস অফিসারটি পুনরায় বলিলেন—"তুমি আমার সঙ্গে এস, আমি তোমাকে গারদে ঢোকাব।" "কত দিনের জন্য ?"—বিবেকানন্দ নম্রকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন। "পনেরোদিনও হতে পারে, আবার একমাসও হতে পারে।" বিবেকানন্দ তাঁহার আরও নিকটে গিয়া সুনজর-লাভেচ্ছুর মত বেশ বিনীত কণ্ঠে বলিলেন—"খাঁ সাহেব, মাত্র এক মাস ? ওটা ছ'মাস হয় না, অন্ততঃ তিন-চার মাস ?" পুলিস কর্মচারীটি হাঁ করিয়া তাকাইলেন এবং সন্দেহের সুরে প্রশ্ন করিলেন —"কি ব্যাপার ; এক মাসের বেশী জেলে থাকতে ইচ্ছা কেন ?" বিবেকানন্দ একান্ত গোপনীয় সুরে বলিলেন—"এ জীবনের থেকে জেল অনেক সুখের। এই সকাল-সন্ধ্যা হাড়ভাঙ্গা হাঁটুনির থেকে জেলের কাজ বেশী কঠিন নয়। আমার রোজ খাবার জোটে না, প্রায়ই না খেয়ে দিন কাটাতে হয়। জেলে অন্ততঃ রোজ দুটো পেটভরে খেতে পাব। আমি আপনাকে আমার পরম হিতৈষী বন্ধুরূপে দেখবো, যদি আপনি আমাকে কয়েক মাস জেলে আটকে রাখতে পারেন।" কথাগুলো শুনিতে শুনিতে একটা হতাশা ও বিরক্তির ভাব খাঁ সাহেবের মুখে দেখা গেল এবং তিনি তৎক্ষণাৎ বিবেকানন্দকে চলিয়া যাইতে বলিলেন।

পুলিসের সঙ্গে দ্বিতীয় মোলাকাৎ হয় কলিকাতাতেই। বিবেকানন্দ তখন কয়েকজন গুরুভ্রাতার সহিত কলিকাতার পার্শ্ববর্তী একটি অঞ্চলে বাস করিতেছেন এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে পড়াশুনা করিতেছেন ও সুবিধা-সুযোগ মত এক-আধটু সামাজিক কর্তব্য পালন করিতেছেন। একদিন তাঁহাদের পরিবারের পরিচিত বন্ধুস্থানীয় এক পুলিস কর্মচারীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি অপরাধী-সন্ধান-বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন এবং কর্মদক্ষতার পুরস্কারস্বরূপ উপাধি ও মেডেলে ভূষিত হন। তিনি বিবেকানন্দকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া সেই সন্ধ্যায় তাঁহার গৃহে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ জানাইলেন। তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া বিবেকানন্দ আরও কয়েকজন পরিদর্শককে দেখিতে পাইলেন। শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাঁহারা সকলেই চলিয়া গেল, কিন্তু ভোজনের কোনও আয়োজনই তিনি দেখিতে পাইলেন না। পক্ষান্তরে, গৃহস্বামী নানাবিষয়ে কথোপকথন শুরু করিয়া দিলেন এবং হঠাৎ স্বর নিম্ন করিয়া বিবেকানন্দের পানে সন্দেহের চাহনি হানিয়া বলিলেন—"এইবার সব খুলে বলে ফেলো দেখি; সব কথা সত্য বলবে, কিন্তু জানই তো আমি তোমার গল্পে ভুলবার পাত্র নই, কারণ তোমাদের কারবার আমার সব জানা আছে। তুমি এবং তোমার দলবল ধর্মপ্রাণতার ভান কর, কিন্তু আমি বেশ ভাল জানি, তোমরা গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছো।" "একথার অর্থ কি ?"—বিবেকানন্দ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোন্ ষড়যন্ত্রের কথা বলছেন এবং তার সঙ্গে আমাদেরই বা সম্পর্ক কি ?" "সেই কথাই তো আমি জানতে চাইছি"—খুব ঠাণ্ডাগলায় পুলিস কর্মচারীটি প্রত্যুত্তর করিলেন, "আমি স্থির নিশ্চিত যে তোমরা একটা বদমতলব এঁটেছো, আর তুমিই হলে দলের সর্দার। সব কথা খুলে বল, তারপর রাজসাক্ষী করে

নিতে চেষ্টা করবো।' 'যদি আপনি সব কিছুই জানেন তবে আমাদের আটক করছেন না কেন, আর কেনই বা আমাদের বাড়ী খানা-তল্লাসি করতে বাকী রেখেছেন?'—এই কথা বলিতে বলিতে বিবেকানন্দ উঠিলেন এবং ধীরে ধীরে দুয়ার বন্ধ করিয়া দিলেন। এখন বিবেকানন্দ একজন ভালো পালোয়ান ছিলেন, তাঁহার গঠনও ছিল খুব শক্তিশালী; অপর দিকে সেই পুলিস কর্মচারীটি ছিলেন শীর্ণকায় ও খর্বাকৃতি। বিবেকানন্দ তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন--'আপনি ভাঁওতা দিয়ে আমাকে আপনার বাড়ীতে ডেকে এনেছেন এবং আমার ও আমার সহচরদের সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগ করেছেন। এই হল আপনার ব্যবসায়। আর আমি, অপমানিত হলেও মানসিক স্থৈর্য ঠিক রাখার শিক্ষাই পেয়েছি। যদি সত্যিই আমি অপরাধী এবং ষড়যন্ত্রকারী হতাম, তবে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যা আপনার ঘাড় ভেঙে দিতে আমায় বাধা দিতে পারত; আপনি সাহায্যের জন্যে চীৎকার করবার অবকাশও পেতেন না! যাই হোক, আমি আপনাকে ছেড়ে দিলাম।' এই বলিয়া বিবেকানন্দ দুয়ার খুলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। পুলিস কর্মচারীটি হতভম্ব ও বাক্যহীন হইয়া বসিয়া রহিলেন। মুখে সন্ত্রাসের চিহ্ন উঠিল। ইহার পর বিবেকানন্দ অথবা তাঁহার সহচরবর্গ আর কখনো এই ব্যক্তির দ্বারা নিগৃহীত হন নাই।

*

ভারত-ত্যাগকালে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন অজ্ঞাত অপরিচিত যুবক; আমেরিকা ও ইংলণ্ড হইতে অর্জিত খ্যাতি লইয়া তিনি ফিরিলেন, এবং সর্বত্র প্রাচীন আর্যধর্মের প্রবক্তা নেতারূপে ঘোষিত হইতে লাগিলেন। মাদ্রাজে তাঁহাকে উদ্দীপনাপূর্ণ সংবর্ধনা জানান হয়। কিন্তু কলিকাতা-সংবর্ধনার কোন কোন সুবিবেচক কর্মকর্তা তাঁহার কাছে খরচের বিল পাঠাইয়াছিলেন। অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে এই ঘটনাটি উল্লেখ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—'সংবর্ধনা নিয়ে আমার কি হবে? এই লোকগুলো মনে করে আমি আমেরিকা থেকে অনেক টাকা নিয়ে এসেছি, যাতে আমার ঢাক বাজানো যাবে। আমাকে পেয়েছে কি? আমি কি ভাঁড় না বাক্যবাগীশ?' এই ঘটনায় তিনি ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর আগ্রহী যুবকগণ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করিতে আসিলেন। ব্রহ্মচর্য ও দারিদ্র্যের দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহারা ভারতের নানাস্থানে মঠ স্থাপন করিলেন। আমেরিকাতে কয়েকজন রহিলেন, যাহার ফলে পৃথিবীর সেই অংশে স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম এখনও উদ্‌যাপিত হইতেছে এবং পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে সে দেশে স্বামীজীকে স্মরণ করা হইতেছে! স্বামী বিবেকানন্দ আমাকে বলিয়াছিলেন—পরমহংস-দেব ব্রহ্মচর্য ও নৈতিক বিশুদ্ধিকে আত্মশাসনের মূলমন্ত্র বলিয়া শিক্ষা দিতেন; স্বামীজীর শিষ্যদিগকে ও তাঁহার মৃত্যুর পর যাঁহারা এই সঙ্ঘে যোগ দিয়াছেন তাঁহাদিগকেও এই বিষয়টিতে জোর দিতে দেখা যায়।

বিবেকানন্দ আমেরিকা যাইবার পূর্বে তাঁহার সহিত আমার সর্বশেষ সাক্ষাৎ হয় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। সেই সময় অল্পদিনের জন্য আমি কলিকাতায় আসিয়াছিলাম এবং এক অপরাহ্ণে আমি সংবাদ পাইলাম যে রামকৃষ্ণদেব মহাসমাধিতে লীন হইয়াছেন। আমি তৎক্ষণাৎ কাশীপুরের বাগান-বাড়ীতে—যেখানে পরমহংসদেব তাঁহার পার্থিব জীবনের শেষ দিনগুলি কাটাইয়াছিলেন—

উপস্থিত হইলাম। তিনি বারান্দার সামনে একটি শুভ্র পরিচ্ছন্ন শয্যার উপর শায়িত ছিলেন, বিবেকানন্দ-সহ তাঁহার শিষ্যেরা এবং অন্যান্য কয়েকজন তাঁহার শয্যা বেষ্টন করিয়া মাটির উপরে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বসিয়াছিলেন। পরম-হংসদেব ডানপাশ ফিরিয়া শুইয়াছিলেন—তাঁহার মুখমণ্ডলে অসীম শান্তির ভাব পরিস্ফুট, সর্বাঙ্গে মৃত্যুর স্তব্ধতা। বৃক্ষগুলি নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, অপরাহ্ণ বিলীয়মান; মাথার উপর সুনীল আকাশে কদাচিৎ দু-এক খণ্ড মেঘ নিঃশব্দে ভাসিয়া যাইতেছে; আর চতুর্দিকের এই সব কিছু জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে এক গভীর প্রশান্তি। আমরা সকলে পরম শ্রদ্ধায় নীরব হইয়া বসিয়া আছি, এই মহাপ্রয়াণের সম্মুখে সকল কোলাহল স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, এমন সময় উপর হইতে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি ঝরিল। ইহাই সেই পুষ্পবৃষ্টি—যাহার কথা প্রাচীন আর্যগণ লিখিয়া গিয়াছেন। যে সকল মরদেহধারী অমর-সভায় আসনগ্রহণের জন্য নির্বাচিত হইতেন, পৃথিবী হইতে তাঁহাদের বিদায়কালে দেবগণ তাঁহাদের উদ্দেশ্যে এই ভাবেই শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেন—বর্ষিত বারি-কণাগুলিই যেন তাঁহাদের নিবেদিত পুষ্পগুলির দ্রবীভূত রূপ। রামকৃষ্ণ পরমহংসকে জীবদ্দশায় দেখিতে পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা, মহাপ্রয়াণকালে তাঁহার মুখের দিব্যভাব দর্শন করার সুযোগলাভও তাহাই।

ইহার পর এগার বৎসরের পূর্বে (১৮৯৭ খ্রীঃ) বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ আমি পাই নাই। তিনি তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ত্রই বিখ্যাত। তিনি অনেক দেশ ঘুরিয়াছেন, অনেক লোক দেখিয়াছেন। আমি তখন লাহোরে। আমি শুনিলাম—তিনি পার্বত্য নিবাস 'ধর্মশালায়' অবস্থান করিতেছেন। কিছুকাল পরেই তিনি কাশ্মীরের অন্তর্গত জম্মু যান এবং তাহার পর লাহোরে নামিয়া আসেন। সেখানে এক শোভাযাত্রার আয়োজন হইয়াছিল—তাঁহার জন্য একটি বাড়ী ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছিল। রেল স্টেশনে ট্রেন আসিলে আমি দেখিলাম একজন ইংরেজ মিলিটারী অফিসার একটি প্রথম শ্রেণীর কামরা হইতে নামিয়া যেন কাহারও জন্য দরজা খুলিয়া দাঁড়াইলেন এবং ঠিক পরেই স্বামী বিবেকানন্দ প্ল্যাটফর্মে নামিয়া পড়িলেন। অফিসারটি স্বামীজীকে নতমস্তকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে বিবেকানন্দ আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁহার করমর্দন করিলেন এবং দুই একটি বিদায়সূচক বাণী উচ্চারণ করিলেন। জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া বিবেকানন্দের কাছে জানিতে পারিলাম—তিনি অফিসারটিকে চিনিতেন না। স্বামীজীর কম্পার্টমেণ্টে উঠিয়া তিনি স্বামীজীকে বলেন—ইংলণ্ডে তিনি স্বামীজীর কয়েকটি বক্তৃতা শুনিয়াছেন এবং ভদ্রলোক নিজে ভারতীয় পদাতিক বাহিনীর একজন কর্ণেল। বিবেকানন্দ প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতেছিলেন, কারণ জম্মুর লোকেরা তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া দিয়াছিল। সেই রাত্রেই বিবেকানন্দ আমার গৃহে দুইজন শিষ্যসহ আসিলেন। সেই রাত এবং পরবর্তী রাত্রিগুলিতে ও দিনে যখনই আমি অবকাশ পাইয়াছি, তখনই দীর্ঘকাল আমরা কথাবার্তা কহিয়াছি এবং যে জিনিসটি আমার মনে গভীর-তম রেখাপাত করিয়াছিল তাহা হইল মাতৃভূমির জন্য বিবেকানন্দের গভীর ভালোবাসা এবং সুতীব্র ভাবাবেগ। তাঁহার মধ্যে অধ্যাত্ম-অনুরাগ এবং তীক্ষ্ণ মনীষার অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছিল। তিনি প্রচুর সমস্যার মধ্যে প্রবেশ করিতেন এবং অধিকাংশেরই সমাধান করিয়া ফেলিতেন। তাঁহার মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণী করিবার অসাধারণ

ক্ষমতা ছিল। তিনি বলিতেন—"ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণী এখন নিঃশেষিত-শক্তি—অটল এবং ধারাবাহিক প্রয়াসের উপযোগী প্রাণশক্তি তাদের নেই; ভারতের ভবিষ্যৎ জনসাধারণের হাতে।' একদিন অপরাহ্নে চিন্তান্বিত মুখে তিনি ধীরে ধীরে আমার নিকট আসিয়া বলিলেন—"যদি জেলে গেলে দেশের কোন উপকার হয় তবে আমি জেলে যেতে খুবই প্রস্তুত।" আমি তাঁহার দিকে বিস্মিত হইয়া তাকাইয়া ভাবিতে লাগিলাম—যাঁহার কণ্ঠে সম্মানমাল্য এখনও অম্লান, তিনি তাহার উল্লেখমাত্র না করিয়া স্বেচ্ছায় কারাবরণের ইচ্ছা করিতেছেন, যদি ইহাতে তাঁহার দেশবাসীর কিছু উপকার হয়! শহীদের মুকুট শিরে ধারণ করিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হন নাই, কারণ কোন কিছু জাহির করার ভাব দেখানো তাঁহার ধাতে ছিল না; দুঃখ বরণের দ্বারা দেশকে মুক্ত করার মত চিন্তার দিকে তাঁহার মন নিঃসন্দেহেই ঝুঁকিতেছিল। তখনও পর্যন্ত কেহ অসহযোগ আন্দোলন বা আইন অমান্য আন্দোলনের কথা শুনে নাই, তথাপি রাজনীতির সঙ্গে যাঁহার কিছুমাত্র সম্পর্ক ছিল না সেই বিবেকানন্দই ভাবী ঘটনার পশ্চাৎছায়ার উপর দাঁড়াইয়াছিলেন। জাপান ভ্রমণকালে জাপানীদের দেশপ্রেম তাঁহার মনে উৎসাহপূর্ণ শ্রদ্ধার সৃষ্টি করিয়াছিল। তিনি বলিতেন—"তাদের দেশই তাদের কাছে ধর্ম। তাদের জাতীয় ধ্বনি হল—মহান জাপান দীর্ঘজীবী হোক। (Dai Nippon, Banzai) সবকিছুর সামনে তাদের দেশ, সবকিছুর উপরে তাদের দেশ। দেশের সম্মান ও সংহতির জন্য কোন ত্যাগই তাদের কাছে যথেষ্ট (বড়) নয়।" এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজীর মুখমণ্ডল উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত।

এক সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ ও আমি এক পঞ্জাবী ভদ্রলোকের (স্বর্গত বক্সী জৈসী রাম) গৃহে আমন্ত্রিত হই। তাঁহার সহিত বিবেকানন্দের 'ধর্মশালায়' সাক্ষাৎ হয়। বিবেকানন্দকে একটি নূতন সুদৃশ্য হুঁকা দেওয়া হইল ধূমপানের জন্য। ধূমপান করার পূর্বে বিবেকানন্দ বলিলেন, "যদি আপনার মনের মধ্যে জাতি সম্পর্কে কোন সংস্কার থাকে তবে আমাকে হুঁকা না দেওয়াই আপনার উচিত, কারণ যদি কোন ঝাড়ুদার আগামী কাল আমাকে হুঁকা আগাইয়া দেয় তবে আমি পরিতৃপ্তির সঙ্গে সেই হুঁকায় ধূমপান করিব—আমি জাতির গণ্ডির বাহিরে।" গৃহস্বামী সবিনয়ে তাঁহাকে বলিলেন যে স্বামীজী তাঁহার হুঁকায় ধূমপান করিলে তিনি বাধিত হইবেন। পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজীর কাছে অস্পৃশ্যতা-সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। উচ্চবর্ণের লোকেরা যাহাদিগকে স্পর্শ করিতেও ঘৃণা বোধ করিবে এমন সব দরিদ্র ও দীনতম ব্যক্তির ঘরে তিনি আহার করিয়াছেন এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই তাহাদের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন। তাই বলিয়া স্বামী বিবেকানন্দ কোনমতেই মৃদু-প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন না। লাহোরে বেদান্তের উপর বক্তৃতা তাঁহার উচ্চভাবপূর্ণ শ্রেষ্ঠ ভাষণসমূহের অন্যতম, ঐ বক্তৃতাকালে তিনি শির উন্নত ও নাসা বিস্ফারিত করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন —'আমি জীবিত গর্বিততম ব্যক্তিদের একজন।' ইহা সচরাচর-প্রকাশিত অসার ধরনের অহমিকার প্রকারভেদ নয়, ইহা বিরাট ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারীর গর্ব-চেতনা, যে ভ্রান্ত দীনতা-বোধ তাঁহার দেশ ও দেশবাসীকে অধঃপাতিত করিয়াছে, ইহা তাহারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

কথোপকথনকালে বিবেকানন্দ ছিলেন উদ্দীপ্ত, উজ্জ্বল, আকর্ষণীয় এবং চমকপ্রদ, তাঁহার জ্ঞানের পরিধিরও ছিল অসাধারণ বিস্তৃতি। আলাপের সময় দেশের চিন্তাই তাঁহার মনকে বেশীর ভাগ সময় অধিকার করিয়া থাকিত। তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাসমূহ তাঁহার বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্তিস্বরূপ ছিল এবং ঐগুলির জ্যোতির্ময় প্রকাশ তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে দেখা যাইত। কিন্তু তাঁহার দেশপ্রেমও তাঁহার ধর্মবোধের মতই গভীর ছিল। আমেরিকান ও ইংরেজ শিষ্যদের উপর তাঁহার কি গভীর প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল, সেকথা যাঁহারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন তাঁহারা ভিন্ন খুব অল্প লোকেই অনুমান করিতে পারিবে।

ভগিনী নিবেদিতা ও আলমোড়ার অপরাপর শিষ্যাদের পরিচর্যাকারী একজন সাধারণ মুসলমান পাচক পর্যন্ত ইহা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিল। পাচকটি আমাকে লাহোরে বলিয়াছিল—"এই মেমসাহেবরা স্বামীজীকে যে রকম ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে, আমাদের কোনও 'মুরিদ' (শিষ্য) কোনও 'মুর্শিদ' (গুরু)-কেও ততখানি করে না।" সামান্য কাপড় ও অতিসাধারণ একজোড়া জুতা পরিহিত এই ভারতীয় সন্ন্যাসীর দর্শনমাত্রে তাঁহার পাশ্চাত্যের শিষ্যেরা—যাঁহাদের মধ্যে কলিকাতায় আমেরিকান 'কনসাল জেনারেল' এবং তাঁহার স্ত্রীও ছিলেন—সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইতেন এবং যখন তিনি কথা বলিতেন, তাঁহারা গভীর মনোযোগের সঙ্গে সশ্রদ্ধচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেন। তাঁহার সামান্যতম ইচ্ছাও আদেশরূপে তাঁহাদের কাছে প্রতিভাত ও পালিত হইত। বিবেকানন্দ কিন্তু সেই একই সরল ও মহান মানুষটি থাকিয়া গিয়াছিলেন—সহজ, ঐকান্তিক এবং গম্ভীর।

আলমোড়ায় বিশিষ্ট ও বিখ্যাত একজন ইংরেজ মহিলা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। এই মহিলাটিকে হিন্দুধর্মের প্রবক্তা হিসাবে দেখিয়া বিবেকানন্দ তাঁহার বিষয়ে সমালোচনা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিবেকানন্দের রোষের হেতু কি? বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন—"তোমরা, ইংরেজরা আমাদের দেশ কেড়ে নিয়েছো; তোমরা আমাদের স্বাধীনতা অপহরণ করেছো এবং আমাদের নিজের দেশেই আমাদের ক্রীতদাস বানিয়েছো; আমাদের দেশের সম্পদ তোমরা নিজেদের দেশে চালান করছো। তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে আমাদের সর্বস্ব যে ধর্ম তাও তোমরা কেড়ে নিতে চাও, এবং আমাদের ধর্মগুরু সাজতে চাও।" ইংরেজ মহিলাটি তখন বলিলেন যে তিনি একজন শিক্ষানবীশ মাত্র, শিক্ষক হইবার বাসনা তাঁহার নাই। বিবেকানন্দ শান্ত হইলেন এবং ইহার পর তিনি এই ভদ্রমহিলার আয়োজিত এক সভায় পৌরোহিত্যও করিয়াছিলেন।

পরবৎসর কাশ্মীরে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমাদের 'হাউস-বোট'-দুটি ঝিলামের উপর পাশাপাশি বাঁধা ছিল। কলিকাতা ফিরিবার পথে তিনি লাহোরে কয়েকদিনের জন্য আমার অতিথি হইলেন; এই সময় নিজের অকালপ্রয়াণ সম্বন্ধে তাহার মনে পূর্ববোধ জাগিয়াছিল। তিনি আমাকে যেন নিতান্ত সাধারণ ভাবে বলিয়াছিলেন—"আর আমি বছর-তিনেক বাঁচবো। আমার শুধু এই ভাবনা, এই সময়ের মধ্যে আমি আমার ভাবগুলিকে রূপ দিতে পারবো কি না।" তিনি প্রায় তিন বৎসর পরেই দেহত্যাগ করেন; শেষবারের মতো তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় ইহার সামান্য পূর্বে, বেলুড়ে। সেদিন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মতিথি। আমি দেখিলাম, সঙ্কীর্তন যখন খুব জমিয়া উঠিয়াছে, বিবেকানন্দ মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছেন এবং মর্মান্তিক ব্যাকুলতায় ধূলি লইয়া মাথায় দিতেছেন।

ভবিষ্যতে ভারতের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁহার চিন্তা বিস্তৃত হইয়াছে। ভারতকে এবং বিশ্বকে তিনি তাঁহার সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবী তাঁহাকে সত্যদ্রষ্টা ও শান্তির মহাদূতদের অন্যতম বলিয়া গণ্য করিবে। পরম শ্রদ্ধায় পৃথিবীর তিন মহাদেশে তাঁহার বাণী শ্রুত হইয়াছে। তাঁহার দেশবাসীর জন্য তিনি কর্মশক্তি ও পৌরুষের অমূল্য ঐতিহ্য, প্রাণশক্তির অপরিমেয় সঞ্চয় এবং ইচ্ছাশক্তির দুর্জয় মহিমা রাখিয়া গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের নবযুগের উদয়দিগন্তে দাঁড়াইয়া আছেন—মহাপৌরুষের সমুন্নত দুর্ধর্ষ মূর্তিতে;—তিনি ভারতবর্ষের ভাবী গৌরবের জয়গান গাহিয়া গিয়াছেন—ভারতবর্ষ উত্থিত হইয়া উন্নতির পথে আবার অগ্রসর হইবে এবং জগৎসভায় নিজের সম্মানের আসন গ্রহণ করিবে।

স্বরূপে সভ্যতা ও ভারতীয় আর্যদৃষ্টি

ডক্টর জয়ন্ত গোস্বামী

'সভ্যতা' শব্দটি আমরা যত্রতত্র প্রয়োগ করি এবং 'সভ্যতা' সম্পর্কে অতি অশিক্ষিত লোকও একটা মোটামুটি ধারণা পোষণ করে। বলা বাহুল্য, এই ধারণার দিক থেকে শিক্ষিত অশিক্ষিত কারো বিশেষ অমিল দেখা যায় না; অর্থাৎ সাধারণের ধারণা—যুগকে স্বীকৃতি জানিয়ে বেশবাস চলনবলন আয়ত্ত করাই হচ্ছে সভ্য হওয়া। এর কারণ সাধারণ মানুষ বাহ্য অস্তিত্বকে বেশী মূল্য দেয় এবং এই ধারণার ব্যাপক সুযোগ করে দিয়েছে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গী।

সভ্যতার স্বরূপ জানতে হলে, বিপরীত শব্দটির চূড়ান্ত প্রয়োগ পর্যবেক্ষণ অনেকটা সহায়তা করবে। অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করলে 'অসভ্য' শব্দটির প্রয়োগের ক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির 'আত্মসর্বস্বতা'-কেই প্রধানভাবে ধরা হয়। পাশবিকবৃত্তি বা পীড়নেচ্ছা, অনুভূতিগত স্থূলতা ইত্যাদি সম্পর্কে যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়ে থাকে, তার সঙ্গেও পূর্বোক্ত শব্দটির সম্পর্ক শিথিল নয়। বস্তুতঃ আত্মক্ষেত্রে দুইপ্রকার গতি আছে—গুণগত এবং পরিধিগত। প্রথমটি হচ্ছে চিন্তা ও অনুভূতিতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কর্ষণ দ্বারা আত্মক্ষেত্রকে সাত্ত্বিকতায় অধিষ্ঠিত করা; এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ব্যক্তিস্বার্থের ক্রমশিথিলতায় আত্মক্ষেত্রের পরিধি সার্বিকক্ষেত্রে প্রসারিত করে দেওয়া। তাই সভ্যতার অগ্রগতির প্রথম পর্যায়ে আত্মসর্বস্ব আদিম মানুষ ক্রমে ক্রমে পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজ ইত্যাদি গঠন করেছে। আবার এই সঙ্গে সূক্ষ্ম হৃদ্বৃত্তি ও চিদ্বৃত্তির উৎকর্ষের সাধন করেছে—যার প্রকাশ চলনবলনে এবং শিল্পে। অর্থাৎ তখনই তারা 'সভ্য'-পদবাচ্য হয়েছে যখন তারা হয়েছে সামাজিক এবং অনুভূতি- ও চিন্তা-সম্পন্ন ব্যক্তি।

বস্তুতঃ প্রয়োগের দিক থেকে যা-ই হোক, থিয়োরীর দিক থেকে এখানে চিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে বিরোধ নেই। কিন্তু উচ্চমার্গে এসে মতৈক্যের অভাব দেখা যায়। হৃদ্বৃত্তির কথা ছেড়ে দিলে চিদ্বৃত্তির দুটি গতি,—একটি বহির্মুখী অন্যটি অন্তর্মুখী। এই বহির্মুখী গতিকে অবলম্বন করেই আধুনিক পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীতে সভ্যতার চরমাবস্থা নির্ধারণের চেষ্টা চলেছে। তাই সভ্যতার সংজ্ঞা সভার উপযুক্ততার (সভায় যে বেশবাস আদবকায়দা স্বীকৃত, তাকে আত্মস্থ করবার ক্ষমতালাভ) প্রসঙ্গেই পর্যবসিত হয়েছে। যাঁরা অতিরেকপন্থী, তাঁরা অবাস্তব হলেও থিয়োরীর দিক থেকে বিশ্বমানবসভার প্রসঙ্গ আনতে চেয়েছেন। গুণ ও পরিধির দিক থেকে আত্মক্ষেত্রের উৎকর্ষ সূচিত হয় হৃদ্বৃত্তি ও অন্তর্মুখী চিদ্বৃত্তির সহায়তায়। কিন্তু এই বৃত্তিদুটির অভাবে বাহ্য সামাজিকতায় বিশেষ অন্তরায়ের সৃষ্টি না হলেও পূর্বোক্ত গুণ বা পরিধির দিক থেকে আত্মক্ষেত্রের ক্রমোৎকর্ষ ঘটে না। তাই একদিক থেকে যেমন সহৃদয়তার বদলে এসেছে লৌকিকতা, অন্যদিকে আত্মপ্রসারতার বদলে জন্ম নিয়েছে আত্ম-সর্বস্বতা। তাই 'সভ্যতা' সম্পর্কে শত পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেও মূল সমস্যার সমাধান ঘটেনি। এঁদের মতে আন্তর্জাতিক মানবসমাজ সংস্থাপন এবং চৈত্তিক উৎকর্ষ বিধানই সভ্যতা। চৈত্তিক উৎকর্ষের কথা বলতে গিয়ে তাঁরা নিতান্ত বাধ্য হয়েই যেন হৃদ্বৃত্তিকে স্বীকার করেছেন। তাই

এঁদের কাছে পৃথিবীর রাষ্ট্রনৈতিক বিভেদ ইত্যাদি সমস্যা বড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং যতোই তাঁরা বহির্মুখী চিদ্বৃত্তির মাধ্যমে এর সমাধানের ক্ষেত্রে চিন্তা করেছেন, ততোই তার অস্থায়িত্ব বা অবাস্তবতা দর্শন করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত দুঃখবাদকে গ্রহণ করেছেন।

ভারতীয় ঋষিরা উপলব্ধি করেছেন যে সভ্যতার অগ্রগতিতে চিদ্বৃত্তির যেটুকু মূল্য তা তার অন্তর্মুখিতায়। অনেকে এর প্রয়োগ প্রাথমিক স্তরে সীমাবদ্ধ করতে চেয়েছেন এবং হৃদ্বৃত্তিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। সমাজ সে-ক্ষেত্রেই সার্থক যেখানে অন্তর্মুখী গতির সাহায্যে ব্যক্তিচিত্ত অন্য সত্তার সঙ্গে অভেদ উপলব্ধি করে। এখানে স্বার্থশিথিলতা রবীন্দ্র-কল্পিত 'একটি বিরাট হিয়া'র জন্মদান করে। চিদ্বৃত্তির গতি সেখানেই রুদ্ধ, যেখানে চিদ্বৃত্তির ক্ষেত্র উভয়তঃ নেই। তাই আন্ত-র্জাতিক মনুষ্যসমাজ সংস্থাপনের পরিকল্পনাতেই এই গতির ছেদ পড়ে। অথচ সমাজের লক্ষ্য বিচার করলে এবং সেই সঙ্গে সভ্যতার অগ্র-গতিকে জড়িত করলে আন্তর্জাতিক মনুষ্যসমাজ সংস্থাপন পরিকল্পনা একটি সঙ্কীর্ণ পরিকল্পনা হিসাবেই প্রমাণিত হয়, কারণ তাতে সব সমস্যার সমাধান হয় না। বহির্মুখী চিদ্বৃত্তির ঐকিক গতি ব্যর্থ বল্লেই পূর্বোক্ত মানের থিয়োরী-গত মূল্যই আছে মাত্র। বাস্তবক্ষেত্রে তার সাক্ষাৎকার মেলে না।

আর্যদৃষ্টি থেকে তাই উপলব্ধি ঘটেছে যে, অন্যের সঙ্গে হৃদ্বৃত্তির মাধ্যমে অভেদ উপলব্ধির পদক্ষেপ মানুষের ক্ষেত্রেই সীমিত নয়। মনুষ্যেতর জীবের মধ্যেও আত্মক্ষেত্রের পরিধি-বিস্তার সম্ভবপর। সেখানে মানুষ, পশু, পাখি, কীটপতঙ্গ—সকলেই সেই সমাজের অন্তর্ভুক্ত। সভ্যতার মাত্রা ঐকিক বিচারে নির্ণীত হয়। অতএব যাঁর চিত্ত সমগ্র জীবকুলকে অভেদরূপে উপলব্ধি করেছে, তিনি সভ্যতার আরো উচ্চমার্গে অবস্থান করেন*।

হৃদ্বৃত্তির পদক্ষেপ এখানেও ছেদ টানেনি। এরূপ অভেদদর্শীর উপলব্ধিতে জড় পরিবেশকেও এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভবপর। জীব ও জড়—সবকিছুর মধ্যেই আত্মক্ষেত্রের পরিধি-বিস্তার অসম্ভব নয়—যদিও তাহা সাধনার অপেক্ষা রাখে। সুতরাং সর্বভূতে অভেদ উপলব্ধির মধ্যেই সভ্যতার প্রকৃত মান নিহিত। এই অভেদ উপলব্ধির জন্যে কেন্দ্র-বিন্দুর সহায়তা গ্রহণ অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়েছে—অনেকের পক্ষ থেকে। সর্বভূতে অভেদ উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন আত্মক্ষেত্রে হৃদ্বৃত্তির কর্ষণ ঘটে, তখন সর্বভূতের মধ্যে পরমাত্মার উপলব্ধি আপনা থেকেই আসে। সুতরাং যিনি সর্বভূতে অভেদের বোধের সঙ্গে পরমাত্মার বোধকে নিজের মধ্যে ধারণ করেন তিনিই চরম সভ্য। এই উপলব্ধির স্তরভেদে যে চরম স্থানের কথা সাধকরা বলেছেন, সেখানে যিনি অধিষ্ঠিত - তিনিই চরম সভ্য। অনেকের মতে এখানে চিন্তা অনুভূতি ও ইচ্ছার সমতা-রক্ষার সাধন প্রয়োজন; যে কোনো একটির আধিক্য এই মার্গে অবনতির সূচনা ঘটাতে পারে। অনেকে আবার আরোহের সঙ্গে সঙ্গে অবরোহের প্রসঙ্গ এনে সভ্যের দায়িত্ব চিহ্নিত করেছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, স্বরূপে সভ্যতাকে উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছে ভারতীয় আর্যদৃষ্টি। আধুনিক যুগে অনেকের কাছে এই সভ্যতাদর্শের মূল্য যতই কম বলে মনে হোক, আত্মক্ষেত্র থেকে যদি এই আদর্শের প্রতি আকর্ষণ ঘটে, তাহলেও তার মূল্য অনস্বীকার্য। মূল্যবোধের যথার্থ দৃষ্টি নিয়ে দেখে যোগ্য মর্যাদা দান করতে পারলে সভ্যতার এই আদর্শকে তথাকথিত শাস্ত্রবচন-মাত্র বা অলীক মতবাদ বলে ভ্রম হবার সম্ভাবনা আর থাকবে না।

জয়রামবাটীতে অন্নপূর্ণাপূজা

শ্রীপুষ্পকুমার পাল

চৈত্রসংক্রান্তির দিন ছুটি পেয়ে জয়রামবাটীতে কল্যাণময়ী শ্রীশ্রীমাকে দেখতে গেলাম। সারাদিন আনন্দে কাটিয়ে বিদায় নেওয়ার সময় মনে হোল, এ যেন ঠিক আসা হোল না। সামনের রবিবার অন্নপূর্ণার পূজা। শনিবার মধ্যাহ্নে এসে রবিবার পূজা দেখে, প্রসাদ পেয়ে অপরাহ্ণে কলকাতা ফিরে গেলেও অনেকটা তৃপ্তি পাওয়া যাবে।

কলকাতায় ফিরে এসে শনিবারের জন্য যেন আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করে রইলাম। অবশেষে প্রতীক্ষিত শনিবার এসে গেল এবং মধ্যাহ্নে মহামায়ীর জয়ধ্বনি দিয়ে জয়রামবাটী অভিমুখে যাত্রা করলাম। সদা কোলাহলমুখর কলকাতা ছেড়ে প্রকৃতির পরিবেশে এসে পড়েছি। রুদ্র বৈশাখের খরতাপে সর্বত্র রুক্ষতা, তবে মাঝে মাঝে শ্যামলিমা। মায়ের কথায় ও চিন্তায় সময় কেটে যাচ্ছে। মায়ের কি আকর্ষণী শক্তি! শ্রীশ্রীমা ছিলেন এক অতিসাধারণ গ্রাম্য কন্যা। বাহ্যতঃ তাঁকে দেখলে এক অতি সাধারণ স্ত্রীলোক ভিন্ন আর কিছু বোঝা যেত না। তবু তাঁর আকর্ষণে শত শত সন্তান কত কষ্টে দীর্ঘ ও বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করে আসতেন; এই জয়রামবাটীতে মায়ের সান্নিধ্যে সেই দিনগুলিই হয়েছে তাঁদের জীবনের সর্বাপেক্ষা আনন্দের দিন।

আজ প্রায় ৪৪ বৎসর হোল মা তনুত্যাগ করেছেন কিন্তু তাঁর ভক্ত সন্তানদের তাঁর প্রতি অনুরাগ ও আকর্ষণ প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। তাঁকে যাঁরা দেখেছেন অথবা তাঁর কৃপা পেয়েছেন সে-সব সন্তানের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে আসছে, কিন্তু তাঁদের লিখিত স্মৃতি-কথা পড়ে সাধারণ লোক শ্রীশ্রীমার অপরূপ জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, সেই অনন্যা জননীর অনুধ্যানে এক অনির্বচনীয় আনন্দের আস্বাদ পাচ্ছে।

মায়ের বাড়ী যাওয়ার পথ আজ সুগম হয়েছে। মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টায় মোটরে মায়ের বাড়ী পৌঁছে গেলাম।

রবিবার দিন প্রভাত হতেই দেখি মাতৃমন্দির উৎসবের আনন্দে নতুন রূপ ধারণ করেছে। গ্রাম্য পরিবেশে এক শান্ত, সরল এবং পরিচ্ছন্ন পূজা উৎসব। মাতৃমন্দিরের সম্মুখে ফাঁকা স্থানটির উপর একটি চাঁদোয়া খাটানো হয়েছে। প্রধান প্রবেশপথে কদলী-বৃক্ষ ও মঙ্গলঘট। নাটমন্দিরে মৃন্ময় অন্নপূর্ণা-মূর্তি। এক শান্ত, সরল ও শুচি পরিবেশে নাট-মন্দির অপরূপ বোধ হচ্ছে। বাহিরে জোড়া ঢাকের বাদ্য এবং ব্যাণ্ড পার্টির বাজনা উৎসবের সৌষ্ঠব আরো আকর্ষণীয় করেছে

নিকটস্থ অন্যান্য গ্রাম ও শহর অঞ্চল থেকে আজ প্রায় সাত-আটশো সন্তান এসেছেন।

শ্রীশ্রীমা যখন স্থূলদেহ নিয়ে এখানে বাস করতেন, তখনকার কথা মনে জাগছে। মা কি ভাবে সন্তানদের সাচ্ছন্দ্য সাধনে ব্যস্ত থাকছেন—সেই সব ছবি মনে ভেসে উঠছে।

শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী বসবাসের সময় কখনও কখনও গ্রামের অন্যান্য মহিলা, আত্মীয়া ও ভক্ত মহিলাদের সঙ্গে আমোদর-নদে স্নান করতে যেতেন। আমোদর-নদ হোল মায়ের গঙ্গা। এই গঙ্গায় স্নানের পর মা ঘাটে বসে সকলের সঙ্গে মুড়ি ও তেলেভাজা খেয়ে আনন্দ করতেন। সুখ-দুঃখের কথার সঙ্গে শ্যামাসঙ্গীত অথবা অন্য দেবদেবীর কথা ও গান হোত।

মায়ের সঙ্গে বনভোজনের মত এই ছোট উৎসব মহিলাদের মনে অপার আনন্দ দিত।

অন্নপূর্ণাপূজার দিন জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমার জীবনের এই শান্ত, সরল ও সামান্য ইচ্ছাটি স্মরণ করা হয়। এবারও বেলা আটটার পর একটি সাধারণ কাঠের সিংহাসনের উপর শ্রীশ্রীমার প্রতিকৃতি বস্ত্র ও পুষ্প দ্বারা সজ্জিত ক'রে একটি ছোটখাট শোভাযাত্রা মায়ের গঙ্গা অভিমুখে অগ্রসর হোল—মা গঙ্গাস্নানে যাচ্ছেন। প্রতিকৃতি-সহ সিংহাসনটি দুইটি লম্বা বাঁশের উপর রাখা হয়েছে, সন্তানেরা কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে "মহামায়ীর" জয়ধ্বনি দেওয়া হচ্ছে। পুজাবাড়ীর জোড়া ঢাক এবং গ্রাম্য ব্যাণ্ড পার্টিটিও সকলকে সচকিত করে শোভাযাত্রার পুরোভাগে চলেছে। গ্রামের অনেক মহিলা ও শিশু পথমাঝে শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছে। সকলেরই মনে আনন্দ।

আমোদর-নদের তীরে মায়ের ঘাটের কাছে পুরাতন চটের আচ্ছাদন দিয়ে বাহুল্যবর্জিত এক মণ্ডপ রচিত হয়েছে।

শোভাযাত্রা মায়ের প্রতিকৃতি-সহ পৌছানোর পর অনেকে আমোদরে স্নান করলেন। কয়েকজন সাধু-সন্তানও উৎসবে যোগ দিয়েছেন। স্নানের পর শ্রীশ্রীমাকে যথাবিধি পূজা করে মুড়ি, তেলেভাজা ও জিলিপি নিবেদন করা হল। কয়েকজন ভক্ত মহিলা মাকে কয়েকটি ভজন-গান শোনালেন। ভক্ত সন্তানেরা ও মায়ের গ্রামের প্রায় তিনশো স্ত্রী, পুরুষ ও শিশু মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করার পর শোভাযাত্রা মাতৃমন্দিরে ফিরে এল। বাহুল্যবর্জিত এই সামান্য উৎসবটি ভক্তহৃদয়ে প্রভূত আনন্দ সঞ্চার করেছে।

মায়ের বাড়ীর কাছে একটি পুরাতন গাছের তলায় বসে আছি। বাংলার এই বিশেষ তীর্থে বসে শ্রীশ্রীমার কথা একান্তভাবে মনে আসছে। শান্ত, মধুর ও অকৃত্রিম ভালবাসা দিয়ে, নিজের স্বভাব, নিজের চরিত্রের মাধুর্য দিয়ে শ্রীশ্রীমা পর ও অজানাকে কি ভাবে একেবারে আপন করে নিতেন!

কত লোক আজ এখানে এসেছেন। এই উৎসব উপলক্ষে অনেকে দু-একদিন আগে থেকেই এসে বসবাস করছেন। চিরদিন শহরবাসে অভ্যস্ত, এমন লোকও বহু এসেছেন; পল্লীপরিবেশে একটু অসুবিধা হয়ত হচ্ছে তাঁদের, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই কারো—সকলেই আনন্দে ভরপুর।

প্রসাদ পাবার সময় ব্রহ্মবান্ধব মহাশয়ের শ্রীশ্রীমার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলির কথা মনে হোল। ব্রহ্মবান্ধব মহাশয় তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায় ১০ই চৈত্র ১৩১৩ সালে লিখেছেন· "যদি তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়া থাকে ত একদিন সেই রামকৃষ্ণ-পূজিত লক্ষ্মীর চরণপ্রান্তে গিয়া বসিও—আর তাঁহার প্রসাদ-কৌমুদীতে বিধৌত হইয়া রামকৃষ্ণ-শশিসুধা পান করিও—তোমার সকল পিপাসা মিটিয়া যাইবে।"

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। প্রসাদ-বিতরণ তখনো চলছে।

বিদায় নিতে হল সজল চোখে। মনে পড়ল জয়রামবাটী থেকে কোন ভক্তের বিদায়কালে মা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সন্তানের যাত্রাপথের দিকে চেয়ে থাকতেন—যতক্ষণ না সে দৃষ্টি-পথের বাইরে চলে যেতো।

কলকাতা ফেরার পথে শ্রীশ্রীমার শেষ কথাকয়টি বারংবার মনে আসতে লাগলো, "তবে একটি কথা বলি—যদি শান্তি চাও মা, কারো দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ, কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।"

সর্বজনীন শিক্ষায় প্রাচীনভাষা সংস্কৃত

অধ্যাপক শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী

(১) ভূমিকা :—"জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ"—ভারতে দীর্ঘকালের প্রচলিত প্রবাদ। তাই দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রাচুর্য-বিধানের সঙ্গে সঙ্গে জনগণকে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত ক'রে তোলাই হ'ল কল্যাণ-রাষ্ট্রের লক্ষ্য। জ্ঞানদীপ্ত, সমুন্নত-চরিত্র নাগরিকই হ'ল রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বিশেষতঃ, যে দেশের সরকার মনীষী লিংকনের সূত্রানুসারে "Government of the people, by the people, for the people," সেই দেশে সুশিক্ষিত মানুষেরই প্রয়োজন সর্বাগ্রে। স্বাধীনোত্তর ভারতে সেই জন্যে শিক্ষাবিষয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক্রমাগতই চলেছে। শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্বজনীন ক'রে তোলা এবং তার মানের (standard) যথাযথ উন্নতিসাধন হচ্ছে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্যেই শিক্ষণীয় বিষয়গুলিরও পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন আজ দেখা দিয়েছে। সাধারণতঃ, মাধ্যমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন শিক্ষায় পরিণত ক'রে তোলা আমাদের উদ্দেশ্য। মোটামুটি শিক্ষিত মানুষ হিসেবে পরিগণিত হ'তে হ'লে বর্তমানে সবাইকে অন্ততঃ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হবে। তারপরে, প্রবণতা অনুসারে বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণের জন্যে স্ব স্ব রুচি অনুসারে নরনারী যে যেদিকে ইচ্ছা অগ্রসর হ'তে পারেন। তাই উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাকে মোটামুটি বর্তমানে মান ধরা হয় ব'লে তাতে বিবিধ বিষয়ের সঙ্গে প্রাচীনভাষা তথা সংস্কৃতের স্থান কিরূপ হওয়া উচিত, তাই বর্তমান নিবন্ধে আলোচ্য।

(২) বৃটিশশাসনে সংস্কৃতশিক্ষা :—ভারতবর্ষে অধুনাপ্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার শুরু উনিশ শতকের গোড়ায়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেকলের প্রস্তাবানুসারে আমাদের দেশে বিলাতী বিদ্যার স্কুল প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এই বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'য়ে দাঁড়ালো জ্ঞানের উদ্বোধন নয়, মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা নয়, জীবনকে বিকশিত করা নয়, ইংরেজ সরকারের দপ্তরে নিম্নপদস্থ কর্মচারী হবার যোগ্যতা জন্মানো। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করলেন যে সরকারী কর্মচারী পদে এই ইংরেজী স্কুলে শিক্ষিত ব্যক্তিদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ১৯৫২-৫৩ সালে স্যার আর্কট্ লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়ারের নেতৃত্বে ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত "Secondary Education Committee"র রিপোর্টের দশম পৃষ্ঠায় এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—"The education imparted in these schools became a passport for entrance into Government services. This was mainly due to the proclamation issued by Lord Hardinge in 1844 that for service in public offices preference should be given to those who were educated in English Schools. *In consequence thereof education was imparted with the limited object of preparing pupils to join the service and not for life.*"

ফলে, কেবলমাত্র একচোখো নীতিতে শুধু ইংরেজী বিদ্যার জন্যেই সরকার সমুদয় অর্থ ব্যয় করতে লাগলো। ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভেই লর্ড বেন্টিংকের শাসনকালে এই কথাই বলা হয়েছে সরকারী "communique"এ—

"The great object of the British Government ought to be the promotion of European literature and Science among the natives of India and all the funds appropriated for the purpose of education would be best employed *on English education alone.*"

ইংরেজের হীন অনুকৃতিতে শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিপুণ ক'রে তোলাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। লর্ড মেকলের ১৮৩৫-এর বিখ্যাত "Minute"এ তাই এমন মানুষই তৈরী করার নির্দেশ রয়েছে, যারা হবে "a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect."

(৩) স্বাধীন ভারতে বাংলাদেশে সংস্কৃত শিক্ষা :—কিন্তু, এই পরিস্থিতিতেও পরাধীন ভারতে গোড়ার দিকে এফ্-এ পর্যন্ত সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য ছিল। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত প্রবেশিকামান পর্যন্ত সংস্কৃত সকলকেই অবশ্যপাঠ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হ'ত। কালক্রমে স্বাধীনোত্তর ভারতে বাংলার "মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ" সংস্কৃতকে ঐচ্ছিক বিষয়ে পরিণত ক'রে হিন্দীকে সংস্কৃতের বিকল্পরূপে গ্রহণের সুযোগ দান করেন। ফলে বাংলা দেশে স্কুল থেকে সংস্কৃত শিক্ষা সমূলে উৎখাত হ'তে চলল দেখে দেশের মহতী বিনষ্টি আশংকা ক'রে সংস্কৃতকে অবশ্যপাঠ্য করার আবেদন নিয়ে সুবিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, অবসর-প্রাপ্ত আই-সি-এস্ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মোদক, ব্যবহারজীবী শ্রীনির্মলচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং বর্তমান লেখক তৎকালীন "মধ্যশিক্ষা পর্ষদের" প্রশাসক ৺ডঃ শিশিরকুমার মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে দীর্ঘ আলোচনা করেন। আলোচনান্তে ডঃ মিত্র সংস্কৃতকে অবশ্যপাঠ্য করা নিয়ে সমর্থন জানিয়েও বললেন যে "মধ্যশিক্ষা আইন" অনুসারে এই ভাষাশিক্ষার পুনর্বিন্যাসে কিছু করার ক্ষমতা পর্ষদের হাতে নেই, আছে সরকারের হাতে। তার পরে ঐ ব্যক্তিবর্গ আবার তৎকালীন শিক্ষা-মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে এই নিয়ে আবেদন জানান। এদিকে সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ এবং অখিল ভারত সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা সম্মেলন এই বিষয়ে দেশে আন্দোলন সৃষ্টি করে। প্রায় সকল ইংরেজী ও বাংলা দৈনিকই সংস্কৃতকে অবশ্যপাঠ্য করার আবেদন সমর্থন করে। ফলে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুআরির ২৪৩নং (শিক্ষা) সরকারী প্রস্তাবানুসারে তেরো জন বিদগ্ধ শিক্ষা-ব্রতীকে নিয়ে মধ্যশিক্ষায় ভাষার পুনর্বিন্যাসের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। তাতে সভাপতি-রূপে ছিলেন ডঃ শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সদস্যরূপে ছিলেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ৺ বৈজ্ঞানিক ডঃ শিশিরকুমার মিত্র, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ অমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺ ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ৺ অধ্যক্ষ অনাথনাথ বসু, অধ্যক্ষ ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, অধ্যক্ষ ডঃ জে. সি. দাশগুপ্ত, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীজ্যোতির্বিকাশ মিত্র এবং শ্রীবিনয়কৃষ্ণ নিয়োগী। এই কমিটিতে বৈজ্ঞানিক, গাণিতিক, আইনজ্ঞ, ভাষাবিদ্, শিক্ষাতাত্ত্বিক এবং প্রধানশিক্ষক প্রভৃতি সর্ব বিষয়েরই মুখ্য-পুরুষেরা ছিলেন। তাঁদের ৯ জনের সিদ্ধান্তানুসারে এই ছিল ব্যবস্থা—

(১) বাংলা—১ম হইতে ১১শ শ্রেণী পর্যন্ত সকল শাখাতেই অবশ্যপাঠ্য।

(২) ইংরেজী—৩য় হইতে ১১শ শ্রেণী পর্যন্ত সকল শাখাতেই অবশ্যপাঠ্য।

(৩) সংস্কৃত অথবা অন্য যে কোন প্রাচীন ভাষা—৫ম হইতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবশ্যপাঠ্য, তারপরে শুধু মানবিক-বিদ্যাশাখায় ৯ম হইতে ১১শ

পর্যন্ত ইলেকটিভ বিষয়রূপে অবশ্যপাঠ্য। বিজ্ঞান, বাণিজ্যাদি শাখায় ঐচ্ছিক।

(৪) হিন্দী—৮ম শ্রেণীতে মৌখিকরূপে অবশ্যপাঠ্য। পরে ঐচ্ছিক।

কিন্তু, বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বাংলা-ভাষার প্রখ্যাত আচার্য ৺ ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ৺ ডঃ শিশিরকুমার মিত্র এবং ৺ অধ্যক্ষ অনাথ নাথ বসু সংস্কৃতকে মানবিকবিদ্যায়ও অবশ্যপাঠ্য করার বিরুদ্ধে অভিমত দান করেন। কিন্তু, পূর্বোল্লিখিত সিদ্ধান্ত অধিকাংশ সদস্যের অভিমত (১৩ জনের মধ্যে ৯ জনের) ব'লে তাই প্রচলিত করার নির্দেশ দান করেন সরকার। রাজ্যপালের স্বাক্ষরে এই নির্দেশ গেজেটে প্রকাশিত হওয়ামাত্র পর্ষৎ-প্রশাসক ডঃ মিত্র ভাষাশিক্ষাবিষয়ে সরকারী ক্ষমতার বৈধতার প্রতিবাদ করেন। যদিও কমিটির সদস্যপদ স্বীকারকালে কিংবা Note of Dissent দেবার সময়ে এই প্রশ্ন তিনি উত্থাপন করেননি। বরঞ্চ গোড়ার দিকে তিনিই বলেছিলেন যে এই বিষয়ে পর্ষদের কোন ক্ষমতা নেই, রয়েছে সরকারের। কিন্তু এখন তিনি বললেন, এই বিষয়ে ক্ষমতা রয়েছে পর্ষদেরই, সরকারের নয়। ফলে এই অচলাবস্থার অবসানের জন্য তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর অনুমতিক্রমে বর্তমান লেখক ও পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন। তখন ৺ ডঃ বিধানচন্দ্র রায় এই বিষয়ে আলোচনার্থ ভাষাচার্য সুনীতিকুমার, ডঃ মিত্র, পূর্বোক্ত ডঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, শ্রীনির্মলচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মোদক, শ্রীমনোরঞ্জন সেনগুপ্ত এবং বর্তমান লেখককে আহ্বান করেন। সুদীর্ঘ আলোচনায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হই এবং তাই বর্তমানে প্রচলিত হয়েছে।—

(১) বাংলা— সকল শাখায় ১ম হইতে ১১শ শ্রেণী পর্যন্ত।

(২) ইংরেজী—সকল শাখায় ৩য় হইতে ১১শ শ্রেণী পর্যন্ত।

(৩) সংস্কৃত (অথবা অন্য কোন প্রাচীন ভাষা)—৮ম শ্রেণীতে সকলের জন্য এবং মানবিকবিদ্যা শাখায় ৯ম হইতে ১১শ শ্রেণী পর্যন্ত।

(৪) হিন্দী—সকলের জন্যে ৭ম এবং ৮ম শ্রেণীতে।

এতে কেবলমাত্র ৮ম শ্রেণীতেই বিজ্ঞান ও বাণিজ্যশাখাদির ছাত্রেরা সংস্কৃত পড়ছে। পূর্বে তাদেরও ৪ বৎসর সংস্কৃত পড়তে হ'ত। মানবিক বিদ্যার ছাত্রেরাই শুধু এখন ৮ম হইতে ১১শ পর্যন্ত ৪ বৎসর সংস্কৃত পড়ছে।

সংস্কৃতকে শিক্ষাব্যবস্থায় এইটুকু স্থান দিতেও বাংলার বহু শিক্ষাব্রতী এবং নেতা আজ রাজী নন। পরাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃতের যে স্থান ছিল, স্বাধীন ভারতে বিশেষতঃ বাংলাদেশে তাও নেই। এই প্রসঙ্গে ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত "Sanskrit Commission" ('56—'57)-এর ৭ম পৃষ্ঠার কথাগুলো বিশেষভাবে আলোচনীয়—"Since the attainment of independence, the country as a whole has been undergoing an all-round regeneration, and the Government have gone all out to explore the channels through which they could help the growth and consolidation of the nation. It cannot be forgotten, as Rajyapal Sri Sriprakash said that in the struggle for freedom which this nation waged, it was inspired and sustained by a sense of its great heritage and an ardent desire to

come into its own and regain the glory that had been eclipsed by alien domination. The dawn of independence has been looked up to by the nation as the begining of an age of cultural rehabilitation of the country. In the fields of arts and letters, several concrete steps have been taken by the Government. And Sanskrit, being the bed-rock of Indian speech and literature and artistic and cultural heritage of the country, has been naturally looking forward to the Government, all these years, for measures for its rehabilitation. This Commission, in the course of its tours, could see a feeling of regret and disappointment among the people that, while no positive steps had been taken for helping Sanskrit, the measures undertaken in respect of other languages have had adverse repercussions on it. *The ultimate result of this has been that Sanskrit has not been allowed to enjoy even the status and facilities it had under the British Raj.*"

বর্তমান ভারতে, বিশেষ ক'রে বাংলাদেশে এই শোচনীয় পটভূমিকায় শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং মূল্যায়ন পুনর্বিবেচ্য। সর্বাঙ্গীণ এবং সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তারে দূরপ্রসারী দৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করতে হবে। আমাদের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের নবোত্থিত সমস্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন ভাষা তথা সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যাচাই ক'রে গ্রহণ করতে হবে নতুন সিদ্ধান্ত। আপাতোদ্ভূত সমস্যার তাড়নায় দিশেহারা না হ'য়ে শিক্ষার মূল আদর্শকে স্থির রেখে জীবনকে সত্যের দৃঢ় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ক'রে শিব-সুন্দরের মহিমায় উজ্জ্বল ক'রে তুলতে হবে। সমুন্নত জীবনের জন্য প্রয়োজন যে সমুন্নত শিক্ষাব্যবস্থা, তাতে সাধারণ ভাবে প্রাচীন ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ ক'রে আমাদের পক্ষে সংস্কৃতের অপরিহার্যতা আলোচনা করা যাক।

সুদূর অতীতে ভারতের শান্তরসাস্পদ তপোবনে ঋষিকণ্ঠে উদ্গীত হয়েছিল মানবের বন্দনা—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"। অমৃতময় পূর্ণব্রহ্মের সন্তানরূপে মানুষ পূর্ণতার ঐতিহ্যকে উত্তরাধিকারসূত্রে নিজের জীবনে বহন ক'রে চলেছে। কিন্তু, যথোচিত শিক্ষার অভাবে জ্ঞানের ঊনতার জন্য সেই পূর্ণতা সাধারণতঃ তার জীবনে প্রসুপ্ত হ'য়ে থাকে। সেই প্রসুপ্ত পূর্ণতার উদ্বোধন তথা মানব-প্রতিভার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ-সাধন হ'চ্ছে শিক্ষার মূলীভূত উদ্দেশ্য। ভারতের নবজাগৃতির অন্যতম পুরোধা স্বামী বিবেকানন্দ এই প্রসঙ্গে বলেছেন—"Education is the manifestation of the perfection already in man." তাই, শিক্ষা-ব্যবস্থায় **জীবনধারণের** বিষয়গুলির সঙ্গে **জীবনগঠনের** উপাদান-সমূহের সমন্বয়সাধন একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষা হওয়া উচিত যুগপৎ ভাবেই formative এবং informative। শিক্ষাব্যবস্থায় গোড়ার দিকে এই সমন্বয়ের আদর্শ পরিত্যক্ত হ'লে শিক্ষা হবে অসম্পূর্ণ। সেই জন্য শিক্ষার পূর্ণতা সাধনের দিক থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে প্রাচীন ভাষা শিক্ষার অপরিহার্যতা স্বীকার না ক'রে পারা যায় না।

অতীতের বুকেই বর্তমানের প্রতিষ্ঠা। ভিত্তিকে বর্জন ক'রে সৌধের নির্মাণ এবং উন্নয়ন কখনো সম্ভব নয়। অতীতের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপরই বর্তমানকে প্রতিষ্ঠিত করলে ভবিষ্যৎ অগ্রগতির প্রসার হবে সম্ভবপর। বর্তমানের মর্মমূল যদি অতীতের রসভূমি হ'তে রসাহরণ না করে তবে সেই বর্তমান অচিরেই বিশুষ্ক হ'য়ে

বিনষ্ট হ'য়ে যাবে। আর তার ভবিষ্যৎ অগ্রগতিও হবে স্তব্ধ। তাই, বিজ্ঞানের বিস্ময়কর জয়যাত্রা এবং প্রযুক্তিবিদ্যার অপরিমেয় প্রসার সত্ত্বেও বর্তমান জীবনে প্রাচীন ভাষা এবং তদাশ্রিত সংস্কৃতির প্রভাব এবং প্রয়োজন বহু ক্ষেত্রে স্বীকৃত। সেইজন্য এই যান্ত্রিকযুগেও প্রাচীন ভাষাকে বর্জন করার কোনো স্থায়ী প্রয়াস চিন্তাশীল চিত্তে আজো পরিলক্ষিত হয়নি। প্রাচীন ভাষা এবং সাহিত্য অতীতে বহু শতাব্দী ধ'রে মানব-জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে; সর্বগ্রাসী কালের করাল আক্রমণকে উপেক্ষা ক'রেও বর্তমানের দুয়ারে এসে উপনীত হ'তে পেরেছে। এর কারণ, মানব-মনীষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান এই প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যের প্রয়োজন এবং আবেদন আজো শেষ হ'য়ে যায়নি। তত্ত্বের চিরন্তনত্ব, তথ্যের প্রাচুর্য এবং প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যই প্রাচীন ভাষাকে বর্তমান জীবনেও সঞ্জীবিত ক'রে রেখেছে। সুদূর অতীতে ধরিত্রীর শৈশবেই প্রাচীনভাষাকে আশ্রয় ক'রে মানব-প্রতিভার যে অতুলনীয় বিকাশ ঘটেছিল, তার কথা চিন্তা করলে বিস্মিত হ'তে হয়! জ্ঞানরাজ্যের সকল দিকেই পরিণত জ্ঞানের সাক্ষ্যবহ অসংখ্য গ্রন্থরাজির প্রাচীনভাষায় প্রকাশ ও প্রচার আমাদের পূর্বসূরীদের অপূর্ব মননশীলতাই সূচিত করে। প্রসঙ্গতঃ জনৈক বিদগ্ধ চিন্তাবিদের কথাগুলো স্মরণ করা যেতে পারে—"Our ideas of law, citizenship, freedom and empire, our poetry and prose literature; our political, metaphysical, aesthetic, and moral philosophy, indeed our organised rational pursuit of truth in all its non-experimental branches as well as a large and vital part of the religion which has won to itself so much of the civilised world, are rooted in the art or thought of that ancient civilisation."

প্রাচীন সংস্কৃতির যাঁরা ছিলেন প্রধান প্রবক্তা, তাঁদের রচনাবলীর যথাযথ অনুশীলন হ'ল প্রাচীন ভাষা পাঠের ফলশ্রুতি। এই সকল গ্রন্থরাজি কেবলমাত্র প্রাচীন সংস্কৃতির ব্যাখ্যানেই পর্যবসিত হয়নি, অধিকন্তু মানবাত্মার মহিমা প্রকাশেও সার্থক হ'য়ে উঠেছে।

অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয়। ভূতবিদ্যার নব নব আবিষ্কার এবং নিত্য নতুন ভৌগোলিক পরিচয় মানুষের জীবনে তখন যুগান্তর আনয়ন করে। শিল্প-বাণিজ্যের অভাবনীয় প্রসার, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রাবল্য এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার বিকাশ মানুষের জীবনে এনে দিয়েছে এক বিরাট পরিবর্তন। ফলে, প্রাচীন ভাষা এবং আধুনিক বিজ্ঞান—সাধারণতঃ এই দুইটি ভিন্ন শাখায় আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বিন্যস্ত করা হয়। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগ বিশেষভাবে বিজ্ঞানের দ্বারাই বিধৃত। তবুও প্রাচীন ভাষা স্বকীয় মহিমায় এখনো প্রতিষ্ঠিত এবং ভবিষ্যতেও প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আজো শত শত বিদ্যার্থী এই প্রাচীন ভাষার প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেন এবং তারই অনুশীলনে আত্মনিয়োগ ক'রে থাকেন।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভাষা শিক্ষার কোন প্রয়োজন আছে কিনা এই বিষয়ে বিতর্ক বর্তমান শিক্ষাজগৎকে আন্দোলিত ক'রে তুলেছে। এর পক্ষের এবং বিপক্ষের যুক্তিগুলি পর্যালোচনা ক'রে একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রয়োজন।

প্রথমতঃ, শিক্ষার উদ্দেশ্য বিদ্যার্থীর মধ্যে পূর্ণ মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তি। তাহ'লে শিক্ষা-ব্যবস্থাকেও সর্বাঙ্গীণ এবং সম্পূর্ণ করা একান্ত প্রয়োজন। এই পূর্ণতার জন্য আবশ্যক আধুনিক জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভাষায় বিধৃত মহনীয় ভাবধারারও পরিবেশন। জীবন-জিজ্ঞাসার মৌলিক উপাদানগুলি প্রাচীন হ'লেও বর্তমান জীবনেও একান্ত প্রয়োজনীয় সুতরাং প্রাচীন ভাষা প্রতিটি মানুষের অবশ্য-শিক্ষণীয়। এর প্রতিবাদে কেউ কেউ বলেন যে প্রাচীন ভাবধারায় জ্ঞানলাভের জন্যে প্রাচীন ভাষা শিক্ষার কোন প্রয়োজন নেই। আধুনিক ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমেই তো প্রাচীন জ্ঞান অর্জন করা যায়।

তার উত্তরে বলা চলে অনুবাদ বিশিষ্ট জ্ঞানের পরোক্ষ রূপটিকেই পরিবেশন করে। অনুবাদ যতই মূলানুসারী হোক না কেন, মূলের পরিপূর্ণ পরিচয় এবং প্রভাব অনুবাদের মাধ্যমে কখনো পুংখানুপুংখরূপে পাওয়া যায় না। বিশেষ আধারে বিশেষ বস্তুর একটি স্বকীয় সুষমা এবং মহিমা প্রকাশিত হয়, যা যে-কোনো আধারে সম্ভব নয়। প্রাচীন ভাষার বিশেষ প্রকাশভঙ্গী এবং ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ শব্দরাশির সহায়তায় জ্ঞানের যে বিশিষ্ট রূপ এবং সৌন্দর্য উপভোগ করা চলে, তা অনুবাদের মাধ্যমে কখনো আস্বাদন করা যায় না। অনুবাদে সাহিত্যের মৌলিক সৌন্দর্য তিরোহিত হয়। মূলের রস অনুবাদে কখনো মেলেনা—রসিকজনের কাছে এই সত্য একান্ত প্রত্যক্ষ সুতরাং সুষ্ঠুভাবে প্রাচীন জ্ঞানলাভের জন্য প্রাচীন ভাষা শিক্ষা অবশ্যপ্রয়োজনীয়।

জীবনের বর্তমান চাহিদা এত প্রবল এবং প্রত্যক্ষ যে তাতে প্রাচীন ভাষা শিক্ষায় বৃথা শক্তিক্ষয় না ক'রে বর্তমানের বিজ্ঞান এবং নাগরিকতাবোধাদির শিক্ষায় মানুষের প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। অতীতের ভাষা অপেক্ষা বর্তমানের জীবন অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। এই মতবাদ যাঁরা প্রচার করেন, তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে অতীতেরই সৃষ্টি বর্তমান। মৃত্তিকা থেকে যতক্ষণ রস আহরণ করে, ততক্ষণই বৃক্ষের হয় বিবর্ধন। মৃত্তিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলে বনস্পতিও সমূলে হয় উৎপাটিত। সুতরাং, বর্তমানকে সমৃদ্ধ করতে হ'লে অতীতের জ্ঞানভূমি হ'তে সঞ্জীবন-রস আহরণ করতে হবে। অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতের অগ্রগতি হবে পরিণত এবং ত্বরান্বিত।

প্রাচীন ভাষা বহুবিধ জ্ঞানের আকর। এমন কি বর্তমানের বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, রাজনীতি, আইন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, শব্দশাস্ত্র, দর্শন, ভাষাবিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে জানতে গেলে প্রাচীন ভাষা শিক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। এই সব বিবিধ বিদ্যার মর্মমূল প্রোথিত হ'য়ে আছে অতীতের প্রাচীন ভাষার সনাতন ভূমিতে। এই বিষয়ে জে. বি. এস্ হালডেন, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য চন্দ্রশেখর বেংকট রমণ, আচার্য কে. এস্. প্রভৃতি বরেণ্য বিজ্ঞানসাধকের অনুশাসন উল্লেখনীয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এককালের প্রেসিডেন্সী কলেজের মেধাবী ছাত্র এবং পরবর্তীকালের ভারতরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে বলেছিলেন—"বাল্যকালে সংস্কৃত রাজেন? তোমরা একেবারে degenerated। সংস্কৃতের মত বৈজ্ঞানিক ভাষা জগতে আর নাই। সংস্কৃতই তো বিশ্বের প্রাণ। সংস্কৃতের এক একটি শব্দ মানুষকে অনেক আবিষ্কারের দিকে প্রবৃত্ত করতে পারে।"

আধুনিক ভাষাসমূহের জননী হচ্ছে প্রাচীন ভাষা। সুতরাং আধুনিক ভাষায় পরিণত

জ্ঞানলাভের জন্য প্রাচীন ভাষা শিক্ষা অপরিহার্য। নব নব ভাবের প্রকাশার্থে নতুন নতুন শব্দ চয়ন এবং গঠন করার জন্য প্রাচীনভাষায় জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন।

প্রাচীনভাষার ব্যাকরণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীনভাষা শিক্ষার মাধ্যমে মানসিক শৃংখলাও মানুষ অধিগত ক'রে থাকে সেই কারণে।

আধুনিক পদ্ধতিতে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতরূপে যদি প্রাচীনভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহ'লে স্বল্প সময়েই সুষ্ঠুভাবে প্রাচীনভাষা শিক্ষা ক'রে তার সাহিত্যের রসাস্বাদনে এবং প্রাচীন সংস্কৃতির মহিমা উদ্ঘাটনে বিদ্যার্থীরা সক্ষম হবেন। তাহ'লে সময় এবং শক্তির অপচয়ের যুক্তি আর টিকবে না।

কেউ কেউ বলেন যে প্রাচীনভাষা শিক্ষার দ্বারা মানুষের দৃষ্টি শুধু অতীতাশ্রয়ী হবে। কুসংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন হ'য়ে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেবে বিদ্যার্থী। কিন্তু, সেকথা ঠিক নয়। উদার
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই ত্রিকালই সমভাবে বিধৃত থাকবে। বিশেষ ক'রে অতীতভাষায় জ্ঞানলাভ করলে, তার মাধ্যমে অতীতের জ্ঞানকে মূলধন ক'রে নিয়ে বর্তমানে ভবিষ্যৎ প্রগতিকে ত্বরান্বিত করা যাবে। মূলধন ব্যতীত বৈষয়িক উন্নতি যেমন কখনো সুকর নয়, তেমনি এক্ষেত্রেও তাই।

সর্বোপরি, মানুষ তো কেবল দেহ নিয়েই নয়। দেহ এবং মন উভয় নিয়েই মানুষ। অধিকন্তু, মনের উৎকর্ষের জন্যেই মানুষ ইতর-হ'তে শ্রেষ্ঠ। বিজ্ঞান-শিক্ষার দ্বারা মানুষের দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা চূড়ান্ত-ভাবে সম্ভব। মানসিক উৎকর্ষের উপাদানগুলো অধিকতরভাবে মেলে প্রাচীনভাষা ও সাহিত্যে। মানসিক উৎকর্ষ সম্পাদিত হ'লেই দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সুষ্ঠুভাবে উপভোগ করা চলে। সুতরাং যে মননের জন্যে মানুষ মানুষ, সেই মননের বিকাশের জন্যে প্রাচীনভাষা শিক্ষার প্রয়োজন একান্ত অপরিহার্য।

তদুপরি অধ্যাত্ম-জীবনের উন্নয়ন আন্তর্জাতিক মৈত্রীসাধন এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রতিষ্ঠার জন্যেও এই প্রাচীন ভাষার অনুশীলন সর্বদা অপেক্ষিত। পৃথিবীর সকল ধর্মগ্রন্থই প্রাচীন ভাষায় রচিত। তাই ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ এবং ধর্মজীবনের বিকাশসাধনে প্রাচীন ভাষা অপরিহার্য। প্রাচীনকালে বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে নানাভাবে যথেষ্ট সংযোগ ছিল। বর্তমানের বিভিন্ন সংস্কৃতি সেই সুপ্রাচীন সংস্কৃতি-সমষ্টিরই পরিবর্তিত রূপ। আজ জাতিগত, গোষ্ঠিগত এবং দেশগত অনৈক্যের যে বিষবাষ্প মানুষের মনের আকাশকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে, তার নিরসনে প্রয়োজন সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। প্রাচীন ভাষায় জ্ঞান লাভ করলে সকল সংস্কৃতির মূল উৎস এবং তার বর্তমান বিকাশ জানতে পারা যাবে। প্রাচীন সাংস্কৃতিক মৈত্রীর অনুবর্তনে বর্তমান জীবনে সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং মৈত্রী প্রতিষ্ঠার শুভবুদ্ধি মানুষের মনে জাগ্রত হবে। ফলে, প্রাচীন ভাষার অনুশীলন বিশ্বসংকট-নিরসনে এক প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ ক'রে মানব-সভ্যতাকে অগ্রগতির পথে পরিচালিত করবে

(ক্রমশঃ)

যাত্রী

শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ

সেই অনাদি কালের প্রভাত বেলায়
যাত্রা করিয়া শুরু
ফেলিয়া এলাম কত জীবনের
নদী-বন-গিরি-মরু !
এখনো পথের হয়নি কি শেষ,
আর কত দূরে আছে সেই দেশ ?
ক্লান্ত যে আমি ওগো পরমেশ
দাও ছায়া, কৃপা-তরু,
আকাশে বিজলী ওঠে চমকিয়া
মেঘ ডাকে গুরু গুরু !
সেই অনাদি কালের প্রভাত বেলায়
যাত্রা করেছি শুরু,
আরো কত দূর যেতে হবে প্রভু,
ভয়ে কাঁপি দুরু দুরু ।
সাথে আছ, তবু ধরো নাই হাত
কেমনে এড়াবো পথসংঘাত,
যাত্রী আমি যে ভীরু,
ধরো হাত ওগো, হে প্রভু আমার !
রাত্রি হয়েছে শুরু !

সাধন-গীতি

শ্রীপ্রভাত বসু

হরির চরণ শরণ আমার,
মরণ তাঁরি বুকে ;
তাঁরেই স্মরি দিবস-রাতি
সদাই সুখে-দুখে ।
হরি আমার সাধন-ধন—
অমূল্য সে পরশ-রতন,
ধ্যানে তাঁরি রূপ দেখি গো—
জপি সে নাম মুখে ।
স্থলে-জলে আছেন তিনি,
জীবন-পারে তাঁরেই চিনি—
প্রেমের ডোরে বেঁধে রাখি
সেই চির-বন্ধুকে !

বিবেকানন্দ স্মরণে

শ্রীবলাইচাঁদ ঘোষ

শুভ সেই দিন, তুমি যবে
'জ্যোতি' হ'য়ে এলে ভবে
'রাম-কৃষ্ণ' হ'তে,
কাল-স্রোতে,
নিত্য
সত্য
ত্যাগী বেশে,
মধু-হাসি হেসে ।
সেদিন তো বুঝি নাই,
দিয়েছ যা, আজও আছে তাই !

'বিবেকে'র জেলেছিলে আলো,
বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে তা গেল ।
আজও প্রতিজনে,
ক্ষণে ক্ষণে
তাই
পাই
জ্ঞান, আলো,—
আঁধারে যা জ্বালো ;
তবু তুমি পথে থেকো ;—
পথিক যে, তারে কাছে ডেকো ।

সমালোচনা

পরমহংস-চরিত (হিন্দী): স্বামী বিজ্ঞানানন্দ সংকলিত, চতুর্থ সংস্করণ। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২০০; মূল্য ২৲।

আলোচ্য হিন্দী পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ ত্যাগী শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ কর্তৃক ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বাংলা হইতে অনূদিত ও সংকলিত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে হিন্দী ভাষায় ইহাই প্রথম জীবন-চরিত। তাঁহার জীবনী ও উপদেশের মোটামুটি সব প্রধান তথ্য এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পাঠক এই পুস্তক পাঠে অনেক নূতন তথ্য ও উপদেশের সন্ধান পাইবেন, যাহা অন্য কোন পুস্তকে আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। উপদেশগুলি বিভিন্ন বিষয়ানুসারে সাজাইয়া দেওয়ায় বুঝিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। হিন্দীতে এই জাতীয় প্রামাণিক পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমরা আশা করি যে হিন্দীভাষী পাঠক-পাঠিকা এই পুস্তক পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন এবং পরম-হংসদেব সম্বন্ধে তাঁহাদের অনুসন্ধিৎসা আরও অধিক বর্ধিত হইবে। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

ছাপা সুন্দর এবং প্রচ্ছদপট চিত্তাকর্ষক।

স্বামী নিগুণানন্দ

ভারত-ইতিহাসের বিবর্তন (প্রাচীন যুগ)—অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন ও অধ্যাপক শ্রীপ্রণয়বল্লভ সেন। প্রকাশক: এস. গুপ্ত এণ্ড ব্রাদার্স, ৫৮ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। পৃষ্ঠা ৪২২; মূল্য ৬৲।

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ আমাদের স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলা ভাষার মাধ্যমে ইতিহাস-চর্চার ও ইতিহাসে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পেয়ে আসছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এই সুযোগদানের সিদ্ধান্তগ্রহণের ফলে বহু অধ্যাপকই পাঠ্যক্রম অনুযায়ী বাংলা ভাষায় ইতিহাস রচনা করে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। সম্প্রতি অধ্যাপক প্রণয়বল্লভ সেন ও অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন লিখিত 'ভারত ইতিহাসের বিবর্তন, প্রাচীন যুগ' প্রকাশিত হয়েছে। কুড়িটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই বইটিতে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস প্রাঞ্জল ভাষায় বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ভারতের ইতিহাসের পাঠ্যক্রম নির্ধারিত হয়েছে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণকাল হতে। কিন্তু প্রাক্ ৩২৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দের ইতিহাসের সঙ্গে পরবর্তী ইতিহাসের যোগসূত্র বজায় রাখার উদ্দেশ্যে গ্রন্থকারদ্বয় 'পূর্বকথায়' ইতিহাসের প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু—ভারত ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য, ভারত ইতিহাসে যুগবিভাগ, ভৌগোলিক প্রভাব—ভারতের মূল ঐক্য, সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা, বৈদিক যুগ—জৈন ও বৌদ্ধধর্ম—মানবসভ্যতায় ভারতের দান—ষোড়শ মহাজনপদ—বিষয়গুলি আলোচনা করে ছাত্রছাত্রীদের কাছে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের ধারা বোধগম্য করেছেন। বিষয়বস্তুর বণ্টন প্রাচীন ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাস পাঠে খুবই অনুকূল। যেমন—

প্রথম অধ্যায়—ঐতিহাসিক উপাদান, দ্বিতীয় অধ্যায়—আলেকজাণ্ডারের ভারত-

অভিযান, তৃতীয়—পঞ্চম অধ্যায়—মৌর্যযুগ, ষষ্ঠ অধ্যায়—শুঙ্গ কাম্ব—চেত সাতবাহন বংশ, সপ্তম অধ্যায়—বৈদেশিক অনুপ্রবেশ—ব্যাকট্রিয় গ্রীক পহ্লব ও কুষাণ আধিপত্য, অষ্টম অধ্যায়—মৌর্যোত্তর—প্রাক্‌গুপ্তযুগের সভ্যতা, নবম—একাদশ অধ্যায়—গুপ্তযুগ, দ্বাদশ অধ্যায়—গুপ্তোত্তর যুগের উত্তর ভারত, ত্রয়োদশ অধ্যায়—সপ্তম শতাব্দীর উত্তর ভারত—হর্ষবর্ধন, শশাঙ্ক, চতুর্দশ অধ্যায়—সপ্তম শতাব্দীর সাংস্কৃতিক চিত্র, পঞ্চদশ—ষোড়শ অধ্যায়—হর্ষের পরবর্তী উত্তর ভারত, ত্রিশক্তি সংঘাত—ভারতীয় সংস্কৃতি ও সমাজ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ অধ্যায়—দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস, উনবিংশ অধ্যায়—প্রাচীন বঙ্গ, বিংশ অধ্যায়—বৃহত্তর ভারত—ঔপনিবেশিক বিস্তার।

উল্লিখিত কুড়িটি অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে একটা অখণ্ড চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বিষয়বস্তুর সুনিপুণ বিন্যাস ও আলোচনার মাধ্যমে লেখকদ্বয় প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের ধর্মনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি ও মিলনমূলক বৈশিষ্ট্য সযত্নে ফুটিয়ে তুলেছেন। রাজনৈতিক আলোচনা বইটিতে যে স্থান পেয়েছে তা প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক বিবর্তন বুঝবার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। এদিক থেকে বলা যেতে পারে যে বইটির নামকরণ সার্থক হয়েছে। স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা উপাদানের দিকে লক্ষ্য রেখে ইতিহাস আলোচনা করবেন—ইহাই বাঞ্ছনীয়। লেখকদ্বয় একথা স্মরণ রেখে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিষয়বস্তুর আলোচনাকালে ঐতিহাসিক উপাদান উল্লেখ করে বইটির প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করেছেন। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন ও প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখিত আছে। এই সঙ্গে লেখকদ্বয় প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অতিরিক্ত পাঠ্য বইএর একটি তালিকা দিয়েছেন। এতে ছাত্রছাত্রীদের ইতিহাসপাঠে আগ্রহ এবং মূল বই পড়বার ঔৎসুক্য বৃদ্ধি পাবে, সন্দেহ নাই। প্রাচীন বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিশদ আলোচনা এই বইটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বিষয়বস্তুর আলোচনাকালে লেখকদ্বয় মুল গ্রন্থ থেকে যেসব উদ্ধৃতি উন্নিবেশিত করেছেন সেইসব গ্রন্থের নাম ও লেখকের উল্লেখ Footnoteএ থাকলে ভাল হত বলে মনে হয়। উদ্ধৃতাংশের বঙ্গানুবাদ পাশাপাশি থাকলে ছাত্রছাত্রীদের বুঝবার পক্ষে সুবিধা হত। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশকালে লেখকদ্বয়কে এ সম্পর্কে একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

মোটকথা, বইটি ছাত্রছাত্রীদের অবশ্য-পঠনীয়। আশাকরি লেখকদ্বয় মধ্য ও বর্তমান যুগের ইতিহাস রচনা করে ছাত্র ির অধিকতর উপকার সাধনে ব্রতী হবেন।

অধ্যাপক হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

বেলুড় মঠ ঃ গত ২১শে ফাল্গুন (৫.৩.৬৫) শুক্রবার শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩০তম জন্মতিথি-উৎসব মহা আনন্দে ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। মঙ্গলারতি, উপনিষদ্-আবৃত্তি, উষাকীর্তন, শ্রীশ্রী-চণ্ডীপাঠ, বিশেষ পূজা, হোম, দশাবতারের পূজা, ভোগারতি, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' এবং 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা, কীর্তন ও ভজন, শ্রীশ্রীকালীকীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। প্রায় দশ হাজার নরনারী বসিয়া এবং বহু ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

অপরাহ্ণে মঠ-প্রাঙ্গণে স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ বাংলায় ও স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ইংরেজীতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী অবলম্বনে সময়োপযোগী মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

সকাল হইতে বহু নরনারী মঠে সমবেত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন। রাত্রে দশমহাবিদ্যার পূজা, শ্রীশ্রীকালী-মাতার বিশেষ পূজা ও হোম হয়। রাত্রিশেষে মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ ১০ জনকে সন্ন্যাসব্রতে এবং ৮জনকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন।

পরবর্তী রবিবার ৭ই মার্চ মহোৎসব-দিনে প্রাতঃকাল হইতেই বেলুড় মঠ এক অপরূপ মহিমায় বিমণ্ডিত হইয়া উঠে। মঙ্গলারতি, উপনিষদ্-আবৃত্তি, ভজন, শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত, কালীকীর্তন, বাউল-সঙ্গীত, রামায়ণগান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরের পূর্বদিকে নির্মিত এক মণ্ডপে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সুবৃহৎ আলেখ্য ও তাঁহার ব্যবহৃত জিনিসপত্র সজ্জিত রাখা হয়। সারাদিনে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল।

উৎসব-সংবাদ

কাশী ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের ১০৩তম জন্মমহোৎসব মহা আনন্দে ও সমারোহে কয়েকদিনব্যাপী বিভিন্ন কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ধর্মানুষ্ঠানপূর্ণ কার্য-সূচীর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

২৩শে জানুআরি শনিবার প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিক-স্তবাদি গান ও প্রার্থনা-সঙ্গীত অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৭টা হইতে বিশেষ পূজানুষ্ঠান ও হোমাদি আরম্ভ হয়। ৮টা হইতে মারাঠী ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ করেন। অনন্তর শ্রীশ্রীচণ্ডী, কঠোপনিষদ্ এবং স্বামীজীর পত্রাবলী পাঠ হয়। মধ্যাহ্নে দরিদ্রনারায়ণসেবা ও সর্ব-সাধারণে হাতে হাতে প্রসাদ-বিতরণ হইয়াছিল। অপরাহ্ণ ৪টার পরে এক জনসভায় 'স্বামীজী ও বিশ্বমানবতা' সম্বন্ধে আলোচনা করেন—স্বামী অপূর্বানন্দ।

সান্ধ্য আরাত্রিকের পরে আশ্রমিক সাধুদের উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত ও ভজন গান এবং রাত্রে ৺কালীমাতার পূজা হইয়াছিল।

২৪শে অপরাহ্ণে এক জনসভায় 'ভারতের নব জাগরণে স্বামীজীর অবদান' সম্বন্ধে আলোচনা করেন—দার্জিলিং গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক শ্রীপ্রশান্তকুমার ঘোষ। ২৫শে হইতে ২৭শে তিন দিন অপরাহ্ণে সুধাকণ্ঠ শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য শ্রীগৌরাঙ্গের 'সন্ন্যাস' কীর্তন করেন।

২৮শে জানুআরি অপরাহ্ণে জনসভায় 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে স্বামীজীর জীবনের প্রভাব' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন স্বামী অপূর্বানন্দ।

২৯শে ও ৩০শে জানুআরি অপরাহ্ণে যথাক্রমে স্বামী ভাস্বরানন্দ ও স্বামী ধর্মেশানন্দ—'স্বামীজীর জীবনালোকে হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতা' এবং 'স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান ভারত' সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

৩১শে জানুআরি রবিবার মধ্যাহ্নে প্রায় ২ হাজার দরিদ্রনারায়ণকে পুরী-তরকারি খাওয়ানো হয়। অপরাহ্ণে আয়োজিত জনসভায় পৌরোহিত্য করেন কাশী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসন্ধান-সংস্থার প্রধান সঞ্চালক শ্রীক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। ৫জন বক্তা বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজীতে স্বামীজীর জীবন, বাণী ও অবদান সম্বন্ধে গভীর চিন্তাপূর্ণ ভাষণ দিয়াছিলেন।

স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত হিন্দী, বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় স্থানীয় ১৩টি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীগণ যোগদান করিয়াছিল। ঐ সভায় ২৭৬ জন প্রতিযোগীর মধ্যে পারিতোষিক বিতরিত হয়।

রাত্রে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত ও আশ্রমিক সাধুদের প্রার্থনা-সঙ্গীতে উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়।

শিলচর : গত ২৩শে জানুআরি, শনিবার স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উৎসব অতি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে সন্ধ্যায় মিশনের বিদ্যার্থী ভবনের বিদ্যার্থিগণ এক বিশেষ অনুষ্ঠানে স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে। 'স্বামীজীর দৃষ্টিতে ভারতীয় নারী' ও 'নব ভারতের স্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ' নামক দুইটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পঠিত হয়। স্বামীজীর রচিত কবিতা আবৃত্তি এবং স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিকের আলোচনা খুবই সুন্দর হয়। সুমধুর সঙ্গীতে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হইয়া উঠে।

২৪শে জানুআরি রবিবার সেবাশ্রমে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা-জজ শ্রীসুকৃতিচরণ দত্ত। সভার প্রারম্ভে নাতিদীর্ঘ এক স্বাগত ভাষণে আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ স্বামীজীর জীবনাদর্শ ব্যাখ্যা করেন।

প্রধান বক্তা—শিলচর গুরুচরণ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাদুর্দিনে স্বামীজীর আবির্ভাব ভারতের জাতীয় জীবনে যে নবপ্রাণ সঞ্চার করিয়াছিল তাহা অতি বিশদভাবে পরিবেশন করেন। তারপর কাছাড় কলেজের অধ্যাপক শ্রীপ্রভাসরঞ্জন ভট্টাচার্য 'স্বামীজীর কর্মযোগ' সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

সভাপতি তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে একমাত্র দেবাদিদেব মহাদেবের চরিত্রের সঙ্গেই স্বামীজীর চরিত্রের তুলনা করা যায় বলিয়া মন্তব্য করেন।

ফরিদপুর : রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১৫ই ফেব্রুআরি (৩রা ফাল্গুন) সোমবার যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দজীর শুভ জন্মোৎসব ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফরিদপুরের জনপ্রিয় জেলা-অধিপতি জনাব এস. ও. রহমান সাহেব। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মাননীয় আলহাজ আবা-আল্লা জহিরউদ্দিন (লালমিঞা) সাহেব এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া উপস্থিত সর্বশ্রেণীর নরনারীকে বিশেষ উৎসাহিত করেন। আশ্রম-পরিচালিত মহাকালী পাঠশালার ছাত্রীগণের স্তবপাঠের পর সভার কার্য আরম্ভ হয়।

তৎপর প্রধান অথিতির ভাষণে ডাঃ মহানাম-ব্রত ব্রহ্মচারী স্বামীজীর জীবনদর্শন অতি সুন্দর ভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন—সকল ধর্মের মধ্যে সমন্বয়-সাধনই মানুষের যথার্থ উন্নতির নির্দেশক। প্রায় দুই সহস্র নরনারী সভায় সমবেত হইয়াছিলেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আলহাজ আবা-আল্লা জহির-উদ্দিন সাহেব স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেন। সভাপতির অভিভাষণে জেলা-অধিপতি এস. ও. রহমান সাহেব তাঁহার নাতিদীর্ঘ ভাষণে স্বামীজীর জীবনী আলোচনা করিয়া সকলকে আনন্দ দান করেন। আশ্রমের সহ-সম্পাদক শ্রীসুধীররঞ্জন চক্রবর্তী সকলকে ধন্যবাদ জানাইবার পর সভান্তে প্রসাদ বিতরিত হয়।

বেলঘরিয়াঃ গত ২০শে ফেব্রুআরি বিকাল ৪॥ টায় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী আশ্রমের 'বিবেকানন্দ শতাব্দী জয়ন্তী ভবনে' প্রাদেশিক বিধান সভার স্পীকার শ্রীকেশবচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় 'স্বামী নির্বেদানন্দ স্মৃতিবক্তৃতার' এবং শিল্পপীঠের পুরস্কার বিতরণেরও আয়োজন করা হইয়াছিল।

শ্রীকেশবচন্দ্র বসু সভাপতির ভাষণে স্বামীজীর আদর্শে ছাত্রদের জীবনগঠনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। প্রধান অতিথি স্বামী চিদাত্মানন্দ 'স্বামী নির্বেদানন্দ স্মৃতি-বক্তৃতায়' 'স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে ভারতের জাতীয় শিক্ষা' বিষয়ে বক্তৃতা দানকালে বলেন যে বিদ্যার্থীদের জাগতিক বিদ্যায় পারদর্শী করার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চরিত্রও গড়িয়া তোলাই আমাদের জাতীয় শিক্ষার আদর্শ—স্বামীজী তাহাই চাহিয়াছিলেন। আশ্রমের প্রেসিডেণ্ট স্বামী তেজসানন্দজীও এবিষয়ে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

সারদানন্দ-জন্মোৎসব

'উদ্বোধন'-ভবনে গত ২৫শে পৌষ (৯ই জানুআরি) শনিবার পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের জন্মতিথি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূজ্যপাদ মহারাজের ঘরে ও পার্শ্ববর্তী কক্ষে তাঁহার প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্য দ্বারা সুন্দর-ভাবে সাজানো হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, স্বামী সারদা-নন্দজীর জীবনীপাঠ, ভোগরাগ, প্রসাদবিতরণ ও ভজন হয়। বহু ভক্ত পূজ্যপাদ মহারাজের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত উদ্বোধন-ভবন আনন্দমুখর ছিল। রাত্রে শ্রীশ্রীকালীকীর্তন হয়।

আমেরিকায় বেদান্ত

স্যানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত-সোসাইটিঃ নূতন মন্দিরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়; পুরাতন মন্দিরে যথারীতি উপনিষদের ক্লাসাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

অক্টোবর ১৯৬৪ঃ নবজন্ম; মানবজাতির ভবিষ্যৎ; সর্বকালে সকলের ধর্মগুরু শ্রীকৃষ্ণ; নির্গুণ ও সগুণ ঈশ্বর; স্বামী বিবেকানন্দ (চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত); সব কিছুই ঈশ্বর; মানবজীবনের পরিচালক মন; উচ্চতর চেতনা ও সত্তার মূল ভূমি; অতীন্দ্রিয়বাদের মর্ম।

নভেম্বরঃ মনকে শান্ত ও একাগ্র করিবার উপায়; আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে জগৎ; বাহিরে কিছুই নাই, সবই অন্তরে; অনন্তের সন্ধানে মানুষ; গুরু, শিষ্য ও দীক্ষা; যে আলো অন্তর আলোকিত করে; মনের উন্নতি ও অবনতি; স্থান, কাল ও চেতনা; কুণ্ডলিনী কখন জাগে?

ডিসেম্বর : মনের মন ও জীবনের জীবন; মৃত্যুর আধ্যাত্মিক অর্থ; হিন্দুদের দৃষ্টিতে মুক্তি; নিজের চেষ্টায় আত্মোন্নতি; যোগবলে দুঃখ-নিবৃত্তি; অবিচ্ছিন্ন ধ্যান; আমিই সত্যের দ্বার; খৃষ্ট কি শিক্ষা দিয়াছিলেন?

সিয়েটেল রামকৃষ্ণ-বেদান্তকেন্দ্রে নূতন মন্দির

আমেরিকার **সিয়েটেল** (ওয়াশিংটন) রামকৃষ্ণ-বেদান্তকেন্দ্রে নূতন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে গত ৯ই জানুআরি হইতে ১১ই জানুআরি, ১৯৬৫ দিবসত্রয়ব্যাপী উৎসব বিশেষ উদ্দীপনা ও আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সিয়েটেলের এই বেদান্তকেন্দ্র ২৭১৬ ব্রডওয়ে ষ্ট্রীটে অবস্থিত, এই কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ স্বামী বিবিদিষানন্দ। আমেরিকার বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে সন্ন্যাসিগণ এই উৎসবে যোগদান করেন। হলিউড কেন্দ্র হইতে স্বামী প্রভবানন্দ ও স্বামী কৃষ্ণানন্দ, স্যান্‌ফ্রান্সিস্কো কেন্দ্র হইতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এবং পোর্টল্যাণ্ড কেন্দ্র হইতে স্বামী অশেষানন্দ আসেন।

৯ই জানুআরি প্রাতঃকালে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের সহযোগিতায় স্বামী অশেষানন্দ আনুষ্ঠানিক পূজাদি সম্পন্ন করেন। পূজান্তে পুষ্পাঞ্জলি অর্পিত হয়। সন্ধ্যায় আরাত্রিক ও ভজন হয়।

১০ই জানুআরি রবিবার আয়োজিত সভায় প্রচুর জনসমাবেশ হইয়াছিল। স্বামী প্রভবানন্দ কর্তৃক প্রারম্ভিক প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী বিবিদিষানন্দ সমবেত সকলকে অভিনন্দন জানান ও বক্তাদিগের পরিচয় দেন। স্বামী অশেষানন্দ শুভার্থী ও বন্ধুবর্গপ্রেরিত শুভেচ্ছা-জ্ঞাপক পত্রগুলি পাঠ করেন।

স্বামী অশেষানন্দ 'অনুভূতির ধর্ম ও দর্শন হিসাবে বেদান্ত' বিষয়ে ভাষণ দেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের বক্তৃতার বিষয় ছিল 'মানবিক দৃষ্টিতে বেদান্ত'। স্বামী প্রভবানন্দ 'প্রেমের ধর্ম বেদান্ত' সম্বন্ধে আলোচনা করিলে এই দিনের সভার কার্য সমাপ্ত হয়। সভায় আলোচিত বিষয়গুলি অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক ও শ্রোতাদের নিকট বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল।

১১ই জানুআরি সন্ধ্যা ৭টায় উৎসবের শেষ অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের সদস্যবৃন্দ ও বন্ধুগণকে এক ভোজে আপ্যায়িত করা হয়। ইহার পর স্বামী বিবিদিষানন্দ ক্রাইস্ট এপিস্কোপ্যাল চার্চের ডঃ আইনস্‌লে কার্লটনকে (Dr. Ainsley Carlton) ও পল থিরীকে (Mr. Paul Thiry) পরিচিত করাইয়া দেন। পল থিরী উপাসনা-মন্দিরের পুনর্গঠনের নকশা প্রস্তুত করেন।

স্বামী অশেষানন্দ 'আমেরিকায় বেদান্তের প্রথম প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে ভাষণ দান প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য জগতে স্বামীজীর অমূল্য দানের কথা উল্লেখ করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা বলেন স্বামী প্রভবানন্দ। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 'রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভাবধারা ও আদর্শ' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাগুলি সম্মানিত অতিথিবর্গের নিকট অত্যন্ত আনন্দদায়ক হইয়াছিল।

উপাসনা-মন্দিরের ভিতরের পুনর্গঠনের সমুদয় কাজই ঈষৎস্বর্ণাভ মেহগিনিতে করা হইয়াছে। বেদীমূলে সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রতীকচিহ্ন খোদিত হইয়াছে। এই প্রতীক জগতের পাঁচটি মূলধর্মের পবিত্র চিহ্ন—পদ্ম, বজ্র, তারকা, ক্রস্‌ এবং চন্দ্র লইয়া গঠিত। ঠিক অনুরূপ নকশা সম্মুখের দরজায় ও দরজার দুই পার্শ্বের রঙীন কাচের উপরও উৎকীর্ণ হইয়াছে।

গ্রন্থাগার ও পাঠাগারটিকে সংস্কার করিয়া আধুনিকভাবে সজ্জিত করা হইয়াছে।

প্রচারকার্য

গত ১৫ই অক্টোবর ও ১৭ই নভেম্বর হইতে ২৭শে ডিসেম্বর পর্যন্ত স্বামী প্রণবাত্মানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন শিলং, পাণ্ডু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র, রামকৃষ্ণ আশ্রম গৌহাটী, তুরা গারোপাহাড়, লিচুতলা, আলিপুরদুয়ার জং রেলওয়ে ক্লাব, ভোলার ডাবরী, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম জলপাইগুড়ি ইত্যাদি স্থানে বিশ্বসভ্যতায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অবদান, জাতীয় জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও যুগাচার্য বিবেকানন্দ, ভারতীয় নারী ও শ্রীশ্রীসারদা দেবী এবং ভারতে শক্তিপূজা সম্বন্ধে ১৫টি বক্তৃতা দিয়াছেন। তন্মধ্যে ১৩টি বক্তৃতা ছায়াচিত্রযোগে প্রদত্ত হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

গত জানুআরির প্রথম সপ্তাহ হইতে মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক রামেশ্বরে এবং উচিপুল্লীতে বাত্যা-প্রপীড়িত জনগণের জন্য 'রিলিফ'-কার্য অনুষ্ঠিত হইতেছে।

দ্রব্যাদি বিতরণের আরও বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে ১১. ২. ১৯৬৫ পর্যন্ত নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি বিতরণ করা হয়:

উচিপুল্লীতে ৫,৯৮৮টি ছোট ও বড় বাঁশ, ৩৭৪ বাণ্ডিল কাঠ, ৬১,৬৫০ তালপাতা, ৫৫,৫৫০ নারিকেলপাতা ও ৩৪ খানি কম্বল এবং রামেশ্বরে ১,৮০০ বাঁশ, ১৫০ বাণ্ডিল কাঠ, ১,২৫,০০০ তালপাতা বিতরিত হইয়াছে।

মূল ভূখণ্ড ও দ্বীপের মধ্যে যানবাহন-চলাচলের এবং খেয়া-পারাপারের অসুবিধার জন্য মূল ভূখণ্ডের মতো রামেশ্বরে রিলিফের জন্য দ্রব্যাদি তত তাড়াতাড়ি বিতরণ করিতে পারা যায় নাই।

স্বামী সর্বেশানন্দের দেহত্যাগ

গত ১লা ফেব্রুআরি বেলা ১১টার সময় বারাণসী শিবালার সন্নিকটে জনৈক ভক্তের গৃহে স্বামী সর্বেশানন্দ (দুর্গাদাস মহারাজ) ৭০ বৎসর বয়সে সহসা হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে জয়রাম-বাটীতে শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বারাণসী সেবাশ্রমে তিনি দীর্ঘকাল সেবাকার্যে রত ছিলেন। কিছুকাল তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। শেষ কয়েক বৎসর তিনি অবসর জীবন যাপন করিতেছিলেন। তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বিবিধ সংবাদ

অখিল ভারত প্রাচ্য বিদ্যা সম্মেলন

গত ২রা জানুআরি হইতে ৪ঠা জানুআরি পর্যন্ত গৌহাটীতে অখিল ভারতীয় প্রাচ্য বিদ্যা সম্মেলনের দ্বাবিংশ অধিবেশন মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দুই বৎসর পর পর ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে প্রায় পাঁচশত দেশী ও বিদেশী পণ্ডিত সমবেত হইয়া বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেন। মূল সভাপতি বারাণসীর ডঃ বাসুদেব শরণ অগ্রবাল বর্তমান হিংসাবিক্ষুব্ধ জগতে প্রাচ্যবিদ্যানুশীলনের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করিয়া বিগত দুই বৎসরে এই ভারত-তত্ত্বের গবেষণাক্ষেত্রের বিস্তৃত সমীক্ষা করেন।

তিনি ভারতের কল্যাণ এবং বিশ্বশান্তির জন্য সংস্কৃতভাষার পঠন-পাঠনের এবং রাষ্ট্রগতভাবে তাহার ব্যবহারের জন্য আবেদন জানান। আসামের রাজ্যপাল শ্রীবিষ্ণু সহায় উদ্বোধনী ভাষণে এই সম্মেলনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা এবং শিক্ষামন্ত্রী শ্রীদেবকান্ত বড়ুয়া সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান। এই সম্মেলনে পুণা হইতে ডঃ আর. এন. দাণ্ডেকর, কাশ্মীর হইতে ডঃ পি. এন. পুষ্প, আন্নামালাই হইতে ডঃ সি. এস বেঙ্কটেশ্বরন্, দিল্লী হইতে ডঃ চন্দ্রভান গুপ্ত, মাদ্রাজ হইতে ডঃ টি. ভি. মহালিঙ্গম্ প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলী ভাষণ দান করেন। বাংলা দেশ হইতে ডঃ রমা চৌধুরী, অধ্যাপক ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, ডঃ কালীকুমার দত্ত, ডঃ শিবেন্দ্রনাথ ঘোষাল প্রভৃতি গবেষণাপত্র পাঠ করেন। নিম্নলিখিত শাখায় সম্মেলনের গবেষণাপত্রাদি পঠিত এবং আলোচিত হয়। আরবী ও পারসী, প্রত্নতত্ত্ব, প্রাচীন সংস্কৃত, ইতিহাস, ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব, ইরাণী, ঐসলামিক সংস্কৃতি, পালি ও বৌদ্ধধর্ম, পণ্ডিত-পরিষদ, প্রাকৃত ও জৈনধর্ম, ধর্ম ও দর্শন, শিল্পবিজ্ঞান ও ললিতকলা, বৈদিক সংস্কৃতি ও আসামের উপজাতীয় সংস্কৃতি প্রভৃতি ছিল আলোচ্য বিষয়।

সারাবতী বিদ্যুৎকেন্দ্র

গত জানুআরির শেষ সপ্তাহে প্রধান মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী মহীশূরের জোগ জলপ্রপাত এলাকায় সারাবতী জলবিদ্যুৎ কারখানার প্রথম ইউনিট উদ্বোধন করেন। ইহার ফলে দক্ষিণ ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। এখানকার জেনারেটারটি ৮৯ হাজার ১ শত কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতাসম্পন্ন। সারাবতী বাঁধ এবং বিদ্যুৎ কারখানা নির্মাণের কার্যে ৪০ হাজার নরনারী নিযুক্ত ছিলেন। সারাবতী জলবিদ্যুৎ কারখানা ভারতের বৃহত্তম কারখানারূপে পরিগণিত হইবে এবং নির্মাণকার্য শেষ হইলে এখানে ১২ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। ইহা দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম বিদ্যুৎ কারখানা। পরিকল্পনানুসারে এখন হইতে ৬ মাস পর পর একটি করিয়া নূতন জেনেরেটর এখানে চালু করা হইবে এবং এই বিরাট কর্মকাণ্ডের সুফল আগামী তিন বৎসরের মধ্যেই জনসাধারণ পাইতে শুরু করিবে। মোট দশটি জেনারেটর চালু করা হইলে ৮ লক্ষ ১১ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। পুরাপুরি চালু হইলে জলবিদ্যুৎসহ উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইবে ১২ লক্ষ কিলোওয়াট।

ভারতীয় ভাষাসমূহের সংখ্যাতথ্য

১৯৬১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনানুসারে বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের সংখ্যা :

হিন্দী	...	১৩,৩৪,৩৫,৪৫০
(খড়িবোলী ৪ কোটি, বাকী ৯ কোটি মৈথিলী প্রভৃতি)		
তেলুগু	...	৩,৭৬,৬৮,১৩২
বাংলা	...	৩,৩৮,৮৮,৯৩৯
মারাঠী	...	৩,৩২,৮৬,৭৭১
তামিল	...	৩,০৫,৬২,৬৯৮
উর্দু	...	২,৩৩,২৩,৫১৮
গুজরাটী	...	২,০৩,০৪,৪৬৪
কানাড়ী	...	১,৭৪,১৫,৮২৭
মালয়লম্	...	১,৭০,১৫,৭৮২
ওড়িয়া	...	১,৫৭,১৯,৩৯৮
পঞ্জাবী	...	১,০৯,৫০,৮২৬
আসামী	...	৬৮,০৩,৪৬৫
কাশ্মীরী	...	১৯,৫৬,১১৫
সংস্কৃত	...	২,৫৪৪

দিব্য বাণী

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ মা কুরু যত্নং বিগ্রহসন্ধৌ।
ভব সমচিত্তঃ সর্বত্র ত্বং বাঞ্ছস্যচিরাদ্ যদি বিষ্ণুত্বম্॥

—শঙ্করাচার্যকৃত দ্বাদশপঞ্জরিকা।

বিষ্ণুপদ লভিবারে অভিলাষী হও যদি, সর্বত্রই সমচিত্ত হও,
শত্রু মিত্র পুত্র বন্ধু, সন্ধি কিম্বা বিগ্রহেতে সমভাবে অনাসক্ত রও।

ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুর্ব্যর্থং কুপ্যসি মষ্যসহিষ্ণুঃ।
সর্বস্মিন্নপি পশ্যাত্মানং সর্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্॥ ৮

তোমার আমার মাঝে, সকল জগৎ জুড়ে একই বিষ্ণু সদা বিদ্যমান,
(তোমারই স্বরূপ তিনি, জানি ইহা) আপনারে সব ঠাঁই করহ দর্শন;
তুমি আমি ভিন্ন ভাবি আমার উপর যদি ক্রোধোন্মত্ত হও কোন ক্ষণে,
জেনো তাহা অর্থহীন; ভুলিয়াও ভেদজ্ঞান আনিও না কভু কোন খানে।

কা তেঽষ্টাদশদেশে চিন্তা বাতুল তব কিং নাস্তি নিয়ন্তা।
যস্ত্বাং হস্তে সুদৃঢ়নিবদ্ধং বোধয়তি প্রভবাদি বিরুদ্ধম্॥ ১১

বাতুলের মত কেন দিকে-দিকে দেশে-দেশে বিক্ষিপ্ত করিয়া মনটিরে
চিন্তায় বিব্রত হও? চালক নাহি কি তব, ধরি যেবা অতি স্নেহভরে
তোমার দুখানি কর নিজ দৃঢ় করপুটে লইয়া যাইতে পারে সেথা—
জন্ম-মৃত্যু, সৃষ্টি-লয়, সুখ-দুঃখ আদি দ্বন্দ্ব জ্ঞানালোকে লুপ্ত হয় যেথা?

গুরুচরণাম্বুজনির্ভরভক্তঃ সংসারাদচিরাদ্ ভব মুক্তঃ।
সেন্দ্রিয়মানসনিয়মাদেবং দ্রক্ষ্যসি নিজহৃদয়স্থং দেবম্॥ ১২

সংসার-বিমুক্ত হও শ্রীগুরুর পাদপদ্মে নির্ভরতা আর ভক্তি বলে,
দিব্যভাবময় তুমি—দেবতা আছেন জেগে নিরবধি তব হৃদিতলে,
মন আর ইন্দ্রিয়েরে সংযত করিয়া তাঁরে হের নিজ হৃদি-শতদলে।

কথাপ্রসঙ্গে

চরিত্রগঠন

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "জগতে সর্বত্র দেখিতে পাই, সকলেই এই শিক্ষা দিতেছে যে, 'সৎ হও, ভাল হও।' বোধ হয় জগতে কোন দেশে এমন কোন বালক জন্মায় নাই, যাহাকে বলা হয় নাই, 'মিথ্যা কহিও না, চুরি করিও না' ইত্যাদি, কিন্তু কেহ তাহাকে এই সকল কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় শিক্ষা দেয় না। শুধু কথায় হয় না। কেন সে চোর হইবে না? আমরা তো তাহাকে চৌর্যকর্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় শিক্ষা দিই না, কেবল বলি, 'চুরি করিও না।' মন সংযত করিবার উপায় শিক্ষা দিলেই তাহাকে যথার্থ সাহায্য করা হয়।"

মনই আমাদের চরিত্র নির্ণয় করে। আমরা যাহা কিছু চিন্তা করি, অনুভব করি, কাজ করি —সেগুলির প্রত্যেকটিই আমাদের মনে একটি স্থায়ী ছাপ রাখিয়া যায়। সেগুলির সমষ্টিই আমাদের চরিত্র। আমরা বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত যাহা কিছু কাজ করিয়াছি, চিন্তা করিয়াছি, অনুভব করিয়াছি, সেগুলিই সূক্ষ্মাকারে আমাদের মনের বর্তমান প্রবণতা নির্ণয় করিতেছে। আমার চরিত্র যদি সৎ হয়, তবে বুঝিতে হইবে পূর্ব হইতে আমার মনে সৎকর্ম ও সচ্চিন্তার ছাপ বেশী রহিয়াছে। আমি যদি অসৎ হই, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে পূর্বে আমি অসৎকর্ম ও অসচ্চিন্তা বেশী করিয়া করিয়াছি। তাহার প্রভাবই এখন আমাকে অসৎকার্যে প্রেরণা দিয়া চলিয়াছে। পূর্বকৃত চিন্তা বা কর্মের এই অশুভ ছাপগুলি পরিমাণে যখন খুব বেশী হয়, তখন মনে শুভ ইচ্ছা জাগিলেও সেগুলি শুভ ইচ্ছাটিকে কর্মরূপায়িত হইতে দেয় না, বাধা দিয়া অপরিণত অবস্থাতেই তাহাকে অবশ করিয়া ফেলে।

আমাদের মনে ছাপ পড়া অনেক কিছুর উপর নির্ভরশীল। স্বামীজীর 'রাজযোগ' গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ বাহিরের বস্তু ও পরিবেশ। দ্বিতীয়তঃ ঐ বস্তুর সঙ্গে আমার বহিরিন্দ্রিয়ের সংযোগ। তৃতীয়তঃ আমার মনের সঙ্গে মস্তিষ্ককেন্দ্রস্থ অন্তরিন্দ্রিয়গুলির সংযোগ। একটি ফুল দেখিলাম—মনে উহার ছাপ পড়িল। ইহার জন্য বাহিরে একটি ফুল ও আলো থাকা চাই। ফুলে প্রতিহত আলোক আসিয়া আমার বহিরিন্দ্রিয় চক্ষুর ভিতর রেটিনায় উহার আকৃতি ও বর্ণ বিশিষ্ট একটি প্রতিবিম্ব ফেলিল। ফুলটির আকৃতি বা বর্ণ বলিতে সাধারণতঃ আমরা যাহা বুঝি, তাহার কিন্তু শেষ হইল এখানেই। এর পরের ধাপগুলি সূক্ষ্মতর—সবই প্রতিক্রিয়া। স্নায়ুগুলি রেটিনা হইতে মস্তিষ্ককেন্দ্রে এই প্রতিক্রিয়াটিকে পৌঁছাইয়া দেয়, ফলে সেখানেও একটি প্রতিক্রিয়া ঘটে। তার পরের ধাপ আরো সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম অন্তরিন্দ্রিয়গুলি অতি সূক্ষ্ম পদার্থে গঠিত মনের সঙ্গে মস্তিষ্ককেন্দ্রের এই প্রতিক্রিয়াগুলির যোগাযোগ ঘটাইয়া মনে স্পন্দন তোলে। মনের এই স্পন্দনই আমাদের অনুভূতি—গোলাপ ফুলের আকৃতি ও বর্ণ দেখা, এবং উহা আমাদের ভাললাগা বা খারাপলাগা, সবই। ফুলটি যদি ভাল লাগে তবে মনের এই ছাপগুলিই প্রথমে চিন্তাকারে প্রেরণা আনিয়া পরে আমাদের দেহকেও সচেষ্ট করিয়া তোলে ফুলটিকে লাভ করিবার জন্য। এই ছাপগুলি মনের চেতন স্তরে কিছুক্ষণ থাকিয়া সূক্ষ্ম হইতে

সূক্ষ্মতর হইয়া অবচেতন মনে প্রবেশ করে এবং সেখানে স্থায়িভাবে রহিয়া যায়। এইগুলির সমষ্টির নাম সংস্কার। এই ছাপগুলি প্রচণ্ড শক্তিশালী। এগুলি যখন খুশি মনের উপরের স্তরে আসিয়া ফুল দেখার সময় যেরূপ হইয়াছিল, তাহার অনুরূপ তরঙ্গ আবার সৃষ্টি করিতে পারে। যেমন স্বপ্নকালে বাহিরের বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ না থাকিলেও এই পূর্বসঞ্চিত ছাপগুলিই মনে জাগ্রৎকালের মত অনুভূতির তরঙ্গ তোলে। এই ছাপগুলি মনে সঞ্চিত থাকে বলিয়াই আমরা অতীত ঘটনা স্মরণ করিতে পারি।

অসৎ কর্মের মূল প্রেরণাশক্তি অসৎ ছাপগুলির, অশুভ সংস্কারের প্রভাব হইতে বিমুক্ত হইবার একটি উপায় মনের উপর নূতন করিয়া অশুভ সংস্কার সৃষ্ট হইবার সুযোগ আর না দেওয়া—উহার উত্তেজক বাহ্য বিষয় হইতে দূরে থাকা। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। মনে পূর্বসঞ্চিত অশুভ সংস্কার যদি পরিমাণে বেশী থাকে, তাহা হইলে সুযোগ পাইলেই সে মানুষকে মন্দকার্যে নিযুক্ত করিবে। সেজন্য মনে অসৎ চিন্তা ও কর্মের ছাপ যাহাতে কম পড়ে, তাহার জন্য চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু করা প্রয়োজন। অশুভ সংস্কারগুলি যখন মনের গভীরতর স্তর হইতে উঠিয়া মনের চেতন স্তরে প্রভাব বিস্তার করিতে সুরু করে—যখন আমরা মন্দ চিন্তা করিবার উদ্যোগ করি—তখনই মনকে উহা হইতে বিরত হইবার শিক্ষা দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে। স্বামী বিবেকানন্দ মনঃসংযম প্রসঙ্গে এইটির উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন—চিন্তাটি সূক্ষ্মাবস্থায় থাকিতেই উহাকে ধরিয়া ফেলা ও প্রতিহত করা। পরে আর কিছু করিবার থাকে না। একবার প্রশ্রয় পাইলে চেতন মনে এগুলির প্রভাব ক্রমশঃ প্রবলাকার ধারণ করে এবং তখন এগুলির প্রভাব শরীরের উপরও কার্যকরী হয়—আমরা চেষ্টা করিয়াও এই অবস্থায় অসৎকর্মের অনুষ্ঠান হইতে নিজেকে আর বিরত রাখিতে পারি না।

অসচ্চিন্তা মনে উঠিবামাত্র উহাকে সরাইয়া দিতে চেষ্টা করিতে হইবে ঠিক কথা; কিন্তু দেখা যায়, ইচ্ছা থাকিলেও অনেক ক্ষেত্রে আমরা তাহা করিতে পারি না—নিজের ইচ্ছাশক্তিকে দুর্বল, নিজেকে অসহায় মনে করি। আমরা যাহাকে পাপকার্য, অন্যায় কর্ম বলি - মনের এই দুর্বলতাই, ইচ্ছাশক্তিহীনতাই তাহার মূল কারণ। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "জগতে পাপ বলিয়া যদি কিছু থাকে, দুর্বলতাই সেই পাপ।" "যাহা কিছু শরীর-মনকে দুর্বল করে, তাহাই পাপ।" সেজন্য সচ্চরিত্র গঠন করিতে হইলে অসৎ পরিবেশ হইতে দূরে থাকিবার ও মনে সদিচ্ছা জাগাইবার ব্যবস্থার সহিত সদিচ্ছাকে ফলবতী করিবার মত শক্তিরও, ইচ্ছাশক্তিরও বর্ধনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

অভ্যাসের দ্বারা ইচ্ছাশক্তিকে বাড়াইয়া তোলা সম্ভব। অভ্যাসের দ্বারা মনকে তাহার নিজের প্রবণতা মত চলিতে না দিয়া আমরা যে পথ আমাদের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া বুঝি সে পথে তাহাকে চালিত করা যায়। অসৎ-কর্মপ্রিয় মনকে সংযত করিয়া এমন অবস্থায় আনা যায়, যেখানে সে যতখানি স্বাভাবিক ভাবে অশুভ কর্ম করিতে ব্যগ্র হয়, শুভ-কর্মানুষ্ঠানের জন্য ততখানি ব্যগ্রতা তাহার স্বাভাবিক হইয়া যাইবে; অশুভ কর্ম করিয়া সে যতখানি আনন্দ পায়, শুভকর্মে তদপেক্ষা অধিক আনন্দ পাইবে। অশুভ চিন্তার উত্তেজক বিষয়ের সংস্পর্শে আসিলেও মন তখন আর

মস্তিষ্কস্থ ইন্দ্রিয়কেন্দ্রে নিজেকে সংযুক্ত করিতে চাহিবে না। এই অবস্থা আসিলে তখন আমাদের চরিত্র যথার্থ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। পুনঃপুনঃ চেষ্টাই—অভ্যাসই—চরিত্রগঠনের একমাত্র উপায়। গীতায় আছে, অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, "সখা, সবই তো বুঝলাম—মনকে স্ববশে না আনলে কিছু হয় না। কিন্তু মনকে সংযত করা তো হাওয়াকে নিজের বশে আনার মতোই দুঃসাধ্য ব্যাপার!" শ্রীকৃষ্ণ ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "ঠিকই বলেছ; তবে কি জান, বৈরাগ্য আর অভ্যাস সহায়ে এটা করা সম্ভব হয়।" বৈরাগ্য বলিতে বুঝায়, যাহা অসৎ বলিয়া বুঝিয়াছি তাহা হইতে বিরত থাকা ও যাহা সৎ বলিয়া বুঝিয়াছি মনেপ্রাণে তাহা আঁকড়াইয়া ধরা।

চরিত্রগঠনে সহায়তা করিতে হইলে আমাদের জীবনের পক্ষে কোন্ চিন্তা ও কোন্ কাজগুলি কল্যাণকর, কোন্গুলি অকল্যাণকর তাহা বিচার যুক্তি সহায়ে মানুষের মনে গাঁথিয়া দিতে হয়; সেই সঙ্গে যাহা কল্যাণকর বলিয়া বুঝা গেল, তাহা জীবন-রূপায়িত করিতে বারবার চেষ্টা করিবার জন্য কার্যকরী প্রেরণা, উৎসাহ ও সুযোগ দিতে হয়। চরিত্র গঠন বা সংশোধন করার দ্বিতীয় আর কোন পন্থা নাই।

মানুষ যন্ত্র নয়। সৎ হইবার ইচ্ছার খোরাক না জোগাইয়া কেবলমাত্র কতকগুলি ছকা পথের উপর দিয়া তাহাকে চালিত করিলেই তাহার মনের পরিবর্তন হয় না। স্বাধীন ইচ্ছাই, স্বাধীনভাবে কিছু করিবার প্রেরণাই জীবনের লক্ষণ। সেজন্য, স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, স্বাধীনতা যত বেশী থাকে, এবং নিষেধ যত কম থাকে মানসিক উন্নতির গতি হয় তত দ্রুততর। যতক্ষণ কাহারো মনে সৎ হইবার ইচ্ছা না জাগিতেছে, ততক্ষণ কাহারো সাধ্য নাই জোর করিয়া তাহাকে সৎ করে। জোর করিয়া বড় জোর আমাদের অসৎ প্রবৃত্তিকে সাময়িকভাবে দাবাইয়া রাখা যায়, এই পর্যন্ত। আমি ক্ষুধায় কাতর, খাইতে চাই অথচ পাইতেছি না—যোগাড় করিতে পারিতেছি না—বাধ্য হইয়া বা অনেকক্ষেত্রে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও চক্ষুলজ্জায় পড়িয়া বা অন্য কোন কারণে আমাকে একদিন উপবাস করিতে হইল। আর, আমার খাদ্যের অভাব নাই, খাওয়ার পথে দেহগত, সমাজগত বা আইনগত কোন বাধাই নাই, অথচ আমি স্বেচ্ছায় একদিন উপবাস করিলাম। এদুটি বাহ্যতঃ এক হইলেও, শরীরের উপর উভয় ক্ষেত্রেই প্রভাব এক হইলেও মনের উপর এ দুটির প্রভাব সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রথমটি মনে ক্ষোভ, দুঃখ ও অশান্তি আনয়ন করে, খাওয়ার ইচ্ছাকে আরও প্রবল করিয়া তোলে; আর দ্বিতীয়টি মনে আনিয়া দেয় আত্মপ্রসাদ ও শান্তি, এবং সবচেয়ে বড় কথা ইহা আত্মবিশ্বাস ও ইচ্ছাশক্তিকে বাড়াইয়া তোলে। উপবাস করিলে খাইবার সময় হইলেই মন খাইতে চাহিবে, শরীরে অনশনজনিত ক্লেশ অনুভূত হইবে; সেগুলিকে স্বেচ্ছায় উপেক্ষা করার ফলেই আত্মবিশ্বাস ও ইচ্ছাশক্তি বাড়িয়া যায়। মনকে তাহার আকাঙ্ক্ষিত পথে চালতে বাধা দিয়া সেখান হইতে টানিয়া আনিবার স্বেচ্ছাকৃত ছোট বড় যে কোন প্রচেষ্টাই তাই চরিত্রের ভিত্তিকে দৃঢ়তর করিয়া তোলে। তাছাড়া, যে কোন সংযমই আমাদের অন্তর্নিহিত আনন্দের আবরণ একটুখানি খুলিয়া দিয়া মনকে উচ্চতর আনন্দে আপ্লুত করিবেই।

আমাদের দেশে পূর্বে পারিবারিক জীবনে, সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থায় চরিত্রগঠনের জন্য যাহা

যাহা প্রয়োজন শিশুকাল হইতেই সকলে তাহা যাহাতে পায়, তাহার আয়োজন ছিল। বর্তমান কালে সর্বক্ষেত্রেই উহা প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। মনে সচ্চিন্তার ছাপ দিবার জন্য ও সৎ হইবার ইচ্ছাকে দৃঢ় করিবার জন্য প্রয়োজন, শিশুকাল হইতে আমরা যাঁহাদের সংস্পর্শে আসি তাঁহাদের, বিশেষ করিয়া মাতা-পিতা ও শিক্ষকের জীবনে সদ্ভাবগুলিকে রূপায়িত দেখা; শিশু-মনের উপর তাঁহাদেরই প্রভাব সব চেয়ে বেশী। সৎ জীবনের সংস্পর্শে থাকিলে মনে আপনা-আপনি সদ্ভাবগুলি প্রবেশ করে। এই ইতিবাচক প্রক্রিয়াটি মনকে অসৎ চিন্তার প্রভাব হইতে রক্ষা করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। শৈত্যের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার দুইটি উপায় আছে। একটি গরম জামা কাপড় গায়ে দিয়া শরীরে শীত প্রবেশের পথ বন্ধ করা, অন্যটি অগ্নিকুণ্ডের নিকট বসিয়া সোজাসুজি তাপ আহরণ করা। এই দ্বিতীয় পন্থাটি সর্বোত্তম সন্দেহ নাই। মাতা, পিতা, শিক্ষক, প্রতিবেশী প্রভৃতির নিকট হইতে এই ইতিবাচক জিনিষটি পাওয়া আজ দুর্লভ; উহা আবার সুলভ করিয়া তুলিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।

আর সেই সঙ্গে চরিত্রগঠনের উপযোগী চিন্তাগুলির বিপরীত চিন্তা মনে যাহাতে ছাপ ফেলিবার সুযোগ কম পায়, তাহার দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মনের প্রবলতম প্রবৃত্তি হইল যৌনপ্রবৃত্তি। এটিকে দমন করিয়া রাখার শক্তি যাহার আছে, মনের অন্যান্য প্রবৃত্তিগুলিকে স্ববশে রাখা তাহার পক্ষে অতি সহজ। যে একটি হাতীকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে, একটি শৃগালকে বাঁধিবার শক্তি তাহার আছে কিনা, এ প্রশ্ন অবান্তর। ছাত্রজীবনই চরিত্রগঠনের, জীবন-প্রস্তুতির উপযুক্ত সময়, এবং যৌবনের প্রারম্ভই সাধারণতঃ ভবিষ্যৎ জীবনের গতি নির্ণয় করে। বর্তমানকালে আমরা মনে যৌনপ্রবৃত্তির ছাপ দেওয়ার সহায়ক চিন্তাদি হইতে বিদ্যার্থীদের যথাসম্ভব দূরে রাখা তো পরের কথা, যাহাতে কেহই ইহা হইতে বঞ্চিত না হয়, তাহার জন্য যেন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি; সিনেমা, রেডিও-র হালকা সঙ্গীতাদি, তথাকথিত বস্তুতান্ত্রিক গল্প-সাহিত্য—সব কিছুরই মাধ্যমে ইহার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছি। আর এগুলির দ্বার বালক-বৃদ্ধ-যুবা সকলেরই কাছে সমভাবে অনাবৃত। যাঁহারা যথার্থই দেশের কল্যাণ-কামী, যাঁহারা বুঝেন যে দেশের কল্যাণের জন্য চরিত্রবান, তেজবীর্যবান লোকের বিশেষ প্রয়োজন, তাঁহাদের দৃষ্টি এদিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর সেই সঙ্গে প্রয়োজন সদ্ভাবোদ্দীপক পুস্তকগুলিকে প্রথম হইতেই পাঠ্যপুস্তকের তালিকাভুক্ত করা, এবং সচ্চিন্তা ও সদালোচনা হইতে যাহাতে অন্ততঃ ইচ্ছুক বিদ্যার্থীরা বঞ্চিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা। বালকরাই যুবক হয়, এবং যুবকরাই হয় দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা। আজ-কালকার ছেলেরাই অন্যপ্রকৃতির—এ ধারণা যদি আমরা কেহ পোষণ করি, তাহার মত ভুল ধারণা আর হইতে পারে না। কোন বিশেষ যুগে সকল শিশুই অশুভ সংস্কার লইয়া জন্মায় না; বরং আমাদের দেশে শুভ সংস্কারের অরুণালোকেই অধিকাংশ জীবনে সুপ্রভাত আসে, যে সব জীবন প্রভাত হইতেই অশুভ সংস্কারের নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন থাকে, তাহার সংখ্যা খুব বেশী নয়। আমাদের আচরণ ও আমাদের সৃষ্ট পরিবেশের মাধ্যমে শিশু, বালক ও যুবকদের কোমল নমনীয় মনে আমরা অশুভ চিন্তার ছাপ ফেলিয়াই চলি—শেষে দোষ দিই

তাহাদেরই। মানুষের মন নীচের দিকে নামিতে চায় স্বাভাবিক গতিতেই, সহজে ঊর্ধ্বাভিমুখী হইতে চায় না। বিপরীত চিন্তার সুযোগ (এবং বহু ক্ষেত্রে সমর্থন) পাইলে উহার নীচে নামিবার গতিবেগ হইয়া উঠে দ্রুততর। মনে রাশি রাশি শুভচিন্তার ছাপ পড়িলে এই নিম্নাভিমুখী গতি সর্বক্ষেত্রেই অন্ততঃ কিছুটা প্রতিহত হয়, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষকে উন্নততর জীবনপথে তুলিয়া আনে—আনন্দপ্রদ, শান্তিপ্রদ, কল্যাণপ্রদ চরিত্রের অধিকারী করিয়া তুলে।

আজ গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে, কি ভাবে এগুলি করা যায়: চরিত্রবান সন্তানের জনক-জননী ও আচার্য হইবার জন্য মাতাপিতা ও শিক্ষকদের নিজ নিজ জীবনকে যথাসাধ্য সংযত ও সৎ আদর্শোজ্জ্বল করিয়া একটি শুচিশুভ্র পরিবেশ সৃষ্টি করা; শৈশব হইতেই বিদ্যার্থীদের স্বাধীন চিন্তা যথাসম্ভব অব্যাহত রাখিয়া ছোটখাট বিষয় লইয়া মনের রাশ টানিতে শিখাইবার ব্যবস্থা করা; বিদ্যার্থীদের মনে সচ্চিন্তা পরিবেশনের জন্য কতকগুলি সদ্‌গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তকের তালিকা-ভুক্ত করা ও নিয়মিতভাবে প্রতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেই সদালোচনার ব্যবস্থা করা; এবং রেডিও প্রভৃতিতে হালকা ভাবোদ্দীপক চিন্তার পরিবেশন যতদূর সম্ভব কমাইয়া যুবকদের সুদৃঢ় দেহমন ও বজ্রদৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অধিকারী করিয়া তোলার উপযোগী ভাবপ্রচারের ব্যবস্থা করা। আন্তরিক ভাবে চিন্তা করিলে উপায় নিশ্চয়ই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে এবং উহা কার্যে পরিণত করাও সম্ভব হইবে। ভারতমাতার কল্যাণ-কল্পে তাঁহার সন্তানদের চরিত্র দেবোপম করিয়া তুলিতে হইলে আমাদের ইহা অবশ্যই করিতে হইবে।

"লোভ ও লালসা বর্জন, রিপুসমূহের প্রভাব হইতে মুক্তি এবং সর্বপ্রকার দ্বেষ ও হিংসার দূরীকরণ—ইহাই প্রকৃত যজ্ঞ, ইহাই প্রকৃত পূজা।"

"যে মানুষ মোহমুক্ত নয়, সে কেবলমাত্র মৎস্য মাংস হইতে বিরতি কিম্বা নগ্ন দেহ কিম্বা মুণ্ডিত অথবা জটামণ্ডিত মস্তক, কিম্বা অমসৃণ পরিচ্ছদ, কিম্বা ভস্মাবৃতদেহ দ্বারা কিম্বা অগ্নিতে আহুতি দিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না।...ক্রোধ, মত্ততা, স্বৈরিতা, ধর্মান্ধতা, শঠতা, হিংসা, আত্মপ্রশংসা, পরগ্লানি, অহমিকা এবং মন্দ অভিপ্রায়—এই সকলকেই অশুদ্ধি বলে।"

—বুদ্ধবাণী

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

১৪ই জুন, '৯৭

আলমবাজার মঠ

ভাই গঙ্গাধর,

অদ্য তোমাকে ৫০৲ টাকার মণিঅর্ডার পাঠাইলাম। তোমরা দুই টাকা মণ করিয়া চাউল পাইয়াছ জানিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। তোমরা adult-দিগকে যে ½ সের করিয়া চাউল দিবে মনে করিয়াছ, সে উত্তম কথা। কিন্তু উহার মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া দিবে। আমার শরীর কয়েকদিন ধরিয়া জ্বর ও আমাশয় রোগগ্রস্ত। আর গত পরশ্ব দিবস বৈকালে এখানে এক অতি ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া আমাদিগের মঠের অনেক স্থান ভগ্ন ও অনেক স্থানে crack হইয়াছে। এ বাড়ী শীঘ্রই ছাড়িতে হইবে। এই কারণেও আমরা সকলে বিশেষ উদ্বিগ্ন আছি। এই ভূমিকম্পে কলিকাতা সহরের প্রায় সকল বাড়ীর কিছু না কিছু ক্ষতি হইয়াছে। ২।৫ জন লোক মারাও গিয়াছে। ৭।৮ দিন পরে তোমাকে সমস্ত যাহা যাহা করিতে হইবে…লিখিব। আমাদের এখান হইতে ২ জন…যশোহর ইত্যাদি অঞ্চলে দুর্ভিক্ষনিবারণে সাহায্যের জন্য যাইবে। যদি না যাওয়া হয়, তবে তোমাদের ওখানেই পাঠাইব। কিন্তু যতক্ষণ না আমাদের লোক যায়, ততক্ষণ আন্দুলবেড়িয়া বা অন্যত্র রিলিফ খুলিও না। এ সম্বন্ধে যাহা আবশ্যক, পরে লিখিব। খাওয়াবার কথা যাহা লিখিয়াছ, তাহা আমি চারুবাবুকেও লিখিব। যদি তিনি টাকা এই জন্য প্রদান করেন, তবেই খাওয়াইবে। নচেৎ যাহা আছে, তাহাতে তো খাওয়ার খরচ কুলাইবে না। সমুদয় পরে জানিতে পারিবে। আর সকলের কুশল। ভরসা করি, তোমরা সকলে কুশলে আছ। সকলে আমার ও এখানকার সকলের প্রণাম ভালবাসাদি জানিবে। ইতি

দাস

ব্রহ্মানন্দ

গুরবে নমঃ

৮ই জুলাই, '৯৭

আলমবাজার মঠ

ভাই গঙ্গাধর,

আমি গত পরশ্ব দিবস তোমাকে ইনসিয়র‍্যান্স করিয়া ১৫০৲ টাকা পাঠাইলাম, তুমি প্রাপ্তিমাত্র তাহা আমাকে পত্রদ্বারা জানাইবে। আর তুমি বাছিয়া বাছিয়া যাহারা যথার্থই অকর্মণ্য, কোনরূপ খাটিয়া খাইতে অক্ষম, তাহাদিগকেই চাউলাদি দিবে। আমাদের এখান হইতে একজন বোধ হয় শীঘ্রই যশোহর-খুলনার দিকে দুর্ভিক্ষনিবারণের জন্য যাইবে। আমি এখন একরূপ ভাল আছি, আর মঠস্থ সকলেও ভাল আছেন। আশা করি তোমাদেরও কুশল। আমার ও মঠস্থ সকলের প্রণাম ও ভালবাসা জানিবে। ইতি

Yours affly

Brahmananda

অমিতাভ

আনন্দ

তমসায় ঢাকা জীবনের পথে
সহসা ফেলেছো আলো,
অবাধিত ক'রে সূর্য, তোমার
প্রজ্ঞা-কিরণ ঢালো!

আমরা 'আমি'-র দীপশিখা নিয়ে
রচিয়া স্বপন ঢাকি তাই দিয়ে
সূর্য, তোমার বিচ্ছেদহীন
বিপুল আলোর রাশি ;
মহাসত্যের পটভূমিকায়
আলোছায়াময় স্বপন ছড়াই,
ফোটে দেহ-মন, বিশ্ব-নিখিল,
কত না কান্না-হাসি।

হে বুদ্ধ! তুমি সকল জীবনে
নীরব চরণ-পাতে
কতবার এসে সুমুখে দাঁড়াও
কত মঙ্গল প্রাতে ;
স্বপনের কোন পরম লগনে
সহসা ভরিয়া তোল যে জীবনে
অনিত্যতার বিস্বাদে আর
নিত্যের মহিমায়,
চকিতে তখন ভাঙ্গিয়া স্বপন
পরাণ জাগিতে চায়।

তবু কাঁপে প্রাণ—মহানির্বাণে,
'আমি'-হীন সেই বিষম বিজনে
সত্য যা তার স্বরূপ কেমন?
শান্তি সেথায় কার?—
তোমার দীপ্ত জীবনই অভয়
নিয়ে আসে বার বার।

মহাশূন্যের অজানায় গিয়ে
তুমি তো আবার আনিলে ফিরায়ে
দেবদুর্লভ হৃদয়খানিরে
বিগলিত করুণায়—
শত সূর্যের আলো-ঝলমল
শতচন্দ্রিমা-স্নেহ-সুশীতল
অন্তবিহীন আলোর উৎসে
অপরূপ মহিমায়!

দুঃস্বপনের খেলাঘরখানি
ভাঙ্গিয়া ফেলিতে যাহা
প্রয়োজন হয়, যাহা বলা যায়
ব'লে গেছ শুধু তাহা।
দেহ-মন হ'তে বাহির হইয়া
মহামুক্তির অঙ্গনে গিয়া
যে পূর্ণতায় মিশে যাই মোরা
নামরূপ-হীন হয়ে,
বাক্যমনের অতীত তাহায়
প্রকাশ করিতে মনের ভাষায়
পারে নাই কেহ, তাই ছিলে সেথা
নীরব, মৌন হয়ে।

স্বতই তো তার হবে উদ্ভাস
ছায়াগুলি মুছে ফেলো,
অবাধিত ক'রে সূর্য, তোমার
প্রজ্ঞা-কিরণ ঢালো!

পত্র-সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দ

ডক্টর তারকনাথ ঘোষ

এক

পত্র লেখার মূল উদ্দেশ্য কোনো সংবাদ জানানো। পত্রের আদিতে সম্বোধন, তারপর জ্ঞাতব্য বিষয় বা প্রশ্ন, তারপর কুশলসংবাদ বা নমস্কারাদির পর পত্র শেষ করাই পত্ররচনার আদর্শ। 'শতং বদ মা লিখ' এই মহাবাক্য স্মরণ করে অনেকে পত্রের মধ্যে যেটুকু না লিখলে নয় কেবল সেইটুকু লিখেই পত্র সমাপ্ত করেন। লিপিকুণ্ঠ ব্যক্তির সংখ্যা কম নয়। কিন্তু অনেকে অন্যভাবে সুপ্রচুর পরিমাণে লিখলেও পত্ররচনার বেলায় যেন কিছুটা কুণ্ঠা প্রকাশ করেন—অন্যত্র অজস্রতার পরিচয় দিলেও পত্রের মধ্যে তাঁরা যথাসম্ভব স্বল্পভাষী।

কিন্তু পত্র মূলতঃ সংবাদ পরিবহনের উদ্দেশ্যে কল্পিত হলেও কেবল বাইরের সংবাদই যে এর বিষয় হবে এমন কোনো কথা নেই—পত্র হৃদয়ের সংবাদও বহন করতে পারে। পত্র-রচনার ক্ষেত্রে মিতভাষীদের সংখ্যাই বেশি হলেও এমন অনেকে আছেন যাঁরা পত্রের মধ্যে উচ্ছলতার পরিচয় দেন। তাঁদের পত্র সীমিত বিষয়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, বক্তব্য বিষয়ের প্রাচুর্য তাঁদের পত্রকে দীর্ঘতর করে তোলে। এই বক্তব্য বিষয় সব সময় নিছক তথ্য নয়, পত্রলেখকের স্বকীয় ভাবনাই পত্রের কলেবর বৃদ্ধি করে। নিষ্প্রাণ লিপির মধ্য দিয়ে সেখানে একটি অন্তরের পরিচয় ফুটে ওঠে, রচনার মধ্যে সেখানে একটি ব্যক্তিসত্তা আত্মপ্রকাশ করে, পত্রের মধ্যে একটি হৃদয়ের স্পর্শ পাই।

পত্রের মধ্যে পত্ররচয়িতার কেবল হৃদয় নয়, মন বা বুদ্ধির পরিচয় ব্যক্ত হতে পারে। লেখক পত্রযোগে এমন বিষয় বিশ্লেষণ করতে পারেন যার ফলে পত্র প্রবন্ধের বিকল্প হয়ে উঠতে পারে। আত্মভাব-খ্যাপন ছাড়াও পরের সমালোচনা করা বা বক্তার আসনে অধিষ্ঠিত থেকে নীতি বা উপদেশ দেওয়াও পত্রলেখকের পক্ষে সম্ভব। বস্তুতঃ পত্রলেখক একযোগে প্রাবন্ধিক, সমালোচক, উপদেষ্টা, সাংবাদিক—সকলকে ছাপিয়ে একটি ব্যক্তিপুরুষ।

পত্রলেখক যখন তাঁর পত্রে কোনো বিষয়ের আলোচনা করেন, তখন তিনি নৈর্ব্যক্তিকভাবে কেবল তথ্যের পর তথ্য পরিবেশনই করেন না, পত্রের মধ্যে নিজের মতামত, নিজের ভালো-লাগা মন্দ-লাগাটুকুও ব্যক্ত করেন। ফলে প্রবন্ধের মধ্যে যেখানে কেবল আলোচনামাত্র থাকে, পত্রের মধ্যে সেখানে লেখকের বিশিষ্ট অভিমত তাঁর ব্যক্তি-মনের সংযোগে স্বাদুতর হয়ে উঠতে পারে। প্রবন্ধের চেয়ে পত্র অনেক হৃদ্য। প্রবন্ধ আমাদের জ্ঞানবৃত্তির কতকটা অনুশীলন ঘটায় বটে, কিন্তু পত্র আমাদের চিত্ত-বৃত্তিকে বিকশিত করে তোলে। পত্রের মধ্যে পত্ররচয়িতার যে সজীব স্পর্শ থাকে তা লিখিত বিষয়বস্তুকে কতক পরিমাণে প্রত্যক্ষ উক্তির মতো সহজগ্রাহ্য ও প্রভাবশীল করে তোলে।

স্বামী বিবেকানন্দ অবশ্যই সংযতচিত্ত পুরুষ ছিলেন; কিন্তু তাঁর ব্যক্তিসত্তার মধ্যে আত্ম-প্রকাশের জন্য প্রবল অভীপ্সা ছিল। তাঁর সমুজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব নানাভাবে আপনাকে বিচ্ছুরিত করেছে। কথোপকথন, বক্তৃতা আর গানের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন কণ্ঠযোগে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন, তেমনিই অপর দিকে প্রবন্ধ

আর পত্রে লেখনীর মধ্য দিয়ে চিত্তের ভাবনা বা হৃদয়ের আকুলতা দূরতর ক্ষেত্রে প্রসারিত করে দিতে উৎসুক হয়েছিলেন। তাঁর পত্রের সংখ্যা কম নয়, তাঁর রচনা ও বাণীর সংকলনের মধ্যে মোট পাঁচশো বাহান্নটি পত্র সংকলিত হয়েছে—এগুলির মধ্যে মূল বাংলা পত্র বা ইংরেজী পত্রের অনুবাদ দুইই আছে। স্বামীজী ফরাসী ভাষাতেও একটি পত্র রচনা করেছিলেন। তাঁর কয়েকটি সংস্কৃত ভাষায় লেখা পত্রও অনুবাদসহ এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আকারের দিক থেকে পরিমাপ করলে এই পত্রগুলি তাঁর সমগ্র রচনাবলীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ হবে।

'পত্রাবলী' থেকে বিবেকানন্দের সমগ্র ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। তাঁর চিন্তা, মতামত, বিশ্বাস, পাণ্ডিত্য—সব কিছুর পরিচয়ই পত্রগুলির মধ্যে পাওয়া সম্ভব। সব কিছু ছাপিয়ে উঠে তাঁর হৃদয়ের পরিচয় পত্রগুলির মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকের সঙ্গে হৃদয়ের সংযোগ রচনা করার একটি আকাঙ্ক্ষা বিবেকানন্দের ছিল—তাঁর বিপুল পত্রসম্ভার রচনার মূলে এটিও একটি বিশিষ্ট কারণ সন্দেহ নেই। তিনি দূরত্বকে পত্রের সাহায্যে অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন। বিশেষতঃ সুদূর আমেরিকায় থাকবার সময় আজীবন-সঙ্গী শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের সাহচর্যের জন্য তাঁর হৃদয় নিশ্চয়ই উদ্বেলিত হয়েছিল। তিনি পত্রের পর পত্র লিখে সকলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এই সব পত্রের মধ্যে তাঁর উপদেশ বা নির্দেশের অন্ত নেই, তিনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একই কালে চিন্তা করেছেন—কিন্তু তাঁর হৃদয়ের আকুলতাই তাঁকে সুপ্রচুর দীর্ঘ পত্র রচনা করতে উৎসুক করেছিল সন্দেহ নেই। এ ছাড়াও এদেশে বা পাশ্চাত্য দেশে তাঁর অগণিত শিষ্য, শিষ্যা ও সুহৃদ্ ছিলেন। তিনি বিভিন্ন পত্রের মধ্য দিয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। এই যোগাযোগ বহিরঙ্গ তথ্যনির্ভর নয়। বিবেকানন্দ তাঁর অন্তরের ভাবনা শিষ্য বা সুহৃৎ সমাজে প্রসারিত করে দিতেই উৎসুক হয়েছিলেন। পত্রের মধ্যে তিনি বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা করেছেন। বলার ভঙ্গির মধ্যেও বৈচিত্র্যের সীমা নেই।

বিবেকানন্দের পত্রাবলীতে অজস্র বিষয় স্থান পেয়েছে। যাঁদের উদ্দেশে পত্র লেখা হয়েছে তাঁদের পরিচয় অনুসারে এই পত্রগুলিকে মোটামুটিভাবে চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—(ক) শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য বা ভক্তকে লিখিত পত্র, (খ) নিজের শিষ্যমণ্ডলীকে লিখিত পত্র, (গ) পাশ্চাত্য শিষ্যস্থানীয় বা সুহৃদ্‌কে লিখিত পত্র, (ঘ) এদেশের শিষ্যস্থানীয়, সুহৃদ্ বা বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লিখিত পত্র।

দুই

শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত বা শিষ্যদের উদ্দেশে লেখা পত্রগুলির মধ্যে বিবেকানন্দের ব্যক্তি-পুরুষের পরিচয় যেভাবে ব্যক্ত হয়েছে এমন আর কোথাও নয়। বাস্তবিকই, অন্তরঙ্গ জনের কাছেই মানুষ নিজের হৃদয় উন্মুক্ত করে দিতে পারে। অপর ব্যক্তিদের কাছে (ঘনিষ্ঠ শিষ্য বাদে) তিনি যে সব পত্র লিখেছেন সেগুলির মধ্যে অনেক মূল্যবান বস্তু আছে বটে কিন্তু সেখানে পত্রলেখক আর প্রাপকের চিত্ত সর্বতোভাবে এক সুরে বেজে ওঠে নি, একটি অদৃশ্য অন্তরাল তাঁর ব্যক্তিপুরুষকে আবৃত করে রেখেছে। কিন্তু সমচিত্ত সমপ্রাণ গুরুভ্রাতাদের কাছে তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। বিশেষতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যমণ্ডলীকে লেখা পত্রের মধ্যে বক্তব্য বিষয়ের চেয়ে তাঁর হৃদয়ের ভাবনাই যেন অনেক সময় প্রবলতর হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই পত্রগুলি

যথার্থই সখার প্রতি সখার উক্তি। এগুলির মধ্যে তাঁর আনন্দ, বিষাদ, ক্রোধ, হর্ষ, ক্ষোভ সবই ফুটে উঠেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্তদিগকে লেখা পত্রগুলির মধ্যে 'রসদদার' বলরাম বসুকে লেখা কয়েকটি পত্র উল্লেখযোগ্য। এই পত্রগুলি ১৮৮৯-এর ডিসেম্বর মাস থেকে ১৮৯০-এর মার্চ মাসের মধ্যে বৈদ্যনাথ, প্রয়াগ আর প্রধানতঃ গাজীপুর থেকে লেখা হয়েছে। বেশির ভাগ পত্রেই বলরামবাবুকে 'পূজ্যপাদেষু' বলে সম্বোধন করেছেন। পত্রগুলির মধ্যে তাঁর শ্রদ্ধার পরিচয় অবশ্যই ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু তিনি প্রয়োজন-বোধে বলরামবাবুকে তিরস্কার করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। একটি পত্রের অংশ—

"সাধুদের সেবা করিয়া কি হইল বলিয়া আপসোস করিয়াছেন। কথাটা ঠিক বটে, অথচ নহে বটে। Ideal bliss-এর দিকে চাহিতে গেলে এ কথা সত্য বটে, কিন্তু যে স্থান ছাড়িয়া আসিয়াছেন সেদিকে তাকাইলেই দেখিতে পাইবেন—ছিলেন গরু, হইয়াছেন মানুষ, হইবেন দেবতা এবং ঈশ্বর। পরন্তু ঐ প্রকার 'কি হইল' 'কি হইল' অতি ভাল—উন্নতির আশাস্বরূপ, নহিলে কেহ উঠিতে পারে না। 'পাগড়ি বেঁধেই ভগবান' যে দেখে, তাহার ঐখানেই খতম। আপনার সর্বদাই যে মনে পড়ে 'কি হইল', আপনি ধন্য নিশ্চিত জানিবেন—আপনার মার নাই।"

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত'-কার মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে বিবেকানন্দ তিনখানি পত্র লিখেছিলেন, তিনটিই ইংরেজীতে লেখা। তিনটিতেই 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত'-এর প্রসঙ্গ। প্রথমটিতে তিনি শ্রীম-র উদ্যমের জন্য তাঁকে প্রশংসা করেছেন; পরবর্তীকালে লেখা পত্রদুটির মধ্যে তিনি গ্রন্থের প্রশংসা করেছেন। বিশেষতঃ শ্রীম নিজের কথা না বলে বা নিজের কল্পনার অনুরঞ্জন কিছুমাত্র না দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন চিত্রিত করেছেন, এটি তাঁর প্রশংসনীয় মৌলিকতা। বিবেকানন্দ মন্তব্য করেছেন,—

"আমাদের গুরুদেব ছিলেন সম্পূর্ণ মৌলিক; সুতরাং আমাদের প্রত্যেককেও হয় মৌলিক হতে হবে নয়তো কিছুই না। এখন আমি বুঝতে পারছি যে, কেন আমাদের মধ্যে আর কেউ এর আগে তাঁর জীবনী লিখতে চেষ্টা করে নি। এই বিরাট কাজ আপনার জন্যই পড়ে ছিল। তিনি নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে আছেন।"

গুরুভ্রাতাদিগকে লেখা পত্রগুলি অমূল্য সম্পদ। এই পত্রগুলির মধ্যে বিবেকানন্দের হৃদয়ের ভাবনা বিচিত্র আকারে পরিব্যক্ত হয়েছে। তিনি বিভিন্ন গুরুভ্রাতাকে পত্র লিখেছেন—অবশ্য রামকৃষ্ণানন্দ আর ব্রহ্মানন্দকে লেখা পত্রের সংখ্যাই বেশি; সারদানন্দকে মাত্র তিনখানি পত্র লিখেছিলেন—তাও ইংরেজীতে—এটি বিস্ময়কর বলে মনে হয়। পত্রগুলির মধ্যে এমন একটি অখণ্ড সুর আছে যে কোন্ পত্রটি কাকে লেখা সেটি বিশেষভাবে চিহ্নিত করার প্রয়োজন হয় না। প্রায় প্রত্যেকটি পত্রই সাধারণভাবে সমস্ত গুরুভ্রাতাদের উদ্দেশ করে লেখা হয়েছে। পত্রগুলি পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে মনে হয় যেন বিবেকানন্দ মঠের একটি কক্ষে বসে তাঁর অন্তরঙ্গ সখাদের কাছে নিজের হৃদয়ের কথা প্রকাশ করছেন।

বিবেকানন্দ আমেরিকা যাওয়ার আগে গুরুভ্রাতাদের যেসব পত্র লিখেছিলেন, সেগুলির মধ্যে চারটি পত্রের সন্ধান পাওয়া যায়—ঐ চারটির মধ্যে তিনটি অখণ্ডানন্দকে উদ্দেশ করে লেখা হয়েছে—একটি সারদানন্দ আর কৃপানন্দকে একসঙ্গে লেখা। অখণ্ডানন্দ তখন

নেপাল থেকে তিব্বত যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। তিব্বতের তন্ত্রাচারের প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ এদেশে তন্ত্রের নামে যে অনাচার ধর্মজগতে প্রবেশ করেছে তার নিন্দা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বুদ্ধের বুদ্ধি ও অতুলনীয় সহানুভূতির কথা স্মরণ করেছেন। শঙ্কর সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য—

"উপনিষদের উপর বুদ্ধের ধর্ম উঠেছে, তার উপর শঙ্করবাদ। কেবল শঙ্কর বুদ্ধের আশ্চর্য heart অণুমাত্র পান নাই; কেবল dry intellect—তন্ত্রের ভয়ে, mob-এর ভয়ে ফোড়া সারাতে গিয়ে হাত শুদ্ধ কেটে ফেললেন।"

আমেরিকায় গিয়ে বিবেকানন্দ গুরুভ্রাতাদের যে সব পত্র লিখেছিলেন, সেগুলির প্রথম কয়েকটিতে আমেরিকার বর্ণনাই প্রধান। আমেরিকা সম্পর্কে তাঁর ধারণা মোটামুটিভাবে এই যে, 'কলাকৌশলে এরা অদ্বিতীয়, ভোগে বিলাসে অদ্বিতীয়, পয়সা রোজগারে অদ্বিতীয়, খরচে অদ্বিতীয়।' তিনি আমেরিকার মেয়েদের প্রশংসা করেছেন। তাঁর একটি পত্রাংশ—

"অদ্ভুত তেজ আর বলের বিকাশ—কি জোর, কি কার্যকুশলতা, কি ওজস্বিতা। হাতীর মতো ঘোড়া—বড় বড় বাড়ীর মতো গাড়ী টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এইখান থেকেই স্বরু ঐ ঢোল সব। মহাশক্তির বিকাশ—এরা বামাচারী। তারই সিদ্ধি এখানে, আর কি! যাক, এদের মেয়ে দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম বাবা! আমাকে যেন বাচ্চাটির মতো ঘাটে-মাঠে দোকানে-হাটে নিয়ে যায়। সব কাজ করে—আমি তার সিকির সিকিও করতে পারি নি। এরা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, আমি এদের পুষ্যিপুত্তুর, এরা সাক্ষাৎ জগদম্বা; বাবা এদের পূজা করলে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। আরে রাম বলো, আমরা কি মানুষের মধ্যে? এই রকম মা জগদম্বা যদি ১০০০ আমাদের দেশে তৈরি করতে পারি, তবে নিশ্চিন্ত হয়ে মরব।"

বিভিন্ন পত্রে স্বদেশের দুর্গতির জন্য তাঁর পরিতাপ ব্যক্ত হয়েছে। বিশেষতঃ ধর্মের নামে যে সব অনাচার বা শোষণ সমাজে প্রচলিত বা যে সব লোকাচার সমাজের শক্তিক্ষয় করছে, সেগুলিকে তীব্রভাবে তিরস্কার করেছেন। তাঁর এই তিরস্কারের মধ্যে প্রবল মর্মপীড়া ফুটে উঠেছে। কয়েকটি পত্রের অংশ--

(ক) যে ধর্ম গরীবদের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা আবার কি ধর্ম? আমাদের কি আর ধর্ম? আমাদের 'ছুৎমার্গ', খালি 'আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না।' যে দেশের বড় বড় মাথাগুলো আজ দু'হাজার বৎসর খালি বিচার করছে,—ডান হাতে খাব, কি বাম হাতে; ডান দিক থেকে জল নেব, কি বাঁ দিক থেকে? এবং ফট্ ফট্ স্বাহা, ক্রাং ক্রুং হুঁ হুঁ করে, তাদের অধোগতি হবে না তো কার হবে?…যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশ বিশ লাখ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরীবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোনও চেষ্টা করে না, সে কি দেশ না নরক! সে ধর্ম, না পৈশাচ নৃত্য!

(খ) যদি ভাল চাও তো ঘণ্টাফণ্টাগুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণের—মানবদেহধারী হরেক মানুষের পূজা করগে—বিরাট আর স্বরাট। বিরাট রূপ এই জগৎ, তাঁর পূজা মানে তাঁর সেবা—এর নাম কর্ম; ঘণ্টার উপর চামর চড়ানো নয়, আর ভাতের থালা সামনে ধরে দশ মিনিট বসব কি আধ ঘণ্টা বসব—এ বিচারের নাম 'কর্ম' নয়, ওর নাম পাগলা-গারদ। ক্রোর

টাকা খরচ করে কাশী-বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে। এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন, তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন, তো এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন; এদিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা, বিদ্যা বিনা মারা যাচ্ছে। বোম্বাইয়ের বেনেগুলো ছারপোকার হাসপাতাল বানাচ্ছে - মানুষগুলো মরে যাক। তোদের বুদ্ধি নাই যে একথা বুঝিস—আমাদের দেশের মহা ব্যারাম—পাগলা-গারদ দেশময়।

অনেক পত্রেই বিবেকানন্দের সুগভীর মানব-প্রেম ব্যক্ত হয়েছে। মানুষের জন্য তাঁর প্রাণ চিরদিনই কেঁদেছে। তিনি অখণ্ডানন্দকে সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা বলেছেন তা স্মরণ করা যেতে পারে—

"গেরুয়া কাপড় ভোগের জন্য নহে, মহা-কার্যের নিশান—কায়মনোবাক্য জগদ্ধিতায় দিতে হবে। পড়েছ, 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃ-দেবো ভব', আমি বলি, 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খ-দেবো ভব'—দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর, ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম জানিবে।"

মানুষের সেবা সম্পর্কে বিভিন্ন নির্দেশ তাঁর পত্রে আছে। দুঃস্থের সেবা, দুর্গতের ত্রাণের যে আদর্শের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন আজ বিশ্ব-বন্দিত, বিবেকানন্দের পত্রাবলীতে সেই আদর্শের মূল আছে। তিনি বিশেষ করে শিক্ষার প্রসারের কথা বলেছেন। শিক্ষার মধ্য দিয়ে আত্ম-জাগরণ ঘটলেই জাতির অভ্যুদয় হবে এটি তিনি প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেছিলেন। এই মহৎ কাজের জন্য তিনি ধনীর দ্বারস্থ হয়ে সময় ও শক্তির অপব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

"তোরা কোমর বেঁধে লেগে যা, হুহুঙ্কারে দুনিয়া তোলপাড় করে দেব। এই ত সবে সন্ধ্যা রে ভাই! দেশে কি মানুষ আছে? ও শ্মশানপুরী। যদি lower class-দের education দিতে পার তা হলে উপায় হতে পারে। জ্ঞানবলের চেয়ে বল আর কি আছে—বিদ্যা শেখাতে পার? বড়-মানুষেরা কোন কালে কোন দেশে কার কি উপকার করেছে? সকল দেশেই বড় বড় কাজ গরীবরা করে। টাকা আসতে কতক্ষণ? মানুষ কই? দেশে কি মানুষ আছে? দেশের লোকগুলো বালক, ওদের সঙ্গে বালকের ন্যায় ব্যবহার করতে হবে। ওদের বুদ্ধিশুদ্ধি দশ বছরের মেয়ে বে করে খরচ হয়ে গেছে।"

কর্মসাধন-প্রসঙ্গে তাঁর একটি উক্তি প্রবচনবৎ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন,

"চালাকি দ্বারা কোনও মহৎ কার্য হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্যের সহায়তায় সকল কার্য সম্পন্ন হয়। তৎ কুরু পৌরুষম্।"

বিভিন্ন পত্রে তিনি মঠ সম্পর্কে বা দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে উৎসব প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিতভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। এ সব বিষয়ে তাঁর বিশিষ্ট চিন্তা ছিল, আবার খুঁটি-নাটি নানা বিষয় সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন।

বিবেকানন্দের সর্ব কর্মপ্রচেষ্টার মূলে শ্রীরাম-কৃষ্ণের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও প্রেম অন্তর্লীন ছিল। তাঁর গুরুভ্রাতাদের কাছে ঐ শ্রদ্ধা ও প্রেমের কথা স্বতন্ত্রভাবে ব্যক্ত করার প্রয়োজন অবশ্যই ছিল না। বরং শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি পাছে অনুষ্ঠান-সর্বস্ব হয়ে ওঠে এ জন্য তিনি বিভিন্ন পত্রে অনুষ্ঠানবাহুল্য ত্যাগ করতে বলেছেন।—'আমার মহাভয় ঠাকুরঘর'—বিভিন্ন পত্রে তিনি রামকৃষ্ণানন্দের 'ঘণ্টা-চামর' নিয়ে কৌতুক করেছেন। তবে শ্রীরামকৃষ্ণ ও

শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে মন্তব্য হিসাবে তাঁর পত্রের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

(ক) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন কি না জানি না, বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতি একঘেয়ে, রামকৃষ্ণ পরমহংস the latest and the most perfect —জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, লোকহিতচিকীর্ষা, উদারতার জমাট; কারুর সঙ্গে কি তাঁহার তুলনা হয়? তাঁকে যে বুঝতে পারে না তার জন্ম বৃথা। আমি তাঁর জন্মজন্মান্তরের দাস, এই আমার পরম ভাগ্য, তাঁর একটা কথা বেদবেদান্ত অপেক্ষা অনেক বড়।

(খ) মা ঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পার নি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে। শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হয় না। আমাদের দেশ অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। মা ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।

তিন

শিষ্যমণ্ডলীকে লেখা পত্রগুলির মধ্যে মাদ্রাজী শিষ্য আলাসিঙ্গা (পেরুমল) আর মার্গারেট নোবৃল্ অর্থাৎ ভগিনী নিবেদিতাকে লেখা পত্র-গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পত্রগুলি ইংরেজীতে লেখা।

বিবেকানন্দ যখন আমেরিকার চিকাগো ধর্মমহাসভায় যান, তখন তাঁর মাদ্রাজী শিষ্য আলাসিঙ্গা তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে দ্বারে দ্বারে অর্থ ভিক্ষা করে বিবেকানন্দের পাথেয়াদি সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন। আলাসিঙ্গাকে লেখা পত্রগুলির মধ্যে বিবেকানন্দ যথার্থ গুরুর মতো উপদেশ দিয়েছেন, তিরস্কার করেছেন আবার নবোদ্যমে কাজ করে যাওয়ার জন্য নির্দেশ ও উৎসাহ দিয়েছেন। অন্য কোনো ব্যক্তিকে লেখা পত্রের মধ্যে, এত নির্দেশ দেখা যায় না। সন্ন্যাসী হলেও বিবেকানন্দ যে কতটা কর্ম-সচেতন ছিলেন এই পত্রগুলিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

আলাসিঙ্গাকে লেখা পত্রগুলির মধ্যে বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যভ্রমণের বিবরণ পাওয়া যায়। আমেরিকা যাত্রার সময় তিনি সিংহলী, মালয়ী, সিঙ্গাপুরী, চীনা ও জাপানীদের বর্ণনা করেছেন। পত্র থেকেই তাঁর ভ্রমণকাহিনী লেখার সূত্রপাত। তিনি এইবারকার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে লিখলে তা অবশ্যই আকর্ষণীয় হত। চিকাগোর ধর্মমহাসভার বিবরণ দিয়ে তিনি যে পত্র লিখেছেন তা বিশেষ মূল্যবান্। তিনি অন্যত্র এই সভার ঘটনাবলী বর্ণনা করেন নি।

যথার্থ হিতৈষী গুরুর মতো বিবেকানন্দ কি ভাবে তিরস্কার করতেন ও উৎসাহ দিতেন কয়েকটি পত্রাংশ থেকে তা অনুভব করা যাবে।—

(ক) আর তোমরা কি করছ? সারা জীবন কেবল বাজে ব'কছ।···তোমরা—দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে তোমাদের জাত যায়!! এই হাজার বছরের ক্রমবর্ধমান জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বসে আছ, হাজার বছর ধরে খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধতা বিচার ক'রে শক্তিক্ষয় করছ! পৌরোহিত্য-রূপ আহাম্মকির গভীর ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খাচ্ছ! শত শত যুগের অবিরাম সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে—তোমরা কি বলো দেখি?

(খ) এ কাজ এক দিনের নয়। পথ ভীষণ কণ্টকপূর্ণ। কিন্তু পার্থসারথি আমাদের সারথি হইতেও প্রস্তুত, তাহা আমরা জানি। তাঁহার নামে, তাঁহার প্রতি অনন্ত বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের শত শত যুগ সঞ্চিত পর্বতপ্রমাণ

অনন্ত দুঃখরাশিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দাও, উহা ভস্মসাৎ হইবেই হইবে।

(গ) তোমরা সেই প্রাচীনকালের য়াহুদী জাতির মতো—জাবপাত্রে শোয়া কুকুরের মতো —নিজেরাও খাবে না, অপরকেও খেতে দেবে না। তোমাদের ধর্মভাব মোটেই নেই; রান্নাঘর হচ্ছে তোমাদের ঈশ্বর, শাস্ত্র ভাতের হাঁড়ি। আর তোমাদের শক্তির পরিচয় রাশি রাশি সন্তান-উৎপাদনে।...আমি লৌহবৎ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও হৃদয় চাই, যা কিছুতেই কম্পিত হয় না। দৃঢ়ভাবে লেগে থাকো। প্রভু তোমাদের আশীর্বাদ করুন।

নিবেদিতাকে লেখা পত্রগুলির মধ্যে ভাবগত গভীরতার আর অন্তরঙ্গতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিবেকানন্দ তাঁর এই শিষ্যাকে উপদেশ, নির্দেশ, উৎসাহ সবই দিয়েছেন—তবে তিনি খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন নি বা কোথাও তীব্র ভাষা প্রয়োগ করেন নি। ...নিবেদিতা উৎকৃষ্ট আধার হওয়ায় তাঁকে মৃদুভাবে ইঙ্গিত মাত্র করাতেই বোধ হয় বিবেকানন্দের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। বিশেষতঃ দূর দেশ থেকে আলাসিঙ্গাকে উপদেশ বা উৎসাহ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, নিবেদিতা তাঁর সান্নিধ্য কিছু বেশি পরিমাণে লাভ করায় সে প্রয়োজন হয় নি।

নিবেদিতা ভারতে আসবার আগে বিবেকানন্দ তাঁকে ইউরোপে অবস্থানকালে দুটি পত্র লিখেছিলেন। প্রথম পত্রটির অংশ—

"পবিত্রতা, ধৈর্য ও অধ্যবসায় দ্বারা সকল বিঘ্ন দূর হয়। সব বড় বড় ব্যাপার অবশ্য ধীরে ধীরে হয়ে থাকে।"

দ্বিতীয় পত্রটির প্রথম অনুচ্ছেদটি প্রণিধানযোগ্য।—

"আমার আদর্শকে বস্তুতঃ অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা চলে, আর তা এই: মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বাণী প্রচার করতে হবে এবং সর্ব কার্যে সেই দেবত্ববিকাশের পন্থা নির্ধারণ করে দিতে হবে।"

বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে যে সব উপদেশ বা নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেগুলি তাঁর অপর পত্র বা বক্তৃতাদির মধ্যেও পাওয়া যায়। কিন্তু কয়েকটি পত্রের মধ্যে তাঁর যে আত্মপরিচয় ব্যক্ত হয়েছে, তা অন্যত্র পাওয়া যায় না। কয়েকটি পত্র থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

(ক) লোকালয় থেকে বহু দূরে—নিভৃতে নীরবে পুঁথিপত্র নিয়ে পড়ে থাকার সংস্কার নিয়েই আমি জন্মেছি, কিন্তু মায়ের ইচ্ছা অন্যরূপ; তবু সংস্কারের অনুবৃত্তি চলেছে।

(খ) আমার ভালবাসা একান্তই আমার আপনার জিনিস, আবার প্রয়োজন হ'লে—বুদ্ধদেব যেমন বলতেন, 'বহুজনহিতায়, বহুজন-সুখায়' তেমনি আমি নিজ হস্তেই আমার হৃদয়কে উৎপাটিত করতে পারি।

(গ) মোটের উপর আমার শরীরের জন্য বিশেষ উদ্বেগের কোন কারণ আছে ব'লে মনে করি না। এ-জাতীয় স্নায়ুপ্রধান ধাতের শরীর কখন বা মহাসঙ্গীত সৃষ্টির উপযোগী যন্ত্রস্বরূপ হয়, আবার কখন বা অন্ধকারে কেঁদে মরে।

বিবেকানন্দ তাঁর 'শিষ্য' শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে দুটি পত্র সংস্কৃতে লিখেছিলেন, স্বামী শুদ্ধানন্দকে লেখা পত্রগুলির মধ্যে একটি সংস্কৃতে লেখা। এইভাবে সংস্কৃতে পত্র লেখা তাঁর বৈচিত্র্য-পিপাসার পরিচায়ক সন্দেহ নেই।

হরিপদ মিত্র, ইন্দুমতী মিত্র, মৃণালিনী বসু, খেতড়ির রাজা অজিত সিংহ প্রভৃতি গৃহী শিষ্যদিগকে লেখা পত্রের মধ্যে অনেক তথ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে

বিবেকানন্দের একটি সস্নেহ ভাব ফুটে উঠেছে। মৃণালিনী বসুকে লেখা দুটি পত্রের মধ্যে ধর্ম আর সমাজ সম্পর্কে বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা আছে। মাদ্রাজী শিষ্য কিডি অর্থাৎ সিঙ্গারভেলু মুদালিয়ারকে লেখা পত্রগুলির মধ্যে একটিতে বিবেকানন্দ শিক্ষা আর ধর্মের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা উদ্ধৃতির যোগ্য —

১। "শিক্ষা হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বর্তমান, তারই প্রকাশ।"

২। "ধর্ম হচ্ছে মানুষের ভিতর যে ব্রহ্মত্ব প্রথম থেকেই বর্তমান, তারই প্রকাশ।"

চার

ইংলণ্ড আর আমেরিকায় অবস্থান করবার সময় বিভিন্ন নরনারীর সঙ্গে বিবেকানন্দের পরিচয় হয়েছিল। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্য বা শিষ্যা না হলেও ভক্ত ছিলেন, অনেকেই তাঁর অনুরাগী সুহৃদ ছিলেন। বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যদেশে অবস্থানকালে এঁদের অনেকগুলি পত্র লিখেছিলেন; এদেশে ফিরে আসবার পরও তিনি তাঁদের অনেকের সঙ্গে পত্রের মধ্য দিয়ে সংযোগ রক্ষা করেছিলেন।

বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যদেশীয়দের মধ্যে যাঁদের পত্র লিখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ই. টি. স্টার্ডি, জন হেনরী রাইট, মিসেস ওলি বুল, জোসেফাইন ম্যাকলাউড, মিসেস লেগেট, মিসেস হেল, হেল ভগিনীগণ, ইসাবেল ম্যাক্‌কিণ্ডলি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই পত্রগুলির মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। বিবেকানন্দকে বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছে। কোথাও বা তিনি শিক্ষাগুরু, কোথাও বা কল্যাণকামী বন্ধু আবার কোথাও বা পরিচিত ব্যক্তিমাত্র। এই পত্রগুলির মধ্যে কোথাও বা অন্তরঙ্গতার পরিচয় পাওয়া যায়, কোথাও বা ধর্মাচরণ বা ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত উপদেশ বা আলোচনা আছে; আবার ভদ্রতাসূচক মামুলি পত্রও দেখা যায়। গুরুভ্রাতা বা শিষ্যদিগকে লেখা পত্রের মধ্যে তিনি যে ভাবে হৃদয় উন্মোচন করেছেন, এই পত্রগুলির মধ্যে সেই ধরনের অন্তরঙ্গ সুর নেই বটে, কিন্তু বিবেকানন্দ এখানেও অকুণ্ঠচিত্তে আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন পত্রের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁর চিন্তার পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি তত্ত্বগত কোনো জটিল বিষয় সরলভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

হেল ভগিনীবৃন্দ, মিসেস ওলি বুল আর জোসেফাইন ম্যাকলাউডকে লেখা পত্রগুলির মধ্যে বিবেকানন্দের জীবনেতিহাসের অনেক উপাদান আছে। বিশেষতঃ তিনি হেল ভগিনীদের যে সব পত্র লিখেছিলেন, সেগুলির মধ্যে বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ বা বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা আছে—অনেক পত্রে তিনি ব্যক্তিগত মনোভাবও প্রকাশ করেছেন। আমেরিকা থেকে ফেরবার পর আলমোড়া থেকে মেরী হেলকে লেখা একটি পত্রের অংশ —

"আমার নিজের মুক্তির ইচ্ছা চলে গেছে। আমি সাংসারিক সুখের প্রার্থনা কখনও করিনি। আমি দেখতে চাই যে, আমার যন্ত্রটা বেশ প্রবলভাবে চালু হয়ে গেছে; আর এটা যখন নিশ্চয় বুঝব যে, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে অন্ততঃ ভারতে এমন একটা যন্ত্র চালিয়ে গেলাম, যাকে কোনো শক্তি দাবাতে পারবে না, তখন ভবিষ্যতের চিন্তা ছেড়ে আমি ঘুমবো। আর নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে ভগবান্ বিদ্যমান এবং একমাত্র যে ভগবানে আমি বিশ্বাসী, সেই ভগবানের পূজার জন্য যেন আমি বার বার জন্মগ্রহণ করি এবং সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি; আর সর্বোপরি আমার উপাস্য পাপী-নারায়ণ, তাপী-

নারায়ণ, সর্বজাতির দরিদ্র নারায়ণ! এরাই বিশেষভাবে আমার আরাধ্য।"

মিসেস বুল, জোসেফাইন ম্যাকলাউড, ইসাবেল ম্যাক্‌কিণ্ডলি, ই. টি. স্টার্ডি প্রভৃতিকে লেখা পত্রের মধ্যে অনেক শিক্ষাপ্রদ বিষয় আছে। বিবেকানন্দ অনেক জায়গায় ধর্মদর্শন সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। পাশ্চাত্য দর্শনের সঙ্গে প্রাচ্য দর্শনের সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের বিবরণও কোনো কোনো পত্রে ব্যক্ত হয়েছে। দুই একটি পত্রে দর্শনের তত্ত্বগুলি সহজভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা আছে। এই ধরনের লেখা কয়েকটি পত্রের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

(ক) প্রত্যেক জীবাত্মাই এক একটা নক্ষত্র-স্বরূপ, আর এই নক্ষত্ররাজি ঈশ্বররূপ সেই অনন্ত নির্মল নীল আকাশে বিন্যস্ত রয়েছে। সেই ঈশ্বরই প্রত্যেক জীবাত্মার মূলস্বরূপ, তিনি প্রত্যেকের যথার্থ স্বরূপ, প্রত্যেকের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব তিনিই। কতকগুলি জীবাত্মারূপ তারকা—যাঁরা আমাদের দিগন্তের বাইরে চলে গেছেন, তাঁদের সন্ধানেই ধর্ম জিনিসটার আরম্ভ; আর এই অনুসন্ধান সমাপ্ত হ'ল—যখন তাঁদের সকলকেই ভগবানের মধ্যে পাওয়া গেল এবং আমরা নিজেদেরও যখন তাঁর মধ্যে পেলাম।

(খ) চাই পূর্ণ সরলতা, পবিত্রতা, বিরাট বুদ্ধি এবং সর্বজয়ী ইচ্ছাশক্তি। এই সকল গুণসম্পন্ন মুষ্টিমেয় লোক যদি কাজে লাগে, তবে দুনিয়া ওলটপালট হইয়া যায়।

(গ) আত্মা স্বভাবতঃ জ্ঞাতা নহেন। 'সচ্চিদানন্দ'-সংজ্ঞায় তাঁহাকে আংশিকভাবেই প্রকাশ করা হয় মাত্র, 'নেতি নেতি' সংজ্ঞাই তাঁহার স্বরূপ যথাযথ বর্ণনা করে। শোপেনহাওয়ার তাঁহার 'ইচ্ছাবাদ' বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। বাসনা, তৃষ্ণা বা তঞ্হা (পালি) প্রভৃতি শব্দেও ঐ ভাবটিই প্রকাশিত হইয়াছে। আমরাও ইহা স্বীকার করি যে, বাসনাই সর্ববিধ অভিব্যক্তির কারণ এবং ইহাই কার্যরূপে পরিণত হয়। কিন্তু যাহাই 'হেতু' বা 'কারণ', তাহাই সেই (সগুণ) ব্রহ্ম এবং মায়া—এই দুইয়ের সংমিশ্রণে উদ্ভূত। এমন কি 'জ্ঞান'ও একটি যৌগিক পদার্থ বলিয়া অদ্বৈতবস্তু হইতে একটু স্বতন্ত্র। তবে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সর্বপ্রকার বাসনা হইতে উহা নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ এবং অদ্বিতীয়ের নিকটতম বস্তু। সেই অদ্বৈত-তত্ত্ব প্রথমে জ্ঞান এবং তারপর ইচ্ছার সমষ্টিরূপে প্রতিভাত হন।

(ঘ) জীব-সমষ্টিকে নিয়েই ঈশ্বর; মানব-দেহের প্রত্যেক কোষের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকলেও দেহ যেমন একটি অখণ্ড বস্তু, ঈশ্বরও ঠিক তেমন একজন ব্যক্তি। সমষ্টিই ঈশ্বর এবং ব্যষ্টি বা অংশই জীব বা আত্মা। ঈশ্বরের অস্তিত্ব জীবের অস্তিত্বের ওপর নির্ভর করছে, দেহ যেমন কোষের ওপর নির্ভর করে; বিপরীতও সত্য। জীবও ঈশ্বরের অস্তিত্ব পরস্পরসাপেক্ষ; একজন যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ অন্যকেও থাকতে হবে। ...ব্রহ্ম এই উভয়ের অতীত, কিন্তু কোনো অবস্থা-বিশেষ নহেন। ব্রহ্মই একমাত্র অদ্বৈতবস্তু; তিনি বহুবস্তু-সম্ভূত নহেন। এই সর্বব্যাপী তত্ত্বই দেহকোষ থেকে ঈশ্বর পর্যন্ত সর্বত্র অনুস্যূত, এবং একে বাদ দিয়ে কেউ থাকতে পারে না। যা কিছু সত্য, তা এই ব্রহ্মতত্ত্ব ভিন্ন আর কিছু নয়।

(ঙ) নীতির ব্যাপারেও ক্রমোন্নতির মাত্রা আছে, এই ভাবটি ধরতে পারলেই আর সব স্পষ্ট হয়ে যাবে। একটু কম সংসারিত্ব, একটু কম প্রতিকার, একটু কম হিংসার মধ্য দিয়ে আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে বৈরাগ্য, অপ্রতিকার, অহিংসা প্রভৃতি আদর্শে উপনীত হতে হবে।

এই আদর্শকে সর্বদা চোখের সামনে রেখে তার দিকে একটু একটু করে এগিয়ে যান। প্রতিকার ছাড়া, হিংসা ছাড়া, বাসনা ছাড়া কেউ সংসারে বাস করতে পারে না। জগৎ এখনও সে অবস্থায় আসেনি, যখন ঐ আদর্শকে সমাজে রূপায়িত করতে পারা যায়। অশুভগুলির মধ্য দিয়ে জগতের যে অগ্রগতি, তা তাকে ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে আদর্শের উপযুক্ত করে তুলছে।

পাঁচ

এদেশের বিভিন্ন অনুরাগীদের লেখা পত্রে বিবেকানন্দের সমাজচিন্তা, বিশেষতঃ তাঁর জাতি-গঠনের আদর্শ ব্যক্ত হয়েছে। লালা গোবিন্দ সহায়, হরিদাস বিহারীদাস দেশাই, ডাঃ নঞ্জুণ্ড রাও, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, স্যর এস. সুব্রহ্মণ্য আয়ার, রাও বাহাদুর নরসিংহা-চারিয়া, ভারতী-সম্পাদিকা সরলা দেবীকে লেখাপত্রগুলি ভারতবর্ষের সমাজ, জীবনধারা আর জনসেবার পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁর বিভিন্ন অভিমতের পরিচায়ক হিসাবে বিশেষ মূল্যবান সন্দেহ নাই। স্বদেশের জন্য তাঁর কী গভীর প্রেম ছিল, তিনি কী ভাবে নিপীড়িত জনগণকে তথা সমগ্র ভারতবর্ষকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন, এই সব পত্রের বহু অংশে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতী-সম্পাদিকা সরলা দেবীকে লেখা একটি পত্রের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। বিবেকানন্দ লিখেছেন—

"প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে জাতির মধ্যে জন-সাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের যে সর্বনাশ হইয়াছে, তাহার মূল কারণ ঐটি—রাজ্যশাসন ও দম্ভবলে দেশের সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ করা। যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয় তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়া। আজ অর্ধশতাব্দী ধরিয়া সমাজসংস্কারের ধুম উঠিয়াছে। দশবৎসর যাবৎ ভারতের নানাস্থল বিচরণ করিলাম, সমাজসংস্কার-সভায় দেশ পরিপূর্ণ। কিন্তু যাহাদের রুধিরশোষণের দ্বারা 'ভদ্রলোক' নামে প্রথিত ব্যক্তিরা 'ভদ্রলোক' হইয়াছেন এবং রহিতেছেন, তাহাদের জন্য একটি সভাও দেখিলাম না! মুসলমান কয়জন সিপাহী আনিয়াছিল? ইংরেজ কয়জন আছে? ছ-টাকার জন্য নিজের পিতা-ভ্রাতার গলা কাটিতে পারে এমন লক্ষ লক্ষ লোক ভারত ছাড়া কোথায় পাওয়া যায়?···

কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা। ইউরোপের বহু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রেরও সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরিবদের কথা মনে পড়িয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হইল? শিক্ষা—জবাব পাইলাম। শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয়-বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিতেছেন; আর আমাদের—ক্রমেই তিনি সঙ্কুচিত হচ্ছেন।"

ভারতের পুনরভ্যুত্থানের জন্য যে পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে হবে, বিবেকানন্দ তা স্পষ্টভাবে বলেছিলেন। তাঁর দুটি পত্রের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে।—

(ক) এ দেশের সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি এবং সব কিছু দেখিতেছি, এবং তাহার ফলে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে একটি মাত্র দেশ আছে, যেখানে মানুষ—ধর্ম কি বস্তু তাহা বোঝে—সে দেশ হইল ভারতবর্ষ। হিন্দুদিগের সকল দোষত্রুটি সত্ত্বেও তাহারা নৈতিক চরিত্রে ও আধ্যাত্মি-কতায় অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বহু উর্ধ্বে; আর

তাহার নিঃস্বার্থ সন্তানগণের যথাযোগ্য যত্ন চেষ্টা ও উদ্যমের দ্বারা পাশ্চাত্যের কর্মৈষণা ও তেজস্বিতার কিছু উপাদান হিন্দুদের শান্ত গুণাবলীর সহিত মিলিত করিলে—এতাবৎ পৃথিবীতে যত প্রকার মানুষ দেখা গিয়াছে তদপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট ধরনের মানুষ আবির্ভূত হইবে।

(খ) আদান-প্রদানই প্রকৃতির নিয়ম; ভারতকে যদি আবার উঠিতে হয়, তবে তাহাকে নিজ ঐশ্বর্যভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া পৃথিবীর সমুদয় জাতির ভিতর ছড়াইয়া দিতে হইবে এবং পরিবর্তে অপরে যাহা কিছু দেয়, তাহাই গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

মহম্মদ সর্ফরাজ হোসেনকে লিখিত একটি পত্রে বিবেকানন্দের ধর্মসমন্বয় সম্পর্কে একটি বৈপ্লবিক চিন্তা ব্যক্ত হয়েছে। তিনি বলেছেন,

"আমাদের দৃঢ় ধারণা যে, বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্ম-পরিণত ইসলাম-ধর্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানব-সাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই—যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরানও নাই; অথচ বেদ, বাইবেল ও কোরানের সমন্বয় দ্বারাই ইহা করিতে হইবে। মানবকে শিখাইতে হইবে যে, সকল ধর্ম 'একত্বরূপ সেই একধর্মে'রই বিবিধ প্রকাশ মাত্র, সুতরাং যাহার পক্ষে যেটি সর্বাধিক উপযোগী সেইটিকেই সে বাছিয়া লইতে পারে।

আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলামধর্মরূপ এই দুই মহান্ মতের সমন্বয়ই—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ—একমাত্র আশা।"

সার্থকতা

শ্রীউমাপদ নাথ

জীবন বিচিত্র হোক ক্ষতি নেই, সর্ব পরিচয়
একসূত্রে সুগ্রথিত—এই যদি সদা সত্য হয়,
জীবন জীবন তবে। অন্যথায় দিনাঙ্কের যোগ:
সে যোগে সংযোগ নেই, সে যে এক প্রাণান্ত দুর্ভোগ
জীবনে যে জ্যোতির্ময় স্বাগ্রহে এসেছে করুণায়—
কোন এক শুভক্ষণে প্রণাম রেখেছি যাঁর পায়,
সর্বকর্মে সর্বধ্যানে মধ্যবিন্দু করি যেন তাঁরে—
আমার প্রতিটি দিন আসে যাঁর দানের আকারে।
ধ্যানের চন্দনে আর কর্মধূপে সুরভিত করি
জীবনের দিনগুলি সবই যদি সমর্পিতে পারি
তাঁরই পাদপীঠতলে; যদি একই বন্দনার সুর
বাজে সর্ব ছন্দে মোর, সর্ব কর্মে শান্ত, সুমধুর,
সহস্র বৈচিত্র্য নিয়ে জীবন সার্থক, পূর্ণ তবে—
অন্যথায় শতছিন্ন, শৃঙ্খলীন, অর্থহীন হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকে সমন্বয়

ডক্টর রমেশ দাশ

যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি তাঁরা অনুক্ষণ মধু-সমুদ্রে অবগাহন করেন। বিশ্বচরাচর তাঁদের কাছে মধুময়; কারণ বিশ্বের সঙ্গে তাঁরা একাত্ম হয়েছেন, বিশ্বাত্মার সঙ্গে তাঁদের আত্মার আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কবির ভাষায়,

"বিশ্বের নিশ্বাস লাগি' জীবন-কুহরে,
মঙ্গল-আনন্দ-ধ্বনি বাজে।"

বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের কোন কিছুই তাঁদের থেকে দূরে নয়। তাঁরা অনুভব করেন বৃহত্তম নক্ষত্র হতে ক্ষুদ্রতম তৃণখণ্ডটি পর্যন্ত "কেহ নহে নহে দূর, আমারি শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর।" চরাচর পরিব্যাপ্ত করে অবিরাম যে বিচিত্র সুরলহরী উচ্ছলিত হচ্ছে, তাঁরা তার ঐকতানের, সমন্বয়ের সন্ধানটি পেয়ে গেছেন।

সকলের সঙ্গে সমন্বিত হতে পারলেই জগৎ মধুময় হয়ে ওঠে। তখন শুধু আলোই মধুর লাগে না, অন্ধকারও মধুর হয়ে ওঠে। শুধু স্বাস্থ্যই উপভোগ্য হয় না, ব্যাধিও উপভোগ্য হয়। যখন বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতা সম্পূর্ণ হয় তখন ভাল-মন্দ, আলো-আঁধার, সুন্দর-অসুন্দরের সমস্ত বৈষম্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে বিশ্ব-চরাচর এক অবাধ আনন্দ, অখণ্ড অমিয়রূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। তখন আর কাউকেই, কোন কিছুকেই বর্জনীয় মনে হয় না, সকলকেই বরণীয় মনে হয়।

বিশ্বাত্মার সঙ্গে একাত্মতালাভের এক উদগ্র ব্যাকুলতা আমরা দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের "বসুন্ধরা" কবিতায়—

"বিদারিয়া
এ বক্ষপঞ্জর, টুটিয়া পাষাণবন্ধ
সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার—হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া,
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া
শিহরিয়া সচকিয়া আলোকে পুলকে,
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে।
* * *
ইচ্ছা করে, বার বার মিটাইতে সাধ
পান করি বিশ্বের সকল পাত্র হতে
আনন্দমদিরাধারা নব নব স্রোতে।"

শ্রেষ্ঠ সাধকের জীবনে এক অপূর্ব অনুভূতি ঘটে থাকে। বিশ্বের সব কিছুর সঙ্গে তাঁরা নিজের একাত্মতা অনুভব করেন। এই অনুভূতি লাভ করেই তাঁরা বলেছেন, "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি", চরম-সত্য এক, লোকে তাকে বিচিত্ররূপে দর্শন করে, পণ্ডিতেরা তাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণনা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাজীবন এই একাত্মতাবোধের ভিত্তিতে সমন্বয়ের একটি অপূর্ব উদাহরণ। বিভিন্ন ধর্মপথে চলে সিদ্ধিলাভ করে তিনি ঘোষণা করেছেন—"যত মত তত পথ"। একই পুকুরের একই জল, কেউ বলছে—water, কেউ বলছে পানি, কেউ বা জল। সর্বভূতে যিনি একই সত্তাকে প্রত্যক্ষ করেন, ভেদ-দর্শন তাঁর পক্ষে অসম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কুকুরের সঙ্গে অকুণ্ঠচিত্তে উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করেছেন, নির্বিকার

চিত্তে নিজ হস্তে অশুচি স্থান পরিষ্কার করেছেন। ধনী-দরিদ্র, পাপী-পুণ্যবান সকলকেই দেখেছেন

অভেদ-উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয়-সাধনই যথার্থ ধর্ম। তা-ই ধর্ম যা ধারণ করে; সমন্বয়ই ধারণ করে। পাপড়ির সমন্বয়েই কুসুমের অস্তিত্ব। সকলের সঙ্গে নিজেকে সমন্বিত করাই মানুষের ধর্ম। শ্রীরামকৃষ্ণের দৈব জীবন সেই সমন্বয়েরই অদৃষ্টপূর্ব দৃষ্টান্ত, তাঁর উপদেশ সেই সমন্বয়েরই বাণী।
গীতায় আছে,

"সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥"

যিনি নিজের মধ্যে সকলকে এবং সর্বভূতে নিজেকে দর্শন করেন, তাঁর চিত্তে সকলের জন্য প্রেমের তুফান বয়ে যায়। এই একাত্মতা-বোধের একটি অপূর্ব উদাহরণ দেখতে পাই শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে। একদিন গঙ্গাতীরে বসে আছেন তিনি; গঙ্গার বুকে একটি নৌকায় দুজন মাঝির মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল—একজন অপরজনের পিঠের ওপর সজোরে এক চাপড় মারল। মাঝির পিঠে পাঁচটা আঙ্গুলের দাগ ফুটে উঠল। দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলেন; দেখা গেল তাঁর পিঠেও ফুলে উঠেছে, পাঁচটা আঙ্গুলের দাগ সেখানে স্পষ্ট।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী সহানুভূতির—প্রেমের বাণী। একই প্রেমময়কে তিনি দেখেছেন এবং দেখতে বলেছেন নিজের ও সকলের মধ্যে: , যত্র জীব, তত্র শিব—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা কর।

ধর্ম কল্পনা-বিলাস নয়, ধর্ম আচরণীয়। প্রকৃত ধর্ম মানুষকে কাপুরুষ করে না, অলস নিষ্কর্মা করে না; প্রকৃত ধর্ম মানুষকে উদ্যমশীল, বলিষ্ঠ, তেজস্বী, নির্ভীক, কর্তব্যপরায়ণ করে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃপ্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াবার প্রেরণা দান করে। তাই আমরা দেখি শ্রীরামচন্দ্র রক্ষ-শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিরত, শ্রীকৃষ্ণ অধর্মের বিপক্ষে প্রচণ্ডভাবে সক্রিয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন—যিনি রাম, যিনি কৃষ্ণ, তিনিই রামকৃষ্ণ। শ্রীরামচন্দ্রের শিক্ষা সার্থকতা লাভ করেছিল তদীয় ভক্ত মহাবীরের চরিত্রে; শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা মূর্ত হয়েছিল তাঁর শিষ্য-সখা অর্জুনের চরিত্রে। অনুরূপ ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা পরিণতি লাভ করেছিল বিশ্বের বিস্ময় বিবেকানন্দ-চরিত্রে—কুসুমের চেয়েও কোমল অথচ বজ্রের চেয়েও কঠোর যে চরিত্র-বলে তিনি সিংহ-বিক্রমে অন্যায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন, বাধা-বিপত্তির দুর্যোগে হিমালয়ের মত চিরউন্নত-শির, অটল থাকতেন।

প্রকৃত ধর্মজীবন জ্ঞান, কর্ম এবং ভক্তির সমন্বয়ে মহিমময়। প্রকৃত জ্ঞান মানুষকে প্রেমিক এবং জগৎকল্যাণ-সাধনে সক্রিয় করে। প্রকৃত ভক্তি জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং কর্তব্যকর্মের মধ্যে মঞ্জরিত। প্রকৃত কর্মের উৎস জ্ঞান-ভিত্তিক ভক্তি। তাই যিনি শ্রেষ্ঠ যোগী তিনি জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম—এই ত্রিবিধ যোগেই সিদ্ধ। রামকৃষ্ণ-চরিত্রে এই তিনেরই অপূর্ব সমন্বয় সংসাধিত হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা—অদ্বৈত জ্ঞান অর্জন কর। সেই জ্ঞান তোমাকে সর্বভূতের সঙ্গে সমন্বিত করবে, তোমার চিত্ত-শতদলকে পূর্ণপ্রস্ফুটিত করবে; তখন ভক্তিপরিমল সর্বভূতে অবস্থিত প্রেমময়ের উদ্দেশে ছড়িয়ে পড়বে চতুর্দিকে, দিক্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হবে সে স্বর্গীয় প্রেম-সৌরভ। সংসার ত্যাগ করে অরণ্যবাসী না হয়েও প্রকৃত ধর্ম লাভ করা যায়; সংসারে থেকে তাঁরই পূজা করছি ভেবে নিজ নিজ কর্তব্য কর্ম করে গেলেই হল; সকলের মধ্যে তিনিই রয়েছেন, মানুষের সেবায় তাঁরই পূজা হয়, একথা যেন ভুল না হয়। তাহলেই প্রকৃত ধর্ম লাভ করতে পারব আমরা।

মহাকাল

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিরেতে শোভিছে পতিতপাবনী
কণ্ঠেতে কালকূট
তুষারধবল নগ্ন শরীর
রক্তিম করপুট।
নাচে ভূতনাথ তাথৈ তাথৈ
মুখে মন্ত্রিত মাভৈঃ মাভৈঃ
ভালমন্দের চিতার ভস্মে
পিঙ্গল জটাজুট।
কালের অতীত নাচে মহাকাল
ব্যোমকেশ অবধূত—
জ্ঞানের আগুন জ্বলিছে ললাটে
পিঙ্গল জটাজুট।

অনির্বচনীয়

শ্রীশিবশম্ভু সরকার

বিশ্ব তোমা দেয় নতি, বলে, 'লোকগুরু'।
তোমার আসনতলে অন্তরের চরু
রেখে যায় ভক্তি-ভরে। তপ্ত অশ্রুজল
নিশির আঁধার-ভরা শিশির সম্বল
সঁপে দেয়, কাঁদে, কহে,—আনো সুপ্রভাত
হে মহান্, বরণীয়, ওগো বিশ্ব-তাত!
চোখের আলোর পারে মনের আলোকে
জীবনে তুলিতে দাও নির্মোহ পুলকে।

* * *

জ্ঞানী কহে, স্ফুট নেত্রে, তুমি মহাজ্ঞান
দ্বৈতের অতীত লোকে দিয়েছ সন্ধান।
কর্মী কহে, জীবনের রহস্যের ভেদ
করেছ হে মহাশিব, এনেছ নির্বেদ।
আমি কহি, তুমি শুধু অনির্বচনীয়—
অশান্ত এ মরলোকে প্রশান্তি, অমিয়!

সর্বজনীন শিক্ষায় প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী

(৫) ভারতীয় সংস্কৃতিতে সংস্কৃতের স্থান :

বিশ্বের সকল দেশেরই শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাচীন ভাষার প্রয়োজন সাধারণভাবে আলোচনা ক'রে এখন ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। বঙ্গ-ভারতের প্রাচীনতম এবং সমৃদ্ধতম ভাষা হচ্ছে সংস্কৃত। অখণ্ড ভারতের সনাতন সংস্কৃতির চিরন্তনী ধাত্রী এই মধুময়ী দেবভাষা। উনবিংশ শতকে বাংলার নবজাগরণের ক্ষেত্রে অন্যতম শিক্ষানেতা বিদগ্ধ বৈদেশিক মনীষী স্যর হোরেস্ হেমান্ উইলসনের স্বরচিত সংস্কৃত-প্রশস্তিটি প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে।—

"ন জানে বিদ্যতে কিং তদ্ মাধুর্যমত্র সংস্কৃতে।
সর্বদৈব সমুন্মত্তা যেন বৈদেশিকা বয়ম্॥
যাবদ্ ভারতবর্ষং স্যাদ্ যাবদ্ বিন্ধ্য-হিমাচলৌ।
যাবদ্ গঙ্গা চ গোদা চ তাবদেব হি সংস্কৃতম্॥"

প্রতীচ্য জগতে বর্তমানে প্রাচীন ভাষা লাতিনের যে প্রভাব, ভারতবর্ষের বর্তমান জীবনে প্রাচীন ভাষা সংস্কৃতের প্রভাব তার চেয়ে অনেক বেশী। আমাদের মাতৃভাষার বারো আনা শব্দই সংস্কৃত; ভাবও সংস্কৃত-ভাষামূলক। উদাহরণরূপে রবীন্দ্রসংগীতের একটি অংশ উদ্ধৃত করা যায়—

"অয়ি ভুবন-মন-মোহিনি
অয়ি নির্মল-সূর্য-করোজ্জ্বল-ধরণি
জনক-জননী-জননি।
নীলসিন্ধু-জলধৌত-চরণতল
অনিল-বিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল
অম্বর-চুম্বিত-ভাল-হিমাচল-
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী॥"

এই শ্রুতি-মধুর ভাবসমৃদ্ধ বাংলা কবিতাটি একটি বিশুদ্ধ সংস্কৃত বাক্যও বলা চলে। প্রতিটি ভারতীয় তার ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষ্যে নিত্যই কিছু কিছু সংস্কৃত বাক্য পাঠ এবং শ্রবণ করেন। এই ভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সংস্কৃতের ব্যবহার নানা রূপে এখনো বর্তমান। লাতিনের কিন্তু এই রকম নিবিড় সম্পর্ক বর্তমানের প্রতীচ্য জীবনের সঙ্গে নেই বললেই চলে। তাই, লাতিনের মত সংস্কৃত আমাদের জীবনে মৃতভাষা কখনও নয়; বরঞ্চ নিত্য ব্যবহারের দ্বারা সঞ্জীবিত। সুতরাং এই দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজন অধিকতর ভাবে স্বীকরণীয়।

আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির চিরকালের বাহন এই সংস্কৃত ভাষা। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত ফরাসী মনীষী ডাঃ লুই রেণোর কথাটি স্মরণ করা যেতে পারে।—

"There is not a living culture without a living tradition. If India is beloved and cherished among the elite of the West, it is on account of her traditional culture. And this culture is embedded above all in the treasures of Sanskrit. Sanskrit and India are inseparably connected inspite of all the transitory harangues of the politicians."

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, চিন্তাশীল মনীষী ৺ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই প্রসঙ্গে দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন—

"Sanskrit is the language of Indian culture and inspiration, the language in

which all her past greatness, her rich thought and her spiritual aspirations are enshrined....Sanskrit has not only been the treasure-house of our past knowledge and achievements in the realm of thought and art, but it has also been the principal vehicle of our nation's aspirations and cultural traditions, besides being the source and inspirations of India's modern languages. For many centuries in the past Sanskrit provided the principal basis of the Unity of India. In that hoary past the whole country had more or less a common pattern of education, common rituals and common beliefs. It was Sanskrit that provided a common medium of expression and of literary effort."

মানবসভ্যতার অরুণোদয়ে মনীষা-সূর্যের প্রথম প্রকাশকে বিধৃত ক'রে রেখেছে সংস্কৃত ভাষা। সেই সুপ্রাচীন যুগে জ্ঞানসাধনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতীয় মনীষা যে অতুলনীয় ফসল ফলিয়েছিল, সংস্কৃত ভাষাই বর্তমান উত্তরাধিকারীদের নিকট সেই ফসল বহন ক'রে এনেছে। এতো বিপুল এবং বিচিত্র সৃষ্টি সংস্কৃতের মত আর কোনো ভাষায় হয়নি। জ্ঞানের সকল ধারাই এখানে পরিপুষ্ট হয়েছিল। ভারতবন্ধু, বিখ্যাত মনীষী আচার্য ম্যাক্স্‌মূলারের অভিমত এই বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য।—

"Whatever sphere of the human mind you may select for your special study, whether it be language or religion or mythology or philosophy whether it be laws or customs, primitive art or primitive science, everywhere you have to go to India, whether you like it or not, because some of the most valuable and instructive materials in the history of man are treasured up in India and in India only." (India: what it can teach us—Max Muller, P. 15)

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভারতীয় আইনশাস্ত্র সম্বন্ধে পোল্যাণ্ডের জনৈক বিশিষ্ট আইনজ্ঞ বলেছেন—

"None can be compared with the Indian laws in exactness and versatility. I believe that no book so competent as Kautilya's Arthasastra was published in ancient times. No work on politics, administration, and law describes local conditions so well. This work alone is enough to invite the study of ancient India and to draw a man to this country for ever."

আবার তুলনামূলক ব্যাকরণ, ভাষাবিজ্ঞান, তর্কবিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র, অলংকার, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, ফলিতজ্যোতিষ, বীজগণিত, জ্যামিতি, শারীরবিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, পশুবিজ্ঞান, পূর্তশাস্ত্র প্রভৃতি সকল বিষয়েই সংস্কৃত ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সুতরাং এই সকল বিষয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর জ্ঞানলাভের জন্যে সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান অর্জন অবশ্যই স্বীকরণীয়।

পাশ্চাত্য জীবনে লাতিনের যে প্রভাব তার চেয়েও সংস্কৃতের অধিকতর গভীর প্রভাব রয়েছে আমাদের জীবনে। অথচ ইউরোপের শিক্ষাব্যবস্থায় লাতিনের স্থান আমাদের সংস্কৃতের চেয়ে অনেক বেশী। ইংলণ্ডের শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্বিন্যাসের জন্যে গঠিত "Norwood Commission" এর সিদ্ধান্ত এই প্রসঙ্গে অনুধাবনীয়। যাঁরা লাতিনকে তুলে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁদের অভিমতকে বিবেচনান্তে অগ্রাহ্য ক'রে কমিশন বলছেন—

"We are not prepared to follow the lead of those reformers of the curriculum who would eject the study of the classics from the Secondary Grammar schools on the ground that their study is irrelevent to the purpose of modern society. We do not take the view that modern society purposes to turn its back upon its own English culture and to deny to succeeding generations one of the means of understanding themselves and their inherited traditions.

Unless a culture attains to and preserves self-knowledge, its continuity is not assured.

We regard study of Latin as of fundamental importance for University work in English, Modern Languages and cognate subjects in history, Law, Philosophy and theology."

আমাদের জীবনে সংস্কৃতের স্থান এর চেয়েও বেশী নয় কি ? সুতরাং আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের প্রাচীন ভাষা সংস্কৃতের একান্ত আবশ্যিকতা তথা অবশ্যপাঠ্যতা দূরদর্শী দৃষ্টিতে স্বীকার না ক'রে পারা যায় না।

(৬) দেশপ্রীতি ও সংস্কৃত :—

শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত দেশপ্রেমের উদ্বোধন। মধ্যশিক্ষা গ্রহণকালে, যখন ছাত্রদের হৃদয় থাকে কোমল, তখনি তাদের চিত্তে দেশপ্রীতির বীজ বপন করা প্রয়োজন। এই সম্বন্ধে মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছে—

"Another important aim which the secondary school must foster is the development of a sense of true patriotism. ......Through a proper orientation and presentation of the curriculum it can make the students appreciative and proud of what their country has achieved in literature and science, art and architecture, religion and philosophy, crafts and industries and other fields of human endeavour."

(Secondary Education Commission Report, Govt. of India. Page—28)

অতীতযুগে ভারতীয় মনীষার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয়েছিল সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই। ওপরের বিষয়গুলিতে সত্যিকারের জ্ঞান লাভ করতে হ'লে সংস্কৃত ভাষায় অধিকার সর্বাগ্রে অর্জন করতে হবে। সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানলাভ ক'রে অতীত ভারতের সত্যিকারের মহনীয় রূপের পরিচয় পেলে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ছাত্রহৃদয়ে দেশপ্রীতি উন্মেষিত হবে। সুতরাং, দেশপ্রেমের উদ্বোধনের জন্য সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানলাভ একান্ত অপরিহার্য।

(৭) আত্মশক্তির উদ্বোধনে সংস্কৃত :—

আত্মবিশ্বাস এবং আত্মশক্তি জাগ্রত করার প্রধান পন্থা, জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে সেও একদিন উত্তমর্ণ ছিল ; ব্যাপক অর্থে সেও মহাজনরূপে বহুদেশে পরিচিত ছিল। সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষ অতীতে উত্তমর্ণের আসনে সমাসীন ছিল। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত হ'তে সেদিন সহস্র সহস্র জ্ঞানভিক্ষু বিদ্যার্থী ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে জ্ঞানার্জনে সমবেত হ'ত। মেগাস্থিনিস, ফা-হিয়ান, হিউয়েন সাং তাই সংস্কৃতজ্ঞ গুরুর চরণতলে উপনিষণ্ণ হ'য়ে সেদিন জ্ঞানসাধনায় নিরত হয়েছিলেন। এই সব কারণে সংস্কৃত শিক্ষা বর্তমানে আমাদের করবে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ, আত্মচেতনায় জাগ্রত। প্রসঙ্গতঃ, মনে পড়ে সদ্যঃস্বর্গত, স্বাধীন ভারতের দীর্ঘ দিনের কর্ণধার, অতুলনীয় প্রতিভাধর দেশ-

নেতা মহামনীষী ৺পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর "Discovery of India" গ্রন্থের কথাগুলো—

"If I was asked what is the greatest treasure which India possesses and what is her finest heritage, I would answer unhesitatingly—it is the Sanskrit language and literature and all that it contains. This is a magnificient inheritance, and so long as this endures and influences the life of our people, so long the basic genius of India will continue."

আমাদের আত্মপরিচয় তথা পিতৃপরিচয় মেলে এই সংস্কৃত ভাষায়। আর সেই পরিচয় অত্যন্ত গৌরবের। সেই গৌরবময় উত্তরাধিকারকে গ্রহণ করতে হ'লে, পূর্বপিতৃগণের মহনীয় পরিচয় লাভ করতে হ'লে সংস্কৃত ভাষা অবশ্যই আয়ত্ত করতে হবে। তাতে গৌরবময় অতীতের পরিচয় লাভ করায় আমাদের আত্মিক ও নৈতিক শক্তির হবে উদ্বোধন। তখন আমরা কবি নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় বলতে পারব—

"চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া
অতীতের সেই মহা আদর্শ॥
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে
রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ॥"

এই সংস্কৃত সাহিত্যই ভারতবর্ষে মাতৃভূমির প্রতি জাগিয়ে তোলে সাতিশয় অনুরাগ। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁর "The Fundamental Unity of India" নামক গ্রন্থে বহু যুক্তি এবং তথ্য সহকারে বলেছেন—

"This intense passion for fatherland, indeed utters itself throughout Sanskrit literature." (Page 56)

তাই প্রগতিবাদী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষানেতাদের জানিয়েছেন উদাত্ত আহ্বান—

"Before flooding India with socialistic and political ideas, first deluge the land with spiritual ideas. The first work that demands our attention is, that the most wonderful truths confined in our Upanishads, in our scriptures, in our puranas, must be brought out."

(৮) ধর্ম ও নীতিশিক্ষায় সংস্কৃত ঃ—

শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্ম ও নীতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। Dictum of the 7th Earl of Shaftbury-তে পাই—

"Education without instruction in religion and morals would merely create a race of clever devils."

সংস্কৃতশিক্ষা ধর্ম- ও নীতি-নির্ভর। তাই শিক্ষাব্যবস্থায় এই ধর্ম ও নীতিমূলক সংস্কৃতভাষা অবশ্যই গ্রহণীয়। কিশোর-চিত্তে নীতি এবং ধর্মবুদ্ধি জাগ্রত করার জন্য সংস্কৃত "পঞ্চতন্ত্রাদি" গ্রন্থের খ্যাতি জগৎজোড়া। এই সকল গ্রন্থের নীতি-প্রেরণা মানুষকে আবার সংসারবিমুখও করে না। ভারতে বিলাতী শিক্ষার প্রথম যুগে চিন্তাশীল ইংরেজরা নীতিশিক্ষার জন্য সংস্কৃতের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই ১৯১৪-এর সরকারী Despatch-এ বলা হয়েছে—"There were in the Sanskrit language many excellent systems of ethics with codes of laws and compendiums of duties." তাই, বিলাতের Court of Directors সংস্কৃতশিক্ষার জন্য যথোচিত ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছেন। ভারতে মধ্যশিক্ষা পুনর্বিন্যাসের জন্যে সরকারীভাবে গঠিত মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টে এই সম্বন্ধে তাই মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে—

"The classical language have always exercised a great attraction.···To the bulk of Indians, *Sanskrit*, which is the mother of most Indian languages has always *appealed both from the* cultural and religious point of the view.···There is a great deal to be said in favour of the view that the study of the language should be promoted." (Page-69)

কিন্তু বাংলা দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এই ভাষার শিক্ষাসম্বন্ধে কতটুকু উন্নতি বিধান করা হয়েছে, তা চিন্তার বিষয়।

আমাদের ধর্মসাধনা সংস্কৃতনির্ভর। এমন কি বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মেরও উচ্চতর দর্শনাদিগ্রন্থ সংস্কৃতেই বিরচিত। শ্রীমৎ শংকরাচার্য, রামানুজাচার্য, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, এমনকি বর্তমান যুগে মহর্ষি দয়ানন্দ প্রভৃতি যুগন্ধর ধর্মপ্রবক্তারা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ধর্মপ্রচার করেছেন সংস্কৃত ভাষারই মাধ্যমে। ভারতের অধ্যাত্ম-সমুন্নতি-প্রয়াসী জনগণের নিকট সংস্কৃতভাষাশিক্ষা অপরিহার্য।

(৯) মাতৃভাষাশিক্ষায় সংস্কৃত :—

সকল শিক্ষাকমিশনের মতো মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

"Amongst languages, the highest importance is to be given to the mother-tongue." (Page-98).

তাছাড়া, মাতৃভাষায় পরিণত জ্ঞানের অভাব শুধু লজ্জা নয়, অপরাধবিশেষ। আমাদের মাতৃভাষা সংস্কৃত হ'তে উদ্ভূত; সংস্কৃতশিক্ষা ব্যতীত মাতৃভাষায় আমাদের পরিণত জ্ঞান কখনো সম্ভব নয়। ভারতে মাতৃভাষা শিক্ষার জন্য সংস্কৃতজ্ঞানের অপরিহার্যতার কথা বৃটিশ ভারতেও শাসকদের দৃষ্টি এড়ায়নি। বিখ্যাত প্রশাসক A. Frazer "Report on the Sanskrit College, Calcutta (31st January, 1835)"-এ লিখছেন—

"The acquisition of Sanskrit is indispensable not only for the study of the classical books composed in that language, but principally as the mother language of a great number of Indian dialects···. It is true and obvious that a true and radical reform of a nation in learning and morality (which is the object of a good government) will begin and proceed with the improvement of their own national language. এই প্রসঙ্গেই পুণা সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ Captain Candy তাঁর রিপোর্টে (১৮৪০ খৃষ্টাব্দ) বলেছেন—

"Sanskrit, I conceive to be the grand reservoir from which strength and beauty may be drawn for the vernacular languages ···I look on every native who possesses a good knowledge of his own mother-tongue, of Sanskrit and of English to possess the power of rendering incalculable benefit to his countrymen."

তাই, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জীবন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শিক্ষা এবং দীক্ষায় সংস্কৃতের দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁর জীবনী অনুসন্ধান করলে তাঁর বাল্যকালের সংস্কৃত-শিক্ষার পরিপাটি ব্যবস্থার কথা জানা যায়। তিনি বাংলা-শিক্ষার্থীর পক্ষে সর্বাগ্রে সংস্কৃত-শিক্ষার নিতান্ত প্রয়োজনের কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন; নিজে সংস্কৃতশিক্ষার জন্য গ্রন্থও রচনা করেন "সংস্কৃতপাঠঃ" নামে। তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা-পাঠার্থীদের তিনি নিজেও সংস্কৃত অধ্যাপনা করতেন। আমাদের মাতৃভাষাকে

নব নব শব্দসম্ভার এবং ভাবরাজিতে সমৃদ্ধ করতে হলেও সংস্কৃতের জ্ঞান অপরিহার্য। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের পরিণত সংস্কৃতজ্ঞান তাঁদের সাহিত্য-প্রতিভা-বিকাশে এক বিরাট স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। বর্তমান ভারতে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী দ্ব্যর্থহীন ভাবে সংস্কৃতশিক্ষার অবশ্য-প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা ক'রে বলেছিলেন—

"I quite agree that the study of Sanskrit is sadly neglected. I belong to a generation which believed in the study of the ancient languages. I do not believe that such a study is a waste of time and effort. I believe it is an aid to the study of modern languages. This is more true of Sanskrit than any other ancient language so far as India is concerned, and every nationalist should study it because it makes a study of the provincial languages easier than otherwise. It is the language in which our forefathers thought and wrote. ...No translation can give the music of the original, which, I hold, has a meaning all its own."

(Harijan, 23rd March, 1940)

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন ভারতসচিব Sir Charles Wood ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারই ফলে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতা মাদ্রাজ এবং বোম্বেতে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ভারতীয় মাতৃভাষা শিক্ষার জন্যই সংস্কৃতশিক্ষাকে আবশ্যিক করার প্রয়োজনীয়তা তিনি সেদিন ঘোষণা করেছিলেন। সেই বিখ্যাত "Wood's Educational Despatch of 1854"-এ স্পষ্ট উল্লিখিত হয়েছে—"A knowledge of the Sanskrit language, the root of the vernaculars of the great part of India, is more especially necessary to those who are engaged in the work of composition in those languages." (ক্রমশঃ)

মহাভিক্ষু

শ্রীহরিপ্রসাদ মেদ্দা

স্বর্গের বিভূতি নিয়ে এসেছিলে এই মর্ত্যধামে,
জ্যোতির্ময় মহাযোগী, মৃত্যুঞ্জয় মধু তব নামে !

শুদ্ধসত্ত্ব, মহাজ্ঞানী, তুমি অমিতাভ, অভিরাম
ত্যাগের শাশ্বত মন্ত্রে, জ্বেলেছিলে দীপ অনির্বাণ,
সাকারেও নিরাকার, সসীমেও অনন্ত অসীম—
বাক্যমনাতীত যাহা, তারি শান্ত মূক জয়গান !

মহাসিন্ধু ! উদ্বেলিত সীমাহীন সমবেদনায় !
এসেছি তোমারি তীরে, মহাভিক্ষু, কি দিব তোমায় !

ভ্রম-সংশোধন

১৩৭১ চৈত্র সংখ্যায় ১৫৬ পৃষ্ঠায় ২য় কলমে ৪ লাইনের পর এই শিরোনাম বসিবে :—

(৪) শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাচীন ভাষা :

রামায়ণ-প্রসঙ্গ

(যুদ্ধারম্ভ)

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

রাম-রাবণের যুদ্ধ প্রবাদবাক্যে ও ইতিহাসে অমর হইয়া আছে। অবশ্য ঐতিহাসিকগণের মতে উহা প্রকৃতপক্ষে আর্য-অনার্যের যুদ্ধ। কত হাজার বৎসর পূর্বে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাহার সঠিক তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। ঐতিহাসিকগণ এই মাত্র অনুমান করেন যে, সমগ্র আর্যাবর্তের প্রায় সর্বত্র তখন আর্যগণ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, প্রাচীন ভারতের সেই যুদ্ধের সহিত বর্তমান বিশ্বযুদ্ধের কী বিরাট পার্থক্য! রামায়ণে অবশ্য পাওয়া যায়, রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ মেঘের আড়ালে অন্তরীক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করিত; ইহার সত্যাসত্য নির্ণয়ের উপায় নাই। বর্তমানে বিজ্ঞানজগতে সত্যই বোমারু বিমান অন্তরীক্ষে গমনাগমন করে এবং অন্তরীক্ষ হইতেই বোমা নিক্ষেপ করিয়া শত্রু ও শত্রুপুরী ধ্বংসের চেষ্টা হয়। এখন যুদ্ধ কেবল স্থলে ও জলে নহে, অন্তরীক্ষেও! রাম-রাবণের যুদ্ধ স্থলপথেই সংঘটিত হয় এবং উহা প্রধানতঃ দ্বন্দ্বযুদ্ধ। উভয়পক্ষ সংগ্রামে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া লড়িয়াছিল। বর্তমানে যুদ্ধে সৈনিকগণের দৈহিক বলবীর্যের উপর ভরসা করিবার অধিক প্রয়োজন নাই। বিজ্ঞানই রণনীতি পরিচালনা করে। সে যুগে সৈনিক-গণের প্রচণ্ড সাহস, বীর্য ও শক্তি ছিল সহায়।

সংগ্রামে রাম ও লক্ষ্মণ তীর ধনুক লইয়া যুদ্ধ করিলেও যুদ্ধের অন্যান্য সজ্জা, যথা রথ, হস্তী বা অশ্ব প্রভৃতি কিছুই ছিল না। আর বানরসৈন্যগণের অস্ত্র ছিল সাল, তাল, সপ্তপর্ণ প্রভৃতি নানাজাতীয় বিশাল বৃক্ষসমূহ, পর্বতশৃঙ্গ বা বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড এবং চড় ও মুষ্টি।

তে তাম্রবক্ত্রা হেমাভা রামার্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
লঙ্কামেবাভ্যধাবন্ত সালতালশিলায়ুধাঃ ॥
তে দ্রুমৈঃ পর্বতাগ্রৈশ্চ মুষ্টিভিশ্চ মহাবলাঃ।
প্রাকারাগ্রাণ্যশক্যানি মমন্থুস্তোরণানি চ ॥
পরিখা পূরয়ন্তশ্চ প্রসন্নসলিলোদকাঃ।
পাংশুভিঃ পর্বতাগ্রৈশ্চ সমযুদ্ধন্ত বানরাঃ ॥

অর্থাৎ—রামের জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ তাম্রমুখ, হেমকান্তি মহাবলশালী সেই বানরগণ সাল, তাল এবং শিলারূপ অস্ত্র লইয়া লঙ্কাভিমুখে দ্রুত গমন করিতে লাগিল। তাহারা বৃক্ষ, পর্বতশৃঙ্গ এবং মুষ্টি দ্বারা দুর্ভেদ্য প্রাচীর ও তোরণসমূহ ভগ্ন করিতে লাগিল। প্রাসাদের চতুর্দিকে স্বচ্ছজলে পরিপূর্ণ পরিখাগুলি ধূলি ও পর্বতশৃঙ্গের দ্বারা পূর্ণ করিয়া সেই বানরগণ যুদ্ধে অগ্রসর হইল।

রাক্ষসগণ কিন্তু সকল প্রকার যুদ্ধোপকরণে সজ্জিত ছিল।

তে হয়ৈঃ কাঞ্চনাপীড়ৈর্ধ্বজৈশ্চাগ্নিশিখোপমৈঃ।
রথৈরাদিত্যসঙ্কাশৈঃ কবচৈশ্চ মহাপ্রভৈঃ ॥
প্রভিন্ন করটৈর্ঘোরৈর্বানরেন্দ্র প্রহারিভিঃ।
অলঙ্কৃতৈঃ বদ্ধতূর্ণৈর্বৃহদ্‌ঘণ্টাবিভূষিতৈঃ ॥
নানাশস্ত্রধরা ঘোরা মেঘা ইব সবিদ্যুতঃ।
নির্যযুঃ সমরং সর্বে দারয়ন্তো মহীতলম্ ॥
সুমহদ্ভির্মহানাদৈঃ পূরয়ন্তো নভস্তলম্।
রাক্ষসা ভীমকর্মাণো রাবণস্য জয়ৈষিণঃ ॥

রাবণের বিজয়াকাঙ্ক্ষী ভীমকর্মা রাক্ষসগণ সকলেই নানাশস্ত্রধারী। তাহাদের সকলেরই স্বুবর্ণভূষিত অশ্ব, অগ্নিশিখাসদৃশ ধ্বজ, সূর্যতুল্য রথ এবং অতিশয় উজ্জ্বল কবচ ছিল। তাহাদের সঙ্গে ছিল বহু মদস্রাবী অলঙ্কৃত হস্তিবৃন্দ, যাহারা

তূণ বহন করিতেছিল। হস্তিবৃন্দের গলস্থিত বৃহৎ ঘণ্টাধ্বনির সহিত বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের ন্যায় প্রচণ্ড শব্দে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া রাক্ষসগণ যুদ্ধে বহির্গত হইল। রাক্ষসগণের অস্ত্র ছিল গদা, শূল, শক্তি, খড়্গ, অস্থিখণ্ড, অঙ্কুশ, কুঠার ও বিভিন্ন শর। তাহারা উত্তমরূপে বর্ম ও কবচ দ্বারা সজ্জিত ছিল।

রামচন্দ্রের পক্ষে সুগ্রীব, অঙ্গদ, জাম্ববান্, হনুমান্, নল, নীল, গয়, গবাক্ষ, সুষেণ, ঋষভ প্রভৃতি মহা যোদ্ধাগণ ছিলেন। রাবণের সহায় ছিল পুত্র ইন্দ্রজিৎ, রণে অবধ্য ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ, ধূম্রাক্ষ, অকম্পন, বজ্রদংষ্ট্র, প্রহস্ত, ত্রিশিরা, মহোদর, মহাপার্শ্ব, কুম্ভ, নিকুম্ভ, মকরাক্ষ প্রভৃতি মহাবলশালী রাক্ষসগণ। উভয় পক্ষে প্রতিদিন যুদ্ধে শত শত বানর ও রাক্ষস নিহত হইয়াছিল। বর্তমান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও প্রতিদিন সংবাদপত্রে নিহত সৈন্যসংখ্যার তালিকা দেখিয়া মনে হইত সমগ্র ইওরোপ বুঝি জনশূন্য হইয়া গেল। কিন্তু তাহা হয় নাই। লঙ্কার যুদ্ধেও প্রতিদিন অগণিত রাক্ষস এবং বানর নিহত হইলেও লঙ্কা রাক্ষসশূন্য হয় নাই এবং বানরসেনাগণের অনেকেই প্রধান যোদ্ধাগণ সহ জীবিত ছিল।

সেতু নির্মিত হইবার পর রামচন্দ্র বানরসৈন্য সহ লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া চারিদিক হইতে লঙ্কানগরী অবরোধ করিলেন। যুদ্ধনিবারণের শেষ চেষ্টায় তিনি অঙ্গদকে দূত করিয়া রাবণের নিকট প্রেরণ করিলেন। বলিয়া পাঠাইলেন, রাবণ সীতা প্রত্যর্পণ করুক, তাহা হইলে তিনি সৈন্যসহ অচিরে লঙ্কানগরী পরিত্যাগ করিবেন। রাবণের মাতা এবং বৃদ্ধ অমাত্যগণও রাবণকে হিতোপদেশ দিয়াছিল, কিন্তু 'চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী।' মহাভারতে দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য সকলের অনুরোধ, পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া দুর্যোধন বলিয়াছিলেন, 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী'—ফলে কৌরব বংশ ধ্বংস হইয়াছিল। রাবণও দৃঢ়সংকল্প, সীতা প্রত্যর্পণ করিবে না—ফল হইল সবংশে নিধন।

বর্ষার জলধারার ন্যায় অসংখ্য বানরসৈন্যের সমাবেশে রাবণ অবশ্য কিঞ্চিৎ চিন্তাযুক্ত হইয়াছিল। বিশেষতঃ গুপ্তচরদ্বয় শুক ও সারণ আসিয়া যখন সংবাদ দিল, পর্বতশিখরে, ঝরণার ধারে, গুহাতে, সমুদ্রের তীরে ও পুষ্পিত কাননে তাহারা সহস্র সহস্র ধাবমান বানরসৈন্যকে বিচরণ করিতেছে দেখিতে পাইয়াছে—

আসীনং পর্বতাগ্রেষু নির্ঝরেষু গুহাসু চ।
সমুদ্রস্য চ তীরেষু পুষ্পিতেষু বনেষু চ॥

তাহারা আরও বলিল, মহারাজ! যে সব নীলবর্ণ মেঘের ন্যায় এবং কৃষ্ণবর্ণ কজ্জলসদৃশ, যুদ্ধে যথার্থ পরাক্রমশালী, বলবান ও তীব্র কোপপরায়ণ ভয়জনক বানরগণকে আপনি লবণ-সমুদ্রের তীরে অবস্থিত দেখিতেছেন, তাহারা সংখ্যায় অগণিত; অতএব অনির্দেশ্য। নখ এবং দন্তই ইহাদের অস্ত্র। এতাদৃশ দুর্জয় বানরগণ পর্বত, বৃক্ষ এবং নদীতে অবস্থান করতঃ যুদ্ধে আপনাকেই লক্ষ্য করিয়া গমন করিতেছে—

নীলামেব মহামেঘান্ যানেতাননুপশ্যসি।
অসিতাঞ্জনসঙ্কাশান্ যুধি সত্যপরাক্রমান্॥
নখদন্তায়ুধান্ বীরাংস্তীব্রকোপান্ ভয়াবহান্।
অসংখ্যেয়াননির্দেশ্যাং স্তীরস্থান্ লবণাম্ভসঃ॥
পর্বতেষ্বথ বৃক্ষেষু নদীষু চ কৃতালয়াঃ।
এতে ত্বামভিগচ্ছন্তি রাজন্ যুধি সুদুর্জয়াঃ॥
আরুহ্য পর্বতাগ্রাণি ক্ষিপন্তি বিপুলা শিলাঃ।
বৃক্ষাংশ্চ বিবিধাকারান্ ন মৃত্যোরুদ্বিজন্তি চ॥

এই সকল সৈনিকগণ পর্বতাগ্রে আরোহণ-পূর্বক বিশাল প্রস্তরখণ্ড এবং নানাবিধ বৃক্ষসমূহ নিক্ষেপ করিতেছে। ইহাদের মৃত্যুভয় নাই। রাবণ মহাবীর, এ পর্যন্ত কাহাকেও সে গ্রাহ্য করে নাই। কিন্তু রামের সৈন্যবল যে উপেক্ষণীয়

নহে তাহা সে বুঝিয়াছিল। তথাপি সীতা-লাভের আশা পরিত্যাগ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। যুদ্ধের ফলাফল কি হইবে তাহা অজ্ঞাত। কিন্তু কোন প্রকারে যুদ্ধারম্ভের পূর্বে সীতাকে যদি লাভ করা যাইত! সীতাকে অন্যভাবে ভয় প্রদর্শন করিয়া কি উহা সম্ভব হইতে পারে না? অনেক চিন্তা করিয়া সে এক নিপুণ শিল্পীকে দিয়া রামচন্দ্রের ছিন্ন মস্তক প্রস্তুত করাইল। তারপর অশোকবনে সীতার নিকট গিয়া সেই মস্তক প্রদর্শন করিয়া বলিল, 'আমাকে বধ করিবার জন্য বিভীষণ কর্তৃক পরিচালিত বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া রাম ও লক্ষ্মণ সমুদ্রের সীমা পর্যন্ত আসিয়াছিল; পথ-শ্রমে ক্লান্ত সৈন্যবাহিনীসহ রাত্রে তাহারা গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইলে, রাত্রির সেই অন্ধকারে আমার চরগণ রাম ও লক্ষ্মণসহ সেনানীসমূহ বধ করিয়াছে।' রাবণ আরও বলিল, 'তোমার স্বামীর এই ক্ষত-বিক্ষত এবং ধূলি-ধূসরিত মস্তক দর্শন কর।' সীতা অতীব সরলা, রাবণের কূটবুদ্ধি অনুসরণ করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। রামচন্দ্র সত্যই নিহত হইয়াছেন মনে করিয়া তিনি শোকে অধীর হইলেন। ইতিমধ্যে এক দৌবারিক দ্রুত আসিয়া রাবণকে কোন সংবাদ দিলে রাবণ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া প্রস্থান করিল। সেই অবকাশে রাক্ষসী সরমা আসিয়া সীতাকে আশ্বাস প্রদান করিল যে, রাম ও লক্ষ্মণ কুশলে আছেন; সমুদ্র অতিক্রম করিয়া তাঁহারা দক্ষিণ তীরে সাগরের প্রান্তে শিবির স্থাপন করিয়াছেন এবং শীঘ্রই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। সীতার অনুরোধে সরমা প্রতিদিন যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে জানাইবার প্রতিশ্রুতি দিল।

অঙ্গদ ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন, রাবণ কোন ক্রমেই সীতাকে প্রত্যর্পণ করিবে না। অগত্যা রামচন্দ্রকে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইল। দলে দলে বানরসৈন্য চতুর্দিক হইতে লঙ্কার দুর্গ আক্রমণ করিল। রাক্ষসগণও দুর্গমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। রাত্রির অন্ধকারে যুদ্ধ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিল। উভয় পক্ষই তুল্য বলশালী হইলেও নীতিগত পার্থক্য ছিল দলপতি রাম ও রাবণের মধ্যে। রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতের পরাক্রম ও উৎপীড়নে ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণ বলিয়াছিলেন, 'সমগ্র রাক্ষসবধের জন্য ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিব।' ব্রহ্মাস্ত্র সম্ভবতঃ 'এ্যাটম বমের' ন্যায় কোন মারাত্মক অস্ত্র, যাহা নিক্ষেপ করিলে বহুসংখ্যক সৈন্য একসঙ্গে নিহত হইতে পারে। রামচন্দ্র কিন্তু উত্তরে বলেন, 'পলায়নপর ও নিরপরাধ রাক্ষস-গণকে বধ করা চলিবে না।' গরুড়ও রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন:

প্রকৃত্যা রাক্ষসা সর্বে সংগ্রামে কূটযোধিনঃ।
শূরাণাং মৃদুভাবানাং ভবতামার্জবং বলম্॥
তন্ন বিশ্বসিতব্যং বৈ রাক্ষসানাং রণাজিরে।
আত্মোপম্যেন ধর্মজ্ঞ নিত্যং জিহ্মা হি রাক্ষসাঃ।
কূটযোধাশ্চ তে সর্বে ক্ষুদ্রাশ্চৈবাপি সর্বশঃ॥

—রাক্ষসগণ সকলেই স্বভাবতঃ রণক্ষেত্রে কূটযুদ্ধ-পরায়ণ, আপনারা বীর হইলেও মৃদুভাবাপন্ন, সরলতাই আপনাদের বল। সুতরাং হে ধর্মজ্ঞ, রণক্ষেত্রে নিজেদের তুলনায় রাক্ষসগণকে কদাপি বিশ্বাস করিবেন না। তাহারা সর্বদাই কুটিল, সর্বাংশে নীচ ও কূটযুদ্ধপরায়ণ।

গরুড়ের এই উক্তির সত্যতা বহুবার প্রমাণিত হইয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, রাম-রাবণের যুদ্ধের সহিত বর্তমান যুগের যুদ্ধের পার্থক্য অনেক। সম্মুখসমরে উভয়পক্ষে যাহারা লড়িয়াছিল, তাহারা প্রকৃতই বীর ছিল। রামায়ণে যুদ্ধকাণ্ডে প্রত্যেকটি বীরের যুদ্ধের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। অজস্র পুনরুক্তি ও অলঙ্কারের আতিশয্য বাদ দিয়াও এ-কথা অনুমান করিতে কষ্ট হয়

না যে, যুদ্ধ ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। বহুবার রাম ও লক্ষ্মণের জীবনসংশয় ঘটিয়াছিল। বহুবার মনে হইয়াছিল, বিজয়-লক্ষ্মী বুঝি রাবণকেই বরণ করিবেন, সীতার দুঃখের রজনী বোধ হয় আর প্রভাত হইবে না। কিন্তু 'যথা ধর্ম তথা জয়' এই বাক্য প্রমাণ করিয়া রামচন্দ্রই পরিশেষে জয়লাভ করেন।

যুদ্ধকাণ্ডের অন্তর্গত দু-একটি বিবরণের উল্লেখ এখানে অবান্তর হইবে না। দুরাত্মা রাবণের প্রধান সহায় ছিল ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ ও পুত্র ইন্দ্রজিৎ। উভয়েই প্রচণ্ড পরাক্রমশালী, বিশেষতঃ কুম্ভকর্ণ অত্যাচার ও পীড়নে সর্বত্র সন্ত্রাসের সৃষ্টি করিয়াছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে প্রথম দিন দ্বন্দ্বযুদ্ধে অঙ্গদের নিকট পরাজিত হইয়া ইন্দ্রজিৎ সম্মুখসমরে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে, পরে অন্তরালে থাকিয়া দূর হইতে রাম ও লক্ষ্মণের উপর অবিরল শরবর্ষণ করিতে থাকে। সর্বাঙ্গে শরবিদ্ধ হইয়া রাম-লক্ষ্মণ সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূমিতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলে বানরসৈন্যগণের মধ্যে হাহাকার-ধ্বনি উঠিল। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া ইন্দ্রজিৎ রাবণকে সংবাদ দিল, রাম ও লক্ষ্মণ নিহত। উল্লসিত রাবণ তৎক্ষণাৎ ত্রিজটা রাক্ষসীর দ্বারা অশোকবনে সীতার নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করিল, এবং বলিয়া দিল—সীতাকে রথে আরোহণ করাইয়া দূর হইতে এই দৃশ্য দেখাইও। রথে উপবিষ্ট সীতা দূর হইতে দেখিলেন, অচৈতন্য রাম ও লক্ষ্মণকে ঘিরিয়া চতুর্দিকে বানরগণ উপবিষ্ট। বৃদ্ধা রাক্ষসীর অন্তঃকরণে ইতিমধ্যে সীতার প্রতি স্নেহ জন্মিয়াছিল। সে আশ্বাস দিয়া বলিল, রাম ও লক্ষ্মণ নিশ্চয় জীবিত আছেন, কারণ বানর-সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হয় নাই। ত্রিজটার কথাই সত্য। শীঘ্রই রাবণের নিকট পুনরায় সংবাদ আসিল—রাম ও লক্ষ্মণ নিহত হন নাই। বানরগণ শতগুণ উৎসাহে পুনরায় নগরী আক্রমণ করিয়াছে। তারপর এক এক করিয়া ধূম্রাক্ষ, অকম্পন, বজ্রদংষ্ট্র ও প্রহস্ত প্রভৃতি বীর রাক্ষসগণ যুদ্ধে নিহত হইলে ক্রুদ্ধ রাবণ স্বয়ং যুদ্ধে গমন করিল। সসৈন্য রাবণকে দেখিবামাত্র লক্ষ্মণ তাহার প্রতি ধাবিত হইলেন, কিন্তু শীঘ্রই রাবণের প্রচণ্ড শরাঘাতে লক্ষ্মণ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গেলেন রাবণ তখন দ্রুত রথ হইতে অবতরণ করিয়া লক্ষ্মণের নিকট গিয়া তাঁহাকে তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু লক্ষ্মণের সংজ্ঞাহীন দেহ তুলিয়া লইয়া পলায়ন করিবার পূর্বেই হনুমান ছুটিয়া আসিয়া রাবণের বিশাল বক্ষঃস্থলে মুষ্টিদ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। সে আঘাতে রাবণ ক্ষণকালের জন্য বিহ্বল হইল। হনুমান সেই অবকাশে লক্ষ্মণের দেহ তুলিয়া লইয়া গেলেন। শ্রীরামচন্দ্র তখন রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। উভয়ের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। রাবণ রথারূঢ়, রামচন্দ্রের রথ নাই; সেজন্য তাঁহার অসুবিধা হইতেছে দেখিয়া বীরভক্ত হনুমান্ রামচন্দ্রকে স্বীয় পৃষ্ঠে বহন করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে রাবণের রথ ভগ্ন হইল, সারথি ও অশ্ব নিহত হইল, অবশেষে রাবণ স্বয়ং নিরস্ত্র হইল। সেই মুহূর্তে রামচন্দ্র তাহাকে বধ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি অন্যায় যুদ্ধ করিবেন না—রাবণকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন। পরাজিত, অপমানিত রাবণ দুর্গমধ্যে ফিরিয়া গেল।

কথিত আছে, রাবণ পূর্বে তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট বরলাভ করিয়াছিল যে, দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ প্রভৃতি কেহ তাহাকে বধ করিতে পারিবে না। রাক্ষসগণ আর্যদিগকে মনুষ্য বলিয়া সম্বোধন করিত এবং রাবণ এই মনুষ্যগণকে নিতান্তই অবজ্ঞার চক্ষে দেখিত।

এখন মনুষ্য হইতেই রাবণের ভয় উপস্থিত। বিভীষণের হিতবাক্য মনে পড়িল, রাম ও লক্ষ্মণ সাধারণ মনুষ্য নহেন। কিন্তু দাম্ভিক, উদ্ধত রাবণের পক্ষে পরাজয় স্বীকার করিয়া সীতা-প্রত্যর্পণ কখনই সম্ভব নহে। বড় বড় যোদ্ধাগণ অনেকেই নিহত। রাবণের মনে পড়িল, ভ্রাতা কুম্ভকর্ণের কথা।

কুম্ভকর্ণ স্বভাবে রাবণের উপযুক্ত ভ্রাতা। তাহার বিশাল আকৃতি সকলের হৃদয়ে ত্রাস উৎপাদন করিত। অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতায় সে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। বস্তুতঃ তাহার অত্যাচার ও পীড়নে রাক্ষসগণও সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত, অন্যান্য প্রাণিগণের তো কথাই নাই। গীতায় আছে :

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাঽসদ্‌গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥

—অসুর ব্যক্তিগণের হৃদয় দুষ্পূরণীয় বাসনায় পূর্ণ। দম্ভ, অভিমান ও মদযুক্ত সেই সকল ব্যক্তিগণ অশুভব্রত পালনপূর্বক দুরদৃষ্ট-উৎপাদক কর্মে প্রবৃত্ত হয়। কামভোগই তাহাদের জীবনের পরম পুরুষার্থ, অপরিমেয় অসৎ চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অসংখ্য আশপাশে আবদ্ধ ও কামক্রোধের অধীন হইয়া তাহারা বিষয়-ভোগের জন্য পরস্বাপহরণাদিরূপ অসদুপায়ে অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা করে। 'আমার সর্বপ্রকার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে, ভবিষ্যতেও পূর্ণ হইবে, দুর্জয়-শত্রুনাশে ও সকলের নিগ্রহে আমি সমর্থ, আমি ভোগী, পুরুষার্থসম্পন্ন, বলবান্ ও সুখী' ইত্যাদি গীতার বাক্যসমূহ কুম্ভকর্ণ-চরিত্রে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। মূর্তিমান অসুরের ন্যায় সকলের মধ্যে ত্রাস সঞ্চার করিয়া সে বিচরণ করিত। তাহার অত্যাচারে লঙ্কা ও জনস্থান পূর্বেই জনশূন্য না হউক, জন-বিরল হইয়া যাইত ; কিন্তু সুখের বিষয়, কুম্ভকর্ণের অধিকাংশ সময় নিদ্রাতেই কাটিয়া যাইত। রাজধানী হইতে দূরে স্বীয় প্রাসাদে প্রচুর আহার, অপরিমিত ভোগ ও নিদ্রা—ইহাতেই সে সন্তুষ্ট থাকিত। রাবণের যে বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, লঙ্কায় যুদ্ধ চলিতেছে—এ সকল সংবাদ সে অবগত ছিল না।

রাবণের আদেশে লোকজন কুম্ভকর্ণের প্রাসাদে উপস্থিত হইল। কুম্ভকর্ণ তখন নিদ্রিত। একজন সাধারণ নিদ্রাকাতর ব্যক্তিকেই জাগরিত করিবার জন্য বহু সময় ধাক্কা ও নানারকম বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হয়। সুতরাং পর্বতসদৃশ সেই বিকটাকার নিদ্রিত রাক্ষসপুঙ্গবকে অসময়ে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য যথেষ্ট আয়োজন করিতে হইয়াছিল। একদিকে ঢাক, ঢোল, শঙ্খ প্রভৃতির তুমুল শব্দ, অপরদিকে বহু রাক্ষস কর্তৃক সর্বাঙ্গে মর্দন ও মুষল, গদা, চড়, মুষ্টি প্রভৃতির প্রয়োগ বহুক্ষণ ধরিয়া চলিবার পর অবশেষে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা-ভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গের পর কুম্ভকর্ণ ভোজনের জন্য ব্যগ্র হয় ; সুতরাং বিবিধ মাংসসহ প্রচুর ভোজ্যদ্রব্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা পূর্বেই করা হইয়াছিল। অপরিমিত আহার ও পানে তৃপ্তিলাভ করিয়া কুম্ভকর্ণ জানিতে চাহিল, অসময়ে নিদ্রাভঙ্গের কারণ কী? রাবণ তাহাকে স্মরণ করিয়াছে শুনিয়া সে তৎক্ষণাৎ রাবণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিল। সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কুম্ভকর্ণ রাবণের সীতাহরণ

এবং তার ফলে যুদ্ধ প্রভৃতি সমর্থন না করিলেও যুদ্ধের জন্য অবিলম্বে প্রস্তুত হইল। তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে, ক্ষুদ্র মানবদ্বয় ও বানরসৈন্যগণকে বধ করিয়া তাহাদের রুধির পান করা তাহার নিকট মোটেই ক্লেশকর হইবে না।

রাক্ষসগণের তুলনায় বানরগণ ক্ষুদ্রকায় ছিল। কুম্ভকর্ণের শরীর পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় বিশাল; আকৃতি ভীষণ, চক্ষুদ্বয় শকট-চক্রের ন্যায়। এতাদৃশ কুম্ভকর্ণ যখন রাজপথ দিয়া প্রাসাদ অভিমুখে গমন করিতেছিল তখন দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া বানরগণ ভীত হইল। পলায়মান সৈন্যগণকে আশ্বস্ত রাখা সুগ্রীবের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। অবশেষে বিভীষণ পরামর্শ দিলেন, সৈন্যগণের মধ্যে প্রচার করা হউক, 'এই দৃশ্যমান প্রাণী যন্ত্রবিশেষ, সুতরাং উহাকে ভয় পাইবার কারণ নাই।' সৈন্যগণ কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া যুদ্ধোদ্যোগ করিতে লাগিল। উৎকট যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত শূলহস্তে বিশাল রথে আরোহণ করিয়া কুম্ভকর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে বানরগণ চতুর্দিক হইতে তাহার শরীরে প্রস্তরখণ্ড, শিলা ও বৃক্ষসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কুম্ভকর্ণ তাহাতে বিন্দুমাত্র কাতর হইল না। পরন্তু কুম্ভকর্ণের তাড়নায় বানরগণ পুনরায় পলায়ন আরম্ভ করিল! সৈন্যগণকে রণে ভঙ্গ দিতে দেখিয়া অঙ্গদ নানা উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যে বহুকষ্টে তাহাদের যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিল। কিন্তু কুম্ভকর্ণ সাক্ষাৎ যমের ন্যায় অসংখ্য সৈন্য সংহার করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল। অবশেষে দলিত, মথিত সৈন্যসমূহের মধ্য হইতে সংজ্ঞাহীন সুগ্রীবকে গ্রহণ করিয়া কুম্ভকর্ণ পুরমধ্যে গমনে উদ্যত হইলে তাহার ক্রোড়ে অবস্থিত সুগ্রীবের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। তখন তিনি হাত দিয়া কুম্ভকর্ণের নাসিকা ও কর্ণদ্বয় ছিন্ন করিলেন। ইতিমধ্যে রামচন্দ্রও অগ্রসর হইয়া শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। রক্তাক্তকলেবর কুম্ভকর্ণ তখন উন্মত্তের ন্যায় বানর, রাক্ষস যাহাকে সম্মুখে পাইল তাহারই জীবননাশে উদ্যত হইল। শেষ পর্যন্ত রামের শর কুম্ভকর্ণের হৃদয় বিদ্ধ করিল। বিকট গর্জন করিয়া কুম্ভকর্ণ যখন পড়িয়া গেল তখন তাহার বিশাল শরীরের চাপেই বহু বানর বিনষ্ট হইল। কুম্ভকর্ণের নিধন-সংবাদে সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। রাবণ বহু বিলাপ করিল কিন্তু যুদ্ধ বন্ধ করিল না। একে একে রাবণের পুত্রগণ—ত্রিশিরা, দেবান্তক, নরান্তক প্রভৃতি নিহত হইলে ইন্দ্রজিৎ দ্বিতীয়বার যুদ্ধে আগমন করিল। (ক্রমশঃ)

উপনিষৎ-কথা

শ্রীমতী পুষ্প দেবী

পিতা মাতা প্রজৈত এব মন এব পিতা বাঙ্‌মাতা প্রাণঃ প্রজা ॥ বৃহদারণ্যক ১।৫।৭

ইহারাই জেনো জনক-জননী-সন্তান-রূপে রয়
মন পিতা আর বাক্য জননী, প্রাণ সন্তান হয়।

বিজ্ঞাতং বিজিজ্ঞাস্যমবিজ্ঞাতমেত. এব যৎ কিঞ্চ বিজ্ঞাতং বাচস্তদ্রূপং বাগ্‌ঘি বিজ্ঞাতা বাগেনং তদ্ভূত্বাঽবতি ॥ ১।৫।৮

যাহা জানা আর যা কিছু অজানা, যাহা কিছু জানিবার—
বাক্, মন আর প্রাণ—ইহারাই জানিও প্রকাশ তার।
বাক্ বিজ্ঞাতা ; যাহা জানি মোরা
বাক্যরূপেই প্রকাশিত তাহা ;
যে জন বাকের এই বিভূতিটি জানে ঠিক মনেপ্রাণে
বাক্য তাহারে রক্ষা করেন অন্ন-ভোজ্য দানে।

যৎ কিঞ্চ বিজিজ্ঞাস্যং মনসস্তদ্রূপং মনো হি বিজিজ্ঞাস্যং মন এনং তদ্ ভূত্বাঽবতি ॥ ১।৫।৯

জানার ইচ্ছা, জিজ্ঞাসা যাহা তারি রূপ ধরে মন
একারণে মন 'বিজিজ্ঞাস্য' এই নামে খ্যাত হন।
মনের এরূপ বিভূতিরে জেনে
যেই জন তারে বোঝে মনেপ্রাণে
মনই তাহারে বুঝাবার তরে সংশয়রূপ ধরে,
আপনি ধরিয়া জিজ্ঞাসা-রূপ তাহারে রক্ষা করে॥

যৎ কিঞ্চাবিজ্ঞাতং প্রাণস্য তদ্রূপং প্রাণো হ্যবিজ্ঞাতঃ প্রাণ এনং তদ্ ভূত্বাঽবতি ॥ ১।৫।১০

জ্ঞান-অগোচর হইলেও যাহে সংশয় নাহি রয়
সেই অজানাই প্রাণের স্বরূপ—'অবিজ্ঞাত' সে তাই।
প্রাণের এরূপ বিভূতিরে জেনে
যেই জন তারে বোঝে মনেপ্রাণে
সেরূপ ধরিয়া সদাই তাহারে পালন করেন প্রাণ—
নিজেরে সদাই আড়ালে রাখিয়া চালক হইয়া রন।

বরাহনগর মঠ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

বরাহনগর মঠে সাধন-ভজনের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রাদির আলোচনাও খুব চলিত। গুরুভ্রাতৃগণ যাহাতে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া বেদাদি শাস্ত্রে পারদর্শী হন, এবং বঙ্গদেশে বেদশাস্ত্রের চর্চা পুনরায় আরম্ভ করিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে কাশীর জমিদার প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়ের নিকট হইতে পাণিনি ব্যাকরণ ও বৈদিক গ্রন্থাদি বরাহনগর মঠে আনাইয়া লন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর তিনি প্রমদাবাবুকে লেখেন—"বঙ্গদেশে বেদশাস্ত্রের একেবারে অপপ্রচার বলিলেই হয়। এই মঠের অনেকেই সংস্কৃতজ্ঞ এবং তাঁহাদের বেদের সংহিতাদি ভাগ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার একান্ত অভিলাষ। ...এ মঠে অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মেধাবী, এবং অধ্যবসায়শীল ব্যক্তির অভাব নাই। গুরুর কৃপায় তাঁহারা অল্পদিনেই অষ্টাধ্যায়ী অভ্যাস করিয়া বেদশাস্ত্র বঙ্গদেশে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিবেন ভরসা করি।"* স্বামীজীর অনুরোধ প্রমদাবাবু সানন্দে রক্ষা করিয়াছিলেন।

বরাহনগর মঠ প্রায়ই আলোচনা-সভায় পরিণত হইত। ধর্ম, ঈশ্বরতত্ত্ব, ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, এমন কি নাস্তিক্যবাদ লইয়াও তর্ক উঠিত, এ সকল সভায় প্রধান বক্তা ও সভাপতি হইতেন নরেন্দ্রনাথ। কোন বিষয়ে তর্ক উঠিলে অন্যান্য সাধুগণ যে পক্ষ অবলম্বন করিতেন, নরেন্দ্রনাথ সাধারণতঃ উহার বিপক্ষ হইয়া তাঁহাদের তর্কজাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজের মতই প্রতিষ্ঠা করিতেন। আবার কোন সময় তাঁহাদের পক্ষ লইয়া নিজের মতবাদও খণ্ডন করিতেন। এমনই ছিল তাঁহার ক্ষুরধার বুদ্ধি ও তর্ক করিবার ক্ষমতা ; সাংখ্য, বেদান্ত, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, যোগশাস্ত্র সকল বিষয়ই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার করিয়া সেগুলির ভিতর কোথায় মিল, কোথায় বা অমিল, এবং কি ভাবে সেগুলিকে জীবনে গ্রহণ করা যায়, তাহা তিনি বুঝাইয়া দিতেন। বেদান্ত ও বৌদ্ধ শাস্ত্র পরস্পর-বিরোধী কি না, কোথায় তাহাদের বিরোধ, কেনই বা বিরোধ তাহা বিচার করিয়া দেখাইতেন। বৈষ্ণব ও শৈব শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া তাহাদের মূলনীতিগুলি বুঝাইয়া দিতেন। শাক্ত শাস্ত্রেরও বিভিন্ন স্তরগুলির ব্যাখ্যা করিতেন। তন্ত্র ও পুরাণের মধ্যে বৈদিক দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি কিরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইল, তাহাও দেখাইতেন। এমন কি শঙ্করের মতবাদও তর্কে উড়াইয়া দিয়া বিপরীত তর্ক দ্বারা উহা আবার প্রতিষ্ঠিত করিতেন। হিন্দুধর্মশাস্ত্রে নূতন এক আলোকপাত করিয়া সকলকে বিস্ময়-বিমূঢ় করিয়া তুলিতেন। পরিশেষে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী আলোচনা করিয়া দেখাইতেন যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দুসমাজের পক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাবের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আরও বলিতেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারা সমগ্র বিশ্বে ধর্মপ্লাবন উপস্থিত করিবে। বরাহনগর মঠে এভাবে সঙ্ঘগঠনের কাজ চলিত।

* পত্রাবলী ১ম ভাগ।

বরাহনগর মঠে সময়োচিত বহু প্রকার ধর্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইত। শিবরাত্রি-ব্রত মহোৎসাহে উদ্‌যাপিত হইত। প্রত্যূষে উঠিয়া নরেন্দ্রনাথের নবরচিত গান "তাথৈয়া, তাথৈয়া, নাচে ভোলা, ব্যোম্ বব বাজে গাল"—সকলে সমস্বরে গাহিতেন। গানের উন্মাদনায় মনে হইত সকলেই যেন ভস্মলেপিত, ব্যাঘ্রচর্ম-পরিহিত, সর্পভূষণ মহাদেবের অপূর্ব নৃত্য চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছেন। সমস্ত রাত্রি প্রহরে প্রহরে পূজা হইত। সঙ্গে সঙ্গে সুগম্ভীর রব শোনা যাইত—"হর, হর, ব্যোম্ ব্যোম্।" উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনাও পূজার অবসর-সময়ে চলিত।

নরেন্দ্রনাথ অসামান্য মেধা, অভূতপূর্ব ধীশক্তি, ও অপরূপ অধ্যবসায় সহকারে যে পরা ও অপরা বিদ্যা অর্জন করিয়াছিলেন, সেই অর্জিত জ্ঞানরাশির সাহায্যেই গুরুভ্রাতাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি উৎসারিত ও অধ্যাত্ম-চেতনা উদ্‌বুদ্ধ করিতে সদাই সচেষ্ট থাকিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে এই কাজটির ভার দিয়াছিলেন। তাঁহার গুরু-ভ্রাতাগণও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে নেতা ও শিক্ষকের পদে বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই শিক্ষায় ও প্রেরণায় দেশ-বিদেশের জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল সমাচার আহৃত হইয়া তাঁহাদের জ্ঞান-ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইতে লাগিল। ভারতীয় মনীষীদিগের চিন্তাধারার অনুশীলন তো তাঁহারা করিতেনই, ভারতের বাহিরে যে সকল জ্ঞানী ও গুণী, কর্মী ও দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়া রত্নরাজি আহরণ করিতেও তাঁহাদের কোন কুণ্ঠা দেখা যাইত না। জ্ঞানের সীমায় গণ্ডিকাটা তাঁহারা আদৌ পছন্দ করিতেন না।

এক এক সময় তাঁহাদের এক এক বিষয়ে ঝোঁক চাপিত। সেই ঝোঁকের প্রবর্তকও হইতেন তাঁহাদের অবিসংবাদিত নেতা নরেন্দ্রনাথ। তাঁহারই প্রেরণা ও উৎসাহে কখনও বা বৌদ্ধ ধর্মের, কখনও বা খৃষ্টান ধর্মের, কখনও বা ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতবাদ-গুলি লইয়া আলোচনা ও পাঠাদি চলিত। নরেন্দ্রনাথের শিক্ষাপদ্ধতি ছিল বহুমুখী। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্কারমুক্ত শিক্ষা নরেন্দ্র-নাথের মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। সেই কারণে তিনি সকল শাস্ত্রের সারটুকু লইতে এবং মানুষের অন্তরের দেবত্ব ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেন।

মঠে ধ্যান-জপ ও ভজন লাগিয়াই থাকিত। কখনও বা দেখা যাইত নরেন্দ্রনাথ মধুরকণ্ঠে গান ধরিয়াছেন এবং তাঁহার গুরুভ্রাতারা সুবিধামত স্থানে বসিয়া ধ্যান-জপে মগ্ন আছেন। শরৎ মহারাজ তাঁহার শিক্ষায় সঙ্গীত-বিদ্যায় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন শরৎ মহারাজের কণ্ঠ ছিল অতি কোমল ও মধুর। তিনি সন্ধ্যার পর অনেকদিন তানপুরা সহযোগে গান করিয়া গুরুভ্রাতাদিগকে আনন্দ দান করিতেন। একদিন রাত্রে তাঁহার রমণীসুলভ কণ্ঠস্বর শুনিয়া পাড়ার কয়েকটি যুবক সন্দেহ করিল যে পরম-হংসদেবের চেলারা রাত্রির সুযোগে অসৎসঙ্গে আমোদ করিতেছে। একে একে তাহারা নিঃশব্দে পাঁচিল টপকাইয়া তাঁহাদের ঘরের সম্মুখে আসিয়া দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিল। দরজা খুলিয়া দিলে গায়ককে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। তাহাদের অপ্রতিভ ভাব দেখিয়া সাধুরা তাহাদের গান শুনিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিলেন। কিছুক্ষণ গান শুনিয়া তাহারা চলিয়া গেল। পরদিন উহাদের মধ্যে একজন অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া যায়।

বরাহনগর মঠে গৃহত্যাগী ভক্তদিগের তপশ্চর্যা চলিতে লাগিল। গৃহস্থ ভক্তেরাও মাঝে মাঝে

আসিতে লাগিলেন। নাগমহাশয় প্রায়ই আসিতেন। তাঁহার তপস্যার পুণ্যালোকে বরাহনগর মঠ আলোকিত হইত। সাধুগণ তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ লাভ করিতেন। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (মাষ্টার মহাশয়) মাঝে মাঝে বরাহনগর মঠে আসিতেন। মাষ্টার মহাশয় গৃহত্যাগী যুবকদিগের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী আলোচনা করিয়া নিজেও আনন্দ পাইতেন, ভক্তদিগকেও অনাবিল আনন্দ দিতেন।

নরেন্দ্রনাথকে দলপতি স্বীকার করিয়া লইলেও সমানভাবে সকলে সব কাজই করিতেন এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিকট হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিতেন। স্বামীজী এই সকল পুণ্যদিনের কথা স্মরণ করিয়া জনৈক শিষ্যকে একদিন বলিয়াছিলেন :—

শশীর কি আদর্শনিষ্ঠা আমরা দেখিয়া আসিতেছি। শশী আমাদের মঠের 'মা' ছিল। সেই-ই ভিক্ষা করিয়া আমাদের আহারের সকল ব্যবস্থা করিত। তখন আমরা রাত্রি ৩টার সময় উঠিয়া কেহ বা স্নান করিয়া, কেহ বা হাত-মুখ ধুইয়া ঠাকুরঘরে গিয়া বসিতাম। ধ্যান-জপে রাত্রিটুকু কাটিয়া যাইত। কোন কোন দিন সকাল হইলেই উঠিয়া পড়িতাম, কোন দিন বা বেলা ৪টা-৫টা পর্যন্ত ধ্যান-জপ চলিত, সময়ের কোন জ্ঞান থাকিত না। শশী খাবার তৈয়ারী করিয়া বসিয়া থাকিত। কখনও বা জোর করিয়া আমাদের ধ্যান-জপ হইতে তুলিয়া দিয়া আহার করাইত। জগৎ থাকুক বা না থাকুক, সে বিষয়ে আমরা তখন গ্রাহ্য করিতাম না।

এই সময় ভগবানলাভের জন্য তাঁহারা কঠোর তপস্যায় ব্রতী ছিলেন। ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (মাষ্টার মহাশয়) স্বামী বিমলানন্দকে তাহার ছাত্রাবস্থায় বলিয়াছিলেন —"যদি ত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে চাও, তবে একদিন বরাহনগর মঠে যাও, সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ত্যাগী শিষ্যমণ্ডলী থাকেন।" এই সময় অনেকেই বরাহনগর মঠ হইতে তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। তীর্থভ্রমণের পথেও তাঁহারা এইরূপ কঠোর ভাবেই জীবনযাপন করিতেন। অধিকাংশ সময় পায়ে হাঁটিয়াই চলিতেন এবং মাধুকরী করিতেন।

বরাহনগর মঠে একটি অনাড়ম্বর সিংহাসনের উপর শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহার সম্মুখে তাঁহার দেহাবশেষ অস্থি ও ভস্ম একটি তাম্রপেটিকায় থাকিত। প্রতিদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ও আরতি হইত। গৃহত্যাগী ভক্তেরা তাঁহার সম্মুখে ভজন গান করিতেন। পুণ্যধাম বারাণসীর বিশ্বনাথমন্দিরে প্রতি সন্ধ্যায় আরতির সময়—"জয় শিব ওঁকার। ভজ শিব ওঁকার। ব্রহ্মা বিষ্ণু সদাশিব। হর হর মহাদেব!" প্রভৃতি যে স্তোত্রটি আজও গীত হইয়া থাকে, বরাহনগর মঠে আরতির সময় প্রথম প্রথম সেই স্তোত্রটিই বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গীত হইত। শেষের দিকে স্বামী অভেদানন্দজীর রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ-স্তোত্র—

"নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং
ভক্তানুকম্পাধৃতবিগ্রহং বৈ।
ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং
তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ॥" প্রভৃতি

সুর করিয়া আবৃত্তি করা হইত। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা নিখুঁতভাবে চলিত। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীই শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবার সকল ব্যবস্থা নিজহাতে করিতেন। পূজার জন্য অপরের বাগানে ফুল তুলিতে গিয়া বা শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ দিবার জন্য অনন্যোপায় হইয়া মঠের পার্শ্ববর্তী বাগানে শাকসবজি সংগ্রহ করিতে গিয়া তাঁহাকে অনেক সময় অপমানিত হইতে

হইত। সে অপমান তিনি মাথা পাতিয়া লইতেন। কালীকৃষ্ণ মহারাজ বরাহনগর মঠে যোগ দিলে, শশী মহারাজকে এই সকল কাজে তিনি অনেক সাহায্য করিতেন। সকলেই বরাহনগর মঠ হইতে তীর্থপর্যটনে বাহির হইতেন; কিন্তু শশী মহারাজ একাদিক্রমে ১০।১১ বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা একটানা করিয়াছেন, মঠ ছাড়িয়া অন্য কোথাও যান নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাই তখন তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। পরবর্তীকালেও যখন যেখানে থাকিতেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবার ভার নিজেই লইতেন।

শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের দেহাবসানের কয়েক মাস পরেই বরাহনগর মঠে বিরজা হোম করিয়া স্বামীজী, রাখাল মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, শশী মহারাজ, শরৎ মহারাজ, সুবোধ মহারাজ, কালী মহারাজ, তারক মহারাজ প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। গঙ্গাধর মহারাজ তখন মঠে উপস্থিত না থাকায় পরে মঠে ফিরিয়া সন্ন্যাস লন। শুনা যায়, কালী মহারাজই সন্ন্যাসের সময় সকলকে মন্ত্রপাঠ করাইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ন্যাসী সন্তানগণের মধ্যে এগারোজনকে শ্রীশ্রীঠাকুর কাশীপুর উদ্যানবাটীতে গেরুয়া-বস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। বুড়ো গোপালদাদা, লাটু মহারাজ ও তারক মহারাজ কাশীপুর মঠ হইতে আর বাড়ী ফিরিয়া যান নাই। অন্যান্য গৃহত্যাগী শিষ্যেরা কিছু দিনের জন্য বাড়ী গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরে একে একে বরাহনগর মঠে আসিয়া যোগ দেন।

আর একটি অদ্ভুত ঘটনা বরাহনগর মঠে ঘটিয়াছিল। উহাও এই স্থানে উল্লেখযোগ্য। ঘটনাটি স্বামীজীর শিষ্য শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় মহাপুরুষ মহারাজের মুখে শুনিয়া বলিয়াছিলেন: একদিন অনেক রাত্রে বরাহনগর মঠে স্বামীজী ও মহাপুরুষ মহারাজ একই মশারির মধ্যে শুইয়া আছেন। উভয়েই নিদ্রিত, এমন সময় একটি আলোর ঝলকে মহাপুরুষ মহারাজের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখেন মশারির বাহিরের দিকে শিবাকৃতি ছোট ছোট মূর্তি ত্রিশূল হাতে বসিয়া আছেন, তাঁহাদের শরীর ও ত্রিশূল হইতে অদ্ভুত জ্যোতি নির্গত হইতেছে। উহা তাঁহার মনের ভ্রম মনে করিয়া পুনরায় চক্ষু বুজিলেন, কিন্তু আলোর ঝলকে ঘুম হইল না। চাহিয়া দেখেন সেই মূর্তিগুলি সেই ভাবেই ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। ব্যাপার কি সঠিক বুঝিতে না পারিয়া তিনি স্বামীজীকে ডাকিয়া সব বলিলেন, ও তাঁহাদের দিকে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করিলেন। স্বামীজী কিন্তু উহাতে কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই পাশ ফিরিয়া শুইলেন, এবং তাঁহাকেও ঐরূপ করিতে বলিলেন; অগত্যা এইভাবে রাত্রিটি কাটিয়া গেল। সকালে উঠিয়া পুনরায় মহাপুরুষ মহারাজ স্বামীজীকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামীজী নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিলেন—"উঁহারা আর কেহ নন, বটুকভৈরব। ছোটবেলা হইতে উঁহারা এইভাবে আমাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।"

শেষের দিকে অনেকেই বরাহনগর মঠ দেখিতে আসিতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী শিষ্যগণ সুযোগ পাইলেই মঠে আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহারা প্রায়ই বলিতেন যে, সংসারের কোলাহল হইতে অব্যাহতি পাইয়া তাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের সংসারে শান্তিলাভ করিতে আসিয়াছেন। সন্ন্যাসী ভক্তেরাও তাঁহাদের বিশেষ আদরযত্ন করিতেন, তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির সহায় হইতেন

বরাহনগর মঠে যুবক সন্ন্যাসিগণ দুঃখ-অনটনের পীড়ন হাসিমুখে কতখানি সহ্য করিতেন, তাহার একটি নিদর্শন দিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। একদিন মঠের কয়েকজন সন্ন্যাসী ভিক্ষায় বাহির হইয়া শূন্যহস্তে ফিরিয়া আসিলেন। কোথাও একমুষ্টি চাউলও মিলিল না, শ্রীগুরু মহারাজের ভোগ দিবেন কি দিয়া—এই চিন্তায় শশী মহারাজ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। এইরূপ অবস্থায় গুরুভ্রাতাদিগকে ভজন ও কীর্তনে প্রমত্ত দেখিয়া তিনি গোপনে এক পরিচিত প্রতিবেশীকে ডাকিয়া সব কথা বলিলেন। প্রতিবেশী যুবকটি বাড়ীর সকলের অজ্ঞাতেই প্রায় এক পোয়া চাউল, কয়েকটি আলু এবং অল্প একটু ঘৃত আনিয়া শশী মহারাজকে দিলেন। শশী মহারাজ সানন্দে উহা গ্রহণ করিয়া মঠে গিয়া রান্না করিলেন, এবং শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করিলেন। নিবেদনান্তে সব একসঙ্গে মাখিয়া কয়েকটি নাড়ু তৈয়ারী করিলেন। দানাদের ঘরে গিয়া এক একটি ভাতের ডেলা সংকীর্তনে উন্মত্ত গুরু-ভাইদের প্রত্যেকের মুখে গুঁজিয়া দিলেন। ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঐ সামান্য জিনিসেই তাঁহারা গভীর পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন। পরে বিস্মিত নেত্রে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাই শশী, এমন সুমিষ্ট নাড়ু কোথায় পাইলে ?" আত্মানন্দে বিভোর সাধুদের ক্ষুধাতৃষ্ণাবোধও সব সময় থাকিত না।

১৮৯১-৯২ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষিত যুবকদিগের একটি দল প্রায়ই বরাহনগর মঠ দেখিতে আসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই শশী মহারাজের ত্যাগ ও নিষ্ঠা এবং শরৎ মহারাজের প্রীতি ও ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে সুধীরচন্দ্র চক্রবর্তী (স্বামী শুদ্ধানন্দ), কালীকৃষ্ণ বসু (স্বামী বিরজানন্দ), খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (স্বামী বিমলানন্দ), গোবিন্দচন্দ্র শুকুল (স্বামী আত্মানন্দ), হরিপদ চট্টোপাধ্যায় (স্বামী বোধানন্দ) এবং সুশীলচন্দ্র চক্রবর্তী (স্বামী প্রকাশানন্দ)-ই প্রধান। মাষ্টার মহাশয়ই (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) এই সকল যুবককে বরাহনগর মঠের সন্ধান দেন। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই সকল যুবককে দীক্ষা দেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যদিগের সংস্পর্শে আসিয়া এবং তাঁহাদের ত্যাগ ও তিতিক্ষাদর্শনে মুগ্ধ হইয়া যখন আরও অনেক শিক্ষিত যুবক বরাহনগর মঠে আসিয়া যোগ দিতে লাগিলেন, তখন ঐ জীর্ণ ও সংকীর্ণ বাড়ীতে স্থানাভাব ঘটিতে আরম্ভ হইল। তখন ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বরাহনগর মঠ হইতে প্রায় দুই মাইল উত্তরে আলমবাজারে মঠ স্থানান্তরিত হইল। এখনও এই মঠবাড়ী দেশবন্ধু রোডে (পশ্চিম), আলমবাজার পোষ্ট অফিসের নিকট জীর্ণাবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। ৩২ এবং ৩৪নং বাস উহার সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করে।

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের বীজ উপ্ত হইয়াছিল ; বরাহনগর মঠে উহার অঙ্কুরোদ্গম হইয়া লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রকাশ ঘটে ; ক্রমে বর্ধিত হইয়া আজ উহা পৃথিবী জুড়িয়া শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে

যে-স্থানে বরাহনগর মঠ অবস্থিত ছিল, সে-স্থানে এখনও কিছুটা জমি খালি পড়িয়া আছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় স্থানটি সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইলে একটি পুণ্যস্মৃতিময় তীর্থরূপে ভবিষ্যতে অগণিত তীর্থযাত্রীর হৃদয়ে চির-অম্লান প্রেরণার আলোক বিকিরণ করিতে থাকিবে।

লতা বা কুণ্ডলিনীশক্তি

শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী

শাস্ত্রে বিষ্ণুশক্তি জগন্মাতা প্রকৃতিকে "লতা" বলা হইয়াছে :

'লতাভূতা জগন্মাতা শ্রীর্বিষ্ণুর্দ্রুমসংস্থিতঃ ॥

(বিষ্ণুপুরাণ ১।৮।২৮)

শ্রীবিষ্ণু-বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া জগন্মাতা শক্তিরূপিণী প্রকৃতি যেন লতার ন্যায় অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। যেমন বিষ্ণু এই জগতের কারণ অনন্ত সর্ব্বব্যাপী মূল পদার্থ, প্রকৃতিও সেইরূপ জগৎ-উৎপত্তির কারণ অনন্ত সর্ব্বব্যাপী শক্তি :

'যথা সর্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম ॥'

(বিষ্ণুপুরাণ ১।৮।১৫)

ইহাই প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্ব। শাক্তের শিব-কালীর এবং বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তির তত্ত্বও ইহাই। চৈতন্যরূপ পুরুষের আশ্রয়ে শক্তিরূপা প্রকৃতি বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের খেলা খেলিতেছেন। পুরুষ দ্রষ্টা, নিষ্ক্রিয়। প্রাণময়ী শক্তিরূপা প্রকৃতি গতিশীল ও সক্রিয় ; অথচ ইহারা দুই-এ এক, একে দুই, যেমন অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা শক্তি। বিষ্ণুশক্তি প্রকৃতি বৈষ্ণব শাস্ত্রে শ্রীরাধা। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলা হইয়াছে। দেবী-ভাগবতেও শ্রীরাধাকে প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী বলা হইয়াছে। এই প্রাণময়ী শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণুপরমাণুতে প্রাণরূপে অনুস্যূতা রহিয়া সৃজন পালন ও লয় ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন। মানবদেহেও এই মহাশক্তিরই লীলাবিলাস চলিতেছে। সাধকগণ ধ্যাননেত্রে প্রাণরূপা এই মহাশক্তিকে স্বীয় দেহমধ্যেই দর্শন করিয়া থাকেন। শাক্তেরা এই দেহমধ্যস্থ শক্তিকে বলেন কুল-কুণ্ডলিনী। আর বৈষ্ণবেরা বলেন হ্লাদিনী বা রাধাশক্তি। এই সক্রিয় গতিশীল প্রাণশক্তি সাধকদেহে লতার ন্যায়ই অনুভূত হন। এইজন্য যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে মহাশক্তি কুণ্ডলিনীকে 'লতা' নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

এই মহাশক্তি কুণ্ডলিনীর সাধনাই প্রকৃত লতা-সাধন। সাধকদেহে এই শক্তির উন্মেষ ও স্ফুরণ হয় যোগসাধনা-বলে অথবা তীব্র ধ্যানানুশীলনে অথবা ভক্তিপ্রভাবে। রামকৃষ্ণ-সাহিত্য আলোচনা করিয়া যতদূর বোঝা যায়, তাহাতে মনে হয়, তীব্র ভক্তি-প্রভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কুণ্ডলিনী-শক্তি উদ্বোধিতা হইয়াছিলেন। 'চরিতামৃত'কার এই শক্তিকে 'ভক্তিলতা' নামে অভিহিতা করিয়াছেন :

'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্তন জলে করয়ে সিঞ্চন ॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায় ॥
তবে যায় তদুপরি গোলক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষ করে আরোহণ ॥
... ...
এইত পরম ফল পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥'

কোন কোন ভাগ্যবান জীব বা সাধক দেহ-ব্রহ্মাণ্ডে তত্ত্ববস্তুর অনুসন্ধান করিতে করিতে গুরুপ্রসাদে সাধনবীজ প্রাপ্ত হইয়া উক্ত বীজ সাধন করত ভক্তিলতাকে স্বীয় দেহ-

মধ্যে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তাঁহার দেহে শক্তির উন্মেষ ও স্ফুরণ হয়। সাধক-মালী শ্রবণ-কীর্তন দ্বারা সেই গুরুদত্ত বীজের যতই অনুশীলন করেন, ততই তাঁহার প্রাণ সংযত হয়; তাঁহার দেহে সংযত প্রাণের গতি লতার মতই অনুভূত হইতে থাকে, ধ্যানপ্রভাবে মূলাধার হইতে উঠিয়া এই লতাশক্তি চক্রসমূহ ভেদ করত বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রম করিয়া পরমব্যোম সহস্রার-চক্রে যায় এবং পরিশেষে মহাশূন্যে অবস্থিত নিত্যবৃন্দাবনে কৃষ্ণচরণ-রূপ কল্পবৃক্ষে আরোহণ করে।

লতাশক্তি বা কুণ্ডলিনীকে অবলম্বন করিয়াই সাধক-মালীকে কল্পবৃক্ষের সমীপে অর্থাৎ সাধনার চরম অবস্থায় পরমতত্ত্বে যাইতে হয়। মহাশক্তির আশ্রয় ব্যতীত কেহ এই ভববন্ধন ছিন্ন করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারে না। সেই জন্য সাধক শক্তিরই আরাধনা সর্বাগ্রে করেন। 'চরিতামৃত'কারও বলিয়াছেন :

'লতা অবলম্বি মালি কল্পবৃক্ষ পায়।'

যিনি প্রকৃত বৈষ্ণব, যিনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি জানেন যে, বৈষ্ণবের আধ্যাত্মিক সাধনার সহিত শাক্তের সাধনার কত নিকটতম সম্বন্ধ ও সাদৃশ্য রহিয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্বপ্রধান প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থ; অথচ এই শাস্ত্রগ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি প্রসঙ্গে ষট্‌চক্র এবং সুষুম্না পথের সাধনা সমর্থিত হইয়াছে। শুধু সমর্থিত হইয়াছে বলি কেন? এই সাধনপন্থাকে সনাতন ও বৈদিক বলিয়া অভিহিত করত আরও বলা হইয়াছে যে, এই সাধনপন্থাতেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেবীভাগবতেও এই সাধন-পন্থাকেই সনাতন ও বৈদিক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

চরিতামৃতকারও তাঁহার গ্রন্থে চক্রসাধনা সম্পর্কীয় নিম্নলিখিত শ্লোকটি শ্রীমদ্ভাগবত হইতে উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করিতেছেন। যথা—

উদরমুপাসতে ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥

দেবগণ হরিকে বলিয়াছিলেন, "ভগবান! তাপসগণের মধ্যে স্থূলদর্শী ঋষিরা উদরদেশ মধ্যে মণিপুরস্থিত ব্রহ্মের চিন্তা করিয়া থাকেন, আরুণিরা হৃৎপ্রদেশস্থ নাড়ীপথে সূক্ষ্ম ব্রহ্মের উপাসনা করেন। হে অনন্ত! তৎপরে তাঁহারা ত্বদীয় উপলব্ধিস্থল শিরঃপ্রদেশে উপনীত হন, তথায় গমন করিলে আর তাঁহাদিগকে কৃতান্তমুখে পতিত হইতে হয় না।" এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শ্রীমদ্ভাগবত শির-প্রদেশ বা সহস্রার-চক্রকে হরির বা শ্রীকৃষ্ণের উপলব্ধিস্থল বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন এবং এই চক্রসাধন-পন্থাতে যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হওয়া যায় সে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন :

এতে সৃতী তে নৃপ বেদগীতে
ত্বয়াভিপৃষ্টে চ সনাতনে চ।
যো বৈ পুরা ব্রহ্মণ আহ পৃষ্ট
আরাধিতো ভগবান্ বাসুদেবঃ ॥ ২।২।৩২

হে রাজন্! তুমি যে দুই সনাতন পথ সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তির কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা বেদে এইভাবেই কথিত আছে। পূর্বে আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান বাসুদেব ব্রহ্মাকে এই দুই গতির বিবরণ বলিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলিতেছেন—

ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ।
বাসুদেব ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ ॥
২।২।৩৩

সাংসারিক মানবগণের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর কল্যাণপ্রদ গতি নাই; কারণ ইহা হইতে ভগবান শ্রীহরিতে প্রেম-ভক্তির উদ্রেক হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এই কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণজনিত সর্বোচ্চ সাত্ত্বিক ভাবগুলির বিকাশ লক্ষিত হয়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমভক্তি-মার্গাবলম্বী পরম যোগী ছিলেন। যোগমার্গে যেরূপ দিব্যোন্মাদ অবস্থা হয়, তাঁহার জীবনেও সেইরূপ হইয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনেও এই দিব্যোন্মাদ হইয়াছিল; তিনি মহাশক্তি লাভ করিয়া যোগের চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন এবং স্বীয় দেহকেই মহাশক্তির আধার জ্ঞান করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভুর যোগবিভূতির কিছু কিছু পরিচয় বৈষ্ণব শাস্ত্রে পাওয়া যায়। মহাপ্রভুর স্বরূপ অবগত হইয়া বীর রামানন্দ যখন ভাবানন্দে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন মহাপ্রভু হস্তস্পর্শে তাঁহার চেতনা আনয়ন করেন।

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

'প্রভু তারে হস্তস্পর্শে করায় চেতন।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবও ঐরূপ হস্তস্পর্শে শিষ্যগণের সমাধি ভঙ্গ করিতেন।

যোগমার্গে যেরূপ ধ্যান স্পর্শ ও দৃষ্টি দ্বারা শক্তিসঞ্চারের ব্যবস্থা আছে মহাপ্রভুও সেইরূপ স্পর্শাদির দ্বারা শক্তিসঞ্চার করিতেন, চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে—

'প্রভু কহে ইহা আমার প্রয়াগে মিলিল।
যোগ্য পাত্র জানি ইহাই গৌর কৃপা হইল॥
তবে শক্তি সঞ্চারি আমি কৈল উপদেশ।
তুমিও কহিও ইহায় রসের বিশেষ॥'

মহাপ্রভু পরমতত্ত্ব মহাভাবে সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্তি দেখিতেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহার নিকট কৃষ্ণময় হইয়া গিয়াছিল। যথা,—

'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে—
তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরও সেই অবস্থা হইয়াছিল। কালীমন্দিরে পূজা করিতে করিতে তিনি মন্দিরের বিভিন্ন বস্তুকে চিন্ময় দেখিয়াছিলেন। কারণ সেই অবস্থায় সর্বত্র তিনি মহাশক্তির স্ফুরণ উপলব্ধি করিতেছিলেন। জগন্মাতাজ্ঞানে বিড়ালকে ভোগের লুচি খাওয়ানই তাহার একটি নিদর্শন। ইহাই সমদর্শী অবস্থা ব্রহ্মভাব বা মহাভাব। শাস্ত্রে আছে—

'অগ্নির্দেবো দ্বিজাতীনাং মুনীনাং হৃদিদৈবতম্।
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং সর্বত্র সমদর্শিনঃ॥

পবিত্রতাঘনমূর্তি শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে এই কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণের জন্য সাধনা ও সিদ্ধিলাভ দেখিয়া আমরা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারি যে, পূর্ণ পবিত্রতা ছাড়া এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব নয়। আমাদের চিত্তের দুর্বলতা ও ভোগাসক্তিই দৃষ্টির আবিলতা আনিয়া সাধনপথকে অপবিত্র করে; যোগশাস্ত্র-সম্মত সাধন অনধিকারীর হস্তে পড়িয়া কী বিকৃত রূপ ধারণ করে!

যশোধরা

স্বামী দিব্যাত্মানন্দ

রাজদুহিতা যশোধরার সঙ্গে কপিলাবস্তুর শাক্যবংশীয় রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র সিদ্ধার্থের বিবাহ হইয়াছিল।

সিদ্ধার্থের জন্মের পর জননী মায়াদেবী দেহত্যাগ করেন। নবজাতকের ভাগ্যগণনা করিয়া অসিত ঋষি বলিয়াছিলেন, 'এই শিশু বিশ্বের মুক্তিদাতা ও সকলের কল্যাণের নিদান হইবে।' মায়াদেবী সেকথা শুনিয়াছিলেন। এরূপ সন্তানের জননী হওয়ার সৌভাগ্য যে কত দুর্লভ, তাহা তিনি জানিতেন। দেহত্যাগের পূর্বে তাই সানন্দে ঘোষণা করিয়াছিলেন, 'যে মাতা এরূপ সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, তিনি আর অপর কোন সন্তানের জননী হইবেন না।' রাজা শুদ্ধোদনের বুকও পুত্রগর্বে ভরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু একমাত্র পুত্র সন্ন্যাসী হইলে চলিবে কেন? পুত্রের মনে যাহাতে সংসারের দুঃখ-কষ্টের চিত্র ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ না পায়, যাহাতে সংসারত্যাগের ইচ্ছা তাহার মনে না জাগে, তাহার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরমসুন্দরী যশোধরার সঙ্গে তাহার বিবাহও দিয়াছিলেন সেইজন্য।

শ্রেষ্ঠ ভোগ্যবস্তুপূর্ণ রমণীয় প্রাসাদে দেবোপম রূপগুণসম্পন্ন স্বামীর সঙ্গে যশোধরা কিছুকাল পরমসুখে অতিবাহিত করিলেন। যথাকালে একটি পুত্রসন্তানের জননীও হইলেন। সংসারে সুখের পাত্র কানায়-কানায় ভরিয়া উঠিল। ঠিক সেই সময়েই ঘটিল বিপর্যয়।

রাজা শুদ্ধোদনের সব চেষ্টা ব্যর্থ হইল। একদিন রাজপথে রথে চড়িয়া ভ্রমণকালে সিদ্ধার্থ মানুষের জরা-ব্যাধি ও মৃত্যুর দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিলেন। একদিন একবার দেখিয়াই বুঝিলেন, জীবন অনিত্য, জীবনের পরিবর্তন ও দুঃখ-কষ্টের কবল হইতে কাহারো নিস্তার নাই। জীবনের এই নগ্নরূপ দেখিয়া ভারাক্রান্ত চিত্তে সারথিকে বলিলেন, "জীবনের এই অবস্থাগুলি অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও মানুষ নিশ্চিন্ত হইয়া সংসার-সুখ ভোগ করে কিরূপে?"

সিদ্ধার্থ রাজ্যসম্পদ, স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, সন্ন্যাসী হইলেন; দুঃখ-কষ্ট, অশান্তি প্রভৃতির হাত হইতে মানুষের মুক্তিলাভের পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগকালে যশোধরা পুত্রকে বুকে জড়াইয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। জাগিয়া উঠিয়া দেখিলেন, গৃহ শূন্য। পরে জানিলেন, সিদ্ধার্থ সন্ন্যাসী হইয়াছেন; মস্তক মুণ্ডিত করিয়া তিনি জীর্ণবাস পরিধান করিয়াছেন, ভিক্ষান্নে জীবন-ধারণ করিতেছেন।

শুনিয়া যশোধরা নিজের মস্তকও মুণ্ডিত করিলেন। অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ করিলেন। স্বামী যেরূপ করিতেছেন শুনিয়াছিলেন, সেরূপ নির্দিষ্ট সময়ে মাটির পাত্রে আহার করিতে লাগিলেন। সিদ্ধার্থ তপস্যা করিতেছেন অরণ্যে আর যশোধরার কঠোর তপশ্চর্যা চলিল বিপুল ভোগ্যবস্তু-পরিবৃত রাজপ্রাসাদের মধ্যেই দুর্নিবার ইচ্ছাশক্তি সহস্র প্রলোভনের মাঝখানেই ত্যাগের আসন বিছাইল।

দীর্ঘ সাত বছর এভাবে অতিবাহিত হইল।

সাত বছর পর যশোধরা সিদ্ধার্থকে পুনরায় দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন

সিদ্ধার্থ ততদিনে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া বুদ্ধ হইয়াছেন ; সত্যলাভজনিত জ্ঞান-প্রদীপ্ত ও করুণার্দ্র হৃদয়ে মানুষকে সেই সত্যলাভ করিবার পথ দেখাইয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেছেন। কিভাবে চলিলে সর্ববিধ দুঃখের পারে যাইয়া মহাশান্তির অধিকারী হওয়া যায়, তাহাই প্রচার করিতেছেন। তাঁহার শান্ত সৌম্য মূর্তি, তাঁহার করুণাবর্ষী নয়ন, তাঁহার ত্যাগপূত জীবন, তাঁহার অমৃতময় বাণী অসংখ্য ব্যক্তিকে তাঁহার কৃপাছায়ায় টানিয়া আনিতেছে, শান্তিসলিলে অবগাহন করাইতেছে।

বুদ্ধদেব তখন রাজগৃহে অবস্থান করিতেছেন। শুদ্ধোদন তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে তিনি পুত্রকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল। বুদ্ধদেব কপিলাবস্তু অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শুদ্ধোদন মন্ত্রীগণ সহ আগাইয়া আসিয়া পুত্রকে সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন। পুত্রের অপরূপ কান্তি দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া শুদ্ধোদনের হৃদয় হইতে এতদিনের দুঃসহ দুঃখ দূরীভূত হইল। তিনি আনন্দিতচিত্তে পুত্রকে আশীর্বাদ করিলেন, 'মুক্তিলাভেচ্ছু মানবের নিকট তুমি মুক্তির দ্বার অবারিত কর।' শুদ্ধোদন প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। বুদ্ধদেব রাজধানীর নিকটস্থ অরণ্যে অবস্থান করিলেন।

পরদিন গৈরিকবসন-ভূষিত বুদ্ধ ভিক্ষাপাত্র হস্তে রাজধানীর পথে ভিক্ষায় বাহির হইলেন। শুদ্ধোদন সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে প্রাসাদে লইয়া গেলেন।

রাজপরিবারের সকলেই বুদ্ধকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার নিকট সমবেত হইলেন। কিন্তু যশোধরা আসিলেন না। শুদ্ধোদন তাঁহাকে আসিবার জন্য সংবাদ পাঠাইলেন।

যশোধরা বলিয়া পাঠাইলেন, 'যদি আমি শ্রদ্ধার পাত্রী হই, সিদ্ধার্থ নিশ্চয়ই আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।' শুনিয়া শুদ্ধোদন আর কিছু বলিলেন না।

কিছুক্ষণ পর বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "যশোধরা কোথায়? তাহাকে তো দেখিতেছি না!" শুদ্ধোদন বলিলেন যে যশোধরা এখানে আসিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

শুনিয়া বুদ্ধদেব দুইজন শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া নিজেই যশোধরার কাছে চলিলেন। শুদ্ধোদনও সঙ্গে চলিলেন। পথে বুদ্ধদেব শিষ্যদ্বয়কে বলিলেন, "দেখ, আমি মুক্তিলাভ করিয়াছি, কিন্তু যশোধরা এখনো মুক্ত হয় নাই। আমার অদর্শনজনিত শোকে তাহার হৃদয় অতিশয় অভিভূত হইয়া আছে। সে যদি আমার পাদস্পর্শ করিতে চায়, তাহাকে বাধা দিও না।"

যশোধরার কক্ষে উপনীত হইয়া বুদ্ধদেব কর্তিত-কেশা, জীর্ণবস্ত্রপরিহিতা তপস্বিনী যশোধরাকে উপবিষ্টা দেখিলেন।

বুদ্ধদেবকে দেখামাত্র যশোধরা অজস্র অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে তাঁহার পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া লুটাইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর নিজেকে সংযত করিয়া উঠিয়া বসিলেন।

বুদ্ধদেব কিছুক্ষণ তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিলেন। বলিলেন, "যশোধরা, তুমি পূর্বপূর্ব জন্মে বহু পুণ্য অর্জন করিয়াছিলে। তোমার শোক বর্ণনাতীত। আবার, তোমার পূর্বপূর্ব জন্মার্জিত মহিমারও সীমা নাই। সেই সুকৃতি-বলে, এবং ইহজন্মে যে পবিত্র জীবন যাপন করিতেছ তাহার ফলে তোমার সব দুঃখের অবসান হইবে, তুমি পরমানন্দ লাভ করিবে।" যশোধরার হৃদয় শান্ত হইল।

এই সময় কপিলাবস্তুর বহুলোক বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করিলেন। রাজপরিবারের দুই জন যুবক সঙ্ঘে যোগদান করিলেন—সিদ্ধার্থের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আনন্দ এবং পিসতুতো ভাই

দেবদত্ত। সিদ্ধার্থের পুত্র রাহুলের বয়স তখন মাত্র সাত বছর—সেও ভিক্ষুজীবন বরণ করিল, সঙ্ঘভুক্ত হইল। যশোধরাই তাহাকে বুদ্ধের নিকট পাঠাইয়াছিলেন; পুত্রকে কোলে লইয়া বাতায়ন-পথে বুদ্ধকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "উনি তোমার পিতা। উঁহার নিকট যাও ও পিতৃধনের উত্তরাধিকার প্রার্থনা কর।"

রাহুল বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া সেইমত প্রার্থনা জানাইলে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, "আমি ইহাকে অনিত্য সম্পদ দিব না, নিত্য সম্পদের অধিকারী করিব, পবিত্র জীবনের উত্তরাধিকার দিব।" রাহুল সঙ্ঘে যোগ দিতে ইচ্ছুক কি না জিজ্ঞাসা করায় রাহুল সানন্দে সম্মতি জানাইল।

বৃদ্ধ রাজা শুদ্ধোদনকে আঘাতের পর আঘাত সহ্য করিতে হইয়াছিল। বালক রাহুলও ভিক্ষু হইয়া গিয়াছে শুনিয়া তিনি মর্মাহত হইলেন।

যশোধরা ভিক্ষুণী হইবার জন্য বুদ্ধের নিকট তিনবার প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব রাজী হন নাই। শুদ্ধোদনের দেহত্যাগের পর পুনরায় প্রার্থনা জানাইলে বুদ্ধদেব সম্মত হইয়া তাঁহাকে ভিক্ষুণী-সঙ্ঘভুক্তা করিলেন। সিদ্ধার্থের বিমাতা প্রজাপতিও সঙ্ঘভুক্তা হইলেন।

যশোধরা ভিক্ষুণী হইয়া দীর্ঘকাল ভিক্ষুণী-সঙ্ঘের সেবা করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের জীবিতকালেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

রাজগীরে তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করা হয়।

অসংখ্য মহীয়সী নারীর উজ্জ্বল জীবন খচিত ভারত-গগনে যশোধরার জীবন বিপুল ভাস্বরতাময় একটি জ্যোতিষ্ক। ভারতীয় নারীত্বের আদর্শের পথে তাহা চিরদিন অম্লান আলোক বিকিরণ করিয়া চলিবে।

রূপ ও নাম

শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস

সাগর হ'তে বাষ্পরূপে
উঠিয়া দূর আকাশে
হারায়ে রূপ, হারায়ে নাম
আসিয়া গিরি-সকাশে
চরণ'পরে ভক্তিভরে
অবশদেহে লুটায়ে প'ড়ে
ফিরায়ে আনে সলিল তার
আপন রূপ-নাম,
নতুন ক'রে সাগর পানে
করে যে অভিযান।

ধরায় মোরা শতেক বার
ছাড়িয়া খেলাঘর
বাহিরে গেছি, এসেছি ফিরে
আবার ধরা'পর।
বাসনা শুধু ঘোরায় মোরে
জীবন হ'তে জীবনতীরে;
টানিয়া লও চরণে তব
মুছায়ে অভিমান
নিভায়ে মোর বাসনাদীপ,
ঘুচায়ে রূপ-নাম।

সমালোচনা

BRAHMA-SŪTRA BHĀṢYA of Saṅkarācārya— Translated by Swami Gambhirananda. Advaita Ashrama, 5 Dehi Entally Road, Calcutta 14. Pages 920+XVII. Price Rs. 20·00

হিন্দুধর্মতত্ত্বের মূল ভিত্তি বেদান্ত বা উপনিষদ্। সত্যদ্রষ্টারা, ঋষিরা যে চিরন্তন আধ্যাত্মিক সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, উপনিষদ্গুলি তাহারই বাণীরূপ। বিভিন্ন উপনিষদে এই সত্যগুলি বিভিন্নভাবে ছড়ানো রহিয়াছে। মহর্ষি বেদব্যাস সত্যদৃষ্টির তপোবন-সঞ্জাত বিভিন্ন উপনিষদ্-তরুশির হইতে বিভিন্ন উক্তি-কুসুমগুলি আহরণ করিয়া, গুছাইয়া সাজাইয়া একটি অপূর্ব পুষ্পস্তবক গড়িয়া তুলিয়াছেন; অতি সংক্ষিপ্তাকারে, সূত্রাকারে বেদান্তোক্ত সত্যগুলিকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বেদান্ত-সূত্রে। উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা— এগুলি বেদান্ত-দর্শনের প্রামাণিক গ্রন্থ; এগুলিকে প্রস্থান-ত্রয় বলে।

চরম আধ্যাত্মিক সত্য সম্বন্ধে প্রচলিত মতবাদগুলির মধ্যে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত —এই তিনটিই প্রধান। প্রধানতঃ মধ্বাচার্য দ্বৈতভাবে, রামানুজাচার্য বিশিষ্টাদ্বৈতভাবে এবং শঙ্করাচার্য অদ্বৈতভাবে নিজ নিজ দার্শনিক মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই প্রস্থানত্রয়ের উপর ভাষ্যরচনা করিয়া নিজ নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন:—বুঝাইয়াছেন যে তাঁহাদের প্রচারিত মতবাদ প্রস্থানত্রয়ে নিহিত সত্যের অনুগ।

ভাষ্য-রচনাকালে প্রচলিত অন্যান্য দার্শনিক মতবাদগুলিকে যুক্তি-প্রমাণ সহায়ে খণ্ডন করিয়া নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। আচার্য শঙ্কর অতি ব্যাপক, বিস্তৃত ও সূক্ষ্মভাবে তাহা করিয়াছেন। শঙ্কর-ভাষ্য তাই দার্শনিকদের নিকট সমধিক সমাদৃত। বলা বাহুল্য, মূল ভাষ্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

সংস্কৃত ভাষায় মূল ভাষ্য অনুসরণ করা যাঁহাদের পক্ষে অসুবিধাজনক, ইংরেজী ভাষায় অনূদিত এই গ্রন্থখানি তাঁহাদের যথেষ্ট সহায়ক হইবে।

গ্রন্থটিতে ব্রহ্মসূত্রের মূল সংস্কৃত সূত্র প্রথমে দেওয়া হইয়াছে; পরে দেওয়া হইয়াছে সংস্কৃত শব্দের পাশে পাশে আক্ষরিক অনুবাদ। তাহার পর দেওয়া হইয়াছে সূত্রটির সরলার্থ। সরলার্থের মধ্যে যেসব স্থানগুলি আরও সহজবোধ্য করার প্রয়োজন হইয়াছে, সেখানে বন্ধনীমধ্যে প্রয়োজনীয় শব্দ বা বাক্য সংযোজিত হইয়াছে।

তারপর শুরু হইয়াছে ভাষ্যের অনুবাদ। ভাষ্যানুবাদকেও প্রসঙ্গ অনুসারে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; প্রসঙ্গের বিষয়বস্তু কোথাও কয়েকটি সূত্রের ভাষ্য জুড়িয়া রহিয়াছে, কোথাও বা একটি সূত্রের ভাষ্যের মধ্যেই প্রসঙ্গান্তর আরম্ভ হইয়াছে।

ভাষ্যরচনার সাধারণ ধারা হইল, বক্তব্য বিষয়ের বিপক্ষে কি কি সন্দেহ জাগিতে পারে, তাহা নিজেই উত্থাপিত করিয়া (পূর্বপক্ষ) পরে খণ্ডন করা। অনুবাদক পূর্বপক্ষের আপত্তি ও তাহার খণ্ডনগুলিকে প্রশ্নোত্তরের আকারে সাজাইয়াছেন; ভাষ্যার্থ ইহাতে আরো সহজবোধ্য হইয়াছে।

গ্রন্থটি সুধীসমাজে সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই। অনুবাদক স্বামী গম্ভীরানন্দজী ধর্ম-সাহিত্য-পাঠকদের নিকট সুপরিচিত। আটখানি প্রধান উপনিষদের শঙ্করভাষ্যের ইংরেজী অনুবাদও তিনি পূর্বে করিয়াছেন। সেগুলিও সুধীমণ্ডলীর নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে।

গ্রন্থটির ছাপা ও বাঁধাই প্রথম শ্রেণীর, প্রচ্ছদ সুরুচি-সম্মত।

THE FLUTE CALLS STILL—Dilip Kumar Roy. Published from Indira Niloy, Hari Krishna Mandir Road, Poona 16. Pp. 360 + xxii. Price Rs. 6·50

একটি মানব-আত্মার কথা ও কাহিনী দিয়েই এই সুদীর্ঘ ও সুমিষ্ট পুস্তকটিকে ভরে তোলা হয়েছে। অবশ্য কোন একজনের লেখা দিয়েই এটা ভরে ওঠেনি; বরং বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীর চিঠি ও লেখা দিয়েই অবিশ্বাস্যকে বিশ্বাসের আদালতে দাঁড় করিয়ে সংকলক বুঝিয়েছেন—বিভূতিবাদ আজও বেঁচে আছে। যাঁকে নিয়ে মুখ্যতঃ এই পুস্তকটির আবর্তন সেই ইন্দিরা দেবী সম্বন্ধে অনেকের প্রশংসা এতে আছে। মানুষ সাধারণতঃ যে কোন ধর্মপথ-যাত্রীর ভেতর বিভূতিবাদকেই বড় ক'রে দেখতে চায়। বিভূতির ইঙ্গিত পেলেই তাঁকে জানবার ও তাঁকে দেখবার আকুল আগ্রহ, আমাদের এই তেত্রিশ-কোটি-দেবতার দেশ ভারতবর্ষে সহজেই দেখা দেয়—অবশ্য ঐ আগ্রহ যতই না কেন ভাবালুতায় মাখা হোক। বিভূতিবাদে অবিশ্বাসী ব্যক্তিরা তাই এই পুস্তকটিতে ঐ বিষয়ে বিশ্বাস গড়ে তোলবার মতো অনেক নজীর পাবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

বইটির বাঁধাই ভাল হ'লেও মুদ্রণ ব্যাপারে ভাঙা অক্ষরের প্রাচুর্য চোখকে ব্যথা দেয়। পরবর্তী সংস্করণে পুস্তকটি এদোষ কাটিয়ে উঠবে বলেই আমরা মনে করি। **স্বামী মহানন্দ**

কল্যাণ (হিন্দী): ৩৯তম বর্ষের প্রথম সংখ্যা—ভগবানের নাম-মহিমা ও প্রার্থনা-অঙ্ক। সম্পাদক—শ্রীহনুমানপ্রসাদ পোদ্দার ও শ্রীচিম্মন-লাল গোস্বামী। গীতা প্রেস, গোরখপুর হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১০০ ; মূল্য ৭·৫০।

বহুল-প্রচারিত 'কল্যাণ' পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলী পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় এবারও একখানি সুন্দর ও মূল্যবান্ সচিত্র বিশেষাঙ্ক প্রকাশ করিয়া পাঠকগণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীভগবানের নামের অপার মহিমা এবং প্রার্থনার অমোঘ শক্তি—এ-কথা সর্বযুগে শুধু স্বীকৃত নয়—পরীক্ষিত। মনের মলিনতা ও চাঞ্চল্য দূর করিয়া এক অনির্বচনীয় পবিত্রতা শান্তি ও আনন্দের সন্ধান দেয় ভগবানের নাম। বর্তমান ভোগমুখর জীবনেও প্রার্থনার প্রভাব অপরিহার্য।

বিভিন্ন দিক হইতে সুলিখিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধের মাধ্যমে নামমহিমা-প্রচার বিশেষভাবে অভিনন্দনযোগ্য। প্রারম্ভে শ্রেষ্ঠ নামপ্রচারক শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর সুন্দর চিত্রখানি পত্রিকাটিকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। এই বিশেষাঙ্কখানি সংরক্ষণযোগ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

বারাণসী ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উৎসব গত ৫ই হইতে ১৪ই মার্চ দশদিনব্যাপী বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি ও 'কথামৃত' পাঠ, ভজন, কীর্তন, প্রসাদবিতরণ, শ্রীশ্রীকালীপূজা, ধর্মসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। বিভিন্ন দিনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে আলোচনা করেন স্বামী অপূর্বানন্দ, স্বামী ধর্মেশানন্দ, স্বামী ভাস্বরানন্দ, স্বামী চিৎসুখানন্দ।

স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হিন্দী, বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় 'শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী' অবলম্বনে প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগীদের মধ্যে ২৪৭টি পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

উৎসবের শেষ দিন কাশীর বিশিষ্ট পণ্ডিত-মণ্ডলীর সমাবেশে 'বেদমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ ও সর্বধর্মসমন্বয়' অবলম্বনে সংস্কৃত ভাষায় প্রবন্ধ ও ভাষণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আয়োজিত সভার উদ্বোধন করেন বারাণসীর মহারাজা শ্রীবিভূতিনারায়ণ সিংহ বাহাদুর এবং সভাপতিত্ব করেন বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত পণ্ডিত শ্রীবদ্রীনাথ শুক্ল। বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। এই উপলক্ষে ২০টি সংস্কৃত রচনা লিখিত হইয়াছিল। বক্তৃতা-প্রতিযোগিতায় ১৯ জন ভাষণ দেন। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী ও সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাণ-বিভাগের প্রধান আচার্য পণ্ডিত শ্রীবলদেব উপাধ্যায় বিচারক ছিলেন। আলোচনা উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল, জনসমাগমও হইয়াছিল প্রচুর। সংস্কৃত ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে আলোচনা-সভা এই প্রথম। কৃতী প্রতিযোগীদের উপযুক্ত পুরস্কার-দানে সম্মানিত করা হয়।

পাটনা ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৫ই মার্চ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩০তম শুভ জন্মতিথি উৎসব যথাবিধি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। উষাকালে মঙ্গলারতি দিয়া উৎসব আরম্ভ হয়। বিশেষ পূজা, হোম ও লীলাপ্রসঙ্গ-পাঠ কর্মসূচীর প্রধান অঙ্গ ছিল। মধ্যাহ্নে প্রায় সহস্র ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে অন্ন-প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যারতির পর আয়োজিত জনসভায় স্থানীয় হিন্দী দৈনিক সংবাদপত্রের সহকারী সম্পাদক শ্রীজয়কান্ত মিশ্র এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি-বিভাগের অধ্যাপক শ্রীবীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় যথাক্রমে হিন্দী ও বাংলাতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে ভাষণ দেন। স্বামী বীতশোকানন্দের বক্তৃতান্তে সভার কার্য সমাপ্ত হয়।

গত ১৯শে মার্চ হইতে ২২শে মার্চ সন্ধ্যায় প্রতিদিন অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী ভাষণ দেন। প্রথম দিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব ও উহার তাৎপর্য এবং পরের তিন দিন রামায়ণ সম্বন্ধে তথ্যসমৃদ্ধ মনোরম ভাষণ দিয়াছেন।

ঢাকা ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মোৎসব ২১শে ফাল্গুন হইতে ২৪শে ফাল্গুন পর্যন্ত আনন্দের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। তিথিপূজা, বৈদিক স্তোত্রপাঠ, হোম, জীবনচরিতপাঠ, আলোচনা, ভজনসঙ্গীত, নিমাইসন্ন্যাস যাত্রাভিনয়, রামায়ণগান ও

দরিদ্রনারায়ণ-সেবা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের দ্বারা উৎসব পালিত হয় এবং ২৩শে ফাল্গুন রবিবার ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় আবু সাঈদ চৌধুরী মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। মিশন বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণের পর ঢাকা মিশনের বার্ষিক সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী পাঠ এবং মিশনের বিভিন্ন বিভাগের কর্মধারা উল্লেখ করিয়া ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দেব মহোদয় সভায় বক্তৃতা করেন। অতঃপর অধ্যাপক জুলফিকার আলি, অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর, ডাঃ মন্মথনাথ নন্দী প্রমুখ বক্তাগণ সভায় বিভিন্ন দিক হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর জীবনালোচনা করেন।

সভাশেষে সভাপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরী শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর জীবনাদর্শ ও বিশ্বপ্রেমের মহতী বাণীর কথা প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করিয়া এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় সকলকে মুগ্ধ করেন। অতঃপর সান্ধ্য আরাত্রিকের পর আশ্রম-প্রাঙ্গণে ব্রহ্মচারী সুকুমার ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর পূতজীবন-চরিত আলোচনা করেন।

মেদিনীপুর ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৫ই মার্চ হইতে ৭ই মার্চ তিন দিবস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩০তম জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ৫ই মার্চ শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে পূর্বাহ্নে বিশেষ পূজাপাঠ, ভোগরাগ, চণ্ডীপাঠ, আরতি ও প্রার্থনানুষ্ঠান হয়। সন্ধ্যায় 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বিশোকাত্মানন্দ। ৬ই মার্চ সন্ধ্যায় 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত। বাঁকুড়ার শ্রীবঙ্কিম দাস অধিকারী মহাশয়ের দল কীর্তন করেন। ৭ই মার্চ রবিবার নরনারায়ণ-সেবা অনুষ্ঠানে প্রায় ৫,৫০০ নরনারী বসিয়া অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলাজজ শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি মহতী ধর্মসভার অধিবেশন হয়। সভায় স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনদর্শন আলোচনা করেন।

কোয়ালপাড়া (বাঁকুড়া) **ঃ** শ্রীরামকৃষ্ণ যোগাশ্রমে গত ৫ই হইতে ১০ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব আনন্দপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে সুষ্ঠু-ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, প্রতিমায় শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজা, ভজন, কীর্তন, নর-নারায়ণ-সেবা, রামনাম-সঙ্কীর্তন, রামায়ণগান, শোভাযাত্রা, ধর্মসভা, নাম-সঙ্কীর্তন, শ্রীশ্রীচণ্ডীর ব্যাখ্যা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই বহু ভক্তের আন্তরিক ভাবে যোগদান উৎসবটিকে বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত করে। ধর্মসভায় স্বামী পরমেশ্বরানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন। ২৫০০ নরনারীকে অন্নপ্রসাদ দেওয়া হয়।

শিলচর ঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শিলচর রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে দিবসত্রয় আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

৫ই মার্চ, শুক্রবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ-জন্মতিথি—পূজা ও ভজন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়।

৬ই মার্চ, শনিবার সন্ধ্যায় স্বামী চিদাত্মানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে এক জনসভা হয়। এই সভায় বক্তৃতা করেন—শ্রীধীরেন্দ্র গুপ্ত ও অধ্যাপক শ্রীভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ভাষণে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের বিভিন্ন দিক অত্যন্ত সুন্দরভাবে আলোচনা করেন।

৭ই মার্চ, রবিবার সমস্তদিনব্যাপী আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সকালে ভজন,

রামনামকীর্তন ও শ্রীরমেন্দ্রমোহন গোস্বামী কর্তৃক পদাবলী কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় পাঁচ হাজার নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় স্বামী চিদাত্মানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনাদর্শ বিষয়ে ভাষণ দেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ঠাকুরের বাণীগুলি কিভাবে প্রতিফলিত করা যায়—তাহা তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। বেতার-শিল্পী শ্রীভুপেন চক্রবর্তী তিনদিনই সঙ্গীত পরিবেশন করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবন : রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের এপ্রিল, ১৯৬৩ হইতে মার্চ, ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের কার্য-বিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এই সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ইহার অন্তর্বিভাগে রোগীর শয্যাসংখ্যা ছিল মাত্র ৪টি। অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া পবিত্র তীর্থক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবন-ধামে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে আর্ত জনসাধারণ এই সেবাশ্রমের মাধ্যমে অকুণ্ঠ সেবা ও চিকিৎসা লাভ করিতেছেন। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে সেবাশ্রম মথুরা রোডের উপর নূতন ভবনে স্থানান্তরিত হইয়াছে; তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু বহু বিশিষ্ট জনসমাবেশে নূতন সেবাশ্রমের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

সেবাশ্রমের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি অঙ্গ : (১) ইনডোর হসপিট্যাল, (২) নন্দবাবা চক্ষু-চিকিৎসালয়, (৩) আউটডোর ডিস্পেন্সারি, (৪) হোমিওপ্যাথি বিভাগ, (৫) এক্স-রে বিভাগ, (৬) ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি, (৭) ফিজিওথেরাপি বিভাগ।

আলোচ্য বর্ষে অন্তর্বিভাগে চক্ষুরোগীসহ ২,০৪০ জন রোগী ভরতি হয়, তন্মধ্যে ১,৪৬৪ জন আরোগ্য লাভ করে, ৪১৬ জন কিছুটা উপকৃত হইয়া চলিয়া যায়। এই বৎসর চক্ষু-অস্ত্রোপচারসহ মোট ১,১৮৩টি অস্ত্রোপচার করা হয়। হাসপাতালের ১০০টি শয্যার মধ্যে গড়ে প্রত্যহ ৫৩টি শয্যা রোগীদের দ্বারা অধিকৃত ছিল।

বোম্বাই-এর শেঠ বানারসীদাস ভগবানদাস পহ্লাদ্রাই রামেশ্বরদাসের দানে নন্দবাবা চক্ষু-চিকিৎসালয় ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। মথুরা-বৃন্দাবন অঞ্চলে চক্ষুরোগের প্রাধান্য ; এই চক্ষু-চিকিৎসালয়টি দ্বারা বহু লোক উপকৃত হইতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে আউটডোর ডিস্পেন্সারিতে ৪৩,৭৫৫ জন নূতন এবং ১,৭২,৫১২ জন পুরাতন রোগী চিকিৎসা লাভ করে। বহি-র্বিভাগে চক্ষুরোগী সহ মোট ১,৬০৩ জন রোগীকে অস্ত্রচিকিৎসা করা হয়। দৈনিক গড়ে ৫৯৩ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে।

হোমিওপ্যাথি বিভাগটি শিশুচিকিৎসা ও পুরাতনরোগের চিকিৎসায় বিশেষ কার্য করিতেছে। আলোচ্য বর্ষে চিকিৎসিত নূতন ও পুরাতন রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ৭,১০৫ ও ১৮,৮৫৩।

এক্স-রে বিভাগে ৬০৭ জনের এক্স-রে করা হয়। ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষিত নমুনার সংখ্যা ৪,৮৭৩। ফিজিওথেরাপি বিভাগে ২১১ জন রোগী চিকিৎসিত হয়।

বৃন্দাবন সেবাশ্রমের উদ্যোগে ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে স্বামীজীর শতবর্ষ-জন্মজয়ন্তী সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

সেবাশ্রম কর্তৃক প্রয়োজনমত বিভিন্ন সেবাকার্য (relief) অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে মথুরা জেলায় মীরপুর গ্রামে হরিজনদের জন্য দুইটি কূপ খনন করানো হয়। এতদ্ব্যতীত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে পাঠ্য-পুস্তকাদি কিনিবার জন্য এবং দুঃস্থদিগকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। অগ্নিকাণ্ডে

ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকটি কুটির পুনর্নির্মাণের জন্যও সাহায্য করা হয়।

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

গত জানুআরির প্রথম সপ্তাহ হইতে মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক রামেশ্বরে ও উচিপুল্লীতে বাত্যা-প্রপীড়িত জনগণের জন্য 'রিলিফ'-কার্য অনুষ্ঠিত হইতেছে।

১১.২.১৯৬৫ হইতে ২৪.৩.১৯৬৫ পর্যন্ত সেবাকার্যের বিবরণ দেওয়া হইল:

গৃহনির্মাণের দ্রব্যাদি, খাদ্য, বস্ত্র ও গৃহস্থালীর জিনিসপত্র বিতরণ করা হয়। ১,৯৩৯টি পরিবারে এবং ৩,৩০০টি শিশুকে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

২৪.৩.১৯৬৫ পর্যন্ত এই সেবাকার্যে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৯৫,০০০ টাকা।

ইহা ছাড়া 'শ্রীরামকৃষ্ণ-পুরম্' নামে একটি নূতন কলোনি নির্মিত হইতেছে। কলোনিটি রামেশ্বর হইতে সাড়ে চার মাইল দূরে রামেশ্বর রোডের নিকটে নির্মাণ করা হইতেছে। থাভাকাডুর (Thavakadu) উদ্বাস্তুদিগকে এখানে বসবাস করিতে দেওয়া হইবে।

প্রচারকার্য

গত ১০. ৭. ৬৪ হইতে ২৯. ১২. ৬৪ সম্বুদ্ধানন্দজী নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি দিয়াছেন:

বিষয়	স্থান
স্বামী বিবেকানন্দ	ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট, কলিকাতা
আচার্য শঙ্কর	বিবেকানন্দ হল, বোম্বাই
শ্রীবুদ্ধ	
শিক্ষার আদর্শ	গীতাভবন ,,
জওহরলাল—দার্শনিক না রাজনীতিজ্ঞ?	বেঙ্গল ইমিউনিটি হল, কলিকাতা
ঈশ্বরের তিন রূপ	পাঠচক্র
কর্মযোগের রহস্য	বলরাম-মন্দির
ডঃ যতীন্দ্রবিমল স্মরণে	লেডি ব্র্যাবোন কলেজ
জীবনে প্রাথমিক শিক্ষা	মহিলা মহাবিদ্যালয়, শ্রীনগর
সনাতন ধর্ম	শিবালা, কাশ্মীর
তরুণ ভারতের উদ্দেশে স্বামীজী	সরকারী মহিলা কলেজ, শ্রীনগর
হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্ম যেখানে মিলিত হয়	এ. টি. টি. কলেজ, ,,
স্বামী বিবেকানন্দ	দুর্গাবাড়ী, খড়্গপুর
তরুণ ভারতের প্রতি স্বামীজী	রেলওয়ে ইনস্টিট্যুট, আদরা
ভারতের অনুপমত্ব	রামপুরহাট কলেজ, বীরভূম
কিরূপে শিক্ষিত হওয়া যায়	রামকৃষ্ণ শিক্ষায়তন, তুম্বিনী
ভারতে নারীজাগরণ	উইমেনস্ ওয়েলফেয়ার সেণ্টার, কলিকাতা
বিজয়াসম্মেলনে ভাষণ	সি. কে. পি. হল, বোম্বাই
স্বামী বিবেকানন্দ	দক্ষিণ দমদম, কলিকাতা
সমাজসেবা	দেশবন্ধু শিশুবিদ্যালয়
স্বামী সুবোধানন্দ	বকুল বাগান
বিজয়াসম্মেলন	রামমোহন হল, কলিকাতা
সনাতন ধর্ম ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ	অনঙ্গমোহন হরিসভা, ,,
ধর্মের প্রয়োজন	আর. এন. মেডিকেল কলেজ, উদয়পুর, রাজস্থান
শিক্ষা	বিদ্যাভবন, উদয়পুর
নারীজাতির আদর্শ	মিত্র কলেজ
তরুণ ভারতের প্রতি স্বামীজী	রেলওয়ে ট্রেনিং ইনস্টিট্যুট
বর্তমানে যে শিক্ষা আমাদের প্রয়োজন	রিজিওন্যাল শিক্ষা মহাবিদ্যালয়, আজমীর
আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর	শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, আজমীর
মানুষের কর্তব্য	নব-নির্বাচিত স্থান, কিষেণগড
ছাত্রসমাজের কর্তব্য ও দায়িত্ব	কিষেণগড় মহাবিদ্যালয়
বর্তমানে আমাদের যে ধর্ম প্রয়োজন	মিউনিসিপ্যাল হল
ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ও জনসাধারণের উদ্দেশে স্বাগত-ভাষণ	শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম-প্রাঙ্গণ, গোয়ালিওর
পূর্ণতার পথ	বিনয়নগর, নিউ দিল্লী
শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা-পার্ষদগণ—পরমযোগী	বেঙ্গল ইমিউনিটি, কলিকাতা
স্বামী প্রেমানন্দ	বেলুড় মঠ, হাওড়া
শ্রীশ্রীমা	বিবেকানন্দ হল, বোম্বাই
আদর্শ শিক্ষা	শোলাপুর কলেজ
ভারতের স্বাধীনতায় স্বামী বিবেকানন্দের দান	তিলক মন্দির, শোলাপুর

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে নূতন বেদান্ত-কেন্দ্র

উত্তর ক্যালিফর্নিয়া বেদান্ত-সমিতির (প্রধান কেন্দ্র: স্যান্‌ফ্রান্সিসকো) একটি শাখাকেন্দ্র কয়েক বৎসর হইল সমিতির নেতা ও আচার্য স্বামী অশোকানন্দজীর প্রেরণা ও প্রচেষ্টায় ক্যালিফর্নিয়া রাজ্যের রাজধানী স্যাক্রামেণ্টো শহরের উপকণ্ঠে স্থাপিত হইয়াছে। কেন্দ্রটির নাম চার্চ অব ইউনিভার্সাল রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড ফিলসফি (বিশ্বধর্ম ও দর্শন মন্দির) এতদিন এই কেন্দ্রটি বেদান্তানুরাগী কতিপয় ভক্তদের লইয়া পাঠ, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে ঘরোয়াভাবে বেদান্তপ্রচার করিয়া আসিতেছিল। সম্প্রতি ইহার স্থায়ী বাড়ীঘরের নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ায় সর্বসাধারণের জন্য কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন গত ১৪ই ও ১৫ই নভেম্বর, ১৯৬৪—দুই দিনব্যাপী উৎসবের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিন বিশেষ পূজার্চনা ও হোম সম্পন্ন করেন বেদান্ত-সমিতির সহকারী সন্ন্যাসিদ্বয়—স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এবং পোর্টল্যাণ্ড বেদান্ত-সমিতির অধ্যক্ষ স্বামী অশেষানন্দ। আমেরিকান ব্রহ্মচারিগণ ঋগ্বেদ ও উপনিষদ্ হইতে আবৃত্তি করেন। সমিতির গায়ক ও গায়িকাদের দল কর্তৃক নানা ধর্মসঙ্গীত গীত হয়। ২২০ জন ভক্ত নরনারী উপস্থিত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দজী, সহাধ্যক্ষ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী এবং সাধারণ সম্পাদক স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী তথা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বেদান্ত-কেন্দ্রের পরিচালক সন্ন্যাসিগণ এই শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে যে-সব বাণী পাঠাইয়াছিলেন তাহা সকলকে পড়িয়া শুনানো হয়। পূজার পর ভক্তেরা পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। অতঃপর সকলকে ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত করা হয়। সকাল হইতে সারাদিন-ব্যাপী উৎসবটি সমাগত ভক্তগণের হৃদয়ে প্রভূত আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা ও আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছিল।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান প্রধানতঃ এই শাখা-কেন্দ্রের স্থানীয় বন্ধু ও প্রতিবেশীদের জন্য আয়োজিত হইয়াছিল। পৃথক পৃথক দলে সকলকে কেন্দ্রের বিভিন্ন গৃহ, বাগান, মন্দির প্রভৃতি ঘুরাইয়া দেখানো হয়। অপরাহ্নে একটি সভায় প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও ভাবধারা সম্বন্ধে স্বামী চিদ্রূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। নানা গায়ক ও গায়িকা এবং বাদক-বাদিকা কর্তৃক ধর্মসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত অনুষ্ঠানের অন্যতম কর্মসূচী ছিল। সভার পর সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।

এই বেদান্তকেন্দ্রটি ৭ একর জমির উপর স্থাপিত। সমগ্র বাড়িটি একতলা এবং উত্তর ক্যালিফর্নিয়ার প্রাচীন স্পেনীয় স্থাপত্যের অনুসরণে নির্মিত। একাংশে মন্দির এবং বক্তৃতা-হল, অপর অংশে লাইব্রেরী, অফিস ও কেন্দ্রপরিচালক সন্ন্যাসীদের বাসস্থল এবং তৃতীয় অংশে সম্মিলন-গৃহ, ত্যাগী কর্মীদের আবাস এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ঘর। বাড়ির ভিতর দিকে উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমে দুটি প্রশস্ত লম্বা বারান্দা আছে। এই বারান্দাদ্বয়ের সামনে একটি সুবৃহৎ সবুজ ঘাসের লন। লনের মাঝে মাঝে ম্যাগনোলিয়া ফুলের গাছ রোপিত। বাড়িটিকে ঘিরিয়া সুপরিকল্পিত বৃক্ষসারি, রাস্তা, পুষ্প ও ফলের বাগান এবং মোটরের পার্কিং স্থান। জমির একটি পৃথক অংশে একটি আলাদা বাড়িতে বাগানের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য জিনিস মজুত রাখিবার আলাদা ঘর এবং নির্মাণশালা। উহার সংলগ্ন একটি সুবৃহৎ ল্যাথ হাউস বা রৌদ্রনিয়ন্ত্রিত কাঠের গৃহে বিশেষ বিশেষ ফুলের গাছের সংগ্রহশালা

করা হইয়াছে। মন্দিরের বেদিটি ভারতীয় কারুকলার রীতিতে নির্মিত। বেদির উপরি-ভাগে স্বর্ণবর্ণের ওঁ। ওঁ-এর ডানপাশে সুদৃশ্য ফ্রেমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দের চিত্র সংগ্রথিত, বামপাশে যীশুখ্রীষ্টের ও বুদ্ধের ছবি।

এই বেদান্ত-কেন্দ্রের যাবতীয় নির্মাণকার্য প্রধানতঃ সমিতির ত্যাগী ও গৃহী কর্মিগণই কয়েক বৎসর ধরিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্যম, ধৈর্য এবং স্বার্থত্যাগ সত্যই অদ্ভুত। শহরের উপকণ্ঠে কথঞ্চিৎ গ্রাম্য বাতাবরণে এবং দূরের পাহাড়, সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর ও বনানীর শ্যামলশ্রী পরিবেষ্টিত এই মনোরম ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার নিলয়টি ইতিমধ্যেই বহু নরনারীর শ্রদ্ধা ও সমাদর আকর্ষণ করিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ ক্যালিফর্নিয়াকে পাশ্চাত্যে বেদান্ত-প্রচারের উত্তম ক্ষেত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। আশা করা যায়, এই নূতন বেদান্তকেন্দ্রটি তাঁহার ভবিষ্যদ্‌বাণীকে অংশতঃ সার্থক করিবে।

উদ্বোধনের পর হইতে প্রতি রবিবারে বেলা ১১টায় সর্বসাধারণের জন্য স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এখানে বক্তৃতা করিতেছেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তিনি উপনিষৎ-ক্লাসও পরিচালনা করিয়া থাকেন। ধীরে ধীরে নূতন নূতন লোক এই বক্তৃতা ও ক্লাসগুলিতে যোগ দিতেছেন।

আমেরিকায় বেদান্ত

১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে রবিবারে নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি প্রদত্ত হইয়াছিল:

হলিউড বেদান্ত-সোসাইটি: অবচেতন মন ও তাহার সংযম; মুক্তি ও গোপনে প্রার্থনা; দিব্য দর্শন; আত্মার শক্তি।

গুরুর কি প্রয়োজন? মুক্তির পথ; খৃষ্ট-জন্মের তাৎপর্য; শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী—প্রচ্ছন্ন মূর্তিতে জগদীশ্বরী।

সান্টাবারবারা কেন্দ্র: পুরুষকার ও শরণাগতি; অবচেতন মনের নিয়ন্ত্রণ; সত্য ও মুক্তি; যে শান্তি আমাদের প্রয়োজন; ঈশ্বর ও স্বাধীন ইচ্ছা।

অতীন্দ্রিয় অনুভূতি; বিশ্বজননী; মুক্তিপথ ও খৃষ্ট; ভাব, আদর্শ ও প্রতীক।

ট্র্যাবুকো কেন্দ্র: যোগের ভূমিকা; পূর্ণতার চাবি; আত্মপ্রচেষ্টায় আত্মোন্নতি; জ্ঞান ও বুদ্ধি; অতীন্দ্রিয় দর্শন।

মনের গভীরে ডুব দাও; ভক্তিযোগ; 'যাহারা নম্র তাহারাই ধন্য'; অবচেতন মন নিয়ন্ত্রণ করার উপায়।

ভ্রম-সংশোধন

মাঘ, ১৩৭১: ৩৩ পৃঃ, ১ম কলম, ১৬শ লাইনে 'সায়াহ্নে' স্থলে 'মধ্যাহ্নে' হইবে।

৩৫ পৃঃ, ১৯শ—২১শ লাইনে 'লণ্ডনের এই মহাসমাবেশের......উপস্থিত ছিলেন।' স্থলে 'লণ্ডনের এই মহাসমাবেশে ভগিনী নিবেদিতাও উপস্থিত ছিলেন। এর পূর্বেও ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ আর এক বিশ্বসভায় আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেন;' হইবে।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর: প্রতিবারের ন্যায় বর্তমান বৎসরেও শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বরে যুগাবতার শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

গত ১০ই পৌষ (২৫শে ডিসেম্বর) শুক্রবার প্রত্যূষ হইতে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ও ভজন-কীর্তনে মঠ-প্রাঙ্গণ মুখরিত ছিল। প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা শ্রীশ্রীমায়ের লীলা-কথা ও বর্তমান যুগে তাহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। আনুমানিক আড়াই হাজার ভক্ত-মহিলা বসিয়া প্রসাদ-গ্রহণে পরিতৃপ্ত হন।

গত ৯ই মাঘ, শনিবার আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ও বেদপাঠের আয়োজন হইয়াছিল। অপরাহ্নে মহিলাসভায় প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা বাংলায় ও প্রব্রাজিকা ঋতপ্রাণা ইংরেজীতে স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক ও বর্তমান যুগে তাহার প্রভাব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভা-নেত্রীর ভাষণে প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা স্বামীজীর জীবনের মূল স্বর নিঃস্বার্থ প্রেম ও ত্যাগের বিষয়ে আলোচনা করেন।

গত ২১শে ফাল্গুন (৫ই মার্চ) শুক্রবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উৎসব বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ ও 'কথামৃত' পাঠের মাধ্যমে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। নিবেদিতা বালিকাবিদ্যালয় ও বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনের ছাত্রীবৃন্দ ভজনগানে সকলকে পরিতৃপ্ত করে। অপরাহ্নে আরাত্রিক, ভজন ও রাত্রে দশমহাবিদ্যার পূজা হয়। ঐ দিনও দ্বিপ্রহরে আনুমানিক সাড়ে সাতশত ভক্ত মহিলা বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

নয়া দিল্লী: বিনয়নগর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে ২৮শে ফেব্রুআরি, ১৯৬৫ রবিবার ইংরেজী, হিন্দী, বাংলা ও তামিলভাষায় আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা হয়। এই প্রতিযোগিতায় প্রায় চারশত ছাত্রছাত্রী যোগদান করিয়াছিল। ৬০ জন প্রতিযোগীকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

এতদুপলক্ষে ১৩ই মার্চ সন্ধ্যা ৭টায় ভারত সেবক সমাজ প্রাঙ্গণে মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী কৈলাসানন্দজীর সভাপতিত্বে এক সভা হয় এবং তথায় আটশত জনসমাগম হয়। প্রারম্ভিক ভজনের পর আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য ছাত্রছাত্রীগণ বিভিন্ন ভাষায় স্বামীজীর বাণী আবৃত্তি করেন। শ্রীমতী রেবা চ্যাটার্জী, শ্রী এস. এন. সান্যাল ও স্বামী স্বাহানন্দ যথাক্রমে বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজীতে ভাষণ দেন। ব্রহ্মচারী গোপাল শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজী সম্বন্ধে ভজন গান করেন। সভাপতি স্বামী কৈলাসানন্দজী তাঁহার ভাষণে এই দুই মহা-পুরুষের বাণী বিশদভাবে আলোচনা করেন এবং পুরস্কার বিতরণ করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও ভজনগানের পর রাত্রি ৯॥ টায় সভার কার্য শেষ হয়।

আমেদাবাদ: ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩০তম জন্মজয়ন্তী গত ৫ই মার্চ শুক্রবার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে (মণিনগর) প্রতিপালিত হইয়াছে। ভোর হইতে বিশেষ পূজা, ভোগ-রাগ, শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ও নবচণ্ডীপাঠ দ্বিপ্রহর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। বৈকালে শ্রীবিবেকানন্দ পাঠচক্রের সভ্যগণ প্রাসঙ্গিক প্রবচনের পর বেদমন্ত্র, 'কথামৃত', শ্রীশ্রীমায়ের কথা, স্বামি-শিষ্যসংবাদ পাঠ করেন। ভজন-কীর্তন ও

আরতি হয়। রাত্রে প্রসাদ-বিতরণের পর উৎসব শেষ হয়।

গত ২৫শে ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের ১১২তম জয়ন্তী ও ২৩শে জানুআরি শ্রীশ্রীস্বামীজী মহারাজের ১০৩ তম জয়ন্তী একই ভাবে প্রতিপালিত হইয়াছিল

পাণ্ডু (আসাম): বিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে গত ১৩ই ও ১৪ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে রামনাম-কীর্তন, 'কথামৃত'-পাঠ, ছাত্রসম্মেলন, পুরস্কার-বিতরণ, বিশেষ পূজা, সারদা-লীলাগীতি, বরগীত (আসামী গান), প্রসাদ-বিতরণ, ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ১০,০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। ধর্মসভায় স্বামী ভব্যানন্দ সভাপতিত্ব করেন; স্বামী সৌম্যানন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন।

রাজারহাট-বিষ্ণুপুর (২৪ পরগণা): নিরঞ্জনানন্দ-ধামে গত ১৩ই ও ১৪ই মার্চ দুইদিন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের জন্মোৎসব পূজার্চনা, ভজন, লীলাকীর্তন, গীতি-আলেখ্য, শাস্ত্রপাঠ, জনসভায় বক্তৃতা ও প্রসাদ-বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ও শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী জীবানন্দ, শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল ও শ্রীযশোদাকান্ত রায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও স্বামী নিরঞ্জনানন্দজীর জীবনী ও শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

পরলোকে সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রায় আড়াই মাস কাল অসুস্থ থাকিয়া গত ২৩শে মার্চ নার্সিংহোমে ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি স্বাধীনচেতা ছিলেন এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন।

সাবিত্রীপ্রসন্নের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ: আহিতাগ্নি, মধুমালতী, পল্লীব্যথা, রক্তরেখা, অনুরাধা, অতসী, জ্বলন্ত তলোয়ার। গদ্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'সুভাষ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র'। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁহার লেখা প্রকাশিত হইত। 'উদ্বোধনে'ও তাঁহার বহু কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার দেহত্যাগে একজন আদর্শনিষ্ঠ চিন্তাশীল কবির অভাব ঘটিল।

তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁশান্তিঃ!

যশোদাকুমার মোদকের দেহত্যাগ

আমরা দুঃখিতচিত্তে জানাইতেছি যে, গত ২২শে ফেব্রুআরি, ১৯৬৫ বিশিষ্ট ভক্ত যশোদাকুমার মোদক ৭৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। হবিগঞ্জে (আসাম) রামকৃষ্ণ মিশন সেবাসমিতি প্রতিষ্ঠায় যাঁহাদের অবদান অবিস্মরণীয়, তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক। ওঁ শান্তিঃ!

প্রাগৈতিহাসিক মানুষ

শিকাগো, ৩রা এপ্রিল: নাইরোবির বারিনডেন মিউজিয়ামের ডিরেক্টর প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ ডক্টর লুই এস. বি. লিকে আবিষ্কার করিয়াছেন যে, ১০ লক্ষ বৎসর পূর্বে তিনটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের মানুষ একই সময়ে ও একই স্থানে বাস করিত। তিনি তাঁহার সহকর্মী বৈজ্ঞানিকদিগকে বলেন যে, তাঁহারা যেন থিয়োরীগুলিকে তথ্যহিসাবে গ্রহণ না করেন এবং নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে মানুষের উৎপত্তির সন্ধান করেন।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মানুষের উৎপত্তি' সম্পর্কে বক্তৃতামালায় ডঃ লিকে এই ভাষণ দেন।

—এ. পি.

দিব্য বাণী

ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু
সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

—কৃষ্ণযজুর্বেদীয় শান্তিপাঠ

গুরুপাশে আসিয়াছি বিদ্যালাভ তরে,
সমভাবে রক্ষা প্রভু, কর আমাদেরে!
উভয়েরে সমভাবে দাও বিদ্যাফল,
বিদ্যার চর্চায় কর সমান সবল।
উভয়ের শ্রমার্জিত অধীত বিদ্যায়
সফলতা আসে যেন তোমার কৃপায়।
বিদ্বেষ করি না যেন মোরা পরস্পরে,
স্নেহপাশে উভয়েরে বাঁধ চিরতরে॥

ঝরিয়া পড়ুক শান্তি চরাচরময়,
চিরশান্তি-পরিমলে ভরুক হৃদয়॥

কথাপ্রসঙ্গে

সাহিত্য ও 'রিয়্যালিটি'

'রিয়্যালিটি'র সংজ্ঞা বহু দার্শনিক বহুভাবে দিয়াছেন। বস্তুকে আমরা যেভাবে দেখি, তাহা সবটাই আমাদের মনের ব্যাপার, না বস্তুর নিজস্ব ধর্ম আছে, না দুই-ই, অথবা বস্তুর ধর্ম বহুমুখী, আমাদের বিভিন্ন মানসিক অবস্থায় আমরা উহার এক একটি বাস্তব রূপই দেখি—এইসব জটিল তথ্য লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। মূল কথা হইল, যাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনওরূপ সংশয় জাগে না, তাহাই 'রিয়্যাল' বা বাস্তব।

রিয়্যালিষ্টিক বা বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান যুগে আমাদের সাহিত্যে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কিন্তু বস্তুতান্ত্রিকতার দোহাই দিয়া যাহা কিছুকে বাস্তব বলিয়া দেখাইবার চেষ্টা করা হইতেছে, তাহার সবই কি বাস্তব, আর উচ্চ আদর্শাত্মক যাহা কিছু তাহার সবই কি রহস্যবিজড়িত, কল্পনা-প্রসূত?

মনে হয়, তাহা সত্য নহে।

সত্যকে, রিয়্যালিটিকে দেখিবার মত ক্ষমতা ও রুচি অনুসারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাইয়া যায়। আর সেই দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া রিয়্যালিটিকে যতখানি আমরা প্রত্যক্ষ করি তাহার সহিত, বিশেষ করিয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে, কল্পনার দৃষ্টিতে আরও অনেক কিছু দেখিয়া তাহাও বাস্তব বলিয়া ধারণা জন্মাইবার চেষ্টা করি। কথাসাহিত্যের ধর্মই হইল অবশ্য কল্পনাকে বাস্তবের মত করিয়া ফুটাইয়া তোলা; কিন্তু যাহার মত ফুটাইবার চেষ্টা করা হইতেছে, তাহা কতখানি বাস্তব? অন্যান্য ক্ষেত্রেও মনে হয় সত্যদ্রষ্টাগণ এবং তুচারজন অতিসংযত-লেখনী সাহিত্যিক ছাড়া আর সর্বত্রই, দৃষ্টিকোণ যাহাই হউক না কেন, কল্পনার প্রভাব দুরতিক্রমণীয়।

বর্তমান যুগে বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যে মাঝে মাঝে এমন সব কুরুচিপূর্ণ রচনা ভয়াবহরূপে চোখে পড়ে, দেখিয়া মনে হয় মানুষ এতদিন ধরিয়া বাহ্যপ্রকৃতির মত অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গেও লড়াই করিয়া মানবতার পথে যতদূর আগাইয়া আসিয়াছে, তাহাকে সেখান হইতে পশ্চাতে টানিয়া আবার আদিম নিম্নভূমিতে লইয়া যাইবার জন্য আমরা উদ্যোগী হইয়াছি নাকি? সু বা কু যে কোন ভাবকে যথাযথ রূপে ভাষায় প্রকাশ যাঁহারা করিতে পারেন, সাহিত্যজগতে উচ্চ আসন অধিকার করা তাঁহাদের পক্ষে অতি সহজ সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার নিজস্ব দৃষ্টি আবিল বলিয়া, আবিলতা ছাড়া ভাল জিনিস আমার চোখে পড়ে না বলিয়া সেই অবিলতাকে কল্পনা সহায়ে বীভৎসতর করিয়া সকলের কাছে পরিবেশন করার কি অধিকার আমার থাকিতে পারে, তাহা তো. ভাবিয়া পাওয়া যায় না। অথচ বহুক্ষেত্রে আজ তাহাই ঘটিতেছে। এমন কি শিক্ষায়তন, যেখানকার ভাবধারা পবিত্র থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়, সেখানকার মুখপত্রগুলিও আজকাল কখনো কখনো এই আবিলতার একটুখানি স্পর্শ লইয়াই আত্মপ্রকাশ করে। ইহা অপেক্ষা আমাদের চরম ঔদাসীন্যের অথবা বিকৃতরুচির পরিচয় আর কি হইতে পারে?

জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় ও বিভিন্ন স্তরে আমাদের মানসিক প্রবণতা ও ভালমন্দ-বিচার-শক্তি বিভিন্ন আকার ধারণ করে; জাতিগত

ও ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিতেও তারতম্য যে বহুল পরিমাণে বিদ্যমান, তাহা বলা বাহুল্য। ইহার যে কোন অবস্থায় কাহারো মধ্যে ভাবকে যথাযথরূপে চিত্তাকর্ষক করিয়া প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আসিলেই, তাহার রচনা সর্বসাধারণের জীবনের পক্ষে কল্যাণকর কি অকল্যাণকর তাহা বিবেচনা না করিয়াই কি প্রকাশ ও প্রচার করিবার সহায়তা করিতে হইবে? বাজারের চাহিদা, লোকের ভাললাগা-না-লাগাটাই সব সময় বড় কথা নয়। ছেলেদের স্কুলে না যাইয়া খেলিতে ভাল লাগে; কিন্তু সে ক্ষেত্রে আমরা কি ভবিষ্যৎ-জীবনের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদের জোর করিয়া স্কুলে পাঠাই না? ব্যক্তিগত ও সমাজগত কল্যাণবিরোধী আপাতমনোরম কাজ করিতে ভাললাগা লোকের সংখ্যা কম নয়; কিন্তু তাহাদের উহা করিতে না দেওয়ার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করি—ক্ষেত্রবিশেষে রাষ্ট্র দণ্ড-বিধানও করে। কিন্তু যে সব রচনা আজ মানুষের সহজাত সাধারণ দুর্বলতার সুযোগ লইয়া আপাতমধুর অকল্যাণকে ভাললাগার বিষ ছড়াইতেছে, সেগুলির প্রকাশ সম্বন্ধে আমাদের করণীয় কিছু আছে কিনা, তাহা লইয়া বোধ হয় যথাযথ ভাবে চিন্তাও আমরা করিতেছি না। দু' একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ, শুদ্ধ-দৃষ্টি, ভারতীয় সংস্কৃতি ও সমাজের কল্যাণকামী সাহিত্যিকের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে দেখিয়া গভীর পরিতৃপ্তি আসিল। কিন্তু এই ব্যাপক সংক্রমণের নিবারণের জন্য এই কার্যকরী শক্তি কতটুকু? দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে বহুজনের, নিশ্চয়ই; তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু নিষ্ক্রিয় সদিচ্ছার মূল্য খুব বেশী নয়। লোকের ভাললাগা-না-লাগা উপেক্ষা করিয়া যাঁহারা সকলের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন হইলে অপ্রিয় কথাও বলেন, তাঁহাদের সদিচ্ছাই সক্রিয়, তাঁহারাই দেশের যথার্থ কল্যাণসাধনে সক্ষম। মহাভারতে আছে, পুণ্যাত্মা বিদুর দুর্যোধনের প্রতিটি অসৎ ইচ্ছার প্রতিবাদ করিতেন, তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন যে ইহা অকল্যাণই টানিয়া আনিবে। পুত্রস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র অন্যায় বুঝিয়াও দুর্যোধনের ইচ্ছা ও কার্য শেষ পর্যন্ত অনুমোদনই করিতেন। একদিন দুর্যোধন বিদুরকে বলিয়াছিলেন: আপনি আমার ভাল চান না, আমাকে দেখিতে পারেন না; যা বলি, তারই প্রতিবাদ করেন। বিদুর হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন: বাবা, তোমার কল্যাণের জন্য তোমাকে অপ্রিয় বাক্য শুনাইবে, জগতে এরূপ লোকের সংখ্যা খুব কম। যাঁহারা আমাদের মন রাখিয়া চলিতে চান, আমাদের অপ্রীতিভাজন হইবার ভয়ে তাঁহারা অন্যায় করিতেছি বুঝিলেও আমাদিগকে কখনও অপ্রিয় কথা বলেন না; আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা খোঁচা দিয়া আনন্দ উপভোগ করিবার জন্যই অপ্রিয় কথা শুনাইয়া থাকেন; সহানুভূতিশীল মন লইয়া শুধু সংশোধনের জন্যই অপ্রিয় কথা শুনাইয়া থাকেন, এরূপ লোক সত্যই দুর্লভ।

সাহিত্যকে উন্নত করিতে হইলে উহাকে বিভিন্নমুখী বিচিত্র সম্ভারে ভরিয়া তুলিতে হইবেই। কিন্তু তাহার মধ্যে কোন কোনটি যদি মানুষকে উন্নত না করিয়া স্বাভাবিক অবস্থা হইতেও অবনত করিয়া দিবার সহায়ক হয়, তাহা হইলেও কি তাহাকে সমাদরে স্থান দিতে হইবে, প্রকাশ-শৈলী মনোরম বলিয়াই? এ-বিষয়ে স্বামীজীর (তখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত) সঙ্গে তাঁহার এক বন্ধুর মতবিরোধ হইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ তখন বি. এ. ক্লাসে পড়েন, শ্রীশ্রীরাম-

কৃষ্ণদেবের নিকট যাওয়া-আসা চলিতেছে। তাঁহার অনৈক বন্ধু একটি সংবাদপত্রের সম্পাদনা করিতেন। একদিন উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সম্বন্ধে বন্ধুটির সহিত আলোচনা চলিতেছিল। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য যথাযথ ভাবপ্রকাশক হইবে, এ-বিষয়ে উভয়ে অনেকাংশে একমত হইলেন। কিন্তু 'মনুষ্যজীবনের যে-কোনপ্রকার ভাবপ্রকাশক রচনাকেই সাহিত্য বলা উচিত কি না'—এ-বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মতভেদ হইল। বন্ধুটির মত হইল, সকল প্রকার ভাবপ্রকাশক রচনাই সাহিত্য-শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ মত প্রকাশ করিলেন, 'সু বা কু যে-কোনপ্রকার ভাব যথাযথ প্রকাশ করিলেও রচনাবিশেষ যদি সু-রুচিসম্পন্ন এবং কোন প্রকার উচ্চাদর্শের প্রতিষ্ঠাপক না হয়, তাহা হইলে কখনই উহাকে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যশ্রেণী মধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে না।' তিনি বলিয়াছিলেন, "সু এবং কু সকল প্রকার ভাব উপলব্ধি করিলেও, মানুষ তাহার অন্তরে আদর্শ-বিশেষকে প্রকাশ করিতেই সর্বদা সচেষ্ট রহিয়াছে। আদর্শ-বিশেষের উপলব্ধি ও প্রকাশ লইয়াই মানবদিগের ভিতর যত তারতম্য বর্তমান। দেখা যায়, সাধারণ মানব রূপরসাদি ভোগসকলকে নিত্য ও সত্য ভাবিয়া তল্লাভকেই সর্বদা জীবনোদ্দেশ্য করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে—They idealise what is apparently real. পশুদিগের সহিত তাহাদের স্বল্পই প্রভেদ। তাহাদিগের দ্বারা উচ্চাঙ্গের সাহিত্যসৃষ্টি কখনই হইতে পারে না। আর এক শ্রেণীর মানব আছে, যাহারা আপাত-নিত্য ভোগসুখাদি লাভে সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া উচ্চ উচ্চতর আদর্শসকল অন্তরে অনুভব করিয়া বহিঃস্থ সকল বিষয় সেই ছাঁচে গড়িবার চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে—They want to realise the ideal. এরূপ মানবই যথার্থ সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া থাকে।"

'রিয়্যাল'কে 'আইডিয়ালাইজ' করিয়াই—আমরা আমাদের দুর্বলতা ও সীমায়িত দৃষ্টি লইয়া যে জীবনযাপন করি, তাহাই আদর্শ জীবন বলিয়া প্রতিষ্ঠা করা এবং নানাভাবে তাহারই সুরুচিপূর্ণ চিত্র বর্ণনা করার বেশী আর কিছু না করিয়াই তখনকার কথা-সাহিত্য নিরস্ত থাকিত। আর আজ? আজ আমরা অনেকেই 'প্রগতির পথে' বহুদূর আগাইয়া আসিয়াছি। দৃষ্টি নিম্নাভিমুখী হইলে সাধারণ মানুষের যাহা চোখে পড়ে, তথাকথিত বস্তুতান্ত্রিক কথা-সাহিত্য অতি যত্নে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়া তদপেক্ষা আরও অনেক কিছু বেশী নোংরা জিনিষ প্রকট করিয়া তুলিতেছে; এবং বোধ হয় কল্পনার দৃষ্টি আরো বহু নিম্নে প্রসারিত করিয়া কল্পনাকেই বাস্তব বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে। ব্যক্তিগত অবনত মনের চিন্তা যে অসংখ্য সরল নমনীয় মনে সর্বনাশের বীজ বপন করিতেছে, সাধারণ অবনত-চিত্ততাকে যে অবনতই থাকিবার বা অধিকতর অবনত হইবার মত চিন্তার ইন্ধন যোগাইতেছে, সে বিষয়ে সেখানে কোন সজাগতাই নাই। চিন্তায় ও কর্মে ব্যক্তি-স্বাধীনতা আমাদের সকলেরই আছে ঠিক কথা, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতার কোন স্থান সেখানে থাকা কি বাঞ্ছনীয়? যেখানে আমার চিন্তার সঙ্গে বহুজনের চিন্তা বিজড়িত হইবার সম্ভাবনা, সেখানে একটা সীমারেখা থাকা একান্ত প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে একবার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, কেহ যদি যাহা খুশি তাহা করিতে চায়, নিজে ভাল বলিয়া বুঝিলে সে তাহা করিতে পারে বটে, কিন্তু একটা সীমা

আছে, যাহার বাহিরে গেলে সমাজ হইতে দূরে জঙ্গলে গিয়া তাহাকে উহা করিতে হইবে—সমাজে থাকিয়া নহে। সমাজে থাকিয়া তাহার সুবিধাগুলি সবই গ্রহণ করিব, আবার তাহার সর্বনাশ-সাধনেরও সহায়ক হইব—ইহা অমানুষিকতা। 'কাহারো ভাল করিবার শক্তি না থাকিলেও অন্ততঃ কাহারো অকল্যাণের কারণ যেন কখনো না হই'—পাশবোত্তর মানব চিন্তাজগতের ইহাই বোধ হয় প্রত্যন্ত প্রদেশ।

তাছাড়া আমি যাহা দেখিতেছি শুধু সেইটুকুই বাস্তব—এ চিন্তাকে কখনই, বিশেষ করিয়া বস্তুর উপর বিজ্ঞানের অত্যুজ্জ্বল আলোকসম্পাতকারী বর্তমান যুগে সুস্থ চিন্তা বলা চলে না; অতি সাধারণ দৃষ্টি দিয়া দেখিয়াও না। আশে পাশে, উর্ধ্বে না তাকাইয়া কেবল নিম্নদৃষ্টি হইয়া যাহা দেখা যায়, বাস্তব বলিতে কি শুধু তাহাই বুঝায়? কলিকাতার পথে চলিয়াছি, পথের পাশে কোথায় ডাষ্টবিন আছে কেবল তাহাই দেখিতেছি, আর দেখিলেই উহা ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া উহার ভিতর কটা পচা বেড়াল, মরা ইন্দুর আছে তাহা বাহির করিয়া পথচারী সকলকেই দেখাইতেছি; আবার তাহারও নীচে আরো কত বীভৎস জিনিষ থাকিতে পারে, কল্পনা সহায়ে দেখিয়া তাহাও প্রচার করিতেছি; সাধারণতঃ পথ চলার সময় সকলের দৃষ্টি সেদিকে যায়ই না, গেলেও এত সব কিছু নজরে পড়ে না। কলিকাতার পথে শুধু এই ডাষ্টবিনগুলিই কি বাস্তব? রাস্তার দুপাশে গাছের মাথায় মাথায় কৃষ্ণচূড়ার অসংখ্য মঞ্জরী যে অপরূপ রূপলাবণ্য ছড়াইতেছে, উর্ধ্বে গোধূলির আকাশে অপরূপ মাধুরী ছড়াইয়া 'দিনের আলোকতরী' যে 'গুটায়ে সোনার পাল সুদূরে নীরবে' অস্তাচলের ঘাটে চলিয়া যাইতেছে—আর এই সবকিছু মিলিয়া আমাদের মনে অনাবিল আনন্দের স্নিগ্ধতা ছড়াইতেছে, এগুলিকেও বাস্তব বলিতে হইবে বৈকি। গভীর চিন্তাশীল বিজ্ঞানীরা এই সকলের ভিতরেই আরো সূক্ষ্ম যে বাস্তবতার ইঙ্গিত পাইয়া বিস্ময়স্তব্ধ হন, অধ্যাত্মবিজ্ঞানীরা এই সব কিছুর ভিতর যে সূক্ষ্মতম আনন্দঘন বাস্তবতার বিদ্যুচ্চমক সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করেন, তাহার কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, কারণ বাস্তবতার সে সু-উচ্চ শিখরগুলিতে উঠিবার বা উঠিতে প্রয়াস করিবার লোকের সংখ্যা খুব বেশী নয়।

মানুষের মনে অসৎচিন্তা উঠে, ইহা যতখানি বাস্তব, অল্পসংখ্যক কয়েকজন ছাড়া (যাহাদের অস্তিত্ব সব সমাজে সব সময়ই কম-বেশী থাকিয়াই যায়) সকল মানুষই আবার অন্যায় ভাবিয়া সে চিন্তাকে মন হইতে সরাইয়া দেয়, ইহাও ততখানি বাস্তব। মানুষের মন নিম্নাভিমুখী হইয়া নিম্নতর আনন্দ উপভোগ করে, ইহা বাস্তব। কিন্তু এইটিই তাহার মনের বাস্তবতার সর্বস্ব নয়, ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী সময় সে উচ্চতর ভূমিতে বিচরণ করে, সেখান হইতে অনাবিল আনন্দ আহরণ করে; ইহাও বাস্তব। কেবলমাত্র ভোগের আনন্দই বাস্তব নয়, সংযম ও ত্যাগ সম্ভূত আনন্দও বাস্তব। স্বার্থমাত্র-সম্বল মন ক্ষুধার সময় অপর ক্ষুধিতের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া নিজে খাইয়া আনন্দ পায়; এ আনন্দ বাস্তব। আবার ক্ষুধিত হইলেও অনেকে নিজের মুখের গ্রাস অপরের মুখে স্বেচ্ছায় তুলিয়া দিয়া অধিকতর আনন্দ পায়; সে আনন্দও বাস্তব। আবার, দেহাতীত অস্তিত্বের বিদ্যুচ্চমক যখন তামসিকতার ঘন আবরণ ভেদ করিয়া উচ্চতর আনন্দময় লোককে চকিতে প্রকট করিয়া

তোলে, তাহার বিপুল আকর্ষণে মনকে উর্ধ্বে টানিয়া লইতে চায়, চিত্তে যখন 'রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে, বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া' চলে, মন তখন দেহেন্দ্রিয়ের বন্ধন ছিঁড়িয়া ইন্দ্রিয়াতীত লোকে ছুটিয়া যাইতে চায়, তাহার বিপুল ইচ্ছাশক্তি সম্ভূত গতিবেগে যখন 'মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে',—তখন অতীন্দ্রিয় প্রদেশের বিপুল আনন্দে ভোগবিরত মন নিষিক্ত হয়; এই আনন্দও ইন্দ্রিয়জ আনন্দের মতই সমভাবে বাস্তব। কারণ একই কষ্টিপাথরে—একই মনের অনুভূতিতে উভয় ক্ষেত্রেই বাস্তবতার ছাপ পড়ে।

ভালমন্দ, শুভ-অশুভে সাধারণ মন ভরিয়া থাকে। বাস্তব অশুভ পথে তাহার গতি দ্রুততর করিবার প্রেরণাদানের সহায়ক না হইয়া সমভাবে-বাস্তব শুভপথে চলিবার প্রবৃত্তিগুলিকে সবলতর করিয়া তুলিবার সহায়ক হইতে কি আমরা সকলে মিলিয়া পারি না? যদি আমাদের কাহারো অবস্থা এতই শোচনীয় হয় যে শুভপথের দিকে তাকাইবার প্রয়োজনবোধও সেখানে উঠে না, অথবা অতি-তামসিক বুদ্ধি 'সর্বার্থান্ বিপরীতান্' দেখে, কল্যাণকে অকল্যাণ বলিয়া এবং অকল্যাণকেই কল্যাণ বলিয়া মনে করে, তবে সে মনের চিন্তারাশিকে যথাসম্ভব গণ্ডীবদ্ধ রাখিবার জন্য, যাহাদের বুদ্ধি নিজস্ব বিচারশক্তিবলে ভালমন্দ নির্ণয়ের মত পরিণতি লাভ করে নাই অন্ততঃ তাহাদের নিকট হইতে দূরে রাখিবার জন্য সর্বপ্রযত্নে প্রয়াসী হওয়া প্রয়োজন।

জীবনের বাস্তবতা সম্বন্ধে এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের স্বদেশজাত নহে, বিদেশাগত। অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, আজও আমাদের অনেকেরই অবস্থা সেইরূপই রহিয়াছে: ভালমন্দ-নির্ণয় এখন আর নিজের বিচার-বিবেক দ্বারা হয় না, পাশ্চাত্যবাসীরা যাহা ভাল বলে তাহাই ভাল বলিয়া, এবং যাহা মন্দ বলে তাহাই মন্দ বলিয়া বিবেচিত হয়। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা দুই শতাব্দী ধরিয়া পাশ্চাত্যের অনুকরণ করিলাম, কিন্তু তাহাদের সাহসিকতা, কর্তব্যপরায়ণতা ও নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি কোন ভাল গুণটিরই অনুকরণ না করিয়া তাহাদের মন্দ ভাবগুলিরই কেবল অনুকরণ করিয়াছি, এবং এখনো করিতেছি। পাশ্চাত্য সমাজ তাহার দোষগুণ লইয়া যেখানে দাঁড়াইয়া আছে তাহা প্রচণ্ড রাজসিকতার সহিত অল্প তামসিকতা মিশ্রিত অবস্থা। এই অবস্থায় নিজের ভালমন্দ সব ভাবগুলি হজম করিয়া তাহা দ্বারা সমাজের পুষ্টিসাধন করিয়া জাগতিক ক্ষেত্রে সবল হইয়া দাঁড়াইবার শক্তি তাহার আছে। কিন্তু আমরা ঘোর তামসিকতায় দীর্ঘকাল ডুবিয়া ছিলাম, কয়েকজন অতিমানবের প্রচেষ্টায় সবে তামসিক প্রভাব কিছুটা কাটাইয়া উঠিয়াছি, রাজসিক ভাব আয়ত্ত করিতে সবে শিখিতেছি। এখন পাশ্চাত্যের তামসিক ভাবগুলি হজম করিবার মত শক্তি আমাদের নেই, উহা দাবাইয়া উঠিবার মত রাজসিকভাব ও আমাদের নিজস্ব সাত্ত্বিক ভাব বর্তমানে পরিমাণে ও ব্যাপ্তিতে যথেষ্ট নয়। উহা আমাদের সমাজের প্রাণশক্তিকে ক্ষীণ করিয়া জীবন হইতে তেজবীর্য কাড়িয়া লইবে। তাছাড়া এত অবনতি সত্ত্বেও, বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া জীবনের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত আমাদের জাতির নিজস্ব সদ্ভাবগুলি এখনো সমাজে বহুল পরিমাণে রহিয়াছে; ঐগুলি আছে বলিয়াই আজিও আমরা নিজস্বতা লইয়া বাঁচিয়া আছি। সেগুলির সংরক্ষণ ও বর্ধনের, এবং উহা ভাঙ্গিয়া-চুড়িয়া দিবার মত

কিছু দেখিলে তাহার পথরোধ করারও দায়িত্ব সাহিত্যিকদের কম নয়।

বর্তমান সময়ে বিপজ্জনক পথের উপর দিয়া আমাদের চলিতে হইতেছে। এখন সর্বাগ্রে প্রয়োজন পরার্থে স্বার্থত্যাগ, তেজ-বীর্য প্রভৃতি যথার্থ মনুষ্যত্বের উদ্বোধক ভাবগুলি বহুল-প্রচারিত করা। সর্বসাধারণের কাছে কোন ভাব পরিবেশন করার পূর্বে আমরা যদি জাতির কল্যাণের কথা সব সময় মাথায় রাখি, তাহা হইলে মনে হয় প্রয়োজনমত নিজেকে সংযত করা সহজ হইবে। পাশ্চাত্য সমাজের ভাল জিনিষগুলি লইতেই হইবে, আমাদের সমাজের দোষগুলি বাদ দিয়া ভালটুকুর সঙ্গে উহা মিশাইতেও হইবে। কিন্তু সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, ইহা করিতে গিয়া আমাদের সমাজের ভালটুকুও যেন সমূলে নষ্ট করিয়া না ফেলি। একটি গল্প শুনিয়াছিলাম। একজন গল্প করিতেছিল, "আমার দাদা পশ্চিম থেকে একবার খুব ভাল একটি জারক নেবু এনেছিলেন। একদিন দাদা নেমন্তন্ন খেয়ে এসে হাঁসফাঁস করছেন। হঠাৎ নেবুটার কথা মনে পড়ে গেল। দাদাকে বললাম, 'একটু অপেক্ষা কর, তোমার অসুখ সারিয়ে দিচ্ছি।' পাশের ঘরে গিয়ে দাদাকে খাওয়ানোর জন্য যেই নেবুটা কাটতে গিয়ে ছুরি চালিয়েছি দেখি ছুরির ফলাটা নেই—নেবুর জারকগুণ এত বেশী ছিল যে ঐ সময়টুকুর মধ্যেই ফলাটা হজম হয়ে গেছে।" শুনে আর একজন বললেন, "ভাল জারক নেবু হলে ওরকম তো হবেই। আমারও এক দাদা কাবুল থেকে একটা জারক নেবু এনেছিলেন। তোর দাদার মত আমার দাদাও একদিন নেমন্তন্ন খেয়ে এসে হাঁসফাঁস করছেন। দেখে জারক নেবুটা টুকরো করে সামান্য একটু দাদার মুখে ফেলে দিয়ে বললাম, 'আর চিন্তা নেই ঘুমিয়ে পড়।' আমি তোর মত বোকা নই, আমি জানতাম ভাল জারক নেবু লোহার ছুরি দিয়ে কাটা যায় না। তাই পাথরের ছুরি দিয়ে কেটেছিলাম—দাদা নেবু কেনার সময়ই একটা পাথরের ছুরিও কিনে এনেছিলেন।

বিকেলে চায়ের আসরে দেখি দাদা আসেন নাই। খোঁজ করতে গিয়ে দেখি, দাদা যেভাবে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন, সেভাবেই চাদরটা রয়েছে। চাদর তুলে দেখি, দাদার টিকিটি শুধু বিছানায় পড়ে আছে, আর সবই হজম হয়ে গেছে। এত জারকত্ব ছিল নেবুটার মধ্যে! পরে শুনেছিলাম, ও নেবু শুধু কাবুলীদের লোহার মত শক্ত শরীরে সহ্য হয়। তাছাড়া মাত্রাও একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল।"

সমাজের কল্যাণ করিতেছি ভাবিয়া, সমাজের ব্যাধি সারাইবার উদ্দেশ্যে বিদেশাগত, কালের পরীক্ষায় এখনো অনুত্তীর্ণ ভাবগুলিকে বস্তুতান্ত্রিকতার নামে নির্বিচারে গ্রহণ ও আমাদের সমাজে প্রয়োগ করিতে যাইয়া আমরা যেন এই কাণ্ডটি না ঘটাইয়া বসি।

স্বামী তুরীয়ানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ
শরণম্

মঠ
আলমবাজার
১৫ জুন, ১৮৯৭

ভাই গঙ্গাধর,

আমি এইমাত্র তোমার একখানি পত্র পাইয়া তোমাদের কুশল সংবাদ পাঠে অতিশয় আনন্দিত হইলাম। আমরাও তোমাদের জন্য বিশেষ চিন্তিত ছিলাম। এখানেও গত শনিবার ঠিক পাঁচটার পর অতি ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। আমাদের সম্মুখের বাটীর বহির্দেশের উপরিভাগ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আমাদের মঠের যদিও কোনস্থান একেবারে পড়িয়া যায় নাই, কিন্তু অনেক স্থানই ফাটিয়া বিশেষ জখম হইয়া একেবারে বাসের অনুপযুক্ত করিয়াছে। আমরা পরদিন হইতেই বাটীর সন্ধান করিতেছি, কিন্তু সুবিধামত পাওয়া যাইতেছে না। এমন বাটী নাই যাহা গত ভূমিকম্পে কোন আঘাত পায় নাই। কলিকাতায় অনেক বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকাও ভূমিসাৎ হইয়াছে, শুনিতেছি অনেক জীবনও নাকি নষ্ট হইয়াছে, কি দুর্দৈব! তোমার নামে গতকল্য রাজা একটি ৫০৲ টাকার মণিঅর্ডার করিয়াছেন, পাইবামাত্র সংবাদ দিবে এবং টাকা ফুরাইবার পাঁচ ছয় দিন পূর্বেই তাঁহাকে টাকার জন্য পত্র লিখিতে তিনি বলিতেছেন। রাজার আজ দিনকতক আমাশয় ও জ্বর হইয়াছিল, এখন ভাল আছেন। আলমোড়া হইতে স্বামীজী তোমার কার্যের সুখ্যাতি করিয়া অতি আনন্দের সহিত এক পত্র লিখিয়াছেন— বাঃ ভাই, লেগে যাও দাদা, এই তো কাজ! 'পরোপকারায় হি সতাং জীবনম্।' স্বামীজী বলেছেন যে, তোমার প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের পূজা করা হচ্ছে। তুমি আমাদের ভালবাসা জানিবে। ইতি—

তোমারই
শ্রীহরি

সর্বজনীন শিক্ষায় প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত

(পূর্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী

(১০) জাতীয় সংহতি সৃষ্টিতে সংস্কৃত :—

জাতীয় সংহতির অভাব স্বাধীনোত্তর ভারতের এক বিরাট সমস্যা। বহু ভাষা এবং বহু প্রদেশে বিভক্ত এই বিশাল উপমহাদেশ অনন্ত-বৈচিত্র্যের লীলাভূমি। একমাত্র সংস্কৃত ভাষাই এই বহুধা-বিভক্ত জনগণের ঐক্যসূত্র। অতীতে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহৃত হ'ত। কেরলের শ্রীমৎ শংকরাচার্য, বাংলার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভৃতি মনীষী নিখিল ভারতে তাঁদের ভাবধারা প্রচারে সর্বভারতীয় ভাষা সংস্কৃতকেই গ্রহণ করেছিলেন, কোনো প্রাদেশিক ভাষা নয়। আন্তঃরাজ্য-সংযোগ এবং ভাবের আদানপ্রদান সংস্কৃতেই নিষ্পন্ন হ'ত। তখন অধিকাংশ রাজ্যের রাষ্ট্রভাষা ছিল সংস্কৃত। এই বাংলাদেশেই পাঠান শাসনের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ লক্ষ্মণসেনের শাসনকাল অবধি রাজকার্য সংস্কৃতেই সম্পাদিত হ'ত। বাংলা ভাষায় প্রাপ্ত প্রাচীনতম গ্রন্থ "চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের" টীকা সংস্কৃতে রচিত। চৈতন্যচরিতামৃতের টীকাও সংস্কৃতে রচিত। অধিক প্রচলিত এবং সর্বভারতীয় ভাষা বলেই এই সব টীকাকার সংস্কৃতকে অবলম্বন করেছিলেন। সংস্কৃত মন্ত্রাদিতেও সর্বভারতীয় ঐক্যচেতনাকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছে। যেমন, সামান্য জলশুদ্ধির মন্ত্রেও দেখি—"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥" বহুরাজ্যে বিভক্ত এই ভারতের জনসাধারণ একমাত্র সংস্কৃতের স্বর্ণসূত্রেই একসঙ্গে বাঁধা ছিল। সুতরাং ভারতীয় জাতীয়তার ভিত্তিতে যদি ভারতীয় চিত্তে ঐক্যবোধ জাগ্রত করতে হয়, তাহলে একমাত্র সংস্কৃতই হচ্ছে তার নিদান। সুতরাং স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের চিত্তে একান্তপ্রয়োজনীয় ঐক্যবোধের বীজ বপন করার জন্য শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃতকে অবশ্যপাঠ্য করা একান্ত প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং রাজনীতিবিদ সর্দার কে. এম. পানিক্কর বলেছেন—"When we talk of our national genius being unity in diversity, the fundamental oneness of the Indian mind ; what we are really meaning is the dominance of Sanskrit which overrides the regional differences and linguistic peculiarities and achieves a true national character in our thought and emotion and even gives form and shape to the languages.···*The Unity of India will collapse if it ceases to be related to Sanskrit and breaks away from Sanskrit and the Sanskrit traditions Sanskrit alone has the preeminence which Hindi could never claim over the great regional languages enabling her to maintain and uphold in every region of India* the supreme claim of Indian Unity". মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন রাজ্যপাল প্রবীণ কংগ্রেস-নেতা ৺পট্টভি সীতারামায়া বলেছেন—"To us in South India, I do not see how we shall stand to lose by recognising Sanskrit as the national language. We can understand Sanskrit better than Hindi and other derivatives of Sanskrit." এই সকল কারণে এক সংস্কৃত ভাষার সূত্রেই ভারতের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণকে বাঁধা যেতে পারে। জাতীয়

সংহতির চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা তাই একান্ত প্রয়োজন।

(১১) আন্তর্জাতিক মর্যাদা অর্জনে সংস্কৃত :—

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের যা মর্যাদা, তা কেবলমাত্র ভারতীয় সংস্কৃতির শাশ্বত অবদানের জন্য। আর সেই সংস্কৃতি হ'ল সংস্কৃত-ভাষাশ্রিত। সুতরাং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের প্রাপ্ত সম্মানের মর্যাদা রক্ষা করতে হ'লে সংস্কৃত শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যেতে পারে যে কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ "অক্সফোর্ড" বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে "ডি-লিট্" উপাধিপ্রাপ্তির প্রতিভাষণ দিয়েছিলেন সংস্কৃতে; শান্তিনিকেতনে সাংস্কৃতিক মেলনোৎসবে চৈনিক প্রতিনিধিগণকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন সংস্কৃতে। এই সেদিনও ভারত-রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সোভিয়েট রাশিয়ায় মৈত্রীযাত্রায় গমন করলে সোভিয়েট সরকার ভারত-রাষ্ট্রপতিকে সংস্কৃত-ভাষায় রচিত মানপত্র দিয়ে সম্বর্ধিত করে। অতীতে সংস্কৃতের মাধ্যমেই পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভারতের রাখীবন্ধন রচিত হয়েছিল। তাই, আজও সংস্কৃতই হচ্ছে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সত্যিকারের সার্থক মিলনভূমি। এই প্রসঙ্গে Rew Warner তাঁর "Cult of Power" (London 1946) গ্রন্থে লিখছেন—

"......a knowledge of the common origins of our ways of thought is a desirable thing to have in a world which must unite or perish. ...One might, on similar grounds, advocate the teaching of Sanskrit in all Indo-European schools." (Page 151.)

তাই ভারত সরকারের "Sanskrit Commission"-এর রিপোর্ট লিখিত হয়েছে—

"It was the inspiration from Sanskrit which had led to the establishment of the Indo-European world, and had brought in a new conception of history. On a study of Sanskrit and its sister languages, the basic unity of the Indo-European people has been, to some extent, established." (Page 74)

শুধু ইউরোপে কেন, এশিয়ারও অন্যান্য দেশের সঙ্গে সংস্কৃতের মাধ্যমেই ভারতের মৈত্রীবন্ধন রচিত হয়েছিল। প্রাচীন চীনে সংস্কৃতচর্চার একটি প্রশস্ত ধারা সেদিন বিদ্যমান ছিল। তথাকার সুপ্রাচীন "বোধিরুচি" মঠে সাতশত সংস্কৃতজ্ঞ ভিক্ষু বসবাস করতেন। সেই অতীতে সংস্কৃত-চৈনিক অভিধান তাঁরা গ্রন্থনা করেছিলেন। হিউয়েন সাং-এর মতো মুমুক্ষু বিদ্যার্থীরা ভারতেই তীর্থযাত্রা করতেন। তিনি "মোক্ষাচার্য" এবং "মহাযানদেব" এই দুটি সংস্কৃত নাম নিজের চৈনিক নামের পরিবর্তে গ্রহণ করেছিলেন এবং চীনে ফিরে গিয়েও সংস্কৃত ভাষাতেই ভারতীয় গুরুদের সঙ্গে পত্রালাপ করতেন। কাম্বোডিয়া, জাভা এবং বোর্ণিয়োতে বিশুদ্ধ সংস্কৃতে রচিত বহু শিলালিপি পাওয়া গেছে। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের পতি স্বর্গত রঞ্জিত পণ্ডিত বহু গবেষণা ক'রে প্রমাণিত করেছেন যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের আদানপ্রদানের ভাষা ছিল তখন একমাত্র সংস্কৃত। বিখ্যাত Spanish গ্রন্থকার এবং ঐতিহাসিক তাঁর "Le Races Aryans de Peru" গ্রন্থে বলছেন যে দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি বিশেষ ক'রে পেরু সংস্কৃতি সংস্কৃত ভাষার দ্বারা বেশ প্রভাবিত। তিনি লিখছেন—"Every page of Peruvian poety bears the imprint of the Ramayana and Mahabbharata. Sanskrit was the secret language of the rulers and Quichna, the language of the Peruvians."

(১২) সংস্কৃতের আন্তর্জাতিক প্রসার :—

Sanskrit Commission-এর রিপোর্টেই বলা হ'য়েছে—

"Sanskrit by its origin and its basic character links us to the West. But it has been no less a potent bond of union for India with the lands of Asia —with Serindia or Central Asia of ancient and mediaeval times where the cultures of China and India had a common meeting place ; with Tibet, with China and the lands within the orbit of Chinese civilisation—Korea and Japan and Vietnam ; and above all, with the lands of farther India—Burma and Siam, Pathet Lao and Cambodia and Cochin China or Champa and the area of Malaya and Indonesia. Ceylon is of course a historical and cultural projection of India. In all these lands, Sanskrit found a home for itself as the vehicle of Indian thought and civilisation which flowed out into them as a peaceful cultural extension, from the closing centuries of the first thousand years before christ. It found for itself new homes in the other countries of Asia as noted above. It found also a place of honour in the culture of a great and civilised people like the Chinese and following the Chinese the Korians, the Japanese and the Vietnamese, and also the Tibetans, and the Turks of Central Asia, and the Mongols and the Manchus." (Page 74.)

তাই, আন্তর্জাতিক বিশ্ব সংস্কৃতের মাধ্যমেই ভারতবর্ষকে জানে এবং সেই জন্যই মর্যাদা দান করে। সংস্কৃতবর্জিত ভারত এবং সংস্কৃতানভিজ্ঞ ভারতবাসী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শুধু অপাঙ্‌ক্তেয় নয় ধিকৃতও বটে। এই কারণেও স্বাধীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃতের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।

(১৩) সংস্কৃত সম্বন্ধে মনীষিমণ্ডলীর অভিমত :—

প্রসঙ্গক্রমে কয়েকজন স্বদেশী এবং বিদেশী দূরদর্শী মনীষীর সংস্কৃতবিষয়ক সদুক্তিসমূহ বিশেষভাবে স্মরণীয়।—

"I believe in the great power which Vivekananda used to ascribe to sanskrit. We are unnecessarily frightened by the difficulty of learning Sanskrit······And that it must not be forgotten that such a knowledge of sanskrit gives one a master-key to the knowledge of the majority of Indian languages not exceeding the southern group."

(M. K. Gandhi)

"The lives of over two hundred million people in our country are associated with the sacred rituals in Sanskrit from birth to death···Sanskrit is thus our great source of strength. The world is in a mess. It could only be redeemed by a wide appreciation of the Ramayana, the Mahabharata and the Bhagavadgita and of the inspiring message of the upanishads, which teach truth and non-violence and above all, faith in the dignity of man's personality, in the moral order and in god."

(Dr. K. M. Munshi)

"There is great inspiration in Sanskrit literature. This is why the study of Sanskrit has become essential for free India."

[Dr. Harekrishna Mahtab]

"Its (Sanskrit) suitability to be the medium for legal, philosophical and scientific thought is unrivalled."

[Dr. Sampurnananda]

"The study of Sanskrit is not a luxury and should not be looked upon as such. *It is a necessity.* Sanskrit, being our greatest single national inheritance, the roots of our national behaviour, pattern of our thought and the source of all our ideas being embeded in Sanskrit, a familiarity with it is necessary for any one who claims to be a true Indian.

Sanskrit alone has the pre-eminence which Hindi could never claim over the regional languages enabling her to maintain and uphold in every region of India the supreme claim of Indian unity."

[Sardar K. M. Panikkar]

সত্যসন্ধানী পাশ্চাত্যমনীষীদের গভীর গবেষণালব্ধ সত্যভাষণগুলো ভারতীয় শিক্ষা-নিয়ন্তাদের বিভ্রান্তি দূর করুক—

"Such is the marvellous continuity between the past and the present in India, that inspite of repeated social convulsions, religious reforms and foreign invasions, Sanskrit may be said to be the only language that is spoken over the whole extent of that vast country. We can hardly understand how, at so early a date, the Indians had developed ideas which to us sound decidedly modern. Some of the riddles of the future find their solution in the wisdom of the past."

(F. Maxmuller)

"Sanskrit, it is of a wonderful structure, more perfect than Greek, more copious than Latin and more exquisitly refined than either."

(Sir William Jones.)

"Justly it is called Sanskrit i. e., perfect, finished. The Sanskrit combines these various qualities, possessed separately by other tongues.... Judged by an organic standard of the principal elements of language, the Sanskrit excels in grammatical structure and is indeed the most perfectly developed of all idioms not excepting Greek and Latin" (Prof. Schelegel)

"Its exceeding age, its remarkable conservation of primitive materials and forms, its unequalled transparency of structure, give it an indisputable right to the first place among the tongues of the Indo-European family."

(Prof. Whitney)

"Sanskrit is a language of unrivalled richness and variety, a language, the parent of all those dialects that Europe has finally called classical."

[W. C. Taylor]

"The intellectual debt of Europe to Sanskrit literature has been undeniably great." [Prof. Macdonell]

"It is impossible to conceive a language so beautifully musical or so magnificently Grand."

[Prof. H. H. Wilson]

"The most beautiful perhaps of all languages."

[Prof. A. Pictat]

প্রবন্ধের কলেবরবৃদ্ধির আশংকায় অপর উদ্ধৃতিপ্রয়োগে নিরস্ত হওয়া গেল।

(১৪) স্বাধীনতার পূর্ণতা-সম্পাদনে সংস্কৃত :—

সর্বোপরি, ভারতের স্বাধীনতার পূর্ণতা-সম্পাদনের জন্য সংস্কৃত শিক্ষা অপরিহার্য। স্বাধীনতার দুটি দিক—রাজনৈতিক এবং

সাংস্কৃতিক। আমাদের দেশে বহু সাধনায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা এলেও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা এখনো আসেনি। অথচ, সাংস্কৃতিক পরাধীনতা (cultural slavery) রাজনৈতিক পরাধীনতার (Political Slavery) চেয়ে অধিকতর ক্ষতিকর এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা না এলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা স্থায়ী হ'তে পারেনা। সংস্কৃতকে অস্বীকার করে ভারতের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অসম্ভব। তাই, ভারতের কষ্টার্জিত স্বাধীনতার পূর্ণতা-সাধনের জন্য সংস্কৃত ভাষা অবশ্য গ্রহণীয় তথা অবশ্য শিক্ষণীয়।

(১৫) হিন্দীশিক্ষায় সংস্কৃত :—

ভারতের সরকারী ভাষা স্থিরীকরণকালে সর্বভারতীয় ঐক্য, সর্বপ্রদেশীয় জনগণের প্রতি সমবিচার এবং ভাষার অফুরন্ত প্রাণশক্তির কথা বিবেচনা করে সংস্কৃতকেই সেদিন গ্রহণ করার জন্য গণপরিষদে প্রস্তাব এনেছিলেন বাংলাদেশ হ'তে নির্বাচিত মুসলমান প্রতিনিধি নাজিরুদ্দিন আহমেদ। আর তাঁকে সমর্থন জানিয়েছিলেন গণপরিষদেরই তৎকালীন বিশিষ্ট সদস্য ৺ডঃ বি. আর. আম্বেদকর, ডঃ বি. ভি. কেশকার, শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী, ডঃ পি. সুব্বারায়ন, শ্রীমতী দুর্গাবাঈ, শ্রী ভি. এস. মুনিস্বামী পিল্লাই, পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র এবং আরো অনেকে। বাইরে থেকে স্যর মির্জা ইসমাইল, নোবেল-পুরস্কারপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক আচার্য চন্দ্রশেখর বেংকট রমণ, ডঃ কৈলাসনাথ কাটজু, ডঃ পট্টভি সীতারামায়া, শ্রী নিজলিঙ্গাপ্পা, ডঃ মাধবদাস শ্রীহরি আণে প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই সংস্কৃত ভাষার পক্ষেই মত প্রকাশ করেন। নানা রাজনৈতিক স্বার্থ-বুদ্ধিতে পরিচালিত হয়ে হিন্দীকে দ্বিতীয়বার ভোট-গণনায় একটি মাত্র ভোটাধিক্যে সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করলেও পূর্বকথিত কারণে সংস্কৃত হতেই শব্দাবলী গ্রহণ করার জন্য ভারতীয় সংবিধানে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে—

"It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, style and expressions used in Hindusthani and in other languages of India specified in the eighth schedule and by drawing···for its vocabulary, *primarily on Sanskrit* and secondarily on other languages". (Indian Constitution. Page. 170)

সুতরাং, এই আপাতস্থিরীকৃত রাষ্ট্রভাষা শিক্ষার জন্যও প্রথমে সংস্কৃত শিক্ষা করা প্রয়োজন। সংস্কৃতে জ্ঞান থাকলে যে কোন ভারতীয় ভাষা সহজেই স্বল্প সময়ে শিক্ষা করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে ১৯।১০।৫২ তারিখে মধ্যপ্রদেশের তৎকালীন রাজ্যপাল ৺পট্টভি সীতারামায়া সুচিন্তিতভাবে বলেছিলেন—

'Sanskrit can no longer be regarded as a dead language. It is up to us to make it a living language. Sanskrit remains dead today because it is neglected. To us in South India, I do not see how we shall stand to lose by recognising Sanskrit as the national language. We can *understand Sanskrit better than Hindi* and other derivatives of Sanskrit. In Telegu there is 60 p.c. Sanskrit admixture and in Malayalam whole samasas of Sanskrit are incorporated".

পাশ্চাত্য জগৎও স্বাধীন ভারতকে সংস্কৃতের মাধ্যমেই দেখতে চায়। বর্তমান লেখক কর্তৃক সংস্কৃতে অনূদিত রবীন্দ্রনাথের "মুক্তধারা" নাটক প্রকাশিত হ'তে দেখে পশ্চিম জার্মানীর মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত আচার্য ডক্টর ফেডারিক্ হাইলার ২৪।৭।৬৪ তারিখে লিখিত পত্রযোগে নানাকথার সঙ্গে জানাচ্ছেন—

"...I love Sanskrit as the most perfect language of the world, the earthly expression of the eternal ritam. Every Sanskrit verse is heavenly music for my ears. I only regret that the independent Indian State did not accept Sanskrit as the official language of India; just as Israel has adapted the ancient language of the Old Testament to modern condition. India could do the same with regard to Sanskrit...."

যাই হোক, সংস্কৃতকেই মধ্যে রেখে অন্য ভাষা শিক্ষা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত সাহিত্যিক কাকা কালেলকার সুন্দর ভাবে বলেছেন—

"Any number of guests may invited to the house, but care has to be taken to see that the guests do not crowd out the host."

(১৬) সিদ্ধান্ত ঃ—

এই সব কারণে শিক্ষাসংস্কারের জন্য গঠিত আচার্য সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণনের নেতৃত্বে "University Education Commission" (১৯৪৮—৪৯), আচার্য লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়রের সভাপতিত্বে "Secondary Education Commission" (১৯৫২—৫৩) শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর খেরের অধিনায়কত্বে "Official Language Commission" (১৯৫৫—৫৬) এবং ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নায়কত্বে "Sanskrit Commission" (১৯৫৫—৫৬)-এ সর্বজনীন শিক্ষায় সংস্কৃতের প্রয়োজনীয়তা দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকৃত হয়েছে।

তাই উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সকল শাখাতেই ৮ম হ'তে ১১শ শ্রেণী পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষাকে অবশ্যপাঠ্য করলে সর্বজনীন শিক্ষায় সংস্কৃতের স্থান কিছুটা রক্ষিত হবে। সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি সংস্কৃত না জানার অভিশাপ হ'তে মুক্ত হবে। কলেজীয় শিক্ষায় কলাবিভাগে স্নাতক পর্যায়ে অন্ততঃ ১০০ নম্বরের একটি পত্র সংস্কৃতের জন্য অবশ্যপাঠ্যরূপে সংরক্ষিত করা একান্ত প্রয়োজন। আর স্নাতকোত্তর শিক্ষায় সকল সাহিত্য শ্রেণীতেও ১০০ নম্বরের একটি সংস্কৃত পত্রের পাঠ প্রবর্তন করা সমুচিত বলে মনে হয়।

সমসাময়িককালে প্রাক্তন উপাচার্য এবং বিচারপতি ডঃ শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সরকার কর্তৃক গঠিত "শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষা পুনর্বিন্যাস" কমিটির সংস্কৃতবিষয়ক অভিমত বিশেষভাবে স্মরণীয়—

"Sanskrit is a language in which the civilization of India has found its expression for over thousands of years. Its influence on Indian civilization is inestimable. By its dynamic force it has absorbed and assimilated numerous elements attaining a classical character. As a language it has unsurpassed and unsurpassable intellectual value. Study of Sanskrit promotes intellectual discipline, and has great effect on the formation of national character. It is the greatest treasure India possesses and is her finest heritage. It would be a great loss to the country, to its culture and heritage if the language is lost. Sanskrit has practically an infinite variety of

synonyms and antonyms and is capable of expressing every shade of thought. It is from Sanskrit that words relating to higher culture could be derived. India needs new scientific and technical words for the development of Science. Sanskrit can supply in abundance the words for the growth of Science and Technology, subjects perhaps to retaining a few words of international use. Sanskrit presents the greatest common measure of agreement in its vocabulary among most of the languages of Modern India, and is vital to their development. *So, the study of Sanskrit is essential.*" (Page 6.)

(১৭) উপসংহার—

যুগের প্রয়োজনে আজ বাংলাদেশের শিক্ষাজগতে নানাবিধ পরিবর্তন ঘটে চলেছে। তারই অজুহাতে সংস্কৃতশিক্ষাকে বৈদেশিক শাসনে যে স্থান দেওয়া হয়েছিল, তার থেকেও বিচ্যুত করার একটা অশুভ প্রয়াস দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে বাংলাদেশে রাজনীতির প্রভাবের সীমায় বদ্ধ অনেক বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীর প্রচেষ্টা সংস্কৃত শিক্ষাবিস্তারের, দেশের যথার্থ কল্যাণের বিরুদ্ধ পথে চলেছে; অনেক ক্ষেত্রে অদূরদর্শিতা ও বিপরীতবুদ্ধি শিক্ষার মূল ভিত্তিকে কম্পিত করছে। অপরিপক্ক কল্পনার বিকলাঙ্গ রূপায়ণ শেষে না মহতী বিনষ্টিকেই নিয়ে আসে। এখানে হিন্দীর যূপকাষ্ঠে সংস্কৃতকে বলি দিতেও কুণ্ঠাবোধ হচ্ছে না; অথচ কেন্দ্রভূমি দিল্লীতে মধ্যশিক্ষার সকল শাখাতেই—সংস্কৃতকে অবশ্যপাঠ্য করা হয়েছে।

শিক্ষাব্যবস্থাই হচ্ছে জাতীয়তার সত্যিকারের ভিত্তি, দেশোন্নতির মৌলিক উপাদান। যে মানবগোষ্ঠী ভবিষ্যতে জাতীয় প্রগতির নেতৃত্ব গ্রহণ করবে, তাদের শিক্ষাব্যবস্থা অসম্পূর্ণ এবং ত্রুটিযুক্ত হ'লে ভবিষ্যৎ জাতি দুর্বল হ'য়ে পড়বে। তাই, ভারতবর্ষে সমুন্নত, সুশিক্ষিত এবং শক্তিশালী জাতিগঠনে সর্বজনীন শিক্ষার পাঠ্যক্রমে সংস্কৃতশিক্ষার অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। সমুন্নত চরিত্র, দেশকল্যাণে উদ্বুদ্ধ, জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত, আদর্শনিষ্ঠ নাগরিকই দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। এই আদর্শনিষ্ঠ নাগরিক সৃষ্টিতে রয়েছে সংস্কৃতশিক্ষার বিরাট ভূমিকা। চতুর্দিকে আজ তরুণসম্প্রদায়ের যে সার্বিক অধঃপতন জাতির ভবিষ্যৎকে আশংকিত করে তুলেছে, তাকে রোধ করতে গেলে সংস্কৃতশিক্ষার প্রসার একান্ত প্রয়োজন। সংস্কৃতের অমৃতস্পর্শে তরুণচিত্তকে সঞ্জীবিত করে তোলা স্বাধীন ভারতের পবিত্র কর্তব্য। তাহলে একদিন ভারতীয় শিক্ষিতসমাজে সার্থক হয়ে উঠবে উপনিষদের ঋষি-পিতামহের মহতী বাণী—

"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।"

এস তুমি, এস মা আবার!

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

অজ্ঞানতা-কুহেলিকা মুছি',
এ বিশ্বেরে করি শুভ্র-শুচি,
জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্তিখানি ধরি
এ ভুবন 'পরি,
শুচিস্মিতা মা আমার, এস তুমি, এস গো আবার!

দিকে দিকে আর্ত্ত-কণ্ঠে ওঠে আর্ত্ত-রব,
নিঃস্বতার মাঝে আজ বিশ্ব যেন হারায়েছে
সকল গৌরব আর সকল বৈভব!
প্রাণের বৈভব দিয়ে পূর্ণ তারে ক'র মা আবার!
শুচিস্মিতা মা আমার, এস তুমি, এস মা আবার!

বুকে বুকে বড় ক্ষুধা,
কণ্ঠে কণ্ঠে বড় তৃষ্ণা জাগে;
এ বিশ্বের ভোগ্য যত, ভরে গেল হলাহলে,
সব কিছু তাই তিক্ত লাগে!
স্তন-সুধা বক্ষে ব'য়ে জাগো তুমি, জাগো মা আবার!
শুচিস্মিতা মা আমার, এস তুমি, এস মা আবার!

আকাঙ্ক্ষার বস্তু লাগি', ভ্রান্তি-পথে ছুটে চলি,
ক্লান্ত হ'ল প্রাণ!
আলেয়ার রূপ দেখি' বৃথামত্ত হ'নু হায়!
জীবনের কোথা পরিত্রাণ!
নিবিড় আঁধার মাঝে আছি মগ্ন হ'য়ে!
এ আঁধারে তুমি এস, জ্ব'লে ওঠ একবার,
করুণার শুভ্র-জ্যোতি ল'য়ে!
অধরা হ'য়ো না আর,
ধরা দাও মা আমার,
প্রাণে তুমি প্রাণময়ী
হও মা আবার!
শুচিস্মিতা মা আমার, এস তুমি, এস মা আবার!

শাক্ত পদাবলীর কাব্যমূল্য

অধ্যাপক শ্রীচিত্তরঞ্জন গোস্বামী

শাক্তপদসমূহের রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। পদগুলিতে ঐ সময়কার সমাজের পরিচয় এমনভাবে ফুটে উঠেছে যে ওগুলোর আলোচনায় সমাজের কথা অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। কিন্তু সমাজের চিত্র মেলে বলেই কিছু পদাবলী কাব্যহিসাবে পাশমার্ক পেয়ে যেতে পারে না। শাক্ত পদে শক্তিসাধনবিষয়ক সমুদয় তত্ত্ব স্থান পেয়েছে, কিন্তু দর্শন বা সাধনতত্ত্বের জোরে কোন রচনায় কবিত্বের দাবী টিঁকতে পারে না। কবিতা একটি সৃষ্টি, জীবন্ত অখণ্ড একটি মূর্তি। ভাব ভাষা সব মিলে এই জীবন ও অখণ্ডতার প্রতীতি যদি জাগাতে পারে তবেই শাক্তপদকে কাব্য বলে মানব।

যে ভাববিষয়কে নিয়ে কাব্য তার জন্যে অন্তরে বাসনা না থাকলে তার আস্বাদ সম্ভবে না—প্রাচীন আলংকারিকের এ নীতিতে আধুনিক কাব্যজিজ্ঞাসুগণেরও সমর্থন আছে। শাক্তপদ ঈশ্বরারাধনামূলক, কাজেই তার পরিপূর্ণ আস্বাদ ঈশ্বরে বিশ্বাসের অপেক্ষা রাখে। নিজের ভ্রাতৃপ্রেম না থাকলেও নিবিড় ভ্রাতৃবাৎসল্যের মাধুর্য আমাদেরকে মুগ্ধ করতে পারে, তাই দেখা যায় তেমনভাবে ঈশ্বরপরায়ণ না হয়েও কাব্যরসিক গানের গান (Song of Solomon), সুফী কবির মরমী কবিতা, বাউল গান, বৈষ্ণব পদ, গীতাঞ্জলি প্রভৃতিতে রস পান। কিন্তু এদের সঙ্গে তুলনায় শাক্তপদের একটু অসুবিধা আছে। এ পদে ভগবানের মধুর রূপ নয়, তাঁর শক্তি ও ঐশ্বর্যের কথা, দ্বিতীয়তঃ সেকথা বড় বেশিরকমভাবে শাক্তদর্শন ও সাধনতত্ত্বের সঙ্গে জড়িত। বৈষ্ণব পদের মধুর ভাব ও ললিত প্রকাশ পাঠকের মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে, শাক্তপদের শক্তি-মহিমা ও তার কঠিন রূপ সেদিক থেকে দুর্বল। কিন্তু একথা বলতে পারি যে যদি শক্তির মহিমা সত্যিই অন্তরে উপলব্ধি করা যায় ও তার রুদ্ধশ্বাস নির্নিমেষ প্রকাশ দেওয়া যায় (বিবেকানন্দের Kali the Mother কবিতা স্মরণীয়) তবে তা নিশ্চয়ই বিদগ্ধ পাঠককে স্পর্শ করবে, যদিও কবিকেও কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে :—

> ও কেরে মনোমোহিনী
> ঐ মনোমোহিনী।
> ঢল ঢল ঢল তড়িৎ-ঘটা,
> মণি-মরকত-কান্তি-ছটা।
> একি চিত্ত-ছলনা, দৈত্য-দলনা,
> ললনা-নলিনী-বিড়ম্বিনী।

—এ কাব্যের স্বাদ ভিন্নতর, কিন্তু ন্যূনতর মোটেই নয়।

তিন হাজারের অধিক শক্তিবিষয়ক পদের সংগ্রহ থেকে বেছে বেছে যে শ'তিনেক পদ অমরেন্দ্রনাথ রায় 'শাক্তপদাবলী' নামে চয়ন করেছেন সেগুলিই আজ শিক্ষিত বাঙ্গালীর অধিগম্য। কাজেই এই বইখানি অবলম্বন করেই শাক্তপদের বিচারে প্রবৃত্ত হব। উক্ত গ্রন্থে সম্পাদক পদগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে সাজিয়েছেন, যেমন বাল্যলীলা, আগমনী, বিজয়া, মনোদীক্ষা, ভক্তের আকূতি, জগজ্জননীর রূপ ইত্যাদি। প্রাচীন সাহিত্যে একই দেবীর মঙ্গলগান যেমন অনেক কবি করেছেন, যেমন একই লীলা নিয়ে বহু বৈষ্ণব মহাজন পদ রচনা করেছেন তেমনি একই

শ্রেণীর অজস্র শাক্তপদের ছড়াছড়ি। এক বিষয় নিয়ে অনেকের লেখায় কোন দোষ নেই, কিন্তু বিষয়টিকে অন্তরে গ্রহণ ও তার প্রকাশের ভঙ্গিতে যদি বিশিষ্টতা না থাকে তবে সে লেখা কাব্যপদবাচ্য হতে পারে না। আমাদের আকরগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই এই শ্রেণীর। বেশ কতকগুলি পদ সংস্কৃত গ্রন্থবর্ণিত আদ্যাশক্তির বিভিন্ন রূপের বঙ্গানুবাদ, কতকগুলি সাধনতত্ত্বের বিবৃতি, অনেকগুলির ভাব ও ভাষা দুই-ই ধার করা অর্থাৎ চিরাচরিত। কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কবিরও এমন পদ আছে যা তাঁদের নামের জোরেও কাব্য বলে গণ্য হতে পারে না। ছন্দের ত্রুটি অনেকই আছে কিন্তু তার কথা বলা ঠিক হবে না কারণ পদগুলি গাওয়ার জন্যে রচিত, ছন্দের যে কিছু ত্রুটি তা সুরে সমর্পিত হলেই কেটে যাওয়ার কথা। এমনও সম্ভব, যে-পদ কাব্যহিসাবে নগণ্য তাই গায়কের কণ্ঠে মনোমুগ্ধকর হতে পারে। সে যা হোক, একথা বিনা দ্বিধায় বলতে পারি যে কাব্যহিসাবেই যদি শাক্তপদকে জনসমাজে তুলে ধরতে হয় তবে তার অনেক ক্ষুদ্রায়তন সংস্করণ দরকার, তিনশ'র জায়গায় তিন পঁচিশ পঁচাত্তরটি পদের সঙ্কলন পাঠককে অনেক বেশী আনন্দ দেবে।

শাক্ত পদাবলীর কবিত্বের উপর আলোক-পাতই আমাদের লক্ষ্য। তাই অকাব্যগুলিকে যথাসম্ভব এড়িয়ে এক একটি বিভাগ ধরে শ্রেষ্ঠ পদগুলিরই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

প্রথমেই 'বাল্যলীলা'। শাক্ত পদাবলীর উপর বৈষ্ণব পদের প্রভাব খুবই (বৈষ্ণব সাধনায়ও অবশ্য শাক্ত তন্ত্রের প্রভাব পড়েছে), বৈষ্ণব প্রভাবেই বিশেষ করে বাংলাদেশে জগজ্জননী আদ্যাশক্তি ঘরের কন্যা-হিসাবে দেখা দিয়েছেন। গিরিরাজ, মেনকা, উমা ও মহেশ্বরের পৌরাণিক কাহিনীর লৌকিকীকরণও এজন্যে দায়ী। দেবতাকে একান্ত আপনার করে ঘরের করে পাওয়ার মধ্যে একটা মাধুর্য আছে, শ্রীমদ্ভাগবত ও বৈষ্ণবপদে এ মাধুর্যের সীমাহীন অভিব্যক্তি। কিন্তু বাল্যলীলার পদগুলিতে কি সত্যিই সে মাধুর্যের সন্ধান মেলে? মোটেই না, কারণ শাক্ত সাধনার পথ ভিন্ন। এখানে পরম সত্তার মধুর কান্ত-রূপের সন্ধান নয়, তাঁর শক্তির, সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কারী বিভূতির সাক্ষাৎ ও প্রসাদ লাভই লক্ষ্য। বৈষ্ণব আনন্দঘন পরম পুরুষের আনন্দলীলা কীর্তন ও তার মাধুর্যে ডুবে থাকতে চায়, তাতেই তার চরিতার্থতা। শাক্ত সংসারের দুঃখধন্ধার উপর জয়ী হতে চায় দিব্যজ্ঞান ও শক্তি অর্জন করে। অজ্ঞানতা ও অক্ষমতাই সমস্ত দুঃখের মূল, অথচ পরম জ্ঞান ও শক্তি আমাদের মধ্যেই লুক্কায়িত আছে, বীরোচিত সাধনা ও মায়ের কৃপায় সেটি মুক্ত হতে পারে। ঘরের স্নেহকাতরা মায়ের প্রতিও আমাদের সম্ভ্রমের ভাব থাকে, কিন্তু এ মা যে অনন্ত শক্তিময়ী অসুরদলনী, প্রলয়ঙ্করীও বটে। কাজেই তাঁকে ভজনার পথ মাধুর্যের পথ নয়। অনন্যচিত্ত, সর্বতোভাবে সমর্পিত-আত্মা সাধকের দুর্লভ প্রচেষ্টাকে ধন্য করে জগন্মাতা সহজ হয়ে ছোট হয়ে কন্যারূপেও দেখা দিতে পারেন। সে হবে এক গভীর নিবিড় অধ্যাত্ম উপলব্ধি, যার অভিব্যক্তি সত্যিই হবে রমণীয়। কিন্তু শাক্ত পদে ভক্তি ও উপলব্ধির এরূপ নিবিড়তা বিরল—'বাল্যলীলা' বিষয়ক পদে ত নেই-ই।

বাল্যলীলার পদগুলি নিতান্তই ব্রজলীলার অক্ষম অনুকরণ। এগুলির না আছে শাক্ত সাধনার সঙ্গে সঙ্গতি, না আছে আভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য। দরিদ্র সংসারের মেয়ে—হঠাৎ

তার মধ্যে দেবৈশ্বর্য আরোপ, দু'য়ে মিলে এক অখণ্ড ছবি আদৌ গড়ে উঠে নি।

'আগমনী' ও 'বিজয়া'র ভাবের সঙ্গে শাক্ত সাধনার অসঙ্গতি নেই। মৃন্ময়ী মূর্তিতে মাকে দুর্গারূপে পূজার পরিপ্রেক্ষিতে এগুলি রচিত। মূর্তিপূজার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে, তা উপাসনাকে পূর্ণতা দিয়ে থাকে। আরাধ্যাকে শুধু মনে বা হৃদয়লোকে না রেখে তাঁকে একেবারে প্রত্যক্ষ বাস্তবরূপে গৃহে তথা জীবনে প্রতিষ্ঠা। সমস্ত গৃহ মায়ের উপস্থিতিতে গম্ভীর হয়ে উঠে, সাধক ও তার পরিজনবর্গের সমস্ত কর্ম চিন্তা চেষ্টা মায়ের সেবায় নিরত হয়, দেহ মন প্রাণ আত্মা সর্বতোভাবে মায়ের কাছে সমর্পিত হতে পায়। মাকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর আগমনের সূচনায় ও তাঁর আবির্ভাবে যে আনন্দ, তাই হল আগমনী-বিষয়ক পদের উৎস। কিন্তু শাক্তকবি জগজ্জননীর কথায় ঘরের কথা নিয়ে আসেন, দুর্গার আগমন যেন শ্বশুরালয়ের নির্বাসন থেকে দুদিনের তার পিত্রালয়ের স্নেহকুলায় কন্যার আগমন। কিন্তু কন্যা ও দেবী দু'য়ে মিলে এক হয়ে যায় নি। পূর্বেই বলেছি শাক্ত সাধনায় দু'য়ের একীকরণ সুদুর্লভ অধ্যাত্ম উপলব্ধির অপেক্ষা রাখে। আগমনীর কবিতায় যে কিছু রস তা তার মানব উপাদানের জন্যে। যে কবিতায় দেবত্ব আদৌ আসে নি সে কবিতাই অধিক উপভোগ্য হয়েছে, কারণ তাতে দ্বৈতের অসঙ্গতি নেই। রামপ্রসাদের একটি পরিচিত পদ নেওয়া যাক।—

গিরি, এবার আমার উমা এলে,
আর উমা পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়—
এবার মায়ে-ঝিয়ে করব ঝগড়া,
জামাই বলে মানব না॥

এর মধ্যে দৈবী ভাব কী আছে? আছে কেবল মানবী মায়ের অন্তরের আর্তি আর তৎকালীন সমাজের সকরুণ ছবি। কমলাকান্তের আর একটি পদের খানিকটা :

কবে যাবে বল গিরিরাজ, গৌরীরে আনিতে?
ব্যাকুল হৈয়েছে প্রাণ উমারে দেখিতে হে।
গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, আনন্দে রোয়েছ ঘরে ;
কি আছে তব অন্তরে, না পারি বুঝিতে।
কামিনী করিল বিধি, তেঁই হে তোমারে সাধি,
নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে॥

একই ভাব একই ছবি ; দেবত্বের মিশেল ঘটে নি বটে, কিন্তু মানবরসটুকু নির্বাধে ফুটে উঠতে পেরেছে। কাজেই একথা বলা চলে যে শাক্ত সাধনার দিক থেকে আগমনীর পদগুলি তেমন সার্থক নয় কিন্তু সাধারণ মানব-কাহিনী হিসাবে এর কাব্যমূল্য আছে।

প্রাচীনকালে দেবদেবীকে উপলক্ষ্য হিসাবে দাঁড় না করিয়ে আপন অন্তরের কথা বলার রেওয়াজ ছিল না। এই হিসাবে আগমনী-বিজয়ার দৈবী ব্যাপারটা উপেক্ষা করে ওগুলোকে বঙ্গজননীর অন্তরের বেদনার অভিব্যক্তি হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। সে বেদনা যে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে অভিব্যক্ত তার পরিবর্তন ঘটলেও এর একটা সর্বজনীন দিক রয়েছে, সে হিসাবে এ পদগুলো আজও উপভোগ্য। কিন্তু দৈবী ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা যায় কি? কন্যার জন্যই কি বেদনা? যে দেবীকে তিন দিন ধরে আপ্যায়িত করে পরম তৃপ্তি পাওয়া গেল তাকে বিদায় দেবার বেদনাও কি এর মধ্যে নেই? সে যাই হোক কাব্যমূল্যের অন্যতম নিরিখ প্রকাশ-শৈলীতেও কিন্তু পদগুলি তেমন সমৃদ্ধ নয়। বেশির ভাগই সরল আটপৌরে ভাষায় লোক-গীতির ভঙ্গিতে রচিত। আগমনী অংশে গৌরীর জবানীতেও কয়েকটি পদ আছে।

'আগমনী' সম্পর্কে যা বলা হল 'বিজয়া'র পদগুলি সম্পর্কেও তাই প্রযোজ্য। কেবল 'বিজয়া'র বেদনায় যে একটা তীব্রতা আছে তার স্বাদ আগমনীর আনন্দের চেয়ে নিবিড়-তর—দুঃখের কথা সুখের চেয়ে বরাবরই আমাদের স্পর্শ করে বেশি

কাল এসে, আজ উমা আমার যেতে চায়!
তোমরা বল গো, কি করি মা,
আমি কোন্ পরাণে উমাধনে মা হ'য়ে
দিব বিদায়!

এ হল 'বিজয়া'র খাঁটি সুর। এ পর্যায়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তের একটি কবিতা আছে। এটি নানা দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। মধুসূদনের পরবর্তী লেখক গিরিশ ঘোষের রচনায়ও ভাষা লোকসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত। অথচ মধুসূদনের পদটিতে বৈদগ্ধ্যের ছাপ ওতপ্রোত। শুধু তাই নয়, এর মধ্যে দৈবী ভাবটি অক্ষুণ্ণ রয়েছে। গিরিরাণীই এখানে মা, কিন্তু তিনি পৌরাণিক রাণীর মহিমায় সমাসীনা। ফলে বিজয়া-দশমীতে ভগবতীকে বিদায় দেবার ও কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাবার বেদনা এক হয়ে উঠতে পেরেছে—দৈবী ও মানুষী ব্যাপারের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ এখানে নেই। প্রকাশও যথেষ্ট আবেগময়:

যেয়ো না রজনি, আজি ল'য়ে তারাদলে।
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে।
* * *
তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার; শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণকুহরে।
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী।

মর্ত্য মানুষের বেদনা এখানে ব্যঞ্জনায় ফুটে উঠেছে দেবতাত্মা হিমালয়ের গৃহের কথায়।

(২)

'জগজ্জননীর রূপ' থেকেই যথার্থতঃ শাক্ত সাধনাসম্মত পদের সুরু। পরবর্তী প্রত্যেকটি বিভাগে (মা কি ও কেমন, ভক্তের আকূতি, মনোদীক্ষা, ইচ্ছাময়ী মা, করুণাময়ী মা, কালভয়হারিণী মা, লীলাময়ী মা, ব্রহ্মময়ী মা, মাতৃপূজা, সাধনশক্তি, নামমহিমা, চরণতীর্থ) মায়েরই পূজারতি, আদ্যাশক্তির রূপ, ঐশ্বর্য, করুণা, মহিমার কথা ও তাঁকে পাবার আকূতি, ও সিদ্ধির পথের অন্তরায়ের কথা। এখানে মায়ের প্রতি আত্মীয়তাবোধ আছে, আবদারও আছে; তবু মা বিশ্বেশ্বরী, আদরের দুলালী নয়।

তুষার-ধবল হৃদে নীলিম নলিনী।
হর-হৃদি-মাঝে আমার শ্যামা মা জননী॥
(মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর)

চমৎকার উপমা, তেমনি হৃদয়-নিংড়ানো ভালো-বাসা, অনায়াসে কাব্যের পঙ্‌ক্তিতে স্থান নিয়ে নিচ্ছে। এরূপ আরও দু' চারটি পঙ্‌ক্তি এই পর্যায়ে আছে। মায়ের দানবদলনীরূপের জাগ্রত বর্ণনা পাই কমলাকান্তের একটি পদে:

নবজলধর কায়।
কালোরূপ হেরিলে আঁখি জুড়ায়॥
কপালে সিন্দুর, কটিতে ঘুঙ্গুর,
রতন নূপুর পায়।
হাসিতে হাসিতে কত দানব দলিছে,
রুধির লেগেছে গায়।

'মা কি ও কেমন'-এ মায়ের সীমাহীন, বিহ্বলকারী মহিমার কথা রয়েছে।

রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত উভয়েই দেখাবার চেষ্টা করেছেন কালী ও কৃষ্ণ মূলতঃ একই:

আমি বেদাগম পুরাণে করিলাম কত
খোঁজ-তালাসি।
ঐ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম—সকল
আমার এলোকেশী। —রামপ্রসাদ

কমলাকান্তের একাধিক পদে অপরোক্ষ অনুভূতির অনিবার্য ছাপ বিদ্যমান :

মজিল মন-ভ্রমরা, কালীপদ-নীলকমলে।
যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হইল, কামাদি কুসুম সকলে।
চরণ কালো ভ্রমর কালো, কালো কালোয়
মিশে গেল ;
দেখ, সুখ দুঃখ সমান হোলো,
আনন্দ-সাগর উথলে।

শেষ ছত্রটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অনুরূপ অধ্যাত্ম অনুভবের পরিচয় রামপ্রসাদেও পাই যেমন 'ব্রহ্মময়ী মা' অংশে একটি পদে :

…ঘুম ছুটেছে, আর কি ঘুমাই,
যুগে যুগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে,
ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি…
প্রসাদ বলে, ভক্তিমুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি।
আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম,
ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি ॥[১]

দু'টি উদ্ধৃতিরই ছন্দস্পন্দে উপলব্ধির আনন্দ তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয়টির প্রকাশে রহস্যময়তা লক্ষণীয়। খাঁটি উপলব্ধি মৌলিক উপমা ও চিত্রকল্প নিয়ে প্রকাশ পায়, অনেক সময়ই হেঁয়ালির আশ্রয় নেয়। আরও কোন কোন কবির লেখায় উপলব্ধির কিছু কিছু রেশ মেলে, অনেক কবিই সংগ্রামী সাধক—চেষ্টা করছেন, লক্ষ্য এখনও দূরে ; বেশির ভাগ পদই মামুলি প্রথাবদ্ধ রচনা।

'ভক্তের আকূতি'তে বেশ কিছু সুন্দর পদ ও পঙ্‌ক্তি রয়েছে। তত্ত্বকথা সত্ত্বেও সাধকের হৃদয়ের অভিব্যক্তি হিসাবে এগুলো চমৎকার গীতিকাব্যের নিদর্শন :

"আমায় দে মা পাগল ক'রে (ব্রহ্মময়ি)।
আর কাজ নেই জ্ঞানবিচারে।"
—ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল

(১) এইসব গানগুলির বহু পাঠান্তর প্রচলিত। —সঃ

"দোষ কারো নয় গো মা.
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।"
—দাশরথি রায়

"তারা, এবারে আমারে কর পার।
তরঙ্গে পড়েছি শ্যামা, না জানি সাঁতার।"
-- কালীদাস ভট্টাচার্য

"মা আমায় ঘুরাবে কত,
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত ?"
—রামপ্রসাদ

"তারা, কোন্ অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে,
সংসার-গারদে থাকি বল ?"
—নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়

"শুক্‌না তরু মুঞ্জরে না, ভয় লাগে মা,
ভাঙ্গে পাছে।
তরু পবন-বলে সদাই দোলে, প্রাণ
কাঁপে মা, থাকতে গাছে ॥
বড় আশা ছিল মনে, ফল পাব মা,
এই তরুতে…"
—কমলাকান্ত

'মনোদীক্ষা'র মধ্যেও কিছু সুন্দর পদ মেলে। সাধক নিজের মনকে উদ্বুদ্ধ করছেন, সংকল্পে অটুট রাখতে চাইছেন ; তত্ত্বকথারও আবৃত্তি করছেন।

তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন,
ওরে আমার শুয়াপাখী !
আমারি অন্তরে থেকে, আমাকে দিতেছ ফাঁকি !
—রামপ্রসাদ

আপনারে আপনি দেখ, যেওনা মন, কারু ঘরে।
যা চাবে এইখানে পাবে, খোঁজ নিজ-অন্তঃপুরে।
—কমলাকান্ত।

প্রায়ই দেখা যায় পদের প্রথম একটি দু'টি পঙ্‌ক্তি সুন্দর, তাতেই কবির নিজস্ব কথাটি প্রকাশ পেয়ে যায়, পরবর্তী পঙ্‌ক্তিগুলিতে হয় ঐ কথারই বিশদ ব্যাখ্যা নয়ত প্রাসঙ্গিক তত্ত্বকথা, —অবশ্য গানরচনার রীতিই এই।

'ইচ্ছাময়ী মা'-র দু'টি ছত্র ভারি সুন্দর, লিখেছেন দেওয়ান রামদুলাল নন্দী :

সকলি তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে
'করি আমি'।

সব কিছুর মধ্যে মায়ের করুণার স্পর্শ অনুভব করা সাধকের একটি বিশিষ্ট মনোভঙ্গির দ্যোতক, এর মধ্যে একটা সকরুণ স্নিগ্ধতা ও মাধুর্য আছে :

বার বার যে দুঃখ দিতেছ তারা,
সে কেবল দয়া তব, জেনেছি গো দুঃখহরা।
—রামলাল দাস দত্ত।

এটাই 'করুণাময়ী মা'র মূল সুর।

'কালভয়হারিণী মা' ও 'সাধন শক্তি' এ দু-বিভাগের পদগুলির কথাও উল্লেখ করতে হয়। এগুলিতে শাক্ত সাধকের বীরভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমটিতে 'কালভয়নিবারিণী কালী'কে হৃদয়ে রেখে কালভয় উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্কল্প (ভয়-জয় বীরভাবের তান্ত্রিক সাধনায় একটি বড় ব্যাপার), দ্বিতীয়টিতে অগ্রসর—সাধক যেন অকুতোভয়, মায়ের ভরসায় মার সঙ্গেই পাঞ্জা লড়তে প্রস্তুত (আসলে মা-ই পরীক্ষায় ফেলেন, অবিদ্যাও মায়েরই রূপভেদ) :

"আমি ধরেছি ছাড়িব না চরণ, যাব না
বিমাতার কোলে।'
—গুরুদাস চক্রবর্তী।

বিমাতা এখানে অবিদ্যা।

"রামপ্রসাদ বলে, দুধ খেয়েছি, ঘোলে
মিশে ঘুলবো না গো।"
—রামপ্রসাদ

"আয় মা সাধন-সমরে,
দেখবো, মা হারে কি পুত্র হারে।"
— রসিকচন্দ্র রায়।

আগমনী-বিজয়ার পদ শাক্ত সাধনার এমনকি দুর্গাপূজার কথা মনে না রেখেও উপভোগ করা যেতে পারে। কিন্তু পরবর্তী সমস্ত পদই সাধনার সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে সে সাধনা ও সাধকের প্রতি সহানুভূতি ছাড়া তাতে রস পাওয়া কঠিন। আর পাঠক যদি নিজে সাধক হন যে কোন ভাবের সাধক—তবে এ পদগুলো যে তাঁর কাছে অত্যন্ত বাস্তব ও প্রেরণাদায়ক হবে তাতেও সন্দেহ নেই।

গান

(মূলতান—ত্রিতাল)

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

মা কালী কি এলো এবার মা সারদা রূপটি ধরে।
তাই নাকি রে রামকৃষ্ণ পূজে তাঁরে ভক্তিভরে॥
সে নাকি রে আদ্যাশক্তি
তাঁরই হাতে সবার মুক্তি
মহালক্ষ্মী সরস্বতী
রূপ ঢেকে মা জ্ঞান বিতরে॥
সীতা, রাধা, অন্নপূর্ণা
মাকে পেয়ে ধরা ধন্যা
মা নামে ডেকেছে বন্যা
কোলে নেয় মা আপামরে।
কাঙ্গালে তারিতে মা যে
এলো কাঙ্গালিনী সাজে
অভয়া বিতরে অভয়
সদা বরাভয় করে॥

রামায়ণ-প্রসঙ্গ

(পূর্বানুবৃত্তি)

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

ইন্দ্রজিৎকে বধ করা সত্যই কঠিন ছিল। যুদ্ধে গমন করিবার পূর্বে ইন্দ্রজিৎ লঙ্কাস্থিত পর্বতগুহায় নিকুম্ভিলা নামক যজ্ঞভূমিতে শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞ করিত এবং যজ্ঞ সমাপনান্তে সে নিজেকে অজেয় মনে করিত। দেখা যাইতেছে অনার্যগণও আর্যগণের ন্যায় কখন কখন যজ্ঞ করিত। তবে আর্যগণ-অনুষ্ঠিত যজ্ঞ হইতে উহা পৃথক ছিল।

ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বর্ণনা পাওয়া যায়,

শস্ত্রাণি শিতধারাণি সমিধশ্চ বিভীতকান্।
লোহিতানি চ বাসাংসি স্রুবং কার্ষ্ণায়সং তথা॥
সর্বতোঽগ্নিং পরিস্তীর্য শরৈঃ সহ সতোমরৈঃ।
অস্থক্ কৃষ্ণস্য ছাগস্য কণ্ঠাদাদায় জীবতঃ॥
জুহাব পাবকং তত্র রক্তাক্তাঃ সমিধস্তথা
ততঃ সমিদ্ধিবিদ্ধস্য বিধূমস্য মহার্চিষঃ।
বভূবুস্তানি লিঙ্গানি বিজয়ং যান্যদর্শয়ন্॥

—তীক্ষ্ণধার শস্ত্রসমূহ, সমিধ্, বিভীতক, রক্তবস্ত্র, কৃষ্ণলৌহনির্মিত স্রুব, শর ও তোমরের সহিত অগ্নির চতুর্দিকে আস্তীর্ণ করিয়া কৃষ্ণবর্ণ জীবিত ছাগলের কণ্ঠ হইতে রুধির গ্রহণপূর্বক ইন্দ্রজিৎ রক্তাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিল। তারপর বৃহৎশিখাবিশিষ্ট সমিৎপ্রদীপ্ত নির্ধূম অগ্নির যে সব লক্ষণ দেখা গেল তাহা ইন্দ্রজিতের জয়লাভের সূচনা করিল। অতঃপর অস্ত্রসমূহ আবাহনপূর্বক অগ্নিতে পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া উত্তম রথে চড়িয়া ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে গমন করিল। রামায়ণে আছে মায়াবলে ইন্দ্রজিৎ অদৃশ্য থাকিয়া বর্ষার বারিবর্ষণের ন্যায় অবিরল শর বর্ষণ করিত। সম্ভবতঃ একই সঙ্গে সুকৌশলে চতুর্দিক হইতে অজস্র শর নিক্ষেপের ফলে তাহাকে দেখা যাইত না বলিয়া মনে হইত অদৃশ্য। ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনুমান্, নীল প্রভৃতি বীর বানরগণ সকলেই শরবিদ্ধ হইলেন। বহু বানর নিহত হইল। যুদ্ধে অদৃশ্যদেহ অস্ত্রধারী ইন্দ্রজিৎকে অবধ্য বলিয়াই রামচন্দ্রের মনে হইল। অবশেষে রাম লক্ষ্মণ উভয়েই সংজ্ঞাহীন হইলে ইন্দ্রজিৎ প্রাসাদে গিয়া পুনরায় রাবণকে সংবাদ দিল—রাম ও লক্ষ্মণ নিহত।

ক্রমে রাত্রি গাঢ় হইল। মনে হইল বহু বানর নিহত হইয়াছে। কিন্তু বিভীষণ আশ্বাস দিয়া বলিলেন, রাম লক্ষ্মণ এবং সৈন্যগণের অনেকেই জীবিত। ইন্দ্রজিতের শরপ্রহারে তাহারা মোহপ্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র। হনুমান্ ও বিভীষণ জ্বলন্ত মশাল লইয়া রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সুগ্রীব, অঙ্গদ প্রভৃতি বীরযোদ্ধাগণ সকলেই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে শায়িত। অবশেষে তাঁহারা মশাল-হস্তে জাম্ববানের নিকট আসিয়া দেখিলেন, বৃদ্ধ ও ব্যাধিগ্রস্ত জাম্ববানের প্রায় মুমূর্ষু অবস্থা। হনুমানকে দেখিয়া জাম্ববান্ আনন্দ প্রকাশ করিয়া মহৌষধি সংগ্রহের নির্দেশ দিলেন। হিমালয় পর্বতে দুইটি গিরি-শিখরের মধ্যে অবস্থিত মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, স্বর্ণকরণী, ও সন্ধানকরণী এই চারটি মহৌষধি আনিতে পারিলে সকলেই সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইবেন। কাজটি যে দুরূহ এবং একমাত্র হনুমানের পক্ষেই উহার সম্পাদন সম্ভব, জাম্ববান্ তাহা জানিতেন।

রামায়ণে বিশল্যকরণী, সঞ্জীবনী প্রভৃতি মহৌষধির উল্লেখ বহুবার দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্রজিতের সহিত প্রথম যুদ্ধেই রাম ও লক্ষ্মণ শরপ্রহারে সংজ্ঞাহীন হইলে বৈদ্য সুষেণ আশ্বাস প্রদান করিয়া বলেন, ক্ষীরোদ সমুদ্রের মধ্যে দ্রোণ ও চন্দ্র নামক পর্বত-শিখরদ্বয়ে অবস্থিত বিশল্যকরণী প্রভৃতি মহৌষধি আনয়ন করিলে রাম-লক্ষ্মণ শীঘ্রই সংজ্ঞালাভ করিবেন। হনুমান্ যাত্রা করিতে উদ্যত, এমন সময়ে গরুড় আসিয়া রাম-লক্ষ্মণের চৈতন্য সম্পাদন ও ক্ষত নিরাময় করেন। ইন্দ্রজিতের সহিত দ্বিতীয়বার যুদ্ধে বড় বড় যোদ্ধাগণ সহ রাম ও লক্ষ্মণ পুনরায় সংজ্ঞাহীন হইলে জাম্ববানের নির্দেশানুসারে আকাশমার্গে গমন করিয়া হনুমান্ হিমালয় পর্বতে উপনীত হন। অতঃপর ঔষধিসমূহ অদৃশ্য হওয়ায় গিরিশৃঙ্গ উৎপাটিত করিয়া পুনরায় আকাশ-মার্গে লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার পর রাবণের শক্তি-প্রহারে লক্ষ্মণ মৃতকল্প হইলে বৈদ্য সুষেণ হনুমানকে রমণীয় গন্ধমাদন পর্বত হইতে বিশল্যকরণী প্রভৃতি ঔষধিসমূহ সংগ্রহ করিয়া আনিতে বলেন। রাবণ ইহা জানিতে পারিয়া কালনেমি নামক রাক্ষসকে পূর্বেই গন্ধমাদন পর্বতে প্রেরণ করে, উদ্দেশ্য কোনরূপে হনুমানকে বিনাশ করা। হনুমান্ আকাশমার্গে ক্রমে সমুদ্র, কিষ্কিন্ধ্যানগর, জনস্থান, দণ্ডকারণ্য প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া যখন কোশল প্রদেশের রাজধানী অযোধ্যানগরীর আকাশে উপস্থিত হইলেন তখন ভরত শূন্যে বিচরণশীল অদ্ভুত প্রাণী সন্দর্শনে কৌতুহলবশতঃ ধনুকে শর যোজনা করেন। অতঃপর ভরতকে হনুমানের আত্ম-পরিচয় ও রাম-লক্ষ্মণের সংবাদ-প্রদান, ভরতের অনুমতি লইয়া গন্ধমাদন পর্বতে গমন, সেখানে কুম্ভীর-বিনাশ, কালনেমি রাক্ষস-সংহার, পর্বতস্থিত গন্ধর্বগণের প্রাণনাশ, অবশেষে ঔষধি চিনিতে অসমর্থ হইয়া উৎপাটিত পর্বতশৃঙ্গ সহ লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন। কুম্ভকোণম্ হইতে প্রকাশিত রামায়ণে জাম্ববান্ ও বৈদ্য সুষেণের নির্দেশানুসরে হনুমান্ কর্তৃক দুইবার মহৌষধি আনয়নের উল্লেখ থাকিলেও দ্বিতীয়বার গমনকালে ভরত-কালনেমি-সংবাদ প্রভৃতির উল্লেখ নাই সুতরাং গৌড়ীয় পাঠের ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত। উপরন্তু উক্ত রামায়ণে ইন্দ্রজিৎ-বধের পর পুনরায় বিশল্যকরণী-প্রয়োগে চিকিৎসার উল্লেখ আছে। পুনঃ পুনঃ ঐ সকল মহৌষধির উল্লেখে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে উহাদের আঘ্রাণে মোহ অপনয়ন ও অঙ্গে লেপনে ক্ষত নিরাময় হইত। জাম্ববান্ সুষেণ প্রভৃতি বানরগণ উহা অবগত ছিল। সুতরাং সমুদ্রের মধ্যে অথবা দক্ষিণ প্রদেশে অবস্থিত কোন পর্বতের উচ্চ চূড়ায় ঐ সকল মহৌষধির প্রাপ্তি-সম্ভাবনাই অধিক। লঙ্কা হইতে আকাশমার্গে হিমালয় পর্বতে গমন করিয়া ঔষধ আনয়ন অবাস্তব বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ হিমালয় পর্বতের উল্লেখ একবার মাত্র পাওয়া যায়: ঐ স্থলেও 'হিমবন্তম্ নগম্' বলিতে হিমালয় পর্বতের পরিবর্তে দাক্ষিণাত্যের পর্বতশ্রেণীর কোন তুষারমণ্ডিত উচ্চ শিখর নির্দেশ করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। ঔষধিসমূহ চিনিতে না পারিয়া গিরিচূড়ার কিয়দংশ বহন করিয়া লইয়া আসা বীর হনুমানের পক্ষে খুবই সম্ভব।

হনুমান্ কর্তৃক আনীত ঔষধিসমূহ আঘ্রাণ করিয়া সৈন্যগণ সহ রাম-লক্ষ্মণ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলে সুগ্রীবের আদেশে সেই রাত্রির অন্ধকারে সৈন্যগণ জলন্ত মশাল হস্তে চতুর্দিক হইতে পুনরায় লঙ্কা-নগরী আক্রমণ করিল। রাম-লক্ষ্মণ জীবিত ও বানরসৈন্যগণ নব উৎসাহে পুনরায় নগরী আক্রমণ করিয়াছে, এই সংবাদে রাবণও তৎপর হইল।

রাবণের ঘোষণা হইতে অনুমান করা যায়, রাক্ষসগণের রণকৌশল-নীতি কতদূর সুপরিচালিত ছিল। রাক্ষসসৈন্যগণের মধ্যে সর্বত্র বাদ্যসংযোগে রাবণের নিম্নোক্ত আদেশ ঘোষিত হয়:

'যে সকল বীর রাক্ষসগণ আমার আদেশে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল সকলেই মহাবলশালী বানরগণ কর্তৃক নিহত। লক্ষ্মণের সহিত রাম ও সৈন্যগণের সহিত সুগ্রীবকে বধ করিতে পারে এরূপ কাহাকেও দেখিতেছি না। রাম অতিশয় বলবান, অস্ত্রবল প্রচুর। অতএব আমার আদেশ —সৈন্যগণ অপ্রমত্ত ও ত্বরাযুক্ত হইয়া লঙ্কানগরীর সিংহদ্বার ও অন্যান্য দ্বার রক্ষা করুক। স্থানে স্থানে হস্তিপৃষ্ঠে সৈন্যগণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া নগরীর সর্বত্র পাহারা দিক। অশোকবনে যেখানে সীতাকে রাখা হইয়াছে সেখানে প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য সকল স্থানে সর্বতোভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যে যে স্থানে সেনানিবাস আছে সেখানকার সৈন্যগণ দলবদ্ধ হইয়া পুনঃপুনঃ নগরীর সর্বত্র টহল দিক।'

'হে নিশাচরগণ, প্রাতে, সন্ধ্যায় ও অর্ধরাত্রে বানরদিগের কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। শত্রুদিগের সামান্য শক্তিও কদাপি অবজ্ঞা করা উচিত নহে, অধিক শক্তির কথা বলাই বাহুল্য।'

রাবণের আদেশে রাক্ষসগণ পুনরায় উৎসাহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অতঃপর বজ্রকণ্ঠ, কুম্ভকর্ণের পুত্রদ্বয় কুম্ভ, নিকুম্ভ ও অন্যান্য বীর রাক্ষসগণ নিহত হইলে ইন্দ্রজিৎ পুনরায় রণস্থলে আগমন করিল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যুদ্ধে আগমনের পূর্বে ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা নামক যজ্ঞাগারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিত। যজ্ঞ সমাপন না করিয়াই তাহাকে পুনরায় যুদ্ধে গমন করিতে হইল, কারণ লঙ্কায় তখন হাহাকার উঠিয়াছে। ক্রুদ্ধ ইন্দ্রজিৎ এক নূতন পন্থা অবলম্বনের কথা চিন্তা করিল। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সহসা পলায়ন করিয়া পরে রথের অগ্রভাগে সীতার ন্যায় অবিকল একটি মূর্তি স্থাপন করিয়া অন্যদ্বার দিয়া নির্গত হইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইল। ইন্দ্রজিতের রথ দর্শনে হনুমান্ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড লইয়া ধাবিত হইলেন, কিন্তু রথের অগ্রভাগে অবস্থান করিতেছেন বিষাদগ্রস্তা, কৃশাঙ্গী সীতা! মহাবীরের চক্ষু অশ্রুরুদ্ধ হইল। প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ আর কিরূপে সম্ভব! ইন্দ্রজিৎ তখন মহাবীর প্রভৃতির সম্মুখেই 'রাম, রাম' বলিয়া বিলাপকারিণী মায়া-সীতার কেশ আকর্ষণপূর্বক তীক্ষ্ণখড়্গের দ্বারা তাহাকে বধ করিল।

সীতা-বধের সংবাদ অবিলম্বে রামের কর্ণগোচর হইল। সকলেই শোকার্ত, এমন সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রের অন্যপ্রান্ত হইতে বিভীষণ আসিয়া উপস্থিত। সব শুনিয়া বিভীষণ বলিলেন, ইন্দ্রজিৎ মায়াবী, নানারূপ মায়া প্রদর্শনে সে অতিশয় পটু। সীতা-বধ তাহার একটা নূতন মায়া মাত্র! সীতাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য বান্ধব ও হিতৈষিগণের বহু অনুরোধ-বাক্য উপেক্ষা করিয়া রাবণ এই বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছে। সুতরাং সীতাবধের অনুমতি-প্রদান তাহার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নহে। বিভীষণ আরও বলিলেন, দুর্ধর্ষ ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে হোম সমাপনান্তে যুদ্ধে গমন করিলে দেবগণেরও অজেয় হয়। সে পুনরায় যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছে। হোম সমাপ্ত হইবার পূর্বেই তাহাকে বধ করিতে হইবে। নতুবা অন্য প্রকারে ইন্দ্রজিৎকে পরাজিত অথবা নিহত করা অসম্ভব।

সৈন্যগণপরিবৃত, উৎকৃষ্ট শরে সজ্জিত লক্ষ্মণ বিভীষণের নির্দেশে ইন্দ্রজিতের যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন। বিভীষণ হইলেন পথপ্রদর্শক। যজ্ঞস্থল পর্বতগুহার নিকট বৃক্ষাচ্ছন্নারণ্যে

গোপনীয় স্থানে। যজ্ঞরত ইন্দ্রজিৎ সহসা বাহিরে প্রচণ্ড কোলাহলধ্বনি ও পাহারারত রাক্ষস-সৈন্যদিগের চীৎকার শ্রবণ করিয়া আরব্ধ কার্য অসমাপ্ত রাখিয়াই দ্রুতপদে বাহিরে আসিল। হনুমান্ ততক্ষণে প্রস্তরখণ্ড ও বৃক্ষ নিক্ষেপ করিয়া রাক্ষস-বধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। ক্রোধে রোমাঞ্চিত কলেবর ইন্দ্রজিৎ তৎক্ষণাৎ রথে আরোহণ করিয়া উদ্যত ধনুর্বাণ হস্তে মহাবীরের প্রতি ধাবিত হইলেন। সেই অবকাশে বিভীষণ অপরদিক হইতে লক্ষ্মণকে লইয়া অন্ধকার বনে যজ্ঞস্থলে উপনীত হইলেন এবং লক্ষ্মণকে নির্দেশ দিলেন, পুনরায় যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করিবার পূর্বেই তীক্ষ্ণশর দ্বারা রথ অশ্ব ও সারথিসহ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিতে হইবে। লক্ষ্মণ যখন পশ্চাৎ হইতে ইন্দ্রজিৎকে সমরে আহ্বান করিলেন, তখন ইন্দ্রজিৎ আশ্চর্য হইয়া সেদিকে ফিরিয়া পিতৃব্য বিভীষণকে দেখিতে পাইল। ইন্দ্রজিৎ বীর-যোদ্ধা, পিতৃব্যের এই নিন্দনীয় আচরণ তাহার মর্ম বিদ্ধ করিল। বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিতের কটূক্তি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্যে' অমর হইয়া রহিয়াছে। ধার্মিক বিভীষণ কিন্তু অপবাদে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন, পরস্ত্রী ও পরধন হরণ, সুহৃদগণের আশঙ্কা উৎপাদন, ঋষিহত্যা, সজ্জনের সহিত যুদ্ধ, অভিমান, গর্ব, শত্রুতা প্রভৃতি দোষই রাবণের ধ্বংসের কারণ। ধর্ম পরিত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে বলিয়াই তিনি রাবণকে ত্যাগ করিয়া রামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং সর্বতোভাবে শ্রীরামচন্দ্রকে সাহায্য করাই তাঁহার উপস্থিত প্রধান কর্তব্য।

যজ্ঞস্থলে প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করিয়া লক্ষ্মণ দণ্ডায়-মান, অতএব সেখানেই উভয়ের মধ্যে সংগ্রাম আরম্ভ হইল। উভয়েই তুল্যবলশালী, ক্ষিপ্রহস্তে শরসন্ধানে ও প্রয়োগে উভয়েই সমান দক্ষ।

ন হ্যাদানে ন সন্ধানে ধনুষের্ন পরিগ্রহে।
ন বিমোক্ষে চ বাণানাং ন বিকর্ষে ন সংগ্রহে॥
ন মুষ্টিপ্রতিসন্ধানে ন লক্ষ্যপ্রতিপাদনে।
অদৃশ্যত তয়োঃ শৈঘ্র্যাদ্ যুধ্যতোর্হস্তলাঘবম্॥

অর্থাৎ তূণ হইতে বাণের উত্তোলন, উত্তোলন পূর্বক ধনুকে স্থাপন, শরনিক্ষেপ, জ্যা আকর্ষণ এবং সংস্থাপন, ধনুকে মুষ্টিবন্ধন এবং লক্ষ্যবেধ প্রভৃতি বিষয়ে যুদ্ধনিরত সেই লক্ষ্মণ এবং ইন্দ্রজিতের ক্ষিপ্রতাবশতঃ হস্তকৌশল কেহই লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। অবশেষে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের কৃষ্ণবর্ণ অশ্বচতুষ্টয় ও সারথিকে নিহত করিতে সমর্থ হইলেন। বাধ্য হইয়া ইন্দ্রজিৎকে রথ হইতে অবতরণ করিতে হইল। পরস্পর সম্মুখীন হইয়া বহুক্ষণ যুদ্ধ করিবার পর লক্ষ্মণের শর ইন্দ্রজিতের শিরস্ত্রাণ ও উজ্জ্বল কুণ্ডল শোভিত মস্তক ছিন্ন করিল। ইন্দ্রজিৎ নিহত হইলে অবশিষ্ট রাক্ষস ভয়ে পলায়ন করিল। লক্ষ্মণ জয়লাভ করিলেন সত্য, কিন্তু ইন্দ্রজিতের অবিরল শরবর্ষণে তাঁহার সর্বাঙ্গ রক্তাপ্লুত। বিশল্যকরণী প্রয়োগে ক্ষতস্থান বাঁধিয়া বিজয়ী লক্ষ্মণ রামের নিকট উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্রজিতের পতনের সংবাদে রাবণের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। পরাজয় সুনিশ্চিত, তথাপি রাবণের পক্ষে সন্ধি অসম্ভব। 'ইন্দ্রজিৎ মায়া-সীতা বধ করিয়াছিল, আমি সত্য সীতা বধ করিব' এই বলিয়া শাণিত খড়্গ হস্তে রাবণ অশোকবনের উদ্দেশ্যে ধাবিত হইল। অমাত্যবর্গ অতিকষ্টে তাহাকে নিবৃত্ত করিল। সীতাবধে ফল কী! পুত্রহন্তা শত্রুদ্বয়কে নিপাত করাই রাবণের প্রধান কর্তব্য। সুতরাং অবশিষ্ট সৈন্যসহ রাবণ স্বয়ং বীরবেশে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধে গমন করিল। পুত্র-ভ্রাতা-আত্মীয়স্বজনের মরণে ক্রুদ্ধ

রাবণ কালান্তকের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া বহু বানরসৈন্য নাশ করিল, অবশেষে তাহার শক্তিপ্রহারে লক্ষ্মণ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গেলেন। শক্তিশেলবিদ্ধ লক্ষ্মণের জীবনাশঙ্কায় রামচন্দ্র কোনপ্রকারে তাঁহার বক্ষ হইতে শেল বাহির করিয়াই রাবণের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইলেন। সেবারও রামচন্দ্রের শরপ্রহারে জর্জরিত রাবণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিল। মহৌষধি প্রয়োগে লক্ষ্মণও সংজ্ঞালাভ করিলেন।

শীঘ্রই পুনরায় রাম ও রাবণের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইতিমধ্যে ইন্দ্র রামের জন্য রথ প্রেরণ করিয়াছিলেন—অর্থাৎ যে ভাবে হউক রামচন্দ্র রথ লাভ করিয়াছিলেন। রাম ও রাবণের দ্বন্দ্বযুদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন, যম ও রুদ্রসদৃশ সেই রাবণ ও রামচন্দ্র পরস্পরের প্রতি যুগপৎ শরবর্ষণ আরম্ভ করিলে সর্বপ্রাণিগণের নিকট ভয়ের কারণ হইয়াছিল।

সন্ততং বিবিধৈর্বাণৈর্বভূব গগনং শিতৈঃ।
মেঘৈরিবাতপাপায়ে বিদ্যুজ্জ্বালাসমাকুলম্॥
শরান্ধকারং তৌ ভীমং চক্রতুঃ সমরে তদা।
গতেঽস্তং তপনে দেবে গর্জন্মেঘাবিবোদিতৌ॥
উভৌ তৌ পরমেষ্বাসাবুভৌ যুদ্ধবিশারদৌ।
উভৌ বাস্ত্রবিদাং মুখ্যাবুভৌ যুদ্ধং বিচেরতুঃ॥
উভৌ হি যেন ব্রজতো বভুস্তেন শরোর্ময়ঃ।
ঊর্ময় শ্বসনাবিদ্ধা ভীমাঃ সাগরয়োরিব॥

উভয়ের বহুবিধ শরজালে গগনমণ্ডল গ্রীষ্মাবসানে বিদ্যুৎপ্রভা ও মেঘের দ্বারা সমাচ্ছন্ন মনে হইতেছিল এবং সূর্য অস্তমিত হইলে গর্জনশীল মেঘদ্বয়ের ন্যায় তাঁহারা শরবর্ষণে রণভূমি অন্ধকারময় করিয়া তুলিলেন। উভয়েই মহা ধনুর্ধারী, যুদ্ধবিশারদ, শ্রেষ্ঠ অস্ত্রজ্ঞ এবং যুদ্ধে আসক্ত ছিলেন। যুদ্ধকালে উভয়ের বিচরণ-পথে বাত্যাবিদ্ধ ভীষণ সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় শর-তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছিল।

কথিত আছে, রাবণবধে অসমর্থ হইয়া শ্রীরামচন্দ্র অবশেষে শ্রীশ্রীদুর্গার আরাধনা করেন এবং নিজ কমলসদৃশ নয়ন উৎপাটন করিয়া অর্ঘ্য দিতে উদ্যত হন। বাল্মীকি-রামায়ণে ইহার উল্লেখ নাই। কোন কোন পাঠে অগস্ত্য ঋষি কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া রামচন্দ্রকে আদিত্য-উপাসনা করিতে দেখা যায়।

সংগ্রামরত রাম ও রাবণ তুল্য পরাক্রমশালী হইলেও উভয়ের মধ্যে এক বিষয়ে পার্থক্য ছিল। রামচন্দ্র দৃঢ় নিশ্চয় করিয়াছিলেন 'যুদ্ধে জয়লাভ করিতেই হইবে।' অপর পক্ষে 'মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী' এই চিন্তা রাবণের হৃদয় অধিকার করায় বাহিরে পূর্ণ বিক্রম দেখাইলেও তাহার অন্তরাত্মা ব্যাকুল হইয়াছিল, ফলে উদ্বেগজনিত শিথিলতা হেতু মধ্যে মধ্যে যথোচিত অস্ত্রপ্রয়োগে নিপুণতার অভাব ঘটিয়াছিল। রণক্ষেত্র হইতে রাবণের বার বার পলায়ন ইহাই সপ্রমাণ করে। অবশেষে অতিশয় ক্রুদ্ধ রাম রাবণের প্রতি মর্মঘাতী শর নিক্ষেপ করিলেন। শর রাবণের হৃদয় ভেদ করিয়া ভূমিতে প্রোথিত হইয়া গেল। রাবণ নিহত হইলে অবশিষ্ট রাক্ষসসৈন্যগণ ভয়ে যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিল।

রাম-রাবণের যুদ্ধসংবাদ সমগ্র দাক্ষিণাত্যে ছড়াইয়া পড়িল। উৎপীড়িত জনগণ সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল কবে রাবণ নিহত হইবে। সুতরাং রাবণের নিধন-বার্তা দ্রুত সর্বত্র প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দূর-দূরান্তর হইতে সকলে ছুটিয়া আসিল। সেতু পার হইয়া বহু ঋষি-মুনি আসিলেন। রাবণের অনুচরদল সর্বত্র বিচরণ করিয়া তাঁহাদের যাগযজ্ঞের বিঘ্ন ঘটাইত। এতদিনে পৃথিবী অত্যাচারমুক্ত হইল। রাবণবধ শ্রীরামচন্দ্রের অপূর্ব কীর্তি। ঋষিগণ

রামচন্দ্রকে সাধুবাদ দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। দিকে দিকে আনন্দধ্বনি উঠিল। ভগবান শত্রু-নাশ করিয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন।

অশেষ দোষের আকর রাবণের অপূর্ব বীরত্ব স্মরণ করিয়া মহানুভব রামচন্দ্র বীরের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাহার উপযুক্ত সংকারের জন্য বিভীষণকে নির্দেশ দিলেন। যুদ্ধাবসানে দলে দলে বানরসৈন্য লঙ্কার প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া লঙ্কার ঐশ্বর্য দর্শনে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। গৌরবময় অনার্য-সভ্যতার পতন ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি অধ্যায়।

যুদ্ধে রামচন্দ্রকে সর্বাধিক সাহায্য করিয়াছিলেন বিভীষণ। যখনই কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তাঁহারা বিচলিত হইয়াছেন, ধীর, স্থির বিভীষণ অগ্রসর হইয়া সান্ত্বনা দিয়াছেন, চোখের উপর আত্মীয়-স্বজনকে নিহত দেখিয়াও পাষাণে বুক বাঁধিয়া পথ দেখাইয়াছেন। লৌকিক দৃষ্টি হইতে বিচার করিলে বিভীষণের সাহায্য ব্যতীত যুদ্ধে জয়লাভ রামচন্দ্রের পক্ষে কঠিন হইত। স্বর্ণঘটের জলদ্বারা বিভীষণের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া, তাঁহাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রামচন্দ্র লঙ্কায় ধর্মরাজ্য স্থাপন করিলেন। ধর্মাত্মা বিভীষণকে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া মিত্রবর্গও আনন্দিত হইলেন। রাজ্যলাভ করিয়া বিভীষণও প্রথমেই পুষ্প ও অন্যান্য মাঙ্গলিক দ্রব্য সহকারে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে পূজা করিয়া সমাদর জানাইলেন। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধকাণ্ড এখানেই শেষ হইল। কিন্তু রামসীতার কাহিনী তখনও অবশিষ্ট রহিয়া গেল। সে কাহিনী বেদনার। মহাবীরকে নিকটে অবস্থিত দেখিয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন, 'বিভীষণের অনুমতি লইয়া নগরীতে প্রবেশপূর্বক মিথিলারাজনন্দিনী সীতাকে যুদ্ধে আমার জয়লাভ ও রাবণের নিধনবার্তা প্রদান কর। তাঁহাকে জানাও আমরা কুশলে আছি, এবং শীঘ্র তাঁহার সংবাদ লইয়া প্রত্যাবর্তন কর।'

মনের মানুষ

শ্রীশান্তশীল দাশ

মনের মানুষ কোথায় গেলে পাই ;
এদিক ওদিক খুঁজে মরি, নাই, সে কোথাও নাই।
কেঁদে কেঁদে আকুল হয়ে
দিনগুলি মোর যায় যে বয়ে,
মিলবে না কি তার দেখা হায়, বিফল জীবনটাই।

আঁধার ঘরে একলা বসে বাজাই বীণাখানি,
আনন্দগান সেই তারে কে বাজায়, নাহি জানি!
দেখি, আমার হাতটি ধরে
বাজাও সে-গান, জীবন-ভ'রে
যে-গানখানি খুঁজে ফিরি সারা জীবনটাই।

ভারত-ভগিনী নিবেদিতা

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীতামসরঞ্জন রায়

(দুই)

সন ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার লণ্ডনে পদার্পণ করেছিলেন—একথা পূর্ব পর্যায়ে উল্লেখ করেছি। এবার লণ্ডনে তিনি তাঁর এক বিশেষ অনুরাগী বন্ধু মিঃ ই. টি. স্টার্ডির গৃহে অতিথিরূপে বাস করেছিলেন।

মার্গারেটের স্মৃতিকথায় আছে—"The Swami returned to London in April of the following year, and taught continuously at the house where he was living with his good friend—E. T. Sturdy in S. Georges Road and again, after the Summer holidays, in a large class-room near Victoria Street."

অবশ্য, এবারের স্থিতিও প্রথমবারেরই মত অল্পকালস্থায়ী ছিল।—সবশুদ্ধ তিন-চার মাস এ-যাত্রায় তিনি ইংলণ্ডে বাস করেছিলেন। কিন্তু সে অপরিসর কালটি মার্গারেটের ব্যক্তিগত জীবনে অল্প তাৎপর্যের সময় ছিল না। অপ্রত্যাশিত প্রথম দর্শনের কালে স্বামী বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে ও মতবাদে মার্গারেটের অন্তরে বিপুল ঔৎসুক্য জাগ্রত হয়েছিল, তার পূর্ণতর বিকাশের জন্যই দ্বিতীয়বারের সাক্ষাৎ একান্তভাবে প্রয়োজনীয় ছিল। মার্গারেটও উৎকণ্ঠিত আগ্রহে প্রতীক্ষমাণা ছিলেন। ফলে, স্বামীজীর দ্বিতীয়বারের লণ্ডন- অবস্থানের একটি দিনও, কোন কারণে, বৃথায় নষ্ট হতে দেননি মার্গারেট। আকর্ষণ ছিল অনিবার্য। জিজ্ঞাসা এবং অন্তর-পিপাসা ছিল যেন দুষ্পূরণীয়। তাই প্রতিটি ভাষণে, প্রতিটি সভায়, প্রতিটি আলোচনাচক্রে উপস্থিত থেকে সেই অদ্ভুত সন্ন্যাসীর অভিনব জীবন-দর্শন যথাযথ অনুধাবন করতে তিনি চেষ্টা করেছিলেন। মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রহরের পর প্রহর সেই আশ্চর্য পুরুষের পাদমূলে তিনি বসে থাকতেন রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে প্রতিটি বাক্য শ্রবণ করতেন এবং অশেষ যত্নে তার নিহিতার্থ উপলব্ধি করতে চাইতেন।···

কোন বিশেষ দেশের ঐতিহ্যের সীমারেখায় স্বামীজীর বাণীসমূহ আবদ্ধ থাকত না। কোন বিশেষ ধর্মের নীতিকথা তাঁর প্রতিপাদ্য হতনা। পরন্তু, সমগ্র মানবগোষ্ঠীর যে শাশ্বত, উদার মর্মবাণী, যে-বাণী সর্বকালের জন্য সত্য, সর্বলোকের পক্ষে প্রযোজ্য—সে বাণীই স্বামীজীর কণ্ঠ থেকে মহামন্ত্রের মত সঞ্জীবনী রসে সিক্ত হয়ে মুহুর্মুহুঃ উদ্গীত হত। অবহিতচিত্তে আকাশে কান পাতলে এখনো যেন শোনা যায় তাঁর কণ্ঠ-নিঃসৃত মন্ত্রের মহাঝঙ্কার।

"Thou art He, O Man! Thou art He. At first, the goal is far-off, outside Nature, and far beyond it, attracting us all towards it. This has to be brought near, yet without being degraded or degenerated, until, when it has come closer and closer, the God of Heaven becomes the God in Nature,··· and the God who is Nature, becomes the God within this temple of the body, and the God dwelling in the temple of the body becomes the temple itself, becomes the soul of man. Thus it reaches the last words it can teach. He whom the sages have sought in all these places, is in our own hearts."······

সে সব অক্ষয় মন্ত্রের ভাবতরঙ্গে মার্গারেটের অবগাহন ছিল যেন তীর্থসলিলে অবগাহনেরই মত—শুচিতায় এবং তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ, স্নিগ্ধতায় ও মাধুর্যে অত্যন্ত সরস।

কোন কোন দিন পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের ধর্ম-প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হতেন স্বামীজী একদিন সে ধরনেরই একটি আলোচনায় মার্গারেট শুনেছিলেন—

'একটি যুক্তি-ভিত্তিক ধর্মের উপরই ইওরোপের ভবিষ্যৎ পরিত্রাণ নির্ভর করছে। অন্ততঃ তাই আমার বিশ্বাস।'…

The Salvation of Europe depends on a rationalistic religion…

জড়বাদী যখন বলেন,… 'There is but One'… তখন তিনি সত্য কথাই বলে থাকেন। পার্থক্য শুধু এই যে আমি 'ঈশ্বর' শব্দটি দিয়ে যাকে অভিহিত করি, জড়বাদী তাকেই পদার্থ শব্দে অভিহিত করে থাকেন।

"Only he calls that one Matter, and I call it God."

আরও শুনেছিলেন,—এক দুর্ভেদ্য রহস্যের আবরণে আবৃত রয়েছে সর্বংসহা এই বসুন্ধরা। এরই বুকে, নিরবধি কাল ধরে আমরা আন্দোলিত হচ্ছি আমাদের কান্না-হাসির, দুঃখ-সুখের তরঙ্গদোলায়। এই বিশ্বচরাচরের সর্বাবয়ব কোন জ্ঞান আমাদের আয়ত্তের মধ্যে নেই। এমন কি, সে অক্ষমতার কথা প্রকাশ করে বলবার যে শক্তি বা ভাষা তাও আমাদের নাগালের বাইরে। অর্ধ-নিদ্রা ও অর্ধ-জাগরণের এক স্বপ্নাচ্ছন্নতার মধ্যে আমরা জীবন যাপন করছি, আবর্তিত হচ্ছি ক্ষণে ক্ষণে।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের এই তো পরিণাম! পশ্চাতে অতীতের কুক্ষিমধ্যে কি সম্পদ ফেলে এসেছি জানিনা, দূর-ভবিষ্যতে কোন পরিণামে গিয়ে উত্তীর্ণ হব তাও জানিনা। শুধু বর্তমানের স্বল্পমেয়াদী জীবনটি নিয়েই আমাদের—

'কান্নাহাসির দোল-দোলান
পৌষ-ফাল্গুনের মেলা'—চলছে।

এই-তো মায়া, এই-তো জীবন-মৃত্যুর বিচিত্র রহস্যলীলা।

"To walk in the midst of a dream, half-sleeping, half-waking, passing all our lives in a haze, this is the fate of every one of us. This is the fate of all sense-knowledge. This is the Universe.' …এখানে সুখের আশা বৃথা, রঙিন স্বপ্ন ব্যর্থ হতে বাধ্য!

কিন্তু, এ-জাতীয় তত্ত্ব, যার সঙ্গে অন্ততঃ কতকাংশেও বিষাদের ছায়া জড়িয়ে থাকে, তাদের বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ এবং আশার অমৃত-কথাও উচ্চারণ করতেন স্বামীজী অজস্রধারায়। সে-সব কথা আবার অমর-জীবনের জারক রসে অভিষিক্ত হয়ে শ্রোতৃবর্গের মধ্যে এক অবাচ্য অনুপ্রেরণা জাগিয়ে দিত মুহূর্ত মধ্যে।

মার্গারেটের কাছে সেও ছিল এক মহা-বিস্ময়, এক অভিনব অভিজ্ঞতা।

মায়াধীন জীবনের অসহায়তার কথা বলতে বলতেই চকিতে সে বন্ধনপাশ ছিন্ন করবার কৌশলটি বিবৃত করতেন বিবেকানন্দ। মার্গারেট ভাবতেন কি করে এটি সম্ভব হয়? এ মহাশক্তি কোথা থেকে আসে, কী ভাবে আসে?

স্বামীজী বলতেন,—এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু-বন্ধনকে অতিক্রম করে শাশ্বত জীবনতত্ত্ব অধিগত করা যায়। যিনি নিত্যের মধ্যেও নিত্য, চেতনের মধ্যে চেতন—যিনি অদ্বিতীয়, সর্বকারণ, যোগক্ষেম, জ্যোতির্ময়,—তাঁকে জানলে,

তাঁর সঙ্গে একাত্ম হতে পারলেই সে বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়, বিলুপ্ত হয়ে যায়।…

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ।

তবে, এ জ্ঞানলাভের সবিশেষ কৌশলটি ঠিক ঠিক জানা চাই, বিশেষ তপশ্চর্যায় তাকে আয়ত্তে আনা চাই। ধর্ম সেই কৌশলটিকেই আমাদের জানিয়ে দিতে চেষ্টা করে। আর কিছু নয়।

'মুদিত আলোর কমল-কলিকাটিরে' সর্ব-সৌন্দর্যে প্রস্ফুটিত করবার পন্থাই সে নির্দেশ করতে চায়।…"It is always a matter of the growth of the individual, a question of being and becoming." ধর্মের এই তো নিগূঢ় তত্ত্বকথা।…

অবশ্য, এর জন্য মহৎ প্রয়াস চাই, নিরলস জীবন-মরণ সাধনা চাই।

বস্তু থেকে ভাবে, প্রাকৃত থেকে অপ্রাকৃতে, মায়া থেকে মায়াতীতে উত্তীর্ণ হবার সবিশেষ আকূতি চাই। 'পিঞ্জরাদিব কেশরী'—এ জগৎ-জাল থেকে অভিনির্গমনের দুর্জয় সাহস থাকা চাই। এ কথাটি স্মৃতিপটে ধরে রাখা চাই যে অব্যয় আত্মা জড় প্রকৃতির দাস নয়, তার জন্য সেই নিত্য-মুক্ত চিন্ময়বস্তু বসে নেই।…"Not the Soul for Nature, but Nature for the Soul."

কোন্ এক প্রশান্ত ধ্যান-রাজ্য থেকে সযত্নে আহরণ করে এই সব অপার্থিব বাণী, শাস্ত্রমুখে 'মন্ত্র' বলে, 'আপ্তবাক্য' বলে যারা কথিত—তাদের প্রকাশ করতেন স্বামীজী। বিস্ময়মুগ্ধ শ্রোতৃবর্গ তদ্গতচিত্তে সে বাণী শ্রবণ করত, অনুধাবন করতে চেষ্টা করত। সে চেষ্টায় সন্দেহ -সংশয় যে দেখা দিত না এমন নয়। সব কথা যে সকলেরই বোধগম্য হয়ে উঠত এমনও নয়। ফলে, কখনো কখনো কেউ হয়ত বিরূপ মন্তব্যই করে বসত। বলত,—

'আপনি যা বলছেন সে সবই অবশ্য অতি সুন্দর কথা, মধুর কথা। কিন্তু এদের মধ্যে নূতনত্ব কোথায়? মৌলিকত্বই বা কি আছে?'

মার্গরেট দেখতেন সে সব মন্তব্য ভারতীয় যোগীর সমাহিত-চিত্ততায় সামান্য একটু আঘাত হয়ত করত কিন্তু পরমুহূর্তে তাঁর অর্ধ-নিমীলিত চক্ষুদুটি যেন কোন স্বপ্ন-সায়রের অথৈ সলিলে নিমগ্ন হত এবং সঙ্গে সঙ্গেই কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হত রহস্যময় গম্ভীর প্রত্যুত্তর।

'বন্ধুবর, আমি যা বলেছি তা নূতনও নয়, পুরাতনও নয়। সে শুধু সত্য, সে শুধু চিরন্তন। সত্যই তার একমাত্র পরিচয়। তুষারঢাকা হিমালয়ের মত, সীমাহীন নীল আকাশের মত, নিত্য-প্রবাহিত এই সৃষ্টির মত—সে প্রাচীন, সে সনাতন।

যদি এর সাহায্যে আপনার চিন্তার গভীরতম প্রদেশটি আন্দোলিত হয়ে থাকে, যদি কোন মহত্তর জীবন যাপনে এ বাণী আপনাকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে—তবে আমি তো ভাল কাজ করেছি বলেই মনে হয়।"…

এমনি কত কথা, অমৃতোপম কত মহাবাণী শ্রবণ করবার সুযোগ লাভ করেছিল মার্গারেট—দ্বিতীয় সাক্ষাতের সেই অপরিসর কালটিতে। সে সুযোগ যেমনি দুর্লভ ও অপ্রত্যাশিত ছিল তার প্রতিক্রিয়াও ছিল তেমনি সুদূরপ্রসারী।

একদিন অতীত যুগে গোপীগীতার অমর কবির কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়েছিল এই কথা:

হে প্রভু, আমার এ তপ্তজীবনে তোমার কথাইতো অমৃত, তোমার বাণী ছাড়া কল্মষাপহ আর কোন বস্তু আর কি আছে?

যুগে যুগে কবিকুল তোমার কথা নিয়েই রচনা করেছেন কাব্য, গ্রথিত করেছেন ছন্দগীতি। শ্রবণ-মঙ্গল তোমার কথা, কীর্তন-মঙ্গল তোমার বাণী··আমি শুনব, আমি বলব।···

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণ-মঙ্গলং শ্রীমদাততম্
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ।

আজ আচার্য বিবেকানন্দের বাণী শ্রবণ করে মার্গারেটের পিপাসু মনটিতেও ঠিক অনুরূপ উচ্ছ্বাসেরই উদয় হয়েছিল। অশেষ সৌভাগ্য এবং সুকৃতি বশে সেই অপূর্ব, অনন্ত জীবনতত্ত্ব শুনবার সুযোগ তিনি লাভ করেছেন। এর তুলনা কি কোথাও আছে? না, নেই। অন্ততঃ মার্গারেটের জীবন-অভিজ্ঞতায় তো নেই।

এমন তিনি কখনো শোনেন নি, কোথাও শোনেননি। আজ স্বামীজীর কথা শুনে ক্ষণে ক্ষণে দৃষ্টির সম্মুখ থেকে অপসারিত হচ্ছে আবরণ মুছে যাচ্ছে সর্ব সংশয়-যবনিকা।···

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।

আর তারই সঙ্গে সঙ্গে সুস্পষ্ট রেখায় যেন প্রকাশিত হচ্ছে অনাগত জীবনের যাত্রাপথ। যে পথকে ক্ষুরধার বলে, দুর্গম বলে বর্ণনা করেছেন কবিকুল—

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

আবার একালেই একদিন একটি আলোচনা-চক্রে মার্গারেট শুনতে পেলেন এই অপ্রত্যাশিত আহ্বান:

আজ ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ এই পৃথিবী কোন্ কাম্য বস্তুটির জন্য অপেক্ষমাণ? কোন্ সামগ্রীর প্রয়োজন তার পক্ষে আজ একান্ত অপরিহার্য?···

আজ তার সর্বাধিক প্রয়োজন—এমন মেয় নরনারীর—তাদের সংখ্যা বিশ-একুশ হলেও ক্ষতি নেই—কিন্তু যাদের কাছে—

'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্যো'র মত, আদর্শের আনুগত্যে যাদের 'চিত্ত ভাবনাহীন, শঙ্কাহীন।' ···যারা নাম-যশ চায় না, ভোগ-বিলাসের আকাঙ্ক্ষা করে না, যারা 'অভী' মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে একথা বলতে পারে।—

ভগবানই আমার জীবনের একক কাম্যধন। ভগবান ভিন্ন, আত্মসাক্ষাৎকার ভিন্ন আর আমার কিছুই প্রার্থনীয় নেই।···

"What the world wants today, is twenty men and women who can dare to stand in the street yonder and say that they possess nothing but God? Who will go?"

অথবা, "The world is in need of those whose life is one burning love—selfless. That love will make every word fell like a thunder-bolt."

এবং, এসব কথা বলতে বলতেই যেন উজ্জ্বল বহ্নিশিখার মত প্রদীপ্ত হয়ে উঠতেন স্বামীজী এবং মুহূর্তে নিজ দীর্ঘ দক্ষিণ বাহু প্রসারিত করে স্থির হয়ে থাকতেন কিছুক্ষণ। চোখের দৃষ্টিতে কি যেন ব্যগ্র প্রত্যাশা, কি যেন গভীর অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা! কেউ কি সাড়া দেবে? শ্রেয়ের জন্য প্রেয়কে বিসর্জন দেবার শক্তি রাখে, স্বপ্ন দেখে···এমন কেউ কোথাও কি আছে?

'আমার জীবনে লভিয়া জীবন,'—সে ধন্য হবে, সার্থক হবে!···

সমস্ত কক্ষটি তখন যেন এক দিব্য আবেশে পূর্ণ হয়ে উঠেছে, একটি নিরবয়ব মহাপ্রশান্তি যেন আচ্ছন্ন করেছে সকলকে।

কিন্তু তারি মধ্যে আরও একটি বাণী ধ্বনিত হল, ধ্যান-বুত্থিত চিত্তের অনাহত শব্দের মত—

"If this is true, what else could matter? If it is not true, what do our lives matter?"

এ মহাতত্ত্ব যদি সত্য হয় তবে অপর বস্তু-নিচয়ের আর প্রয়োজন কি? আর এ তত্ত্বই যদি মিথ্যা হয় তবে জীবনের মূল্যই বা কি?…

এমনিভাবে লণ্ডনের দ্বিতীয়বারের সাক্ষাৎ-কারের দিনগুলিতে ক্ষণে ক্ষণে অভিনব ভাব-প্রবাহের খরস্রোতে যেন ভেসে চলেছিল মার্গারেট। মনে হয়েছিল এক অপ্রত্যাশিত পরিণাম, এক মহা-আহ্বান যেন তার জন্য অপেক্ষা করছে। কে যেন বলছে, ভবিষ্যতের অস্পষ্টতার অন্তরাল থেকে অহরহই বলছে—

'আপনারে তোর না করিয়া ভোর
দিন তোর চলে যাবে না।
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই—
কিছু নাই তোর ভাবনা।'

অর্থাৎ, সেকালে মার্গারেটের জীবনে একটি সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন যে আসন্ন হয়েছিল তাতে আর সন্দেহ নাই। একদিকে রহস্যাবৃত অন্তর-জগতের অভিনব-সংবাদ বিচিত্র উন্মাদনার সৃষ্টি করছে আর অন্যদিকে দ্বিধা ও সংকোচ যেন মধ্যে মধ্যেই মনটিকে পিছনের দিকে আকর্ষণ করছে। একদিকে নূতন জীবনের স্বপ্ন ও এড্‌ভেঞ্চার গোধূলিলগ্নের বংশীধ্বনির মত—"Like the sound of a flute heard far away on the bank of some river in the hour of dawn"—ইঙ্গিতে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, অপরদিকে অনিশ্চয়তার শঙ্কা জাগ্রত হচ্ছে, বিলুপ্ত হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে।

তাই মার্গারেটের আত্মস্মৃতির পৃষ্ঠায় লেখা আছে,—

"His system as a whole, I for one, viewed with suspicion, as forming only another of those theologies which if a man should begin by accepting he would surely end by transcending and rejecting."

এই যেমন একদিকে—আবার অন্যদিকে, একই কালে,—মার্গারেটের অন্তরে এ বিশ্বাসটিও দৃঢ়বদ্ধ হয়েছিল যে এই সেই দৈব-প্রেরিত, আধিকারিক পুরুষ যার কল্যাণস্পর্শে তার স্বকীয় জীবন ধন্য হবে, জন্ম সার্থক হয়ে উঠবে। মনে হয়েছিল যে এই সে আদর্শ মহাজীবন—প্রেম এবং জ্ঞান, ভক্তি এবং যুক্তি—যার মধ্যে এক দিব্য দেবদেউল গড়ে তুলেছে, এক মন্দাক্রান্তা জীবনছন্দ রচনা করেছে। মার্গারেটের নিজস্ব ভাষায়—

"It is difficult at this point to be sufficiently explicit. The time came before Swami left England, when I addressed him as 'Master'. I had recognised the heroic fibre of the man, and desired to make myself the servant of his love for his own people."—কাজেই নিঃসংশয়, মার্গারেট নিঃসংশয় হয়েছিলেন সে বিষয়ে।…

সমস্যা ছিল শুধু নিজ ব্যক্তিগত জীবনের বিবিধ বন্ধন-জটিলতা নিয়ে। নিজ দেশগত এবং শিক্ষাগত দৃঢ়মূল সংস্কাররাশি নিয়ে। তাই প্রশ্নটিও জেগেছিল এই ধরনের,—

এই সিংহবীর্য সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার নিজ জীবনের প্রাক্তন সম্বন্ধ কি কিছু আছে? যদি থেকে থাকে তবে সে সম্বন্ধের রূপ কি? প্রকৃতি কি? আর যদি না থাকে—তবে? তবেই তো মহা-অনিশ্চয়তা, মহা-সমস্যা। মার্গারেটের সেদিনকার অন্তর্দ্বন্দ্বেরও এই-ই ছিল মূল জটিলতা। এর ফলে, নিরতিশয় উৎকণ্ঠা ও চাঞ্চল্য তাকে পেয়ে বসেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে,

একথা সেদিন তার জানা ছিল না যে যাঁকে কেন্দ্র করে তার অন্তরজীবনে কঠিন বিপ্লবের সূচনা হয়েছে, যাঁকে নিয়ে মহাজিজ্ঞাসার তিনি সম্মুখীন—তাঁর জীবনের প্রথম পর্যায়েও অনুরূপ জটিল সমস্যাই মাথা তুলেছিল। আধ্যাত্মিক জীবনের সূক্ষ্ম, অনুভূতিগম্য ইতিহাসে, গুরুশিষ্য-সংবাদের ইতিবৃত্তে এ কোন নূতন কথা নয়, অভিনব ব্যাপার নয়। স্বামী বিবেকানন্দের চরিতকথায়ও দেখা যাবে যে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের আচার্য বিবেকানন্দ, একদিন এক সংশয়-পীড়িত, জিজ্ঞাসু যুবক ছিল। নরেন্দ্রনাথ নামে সেদিন সে পরিচিত ছিল। সমস্যা-জর্জরতায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে নগ্নপদে, একবস্ত্রে কলকাতা মহানগরী থেকে প্রায় তিন চার ক্রোশ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে পাগল-পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে সেদিন সে উপস্থিত হয়েছিল। বুঝতে চেয়েছিল স্ব-স্বরূপ, জানতে চেয়েছিল সে কে, কোথা থেকে এসেছে? শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের সঙ্গে [illegible]র সম্বন্ধই বা কি?

তারপর? তারপর, দিনে দিনে গত হয়েছিল দিন। সংশয়কুয়াসা অপসারিত হয়েছিল ধীরে ধীরে। অপগত-সংশয় সে যুবক তখন প্রার্থনা করেছিল নির্বিকল্প সমাধি, পূর্ণ সমাহিত-চিত্ততা। বলেছিল,

"আমি নিরবধি নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হয়ে যেতে চাই, ডুবে থাকতে চাই। আর আমার কোন কামনা, কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। হে ঠাকুর, আমার এ প্রার্থনা তুমি পূর্ণ করে দাও।"

কিন্তু কাল সেদিন অনুকূল ছিল না। নরেন্দ্রনাথের অন্তরের ঐকান্তিক আবেদনও তখন সেজন্যই পূর্ণ হয়নি। পরন্তু, তদীয় আচার্যদেব প্রচণ্ড ধিক্কার দিয়ে তার সে আবেদন অগ্রাহ্য করেছিলেন এবং তৎপরিবর্তে আর এক মহাকর্মভার, এক বিশেষ গুরু-দায়িত্ব তার স্কন্ধে ন্যস্ত করেছিলেন, করে বলেছিলেন,…

নির্বিকল্প সমাধি এখন নয়। যথাকালে সে সম্পদ তুমি লাভ করবে। আজ যুগ-প্রয়োজনে শিববোধে জীবসেবার দায়িত্ব গ্রহণ কর তুমি। আর্তজনের চোখের জল মুছিয়ে দাও। নিষ্পাদপ ঊষর প্রদেশে—বহু-যোজন-বিস্তৃত-শাখা মহীরুহের মত নিজ জীবন-বৃক্ষটিকে তুমি বর্ধিত কর, প্রসারিত কর। আর তার প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছায়তলে তৃষিত, তাপিত নর-নারী আশ্রয় লাভ করুক, শান্তিলাভ করুক। এবারে এই তোমার জীবনব্রত।

তাই বলছিলাম,—লণ্ডনে স্বামীজীর সঙ্গে দ্বিতীয়বারের সাক্ষাৎকালে তরুণী মার্গারেটের সম্মুখে যে সমস্যা মাথা তুলেছিল—ঠিক সে-জাতীয় সমস্যাই একদিন তদীয় আচার্যদেবের জীবনেও উপস্থিত হয়েছিল, প্রায় একই ধরনের জটিলতা নিয়ে, একই-জাতীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে।… পার্থক্য যা ছিল সেটি পরিমাণগত, প্রকৃতিগত নয়। কোয়াণ্টিটেটিভ, কোয়ালিটেটিভ নয়।…

(ক্রমশঃ)

শিক্ষার আদর্শ ও স্বামী বিবেকানন্দ

অধ্যাপক শ্রীপ্রণব মিত্র

উপনিষদ্ বলিয়াছেন—ন মেধয়া না বহুনা শ্রুতেন, অর্থাৎ শাস্ত্রপাঠ এবং বুদ্ধিচর্চার দ্বারা পরমজ্ঞান লভ্য হইতে পারে না। জ্ঞান স্বয়ম্প্রকাশ। আমাদের দেশের ঋষিগণ ধ্যান সহায়ে সত্যের প্রকৃষ্ট রূপটি দর্শন করিতেন, তাহাদের বাণী সেই সত্যের—সেই উপলব্ধ তত্ত্বের প্রকাশক। কিন্তু সত্যকে তাঁহারা বাণীবদ্ধ করিলেন উত্তরসূরীর মুখ চাহিয়া। সেইসঙ্গে আবার সাবধানও করিয়া গেলেন এই বলিয়া যে সত্য নিছক বুদ্ধিচর্চার দ্বারা লভ্য নয়। আসল কথা, তাঁহাদের বলিবার উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, বিদ্যাচর্চা কিংবা শাস্ত্রচর্চা মননকে পরিশীলিত করিয়া দেয় এবং সেই মননের দ্বারা আত্মতত্ত্ব উপলব্ধ হয়। আমাদের দেশের শিক্ষাতত্ত্বের ইহাই মূল কথা। আমরা শিক্ষাকে আরোপিত ভাবিতে পারিনা, আমাদের মতে শিক্ষা স্বতোৎসারিত। তাহা অপরের চিন্তারাশির সঙ্কলনমাত্র নয়, তাহা চিত্তবিকাশের ক্রমে স্বকীয় উৎসার। বোধকরি এইজন্যেই আমাদের দেশে শিক্ষার সহিত দীক্ষা শব্দটিও জড়িত। আমাদের শিক্ষা আসলে ঐ আত্মদীক্ষা। উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তানায়কগণের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের নাম শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে এবং উনবিংশ শতাব্দীতে অন্যান্য বহু বিষয়ের মত আধুনিক শিক্ষাবিধিরও নবজন্ম ঘটিয়াছিল। রামমোহন হইতে সুরু করিয়া বিদ্যাসাগর পর্যন্ত সকলেই শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। শিক্ষার মাধ্যম, ক্ষেত্র এবং বিষয় সম্পর্কে তাঁহারা নানাপ্রকার গবেষণা করিয়া গিয়াছেন এবং বলা বাহুল্য যে সেই গবেষণার ফলভোগ আমরা আজিও করিতেছি। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের যে একটি বিশিষ্ট অবদান রহিয়াছে তাহা আজ পর্যন্ত অনেকেরই অপরিজ্ঞাত। এবং প্রসঙ্গতঃ একথা বলিলেও অন্যায় হইবেনা যে শিক্ষাচিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দ অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

অন্যেরা শিক্ষাচিন্তায়, বিশেষভাবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে গবেষণাকে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন এবং সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা অবশ্যম্ভাবী ছিল। জাতীয় জীবনে অবক্ষয় নানা বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া সেদিন আমাদের নৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল এবং প্রথার দাসত্ব শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিপদেই স্বাধীন চিত্তস্ফূর্তির কণ্ঠরোধ করিতেছিল। ইহার আশু প্রতিবিধানে প্রচলিত ব্যবস্থার দ্রুত জীর্ণসংস্কার ছাড়া সেদিন আর কিই-বা করিবার ছিল। উনবিংশশতাব্দীর প্রথমদিকে সেই চিত্তমুক্তি, সেই নূতনপুরাতনের, পূর্ব-পশ্চিমের মিলন ; ইহাদের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

কিন্তু তবুও ক্ষোভ রহিয়া গেল—বোধকরি সে ক্ষোভ আজিও মিটে নাই। বিভিন্ন স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। নব নব পাঠ্যপুস্তক রচিত হইল। উপযুক্ত পাঠ্যক্রম নির্বাচিত হইল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। স্নাতক, স্নাতকোত্তর উপাধিধারীগণের আবির্ভাব হইতে লাগিল। কিন্তু তাহার পরও প্রশ্ন রহিয়া গেল—"বিদ্যাশিক্ষা কাকে বলি ? বই পড়া ? না, নানাবিধ জ্ঞানার্জন ?—তাও নয়।" এই প্রশ্ন

লইয়া স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার শিক্ষা-চিন্তায় বিবৃত হইলেন। প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়াছিলেন—“প্রত্যেক বিষয়ের ব্যাখ্যা তোমার নিজের ভিতরে। কেহই কখনও অপরের দ্বারা শিক্ষিত হয় নাই। প্রত্যেককেই নিজেকে নিজে শিক্ষা দিতে হইবে—বাহিরের আচার্য কেবল উদ্দীপক কারণ মাত্র।”

স্বামীজীর এই কথাগুলির পশ্চাতে রহিয়াছে তাঁহার বেদান্ত। ব্রহ্মকে একমেবাদ্বিতীয়ম্ সত্য জানিয়া সৃষ্টিকে অধ্যাসমাত্রে পর্যবসিত করিয়া যে প্রচণ্ড জ্ঞানযোগ, তাহা সম্ভবতঃ স্বামীজীর উদ্দিষ্ট ছিল না এবং তিনিও তাঁহার গুরুদেবের মত “যত্র জীব তত্র শিব” এই বাক্যেই বিশ্বাসী ছিলেন। তাই জীবের মধ্যে তিনি দেখিতেছেন ব্রহ্মের শক্তিকে, তাঁহার অসীম জ্ঞানকে—শুধু উপরে অবিদ্যার আবরণ পড়িয়া আছে। শিক্ষা সেই অবিদ্যার আবরণ অপসারণ করিয়া সত্যের নিত্য জ্যোতিকে বিকশিত করিয়া তোলে। স্বামীজী বলিতেছেন—“অধিকাংশ ব্যক্তিতে সেই আভ্যন্তরীণ ঐশ্বরিক জ্যোতি আবৃত ও অস্পষ্ট হয়ে রয়েছে। যেন একটা লোহার পিপের ভিতর একটা আলো রাখা হয়েছে, ঐ আলোর এতটুকু জ্যোতিও বাইরে আসতে পারছে না। একটু একটু করে পবিত্রতা নিঃস্বার্থতা অভ্যাস করতে করতে আমরা ঐ মাঝখানকার আড়ালটাকে খুব পাতলা করে ফেলতে পারি। অবশেষে সেটা কাচের মত স্বচ্ছ হয়ে যায়।”

এই কথাগুলি হইতেই স্বামীজীর শিক্ষার আদর্শ বুঝা যাইবে এবং এই জন্যই বলিতেছিলাম যে শিক্ষাচিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দের কালজয়ী অবদান রহিয়াছে—তিনি এমন কতকগুলি বিষয়ে জোর দিয়াছেন যাহা তাঁহার বিশেষ-দীক্ষার অনুযায়ী এবং এ-সকল কথা তাঁহার মত করিয়া আর কেহই বলেন নাই। এই দৃষ্টিকোণ হইতেই তিনি প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে নিছক Head-learning বলিয়া ধিক্কৃত করিয়াছেন। স্বামীজী প্রচলিত শিক্ষাকে negative education বলিয়াছেন। এ শিক্ষার সহিত আমাদের দেশের নাড়ির যোগ নাই। শিক্ষা এখন শুধু অর্থকরী। আমরা শিখি কিন্তু আমাদের বিশ্বাস গভীর হয় না। এই স্বামীজী বলিতেছেন: “মানুষগুলো একেবারে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-বর্জিত হচ্ছে; গীতাকে প্রক্ষিপ্ত বলবে, বেদকে চাষার গান বলবে। ভারতের বাইরে যা কিছু আছে তার নাড়ি-নক্ষত্রের খবর আছে, নিজের কিন্তু সাতপুরুষ চুলোয় যাক—তিন পুরুষের নামও জানে না।” ইহার ফলেই আমাদের অবস্থা সেই চন্দনকাষ্ঠের ভারবাহী উষ্ট্রের মত—“ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য।” এই আরোপিত শিক্ষা আমাদিগকে ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের মত এক অদ্ভুত জীবে পরিণত করিয়াছে। স্বামীজী চাহিয়াছিলেন শিক্ষার এবংবিধ ধারাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করিতে। তাঁহার শিক্ষা, প্রকৃত মানুষ-গড়ার শিক্ষা, অথবা বলিতে পারি মানুষ-জাগানোর শিক্ষা।

কিন্তু স্বামীজী শিক্ষা সম্পর্কে শুধুমাত্র কতকগুলি ভাসা-ভাসা উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি সুস্পষ্টভাবে কতকগুলি উপায় নির্দেশিত করিয়া গিয়াছেন। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য চরিত্রগঠন এবং ইহার সহায়ক সংযম, একাগ্রতা ও ব্রহ্মচর্য। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ কার্যের মধ্য দিয়াই ইহা আয়ত্ত হইতে পারে। আর সেই সঙ্গে চাই আত্মশক্তিতে বিশ্বাস। স্বামীজী বলিতেছেন: “প্রাচীন ধর্ম বলিত, যে ঈশ্বরে বিশ্বাস না করে সে নাস্তিক। নূতন ধর্ম

বলিতেছে, যার নিজের উপর বিশ্বাস নাই সে নাস্তিক।"

স্বামীজীর আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া আধুনিককালের কোন কোন মানবতা বাদী উৎসাহী বুদ্ধিজীবী ঊনবিংশ শতাব্দীর নব-জাগরণের মূল ভাবের বিপরীতে স্বামীজীর আদর্শকে ক্রিয়াশীল বলিয়াছেন, কিন্তু আমাদের মনে হয় ধর্ম এবং ভগবান, এই কথাদুইটি নব-মানবধর্মের বিরোধী নয়, বিশেষতঃ স্বামীজী আমাদের দেশে আধুনিককালে দরিদ্রনারায়ণের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন—"আমি বলি দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব—দরিদ্র মূর্খ অজ্ঞানী কাতর—এরাই তোদের দেবতা হোক। এদের সেবাই পরম ধর্ম জানবি।" এই জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ জনশিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যাহা করিতে পারে না তাহা সম্ভবপর হইতে পারে শিক্ষাব্রতী সন্ন্যাসিগণের দ্বারা। তাঁহারা দরিদ্রগণের মাঝখানে, তাহাদের কর্মের অবসরে এক একটা শিক্ষাদানের পরিকল্পনাকে রূপায়িত করিতে পারেন। তবে শিক্ষাদান বলিতে সেইকথা—কতকগুলি ভাবের আরোপ নয়—চরিত্রসৃষ্টি—মনুষ্যত্বের উদ্বোধন।

বস্তুতঃ ইহাই স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তার কতক-গুলি মূল তত্ত্ব এবং আমাদের মনে হয় আসলে উহা একটিই তত্ত্ব। স্বামীজী শিক্ষা বলিতে বুঝিতেন—আত্মভাবের স্ফুরণ: অশেষ জ্ঞান ও অনন্ত শক্তির আকর ব্রহ্ম প্রত্যেক নরনারীর অভ্যন্তরে সুপ্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন; সেই ব্রহ্মকে জাগরিত করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

আজ বহুকাল অতীত হইয়াছে এবং এদেশের প্রথানুযায়ী আমরা স্বামীজীর আদর্শচিন্তা অনুসরণে বিরত হইয়া শুধুমাত্র বীরপূজায় মাতিয়াছি। তাহা না হইলে শিক্ষার প্রসারের পথকে সুগম না করিয়া আজ শুধু প্রাণহীন আইনকানুন ও বিধিনিষেধের পাকচক্রে শিক্ষার গলা টিপিয়া মারা হইত না। বড় বড় বাড়ী, নূতন নূতন পাঠ্যক্রম ও পুস্তকতালিকা প্রকাশ করিয়া কতকগুলি উপাধিধারী ব্যক্তিকে বাহির করা হইতেছে যাহারা বিশেষ শিক্ষার গুরুভারে কুব্জপৃষ্ঠ ম্লানদেহ এবং চোখের সঙ্গে খাপ-না-খাওয়া পরকলার মধ্য দিয়া বাস্তবজগৎটাকে তাহারা এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখিতেছে। তাহাদের মধ্যে সেই মানুষ কই?—সেই আত্মবিদ্ কই? স্বামীজীর আদর্শ কি কোনোদিনই সাফল্যমণ্ডিত হইবে না?

পূষা

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ

বৈদিক দেবসমাজে পূষা একদিন ছিলেন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু আজ পূষাকে কেহ চিনে না। পৌরাণিক যুগে পূষা মানুষের স্মৃতি থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেছেন। তাঁর গুণাবলীর কিছু কিছু রুদ্রের নবরূপায়ণ শিবের উদয়নে সাধকের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছে।

পূষার একক স্তুতি ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৪২ এবং ১৩৮ সূক্তে, ষষ্ঠ মণ্ডলের ৫৩-৫৬ এই চারিটি সূক্তে এবং ৫৮ সূক্তে এবং দশম মণ্ডলের ২৬ সূক্তে গীত হয়েছে। দ্বিতীয় মণ্ডলের ৪০ সূক্তে সোম এবং পূষাকে যুক্তভাবে স্তুতি করেছেন ঋষি গৃৎসমদ এবং ষষ্ঠ মণ্ডলের ৫৭ সূক্তে বৃহস্পতি-পুত্র ভরদ্বাজ ইন্দ্র ও পূষার স্তব করেছেন। পূর্বোক্ত আটটি সূক্তের ঋষিগণ হচ্ছেন যথাক্রমে ঘোরপুত্র কণ্ব, দিবোদাসের পুত্র পরুচ্ছেপ, বৃহস্পতিতনয় ভরদ্বাজ এবং ইন্দ্রপুত্র বিমদ বা বসুক্রপুত্র বসুকৃৎ। পূষার নাম ঋগ্বেদে ১২০ বার উল্লিখিত হয়েছে।

পূষা দেবতার অর্থ কি তা নিয়েও মতান্তর আছে। সায়ণ বলেছেন যে, পূষা হলেন জগৎ-পোষক পৃথিব্যভিমানী দেব, কিন্তু তাঁর এই ব্যাখ্যা অন্য কেহই গ্রহণ করেন নি। সায়ণের অর্থ যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। যাস্ক নিরুক্তে বলেছেন: অথ যদ্রশ্মি পোষং পুষ্যতি তৎ পূষা ভবতি। দুর্গাচার্য নিরুক্তের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যখন অপূর্ণ তেজের জন্য সূর্য কিরণমালাকে পোষণ করেন, তখনকার সূর্যের নাম পূষা। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন: 'পূষার সূর্য অর্থই সঙ্গত এবং সকল পণ্ডিতগণের সম্মত। The Sun as viewed by shepherds —Maxmuller. মেঘ হইতে অনেক সময় সূর্য বাহির হন, এইজন্য পূষাকে মেঘপুত্র বলা হয়েছে। গোরক্ষকগণ সূর্যকে যে প্রকৃতিতে অবলোকন করিত, সেই প্রকৃতির সূর্যই পূষা। সুতরাং তাহার হস্তে প্রতোদ, তিনি পথ নির্দেশ করেন, গোসকল রক্ষা করেন, নষ্টপশু উদ্ধার করেন, ভ্রমণকারীদিগকে সৎ পথে লইয়া যান।' বৃহদ্দেবতায় বলা হয়েছে:

পুষ্যন্ ক্ষিতি পোষয়তি প্রণুদন্ রশ্মিভিস্তমঃ।
তেনৈনমস্তৌৎ পূষেতি ভরদ্বাজস্তু পঞ্চভিঃ॥ ২-৬৩

—ভরদ্বাজ পাঁচটি সূক্তে পূষার স্তব করেছেন—পূষা ক্ষিতিকে পোষণ করেন এবং রশ্মিজালে তিমির বিদূরিত করেন তাই তাঁকে পূষা বলা হয়। অতএব পূষা যে সূর্যের তিমির-বিদার প্রথম অভ্যুদয়, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

শ্রীঅরবিন্দও সেই কথা বলেছেন: Since the divine work in us cannot be suddenly accomplished, the godhead cannot be created all at once, but only by a luminous development and constant nurture through the succession of the dawns.···Surja the sun-power manifests himself in another form as Pushan. The Increaser, the root of this name means to increase, foster, nourish. The spiritual wealth coveted by the Rishis is one that thus increases 'day by day', that is, in each return of this fostering sun; increase or growth (pushti) is a frequent object of their prayers. Pushan represents this aspect of the Surja-power. He is the 'lord and

master of plentitudes,…' Pushan is the enricher of our sacrifice. Vast Pushan shall advance our chariot by his energy, …Pushan is described as himself a stream of the divine riches.

আমাদের বৈদিক পিতামহগণের দৃষ্টি সীমিত ছিল না—তাঁরা ছিলেন অদিতির উপাসক, অনন্ত ও অসীমের জন্যই ছিল তাঁদের প্রাণের বিহ্বল আকৃতি—তাই তাঁরা চাইতেন, 'পোষমেব দিবে দিবে'—সেই প্রাচুর্য ও পুষ্টি, যা দিনে দিনে নিত্য নবীনতায় ভাস্বর হয়ে ওঠে—এই অনবাধিত অসঙ্কোচ উদয়নের দেবতাই পূষন্। বৈদিক যুগের পর আমরা এই প্রবৃদ্ধি ও বিবর্ধনের বার্তা হারিয়েছি, তাই পূষাও আমাদের ত্যাগ করেছেন; পুষ্টিম্ভর পূষাকে স্তুতি করে আমরা নব নব উত্তরণে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছি না।

উদয়ের পথে বর্ণাঢ্য বিভূতি নিয়ে জ্যোতির্ময় পূষা দেখা দেন, তাই তাঁর জটাজাল নিয়ে তিনি কপর্দী। কিন্তু তাঁর রূপ ও আকৃতি পরিস্ফুট নহে। তাঁর জটাযুক্ত কেশ পরে শিবের মস্তকে দেওয়া হয়েছে।

পূষা 'আঘৃণি'—পরমোজ্জ্বল প্রভায় তিনি দীপ্তিমান্। তিনি তাঁর দোদুল্যমান শ্মশ্রু নিয়ে বিরাজ করেন! তাঁর বল্লম স্বর্ণমণ্ডিত। তিনি ছাগবাহন—শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন—পূষা অদন্তক।

সোমমন্য উপাসদৎ পাতবে চম্বো সুতং।
করম্ভমন্য ইচ্ছতি। ঋ ৬।৫৭।২

ইন্দ্র মুষল দ্বারা নিষ্কাষিত সোমরস পানে ইচ্ছুক আর পূষা করম্ভ পানে লালায়িত করম্ভ ঘৃতসিক্ত ছাতুর তৈরী হবি।

অজাশ্বঃ পশুপা বাজপস্ত্যো ধিয়ং
জিন্বো ভুবনে চিত্তে অর্পিতঃ
অষ্ট্রাং পূষা শিথিরামুদ্বরীবৃজৎ সংচক্ষাণো
ভুবনা দেব ঈয়তে॥ ঋ ৬।৫৮।২

ছাগেরাই পূষার অশ্ব। তিনি পশুপতি, তাঁর গৃহে অন্ন ও বীর্য সদা বিরাজমান, তিনি মানুষকে সুকর্মে প্রেরণ করেন, মানুষের অন্তরে বাণী জাগ্রত করেন, তিনি প্রজাপতির দ্বারা সর্বলোক-নায়কত্বে অর্পিত। তাই তিনি তাঁর হস্তের চাবুক বিঘূর্ণিত করে, সমস্ত লোককে সম্যক্-ভাবে অবলোকন ক'রে নভস্তলে বিচরণ করেন।

যাং পূষন্ ব্রহ্মচোদনীমারাং বিভর্ষ্যাঘৃণে।
তয়া সমস্য হৃদয়মা রিখ কিকিরা কৃণু॥
ঋ ৬।৫৩।৮

হে ভাস্বর পূষন্! তুমি অন্ন দান কর, তুমি মানুষের হৃদয়ে প্রার্থনা জাগাও, তাদের ব্রহ্মনিষ্ঠ করাও, তোমার হস্তে রয়েছে 'আরা' যে সূক্ষ্মাগ্র লৌহদণ্ড দিয়ে তুমি লুব্ধ জনগণের হৃদয় বিদ্ধ কর, সেই লৌহদণ্ড তুমি শিথিল কর।

পূষা শিবময় মঙ্গলময় পথে মানুষকে পরিচালিত করেন। কণ্ব ঋষি তাই প্রার্থনা করছেন :—'হে পূষন্, হে উদকপুত্র, অভীষ্ট যেন পথযাত্রায় লাভ করি—আমাদের পথকে তুমি সুগম কর, সমস্ত অন্তরায় বিদূরিত কর। পথ থেকে যারা প্রতিপক্ষ, যারা বৃকের মত ক্ষতি-কারক, সেই সব অত্যাচারীদের বিনাশ কর। পথে তস্করাদি যে সব প্রতিবন্ধক রয়েছে, তাদের অপসারণ কর। তাদের অতিদূরে প্রেরণ কর। যারা বিষকুম্ভ অথচ পয়োমুখ সেই সব দুরাচারদের তুমি পদদলিত ক'রে পিষ্ট কর। হে জ্ঞানবান্ পূষা! আমরা তোমার শরণ গ্রহণ করি, আমাদের পিতৃপুরুষগণকে যে ভাবে রক্ষা করে-ছিলে, সেই ভাবে আমাদিগকেও পরিত্রাণ কর। হে সৌভাগ্যদায়ক দেবতা! তোমার আয়ুধ-সকল স্বর্ণনির্মিত, তুমি আমাদের ধন বৃদ্ধি কর। আমরা যেন শত্রুকে অতিক্রম করতে পারি, আমাদের পথ সুগম ও সুপথ কর, তুমি

আমাদিগকে ‘ক্রতু’ জানাও। শোভন তৃণসম্পন্ন সর্বৌষধিযুক্ত দেশে আমাদিগকে পরিচালিত কর, পথে যেন আমরা সন্তাপ না পাই, তোমার এই শক্তি প্রকাশ কর। হে দেব! আমাদিগকে অনুগ্রহ কর, আমাদিগের গৃহ ধনে পূর্ণ কর, দাও আমাদের পরম বিত্ত, আমাদিগকে সর্বোত্তম কর, আমাদিগকে বীর্যবান্ কর তোমার এই মাহাত্ম্যকে প্রকাশ কর। আমরা পূষাকে নিন্দা ক'রব না, ‘সূক্ত’ দিয়ে তাঁর অর্চনা ক'রব। তাঁর কাছে আমরা পার্থিব এবং অপার্থিব ‘রয়ি’ যাচ্ঞা করি।

পুষ্টিম্ভর পূষা রথিশ্রেষ্ঠ। তিনি মানুষকে মহৎ অভ্যুদয়ের পানে নিয়ে চলেন। সত্য, অমৃত ও জ্যোতির পথে তিনি আমাদিগকে প্রতিনিয়ত উত্তরণ করাতে সাথে সাথে রয়েছেন। তিনি আমাদিগকে প্রাচুর্য ও পরম পুষ্টি প্রদান করেন।

প্রার্থনায় পাই, পূষা মঙ্গলের নিদান—তাঁর মহিমা চিরদিন কীর্তিত হয়—তিনি বিশ্বের মনকে আকর্ষণ করেছেন—তিনি শত্রুকে প্রতিহত করেন—তিনি মর্ত্য মানুষের অমর্ত্য সখা হবেন; যাঁদের তিনি সখা, তারা চিৎশক্তি লাভ করে, প্রজ্ঞায় প্রদীপ্ত হয়; তিনি জীবনের প্রতিটি সংগ্রামে মানুষের সহায়তা করেন। তাই তাঁর সখ্য অবহেলার নয়।

ভরদ্বাজ বৃহস্পতিতনয় পাঁচ পাঁচটি সূক্তে পূষার অর্চনা করেছেন। ভরদ্বাজ বলছেন, পূষা পথের পতি গৃহের পতি। তিনি মানুষের অন্তরে জাগান আত্মীয়তা—সেই প্রেমের প্রভাতে কৃপণেরও মনে দানের প্রেরণা জাগে, তার হৃদয়ও সহানুভূতিতে কোমল হয়ে ওঠে। হে দেবতা, আমাদিগের চিত্তবৃত্তির পূর্ণতা সাধন কর। আমাদিগকে প্রভুত্ব ও ধনে সমৃদ্ধ কর।

হে পূষন্, তুমি সেই কুশলী বিদ্বানের সহিত আমাদের মিলিত কর, যিনি অবলীলাক্রমে আমাদিগকে নষ্ট ধনের সন্ধান দিবেন। হে দেবতা তুমি সেই ক্রান্তিদর্শী মহাত্মার সঙ্গে আমাদের সংযোগ করাও—যিনি পরমতত্ত্ব জানেন—যিনি অবিলম্বে আমাদিগকে অনুশাসন দিতে পারবেন—যিনি বলতে পারবেন—‘এইতো তোমাদের বাঞ্ছিত অমৃতধন।’ আমরাও তাঁর উপদেশে সেই পরম সম্পদের গৃহে উপনীত হব এবং বলতে পারব—‘এইতো সেই অভীষ্ট সম্পৎ।’

দেব পূষণের চক্রায়ুধ কখনও বিনষ্ট হয় না।

পূষা আমাদের গো ও অশ্ব পালন করুন। তাদের রক্ষা করুন। তারা যেন বিপদে না পড়ে। হে চিরসতর্ক প্রভু, তুমি ঈশান, তুমি ধনপতি, তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাদিগের দিকে প্রসারিত কর। আমাদিগের যা কিছু গেছে হারিয়ে, সব পুনরায় ফিরে আসুক। হে পূষন্, তুমি পুণ্যবানের সখা।

আ তে স্বস্তিমীমহ আরে অঘামুপাবসুং।
অদ্যা চ সর্বতাতয়ে শ্বশ্চসর্বতাতয়ে॥ ঋ ৬।৫৬।৬

—তুমি আমাদের স্বস্তি দাও, পাপ থেকে দূরে নাও, পরম সম্পদে পূর্ণ কর। আজ দাও সর্ব কল্যাণ, পরিপূর্ণ আনন্দ, কালও দাও শিবময় শান্তি এবং অখণ্ড আমোদ।

শুক্রং তে অন্যদ্যজতং তে অন্যদ্বিষুরূপে
অহনী দ্যৌরিবাসি।
বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবো ভদ্রা
তে পূষন্নিহ রাতিরস্তু। ঋ ৬।৫৮।১

হে পূষন্। তুমি একরূপে শুক্র—ভাস্বর দিবস, অন্যরূপে কৃষ্ণবর্ণ রাত্রি—এই দুই বিপরীত রূপ নিয়ে প্রতিদিন তোমার মহিমা প্রকাশ করছ। অহোরাত্রি তোমারই দান—সেই বিপরীত যুগলের একটি সুনির্মল দিবস, অন্যটি তামসী রাত্রি—আদিত্য যেমন প্রকাশক, তুমিও তেমনই প্রকাশক।

হে স্বধাবান্ দেবতা! সকল প্রজ্ঞার তুমিই রক্ষক, সকল মায়ায় তুমিই ধারক, তুমিই জ্যোতির্ময় সূর্য—তোমার কল্যাণী বদান্যতা আমাদিগকে নিত্যক্ষণ বর্ধিত করুক। ভরদ্বাজ তাঁর স্তুতি শেষ করেছেন নীচের দুই শ্লোকে :

যাস্তে পূষন্নাবো অন্তঃ সমুদ্রে
হিরণ্যয়ীরন্তরিক্ষে চরন্তি।
তাভির্যাসি দূত্যাং সূর্যস্য কামেন
কৃত শ্রব ইচ্ছমানঃ ॥ ঋ ৬।৫৮।৩

পূষা সুবন্ধুর্দিব আ পৃথিব্যা
ইলস্পতির্মঘবা দস্মবর্চাঃ।
যং দেবাসো অদদুঃ সূর্যায়ৈ কামেন
কৃতং তবসং সঞ্চম্ ॥ ঋ ৬।৫৮।৪

হে পূষা, তোমার হিরণ্ময় পোতসকলে তুমি সমুদ্রে এবং অন্তরীক্ষে বিচরণ কর, সেই পোতারোহণে অসুরবধার্থ গত সূর্যদেবের বার্তাবহ হয়ে তুমি সূর্যপ্রিয়ার নিকট দৌত্যকর্ম সমাধা করেছিলে—সূর্যকন্যা সূর্যার প্রণয়াভিলাষী হয়ে কীর্তিমুকুট অর্জন করবার উৎসাহে তুমি এই দৌত্যভার গ্রহণ করেছিলে।

হে জগৎপোষক দেব! তুমি দ্যুলোক এবং ভূলোক উভয়েরই সুবন্ধু, হে অন্নপতি! হে ধনপতি মঘবা, তোমার বিভূতি দর্শনীয়, দেবগণ সূর্যাকে তোমায় দান করেছিলেন, কারণ তুমি ছিলে সূর্যার প্রণয়ভিখারী আর বিশেষতঃ তুমি বলবান্, তুমি প্রবৃদ্ধ এবং সত্বরগমনশীল।

সংক্ষেপে বলা যায়, দেবতা পূষন্ দাতা। সুপথের দর্শক এবং পশুপালের রক্ষক। কীথ গ্রীক দেবতা Hermes এবং পূষার মধ্যে আশ্চর্যজনক সৌসাদৃশ্যের উল্লেখ করেছেন :

The similarity of Pusan to Hermes is undoubted, both have in common the duty of conducting men or the souls of the dead on the roads, they are connected with the herds, confer wealth, act as convoys, are connected with the goat and even the braided hair of Pusan has been compared with the Krobalos of Hermes.

দেবশ্রবা যামায়ণ দশম মণ্ডলের সপ্তদশ সূক্তে বলেছেন যে পূষা মৃতের আত্মাকে পরলোকে নিয়ে যান। তিনিই পিতৃগণের সহিত মৃত আত্মাকে মিলিত করেন।

পূষেমা আশা অনু বেদ সর্বাঃ সো অস্মাঁ
অভয়তমেন নেষৎ।
স্বস্তিদা আঘৃণিঃ সর্ববীরোঽপ্রযুচ্ছৎ পুর এতু
প্রজানন্ ॥ ঋ ১০।১৭।৫

প্রপথে পথামজনিষ্ট পূষা প্রপথে দিবঃ
প্রপথে পৃথিব্যাঃ।
উভে অভি প্রিয়তমে সধস্থে আ চ পরা চ
চরতি প্রজানন্ ॥ ১০।১৭।৬

পূষা সকল দিককে চেনেন, সকল দেশের তথ্য জানেন। তিনি অভয়তম পথে আমাদিগকে পরিচালিত করুন, তিনি স্বস্তিদাতা, তিনি দীপ্তিমান্, তিনি বীরশ্রেষ্ঠ; সেই চিরজাগ্রত চিরসতর্ক জ্ঞানী দেবতা আমাদের পুরোভাগে থাকুন। পূষা দূর পথের সহায় হতেই জন্মেছিলেন—পৃথিবী এবং দ্যুলোকের দূরতম পথে তিনি পথ দেখান, তিনি সর্বজ্ঞ, তাঁর প্রজ্ঞান দিয়ে তিনি সভাসমিতির প্রিয়তম স্থানে যাতায়াত করেন।

পূষা চিৎজ্যোতির তীব্রচ্ছটায় মানুষকে জ্ঞানের ক্রান্তি পাইয়ে দেন; কিন্তু কেবল তাই নয়, তা থেকে দূরে, বহু দূরে জ্ঞানের ঊর্ধ্বতম লোকে ইন্দ্রিয়াতীত মহিমায় ঝলমল ঐশ্বর্যে নিয়ে যান—লোকোত্তর আনন্দের তিনিই দাতা, কারণ তিনি চিন্ময় বিস্তার পথকে সকল দিক থেকে সকল কোণ থেকে সম্পূর্ণভাবে জানেন।

ঋগ্বেদের প্রার্থনা : তেজস্বী পূষা তাঁর বীর্যে এবং মহিমায় আমাদের জীবনরথকে ভাস্বর এবং পরিপূর্ণ করুন। তিনি আমাদের অন্তরের আকুতি শুনুন এবং আমাদের সম্পৎকে বৃহত্তর করুন।

পূষা আমাদের অন্তশ্চেতনার কমলকে ধীরে ধীরে ফুটিয়ে তোলেন—বিচিত্র নব বিভূতির উন্মেষে হৃদয়-আধারকে পবিত্র করেন। জীবনের আকাঙ্ক্ষিত তুঙ্গভূমিতে আরোহণ করিয়ে তিনি আমাদিগকে সার্থকতায় সফল ক'রে তোলেন।

তিনি বিমোচন—মানুষকে তিনি পরম মুক্তির পথ দেখান। মেধাতিথি বলেন :

'আ পূষঞ্চিত্রবর্হিষমাঘৃণে ধরুণং দিবঃ।
আজা নষ্টং যথা পশুম্ ॥ ১।২৩।১৩
পূষা রাজানমাঘৃণিরপগূলহং গুহাহিতং।
অবিন্দচ্চিত্রবর্হিষং ॥ ১।২৩।১৪
উতো স মহ্যমিন্দুভিঃ ষড়্যুক্তাঁ অনুসেষিধৎ।
গোভির্যবং ন চর্কৃষৎ॥ ১।২৩।১৫

...সেই পরম দেবকে আমাদিগের নিকট আনয়ন কর, হে পরমদীপ্ত পূষন্—যিনি দ্যুলোককে শিরোদেশে ধারণ ক'রে আছেন, যিনি বিচিত্র কুশাসনে আসীন হয়ে বিরাজ করছেন। পূষা গুহাহিত লুক্কায়িত রাজা সোমকে খুঁজে পেয়েছেন। যিনি বিচিত্রবর্ণ কুশাসনে বসে আছেন। তিনি ষড় ঋতুকে আমাদের নিকট নিয়ে আসেন—যেমন গোরুর দ্বারা যব চাষ করা হয়, তেমন ভাবেই তিনি সোমবিন্দু পান করে ষড় ঋতুকে আনয়ন করেন।'

সোম হলেন অমৃতত্বের দ্যোতক। পরম প্রজ্ঞায় ভাস্বর পূষন্ মানুষকে সেই অমৃতত্বের পথে নিয়ে যান। সোম যে আনন্দ দেন, সে আনন্দ চিৎস্বরূপের বীর্যে চিরন্তন ও নিত্য নবায়মান। অতএব পূষাকে গ্রহণ করে জীবনের লীলায়নে সাধক পান পূর্ণতর ও অফুরন্ত রসোচ্ছল আনন্দ।

পূষা চিরপ্রগতির প্রতীক, কারণ তিনি পথকে ভালভাবে চেনেন, ভালভাবে জানেন। পথে চলাই তাই তাঁকে পাওয়ার উপায়। পূষার অনুগামী হলে তাই জীবনে আসে সৌষম্য ও ঋতের ছন্দ।

সূর্যা আদর্শ বধূ, অপর পক্ষে সকল বধূর আদর্শ। তাই সূর্যার স্বামী পূষা নববধূদের পরমোপকারক বন্ধু।

পূষা ত্বেতো নয়তু হস্তগৃহ্যাশ্বিনা
ত্বা প্র বহতাং রথেন।
গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্নী যথাসো বশিনী
ত্বং বিদথমা বদাসি। ঋ ১০।৮৫।২৬
তাং পূষঞ্ছিবতমামেরয়স্ব যস্যাং বীজং
মনুষ্যা বপন্তি।
যা ন ঊরূ উশতী বিশ্রয়াতে যস্যামুশন্তঃ
প্রহরাম শেপং ॥ ১০।৮৫।৩৭

হে নববধূ! পূষা তোমার কল্যাণহস্ত ধারণ করুন এবং পরিচালনা করুন, অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহাদের রথে তোমায় বহন করুন। গৃহপত্নী রূপে গৃহে গমন কর, সভাতে নেত্রী হিসাবে সকলের সাথে সংলাপ কর। হে পূষন্, আমার বধূকে শিবতমা কর,......।

ভগ, পূষা ও অর্যমা এই তিনজনকে একত্র অর্চনা করা হয়েছে। সত্যব্রত সামশ্রমী লিখেছেন : 'উষোদয়ের পরেই প্রাতঃকাল, ইহাকেই অরুণোদয়কাল কহে। প্রাতঃকালের পরই ভগোদয়ের কাল অর্থাৎ অরুণোদয়ের পরই যখন সূর্যের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত তীব্র হইয়া উঠে, ভগ সেই কালের সূর্য। যে পর্যন্ত সূর্যের তেজ অত্যুগ্র না হয়, তাবৎ তাদৃশ স্বল্পতেজা সূর্যকে পূষা কহে অর্থাৎ পূষা ভগোদয়ের পরকালবর্তী সূর্য; পূষোদয়ের

পরই অর্কোদয় কাল। ইহার পরই মধ্যাহ্ন। এই কালের সূর্যকে অর্ক বা অর্যমা কহে। এই অর্যমার অন্তেই পূর্বাহ্ণ শেষ হয়।'

পূষা ঐন্দ্রজালিকদের দেবতা। তিনি নষ্ট ধন পুনরুদ্ধার করেন তাই তাঁকে বলা হয় অনষ্টবেদা।

যস্য ত্যন্মহিত্বং বাতাপ্যময়ং জনঃ।
বিপ্র আ বংসদ্ধীতিভিশ্চিকেত সুষ্টুতীনাং॥
১০।২৬।২

মেধাবী যাজ্ঞিক পূষার মহিমা জানেন। যাগ কর্মের দ্বারা তিনি পূষার মণ্ডলে অবস্থিত উদকরাশি প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করেন। সেই দ্যুতিমান্ পূষা তাঁর শোভন স্তুতি শ্রবণ করুন। পুষাকে তাই বৃষ্টির জন্য ভজন করা হ'ত, একথা এই ঋক্‌মন্ত্রে প্রমাণিত হল।

পশুপা পূষার পরিণতি পশুপতি শিবে। তাঁর প্রোজ্জ্বল জটাজাল শিবের শিরোভূষণ হয়ে দেখা দিয়েছে। মৃত্যুর পরপারে আত্মার সাথী মৃত্যুদেবতা মহাকাল রুদ্রে পরিণত হয়েছেন। জ্ঞানবান্ ও ধীমান্ পূষা পরম যোগী ও পরম তপস্বী দেবাদিদেব মহাদেবে পরিণত হয়েছেন। তাঁর দেবত্বের বৈভব মহেশ্বরের মাঝে নবীনতা এবং অচিন্ত্য শক্তি লাভ করেছে।

পূষাকে তাই প্রণতি জানাই। চিন্ময় সত্যের দীপ্ত ছটায় তিনি আমাদিগকে আলোকিত করুন। আমাদের মানব-চেতনা থেকে অবিদ্যার শেষ হোক। দিব্য ও দেব-চেতনায় আমরা যেন উজ্জীবিত হয়ে উঠি। আমাদের হোক পূর্ণ রূপান্তর। ভূমার এষণা হোক আমাদের কাম্য। পূষা আমাদের দিন 'পুষ্টি', দিন বিবর্ধন এবং পুষ্টি, আমরা লোকোত্তর শক্তির উন্মেষে সীমিত জীবনের বহু ঊর্ধ্বে অসীমতার স্পর্শে যেন পরিপূর্ণতা লাভ করি।

পূষা বিষ্ণুর্হবনং মে সরস্বত্যবন্তু সপ্ত সিন্ধবঃ।
আপো বাতঃ পর্বতাসো বনস্পতিঃ শৃণোতু
পৃথিবী হবং॥ ৮।৫৪।৪

মাতরিশ্বা কাণ্বের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও বলি—হে পূষাঃ তুমি, বিষ্ণু সরস্বতী, আমার আহ্বান শোনো—সপ্ত সিন্ধু আমার আহ্বান শুনুন—এই আমার আহ্বান শুনুন জলদেবতা, বায়ু, পর্বত, বনস্পতি এবং পৃথিবী। জীব-চৈতন্য ও বিশ্বচৈতন্যের সমন্বয় বিধান করেন পূষা। তখন আত্মহারা তন্ময়তায় মানুষ লাভ করে এক অপূর্ব ঐক্যবোধ, শাশ্বত শান্তি এবং পরম আনন্দ।

উপলব্ধি

শ্রীসমর রায়

কেন্দ্রীভূত চিন্তারাশি আবর্তিছে কোন্ লক্ষ্য
ঘিরে—
মনের প্রাচীরে?
করিতেছে কার অন্বেষণ?
কে তুমি আমার ধ্যেয়,
অব্যক্ত, অব্যর্থ শরে
চিন্তার গ্লানিমা-ভূত মোহ-পাশ নাশি
আঁকিতেছ সত্যের মহা-দিগ্বলয়?

আমার হৃদয় বুঝি তাই ক্ষণে-ক্ষণে,
আনমনে,
দিশাহারা প্রকৃতির অন্ধকার কোণে—
তোমারে স্মরণ করি গেয়ে উঠে গান—

"আমি তাঁর পেয়েছি সন্ধান!
পৃথ্বীরে যা করিছে আবিল, কানমার তীরে
লোভের তিমিরে—
নিশিদিন শুনি যে ক্রন্দন,
এহ বাহ্য, এ তো সত্য নয়!"

আকাশ-পৃথিবী আর মানুষের হৃদয়-গভীরে
জাগরূক সে মহা-স্পন্দন
রচিতেছে নিত্য-নব যে মন্দির, যে সঙ্গীতালয়,
তুমি সেথা আরাধ্য দেবতা!
এ নিখিল-চরাচর শত ব্যঞ্জনায়
ঘোষিছে সে কথা।

বোধিসূর্য

ব্রহ্মচারী বিদ্যাচৈতন্য

'সদেবস্য লোকস্য হিতায় সুখায় ধর্মং দেশয়িষ্যতি। সংসারপঞ্জর-চারকাবরুদ্ধানাং ক্লেশবন্ধনবদ্ধানাং সত্ত্বানাং বন্ধননির্মোক্ষং করিষ্যতি। অজ্ঞানতমস্তিমিরপটলপর্যবনদ্ধনয়-নানাং প্রজ্ঞাচক্ষুরুৎপাদয়িষ্যতি।' পরমজ্ঞানী মহর্ষি অসিত শাক্যকুলোদ্ভব গৌতমের উদ্দেশে বলিলেন, ভবিষ্যতে দেবলোক ও নরলোকের সুখ ও হিতের জন্য এই কুমার ধর্মোপদেশ দিবেন। তিনি সংসারপিঞ্জরাবদ্ধ ও ক্লেশ-বন্ধনে আবদ্ধ জীবের বন্ধন মোচন করিবেন। এবং অজ্ঞান-অন্ধতা রূপ তিমিরপটলাবৃত-নয়ন লোকদিগের প্রজ্ঞাচক্ষু উৎপাদন করিবেন।

নিজ পুত্রের সম্বন্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণী রাজা শুদ্ধোদনকে বিচলিত করিয়াছিল। তাই পুত্রকে সংসারবন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তিনি কুমারের বিবাহ দিলেন, রাজপ্রাসাদে বাদ্যগীতাদির ব্যবস্থা করিয়া তাহার চিত্ত-বিনোদনের ব্যবস্থা করিলেন এবং জরা ব্যাধি ও ক্লেশ যাহাতে তাহার নয়নগোচর না হয় তজ্জন্য প্রাসাদরক্ষীদের সতর্ক থাকিতে বলিলেন। কিন্তু যিনি জগৎকে নির্বাণের পথ দেখাইবেন, তাঁহার বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য দৈব ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। তাই নগরদর্শনকালে প্রহরীদের সতর্কতাকে উপেক্ষা করিয়া ব্যাধি, বার্ধক্য ও মৃত্যুর কবলে দেহের ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম কুমারের নয়নগোচর হইল। মৃতদেহকে দেখিয়া মৃত্যুর পরিণাম চিন্তনান্তে সিদ্ধার্থ বলিয়া উঠিলেন,

'জ্ঞানী হইয়া যে ব্যক্তি আমোদ-আহ্লাদে রত হয় তাহাকে ধিক্। প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, ভাল করিয়া মুক্তির উপায় চিন্তা করিব। শান্তি কোথায়?' এ মোহজাল ছিন্ন হইল-শ্রমণকে দেখিয়া। মুক্তির নিশানা হাতে পাইলেন তিনি।

সেই দিন গভীর নিশীথে কুমার স্ত্রীপুত্র ও রাজ্যের মায়া ত্যাগ করিয়া প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন এবং অতি প্রত্যুষে অণোমা নদীর তীরে ভার্গব মুনির আশ্রমের সন্নিকটে ছন্দককে বিদায় দিলেন।

অসীমের পথে যাত্রা সুরু হইল।

স্বস্বরূপকে জানার পথকে বেদ বলিয়াছেন—'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া'। সেই কণ্টকাকীর্ণ পথে সিদ্ধার্থ প্রবেশ করিলেন। এই মার্গের যাবতীয় সংবাদ তাঁহার নিকট অজ্ঞাত। অধ্যয়ন, তপস্যা ও উপযুক্ত গুরুর উপদেশ ব্যতীত জ্ঞানলাভ সম্ভব নহে। তাঁহাকে পথের সন্ধান দিতে পারে, এমন কাহাকেও দেখিলেন না। নিকটবর্তী আশ্রমবাসীদের দেখিলেন; তাহারা বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ড, তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনে রত, যাহার ফলে কেহ কেহ স্বর্গাদি লোকে গমন করে। উহাদের তিনি তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়া অরাড় মুনির আশ্রমে গমন করিলেন।

জিজ্ঞাসু কুমারের প্রশ্নের উত্তরে অরাড় মুনি বিবেকজ, বিতর্কবর্জিত, প্রীতিবিবর্জিত ও সুখদুঃখবর্জিত চার প্রকার ধ্যানের কথা উল্লেখ করেন। এই চার প্রকার ধ্যানে সিদ্ধ ব্যক্তি হৃদয়স্থিত আকাশকে ভাবনা করিয়া আকাশ-পরিব্যাপ্ত আত্মাকেই অনন্তরূপে দর্শন করে। আবার কেহ আত্মার দ্বারা আত্মাকে নিবর্তিত

করিয়া 'কিছুই নাই' বা 'শূন্য' দৃষ্টি লাভ করেন। ইহা 'অকিঞ্চনায়তন' ধ্যান নামে প্রসিদ্ধ। এই অবস্থায় পিঞ্জর হইতে পক্ষী যেরূপ নির্গত হয় সেইরূপ দেহ হইতে ক্ষেত্রজ্ঞ নির্গত হইলে উহাই মুক্তি বা নির্বাণ নামে খ্যাত হয়।

অরাড় মুনির সাধনের বিভিন্ন অনুভূতিতে সিদ্ধার্থ আস্থাবান হইলেও ক্ষেত্রজ্ঞরূপী অহংজ্ঞান তাঁহার বর্ণিত নির্বাণে বিদ্যমান থাকায় তিনি উহাকে চরম অনুভূতি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ক্ষেত্রজ্ঞ বা অহংজ্ঞানের সংস্কার বীজস্বরূপ ও প্রসবধর্ম-সম্পন্ন। অন্যান্য কারণসমূহ বর্তমান থাকিলে উহা অঙ্কুরিত হইবার যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়। অতএব উহা নির্গুণ নয়। আত্মার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া অরাড় মুনি যাহাকে শ্রেষ্ঠ অবস্থা বলিয়া মনে করিতেছেন, উহা আসলে সমাধিঅবস্থার নিম্নস্তর। তাই জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিলেও অরাড় মুনি তখনও নির্বাণ লাভ করিতে পারেন নাই।

অরাড় মুনিকে ত্যাগ করিয়া কুমার রুদ্রক মুনির নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাহার অবস্থাও তদনুরূপ। সাধন-মার্গে তিনি অরাড় মুনি অপেক্ষা একস্তর মাত্র ঊর্ধ্বে উঠিয়াছিলেন। উহার নাম নৈবসংজ্ঞা—নাসংজ্ঞায়তন ধ্যান। ঐ অবস্থা সংজ্ঞা বা অসংজ্ঞার অতীত। উহা অকিঞ্চনায়তন ধ্যানকেও অতিক্রম করে ঐ অবস্থায় বুদ্ধি সূক্ষ্ম ও নিষ্ক্রিয় হয় এবং দেহেতেই অবস্থান করে। তজ্জন্য সাধককে পুনরায় দেহ ধারণ করিতে হয়, কারণ বুদ্ধি দেহেতেই নিবদ্ধ থাকে।

রুদ্রক মুনিকে জন্মমৃত্যুনিরোধে অক্ষম দেখিয়া কুমার সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল রুদ্রক মুনির পঞ্চ শিষ্য।

এই সময় সিদ্ধার্থের মনে এক আশ্চর্য ধারণা জন্মে যাহা তাঁহাকে পরবর্তী ছয় বৎসর কাল এক ঘোর সুদুশ্চর তপস্যায় নিয়োজিত রাখিয়াছিল: সাধনাবস্থায় ইন্দ্রিয় ও মনকে যেমন ভোগ্য বস্তুর সহিত সংস্পর্শশূন্য করিয়া রাখা প্রয়োজন, তেমনি শরীরকেও প্রয়োজনীয় খাদ্য না যোগাইয়া ক্ষীণ ও দুর্বল করিয়া ফেলা উচিত। উহা কার্যে পরিণত করিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। নিরঞ্জনা-নদীতীরে কখনও স্বল্পাহার করিয়া কখনও বা উপবাসে দেহের ক্ষুন্নিবৃত্তি সবলে দমন করিয়া তিনি অমানুষিক সাধনায় রত হইলেন। পঞ্চভিক্ষুও তাঁহার সহিত তপস্যায় যোগদান করিল। চোখ দীপ্তিহীন, প্রাণ তেজহীন, দেহ বলহীন হইয়া কঙ্কালসার হইল। এই ভাবে সিদ্ধার্থের জীবনের এক অন্ধকারময় যুগ অতীত হইল। যে সম্বোধি লাভ করার জন্য রুদ্রককে ত্যাগ করিলেন তাহা আয়ত্ত হইল না। বুঝিলেন, ক্লেশকর তপস্যা দেহের ও মনের তেজবীর্যই নষ্ট করিতেছে, ধ্যানের উৎকর্ষ জন্মাইতেছে না। তিনি কৃচ্ছ্রমার্গ ত্যাগ করিলেন ও সাধনপথ পরিবর্তনে যত্নপর হইলেন।

'অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে.

বোধিলাভের জন্য সিদ্ধার্থ হিমালয়সদৃশ এই অচল অটল প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

'নৈবাহং মরণং মন্যে মরণান্তং হি জীবিতম্।
অনিবর্তী ভবিষ্যামি ব্রহ্মচর্যপরায়ণঃ ॥'

মরণান্তই আমার জীবন। তাই আমি মরণ মানি না। আমি ব্রহ্মচর্যব্রতধারী হইয়াই অবস্থিতি করিব। উহা হইতে কদাপি নিবৃত্ত হইব না।

সিদ্ধার্থ জয়ী হইলেন। এক বৈশাখী পূর্ণিমায় তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তেমনি আর এক পূর্ণিমায় শাক্যবংশোদ্ভব কুমার

অন্ধকার হইতে চির আলোকে, অনৃত হইতে সত্যে, মৃত্যু হইতে অনন্ত জীবনে এবং তৃষ্ণা ও বিনাশ হইতে শান্তি ও অমৃতের রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। 'এবং খলু ভিক্ষবো বোধিসত্ত্বো বিদ্যাং সাক্ষাৎ করোতি তমো নিহন্তি স্ম আলোক-মুৎপাদয়তি স্ম।' বোধিদ্রুম-তলে একাসনে বসিয়া তিনি আজ বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

দীর্ঘ অশীতি বর্ষ জীবিত থাকিয়া বুদ্ধ নানা আখ্যায়িকা ও উপমার মাধ্যমে ধর্মের ব্যবহারিক কার্যকারিতা, ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের কর্তব্য ও জগতের অনিত্যতা বিষয়ে সম্যক অবধারণের জন্য উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তত্ত্ববিষয়ে বৃথা বিচার না করিয়া নিজ নিজ চেষ্টায় সাধন-দ্বারা উহার উপলব্ধিই মানুষের পক্ষে শ্রেয়ঃ। কারণ অনুপলব্ধ তত্ত্ব নাস্তিক্যেরই সামিল। উহা কোন প্রয়োজনেই আসে না। তাঁহার দু-চারটি কথার উল্লেখ করিয়া আমরা আলোচনা শেষ করিতেছি :

জীব-জগৎ ও সর্ববস্তুর মূলে এক সত্তা বিদ্যমান। এক মৃত্তিকা যেমন প্রয়োজনোপযোগী ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ পূর্বক নানা কার্যে ব্যবহৃত হয়, তেমনি এক সত্য বিভিন্ন সংস্কারাত্মক মনের দরুণ ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপাদি প্রাপ্ত হয়।

নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভেদজ্ঞান-তিরোহিত, সর্বভূতে সমদর্শী হন। যিনি বিভিন্ন ধর্মমত পরিত্যাগ করিয়া অষ্টম মার্গের আশ্রয় গ্রহণ করেন তিনিই নির্বাণের পথে যথার্থ উন্নীত হন। যিনি সংযমী, সত্যবাদী, পবিত্র, মিতভাষী সরল, কর্মে পটু ও সদাচারী—তিনিই সুখ ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করেন।

মানুষ নানাবিধ কর্মে নিয়োজিত হয়; উহা কখনও স্বার্থ, কখনও পুণ্যার্জন, কখনও পরার্থ ও ক্বচিৎ নিষ্কামভাব দ্বারা সাধিত হয়। চতুর্বিধ কর্ম সুকৃতির পর্যায়ভুক্ত; কিন্তু সবই সমান পুণ্য দান করে না। যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে প্রাণী নিধনপূর্বক নৈবেদ্য অর্পণ বহু মূল্যযুক্ত কিন্তু উহার পুণ্য খুবই সামান্য। সঙ্কীর্ণ মনের জন্য ঈপ্সিত দানের কিয়দংশ ভোগে যে আগ্রহী উহার দ্রব্যমূল্য ও পুণ্য উভয়ই স্বল্প।

যে সর্বভূতের প্রতি মৈত্রীবশতঃ দান করে অথচ জ্ঞান দাক্ষিণ্য মান যশের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, তাহার দান স্বল্পমূল্য হইলেও অধিক পুণ্যময়। যে ব্যক্তি নিষ্কামভাবে, এবং সর্ববস্তুতে ঈশ্বর বর্তমান এই ভাব লইয়া জীবসেবা ও জীবকুলের অভাব-মোচনে ব্রতী হয়, তাহার দানের মূল্য ও পুণ্য সর্বাধিক।

"তোমার বিবেকী মনুষ্যপ্রকৃতি এবং সত্যের মধ্যে তোমার 'আমি'-র কল্পনা ব্যবধান সৃষ্টি করিতেছে; এই কল্পনা দূর কর, তুমি বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পাইবে।"

"সর্বগ্রাসী অহংকার বর্জন করিলে তুমি মনের যে নির্মল প্রশান্ত অবস্থা লাভ করিবে, ঐ অবস্থা তোমাকে সম্পূর্ণ শান্তি, মঙ্গল ও জ্ঞান দিবে।"

— বুদ্ধবাণী

জয়রামবাটী ও স্নেহময়ী জননী

শ্রীমতী মীরা মিত্র

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে অঙ্কে ধারণ করে পশ্চিম বাংলার সেই অখ্যাত গ্রাম জয়রামবাটী আজ কেবলমাত্র সর্বত্র বিখ্যাতই নহে, পরম তীর্থরূপে ভক্তহৃদয়ে বিশেষভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে। কামারপুকুরও তাই। পাশাপাশি এই দুইখানি গ্রামের বৈশিষ্ট্য কেবলমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা শ্রীশ্রীসারদামণির জন্মভূমি ও লীলাস্থান হিসাবেই।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা একটু আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমে জয়রামবাটী প্রসঙ্গে আসা যাক। মায়ের স্থূল দেহ থাকাকালীন জয়রামবাটীর যে চেহারা ছিল, আজ তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তবে, কয়েকটি জলাশয় এবং মায়ের পুরাতন বাড়ী ও নতুন বাড়ী আজও একই ভাবে রয়েছে। আমোদর নদের ছোট খালটি, যাকে মা গঙ্গা বলতেন এবং যেখানে গঙ্গাস্নান করতেন, সেই থেকে "মায়ের গঙ্গা" নামে পরিচিত।

আরামবাগ হয়ে কালীপুরের রাস্তায় জয়রামবাটীতে প্রবেশ করতে মায়ের বাড়ীর মুখেই রাস্তার বাঁ দিকে যে তালপুকুরটি আছে সেটি মায়ের ব্যবহৃত পুষ্করিণী।

মায়ের জন্মস্থানের উপর এখন শ্রীশ্রীমাতৃ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মাতৃমন্দিরের কাছেই (সম্মুখভাগে) তাঁর ব্যবহার করা পুণ্যিপুকুর। পুণ্যিপুকুরের এক পাড়ে গেস্টহাউস। মায়ের নতুন বাড়ীও পুণ্যিপুকুরের পাড়ে অবস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোভাবের পর মা যখন জয়রামবাটীতে অবস্থান করতেন তখন (মায়ের কথিত) গঙ্গাস্নান করতে তাঁকে মেঠো পথে যেতে হত। এখন অবশ্য বড় রাস্তার উপর দিয়েই মায়ের গঙ্গায় যাবার পথ। মায়ের গঙ্গায় ঘাট বাঁধানো হয়েছে। এখানে দাঁড়িয়ে মায়ের বাড়ীর দিকে তাকালে মাঝখানে ধান, আখ ইত্যাদির ক্ষেত চোখে পড়ে।

বহু দূর-দূরান্তর হতে মায়ের ভক্ত সন্তানদের নিত্য সমাগম ঘটে এই জয়রামবাটীতে।

বড় রাস্তা হতে মায়ের বাড়ীতে প্রবেশ-পথের দুই পার্শ্বে মাটির ভিটে, টিনের ঘর, খড়ের চালাঘর ও ধানের মরাই। ডান হাতে মায়ের নতুন বাড়ী ও বাঁ হাতে মায়ের পুরাতন বাড়ী অতিক্রম করে মায়ের আঙ্গিনায় পৌঁছে মন্দিরের কাছে যেতেই মায়ের কথা মনে পড়ে, "এস বাবা এস, পথে কোন কষ্ট হয়নি তো?" ত্রস্ত পদক্ষেপে মন্দিরে পৌঁছেই মায়ের প্রবাসী সন্তানরা মাকে প্রাণভরে দর্শন করতে একেবারে আসন করে বসে যায় মেঝেতে।

শ্বেতপদ্মের ওপর আসন করে বসা। লালপাড় শাড়ী অঙ্গে জড়ানো মায়ের শুভ্র মর্মর-মূর্তিখানি দেখে মন আপনি গেয়ে ওঠে—

"বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি,
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী!
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে॥"

সংসারক্লিষ্ট, দুঃখজর্জরিত সন্তানকে কোলে নিতে মা যেন কোল পেতে বসে আছেন। গিয়ে আর ফিরে আসতে ইচ্ছা হয় না। তবু সংসারের টানে আসতেই হয়। তিনি মহামায়া, সবই তাঁর খেলা। ভুবনমোহিনী মায়ার আবরণে

ঢেকে যিনি সংসারে রেখেছেন, তিনিই আবার সন্তানদের ঘরে ফেরার সময় আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে ঘন ঘন চোখ মুছতেন; দাঁড়িয়ে থাকতেন অনিমেষ-নয়নে যতক্ষণ দেখা যেত তাদের।

ছোট, বড়, গৃহী, সন্ন্যাসী সকলের জন্যই সদর অন্দর দুই দরজাই খোলা। জয়রামবাটীতে মায়ের বাড়ী ঢুকবার কোন গেট বা বিধিনিষেধ নেই। নেই সময়ের ধরাবাঁধা নিয়ম। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত সন্তানকে আশ্রয় দিতে জগজ্জননীর আঙ্গিনা যেন দিনরাত অপেক্ষা করে। অহৈতুকী স্নেহ অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে মা বলতেন, "আমি সতেরও মা অসতেরও মা। পাতানো মা নই, আপন মা।"

কথাপ্রসঙ্গে মা বলতেন, "যখন আমার কোন ভক্তকে মনে পড়ে, আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়, তখন হয় সে নিজে আসে, নয় তাঁর চিঠিপত্র আসে।"

পৌষ মাসের কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে মায়ের জন্মোৎসব হয় জয়রামবাটীতে ও অন্যান্য মঠ মিশনে। মায়ের যে সব সন্তানরা জয়রামবাটীতে উৎসবে একবার যোগদান করেছেন, তাঁরাই শুধু জানেন যে প্রতি বছর ঐ সময় মায়ের কাছটিতে যাবার জন্য প্রাণ কেমন ব্যাকুল হয়। সেই পৌষের কৃষ্ণাসপ্তমীর দিবসটিতে ভক্ত সন্তানের অবুঝ মন যেন আর বাধ মানতে চায় না, হয় সশরীরে, নয় মনে মনে চলে যায় সে পুণ্যস্মৃতি-বহনকারী জয়রামবাটীতে। বিষ্ণুপুর এসে নামলেই জয়রামবাটীর বাসখানি তাঁকে মায়ের বাড়ী অভিমুখে নিয়ে রওনা হয়।

রাস্তায় কোয়ালপাড়ায়, মায়ের বিশ্রামস্থান জগদম্বা আশ্রমের কাছে এলে বাসখানি একটু থেমে যেন বলে দেয় "যান, তাড়াতাড়ি প্রণাম করে আসুন, দেরী করবেন না।"

সন্তানকে একটু আদর করতে মাঝ রাস্তায়-ও মা যেন তাঁর ঝকঝকে-তকতকে কুটিরে অপেক্ষা করছেন। দর্শন সেরে বাসে উঠে আবার এগিয়ে চলে সবে। জয়রামবাটীতে বাস এসে পৌঁছতেই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

সেদিন পৌষ কৃষ্ণাসপ্তমী তিথি। মায়ের মন্দিরে ঢুকতে আশেপাশে কি রয়েছে তা যেন সন্তানদের আর চোখেই পড়েনা। ত্বরিতপদে মন্দিরে উঠেই মায়ের কাছটিতে গিয়ে দাঁড়ায়। গর্ভমন্দিরে সযত্নকৃত কত আয়োজন জগন্মাতার পূজার। নাটমন্দিরে এক পাশে গীতা চণ্ডী পাঠ হচ্ছে। মন্দিরের আঙ্গিনায় কলাগাছ ও মঙ্গলঘট বসানো হয়েছে। ঢাকীরা ঢাক বাজিয়ে চলেছে। অগণিত ভক্ত ছেলেমেয়ে স্নানান্তে শুচিশুভ্র বেশে নাটমন্দিরে বসে মায়ের পূজা দেখছেন। কেউ বা এদিক-ওদিক ঘুরে দেখছেন। একটু এগিয়ে কাছেই পথের দুপাশে ছোট্ট ছোট্ট দোকান বসেছে। খাবার, চা, ছেলেমেয়েদের খেলনা, লক্ষ্মীর পাঁচালি ও নানা ছোটখাট জিনিষ নিয়ে। সমস্ত কিছু মিলে একটি সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। মনে হচ্ছে শারদীয়া পূজার মত।

শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন: ও সারদা, সরস্বতী, জ্ঞানদায়িনী, এবার নিজরূপ ঢেকে এসেছে। বহু ভক্ত শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মে অঞ্জলি দিয়েছেন দশভুজা-জ্ঞানে। আজও তাঁর ভক্ত-সন্তানদের হৃদয়ে শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবীরূপে, জগজ্জননী-রূপে, গর্ভধারিণী জননী-রূপে জলজল করছেন।

আমাদের নিত্য অশান্তিময় সংসারে স্নেহময়ী জননীর শ্রীমুখের একটি বাণী বার বার স্মরণ করে দুরূহ জীবনের পথ যেন সহজ সরল ও শান্তিপূর্ণ করে তুলতে পারি, এই প্রার্থনা জানাই তাঁর শ্রীপাদপদ্মে। তাঁর শেষ কথা স্মরণ করি, "শান্তি যদি চাও মা, দোষ কারও দেখোনা, দোষ দেখবে নিজের।"

সমালোচনা

Swami Brahmananda in pictures (Birth Centenary Souvenir—1863-1963)—Second Edition. Published by Swami Jnanatmananda, manager Udbodhan Office, 1 Udbodhan Lane, Calcutta 3. Pp. 100. Price Rs. 10/—

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সংক্ষিপ্ত মনোজ্ঞ ইংরেজী জীবন-চরিত (প্রখ্যাত মার্কিন সাহিত্যিক মনীষী ক্রষ্টফার ঈশারউড লিখিত) সহ ১২৫টি আলেখ্যের যে সুন্দর চিত্র-পুস্তকটি (Album) গত বৎসর (১৯৬৪) তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা বিশেষভাবে সমাদর লাভ করায় কয়েক মাসের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়; ভক্তগণের আগ্রহাতিশয্যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাতে প্রথম সংস্করণের সমস্ত বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ আছে। আমরা আশা করি, ৮০ পাউণ্ড ইটালিয়ান আর্ট পেপারে মুদ্রিত এই বর্তমান সংস্করণটিও শ্রীশ্রীমহারাজের পুণ্য জীবনের বিভিন্ন অবস্থার আলেখ্যগুলি (পরিচয়-সহ) দ্বারা তাঁহার জীবনানুধ্যানে সহায়ক হইবে।

The Ramakrishna Mela—1965—Organised by Institute of Social Education and Recreation, Ramakrishna Mission Ashrama, Narendrapur, 24-Parganas. Pp. 134 + 25 + 14 + xxxii.

গত কয়েক বৎসর হইতে প্রতি বর্ষে নরেন্দ্রপুর আশ্রমে রামকৃষ্ণ-মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলাটি স্থানীয় ও অনতিদূরবর্তী অঞ্চলের জনসাধারণের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার এবং পরস্পরের প্রতি হৃদ্যতার যোগসূত্র; শিক্ষাক্ষেত্রেও। এই মেলাকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জন-কল্যাণমূলক ভাবধারা প্রচারে যাহা যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তন্মধ্যে পত্রিকা-প্রকাশন অন্যতম। আলোচ্য পত্রিকাখানিকে সর্বাঙ্গসুন্দররূপে প্রকাশ করিবার প্রচেষ্টা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ইংরেজী বাংলা ও হিন্দীতে সুলিখিত ও সুসম্পাদিত প্রবন্ধাবলীতে পরিবেশিত তত্ত্ব ও তথ্যসমূহ সর্বশ্রেণীর পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ। উৎকৃষ্ট কাগজে শোভন মুদ্রণ এবং বহু সুন্দর চিত্রের সন্নিবেশ পত্রিকাটিকে বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন করিয়াছে।

অঞ্জলি (বিশেষ-সংখ্যা)—প্রকাশক: স্বামী সুখদানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সারগাছি মুর্শিদাবাদ। পৃষ্ঠা ১৬০।

সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম হইতে প্রকাশিত 'অঞ্জলি' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাখানি নানা দিক হইতে বিশিষ্টতার দাবি করিতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাপার্ষদ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের পুণ্য জীবন ও বাণী অবলম্বনে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সন্ন্যাসিগণ লিখিত উচ্চস্তরের ইংরেজী ও বাংলা প্রবন্ধাবলী 'জীবনকথা', 'অর্ঘ্য' ও 'স্মৃতি-চয়ন' শিরোনামে সাজানো হইয়াছে। পত্রিকার প্রথমাংশে সন্নিবেশিত 'স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা', স্বামীজীর 'শাশ্বতবাণী' ও 'ভারতের ভবিষ্যৎ' এবং স্বামী অখণ্ডানন্দের 'সেবাব্রত', 'স্বামীজীর পত্র ও প্রেরণা', 'তিনখানি পত্র', 'প্রয়াগ'—নিবন্ধগুলি পাঠকচিত্তকে শুধু আকর্ষণ করিবে না, মুগ্ধ করিয়া এক অপূর্ব ভাবরাজ্যে লইয়া যাইবে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

সাধারণ বিভাগে প্রদত্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যেও বহু জ্ঞাতব্য বিষয় দেওয়া হইয়াছে, বিশেষ করিয়া আশ্রমের ইতিহাস-সংক্রান্ত রচনাটিতে আশ্রমের ক্রমবর্ধমান রূপটি চিত্রিত। ১৬টি চিত্রে সংখ্যাটি অলঙ্কৃত। পত্রিকায় সুসম্পাদনার ছাপ পরিস্ফুট। এই মূল্যবান্ পত্রিকাটি সাদরে সংরক্ষণযোগ্য।

শ্রীশ্রীগুরুগ্রন্থ সাহিবজী (১ম ও ২য় খণ্ড) ও **গউড়ী সুখমনী সাহিব** (বঙ্গাক্ষরে মূল ও সটীক বঙ্গানুবাদ)—অনুবাদক: অধ্যাপক শ্রীহারানচন্দ্র চাকলাদার। প্রকাশক: কবিরাজ শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র চাকলাদার, ভেডিক রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, বেরহামপুর (গঞ্জাম), উড়িষ্যা। পৃষ্ঠা: ১০৯, ২৪৯, ২৩৪; মূল্য: ৩৲, ৪৲, ৫৲।

শিখ-সঙ্ঘের আদি-গ্রন্থ গুরু অর্জুনদেব-কৃত 'গ্রন্থসাহিব' সুপ্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থ। ইহা শিখদিগের গুরুস্থানীয় বলিয়া ইহার পরিচিত নাম 'গুরুগ্রন্থ'; সম্মানের জন্য 'সাহিব' অর্থাৎ 'মাননীয়' শব্দ যোগ করা হয়। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। 'গ্রন্থসাহিব'-এর অনুবাদ বঙ্গসাহিত্যে একটি দুর্লভ সংযোজন। শ্রীবিজয়কৃষ্ণের শিষ্য প্রাচীন ও আধুনিক গুরুমুখী ভাষায় সুপণ্ডিত শ্রীহারান চন্দ্র চাকলাদার এই দুরূহ কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। অনুবাদের সাহায্য ব্যতীত গুরুগ্রন্থে প্রবেশাধিকার দুষ্কর। আলোচ্য পুস্তকগুলির অনুবাদ স্বচ্ছ ও সহজবোধ্য। সুচিন্তিত ব্যাখ্যা ও টীকায় অনুবাদক দেখাইয়াছেন যে, গুরু নানকজী তাঁহার বাণীতে যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভাব বেদ উপনিষদ্ গীতা ও ভাগবতে বিদ্যমান।

প্রথম খণ্ডে 'জপজী', 'রহিরাস' ও 'সোহিলা' প্রকাশিত; প্রারম্ভে গুরু নানকের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত এই খণ্ডের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে 'শ্রীরাগ প্রথমার্ধ' সুমুদ্রিত।

'মন রে অহনিসি হরিগুণ সারি
জিন খিনু পলু নামু ন বীসরৈ তে জন
বিরলে সংসারি ॥ ১ ॥ রহাউ ॥

—হে মন, অহর্নিশি হরিগুণ স্মরণ কর। যে পুরুষ ক্ষণমাত্র বা পলমাত্র কালও হরিনাম বিস্মৃত হয় না, এরূপ পুরুষ সংসারে বিরল।' নিরন্তর ভগবৎস্মরণই কর্তব্য—এই কথা নানাভাবে গ্রন্থগুলিতে লিপিবদ্ধ।

'সুখমনী' গ্রন্থসাহিবের মধ্যস্থ 'রাগ গউরী'র অংশবিশেষ। সুখস্বরূপ অমৃতময় হরিনামের মাহাত্ম্যসূচক বাণীর নাম 'সুখমনী'! হরিনামের মাহাত্ম্য বা সুখমনী সাহিবের পরিশিষ্ট—১৬ পৃষ্ঠার পুস্তিকাখানিও ভক্তগণের বিশেষ সমাদর লাভ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় পত্রিকা (১৯৬৫), দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা: প্রকাশক—স্বামী সারদেশ্বরানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, কামারপুকুর, হুগলি। পৃষ্ঠা ৮৮+২৪।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবস্থল তথা বাল্যলীলা-নিকেতন শ্রীধাম কামারপুকুর আজ সমগ্র পৃথিবীর তীর্থক্ষেত্র। এই পুণ্যস্থানে রামকৃষ্ণ-মিশনের পরিচালনায় যে বহুমুখী বিদ্যালয় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারায় আদর্শ শিক্ষা প্রচারে ব্রতী, তাহারই ছাত্র ও শিক্ষকগণের প্রবন্ধাবলী দ্বারা আলোচ্য পত্রিকাখানি সমৃদ্ধ। ছাত্রদের লেখা কবিতা ও প্রবন্ধগুলিতে সাহিত্য-চর্চার আন্তরিকতা দেখা যায়। ৺প্রমদাদাস মিত্রের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণাষ্টকম্' সংস্কৃত-স্তোত্র পত্রিকাটির অলঙ্কার-স্বরূপ। শিক্ষকবৃন্দের রচনাগুলিতে মননশীলতা পরিস্ফুট। '১৯৬৪ সালে বিদ্যালয়ের বিশেষ ঘটনাপুঞ্জ' শিক্ষায়তনের সহিত পাঠকগণের পরিচয় ঘটাইবে। ইংরেজী বিভাগের লেখাগুলিও প্রশংসার দাবি রাখে। এই বিদ্যালয়-পত্রিকাখানির ক্রমোন্নতি সকলেরই কাম্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

বোম্বাই: রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম খারে (Khar) অবস্থিত। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই কেন্দ্রটি গত ৪০ বৎসর যাবৎ জাতিধর্ম-নির্বিশেষে জনগণের অকুণ্ঠ সেবা করিয়া আসিতেছে। ১৯৬১-৬২ ও ১৯৬৩-৬৪ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্রমের কার্যধারা প্রধানতঃ চার ভাগে বিভক্ত: (১) আধ্যাত্মিক ও সংস্কৃতিমূলক (২) শিক্ষাবিষয়ক, (৩) চিকিৎসা-সম্বন্ধীয়, (৪) জনহিতকর ও সেবামূলক।

আশ্রমে দৈনিক পূজা ও উপাসনাদি অনুষ্ঠিত হয় এবং অবতার ও মহাপুরুষগণের জন্মতিথি ও শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়। আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে নিয়মিত ধর্ম-বিষয়ক বক্তৃতা ও ক্লাসের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। দেশের বিভিন্ন স্থানেও বক্তৃতা দেওয়া হয়। ১৯৬১-৬২ খৃষ্টাব্দে ১৮৫টি ক্লাস ও ২২টি বক্তৃতা এবং ১৯৬২-৬৩ খৃষ্টাব্দে ১২৯টি ক্লাস ও ৫৫টি বক্তৃতা হইয়াছিল।

আশ্রমে কলেজের ছেলেদের জন্য একটি ছাত্রাবাস পরিচালিত হয়। আলোচ্য দুই বর্ষেই ছাত্রাবাসে ১৬ জন করিয়া বিদ্যার্থী ছিল। গ্রন্থাগারে দশ হাজারের উপর পুস্তক আছে, পাঠাগারে শতাধিক পত্র-পত্রিকা লওয়া হয়। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে গ্রন্থগার হইতে যথাক্রমে ৩,৮০৭ ও ৬,১৫০ পুস্তক পড়িতে দেওয়া হইয়াছিল।

দাতব্য চিকিৎসালয়ে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ প্রধানতঃ এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক মতে চিকিৎসা করেন। এলো-প্যাথিক বিভাগে সার্জিক্যাল, প্যাথলজিক্যাল, রেডিওলজিক্যাল প্রভৃতির সুব্যবস্থা আছে। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে দুই লক্ষাধিক রোগী বিনা-ব্যয়ে চিকিৎসা লাভ করে।

দেশের যে-কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমি-কম্প অথবা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুর্ঘটনার সময় এই কেন্দ্রকর্তৃক সেবাকার্য অনুষ্ঠিত হয়। এ পর্যন্ত ২৬টি রিলিফ করা হইয়াছে। সাম্প্রতিক কালের মধ্যে কচ্ছ ও সুরাটে অনুষ্ঠিত সেবাকার্য উল্লেখযোগ্য; এই রিলিফ-কার্যে দশ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হয়।

১৯৬৩-৬৪ খৃষ্টাব্দে স্বামীজীর জন্ম-শত-বার্ষিকী বিভিন্ন অনুষ্ঠান সহকারে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য

গত ৭ই এপ্রিল রামেশ্বরের সন্নিকট 'শ্রীরামকৃষ্ণ-পুরম্' নামে নবনির্মিত কলোনিটির উদ্বোধন অনুষ্ঠান ভাবগম্ভীর পরিবেশে সম্পন্ন হইয়াছে। এই কলোনিতে নির্মিত ৫৭টি কুটীরে বাত্যা-প্রপীড়িত জনগণকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক পরিবারে রান্নার সরঞ্জাম ও পাত্রাদি, বালতি, ধুতি ও শাড়ি, লণ্ঠন, চাল-ডাল-লবণ, আয়না-চিরুনি, শ্রীশ্রীগুরু-মহারাজের প্রতিকৃতি ইত্যাদি দেওয়া হয়। নূতন কলোনিতে যাহাতে জলকষ্ট না হয়, তজ্জন্য তিনটি নলকূপ খনন করা হইয়াছে। উচিপুল্লী ও রামেশ্বরে দুইটি রিলিফ কেন্দ্রে বাত্যাপীড়িত জনগণের সেবাকার্যে মোট ব্যয় হইয়াছে লক্ষাধিক টাকা। শিশুসহ মোট ৮,৬৫৪ জন সেবা লাভ করিয়াছে।

উৎসব-সংবাদ

জামসেদপুর ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব গত ৫ই মার্চ যথাবিহিত পূজা হোম ইত্যাদি দিয়া আরম্ভ করিয়া ২৩শে মার্চ প্রায় ২,০০০ দরিদ্রনারায়ণসেবা সহকারে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ২০শে মার্চ একটি সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়; টিউব কোম্পানির শ্রী এ. কে. দ্বিবেদী এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্বামী চিদাত্মানন্দ, স্বামী মহানন্দ এবং টাটা লৌহ কারখানার আইন-বিভাগীয় কর্মসচিব শ্রী বি. কে. প্রসাদ যথাক্রমে হিন্দী, বাংলা ও ইংরেজীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। সভাপতি সংক্ষিপ্ত ভাষণে সারগর্ভ কথায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধর্ম-সমন্বয় ও সহনশীলতার বাণী-প্রচারের সার্থকতা বুঝাইয়া দেন।

উৎসবের অঙ্গরূপে জামসেদপুরস্থিত মিশনের পাঁচটি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পারিতোষিক-বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। টাটা কোম্পানির এজেণ্ট শ্রী কে. খোসলা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীমতী খোসলা পারিতোষিক বিতরণ করেন।

২২শে মার্চ সকাল পৌনে দশটায় সোসাইটি-প্রাঙ্গণে আরও একটি চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানে স্বামী চিদাত্মানন্দ জামসেদপুর আশ্রমের তিনটি বৃহত্তম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করেন। মিশন-পরিচালিত সিদগোরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ব্যাণ্ডপার্টি সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

২০শে এবং ২১শে সন্ধ্যায় হাওড়া 'মায়ের মন্দিরে'র সভ্যগণ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীগৌরাঙ্গ লীলাগীতি পরিবেশন উৎসবের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান।

জামসেদপুর সরকারী হাসপাতালের রোগী-দিগকে ফল ও মিষ্টান্ন বিতরণ করাও উৎসবের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কাটিহার ঃ গত ২১শে মার্চ হইতে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে পাঁচদিনব্যাপী আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দুইদিন স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ ও স্বামী প্রণবাত্মানন্দ, এবং রামকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর লীলাকীর্তন করেন। তৃতীয় দিনে প্রাকৃতিক দুর্যোগবশতঃ অল্প-সংখ্যক শ্রোতৃমণ্ডলীকে রামকুমারবাবু ভজন-সঙ্গীতে আপ্যায়িত করেন। চতুর্থ দিনে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন এবং স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ছায়াচিত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাল্যজীবন প্রদর্শন করেন। পঞ্চম দিনে বিদ্যামন্দিরের ছাত্রদের বিচিত্রানুষ্ঠান, পুরস্কারবিতরণ ও স্থানীয় গায়কদের সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। গত ২৮শে মার্চ রবিবার নরনারায়ণসেবার আয়োজন করা হয়। উহাতে প্রায় তিন হাজার নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

জলপাইগুড়ি ঃ গত ২৬শে মার্চ হইতে ২৮শে মার্চ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রতিদিন সকালে পূজা-পাঠাদির ব্যবস্থা ছিল। প্রতিদিনই বিকালে গম্ভীরানন্দজীর সভাপতিত্বে ধর্মসভা হয়, সভায় প্রথমদিন স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী পরশিবানন্দ ও স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ। সভান্তে চণ্ডীর গান পরিবেশন করেন শ্রীঅহিভূষণ ঠাকুর। দ্বিতীয়

দিন শ্রীশ্রীমায়ের কথা আলোচনা করেন স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ ও শ্রীহরিপদ গাঙ্গুলী। এইদিনও সভান্তে চণ্ডীর গান হয়। তৃতীয় দিন সভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যজীবন আলোচনা করেন স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ও স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ। এইদিন সভান্তে কীর্তনের আয়োজন ছিল।

উৎসবের একটি আকর্ষণীয় অঙ্গ ছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনালেখ্য-প্রদর্শনী; ২৬শে মার্চ ইহার দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়। শেষ দিন, ২৮শে মার্চ দ্বিপ্রহরে প্রায় দশহাজার লোক বসিয়া প্রসাদ পান।

তমলুকঃ বিগত ২রা এপ্রিল হইতে ৫ই এপ্রিল পর্যন্ত চারিদিন ধরিয়া আশ্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩০তম আবির্ভাব উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উৎসবে ঊষাকীর্তন, শাস্ত্রপাঠ ও শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়।

আশ্রমপ্রাঙ্গণে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে প্রারম্ভিক ভাষণে আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অন্নদানন্দ সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন।

উৎসবের প্রথম দিন স্বামী আদীশ্বরানন্দ, স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ এবং সভাপতি শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দান করেন। দ্বিতীয় দিনে শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী 'অর্জুনের তপস্যা' বর্ণনা করেন। তৃতীয় দিন সকালের আলোচনা-সভায় হ্যামিল্টন স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীকালোবরণ চট্টোপাধ্যায় এবং সন্ধ্যার ধর্ম-সভায় মহকুমাশাসক শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ রায় সভাপতিত্ব করেন। ঐ দিন অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যান্তে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবনদর্শন সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন এবং স্বামী আদীশ্বরানন্দ ও স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

ভজনসঙ্গীত ছিল এই উৎসবের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। 'ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ' এবং 'সুরে কথামৃত' পরিবেশন করেন বিশিষ্ট কথাকার শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী শ্রীপান্নালাল ভট্টাচার্য, শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁহাদের সহযোগিগণ। উৎসবের চতুর্থ দিন সন্ধ্যায় 'সাবিত্রী-সত্যবান' ছায়াচিত্র প্রদর্শনের মধ্য দিয়া উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বেলঘরিয়াঃ গত ৮ই হইতে ১০ই এপ্রিল চারদিন রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী আশ্রমে মহাসমারোহে ও বিপুল আনন্দের মধ্যে শ্রীশ্রীবাসন্তীদুর্গাপূজা সম্পন্ন হয়। বিদ্যার্থী আশ্রমে শ্রীশ্রীবাসন্তীদুর্গোৎসব এই প্রথম। পূজার কয়দিন সমাগত সকলকেই বসাইয়া অন্ন-প্রসাদ দেওয়া হয়। নবমীপূজার দিন আশ্রমে প্রায় দেড়শত জন সাধুসমাগম হইয়াছিল। স্থানীয় দুঃস্থগণের মধ্যে একশত খানি শাড়ি বিতরণ উৎসবের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল।

বক্তৃতা-সফর

গত জানুআরি হইতে মার্চ মাস পর্যন্ত স্বামী প্রণবাত্মানন্দ জলপাইগুড়ি জেলা লাইব্রেরী, রামকৃষ্ণ আশ্রম রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ পার্বতী-সুন্দরী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ইটাহার হাইস্কুল, খামরুয়া, চূড়ামন, চাভোট, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম মালদহ, পাকুয়া, মহেশপুর, চাঁদপুর, নালাগোলা, ময়নাবতী, বামনগোলা হাইস্কুল, পুরাতন মালদহ, একবর্ণা, গোবরজনা, নিমা-সরাই, কালিয়াচক, স্বাহাপুর অনাথাশ্রম, গাজোল, বেহারগ্রাম, বালুরঘাট মহিলা সমিতি, বালুরঘাট কালিবাড়ী, রামকৃষ্ণ আশ্রম তপন, নয়াবাজার, কুশমণ্ডী, হেমতাবাদ, খরবা,

সামসী, গোবিন্দপাড়া, মহদীপুর, রামকৃষ্ণ আশ্রম আরারিয়া, রামকৃষ্ণ আশ্রম পূর্ণিয়া, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম কাটিহার, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম জলপাইগুড়ি ইত্যাদি স্থানে ভারতীয় সংস্কৃতি, শিক্ষাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ, বিশ্বসভ্যতায় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অবদান, হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব, জাতীয় জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও যুগাচার্য বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ৫০টি বক্তৃতা দিয়াছেন, তন্মধ্যে ৪৩টি ছায়াচিত্রের মাধ্যমে দেওয়া হইয়াছে।

বিশিষ্ট আমেরিকান ভক্তের লোকান্তর

আমরা দুঃখিত চিত্তে জানাইতেছি যে, কাউন্টেস্ মাবেল কল্লোরেডো-ম্যানস্‌ফোল্ড (Countess Mabel Colloredo-Mansfold) গত ২৬শে মার্চ, ১৯৬৫ পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে আমৃত্যু তিনি নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের সেক্রেটারি ছিলেন। তিন বৎসর পূর্বে তাঁহার ক্যান্সার অস্ত্রোপচার করার পর সকলেই আশা করিয়াছিলেন তিনি সম্পূর্ণ নিরাময় হইবেন, কিন্তু গত তিন মাস পূর্বে তিনি পুনরায় ঐ রোগে আক্রান্ত হন; এবারে তাঁহার অস্থি এবং মজ্জাও ঐ রোগে আক্রান্ত হয়। বোস্টন-স্থিত তাঁহার পিতৃগৃহে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার অসুস্থ অবস্থায় স্বামী নিখিলানন্দ প্রায়ই তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন এবং মৃত্যুকালেও তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। গত তিন মাস তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের ধ্যানে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। ঐ সময় বোস্টনে গিয়া স্বামী নিখিলানন্দ প্রায়ই, তাঁহাকে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' (The Gospel of Sri Ramakrishna), 'বিবেকচূড়ামণি' ও স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া শুনাইতেন। স্বামী নিখিলানন্দ তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী বোস্টনে তাঁহার শেষকৃত্য পরিচালনা করেন; স্বামী ভাষ্যানন্দ ও স্বামী সর্বগতানন্দ এবং কাউন্টেসের কন্যা ও পুত্রদ্বয় এই সময় উপস্থিত ছিলেন। গত ৪ঠা এপ্রিল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রে তাঁহার স্মৃতিতে প্রার্থনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রার্থনায় তাঁহার বহু অনুরাগী বন্ধু ও কেন্দ্রের বহুসংখ্যক সভ্য যোগদান করেন। তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী দেহভস্ম বেলুড় মঠে মাতৃমন্দিরের সম্মুখস্থ গঙ্গাঘাটে বিসর্জনের জন্য প্রেরিত হয়।

কাউন্টেস্ কল্লোরেডো অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃকুল এবং মাতৃকুল—উভয়েরই আভিজাত্য প্রখ্যাত। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রে আসেন। স্বামী নিখিলানন্দের সহিত বন্ধুবর্গ-সহ তিনি তিনবার ভারতে আসেন এবং শ্রীশ্রীমায়ের ও স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি হিন্দুধর্মকে নিজধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেন; হিন্দুধর্ম গ্রহণ করার পর তাঁহার নাম হয় 'নিষ্ঠা'। হিন্দুধর্মের দেবদেবীর উপর ভক্তি-পরায়ণা এই মহিলা মায়াবতী হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া ভারতের তীর্থগুলি দর্শন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সকল সন্ন্যাসীর উপরই তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার উদারতা, ভদ্রতা ও চরিত্রমাধুর্যে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। তাঁহার শেষ অসুখের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ তারযোগে তাঁহাকে আশীর্বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেহাবসানে নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের একজন অকপট অক্লান্ত কর্মীর অভাব ঘটিল এবং রামকৃষ্ণ মিশন একজন ভক্ত বন্ধু হারাইলেন।

তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা শাশ্বত শান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ঃ পোর্টব্লেয়ার রামকৃষ্ণ কেন্দ্রের আমন্ত্রণে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ও স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ গত ৮ই জানুআরি, ১৯৬৫ আন্দামান গমন করেন। ৮ই হইতে ১৫ই জানুআরি বিভিন্ন দিনে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত সভায় তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাধারা অবলম্বনে ধর্ম- ও সংস্কৃতিমূলক বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাগুলির অধিকাংশই ইংরেজী ও বাংলাতে প্রদত্ত হইয়াছিল। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সর্বত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের চীফ কমিশনার শ্রী বি. এন. মাহেশ্বরীর উদ্যোগে ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় বিভিন্ন স্থানের অনুষ্ঠানগুলি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

নাটশাল ঃ গত ৬ই এপ্রিল নাটশাল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। বিকাল ৪ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী অন্নদানন্দ এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন স্বামী আদীশ্বরানন্দ। সভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও স্বামী অখণ্ডানন্দজীর জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। সভান্তে প্রায় সহস্র ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

বজবজ ঃ বজবজের খড়িবেড়িয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দ আশ্রমের উদ্যোগে গত ২০শে মার্চ হইতে ২৭শে মার্চ পর্যন্ত সাতদিনব্যাপী এক কর্মসূচীর মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে। চণ্ডী, গীতা ও কথামৃত পাঠ, কালী-কীর্তন প্রভৃতির দ্বারা উৎসবের সূচনা হয়। ২১শে মার্চ দ্বিপ্রহরে প্রায় ত্রিসহস্রাধিক নরনারী অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন। ঐদিন বিকালে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ মহারাজ ভাষণ দেন এবং পরে প্রখ্যাত বাউল গীতিকার প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী বাউলগীতি পরিবেশন করেন। ২৩শে মার্চ সন্ধ্যায় সুমতি মুখার্জীর রামায়ণ-গান শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষ মুগ্ধ করে। ২৫শে ও ২৬শে মার্চ যথাক্রমে (আশ্রম-পরিচালিত বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের) ছাত্রীরা শরৎচন্দ্রের "নিষ্কৃতি" এবং ছাত্রেরা "যুগাবতার" নাটক অভিনয় করিয়া সকলের প্রশংসা অর্জন করে। ২৭শে মার্চ রাত্রি আটটায় ডক্টর রমা চৌধুরীর উপস্থিতিতে কলিকাতার "প্রাচ্যবাণী" কর্তৃক শ্রদ্ধেয় যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর রচিত সংস্কৃত নাটক "ভারত-বিবেকম্" অভিনীত হয়।

বেহালা ঃ পর্ণশ্রী পল্লীতে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রের উদ্যোগে গত ২১শে মার্চ হইতে চারিদিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিন কীর্তন সহযোগে পল্লী-পরিক্রমণ, পূজা ও হোম কৃত্যাদির পর মধ্যাহ্নে প্রায় এক হাজার নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে আয়োজিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী জীবানন্দ। দ্বিতীয় দিন সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সৌজন্যে 'সাবিত্রী-সত্যবান' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। শেষ দুইদিন সন্ধ্যায় শ্রীমতী সুমতি মুখার্জি রামায়ণ গান করেন।

বানিয়াখামার (খুলনা) ঃ গত ২৮শে ফাল্গুন শুক্রবার খুলনা শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের উদ্যোগে বানিয়াখামারনিবাসী শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দাস মহাশয়ের বাটীতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৩০তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত

হয়। সকালে মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদি ও ভজন হয়। বাগেরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ব্রহ্মচারী শম্ভুচৈতন্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ করেন।

দুপুরে প্রায় ৪০০ শত ভক্ত বসিয়া প্রসাদ পান। বিকালে শ্রীবিনোদবিহারী সেন শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় আরাত্রিকের পর শ্রীশ্রীরামনামসঙ্কীর্তনে উৎসব শেষ হয়।

জগৎনাথ বসুরায়ের দেহত্যাগ

শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম বিশিষ্ট গৃহী ভক্ত শ্রীজগৎনাথ বসুরায় গত ৬ই বৈশাখ (১৯শে এপ্রিল) সন্ধ্যায় তাঁহার দক্ষিণ কলিকাতা-স্থিত ভবনে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার বয়স ৭৯ হইয়াছিল। ১৯৪২ সনে তিনি চাকুরি-জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তখন তিনি ছিলেন রংপুর (এখন পূর্ব পাকিস্তানে) জিলার দায়রা জজ।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীবসুরায় পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ স্বামী শিবানন্দজীর কৃপা লাভ করেন। সেই সময় হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বেলুড় মঠ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যান্য শাখা-আশ্রমের সহিত তাঁহার যোগাযোগ অক্ষুন্ন ছিল। পূজনীয় স্বামী সুবোধানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'-রচয়িতা শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (মাস্টার মহাশয়) প্রমুখ মহাপুরুষের পুণ্যসঙ্গলাভে ধন্য শ্রীবসুরায় সারা জীবন ধর্মপথে থাকিয়া সংসার-আশ্রমের কর্তব্য পালন করেন।

তাঁহার আত্মা শ্রীগুরু-পাদপদ্মে মিলিত হইয়া চিরশান্তি লাভ করুক।

পরলোকে নরেন্দ্রকিশোর দত্ত

ভক্ত, শিক্ষাব্রতী ও দেশপ্রেমিক নরেন্দ্র-কিশোর দত্ত ৭৫ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। পূর্ব-বঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা তাঁহার জন্মস্থান ছিল। জীবনের প্রথমাবধিই তিনি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ছিলেন এবং দেশসেবায় অনেক দুঃখ-কষ্ট বরণ করেন। ধর্মপ্রাণ ও চিরকুমার নরেন্দ্রবাবু পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ স্বামী শিবানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ।

সংস্কৃত-সাহিত্যপরিষদের বার্ষিকোৎসব

গত ৭ই ডিসেম্বর কলিকাতা সংস্কৃত-সাহিত্যপরিষদের ৪৮তম বার্ষিকোৎসব পরিষদের নিজস্ব ভবনে সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। বিহারের রাজ্যপাল ডঃ শ্রীঅনন্তশয়নম্ আয়েঙ্গার সংস্কৃতভাষায় প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে বর্তমান ভারতে ভাবগত সংহতিসাধন এবং জাতীয়তার উদ্বোধনের জন্য প্রতিটি ভারতীয়ের সংস্কৃতশিক্ষার অপরিহার্যতার কথা বিশ্লেষণ করেন। অধ্যক্ষ ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী পরিষদের বিভিন্নমুখী কর্ম-ধারার কথা বিবৃত করিয়া সম্পাদকীয় ভাষণ দান করেন। রাষ্ট্রশিক্ষামন্ত্রী শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন মিশ্র, জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শেরিফ শ্রীমোহনলাল মুখোপাধ্যায় ভাষণ দান করেন। সভান্তে পরিষৎসদস্যগণ পরিষদের সাংস্কৃতিক সম্পাদক অধ্যাপক ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী রচিত 'বার্তাগৃহম্' (রবীন্দ্রনাথের ডাকঘরের সংস্কৃত রূপ) নামক বহু-অভিনীত বিখ্যাত নাটকটি অভিনয় করিয়া সংলাপের সারল্যে, অভিনয়ের চাতুর্যে এবং রসসৃষ্টিতে সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য সংস্কৃত ভাষায় উদাত্তকণ্ঠে স্বাগত ভাষণ দান করিয়াছেন। পরিষদের গবেষণা-বিভাগ, গ্রন্থাগার, ২০ হাজার পাণ্ডুলিপির বিরাট ভাণ্ডার, নাট্যবিভাগ, গবেষণাপত্র, অধ্যাপনাবিভাগ, গ্রন্থ-প্রকাশন-বিভাগ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। বর্তমানে প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার অন্যতম আন্তর্জাতিক কেন্দ্র বাংলার এই সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ।

দিব্য বাণী

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদিপ্রপঞ্চং যৎ প্রকাশতে।
তদ্‌ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে॥—কৈবল্যোপনিষৎ-১৭

(জাগরণে ফুটে ওঠে অতি স্থূল এ বিশ্বজগৎ,
স্বপ্নে প্রকাশিত হয় সূক্ষ্মতর বিশ্ব মনোময়,
স্বপ্নহীন নিদ্রাকালে জাগে শান্ত আনন্দের ধাম
স্থূল সূক্ষ্ম জগতের কোন কিছু সেথা নাহি রয়।)
জাগরণ স্বপ্ন আর সুষুপ্তির এ তিন জগৎ
প্রকাশিত হয় যেই অবিকার শুদ্ধ চেতনায়
আমি সে চেতনা, ব্রহ্ম,—এই সত্য প্রত্যক্ষ হইলে
সকল বন্ধন হতে চিরতরে মুক্তিলাভ হয়॥

ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ময়ি সর্বং লয়ং যাতি তদ্‌ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্॥ ১৯

আমা হতে লভে জন্ম সব কিছু, সকল ভুবন,
আমি আছি তাই তারা আমাতেই প্রতিষ্ঠিত রয়,
প্রলয়ে আমারই মাঝে পুনরায় মিশে যায় সব ;
এসবের মূল আমি—অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আমি তাই॥

বেদৈরনেকৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্।
ন পুণ্যপাপে মম নাস্তি নাশো ন জন্ম দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিরস্তি॥ ২২

দেহেন্দ্রিয়ে 'আমি'-বোধ নাহি মোর, দেহাতীত আমি ;
নাহি মোর পাপ-পুণ্য, নাহি মোর জনম-মরণ ;
বেদান্তের প্রকাশক আমি, বেদবিদ্ ; সর্ববেদ
ঘোষিতেছে যাঁর কথা—আমি সেই ব্রহ্ম সনাতন॥

কথাপ্রসঙ্গে

ভারতীয় ক্ষাত্রধর্মের আদর্শ

আমাদের জাতির প্রাণ ধর্মে নিহিত। ধর্মকে অবলম্বন করিয়াই আমাদের জাতির জীবনধারা প্রবাহিত। ধর্মকে যখন জীবনে আমরা ঠিকমত রূপায়িত করিতে পারি, তখনই আমাদের জাতি সর্ববিধ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "সকল জাতিরই এক একটি আদর্শ আছে, তাহাই সেই জাতির মেরুদণ্ড-স্বরূপ।...আমাদের মাতৃভূমির জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি ধর্ম—একমাত্র ধর্ম।...ভালই হউক, মন্দই হউক সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতে ধর্মই জীবনের চরমাদর্শরূপে পরিগণিত হইয়াছে। এক্ষণে উহা আমাদের প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছে, জীবনীশক্তিরূপে দাঁড়াইয়াছে। ...এই ধর্মপথের অনুসরণ করাই ভারতের জীবন, ভারতের উন্নতি ও ভারতের কল্যাণের একমাত্র উপায়।" আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি বিভাগ অতি প্রাচীন কাল হইতেই অধ্যাত্ম-জীবনের উন্নতির সহায়ক রূপেই ছন্দোবদ্ধ।

একটি জাতির জীবনধারাকে স্বচ্ছন্দগতি করিবার জন্য বহুবিধ কর্মের প্রয়োজন। প্রাচীন কালে এই কাজগুলি করিবার জন্য গুণ ও কর্মানুযায়ী চারিটি বর্ণ বা মূল বিভাগ সৃষ্ট হইয়াছিল—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। যাঁহারা জাগতিক উন্নতির অপেক্ষা আধ্যাত্মিক উন্নতিকেই জীবনে অধিক মূল্যবান মনে করিতেন, অল্পে সন্তুষ্ট থাকিয়া নিজেদের আধ্যাত্মিক জীবন গঠন ও সমাজে অধ্যাত্মভাব প্রচারই যাঁহাদের জীবনোদ্দেশ্য ছিল, তাঁহারা ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয় দেশশাসক শ্রেণী; শিল্পী ও ব্যবসায়ীগণ বৈশ্য। আর এই তিন শ্রেণীর লোকের দ্বারা নিয়োজিত হইয়া যাঁহারা তাঁহাদের প্রয়োজনীয় কাজগুলি করিয়া দিতেন, তাঁহারা শূদ্র।

এই চারি বর্ণের লোকের কর্তব্য বিভিন্ন। কিন্তু তাহারই মধ্যে নিজ নিজ কর্তব্য নিষ্ঠার সহিত সুসম্পন্ন করিয়া, সমষ্টির প্রয়োজন মিটাইয়াও ব্যষ্টিজীবন যাহাতে আত্মবিকাশের পথে অবাধে অগ্রসর হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ইহাতে ছিল। সেই অনুসারে প্রত্যেক বর্ণের কর্তব্য বা 'ধর্ম' নির্দিষ্ট আছে।

গুণগত ও কর্মগত হইলেও ক্রমে স্বাভাবিক নিয়মে এই বিভাগ বংশগত হইয়া পড়ে। বংশগত হইলেও জাতির প্রাণশক্তি যতদিন সবল ছিল, ততদিন কোন ক্ষতি তাহাতে হইত না। বংশানুক্রমে এইগুলি লোকের মজ্জাগত হইত, নিজ বর্ণানুযায়ী গুণ অর্জন করিয়া নিজ বংশগত কর্তব্যকেই লোকে মনেপ্রাণে মানিয়া লইত। যথাযোগ্য সুযোগ-সুবিধা হইতেও বঞ্চিত হইত না কেহ। সামান্য ব্যতিক্রম কখনো বা হইত – ব্রাহ্মণের মধ্যে ক্ষত্রিয়ের কিম্বা ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণের গুণ কোথাও কোথাও অতি প্রবল হইত। সে ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য সম্পাদনে বা ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণোচিত জীবন যাপনে কোন বাধা থাকিত না। তবে নিজ বংশগত গুণ ও কর্মগত কর্তব্যে তালগোল পাকানো হইত না। মহাভারতে দেখা যায়, কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য ব্রাহ্মণবংশজাত হইয়াও ক্ষত্রিয়ের কর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; সমাজে ক্ষত্রিয়জনোচিত অধিকার ও সম্মান তাঁহারা পাইয়াছিলেন, কিন্তু কখনো ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য সম্পাদনের সময় ব্রাহ্মণের ধর্মকে টানিয়া আনিয়া জটিলতার সৃষ্টি করেন নাই। অহিংসা, ক্ষমা প্রভৃতি ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক ধর্ম; কিন্তু যুদ্ধকালে ইহার বিরোধী কর্ম সৈন্যধ্বংস করিব না—এ কথা তাঁহারা কখনো বলেন নাই, নিখুঁতভাবেই যুদ্ধকালে ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। এমন কি,

ক্ষত্রিয়ের অন্যতম প্রধান গুণ আনুগত্য হইতেও কখনো বিচ্যুত হন নাই। দুর্যোধন অন্যায় যুদ্ধ করিতেছেন ইহা তাঁহারা জানিতেন, যুদ্ধের পূর্বে আলোচনার সময় ইহার তীব্র প্রতিবাদও করিয়াছেন, কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইলে অন্নদাতা দুর্যোধনের জয়ার্থেই যথাসাধ্য নিজ করণীয় কর্ম করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে কোন বাধাসৃষ্টিও হয় নাই; শেষ সময়ে ধ্যানস্থ হইয়া দ্রোণাচার্য দেহত্যাগ করিয়াছেন।

কিন্তু মাঝে মাঝে সমস্যা একটি দেখা দিত। পূর্বে বলা হইয়াছে, শ্রেণীবিভাগ যে ভাবেই হউক না কেন, কর্তব্য যাহাই হউক না কেন, এদেশে উহাকে জীবনের আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়করূপেই লওয়া হইত। ফলে যাঁহারা ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য বরণ করিয়াছেন, অথচ যাঁহাদের ভিতর ব্রাহ্মণোচিত সাত্ত্বিক ভাবেরই প্রাধান্য বিদ্যমান, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কি করা উচিত বা অনুচিত এই লইয়া তাঁহাদের ভিতর একটি সমস্যার সৃষ্টি হইত। ব্রাহ্মণের আদর্শ আর ক্ষত্রিয়ের আদর্শ সমপরিমাণ ঔচিত্যের দাবী লইয়া পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইত। অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইত তখনই।

কয়েক শতাব্দী ধরিয়া আমাদের আধ্যাত্মিক-জীবনের অবনতির ফলে যখন সর্ববিষয়েই অবনতি আসিয়াছিল, তখন এই বর্ণবিভাগও গুণ-কর্ম-নিরপেক্ষ হইয়া সম্পূর্ণরূপে বংশগতই হইয়া পড়ে। যেমন, বর্ণোচিত গুণ না থাকা সত্ত্বেও, বর্ণোচিত কর্ম না করা এবং ব্যবসায়াদি অন্য-বর্ণোচিত কর্ম করা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণবংশজাতগণ বর্ণোচিত সুবিধা ও সম্মান সমাজ হইতে সবই পাইতে থাকেন; আবার গুণ ও কর্মের দিক দিয়া তাঁহাদের সমকক্ষ বা যোগ্যতর ব্যক্তিরা অন্য-বংশজাত বলিয়াই প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা হইতে ক্রমেই বঞ্চিত হইতে থাকেন। বর্তমানে আমাদের কর্ম ও সঙ্গে এই বংশগত বর্ণবিভাগের খুব বেশি সম্পর্ক নাই সত্য, কিন্তু নাম থাক আর নাই থাক, গুণ ও কর্মানুসারে শ্রেণীবিভাগ কোন না কোন আকারে শুধু এখানে নয়, জগতের সর্বত্রই এখনো আছে, এবং পরে থাকিবেও। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "জাতিবিভাগ স্বাভাবিক নিয়ম।" "লোকে আপনাদের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগ করিবেই; ইহা অতিক্রম করিবার উপায় নাই।" "কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে অধিকার-তারতম্যগুলিও থাকিবে; এগুলিকে সমূলে বিনাশ করিতে হইবে।" বর্তমান জগতে অন্যতম মানব-কল্যাণকর শুভপ্রচেষ্টা এই অধিকার-তারতম্যগুলিরই সমূল বিনাশ সাধন, গুণ-কর্মগত শ্রেণীবিভাগের নয়। শ্রেণীবিভাগের একটি কাঠামো ভাঙ্গিয়া দিলে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আর একটি কাঠামো তাহার স্থান অধিকার করিবেই।

শ্রেণীবিভাগ স্বাভাবিক নিয়ম বলিয়া স্বদেশের সংস্কৃতিসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতা বা দেশশাসকদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের আদর্শগত এই অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রাচীনকালের মত বর্তমানকালেও কোন কোন ক্ষেত্রে সমস্যাকারে প্রকট। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের জীবনে প্রকট হইলে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সাধারণের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িয়া সেখানে আদর্শসম্বন্ধে একটি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিবে, ইহাই স্বাভাবিক। কারণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যেরূপ আচরণ করেন, সাধারণ লোকে, অনেক ক্ষেত্রে চোখ বুজিয়াই, তাহাই অনুসরণ করিয়া থাকে। ইহার ফল অতি ভয়াবহ হইতে পারে—সমাধান যথাযথ না হইলে, ধর্ম অযথাবৎ প্রযুক্ত হইলে অধর্মকে ধর্ম জ্ঞান করিয়া, দুর্বলতাকেই মনুষ্যত্ব

ভাবিয়া সমগ্র জাতি হীনবল, নির্জীব হইয়া যাইতে পারে।

তাই, ভারতের আপামর সাধারণের কাছে, রাজপ্রাসাদ হইতে শুরু করিয়া দীনের কুটির পর্যন্ত সর্বত্রই যাহা ভারতীয় সংস্কৃতি রূপ অমৃত পরিবেশন করিয়া আসিতেছে, সেই মহাভারতে ইহার বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাই। যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে শুরু করিয়া যুদ্ধারম্ভের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত পাণ্ডবজীবনে এই সমস্যাটি অতি প্রবলাকার ধারণ করিয়াছিল, আর তাহার নিঃসংশয় সমাধানও করিয়া দিয়াছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। পাণ্ডবজননী কুন্তীদেবীর দৃষ্টিও ছিল এ বিষয়ে স্বচ্ছ। তিনি বীর রমণী বিদুলার উপাখ্যানের মাধ্যমে আদর্শের সন্দেহদোলায় দোলায়মান যুধিষ্ঠিরকে যেসব কথা বলিয়াছিলেন, অনুরূপ সন্দেহের নিরসনে বর্তমান সময়েও সে কথাগুলি সমভাবে শক্তিশালী। কথাগুলি অতি স্পষ্ট; রাজশক্তির পক্ষে কোনটি ধর্ম, কোনটি অধর্ম, সেবিষয়ে কোথাও কোন দ্বিধা, কোন জটিলতা নাই। কথাগুলি তাই বহু-প্রচলিত হইলেও এখানে পুনরুদ্ধৃত হইল।

রাজশক্তি যেখানে শক্তিমান ও সাহসী, সেই-সঙ্গে হৃদয়হীন ও বিবেকবর্জিত, সেখানে অবশ্য এ জাতীয় কোন সমস্যা উঠে না। ক্ষাত্রশক্তি যেখানে আধ্যাত্মিকতায় উন্নত, হৃদয়বান ও বিবেকী, অথচ অমিত শক্তিশালী ও সাহসী—সেখানে কখনো কখনো এ সমস্যার উদ্ভব হয়। ব্রহ্মতেজ ও ক্ষাত্রবীর্যের সমন্বয় যেখানে সর্বাঙ্গ-সুন্দর, সেখানেও এ সমস্যার স্থান নাই। যেমন ছিল না ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের জীবনে; এই সমন্বয়ের মূর্তিমান আদর্শ হইয়াই, আদর্শ-স্থাপনের জন্যই তাঁহারা আসিয়াছিলেন। সমস্যা জাগে সেখানে, যেখানে অমিত ব্রহ্মতেজ ক্ষাত্রবীর্যের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারে না। পাণ্ডবদের মধ্যেও যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের ভিতর তাই ইহা সর্বাধিক প্রকট।

সমস্যা ও তাহার সমাধানের পটভূমিটিও অতি জটিল একটি পরিস্থিতি। বনবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়া পাণ্ডবগণ দুর্যোধনের কাছে নিজেদের ন্যায়তঃ প্রাপ্য রাজ্য ফিরিয়া চাহিলেন, কিন্তু পাইলেন না। শান্তিতে মিটাইবার সব চেষ্টা যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত, যুধিষ্ঠির তখনো আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে চাহিলেন। অবশ্য শান্তির জন্য কথাবার্তা চালাইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দ্রুপদরাজের পরামর্শে ও শ্রীকৃষ্ণের সমর্থনে বলসংগ্রহেও মনোনিবেশ করিয়াছিলেন; কারণ বলহীনের শান্তির প্রস্তাবকে সদিচ্ছাপ্রসূত হইলেও শত্রুপক্ষ দুর্বলতা বলিয়া মনে করিতে পারে। তাছাড়া আলোচনার পরিণামও অনিশ্চিত।

শ্রীকৃষ্ণ শান্তির এই প্রস্তাব লইয়া দুর্যোধনের সভায় গেলেন, কিন্তু দুর্যোধন কোন কথা শুনিলেন না। ফিরিবার পথে শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীদেবীর সঙ্গে দেখা করিয়া সব বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিলেন, "এই পরিস্থিতিতে আপনার পুত্রদের নিকট আপনার যদি কিছু বক্তব্য থাকে তো বলুন, আমি ফিরিয়া গিয়া জানাইব।"

কুন্তীদেবী সেই সময় বলিয়াছিলেন, "যুধিষ্ঠিরকে আমার নাম করিয়া বলিবে, 'তুমি যদি হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা না কর, তাহা হইলে তোমার পক্ষে সেটি অধর্ম হইবে। ব্রাহ্মণদের মত সব সময় শাস্ত্র পাঠ করিয়া তোমার বুদ্ধি গুলাইয়া গিয়াছে। ধর্ম সম্বন্ধে তোমার যাহা ধারণা হইয়াছে, তাহা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নহে। রাজাকে প্রজাপালনের জন্য নিষ্ঠুর কাজ করিতে হইলেও সেইটিই তাহার ধর্ম। ধার্মিক রাজা সর্বত্র সমীচীনভাবে দণ্ডবিধান করিলে তবেই দেশের কল্যাণ হয়, সত্যযুগ

ফিরিয়া আসে। তুমি যাহাকে ধর্ম বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা রাজর্ষিদের ধর্ম নহে। দুর্বল অহিংসা-পরায়ণ রাজা কখনও প্রজাপালন করিতে পারে না। যে বুদ্ধিদ্বারা তুমি এখন পরিচালিত হইতেছ, এ বুদ্ধি তোমার হউক— এ আশীর্বাদ আমি বা তোমার পিতা কখনও তোমাকে করি নাই; তপঃপরায়ণ হও, যজ্ঞ-দানাদি কর, এ আশীর্বাদ আমরা করিয়াছি; আবার সেই সঙ্গেই সর্বদা বলিয়াছি, বীর হও, বলবান হও, তেজস্বী হও।'

আর, বিদুলার এই উপাখ্যানটি যুধিষ্ঠিরকে শুনাইবে:

বিদুলা ছিলেন জিতেন্দ্রিয়া, শাস্ত্রজ্ঞা, ক্ষাত্রধর্মে নিষ্ঠাবতী রাজমহিষী। তাঁহার পুত্র সিন্ধুরাজের কাছে পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া অবসন্নহৃদয়ে শুইয়া পড়িয়াছেন শুনিয়া পুত্রের নিকটে আসিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'কাপুরুষ কোথাকার, আমার গর্ভে জন্মিয়াও বংশের মান রাখিতে পারিলে না! লজ্জা নাই তোমার—সিন্ধুরাজ তোমার রাজ্য কাড়িয়া লইল, আর তুমি নপুংসকের মত ভয়ে পলাইয়া আসিয়া শয্যাগ্রহণ করিয়াছ! নিজের শক্তিতে, নিজের পায়ের উপর ভর করিয়া যে দাঁড়াইতে পারে না, সে কি ক্ষত্রিয় নামের যোগ্য? ক্ষত্রিয় কেন, সে মানুষ নামেরও যোগ্য নয়; মানুষের সংখ্যা বাড়ানো ছাড়া মানুষের আর কোন গুণই তাহার মধ্যে নাই! তোমার মত নিরুৎসাহ, নির্বীর্য পুত্র আর কোন ক্ষত্রিয় রমণীকে যেন প্রসব করিতে না হয়।

সাহসী হও। নিজেকে দুর্বল মনে করিও না কখনো। উৎসাহী হও। এভাবে পরাজয় বরণ করিয়া লইয়া আজীবন অপমান ও দুঃখের বোঝা বহন করিয়া বাঁচিয়া থাকিয়া কি লাভ? বাঁচিতে হয় তো মানুষের মত বাঁচিয়া থাক। তেজবীর্যের লেলিহান শিখা বিস্তার করিয়া জ্বলিয়া উঠ। প্রচণ্ড বিক্রমে শত্রুকে আক্রমণ কর। হয় বিজয়ী হইয়া ফিরিয়া এস, আর না হয় বীরের মত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ কর। তুষাগ্নির মত দীর্ঘকাল ধরিয়া ধূমায়িত হওয়া অপেক্ষা ক্ষণকালের জন্যও দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠা ঢের ভাল—দীর্ঘকাল কাপুরুষের জীবন যাপন করা অপেক্ষা স্বল্পকালের জন্যও বীর হওয়া ভাল; বীরের মত যুদ্ধ করিয়া তুমি যদি মরিয়াও যাও, তাহাতে আমি বেশী খুশী হইব।'

সঞ্জয় বলিয়াছিলেন, 'মা একি বলিতেছ? আমি মরিয়া গেলে বাঁচিয়া থাকিয়া কি আনন্দ পাইবে তুমি?'

বিদুলা বলিয়াছিলেন, 'তুমি ক্লেশের ভয়ে ক্লীবের মত যুদ্ধ এড়াইয়া যাইতে চাহিতেছ; ইহাকে আমি তোমার মৃত্যুতুল্য গণ্য করি। হংসী যেমন এক সরোবর হইতে অন্য সরোবরে গমন করে, আমিও তেমনি এক রাজকুল হইতে অন্য রাজকুলে আসিয়াছি, রাজমাতাও হইয়াছি। তুমি যদি এখন কাপুরুষের জীবন পছন্দ কর, যুদ্ধ করিয়া হৃতরাজ্য উদ্ধার করিতে না পার, তাহা হইলে আমাকেও দীনহীনার ন্যায় বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। আমার পক্ষে সেটিও মরণেরই সমান। আমরা লোকের আশ্রয় স্বরূপ—কখনো কোন প্রার্থীকে আমরা 'না' বলি নাই। আমাকেই যদি এখন অপরের মুখাপেক্ষী হইয়া জীবিকার্জন করিতে হয়, তাহা অপেক্ষা আমার মরণই ভাল।

যুদ্ধ করিতে ভয় পাইতেছ কেন? যুদ্ধে তোমায় জয় হইবে না—একথাই বা পূর্বে সিদ্ধান্ত করিতেছ কেন? সিন্ধুরাজ তো আর অমর নহেন! তুমি যদি প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া অসীম সাহস লইয়া যুদ্ধ করিতে পার, তাহা হইলে তিনি পরাজিত হইবেন।

বাবা, ক্ষত্রিয়কুলে যে জন্মিয়াছে, তাহার যদি ধর্মজ্ঞান থাকে, সে কখনো ভয়ে বা অন্নের আশায় কাহারো নিকট নতি স্বীকার করে না। সে মরিয়া যায় তবু নত হয় না। যথার্থ ক্ষত্রিয় নত থাকে একমাত্র ঈশ্বরের কাছে, আর ব্রাহ্মণের কাছে।'

সঞ্জয় বলিলেন, 'মা তোমার হৃদয় লৌহময় নাকি? সন্তানের জন্য কোন ভালবাসা নাই সেখানে? যেভাবে আমাকে জোর করিয়া যুদ্ধে পাঠাইতে চাহিতেছ, তাহাতে মনে হইতেছে তুমি আমার মা নও, পরমাতা; আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্কই নাই যেন! মা, আমি তোমার একমাত্র পুত্র; আমি যুদ্ধে মরিয়া গেলে রাজ্য ফিরিয়া পাইয়াই বা কি সুখে থাকিবে তুমি?'

বিদুলা বলিয়াছিলেন, 'বাবা, তুমি যাহাতে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন করিতে পার, সেইজন্যই এসব কথা বলিতেছি। যদি তুমি তোমার কর্তব্যে অবহেলা কর, তোমার পক্ষে সেটি অতি গর্হিত কর্ম হইবে। আমি তোমার মা হইয়া এখন যদি সদুপদেশ দিতে না পারি, তাহা হইলে আমার পুত্রস্নেহে আর নিজ শাবকের প্রতি গর্দভীর স্নেহে কোন পার্থক্য থাকিবে কি? যে সব জননীরা পুত্রকে অশিক্ষিত, কুশিক্ষাপ্রাপ্ত বা দুর্বুদ্ধি দেখিয়াও আনন্দে থাকেন—তাহাদের মানুষ করিয়া তুলিতে চান না—তাঁহাদের সন্তানের জন্মদানই বৃথা। হৃদয়ের দুর্বলতা কাটাইয়া তুমি যদি আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পার, সজ্জনের মত আচরণ করিতে পার, তাহা হইলেই তুমি আমার প্রিয় হইবে। যুদ্ধ, দুর্জনদমন ও প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। রাজা সহায়-সম্পন্ন হউন বা না হউন, লোকনিয়ন্ত্রণ ও পাপাত্মার দণ্ডবিধান করিয়া তাঁহাকে কালযাপন করিতে হইবে। তুমি ভীত হইলেও ভীতের ন্যায় ব্যবহার কখনো করিও না; রাজাকে ভীত দেখিলে অমাত্য, বল প্রভৃতিও ভীত হন, প্রজাগণের একতাবন্ধন নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন। তোমার তেজবৃদ্ধির জন্যই এত সব কথা আমি বলিলাম।'

বিদুলার কথায় সঞ্জয়ের হৃদয়ের দুর্বলতা কাটিয়া গিয়াছিল। সিন্ধুরাজকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তিনি হৃতরাজ্য পুনরায় উদ্ধার করিয়াছিলেন।"

কুন্তীদেবী বিদুলার উপাখ্যানের মাধ্যমে যুধিষ্ঠিরের প্রতি নিজ বক্তব্য এভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ভারতের গৌরব এই ধর্মপ্রাণা তেজস্বিনী ক্ষত্রিয়জননীর বিদ্যুদ্গর্ভ বাক্যগুলি আমাদের হৃদয়ের দুর্বলতাকে চির-অপসারিত করুক—ক্ষাত্রবীর্য ও ব্রহ্মতেজের সমন্বয় সাধন করিয়া আমরা যাহাতে দুর্জনের, অন্যায়কারীর নিকট উদ্যতবজ্র কালান্তকের মত, এবং শান্তিকামীর নিকট প্রেমার্দ্রহৃদয় দেবদূতের মত হইতে পারি। অন্যায়ের প্রতিরোধকল্পে আমাদের শক্তিমান হইতেই হইবে। শক্তিহীনতা ধর্ম নয়; শক্তির অভাব তামসিকতার লক্ষণ। ইহা সর্ববিষয়েই মানুষকে মৃত্যুর পথে লইয়া যায়। সাত্ত্বিক ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শক্তিও বাড়িয়া চলে, তবে সংযত থাকে। সাত্ত্বিকভাবের চরম অবস্থায় বিপুল শক্তির আধার হওয়া সত্ত্বেও মানুষ উহার পূর্ণ সংযমেও সক্ষম হয়; মানুষ যথার্থ অহিংসা-পরায়ণ হয় তখনই। কিন্তু সে কয়জন? সেই অল্প কয়েকজনের ধর্ম অনুসরণ করিতে যাইয়া কোটি কোটি সাধারণ মানুষের যেন সর্বনাশ সাধিত না হয়। একজনের ধর্ম অপরের ঘাড়ে চাপাইয়া তালগোল পাকাইলে অনধিকারীর ক্ষেত্রে ইহা হিতে বিপরীতই

করে, সাত্ত্বিকতার পরিবর্তে মহা তামসিকতা আনে, মানুষকে মেরুদণ্ডহীন করিয়া তোলে। ধর্মও হয় না, জাগতিক উন্নতিও হয় না—'মানুষ' হওয়াই হয় না। গুণ ও কর্ম অনুসারে বিবৃত ভারতীয় সংস্কৃতির, ভারতীয় আদর্শের অনুসরণ আমাদের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় বিষয়েই ক্রমোন্নত করিবে; তাহারই জন্য অধিকারবাদ, তাহারই জন্য শ্রেণীবিভাগ। ভারতের ভাগ্যবিধাতা, ভারতের 'চির-সারথি' পার্থসারথি যেন সমন্বিত ব্রহ্মতেজ ও ক্ষাত্রবীর্যের বিপুল বিকাশে আমাদের ক্ষাত্রশক্তিকে আদর্শের শীর্ষদেশে উন্নীত করেন; ক্রমাগত ধূমায়িত না হইয়া তেজবীর্যের লেলিহান শিখা বিস্তার করিয়া ভারত যেন আবার শ্রীরামচন্দ্র-মহাবীরের ভারতের মত, কৃষ্ণার্জুনের ভারতের মত সংযত-জীবনবেদীতলে দেদীপ্যমান হইয়া উঠে, অন্তর ও বহিরাগত সর্ববিধ অন্যায়কে ভস্মাবশেষ করে।

তবে একথা নিশ্চিত, জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী জাতি হইলেও কাহারো অকল্যাণ ভারত কখনো করিবে না। আর এরূপ শক্তিমান হইতে পারিলে তখনই আমাদের সদিচ্ছাপ্রসূত মানবজাতির পক্ষে কল্যাণকর ভাবগুলি জগতে কার্যকরী হইবে, বিশ্ববাসী উহা সশ্রদ্ধভাবে গ্রহণ করিবে। বিশ্বের যথার্থ কল্যাণ তখনই আমরা করিতে পারিব। তাহার পূর্বে উহা দুর্বলের প্রলাপ বলিয়া বিবেচিত হওয়াও খুব বিচিত্র নয়।

"অহিংসা ঠিক, 'নির্বৈর' বড় কথা; কথা তো বেশ, তবে শাস্ত্র বলছেন—তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও, তাহলে তুমি পাপ করবে।…এ সত্য কথা, এটি ভোলবার কথা নয়।"

"অন্যায় করো না, অত্যাচার করো না। যথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ, গৃহস্থের পক্ষে; তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী তুরীয়ানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ — মঠ, ২ জুলাই, ১৮৯৭

প্রিয়তম গঙ্গাধর,

অনেক দিন হল তোমাকে কোন পত্রাদি লিখিতে পারি নাই। তুমি এখন কেমন আছ? মুখের ক্ষত বেশ সেরে গেছে তো? শরীরের একটু যত্ন নেবে। তুমি যে কাজ করছ, মন যে ভাল থাকবে বলা বাহুল্য। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ আর কতদিন থাকিবে মনে করিতেছ? টাকার জন্য ভাবিবে না। যাঁহার কাজ তিনিই সব সঙ্কুলান করিয়া দিবেন। মাদ্রাজ হইতে শীঘ্র একটা মনিঅর্ডার আসিবার কথা আছে। গুডউইন কাল ২০৲ পাঠাইয়াছে এবং আরও দু-এক শত টাকা চাঁদা আদায় করিয়া পাঠাইবে লিখিয়াছে। চারুবাবুও (মহাবোধি সোসাইটী) বিশেষ মনোযোগী আছেন। এইরূপে কাজ আপনিই চলিয়া যাইবে; শশীও মাদ্রাজে ব্রহ্মবাদী ও প্রবুদ্ধ ভারতে লিখিয়া সাধারণের এবিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। তুমি শশীর নিকট হইতে পত্র পাইয়া থাক বোধ হয়। মধ্যে তুমি ভুলিয়া শশীকে মঠের ঠিকানায় এক পত্র লিখিয়াছিলে, আমি তাহা মাদ্রাজের ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়াছি। আজ শুকুল মহাশয় মঠ হইতে শশীর নিকট মাদ্রাজে যাত্রা করিয়া কলিকাতায় দু-এক দিন থাকিবেন। রামের সহিত কটক পুরী দর্শন করিয়া রেলযোগে মাদ্রাজ যাইবেন। শশী সেখানে অতি উত্তম আছে, খুব স্বাধীন, মাসে একশত টাকা করিয়া রামনাদের রাজা শ্রীগুরুদেবের সেবার জন্য খরচ দিতেছে, কোন কষ্ট নাই। শশী প্রাতে ও সায়ং রামায়ণ ও গীতা পাঠ করিতেছে। ইংরেজীর চর্চাও করিতেছে, শীঘ্রই series of lectures দিবে লিখিয়াছে। কালী ও শরৎ বেশ ভাল আছে, তুমি কি তাদের কাছ থেকে পত্রাদি পাইয়াছ? আমি তাহাদিগকে তোমার কথা খুব লিখিয়াছিলাম। স্বামীজী আলমোড়া হইতে তোমার খুব সুখ্যাতি করিয়া আমাদিগকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি গুরুদেবের কৃপায় এখন বেশ সুস্থ ও সবল হইয়াছেন এবং শীঘ্রই ভারতভ্রমণের জন্য যাত্রার সঙ্কল্প করিবেন লিখিয়াছেন। রাজা বেশ আরোগ্য হইয়াছেন, কলিকাতায় বায়ুপরিবর্তনে গিয়াছেন। যোগেন ও সারদা কলিকাতায় ভাল আছে। স্বামীজী কলিকাতায় যে সভা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার কার্য বেশ চলিতেছে। আমাকে ইহার দুইটি অধিবেশনে যাইতে হইয়াছিল। সভার কার্যকলাপ ও উৎসাহ দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলাম।......আমার ভালবাসা জানিবে। ইতি—

তোমারই শ্রীহরি

পুনঃ

নিত্যানন্দ ও সুরেশ্বরানন্দকে আমার ভালবাসা ও নমস্কার দিবে, তাহারা কেমন আছে লিখিবে।

সনাতন ধর্মে মূর্তিপূজার স্থান*

স্বামী আদিনাথানন্দ

যে সত্যদ্বারা জড়জগৎ, মন-প্রাণ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়, সনাতন ধর্ম বলিতে সেই সত্য-গুলিই বুঝায়। সত্যদ্রষ্টাদের, ঋষিদের জ্ঞানদীপ্ত চেতনায় এই সত্য উদ্ভাসিত হইয়াছিল। ধর্ম-সাধনার ইতিহাসে যুগে যুগে অসংখ্য সাধু, ধর্মনেতা ও অবতারগণের উপলব্ধিতে উহা সমর্থিত হইয়া আসিতেছে।

এই সত্য বা নিয়মগুলিই ধর্ম-বিজ্ঞানের বিষয়-বস্তু। মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারের এই গুরুত্ব-পূর্ণ বিভাগটির কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ মীমাংসা হইল :

প্রথমতঃ সনাতন ধর্ম বলেন, জগতে আমরা প্রাণের যে বিভিন্ন বিকাশ এবং জড়ের যে বহুবিধ রূপ দেখিতে পাই, সেগুলির মূলে রহিয়াছে একটি মাত্র সত্তা—সচ্চিদানন্দ বা ব্রহ্ম; এই সত্তা হইতেই সব কিছু বিকশিত হইয়াছে, চরমে সব কিছুই এই সত্তায় বিলীন হইবে। এই সর্বব্যাপক দিব্যানুভূতির দৃঢ়ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াই প্রাচীন ঋষিরা মানবসমাজে ঘোষণা করিয়াছেন—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
অদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

দ্বিতীয়তঃ, সত্যদ্রষ্টারা মানব-ব্যক্তিত্বকে জড়কণার সমষ্টি হইতে উদ্ভূত বা শরীরবিজ্ঞানের নিয়মানুগ বা মস্তিষ্কক্রিয়া-প্রসূত বলিয়া মনে করেন নাই; আসল মানুষ দেহাতিরিক্ত এবং স্বরূপতঃ সে চরম সত্তার সহিত এক—এই কথাই তাঁহারা শিখাইয়াছেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত হইল, মানুষ রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রাণীমাত্র নহে, সমৃদ্ধি-উৎপাদক, যোদ্ধা বা কৃষ্টির ধারক মাত্র নহে—তাহার জীবনের অন্য একটি উদ্দেশ্য রহিয়াছে; আধ্যাত্মিকতার পথে স্বরূপ-উপলব্ধি দ্বারা জড়ের সর্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়াই তাহার জীবনোদ্দেশ্য। জীবন ও ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি সম্বন্ধে এই প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিতে না পারিলে জীবন নিরর্থক। কাজেই দেবত্বের পর্যায়ে উন্নীত হইবার এবং আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার উচ্চভূমিতে জীবনযাপন করিবার অনুশাসনই হইল সনাতন ধর্ম।

তৃতীয়তঃ, ঋষিরা বলেন এই বিশ্বের পশ্চাতে যে চরম সত্য রহিয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে স্বজ্ঞার বিকাশ ও পরিপুষ্টিসাধন প্রয়োজন—স্বজ্ঞা বুদ্ধিবৃত্তির উচ্চতর একটি অবস্থা। যাঁহারা দেহ-মন-সীমায়িত 'আমি'-বোধের, স্বার্থ-বোধের উর্ধ্বে উঠিয়া মানসিক সাম্য ও স্থৈর্যের অধিকারী হন, তাঁহাদের হৃদয় আবরণ-মুক্ত হইয়া স্থৈর্যের আলোকে উদ্ভাসিত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলিতেছেন যে এই অনুপম অবস্থালাভের অন্যতম পথ ভক্তিমার্গ—

'তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

উপনিষদেও বিভিন্ন প্রকার উপাসনা ও আরাধনার পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে। এইগুলির উদ্দেশ্য হইল আমাদের অন্তরের বাধা অপসারণ-পূর্বক জীবন ও মানবজাতি সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তারসাধন করিয়া আমাদিগকে অনুভূতির উচ্চভূমিতে লইয়া যাওয়া, যাহাতে আমরা বিশ্বের মূলগত দিব্যজ্ঞান ও আনন্দ

* মূল ইংরেজী হইতে অনূদিত।

প্রকাশের উপযুক্ত আধার হইয়া উঠিতে পারি, এবং পরিশেষে উহার সহিত মিশিয়া এক হইয়া যাইতে পারি। প্রতীকোপাসনা বা মূর্তি অবলম্বনে দেবদেবীর পূজা পূর্বোক্ত আত্ম-বিকাশের একটি পথ। আমাদের ব্যক্তিত্বের আমুল পরিবর্তন সাধন করিয়া, উন্নতির পথে ধাপে ধাপে আমাদিগকে অগ্রসর করাইয়া নিজ দিব্যস্বরূপ উপলব্ধি করানোই সাকারোপাসনার মূল্ উদ্দেশ্য।

হিন্দুধর্মের ইতিহাসে প্রতীক, মূর্তি এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ধারণা ভগবদারাধনার পথে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছে যে, বলা যায়, স্মরণাতীত কাল হইতে ইহাই হিন্দু-উপাসনার বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক দেশে ও প্রত্যেক ধর্মে কমবেশী এইরূপই ঘটিয়াছে; কারণ এইগুলিকে বাদ দিয়া চলা সম্ভব নয়। পরব্রহ্ম সম্বন্ধে ধারণা করিতে যাইলে প্রতীক, প্রতিমা বা চিত্র অবলম্বনেই আমাদের মনে চিন্তার উদয় হয়। আমাদের মনের গঠনই এরূপ যে অনন্তের ধারণার সহিত প্রতীক ও মূর্তির ধারণাকে সংযুক্ত করিতে আমরা বাধ্য হই। "এই প্রতীকাদির ভাবগুলি যেন একটি আলনার মত, যাহাতে আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক ভাবগুলি ঝুলাইয়া রাখিতে পারি।" শব্দকে অবলম্বন না করিয়া যেমন চিন্তা করা অসম্ভব, তেমনি প্রতীক বা মূর্তি ব্যতীত ঈশ্বর-চিন্তা করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে।

হিন্দুধর্ম অদ্বৈত মতবাদের জন্য সুপ্রসিদ্ধ; তাহার মধ্যে মূর্তিপূজার প্রচলন আশ্চর্য ঘটনা। ইহার মূল উৎস খুঁজিয়া বাহির করা ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়। এক শ্রেণীর পণ্ডিত এইরূপ মত পোষণ করেন যে বৈদিক যুগের শেষের দিকে অথবা বৈদিকোত্তর যুগে মূর্তিপূজার উদ্ভব হয়, এবং ভারতীয় আর্যদের সহিত ভারতের আদিম অধিবাসীদের—বিশেষ করিয়া দ্রাবিড়দের—সংমিশ্রণের ফলেই ইহা ঘটিয়াছিল। আর যতদূর জানা যায়, পূজিত মূর্তিগুলির মধ্যে বাসুদেব এবং সংকর্ষণের মূর্তিই প্রাচীনতম।

'কমলা বক্তৃতামালা'য় ডক্টর রাধাকৃষ্ণন এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে বৈদিক আর্যদিগের মন্দির বা মূর্তি বলিয়া কিছু ছিল না; দ্রাবিড়ী সভ্যতায় মূর্তিপূজার উন্নতি সাধিত হয় এবং যজ্ঞের পরিবর্তে পূজা সমর্থিত হয়।

সিন্ধু-উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক অবস্থান খনন করিয়া দেখা গিয়াছে যে ঐ যুগে মানব এবং অতিমানব-পূজা প্রচলিত ছিল; আর্যেরা সেখান হইতে উহা গ্রহণ করে। পুরাণ এবং রামায়ণ-মহাভারতের যুগে আমরা মূর্তিপূজার—বাসুদেব, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা প্রভৃতির পূজার—স্পষ্ট নিদর্শন পাই।

মহাভারতে এবং ভাগবতে বহুবিধ মূর্তিপূজার উল্লেখ দেখা যায়। হিন্দুদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন ঘটিবার কারণ কি?

প্রথম কারণ—ভক্তিভাব, যাহা উপনিষদের যুগেও লক্ষিত হয়। পরবর্তীকালে ভক্তিমার্গ-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মনেতারা দেবদেবীর মূর্তি প্রচলনের প্রয়োজন অনুভব করেন। ভক্তিপথের আরাধনায় আরাধ্যের একটি বাস্তব রূপ প্রয়োজন, ভক্ত যাহাতে ইষ্টের সহিত ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে পারে। সুতরাং মানব-প্রকৃতির এই চাহিদা পূরণ করিবার প্রয়োজনে বৈদিক ও বৈদিকোত্তর যুগে দেবতারা যে সব শক্তি- ও গুণ-সমন্বিত হইয়া বর্ণিত হইয়াছেন, সেই বর্ণনানুসারেই মূর্তিগুলি নির্মিত হইল।

দ্বিতীয় কারণ, ঈশ্বরের অবতারত্বে বিশ্বাস। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, রামানুজাচার্য, শ্রীচৈতন্য এবং অন্যান্য বহু সাধু ও

সত্যদ্রষ্টাগণ ঈশ্বরের অবতাররূপে পূজিত হইতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের মূর্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইল।

কোন কোন সমালোচকের মতে সাকারোপাসনা নিম্নস্তরের উপাসনা, দুর্বল ও অনুন্নত মানুষের জন্যই ইহার প্রয়োজন; তাছাড়া ইহা পৌত্তলিকতারই প্রকারান্তর। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বলা চলে ঃ

মূর্তিপূজা উচ্চ সংস্কৃতি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ এবং ধর্মাচার্য ও ধর্মসংস্কারকগণ দ্বারা গৃহীত ও সমর্থিত বলিয়া ইহার গভীর তাৎপর্য ও গুরুত্ব রহিয়াছে। ভারতবর্ষের সর্বত্রব্যাপ্ত সাধুদের জীবনেতিহাস ইহার অকাট্য প্রমাণ। শক্তিবাদ শঙ্করাচার্যেরও প্রিয় ছিল; তাঁহার রচিত শক্তিস্তোত্রগুলি হৃদয়ের গভীর প্রদেশে আলোড়ন জাগায়। রামেশ্বরের শৃঙ্গেরী মঠে, দ্বারকায়, পুরীতে ও ও হিমালয়ের জ্যোতির্মঠে শক্তিরূপিণী দেবীগণের নামে তিনি পীঠ উৎসর্গ করেন।

শঙ্করাচার্যের ভক্ত, 'অদ্বৈতসিদ্ধি'-রচয়িতা মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন—

'পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাৎ অনাবিলনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বম্ অহং ন জানে।'

বৈদান্তিক পণ্ডিত অপ্পয় দীক্ষিত খুব শিবভক্ত ছিলেন; দেহত্যাগকালে তিনি শিবের দর্শনলাভ করেন।

হিন্দুধর্মমতে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির চরম পর্যায় হইল এক অতিচেতন অবস্থা, যেখানে সর্ববিধ ভেদরহিত হইয়া পূজ্য ও পূজক এক অনির্বচনীয় অখণ্ড আনন্দের উপলব্ধিতে একীভূত হন।

তথাপি এরূপ লোকের সংখ্যাই অধিক, যাঁহারা ধরাছোঁয়ার মত কোন স্থূল অবলম্বন ব্যতীত চরম সত্তা সম্বন্ধে ধারণা করিতে অপারগ। তাঁহাদের জন্য, আধ্যাত্মিক পথযাত্রার প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতীক, মূর্তি, পট ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। সেজন্য ধর্ম-প্রচারকগণ পবিত্রতা, সত্য, সর্বব্যাপিত্ব প্রভৃতি ভাবগুলিকে বিভিন্ন মূর্তি বা প্রতীকের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে বরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের শৈশব অবস্থায় এগুলি সহায়তা করে; তাহাকে কিন্তু ধাপে ধাপে উঠিয়া উন্নত হইতেই হইবে; সর্বোচ্চ ধাপে, অতিচেতন অবস্থার চরম শিখরে পৌঁছাইবার পূর্বে তাহার থামা চলিবে না।"

মাটি, পাথর, কাঠ, বা এরূপ কোন জড়-পদার্থ দ্বারা গঠিত মূর্তি বা প্রতিকৃতিকেই যে ভগবানের প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এখন কোন কথা নাই; উহা শব্দময় বা মানস-ও হইতে পারে। 'ওঁ' এই শব্দটিকে আমরা চরম সত্যের প্রতীকরূপে গ্রহণ করিতে পারি; ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী শক্তিরূপেও ধারণা করা চলে। জড়পদার্থে গড়া মূর্তির মতই এই শব্দ বা ভাবগুলিও প্রতীকরূপে সমভাবে কার্যকরী। এই প্রতীকগুলি ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা জন্মাইয়া দেয়, কিন্তু এগুলিই ঈশ্বর নহে। সুতরাং ঈশ্বরচিন্তার জন্য মাটির প্রতিমা প্রভৃতি অবলম্বন করাকে যাঁহারা অযৌক্তিক জ্ঞানে পরিহার করেন, বস্তুতঃ তাঁহারা প্রতীকোপসানার গণ্ডিতেই আবদ্ধ। স্বামী বিবেকানন্দ ভক্তি-যোগে এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "দুই ধরনের মানুষের কখনও মূর্তির প্রয়োজন হয় না—পশু-মানব, যে কখনো ধর্মের কথা চিন্তাই করে না, এবং পূর্ণতাপ্রাপ্ত মানব, যিনি এই সকল অবস্থা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। এই দুই শ্রেণীর মাঝখানে অবস্থিত সকল মানুষের পক্ষেই অন্তর্জগতে ও বহিঃপ্রদেশে কোন না কোন একটা আদর্শের প্রয়োজন আছে। এই আদর্শ

কোন বিগতদেহ মানবকে অথবা কোন জীবিত স্ত্রী বা পুরুষকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে। এরূপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক, কারণ আমাদের স্বভাবই হইল স্থূলত্ব-প্রবণ—সূক্ষ্ম ভাবগুলিকে আমরা স্থুল-রূপায়িত করিতে চাই।

এমন বহু ব্যক্তি আছেন, যাঁহাদের মন বস্তুনিরপেক্ষ ধ্যান বা ভগবানের নিরাকার সত্তার ধারণা করিতে অক্ষম। তাঁহাদের জন্ম জনপ্রিয় প্রতিমা ও প্রতীক থাকা চাই; নতুবা তাঁহারা গভীর অন্ধকারেই নিমজ্জিত থাকিবেন। সেজন্য ধর্মপ্রচারকগণ জনসাধারণের বোধগম্য মূর্তি ও প্রতীকের মাধ্যমেই সর্বোচ্চ তত্ত্বগুলি প্রচার করেন। সসীমের মাঝে অসীমকে দেখাই প্রতীকোপাসনার উপযোগিতা; ইহার মাধ্যমে আমরা অসীমকে উপলব্ধি করিতে পারি। এই সসীম রূপগুলি সর্বব্যাপী চৈতন্য-সত্তা ব্রহ্মেরই প্রতিরূপ: 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণঃ রূপকল্পনা।'

একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—প্রতীকে প্রকাশিত ভাবটি পর-ব্রহ্মের পূর্ণ ভাব হইতে পারে না; মূর্তি যদি বাস্তবের স্থলাভিষিক্ত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই পৌত্তলিকতায় পর্যবসিত হইবে। বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার চিকাগো বক্তৃতায় দেখাইয়াছেন যে, আমাদের সাকারোপাসনা পৌত্তলিকতা বা বহুঈশ্বরবাদ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; কারণ মূর্তি পরমসত্তার প্রতীক মাত্র, অন্তরে অনন্ত পরব্রহ্মের ভাব জাগাইয়া তোলাই উহার উদ্দেশ্য। পূজার পূর্বে আমাদের আবৃত্তি করিতে হয়—

'তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীব চক্ষুরাততম্‌।'

এই মন্ত্রে আমাদিগকে আলোকের ন্যায় স্বতঃপ্রকাশ দেবতার নিত্য-সান্নিধ্য উপভোগ করিতে বলা হইতেছে। সুতরাং হিন্দুরা মূর্তিকে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া মাটি বা পাথরের পূজা করে না, মূর্তির মাধ্যমে কোন দেবতা বা দেবীর আরাধনা করে। দেবদেবীগণ হইলেন অতিমানব সত্তা; ইঁহারা কতিপয় গুণ-ও শক্তি-বিশিষ্ট এবং সর্বদা ভাবজগতে অবস্থান করেন। মূর্তিগুলি এমনভাবে নির্মিত হয় যাহাতে দেবদেবীগণের শক্তি ও গুণগুলি তাহাতে ফুটিয়া ওঠে। পূজাকালে এই সব দেবদেবীকে মূর্তিতে অবতরণ করিতে, মূর্তির মাধ্যমে পূজা ও নৈবেদ্য গ্রহণ করিতে এবং পূজায় শেষ পর্যন্ত মূর্তিতে অবস্থান করিতে আমন্ত্রণ ও প্রার্থনা জানানো হয়। এই প্রক্রিয়াকে শুদ্ধি ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠা বলা হয়। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে ভবতারিণীর মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক জগ-জ্জননীর দর্শনলাভ, আজীবন তাঁহাকে সাক্ষাৎ জননীরূপে কাছে পাওয়া ও প্রতিপদে তাঁহার নির্দেশে পরিচালিত হওয়া মূর্তিপূজার অন্তর্নিহিত সত্যটিকে আমাদের মনে সুস্পষ্টরূপে ফুটাইয়া তোলে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কিভাবে প্রতিমাতে জগজ্জননীকে সদা-আবির্ভূতা দেখিতেন, কিভাবে প্রতিমা জীবন্ত হইয়া উঠিয়া চতুর্দিকে আনন্দের হাসি বিচ্ছুরিত করিত, তাহারও বিশদ বিবরণ আমরা পাই। পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের এবং কিয়ৎপরিমাণে ব্রাহ্মসমাজের নেতাদের শিক্ষার প্রভাবে প্রভাবান্বিত স্বামী বিবেকানন্দ পূর্বে প্রকাশ্যভাবে মূর্তিপূজার নিন্দা করিতেন; দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে দেবীর সাক্ষাৎ দর্শনলাভের পর কিন্তু তিনিও সাকারোপাসনা মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমেরিকার ধর্মমহাসভায় তিনি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহাতে ঘোষণা করিয়াছেন, "যাঁহাদের 'পৌত্তলিক' বলা হয়, তাঁহাদের ভিতর এমন লোক দেখিয়াছি, যাঁহাদের মত নীতিপরায়ণ,

আধ্যাত্মিকতাবান ও প্রেমার্দ্রহৃদয় ব্যক্তি আমি কোথাও দেখি নাই ; এরূপ দেখিয়াছি বলিয়াই (সাকারোপাসনার বিরুদ্ধে কিছু শুনিলে) আমাকে থামিতে হয় এবং মনে প্রশ্ন জাগে, 'পাপ হইতে পবিত্রতা উদ্ভূত হইতে পারে কি ?'"

হিন্দুদের মূর্তিপূজার আরো একটি অপূর্ব বৈশিষ্ট্য আছে ; সেটি যদি সঠিকভাবে বোধগত হয়, তাহা হইলে পরিষ্কার ধারণা জন্মাইবে যে মূর্তিপূজা বহু দেবদেবীর পূজা নয়—বিভিন্ন মূর্তির মাধ্যমে একই পরমেশ্বরের পূজা। হিন্দুগণ ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, দেবদেবীগণ মূলতঃ এক চরম সত্তার—ব্রহ্মের—বিভিন্ন শক্তি ও গুণের রূপায়ণ মাত্র। সুতরাং নারায়ণ, শিব, কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী—এই সব দেব-দেবী ব্রহ্মেরই বিভিন্ন ভাবের মূর্ত প্রকাশ, ভক্তের মঙ্গলের জন্য তাঁহার বিভিন্ন গুণ ও শক্তির প্রতীকরূপে ইঁহারা প্রকাশিত। ইঁহাদের যে কোন জনের চরণে ভক্তিঅর্ঘ্য দান করিয়া আমরা সর্বভূতে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইতে পারি।

মূর্তিপূজার চরম ফল লাভ করিতে হইলে বিষয়টিকে যথাযথরূপে দেখিবার শক্তির বিকাশ ঘটাইতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেভাবে প্রতিমায় শক্তিরূপিণী দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহা অনুধাবন করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব কিভাবে ইহা করিতে হয়। অকপট হইয়া এবং আরাধ্যা দেবীর চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া পূজা করিতে হইবে। ইহা না করিয়া মহা সমারোহে বিচিত্র অনুষ্ঠানসহ শক্তিপূজা করিলেও শক্তির যথার্থ পূজারীদের মত তেজোদৃপ্ত পৌরুষ, চরিত্রবল ও সদাচারের বিকাশ আমাদের মধ্যে ঘটিবে না। পূজাকে আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি-বিকাশের এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের অনুপম সুযোগরূপেই গ্রহণ করা সঙ্গত, উৎসব ও আমোদ-প্রমোদময় সামাজিক অনুষ্ঠানরূপে নয়।

সকল উপাসনার পরিণতি সত্যোপলব্ধিতে। শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজিতা শক্তিরূপিণী দেবীর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন সেই পরিণতিলাভের পথে আমাদিগকে পরিচালিত করেন ; প্রতীকে যাঁহার আরাধনা করিতেছি, তিনিই আমার নিজের স্বরূপ, তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চরম সত্য সচ্চিদানন্দ, তিনিই বিশ্বরূপে প্রকাশিত, শুধু মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মূর্তিই নয়, প্রতিটি জীবদেহই তাঁহার জীবন্ত বিগ্রহ—এই সত্য প্রত্যক্ষ করাইয়া, সর্বজীবের প্রতি প্রেমে হৃদয় পূর্ণ করিয়া দিয়া আমাদের জীবন যেন সার্থক করেন। স্বামী বিবেকানন্দের অমর বাণী আমাদের উদ্বুদ্ধ করুক :

"ব্রহ্ম হ'তে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন-প্রাণ-শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা
খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে
ঈশ্বর।"

শান্তিপর্বে রাজধর্ম

অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য

(১)

শান্তিপর্ব ধর্মোপদেশের খনি। ১৮ খানি পর্বের মধ্যে আকারে ইহা বৃহত্তম—নানা বিষয়ে চিন্তার বৈচিত্র্যে ইহা বিশ্বকোষতুল্য। তিনটি মূল ভাগে ইহার উপদেশরাশি সাজান হইয়াছে—রাজধর্ম, আপদ্‌ধর্ম ও মোক্ষধর্ম। রাজধর্মই প্রথমে বিবৃত হইয়াছে; কারণ, সমরবিজয়ী রাজচক্রবর্তী যুধিষ্ঠির প্রশ্নকর্তা; তিনি সংসারে বিরক্ত—যুদ্ধের পরিণামে ভগ্নহৃদয়, অন্তরের গ্লানিতে পীড়িত অথচ অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজকর্তব্যে বিজড়িত। উপদেষ্টা—শরশয্যায় শয়ান কুরু-পিতামহ—নির্লিপ্ত কিন্তু আদ্যোপান্ত সংসার-রঙ্গনাট্যের সাক্ষী ও মর্মগ্রাহী। সমাজতত্ত্বের সকল প্রসঙ্গই ইহাতে আসিয়া পড়িয়াছে—বর্তমানে সবিস্তারে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাহা যাহা আলোচিত হইতেছে সে সকলেরই মূল ও পূর্ব সূচনা এখানে লক্ষিত হয়। ৬১ অধ্যায়ে মনস্বী ভীষ্ম রাজধর্মের প্রাধান্য দেখাইয়া বলিতেছেন—

যথা রাজন্ হস্তিপদে পদানি
সংলীয়স্তে সর্বসত্ত্বোদ্‌ভবানি।
এবং ধর্মান্ রাজধর্মেষু সর্বান্ সর্বাবস্থান্
সংপ্রলীনান্ নিবোধ॥
সর্বে ধর্মা রাজধর্মপ্রধানাঃ
সর্বে বর্ণাঃ পাল্যমানা ভবন্তি।
সর্বস্ত্যাগো রাজধর্মেষু রাজন্!
ত্যাগং ধর্মঞ্চাহুরগ্র্যং পুরাণম্॥
মজ্জেত্রয়ী দণ্ডনীতৌ হতায়াং
সর্বে ধর্মাঃ প্রক্ষয়েয়ুর্বিবুদ্ধাঃ
সর্বে ধর্মাশ্চাশ্রমাণাং হতাঃ স্যুঃ
ক্ষাত্রে ত্যক্তে রাজধর্মে পুরাণে॥

সকল জন্তুর পদচিহ্ন যেমন হস্তিপদচিহ্নে মিলাইয়া যায় সেইরূপ সকল অবস্থার ধর্মসমূহ রাজধর্মে অন্তর্ভুক্ত হয়। সকল ধর্মের মধ্যে রাজধর্মই প্রধান এবং রাজধর্ম-বলেই সমস্ত বর্ণ পালিত হয়। রাজধর্মের মধ্যে সকল প্রকার ত্যাগই রহিয়াছে এবং ত্যাগই শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীন ধর্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ। দণ্ডনীতি বিধ্বস্ত হইলে তিন বেদ মগ্ন হয়, সমাজে প্রবর্তিত সকল ধর্ম বিনষ্ট হয়। আশ্রম- ধর্মসকল লয় পায়—ক্ষত্রিয়ের সেবিত প্রাচীন রাজধর্ম যদি পরিত্যক্ত হয়। রাজশক্তির আধার ও আকার কালক্রমে পরিবর্তিত হইলেও রাষ্ট্রের ব্যাপক সর্বাধিকার ও সর্বপ্রকার মর্যাদা বর্তমানেও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে বরং সমাজজীবনের সকল অংশে উহা আরও অধিক অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে—সমাজ-সংস্থার সার্বভৌম অধিকারের (Totalitarian) সামগ্রিক ভাবের ইহা মূর্ত বিকাশে দাঁড়াইয়াছে।

অর্থশাস্ত্র ও রাষ্ট্রতন্ত্রের চিন্তা দীর্ঘকাল চর্চার ফলে পরিপুষ্ট হয়। মহাভারতে এই ইতিহাসের ক্রম দেখানো হইয়াছে—প্রথমে সুবৃহৎ ব্রহ্মসংহিতা, পরে বৈশালাক্ষ বাহুদণ্ডক, এবং বার্হস্পত্য, শুক্রাচার্য ও কামন্দকীয় নীতিশাস্ত্র প্রচারিত হয়। এ সকলে আলোচনার বিষয় ছিল রাজশক্তি ও তাহার উদ্ভব, শাসনতন্ত্র ও তাহার অঙ্গসমূহ, সমরোপকরণ, রাজপরিজন, দণ্ডনীতি, অর্থসংগ্রহ, মন্ত্রণা ও পররাষ্ট্রনীতি। শান্তিপর্বের ৪৫ হইতে ১২৬ অধ্যায় পর্যন্ত আলোচিত হইয়াছে—রাজ-সম্মান ও রাজকার্য, রাজপদের ও পৌরাণিক রাজবংশের ইতিহাস, সৈন্য, চর, সন্ধি-বিগ্রহ, অস্ত্র ও ছয়প্রকার দুর্গ। পুরোহিত ও রাজপুরুষ,

গ্রাম-মুখ্য, পুরপ্রধান প্রভৃতি অধিকারী পুরুষ ও রাজশক্তিতে কাল-নিয়ন্ত্রণ। রাজতন্ত্রের উদ্ভবের মূলে সমাজশৃঙ্খলা—শৃঙ্খলার মূলে দণ্ডবিধান—সকল শাসনের উহাই মূলস্তম্ভ, রাজশক্তি ও সামর্থ্যের উৎস।

প্রতীচ্য-অনুসন্ধানে মানবসমাজের যে আদিম অবস্থার কথা উঠিয়াছে—প্রকৃতিসিদ্ধ, স্বাভাবিক পরিস্থিতি—State of nature—যাহা সমাজ-সংবিধান—Social contract-এর পূর্ববর্তী—তাহার আভাস এখানে রাজ্য-গঠনের প্রসঙ্গে পাওয়া যায়। এমন সময় ছিল যখন রাজ্য বা রাজা, দণ্ড বা দণ্ডদাতা ছিল না—সকল লোক ধর্মের প্রেরণায় পরস্পরকে রক্ষা করিত।

নৈব রাজ্যং ন রাজাসীন্ন চ দণ্ডো ন দাণ্ডিকঃ।
ধর্মেণৈব প্রজাঃ সর্বা রক্ষন্তি স্ম পরস্পরম্ ॥
পাল্যমানাস্তথান্যোন্যং নরা ধর্মেণ ভারত।
খেদং পরমুপাজগ্মুস্ততস্তান্ মোহ আবিশন্ ॥

এইভাবে ধর্মবশে পরস্পরের দ্বারা রক্ষিত থাকিয়া প্রজাসকলের আয়াস বোধ হইতে লাগিল এবং চিত্তবিকার আসিয়া পড়িল। মোহ, লোভ, কাম, ক্রোধে তাহাদের অন্তর কলুষিত হইতে লাগিল। তখন ধর্মকার্যের বিপর্যয় হওয়াতে দেবগণ ব্রহ্মার নিকট আবেদন করায় ত্রিবর্গের ও মোক্ষের বিধান করিয়া ব্রহ্ম-সংহিতা নামক শাস্ত্র তিনি প্রকাশ করেন। ইহারই ক্রমিক সংক্ষেপে পূর্বোক্ত অর্থশাস্ত্রগুলি প্রচলিত হয়।

দণ্ডেন নীয়তে চেদং দণ্ডং নয়তি বা পুনঃ।
দণ্ডনীতিরিতি খ্যাতা ত্রীন্ লোকানভিবর্ততে ॥

এই শাস্ত্র অনুসারে সমাজের প্রভু সৎপথে জগৎ পরিচালন করিবেন, প্রজাদের দণ্ডবিধান করিবেন—এই কারণে ইহা দণ্ডনীতি নামে অভিহিত হয়। ত্রিলোকে ইহার বিধান-সমূহ বলবৎ হইবে—ইহাই অভিপ্রেত।

রাজা চেন্ন ভবেল্লোকে পৃথিব্যাং দণ্ডধারকঃ।
জলে মৎস্যানিবাভক্ষন্ দুর্বলান্ বলবত্তরাঃ ॥

রাজা এই পৃথিবীতে লোকের দণ্ডবিধান না করিলে জলে বৃহৎ মৎস্য যেমন ক্ষুদ্র মৎস্যকে ভক্ষণ করে, তেমন সমাজে প্রবলেরা দুর্বল-দিগকে ভক্ষণ করিত। এই মাৎস্যন্যায়ের দমন রাজধর্ম।

হন্তাদ্বন্তং পরিমুষেদ্ ভিদ্যেরন্ সর্বসেতবঃ।
ভয়ার্তং বিদ্রবেৎ সর্বং যদি রাজা ন পালয়েৎ ॥

রাজা পালন না করিলে দস্যু প্রভৃতি হস্ত হইতে দ্রব্য অপহরণ করিত, সকল নিয়মবন্ধন ভাঙ্গিয়া পড়িত, সকলে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইত।

কুরুতে পঞ্চরূপাণি কালযুক্তানি যঃ সদা।
ভবত্যগ্নিস্তথাদিত্যো মৃত্যুর্বৈশ্রবণো যমঃ ॥

কাল অনুসারে রাজা পাঁচ প্রকার রূপ ধারণ করেন। পাপিষ্ঠগণকে অগ্নির মত তিনি স্বতেজে দগ্ধ করেন; সর্বতশ্চক্ষুঃ হইয়া সূর্যের মত মঙ্গল-বিধান করেন, দুর্বৃত্তগণকে সপরিজনে তিনি মৃত্যুর মত সংহার করেন, দণ্ডপ্রয়োগে দুষ্টের নিগ্রহ এবং শিষ্টের প্রতি অনুগ্রহ করেন; যম অর্থাৎ ধর্মরাজের মত, অপকারিগণের নিকট কাড়িয়া লইয়া কুবেরের মত উপকারিগণকে অজস্র দান করেন। দণ্ডের এইরূপ বর্ণনা আছে—

নীলোৎপলদলশ্যামশ্চতুর্দংষ্ট্রশ্চতুর্ভুজঃ।
অষ্টপান্নৈকনয়নঃ শঙ্কুকর্ণোর্ধ্বরোমবান্ ॥
জটী দ্বিজিহ্বস্তাম্রাস্যো মৃগরাজতনুচ্ছদঃ।
এতদ্রূপং বিভর্ত্যুগ্রং দণ্ডো নিত্যং দুরাধরঃ॥

দণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বর্ণ নীলোৎপল-দলের মত শ্যাম—কারণ কৃষ্ণবর্ণ পাপের তিনি নিবারক। তাঁহার চারি দণ্ড—কারণ ধনহরণ, কারাবাস, নির্বাসন ও দেহদণ্ডে তিনি অপরাধীর

শাসন করেন। তিনি চতুর্ভুজ—কারণ স্বগৃহ, পরগৃহ, গুপ্তস্থান এবং জলমধ্য হইতে দুষ্টকে তিনি সংগ্রহ করেন। তিনি অষ্টপাদ—কারণ রাজদ্বারে বিচারের ভাষা, উত্তর, সাক্ষী, লেখ্য, শ্রবণ, প্রশ্ন, তর্ক, সিদ্ধান্ত এই আটটি অংশ। তিনি সর্বতশ্চক্ষুঃ তাই বহুনেত্র, শঙ্কু বা লৌহশলার মত তাঁহার কর্ণ—কারণ দণ্ড অপরাধীকে বিঁধিতে থাকে। তিনি ঊর্ধ্বলোম—নানা তর্ক-বিতর্কে আচ্ছন্ন। জটার মত মস্তকোপরি অর্থাৎ উচ্চাসনে বিচারক আসীন—তাই দণ্ড জটাধারী। ইনি দ্বিজিহ্ব—কারণ বাদী ও প্রতিবাদী—উভয়ের প্রতি অবহিত। দণ্ডবিধানে তাঁহার মুখ আরক্তিম—তাই তিনি তাম্রবর্ণ। সিংহ-চর্মাবৃতের মত ইনি দর্শকের ভীতিকর। সমাজ-শাসনে দণ্ডের কার্য নানাভাবে দুর্বৃত্তকে আঘাত।

ভিন্দংশ্ছিন্দন্ রুজন্ কৃন্তন্ দারয়ন্ পাটয়ংস্তমঃ।
ঘাতয়ন্নভিধাবংশ্চ দণ্ড এব চরত্যুত ॥

ভেদ, ছেদ, ভঙ্গ, কর্তন, বিদারণ, উৎখাত, হনন ও ধাবন করিয়া দণ্ড সংসারে বিচরণ করে। সামাজিক জীবের সকল মনোভাব ও পরিস্থিতির মূলে দণ্ডের ক্রিয়া—সেই জন্য দণ্ডের নানা রূপ।

সপ্ত প্রকৃতি চাষ্টাঙ্গং শরীরমিহ যদ্বিদুঃ।
রাজ্যস্য দণ্ডমেবাঙ্গং দণ্ডঃ প্রভব এব চ ॥

প্রভু, সচিব, মিত্র, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও সৈন্য ই সাতটি এবং হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, নৌকা, বেতনভুক্ ভৃত্য, দেশীয় ও পার্বত্য সহায় —এই আটটি অঙ্গে যে রাজ্যের শরীর বলা হয় —উহার দণ্ডই প্রধান অঙ্গ, কারণ দণ্ডই ধর্মের একমাত্র প্রভাবের হেতু। আধুনিক পরিভাষায় দণ্ডই সমাজশৃঙ্খলার sanction—সহায় ও সমর্থক।

অদদদ্দণ্ডমেবাস্মৈ ধৃতমৈশ্বর্যমেব চ।
বলেন যশ্চ সংযুক্তঃ সদা পঞ্চবিধাত্মকঃ ॥

রাজা সর্বদা বলসম্পন্ন; প্রজাগণের জীবন, ধন, মান, স্বাস্থ্য ও ন্যায় রক্ষা করেন বলিয়া তিনি পঞ্চবিষয়বিধায়ক। স্বয়ং বিধাতা তাঁহাকে এই দণ্ড ও নিজ প্রভুত্ব দান করিয়াছিলেন।

যথা হি রশ্ময়োঽশ্বস্য দ্বিরদস্যাঙ্কুশো যথা।
নরেন্দ্রধর্মো লোকস্য তথা প্রগ্রহণং স্মৃতম্ ॥

অশ্বের যেমন মুখ-রজ্জু এবং হস্তীর যেমন অঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণের উপায়, রাজধর্মও সেইরূপ লোকের বিপথগমন নিবারণ করিবার উপায়। সমাজের ইহা মুখরজ্জু বা লাগাম।

রাজশক্তি লোকে ধর্মের ধারক স্তম্ভপ্রায়—সেইজন্য বল ও সামর্থ্য ইহার প্রাণস্বরূপ। বিপুল সমাজের শ্রেয়োবিধান ইহার কর্তব্য। সেইজন্য রাজধর্ম সর্বদা ক্ষমাপরতা নহে। ভীষ্ম বলিলেন—

ন চ ক্ষান্তেন তে নিত্যং ভাব্যং পুত্র সমন্ততঃ।
অধর্মো হি মৃদূ রাজা ক্ষমাবানিব কুঞ্জরঃ ॥
ক্ষমমাণং নৃপং নিত্যং নীচঃ পরিভবেজ্জনঃ।
হস্তিযন্তা গজস্যেব শির এবারুরুক্ষতি ॥

বৎস! সকল দিকে সর্বদা তুমি ক্ষমাশীল হইবে না, ক্ষমাশীল হস্তীর মত মৃদুস্বভাব রাজা অধম গণ্য হন। হীন ব্যক্তিরাও ক্ষমাশীল রাজাকে অগ্রাহ্য করে। যেমন মাহুত হস্তীর মাথায় উঠে—নগণ্য লোকও এরূপ রাজাকে অবজ্ঞা করে। রাজার ধর্ম—দুষ্টের শাসন ও রাষ্ট্রের রক্ষা।

তদ্রাজ্যে রাজ্যকামানাং নান্যো ধর্মঃ সনাতনঃ।
ঋতে রক্ষান্তু বিস্পষ্টাং রক্ষা লোকস্য ধারিণী ॥

রাজ্যকামী ক্ষত্রিয়গণের রাষ্ট্রে সুস্পষ্ট প্রজা-রক্ষা ব্যতীত অন্য সনাতন ধর্ম নাই—রক্ষাকার্যই লোক ধারণ করিয়া থাকে।

ষড়েতান্ পুরুষো জহ্যাদ্ভিন্নাং নাবমিবার্ণবে।
অপ্রবক্তারমাচার্যমনধীয়ানমৃত্বিজম্ ॥
অরক্ষিতারং রাজানং ভার্যাং চাপ্রিয়বাদিনীম্।
গ্রামকামঞ্চ গোপালং বনকামঞ্চ নাপিতম্ ॥

সাগরের বক্ষে ভগ্ন নৌকার মত এই ছয় জনকে মানুষ ত্যাগ করিবে—যে আচার্য বাক্যে অপটু, যে পুরোহিত বেদাধ্যয়ন করে না, যে রাজা দেশরক্ষায় অসমর্থ, কটুভাষিণী ভার্যা, গ্রামে আসক্ত গোপালক, আর বনমুখী নাপিত। আরও বলা হইয়াছে—

দ্বাবিমৌ গ্রসতে ভূমিঃ সর্পো বিলশয়ানিব।
রাজানং চাবিরোদ্ধারং ব্রাহ্মণং চাপ্রবাসিনম্॥

গর্তবাসী ইন্দুরগুলিকে সর্প যেমন গ্রাস করে—তেমনি বিরোধে বিমুখ রাজা এবং প্রবাসে কাতর ব্রাহ্মণ—এই দুই জনকে পৃথিবী হরণ করে।

প্রসঙ্গক্রমে একস্থলে যুধিষ্ঠিরকে কিছু ভর্ৎসনা করিয়া পিতামহ বলিলেন—

বেদাহং তব যা বুদ্ধিরানৃশংস্যগুণৈব সা।
ন চ শুদ্ধানৃশংস্যেন শক্যং রাজমুপাসিতুম্॥
সদৈব ত্বাং মৃদুপ্রজ্ঞমত্যার্যমতিধার্মিকম্।
ক্লীবং ধর্মঘৃণাযুক্তং ন লোকো বহু মন্যতে॥

জানি আমি—তোমার এখন যে বুদ্ধি, অনিষ্ঠুরতাই তাহার গুণ, কিন্তু শুধু কোমলতা দ্বারা রাজ্য ভোগ করা যায় না। সর্বদা কোমল-চিত্ত, অতি সুশীল এবং অতি ধার্মিক তোমার প্রবৃত্তি। এরূপ প্রতিকারে অক্ষম বা নিস্তেজ, এবং ধর্ম- ও কৃপা-পরবশ হইলে লোকে তোমাকে সমাদর করিবে না।

অন্যত্র ভীষ্ম বলিলেন—

অপারে যো ভবেৎ পারমপ্লবে যঃ প্লবো ভবেৎ।
শূদ্রো বা যদি বাপ্যন্যঃ সর্বথা মানমর্হতি॥
যমাশ্রিত্য নরা রাজন্ বর্তয়েয়ুর্যথা সুখম্।
অনাথাস্তপ্যমানাশ্চ দস্যুভিঃ পরিপীড়িতাঃ॥
তমেব পূজয়েয়ুস্তে প্রীত্যা স্বমিব বান্ধবম্।
মহদ্ধ্যভীষ্টং কৌরব্য! কর্তা সম্মানমর্হতি॥

দুস্তর বিপদে যিনি পারস্বরূপ হন, তরীর অভাবে যিনি তরী হন, তিনি শূদ্র বা যে কোন বর্ণের হোন না কেন—সর্বথা রাজসম্মান পাইবার তিনি অধিকারী। হে কুরুকুলনন্দন, অসহায়, দুঃখসন্তপ্ত এবং দস্যু দ্বারা উৎপীড়িত জনগণ যাহাকে আশ্রয় করিয়া সুখে জীবন ধারণ করে, তাহাকেই তাহারা নিজ বান্ধবের ন্যায় প্রীতির সহিত পূজা করিবে। অভীষ্টই সর্বোপরি মহৎ এবং উহার যে সম্পাদক সেই রাজসম্মানের অধিকারী।

রাজা বসুমনা—কোশলের অধিপতি—কোন সময়ে জিজ্ঞাসা করেন—কি উপায়ে সমাজের উন্নতি, কি কারণে সমাজের বিনাশ ঘটে। ইহার উত্তরে ৬৬ অধ্যায়ে বৃহস্পতির উক্তি—'যদি রাজা ন পালয়েৎ' এবং 'যদা রক্ষতি ভূমিপঃ'—রাজা যদি পালন না করেন এবং যখন ভূপতি রক্ষা করেন—এইরূপে অন্বয় ও ব্যতিরেক মুখে ৫০টির উপর শ্লোকে নিবদ্ধ হইয়াছে। দেবগুরুর এই উক্তিতে স্বত্ব-স্বামিত্বের যে প্রশ্ন আজ মনুষ্য-সমাজকে আলোড়িত করিতেছে তাহার সূচনা দেখা যায়। সমাজশৃঙ্খলার মূলে উপকরণের উপর অধিকারের প্রশ্ন। বৃহস্পতি বলিতেছেন—

যথাহ্যনুদয়ে রাজন্ ভূতানি শশিসূর্যয়োঃ।
অন্ধে তমসি মজ্জেয়ুরপশ্যন্তঃ পরস্পরম্॥
যথাহ্যনুদকে মৎস্যা নিরাক্রন্দে বিহঙ্গমাঃ।
বিহরেয়ুর্যথাকামং বিহিংসন্তঃ পুনঃ পুনঃ॥
মমেদমিতি লোকেঽস্মিন্ ন ভবেৎ সম্পরিগ্রহঃ।
ন দারা ন চ পুত্রঃ স্যান্ন ত্বন্নং ন পরিগ্রহঃ।
বিষ্বগ্লোপঃ প্রবর্তেত যদি রাজা ন পালয়েৎ॥

চন্দ্র সূর্য আকাশে না উঠিলে সকল জীব যেমন পরস্পরকে দেখিতে পায় না এবং অন্ধ-তামসে মগ্ন হয়, জলাভাবে মৎস্যসকল কিংবা অরক্ষিত অরণ্যে পক্ষিগণ পরস্পরকে হিংসা করিয়া যথেচ্ছ বিচরণ করে, সেইরূপ এ সংসারে—'ইহা আমার' এরূপ ধারণা এবং স্ত্রী-পুত্র ও খাদ্যবস্ত্রে আমার বলিয়া অধিকার এবং

সকল বিষয়ে সকলের নিজস্ব বলিয়া ব্যবহার লুপ্ত হয়—রাজা যদি না পালন করেন। পক্ষান্তরে, সুশাসনে রাষ্ট্র হয় নিরুপদ্রব ও নিরুদ্বেগ।

বিবৃত্য হি যথাকামং গৃহদ্বারাণি শেরতে।
মনুষ্যা রক্ষিতা রাজ্ঞা সমন্তাদকুতোভয়াঃ॥
স্ত্রিয়শ্চাপুরুষা মার্গং সর্বালঙ্কারভূষিতাঃ।
নির্ভয়াঃ প্রতিপদ্যন্তে যদি রক্ষতি ভূমিপঃ॥
বার্তামূলোহ্যয়ং লোকস্ত্রয়া বৈ ধার্যতে সদা।
তৎসর্বং বর্ততে সম্যগ্ যদি রক্ষতি ভূমিপঃ॥
ন হি জাত্ববমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি॥

চতুর্দিকে নৃপতি কর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া মনুষ্যগণ যথেচ্ছভাবে গৃহদ্বার উন্মুক্ত রাখিয়া রাত্রে নির্ভয়ে শয়ন করে। নারীসকল পুরুষ সহচর না থাকিলেও অলঙ্কারভূষিত হইয়া নিশ্চিন্তভাবে পথে যাতায়াত করে। সমাজ-স্থিতির মূলে জীবিকা—উহা দ্বারা সর্বদা লোক বিধৃত হয় এবং সে সকল যথাযথ নিষ্পন্ন হয় যদি ভূপতি রক্ষাকার্য সুসম্পন্ন করেন। নর-পালকে সেইজন্য সাধারণ মনুষ্য বলিয়া অবজ্ঞা করিবে না; প্রকৃতপক্ষে ইনি মহতী দেবতা—নরাকারে বিরাজ করেন। রাজশক্তি নৈর্ব্যক্তিক হইলেও—লোকতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের আকার ধারণ করিলেও—রাষ্ট্রের অব্যাহত প্রভুতা এবং জনসাধারণের কর্তব্য রাষ্ট্রানুগত্য পূর্বেও যেমন, আজও তেমনি সত্য।

আদর্শ রাজশাসন—অতীত ভারতের গৌরব-কাহিনী। শান্তিপর্বে উপাখ্যান আছে—ধার্মিক কেকয়রাজ বনমধ্যে রাক্ষস কর্তৃক আক্রান্ত হইলে নিজ রাজ্যের অপূর্ব বৃত্তান্ত বিবৃত করেন। তিনি বলিতে থাকেন—

ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্যো ন মদ্যপঃ।
নানাহিতাগ্নির্নাযজ্বা মা মমান্তরমাবিশঃ॥

আমার রাজ্যে চৌর বা স্বজনবঞ্চক কৃপণ বা মদ্যপায়ী লোকের বা অগ্নিহোত্র- ও যজ্ঞ-হীন ব্রাহ্মণের বাস নাই—সুতরাং আমাতে তোমার অধিষ্ঠান হইতে পারে না।

ন যাচন্তে প্রযচ্ছন্তি সত্যধর্মবিশারদাঃ।
নাধ্যাপয়ন্ত্যধীয়ন্তে যজন্তে যাজয়ন্তি ন॥

আমার রাজ্যে এরূপ বিপ্র বহু আছেন—যাঁহারা সত্য ধর্মের নিপুণ অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা অধ্যাপনা না করিয়াও জ্ঞানের জন্য অধ্যয়ন করেন, যাঁহারা দেবপূজা করেন—কিন্তু যাজন করেন না।

কৃপণানাথবৃদ্ধানাং দুর্বলাতুরযোষিতাম্।
সংবিভক্তাস্মি সর্বেষাং মা মমান্তরমাবিশঃ॥

দীন, অসহায়, বৃদ্ধ, দুর্বল, রুগ্ন, অবলা প্রভৃতি সকলের জন্য আমি সম্পদের সতত সংবিভাগ করিয়া থাকি—সুতরাং আমার অন্তরে তুমি প্রবেশ করিতে পার না।

তপস্বিনো মে বিষয়ে পূজিতাঃ পরিপালিতাঃ।
সংবিভক্তাশ্চ সৎকৃত্য মা মমান্তরমাবিশঃ॥
নাবজানাম্যহং বৈদ্যান্ন বৃদ্ধান্ন তপস্বিনঃ।
রাষ্ট্রে স্বপতি জাগর্মি মা মমান্তরমাবিশঃ॥
ন মে শস্ত্রৈরনির্ভিন্নং গাত্রে হ্যঙ্গুলমন্তরম্।
ধর্মার্থং যুধ্যমানস্য মা মমান্তরমাবিশঃ॥

আমার অধিকার মধ্যে তপস্বীরা পূজিত ও পরিপালিত হন; সম্মানপূর্বক ন্যায্য বিভাগ করিয়া আমি তাহাদের প্রয়োজন সাধিত করি—আমাতে তোমার প্রবেশ সম্ভব নহে। বিদ্বান্, বৃদ্ধ ও তপস্বিগণকে আমি অবজ্ঞা করি না। রাজ্যের সকলে নিদ্রিত থাকিলেও আমি জাগ্রত থাকি—আমার অন্তরে তোমার অনধিকার। আমার শরীরে দুই অঙ্গুলী পরিমিত স্থানও নাই—যেখানে শস্ত্রের আঘাত হয় নাই—ধর্মার্থে এরূপ যুদ্ধ করিয়াছি—সুতরাং

আমার অন্তরে তোমার প্রবেশ হইতে পারে না। কোশলরাজের এই বৃত্তান্ত শুনিয়া রাক্ষস তাহাকে ত্যাগ করিয়া অপসৃত হয়।

মানবসমাজের ক্রমিক বিবর্তের সঙ্গে ধর্ম-ও চরিত-নীতি শাসনযন্ত্রের দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হইতেছে। রাজশক্তির এই সামগ্রিক অধিকার অতি প্রাচীনকাল হইতে মনীষিগণ অনুভব করিয়া আসিতেছেন। বেদজ্ঞ ঋষি উতথ্য মান্ধাতাকে রাজধর্মের এই দিক পরিস্ফুট করিয়া দেখান।

ধর্মে তিষ্ঠন্তি ভূতানি ধর্মো রাজনি তিষ্ঠতি।
স রাজা সাধু যঃ শাস্তি স রাজা পৃথিবীপতিঃ॥
রাজা পরমধর্মাত্মা লক্ষ্মীবান্‌ ধর্ম উচ্যতে।
দেবাশ্চ গর্হাং গচ্ছন্তি ধর্মো নাস্তীতি চোচ্যতে॥

সকল জীব ধর্মের আধারে অবস্থিত এবং ধর্মের অবস্থান রাজার উপর। পরম ধার্মিক এবং রাজ্যশ্রীসম্পন্ন রাজাকে ধর্ম বলা হয়—তাঁহার অভাবে দেবতারা নিন্দিত হন এবং লোকে 'ধর্ম বলিয়া কিছু নাই'—এরূপ আলোচনা করে।

যস্মিন্‌ ধর্মো বিরাজেত তং রাজানং প্রচক্ষতে।
যস্মিন্‌ বিলীয়তে ধর্মস্তং দেবা বৃষলং বিদুঃ॥
বৃষো হি ভগবান্‌ ধর্মো যস্তস্য কুরুতে হ্যলম্‌।
বৃষলং তং বিদুর্দেবাস্তস্মার্দ্ধর্মং বিবর্ধয়েৎ॥

যাঁহাতে ধর্ম বিরাজ করেন, তাঁহাকেই জ্ঞানিগণ রাজা বলেন—যাহাতে উহা বিলীন হয় তাহাকে বৃষল মনে করা হয়। ভগবান বৃষ-স্বরূপ, উহার যে উচ্ছেদ করে সেই বৃষল। সুতরাং ধর্মের ন্যূনাধিক্যে যে বিভিন্ন যুগ—রাজাই তাহার প্রবর্তক।

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চ ভরতর্ষভ।
রাজবৃত্তানি সর্বাণি রাজৈব যুগমুচ্যতে॥

ভরতকুলশ্রেষ্ঠ! জানিও, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি—এই যুগভেদ—রাজার কার্যকলাপের নামান্তর; রাজাকেই যুগ বলা হয়। মনু-সংহিতায় অনুরূপ শ্লোকে রাজাই কালের কারণ এবং রাজপ্রবৃত্তিই কালধর্মের প্রবর্তক বলা হইয়াছে।

কলিঃ প্রসুপ্তো ভবতি স জাগ্রদ্দ্বাপরং যুগম্‌।
কর্মস্বভ্যুদ্যতস্ত্রেতা বিচরংস্তু কৃতং যুগম্‌॥

রাজা নিদ্রিত হইলে কলি, জাগরিত হইলে দ্বাপর, কর্মে উদ্যোগী হইলে ত্রেতা যুগ আবির্ভূত হয়; যখন নিজ কর্তব্য পালনে সর্বত্র বিচরণ করেন—তখন সত্য যুগ আসে। রাজবৃত্তের এই যুগকারক প্রভাব বৈদিক সময় হইতে স্বীকৃত ও খ্যাপিত। শতপথ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই কথাই আছে—

কলিঃ শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পদ্যতে চলন্‌॥

নিরীহ, নিষ্ক্রিয়, ন্যায়ান্যায়ে উদাসীন, নিজ-কর্মে শিথিল রাজমনোবৃত্তির পক্ষে এই সব কথা—ভেষজস্বরূপ ও সঞ্জীবন মন্ত্রতুল্য।

ভারত-ভগিনী নিবেদিতা

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীতামসরঞ্জন রায়

(নরেন্দ্রনাথ যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট প্রথম গমন করেন।) সেদিন যুবক নরেন্দ্রনাথকে দেখবামাত্র তাঁর গুরু চিনতে পেরেছিলেন। নিঃসংশয় হবার জন্য পরীক্ষা অবশ্য করেছিলেন, কিন্তু প্রথম-দর্শনের যে-সিদ্ধান্ত সেটি সর্বাংশেই নির্ভুল ছিল। তাই প্রথম-দর্শনেই নিজ উত্তর-সাধককে চিহ্নিত করেছিলেন তিনি এবং আকর্ষণও করেছিলেন অনিবার্য শক্তিতে।

আর আজ? আজ স্বামী বিবেকানন্দও কি মার্গারেটের মধ্যে তাঁর উত্তর-সাধিকা মানস-কন্যাটিকে প্রথম-দর্শনেই চিনতে পেরেছিলেন? বহিরাবরণের প্রচ্ছন্নতার অন্তরালে যে চিত্তটি উৎসর্গ-উন্মুখতায় অপেক্ষমাণ তার আকৃতি কি তিনি উপলব্ধি করেছিলেন?

"সুবাসিত পুষ্প রহে পল্লবে বিলীন,
গন্ধ তার লুকাবে কোথায়?"—

এ উক্তি মার্গারেটের জীবনে কি সত্য হয়ে উঠেছিল? রূপ নিয়েছিল সেইদিন?—হয়ত নিয়েছিল, অন্ততঃ নেওয়াই সম্ভব। কারণ, সিদ্ধ গুরুর তৃতীয় নেত্রের সন্ধানী দৃষ্টির সম্মুখে শুভসংস্কারের মহাসম্পদ উদ্ঘাটিত হয়ে থাকে। দক্ষ শিল্পী নানা আবর্জনার মিশ্রণ থেকেও কঠিন হীরকখণ্ডকে আবিষ্কার করে। বস্তুতঃ, তাকে রূপ দেবার এবং ঔজ্জ্বল্য দান করবার—প্রবল আকাঙ্ক্ষাই শিল্পীকে সেই বিশেষ দৃষ্টিটি দান করে থাকে।

অতএব, মার্গারেটের ঐকান্তিক আবেদন—ভাষায় অনুক্ত হলেও—যথাকালে তাঁর ভাবী আচার্যের মনে সাড়া জাগিয়েছিল। এবং সেই-জন্যই দেখা যায় যে এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের কালেই, একদিন সহসা নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই স্বামীজী আহ্বান জানিয়েছিলেন মার্গারেটকে। সে আহ্বানের পশ্চাতে যেন একটি পূর্বনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের সুর ধ্বনিত ছিল। স্বামীজী চেয়েছিলেন,—"আমার দেশের মেয়েদের জন্য আমার বিশেষ একটি পরিকল্পনা রয়েছে। মার্গারেট, আমার মনে হয়, অনেক সময়ই মনে হয়, আমার সে পরিকল্পনাটিতে তোমার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাকে রূপ দেবার জন্য, সফল করবার জন্য তোমাকেই আমার প্রয়োজন।"...

"I have plans for the women of my own country in which you, I think, could be great help to me."

সে আবেদনের সন্ধানও যেমন মার্গারেটের ক্ষেত্রে অব্যর্থ হয়েছিল—তার প্রভাবও তেমন মর্মস্পর্শী হয়েছিল। মুহূর্তে যেন জোয়ার এসেছিল তাঁর জীবনপ্রবাহে। অন্তরের মণি-মঞ্জুষার কঠিন আবরণ সহসা শিথিল হয়ে গিয়েছিল।

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥"

হিরণ্ময় পাত্রদ্বারা সত্যের মুখ আবৃত রয়েছে। হে পূষন্, সে আবরণ অপসারিত করে দাও। আমি সত্যকে জানব, ধর্মকে উপলব্ধি করব। —উপনিষদের এই ত প্রার্থনা।

আর আজ মার্গারেটের সম্মুখেও সেই সত্য ও ধর্মকে দেখবার জন্য, তাদেরই নিগূঢ় মর্মবাণী উপলব্ধি করবার জন্য আচার্যের ছিল অপ্রত্যাশিত মহা-আহ্বান।

মার্গারেট মনেপ্রাণে অনুভব করেছিলেন যে এই সেই অপ্রত্যাশিত ইঙ্গিত—যা তার সমগ্র জীবনটিকে আমূল বদল করে দেবে, পরিবর্তিত করে দেবে।

"It was a call which would change my life."

বলা বাহুল্য কোন মামুলি বা আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণের জন্য সে আহ্বান-বাণী উচ্চারিত হয়নি। বেদনা-পীড়িত এ পৃথিবীর বিশাল কর্মশালা বর্জন করে আত্মমুক্তির চিরাচরিত পথ অনুসরণ করবার জন্যও সে আহ্বান ধ্বনিত হয়নি। পরন্তু, 'শিববোধে জীবসেবার' যে মহা-দায়িত্ব নিজ গুরুর কাছ থেকে তিনি স্বয়ং লাভ করেছিলেন এবং যার কথা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি—তাতে অংশ গ্রহণ করবার জন্যই নিজ মানসকন্যার প্রতি তাঁর ঐ আহ্বান ছিল।…

আজ মার্গারেটের দেহত্যাগের কত বৎসর অন্তে তাঁর মহৎ জীবনের সে অক্ষয় লগ্নটির কথা আমরা চিন্তা করি, ধ্যান করি। মার্গারেট অবশ্য কোনদিক দিয়েই একজন সাধারণ রমণী ছিলেন না।

বহু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এক প্রচণ্ড কর্মৈষণাও তাঁর প্রকৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। অনিশ্চিত এবং অনির্দিষ্ট এক রহস্যময় ভবিষ্যৎ তাঁকে যেন নিরবধি হাতছানি দিয়ে ডাকত। সে-কথা পূর্বেও উল্লেখ করেছি।

কাজেই, এটা সম্ভব যে স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান তাঁর মনে এক মহা-আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। তাছাড়াও ছিল সেই বিরাট পুরুষের বিচিত্র জীবন, বিচিত্র মহিমা,—যাঁকে দেখবামাত্র সমগ্র সত্তা উচ্চকিত হয়ে স্বতই যেন বলে উঠত—

"Behold, behold the man!"

তথাপি, ঠিক সেই মুহূর্তেই, স্বামীজীর পরিকল্পনার কথা শুনবার সঙ্গে সঙ্গেই, কোন চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হননি মার্গারেট।

হওয়া সম্ভবও ছিল না।

তার জন্য আরও সময়ের প্রয়োজন, আরও সন্দেহ-নিরসনের আবশ্যকতা ছিল। তাই দেখা যায় যে এ ঘটনার অব্যবহিত পরেই নিজ মনোগত প্রশ্ন-কয়েকটি সহজ বাক্যে গ্রথিত করে স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করছেন মার্গারেট:

আপনার জীবনের লক্ষ্য কি, ব্রত কি? কোন্ আদর্শের বাস্তব রূপায়ণে আপনি সতত নিযুক্ত আছেন? দুটি-একটি বাক্যে সে-কথা আমি জানতে চাই।…আমার নিজ জীবনের ঐকান্তিক প্রয়োজনের তাগিদেই সে-কথা আমার জানা বিশেষ দরকার।

"ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্॥

একদা বিগত অতীতে, মহাভারতের যুগে মহারথী ধনঞ্জয় পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলেছিলেন। কারণ ছিল তাঁর বিভ্রান্তি, কারণ ছিল তাঁর বিমূঢ়তা। বহু বিরুদ্ধ মতবাদের সংঘাতে বস্তুতই তিনি পীড়িত হয়েছিলেন সেদিন। আবার শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ় পরিচয়টিও তখন পর্যন্ত তাঁর কাছে অজ্ঞাত রহস্যের মত ছিল। সুতরাং, 'বুদ্ধিং মোহয়সীব মে'—এ অভিযোগটি স্বতই উচ্চারিত হয়েছিল তাঁর কণ্ঠ হতে।

তারপর শ্রীকৃষ্ণের নিকট থেকে শাশ্বত উপদেশ এবং দিব্যদৃষ্টি লাভ করে অনাসক্ত কর্মকৌশল তিনি জ্ঞাত হয়েছিলেন। উপলব্ধি করেছিলেন সৃষ্টিরহস্যের বিচিত্র মর্মকথা—

"ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।"

ফলে, অর্জুনের মোহ নষ্ট হয়েছিল, লুপ্তস্মৃতি পুনর্জীবিত হয়েছিল। তিনি আত্মস্থ হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করে বলেছিলেন,—

হে পুরুষোত্তম, তোমার প্রসাদে আমার মোহ অপসৃত হয়েছে, নষ্ট স্মৃতি আমি পুনরুদ্ধার করতে পেরেছি। এখন নিঃসংশয় হয়ে তোমার আদেশ আমি পালন করব। আমি যুদ্ধ করব।

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥"

ইত্যাদি…

আবার আজ, সে যুগের কত কাল, কত মন্বন্তর পরে—বিভ্রান্ত মার্গারেটের প্রশ্নের উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দও যেন অনুরূপভাবেই নিজ জীবনের নিভৃত মর্মকথাটি প্রকাশ করেছিলেন। একটি নাতিদীর্ঘ পত্রের মাধ্যমে সে পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছিল। সে পত্র মার্গারেটের সংশয়-পীড়িত চিত্তে অমৃতনিষেকের মত ক্রিয়াশীল হয়েছিল। চলার পথে চরমসিদ্ধান্ত গ্রহণের অগ্নিমন্ত্রই যেন বহন করে নিয়ে এসেছিল সেই পত্রখানি। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুন তারিখের লিখিত সে পত্রটি এইরূপ ছিল।—

"প্রিয় মিস নোবৃল,

আমার জীবনের আদর্শটিকে সংক্ষেপে এই ভাবে প্রকাশ করা চলে।

মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বাণী প্রচার করতে হবে এবং সর্বকার্যে সে দেবত্ব-বিকাশের পন্থা নির্ধারণ করে দিতে হবে।

কুসংস্কারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ এই সংসার। যে উৎপীড়িত, তাকে আমি করুণা করি—তা সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক। আর যে উৎপীড়নকারী—তার প্রতি আমার করুণা আরও বেশী।

আমার কাছে এ ধারণাটি দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে যে অজ্ঞতাই সর্বদুঃখের হেতু। তাছাড়া, আর কিছু নয়। জগৎকে কে আলো দেবে? কে পথ দেখাবে?

আত্মবিসর্জনই ছিল অতীতযুগের কর্মরহস্য। আর আমার মনে হয় অনাগত কালেও যুগ যুগ ধরেই তাই চলতে থাকবে। যাঁরা নির্ভীক, যাঁরা বরেণ্য, বহুজনের সুখের জন্য, বহুজনের হিতের জন্য—তাঁদেরই আত্মবিসর্জন দিতে হবে, আত্মত্যাগ করতে হবে। অনন্ত প্রেম ও করুণা বক্ষে নিয়ে শত শত বুদ্ধের আবির্ভাব হবে—এ কামনা নিয়ে চিরকাল এ জগৎ অপেক্ষা করবে।

জগতের ধর্মগুলি এখন প্রাণহীন মিথ্যা অভিনয়ে পর্যবসিত হয়েছে। এখন প্রয়োজন, একান্তভাবে প্রয়োজন—চরিত্র। প্রেম-প্রদীপ্ত জীবন চাই, স্বার্থহীন মানুষ চাই। তেমন মানুষের জীবন এবং প্রত্যেকটি কথা অব্যর্থ হবে, অমোঘ হবে।…

এসব তোমার কাছে কুসংস্কার বলে মনে হবে না আশা করি। তোমার মধ্যে এক বিরাট শক্তি রয়েছে, ক্রমে আরও শক্তি আসবে। আমরা চাই জ্বালাময়ী বাণী, আর জ্বলন্ত, জীবন্ত কর্মসাধনা। হে মহাপ্রাণ,—ওঠ, জাগো। দুঃখের আগুনে পুড়ে গেল সংসার, ছাই হয়ে গেল পৃথিবী—আর তুমি ঘুমাচ্ছ? এ নিদ্রা কি তোমার সাজে?

এস আমরা ডাকি, অবিশ্রাম ডাকি—যতক্ষণ না নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত হয়ে ওঠেন, যতক্ষণ না অন্তরের অধিদেবতা সাড়া দেন। মানুষের জীবনে এর চেয়ে বৃহত্তর, এর চেয়ে মহত্তর আর কি আছে বল?

আমি জানি খুঁটিনাটির জন্য কিছু আটকাবে না। আমার চলার পথে, গতির সঙ্গে সঙ্গেই সব প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি এসে যাবে। তাই, আটঘাট বেঁধে, প্ল্যান করে আমি কোন কাজ

করি না। কর্মপ্রণালী আপনি গড়ে ওঠে এবং নিজেই নিজের কাজ সাধন করে থাকে। আমি শুধু বলি,—ওঠ, জাগো। উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত! এই আমার কাজ, এই আমার জীবন-ব্রত!"

এই চিঠি। মর্মস্পর্শী এই লিপির আবেদন মার্গারেটের জীবনে সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তনের এক বিস্তৃত পটভূমি রচনা করেছিল। আর শুধু, পটভূমি রচনাই বা বলি কেন,—সে পত্রের প্রত্যক্ষ আবেদনের ফলেই নিজ দেশ, আত্মীয়-পরিজন, সমাজ, কর্মভূমি—এক কথায় জীবনের আকাঙ্ক্ষিত যা-কিছু সব চিরদিনের মত পিছনে ফেলে ভারতবর্ষের সেবায় আত্মোৎসর্গ করবার চরম সঙ্কল্প তিনি গ্রহণ করেছিলেন এবং দু'বৎসরেরও অনধিক কাল মধ্যেই অর্থাৎ ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাসে তিনি ভারতবর্ষে উপনীত হয়েছিলেন। সোনার বাংলার সরস মাটিতে সেই মার্গারেটের প্রথম পদার্পণ।...

ইতিমধ্যে অবশ্য পর পর আরও কতগুলি মহামূল্যবান চিঠি লিখেছিলেন স্বামীজী মার্গারেটকে। সে সব চিঠির ছত্রে ছত্রেও কত আশীর্বাদ, কত অনাবিল স্নেহধারা বর্ষিত হয়েছিল। মার্গারেটকে নিয়ে স্বামীজীর যে স্বপ্ন, যে দূর-প্রসারিত আশা—সে সব যেন স্তবকে স্তবকে প্রস্ফুটিত হয়েছিল সে সব পত্রগুচ্ছে—আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন ভারতের যে রূঢ় বাস্তব চিত্র, যে ক্ষুৎ-পীড়িত বেদনার্ত ছবি—তাও উদ্ঘাটিত হয়েছিল নিখুঁত বর্ণনায়, পরিচ্ছন্ন চিত্রে। তাদের মধ্যে উৎসাহ-প্রেরণাও ছিল যেমনি অফুরন্ত—সতর্ক সাবধান বাণীও ছিল তেমনি প্রচুর।...সেজন্য, উদাহরণ হিসাবেই আরও একটি পত্র এখানে আমরা উদ্ধৃত করব। স্বামীজী লিখেছিলেন,—

"তোমাকে খোলাখুলিভাবেই একটি কথা বলছি। এখন আমার মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে যে ভারতবর্ষের সেবায়, ভারতবর্ষের কল্যাণকল্পেই তোমার ভবিষ্যৎজীবন চিহ্নিত হয়ে আছে।

আজ আমাদের দেশের জন্য, বিশেষ করে তার নারীসমাজের জন্য একটি শক্তিমতী নারী চাই। পুরুষ নয়, নারী। যোগ্যা, মনস্বিনী নারী। সিংহিনী-সম মহিলা। ভারতভূমির ঊষরতা এখনো ঘোচেনি, যোগ্য নারীর উদ্ভব এখনো সেখানে বিরল। তাই অন্যদেশ থেকে ধার করা ভিন্ন তার গত্যন্তর নেই।

তোমার শিক্ষা ও ঐকান্তিকতা, তোমার শুচিতা ও প্রেম,—সর্বোপরি, তোমার ধমনীমধ্যে প্রবাহিত যে কেল্টিক-রক্ত, তারই জন্য তুমিই প্রত্যুত সেই যোগ্যা নারী—যার প্রয়োজন আজকের ভারতবর্ষে অপরিহার্য। তবে, এর মধ্যে একটি কথা আছে। সেটিও তোমাকে খোলাখুলিভাবেই বলা দরকার!

মহৎ কর্মের পথের বাধা সর্বদাই দুরতিক্রম্য হয়ে থাকে। 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি'।...এ দেশের দুঃখ যে কত গভীর, কত মর্মান্তিক, মানুষের কুসংস্কার এবং দাসত্বের বদ্ধতা যে এখানে কত ব্যাপক তা তুমি ধারণাও করতে পারবে না। স্বাধীন দেশের পরিচ্ছন্ন আবহাওয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে সেটা ধারণা করা সম্ভবও নয়। এ দেশে সত্যি যদি তোমার আসা হয়, তবে দেখতে পাবে অর্ধ-ভুক্ত, অর্ধ-উলঙ্গ, অশিক্ষিত নরনারীর এক অবিশ্রান্ত জনতা! জাতি-বিচার আর ছোঁয়াছুঁয়ি সম্বন্ধে এদের ধারণা বীভৎস। ভয়েই হোক আর ঘৃণায়ই হোক শ্বেতাঙ্গদের স্পর্শ করতেও এরা সঙ্কুচিত হয়। শ্বেতাঙ্গগণও এদের অন্তর থেকে ঘৃণা করে। অথচ, এদেরই মধ্যে তোমাকে বাস করতে হবে, এদেরই জন্য কাজ করতে হবে।

তোমার স্বদেশবাসিগণ তোমার কাজ অত্যন্ত

অপছন্দ করবেন। তাঁরা তোমাকে উন্মাদ মনে করবেন, সন্দেহের চোখে দেখবেন।

তার উপর, এদেশের জল-হাওয়াও তোমার পক্ষে প্রতিকূল হবে। গ্রীষ্মপ্রধান এই দেশ। এখানকার শীতও তেমন তীব্র নয়—অনেকটা তোমাদের গ্রীষ্মকালের মত। আবার, দক্ষিণাঞ্চলে তো বারো মাসই যেন আগুনের হল্কা চলছে। শহরের বাইরে কোথাও ও-সব দেশের মত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোন উপকরণ পাওয়া যায় না।

তথাপি, এসব জেনেও, যদি তুমি এদেশের কাজে ব্রতী হও, এদেশের সেবায় আত্মোৎসর্গে কৃতসঙ্কল্প হও,—তবে শতবার, সহস্রবার আমি তোমাকে স্বাগত আহ্বান জানাব।

তুমি এস। তোমার মত নারীর, তোমার মত কন্যার প্রয়োজন আজকের ভারতবর্ষে যে কত গভীর তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।···

কিন্তু, আমি আবারও বলছি। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে বিশেষভাবে সবদিক ভেবে দেখো, বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে ধীরভাবে পূর্বাপর চিন্তা করে নিও। তারপর ঝাঁপ দিও। ফলের জন্য চিন্তিত হয়ো না। তোমার সযত্ন প্রয়াস সত্ত্বেও আকাঙ্ক্ষিত ফললাভে যদি ব্যর্থ হও, যদি কর্ম-আবর্তে বিরক্তি বা অবসাদ আসে—তাতেই বা কি? আমার দিক থেকে সেজন্য কোন ভাবান্তর উপস্থিত হবে না।···আমি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তোমার পার্শ্বে থাকব। তুমি ভারতবর্ষের জন্য কাজ কর, আর না-ই কর, বেদান্তের ভাবধারা গ্রহণ কর অথবা বর্জন কর—কি আসে যায় তাতে?"

"I will stand by you unto death, whether you work for India or not, whether you give up Vedanta or remain in it."

"মরদ্‌কা বাত, হাতীকা দাঁত,—একবার বেরিয়ে এলে আর কি ফেরে? না, ফেরে না। পুরুষের বাক্যও ঠিক সেইরূপ জেনো।"

"The tusks of the elephant come out, but they never go back. Even so are the words of a man."···

আবার, একালে এবং এ-প্রসঙ্গেই আরো একটি সতর্কবাণী উল্লেখ করেছিলেন স্বামীজী, এবং সেও পত্রেরই মাধ্যমে।···

"ভারতবর্ষের কাজে সর্বতোভাবে তোমাকে আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। কারু পক্ষপুটে আশ্রয় নেওয়া তোমার চলবেনা।···

'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥'

এই শাস্ত্রবাক্যটি সতত স্মরণে রেখে কর্মের সংকট-সংকুল পথে তোমাকে অগ্রসর হতে হবে।" ইত্যাদি···

তবে, এসব চিঠি যে সময় মার্গারেটের হাতে পৌঁছেছিল তখন নিজের দিক থেকে তাঁর সঙ্কল্প বহুলাংশেই দৃঢ়বদ্ধ হয়ে গেছে। ভারতবর্ষেই আসবেন মার্গারেট, এ-দেশের সেবায়, বিশেষ করে এ-দেশের নারীজাতির সেবায়ই আত্মোৎসর্গ করবেন তিনি। যদিও তখন পর্যন্ত ইংলণ্ডের কর্মজীবন থেকে মার্গারেট অবসর গ্রহণ করেননি। স্নেহময়ী জননীর অনুমতিও প্রার্থনা করা হয়নি।···

ভারতবর্ষ, ভৌগোলিক বিচারে একটি উপ-মহাদেশের মত যার বিস্তৃতি—সেটিও তখন পর্যন্ত তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বাইরে। শুধু পুঁথির পাতায় আর স্বামীজীর জীবনের মধ্য দিয়েই তার অস্পষ্ট পরিচয় তিনি লাভ করেছেন। তথাপি দুর্নিবার আকর্ষণ আসছে সূক্ষ্ম চিন্তার পথে। স্বামী বিবেকানন্দের

আন্তরিক আহ্বান তাঁকে টানছে, সে মহা-পুরুষের অপার্থিব স্নেহ, সেও তাঁকে টানছে। টানছে দুর্নিবার শক্তিতে, বিরামহীন প্রক্রিয়ায়। আর তারই ফলে অন্তরের অন্তস্তলে সঙ্কল্পের একটি সুদৃঢ় বুনিয়াদ ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। আবার, তারই সঙ্গে সঙ্গে কেমন এক ঔদাসীন্যও যেন অন্তরকে দিনে দিনে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে।

এই দু'দিনের নশ্বর জীবনের সীমিত পরিধি অতিক্রম করে যে জীবন-মন্দাকিনী—কল্প থেকে কল্পান্তরে, জন্ম থেকে জন্মান্তরে অবিশ্রাম প্রবাহে গতিশীলা, তারই আহ্বান যেন মার্গারেটের কর্ণে প্রবেশ করে তার অতীতকে বিস্বাদ করে দিচ্ছে, পারিপার্শ্বিকতার বন্ধন শিথিল করে ফেলছে আর ক্ষণে ক্ষণে, বিচিত্র রোমাঞ্চ নিয়ে এক নূতন জীবনের তীব্র, তীক্ষ্ণ আহ্বান ধ্বনিত হচ্ছে মর্মমূলে। ডাকছেন, স্বামীজী যেন ডাকছেন,—

"The world is burning in miseries. Can you sleep? Awake, awake, great soul!"

যেন বলছেন,—

"চল তব বাধাহীন পথে
শ্রান্তিহীন, ক্লান্তিহীন গতি,
যতদিন ওই তব মহাদ্যুতি প্রখর প্রভায়
প্লাবিত না হয় বিশ্ব, পৃথিবীর সর্বদেশে
সেই আলো নহে বিচ্ছুরিত, যতদিন
সকল মানব
তুলি উচ্চশির—নাহি হেরে টুটিল শৃঙ্খল,
নাহি জানে আনন্দেতে পরিতৃপ্ত
তাদের জীবন।"—

ধন্য যে আমি তাই

শ্রীমতী বিভা সরকার

যা দিয়েছ তুমি অনেক দিয়েছ, ধন্য করেছ প্রভু,
যা পাইনি তার বেদনা-বিলাপে শোক জাগাব না কভু!
মুঠি মুঠি তুলি' হৃদয়ের সোনা বিলাইয়া দি'ছি না করি ভাবনা,
অপরাহ্নের সীমানায় মন চমকিয়া চায় তবু;
যা পেয়েছি তা তো অনেক পেয়েছি, ধন্য হয়েছি প্রভু!
মিলিল না যাহা ভুলিয়া তা মন সুখে-দুঃখে যেন করে সমজ্ঞান,
মানস-সরসী বৃথা উদ্বেল জীবনের সুখে-দুঃখে,
সব সুখ-দুঃখ-মন্থন ধন! অনুক্ষণ আছে বুকে।
দাও সুধা-রস মন-ভৃঙ্গারে, ক্ষোভ ঘুচে যাক স্মরিয়া তোমারে,
সুখ-দুঃখাতীত অমিয় সায়রে গাহন করিতে চাই,
সুখে-দুখে মোরে টানিছ সে পথে, ধন্য যে আমি তাই।

বুদ্ধপূর্ণিমা*

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ধম্মং সরণং গচ্ছামি।
সংঘং সরণং গচ্ছামি।

আজ বুদ্ধপূর্ণিমা। আনতশিরে স্মরণ করি সেই করুণাঘন অমিতাভকে যাঁর দীপ্ত, মুক্ত মহাজীবনের আলোয় পৃথিবীর কত নরনারী জ্বালিয়ে নিলো তাদের জীবন-প্রদীপ। রাজার ঘরে তিনি জন্মেছিলেন। যৌবন ছিল, সিংহাসন ছিল, ...পুষ্পগন্ধে সুরভিত প্রমোদ-উদ্যান ছিল, আর ছিল জীবনসঙ্গিনী—সুন্দরী যশোধরা।

রাজপুত্রের সোনালি দিনগুলি প্রাসাদের সুখময় নীড়ে উচ্ছল আনন্দরসে কানায় কানায় ভরা। প্রাচুর্যের এবং সৌন্দর্যের মধ্যে তবু তরুণ গৌতমের চিত্তে মাঝে মাঝে কেন নেমে আসে নৈরাশ্যের কালো ছায়া? মনের মধ্যে কেন তিনি অনুভব করেন একটা দারুণ অতৃপ্তি? কোন্ দিগন্তের পার থেকে কে যেন কানে কানে তাঁকে বলে: "হেথা নয়, হেথা নয় আর কোনখানে।"

জীবনের এমনি একটা হতাশাময় মুহূর্তে মন যখন তাঁর ক্লান্তিতে ভারাক্রান্ত ছিল তখন রথে চলতে চলতে তিনি দেখতে পেলেন বার্ধক্যে নুয়েপড়া এক জরাগ্রস্ত ব্যক্তিকে। দেখেই মন তাঁর কেমন বিমর্ষ হয়ে গেল! সারথি বললো, 'জীবনের এই নিয়ম! আমরা কেউ জরা থেকে রক্ষা পাব না।' আর একটু দূর গিয়ে রাজপুত্র দেখলেন, এক ব্যক্তি ব্যাধির যন্ত্রণায় খুবই কষ্ট পাচ্ছে। সারথি বললো, 'দেহ থাকলে ব্যাধির হাত থেকে কারও নিস্তার নেই। তৃতীয় দৃশ্যের পটভূমিতে রাজপুত্র দেখলেন এক মৃতের দেহ। সারথি আবার শোনালো: 'যার জন্ম আছে তার মৃত্যুও আছে।'

বাস্তবের রূঢ় ধাক্কায় গৌতমের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হোলো! এতদিন তিনি সুখের মরুমায়ায় অবাস্তবের মধ্যে বাস করেছেন! মৃত্যুর খড়্গের ছায়ায় যা অনিত্য তাকেই নিত্য ভেবে ভোগপরিবৃত হয়ে ছিলেন। যেখানে সবই পরিবর্তনশীল, সবই নিমেষে নিমেষে কালের মুখ-গহ্বরে বিলীয়মান সেখানে রাজমুকুটের আর যশোধরার আকর্ষণে প্রাসাদের স্বর্ণপিঞ্জরে বাঁধা থাকতে মন তাঁর রাজী নয়। তিনি সত্যকে জানবেন আর সত্যকে জেনে দুঃখময় জীবনের জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহকে অতিক্রম করবেন।

অবশেষে অন্তরাত্মার গভীর থেকে এলো সেই অমোঘ আহ্বান যে-আহ্বানে সাড়া দিয়ে সত্যান্বেষী সাধকেরা যুগে যুগে কূলহীন সমুদ্রের অজানায় জীবনতরী ভাসিয়ে দিয়েছে! ভগবান প্রত্যেকটী মনের সামনে সত্য এবং আরাম—দুটীকেই রেখেছেন। এ দুয়ের যে-কোন একটীকে বেছে নেবার স্বাধীনতা মানুষকে তিনি দিয়েছেন। যেটা খুশি তুমি বেছে নিতে পারো। কেবল দুটোকে একত্র নেওয়া কখনোই চলবে না। মানুষের স্বভাবে সত্যের এবং আরামের অদ্ভুত একটা মিশেল আছে। সে কখনো সত্যকে চায়, কখনো আরামকে। মানুষ দু'য়ের মাঝে অনবরত দুলছে যেন ঘড়ির দোলক। আরামের দিকে যার ঝোঁক সে চাইবে পার্থিব

(* অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সৌজন্যে)

সুখসম্পদ, প্রাচুর্যের মধ্যে নিরাপত্তা এবং শান্তি, যশোলক্ষ্মীর অনুগ্রহ। আর সত্যানুরাগ যার স্বভাবে প্রবল সে তো গতানুগতিকতার আতপ্ত কোটর-জীবনের অকিঞ্চিৎকর সুখে লোভ করবে না; বন্দরের শান্ত জলে নোঙর ফেলে কূল আঁকড়ে থাকবে না। পৃথিবীর কোন বন্ধনই যে তার জন্যে নয়।

একদা গভীর রাত্রে সত্যাশ্রয়ী গৌতম গৃহত্যাগী হলেন সমস্ত মানুষের জন্যে মুক্তির অমৃত আহরণ করতে। জরা-মৃত্যু-ব্যাধি-ক্ষুধা-তৃষ্ণার দাস মানুষের এই বাসভূমি মর্ত্যলোকে তিনি আবিষ্কার করবেন সেই পথ যে-পথ আর্ত-মানবতাকে মুক্তির আনন্দলোকে পৌঁছে দেবে। সত্যের প্রতি সুগভীর অনুরাগে এবং মানুষের প্রতি সীমাহীন প্রেমে গৌতম বৈরাগ্যের কঠিন রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। ষোলো আনা মন সত্যান্বেষণে ঢেলে দিলে তবেই না সত্যকে পাওয়া যায়! কপিলাবস্তুর রাজপ্রাসাদের নানা প্রলোভনের মধ্যে চিত্তকে লক্ষ্যে একাগ্র রাখা কোনমতেই সম্ভব ছিল না। তপস্যায় সফলকাম হওয়ার জন্যে গৌতম তাই ত্যাগের দুর্গম পথের পথিক হলেন।

পরিব্রাজক রাজপুত্র পথের এক ভিখারীর সঙ্গে নিজের পরিচ্ছদ বিনিময় করলেন। কেটে ফেললেন মাথার চাঁচরকেশ, খুলে ফেললেন অঙ্গের অলঙ্কার। রাজপুত্রের পার্থিব কোন বন্ধনই আর রইলো না। জ্ঞানের অন্বেষণে ব্রতী হবার জন্যে দেহে মনে তিনি এখন প্রস্তুত। বোধিদ্রুমমূলে সাধনা সুরু হোলো—চরমসত্যকে উপলব্ধি করবার নির্জন সাধনা। ইতিহাসের নিঃসঙ্গতম একটী মানুষ অন্তরের গভীরে আলোর জন্যে কী কঠিন সংগ্রাম ক'রে চলেছেন! একলা মনের সত্যানুসন্ধানের সেই দুর্জয় অভিযান অবশেষে একদিন উপলব্ধির শিখরে তাঁকে পৌঁছে দিলো। তাঁর মনে আর কিছুমাত্র সংশয় রইলো না।

গৌতমকে সাধনার পথ থেকে ভ্রষ্ট করবার জন্যে মারের প্রলোভনের সেই রোমাঞ্চকর কাহিনীটি! মার অর্থাৎ যে মৃত্যুর জালে মানুষকে জড়ায়। কামনাই তো আমাদিগকে আত্মকেন্দ্রিক করে, ব্যক্তিগত তৃষ্ণার ফেনিল আবর্তে আমাদিগকে ক্রমাগত ঘুরপাক খাওয়ায়, আমাদের আত্মাকে সম্প্রসারিত হ'তে দেয়না বৃহৎ জগতের মধ্যে। আর আত্মার এই সংকোচই তো আসল মৃত্যু। তাই কামনার আর এক নাম মার। মার গৌতমকে বলল, 'কপিলাবস্তুতে ফিরে গিয়ে রাজ-সিংহাসনে বসো। কি হবে জীবনটাকে নিষ্ফল সাধনায় ব্যর্থ করে দিয়ে?' কিন্তু সত্যকে জানবার জন্যে গৌতম কঠোপনিষদের নচিকেতার মতোই তখন মরিয়া! সেই নচিকেতা যিনি যমের কাছে জানতে চাইলেন, মৃত্যুর পর মানুষ থাকে অথবা থাকেনা। যম যুবককে নিরস্ত করবার জন্যে কত প্রলোভনই না দেখালেন! নচিকেতা কিন্তু পার্থিব কোন সুখই কামনা করলেন না। তিনি জ্ঞানকেই বেছে নিলেন। মারের সঙ্গে সংগ্রামে গৌতম জয়লাভ করলেন। কামনার যখন নিঃশেষে মৃত্যু হোলো তখন উপলব্ধির জ্যোতিঃসমুদ্রে গৌতমের সংশয়ের সমস্ত অন্ধকার অকস্মাৎ মিলিয়ে গেল! তাঁর চিত্ত কানায় কানায় ভরে উঠল এক অনির্বচনীয় প্রশান্তিতে। তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করলেন! বোধিদ্রুমমূলে সত্য লাভ ক'রে গৌতম বারাণসীতে এলেন। সারনাথে তাঁর পাঁচজন প্রাক্তন অনুচরের কাছে উপলব্ধিগত সত্যকে তিনি প্রথম ব্যক্ত করলেন। গৌতম যে বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন, অন্ধকার থেকে জ্যোতিতে পৌঁছেছেন, এ বিষয়ে তাদের মনে আর কোন সন্দেহ রইলো না। সারনাথের

মৃগদাবে নবধর্মের প্রতিষ্ঠা হোলো, যারা বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করল তাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে চলল।

গৌতমের মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে, জীবনের সমস্ত দুঃখের মূলে লুব্ধ বাসনার বহ্নি-দাহ, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ধাবমান চঞ্চল চিত্তের ইন্দ্রিয়-ক্ষুধার তাড়না। শুধু ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা নয়; সেই ক্ষুধার সঙ্গে আছে ব্যক্তিগত অমরত্বের কামনা এবং জাগতিক সম্পদের লালসা। এই ত্রিবিধ কামনাকে জয় করতে পারলে তবেই দুঃখের পারে পৌঁছানো সম্ভব। জীবনের বেদীতে তৃষ্ণা-রাক্ষসী প্রতিষ্ঠিত থাকতে ছায়া থেকে ছায়ার পিছনে দৌড়ে দৌড়ে শুধু ক্লান্তি কুড়ানোর বিড়ম্বনা! ব্যক্তিগত চিন্তারাশির কেন্দ্র থেকে আমি—এই উত্তম পুরুষটী চলে গেলেই আত্মার প্রশান্তি! নির্বাণ মানে বিলুপ্তি নয়; যে সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা নিতান্তই আত্মকেন্দ্রিক এবং সেইজন্যেই যারা জীবনকে ক্ষুদ্র করে নির্বাণের মধ্যে সেই ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলির অবসান!

ইতিহাসের বিচিত্র ঘটনার পটভূমিতে বুদ্ধকে দাঁড় করিয়ে তাঁর বাণীর বিশাল তাৎপর্য উপলব্ধি করবার দিন এসেছে আজ। শক্তির মোহে, ঐশ্বর্যের মোহে, খ্যাতির মোহে, জাগতিক সুখের মোহে অন্ধ মানুষের দূষিত স্বার্থবুদ্ধি পৃথিবীকে আজও নরকেরই সামিল করে রেখেছে। বুদ্ধের সমস্ত উপদেশের মূলে অনাসক্তির আদর্শ। ব্যক্তিগত স্বার্থের সীমানার বাহিরে বৃহৎ জগতের মধ্যে নরনারী যতক্ষণ নিজের চেতনাকে, নিজেদের সত্তাকে প্রসারিত করতে না পারছে ততক্ষণ সমাজে শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, শান্তি অথবা সুখ আসবে কেমন করে?

পৃথিবীর শিরে আসন্ন মহাযুদ্ধের ছায়া যখন ঘনায়মান, এসিয়ার পূর্ব-দক্ষিণে যখন হিংসার আগুন জ্বলে উঠেছে তখন কি এই বুদ্ধপূর্ণিমায় আমরা স্মরণ করবোনা সেই করুণাঘন মহা-মানবকে যিনি কায়মনোবাক্যে অহিংসার আদর্শকে অনুসরণ করবার কথা বারম্বার আমাদিগকে বলেছেন? সর্বজীবে দয়া, সর্ব-ভূতে আত্মোপলব্ধি—অহিংসার এই আদর্শকে আমাদের জীবনের দৈনন্দিন খুঁটিনাটি কথাবার্তায় এবং আচরণে সত্য করে তুলবার তপস্যা করে গেছেন বুদ্ধ।... বৌদ্ধধর্ম প্রধানতঃ আমাদের আচরণ নিয়ে। এই ধর্ম আমাদিগকে বলেছে, ক্রোধ সর্বথা পরিত্যাজ্য। বলেছে, যুদ্ধে হস্তী যেমন নিক্ষিপ্ত শরজালকে বহন করে—তেমনি করেই আমরা যেন অপরের কঠিন তিক্ত বাক্য বহন করি। বুদ্ধ বলেছেন,যে মানুষ নিজেকে নিজের শাসনে এনেছে তার জুড়ি নেই। বলেছেন, বন্যকুঞ্জরের মতোই পৃথিবীতে নির্জনে বিচরণ করো। জটা রাখলে, উলঙ্গ থাকলে, উপবাস বা মৃত্তিকায় শয়ন করলেই ব্রাহ্মণ হয়না। শান্ত, অচঞ্চল জীবন যে যাপন করে, যে সংযমী, কোন প্রাণীরই ক্ষতি করেনা এবং সত্যাশ্রয়ী, আসল ব্রাহ্মণ সে-ই। বুদ্ধের বাণীর মধ্যে এমনি মণি-মুক্তার প্রাচুর্য। তিনি পুরাতন হয়েও আমাদের কাছে চিরনূতন। যে অমৃতবাণী আমাদের জন্যে তিনি রেখে গেছেন তার বিপুল তাৎপর্য যদি আমরা সম্যক উপলব্ধি করতে পারতাম!

রামায়ণ-প্রসঙ্গ

[পূর্বানুবৃত্তি]

প্রব্রাজিকা ঋতপ্রাণা

সীতার অগ্নিপরীক্ষা

রামায়ণে সীতাপ্রসঙ্গ প্রায় সর্বত্রই বেদনাদায়ক। সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত আদর্শ স্থাপন করিবার জন্যই তাঁহার দেহ-পরিগ্রহণ। অশোকবনে তরুতলে উপবিষ্টা রাক্ষসী-পরিবেষ্টিতা জনকনন্দিনী মুহূর্ত গণনা করিয়া দিন কাটাইতেছেন। কবে রামচন্দ্র আসিয়া তাঁহাকে শত্রুপুরী হইতে উদ্ধার করিবেন! কখনো দূর হইতে রাক্ষসগণের বিজয়োল্লাস শ্রবণে হৃদ্‌স্পন্দন যেন থামিয়া যায়, সংবাদ আসে রাম লক্ষ্মণ জীবিত নাই। আবার সরমা রাক্ষসী ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দেয়, বীর রাক্ষসগণ একে একে নিহত হইতেছে; রাম-লক্ষ্মণের জয় সুনিশ্চিত। অবশেষে বুঝি দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হইল। আনন্দে উল্লসিত মহাবীর সীতা-সমীপে করজোড়ে নিবেদন করিলেন, রামচন্দ্র বিজয়লাভ করিয়াছেন, রাবণ নিহত। আনন্দ-আবেগে রুদ্ধকণ্ঠ সীতা ক্ষণকাল কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তারপর মহাবীরের প্রশ্নে ধীরে ধীরে বলিলেন, এমন কোন উৎকৃষ্ট রত্ন তাঁহার জানা নাই যাহা দিয়া এই প্রিয় সংবাদ জ্ঞাপনের জন্য তিনি মহাবীরকে পুরস্কৃত করিতে পারেন। কিন্তু সীতার স্নেহপূর্ণ বাক্য অপেক্ষা কোন্ বস্তু মহাবীরের নিকট অধিক আদরণীয়? মহাবীর বলিলেন, কেবল একটি মহৎ ও প্রিয় বর তিনি প্রার্থনা করেন। সীতা উহা প্রীতিসহকারে দান করেন এবং শ্রীরামচন্দ্রও উহা অনুমোদন করেন, ইহাই তাঁহার অভিলাষ। যে সকল বিকৃতমুখী রাক্ষসী রাবণের আদেশে নিষ্ঠুর বাক্য ও আচরণে এতদিন তাঁহাকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়াছে সেই নৃশংস আচরণকারিণীগণকে তিনি মুষ্টি ও বাহু দ্বারা প্রহার এবং চক্ষু উৎপাটন, কর্ণ-নাসিকা ছেদন, কেশোৎপাটন প্রভৃতি দ্বারা ক্লেশপ্রদানে সমুৎসুক। সীতা কি তাঁহার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন না?

মহিমান্বিতা সীতার অন্তঃকরণে রাক্ষসীগণের প্রতি কোন বিদ্বেষ ছিল না, পরন্তু শুভ-সংবাদে তাহাদের প্রতি স্নেহেরই সঞ্চার হইল। স্মিতহাস্যে তিনি বলিলেন, দাসীরা সর্বদাই পরাধীনা, অসহায়া, রাজার আশ্রয়ে থাকে, অতএব তাহাদের রাজাজ্ঞা পালন করিতে হয়! তাহারা কদাপি ক্রোধের উপযুক্ত পাত্র নহে। বিশেষতঃ তিনি মনে করেন, সর্বপ্রকার দুঃখভোগ তাঁহারই পূর্বকৃত কর্মফল। মহাবীর মানিয়া লইলেন। রামপত্নী যশস্বিনী সীতারই উপযুক্ত কথা। অতঃপর মহাবীর বিদায় প্রার্থনা করিলে সীতা তাঁহাকে বলিলেন, তিনি রামচন্দ্রকে দর্শন করিতে চাহেন।

মহাবীরের নিকট সীতার বার্তা শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বহুক্ষণ নীরব রহিলেন। অবশেষে দীর্ঘ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তিনি বিভীষণকে অনুরোধ করিলেন,—অবগাহনস্নাতা, উৎকৃষ্ট অঙ্গরাগ ও অলঙ্কার বিভূষিতা বিদেহরাজনন্দিনীকে আমার সমীপে আনয়ন কর।

সীতা বোধ হয় অনুমান করিয়াছিলেন, তাঁহার দুঃখের রজনী তখনও প্রভাত হয় নাই, তাই বিভীষণ রামের আদেশ নিবেদন করিলে

তিনি বলিলেন, স্নান অথবা সজ্জার কোন প্রয়োজন নাই, তিনি যে অবস্থায় রহিয়াছেন, সেই অবস্থাতেই রামচন্দ্রকে দর্শন করিবেন। কিন্তু বিভীষণ যখন বলিলেন, রামচন্দ্রের নির্দেশ পালন করা উচিত, তখন সীতা আর প্রতিবাদ করিলেন না। পরিচারিকাবৃন্দ সীতাকে স্নান করাইয়া মহামূল্য পরিচ্ছদ ও আভরণে সজ্জিত করিল। উৎকৃষ্ট শিবিকায় আরোহণ করিয়া জনকনন্দিনী রামচন্দ্র-দর্শনে চলিলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, মহাকবি বাল্মীকি পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানবচরিত্র অঙ্কিত করিতে চাহিয়াছিলেন, যে চরিত্র সর্ববিষয়ে দেবগণকেও অতিক্রম করিবে। বাল্মীকির রামচন্দ্র তাই সর্বগুণসম্পন্ন মানব, তাঁহার রচিত রামায়ণে রামের লৌকিক চরিত্রই সুপরিস্ফুট, তবে সে লোক-চরিত্র অনুপম, অসাধারণ। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর সীতাদর্শনে একদিকে সুগভীর স্নেহ, আবার সেই সঙ্গে সমাজের কঠোর অনুশাসন স্মরণে ক্রোধের উদয়—উভয় বৃত্তির পরস্পর সংঘাতে রামচন্দ্রের সমুদ্রসদৃশ গভীর হৃদয় আলোড়িত। ভুলিয়া যাইতে হয় এ ঘটনা প্রাচীন যুগের। হৃদয়ের চিরন্তন বৃত্তিগুলি উপেক্ষা করিয়া কেবল ঘটনার বিন্যাস ও অলৌকিকত্ব স্থাপন, বাল্মীকির রামায়ণে কোথাও নাই। যেখানে ইহার ব্যতিক্রম, অনুমান করিতে কষ্ট হয় না, ঐ অংশ পরবর্তীকালে সংযোজিত।

শিবিকারোহণে সীতা রামচন্দ্র-দর্শনে চলিয়াছেন পথের দুইধারে কৌতূহলাক্রান্ত শত শত বানর ও রাক্ষস দাঁড়াইয়া। বিদেহরাজনন্দিনী নারীশ্রেষ্ঠ সীতা দেখিতে কীরূপ—যাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য মহাসমুদ্রের উপর সেতুবন্ধন, যাঁহার জন্য রাক্ষসাধিপতি রাবণ নিহত, বানরবংশের সঙ্কটদশা উপস্থিত হইয়াছিল, অনেক বানর নিহতও হইয়াছে!

এদিকে বিজয়লাভ করিয়াও রামচন্দ্র চিন্তামগ্ন। বহুকাল রাক্ষসগৃহবাসিনী সীতার আগমনসংবাদ ঘোষণা করিলে তাঁহার হৃদয়ে এককালে হর্ষ, দৈন্য ও ক্রোধ উপস্থিত হইল। অবশেষে নিজকে সংযত করিয়া নির্দেশ দিলেন—শিবিকা তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করা হউক! উষ্ণীষধারী রক্ষিগণ বেত্রদ্বারা পথের উভয় পার্শ্বে অপেক্ষমাণ উৎসুক জনতাকে বিতাড়ন করিতেছে দেখিয়া করুণার্দ্রহৃদয় রামচন্দ্র বিভীষণকে ডাকিয়া নিষেধ করিতে বলিলেন। প্রজাগণ রাজার পুত্রসদৃশ, সুতরাং সীতা তাহাদের জননী। ইহা ব্যতীত সৎস্বভাবই স্ত্রীলোকের যথার্থ আবরণ:

ন গৃহাণি ন বস্ত্রাণি ন প্রাকারা ন সৎক্রিয়াঃ।
ন চান্যো রাজসৎকারঃ শীলমাবরণং স্ত্রিয়াঃ॥
ব্যসনেষু বিবাহেষু কন্যানাং চ স্বয়ম্বরে।
ক্রতৌ সংসৎসু চ স্ত্রীণাং দর্শনং সর্বলৌকিকম্॥

—গৃহ, বস্ত্র, প্রাচীর, সৎকার্য এবং রাজকৃত সম্মান কখনো নারীর প্রকৃত আবরণ হইতে পারে না। ইহা ব্যতীত বিপৎকালে, বিবাহ ও স্বয়ম্বর সভায়, যজ্ঞক্ষেত্রে, এবং কন্যাদর্শন বা পরীক্ষাসভায় নারীগণের দর্শন সর্বলোকসিদ্ধ। সম্প্রতি যুদ্ধের বিষয়ীভূতা এই সীতাদেবী মহাবিপদের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন, সুতরাং ইঁহার দর্শনে দোষ নাই, বিশেষতঃ আমার সমীপে।

—অতএব শিবিকা পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজেই বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে আমার সমীপে আনয়ন কর, বানরগণ ইঁহাকে অবলোকন করুক—রামের এই আদেশে বিভীষণ এবং সুগ্রীব হনুমান্ প্রভৃতি বানরগণ চকিত হইয়া পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রামের নয়নে অন্তর্নিহিত ক্রোধ অনুমিত হয়। তাঁহার অভূতপূর্ব আকৃতি দর্শনে সকলেই শঙ্কিত।

'রামচন্দ্র সীতার প্রতি কীদৃশ ব্যবহার করিবেন' না বুঝিতে পারিয়া লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, অঙ্গদ প্রভৃতি লজ্জায় ও চিন্তায় মৃতপ্রায়। অথচ কাহারও সাহস নাই যে, রামচন্দ্রকে কোন প্রশ্ন করিবেন।

সীতা তখন শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজেই গমন করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষে নারীগণের অবগুণ্ঠন-প্রথা তখন ছিল না। তবে উপরের শ্লোক হইতে অনুমিত হয়, নারীগণ বিশেষ বিশেষ স্থলে জনতার সম্মুখে অবস্থান করিতেন। বিশেষতঃ রাজান্তঃপুরবাসিনী সহস্র কৌতূহল দৃষ্টির সম্মুখে পদব্রজে গমন করিবেন—ইহা কোনক্রমেই শোভনীয় নহে।

মূর্তিমতী লক্ষ্মী, লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং দেহধারিণী সূর্যপ্রভার ন্যায় সীতা বহু দৃষ্টির সম্মুখে সঙ্কুচিতা হইয়া যখন নতমস্তকে অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে ধীরপদক্ষেপে রামচন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইলেন তখন কোলাহলকারী বিপুল জনতা মুহূর্তে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল।

সীতাদর্শনে রামচন্দ্রের মনোভাব বর্ণনা করিতে গিয়া কবি লিখিয়াছেন :—

বিবর্ণবদনো রামঃ স্নেহক্রোধাব্ধিমধ্যগঃ।
বভূবাধিকতাম্রাক্ষো বাষ্পনিগ্রহণে রতঃ॥

একদিকে সমুদ্রসদৃশ অসীম স্নেহ, অপর দিকে ক্রোধ—উভয়ের সংঘাতে অত্যন্ত মলিনবদন, আরক্তচক্ষু রামচন্দ্র তখন অশ্রুসংবরণে ব্যাপৃত। তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান সীতা অনাথার ন্যায় অশ্রুমোচন করিতেছেন। চারিদিকে অপেক্ষমাণ বানরদলপতিগণ ও বিভীষণ প্রভৃতি কাতরভাবে অশ্রুপূর্ণলোচনে চাহিয়া রহিয়াছেন।

মুখং বস্ত্রেন সংছাদ্য সৌমিত্রির্জাতসম্ভ্রমঃ।
বাষ্পনিগ্রহণে যত্নমকোরদ্ ধৈর্যসংস্থিতঃ॥

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ আবেগভরে বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আবৃত করিয়া ধৈর্য অবলম্বনপূর্বক চোখের জল সংবরণের বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র কোন সম্ভাষণ করিলেন না দেখিয়া সীতা তাঁহার মানসিক বিকার অনুমান করিলেন।

নিগৃহ্য মনসা বাষ্পং বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা।
বিস্ময়াচ্চ প্রহর্ষাচ্চ স্নেহাৎ ক্রোধাৎ ক্লমাদপি॥
বহুরূপেণ দদৃশে ভর্তুর্বদনমীক্ষতী।

দেখা গেল, বিদেহরাজনন্দিনী সীতা শোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। বিশুদ্ধ বুদ্ধিদ্বারা অন্তরে ধৈর্য অবলম্বনপূর্বক অশ্রুজল রোধ করিয়া বিস্ময়, হর্ষ, স্নেহ, ক্রোধ এবং ক্লান্তিবশতঃ নানাভাবে রামচন্দ্রের মুখমণ্ডল দর্শন করিতে লাগিলেন।

ধীরে ধীরে রামচন্দ্র আত্মস্থ হইলেন, এবং সীতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—ভদ্রে! আমি পৌরুষবলে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুহস্ত হইতে তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি। শত্রুকৃত পরাভবের অবসান হইয়াছে। রাক্ষস কপটরূপ ধারণ করিয়া আমার অনুপস্থিতিতে তোমাকে অপহরণ করিয়াছিল। তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্য হনুমানের সাগরলঙ্ঘন, সেতুবন্ধন, বানর-সৈন্যগণের সহিত সুগ্রীবের যুদ্ধে বিক্রমপ্রদর্শন এবং বিভীষণের সর্বপ্রকার পরিশ্রম আজ সফল।

রামচন্দ্রের কণ্ঠস্বর শ্রবণে হরিণীর ন্যায় উৎফুল্ললোচনা সীতার চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রু ঝরিতে লাগিল, তিনি তখনও ভাবিতে পারেন নাই যে রামচন্দ্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন! কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার সকল আশঙ্কার অবসান হইল। তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া রামচন্দ্র যাহা বলিলেন তাহার সারাংশ হইল, সীতার অপহরণ-জনিত যে অপবাদ চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা অপনয়ন পূর্বক স্বীয় বিখ্যাত বংশের নিন্দা দূর করিবার জন্যই তিনি শত্রুহস্ত হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বন্ধুগণের সহিত তাঁহার সমর-পরিশ্রম স্বীকার সীতার জন্য নহে। উজ্জ্বল বংশসম্ভূত কোন্ তেজস্বী পুরুষ পরগৃহ-

বাসিনী এবং অপরের স্পর্শকলঙ্কিতা স্ত্রীকে অবিকৃতচিত্তে পুনরায় গ্রহণ করিতে পারে! অতএব সীতার যে দিকে ইচ্ছা গমন করিতে পারেন।

সমগ্র জনতা স্তব্ধ; শ্রীরামচন্দ্র এ কী বলিতেছেন! সীতার জন্য তিনি কী না করিয়াছেন? রামচন্দ্র জানিতেন, রাক্ষসগৃহে অবস্থিতা পত্নীকে পুনর্গ্রহণ সমাজ অনুমোদন করিবে না। তিনি যদি সাধারণ একজন প্রজা হইতেন, সীতাকে লইয়া পর্ণকুটীরে বাস তাঁহার পক্ষে কত সুখের এবং অনায়াস হইত। তিনি রাজা, রাজধর্ম রক্ষা ও পালন তাঁহার প্রধান কর্তব্য; সেখানে ব্যক্তিগত সুখ বা অভিলাষের প্রশ্ন উপেক্ষণীয়। রাজা স্বয়ং সমাজব্যবস্থা অনুসরণ না করিলে অপরে তাহা মানিবে না, 'যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ'—প্রাকৃত লোক মহাপুরুষের আচরণই অনুসরণ করিয়া থাকে। তিনি কি জানিতেন না, সীতা মনেপ্রাণে বিশুদ্ধা! তথাপি রাক্ষসগৃহে অবস্থিতা পত্নীকে অবিলম্বে গ্রহণ করা সমাজের দৃষ্টি দিয়া বিচার করিলে সম্ভব নহে।

ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগের বহু সমাজব্যবস্থা বা সমাজের অনুশাসন বর্তমান যুগের দৃষ্টিতে অবাস্তব বা অর্থহীন বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ যে কোন যুগের সমাজব্যবস্থা বা বিধি-নিয়ম সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে তবেই তাহাতে সঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব। বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ভারতের সমাজ 'বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র।' তিনি বলিয়াছেন, 'ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে।'

নিষ্কলঙ্ক, বিশুদ্ধ হইতে বিশুদ্ধতরা জানিয়াও প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পত্নীকে ত্যাগ করিয়া আদর্শ-স্থাপন রামচন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব। পরীক্ষা ব্যতীত সীতাকে গ্রহণ করিলে লোকে গোপনে তাঁহার সমালোচনা করিত, (যেমন অযোধ্যার পুরবাসিগণ পরে করিয়াছিল) এবং উপহাস করিয়া বলিত, 'দশরথের পুত্র রামচন্দ্র মূর্খ ও কামুক'; ঋষিগণকে রামচন্দ্র এই যুক্তি দেখাইয়াছিলেন।

রামের কঠোর বাক্য সীতার মর্ম বিদ্ধ করিল। স্বভাবতঃ তিনি কোমলা ও অতি মৃদুস্বভাবা কিন্তু প্রয়োজনবোধে মন স্থির করিয়া দৃঢ়তা ও সাহসের সহিত কর্তব্য নির্ধারণ তাঁহার অনুপম চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। রাক্ষসরাজ রাবণ কর্তৃক নিপীড়িত হইয়া তিনি প্রথমে বিহ্বল হইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন, কিন্তু উপায়ান্তর না দেখিয়া পরে ভয় ত্যাগ করিয়া দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—যেহেতু বর্তমানে আমি তোমার আয়ত্তাধীনা, আমার এই অচেতন শরীর তোমার অধিকারে। এই শরীর অথবা জীবন আমার রক্ষণীয় নহে।

রামচন্দ্রের বাক্যে আহত হইয়া অশ্রুসংবরণ-পূর্বক তিনি ধীরে অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন—হে বীর, নীচজাতীয়া রমণীর ন্যায় আমাকে এতাদৃশ অনুচিত রূঢ়বাক্য শুনাইতেছেন কেন? যেরূপ ভাবিতেছেন আমি সেরূপ নহি। অঙ্গ আমার বশীভূত না থাকায় শত্রু রাবণ তাহা স্পর্শ করিয়াছে সত্য, কিন্তু উহা আমার ইচ্ছাপূর্বক নহে, দৈবই সেখানে বলবান। কিন্তু মন আমার অধীন, এবং সে মন আপনাকে ব্যতীত আর কাহাকেও চিন্তা করে নাই। আপনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমার আচরণ, স্বভাব, সচ্চরিত্রতা ও আপনার প্রতি ভক্তি সমস্তই উপেক্ষা করিয়া সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় কেবল আমি নারী এই কথাই বিবেচনা করিলেন। আপনি

যে আমাকে চিনিতে পারিলেন না উহাই আমার মৃত্যুতুল্য।

সীতা আরও বলিলেন, তাঁহার অন্বেষণার্থে রামচন্দ্র যখন মহাবীরকে প্রেরণ করিয়াছিলেন তখনই কেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই! রামচন্দ্র কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছেন ইহা শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ তিনি মহাবীরের সম্মুখে জীবন ত্যাগ করিতেন, এবং তাহা হইলে বন্ধুগণ সহ রামচন্দ্রের জীবনসংশয়কর বৃথা কষ্টস্বীকার প্রয়োজন হইত না।

অতঃপর লক্ষ্মণের দিকে ফিরিয়া সীতা বলিলেন—মিথ্যা অপবাদ লইয়া জীবনধারণের অভিলাষ নাই, তুমি আমার জন্য চিতা প্রস্তত কর।

লক্ষ্মণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এই অভাবনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব কে কল্পনা করিতে পারিয়াছিল! তিনি রামচন্দ্রের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন, মনে হইল, তিনি বিদেহরাজনন্দিনীর অভিপ্রায় সমর্থনই করিতেছেন। আর এমন কে আছেন যিনি ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন!

ন হি রামং তদা কশ্চিৎ ক্রোধশোকবশং গতম্॥
অনুনেতুমথো বক্তুং দ্রষ্টুং বাপ্যথ শক্নুবন্॥

—উপরন্ত ক্রুদ্ধ এবং শোকাকুল রামচন্দ্রকে অনুনয় করিতে বা তাঁহার সহিত কথা বলিতে, এমন কি তাঁহার দিকে চাহিতেও কাহারও সাহস হইল না।

অগ্নি প্রজ্বলিত হইল। বিদেহরাজনন্দিনী সীতা নিশ্চল নতমুখে অবস্থিত রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিয়া দৃঢ় অকম্পিত পদক্ষেপে প্রজ্বলিত অগ্নির দিকে অগ্রসর হইলেন। তারপর দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম নিবেদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্নির উদ্দেশ্যে বলিলেন,

যথাহং কর্মণা বাচা শরীরেণ চ রাঘবম্।
সততং নাতিবর্তেয়ং প্রকাশং বা রহঃসু বা॥
যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাতিবর্ততি রাঘবাৎ।
তথায়ং লোকসাক্ষী মাং সর্বতঃ পাতু পাবকঃ॥

আমি যে প্রকাশ্যে অথবা গোপনেও কার্য, বাক্য বা শরীর দ্বারা রামচন্দ্রকে অতিক্রম করি নাই, বা আমার হৃদয় যে কখনও রামচন্দ্র হইতে বিচলিত হয় নাই, সেজন্য এই লোকসাক্ষী অগ্নিদেব আমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করুন।

প্রজ্বলিত অগ্নির সম্মুখে প্রার্থনারতা সীতাকে অভিভূত জনতা উৎকন্ঠিত চিত্তে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সকলেরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ, কণ্ঠ রুদ্ধ। অবশেষে পুনরায় রামচন্দ্রের দিকে ফিরিয়া করজোড়ে প্রণাম জানাইয়া আয়তলোচনা সেই বিদেহরাজনন্দিনী সীতা নিঃশঙ্কচিত্তে জ্বলন্ত হুতাশনে প্রবেশ করিলেন।

সা তপ্তবরহেমাভা তপ্তকাঞ্চনভূষিতা।
পপাত জ্বলনে দীপ্তে হুতাহুতিরিবাধ্বরে॥

তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, তপ্তকাঞ্চনভূষিতা সেই দেবীকে যজ্ঞে প্রক্ষিপ্ত আহুতির ন্যায় মনে হইল।

সমবেত জনতা হাহাকার করিয়া উঠিল।

রামায়ণে আছে সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করিবার পর স্বর্গ হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণ এবং পিতৃগণের সহিত রাজা দশরথ লঙ্কায় আগমন পূর্বক রামচন্দ্রকে বলেন, তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া সীতাকে সাধারণ মানবীজ্ঞানে উপেক্ষা করিতেছেন কেন! উত্তরে রামচন্দ্র বলেন, তিনি নিজকে দশরথের পুত্র সামান্য মানব বলিয়াই জানেন। অতঃপর দেবগণ নানা স্তবস্তুতির দ্বারা তিনি যে ঈশ্বরাবতার ইহাই নিবেদন করেন—রামচন্দ্র বিষ্ণু, সীতা লক্ষ্মী ইত্যাদি। ইতিমধ্যে অগ্নিও

অক্ষত সীতাকে গ্রহণ করিয়া চিতা হইতে আবির্ভূত হইয়া বলেন, তিনি সর্বজীবের হৃদয়ে সাক্ষী-রূপে অবস্থান করেন, প্রত্যক্ষ-দর্শী এবং সীতাকে বিশুদ্ধস্বভাবা বলিয়াই অবগত আছেন, সুতরাং তাঁহাকে রামচন্দ্র গ্রহণ করুন।

কী উপায়ে সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াও বিন্দুমাত্র দগ্ধ হন নাই, তাহা বিস্ময়কর। পৌরাণিক আখ্যান অস্বীকার করা যাইতে পারে। ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে উপস্থিত সকলে অগ্নি নির্বাপিত করেন। কিন্তু অগ্নি সীতাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই—ইহাও সত্য, এজন্যই সীতার অগ্নিপরীক্ষা জগতে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। জগতে কত অলৌকিক ব্যাপার ঘটে, সেগুলি সব সময় সাধারণ নিয়মে ব্যাখ্যা করা যায় না। কঠিনতম পরীক্ষায় অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইলেই উহাকে সীতার অগ্নিপরীক্ষার সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে।

রাম-রাবণের যুদ্ধসংবাদ দূর-দূরান্তরে বিস্তৃত হইয়াছিল। বিশেষতঃ দুরাত্মা রাবণ নিহত হইয়াছে এই সংবাদে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সহ বহু ঋষিমুনিও লঙ্কায় আগমন করেন। সকলেই একবাক্যে রামচন্দ্রকে বলেন, সীতা পবিত্র এবং বিশুদ্ধা, তাঁহাকে গ্রহণ করায় রামচন্দ্রের কোন অন্যায় হইবে না। রামচন্দ্র বলেন, তিনি জানিতেন, সীতা অনন্যহৃদয়া, সীতার পবিত্রতা সম্বন্ধে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তিনি বহুদিন রাক্ষসরাজ রাবণের অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা ছিলেন। যোগ্যতম পরীক্ষা দ্বারা জনতার সম্মুখে তাঁহার বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। নতুবা রামচন্দ্রকে সকলে স্বেচ্ছাচারী বলিত। সীতার অপবাদ এবং স্বীয় দুর্নাম ক্ষালন করিবার জন্য ও সমবেত সকলের বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত সমবেত জনগণের সম্মুখে অগ্নিতে প্রবেশ করিতে সীতাকে তিনি নিষেধ করেন নাই। তিনি নিশ্চিত জানিতেন, অগ্নি তাঁহাকে দগ্ধ করিবে না।

কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সীতা জগতে চিরকালের জন্য সতীত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন। সমাগত ঋষিবৃন্দ রামচন্দ্রকে আশীর্বাদ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অন্যান্য যাহারা আসিয়াছিল তাহারাও রাম-রাবণের যুদ্ধ, সেতুবন্ধন, রাবণের নিধন, সীতার অগ্নিপরীক্ষা প্রভৃতি আলোচনা করিতে করিতে ফিরিয়া গেল। লোকমুখে ধীরে ধীরে সমগ্র জনস্থানে এবং উত্তরপ্রদেশে সেই অলৌকিক কাহিনীসকল ছড়াইয়া পড়িল।

ভ্রম-সংশোধন

এই সংখ্যায় ২৯১ পৃষ্ঠা, ১ম কলম, ২১ লাইনটি এরূপ হইবে : 'পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ'
গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ২৭২ পৃষ্ঠায় 'পৌষ' স্থলে 'অগ্রহায়ণ' হইবে।

বুদ্ধ

শ্রীব্যোমকেশ মাইতি

অনন্ত ভোগের মাঝে জেনেছিলে, হে রাজতনয়,
চপল জীবন অতি! ধনমান যৌবন প্রণয়,
বিদ্যুৎচঞ্চল সুখ
দিকে দিকে তোলে দুঃখ-তরঙ্গ আকুল;
জরা ব্যাধি মৃত্যু ক্রূর
বাজাইছে বিশ্বপ্রাণে অশ্রু-ঝরা বেদনার সুর—
প্রতিক্ষণে ঝরে যায়
অর্ধস্ফুট সুখময় পুষ্পদলগুলি,
সোনার হরিণ ছুটে নিত্য হেথা হৃদয় ব্যাকুলি।.
স্বপ্ন যায় টুটি,
কাঁদে ব্যথাহত প্রাণ সত্যের কঠিন বুকে লুটি।

তুমি বুদ্ধ, চির শুদ্ধ—আনন্দের ধাম,
দুঃখের দুশ্চর তপে মৃত্যুঞ্জয় তুমি আপ্তকাম।
তোমার বাঁশির তান
পথহারা পথিকেরে দিল হেথা ঘরের সন্ধান—
চির মৌন অসীমের প্রেমের আহ্বান—
পরম নির্বাণ।
হিংসার আঁধার রাতে
প্রেমের প্রদীপ জ্বলে,
বাজে চির সুন্দরের গান;
হে অমৃত, এ যে তব দান!
তুমি আজ নাই;
তব গান যায় নাই থামি,
লুব্ধ ক্ষুব্ধ বক্ষে ঢালি' শান্তি-সুধা তব প্রেম-বাণী
আজিও ধ্বনিয়া চলি' কাল-মন্দিরায়
সান্তের চঞ্চল বুকে অচঞ্চল অনন্তের
পিপাসা জাগায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও হাজরা মহাশয়*

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ

কামারপুকুরের কয়েক মাইল পশ্চিমে ক্ষুদ্র গ্রাম—মড়াগেড়ে। এই গ্রামেই বাস ছিল হাজরার। পুরা নাম—প্রতাপচন্দ্র হাজরা। জাতিতে সদ্‌গোপ। পেশা—চাষবাস। কিন্তু চাষে মন ছিল না হাজরার। বাড়ীতে স্ত্রী, কয়েকটি ছেলেমেয়ে আর বুড়ী মা। তার উপরে একটি ঋণের বোঝা। প্রায় হাজার টাকা। শুষ্ক, নীরস মন। ভক্তি-বিশ্বাসের বালাই নাই। কিন্তু শিশুকাল থেকেই হরি-বাই ছিল হাজরার। সংসার প্রতিপালনে অসমর্থ হয়ে হরিনাম জপ করতেন। মনের অন্তস্তলে ছিল একটু ধন-কামনা।

পাশেই সিহড় গ্রাম। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগনে হৃদয় মুখুজ্জের বাড়ী এখানে। হৃদয়ের সঙ্গে হাজরার জানাশোনা অনেকদিনের। হৃদয়ের কাছেই তিনি শুনেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ সিহড়ে এসেছেন একবার। সংবাদ পেয়েই হাজরা গিয়ে হাজির। শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করে বললেন, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করবো বলে এসেছিলাম।'

'কি কথা গো?' শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞসা করলেন সহানুভূতির সুরে। হাজরা বললেন—'ভগবানের কি কান আছে? এত যে ডাকি, ডাক পৌছায় কি তাঁর কানে?' শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'তুমি তো চাষীর ছেলে গো। কেমন করে জল ছেঁচে ক্ষেতে নিয়ে যেতে হয়, তা জান। মাঝ পথে নালায় যদি ঘোগ থাকে, জল কি পৌছাবে ক্ষেতে? সমস্ত পুকুর ছেঁচে ফেললেও ক্ষেতে জল যাবে না। সব জল চলে যাবে মাঝ পথে ঘোগের ভিতরে। বাসনা-ঘোগ বন্ধ কর আগে তবে তো পৌছাবে তোমার ডাক।'

কয়েক বৎসর পরে। দক্ষিণেশ্বরে তখন শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা চলেছে তাঁর বালক ভক্তদের সঙ্গে। পূর্বসংস্কার বশে একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসে হাজির হলেন হাজরা। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে আশ্রয় পেয়ে গেলেন। নিত্য গঙ্গাস্নান, মা ভবতারিণীর অন্নপ্রসাদ আর সারা দিন মালা-জপ। কিছুদিন জপতপ করতেই তাঁর মনে একটু অহংকারের ভাব এল। ভাবলেন—তিনিই বা শ্রীরামকৃষ্ণের চেয়ে কম কিসে! কোন নূতন ভক্ত হয়তো এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে, শ্রীরামকৃষ্ণের খোঁজে। হাজরার সঙ্গেই প্রথম দেখা। ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'মশায়, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেব কোথায় থাকেন এখানে?' হাজরা বললেন, 'তাঁর কাছে যাবার কি দরকার। তত্ত্বকথা শুনবেন? বসুন, আমিই শোনাব।' ভক্ত হয়তো কাঁচুমাচু করছেন। এমন সময় শ্রীরামকৃষ্ণ এসে হাজির সেখানে। দেখেই বুঝে নিলেন ব্যাপারখানা। ভক্তকে ডেকে নিয়ে গেলেন নিজ কক্ষে।

শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষের দক্ষিণ-পূর্বে লম্বা বারান্দায় আসন করে, চোথ বুজে জপ করতেন হাজরা। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখে হাসতেন। চুপিসাড়ে গিয়ে মালা কেড়ে নিয়ে পালাতেন। হাজরা ছুটতেন পিছনে পিছনে মালা উদ্ধারের জন্যে। মালা ফিরে পেয়ে পুনরায় এসে জপে বসতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'তপ জপ করে কি হবে? এখানকার উপরে বিশ্বাস থাকলে আপনিই সব

* প্রধানতঃ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' অবলম্বনে লিখিত।

হয়ে যাবে।' কখনো বা বুঝিয়ে বলতেন, 'শুষ্ক জপে কিছু হবে না। মনকে ভক্তিতে সরস ক'রে কামনাশূন্য হয়ে জপ করতে হয়।' কে শোনে কার কথা। উত্তরে হাজরা বলতেন, 'ঈশ্বরের অনন্ত ঐশ্বর্য। ইচ্ছা করলে তিনি ধন-দৌলত কি দিতে পারেন না?' শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তদের কাছে বলতেন, 'হাজরা এখানকার মত সব উলটে দিতে চায়।···ভারী পাটোয়ারী বুদ্ধি।'

বীর যুবক নরেন্দ্রনাথ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের পরম আদরের। মর্ত্যলীলার প্রধান সহচর রূপে তিনি তাঁকে সঙ্গে করেই এনেছিলেন। নরেন্দ্র কিছু দিন আসতে পারেননি দক্ষিণেশ্বরে। নরেন্দ্রের বিচ্ছেদ-বেদনা তাঁর অসহ্য। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে প্রবেশ করে হাজরা দেখলেন, বিষণ্ণ মনে বসে আছেন তিনি, চোখদুটি অশ্রুসিক্ত। নরেন্দ্রের জন্যে তিনি কাঁদছেন শুনে হাজরা বিস্মিত হলেন। বললেন, 'পরমহংস অবস্থা আপনার। সর্বদা সচ্চিদানন্দে মগ্ন হয়ে থাকবেন —ইহাই কাম্য। তা না ক'রে, এই সব ছেলেদের জন্যে ভেবে উতলা হওয়া কি আপনার সাজে?'

বালকস্বভাব ঠাকুর। সকলের কথাতেই ষোল আনা বিশ্বাস। তাঁর মনে হল—হাজরা ঠিকই বলেছে। এমনটা আর করা হবেনি। নিজেকে সংযত করে, চটি জুতো পরে, চলে গেলেন পঞ্চবটীর দিকে। খানিক পরেই ফিরে এসেছেন। সোজা হাজরার কাছে গিয়ে বললেন,—'বেশ করেছি, ছেলেদের জন্যে ভেবেছি, হাজারবার ভাববো। তোর তাতে কি······? ছেলেদের মঙ্গলেরই জন্যেই ভাবি, এতে তাদের কল্যাণ হবে—মা বললেন।'

হাজরা ছিলেন নিরাকারবাদী। শ্রীশ্রীঠাকুরের পরমপ্রিয় নরেন্দ্রনাথও তাই। এই জন্যেই বোধ হয় উভয়ের মধ্যে জন্মেছিল প্রগাঢ় প্রীতি। একত্রে বসে কত আলোচনা, গল্প, তামাক্-সেবন। শ্রীরামকৃষ্ণের যুবক ভক্তেরা তাই ঠাট্টা করে বলতেন—হাজরা নরেন্দ্রের 'ফেরেণ্ড'। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের নিকটে অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন যে, এক সচ্চিদানন্দ সর্বভূতে রয়েছেন; জীব, জগৎ, সবকিছুর মধ্যেই তিনি। কথাটা নরেন্দ্রনাথের মনে ধরলো না; আমি, তুমি, সবই ভগবান—এ আবার কি কথা! আলোচনান্তে উঠে হাজরার কাছে গেলেন নরেন্দ্রনাথ। শ্রীশ্রীঠাকুরের পূর্ব আলোচনার কথা তুলে, বিদ্রূপের সুরে বললেন, "এ কি কখনো হতে পারে? ঘটিটা ঈশ্বর, বাটিটা ঈশ্বর, যা কিছু দেখছি, সবই ঈশ্বর, আমরাও ঈশ্বর!" হাজরাও ব্যঙ্গে যোগ দিলেন। হাসির রোল উঠল সেখানে।

হাসির শব্দ শ্রীরামকৃষ্ণের কানে গেল। আলুথালু বেশে তিনি উঠে গেলেন সেখানে। 'তোরা কি বলছিস রে'—বলেই হঠাৎ নরেন্দ্রকে স্পর্শ করে সমাধিস্থ হলেন। মুহূর্তের মধ্যে নরেন্দ্রনাথের মনোজগতে যুগান্তর ঘটে গেল। স্তম্ভিত নরেন্দ্রনাথ সত্য সত্যই দেখতে লাগলেন ঈশ্বর ভিন্ন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অন্য কিছুই আর নাই। জলে, স্থলে, উদ্ভিদে সর্বত্র সত্য সত্যই তিনি তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করতে লাগলেন। এই ভাবের আবেশ নিয়েই ফিরে গেলেন নিজ গৃহে।

সর্বদা ভাবাবিষ্ট। খেতে বসে থালা, বাটি এমনকি অন্নের মধ্যেও ঈশ্বরদর্শন হতে লাগলো। দু'এক গ্রাস খেয়ে স্থির হয়ে বসে থাকতেন, আর খেতে পারতেন না। মা এসে বললে আবার খেতেন। মা ভুবনেশ্বরী বেদনাহতা হয়ে কাঁদতেন। বলতেন, 'ভিতরে ভিতরে কি একটা রোগ হয়েছে ছেলেটার, ও আর বাঁচবে না।'

সর্বদা ভাবাচ্ছন্ন নরেন্দ্রনাথ। এই আচ্ছন্ন ভাব একটু কমলে জগৎটাকে স্বপ্ন বলে মনে হত। সন্ধ্যার সময় হেদুয়ার বাগানে বেড়াতে গিয়ে লোহার রেলিং-এ মাথা ঠুকে দেখতেন—রেলিংটা স্বপ্নের না সত্যকার। এই অনুভূতি নরেন্দ্রনাথের বেশ কিছুদিন ছিল।

দক্ষিণেশ্বর-লীলায় হাজরার সঙ্গে বহু রঙ্গ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বলতেন,—'জটিলা-কুটিলা না থাকলে নরলীলা পোষ্টাই হয় না।' নরেন্দ্রাদি ভক্তদের সাক্ষাতে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন হাজরাকে,—'বল দেখি, কার ক' আনা হয়েছে।' অসংকোচে জবাব দিলেন হাজরা—'আমার (অর্থাৎ হাজারার নিজের) বার আনা হয়েছে, নরেন্দ্রনাথের ষোল আনা পূর্ণ।' আর শ্রীরামকৃষ্ণকে বললেন—'আপনার এখনও লালচে মারছে।' অর্থাৎ এখনও কিছু বাকী।

হাজরা মহাশয়ের পাটোয়ারী বুদ্ধি প্রবল। তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণের ভালবাসা কম ছিল না তাঁর উপরে। বহু সুকৃতি না থাকলে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে থাকবার অধিকারও পেতেন না। তবে তিনি মাঝে মাঝে মাত্রা-জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। এক এক বার শ্রীরামকৃষ্ণের সমক্ষে ভক্তদের নিন্দাও করে বসতেন।

হাজরা ছিলেন নিরাকারবাদী—জ্ঞানমার্গী। ঈশ্বর যে মানবশরীর ধারণ ক'রে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হ'তে পারেন, একথা তিনি বিশ্বাস করতেন না। রঙ্গপ্রিয় শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন তাঁকে পদসেবা করতে বললেন। মুশকিলে পড়লেন হাজরা। একান্ত অনিচ্ছা। কিন্তু মুখের উপর 'না' বলতে বাধলো। ক্লিষ্টচিত্তে পায়ে হাত বুলোতে লাগলেন। বহুক্ষণ পরে ছাড়া পেয়ে পালিয়ে বাঁচলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কিন্তু নাছোড়বান্দা। পরদিন আবার ডেকে পাঠালেন। এমনই প্রতিদিন। আহারের পর বিশ্রামের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ ডেকে পাঠাতেন হাজরাকে, পায়ে হাত বুলোবার জন্য। কয়েক-দিন এইভাবে চলার পর নিস্তারের পন্থা খুঁজতে লাগলেন হাজরা।

আহারের পর এক গোপনীয় স্থানে গিয়ে একদিন শুয়ে পড়লেন, মুখে ঢাকা দিয়ে। কপট নিদ্রা। সর্বজ্ঞ ঠাকুর হুঁকো হাতে ঠিক জায়গায় গিয়ে হাজির। নাকে তামাকের ধোঁয়া দিতেই মুখের ঢাকা খুলে, হেসে উঠলেন হাজরা। শ্রীশ্রীঠাকুর হাতে ধরে টেনে আনলেন তাঁকে, নিজ কক্ষে। বললেন, 'পায়ে হাত বুলিয়ে দাও।'

পরদিন থেকে হাজরার আর ডাক পড়লো না। দীর্ঘ কয়েক মাস গত হল। শ্রীশ্রীঠাকুরের বালক ভক্তেরাই এখন পায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। ইতিমধ্যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এসেছে হাজরার অন্তরে। তাঁর চোখের ঠুলি খুলে পড়েছে! শ্রীরামকৃষ্ণের দেববাঞ্ছিত চরণ দুখানি স্পর্শ করবার জন্যে তিনি এখন ব্যাকুল। কিন্তু কি আশ্চর্য! যখনই তাঁর কক্ষে যান, দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণ পা-দুখানি সযত্নে ঢাকা দিয়ে বসে আছেন। বলি বলি করেও বলতে পারেন না। বিষণ্ণ মনে ফিরে আসতে হয়। নৈরাশ্য ক্রমে চরমে উঠলে জোর ক'রে পদসেবা করতে গেলেন একদিন। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্মত হলেন না।

হাজরা বুঝলেন, দেহমন আরও শুদ্ধ করতে হবে; চরণস্পর্শের অধিকার পেতেই হবে। গঙ্গামৃত্তিকা-ভক্ষণ আর অহর্নিশ নামজপ করতে হবে। মশারির ভিতর, মালা হাতে, কম্বলশয্যায় শুয়ে পড়লেন তিনি। মাথার কাছে একতাল গঙ্গামাটি। পর্যায়ক্রমে একপাক মালাজপ ও একটি করে গঙ্গামাটির গুলি ভক্ষণ,—চললো সারা দিনমান, সারারাত্রি। ভক্ত-

বৎসল ঠাকুর প্রসন্ন হলেন। ধীর পদে গেলেন যেখানে হাজরা কঠোর সাধনায় মগ্ন। ডাকলেন করুণা-তরল কণ্ঠে। হাজরা নিরুত্তর। আকণ্ঠ অভিমানে আরও রোখ ক'রে জপ করতে লাগলেন। শেষে ভক্তাধীন ঠাকুর তাঁকে হাতে ধরে টেনে নিয়ে গেলেন নিজ কক্ষে। বললেন—'পায়ে হাত বুলিয়ে দাও।'

দীর্ঘকাল অবহেলিত হাজরা আজ প্রাণ ভ'রে পদসেবা করতে লাগলেন। একটু পরেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, 'হয়েছে গো, এখন যাও, বিশ্রাম কর গে।'

"—অতি অল্পক্ষণ মধ্যে কন গুণমণি।
পরিতৃপ্ত সেবায় সন্তুষ্ট এবে আমি॥
আপন শয্যায় তুমি করহ গমন।
হাজরা বলেন নাহি ছাড়িব চরণ॥"

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণের মর্ত্যলীলার অবসানের পর অনেকদিন বেঁচে ছিলেন হাজরা। শোনা যায় মৃত্যুকালে প্রাণভরে দর্শনলাভও হয়েছিল তাঁর। বৈকুণ্ঠপতির 'জটিলা-কুটিলার' প্রয়োজন আছে কিনা জানা নাই। তবে হাজরামশায় যে সোজা রামকৃষ্ণলোকে গিয়ে হাজির হয়েছেন, তাতে আর সন্দেহ কি ?

গান

(কাফি-সিন্ধু—তেওরা)

ব্রহ্মচারী শশাঙ্ক

আজি উথলিল রামকৃষ্ণ-সিন্ধু ভুবনে ভুবনে রে—
আদি ও অন্তে, বেদ-বেদান্তে, দিগন্তে দিগন্তে রে।
সকল ধর্মে উঠিল যে সুর, তোমার বীণায় হ'ল তা মধুর,
অবসান আজি যত সংশয় ধর্ম-দ্বন্দ্বে রে।
যে ছিল নীচে সবার পিছে, (তুমি) ডাকিলে তারে আপন কাছে,
কালিমা যত নিমেষে মিলাল তব নাম-গুণে হে।
তুমি বিরাজ হৃদয় মাঝে সকল জীবের মঙ্গল কাজে,
ঝংকৃত যা বীরের হৃদয় বিবেক-আনন্দে হে॥

গৃহস্থাশ্রম

শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায়

আদর্শ গৃহী হওয়া খুবই কঠিন কাজ। স্বামীজী কর্মযোগে বলেছেন, আদর্শ সন্ন্যাসী হওয়া অপেক্ষা আদর্শ গৃহী হওয়া বরং কঠিন। যিনি বিবাহ না করে ভগবান লাভের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁর জীবন যত মহৎ, বিবাহিত জীবন যিনি যথাধর্ম পালন করেন, তাঁর জীবনও তত মহৎ। আদর্শ সন্ন্যাসী হওয়া যতখানি কঠিন কাজ, আদর্শ গৃহস্থ হওয়াও ততখানি কঠিন।

গৃহস্থের কর্তব্য ও গুরুদায়িত্ব বর্ণনাকালে স্বামীজী বলেছেন, গৃহস্থই সমগ্র সমাজের মূল-ভিত্তি ও অবলম্বন, জীবন ও সমাজের কেন্দ্র। গৃহস্থ ব্যক্তি অবশ্যই ঈশ্বরপরায়ণ হবেন, কিন্তু সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ও তাঁর ঈশ্বর-উপাসনার পদ্ধতি এক নয়। যে ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তি সদুপায়ে অর্থোপার্জন করেন ও সৎকার্যে তা ব্যয় করেন, তিনি সংসারত্যাগী সাধক সন্ন্যাসীর মতই পুণ্যাত্মা।

এখন প্রশ্ন হল, সদদুপায়ে অর্থোপার্জন ও সৎভাবে ব্যয় বলতে কি বুঝায়? সনাতন ভারতের শাস্ত্রকারগণ এ বিষয়ে কি শাশ্বত নির্দেশ রেখেছেন আমাদের সম্মুখে? স্বামীজী "মহানির্বাণ-তন্ত্র" থেকে একটির পর একটি উদ্ধৃতি তুলে তা বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলছেন, গৃহস্থের প্রধান কর্তব্য হ'ল অর্থোপার্জন, কারণ যথেষ্ট অর্থ ছাড়া আত্মীয়-পরিজন ও প্রত্যাশী সকলের প্রতি যথাযথ কর্তব্যপালন সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে যে, মিথ্যা কথা ব'লে, প্রতারণার সাহায্যে বা চুরি ক'রে একটি কপর্দকও যেন উপার্জিত না হয়। তাঁর সবসময় একথা মনে রাখা দরকার যে, তাঁর জীবন ঈশ্বরের সেবার জন্য, যে সেবা আমাদের পরম পিতা পেতে চান তাঁর সৃষ্ট সকল জীবের পরিতৃপ্তির মাধ্যমে।

গৃহস্থের জীবনের আদর্শ হবে, প্রতিদানের প্রত্যাশী না হয়ে কাজ করা। সৎকর্ম করা, অথচ তাতে নামযশ হ'ল কি না সেদিকে একেবারে দৃষ্টি না দেওয়া—স্বামীজী বলেছেন, এজগতে এইটিই সবচেয়ে কঠিন কাজ। জগতের লোকের প্রশংসায় ঘোর কাপুরুষও সাহসী হয়, নির্বোধ ব্যক্তিও বীরোচিত কাজ করে; কিন্তু কারও স্তুতি-প্রশংসার প্রত্যাশী না হয়ে অথবা সেদিকে আদৌ দৃষ্টি না দিয়ে সর্বদা সৎকার্য করাই প্রকৃতপক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বার্থত্যাগ। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী প্রশ্ন করেছেন—"শিশুসন্তান-দিগকে কিছু দিলে তোমরা কি তাহাদের নিকট হইতে কিছু প্রতিদান চাও? তাহাদের জন্য কাজ করাই তোমার কর্তব্য—ঐখানেই উহা শেষ। কোন বিশেষ ব্যক্তি, নগর বা রাষ্ট্রের জন্য যাহা কর তাহা করিয়া যাও, কিন্তু সন্তানদের প্রতি তোমার যেরূপ ভাব উহাদের প্রতিও সেইভাব অবলম্বন কর, উহাদের নিকট হইতে প্রতিদানস্বরূপ কিছু আশা করিও না। ...যখন আমরা কিছু প্রত্যাশা করি তখনই আসক্তি আসে। কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষাই আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতিবন্ধক; শুধু তাই নয়, পরিণামে উহা দুঃখের কারণ হয়।"

গৃহস্থের নিত্যকর্ম কি কি? এ সম্বন্ধে মহা-নির্বাণতন্ত্রের নির্দেশ—মাতা ও পিতাকে প্রত্যক্ষ দেবতাজ্ঞানে সর্বপ্রযত্নে তাঁদের সেবা করা। যদি

মাতা ও পিতা তুষ্ট থাকেন তবে সেই ব্যক্তির প্রতি ভগবান প্রীত হন। পিতামাতার সম্মুখে কখনও ঔদ্ধত্য, পরিহাস, চঞ্চলতা ও ক্রোধ প্রকাশ করা উচিত নয়। যে সন্তান কখনও পিতামাতাকে কর্কশ কথা বলে না, সেই প্রকৃত সুসন্তান। মাতা, পিতা, পুত্র, ভার্যা, ভ্রাতা, ও অতিথিকে ভোজন না করিয়ে যে গৃহী নিজের উদর পূরণ করে, সে পাপী।

ভার্যার প্রতি গৃহস্থের প্রধান কর্তব্য তাঁকে তাড়না না করা। বিদ্বান ব্যক্তি নিজ পত্নী বর্তমানে অন্য স্ত্রীলোককে স্ত্রীভাবে চিন্তা করবেন না। স্ত্রীলোকের সম্মুখে অশিষ্ট বাক্য ব্যবহার করবেন না এবং নিজের বাহাদুরী দেখাবেন না। ধন, বস্ত্র, প্রেম, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও অমৃততুল্য বাক্য দিয়ে সর্বদা পত্নীর সন্তোষ-বিধান করবেন। যে ব্যক্তির প্রতি পতিব্রতা স্ত্রী তুষ্টা, তিনি সমুদয় ধর্মই আচরণ করেছেন।

গৃহী ব্যক্তি অতিরিক্ত নিদ্রা, আলস্য, দেহের যত্ন, কেশবিন্যাস ও অশন-বসনে আসক্তি ত্যাগ করবেন। আহার, নিদ্রা, বাক্য ইত্যাদি সকল ব্যাপারেই তাঁর পরিমিতি-বোধ থাকবে, সংযম থাকবে। গৃহস্থ হবেন অকপট, নম্র, অন্তরে বাহিরে শৌচসম্পন্ন, সকল কর্মে উদ্যোগী ও নিপুণ (মহানির্বাণতন্ত্র—৮।৫১-৬২)।

গৃহস্থ তিনটি বিষয়ে কিছু বলবেন না—নিজ যশ ও পৌরুষের বিষয়, অপরের কথিত গুপ্ত কথা ও অপরের উপকারার্থে তিনি যা করেছেন। গৃহস্থের নিজেকে ধনী বা দরিদ্র কিছুই বলা উচিত নয়, বা তাঁর নিজের ধনের গর্ব করা উচিত নয়। ...গৃহস্থ যত্নপূর্বক বিদ্যা, ধন, যশ, ও ধর্ম উপার্জন করবেন এবং দ্যূতক্রীড়াদি, অসৎসঙ্গ, মিথ্যাবাক্য ও হিংসা, অনিষ্টাচরণ বা শত্রুতা পরিত্যাগ করবেন (মহানির্বাণতন্ত্র—৮।৫৮)।

গৃহস্থের কর্তব্য সম্বন্ধে মহানির্বাণতন্ত্রের অন্যান্য শ্লোক বিশ্লেষণকালে স্বামীজী এক-জায়গায় বলছেন,—"গৃহস্থকে প্রথমতঃ জ্ঞান, দ্বিতীয়তঃ ধন উপার্জনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই তাহার কর্তব্য। আর গৃহস্থ যদি তাহার এই কর্তব্য পালন না করে, তাহাকে ত মানুষ বলিয়াই গণনা করা যাইতে পারেনা। যদি কোন গৃহস্থ অর্থোপার্জনের চেষ্টা না করে, তাহাকে দুর্নীতিপরায়ণ বলিতে হইবে। যদি সে অলসভাবে জীবনযাপন করে এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তাহাকে অসৎপ্রকৃতি বলিতে হইবে।"

শুধু গৃহ-সংসারের মধ্যেই গৃহস্থের কর্তব্য শেষ নয়। স্বামীজী বলছেন—যে ব্যক্তি জলাশয়-খনন, বৃক্ষরোপণ, পথিমধ্যে বিশ্রামাগার ও সেতু নির্মাণ ক'রে সাধারণের সেবা করেন, তিনি ত্রিভুবনবিজয়ীর মতই সফল পুরুষ।

গৃহী ব্যক্তিকে অবশ্যই সৎ, নম্র ও বিনীত হতে হবে, কিন্তু নির্বীর্যতা, কাপুরুষতা বা প্রতিকারহীন নিশ্চেষ্টতাকে যেন বিনয় বা নম্রতা বলে ভুল করা না হয়। মহানির্বাণতন্ত্রের একটি শ্লোক বিশ্লেষণকালে স্বামীজী বলছেন, "শত্রু-গণকে বীর্যপ্রকাশ করিয়া শাসন করিতে হইবে, ইহা গৃহস্থের অবশ্যকর্তব্য। গৃহস্থ ঘরের এক কোণে বসিয়া কাঁদিবে না, অপ্রতিকারবিষয়ক বাজে কথা বলিবে না। গৃহস্থ যদি শত্রুগণের নিকট শৌর্য-প্রকাশে বিরত থাকে তাহা হইলে তাহার কর্তব্যের অবহেলা হয়। ...অসৎ ব্যক্তিকে সম্মান করা গৃহীর কর্তব্য নয়, তাহাতে অসদ্বিষয়েরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়।"

দেশ ও জাতির প্রতিও গৃহী পবিত্র কর্তব্য-বন্ধনে আবদ্ধ। মহানির্বাণতন্ত্রে আছে—

ন বিভেতি রণাদ্ যো বৈ সংগ্রামেঽপ্যপরাঙ্মুখঃ।
ধর্মযুদ্ধে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্॥

শ্লোকটি বিশ্লেষণকালে স্বামীজী বলছেন—"যিনি যুদ্ধে ভয় পান না, যিনি সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ বা যিনি ধর্মযুদ্ধে মৃত হন, তিনি ত্রিভুবন জয় করেন। যদি স্বদেশের বা স্বধর্মের জন্য যুদ্ধ করিয়া গৃহস্থের মৃত্যু হয়—যোগিগণ ধ্যানের দ্বারা যে পদলাভ করেন, তিনিও সেই পদ লাভ করিয়া থাকেন।"

সুতরাং, গৃহীর জীবন কর্তব্যময়, কর্মময় তার কর্তব্য আছে মাতা পিতা ভার্যা পুত্র ও কন্যাদের প্রতি, স্বজন বন্ধু ও সহায়হীনদের প্রতি, সমাজ দেশ ও স্বধর্মের প্রতি। নিরন্তর কর্মরত থাকার জন্যই সংসারে পুরুষের আগমন।

কিন্তু সে কর্ম করতে হবে প্রভুর মত, ক্রীতদাসের মত নয়। শৃঙ্খলবদ্ধ ক্রীতদাস সকল কাজ করে নিরুপায় হয়ে, তার সঙ্গে অন্তরের সংযোগ থাকেনা, থাকেনা কোন ভালবাসার অনুপ্রেরণা। কিন্তু গৃহীর কাজের মূল অনুপ্রেরণা ভালবাসা, কল্যাণচিন্তা। আত্মীয় পরিজন স্বদেশ সমাজ ও স্বধর্মের জন্য গৃহস্থ যে আত্মদান করেন তা করেন স্বেচ্ছায়, সকলকে ভালবাসার তাগিদে। সে আত্মদান প্রকৃতপক্ষে ভগবানে আত্মনিবেদন।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "হে অর্জুন! আমাকেই দেখনা, যদি আমি এক মুহূর্ত কর্ম হইতে বিরত হই, সমগ্র জগৎ ধ্বংস হইবে। কর্ম করিয়া আমার কোন লাভ নাই। আমিই জগতের একমাত্র প্রভু, তবে আমি কর্ম করি কেন?—জগৎকে ভালবাসি বলিয়া।" —প্রকৃত গৃহস্থের সকল কাজের অনুপ্রেরণাও এই অনাসক্ত ভালবাসা। এই ভালবাসাই গৃহস্থের ঈশ্বরোপাসনা।

"মানুষ হও···। অমনি দেখবে ওসব বাকী আপনা আপনি গড়গড়িয়ে আসছে। ও পরস্পরের নেড়ি কুত্তোর খেয়োখেয়ি ছেড়ে সদুদ্দেশ্য, সদুপায়, সৎসাহস, সদ্বীর্য অবলম্বন কর। যদি জন্মেছ তো একটা দাগ রেখে যাও।"

"কর্ম করতে গেলে কিছু না কিছু পাপ আসবেই। এলোই বা। উপবাসের চেয়ে আধপেটা ভাল নয়? কিছু না করার চেয়ে, জড়ের চেয়ে, ভালমন্দ মিশ্রিত কর্ম করা ভাল নয়? গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, দেয়ালে চুরি করে না, তবুও তারা গরু আর দেয়ালই থাকে। মানুষে চুরি করে, মিথ্যা কথা কয়, আবার সেই মানুষই দেবতা হয়।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

দুঃখের নিবৃত্তি

ডক্টর শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ দাস

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে একবার বিছে কামড়াইয়াছিল। ভীষণ যন্ত্রণা। তখন তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে রবীন্দ্রনাথ বলিয়া আর একজন কবি কষ্ট পাইতেছেন, তিনি কষ্ট পাইতেছেন না। এই রকমভাবে নিজেই নিজেকে আলাদা করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলেন। ফলে অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই যন্ত্রণা কোথায় চলিয়া গেল, সব ভুলিয়া গেলেন।[১] অতএব দেখা যাইতেছে, শারীরিক যন্ত্রণা বা কষ্ট ঔষধপত্র ব্যতিরেকেও নিজের চেষ্টায় দূর করা যায়। কিরূপে ইহা সম্ভব হয়? বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, সকল প্রকার শারীরিক অনুভূতি, তা সে সুখকরই হউক বা দুঃখকরই হউক, স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনার ফলেই হইয়া থাকে। স্নায়ুসূত্রের এই উত্তেজনা মস্তিষ্কে নীত হইলেই আমরা শারীরিক অনুভূতি লাভ করি। "স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনা-প্রবাহ ইচ্ছানুসারে হ্রাস বা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। এই হ্রাস-বৃদ্ধি আণবিক সন্নিবেশের উপর নির্ভর করে। একরূপ সন্নিবেশে উত্তেজনার প্রবাহ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, অন্যরূপ সন্নিবেশে উত্তেজনার প্রবাহ আড়ষ্ট হইয়া যায়। * * * ইহাতে দেখা যায়, স্নায়ুসূত্রে আণবিক সন্নিবেশ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা নিয়মিত হইতে পারে। তাহা হইলে ভিতরের শক্তিবলেও স্নায়ুসূত্রের উত্তেজনা-প্রবাহ বর্ধিত অথবা সংযত হইতে পারিবে।"[২] ইচ্ছাশক্তির দ্বারা স্নায়ুসূত্রের উত্তেজনা-প্রবাহ হ্রাস করিয়া শারীরিক যন্ত্রণা বা দুঃখকে দূর বা প্রশমিত করা যাইতে পারে। কিন্তু সব সময়েই কি এই উপায়ে দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব? যন্ত্রণার তীব্রতা, ইচ্ছাশক্তির প্রবলতা, নিজের সাধনা প্রভৃতির উপর ইহা নির্ভর করে। বৈজ্ঞানিকেরাও স্বীকার করেন ইচ্ছাশক্তির দ্বারা স্নায়বিক উত্তেজনা নিয়মিত করা বহুদিনের অভ্যাস- ও সাধনা-সাপেক্ষ।[২] অতএব এ উপায়ে দুঃখের নিবৃত্তি আদৌ সহজসাধ্য নহে। তাহা যদি হইত তাহা হইলে সকলেই এই উপায়ে দুঃখের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিত।

সকল দুঃখেরই অনুভূতি হয় মনে। স্নায়ু, মস্তিষ্ক প্রভৃতির মাধ্যমে শরীরের বেদনা মনকে স্পর্শ করে। সাধারণ অবস্থায় আমরা শরীরের সঙ্গে জড়াইয়া থাকি, তাই শরীরের দুঃখ আমাদের মনের নাগাল পায়। ইচ্ছাশক্তি প্রবল থাকিলে স্পর্শ করিলেও শারীরিক দুঃখকে আমরা মন হইতে সরাইয়া দিতে পারি। কিন্তু এই দুঃখের চিরনিবৃত্তি ঘটে একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান বা ভগবানলাভ হইলে; তখন শারীরিক দুঃখ আর আমাদের স্পর্শই করিতে পারে না; তখন দেহ হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়। অবশ্য ভোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিরত হইতে না পারিলে এ অবস্থা আসে না; শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, "কামিনীকাঞ্চনের উপর ভালবাসা যদি একেবারে চলে যায়, তাহলে ঠিক বুঝতে পারা যায় যে দেহ আলাদা আর আত্মা আলাদা। নারকেলের জল সব শুকিয়ে গেলে মালা আলাদা, শাঁস আলাদা হয়ে যায়।

(১) আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ—রাণীচন্দ। (১৩৫১) পৃষ্ঠা ৪৪।

(২) অব্যক্ত—আচার্য শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু। (১৩৫৮) পাতা ২২৩-২২৪।

…যেমন খাপ্ আর তরবার—খাপ্ আলাদা, তরবার আলাদা।"[৩]

শারীরিক দুঃখ ছাড়া মানসিক দুঃখও আছে। বাসনা বা তৃষ্ণাই মানসিক দুঃখের কারণ। সকল বাসনা বা কামনা হইতে মনকে মুক্ত করিতে পারিলেই মানসিক দুঃখের হাত হইতে মুক্তিলাভ্ করিতে পারা যায়। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, মনই মনুষ্যগণের বন্ধন ও মুক্তির কারণ। বিষায়াসক্ত মন বন্ধনের ও বিষয়হীন মন মুক্তির কারণ—

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈ নির্বিষয়ং স্মৃতম্॥[৪]

কিন্তু মনকে সম্পূর্ণরূপে বিষয়মুক্ত করা অতিশয় কঠিন। মন সম্পূর্ণরূপে বিজিত না হইলে তাহা সম্ভব নহে। এমন কি কাহারও কাহারও মতে ভগবানের কৃপা ব্যতিরেকে কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় ইহা সম্ভবই নহে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "ঈশ্বরের কৃপা না হ'লে, মায়া দোর ছেড়ে না দিলে কারুর আত্মজ্ঞান লাভ ও দুঃখের নিবৃত্তি হয় না—জানবি।"[৫] এইজন্য যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বলা হইয়াছে, সমুদ্রপান, সুমেরু-পর্বত উন্মূলন অথবা বহ্নিভক্ষণ—এই সব কর্ম হইতে মনোজয় আরও বিষম ব্যাপার -

অপ্যব্ধিপানান্মহতঃ সুমেরুন্মূলনাদপি।
অপি বহ্ন্যশনাৎ সাধো বিষমশ্চিত্তনিগ্রহঃ॥

বিষয়-বাসনা মনের স্বাভাবিক ধর্ম মানুষের মন লতানে গাছের মতন; কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করাই তাহার স্বভাব। মন যখন কোন না কোন বিষয়ে আসক্ত হইবেই, তখন অন্য সব বিষয় হইতে মনকে বিযুক্ত করিয়া এরূপ কোন একটি বিষয়ে আসক্ত করা উচিত যাহা অক্ষয়, অনাদি ও অনন্ত। তাহা হইলে আর বিষয়ের ক্ষয়জনিত দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। অতএব ভগবানে মনকে আসক্ত করাই ভাল কারণ তিনিই অক্ষয়, অনাদি ও অনন্ত। ভগবানের উপর নির্ভর করিলে অনেক দুঃখের হাত হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট একদিন এক পুত্রশোকাতুর ভক্ত (সেইদিনই তাঁহার পুত্রবিয়োগ হইয়াছিল) উপস্থিত হইলে তিনি নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যু-প্রসঙ্গ তুলিয়া এই বলিয়া সান্ত্বনা দিয়াছিলেন, "আহা! পুত্র-শোকের মত কি আর জ্বালা আছে?…অক্ষয় মলো—তখন কিছু হলো না। কেমন করে মানুষ মরে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম। দেখলুম—যেন খাপের ভিতর তলোয়ারখানা ছিল, সেটাকে খাপ থেকে বার করে নিলে। তলোয়ারের কিছু হলো না—যেমন তেমনি থাকল, খাপটা পড়ে রইল! দেখে খুব আনন্দ হলো—খুব হাসলুম, গান করলুম, নাচলুম! …তার পরদিন ঐখানে দাঁড়িয়ে আছি, আর দেখছি কি, যেন প্রাণের ভিতরটায় গামছা যেমন নেংড়ায় তেমনি নেংড়াচ্ছে, অক্ষয়ের জন্য প্রাণটা এমনি কচ্ছে! ভাবলুম, মা, এখানে (আমার) পরনের কাপড়ের সঙ্গেই সম্বন্ধ নাই, তা ভাইপোর সঙ্গে তো কতই ছিল! এখানেই (আমার) যখন এরকম হচ্ছে, তখন গৃহীদের শোকে কি না হয়!—তাই দেখাচ্ছিস বটে!" "তবে কি জান, যারা তাঁকে (ভগবানকে) ধরে থাকে তারা এই বিষম শোকেও একেবারে তলিয়ে যায় না। একটু নাড়া-চাড়া খেয়েই

(৩) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত—৪র্থ ভাগ, ৩০৫ পৃষ্ঠা।
(৪) পঞ্চদশী—বিদ্যারণ্যমুনিকৃত—১১শ প্রকরণ —১৭ শ্লোক।
(৫) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ। —স্বামী সারদানন্দ প্রণীত। তৃতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা ২৮৪
(৬) বশিষ্ঠবাক্য—পঞ্চদশীতে উদ্ধৃত ৭ম প্রকরণ, —১২১ শ্লোক।

সামলে যায়। চুনোপুঁটির মত আধারগুলো একেবারে অস্থির হয়ে ওঠে বা তলিয়ে যায়। দেখনি? গঙ্গায় ষ্টীমারগুলো গেলে জেলে-ডিঙ্গীগুলো কি করে? মনে হয় যেন একেবারে গেল। আর বড় বড় হাজারমুনে ভিস্তিগুলো দুচার বার টালমাটাল হয়েই যেমন তেমনি—স্থির হলো। দুচার বার নাড়া-চাড়া কিন্তু খেতেই হবে।"[৭]

বৌদ্ধরা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী কিন্তু ঈশ্বরবিশ্বাসী নহেন; তাঁহারাও মনকে বিষয়মুক্ত করার বা বাসনা ত্যাগ করার কথা বলিয়াছেন। এজন্য দুঃখের নিবৃত্তিকল্পে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামক নির্দেশিত পথে চলিতে বলা হইয়াছে।

যাঁহারা পুনর্জন্ম, স্বর্গ, নরক প্রভৃতিতে বিশ্বাস করেন না ও দেহাতীত কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, দুঃখ লাঘব করিবার জন্য তাঁহারাও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা বা শিল্পচর্চা করিতে পরামর্শ দেন; কারণ এ সব বিষয়ের কোন ক্ষয় বা অন্ত নাই।

(৭) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ প্রণীত তৃতীয় খণ্ড—পৃষ্ঠা ২৫, ২৬

বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক ভাবধারা

অধ্যাপক শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারত অধ্যাত্মভূমি—আধ্যাত্মিকতাই ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বেদ-উপনিষদ্ ও গীতার বাণীই সেই আধ্যাত্মিকতার মূল ভিত্তি। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে বাসুদেব অর্জুনকে 'সমদর্শন' হইবার উপদেশ দিয়াছিলেন। পরমাত্মাকে সর্বভূতে দর্শন এবং সেই পরমাত্মাতেই আবার সর্বভূতকে নিরীক্ষণ, এই উপলব্ধিই মানুষকে সর্বত্র সমদর্শন করে।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম দর্শন হইতেই সংশয়াকুল নরেন্দ্রনাথকে সেই পরমজ্ঞান, 'অদ্বৈতজ্ঞানই' দিতে চাহিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে 'ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ'। ঠাকুরের 'ভবতারিণী', ব্রহ্মময়ী; তিনি আর অদ্বৈতবাদীর ব্রহ্ম একই। শ্রীরামকৃষ্ণ-পদপ্রান্তে শিক্ষালাভের পর আমেরিকা পর্যটনকালে পরিশ্রান্ত বিবেকানন্দ নির্জনে বিশ্রামলাভের জন্য সেন্ট-লরেন্স নদীর উপর সহস্রদ্বীপোদ্যানস্থ ভবনে কয়েকটি সপ্তাহ যাপন করিতেছিলেন। সেখানে একদিন প্রাতঃকালে অল্প সময়ের মধ্যে রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার অমর গীতি, 'সন্ন্যাসীর গীতি'। উহার প্রতি ছত্রে ধ্বনিত হইয়া আছে অদ্বৈতবাদীর ব্রহ্মোপলব্ধি, বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞান।

"কার পিতা তবে, কাহার সন্তান?
কার বন্ধু শত্রু কাহার ধীমান্?
একমাত্র যেবা—যেবা সর্বময়,
যাহা বিনা কোন অস্তিত্বই নয়,
'তত্ত্বমসি' ওহে সন্ন্যাসী প্রবর,
উচ্চরবে তাই এই তান ধর—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ।"

ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াতের পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছেও ঈশ্বরদর্শন সম্পর্কে ঈপ্সিত উত্তর প্রাপ্তিতে নিরাশ হইয়া হৃদয়ে প্রবল অশান্তি বহন করিয়া, যখন 'জিজ্ঞাসার' মূর্ত

প্রতীক নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ-পদপ্রান্তে উপনীত হইলেন এবং সোজা প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?", তখন শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন, "হাঁ দেখেছি; তোকে যেভাবে দেখছি, তার চেয়েও স্পষ্টভাবে দেখেছি। আর তুই যদি দেখতে চাস, তোকেও দেখাতে পারি।"

নরেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবনের আরম্ভ এই প্রশ্নে ও জিজ্ঞাসায়। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেই নরেন্দ্রনাথ পাইলেন তাঁহার প্রশ্নের উত্তর এবং সমস্যার সমাধান। তখন হইতেই গুরু-শিষ্যের দিব্যলীলা দিনের পর দিন চলিতে লাগিল। যদি ইহা স্বীকার করি যে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম ধাপ, '—শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্', তবে তার শেষ ধাপ 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' এই প্রসঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের নিরক্ষর পূজারীর পায়ে বিবেকানন্দের আত্মসমর্পণের উক্তিটি লক্ষণীয়:

"আজকাল ইহা একটি চলিত কথায় দাঁড়াইয়াছে…যে সাকারোপাসনা দোষাবহ। আমিও একসময় এরূপ ভাবিতাম, আর ইহার শাস্তিস্বরূপ আমাকে এমন এক ব্যক্তির পদতলে শিক্ষালাভ করিতে হইয়াছিল, যিনি প্রতিমাপূজা হইতেই সব পাইয়াছিলেন।" জিজ্ঞাসাই নরেন্দ্রনাথকে বিবেকানন্দে রূপান্বিত করিয়াছিল। কালীমন্দিরের মা ভবতারিণী, অদ্বৈতবাদীর পরব্রহ্ম, খৃষ্টানের গড্, মুসলমানের আল্লা, এ-সকল এক ঈশ্বরেরই অনন্ত রূপ। সব কিছুই এক নিত্য সত্তার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' ব্রহ্ম ও ব্রহ্মময়ী অভিন্ন। ঠাকুর তাঁহার এই উপলব্ধিই শিষ্যে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। এই উপলব্ধির উপরই নরেন্দ্রনাথের অধ্যাত্মজীবন প্রতিষ্ঠিত হইল। গুরুর কৃপায় সাধনায় সিদ্ধ নরেন্দ্রনাথ যথাসময়ে Practical Vedantist মানবমিত্র বিবেকানন্দে রূপান্তরিত হইয়া বিশ্বকল্যাণে আপনাকে উৎসর্গ করিলেন।

ঠাকুরের পদপ্রান্তে উপবিষ্ট নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টিতে 'সপ্তর্ষির একটি ঋষি।' ধ্যানমগ্ন হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেখেছিলেন, তিনিই একদিন বালকবেশে সেই ঋষির গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, "আমি যাচ্ছি, তোমাকেও যেতে হবে।" নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণের সেই 'নরঋষি'—নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে 'সহস্রদল পদ্ম'—শ্রেষ্ঠ আধার। নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ঠাকুর বলতেন, 'এরা নিত্যসিদ্ধের থাক, এরা সংসারে বদ্ধ হয় না। একটু বয়স হলেই চৈতন্য হয়—আর ভগবানের দিকে চলে যায়।' নরেন্দ্র ঠাকুরের নিকট বেদের 'হোমাপাখী।' হোমাপাখী চোখ ফুটলেই দেখতে পায় যে সে পড়ে যাচ্ছে, মাটিতে লাগলে একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। তখন সে পাখী 'মায়ের দিকে একেবারে চোঁচা দৌড় দেয়, আর উচুঁতে উঠে যায়।' ঠাকুরের উক্তি হইতেই আমরা নরেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবনের সূত্রটি ধরিতে পারি। ছেলেবেলায় নরেন্দ্রনাথ 'ধ্যান-ধ্যান' খেলিতেন। কাশীপুর আশ্রমে ঠাকুরের শিক্ষাগুণে 'নির্বিকল্প সমাধিতে পরমানন্দের' আস্বাদও একদিন লাভ করিলেন। নরেন্দ্রকে দিয়া ঠাকুরের অনেক কাজ—তাই আবার সমাধির ঘরে চাবিও দিয়া রাখিলেন। ঠাকুরের দেহাবসানের পর তিনি কয়েক বৎসর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে পরিভ্রমণ, বেদান্ত প্রচার, মঠ ও মিশন সংগঠন, কেন্দ্র স্থাপন, বিশ্বকল্যাণে মানব-সেবাকার্যে আত্মোৎসর্গ, শিষ্য ও কর্মিদল গঠন প্রভৃতি অসংখ্য কার্য দ্বারা জগৎ 'তোলপাড়' করিয়া, বিপুল নিরলস কর্মে নিজকে একেবারে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। দশ বৎসরে একশত বৎসরের কাজ সমাপন করিয়া এবং মানবজাতির হাজার বৎসরের

কর্মসূচীর ইঙ্গিত রাখিয়া শেষ দিনে পরিশ্রান্ত মায়ের ছেলে যেন "মা, মা" এই অস্ফুট ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া মায়ের কোলেই আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন।

পিতা বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর সংসারের তীব্র অভাবের তাড়নায়, সংসারের অসহনীয় জ্বালা-যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন—ঠাকুর যেন একবার মাকে বলিয়া নরেন্দ্রনাথের সাংসারিক অভাব মিটাইয়া দেন ; ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে ভবতারিণীর মন্দিরেই পাঠাইয়া দিলেন। নরেন্দ্রনাথ সংসারের কথা ভুলিয়া গিয়া শুধু প্রার্থনা করিলেন : 'মা, আমায় জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস, বৈরাগ্য দাও।' সে দিন মায়ের কাছে নরেন্দ্রনাথ আর কিছু চাহিতে পারেন নাই।

কাশীপুরে ঠাকুরের দেহাবসানের দিন নরেন্দ্রের মনের সকল সংশয়ের নিরসন করিয়া তিনি বলিয়া গেলেন : "যে রাম, যে কৃষ্ণ—সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ।"

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার শ্রেষ্ঠ সন্তানকে দিয়া গেলেন জীবনের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্পদ—বলিয়া গেলেন; 'তোকে সব দিয়ে ফকির হয়ে গেলুম।' শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে সার তত্ত্বের উপলব্ধি হইতেই বেদান্তকেশরী নরসখা মানব-মিত্র বিবেকানন্দের জন্ম হইল। বিবেকানন্দের জীবন বিশ্বকল্যাণে নিয়োজিত হইল। জীবনের একমাত্র আদর্শ হইল ত্যাগ ও সেবা—Service and Renunciation ; আর তাহা—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'। দক্ষিণেশ্বরে মায়ের ছেলে শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বসাধনায় সিদ্ধ—অবিরাম তাঁহার প্রার্থনা, "মা আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও" —তাঁহার কণ্ঠে গান, "আমায় দে মা পাগল করে, —আমার কাজ নাই মা জ্ঞান-বিচারে।" সেই যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের হাতে গড়া বিবেকানন্দ। তিনি চাহিয়াছিলেন, বিবেকানন্দের কাছে আসিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারী সংসারতাপ জুড়াইবে। শ্রীরামকৃষ্ণের আশিস লাভ করিয়া কঠোর তপশ্চর্যায় পরিব্রাজক বিবেকানন্দ শক্তির বিকাশ ও জ্ঞানসঞ্চয় করিলেন। উদাত্তকণ্ঠে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে বেদান্তের অমোঘ বাণী প্রচার দ্বারা জীবকল্যাণ-সাধনই জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিলেন :

"ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়
মনপ্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়।"

* * *

মানবমিত্র বিবেকানন্দ মানুষকে শিখাইয়া গেলেন 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'—তিনি দিয়ে গেলেন জগৎকে সকল পূজার শ্রেষ্ঠ পূজা, 'দরিদ্র-নারায়ণসেবা'। বনের বেদান্তকে বিবেকানন্দ লইয়া আসিয়াছেন আমাদের সংসারের ঘরে ঘরে। তাঁহার বেদান্তের আদর্শটি উজ্জ্বল হইয়া আছে তাঁহার কয়েকটি কথায়, "আমার আদর্শকে বস্তুতঃ অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতে পারে —মানুষের নিকট তাহার অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রচার এবং জীবনের প্রতিকার্যে সেই দেবত্ব-বিকাশের পথনির্ধারণ।"

'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'—এই আহ্বানের মধ্যেই নিহিত আছে বিবেকানন্দের অধ্যাত্ম-সম্পদের মূলসূত্রটি। আমরা অমৃতের পুত্র—অমৃতত্বলাভের অধিকারী!

একদিকে বেদান্তের উত্তুঙ্গ শিখর হইতে "তত্ত্বমসি" মন্ত্রের বজ্রনির্ঘোষ প্রচার—অন্যদিকে মায়ের কোলে—আমি মায়ের—মা আমার—এই দুইটি ভাবস্তম্ভের উপরই শ্রীরামকৃষ্ণসন্তান বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক সৌধ বিধৃত। বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক ভাবধারা ভারতের যুগযুগসঞ্চিত জ্ঞানের 'Sum-total'। সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন, নারায়ণজ্ঞানে সকলের সেবা—ইহাই

বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত আধ্যাত্মিক জীবনের মূলকথা। ত্যাগ ও সেবা—ইহাই আমাদের ধর্ম, কর্ম, মোক্ষ বা ভগবান লাভের সেতু। সচ্চিদানন্দোপলব্ধি বা মায়ের কোলে পরমশান্তি লাভ—ইহাই মানব-জীবনের লক্ষ্য। নিষ্কাম কর্মযোগের সাধনা সেই লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপায়। প্রত্যেক ভারতবাসীকে তিনি বলিলেন, "তোমার সমাজ বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র—তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি-প্রদত্ত।"

'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে'—ত্যাগ ও সেবা মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া নরনারায়ণ-সেবায় জীবনোৎসর্গ, ইহাই বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক ভাবধারা। উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর আদর্শ। শ্রীরামকৃষ্ণ-পদতলে শিক্ষালাভের পর বিবেকানন্দকে আমরা পাই জ্ঞান-বৈরাগ্য-বিশ্বপ্রেমের ত্রিবেণী-সঙ্গমে। বিবেকানন্দ প্রেমিক সন্ন্যাসী—জগতের কল্যাণকামী আচার্য। বিভ্রান্ত মানুষের পথ-প্রদর্শক—ঐতিহ্যময় ভারতের শাশ্বত বাণীর মূর্ত প্রতীক। বিবেকানন্দ সর্বোপরি মানবমিত্র, ত্যাগ ও সেবার পথেই পরাশান্তি ও ভাগবত জীবন লাভ করা যায়—জগতের সামনে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তান বিবেকানন্দ এই মহান্ আদর্শটি রেখে গেলেন। মনে হয় উহাই বিশ্বের কল্যাণের পথ—উহাই জীবনে শান্তি ও পরমানন্দ লাভের উপায়।

জীবনসন্ধ্যায় পরমানন্দ-সাগরে মিশিয়া উহার সহিত এক হইয়া যাইবার চিত্রটি তিনি ফুটাইয়াছেন:

"এইরূপে বন্ধো, দিন পর দিন,
করমের শক্তি হয়ে যাবে ক্ষীণ;
আত্মার বন্ধন ঘুচিয়া যাইবে,
জনম তাহার আর না হইবে;
'আমি' বা 'আমার' কোথায় তখন?
ঈশ্বর—মানব—তুমি—পরিজন—
সকলেতে 'আমি', আমাতে সকল—
আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ কেবল।
সে আনন্দ তুমি, ওহে বন্ধুবর,
তাই হে আনন্দে ধর তান ধর—
ওঁ তৎসৎ ওঁ।"

নবযুগউদ্‌গাতা, নরসখা, প্রেমিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দর এই মঙ্গলগীতির সুরটি আমাদের জীবনেও ধ্বনিত হউক—তাঁহার আশীর্বাদ আমাদের উপর বর্ষিত হউক। মানবজাতি তাঁহার অধ্যাত্ম-সম্পদের অধিকারী হউক—এই প্রার্থনা।

সমালোচনা

Svāmī Vivekānanda: A Historical Review—By Dr. R. C. Majumdar. Publisher: Sures C. Das, General Printers & Publishers P. Ltd. 119, Dharamtala Street, Calcutta 19. Pp. 182; Price Rs. 10/-.

অল্পকাল পূর্বে স্বামীজীর জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে একাধিক গ্রন্থ তাঁহার জীবন ও বাণীর মহিমা ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানি একই উদ্দেশ্যে প্রকাশিত। আধুনিক ভারতের জীবিত ঐতিহাসিকদের শীর্ষস্থানীয় শ্রদ্ধেয় রমেশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় স্বামীজীর শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আহূত হইয়া যে তিনটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন সেই বক্তৃতাবলীই এই পুস্তকের রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

স্বভাবতই অধ্যাপক মজুমদারের ন্যায় প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের লেখনী-নিঃসৃত পুস্তকটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হইতে স্বামীজীর জীবন ও বাণীর তাৎপর্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে স্মরণীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ১৮২ পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত পুস্তকটিতে স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার যে পরিচয় লেখক উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা সেই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের মহত্ত্বকে বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে। আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও স্বামীজীর মহিমা যে মনস্বিতার আলোকে বিশ্লেষণ করিয়া লেখক পাঠকগণকে দেখাইতে চাহিয়াছেন তাহার মূল্য অল্প নহে।

চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত পুস্তকটিতে প্রথম তিন অধ্যায়ে যথাক্রমে স্বামীজীর জীবনের প্রথম পর্যায়, স্বামীজীর পাশ্চাত্য জগতে ভ্রমণ ও তাঁহার ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী কার্যাবলীর বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে স্বামীজীর প্রতিভার বিভিন্ন দিকের সুচিন্তিত সমালোচনা স্থান পাইয়াছে।

পুস্তকটির প্রধান গুণ ইহার ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী। স্বামীজী-সম্বন্ধে আলোচনায় লেখক Historical criticism বা ঐতিহাসিক সমালোচনার পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

এইজন্য তথ্যের পরিবেশনে প্রামাণিকতার দিকে তাঁহার দৃষ্টি যেমন তীক্ষ্ণ, তত্ত্বের আলোচনায় অলৌকিকত্বের অবতারণার পরিবর্তে লৌকিক যুক্তি-পরায়ণতার প্রতি তাঁহার আস্থা তেমনি সুস্পষ্ট। তাঁহার প্রত্যেকটি মন্তব্যের পশ্চাতে ঐতিহাসিকের সতর্কতা সুপরিস্ফুট।

স্বামীজীর নিতান্ত সংক্ষিপ্ত জীবনী এই পুস্তকে সঙ্কলিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে কোথাও লেখক কোন অলৌকিক ঘটনাকে স্বামীজীর মহিমা-প্রচারে প্রধান উপজীব্য রূপে গ্রহণ করেন নাই। স্বামীজীর জীবনের অলৌকিক অভিজ্ঞতাকে তিনি কিন্তু সম্পূর্ণ অস্বীকারও করেন নাই।

স্বামীজী 'রাজযোগ' গ্রন্থে মানব-মনের অবচেতন, চেতন ও অতীন্দ্রিয় চেতনার যে তিনটি স্তরের উল্লেখ করিয়াছেন অধ্যাপক মজুমদারের জীবনী-ব্যাখ্যায় তাহার স্বীকৃতি আভাষিত।

স্বামীজী-সম্বন্ধে অলৌকিক ঘটনার অবতারণায় তাঁহার অনাসক্তি সত্ত্বেও অধ্যাপক মজুমদার স্বামীজীর অলৌকিক মহিমায় অবিশ্বাসী নহেন। অধ্যাপক মজুমদারের বিশ্লেষণে সেই অলৌকিক মহিমার ভিত্তি স্বামীজীর অসাধারণ ত্যাগ, বৈরাগ্য, অসীম মানব-প্রীতি ও জ্বলন্ত দেশপ্রেম এবং অসামান্য চিন্তাশীলতা ও আধ্যাত্মিক গুণাবলী। এই পুস্তকের বিভিন্ন

অধ্যায়ের নানা স্থানে অধ্যাপক মজুমদার স্বামীজীর উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি নিপুণভাবে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন।

স্বামীজীর সর্বজনপরিচিত জীবনকাহিনীকেই অধ্যাপক মজুমদার গ্রহণ করিয়াছেন। কোন অজ্ঞাত তথ্য জীবনী-অংশে স্থান পায় নাই। তথ্য-সমাবেশের দিক হইতে বিশিষ্টতা না থাকিলেও স্বামীজীর মহত্ত্ব ও প্রতিভার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এই পুস্তকটির মৌলিকতা ও উৎকৃষ্টতা উল্লেখযোগ্য।

স্বামীজীর জীবনের কেন্দ্রস্থলে যে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এই সত্যকে লেখক সর্বদাই স্মরণ করিয়াছেন। বহু পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পর স্বামীজী কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা বিবৃত করিয়া লেখক বলিয়াছেন—"In later life Narendra used to say that all his learning and all his ideas were derived from Ramakrishna" (P 11).

ইতিহাস-সম্পর্কিত স্বামীজীর উক্তি সম্বন্ধে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক অধ্যাপক মজুমদারের এই মন্তব্যটি বিশেষভাবে স্মরণীয়—"He has given an altogethar new interpretation of the evolution of Indian history through ages, which considering the time in which he wrote, displays an amazing depth of knowledge and critical judgment" (P 96).

জাতীয় জীবনে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বামীজীর ঐতিহাসিক ভূমিকাটিও অধ্যাপক মজুমদার সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

প্রাচীন ভারত ও আধুনিক ইউরোপের ভাবধারার সংঘাত লইয়া আমাদের জাতীয় জীবনে যে সঙ্কট দেখা দিয়াছিল তাহার সমাধান যে স্বামীজীই নির্দেশ করিয়াছিলেন, ইহা ব্যক্ত করিয়া অধ্যাপক মজুমদার বলিয়াছেন—"In other words, the conflict between the thesis represented by the Anglican Reformists, and the anti-thesis represented by the reactionary orthodox Hindus was resolved by the synthesis propounded by Svami Vivekananda, which has been accepted as the basis for the evolution of Modern India" (P—139).

অধ্যাপক মজুমদার পুস্তকরচনায় তাঁহার উদ্দেশ্যের উল্লেখ করিয়া ভূমিকায় স্বামীজীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"I cannot think of any other person who has a greater claim to be regarded as the true friend, philosopher and guide of the young generations of India in the complexities of life with which they are faced today."

স্বামীজীকে আচার্যরূপে গ্রহণ করিলে ভারতের তরুণসমাজ যে তাহাদের জীবনের সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইবে অধ্যাপক মজুমদারের সহিত এই বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই একমত হইবেন।

সেই অদ্বিতীয় মহাপুরুষের নির্দেশিত পথই যেমন জাতির পক্ষে তেমনি বিশ্বের পক্ষে দুরূহ সমস্যা হইতে মুক্তির প্রকৃত পথ

অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

শিলং : রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৬১—৬২ ও ১৯৬২—৬৩ খৃষ্টাব্দের কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই আশ্রম কর্তৃক পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয়টি বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক উভয় মতেই চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। আধুনিক ল্যাবরেটরি, এক্স-রে, ইলেক্ট্রোথেরাপি প্রভৃতি বিভাগ এলোপ্যাথিক চিকিৎসার অঙ্গহিসাবে ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে চিকিৎসাবিষয়ক তথ্য :

	১৯৬১—৬২	১৯৬২—৬৩
চিকিৎসিতের সংখ্যা	৬২,৮১০	৬৩,৮৪৫
	(নূতন : ৩২,০৮৫)	(নূতন : ৩৫,৭৮৩)
সাধারণ অস্ত্র-চিকিৎসা	২৬০	২২৯
চক্ষু-চিকিৎসা	৫৪১	৪২০
এক্স-রে পরীক্ষা	৪৯২	১,৩৫১
ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষিত নমুনা	৯৭৪	১,৪৩৫
ইঞ্জেকশন	১,৭৬৮	১,৫৫১

পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে একটি ভ্রাম্যমাণ ডিস্পেন্সারি পরিচালিত হয়; ইহাতে আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে ২,৮৩১ ও ৬,৫৮৫ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে।

আশ্রমের বিবেকানন্দ লাইব্রেরীর পুস্তক-সংখ্যা ৫,৫৫১। অবৈতনিক পাঠাগারে ৩৮টি সাময়িক ও ১৩টি দৈনিক পত্রিকা রাখা হয়। গ্রন্থাগার-সংলগ্ন শ্রোতৃ-ভবনটির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ১০০ জন শ্রোতার স্থান হইবে। বিদ্যার্থী ভবনে উভয় বর্ষেই ২৪ জন করিয়া ছাত্র ছিল। ইহাদের মধ্যে ৪ জন বিনা-খরচে ও ৪ জন আংশিক খরচে থাকিবার সুযোগ লাভ করে। বিদ্যার্থীদের জন্য ১২০টি ধর্মক্লাস করা হইয়াছে। নিকটস্থ হরিজন কলোনিতে একটি নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে।

আশ্রম কর্তৃক খাসী, গারো ও আসামী ভাষায় স্বামীজী-বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

সাপ্তাহিক ধর্মমূলক ক্লাস, প্রতিমায় দুর্গাপূজা এবং সাময়িক উৎসবাদি যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসব-সংবাদ

কাঁথি : শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৩রা, ৪ঠা ও ৫ই এপ্রিল তিন দিন ধরিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিশেষপূজা-পাঠাদি, সভা, সঙ্গীত ও প্রসাদবিতরণ উক্ত উৎসবের প্রধান প্রধান অঙ্গ ছিল। ৪ঠা এপ্রিল বিভিন্ন গ্রাম হইতে আগত ২৫টি সংকীর্তন-সম্প্রদায় হরিনামকীর্তনে যোগদান করেন। তিন দিনে মোট প্রায় ৭,০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীপান্নালাল ভট্টাচার্য প্রমুখ সঙ্গীত-বিশারদগণ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল সন্ধ্যায় যথাক্রমে স্থানীয় দেশপ্রেমিক শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কাঁথির মহকুমা শাসক শ্রী জি. বেঙ্কট রমনের সভাপতিত্বে স্বামী অজজানন্দ ও বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষামন্দিরের অধ্যক্ষ শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায় ধর্মালোচনা করেন। সভায় প্রত্যহ জনসমাগম হইত প্রায় পাঁচ-হাজার করিয়া।

বাগেরহাট : গত ৯ই এপ্রিল বাগেরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাৎসরিক জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

ভোরে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা ও ভোগ-রাগাদির পর মধ্যাহ্নে দরিদ্র-নারায়ণসেবায় প্রায় সাড়ে তিন হাজার লোক প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বিকালে মহকুমা-শাসক জনাব আকবরী সাহেবের সভাপতিত্বে ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। প্রায় আড়াই হাজার শ্রোতা সভায় যোগদান করেন।

রাত্রি ৮টায় বরিশালের অন্যতম কীর্তনীয়া জীবনবাবু কীর্তন গান করেন।

আসানসোল ঃ গত ১৩ই এপ্রিল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকৃত বিজ্ঞান, কারিগরী ও কলা প্রদর্শনীর উদ্বোধনের মাধ্যমে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের এই বৎসরের ছয়দিন-ব্যাপী শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের শুভ সূচনা হয়; প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন ইণ্ডিয়ান ওয়াগন কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার লেঃ কঃ বি. বাসু। ঐ দিন অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী মহাভারতের শাশ্বত বাণী আলোচনা করেন।

পরদিন, ১৪ই এপ্রিল শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি লইয়া একটি প্রভাতী-শোভাযাত্রা শহর পরিভ্রমণ করে। ঐদিন সন্ধ্যায় শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী সুললিত কণ্ঠে রামায়ণের 'ভরত-চরিতকথা' এবং পরদিন 'শবরীর প্রতীক্ষা' অংশের সুব্যাখ্যা করেন।

১৬ই এপ্রিল হইতে পর পর তিন দিন আশ্রম-প্রাঙ্গণে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজার ব্যবস্থা ছিল। সন্ধ্যায় জনসভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণীর আলোচনা করেন সাহিত্যিক শ্রীতামসরঞ্জন রায় (সভাপতি) এবং স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পরে বেতারশিল্পী শ্রীভূপেন চক্রবর্তী 'স্বামীজী' গীতি-আলেখ্য সুললিত কণ্ঠে পরিবেশন করেন।

১৭ই এপ্রিল সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-দর্শন। এই দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী চিদাত্মানন্দ। শ্রীমতী নীহারবালা দেবী, স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ এবং অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্তা শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। বক্তৃতাশেষে শ্রীভূপেন চক্রবর্তী কয়েকখানি ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

১৮ই এপ্রিল তারিখে দুপুরে নরনারায়ণ-সেবার ব্যবস্থা ছিল। এদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রসিদ্ধ সাংবাদিক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং স্বামীজীর বাণী আলোচনা করেন স্বামী চিদাত্মানন্দ ও স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ। শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁহার মনোজ্ঞ ভাষণে স্বামীজীর জীবনী ও বাণীর নানামুখী আলোচনার মাধ্যমে এই কথাটির উপর বিশেষভাবে জোর দেন যে একমাত্র স্বামীজীর উদার মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতেই বিশ্বভ্রাতৃত্বের সোপান রচিত হইয়াছে এবং ইহাই বিশ্বভ্রাতৃত্বের উৎকর্ষকে ত্বরান্বিত করিবে।

প্রদর্শনীটি উৎসবের ছয়দিনই খোলা ছিল। মৃন্ময়মূর্তিতে স্বামীজীর চিত্তাকর্ষক জীবনরূপায়ণ প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণীয় অংশ ছিল।

১লা মে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ মহাশয় আশ্রম-বিদ্যালয়ের পুরস্কারবিতরণী সভায় পৌরোহিত্য করেন ও ছেলেদের পুরস্কার বিতরণ করেন।

মনসাদ্বীপ ঃ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব উপলক্ষে দুইদিন এবং স্থানীয় দুইটি স্কুলে দুইদিন অনুষ্ঠানাদি হয়। আশ্রমে ১৬ই এপ্রিল প্রভাতফেরী, পতাকা উত্তোলন, ছেলেদের ড্রিল ক্রীড়া-কৌশল, প্রাক্তন ছাত্র ও অভিভাবক সম্মেলন এবং পারিতোষিক-বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়; বর্তমান ছাত্রগণ "নন্দকুমার"

নাটক মঞ্চস্থ করে। ১৭ই এপ্রিল সকালবেলা পূজা, ভোগারতি, কীর্তন প্রভৃতি, দুপুরে ব্যাণ্ডপার্টি ও কীর্তনীয়াদলসহ শোভাযাত্রা, এবং বিকালে ধর্মসভা হয়। সভান্তে সন্ধ্যায় প্রায় তিন হাজার ভক্ত বসিয়া অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন।

সভাতে স্বামী অমলানন্দ সভাপতির এবং স্বামী সত্যকামানন্দ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। স্বামী সিদ্ধিদানন্দ আশ্রমের বিবরণী পাঠ করেন।

১৮ই এপ্রিল স্থানীয় নটেন্দ্রপুর স্কুলে সভা হয়। সভার প্রথমে ছাত্রদের আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা হয়। পরে স্বামী সত্যকামানন্দ, স্বামী অমলানন্দ এবং স্বামী সিদ্ধিদানন্দ বক্তৃতা দেন। ১৯শে এপ্রিল সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল হরিণবাড়ী স্কুলে।

গড়বেতা : মেদিনীপুর জেলায় গড়বেতা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১৮ই ও ১৯শে এপ্রিল দিবসদ্বয়ব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিনে পূজাপাঠাদি অনুষ্ঠানের পর প্রসাদ বিতরিত হয়; প্রায় সাত হাজার নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় ধর্মসভার অনুষ্ঠান হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী মহারাজ এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন সাউথ ইস্টার্ণ রেলের সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার শ্রীহরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তৃতা-আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী বিশোকাত্মানন্দ ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ধর্মসভার পর 'নচিকেতা' ও 'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ' যাত্রাভিনয় সমবেত জনগণের আনন্দ বর্ধন করে। দ্বিতীয় দিনে আরাত্রিকান্তে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সঙ্গীতসহযোগে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-লীলা' বিষয়ে কথকতা ও আলোচনা করেন। অতঃপর স্থানীয় স্কুলের ছাত্রগণ একটি নাটক মঞ্চস্থ করে।

আমেরিকায় বেদান্ত

নিউইয়র্ক : রামকৃষ্ণ-বেদান্ত কেন্দ্র।

এই কেন্দ্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছে :

জানুআরি, ১৯৬৫ : মানুষ ও তাহার প্রকৃত সত্তা; ঈশ্বরকে খুঁজিও না, তাঁহাকে দর্শন কর; স্বাধীন ইচ্ছা আছে কি? ধর্মসম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের ধারণা; মৌনের নিরাময় করার শক্তি।

ফেব্রুআরি : প্রার্থনার শক্তি; জগতের কাছে বুদ্ধের বাণী; জ্ঞানের পাচটি ভূমি; ধ্যান ও আধ্যাত্মিক উন্নতি।

মার্চ : বর্তমান ধর্মচিন্তায় শ্রীরামকৃষ্ণের দান; পবিত্র মন্ত্র ওঁকার; আধ্যাত্মিক সাধনরূপে কর্ম; আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের চারটি স্তর।

এতদ্ব্যতীত ভাগবত ও গীতা অবলম্বনে কয়েকটি ক্লাস করা হইয়াছিল।

দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়া বেদান্ত সোসাইটিতে ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের জানুআরি ও মার্চ মাসে (রবিবারে) নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি দেওয়া হইয়াছিল :

হলিউড কেন্দ্র : ভক্তিপথ; প্রকৃত কৃপা; আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা; স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার বাণী; কর্ম ও দুঃখভোগ।

জ্ঞানের পথ; বহুত্বে ঐক্য; দৈবী নম্রতা; শ্রীরামকৃষ্ণ।

সাণ্টা বারবারা কেন্দ্র : ভীতিজয়; চেষ্টা ও সহনশীলতা, ভক্তির পথ; অনুভূতিই ধর্ম; স্বামীজী ও তাঁহার বাণী।

ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দর্শন; জ্ঞানমার্গ; ধ্যান-যোগ; প্রার্থনা ও প্রাপ্তি।

ট্র্যাবুকো কেন্দ্র : কর্মযোগ; যথার্থ কৃপা: আধ্যাত্মিক জীবনের আনন্দ; মনের শক্তি; মহান্ আশ্বাস।

ধর্মসমন্বয়; সর্বভূতে ঈশ্বর বর্তমান; ভক্তি-যোগ, যোগসমুচ্চয়।

বিবিধ সংবাদ

এভারেস্ট-শিখরে ভারতীয় অভিযাত্রী দল

বড়ই আনন্দ ও গৌরবের সংবাদ—লেঃ কম্যাণ্ডার কোহ্‌লি পরিচালিত ভারতীয় এভারেস্ট অভিযাত্রী দল গত ২০শে মে হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখর এভারেস্টে আরোহণ করিয়াছেন। পর পর চারবার অভিযাত্রিগণ এই কৃতিত্ব অর্জনে সক্ষম হইয়াছেন। ২৯,০২৮ ফুট উচ্চ তুষারমণ্ডিত দুর্গম শিখরে আরোহণ অভিযাত্রিগণের অতুলনীয় পরিচালন-দক্ষতা, দুঃসাহসিক অধ্যবসায় ও কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচায়ক। ভারতীয় অভিযাত্রী দলের দুই জন সদস্য ক্যাপ্টেন এ. এস. চীমা ও শ্রীনওয়াং গোম্বু গত ২০শে মে সকাল সাড়ে ন'টার সময় এভারেস্ট-শৃঙ্গে প্রথম আরোহণ করেন। ২২শে মে বেলা ১২টা ৩০ মিনিটের সময় দ্বিতীয় বার আরোহণের কৃতিত্ব অর্জন করেন সোনাম গিয়াৎসো ও সোনাম ওয়াংগিয়াল। ২৪শে মে ১০-৪৫ মিনিটের সময় তৃতীয় বার আরোহণ করেন সি. পি. ভোরা ও আঙকামি। ২৯শে মে বেলা ১০-৪৫ মিঃ-এর সময় এইচ. সি. রওয়াল, ক্যাপ্টেন এইচ. এস. আলুওয়ালিয়া এবং ফু দর্জি চতুর্থবার আরোহণ করেন। ফলে ভারতীয় দল পর্বতারোহণে বিশ্ব-রেকর্ড স্থাপন করিলেন।

মাত্র ৮৫ দিনের প্রচেষ্টায় ভারতীয় অভিযাত্রী দল অদম্য সাহসিকতা ও দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় দিয়া পৃথিবীর উচ্চতম পার্বত্য শিখরে ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

এভারেস্ট-শৃঙ্গে ভারতীয় অভিযান ১৯৬০ ও ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে আরো দুইবার হইয়াছিল, কিন্তু সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ দল সর্বপ্রথম এভারেস্ট-শৃঙ্গারোহণের চেষ্টা করেন। তখন হইতে ১৯৫২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এজন্য মোট আটটি অভিযান হইয়াছে, কোনটিই সফল হয় নাই। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল হাণ্ট পরিচালিত বৃটিশ অভিযাত্রী দল প্রথম সাফল্যমণ্ডিত হন; সেবারেও হিলারীর সহিত সর্বপ্রথম এভারেস্ট-শৃঙ্গের শীর্ষদেশে উঠিয়া তেনজিং নোরগে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ইহার পর ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে সুইস অভিযাত্রী দলের এবং ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে মার্কিণ অভিযাত্রী দলের অভিযানও সাফল্যমণ্ডিত হয়।

এভারেষ্ট-বিজয়ে চতুর্থ সাফল্যমণ্ডিত দল হইলেও এবারের এই সার্থক অভিযান সর্বতোভাবে ভারতীয় সাফল্যের ঘটনা। সদস্যগণ সকলেই ভারতীয় এবং পর্বতারোহণের সকল সরঞ্জাম ও উপকরণ ভারতীয় শ্রমশিল্পেরই অবদান। ভারতীয় সংকল্প, দৃঢ় পণ, অধ্যবসায় ও অদম্য প্রচেষ্টা আজ দুর্জয়কে জয় করিয়াছে।

কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দ-স্মৃতিমন্দির

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারতের সর্বদক্ষিণ প্রান্ত কন্যাকুমারীর মন্দির হইতে কিছু দূরে সমুদ্রগর্ভস্থ ভারতের শেষ শিলাখণ্ডের উপর ধ্যানস্থ হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের দুঃস্থ জনগণের দুর্দশা দূর করিবার কার্যকরী পন্থার সন্ধান পাইয়াছিলেন। ইহার তিন মাস পরেই তিনি আমেরিকা যাত্রা করেন। ইহার স্মৃতিরূপে শিলাখণ্ডটির উপর একটি মন্দির—'বিবেকানন্দ মণ্ডপ'—নির্মাণের প্রারম্ভিক কার্য আরম্ভ হইয়াছে।

১৯৬২ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে 'স্বামী বিবেকানন্দ সেন্টিনারী সেলিব্রেশন্‌স এ্যাণ্ড বিবেকানন্দ

মেমোরিয়্যাল কমিটি' নামে একটি সর্বভারতীয় সংসদ গঠিত হয়। ভারতের সর্বত্র স্বামীজীর শতাব্দী-জয়ন্তী পালন এবং ভারতের যে শেষ শিলাখণ্ডটির উপর বসিয়া স্বামীজী ধ্যানস্থ হইয়াছিলেন, তাহার উপর একটি স্মৃতিমন্দির নির্মাণ এই সংসদের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৯৬২ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে সংসদ এই স্মৃতিমন্দির নির্মাণের জন্য মাদ্রাজ সরকারের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন; কেন্দ্রীয় সরকারের নিকটও বিষয়টি উপস্থাপিত হয়। বহু বাধা-বিঘ্নের পর ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বাঞ্ছিত অনুমতি পাওয়া যায় এবং মাদ্রাজ সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া মন্দির-নির্মাণের বিস্তারিত পরিকল্পনা স্থিরীকৃত হয়।

শিলাখণ্ডটি তটভূমি হইতে প্রায় এক হাজার ফুট দূরে অবস্থিত। শিলাখণ্ডটি লম্বায় প্রায় ৩০০ ফুট, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহার শীর্ষদেশের উচ্চতা প্রায় ৫৫ ফুট।

ইহার উপর যে মন্দিরটি নির্মিত হইবে, পরিকল্পনানুসারে উহা ৯৫ ফুট লম্বা ও ৩৮ ফুট চওড়া হইবে। মন্দিরের প্রধান গম্বুজটির শীর্ষদেশের উচ্চতা হইবে শিলাপৃষ্ঠ হইতে ৬০ ফুট, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১১৫ ফুট। গর্ভমন্দিরে ৪ ফুট উচ্চ বেদীর উপর স্বামীজীর একটি ১০ ফুট উচ্চ ব্রোঞ্জনির্মিত মূর্তি (পরিব্রাজক—দণ্ডায়মান) স্থাপিত হইবে।

মন্দিরের প্রধান প্রবেশদ্বার অজন্তা গুহা-দ্বারের অনুকরণে এবং চূড়াটি বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দিরের চূড়ার মত করিয়া পরিকল্পিত। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রাচীরগাত্রে স্থানে স্থানে শাস্ত্র হইতে এবং স্বামীজীর বাণী ও রচনা হইতে উদ্ধৃতি খোদিত থাকিবে; তাছাড়া স্বামীজীর জীবনের কয়েকটি প্রধান ঘটনার রিলিফ-চিত্রও সন্নিবিষ্ট করার পরিকল্পনা রহিয়াছে।

মন্দিরের চারিদিকে থাকিবে বিস্তৃত চাতাল। মন্দিরের পশ্চাৎভাগে চাতালের নীচে একটি ৫৫ ফুট লম্বা, ২৫ ফুট চওড়া ভূগর্ভ-প্রকোষ্ঠও থাকিবে। শিলাখণ্ডটিকে বেড়িয়া একটি ১২ ফুট চওড়া রাস্তা নীচের জেটী হইতে মন্দিরদ্বার পর্যন্ত চলিয়া আসিবে।

সমুদ্রমধ্যস্থ শিলাখণ্ডটিতে পৌঁছিবার সুবিধার জন্য কন্যাকুমারী তটভূমিতে একটি এবং শিলাখণ্ডের পাদদেশে আর একটি জেটী নির্মিত হইবে। মাদ্রাজ সরকার এই কাজটির ভার লইয়াছেন, জেটীর নির্মাণকার্য আরম্ভও করিয়াছেন; আশা করা যায় বর্তমান বর্ষের সেপ্টেম্বর মাসেই কাজটি সম্পন্ন হইবে।

জেটী নির্মিত হইবার পর অবিলম্বে শিলাখণ্ডের উপর মন্দিরের ভিত্তির জন্য প্রারম্ভিক কার্য আরম্ভ করা হইবে।

মন্দিরটি হইবে গ্র্যানাইট পাথরের। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর হইতে নক্সা অনুযায়ী মাপ করিয়া পাথর কাটার কাজ সুরু হইয়া গিয়াছে। সমুদ্রতটে সাময়িক গৃহাদি নির্মাণ করিয়া এই কাজ আরম্ভ হইয়াছে। বর্তমানে সাধারণ কর্মী ছাড়া প্রায় ৯০ জন সুদক্ষ কারিগর এই কার্যে ব্যাপৃত আছেন। আশা করা যায় ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের জানুআরি মাসের মধ্যেই শিলাখণ্ডের উপর সাইজ করা পাথরগুলিকে লইয়া গিয়া গাঁথনির কাজ সুরু হইবে। ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্মাণ-কার্য সমাপ্ত হইবে বলিয়া অনুমান।

সমগ্র পরিকল্পনাটিকে রূপ দিতে ৩১,৫০,০০০ টাকার মত খরচ হইবে। জেটী নির্মাণ ছাড়া ব্যয়বহুল প্রারম্ভিক কাজ আরো অনেক আছে—তটভূমি হইতে শিলাখণ্ডে বিদ্যুৎ ও জল লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করা, শিলাখণ্ডের নীচ হইতে উপরে পাথর তুলিবার জন্য ক্রেণ বসানো ইত্যাদি।

অখিল ভারতীয় বিবেকানন্দ শিলা স্মারক কমিটির সংগঠন-সম্পাদক শ্রীএকনাথ রাণাডে এই বিস্তারিত সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন। তাঁহার একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় ও অটল সঙ্কল্পেই সব বাধা ঠেলিয়া পরিকল্পনাটি বাস্তব রূপায়ণের পথে এত দূর অগ্রসর হইয়াছে। স্বামীজীর আশীর্বাদে ও স্বদেশবাসিগণের অকুণ্ঠ অর্থ-সাহায্যে কাজটি অচিরে সুসম্পন্ন হইবে, সন্দেহ নাই।

উৎসব-সংবাদ

আগরতলা ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ৫ই মার্চ হইতে ১৪ই মার্চ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩০তম শুভ আবির্ভাব উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ৫ই মার্চ পূজা ও চণ্ডীপাঠ, ৬ই মার্চ ভাগবতপাঠ ও ৭ই মার্চ ভজন এবং ৮ই মার্চ শ্রীশ্রীকথামৃত পাঠ ও আলোচনা হয়।

৯ই হইতে ১১ই মার্চ তিনটি সভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন যথাক্রমে ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ, অধ্যাপিকা ডঃ নীরা চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যক্ষ শ্রীসুশান্তকুমার চৌধুরী। বেলুড় মঠের স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ও স্বামী নিগমাত্মানন্দ প্রতিদিনিই সভায় বক্তৃতা করেন। ১০ই মার্চ সকালে মাননীয় মন্ত্রী শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক দুঃস্থ জনগণকে বস্ত্র বিতরণ করেন।

১২ই মার্চ উদয়পুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পাঠচক্রে সভা হয়। সভায় স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ও স্বামী নিগমাত্মানন্দ ভাষণ দেন।

১৩ই মার্চ বেতারশিল্পী শ্রীভূপেন্দ্র চক্রবর্তী স্বামী বিবেকানন্দের জীবনকথা সঙ্গীতের মাধ্যমে পরিবেশন করেন। ১৪ই মার্চ প্রায় ছয় হাজার নরনারী বসিয়া অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন।

কোলাঘাট ঃ তমলুক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে উদ্যোগে এবং কোলাঘাট অধিবাসিবৃন্দের সহযোগিতায় গত ২৫শে এপ্রিল কোলা ইউনিয়ন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ত্রিংশদধিকশততম শুভ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্বাহ্নে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম ও প্রসাদ বিতরণাদি করা হয়। সন্ধ্যায় মাননীয় মন্ত্রী শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক ধর্মসভার অধিবেশনে স্বামী অন্নদানন্দ ও স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ 'শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে' মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। সভান্তে বেতারশিল্পী শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সম্প্রদায় 'সুরে কথামৃত' পাঠ ও সুমধুর সঙ্গীতের মাধ্যমে পরিবেশন করেন।

পরলোকে মাখনলাল সেন

খ্যাতনামা বিপ্লবী ও প্রবীণ রাজনৈতিক কর্মী এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক মাখনলাল সেন মহাশয় কিছুকাল যাবৎ অসুস্থ থাকিয়া গত ১০ই মে ৮৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নানারূপ সেবাকার্যে তিনি সক্রিয় সহযোগিতা করিয়াছিলেন।

ঢাকা-বিক্রমপুরের সোনারং-এর বিখ্যাত সেন-পরিবারে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। দেশের জন্য তিনি বহু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তদানীন্তন রাজরোষে তাঁহাকে বহু বার কারাবরণ করিতে হয়। এই নির্ভীক আত্মত্যাগীর দেহমুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

শ্যামাচরণ মিত্রের দেহত্যাগ

বিশিষ্ট ভক্ত শ্যামাচরণ মিত্র মহাশয় গত ৬ই মে কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে প্রায় ৭৩ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন, তিনি নানারূপ অসুখে ভুগিতেছিলেন। শরীর যাইবার কিছু দিন পূর্বে তিনি হঠাৎ পড়িয়া যান; সেবাপ্রতিষ্ঠানে তাঁহার অস্ত্রোপচার হইয়াছিল।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। জীবনের শেষ দিকে তিনি একাকী থাকিয়া সাধনভজনে কাটাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কয়েকটি শাখাকেন্দ্রের সহিত তিনি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন।

তাঁহার আত্মা ভগবৎপদে চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

দিব্য বাণী

তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি। বীর্যমসি বীর্যং ময়ি ধেহি।
বলমসি বলং ময়ি ধেহি। ওজোঽস্যোজো ময়ি ধেহি।
মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি। সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি॥

—বৈদিক প্রার্থনা

তেজ তুমি, তেজ দাও; বীর্য তুমি, কর বীর্যবান্;
ওজঃ তুমি, ওজঃ দাও; বল তুমি, কর বলীয়ান্।
অন্যায় সহনা তুমি, অন্যায়-বিদ্রোহী কর মোরে,
সহ-রূপী! শক্তি দাও দুঃখ-কষ্ট সব সহিবারে।

কিন্নাম রোদিষি সখে ত্বয়ি সর্বশক্তিঃ
আমন্ত্রয়স্ব ভগবন্ ভগদং স্বরূপম্।
ত্রৈলোক্যমেতদখিলং তব পাদমূলে
আত্মৈব হি প্রভবতে ন জড়ঃ কদাচিৎ॥

—স্বামী বিবেকানন্দ

ক্রন্দন কি হেতু সখা, সব শক্তি লুক্কায়িত অন্তরে তোমার,
প্রকাশিত কর সখা, অন্তরের সে ঐশ্বর্যে—নিজ স্বরূপেরে;
বিকাশ ঘটিলে তার, দেখিবে এ ত্রিভুবন আসিয়াছে তব পদতলে—
আত্মশক্তি চিরজয়ী—জড় কভু নাহি পারে প্রভাবিতে তারে।

কথাপ্রসঙ্গে

বিশ্বপ্রেম ও ভারতবর্ষ

বিশ্বপ্রেম, মানবপ্রেম, সাম্য, বিশ্বশান্তি প্রভৃতি কথাগুলি আমরা বহুবার বহুভাবে আলোচিত হইতে শুনিতেছি। বড় বড় দেশনেতাদের বৈঠকে, কাগজে, আলোচনার মাধ্যমে আজ এই কথাগুলি মাঝে মাঝে বিশ্বজুড়িয়া সকলেরই কাছে পৌঁছিতেছে। এ কথাও আমরা নিশ্চিত বলিয়া জানি যে, আজিকার দিনে পৃথিবীর সবদেশের মানুষের যদি পরস্পরের প্রতি ভালবাসা না থাকে, পরস্পরের কল্যাণের কথা আমরা যদি আন্তরিক-ভাবে চিন্তা না করি, তাহা হইলে যে কোন সময়ে গোটা পৃথিবীটাই ধ্বংসের সম্মুখীন হইতে পারে।

কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে পূর্বের মত এখনো দেখা যাইতেছে যে, মুখে এই সব গালভরা কথা বলিলেও আমরা আচরণ করিতেছি তাহার বিপরীত। আচরণের সময় ব্যক্তিগত বা জাতিগত স্বার্থই নগ্ন রূপ লইয়া প্রকট হইতেছে; অবশ্য যতক্ষণ সম্ভব যুক্তিসহায়ে সে আচরণকে বিশ্বকল্যাণের বা কোন মহদুদ্দেশ্যের, অন্ততঃ ন্যায়ের একটি চাকচিক্যময় আবরণে ঢাকিবার প্রয়াস করা হয়। যেখানে তাহাও সম্ভব নয়, সেখানে এই বাহ্যপ্রলেপটি না থাকিলেও কোন সঙ্কোচ আসে না আমাদের। ভিয়েটনামে ইহার রূপ একপ্রকার। রাষ্ট্রপুঞ্জের বয়স আজ বিশ বছর হইল; কিন্তু এতদিনেও নিরপেক্ষভাবে সত্যপ্রকাশ করিবার পরিবেশ এখনো সেখানে হইল না। সেখানেও কাশ্মীর-প্রসঙ্গে ইহার রূপ অন্য প্রকার। ভারতসীমান্তে পাকিস্তান ও চীনের মধ্যে ইহার রূপ আর এক রকম। সত্যকে চাপা দেওয়ার বা বিকৃত করার যুক্তি সর্বত্রই রহিয়াছে, এমন কি ন্যায় ও বিশ্বশান্তির দোহাই-ও আছে। কিন্তু স্বার্থের বিকশিত দন্তকে কোথাও আবৃত করিয়া রাখা যাইতেছে না। অথচ বিশ্বমানবের কল্যাণচিন্তায় নাকি আমরা প্রায় সকলেই আকুল। এমন কি, যে উদ্যতফণা হিংস্রতা বলিয়াছে—আণবিক যুদ্ধে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ মরিয়া যাইলেও ক্ষতি নাই, যে কয়জন বাঁচিয়া থাকিবে তাহাদের লইয়াই আমার নিজের মনের মত করিয়া নূতন পৃথিবী গড়িব—সেও দাবী করে যে, তাহার এই চিন্তা নাকি মানবকল্যাণেচ্ছা হইতেই উদ্ভূত। ইহার নাম আর যাহাই হউক, ইহাকে মানবপ্রেম বা সাম্যের বাণী কখনই বলা যায় না।

ভিতরে প্রবল স্বার্থপরতা গজগজ করিলে তাহাকে বেশীক্ষণ লুকাইয়া রাখা যায় না। একটি সীমা আছে যতদূর পর্যন্ত তাহার আসল রূপটি দেখা যায় না, ঢাকা থাকে; সেই সীমা ছাড়াইয়া গেলেই উহা আত্মপ্রকাশ করে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথাগুলি মনে পড়ে: কুকুরগুলো এমনি দেখা যায় বেশ পরস্পরের গা চাটিতেছে, দেখিয়া মনে হয় কত ভাব! চারটি ভাত ফেলিয়া দাও, দেখিবে অমনি দাঁত বাহির করিয়া কামড়াকামড়ি সুরু হইয়াছে।

জড়বিজ্ঞানের উন্নতিসহায়ে বাহ্যপ্রকৃতিকে জয় করিয়া মানুষ আজ বিপুল শক্তির অধিকারী হইয়াছে। উহা যাহাদের হাতে আছে, কোন কারণে তাহাদের মধ্যে কাহারো মন বা বুদ্ধির ভারসাম্য নষ্ট হইলেই মানবসভ্যতার ধ্বংস

আসন্ন হইতে পারে। উহা প্রয়োগ করিলে নিজেকেও ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচানো সম্ভব হইবে না, এই জন্যই ঐ শক্তি প্রযুক্ত হইতেছে না; বিশ্বপ্রেমের প্রেরণায় নয়—এ ধারণা অমূলক নয়। যখন সে সম্ভাবনা ছিল না, তখন তথাকথিত সভ্য মনোবৃত্তি বা মানব-প্রেম জাপানকে উহার করালগ্রাস হইতে বাঁচাইতে পারে নাই। আজ অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী বা তুলনায় প্রায় শক্তিহীন অপরাপর দেশগুলিকে নিরাপত্তার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এই সব অমিতশক্তিধরদের মুখের দিকেই চাহিয়া থাকিতে হইতেছে। কারণ ইহাদের ইচ্ছা বা কথা, ন্যায়-অন্যায় যাহাই হউক, কার্যে পরিণত হইবার শক্তি রাখে।

এরূপ একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতেই কি মানুষকে চিরদিন বাস করিতে হইবে? বিশ্ব-প্রেম, বিশ্বশান্তি প্রভৃতি কথাগুলিকে কি বাস্তব করিয়া তুলিবার কোন উপায় নাই? না আণবিক বিপর্যয়ে একটি বীভৎস ধ্বংস ঘটিবার পূর্বে কিছু হইবে না?

কি হইবে, কেহই তাহা জোর করিয়া বলিতে পারে না। পাশ্চাত্যের একজন মনীষী যে আশঙ্কার ইঙ্গিত দিয়াছিলেন—প্রচুর ব্যয়-বহুল আণবিকাস্ত্র উৎপাদনের প্রতিযোগিতার পথে চলিতে চলিতে একজন যদি কখনো উপলব্ধি করে যে আর অধিকদূর অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নয়, তাহার প্রতিযোগী অনিবার্যভাবে তাহাকে ছাড়াইয়া যাইবে, তখন হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া সে তাহার উপর আণবিক অস্ত্র প্রয়োগ করিতে পারে—তাহা একেবারে অমূলক না হইলেও ঈশ্বরেচ্ছায় তাহা যেন না ঘটে। আণবিক অস্ত্রের ধ্বংসের বীভৎসতার চিন্তাই যেন আমাদিগকে ইহা হইতে দূরে রাখে। স্বামী বিবেকানন্দ অবশ্য প্রসঙ্গান্তরে একবার বলিয়াছিলেন, "বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ কমিয়া যাইবে।" মানুষের সদিচ্ছা ও সদ্‌বৃত্তির নিকট আবেদন জানাইয়া এই মহা ধ্বংসকে দূরে রাখিবার প্রচেষ্টাই আজ সকলে করিতেছে। এইটিই বিশ্বশান্তির একমাত্র পথ সন্দেহ নাই। কিন্তু এই আবেদন অন্তরে পৌঁছিয়া সেখানে স্থিত হইবে কি? দেখা যাইতেছে, আণবিক যুদ্ধ এখনো (এবং হয়ত চিরকালের জন্য) স্থগিত থাকিলেও বিরোধের অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বার্থসিদ্ধির জন্য ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্নকে দূরে ঠেলিয়া রাখা হইতেছে।

মানুষের চিন্তাশীলতা বহু উচ্চে আজ উঠিয়াছে, তবু এরূপ হইতেছে কেন? ইহার একটি মাত্র উত্তর আছে, যাহা একজন মনীষী পূর্বেই বলিয়াছেন—বাহ্যপ্রকৃতিকে জয় করিবার পথে আমরা যতদূর অগ্রসর হইয়াছি, অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করিবার পথে তাহার তুলনায় বহুদূর পশ্চাতে আছি। বাহ্যপ্রকৃতিকে জয় করিবার জন্য আজ আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করিতেছি, কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করিবার প্রয়োজনবোধ আমাদের মধ্যে আজও জাগিয়াছে কিনা সন্দেহ। এমন কি, বিশ্বশান্তির জন্য মনের যে সদ্‌বৃত্তিগুলির কাছে আমরা আবেদন জানাইতেছি, সেগুলিকে কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিতেও অনেকে আজ দ্বিধাবোধ করে না। সেজন্য বহির্বিষয়ে সভ্যতার পথে এত অধিকদূর অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও অন্তরের আদিম বর্বরতাকে কমাইবার পথে আমরা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারি নাই। স্বামী বিবেকানন্দ অর্ধশতাব্দীরও পূর্বে সাবধানবাণী শুনাইয়া গিয়াছেন। বলিয়া গিয়াছেন, বাহ্য-প্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি—উভয়ের সঙ্গে লড়াই করিয়া উভয়কে জয় করিয়া চলাই মানবের

যথার্থ প্রগতির, যথার্থ কল্যাণের পথ। বাহ্যপ্রকৃতির বিজয়লব্ধ নিত্য নূতন ভোগোপকরণের অধিকারী ও তাহাতে উন্মত্তপ্রায় ইওরোপকে বলিয়াছিলেন: একটি আগ্নেয়গিরির মুখের উপর তোমরা দাঁড়াইয়া আছ, যে কোন মুহূর্তে অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়া সব গুঁড়া হইয়া যাইতে পারে—যদি না তোমাদের সভ্যতাকে জড়বাদের ভিত্তি হইতে সরাইয়া আনিয়া আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কর। আধ্যাত্মিকতা আসে অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করার পথে। এখনো কথাগুলি গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবার সময় আছে। স্বামীজী এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করিবার পর দুইটি অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়া গিয়াছে। তৃতীয়টির সম্ভাবনায় সারা বিশ্ব আজ আতঙ্কিত; যদি উহা ঘটে, আমরা জানি, সত্যই সব গুঁড়া হইয়া যাইবে।

বরেণ্য বিজ্ঞানিগণ জীবনপাত করিয়া যে সত্য আবিষ্কার করিতেছেন, যে শক্তি অর্জনের দ্বার খুলিয়া দিতেছেন, মানুষের মনের গহনে লুক্কায়িত নেকড়ের দল সে উন্মুক্ত দ্বারে প্রবেশ করিয়া শক্তি করতলগত করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আজ মানবতার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্যত। বাঁচিবার পথ একটি মাত্র আছে—মানুষের অন্তর হইতে এই হিংস্র জন্তুটিকে সরাইয়া সেখানে 'মানুষ'কে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতিকেই পরমার্থ ভাবিয়া কেবলমাত্র উহারই জন্য প্রয়াস করিলে হইবে না, কেবল উহা দ্বারা পৃথিবীকে শান্তিময় করিয়া তোলা কোনদিনই সম্ভব হইবে না। যে কোন শক্তি অর্জন করিবার জন্য বিপুল অধ্যবসায় ও তপস্যার প্রয়োজন হয়; এই দিকেই আজ আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে চাহিতেছি। কিন্তু সেই সঙ্গে শক্তিমানকে যথার্থ মানবপ্রেমিক করার জন্যও যে সমপরিমাণ অধ্যবসায় ও তপস্যার প্রয়োজন এবং উহা না করিলে যে বর্তমান বিভীষিকার হাত হইতে কোনদিনই পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে না, সেদিকে কয়জনের ব্যাকুল দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে?

সদিচ্ছা, অপরের প্রতি ভালবাসা (দেওয়া-পাওয়ার হিসাব নয়), অপরের কল্যাণকামনা—এগুলি হৃদয়ের জিনিস, বুদ্ধি বা যুক্তির এলাকার নয়। ভালবাসার একমাত্র মাপকাটি—যাহাকে ভালবাসি তাহার জন্য আমি কতখানি ত্যাগ-স্বীকার করিতে পারি। স্বার্থত্যাগের শক্তি যেখানে নাই, সেখানে ভালবাসা থাকিতে পারে না।

হৃদয় প্রসারিত না হইলে নিছক যুক্তির দিক হইতে মানুষ অপরের কল্যাণের জন্য ত্যাগ-স্বীকার করিতে চাহিবে কেন? মানুষের হৃদয়ের সদ্বৃত্তিগুলিই মানবজাতির নিরাপত্তার একমাত্র অবলম্বন—কোন স্বাক্ষরিত চুক্তি বা গঠিত সঙ্ঘ নয়। উহা অন্তঃপ্রকৃতিকে বশীভূত করার বা আধ্যাত্মিকতার উপরই নির্ভরশীল, কেবল বাহ্যপ্রকৃতিকে জয় করার উপর, বা বুদ্ধি ও যুক্তির উৎকর্ষ সাধনের উপর নহে। নহে যে, তাহা আজ আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি। স্বদেশে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে দেখিতেছি, বিশ্বের অঙ্গনেও দেখিতেছি। মানুষের অন্তর হইতে বর্বরতাকে, হিংস্রতাকে দূর করিবার জন্য সচেষ্ট না হইয়া পৃথিবীর সব দেশগুলিই যদি আজ বিপুল শক্তিমান রাষ্ট্রগুলির মতই সমপরিমাণে শক্তিমান হইয়া উঠে, তাহা হইলেও এই সমস্যার সমাধান হইবে না—রাষ্ট্রগত স্বার্থ একটি আরও ভীষণ বিপর্যয়ের সম্ভাবনাকে কাছে টানিয়া আনিবে। আবার অন্যদিকে শক্তির দিক দিয়া সম ভূমিতে যাহারা দাঁড়াইতে পারিবে না,

চিরদিনই তাহাদিগকে অধিকতর শক্তিমানদের মুখের দিকে সভয়ে চাহিয়া থাকিতে হইবে।

একথা আমাদের বুঝিতেই হইবে যে হৃদয়বান, যথার্থ মানবপ্রেমিক হওয়ার জন্য সাধনার প্রয়োজনও আজ অনিবার্য। আজ না বুঝিলে বুঝিতে একদিন হইবেই, সেদিন মানবসভ্যতার মহাশ্মশানের মাঝে দাঁড়াইয়া আমরা ইহা বুঝিব ; কিন্তু সে অতি বিলম্বে - তখন বুঝিয়া আর লাভ কি হইবে ?

পৃথিবীর মানুষ কি স্বদেশবাসী ছাড়া অপর দেশের লোকের জন্য অনুভব করে না? সাধারণ মানুষ কমবেশী সকলেই করে। মানুষের মনের মূল গঠন জগৎ জুড়িয়া সর্বত্রই একরূপ। পরিবেশ ও শিক্ষা-চিন্তা অনুযায়ী উহার গতি হয় মাত্র। মানুষের মনের সহজাত সহানুভূতিকে চেষ্টা করিয়া বাড়াইয়া তোলা যায়। ভারতবর্ষ যুগ-যুগান্তের সাধনায় ইহা আবিষ্কার করিয়াছে। জগতের অন্যান্য জাতিদের কাছেও এই সত্য পৌছাইয়া দিতে হইবে।

কিন্তু তাহা হইবে কিরূপে? ভোগোন্মত্ত, বহির্মুখ, শক্তিমদোদ্ধত পাশ্চাত্যের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইবেই বা কেন? একথা সে বিশ্বাসই করে না, পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ইচ্ছা তো সুদূরপরাহত।

মানুষের মনের স্বভাব হইল নিজের অভিজ্ঞতা না থাকিলে বা প্রত্যক্ষ কিছু না দেখিলে সে কোন কথাই ঠিক ঠিক গ্রহণ করিতে চায় না। বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য তাহার মনের গ্রহণযোগ্য একটি বাস্তব উদাহরণ সম্মুখে থাকা চাই।

রাষ্ট্র ও সমাজ আধ্যাত্মিকতাভিত্তিক হইলে সে রাষ্ট্রের মানুষের সুখ-শান্তি যে বাড়িয়াই যায়, শক্তির দিক দিয়াও সে যে ঝিমাইয়া না পড়িয়া অপরের সমকক্ষ বা তদপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হয়—ইহার স্থূল উদাহরণ একটি চাই। একটি জাতিকে ইহা হাতে হাতে করিয়া দেখাইতে হইবে। দেখাইতে হইবে যে, শক্তি থাকিলেও মানুষ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য উহার অপব্যবহার না করিয়া অপরের কল্যাণের জন্য নিজেকে সর্বাবস্থায় সংযত রাখিতে পারে। দেখাইতে হইবে, শক্তিমান হইতে হইলে মানুষের আবরণের মধ্যে দানবীয় ভাব না আনিলেও চলে—দেবতাও শক্তিমান হয়। সেই মহা-শক্তিধর দেবমানবদের মুখ দেখিতেই জগতের সাধারণ মানুষ আকুলনয়নে চাহিয়া আছে। জগতের সকল শক্তিমান রাষ্ট্রনেতার আসনে এরূপ দেবমানবগণ যেদিন বসিবেন, জগতের লোক সেদিন নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে ; তাহার পূর্বে যত আশ্বাসবাণী, যত মানবপ্রেমের কথা, শান্তির যত 'ললিত বাণী'ই আমাদের কানে আসুক না কেন, আমরা জানি উহা 'ব্যর্থ পরিহাস' ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ আদর্শ দেখাইবে কে? দেখাইবার একমাত্র শক্তি আছে ভারতবর্ষের। শুধু শক্তি আছে নয়, স্বামীজী বলিয়া গিয়াছেন, এই আদর্শ দেখাইবার জন্যই ভারতবর্ষ এত ঝড়ঝঞ্ঝা সহিয়াও বাঁচিয়া আছে। ভারতবাসীর অন্তরে বিদেশাগত বহুবিধ আদর্শবাদের প্রভাব সত্ত্বেও আজিও আধ্যাত্মিকতা মজ্জাগত ; জাতীয় চিত্তের অগভীর প্রদেশের স্বল্পাংশে প্রলোভন-লুব্ধতা ও অবিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের অন্তরাত্মা এখনো বাহুশক্তি অপেক্ষা অন্তঃশক্তিতে বিশ্বাসী। সেজন্য একমাত্র আমরাই চেষ্টা করিলে জগতে বর্তমান যুগে একান্ত প্রয়োজনীয় আদর্শ-জাতি হিসাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারি। সেই চেষ্টাই আমাদের করিতে হইবে, নিজের ও বিশ্বের কল্যাণের জন্য। শক্তি অন্তরে নিহিত আছে ;

আমরা উহার প্রকাশের পথে একগুণ চেষ্টা করিলে বিশ্ববিধাতা শতগুণে সহায়তা করিবেন।

পাশ্চাত্যের শক্তিমান জাতিগুলিকে দেখিয়া আমরা অনেকেই আজ তাহাদের আদর্শের হুবহু অনুকরণ করিয়া সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইতে চাহিতেছি। অনেকে আবার চাহিতেছি শক্তিমান জাতিগুলির মত শক্তিঅর্জনের প্রয়োজনীয়তায় ভ্রূক্ষেপহীন হইয়া কেবল প্রেম মৈত্রী প্রভৃতি অন্তরের আধ্যাত্মিক বৃত্তিগুলির অনুসরণ করিতে। আমরা যেন না ভুলি, এই দুইটিরই প্রয়োজন আছে। হিংস্র আততায়ীকে রুখিবার মত শক্তি সঞ্চয়ের প্রচেষ্টায় ঔদাসীন্য নিজের পক্ষে যতখানি বিপজ্জনক, তাহার মত হিংস্র হইবার প্রয়াসও বিশ্বের পক্ষে ততখানিই মারাত্মক।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের মিলন শুধু ভারতকেই বাঁচাইবে না, স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন, ইহা মানবজাতিকে বাঁচাইয়া উন্নততর মানবগোষ্ঠী গড়িয়া তুলিবে। তাহার জন্য এই দুই ভাবের সমন্বয় ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন পন্থা নাই এবং সে পথে শক্তি-দৃপ্ত পদক্ষেপে বিশ্বপ্রেমের অমৃতবর্ষণ করিতে করিতে সর্বাগ্রে অগ্রসর হইবার মত জাতি ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীতে আর কোথাও নাই।

বর্তমান ভারত

যে ভারতের উদ্দেশ্য এত মহৎ, তাহার অবস্থা আজ কিরূপ? সে-উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা পরের কথা, নিজের উন্নতিচেষ্টাই বা তাহার আজ কোথায়? যে ভারত অতীতে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক গৌরবের উচ্চতম শিখরে উঠিয়াছিল এবং মাঝখানে সহস্র বৎসরের অবনতির চরম অবস্থাও কাটাইয়া বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে আত্মবিশ্বাসী হইয়া সগৌরবে আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে ভারত বর্তমানে পুনরায় ঝিমাইয়া পড়িল কেন? জাগতিক উন্নতির দিক দিয়া দেখিলে বর্তমান অভাব-অনটন সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে আমরা আগাইয়াই চলিয়াছি। কিন্তু কয়েক শতাব্দীর পুঞ্জীভূত জড়তা-দীনতা কাটাইয়া তেজবীর্যদীপ্ত যে দেবশিশুরা একদিন মাথা তুলিয়াছিল, তাহাদের দেখা আজ আর মিলিতেছে না কেন? অগ্নিযুগে সংযমের দৃঢ় ভিত্তি আশ্রয় করিয়া পৌরুষের যে লেলিহান শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, স্বাধীনতা-লাভের পূর্ব পর্যন্ত ত্যাগ-পূত যে পৌরুষ মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়াছিল, যে পৌরুষ আমাদের সহস্র বৎসরের অবনমিত মস্তককে ক্রমেই উন্নততর করিতেছিল, মহাশক্তির আধার হইয়া বিজয়ের পর বিজয়ের পথে চলিয়া দেশবাসীর অন্তর গৌরব ও প্রেরণায় ভরিয়া দিতেছিল, স্বাধীনতালাভের পর হইতেই তাহা ক্রমবিলীয়মান হইতে লাগিল কেন? পৌরুষের সাধনা না করিয়া যুবশক্তি ক্রমশই আবার মেরুদণ্ডহীন হইয়া পড়িল কেন?

বীরদর্পকে হৃদয় হইতে সরাইয়া সেখানে দ্বিধাগ্রস্ত কোমলতার ভাব আসিল কি করিয়া? স্বদেশের জন্য ত্যাগের আদর্শকে দূরে সরাইয়া আত্মসুখ-সর্বস্বতা সেখানে আসন বিছাইল কিভাবে? যদি চোখ খুলিয়া দেখা যায়, ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দিবে—যিনি সিংহগর্জনে আমাদের জাগাইয়াছিলেন, যিনি আমাদের সর্ববিধ উন্নতির একমাত্র প্রেরণা আধ্যাত্মিকতা অবলম্বনে জাতির জীবনকে তেজবীর্যময় করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহার ভাব একদিন আমরা মনেপ্রাণে গ্রহণ করিয়াছিলাম বলিয়াই 'মানুষের' মত শির উন্নত করিয়া চলিতে পারিয়াছিলাম, জ্ঞাতসারেই

হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক তাঁহারই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা সেদিন সংযমের ভিত্তির উপর জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। আর আজ তাঁহার বাণীকে জীবন হইতে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছি, তাই এই দুর্দশা; তাই আজ বারে বারে আততায়ীর কাছে, অন্যায়ের কাছে আমাদের শির নত করিতে হইতেছে। তাই আজ জগৎ সত্যকে বিকৃত করিয়া দেখাইলেও তাহাতে সক্রিয় প্রতিবাদ করিবার শক্তিও আমরা হারাইয়াছি। প্রাক্-স্বাধীন ভারতের গর্বোন্নতশির, দুর্দ্ধর্ষ ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন দেবশিশুদের কথা মনে পড়িলে, আমাদের বর্তমান অবস্থা তুলনা করিয়া জগতের সম্মুখে মুখ দেখাইতেও আজ লজ্জা বোধ হয়। সর্বনাশের কথা—সে লজ্জাও আমাদের সব সময় হয় না—বিশ্বপ্রেমের দোহাই দিয়া দুর্বলতাকে আমরা ঢাকিয়া রাখিতে চাই।

ধর্মই—আধ্যাত্মিকতাই ভারতের সর্ববিধ শক্তির মূল উৎস—তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। দুর্দিনের দুর্যোগের মাঝে আধ্যাত্মিকতাভিত্তিক জীবন হইতেই জাগরণের শক্তিগর্ভ বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল—"হে বীর, সাহস অবলম্বন কর ····সদর্পে ডাকিয়া বল ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ,···ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ।"

সেই ভারতের মৃত্তিকাকে বিদেশীর অধিকার হইতে মুক্ত করিবার জন্য যে শক্তিতরঙ্গগুলি উঠিয়াছিল, তাহার মধ্যে অতি বিপুল তরঙ্গগুলি উঠিয়াছিল স্বামীজীর ভাবানুগ, স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষিত ধর্ম- বা আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক জীবনকে অবলম্বন করিয়াই। অগ্নিযুগের বীরের দল স্বামীজীর বাণী ও গীতা হইতেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আহরণ করিয়াছিলেন, দেশাত্মবোধের সে আগুন ছড়াইয়া দিয়াছিলেন সারা ভারতে। মহাত্মা গান্ধী, যাঁহার জীবন ছিল—'তুমি কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল···চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই'—স্বামীজীর এই বাণীরই মূর্ত প্রতীক, সে দেশাত্মবোধকে জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন ভারতের নিজস্ব শক্তির উৎস আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়াই তাঁহার নীতি সম্বন্ধে দ্বিমত থাকা সত্ত্বেও ভারতের জাগরণের পথে বিপুল প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিল। দেশের আপামরসাধারণের চিত্তে অনাবিল আত্মবিশ্বাসের উদ্বোধক নেতাজীর জীবনও আধ্যাত্মিকতাভিত্তিক—প্রত্যক্ষভাবে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারা-স্নাত, ভারতীয় ক্ষত্রিয়ের আদর্শে ক্ষাত্রবীর্য ও ব্রহ্মতেজের সমন্বয়ে গঠিত।

জ্বলন্ত পাবকের মত এই সব জীবনগুলি ভারতের নিজস্ব শক্তির উৎস হইতে, ধর্ম বা আধ্যাত্মিতকা হইতেই শক্তি আহরণ করিয়াছিল। ইহাতে প্রেরণা জাগাইতে স্বামীজীর বাণীর শক্তি অমোঘ। আজ আমরা স্বামীজীর বাণী ভুলিয়াছি। ধর্মের দিকে চাহিতে আমাদের আজ বোধ হয় সঙ্কোচ হয়। মানুষকে যাহা আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি হইতে সরাইয়া দেয়, যাহা পৌরুষকে অবনমিত করিয়া স্ত্রীসুলভ কোমলতায় হৃদয় ভরাইয়া দেয়, আমাদের যুবকদের মনের উপর আজ সেই সব সাহিত্যের ও কাব্যেরই প্রভাব অধিক—স্বামীজীর শক্তিপ্রদ, পৌরুষদীপ্ত ভাবধারার স্থান সেখানে নাই বলিলেই চলে। এই দুদিনে যুব-জীবনে স্বামীজীর ভাবধারার ও ধর্মের প্রবেশ-পথ অবিলম্বে সুবিস্তৃত করিতে আমরা যেন ভ্রূক্ষেপহীন ও দ্বিধাগ্রস্ত না থাকি।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও ধর্মজীবন*

স্বামী শঙ্করানন্দ

ধর্ম বলতে আমরা খুব কঠিন একটা কিছু ধারণা করে বসি। এ-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা বা বোধ খুব কম লোকেরই আছে। কারণ ধর্ম অপরোক্ষ অনুভূতির বস্তু

ধর্মজীবনে একটি বড় জিনিস হচ্ছে সরলতা।... যিনি ধার্মিক, তিনি সরল। শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন সরলতার প্রতিমূর্তি। তাঁর শ্রীমুখের দিকে তাকালে, একেবারে সরল শিশুর মত তাঁকে মনে হয়।...

ধর্ম বলতে অনেক সময় আমরা একটা কিম্ভূতকিমাকার ধারণা করে বসি। কতকগুলো আচার-অনুষ্ঠানকেই আমরা ধর্ম বলে ধরে নিই। ফলে, অনেক সময় আমরা একটা বিভ্রাট করে ফেলি। তখন প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে কেবল আচার-অনুষ্ঠান নিয়েই মাতামাতি করি এবং আচার-বিধি ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতিগুলোকেই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য বলে মনে করি তার ফলে, আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যাই এবং অনর্থক বিপাকে পড়ি

ধর্মজীবন যেমন জটিল, তেমনি আবার সহজ-সরল। 'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্'— ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব ভক্তগণের হৃদয়-গুহায়, হৃদয়ের মণিকোঠায় নিহিত রয়েছে। যাঁরা কেবল আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকেন, তাঁরা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেন না। তাই তাঁদের কাছে ধর্মজীবন বেশ জটিল এবং শুষ্ক বলে মনে হয়। যাঁরা হৃদয়ের সরলতা-পবিত্রতা, প্রেম-ভালবাসা— এগুলো বাড়াবার জন্য প্রযত্ন করেন, তাঁদের কাছে ধর্মজীবন বেশ সহজ ও সরল এবং পরম সুখের হয়।...

শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, 'তাঁর কৃপা-বাতাস তো বইছেই, পাল তুলে দে না!' ঈশ্বরের কৃপা-দাক্ষিণ্য সর্বদাই রয়েছে। জীবের প্রতি, জগতের প্রতি অপার কৃপাপরবশ হয়ে তিনি ধরাধামে স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আমাদের মন হচ্ছে পাল। এই মনকে তুললেই তাঁর কৃপাবাতাস তাতে লাগবে। তাহ'লে গন্তব্য স্থানে সহজেই পৌঁছান যাবে।...

তিনি বলতেন, 'আমি ষোল টাং করে গেলাম, তোরা এক টাং কর।' তিনি দুশ্চর সাধনা করে আমাদের পথ এবং প্রণালী—উভয়ই সহজ করে দিয়ে গেছেন আমরা সহজে তাঁর কৃপা পাব ' তিনি আমাদের হয়ে সব করে গেছেন। তিনি কাঠ-খড় সংগ্রহ করে আগুন জেলে দিয়ে গেছেন, আমরা পাশে বসলেই বা নিকটে গেলেই তাপ অনুভব করব।...আমাদের 'এক টাং' করলেই হবে। শরণাগত হয়ে তাঁর নাম এবং তাঁর স্মরণ-মনন করলেই সব হয়ে যাবে।...

---

* কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন দিবসে (১লা মার্চ, ১৯৪৯) জনসভায় পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের সংক্ষিপ্ত ভাষণ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক শ্রুত-লিখিত।

জীবন্মুক্তিপ্রসঙ্গ

স্বামী ধীরেশানন্দ

প্রস্তাবনা

সংসারে কেহ দেহ, যৌবন, পদমর্যাদাদি লইয়া, কেহ বা স্ত্রী-পুত্র-ধনাদি লইয়া, কেহ বা পোষা জীবজন্তু লইয়া মশগুল—আনন্দলাভের আশায়। কিন্তু স্বরূপানন্দের অনুভব না হইলে মানুষ যাহা চায় তাহা পায় না ও অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া অশেষ দুর্দশা ভোগ করে।

সংসারে মানুষ কি চায় তাহা বলিতে গেলে বলিতে হয়, মানুষ স্ত্রীপুত্র ধন বিষয়াদি কিছুই চায় না। চায় কেবল একটু সুখ। আর চায় যাহাতে তাহার কোন দুঃখ না হয়। অর্থাৎ সুখ-প্রাপ্তি ও দুঃখ-নিবৃত্তিই জীবের কাম্য। বিষয়-প্রাপ্তিতে সুখানুভব হয় বলিয়া জীব মনে করে সুখ বিষয়গত, তাই বিষয় চায়। বিষয় বিনাশী বলিয়া বিষয়াবলম্বনে যে সুখ অনুভূত হয় তাহাও বিনাশী। সে সুখ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কিন্তু মানুষ ক্ষণিক সুখে তৃপ্ত হইতে পারে না, তাই সে সুখলাভার্থে পুনরায় বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। আলেয়ার আলো ধরিবার এই ব্যর্থ চেষ্টায় গোটা জীবনটাই অবশেষে একদিন নিঃশেষিত হইয়া যায়।

শারীরিক ব্যাধি আদি দুঃখ, মানসিক সন্তাপাদি দুঃখ, চোর ব্যাঘ্র আদি হইতে উৎপন্ন দুঃখ এবং অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি আদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়জনিত দুঃখ—এই সব দুঃখ জীবের নিত্য সহচর। তেমনি শারীরিক ও মানসিক সুখ, অনুকূল অন্য প্রাণী হইতে প্রাপ্ত সুখ ও প্রকৃতির আনুকূল্যলব্ধ সুখও জীব ভোগ করিয়া থাকে। এই সুখগুলিই জীব সর্বদা কামনা করিয়া থাকে, পূর্বোক্ত দুঃখগুলি সে মোটেই চায় না।

সুখ ও দুঃখের স্বরূপ বিচার করিলে দেখা যায় যে উহাদের প্রত্যেকটিই দুই প্রকার। বিষয় ও ইন্দ্রিয় সহযোগে প্রথমে সুখের অনুভব হইল; তারপর আমি উল্লাসে 'আমি আজ ধন্য, কৃতকৃত্য' এইরূপ মনে করিয়া হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। তেমনি দুঃখের অনুভব হইল, তারপর আমি শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলাম। এই ভাবেই সংসার-নাটক চলিতেছে। অনিচ্ছা-সত্ত্বেও জীবকে দুঃখানুভব করিতে হইতেছে আর ইচ্ছাসত্ত্বেও নিত্য নিরবচ্ছিন্নভাবে সে সুখ প্রাপ্ত হইতেছে না। কিন্তু সকলেই চায়, দুঃখ চির-নিবৃত্ত হউক এবং অসীম সুখ নিত্য অক্ষুণ্ণ থাকুক। অর্থাৎ আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি ও নিরবশেষ, নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা আনন্দ-প্রাপ্তি—ইহাই সকলের কাম্য। এই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও নিরবশেষ, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-প্রাপ্তিকেই শাস্ত্রে মোক্ষ বলে। এই মোক্ষ যে চায় সেই মুমুক্ষু। সুতরাং একভাবে বলিতে গেলে জগতে সকলেই মুমুক্ষু; কারণ সকলেই কার্যতঃ এইটিই চায়। কিন্তু মোক্ষলাভের যথার্থ উপায়টি সকলে জানে না।

বেদান্ত বলেন জীব স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। ভ্রান্তিবশতঃ জীব নিজেকে ক্ষুদ্র, পরিচ্ছিন্ন মনে করিয়া সংসারে নানা রাগ-দ্বেষ, মান-অপমান, লাভ-অলাভ ও সুখ-দুঃখে অভিভূত হইয়া কষ্ট পাইতেছে। এই বন্ধনদশা হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায় হইতেছে আত্মস্বরূপাববোধ। অজ্ঞানীর দুঃখ-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা থাকিলেও সে উহার ঠিক সাধনটি জানে না। দুঃখদ ও বিনাশী

বিষয়সুখ হইতে পরাবৃত্ত হইয়া অন্তর্মুখ চিত্তে আত্ম-তত্ত্বানুশীলন করার পরিবর্তে সে স্থায়ী সুখের আশায় ঐ বিষয়ভোগ-সম্পাদনের ব্যর্থ চেষ্টাতেই অধিকতর কষ্ট পায়। কোন কোন ভাগ্যবান্ জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি বশতঃ শ্রীগুরু ও ঈশ্বর-কৃপায় দুর্লভ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া জীবদ্দশাতেই সর্ববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দে অবস্থান করিয়া থাকেন। ইঁহারাই জীবন্মুক্ত। এই জীবন্মুক্তি বিষয়েই আমরা এখানে শাস্ত্রদৃষ্টি সহায়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি

জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ প্রারব্ধভোগাবসানে দেহ-পাতান্তর বিদেহমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

সম্যক্ বিচার প্রভাবে উৎপন্ন ব্রহ্ম ও জীবাত্মা বিষয়ক অভেদ জ্ঞানই জীবন্মুক্তিরূপ ফল প্রদান করতঃ বিদেহমুক্তি সম্পাদন করিয়া থাকে।

শ্রীবশিষ্ঠজী বলিয়াছেন—'জীবতো যস্য কৈবল্যং বিদেহে স চ কেবলঃ।'

—যিনি জ্ঞানদ্বারা জীবদ্দশাতেই কেবলভাব বা ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিয়াছেন দেহপাতানন্তর তিনিই বিদেহকৈবল্য লাভ করিয়া থাকেন।

'বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে'—(কঠ ২।২।১)

'তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে'—(ছাঃ ৬।১৪।২)

'জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ'—(শ্বে ১।১১)

'ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি'—(কেন ১।২।৫)

—ইত্যাদি বহু শ্রুতি জীবন্মুক্তি পূর্বক বিদেহমুক্তি প্রতিপাদন করিয়া থাকেন।

আত্মজ্ঞানের কারণ মহাবাক্য

জীবন্মুক্তি পূর্বক বিদেহমুক্তি সম্পাদনসমর্থ ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান বেদান্তোক্ত মহাবাক্য হইতেই অধিকারী পুরুষ লাভ করিয়া থাকেন। জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদক বাক্যের নামই **মহাবাক্য**। যে বাক্য শ্রবণের পর আর কিছু শ্রোতব্য থাকে না এবং যে বাক্য-জন্য জ্ঞানের উল্লাসের পর ঐ জ্ঞানের প্রভাবে ঐ বাক্যও আর থাকে না, তাহাই **মহাবাক্য**। এই মহাবাক্যার্থ সাক্ষাৎকারের জন্য উপযুক্ত গুরু ও শিষ্য প্রয়োজন। গুরুর উপদেশে শিষ্য মিথ্যাভূত উপাধির স্বরূপ জানিয়া বিচার সহায়ে উহা ত্যাগ করেন এবং লক্ষ্য চৈতন্যের অভিমুখী হইয়া অন্তে অখণ্ড-চৈতন্য-স্বরূপে অবস্থান করেন। মহাবাক্য গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ও সর্ব বেদান্তের সার। উহার অর্থ গ্রহণে সামর্থ্য সম্পাদন নিমিত্ত পূর্বে শম-দমাদি বহু সাধন অভ্যাস প্রয়োজন। সমর্থ পুরুষই মহাবাক্য শ্রবণ বা তদর্থ বিচার জনিত জ্ঞানলাভে কৃতার্থ হইয়া থাকেন। কারণ—

'অধিকারিণি প্রমিতি জনকো বেদঃ।'

—অধিকারী পুরুষের প্রতিই বেদ প্রমাজ্ঞান উৎপন্ন করিয়া থাকেন।

এই জ্ঞান অতি দুর্লভ। ভগবান গীতামুখে বলিয়াছেন—

'কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।' (৭।৩)

'শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।' (২।২৯)

'আশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ।' (কঠ ১।২।৭)

—ইত্যাদি শ্রুতি- ও স্মৃতি-বাক্যসমূহ অধিকারীর দুর্লভতা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ঈশ্বরকৃপা, গুরুকৃপা, আত্মকৃপা ও শাস্ত্র-কৃপা হইলে তবেই জ্ঞান হওয়া সম্ভবপর। অহেতুক-কৃপাসিন্ধু শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুমুখে মহাবাক্য শ্রবণে যেরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে, কেবল নিজে নিজে শাস্ত্র পড়িয়া ও বিচার করিয়া তাহা হয় না। বেদান্ত-বাক্য শ্রবণে অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং বোধমাত্র অবশেষ থাকে। উহাই আত্মবোধ। উহা ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞানবিশেষ নহে; স্বপ্রকাশ অপরোক্ষ আত্মবোধ ইন্দ্রিয়ের অবিষয়।

মহাবাক্য এইরূপেই আত্মজ্ঞানের জনক। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার দ্বারা জীবদ্দশাতেই সর্ব কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি এবং অজ্ঞান ও তৎকার্য জীবজগৎ বাধিত হওয়াকেই জীবন্মুক্তি অবস্থা বলা হয়।

আত্মাশ্রিত অজ্ঞাননাশ ত্রিবিধ। বরাহ শ্রুতি (২।৬৯) বলেন—

'শাস্ত্রেণ নশ্যেৎ পরমার্থরূপম্,
কার্যক্ষমং নশ্যতি চাপরোক্ষ্যাৎ।
প্রারব্ধনাশাৎ প্রতিভাসনাশঃ,
এবং ত্রিধা নশ্যতি চাত্মমায়া॥'

—অর্থাৎ উত্তরমীমাংসা শাস্ত্রবিচার দ্বারা এইরূপ বোধ হয় যে জগতের পারমার্থিক সত্তা নাই, উহা কেবল ব্যবহারিক। ইহাকে যৌক্তিক বাধ বলা যাইতে পারে। পুনঃ শ্রবণমননাদির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে জগতের ঐ ব্যবহারক্ষম (কার্যক্ষম) সত্তাও বাধিত হইয়া যায়। তখন বাধিতানুবৃত্তিবশতঃ জীবজগতের সত্তাবিহীন প্রতীতি মাত্র বা প্রাতিভাসিক সত্তা মাত্র অবশেষ থাকে। এই প্রতীতি বিক্ষেপশক্তিযুক্ত অজ্ঞানের কার্য। ইহাও প্রারব্ধভোগাবসানে নিবৃত্ত হইয়া যায়। অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা আবরণশক্তি-যুক্ত অজ্ঞান নষ্ট হয়। উহাই অপরোক্ষ বাধ। তাই অজ্ঞান-জীব-জগতের প্রথম হয় যৌক্তিক বাধ, দ্বিতীয়তঃ অপরোক্ষ বাধ বা সরূপনাশ, তৃতীয়তঃ প্রারব্ধভোগাবসানে আত্যন্তিক নাশ বা অরূপ নাশ হইয়া থাকে। এইরূপে অজ্ঞাননিবৃত্তি ত্রিবিধ।

বিদ্যাধিকারী দুই প্রকার

কৃতোপাস্তি ও অকৃতোপাস্তি ভেদে আচার্যগণ দুই শ্রেণীর বিদ্যাধিকারীর কথা বলিয়া থাকেন। যিনি উপাস্যদেবতার দর্শন পর্যন্ত উপাসনা সমাপ্ত করিয়া পরে তত্ত্ববিচারাদি সহায়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তিনি **কৃতোপাস্তি**। আর যাঁহারা কিছু উপাসনা করিয়া বা না করিয়াই জ্ঞানমার্গে প্রবৃত্ত হইয়া জ্ঞান সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহারা **অকৃতোপাস্তি**। কৃতোপাস্তি জ্ঞানীর উপাসনাকালেই মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় হইয়া যায় বলিয়া জ্ঞানের পর আর তাঁহার কিছু কর্তব্য অবশেষ থাকে না। কিন্তু যিনি প্রথমে উপাসনা করেন নাই তাঁহাকে জীবনমুক্তি অবস্থার দৃঢ় স্থিতির জন্য জ্ঞানের পরও মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়ের সাধন করিতে হয়।

(এ বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ 'জীবনমুক্তি-বিবেক' ও গীতা ৬।৩২ মধুঃ টীকা দ্রঃ)

জীবন্মুক্তির কারণত্রয়

তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়—এই তিনটি দৃঢ় হইলেই **যথার্থ** তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে জীবন্মুক্তি অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। অকৃতোপাস্তির যে তত্ত্বজ্ঞান উহা **অদৃঢ়**। উহা দৃঢ় করিবার জন্য মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়ের আবশ্যকতা আছে। তত্ত্বজ্ঞান স্বরূপাবরণ নিবৃত্ত করিয়া থাকে, বাসনাক্ষয় চিত্তের বিক্ষেপ নিবৃত্ত করে এবং মনোনাশ মলদোষ দূর করিয়া থাকে। এই তিনটি একত্র পরিপূর্ণভাবে প্রকট হইলে তবেই জীবদ্দশায় জীবন্মুক্তি অবস্থা লাভ হয়। তখন তাঁহার আর কোন কর্তব্য অবশেষ থাকে না। তিনি তখন কৃতকৃত্য, জ্ঞাতজ্ঞেয়, প্রাপ্তপ্রাপ্তব্য ও হতহেয় অবস্থায় সমারূঢ়। দেহেন্দ্রিয় ও ব্যবহারে তাঁহার কোন অভিমান থাকে না। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি এগুলিকে ত্যাগও করিতে পারেন না। প্রারব্ধচালিত হইয়া তিনি সর্ব ব্যবহার করিয়া যান। শরীর, মন, ব্যবহার—সব প্রারব্ধাধীন। তিনি নির্লিপ্ত, স্বরূপানন্দে সদা বর্তমান। প্রারব্ধভোগাবসানে দেহপাত হইলে তিনি বিদেহমুক্ত হন।

প্রারব্ধান্তে ত্রিপুটিরহিত ব্রাহ্মীস্থিতির নামই বিদেহমুক্তি। জীবন্মুক্তি অবস্থায় জ্ঞানদগ্ধ ত্রিপুটি সহায়ে সর্ব ব্যবহার সত্ত্বেও বোধস্বরূপে অবস্থিতি—এই মাত্র ভেদ। সংসার-কারণ অজ্ঞান নাশ হইয়া যাওয়াতে তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না।

প্রথমাবস্থায় জীবন্মুক্ত যখন বোধস্বরূপে অবস্থান করেন তখন নিজেকে প্রসন্ন ও কৃতার্থ বোধ করেন। বৃত্তি বাহ্যবিষয়ক হইলে তিনি উদ্বিগ্ন হন। অল্প সময়ই এই অবস্থায় তিনি স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন। জগৎকে মিথ্যা বলিয়া জানিলেও ব্যবহারে বিক্ষিপ্ত ও উদ্বেগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। তখন 'জগৎ মিথ্যা' এইরূপ অখণ্ডিত বৃত্তি থাকে না। জগৎদৃষ্টিও নিবৃত্ত হয় না বলিয়া তখন তিনি উহা নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করেন কারণ জগৎবৃত্তি হইলেই দুঃখানুভব হয়।

মধ্যমাবস্থায় তিনি জগৎবৃত্তি নিরোধ করিতে করিতে অধিকতর সময় (ব্যবহারকালেও) সাক্ষীস্বরূপে অবস্থান করেন। সাক্ষীনিশ্চয় তখন সদা অক্ষুণ্ন হয়। তিনি ব্যবহারে গ্লানি বোধ করেন এবং কর্তৃত্বাভিমানরহিত হইয়া যাহা করিবার তাহা করিয়া যান মাত্র।

উত্তমাবস্থায় আর তাঁহার কোন কর্তব্য অবশেষ থাকে না। তখন তাঁহার অখণ্ডিত সাম্যভাব। এই অবস্থায় ব্যুত্থান ও সমাধি তুল্য বলিয়া প্রতিভাত হইতে থাকে। তখন সর্ব-সংসার, মূঢ়, অজ্ঞানী, চর, অচর সবই স্বস্বরূপ ভিন্ন আর কিছু বলিয়া মনে হয় না। বলা বাহুল্য মনোনাশ- ও বাসনাক্ষয়-অভ্যাসের ক্রমবিকাশ সহ পূর্বোক্ত তিন অবস্থা জীবন্মুক্তের জীবনে আসিয়া থাকে। জীবন্মুক্তি অবস্থা সকলের এক প্রকার হয় না.

জীবন্মুক্তিতে শরীর, জীব, জগতাদি প্রতীতি-সহ ব্রহ্মপ্রাপ্তি, আর বিদেহমুক্তিতে শরীরাদি প্রতীতিরহিত ব্রাহ্মী স্থিতি—ইহাই বৈশিষ্ট্য। মুক্তির দিক হইতে উভয়ই সমান। তবে জীবন্মুক্ত না হইলে কেহ বিদেহমুক্ত হইতে পারে না।

ঈশ্বরকোটি ও ব্রহ্মকোটি জীবন্মুক্ত

জীবন্মুক্ত দুই শ্রেণীর হইয়া থাকেন।—ঈশ্বরকোটি ও ব্রহ্মকোটি। প্রারব্ধ-বৈচিত্র্যই এই ভেদের কারণ। তন্মধ্যে ব্রহ্মকোটি জীবন্মুক্ত জগৎসম্বন্ধরহিত, মূক ও আত্মারাম হইয়া থাকেন। ইঁহাদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সাধিত না হইলেও, পরোক্ষভাবে জগতের সমূহকল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। জগতে ইঁহাদের অবস্থানই পরম শুভের জনক, (সন্ন্যাসগীতা ১১।৩২,৩৩)। ঈশ্বরকোটি জীবন্মুক্ত ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে জগৎকল্যাণে রত থাকেন,—এইরূপ পুরুষধুরন্ধরগণকৃত উপকার দ্বারাই জগৎ ধন্য হইয়া থাকে। যথা—

'ব্রহ্মেশকোটিভেদেন জীবন্মুক্তো দ্বিধা মতঃ।
প্রারব্ধকর্মণাং তত্র জীবন্মুক্ত মহাত্মনাম্॥
বৈচিত্র্যমেব হেতুঃ স্যাৎ প্রভেদে দ্বিবিধে ধ্রুবম্।
ব্রহ্মকোটিং সমাপন্না জীবন্মুক্তা ভবন্ত্যহো॥
আত্মারামাঃ সদামূকাঃ জগৎসম্বন্ধবর্জিতাঃ।
ঈশকোটিং শ্রিতা যে চ জীবন্মুক্তাঃ স্ববেদিনঃ॥
ত ঈশপ্রতিমাঃ সন্তো ভগবৎকার্যরূপতঃ।
সংরক্তা বিশ্বকল্যাণে সন্তিষ্ঠন্তে মহীতলে॥
বিশ্বমেবংবিধৈরেব হ্যেকমাত্রং স্বধাভুজঃ।
ভবন্ত্যপকৃতং ধন্যং জীবন্মুক্তৈর্মহাত্মভিঃ॥'
(শম্ভুগীতা ৬।৮০-৮৪)

ঈশ্বরকোটি জীবন্মুক্ত পুরুষের ক্রিয়াকারিতা দুই প্রকারে হইয়া থাকে প্রথম আপন প্রারব্ধের ভোগদ্বারা ক্ষয়; দ্বিতীয়, ব্যষ্টিকেন্দ্র নষ্ট হইয়া যাওয়াতে সমষ্টিকেন্দ্র অর্থাৎ বিরাট্-কেন্দ্র বা ঈশ্বরেচ্ছা দ্বারা চালিত হইয়া

ঈশ্বরকে প্রথম হইতেই পরোপকার করিবার অধিকার লাভকরতঃ জগদ্গুরুরূপে অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রচার করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। বিরাট্কেন্দ্রচালিত এই মহাপুরুষগণ বিরাট্পুরুষের ইঙ্গিতে অনায়াসেই ভগবৎকার্য সাধনে সমর্থ হন। যথা—

'**জীবন্মুক্তঃ ঈশকোটিঃ** পূর্বস্মাদেব বস্তুতঃ।
পরোপকারতত্ত্বাধিকারিত্বং বৈ সমাশ্রয়ন্॥ ৩৪
জগদ্গুরুত্বমাপন্নোঽধ্যাত্মজ্ঞানং প্রচারয়ন্।
বিশ্বপ্রভূতকল্যাণং জনয়ত্যবিলম্বিতম্॥ ৩৫
সতঃ সমুচিতাৎ কেন্দ্রান্নূনং ভগবদিঙ্গিতৈঃ।
স কর্তুং ভগবৎকার্যং প্রভবত্যনুপদ্রবম্॥ ৩৭
এতাদৃগেব পরমহংসাদর্শো জগদ্গুরুঃ।
জীবন্মুক্তো হি সর্বেষাং কল্যাণং কর্তুমর্হতি॥ ৩৮
জগতাং জীবনায়ৈব জীবন্মুক্তস্য জীবনম্॥ ৭২
জগৎপবিত্রতাসিদ্ধ্যৈ জীবন্মুক্তস্য কর্ম বৈ॥ ৭৩'

(সন্ন্যাসগীতা—১১শ অধ্যায়)

ব্রহ্মকোটি ও ঈশ্বরকোটি জীবন্মুক্ত পুরুষের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এ প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক। শ্রীরামচন্দ্রেরও এই শংকা হইয়াছিল। তদুত্তরে শ্রীবশিষ্ঠজী বলিয়াছেন যে ত্রিগুণময় সংসারদৃশ্যের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় পূর্বক অন্তঃশীতলতার নামই সমাধি। উহা অনন্ত তপস্যার ফল। অতএব ব্যবহারে নানাকর্মে ব্যাপৃত জ্ঞানী ও সমাধিস্থ-জ্ঞানী, উভয়েই সমান। যথা—

'ইমং গুণসমাহারমনাত্মত্বেন পশ্যতঃ।
অন্তঃশীতলতা যাসৌ সমাধিরিতি কথ্যতে॥
দৃশ্যৈর্ন মম সম্বন্ধ ইতি নিশ্চিত্য শীতলঃ।
কশ্চিৎসংব্যবহারস্থঃ কশ্চিদ্ধ্যানপরায়ণঃ॥
দ্বাবেতৌ রাম সুসমাবন্তশ্চেতসি শীতলৌ।
অন্তঃশীতলতা যা স্যাত্তদনন্ততপঃফলম্॥'

(যোগবাশিষ্ঠ)

অন্তরের শীতলতা যদি ব্যবহারকালেও রহিল, তবে সমাধি অবস্থা হইতে ব্যবহারাবস্থার কোন পার্থক্যই রহিল না। যেমন নেশা হইলে তখন বাহ্যজ্ঞান থাকে না, তখন কেহ অপমান করিলেও সে তাহা বোধ করে না। সে আপন ভাবেই স্থিত থাকে। তাহা জ্ঞানবিচারের নেশাই হউক, মানপ্রতিষ্ঠার নেশাই হউক বা সুরা প্রভৃতি পানের নেশাই হউক, সব সমান।

জ্ঞানের গভীর নিষ্ঠা কিঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করাইবার উদ্দেশ্যেই এখানে এইরূপ অতি-পরিচিত লৌকিক দৃষ্টান্তের সাহায্য লওয়া হইল মাত্র। জ্ঞানের সহিত উহাদের তুল্যতা দেখাইবার জন্য নহে।

জীবন্মুক্তের ব্যবহারবৈচিত্র্য

সকল জীবন্মুক্তেরই নিশ্চয় জ্ঞান এক। কিন্তু প্রারব্ধকর্মবৈচিত্র্যবশতঃ তাঁহারা নানারূপে প্রতীত হন এবং তাঁহাদের আচার-ব্যবহার এবং চিত্তের প্রশান্তিতেও ভেদ হয়। ব্যবহারিক কর্মে ব্যস্ত থাকিয়া বা না থাকিয়াও জীবন্মুক্তি হইতে পারে। জীবন্মুক্তির হেতু তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়—বর্ণাশ্রমধর্মরাহিত্য নহে। বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম চিত্তের শুদ্ধি সম্পাদক। ঐ চিত্তশুদ্ধিপূর্বকই জ্ঞান হয়। সুতরাং জ্ঞানীর আর ঐ কর্মের কোন প্রয়োজন নাই। জ্ঞানের পর ব্যবহার প্রারব্ধানুসারেই হইয়া থাকে। যদি প্রারব্ধ বর্ণাশ্রম ধর্মানুষ্ঠানের অনুকূল হয় তবে বিদেহকৈবল্য পর্যন্ত তিনি বর্ণাশ্রমধর্মানুষ্ঠান করেন, আর যদি প্রারব্ধ তৎ প্রতিকূল হয় তবে জ্ঞানীর ব্যবহার বর্ণাশ্রম-ধর্মানুষ্ঠানরহিত হইয়া থাকে।

কোন আচরণই জীবন্মুক্তির বাধক নহে। অবশ্য তিনি স্বভাববশে শুভাচরণই করিয়া থাকেন; অশুভাচরণ করেন না বা করিতে পারেন না। মনের শুদ্ধি, নির্লিপ্ততা, প্রসন্নতা, নিস্পৃহতাদি সাত্ত্বিক গুণসকল জ্ঞানীরই অন্তরে

সূক্ষ্মরূপে থাকে। ব্যবহারকালে ঐ সকল গুণ বাহিরে দেখা যায়; কখনও বা দেখা যায় না বলিয়াও মনে হইতে পারে। জীবন্মুক্ত কর্মকাণ্ডী, অতি তপস্বী, অতি ত্যাগী, বক্তা, মৌনী, ঐশ্বর্যধারী, নিষ্কিঞ্চন—নানাপ্রকার হইয়া থাকেন। কোন বিষয়েই তাঁহার নিজের কোন অভিনিবেশ বা আগ্রহ নাই। প্রারব্ধবশে আচরণ বিচিত্র হইয়া থাকে। সকলের একই প্রকার প্রারব্ধ যেমন হয় না, তেমনি আচরণও একই প্রকার হয় না।

লক্ষণ

গীতায় স্থিতপ্রজ্ঞ, ভক্ত, গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ বলা হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানীর যত লক্ষণই দেখান যাউক না কেন, সে সবই স্বসংবেদ্য বলিয়া অপরের দৃষ্টির বিষয় নহে। স্থূল ব্যবহার দর্শনে ঐগুলি কেবল অনুমিত হইতে পারে মাত্র। সাধক ঐ গুণগুলি আয়ত্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন—এই জন্যই উহার উল্লেখ। উহা জ্ঞানীকে পরীক্ষা করিয়া চিনিবার জন্য নহে। অজ্ঞাননিবৃত্তি স্থূল আকারে দেখা যায় না। দেহ, ইন্দ্রিয়, জগৎ, সর্ব দৃশ্যই অজ্ঞান-কার্য, কিন্তু উহা অজ্ঞান নহে। কারণ এগুলি থাকা সত্ত্বেও জ্ঞানীর অজ্ঞান নষ্ট হয় এবং জ্ঞানীর নিকট দেহ-জগতাদির প্রতীতি জ্ঞানের বাধকরূপে প্রতীত হয় না। জ্ঞান কেবল অজ্ঞানেরই নাশক। 'জ্ঞানমজ্ঞানস্যৈব নাশকম্' (পঞ্চপাদিকা)।

জীবন্মুক্তের ব্যবহার বিচার

ব্যবহারকালে জ্ঞানীর বুদ্ধি ব্যবহারের অনুকূল হইয়াই সব করিয়া থাকে কিন্তু আত্মভাব হইতে বিচলিত হয় না। নট যেমন অনেক বেশ ধারণ করতঃ সুখ-দুঃখের ভাব প্রকাশ করে কিন্তু নিজের নটভাব বিস্মৃত হয় না, তদ্রূপ। জ্ঞানী সকলের সঙ্গে মিলিত হইলেও তিনি কাহারও প্রতি আসক্ত হন না। তিনি জড়পদার্থ নন তাই শীত-উষ্ণাদি, প্রারব্ধপ্রাপিত সুখ-দুঃখের সর্ব অনুভবই তাঁহার হয় কিন্তু তিনি কিছুতেই বিচলিত হন না। সুখপ্রাপ্তিতে তাঁহার আনন্দানুভব হয় নিশ্চয়ই, কিন্তু হর্ষ হয় না। হর্ষ একপ্রকার মদ বিশেষ। 'অহো, আমি কি ভাগ্যবান, এরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছি!'—এরূপ উল্লাসকেই হর্ষ বলে। তদ্রূপ দুঃখপ্রাপ্তিতে তাঁহার দুঃখানুভবও নিশ্চয়ই হয় কিন্তু শোক অর্থাৎ 'অহো আমি কি হতভাগ্য! এখন কি করি, কোথায় যাই'—এরূপ বিলাপ তিনি কখনই করেন না। কারণ—

'বোধাৎ প্রাক্ দ্বিবিধং দুঃখমেকং বুদ্ধিস্বভাবজম্।
রোগাবমানদারিদ্র্যপুত্রহান্যাদিরূপকম্॥
অপরং ত্বীদৃশে দুঃখে মগ্নোঽহং বহুজন্মসু।
ইত উদ্ধর্তুমাত্মানং ন শক্নোমীতি **মোহজম্**॥
তত্রাদ্যং **কর্মজত্বেন** নশ্যেদ্ ভোগাদৃতে নহি।
দ্বিতীয় **ভ্রমজং** তত্ত্ববোধাদেব নিবর্ততে॥
হর্ষশোকৌ বিভ্রমোত্থৌ কর্মোত্থসুখদুঃখয়োঃ।
বোধহেয়ৌ হর্ষশোকৌ ভোক্তব্যে তু সুখেতরে॥
(বৃহঃ বার্ত্তিকসার, ১ম অধ্যায় শ্লোক ৩২—৩৫)

—জ্ঞানের পূর্বে দ্বিবিধ দুঃখে লোকে সন্তপ্ত হইয়া থাকে। একটি হইতেছে রোগ, অপমান, দারিদ্র্য, পুত্রনাশাদিরূপ **কর্মজ** দুঃখ। অপরটি হইতেছে ঐ দুঃখে পতিত হইয়া 'হায়, কত জন্ম এরূপ দুঃখ আমি পাইতেছি, কি করিয়া আমি দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইব তাহা বুঝিতেছি না'—এইরূপ শোক বা বিলাপ। ইহা **মোহজ** অর্থাৎ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কর্মজ দুঃখ ভোগ বিনা নাশ হয় না। মোহজ বা ভ্রান্তিজ দুঃখ

তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। কর্মজ সুখ-দুঃখ প্রাপ্তিতে জীব যে হর্ষ ও শোক অনুভব করে উহা বিভ্রম- বা অজ্ঞান-জনিত; জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞান নাশ হইলে ঐ হর্ষ-শোক আর থাকে না কিন্তু কর্মজ সুখ-দুঃখ জ্ঞানী-অজ্ঞানী-নির্বিশেষে সকলকেই ভোগ করিতে হয়।

জীবন্মুক্ত সব কিছু করিয়াও, সব কিছু অনুভব করিয়াও, অন্তরে অকর্তা অসঙ্গ আত্ম-বোধ বলে সর্বাবস্থায় নির্বিকার থাকেন।

অজ্ঞানী শত চেষ্টা করিয়াও জ্ঞানী জীবন্মুক্তের নিষ্ঠা বুঝিতে অপারগ। তাই অনেকে জ্ঞানীর বিচিত্র ব্যবহার দর্শনে নানাবিধ আক্ষেপ করিয়া থাকেন।

'অন্তর্বিকল্পশূন্যস্য বহিঃ স্বচ্ছন্দচারিণঃ।
ভ্রান্তস্যেব দশাস্তাস্তাস্তাদৃশা এব জানতে

—অন্তরে আত্মদৃষ্টি সহায়ে নির্বিকল্পনিশ্চয়, কিন্তু বাহিরে যেন অজ্ঞানীতুল্য স্বচ্ছন্দ ব্যবহার —জীবন্মুক্ত পুরুষের এই অপূর্ব স্থিতি তত্তুল্য অন্য জ্ঞানীগণই জানিয়া থাকেন। যেমন স্বপ্ন-সৃষ্টির নির্ণয় স্বপ্নমধ্যে বিদ্যমান থাকিয়া কখনও হইতে পারে না, তদ্রূপ জ্ঞানীর স্থিতিও অজ্ঞানীর বোধগম্য নহে। অজ্ঞানী থাকেন এই ব্যবহারিক জগতে, আর জ্ঞানী থাকেন এই জগতের সাক্ষী-চৈতন্যে। ব্যবহার উভয়ের একই প্রকার হইয়া থাকে। তবে ভাবে পার্থক্য। বর্ণ বা আশ্রম অনুযায়ী ব্যবহারই জ্ঞানী করিয়া থাকেন কিন্তু নিষ্ঠা তাঁহার পরমার্থে। স্ত্রীবেশে নট ষোল-আনা স্ত্রীজনোচিত ব্যবহারই করিবার চেষ্টা করে, সেই সঙ্গে তাহার এই বোধও থাকে যে সে নট, সে স্ত্রী নহে। জ্ঞানীরও তদ্রূপ।

সাধারণ জীব দৃশ্য-জগৎকে সত্য বলিয়া জানেন, আর জ্ঞানী জানেন যে এ সব স্বপ্নদৃশ্যবৎ মিথ্যা—এই পার্থক্য।

ব্যবহারিক শরীর-প্রতীতি সহ ব্রাহ্মীস্থিতির নামই জীবন্মুক্তি; শরীররহিত হইয়া ঐ ব্রাহ্মীস্থিতির নামই বিদেহমুক্তি। মুক্তিতে কোন ভেদ নাই। তবে শাস্ত্রে যে ব্রহ্মবিদ্‌বর, ব্রহ্ম-বিদ্‌বরীয়ান্, ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ ইত্যাদি স্তর কল্পনা করিয়াছেন উহা চিত্তের সমাহিত অবস্থার তারতম্য মাত্র। জ্ঞানের বা মুক্তির তারতম্য কখনই নহে।

চতুর্বিধ জিজ্ঞাসু

বেদান্তে চারি প্রকার জিজ্ঞাসুর বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রথম, যথা বিরাট্ আত্মা। তিনি জানিলেন যে তাহা হইতে ভিন্ন কিছুই নাই, অতএব কাহার দ্বারা তিনি ভয় পাইবেন? এইরূপে সর্বপ্রপঞ্চ বিলাপন অর্থাৎ প্রপঞ্চাভাব জ্ঞানপূর্বক তিনি অভয় ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছিলেন। (বৃহঃ ১।৪।২) জন্মান্তরশ্রুত বেদান্তের মহাবাক্য শ্রবণ-বিচারের ফলেই বিরাট্‌পুরুষের এই জন্মে জ্ঞান হইল।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত, যেমন ভৃগু। তিনি পিতার নিকট ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ জানিয়া নিজে বিচারের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেন। (তৈঃ ৩।১ –৬) পিতা বলিলেন—'যাঁহা হইতে সব জাত হয়, যাঁহাতে সব স্থিত এবং যাঁহাতে সব লয় পায়, তাহাই ব্রহ্ম। তুমি তপস্যা অর্থাৎ বিচার দ্বারা এইটি জান। ভৃগু লক্ষণ মিলাইয়া অন্ন, প্রাণ, মন ইত্যাদিকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিলে পিতা পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন যে এখনও হয় নাই, আবার বিচার কর। অবশেষে শ্রুত পিতৃবাক্য পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া ভৃগু অনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিয়া কৃতার্থ হইলেন।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত, শ্বেতকেতু। গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত, বিদ্যামদগর্বী শ্বেতকেতুকে পিতা আরুণি তাঁহার বিদ্যাগর্ব দূর করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন—'বৎস, তুমি কি সেই

বিদ্যা লাভ করিয়াছ যৎসহায়ে অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়, অচিন্তিত বিষয় সুচিন্তিত হয় ও অনিশ্চিত বিষয় সুনিশ্চিত হয়?' কিন্তু শ্বেতকেতু উহা জানিতেন না। তখন তাঁহার গর্ব দূর হইল। অতঃপর পিতা আরুণি নিজেই পুত্রকে পুনঃপুনঃ নয়টি পর্যায়ে নানা যুক্তি সহায়ে অপূর্ব উপদেশ প্রদান করিলেন এবং তাহাতে অসম্ভাবনা বিপরীতভাবনা নিরাকরণপূর্বক পুত্র শ্বেতকেতু 'আমি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম'—এইরূপ দৃঢ় অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার লাভকরতঃ কৃতকৃত্য হইলেন (ছাঃ ৬।৮—১৬)। এখানে দেখা যায় যে গুরু কর্তৃক পুনঃপুনঃ স্মারিত হইয়া শিষ্য জ্ঞান লাভ করিলেন।

চতুর্থ দৃষ্টান্ত, পিশাচক। পিশাচক নামক কোন ব্যক্তি কার্যোপলক্ষে বনে প্রবেশ করিয়াছিল। সেখানে ঋষিগণ গুরুমুখে বেদান্তোক্ত তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যের ব্যাখ্যান শুনিতেছিলেন। দূর হইতে পিশাচকও উহা সকলের অলক্ষ্যে শ্রবণ করিল। পূর্ব জন্মজন্মান্তরকৃত সুকৃতি-ফলে অতিশুদ্ধান্তঃকরণ মহাভাগ্যবান্ পিশাচকের চিত্তাকাশ ঐ মহাবাক্য শ্রবণ প্রভাবেই দৃঢ় অপরোক্ষ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পিশাচক কৃতকৃত্য হইলেন। তাঁহার অজ্ঞানাদি যাবতীয় বন্ধন নির্মূল হইল। বাক্য শ্রবণ মাত্রই জ্ঞান হওয়া বিরল কোন ভাগ্যবান্ পুরুষেই ঘটিয়া থাকে।

তাই আচার্য সুরেশ্বর বলিয়াছেন—

'কৃৎস্নানাত্মনিবৃত্তৌ চ কশ্চিদাপ্নোতি নির্বৃতিম্।
শ্রুতবাক্যস্মৃতেশ্চান্যঃ স্মার্যতে চ বচোঽপরঃ॥
বাক্যশ্রবণমাত্রাচ্চ পিশাচকবদাপ্নুয়াৎ।
ত্রিষু যাদৃচ্ছিকী সিদ্ধিঃ স্মার্যমাণে তু নিশ্চিতা॥
সর্বোঽয়ং মহিমা জ্ঞেয়ো বাক্যস্যৈব যথোদিতঃ।
বাক্যার্থং ন হ্যতে বাক্যাৎ
কশ্চিজ্জানাতি তত্ত্বতঃ॥'
(নৈঃ সিদ্ধিঃ ২।২-৪)

অর্থাৎ কোন কোন বিমলমতি পুরুষ কৃৎস্ন প্রপঞ্চাভাব নিশ্চয়করতঃ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন—যথা বিরাট্। কেহ বা শ্রুত বেদান্তবাক্য পুনঃপুনঃ স্মরণকরতঃ জ্ঞান দ্বারা মোক্ষপদবীতে আরূঢ় হইয়া থাকেন—যথা ভৃগু। পুনঃ কোন অধিকারী বার বার মহাবাক্য স্মারিত হইয়া অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার লাভ করতঃ কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন—যথা শ্বেতকেতু।

মহাবাক্য শ্রবণমাত্রই আবার কেহ কেহ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। যথা—পিশাচক। বিরাট্, ভৃগু ও পিশাচকের যে জ্ঞানলাভ তাহা যাদৃচ্ছিক অর্থাৎ হঠাৎ, যেন অপ্রত্যাশিত ভাবে হইয়া গেল। ঐরূপ সকলের হয় না। কাহারও কাহারও হয় কিন্তু সকলের পক্ষে এই ভাবে জ্ঞান হয় না। কিন্তু বাক্যস্মার্যমাণ হইলে জ্ঞান সকলের অবশ্যই হইয়া থাকে, যেমন শ্বেতকেতুকে পিতা পুনঃপুনঃ বিবিধ যুক্তি সহায়ে বুঝাইয়া সংশয়-বিপর্যয়রহিত তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী করিলেন। এইটিই সকলের পক্ষে নিশ্চিত মার্গ। গুরুমুখে ও সৎসঙ্গে পুনঃপুনঃ বেদান্ত শ্রবণ ও মনন অর্থাৎ বিচার দ্বারাই সকলের নিশ্চিতরূপে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। অহো! বেদান্তবাক্যের কি অলৌকিক মহিমা! কিন্তু বেদান্তোক্ত মহাবাক্য বিচার বিনা কেহ বাক্যার্থ অবগত হইতে সমর্থ হয় না।

প্রসঙ্গক্রমে ইহাও সিদ্ধ হয় যে যাঁহার মহাবাক্য শ্রবণমাত্রই জ্ঞান হইয়া যায় তাঁহার আর মনন-নিদিধ্যাসনের কোন প্রয়োজন নাই। আবার যাঁহার শ্রবণানন্তর মনন বা বিচার দ্বারাই জ্ঞান হইয়া যায় তাঁহার পক্ষে আর নিদিধ্যাসন নিষ্প্রয়োজন। বার্ত্তিককার বলেন যে বিচারদ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাই নিদিধ্যাসন।

নিদিধ্যাসন জ্ঞানরূপ ; ধ্যানরূপ নহে। যাহারা বিচার-দ্বারা জ্ঞানসম্পাদনে অসমর্থ তাহাদের জন্য ধ্যান সমাধিরূপ নিদিধ্যাসন বিহিত রহিয়াছে।

বিচার করিতে করিতেও চিত্ত স্বভাবতই একাগ্র ও সমাহিত হইয়া পড়ে। অতি অল্প-ক্ষণের জন্য হইলেও ঐ সমাধিদ্বারাই বিচারলব্ধ জ্ঞানের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়। এইরূপে দেখা যায় কেহ কেহ জ্ঞানদ্বারা সমাধিপ্রাপ্ত হন, (মাঃ কারিকা ৩।৩২-৩৪)। ইঁহারা উত্তম অধিকারী। আবার কোন কোন মন্দাধিকারী পুরুষ মনোনিরোধ অর্থাৎ সমাধি সম্পাদন দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান, দুঃখক্ষয় ও অক্ষয় শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। (মাঃ কারিকা ৩।৪০)। বিভিন্ন অধিকারীর জন্য বিভিন্ন পথ। উপায় বিভিন্ন হইলেও সকলেই কিন্তু জ্ঞানদ্বারা একই জীবন্মুক্তি অবস্থা লাভ করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন। ইহাই মানবজীবনের চরম কাম্য। এ অবস্থায় জ্ঞানী সর্বদা স্বরূপে অবস্থিত হন। যাবতীয় সাংসারিক দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে পরম আনন্দে তখন তিনি অবস্থান করেন। নিত্যমুক্ত আত্মার মায়িক জন্মধারণের সার্থকতা এই অবস্থা প্রাপ্তিতে। তাই আচার্য নরহরি তদ্রচিত 'বোধসার' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

'জীবন্মুক্তিসুখপ্রাপ্ত্যৈ স্বীকৃতং জন্মলীলয়া।
আত্মনা নিত্যমুক্তেন ন তু সংসারকাম্যয়া' ॥
—(বোধসার। জীবন্মুক্ত্যষ্টাদশী-৩)

—জীবন্মুক্তি-সুখলাভের জন্যই নিত্যমুক্ত আত্মা মায়িক জন্ম স্বীকার করিয়াছেন, সংসার-ভোগের জন্য নহে।

কল্পনা

শ্রীহিমাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষ কি দিয়ে গড়া ?
দেহ, বুদ্ধি ও কল্পনা দিয়ে ভরা।
দেহে তো রয়েছে ব্যাধি ও মৃত্যুভয় ;
বুদ্ধি ? তাহাকে বিশ্বাস কই হয় ?
কল্পনা একা মানুষকে করে বড়—
দেবত্ব এনে মানুষের মাঝে সেই তো করেছে জড়ো !
কল্পনা আছে তাই সে হয়েছে কবি
ধূলার ধরণী মাঝারে এঁকেছে স্বর্গের একি ছবি !
কল্পনা আছে তাই তো মানুষ চাহিয়াছে ঈশ্বর,
তাই তো তাঁহারে আপন ভেবেছে, ভাবেনি কখনো পর ;
কল্পনা আছে তাইতো মানুষ মানেনি কিছুতে হার,
সব জীব মাঝে হেরিবারে শিব তাই তো প্রয়াস তার !
কল্পনা তারে দিয়েছে অভয় মরণে, দুঃখে, শোকে ;
কল্পনা তারে লইয়া গিয়াছে কল্পনাহীন লোকে।

'আত্মানং বিদ্ধি'

অধ্যাপিকা শ্রীমতী নন্দিতা সান্যাল

উপনিষদ্ বলেছেন 'আত্মানং বিদ্ধি': নিজেকে জান—স্বীয় সত্তাকে উপলব্ধি কর। মানুষের ইতিহাস নব নব রহস্যের উন্মোচন ও তার উপলব্ধির ইতিহাস। একঘেয়ে চলায় মানুষের ক্লান্তি। তাই জীবনের পথে সে যেখানেই নতুন কিছু পেয়েছে সেখানেই তার চিত্ত উন্মুখ হয়েছে; জগতের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে গেছে জীবন। কিন্তু জগতের সমস্যার চেয়েও অনেক বড় সমস্যা জীবনের সমস্যা। কারণ মানুষ একাধারে সব সমস্যার সমাধান আবার সব সমস্যার কেন্দ্র। মানবাত্মার অস্তিত্ব স্রষ্টার গৌরব, সৃষ্টির বিস্ময়। এ এমন এক প্রশ্ন যার উত্তর মানুষ পায় না, অথচ যা না পেলেও তার নয়। তাই আমাদের ঋষিরা বলেছেন: 'আত্মানং বিদ্ধি', সবার আগে নিজেকে জান।

অস্তিত্বের প্রশ্ন এমনই এক প্রশ্ন যার উত্তর দিতে গিয়ে বিজ্ঞান থমকে দাঁড়িয়েছে, সাহিত্য হয়েছে বাঙ্ময়, দর্শন হয়েছে মৌন। বিজ্ঞান যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যুক্তির চুলচেরা হিসাব নিকাশের পথেই তার অভিযান। কিন্তু যা বাক্যের অতীত, মনেরও অতীত, সেই অতীন্দ্রিয় সত্তার রাজত্বে যুক্তির প্রবেশাধিকার কোথায়?

আত্মার ব্যাখ্যা তাই বুদ্ধিতে মেলে না। যেটুকু মেলে তাতে বিজ্ঞান কেবল এই কথাটাই বলতে চেয়েছে যে অলৌকিক আত্মা অলীক স্বপ্ন। তথাকথিত মন জড়শক্তির রূপায়ণমাত্র। কিন্তু কথাটা বলবার সময় জড়শক্তির উৎসমুখের যে অস্পষ্ট কলতান বিজ্ঞানের কানে এসে পৌঁছেছে তা নিয়ে সে আর মাথা ঘামায় নি। সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সাহিত্য।

সাহিত্যের আলোচ্য বিষয় সহিতত্ব বা মিলন। সত্তা যখন সত্তার সঙ্গে মিলিত হয়, তখন হৃদয়ের বীণায় জাগে সুর, সে সুর প্রকৃতির বুকে স্পন্দন তোলে। সাহিত্য সেই স্পন্দিত সুরের মূর্ছনা। আবার, আত্মোপলব্ধির অভীপ্সায় অসীম মিলন নামে সীমার পর্যায়ে—সত্তা থেকে সত্তা হয় বিচ্ছিন্ন; প্রকৃতির বুকে জাগে কান্না। সৃষ্টির সেই বিরহের বেদনাও সাহিত্য। কাজেই বিরহ-মিলনের পালা ঠেলেই এগিয়ে চলে সাহিত্যের ভেলা।

বিজ্ঞানের অভিযান যেখানে শেষ হয় সেখানে সাহিত্যের অভিযানের সূচনা, আর সাহিত্যের অভিযান যেখানে সমাপ্ত সেখানে সুরু হয় দর্শনের সাধনা।

দর্শন সত্যের সাধনা ও তার উপলব্ধি—চিরন্তন আত্মার নিরন্তর কৌতূহল। পশুর সঙ্গে মানুষের তফাৎ এই যে মানুষ তার মান সম্বন্ধে হুঁশ। জীবজন্তুরা কেবল ক্ষুধাতৃষ্ণা মিটিয়েই খুশি কিন্তু মানুষ 'আরো কিছু' চায়। তাই পরিপূর্ণ সুখের মাঝেও অকারণেই তার মন উদাস হয়ে যায়......ঘটনার স্রোতে জীবনটাকে খড়কুটোর মত ভেসে যেতে দেখে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। অস্তিত্বের ভারে সে যখন হাঁপিয়ে ওঠে তখন চারিদিকের কোলাহলের মাঝেও মন প্রশ্ন করে: আমি কে? কোথা থেকে এলাম? কোথায়ই বা চলেছি? অন্তরের এই জিজ্ঞাসা ও তার উত্তরদানের প্রয়াসই দর্শন।

কাজেই কি সাহিত্য, কি দর্শন সর্বত্রই মানুষ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কেবল নিজেকেই জানতে চেয়েছে। সে কখনও জগতের কাছে জীবনকে মেলে ধরেছে, কখনও বা জীবনের মাঝে জগৎকে গুটিয়ে নিয়েছে। কিন্তু জগৎ ও জীবনের ঠিক মাঝখানে একটা স্থান আছে যা মানুষের চির-অপরিচিত। সেখানে জীবন জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থমকে গেছে, সত্তার নীরবতা লক্ষ্য করে আত্মা হয়েছে স্তব্ধ

মানুষের কৌতূহল তার অস্তিত্বের অস্তিত্ব নিয়ে নয়—অস্তিত্বের প্রকৃতি নিয়ে। সে সব কিছুকে জানে কিন্তু জানে না সে নিজেকে—জানে না কি তার চাহিদা···কি তার দাবী···কি-ই বা তার পাওনা। তাই সাধারণতঃ সে যা চায় তা পায় না আর যা পায় তাকে কোনদিনই চায় না। আসলে চাহিদাটাই তার অজানা। যা ক্ষণকালের, কোন রকম না ভেবেই তাকে আমরা চিরকালের ভেবে চেয়ে বসি। তাই চাহিদা থাকে কেন্দ্রে, প্রাপ্তি থাকে পরিধিতে—কেন্দ্র-পরিধির মিলন আর ঘটে না।

মানুষের চাহিদা যে মেটে না, তার কারণ প্রবৃত্তির পীড়নে মানবাত্মা অবিরত ক্ষতবিক্ষত। এই ক্ষতি জীবনকে অশান্ত করে তোলে। কামনা বাসনার পাকে পাকে নিজেকে জড়িত করে আত্মা ভাবে এই তার স্বভাব। সত্যকে পদদলিত করে মিথ্যার আলেয়াকেই আলো ভেবে সে তার পেছনে ছোটে। মদির বাসনার ফেনিলতায় মত্ত জীবাত্মা বিলাসের আপাতমধুরতায় সম্মোহিত হয়···কামনার পূর্তিতে ও ব্যর্থতায় উপচে ওঠে জীবনপাত্র। প্রতিনিমেষের ইচ্ছা, প্রতি মুহূর্তের অস্তিত্ব চেতনাকে পীড়িত করে; বিরহমলিন, লাভ-ক্ষতির টানাপোড়েনে হৃদয় হয় অবসন্ন।

সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব অখণ্ড জীবনকে যখন খণ্ডে খণ্ডে বিচ্ছিন্ন করে, মানুষ তখন জীবনের ফাঁক খ্যাতি-প্রতিপত্তির ফাঁকি দিয়ে ভরতে চায়। সামনে যা পায় তাকেই সে সত্য ভেবে আঁকড়ে ধরে—সে জানে না যে তার কল্পনার পূর্ণ এক বিরাট শূন্যমাত্র। আশা-আকাঙ্ক্ষার তাসগুলো দিয়ে আমরা যে সৌধ গড়ি, কোথাকার এক দমকা বাতাস এক নিমেষেই তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাকার করে। ব্যর্থতার প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে জীবন-স্বপ্ন হয় চুরমার!

কিন্তু এই মোহাবস্থা মানবের চিরন্তন নয়। তার জীবনে মোহ ও মোহভঙ্গ দুইই সমান সত্য। মোহ যখন ভঙ্গ হয় তখন মানবাত্মার গভীর অতৃপ্তি চায় নিবিড় প্রশান্তি। দুঃখ-সুখের দ্বন্দ্বে আমাদের জীবন কেটে যায়···তবু চলার পথে মাঝেমাঝে এমন কতগুলো মুহূর্ত আসে যখন আমাদের থামতে হয়······দুঃখ-সুখের ঊর্ণাজালে বন্দী মন ক্ষণকালের জন্য নিজেকে আনে গুটিয়ে। জীবনপথে চলতে গিয়ে যে মানুষ পেছন পানে তাকায় নি, সমুখের কথাও যে ভাবে নি, সে আজ আচমকা আঘাত খায়—তার গতি হয় ভঙ্গ—জাগে চেতনা। জীবন-মৃত্যুর সাগরসঙ্গমে দাঁড়িয়ে মন প্রশ্ন করে 'আমি কে'? নির্ঝরিণীর কলতানে, পত্রের মর্মরে, বাতাসের গুঞ্জনে অন্তরের ধ্বনি হয় প্রতিধ্বনিত: 'আমি কে'? চিরন্তন নচিকেতা-প্রাণ নিজেকে জানবার জন্য ছটফটিয়ে ওঠে।

কামনার রঙীন স্বপ্ন নিয়ে ভোগ শাশ্বত সত্তার সামনে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু মোহ আজ ভেঙ্গেছে। তাই সুখের আবর্জনা সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে ঠেলে হৃদয় বলে: 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্।' নানাভাবে নানাকাজে পলে পলে মৃত্যুর পালা ফুরিয়েছে; চাহিদা আজ অমৃতের। বল! আমি কে? স্বার্থ দিয়ে

সংস্কার দিয়ে এতদিন যাকে জেনেছি সে ত আমি নই! শূন্যদিগন্তের ভূমিকায় আত্মা আজ নতুন জীবনচ্ছবি আঁকতে চায়! তার জীবনপিপাসা প্রকাশিত হয় প্রার্থনার ব্যাকুলতায়: 'অসতো মা সদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়'! হে অনন্ত তুমি আমার মাঝে প্রকাশিত হও: 'আবীরাবীর্ম এধি'!

অনন্ত প্রকাশিত হয় কখন?—যখন সান্ত নিজেকে চেনে। প্রবৃত্তির পীড়ন এড়াবার একমাত্র উপায় নিজেকে জানা—মনুষ্যত্ব উপলব্ধি করা—স্বভাবকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করা। কিন্তু মনুষ্যত্বলাভের পথ বড় কঠিন। মানুষ ত্যাগের পথে, প্রেমের পথে আপনাকে উপলব্ধি করে।

সুখ-দুঃখকে সমজ্ঞানে উপেক্ষা করে চলতে হয় এপথে। জগতে সবকিছুই বিধাতার দান। গভীর দুঃখ শুধু মানুষেরই জন্য; জীবজন্তুর বেদনা সীমিত। গভীর বেদনা মনুষ্যত্বকে মহীয়ান্ করে। মনুষ্যত্ব কষ্টার্জিত ধন—আঘাত-সংঘাতে, ব্যথাভরা প্রাণের বিনিময়ে পাওয়া সম্পদ। এ সম্পদলাভ দুর্বলের ভাগ্যে ঘটে না—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'।

কেবল সুখ-দুঃখের ঘূর্ণীতে আবর্তিত হবার জন্য মানুষ পৃথিবীতে আসে না—ত্যাগসম্ভূত বিপুল আনন্দেও তার চিরন্তন অধিকার। ত্যাগ বলতে রিক্ততা বা দারিদ্র্য বোঝায় না—বোঝায় শূন্যতার, হীনতার বিসর্জন; নিজের ক্ষুদ্রতাকে দুহাতে ছুঁড়ে ফেলে নিজের সুখ-দুঃখাতীত অন্তহীন আনন্দময় স্বরূপের পথে অভিযান।

হীন প্রবৃত্তি বিনষ্ট হলে অন্তরে জাগে প্রেম। প্রেমে লাভ-ক্ষতির হিসাব-নিকাশ থাকে না—জীবনের সব দ্বন্দ্ব সেখানে ছন্দোলাভ করে। প্রবৃত্তির ভীড়ে মানুষ যখন হারিয়ে যায়, তখন সে নিজেকে খুঁজে পায় না। কিন্তু কোন রকমে ভীড়টা ঠেলেঠুলে নিবৃত্তির প্রান্তরে এসে দাঁড়াতে পারলেই ক্লান্তির অবসান—সেখানে শান্তির মুক্তবায়ু।

প্রেমের পথ পরিক্রমণ শেষে মানুষ যেখানে থামে, সেখানে জীবাত্মা-পরমাত্মার কোন ভেদ আর থাকে না—সেখানে জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় মিশে এক হয়ে যায়—সেখানে দ্বৈত নেই—'কেবলাদ্বৈতম্'।

আত্মা তার অদ্বৈতাবস্থাকে যখন উপলব্ধি করে তখন সে বলে, পেয়েছি! আমার সাধনার ধন, আনন্দের ধন আমি পেয়েছি। চাওয়া আজ পাওয়ার সঙ্গে মিশে এক হল; সীমা ছাড়া পেল অসীমের মাঝে। সত্তাকে উপলব্ধি করে জেনেছি আমিই সেই—'সোঽহম্'! এক জ্যোতির্ময় মহান পুরুষের সন্ধান আমি পেয়েছি—'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'। আর জেনেছি, আমিই সেই পুরুষ।

"'সংসারীর আমি'—'অবিদ্যার আমি', 'কাঁচা আমি' একটা মোটা লাঠির ন্যায়। সচ্চিদানন্দ সাগরের জল ঐ লাঠি যেন দুই ভাগ করছে। 'ঈশ্বরের দাস আমি', 'বালকের আমি', 'বিদ্যার আমি' জলের উপর রেখার ন্যায়। জল এক, বেশ দেখা যাচ্ছে,—শুধু মাঝখানে একটি রেখা, যেন দুভাগ জল। বস্তুতঃ এক জল,—দেখা যাচ্ছে।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

হিন্দু ধর্ম*

অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য

ঊর্ধ্বমূল অধঃশাখ, অব্যয় অশ্বত্থ—সুপ্রাচীন অথচ অবিনশ্বর—জনারণ্যে বিশাল বনস্পতি—দিকে দিকে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা—এখনও প্রাণরসে উচ্ছল—ইহাই হিন্দুসভ্যতা। কালের প্রবাহ, নানা জাতি, নানা সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইহা সাক্ষী। স্মরণাতীত কালে ভারতের এই ঐতিহ্য মহিমময় ঋষি, মনীষী, সন্ত, ভূপতি, দেবমানব পরম্পরার প্রযত্নে রোপিত হইয়া বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া পরিপুষ্ট। নানা জাতি, নানা ভাষা ইহার অবয়ব—সর্ব-সমন্বয়ে রচিত এই জাতি অন্তরে যে প্রতিচ্ছবি ও প্রতিক্রিয়া জাগায় তাহারই মূর্তবিগ্রহ হিন্দুসংস্কৃতি। পূর্ণবিকশিত জাতীয় জীবনের সমস্ত সরঞ্জামে ইহা সমৃদ্ধ। পুণ্যতম বেদ, বিপুল ধর্মশাস্ত্র, বিচিত্র সাহিত্য-সম্ভার, মৌলিক ও প্রায়োগিক বিজ্ঞান, সূক্ষ্মতম শিল্পকলা, নানা দার্শনিক সম্প্রদায়, সুসংহত সমাজ-বিন্যাস ও বিপুল ধর্মানুষ্ঠান—নিখিল মানবসমাজের ইহা চিরস্থায়ী সম্পদ্, চিরন্তন প্রেরণার উৎস মহাদেশের শীর্ষে বিরাজিত হিমালয়-পর্বতশ্রেণী যাহার প্রত্যক্ষ প্রতীক, সেই ভূমা বা বিরাটের অনুভূতি ইহার ধ্রুব তারা। বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের স্বীকার ইহার প্রাণের ছন্দ। সকল অভ্যাগতকে বরণ ইহার সমাজনীতি। যুগে যুগে আততায়ীর অভিযানে ইহা বিপন্ন ও সাময়িকভাবে স্তম্ভিত হইলেও, পুনরায় ইহা স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। বিজাতিকে ইহা আশ্রয় দিয়াছে—হয়ত সে বিজাতি পরে হন্তারক হইয়াছে। বাণিজ্যিক বা সামরিক অভিযানের উদ্দেশ্যে ইহা প্রতিবেশী রাজ্যকে অস্ত্রের ঝনঝনায় বা অগ্নিপ্রয়োগে উদ্বেজিত করে নাই; কিন্তু বহুবিস্তৃত সাংস্কৃতিক উপনিবেশগুলির অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাভক্তি অর্জন করিয়াছে—ধর্মের গৌরব ঘোষণা করিয়া, সর্বত্র সমচিত্ততা ও সান্ত্বনা বিতরণ করিয়া, শান্তির প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা করিয়া। নিজ বৈশিষ্ট্যে ইহা অদ্বিতীয়, প্রাচীনতায় সকলকে অতিক্রম করিয়াছে; অমর প্রাণশক্তিতে সমকক্ষ ও সমকালীনদের পশ্চাতে ফেলিয়াছে। অসীমের ও চরমতত্ত্বের সন্ধানে সর্বসমন্বয়ী তথ্যের প্রতি-পাদনে জাতির ও প্রকৃতির সীমান্ত উল্লঙ্ঘন করিয়া আত্মপ্রসারে, জগৎকল্যাণের পথে আপনার মুক্তির সাধনায় ইহা অনুপম। এই সাংস্কৃতিক আদর্শ মানবজাতির সেবা ও মানবতার মহিমা স্থাপনে—অদ্বিতীয়। সত্যাবিষ্কারের ক্রমিক সম্প্রসারণের লক্ষণে ইহা চিহ্নিত। সত্যলাভের একটি মাত্র পন্থা আবিষ্কার করিয়াই ইহার শক্তি নিঃশেষিত হয় নাই—পরপর আবির্ভূত আপনার প্রতিভূ সন্তানগণের মনন ও সাধনের দ্বারা সত্যের বীথি ইহা প্রশস্ততর করিয়াছে। অখণ্ড বাস্তববোধের প্রজ্ঞায় প্রারম্ভ হইতে ইহা চালিত হইয়াছে, সত্য স্বীকারের উন্মুখতা ইহার স্বভাব। তাই ঋত বা বিশ্ব-নিয়মতন্ত্র এবং সত্য বা কায়মনোবাক্যে বাস্তব-সঙ্গতি ইহার প্রথম উদ্ভাবন। যুগে যুগে নিজ অনুগামীদের সংহত, সংগঠিত করার জন্য, বৈচিত্র্যের মাঝে সামঞ্জস্য-সাধনের জন্য ইহা প্রয়াসী; তাহাতেই ইহার যতকিছু

* 'বিশ্বহিন্দুপরিষৎ' সভায় পঠিত।

সংস্কার ও পরিবর্তন। কিন্তু সকল বাহ্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাঝে নিজ অপরিবর্তিত অন্তরাত্মাকে ইহা কখনও হারায় নাই—তাই সনাতন হিন্দু ইহার নাম।

চিরন্তন ধর্মের উপাদান—সত্য, তপস্যা, শৌচ, করুণা ও ত্যাগ—ইহার অবিচল প্রত্যয় ও নিষ্ঠার বস্তু প্রাণের সকল আধার ও প্রকাশের অলঙ্ঘ্য মূল্য ও মর্যাদার এবং মানবাত্মার সকল সত্য অনুভূতির যথার্থতা-বোধ—ইহার মূল প্রত্যয়। সৎপদার্থ এক—জ্ঞানিগণ নানাভাবে উহা ব্যক্ত করিয়া থাকেন—ইহাই বিশ্বাসের বনিয়াদ। সকল জীব আমাকে মিত্রের চক্ষে যেন দেখেন—আমি যেন সকল জীবকে মিত্রের চক্ষে দেখি—সমাজ-সম্পর্কের এই ছিল মূলসূত্র। এই পরিবেশের মধ্যে যে সকল মহামনীষী উদ্ভূত হন, তাঁহারা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং সর্ববিরোধের সমন্বয়ের অনুশীলনে প্রয়াসী ছিলেন। এই জন্য হিন্দু সংস্কৃতির ও সংগঠনের লক্ষ্য এহেন নীতি-তন্ত্র এবং জীবনচর্যা, যাহাতে 'সকল মানবই ভাই, সমস্ত জগৎই স্বদেশ, বসুধাই কুটুম্ববৎ'—এ আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হইতে পারে। উদার সমীক্ষা, বিশ্বজনীন মনোভাব ইহার চিন্তার গতি নিয়মিত করে। ইহার নানা কক্ষে রচিত মহা সৌধে বহু বিচিত্র সম্প্রদায়, মতবাদ ও বিশ্বাস স্বচ্ছন্দে প্রতিবেশী-সুলভ সম্প্রীতিতে একত্রে বাস করিয়াছে। হিন্দু সমাজের বক্ষে স্থান পাইয়াছে একান্ত বিপরীত সিদ্ধান্তের পরিপোষক জনগণ—অদ্বৈত, দ্বৈত ও নানাত্ববাদী, আস্তিক ও নাস্তিক এবং বিশ্বাত্মবাদী, অচিৎ ও চিন্ময়-বাদী এবং অনাদিস্পষ্ট জড়বাদী, ভক্তি ও কর্মমার্গী, যোগী ও সন্ন্যাসী, নীতিবাদী, জড়োপাসক এবং আদিম দেবপূজক; বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, আর্য, ব্রাহ্ম, প্রার্থনা-সমাজ। যুগে যুগে শৈব, সৌর, বৈষ্ণব ও শাক্ত, যাঁহারা জনসাধারণের অন্তরে চরম সত্য ও অধ্যাত্ম আলোক ও পরমানন্দের বার্তা বহন করিয়াছেন, ভারতের পুণ্যভূমি এবং অধ্যাত্ম-ভাণ্ডার হইতে যাঁহারা নিজ নিজ বিশ্বাস সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে ইহা বাহুপাশে বদ্ধ করিয়াছে। তাঁহাদের তীর্থ, মন্দির, মঠ ও আশ্রম প্রাকৃতিক সৌ নিকেতনের মুকুটস্বরূপ হইয়া হিন্দুমনের বিরাট রূপের পবিত্রতাবোধের সাক্ষ্য দেয়। হিন্দুর মজ্জাগত নৈতিক ভাবরাজি, ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা, অহংকার-নিরোধ, সরল তাপস জীবনে শ্রদ্ধা, আত্মার বিভূতি, প্রপঞ্চের অন্তরালে বিভুসত্তা—এ সকল তাহার পরিচয় প্রদান করে। দীর্ঘকাল এসিয়া মহাদেশের শস্যভাণ্ডার ছিল ভারত, এবং নিজ অপর্যাপ্ত সম্ভার হইতে দেশান্তরে ক্ষুধার অন্ন এবং প্রজ্ঞার ভাণ্ডার হইতে জ্ঞানরাশি সে বিতরণ করিয়াছে। মানবিকতার সর্বোচ্চ আদর্শ চরমতত্ত্বের ও উদার ভাবের কৃষ্টি বিস্তারে ভারত ছিল অগ্রদূত।

মানববুদ্ধিগম্য এবং উহার অতীত তত্ত্বসমূহ এই যজ্ঞবেদীর হোমাগ্নি হইতে শিখার মত উৎপতিত হইয়া বিস্তৃত ভূভাগে বিসর্পিত হয়। ...বহু শতাব্দীর নিদ্রামগ্নতার এবং পার্থিব অভ্যুদয়ে ঔদাসীন্যের পর ভারত এখন স্বাধীন এবং সচেতন—আজ সে আন্তর্জাতিক বিনিময় ও ব্যবহারের চতুষ্পথে দাঁড়াইয়াছে—আধুনিক জগতের আহ্বান তাহার সম্মুখে। পৃথিবী আজ আকারে সংকুচিত ও শীর্ণ। আত্মরক্ষার আকুলতায় সকলে আজ সজাগ ও ক্রিয়াশীল অতীতের যে সকল সভ্যতা আজও সজীব—ইহুদী ও মঙ্গোলীয়, আরব ও আংলোস্যাক্সন, স্লাভ ও টিউটন ও

ল্যাটিন এবং সাথে সাথে এসিয়া ও আফ্রিকার সদ্যোমুক্ত জাতিগুলি আজ তাহাদের আত্মীয়তা-বন্ধন নবভাবে গ্রথিত করিতেছে—ধর্মের শৃঙ্খল দৃঢ় করিতেছে এবং সাজাত্যের বৈশিষ্ট্য জগতে প্রস্ফুট করিতেছে। অখিল ইস্লামীয় সংঘ, বিশ্ব-বৌদ্ধ সম্মেলন, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত রোমীয় ধর্মগুরুর উপস্থিতিতে ক্যাথলিক সমাবেশ—এগুলি মানবসমষ্টির মধ্যে উদ্বুদ্ধ আত্মসম্বিতের লক্ষণ ও প্রকাশ এবং ধর্ম যে বিভাজক নহে, সংযোজক-শক্তি তাহার প্রমাণ। জগৎময় মানব-মনোবৃত্তির এই নূতন পরিবেশের মাঝে বিশ্বহিন্দু-পরিষৎ ভারতমাতার সন্তানদিগকে—সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর যে প্রান্তেই তাঁহারা প্রবাসী হউন বা স্থায়িভাবে বাস করুন না কেন, তাঁহাদের অন্তরে ঐক্যের আহ্বান শুনাইতে, তাহার উপযুক্ত ক্ষেত্রের আয়োজন করিতে উদ্যোগী। মহাভারতের স্মৃতি বৃহত্তর ভারতের সংযোগ-সূত্র। হিন্দু সংস্কৃতির উদার আলোক ও উদাত্ত বাণীর যাঁহারা দূত এবং বার্তাবহ, তাঁহাদের মহনীয় আদর্শ উদ্দীপিত করাই ইহার উদ্দেশ্য। বিশ্ব-কবির ভাষায়—"ভারতের জরাবিহীন জাগ্রত ভগবান্ আজ আমাদের আত্মাকে আহ্বান করিতেছেন, যে আত্মা অপরাজিত, অমৃতলোকে যাহার অনন্ত অধিকার।" গগন-বিস্তার ব্যাপিয়া তাঁহার শাশ্বত আহ্বান ধ্বনিত হইতেছে—উদ্বুদ্ধ করিতেছে—আত্মানং বিদ্ধি—আপনাকে জান। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত। সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী, সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্। সমানং মন্ত্রমভি-মন্ত্রয়ে বঃ, সমানেন বো হবিষা জুহোমি। এক হোক মন্ত্র, এক সংসদ, এক মন, এক আকূতি, এক মন্ত্রে তোমাদের অনুপ্রাণিত করি, এক আহুতি তোমাদের উদ্দেশ্যে অর্পণ করি।

দৃষ্টিভঙ্গি

ডাঃ শ্রীশচীন সেনগুপ্ত

দশজনে যাহা কভু
করিতে না পারে,
সে কাজ করিয়া দম্ভ
করি বারেবারে।

যাঁহার শকতি লয়ে
তনু-মন-প্রাণ
চেতনা-বিভায় ভাসে,
হয় শক্তিমান,

এ বিশ্ব ভুবন চলে
তাঁহারই ইচ্ছায় ;
একথা স্মরিলে দম্ভ
দাঁড়ায় কোথায় ?

রামায়ণ-প্রসঙ্গ

[পূর্বানুবৃত্তি]

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

(রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ও রাজ্যাভিষেক)

লঙ্কানগরীতে সেই রাত্রি আনন্দে অতিবাহিত হইল। পরদিন প্রভাতে বিভীষণ আসিয়া করজোড়ে নিবেদন করিলেন, রাজ্যের শ্রেষ্ঠ মহিলাগণ স্নানের জল, বিবিধ মাল্যচন্দন, অঙ্গরাগ ও উৎকৃষ্ট বসন এবং আভরণ লইয়া সমাগত। সকলেরই হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা, রামচন্দ্রকে রাজ-বেশে সজ্জিত দেখেন। রামচন্দ্র বলিলেন, তিনি বনবাসে রহিয়াছেন বলিয়া মহামতি ভরতও তপস্বীর বেশ ধারণ করিয়া আছেন। সুতরাং তাঁহার বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হওয়া উচিত নহে। ভরত তাঁহাকে বনবাস হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য চিত্রকূট পর্বত পর্যন্ত অসিয়াছিল, তথাপি তিনি তাহার অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। চতুর্দশবর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। যাহাতে তিনি সত্বর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন বিভীষণ তাহার ব্যবস্থা করুন।

যাত্রার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। বহুবিধ উপচারে বিভীষণ রাম ও লক্ষ্মণকে যথাবিহিত পূজা করিলেন। রামচন্দ্রের নির্দেশে বানর-গণকেও বিবিধ ধনরত্ন দ্বারা সম্মানিত করিলেন—তাহাদের বিক্রমের ফলেই তিনি লঙ্কার অধিপতি। রামচন্দ্র বিভীষণের নিকট হইতে বিদায় লইতে গিয়া বলিলেন—আমি তোমাকে ত্যাগী, সংগ্রহীতা, দয়াবান্ ও মনস্বী বলিয়া অবগত আছি। হে ধর্মপ্রবর রাক্ষসরাজ, আমি তোমাকে লঙ্কারাজ্য প্রদান করিলাম।

তারপর তিনি সুগ্রীবের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন,

যৎ তু কার্যং বয়স্যেন স্নিগ্ধেন চ হিতেন চ।
কৃতং সুগ্রীব তৎ সর্বং ভবতা ধর্মচারিণা॥
কিষ্কিন্ধ্যাং গচ্ছ সুগ্রীব স্বরাজ্যমনুপালয়।

—হে সুগ্রীব, স্নিগ্ধ ও হিতাকাঙ্ক্ষী বয়স্যের যাহা কর্তব্য, ধর্মপরায়ণ তুমি তাহা সমস্তই করিয়াছ। এক্ষণে কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিয়া স্বরাজ্য পালন কর। সমবেত বানরগণকে রামচন্দ্র বলিলেন, আমি অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিতে চাই, তোমরা সকলে অনুমতি প্রদান কর।

কিন্তু দলবলসহ বিভীষণ ও সুগ্রীবের মনোগত অভিপ্রায় রামচন্দ্রের সহিত অযোধ্যায় গমন করিয়া তাঁহার রাজ্যাভিষেক দর্শন করেন। আনন্দ সহকারে রামচন্দ্র তাহা অনুমোদন করিলেন। অবশেষে সকলে যাত্রা করিলেন। যাইবার পথে রথে উপবিষ্ট রামচন্দ্র সীতাকে ত্রিকূট পর্বতের শিখরে অবস্থিত লঙ্কানগরী এবং যুদ্ধের বিভিন্ন স্থল দেখাইতে লাগিলেন। যে পথ দিয়া রামচন্দ্র সসৈন্যে লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছিলেন সেই পথ দিয়াই ফিরিয়া চলিলেন। সেতু উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য, তারপর গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত অগস্ত্য ঋষির আশ্রম এবং শরভঙ্গ ও অত্রি ঋষির আশ্রম অতিক্রম করিয়া তাঁহারা মন্দাকিনী তীরস্থিত চিত্রকূট পর্বত সমীপে উপনীত হইলেন। পরিচিত স্থানগুলির পুনর্দর্শনে এবং পুরাতন স্মৃতিচারণে তাঁহাদের চিত্ত কখনও

আনন্দে, কখনও বিষাদে অভিভূত হইল। অবশেষে দূর হইতে ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রম দেখা গেল। রামচন্দ্র বলিলেন—

ইয়ঞ্চ দৃশ্যতে সীতে গঙ্গা ত্রিপথ-গামিনী।
শৃঙ্গবেরপুরঞ্চৈব গুহো যত্র সখা মম॥
ইঙ্গুদীমূলমেতচ্চ দৃশ্যতে তনুমধ্যমে।
একরাত্রোষিতা যত্র তীর্থ্বা ভাগীরথীং বয়ম্॥

সীতা, ঐ দেখ ত্রিপথগামিনী গঙ্গানদী এবং শৃঙ্গবেরপুর দেখা যাইতেছে, যেখানে আমার সখা গুহ বাস করেন। আর ঐ যে ইঙ্গুদীমূল দেখা যাইতেছে, ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া আমরা একরাত্রি এখানে বাস করিয়াছিলাম।

ভরদ্বাজও রামচন্দ্রের প্রতীক্ষায় ছিলেন, কবে তিনি বনবাসান্তে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিবেন। অযোধ্যা হইতে ভরদ্বাজের আশ্রম অধিক দূরে নহে, সেজন্যই ঋষিপ্রবরের অনুরোধ সত্ত্বেও রামচন্দ্র তাঁহার আশ্রমসমীপে বাস করিতে স্বীকৃত হন নাই। যথাযোগ্য অভিবাদনান্তে রামচন্দ্র ভরদ্বাজকে অযোধ্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রজাবর্গ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ও সুস্থ আছে তো? ভরত কি রাজকার্যে নিযুক্ত আছেন? মাতৃগণ জীবিত আছেন কি না।

ভরদ্বাজ সব সংবাদ দিলেন, রাজধানীতে ও গৃহে সর্বাঙ্গীণ কুশল। জটা ও চীরধারী ভরত রামচন্দ্রের পাদুকাযুগল সম্মুখে রাখিয়া তাঁহারই প্রতীক্ষায় রাজকার্যে মগ্ন। তারপর রামচন্দ্রকে সম্ভাষণ করিয়া ঋষি বলিলেন,

যৎ পুরা চীরবসনং ত্বাং দৃষ্ট্বা বনবাসিনম্।
কারুণ্যমভবদ্ ভূয়ো মমেহ সমিতিঞ্জয়॥
তৎ সম্প্রতি সমৃদ্ধার্থং সমিদ্ধমিব পাবকম্।
সমীক্ষ্য বিজিতারিং ত্বাং মম প্রীতিরনুত্তমা॥

—হে যুদ্ধজয়িন্, পূর্বে বল্কল-পরিহিত বনবাসী তোমাকে দেখিয়া আমার অত্যধিক শোকের উদ্রেক হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় শত্রুবিজয়ী সেই তোমাকে সফল-মনোরথ দেখিয়া আমি অতিশয় আনন্দিত।

তাঁহারা রামের কার্য সমস্তই অবগত আছেন—জনস্থানে বহু রাক্ষস নিধনপূর্বক তাপস-গণকে রক্ষা করা, রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ, সুগ্রীবের সহিত রামের বন্ধুত্ব ও বালিবধ, পবননন্দন মহাবীরের সমুদ্রলঙ্ঘনরূপ অদ্ভুতকার্য ও সীতার সংবাদ আনয়ন, নল কর্তৃক সমুদ্রে সেতু-বন্ধন, অবশেষে রাবণ-নিধনে বিভীষণের রাজ্যাভিষেক, সীতার অগ্নিপরীক্ষা এবং দেব ও ঋষিগণের রামচন্দ্রকে সাধুবাদ প্রদান।

ভরদ্বাজের অনুরোধে রামচন্দ্র তাঁহার আতিথ্য গ্রহণপূর্বক সেইরাত্রি আশ্রমে অতিবাহিত করিলেন। পরদিন সূর্যোদয়ের পূর্বে তিনি মহাবীরকে অযোধ্যায় প্রেরণ করিলেন। মহাবীর যেন ভরতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রামচন্দ্রের সকল বার্তা নিবেদন ও তাঁহার আগমন ঘোষণা করেন। শৃঙ্গবেরপুরের বনচারী নিষাদরাজ গুহ রামচন্দ্রের প্রাণতুল্য বন্ধু, তাহাকেও সংবাদ দিতে হইবে। মুখভঙ্গী, দৃষ্টি ও আলাপ-আলোচনা হইতে মহাবীর যেন ভরতের মনোভাব জানিবার চেষ্টা করেন। পুরুষানুক্রমিক সমৃদ্ধ রাজ্যলাভে মনের গতি পরিবর্তিত হওয়া বিচিত্র নহে।

সঙ্গত্যা ভরতঃ শ্রীমান্ রাজ্যেনার্থী ভবেদ্ যদি।
প্রশাস্তু বসুধাং সর্বাং চিরায় রঘুনন্দনঃ॥

—দীর্ঘকাল রাজ্যের সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীমান্ ভরত যদি রাজ্যাভিলাষী হইয়া থাকেন, তবে তিনিই চিরকালের জন্য সমগ্র পৃথিবী শাসন করুন।

প্রকৃতপক্ষে ভরতের উপর রামচন্দ্রের আস্থা পূর্ববৎ অটুট ছিল। কারণ উপরোক্ত নির্দেশ দিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলেন—ভরত নরশ্রেষ্ঠ,

তাহার অন্তঃকরণ পূর্বে এরূপ কখনও হয় নাই এবং আমার বিশ্বাস বিধাতাকৃত মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া সে কদাপি সৎপথ হইতে বিচলিত হইবে না।

হৃদয়েনাভিজানামি ভরতস্য তু হৃদ্‌গতম্।
মন্নিমিত্তমপি প্রাণাংস্ত্যজেন্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥

—আমি আমার মন দিয়া ভরতের মনোভাব অবগত আছি, সে আমার জন্য প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগে সর্বদা প্রস্তুত, ইহাতে কোন প্রকার সংশয় নাই। তাহার দোষ অনুসন্ধান করাই অন্যায়, তথাপি নীতিশাস্ত্রানুযায়ী আমি এই সংবাদ লইতে চাহি।

রামচন্দ্র আরও বলিয়া দিলেন, তাঁহাদের অযোধ্যার পথে অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্বেই যেন মহাবীর ভরতের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে সকল কথা নিবেদন করেন।

মহাবীর নন্দীগ্রামে ভরতকে দর্শন করিলেন —কৃষ্ণাজিন-পরিহিত, কৃশকায়, জটাধারী ভরত সিংহাসনে রামচন্দ্রের পাদুকাযুগল স্থাপন করিয়া আমাত্যগণের সহিত রাজকার্য পরিচালনে ব্যাপৃত।

মহাবীরের নিকট রামচন্দ্রের সমুদয় বার্তা শ্রবণ করিয়া ভরত ক্ষণকালের জন্য আত্মহারা হইলেন; পরে আনন্দাশ্রুবর্ষণের দ্বারা মহাবীরকে অভিষিক্ত করিয়া বলিলেন,—হে সাধো, প্রিয়-সংবাদ দানকারী তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাই প্রদানে আমি প্রস্তুত,

বহূনামপি বর্ষাণাম্ ইদং শ্রুতিরসায়ণম্।
শৃণোম্যহং প্রীতিকরং যন্নাথস্যাদ্য দর্শনম্॥

মুহূর্তমধ্যে চতুর্দিকে সংবাদ প্রচারিত হইয়া গেল, দীর্ঘ চতুর্দশ বর্ষ বনবাসান্তে রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিতেছেন তাঁহার সংবর্ধনার আয়োজন চলিতে লাগিল। মঙ্গল-বারি-কলস ও পতাকা শোভিত প্রতি গৃহে জনগণ পবিত্র হইয়া দেবতার অর্চনায় রত হইল। রাক্ষসগণের বেদপাঠে ও বৈতালিক-গণের মাঙ্গলিক স্তুতিতে মুখরিত হইয়া উঠিল সমগ্র রাজধানী। নন্দীগ্রাম হইতে অযোধ্যা পর্যন্ত পথ পত্রে-পুষ্পে অপূর্ব শ্রী ধারণ করিল। তারপর আমাত্যগণ বেদপাঠরত ব্রাহ্মণ ও মাল্যধারী নাগরিকগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া, জনগণের আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত পথ ধরিয়া ভরত অগ্রসর হইলেন রামচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য। তাঁহার মস্তকে রামের পাদুকাদ্বয়, তাহার উপর শুভ্রমাল্যভূষিত শ্বেতছত্র। কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ী অন্যান্য রাজপুরবাসিনীগণের সহিত রথে আরোহণ করিয়া অগ্রসর হইলেন। অশ্বের খুরের শব্দের সহিত মিলিত হইল রথচক্রের শব্দ। শঙ্খ ও দুন্দুভি নির্ঘোষে প্রকম্পিত হইল চতুর্দিক। সমগ্র অযোধ্যানগরী যেন রামচন্দ্রকে দেখিবার জন্য নন্দীগ্রামে আগমন করিল। একদিন সমগ্র পুরবাসী অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে রামের সঙ্গে নগরীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত আসিয়াছিল। আজ হর্ষোৎফুল্ল জনতা তাঁহার সংবর্ধনার জন্য আনন্দধ্বনি সহকারে উপস্থিত। অধীর ভরত বারংবার হনুমান্‌কে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র সত্যই আসিতেছেন কি! কে জানে, হনুমান্ বানরসুলভ চাপল্যবশতঃ অর্থহীন উক্তি করিয়াছেন কি না!

অবশেষে রামচন্দ্রের রথ দেখা গেল। নরনারীর সম্মিলিত কণ্ঠের 'ঐ রাম, ঐ রাম' চীৎকারে আকাশ-বাতাস প্রতিধ্বনিত হইল। রথ আসিল, প্রণত ভরতকে রামচন্দ্র আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন। নাগরিকবৃন্দ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল, 'কৌশল্যানন্দবর্ধন মহাবাহু রামচন্দ্র, আপনার আগমন শুভ হউক।' ভরত স্বয়ং পাদুকাযুগল রামচন্দ্রের পদদ্বয়ে পরিধান

করাইয়া বলিলেন—আপনার গচ্ছিত রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলাম। আপনার আদেশে ভয়ে ভয়ে আমি উহা গ্রহণ করিয়াছিলাম সুখার্থী হইয়া নহে।

সুমন্ত্র একদিন রথে করিয়া রামচন্দ্রকে বনমধ্যে রাখিয়া আসিয়াছিল। দীর্ঘ বনবাসান্তে সুমন্ত্র আবার সুসজ্জিত রথ লইয়া উপস্থিত। ভরত অশ্বের রশ্মি ধারণ করিলেন, শত্রুঘ্ন রামের মস্তকে ছত্র ধারণ করিলেন, লক্ষণ শ্বেত চামর লইয়া বীজন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণের বেদপাঠ, বন্দিগণের স্তুতি, মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনি ও পুষ্প এবং লাজ বর্ষণের মধ্য দিয়া শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় উপনীত হইলেন।

পরদিন প্রভাতে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক হইল। চতুর্দশ বর্ষ পূর্বে রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন দশরথ। তাঁহার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। রাজ-সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া সেদিন রামচন্দ্রকে বনবাসে যাইতে হইয়াছিল। তাঁহাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার আকাঙ্ক্ষা প্রজাগণের এতদিন পরে পূর্ণ হইল :

ততঃ প্রভাতে বিমলে মুহূর্তেঽভিদিতি প্রভুঃ।
বশিষ্ঠঃ পুষ্যযোগেণ ব্রাহ্মণৈঃ পরিবারিতঃ॥
রামং রত্নময়ে পীঠে প্রাঙ্মুখং সহ সীতয়া।
উপবেশ্য মহাত্মানং মহর্ষিবিহিতেন তু॥
শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা স তদা বিধিবদ্দ্বিজঃ।
রাঘবস্যাভিষেকার্থং স দ্বিজেভ্যো ন্যবেদয়ৎ॥

—অনন্তর প্রাতঃকালে পুষ্যা-নক্ষত্রযোগে শুভ সন্ধি-মুহূর্তে রাজপুরোহিত বশিষ্ঠদেব সীতার সহিত মহাত্মা রামচন্দ্রকে রত্নময় আসনে পূর্বমুখে উপবেশন করাইলেন এবং শাস্ত্রনির্ধারিত বেদবিহিত বিধানানুসারে অভিষেকার্থে ব্রাহ্মণগণকে নিবেদন করিলেন।

দীর্ঘ শ্মশ্রু ও জটা মোচন করিয়া স্নানান্তে দিব্যগন্ধলেপন ও বহুমূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত রামচন্দ্র সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। রত্নহার ও উজ্জ্বল কুণ্ডলধারণে তাঁহার দেহ অপূর্ব শ্রী ধারণ করিল। বশিষ্ঠ, বামদেব, গোতম, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি পুরোহিতগণ এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ নির্মল, সুগন্ধি তীর্থসলিল দ্বারা রামচন্দ্রকে অভিষিক্ত করিলেন। শত্রুঘ্ন তাঁহার মস্তকে মঙ্গলসূচক শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিলেন। সুগ্রীব, বিভীষণ চামরদ্বারা বীজন করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ বিজয়াশীর্বাদে উন্নতি কামনা করিয়া স্তব করিলেন। দেব-গন্ধর্বগণের সঙ্গীতে ও অপ্সরাগণের নৃত্যে রাজসভা মুখরিত হইয়া উঠিল। সিংহাসনে উপবিষ্ট রামচন্দ্র ব্রাহ্মণগণকে বহুবিধ দান করিলেন, প্রার্থিগণের মনোরথ পূরণ করিলেন। বানরদল সহ সুগ্রীব এবং রাক্ষসাধিপতি বিভীষণ বহুভাবে সমাদৃত হইলেন। জনকনন্দিনী সীতা নিজের গলা হইতে কণ্ঠহার উন্মোচন করিয়া রামচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। রামচন্দ্র বলিলেন—মৈথিলী, তুমি যাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছ তাহাকেই কণ্ঠহার প্রদান কর।

পুরুষকার, পরাক্রম এবং বুদ্ধি, এই তিন বিষয়ে মহাবীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে? সীতা সেই পবন-নন্দন বীর হনুমান্‌কে কণ্ঠহার উপহার দিলেন।

একমাসকাল অযোধ্যায় অতিবাহিত করিয়া অবশেষে প্রচুর ধনরত্ন সহ বানরগণ ও রাক্ষসগণ বিদায় প্রার্থনা করিল। রামচন্দ্রের বিচ্ছেদ-দুঃখে সকলেই কাতর। প্রস্থানোদ্যত হনুমানকে রামচন্দ্র সস্নেহে বলিলেন—বানরপুঙ্গব হনুমান্, আমি তোমাকে বিশেষ সৎকার করি নাই। তুমি মহৎ কর্ম সম্পন্ন করিয়াছ, অতএব অদ্য তুমি বর গ্রহণ কর।

আনন্দাশ্রুপূর্ণ নেত্রে মহাবীর তখন বলিলেন—প্রভু যদি আমাকে বরপ্রদানে অভিলাষী হইয়া

থাকেন, তবে এই বর দিন, যে পর্যন্ত পৃথিবীতে রামনাম প্রচারিত থাকিবে সে পর্যন্ত যেন আমার দেহে প্রাণ থাকে—

যাবদ্ রামকথা দেব পৃথিব্যাং প্রচরিষ্যতি।
তাবদ্ দেহে মম প্রাণাস্তিষ্ঠন্তু বরদোঽসি চেৎ॥

উত্তরে রামচন্দ্র বলিলেন—এবং ভবতু ভদ্রং—তাহাই হউক, তুমি অমর হও। রামচন্দ্রের বরপ্রদান নিষ্ফল হইতে পারে না। অদ্যাপি সমগ্র ভারতে রামভক্তদিগের হৃদয়ে নিত্য অধিষ্ঠিত এবং পূজিত হনুমান্ অমর হইয়া রহিয়াছেন।

রামচন্দ্র রাজা হইলে ভরত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। রামচন্দ্রের রাজ্যশাসন সম্বন্ধে জানা যায়, তিনি ভ্রাতৃবর্গের সহিত প্রতিদিন স্বয়ং রাজকার্য পরিচালনা করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে ভারত ধনধান্যে সমৃদ্ধিশালী এবং প্রজাবর্গ সন্তুষ্ট ও ধর্মপরায়ণ ছিল। ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণ স্ব স্ব কর্ম পালনপূর্বক স্বধর্মে প্রবৃত্ত ছিল। তিনি অশ্বমেধ প্রভৃতি বহুবিধ বৃহৎ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। সংক্ষেপে বলা যায়, রামচন্দ্র আদর্শ নৃপতি ছিলেন এবং রামরাজ্যে সকলেই সুখে ও শান্তিতে বাস করিতেন।

ফলশ্রুতি

শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত

আনন্দ তোমার আছে হে পৃথিবী, আনন্দের টানে
বীজের অঙ্কুর হ'তে গাছ লতা বের হ'য়ে আসে
পুষ্পের স্তবক নিয়ে : নদী বয়ে যায় কলোচ্ছ্বাসে,
নক্ষত্রের নীহারিকা ভূমার কি প্রতিচ্ছবি আনে!
পিতামহ দিনগুলি আনন্দের সেই মন্ত্র জানে,
সেই উত্তরাধিকার আজও পাই বুকের আবাসে ;
'হৃদে আবির্ভূত হও'—অন্তরের ডাক তাই ভাসে,
'তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং' এই সুর তাই জাগে প্রাণে।

এর মাঝে বেদনার অন্তশ্চারী সে-প্রবাহ জাগে
সেও নয় অবজ্ঞেয় ; অস্তিত্বের প্রশ্নের বেদনা :
কোথায় ছিলাম আমি, কোথা যাবো, কে করলো রচনা,
কে পাঠালো এই বিশ্বে কি জন্যে বা কোন্ অনুরাগে ?
কিছু তো উত্তর নেই, মনের কেবল আনাগোনা :
পৃথিবীর ফলশ্রুতি তাই শুধু আনন্দবেদনা।

পঞ্চবটী

অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

দূর থেকে দেখতে পেলাম পঞ্চবটীর তলায় আভূমিপ্রণত এক সন্ন্যাসী। অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম সেরে শান্তভাবে একটি পাশে বসে রইলেন। পাশে কল্লোলবাহিনী গঙ্গা, মাঝে মাঝে একটি দুটি পাতা ঝরে পড়ছে, মাটিতে ছায়ারৌদ্রের খেলা।

সামনে নহবত, পার হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘর, সে ঘর পেরিয়ে মন্দির-অঙ্গন, দ্বাদশ শিব, রাধাকান্ত, ভবতারিণী মা। আবার ঘুরে ফিরে পঞ্চবটীতে এলাম। সেই সন্ন্যাসীটি স্থির ধ্যানে আসীন; সামনে লোকজন ঘুরছে ফিরছে। কেউ গল্প করছে, অনতিদূরে কোন তরুণদলের চড়ুইভাতির কলরব, কোন ধনাঢ্য মোটরবিহারীর বিস্তৃত শতরঞ্চিতে তাস ও ট্রান্সিস্টারের আয়োজন। ভীড় আরো বাড়বে। আজ ছুটির দিন।

ফিরে এসে গঙ্গার সামনে একে একে জড়ো হওয়া নৌকাগুলির দিকে চেয়ে রইলাম। এখান থেকে নৌকো করে শ্রীরামকৃষ্ণ কতদিন কলকাতা ও তার আশেপাশে কত জায়গায় গিয়েছেন শেষ যাওয়া সেই পাণিহাটির মহোৎসবে।

এই পথ দিয়ে তিনি কতবার এসেছেন, গিয়েছেন! এই পঞ্চবটী থেকে মায়ের মন্দির—এই পথটিই তো তাঁর একান্তপথ। সব সাধনার শুরু ও শেষ—মৃন্ময়ী, চিন্ময়ী, মানবী—সব মূর্তিতে মায়ের আরাধনার সঙ্কল্প এই পথে যেতে আসতে। কোন দিব্যমুহূর্তে মহাজননীর প্রকাশ ঘটেছিল পাষাণমূর্তির মাঝখানে। এই গঙ্গার তীরে তাঁর ব্যাকুল কান্নার উত্তরে পরমপ্রার্থিতা জননী সন্তানকে চিরদিনের জন্য অভয়অঙ্কে স্থাপন করে নবযুগের উদ্বোধন ঘটালেন। কিন্তু সে পূজার পরিপূর্ণতা মানবীদেহে তাঁর পূজাগ্রহণে। ফলহারিণী কালিকাপূজার পুণ্যতিথিতে সহধর্মিণী সারদাদেবীর চরণে উৎসর্গিত হল এতকালের তপের ফল, জপের ফল, যা কিছু ফল অফল।

এই পঞ্চবটীতেই সেই মাতৃসাধনার সূত্রপাত, ক্রমবিকাশ। শুধু মাতৃসাধনার কেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার বেশীর ভাগ এই পঞ্চবটীতে অনুষ্ঠিত। এইখানেই প্রথম জনমদুখিনী সীতার আবির্ভাব, দাস্য ও বাৎসল্যভাবে শ্রীরামচন্দ্রের আরাধনা, চৌষট্টিতন্ত্রের সর্বস্তরের সাধনা, সখ্য ও মধুরভাবে কৃষ্ণতন্ময়তা। আবার এইখানেই একদিন নির্বিকল্পধ্যানমগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃমূর্তি অতিক্রম করে অদ্বৈত ব্রহ্মসত্তায় লীন হয়ে গেলেন। রূপ থেকে রূপাতীত সমাধিলোকে মহাযাত্রার সব পদচিহ্ন এই পঞ্চবটীর চারপাশে। আবার সত্যের অদ্বয় উপলব্ধির পরেও লীলানন্দময় শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তসঙ্গ ও আদর্শমানবজীবনগঠনের শুভসাধনার অন্যতম পীঠস্থান এই পঞ্চবটী নরেন্দ্রনাথ, রাখাল, লাটু—সকলের ক্ষেত্রেই এই পঞ্চবটীতে সাধকজীবনের সূচনা। দক্ষিণেশ্বর থেকে বেলুড় অবধি এই পঞ্চবটীরই প্রসারিত ছায়া।

আড়াই হাজার বছর অগে নিরঞ্জনাতীরে শাক্যসিংহ বসেছিলেন বোধিদ্রুমতলে সে মূল বৃক্ষ নেই, কিন্তু তারই অগণিত শাখা-প্রশাখার অভিযান হয়েছে নানা দেশে, নানা

মনে। সেই সূত্রে বোধিতরু আবার ফিরে এসেছে ভগবান বুদ্ধের সাধনভূমিতে।

সামান্য পরিবর্তন হলেও দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী এখনো তার মূল জায়গায়ই রয়ে গেছে; এখনও তার শিরায়, শাখায়, নেমে আসা ঝুরির ফাঁকে ফাঁকে, কোথাও না কোথাও শ্রীরামকৃষ্ণস্পর্শের আনন্দ-শিহরণ সঞ্চারিত।

আমরা যারা তাঁকে দেখিনি, তারা পঞ্চবটী দেখে তাঁকে অনুমান করে নিতে পারি। এই নিঃশব্দ ছায়াবীথির অন্তরালে কী প্রচণ্ড সাধনার ঝড় বয়ে গেছে একটি মানবদেহ-অবলম্বনে। পৃথিবীর ইতিহাসে এক একটি অধ্যাত্মভাবের আবির্ভাবেই মানবচিন্তার ইতিহাসে কী বিপুল আলোড়ন! শাক্ত, বৈষ্ণব, ইসলাম, খ্রীষ্ট—সব সাধনার মিলিত ফল এই পঞ্চবটীর তপস্যাপূত নির্জনতায় বিগ্রহ ধারণ করে শ্রীরামকৃষ্ণে পরিণত। নানা বৃক্ষের সমাহার শুধু নয়, জগতের শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মচিন্তা ও উপলব্ধির সমাহার এই পঞ্চবটীতে

অশ্বত্থবিল্ববৃক্ষঞ্চ বটধাত্রী-অশোককম্।
বটীপঞ্চকমিত্যুক্তং স্থাপয়েৎ পঞ্চদিক্ষু চ ॥
অশ্বত্থং স্থাপয়েৎ প্রাচি বিল্বমুত্তরভাগতঃ।
বটং পশ্চিমভাগে তু ধাত্রীং দক্ষিণতস্তথা ॥
অশোকং বহ্নিদিক্‌স্থাপ্যং তপস্যার্থং সুরেশ্বরি।
মধ্যে বেদীং চতুর্হস্তাং সুন্দরীং সুমনোহরাম্ ॥ *
[স্কন্দপুরাণ]

শ্রীরামকৃষ্ণ আসবার আগে থেকেই একটি পঞ্চবটী ছিল দক্ষিণেশ্বরে। কালক্রমে প্রাচীন বটগাছটি ছাড়া তার আর সব গাছগুলিই নষ্ট হয়ে যায়। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের হাতে নতুন একটি পঞ্চবটী স্থাপন করেছিলেন। আগে একটি আমলকীতলায় তিনি ধ্যান করতেন। পুরানো পঞ্চবটীর কাছাকাছি হাঁসপুকুরটি নতুন করে খুঁড়ে তার মাটিতে চারদিক ভরাট করে ফেলায় সেই আমলকী গাছটি নষ্ট হয়ে যায়। তাই সাধনকুটিরের পশ্চিমে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন নিজের হাতে একটি অশ্বত্থের চারা রোপণ করে তাঁর ভাগ্নে হৃদয়কে দিয়ে বট, অশোক, বেল ও আমলকীর চারা রোপণ করালেন। তারপর তুলসী ও অপরাজিতার অনেকগুলি চারা পুঁতে চারদিকে ঘিরে দিলেন। তবু উপযুক্ত বেড়ার অভাবে পঞ্চবটীর গাছগুলি প্রথম দিকে ছাগলে গোরুতে মুড়িয়ে ফেলেছিল। শোনা যায়, গাছগুলির এই দুরবস্থা দেখে এদের বেড়া দিয়ে রক্ষা করবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ যখন চিন্তিত, তখনই গঙ্গার বানে বেড়া তৈরীর সব উপকরণ ভেসে এসে গঙ্গাতীরে উপস্থিত—কতকগুলি গরাণের খুঁটি, নারিকেলের দড়ি, বাঁখারি, এমন কি একটি কাটারি পর্যন্ত। কালীবাড়ির ভর্তাভারি নামে একটি মালীকে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কত আনন্দের সঙ্গে সেদিন বেড়াটি তৈরী করেছিলেন, সেকথা সহজেই অনুমেয়। কিছুদিন নিয়মিত জলসিঞ্চনে তুলসী ও অপরাজিতার বেড়াগুলি উঁচু হয়ে নবজাত পঞ্চবটীর চারপাশে এমন আবেষ্টনী রচনা করল যে, বাইরে থেকে আর শ্রীরামকৃষ্ণের তপস্যার কোন বিঘ্ন হবার সম্ভাবনা রইল না।

পঞ্চবটীর এই জন্ম-ইতিহাসে একটু অলৌকিক যোগাযোগের আভাস আছে। বানের জলে বেড়ার উপকরণ ভেসে আসার ব্যাপারটি আমরা

* অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, আমলকী ও অশোক—এই পাঁচটি বৃক্ষকে একত্রে পঞ্চবটী বলে। এই পাঁচটি বৃক্ষকে পাঁচ দিকে স্থাপন করতে হয়—পূবে অশ্বত্থ, উত্তরে বিল্ব, পশ্চিমে বট, দক্ষিণে আমলকী এবং অগ্নিকোণে অশোক; আর তার মাঝখানে তপস্যার জন্য চারহাত পরিমাণ সুন্দর সুমনোহর বেদী স্থাপন করতে হয়।

কেবলমাত্র আকস্মিক যোগাযোগ-ঘটনাই মনে করতে পারি। আবার সিদ্ধসঙ্কল্প মহাপুরুষের ক্ষেত্রে এমন যোগাযোগকে যাঁরা দৈব ইচ্ছা মনে করেন, তাঁদেরও অস্বীকার করা যায় না। আসলে লৌকিক-অলৌকিকে ভেদ অনেকটাই দৃষ্টিভঙ্গীগত। অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে সাধারণ-মানবদৃষ্টি বহুদূর-প্রসারিত হয়ে এমন অনেক সত্য প্রত্যক্ষ করে, যা লৌকিক জগতে অবাস্তব ও অসম্ভব মনে হওয়াই স্বাভাবিক। তাই তো সাধকের জিজ্ঞাসা—'এহ বাহ্য, আগে কহ আর।'

অলৌকিক ঘটনা বা উপলব্ধির প্রমাণ লৌকিকজীবনের অধ্যাত্মসমুন্নতি। বিশেষ মুহূর্তের আবেগ-উচ্ছ্বাস অথবা অঘটনঘটনা—পরবর্তীকালে তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে সাধনার বা প্রযত্নের অভাবে। এক্ষেত্রে বিবেকানন্দের বাণী স্মরণীয়—"অলৌকিকত্বরূপ যে অদ্ভুত বিকাশ, চিরোপার্জিত লৌকিক চেষ্টাই তাহার কারণ; লৌকিক ও অলৌকিক কেবল প্রকাশের তারতম্যে।" ('ভাববার কথা'—'জ্ঞানার্জন' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

শ্রীরামকৃষ্ণজীবন সেই অলৌকিক সত্য-লাভের লৌকিক প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা তো করেই নি, বরং জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যবহারিক নৈপুণ্যকেও অধ্যাত্মসাধনার অন্যতম মাপকাঠি করে গিয়েছে।

ঘটনাগত যোগাযোগের আকস্মিকতা ছাড়াও এমন অনেক সাধারণবুদ্ধির অগোচর পরমসত্যের জ্যোতির্ময় প্রকাশ শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রেণীর মহামানবদের জীবনে দেখা যায়, যা আমাদের সীমাবদ্ধ ধারণায় মাপ করতে যাওয়াই মূঢ়তার নামান্তর। তবু এই সব ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধির প্রয়োজন আছে বৈ কি! শুধু মনকে সেই উপলব্ধির যোগ্য করে তোলা প্রয়োজন। দৃষ্টি থাকলে তবে তো অণুবীক্ষণে চোখরাখার ফল।

যীশু, বুদ্ধ, মহম্মদ, শংকর, চৈতন্য—কার জীবনীতে অলৌকিকতা নেই? শুধু দিন-যাপনের প্রাণধারণের সাধনা করতে তো তাঁরা আসেন নি, এসেছিলেন জীবনধারণের পরম-সার্থকতার দিকে আমাদের চোখ ফেরাতে। বলা বাহুল্য, সে চোখ বাইরের চর্মচক্ষু নয়, অন্তরতম দৃষ্টি। সে আলোয় এ জগৎ ও জীবনের রূপান্তর ঘটে বলেই তা অলৌকিক। কিন্তু কোনমতেই ভেলকিবাজি নয়। 'লাগ্ ভেলকি লাগ্' বলে যে বাজীকরের সমাধি হয়েছিল, সেই বহিরঙ্গ সমাধি ভাঙতেই বাজিকর রাজার উদ্দেশ্যে "টাকা দেও, কাপড়া দেও"—এই মাত্রই চেয়েছিল। উপরি-উক্ত মহামানবেরা চেয়েছিলেন সর্বস্বের পরিবর্তে পরমসত্যের আবির্ভাব ভেলকির সঙ্গে ধর্মের এইখানে পার্থক্য।

* *

তুলসী-অপরাজিতার বেড়ার আড়ালে ক্রমবর্ধমান পঞ্চবটীর পল্লবঘন ছায়াতলে কিন্তু জগতের সেরা যাদুকরের রঙ্গমঞ্চ তৈরী হচ্ছিল। দিনের পর দিন সাধনা থেকে সাধনান্তরে পরমসত্যের বহুবিচিত্র রূপায়ণের সে কাহিনীর বেশীর ভাগই লোকলোচনের অন্তরালে। সন-তারিখের হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনকাল বারোবৎসর, কিন্তু এই বারোটি বৎসর ভারতাত্মার সংক্ষেপিত পাঁচহাজার বৎসরের তপস্যা। শুধু ভারতের নয়, লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দজীর অনুসরণে বলা যায়—বেদ, উপনিষদ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মশাস্ত্রসমূহের অধ্যাত্মসত্যের নিশ্চিতপ্রমাণস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপর্ব সর্ব-মানবের তপস্যার ফলশ্রুতি।

তাই ভারতের ধর্মসাধনার ইতিহাসে বোধিদ্রুমের পরেই পঞ্চবটীর স্থান। আর পৃথিবীর ইতিহাসে এমন সর্বধর্মমিলনের সাধনতীর্থ আর কোথাও দেখা যায় কি? দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী যে আমাদের পরমযত্নের আরাধ্যবস্তু, একথা বারংবার স্মরণীয়।

শুধুমাত্র দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-প্রাঙ্গণই নয়—এই পঞ্চবটী, অদূরে বিল্বতলে পঞ্চমুণ্ডির আসন, হাঁসপুকুর—এ সবই শ্রীরামকৃষ্ণতীর্থরূপে স্মরণ-মনন ও বন্দনার যোগ্য তীর্থ।

* * *

দিন যত শেষ হয়ে এলো, পঞ্চবটীর চার পাশে জনতার কোলাহল কেবলই বাড়তে লাগল। ছুটির দিনের অবসরযাপনের মত্ততায় এখন এই পঞ্চবটী যে কোন পার্ক, যে কোন সখের বাগানমাত্র।

শুধু পঞ্চবটীর তলায় সেই সন্ন্যাসীটি এখনো ধ্যানস্থ। আমাদের শুভবুদ্ধি কোনদিন এই সাধনপীঠের প্রশান্ত নির্জনতা ফিরিয়ে আনবে—ওই সমাহিত সাধক হয়তো তারই প্রতীক।

বাস্তব

মহম্মদ গোলাম আম্বির

পার্থিব যত সুখ সম্পদ একদা হইবে লয়,
পথের পাথেয় অন্ততঃ কিছু করেছ কি সঞ্চয়?
দেখিছ না দূরে তিমির রাত্রি, সন্ধ্যার কালো ছায়া
দলিত মথিত করিয়া বক্ষ ছিন্ন করিবে মায়া?
দাঁড়ায় কভু কি যাত্রা ভুলিয়া দিনের দীপ্ত রবি
নিখিল বিশ্ব অশ্রু-নয়নে আঁকিলে করুণ ছবি?
অকপট মনে হলে আগুয়ান সত্যের ধ্বজা ধরি
জীবনের চির দুর্গম পথে, বিশ্বপিতারে স্মরি,
সকল বিপদে চিরসাথীরূপে সাক্ষাৎ পাবে তাঁর,
জ্ঞানের আলোক জ্বলিবে হৃদয়ে ঘুচিবে অন্ধকার।

নতুন যুগের ভারত-সন্ন্যাসী

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

"এই আমার ভারতবর্ষ, এই আমার মাতৃভূমি;—দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দুঃখ, রোগ-শোকব্যথা-জর্জরিত, ছিন্নবসন-পরিহিত, যুগ-যুগান্তের নিরাশাক্লিষ্ট নরনারী, বালক-বালিকাগণ অন্নাভাবে প্রপীড়িত, আশা-উদ্যম-আনন্দ-উৎসাহের অভাবে ভারত কঙ্কালে পরিপ্লুত, মহাশ্মশানে পরিণত!"—ভারতের শেষ প্রান্তে সমুদ্রতীরে কন্যাকুমারীতে নিশ্চল হয়ে বসে-থাকা বিবেকানন্দ যেন স্বপ্ন দেখে উঠলেন, তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল—"এদের ফেলে আমি কোথায় ঈশ্বর খুঁজি? এরাই ত জীবন্ত ঈশ্বর।" গৌতম বুদ্ধের মত উপেক্ষিত মানুষের মুক্তির জন্য, স্বদেশের কল্যাণ-কামনায় বিবেকানন্দ ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। স্বদেশের জন্য, মানুষের জন্য এই যে ব্যাকুলতা এই যে গভীর মানবপ্রীতি,—এই হল বিবেকানন্দের নূতন ধর্মবোধ, নূতন যুগের সন্ন্যাসধর্ম। স্বামীজীর প্রবর্তিত এই নূতন সন্ন্যাসধর্মের ইঙ্গিতই রয়েছে স্বামীজীর একটি চিঠিতে। জাপানীদের উন্নতি দেখে কোনো বন্ধুকে তিনি লিখলেন: "নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত থেকে বাইরে এসে দেখ, সব জাতি তরতর ক'রে কেমন এগিয়ে চলেছে!

তোমরা কি মানুষকে ভালবাস? তাহলে এসো, ভাল হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি। পেছনে চেওনা, সামনে এগিয়ে যাও। ভারতমাতা অন্ততঃ এরূপ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো—মানুষ চাই, পশু নয়।" এক যুগসন্ধিক্ষণে স্বামী বিবেকানন্দের এই উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে শত সহস্র তরুণ-তরুণী এগিয়ে এলেন,—জীবসেবার মধ্যেই শিবসেবার সন্ধান পেলেন তাঁরা। স্বামীজী হলেন তাঁদের আদর্শ, তাঁদের সকল কর্মের প্রেরণা, সেবাধর্মের ঋত্বিক।

কেহ কেহ হয়ত বলবেন, বিবেকানন্দ ছিলেন হিন্দু সন্ন্যাসী, যিনি বর্তমান যুগের হিন্দুধর্মকে নূতনভাবে গড়ে তুলেছেন। আবার কেহ তাঁকে দার্শনিক পণ্ডিতরূপে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করবেন। কিন্তু আমরা বলব—তিনি ছিলেন নবীন ভারতের জাগরণমন্ত্রের ঋষি।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে গুরু পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর বিবেকানন্দ সমগ্র ভারত ভ্রমণ করেন। কোথাও তিনি শান্তি দেখতে পেলেন না। শুধু দেখতে পেলেন: মানুষের দারিদ্র্য, দুঃখ, শোক আর তাপ। সমবেদনায় তাঁর হৃদয় উথলে উঠল, পরবর্তীকালে পৃথিবীর যেখানেই তিনি গিয়েছেন, অন্য জাতির অবস্থার সঙ্গে ভারতবাসীর অবস্থা তুলনা ক'রে তাঁর প্রাণ সব সময়ই ছটফট করত। শয়নে জাগরণে তাঁর শুধু এক স্বপ্ন ছিল—কেমন ক'রে এই অধঃপতিত জাতিকে উন্নত করা যায়, সকল জাতির সমান মর্যাদায় প্রতি করা যায়!

পাশ্চাত্যে বেদান্তপ্রচারের কাজ সমাধা ক'রে স্বামীজী ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে ফিরে এলেন বিজয়ীর বেশে। ফিরে এসেই বিবেকানন্দ আমাদের অধঃপাতের কারণ নির্ণয় করলেন দেখলেন, তার মধ্যে শারীরিক অক্ষমতা এবং ইচ্ছাশক্তির অভাবই প্রধান। কাজে তিনি দেশের যুবকদের শারীরিক শক্তি

অর্জনে ও ব্রহ্মচর্য পালনে আহ্বান জানালেন, সঙ্গে সঙ্গে যুবকদের তিনি সমাজ-সেবা-ব্রতে উৎসাহিত ক'রে তুললেন। যুবকদের ডেকে বললেন: "দুর্ভিক্ষ হয়েছে, চলে যা' সেইদিকে; না হয় মরেই যাবি। তোর আমার মত কত কীট হচ্ছে, মরছে; তাতে জগতের কি আসছে যাচ্ছে? একটা মহান উদ্দেশ্য নিয়ে মরে যা'। মরে তো যাবিই! তা ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে মরাই ভাল। তোরাই ত দেশের আশা-ভরসা। তোদের কর্মহীন দেখলে বড় কষ্ট হয়। লেগে যা'! লেগে যা'!—দেরী করিসনা—মৃত্যু ত দিন দিন নিকটে আসছে। আর পরে করবি ব'লে বসে থাকিসনি, তাহলে কিছুই হবে না।" এই স্বদেশভক্ত বীর সন্ন্যাসীর প্রতি রক্তকণায় স্বদেশের প্রতি গভীর মমতার স্রোত প্রবাহিত হত।

সন্ন্যাসী ছিলেন ব'লে আর দশজনের মত তিনি প্রকাশ্যে রাজনীতিতে যোগ দিতে পারতেন না; কিন্তু সকলেই জানেন, তিনি যে সেবাধর্ম জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের ভারতীয় গণজাগরণ ও গণ-অভ্যুত্থানরূপে তাই আত্ম-প্রকাশ করেছিল। সেজন্যেই স্বামীজী এমন নরনারী তৈরী করতে চেয়েছিলেন, "যাঁরা গতানুগতিকভাবে স্বার্থান্ধ হয়ে ভোগ-লালসার পশ্চাতে ধাবিত হবেনা—যারা নরনারায়ণের সেবায় সর্বস্ব অর্পণ ক'রে যুগপরিবর্তনে সহায়ক হবে, অবশিষ্ট জীবন মাতৃভূমির উন্নতিকল্পে ব্যয় করবে—অথবা এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করবে।"

এই হল বিবেকানন্দের নবযুগের সন্ন্যাসধর্ম। এই ধর্মকে আশ্রয় ক'রে কত লোক পরহিতের জন্য ঘর ছেড়েছেন, কত লোক অকালে প্রাণত্যাগ করেছেন, আবার কতজন আদর্শের জন্য জীবনপাত করেছেন। বিশ্বকল্যাণব্রতী সন্ন্যাসীর কাছে সকল পতিত মানবে ঈশ্বরের সত্তা অনুভূত। তিনি দিব্যচক্ষে দেখলেন, ভারতের অধঃপতনের মূলে অসাম্য—বিশেষ ক'রে সামাজিক অসাম্য। তাই তিনি জাতিকে বাঁচাবার সঞ্জীবন-মন্ত্র উচ্চারণ করলেন "আমি দিব্যচক্ষে দেখছি, এদের ও আমার মধ্যে একই ব্রহ্ম—একই শক্তি রয়েছেন, কেবল বিকাশের তারতম্য। সর্বাঙ্গে রক্তসঞ্চার না হলে, কোন দেশ কোন কালে উঠেছে দেখেছিস?" এই বিশ্বদৃষ্টি, এই অনন্য শুভবুদ্ধিই স্বামীজীকে অনন্যসাধারণ করেছে। তিনি বিশ্বের হয়েও যে স্বদেশের মানুষ হতে পেরেছিলেন, তারও রহস্য বোধহয় এখানেই খুঁজলে পাওয়া যাবে

পৃথিবীর ইতিহাস খুঁজলেই চোখে পড়ে এমন কতকগুলি লোকের কথা, যাঁরা পৃথিবীর চেহারা পাল্টে দিয়েছেন,—যাঁদের স্বভাব, কাজ, চলাফেরা সাধারণ লোক থেকে একটু আলাদা। আমাদের মতোই তাঁরা হাসেন, খান, ঘুমান। কিন্তু আমরা যে জিনিসটা সাধারণভাবে দেখি, সেই জিনিসটা থেকেই তাঁরা এমন কোনো ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেন, যা তাঁদের নিজেদের সমগ্র জীবনধারা বদলে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীরও রূপ পরিবর্তন করে।

কিন্তু সে জিনিসটা কী, যার এত ক্ষমতা, যা মানবসমাজে একটা ওলট-পালট ক'রে দেয়, যা প্রচলিত বাধা-নিষেধের গণ্ডি অতিক্রম ক'রে পৃথিবীতে নূতন সমাজের পত্তন করে? দৃঢ় সংকল্প বিশ্ববিজয়ের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে নেপোলিয়নকে দিগ্বিজয়ী করেছিল। কপিলাবস্তুর শুদ্ধোদনের পুত্রকে কেই বা চিনত, যদি তিনি মানুষের দুঃখ দূর করবার জন্য রাজ্য, সংসার পরিত্যাগ ক'রে দুঃখজয়ের সাধনায়

আত্মনিয়োগ না করতেন? প্রবাদের উক্তিটি স্মরণীয়: বোমা-বারুদের চেয়ে অনেক বেশী বিস্ফোরণের ক্ষমতা রয়েছে এক-একটি ভাবধারার মধ্যে। নইলে, একজন সাধারণ বাঙালীর ছেলে মাত্র ৩০ বছর বয়সে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চিকাগো ধর্মমহাসভায় দাঁড়িয়ে পাশ্চাত্যধর্মের সমবেত খ্যাতনামা প্রতিনিধিগণের সমক্ষে কেমন ক'রে নিজের বাগ্মিতায় সমস্ত পৃথিবীর মনকে নিজের দিকে আকর্ষণ ক'রে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিলেন? সেদিন যদি বিবেকানন্দ ব্যর্থ হতেন—বিপদে ও সংকোচে নুয়ে পড়তেন তিনি, তবে আজ পৃথিবীর ইতিহাসে হিন্দুধর্ম এত উচ্চে স্থান পেত কি? Morning shows the day—মানুষের জীবনের ক্ষেত্রেও এই আপ্তবাক্যটি সমভাবে প্রযোজ্য। অতি শৈশবেই সাধারণের মধ্যে অসাধারণত্বের যে লক্ষণ অর্ধস্ফুট অবস্থায় ছিল—বৃহৎ জাগতিক ব্যাপারের মধ্যে বৃহত্তর মানবসমাজের ক্ষেত্রে তাই অসাধারণ ভাস্বর হয়ে উঠল। স্বামীজীর শুচিশুদ্ধ অপাপবিদ্ধ অন্তরের অকৃত্রিম ধর্মভাবটির সঙ্গে স্বদেশানুরাগ যুক্ত হয়ে এক নূতন ভাবতরঙ্গের সৃষ্টি করল। এই নব ভাবটিই হ'ল তাঁর দরিদ্রনারায়ণ-সেবাব্রত।

জপ-তপ-যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতির মধ্যে ডুবে থেকে যে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী আপনার ইষ্ট খোঁজেন—বিবেকানন্দ সেই সন্ন্যাসী ছিলেন না। "যতদিন পর্যন্ত আমার জন্মভূমির একটি কুকুরও অভুক্ত থাকবে ততদিন তাকে আহার-প্রদানই আমার ধর্ম। এ ছাড়া আর যাকিছু সব অধর্ম"—স্বামী বিবেকানন্দ ছাড়া আর কোনো সন্ন্যাসী এমন কথা কোনোদিন বলেননি। সংসারাসক্ত না হয়েও সংসারকে তিনি এমন ক'রে ভালবাসতে পেরেছিলেন শুধু এই কারণে যে, সংসারও ঈশ্বরের সৃষ্টি, সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে নিজেকেই প্রকাশ করেন। তাই তাঁর সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে স্বামীজী ঈশ্বরদর্শন করেছেন। বিশ্বনিয়ন্তাকে এইভাবে বিশ্বের মধ্যে একান্তভাবে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন বলেই তিনি 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' করতে পেরেছিলেন এবং তা পালন করতে সকলকে আহ্বান করেছিলেন। অধ্যাত্মবাদের জীবন্ত প্রতিমূর্তি হয়েও তিনি বাস্তব জাগতিক ব্যাপারগুলিকেও উপেক্ষা করেননি, পরন্তু কোনোদিন তাঁর মধ্যে স্বদেশ-ও স্বজাতি-প্রেমেরও অভাব ঘটেনি। সকলকে আশার বাণী শুনিয়ে তিনি বললেন, "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।" "কিন্তু কীভাবে মৃত্যুর হাত থেকে ভারতকে রক্ষা করা সম্ভব? প্রত্যেক মানুষকে মানুষের মর্যাদা না দিলে ত কোনো দেশ বাঁচতে পারে না।" তাই তিনি ভারতবাসীকে জলদগম্ভীর স্বরে সম্বোধন ক'রে বললেন: "হে মানব, মৃতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবন্তের পূজাতে আহবান করিতেছি।...দুর্বলতা ও দাসজাতি-সুলভ ঈর্ষাদ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগচক্র পরিবর্তনের সহায়তা কর।"

আজকের এই যুগ-সংকটের দিনে বিবেকানন্দের এই উদাত্ত আহ্বান কিছুতেই ব্যর্থ হতে দেব না—আজকে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার হালদার

পৃথিবীর ধর্মেতিহাস তথা অবতার-জীবন আলোচনা করলে দেখা যায়—অবতারগণের সঙ্গে আবির্ভূত হন একদল পার্ষদ, যাঁদের কাজ হল অবতার-জীবনে অনুভূত সত্যসমূহ স্ব স্ব জীবনে প্রতিফলিত করা—এবং তাঁদেরই প্রবর্তিত যুগধর্ম-প্রবর্তনে ও জীবকল্যান-সাধনে জীবন উৎসর্গ করা। শ্রীবুদ্ধের আনন্দ, সারিপুত্ত ও মৌদ্গল্লায়ন, ঈশামশির সেন্টপিটার ও সেন্টপল এবং শ্রীচৈতন্যের নিত্যানন্দ প্রমুখ পার্ষদ—একই সনাতন নিয়মের দৃষ্টান্ত।

অবতার-বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে ও তাঁর মহাশক্তিধর পার্ষদগণের আগমনে ও শুভমিলনে-উপরোক্ত আধ্যাত্মিক নিয়মটিই যেন পূর্বাপেক্ষা আরও উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী শিষ্যবর্গের জীবন ভারতের সনাতন ধর্মাকাশে এক একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় পৃথিবীর বিস্ময়রূপে চিরকাল দীপ্যমান থাকবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কঠোর ত্যাগ-তপস্যাপূর্ণ অনুভূতি-সমৃদ্ধ অনন্ত ভাবময় জীবনের দিগ্‌দর্শনে তাঁরা যেন এক একটি দিক্‌পাল।

ভক্ত ও সাধকদের কল্যাণার্থে শাস্ত্রমুখে বারবার সাধুসঙ্গের অপার মাহাত্ম্যের কথা বলা হয়েছে। জ্ঞানের অবতার শঙ্করোপম শঙ্করাচার্যও তাঁর অনবদ্য সুমধুর ভাষায় সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্তনপ্রসঙ্গে বলে গেছেন—

> "ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
> ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।"

আজ থেকে প্রায় উনত্রিশ বৎসর পূর্বে মাত্র তিনটি দিনের জন্য পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের পূত-সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে পূজনীয় বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শুভাগমন করেছিলেন। তার প্রায় চারমাস পূর্বে হঠাৎ দীক্ষাগ্রহণের জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করে তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করে এলাহাবাদে চিঠি লিখেছিলুম; প্রায় পত্রপাঠই উত্তর দিয়ে কৃপা করে তিনি জানিয়েছিলেন, "...দীক্ষা হবে; কিন্তু এলাহাবাদ দূরদেশ—এখানে আসা কষ্ট-ও ব্যয়-সাধ্য—আগামীকালে আমি যখন পূর্ববঙ্গে যাব তখন হবে।"

আশা ও নিরাশার দোলায় প্রায় তিন চার মাস কাল আন্দোলিত হয়ে ভেবে ভেবে দিন কাটাচ্ছি এমনি সময়ে—একদিন শুভ মুহূর্তে—একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে ময়মনসিংহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের তৎকালীন অধ্যক্ষ মহারাজের কাছ থেকে খবর এলো—"বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ ঢাকায় শুভাগমন করেছেন—দীক্ষার্থীরা এ সুযোগ হারাবেন না।" সংবাদ পেয়ে সরকারী কাজ থেকে ছুটি নিয়ে তার পরদিনই রাত্রি ন'টার ট্রেনে ঢাকা যাত্রা করলুম। আজও মনে আছে, অনিবার্য কারণবশতঃ ট্রেনখানা সেদিন প্রায় দেড়ঘণ্টা দেরীতে এসেছিল।

পরদিন প্রত্যুষে স্নানান্তে তাঁর পদপ্রান্তে উপস্থিত হলুম; ঢাকা আশ্রমের উত্তরমুখী মঠগৃহের বারান্দায় তাঁর দর্শন পেলুম। বিশেষ

চেষ্টায় সংগৃহীত—একটি বৃহদাকার কাষ্ঠাসনে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ উপবিষ্ট ছিলেন। সম্মুখে টেবিলের উপর দুটি ফুলের তোড়া ও ধূপদানি। ভক্তিভরে চরণে প্রণত হয়ে বন্দনা করলুম; তিনিও পরমকৃপাভরে মস্তকে হস্তস্থাপন করে আশীর্বাদ করলেন।...যথাসময়ে বহুপ্রত্যাশিত দীক্ষা লাভ করে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করলুম।

এ-কদিন বেশ কিছু দর্শনার্থী ও অভ্যাগতদের ভিড় লেগে থাকত সর্বক্ষণ তাঁর ঘরে ও বাইরের বারান্দায়; তার মধ্যে সব শ্রেণীর লোকই থাকতেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আইনজীবী ও বিচারক, বালিয়াটীর জমিদার-পরিবার ও স্থানীয় বিভিন্ন গৃহী ভক্তগণ। তাছাড়া কী এক দুর্বার আকর্ষণে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরও ভিড় লেগে থাকতো তাঁর ঘরের আশেপাশে; আর তাদের অনাবিল কলহাস্যে মুখরিত হত আশ্রম-প্রাঙ্গণ ও তাঁর কুটীর-সংলগ্ন অলিন্দ! * * * * নাটকের দৃশ্য হতে দৃশ্যান্তর পরিবর্তনের ন্যায় তাঁকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে থাকতে দেখেছি, তিনটি দিনের দুর্লভ অবকাশেই। অধিকাংশ সময়ই আনন্দোচ্ছল রহস্যালাপে মগ্ন -তারই মাঝে মাঝে কত অমূল্য কথা বলছেন! দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে তাঁর প্রথম দর্শন ও মল্লযুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা, সারনাথে বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে দর্শনের কাহিনী, ব্রহ্মদেশ ভ্রমণকালে পেগুতে শায়িত বুদ্ধমূর্তির সন্নিধানে তাঁর জ্যোতিদর্শনের বিবরণ, সেবাশ্রম-নির্মাণকার্য পরিদর্শন উপলক্ষে কাশীধামে টাঙা থেকে পতনের পর জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় দেবাদিদেব বিশ্বনাথের তুষার-শীতল আলিঙ্গন ও রোগমুক্তি এবং ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নানকালে ত্রিবেণী মায়ের দর্শনের অমিয়-মধুর কাহিনীগুলির বর্ণনাকালে মাঝে মাঝে দেখেছি তাঁর এক গম্ভীর রূপ—যখন তিনি সবাইকে হাত জোড় করে অনুরোধ জানাতেন—"এখন একটু একলা থাকব!" * * * এই ভাব-বৈচিত্র্য মেঘের রং পরিবর্তনের ন্যায় কতই সুন্দররূপে প্রতিভাত হতে দেখেছি বারংবার। হয়ত ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা গল্প-গুজব সব কিছু চলছে—ঘরটি আনন্দে পরিপূর্ণ। কত কথা বলে চলেছেন—কিন্তু তারই মাঝখানে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে উঠলেন—"এখন একটু একলা থাকব!"—আর তখনই তাঁকে একলা থাকার সম্পূর্ণ সুযোগ দিয়ে সব্বাইকে চলে যেতে হতো, কারও জন্য কিন্তু কোন ব্যতিক্রম ছিলনা!

ঘণ্টাখানেক পর বাইরে বেরিয়ে ফিরে এসে আবার আপন ঘরে শিশুদের সঙ্গে শিশুর মতনই হয়ে যেতেন। একদিন শুনলুম, কয়েকটি দুষ্টু খোকা তাঁর জানালার পাশে উঁকি দিচ্ছে দেখে বলে উঠলেন—"বাঘ দেখতে এসেছো? দূর থেকে দেখে যাও, কিন্তু খাঁচায় হাত দিয়োনা যেন।" আবার কখনো বলতেন, "এখন খানিকটা দুষ্টুমি কর; যখন হাত জোড় করব, তখন কিন্তু চলে যেতে হবে।" রঙ্গ করে হেসে হেসে বলতেন, "হাত জোড়ের মানে জান তো?—হাত জোড় মানে—Please get out—অর্থাৎ এবার কেটে পড়ুন।"

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথারও উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি—তাঁর জীবনীতে উল্লিখিত আছে, প্রথম দিকে তিনি দীক্ষা বেশী দিতেন না, এবং স্ত্রীলোকদের কাছে ঘেঁষতে দিতেন না। পরে কিন্তু তাঁর এই ভাব পালটে যায়। তাঁর নিজের কথায় আছে যে, মহাপুরুষ মহারাজের অদর্শনের পর—মহাপুরুষ মহারাজের কৃপা ও করুণার ভাবটি যেন তাঁর ভিতরে ঢুকে গেল; এবং তখন তিনি স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে সকল দীক্ষা-

প্রার্থীরই প্রার্থনা পূর্ণ করতে লাগলেন প্রায় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

কোথাও যেতে হলে—বিশেষতঃ ট্রেন ধরার ব্যাপারে তাঁর একপ্রকার শিশুসুলভ ব্যাকুলতা ও দুশ্চিন্তা ছিল! ট্রেন তাঁকে ফেলে চলে যাবে, এই ধারণাই যেন তাঁকে পেয়ে বসতো। দুঘণ্টা না হোক অন্ততঃ একঘণ্টা দেড়ঘণ্টা পূর্বে তাঁর স্টেশনে যাওয়া চাই-ই। বেলুড়মঠ থেকে এলাহাবাদ যাবার সময়ে প্রায় প্রত্যেক বারই এই নিয়ে অনেক মজার ব্যাপার হতো। অন্যান্য সন্ন্যাসী মহারাজদের এসে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে হতো যে ট্রেন তাঁকে না নিয়ে ফাঁকি দিয়ে চলে যাবেনা—এক ঘণ্টা আগে রওনা হলেই চলবে। তিনি যেন সান্ত্বনা মানতে চাইতেন না; প্রায়ই 'চিন্তিত'ভাবে বলে ফেলতেন, "তোমরা যাই বলো—আজকে আর ট্রেন ধরা হবেই না।" ঢাকা থেকে কলকাতা যাত্রা করার প্রাক্কালেও একই নাটকের পুনরভিনয় হল। অনেক সাধ্য-সাধনার পর অন্ততঃ দেড়ঘণ্টা আগে তাঁকে ঢাকা স্টেশনে নিয়ে যেতে হল। আমরাও প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজন দর্শনার্থী স্টেশনে উপস্থিত হলাম। স্টেশনে প্লাটফর্মে বাইরে একখানা বড় চেয়ারে তাঁকে বসানো হল। সেখানে পৌছেই তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। পরমুহূর্তে আবার ভক্তদের আনীত মিষ্টি ও অন্যান্য খাবারে ভর্তি পাঁচছয়টি টিফিন কেরিয়ার খুলে, শিশুর মত, কি কি এসেছে এক ফাঁকে দেখে নিলেন। সেবকদের কাছে শুনলুম, তিনি তার এক কণাও মুখে দেবেন কিনা সন্দেহ। কাছে গিয়ে আমরা তাঁকে একে একে প্রণাম করলুম—কিন্তু স্টেশনে পৌছেও তাঁর সেই অন্যমনস্ক ভাবের কোন পরিবর্তন দেখতে পেলুম না। তবু তাঁর মুখ থেকে কিছু শোনবার জন্য সাহস করে জিজ্ঞেস করলুম—"আবার পূর্ববঙ্গে আসছেন তো?" উত্তরে শুধু হাতদুটি তুলে আকাশের দিকে দেখিয়ে দিলেন—যেন বুঝিয়ে দিলেন, 'তাঁর যা ইচ্ছে তাই হবে।'

নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেনখানা এলে তাঁকে প্রণাম করে অনেকেই নিজ নিজ স্থানে চলে গেলেন। আমরা প্রায় পঁচিশ-ত্রিশজন একই ট্রেনে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত চললুম। পথে দোলাইগঞ্জ স্টেশনে দুমিনিটের জন্য গাড়ী থামলে ঢাকার নবাব-পরিবারের দুজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক—তার মধ্যে একজন তৎকালীন ক্রীড়াজগতে সুপরিচিত ও জনপ্রিয়—ট্রেনে উঠে মস্তক থেকে উষ্ণীষ উত্তোলন করে একান্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের পাদবন্দনা করলেন। কিন্তু তাঁর সেই ভাবগম্ভীর মূর্তির বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হলনা! আমি বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করলুম, তাঁর দৃষ্টি পূর্ববৎ শরতের নিরভ্র আকাশে নিবদ্ধ হয়েই রইল। যেন একটি বিশাল অচঞ্চল সমুদ্র, বাইরের কোন ঘটনা সেখানে তরঙ্গ তুলতে পারছে না। আগন্তুক ভদ্রলোক দুজন পুনরায় সসম্ভ্রমে প্রণত হয়ে হাসিমুখে বিদায় গ্রহণ করলেন। আজ থেকে উনত্রিশ বছর পূর্বে তাঁর এই স্থির গম্ভীর ভাবটি আমার মনে যে দাগ কেটেছিল, আজও তা সমভাবে গভীর হয়ে আছে।

আর, তাঁর একটি কথা মনে গভীরভাবে গেঁথে আছে। সেই কথাটি বলেই প্রবন্ধের উপসংহার করব। তাঁর কৃপাপ্রাপ্ত জনৈক ভক্তের দীক্ষাগ্রহণের পূর্ব হতেই মনে একটি প্রশ্ন জেগেছিল—আমরা যে জগৎ দেখছি, শুনেছি এটি একটি স্বপ্ন; এ স্বপ্ন ভাঙে কি করে, আর এ স্বপ্ন যখন ভাঙে তখন কী বাকী থাকে? তিনি ভেবেছিলেন, দীক্ষার পর গুরুদেবের কাছে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করে উত্তর জেনে নেবেন। কিন্তু কার্যতঃ সেটি আর ঘটে ওঠেনি। গুরু যে অন্তর্যামী, দীক্ষার দিন রাত্রিতেই তিনি সে বিষয়ে নিঃসংশয় হলেন। সে রাত্রে তিনি স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর মুখ হতে এই কথাকয়টি শুনে কৃতার্থ হয়েছিলেন—"তোমাকে যে মন্ত্রটি দিয়েছি তা জপ করলেই তোমার জগৎরূপ স্বপ্নটি ভাঙবে।"

শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতী

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

আজ এমন একজন মহাপুরুষের জীবনকথা আলোচনা করা যাইতেছে যাঁহার নাম পণ্ডিত-মহলে সুপরিচিত।

ষোড়শ শতাব্দীতে এই মহাত্মা পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালি-পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার নাম মধুসূদন। বাল্যকাল হইতেই লেখাপড়ার প্রতি ইঁহার সাতিশয় অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত। অতি অল্প বয়স হইতেই ইনি সংস্কৃতে কবিতা লিখিতে পারিতেন। একবার ইঁহার পিতা প্রমোদন পুরন্দরাচার্য সম্পত্তির কর পরিশোধ করিবার জন্য দূরবর্তী জমিদারগৃহে গমন করেন; মধুসূদনও সেদিন তাঁহার সহিত গিয়াছিলেন। জমিদারগৃহে তাঁহার পিতা ও অপরাপর ব্যক্তিকে যেরূপ দুর্দশা ভোগ করিতে হইল, তাহা দেখিয়া তাঁহার মনে সংসারত্যাগ করিবার বাসনার উদয় হইল। প্রত্যাগমনসময়ে তিনি তাঁহার পিতার অনুমতি লইয়া স্বগ্রামের পরিবর্তে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। প্রথমে তিনি নবদ্বীপে আগমন করেন ও কয়েক বৎসর তথায় থাকিয়া তথাকার সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক পণ্ডিত মথুরানাথ তর্কবাগীশের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহার পিতাকে একাকী প্রত্যাগত দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে মধুসূদনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আত্মীয়স্বজন যখন বুঝিতে পারিলেন যে মধুসূদন আর ফিরিয়া আসিবেন না, তখন তাঁহারা তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন। তখনকার দিনে নবদ্বীপ ছিল বিদ্যার কেন্দ্রস্থল। বিদ্যার্জন, বিশেষতঃ ন্যায়দর্শন শিক্ষা করিবার জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিদ্যার্থিগণ নবদ্বীপে সমাগত হইতেন। নবদ্বীপের জন্য তখন বাংলার নাম সর্বত্র সুপরিজ্ঞাত ছিল। মধুসূদনের জ্যেষ্ঠাগ্রজ নবদ্বীপে আসিয়া বহু অনুসন্ধানের পর যেখানে মধুসূদন অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে দেখিয়া ব্রহ্মচারী মধুসূদন তৎক্ষণাৎ তাঁহার আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কয়েকদিন তথায় থাকিবার পর তিনিও ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া কনিষ্ঠের নিকট স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিলেন। নবদ্বীপ ন্যায়দর্শনের পীঠস্থান স্বরূপ; তদুপরি বরেণ্য অধ্যাপকের আশ্রয়ে অবস্থান এই অবস্থায় ন্যায়দর্শন আলোচনার সুযোগ কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি পরিত্যাগ করিতে পারেন?

অধ্যাপক দেখিলেন, মধুসূদন যেরূপ মেধাবী ছাত্র, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সেরূপ নহেন; তাহা হইলেও তিনি তাঁহাকে ছাত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। এইরূপে দুইজনেই তথায় ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন। যথাসময়ে মধুসূদন তাঁহার পাঠ সাঙ্গ করিয়া জ্যেষ্ঠকে বলিলেন যে তিনি বেদান্ত-দর্শন পাঠ করিবার জন্য কাশীধামে গমন করিবেন; তিনি যেন নবদ্বীপে থাকিয়া তাঁহার আরব্ধ পাঠ সমাপ্ত করেন। এই বলিয়া অধ্যাপককে যথাযোগ্য অভিবাদনান্তে মধুসূদন বারাণসী যাত্রা করিলেন। বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া মধুসূদন তথাকার সর্বশ্রেষ্ঠ

দার্শনিক পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী বিশ্বেশ্বর সরস্বতীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন ও যথারীতি বেদান্ত-আলোচনা ও সাধনভজন করিতে লাগিলেন।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রগুলির মধ্যে এই ছয়খানি দর্শনই প্রধান—বৈশেষিক, ন্যায়, পাতঞ্জল, সাংখ্য, পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত। এই ছয়খানির মধ্যে বেদান্ত আবার সর্বপ্রধান। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মধুসূদন অতি সত্বরই উপযুক্ত আচার্যের সাহায্যে বেদান্তদর্শনে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন এবং তাঁহার সহপাঠীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিলেন। তাঁহার আচার্যদেব ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিশেষ স্নেহপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন। আধ্যাত্মিক সাধনাতেও মধুসূদন দ্রুত উন্নতি করিতে লাগিলেন। বিশ্বেশ্বরের অপর শিষ্যগণ মধুসূদনের অসাধারণত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিলেন। আচার্য বিশ্বেশ্বর ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার শিষ্যগণকে মধুসূদনের প্রাধান্য বুঝাইয়া দিবার জন্য কোনও একটি সুযোগের সন্ধানে থাকিলেন।

এদিকে মধুসূদনের জ্যেষ্ঠাগ্রজ যথাসময়ে ন্যায়ের পাঠ সমাপন করিয়া ভ্রাতার অনুসন্ধানে কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীবেশে ভ্রাতাকে দেখিয়া তিনি কিছু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সন্ন্যাসী ভ্রাতাকে দেশে ফিরিবার কথা বলায় মধুসূদন বলিলেন যে তিনি সনাতন ত্যাগধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি আর দেশে ফিরিবেন না। ভ্রাতার বৈরাগ্য অগ্রজেও সংক্রামিত হইল। তিনি বলিলেন যে তিনিও সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। দূরদর্শী মধুসূদন বলিলেন যে তাঁহার জীবনে সন্ন্যাস নাই, তিনি যেন দেশে ফিরিয়া পবিত্রভাবে সংসারে থাকিয়া জীবন যাপন করেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা অতঃপর কোটালিপাড়ায় প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন যে তাঁহার পিতা প্রভৃতি অনেকেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তিনি অতঃপর বিবাহ করিয়া গৃহী হন। পাণ্ডিত্য, সরলতা ও পবিত্রতার জন্য সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়া যথাসময়ে তিনি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন। শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহার বংশধরগণ আজিও ফরিদপুরে বাস করিতেছেন।

ইতিমধ্যে মধুসূদন গীতার টীকা, ভক্তি-রসায়ন, বেদান্ত-কল্পলতিকা, সিদ্ধান্তবিন্দু প্রভৃতি অতি মূল্যবান গ্রন্থসকল রচনা করিয়া ফেলিলেন। একদা আচার্য বিশ্বেশ্বর মধুসূদন প্রভৃতি সমুদয় শিষ্যসহ পশ্চিমাঞ্চলে তীর্থযাত্রা করিলেন। যখন সকলে যমুনার তীরে উপস্থিত হইলেন তখন বিশ্বেশ্বর সরস্বতী প্রস্তাব করিলেন যে কেবলমাত্র মধুসূদন যমুনাতীরে অবস্থান করিবেন ও অবশিষ্ট সকলে যমুনা পার হইয়া চলিয়া যাইবেন। এই সময় দিল্লীর বাদশাহ আকবরের বেগমের শূলরোগ হইয়াছিল; রোগের অসহ্য যন্ত্রণায় বেগম অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন, চিকিৎসার প্রচুর বন্দোবস্ত সত্ত্বেও রোগের কিছুমাত্র উপশম নাই। একদিন রাত্রে বেগম স্বপ্ন দেখিলেন যে একজন সন্ন্যাসী যেন অদূরে যমুনাতীরে ধ্যানস্থ আছেন, এবং তাঁর কৃপায় তিনি রোগমুক্তা হইয়াছেন।

বাদশাহকে বেগম স্বপ্নবৃত্তান্ত নিবেদন করিলে উভয়ে ছদ্মবেশে সন্ন্যাসীর নিকট যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। যথাসময়ে যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়া বেগম মধুসূদনকে দেখিয়াই স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষ বলিয়া চিনিতে পারিলেন। কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করার পর মধুসূদনের ধ্যানভঙ্গ হইল ও তিনি বেগমের প্রার্থনায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিলে বেগম সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন। যোগসিদ্ধ

মহাপুরুষের পক্ষে এরূপে রোগ নিবারণ করার উদাহরণ ভারতে বিরল নহে। অতঃপর পূর্ব-ব্যবস্থানুসারে বাদশাহের সৈন্য সেনাপতি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাদশাহ আত্ম-প্রকাশ করিয়া বহু মূল্যবান মণি-মাণিক্যাদি মধুসূদনের পাদপদ্মে উপহারস্বরূপ প্রদান করিয়া রাজোচিত বেশে স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন।

যথাকালে বিশ্বেশ্বর সরস্বতী শিষ্যসহ তথায় উপস্থিত হইলেন ও দেখিলেন যে মধুসূদন ধ্যানস্থ এবং তাঁহার পদতলে কত মূল্যবান হীরকাদি পড়িয়া রহিয়াছে। সমীপস্থ লোক সকলের মুখে মধুসূদনের কীর্তিকথা গুরু ও শিষ্যগণ অবগত হইলেন ও শিষ্যগণকে মধুসূদনের মাহাত্ম্য বুঝাইয়া দিলেন। শিষ্যগণ বুঝিলেন, তাঁহারা মধুসূদনের তুলনায় কত হীন; মধুসূদনের প্রতি তাঁহাদের মনে যে ঈর্ষা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা চিরতরে বিদূরিত হইল। সকলে কাশীধামে প্রত্যাগত হইলেন। এই সময় গুরুর আদেশে মধুসূদন একখানি দুরূহ পুস্তক প্রণয়ন করেন—ইহার নাম 'অদ্বৈতসিদ্ধি'। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন না হইলে এই পুস্তক পাঠ করিয়া ইহার মর্ম উপলব্ধি করা কাহারও সাধ্য নাই

এদিকে আকবর মধুসূদনের সন্ধান করিয়া তাঁহাকে স্বীয় রাজধানী দিল্লীতে আনাইয়া একটি পণ্ডিতসভার আয়োজন করিয়াছিলেন নানাশাস্ত্রের আলোচনায় মধুসূদনের অগাধ পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া আকবর বাদশাহ সেই সভাতেই তাঁহাকে একটি প্রশস্তি অর্থাৎ মানপত্র প্রদান করেন। মধুসূদনের যে কিরূপ অপার বিদ্যা ছিল, ইহা তাহারই পরিচায়ক। প্রশস্তিটি এইরূপ :—

বেত্তি পারং সরস্বত্যাঃ মধুসূদন-সরস্বতী।
মধুসূদন-সরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি সরস্বতী॥

অর্থাৎ মধুসূদন বিদ্যার পারে পৌঁছিয়াছেন এবং মধুসূদনের বিদ্যার গভীরতা পরিমাপ করিতে কেহই সক্ষম নহেন, যদি কেহ সক্ষম হন তা তিনি স্বয়ং সরস্বতী অর্থাৎ বিদ্যার দেবী। বিদ্যায়, পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানে, ভক্তিতে, ত্যাগে, বৈরাগ্যে, গ্রন্থরচনায়, শাস্ত্রপ্রচারে মধুসূদন ছিলেন প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। তাঁহার দ্বারা বঙ্গদেশের গৌরব যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আজ পর্যন্ত তাঁহার রচিত 'গূঢ়ার্থদীপিকা' নামক গীতার টীকা ও অন্যান্য জ্ঞানগর্ভপুস্তকাবলী সমগ্র ভারতের পণ্ডিতসমাজের পরম আদরের সামগ্রী। বেদান্তশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে হইলে, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে মধুসূদন-প্রণীত গ্রন্থাবলী পাঠ করা অত্যাবশ্যক। এই পণ্ডিত সন্ন্যাসী সমগ্র ভারতের শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁহার গ্রন্থাবলী সর্বত্রই পঠিত ও আলোচিত হইয়া থাকে। যদি বাঙালী বাংলার গৌরবকে নিজের গৌরব বলিয়া মনে করে তবে যাঁহার জন্মে বাংলা গৌরবান্বিত হইয়াছে তাঁহার জীবনী পাঠ ও আলোচনা করা তাহার পক্ষে সর্বতোভাবে কর্তব্য। দেশ ও জাতিকে উন্নত ও গৌরবান্বিত করিতে হইলে যাহা যাহা শিক্ষা করা আবশ্যক তাহা অবগত হইবার একমাত্র উপায় মহাপুরুষগণের জীবনী আলোচনা ও তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ।

বীরভূমের একটি অবহেলিত মন্দির ঃ ডাবুকেশ্বর

শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী

রাঙামাটির দেশ বীরভূম। জয়দেব চণ্ডী-দাসের বীরভূমের দান বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কম নয়। বীরভূম বাউলের দেশ, বৈষ্ণবের দেশ, শাক্তেরও লীলাভূমি। শাক্তের তপস্যাভূমি শ্রীশ্রীতারাপীঠ বামাক্ষেপার সাধনভূমি। এ ছাড়া যত্রতত্র ছড়িয়ে রয়েছে শক্তি-উপাসনার ক্ষেত্র—লাভপুরে ফুল্লরা, বোলপুরের অদূরে কঙ্কালীমাতা, সাঁইথিয়ায় নন্দিকেশ্বরী, নলহাটীতে ললাটেশ্বরী প্রভৃতি। এর কোনটির পেছনে আছে পুরাণপ্রথিত বাহান্ন পীঠের সমর্থন, কোনটির পেছনে যুক্তি দুর্বল হলেও দাবী করা হয় সতীদেবীর কাহিনীর সঙ্গে এরা সকলেই যুক্ত। বৈষ্ণবের তীর্থক্ষেত্র বীরচন্দ্রপুর নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর জন্মভূমি, মহাভারতের একচক্রানগরীর সঙ্গে একে এক করে দেখে থাকেন এতদঞ্চলের বাসিন্দাগণ। শুধু এইই নয়; শৈবসাধনার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে ছিল না অতীতের বীরভূম, তার প্রমাণ যথেষ্ট রয়েছে। শক্তি-উপাসনার স্থানগুলি কিছু কিছু প্রচারলাভ অধুনা করলেও শিবসাধনার স্থান-সমূহ আজও অপরিচিত। শিবসাধনার ক্ষেত্র হিসাবে আমরা কতকগুলি মন্দিরের নাম স্মরণ করব—মল্লারপুরে মল্লেশ্বর, কীর্ণাহারের অদূরে জল্লেশ্বর বা জল্পেশ্বর, তারাপীঠের নিকটে ডাবুকেশ্বর প্রভৃতি। প্রতিটি মন্দিরেই আজিও ভক্তসমাগম হয়ে থাকে মঙ্গলবার ও শনিবারে। এছাড়া শিবচতুর্দশীতে তো হয়ই। বীরভূমের গ্রামে গ্রামে দেখা যায় এদের পূজারী পাণ্ডারা 'বাবার প্রসাদী বেলপাতা' নিয়ে বাড়ী বাড়ী ফিরছেন। কিছু কিছু 'সিধা' ও অল্প দক্ষিণার বিনিময়ে এঁরা দিয়ে আসেন মহেশ্বরের আশীর্বাদ গৃহস্থের মঙ্গলকামনায়।

আমাদের বর্তমান আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে একটি শিবসাধনার ক্ষেত্রকে নিয়ে। বীরভূম অথবা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্র দেখা যাবে বহুকালের পুরাতন শিবমন্দির। তার অনেকগুলিই প্রত্নতাত্ত্বিকের কৌতূহল মেটাতে পারে। একটি মন্দিরকে ঘিরে এক একটি বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ সমবেত হন বিভিন্ন পর্ব উপলক্ষে।

পূর্ব রেলপথের সাহেবগঞ্জ লুপলাইনের একটি স্টেশন, নাম মল্লারপুর। সেখান হতে ৬ মাইল সোজা পূর্বে একটি গ্রাম, নাম ডাবুকেশ্বর। প্রতিটি ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করেছি যে যেখানে 'শিব' রয়েছেন সে গ্রামের নাম 'ঈশ্বর' দিয়ে গঠিত। উদাহরণ আগের নামগুলি হতে মিলবে অথবা আরও একটি মন্দিরের নাম করা যায়, যেটি সাঁইথিয়া রেলস্টেশনের অদূরে কলেশ্বর শিবমন্দির। এই ডাবুকেশ্বরেও আছে শিবমন্দির। মন্দিরের চড়াটি বহুদূর হতে নজরে প'ড়ে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরই দু-মাইল উত্তর-পশ্চিম কোণে আছেন 'বশিষ্ঠারাধিতা তারা', বামাক্ষেপার সাধন-ক্ষেত্র; সুতরাং সেখান হতেই নজরে এসেছে এ মন্দিরের শীর্ষভাগ, ডাক দিয়েছেন মহাদেব নিজেই। গোযানই এই অঞ্চলের একমাত্র চলাচলের উপায়। আমাদের উপায় পদ-যাত্রা। গ্রামের প্রাচীনদের মুখে গ্রামটির পরিচয় 'গ্রামটি স্বরূপসিংহ পরগণার অন্তর্গত।' বর্তমান মৌড়েশ্বর থানার ও রামপুরহাট মহকুমার

অধীনে এ গ্রাম। গ্রামের আধ মাইল উত্তরে "মজুরহাটি" গ্রামে থাকেন পুরানো জমিদার।

গ্রামটিকে মোটামুটি বড়ই বলা যেতে পারে। একটু বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলাম যে গ্রামের বাসিন্দাগণ অধিকাংশই মুসলমান-ধর্মাবলম্বী। আরও আশ্চর্য হলাম যে মন্দিরের চারিপাশে সমস্তই মুসলমানের বাড়ী। গ্রামের মাঝামাঝি জায়গায় মন্দিরটি স্থাপিত। মন্দিরের এলাকা অনেকদূর বিস্তৃত।

সমতলভূমি হতে আনুমানিক সাড়ে চারিহাত উঁচুতে মন্দিরটি স্থাপিত। দুই বিঘা জমি জুড়ে বিস্তৃত এই মন্দির এলাকা। মন্দিরটি আনুমানিক ষোল হাত পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। তিনটি চত্বর ও দুটি সিংহদ্বারে বিভক্ত মন্দিরটি। প্রথম চত্বরটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা পনের ষোল হাত বারান্দাযুক্ত, দ্বিতীয় চত্বরে দশটি ঘর অতিথি-সেবার জন্য, তৃতীয় চত্বরে উত্তর দিকে একটি কালীর মন্দির, দুটি ভাঁড়ার ঘর, আটটি ঘর বিভিন্ন কাজের জন্য ও একটি ভোগঘর। এই চত্বরের পূর্বদিকে আগত সন্ন্যাসীদের পূজাদির জন্য চারটি ভোগঘর, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হাজার লোকের বসার মত ঢাকা বারান্দা, পূর্ব ও দক্ষিণে জলের জন্য ইন্দারা। এই চত্বরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সাড়ে চার হাত উঁচু বেদীর ওপর মূল বেদী ও মন্দির। অধিষ্ঠিত দেবতা উন্মত্তেশ্বর ভৈরব, অনাদিলিঙ্গ। বিগ্রহ দেখার জন্য চারিদিকে খোলা বারান্দা। মন্দিরটি আনুমানিক পঞ্চাশ হাত উঁচু। মন্দিরের পূর্বদিকে একটি ডোবা, স্থানীয় ভাষায় 'গড়ে', নাম চন্দনগড়ে। আগে মন্দিরের চারিপাশে যাঁরা বাস করতেন তাঁরা ব্রাহ্মণ, কুমার, মালি প্রভৃতি শ্রেণীর হিন্দু। পুরানো দিনে মন্দির ছিল বিত্তশালী, বর্তমানে তার সম্পত্তি দাঁড়িয়েছে বত্রিশ বিঘা জমি, সেটুকুও সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে।

বীরভূমের বহুখ্যাত কৈলাসপতি মহারাজ এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমে ১২৮০ হতে ১৩০০ বঙ্গাব্দের মধ্যে এ মন্দির নির্মিত হয়। আনুমানিক ব্যয় দেড় লক্ষ টাকা। সাধক কৈলাসপতি সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত। ১১৮৪ বঙ্গাব্দে নদীয়া জেলার উলোগ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সন্ন্যাসের আগে তাঁর নাম ছিল ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়। যৌবনের শুরুতেই ভুবনমোহন গৃহত্যাগী হন; তারপর বৃন্দাবনে গিয়ে অটলানন্দ মহারাজ অথবা কাশীতে গিয়ে ব্রহ্মানন্দ মহারাজের কাছে দীক্ষা নেন। কাশীতে বাস করার সময় তিনি বাবা চন্দ্রনাথের স্বপ্নাদেশ পান ও রাঢ়ের এই অঞ্চলে এসে উন্মত্তেশ্বর ভৈরবের মন্দির স্থাপন করেন।

কৌলাচারী সাধক ছিলেন এই কৈলাসপতি। ১২২০ বঙ্গাব্দে তিনি ডাবুকেশ্বরে আসেন। জমিদার মহেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। জমিদারবাড়ীর জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁকে বলেন যে তারাপীঠের মহাশ্মশানে একটি শিবলিঙ্গ আছে। তখন কৈলাসপতি তারা-পীঠের শ্মশান হতে ঐ শিবলিঙ্গ উদ্ধার করে এনে স্থাপন করেন ডাবুকেশ্বরে

প্রচলিত কাহিনী আসল মন্দিরটিকে আরও প্রাচীনতর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে। ডাবুকেশ্বরের অদূরে বৈষ্ণবতীর্থ বীরচন্দ্রপুর, যার খ্যাতি একচক্রানগরী ব'লে। এই একচক্রার সঙ্গে স্থানটি মহাভারতীয় যুগে স্থাপিত হওয়ার সনদ লাভ করছে। ভীমের এক স্মরণীয় কীর্তি অনুষ্ঠিত হয়েছিল একচক্রা-নগরীতে। সম্ভবতঃ সেই সূত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে বর্তমান গ্রামের কাহিনী প্রচলিত।

পাণ্ডবজননী কুন্তী অজ্ঞাতবাসে থাকাকালীন পাঁচপুত্র সহ এখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তখনও এখানে শিবমন্দির ছিল। কুন্তীদেবীর সঙ্গে পাণ্ডবগণ কয়েক দিন বাস করেছিলেন এই মন্দির এলাকায়। মন্দিরটি পরে নষ্ট হয়ে যায়। সেই পুরাতন মন্দিরের বেদীর উপরেই বর্তমান বেদী স্থাপিত। বর্তমান অধ্যক্ষ কৈলাসপতি শিবলিঙ্গ উদ্ধার করার পর অর্থসংগ্রহে বাহির হন এবং কলিকাতায় আসেন। কলিকাতা হতে ফিরবার পর তিনি ছ-বিঘা জমি নির্দিষ্ট করেন মন্দিরনির্মাণের জন্য। জনৈক মুসলমান তখন ঐ জমির মালিক ছিলেন। যাদুসেখ নামে এক মুসলমান তাঁকে ঐ সময় সাহায্য করেন, কেননা জমি সংগ্রহ করতে গিয়ে বিবাদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তারপর মন্দিরের ভিত্তি-পত্তন হয়। এই সময় মাটির নীচ হতে বের হয়ে আসে পুরানো বেদী।

কৈলাসপতির বহু ভক্ত-শিষ্যের কথা বলা হয়ে থাকে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তদানীন্তন কাশ্মীরসম্রাটের দেওয়ান মহেশচন্দ্র বিশ্বাস। কাশ্মীর-রাজবংশের কোন সন্তান ছিল না। তাঁর খ্যাতি এত বিস্তৃতি লাভ করেছিল যে তিনি কাশ্মীররাজ কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে কাশ্মীরে গমন করেন, সঙ্গে যান তাঁর বহু ভক্ত-শিষ্য। সেখানে তাঁরা এক বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞের ফলে নিঃসন্তান রাজা এক সন্তান লাভ করেন। এই সন্তানের নাম রাখা হয় হরিহর সিংহ। রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে সন্ন্যাসী মহারাজকে মন্দিরনির্মাণের জন্য একলক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা দান করেন ও মাসিক ৫০৲ (পঞ্চাশ) টাকা সেবাভোগের জন্য দেবার প্রতিশ্রুতি দেন।

কৈলাসপতি মহারাজের দেহরক্ষার পর ডাবুকেশ্বরের মন্দিরের সেবাভোগ-ব্যবস্থাকে স্থায়ী রাখার অনেক আয়োজন করা হয়েছে। স্বামী কুমারানন্দ ২৪. ২. ২৯ বঙ্গাব্দে আদালত হতে সেবার অনুমতি লাভ করেন। ১৩৩১ সালে স্বামী শ্যামানন্দের নেতৃত্বে এক জনসভা আহূত হয়েছিল। ১৩৩২ বঙ্গাব্দে সিউড়ি সদর মহকুমার জজ ও রামপুরহাটের সাব-ডিভিসনাল জজকে নিয়ে এক 'ট্রাস্টি' কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিতে তেরোজন সদস্য ছিলেন। পূর্বকথিত কাশ্মীররাজের মাসিক সাহায্য ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত পাওয়া যেত। তারপর কোন প্রকার সাহায্য না পাওয়ায় ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সেবাভোগ বন্ধ ছিল। ১৩৬৪ সালে জগন্নাথগিরি মহারাজের নেতৃত্বে একটি নতুন 'কমিটি' গঠিত হয়েছে। মন্দিরটির যথাসম্ভব সংস্কার করে স্থাপিত হয়েছে 'কৈলাসপতি সেবাসঙ্ঘ'। পুরাতন প্রথামত সেবাভোগের আয়োজন করে দর্শনার্থীদের সুযোগসুবিধা দানের চেষ্টা করছেন এই সেবাসঙ্ঘ।

সমালোচনা

Ramakrishna and his Disciples by Christopher Isherwood. Publisher: Advaita Ashram, 5, Dehi Entally Road, Calcutta—14. (Printed in England.) Pp. 343 + xii, Price (in India) Rs. 12'50.

লেখক আধুনিক সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত। ধর্মীয় সাহিত্যে তাঁর পারদর্শিতার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার সুন্দর ছন্দানুবাদের মাধ্যমে। ইংরেজী ভাষাভাষীদের জন্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের এই জীবনী লিখে তিনি এবিষয়ে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করলেন। গীতার অনুবাদে তিনি রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের হলিউড কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দজীর সঙ্গে সহযোগিতা করেন। ক্রমে এই যোগাযোগ তাঁকে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনে গভীর অনুপ্রবেশে যথেষ্ট সহায়তা করেছে; আর জুগিয়েছে সত্যানুসন্ধীর দৃষ্টিকোণ থেকে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের ভাগবত-জীবন অনুধ্যানের প্রচুর প্রেরণা এবং তাঁর উত্তরসাধক অন্তরঙ্গ শিষ্যদের সাধনা ও তাঁদের প্রবর্তিত সঙ্ঘের গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্যাদি আহরণে স্পৃহা। উভয়তই তিনি যে প্রশংসার্হ সাফল্য অর্জন করেছেন, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ বইটির সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে।

ধর্মজগতে শ্রীরামকৃষ্ণের অতুলনীয় দান আজ সর্বত্র স্বীকৃত। তাঁর পাশ্চাত্য জীবনী-লেখক মনীষী ম্যাক্সমূলার ও রঁমা রঁলা-কে এই দেব-জীবনের অতলস্পর্শী গভীরতা বিস্মিত করেছে। আর্য-ভারতের আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসে যাবতীয় ধর্মসাধনার প্রত্যেকটি মূল সত্য তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। যে নির্বিকল্প সমাধির আনন্দ জীবনে একবার আস্বাদন করলে ব্রহ্মানুভূতিলাভে সাধকের জীবন কৃতকৃতার্থ হয়, সাধনকালে শ্রীরামকৃষ্ণ ছয়মাস কাল নিরন্তর সেই ভূমিতে অবস্থান করেছেন! সাধনকালের পরেও কতশতবার তাঁর সেই অবস্থায় স্থিতি হয়েছে, তার হিসাব কে দেবে? এখানেই কি শেষ? খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্ম প্রভৃতিতও সাধন ক'রে তিনি সিদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর প্রধান জীবনী-লেখক স্বামী সারদানন্দও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে দার্শনিক যুক্তি অবলম্বনে বিস্তৃত আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন যে, পৃথিবীর সব ধর্মের সার সত্য শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে উপলব্ধ হয়েছে। এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি-সঞ্জাত তাঁর উদার সর্বধর্মসমন্বয়-বার্তা—'যত মত তত পথ'—তাই ভিন্ন ধর্মীরও অন্তর স্পর্শ করে।

সাধন-শেষে মা জগদম্বা তাঁকে আদেশ করেছিলেন: তুই ভাবমুখে থাক। অর্থাৎ এ যেন কতকটা ঘর ও দাওয়ার মাঝের চৌকাঠে দাঁড়ানো—যেখান থেকে ভেতর বার (নিত্য ও লীলা) দুই-ই দেখা যায়। বাইরের জগৎকে তাই তিনি মায়া ব'লে উড়িয়ে দেননি। তবে স্থূল জগৎটা আমাদের কাছে যতখানি সত্য, তাঁর কাছে সূক্ষ্ম জগৎ ঠিক ততখানিই সত্য ছিল। তাই তিনি আমাদের 'শিব-জ্ঞানে জীব-সেবা' করতে উপদেশ করেছেন।

কিন্তু যে জীবন এত গভীর, তার উপর যেন অনেক সময়ই একটি আবরণ টানা থাকতো সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার। তাঁর অপার আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের খবর ক'জন রাখতেন? জিজ্ঞাসুর কাছে অবশ্য তাঁকে ধরা দিতে হতো।

তাতেও সব সময় সকলের সংশয় মিটতো না। কেননা একদিকে যেমন তিনি তন্ময় হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধর্মালোচনা ক'রে একঘর লোককে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখতেন, অন্যদিকে তেমনি তাঁর অন্তরঙ্গ যুবক-শিষ্যদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি ক'রে হাসির ফোয়ারা ছোটাতেন, বর্ষীয়ান শিষ্যদের সঙ্গে তাঁদের মতো করে রঙ্গরসের কথা বলতেন। তথাকথিত শালীনতার সীমা লঙ্ঘিত হলো কিনা তা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। মনীষী কেশব সেনের অপূর্ব বাগ্মিতা বা পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির চতুর শাস্ত্রব্যাখ্যান-কৌশল তাঁর ছিল না সত্য। কিন্তু এইসব মনীষী এই সহজ মানুষটির সামনে শিশুর মতো আচরণ করতেন, তাঁর কথার গভীর তাৎপর্য অনুধাবন ক'রে অবাক হতেন। 'ব্যাঙাচির ল্যাজ খসা', 'ফুলের গন্ধে মেছুনির ঘুম না আসা' প্রসঙ্গাদি কেশববাবুকে মুগ্ধ করেছিল। ঠাকুর যখন কথার মাঝে গম্ভীর হয়ে যেতেন, তখন অন্য চেহারা। কাছে যেতে কেউ সাহস পেতেন না। গৃহস্থ ভক্তদের তিনি দাসীর মতো বা পাঁকাল মাছের মতো সংসারে থাকতে বলতেন। কিন্তু অন্তরঙ্গ যুবক ভক্তদের সব ছেড়ে ভগবানকে ডাকতে বলতেন; কারণ একমাত্র সৎ বস্তু তিনিই।

এইরূপ আপাতবিরোধী ভাব ও বিচিত্র ঘটনায় পূর্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের একটি বিশ্বস্ত চিত্র গ্রন্থকার তুলে ধরেছেন বিভিন্নরুচিসম্পন্ন দেশ-বিদেশের পাঠকের সামনে। তাঁর গ্রন্থনের প্রধান উপজীব্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত। ভাল-লাগা মন্দ-লাগার, উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন ছেড়ে দিয়ে তিনি পর পর হুবহু ঘটনা লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়নি। সবই যাচাই করা সত্য। লেখক শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত, তাঁর অবতারত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু ভক্তির আতিশয্য বা উচ্ছ্বাস বইটিতে নেই। রয়েছে সংযত মৌন স্বীকৃতি। দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিক যুক্তিসহ; নিরাভরণ ভাষার সহজ স্বচ্ছন্দ নির্বাধ গতিতে বর্ণনা এগিয়ে চলেছে। তবে এতে সজীবতা ব্যাহত হয়েছে কিছুটা। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন ও জগদম্বার প্রথম দর্শন, হরগৌরীর মিলন সম শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদার পরিণয়, বিশেষ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারার প্রধান ধারক ও প্রচারক বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে চিত্রগুলি জীবন্ত হয় নাই। ঈশারউড-এর লক্ষ্য সর্ব স্তরের পাঠক, যাঁদের মানসিক গঠন যেমন স্বতন্ত্র, চিন্তাধারাও তেমনি বিচিত্র। তাই ভয় হয়, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধক- ও পরবর্তী-জীবনের আচরণ ও দর্শনাদি অনেক ক্ষেত্রে (পৃঃ ৫৮-৯, ১১৩-১৫, ১৪৮, ইং) পাশ্চাত্য পাঠকের রুচিবোধে হয়তো বা ধাক্কা দেবে। (তবে ভুললে চলবে না আধুনিক চিকিৎসায় 'শক ট্রীটমেণ্ট'-এর অবদান স্বীকৃত হয়েছে !) কিন্তু সত্যের সম্মুখীন হতে ভয়ই বা কেন ? ৫১

'কালী'রূপের বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক এ বিষয়ে সুন্দর আলোকপাত করেছেন। তিনি পশ্চিমীদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন, তাঁদের "the pretty and pleasant are more 'real' than the ugly and the unpleasant"—এই ধারণা বিকৃত সত্য। হিন্দুর ধারণা অন্যরূপ, তাঁরা ভয়ঙ্করেরও পূজারী। (আণবিক বিজ্ঞানীরাও অজ্ঞানতঃ তাই নয় কি ?) স্বামীজীর "নাচুক তাহাতে শ্যামা", "Kali the Mother" কিসের প্রতীক ? আলোচ্য গ্রন্থটি পড়ে পাশ্চাত্যবাসীর (তথা যুক্তিবাদী দেশীয় পাঠকের) হিন্দুধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে ধারণা আরও স্পষ্ট হবে। অনেক ভুল ভাঙবে। আধ্যাত্মিকতা ও সিদ্ধাই

(psychic power), সমাধি ও ভাব (trance) ধর্মনিষ্ঠা ও গোঁড়ামি প্রভৃতির পার্থক্য সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর মতো প্রকাশনার সর্ব বিভাগে প্রখর দৃষ্টি দেওয়ায় (যেমন, ধারণার সৌকর্যার্থে অনেক ছবি সংযোজন) বইখানি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর, এ কথা বলাই বাহুল্য। আশা করি আগামী সংস্করণে ২১৮ পৃষ্ঠার ভ্রমটি সংশোধিত হবে—নিত্যনিরঞ্জন সেন নয়, ঘোষ হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন অনবদ্য, অভূতপূর্ব। সাধারণ মাপকাঠিতে মেপে একে ক্ষণজন্মা নেতা, বীর যোদ্ধা বা যুগন্ধর পুরুষের পর্যায়ে ফেলে রাখলে ভুল করা হবে। গ্রন্থকার তাই এই ভাগবত জীবনকে বলেছেন একটি phenomenon—যা অসাধারণ ও রহস্যময় হলেও প্রত্যক্ষীভূত। পাঠক এ-জীবনকে কী ভাবে গ্রহণ করবেন?—"How should one interpret it ? How react to it ? Should it be dismissed from the mind, as something irrelevant and inconveniently out of line with everyday experience ? Or should it be taken as the starting point of a change in one's own ideas and life ?" (P. 333)

স্বামী সত্যঘনানন্দ

গীতাতত্ত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহ প্রণীত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির প্রকাশকমণ্ডলী, ৪নং ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো, কলিকাতা-২৫ কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম খণ্ড—২৫৬ পৃষ্ঠা; দ্বিতীয় খণ্ড—২৯৬ পৃষ্ঠা; প্রতি খণ্ডের মূল্য—৮৲ টাকা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক সুপণ্ডিত এবং মনীষী সাধক গ্রন্থকার এই দুইটি পুস্তকে গীতার শিক্ষার সহিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বহু উক্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং সামঞ্জস্য অতি চমৎকারভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই কার্যে তাঁহাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। যে চিন্তাশীলতা, মনন-প্রাখর্য, অন্তর্দৃষ্টি এবং শাস্ত্রজ্ঞানের তিনি পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রসংশনীয়। গ্রন্থ দুটি যেন একাধারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাষ্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশের গীতা-সূত্র। যাঁহারা গীতার অনুরাগী তাঁহারা গীতার নূতন আলোক পুস্তকদ্বয়ে দেখিতে পাইবেন, পক্ষান্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তেরা যুগাবতারের শিক্ষার গীতালোকদীপ্ত সার্থকতা দেখিয়া আনন্দিত হইবেন।

গ্রন্থকার গীতার ১৬৩টি শ্লোক আলোচনার জন্য নির্বাচন করিয়াছেন। শ্লোকগুলি ১৬টি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হইয়াছে। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের মূল বিষয়বস্তু আবার কয়েকটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত। প্রত্যেক অনুচ্ছেদেরও আলোচ্য বিষয়ের এক একটি নাম দেওয়া হইয়াছে। উদাহরণ: প্রথম পরিচ্ছেদ—অবতার তত্ত্ব (ক) অবতারের লীলা (খ) অবতারকে চেনা কঠিন (গ) অবতারের উদ্দেশ্য (ঘ) অবতার-তত্ত্বে প্রতীতির ফল। এই পরিচ্ছেদে গীতার ৪র্থ, ৭ম, ৯ম এবং ১০ম অধ্যায় হইতে প্রাসঙ্গিক ৯টি শ্লোক আলোচনার জন্য লওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক শ্লোকের প্রাঞ্জল অনুবাদের পর গ্রন্থকারের নিজস্ব আলোচনা এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নানা উক্তি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, সুরেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক সংগৃহীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—এই তিন গ্রন্থ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ গ্রন্থকার উদ্ধৃত করিয়াছেন। গীতার আলোচনায় তিনি শঙ্করাচার্য, মধুসূদন সরস্বতী, শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যগণের

ব্যাখ্যা মাঝে মাঝে উল্লেখ করিয়াছেন। পরিশিষ্টে অন্যান্য শাস্ত্র এবং সাধুসন্তের বাণী হইতে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি গ্রন্থের একটি মূল্যবান বৈশিষ্ট্য। উপযুক্ত ১৬৩ শ্লোক ছাড়া গীতার আরও প্রায় দুইশত শ্লোক অংশতঃ বা সম্পূর্ণ আলোচনায় স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে ১২০ পৃষ্ঠা ব্যাপী নির্ঘণ্টটি শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের উপদেশের একটি মূল্যবান নির্দেশিকা।

এই সুসম্পাদিত এবং সুলিখিত গ্রন্থটি বাংলার ধর্মসাহিত্যের তথা শ্রীরামকৃষ্ণ ও গীতা-সাহিত্যের একটি বিশেষ আদরণীয় সংযোজন বলিয়া আমরা মনে করি। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ
স্যানফ্রান্সিস্‌কো বেদান্ত সোসাইটি

সন্ত তেরেশা ও পূর্ণতার সাধন—শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহ প্রণীত, প্রকাশক—শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির প্রকাশক-মণ্ডলী, ৪নং ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো, কলিকাতা-২৫ ; পৃষ্ঠা—৯৫ ; মূল্য ১·৫০ টাকা।

সন্ত তেরেসা খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর স্বনাম-ধন্যা স্পেনদেশীয় মরমী সাধিকা। অপূর্ব বিশ্বাস, ভক্তি, ত্যাগবৈরাগ্য ও তত্ত্বজ্ঞানে তাঁহার জীবন উদ্দীপ্ত। যে কোন ধর্মের ঈশ্বরভক্তগণ এই অলোকসামান্যা মহীয়সীর জীবন হইতে প্রচুর আধ্যাত্মিক প্রেরণা লাভ করিতে পারেন। বর্তমান বইটিতে ডক্টর হরিশ্চন্দ্র সিংহ সন্ত তেরেসার জীবনী সংক্ষেপে উপস্থাপিত করিয়া ঐ সাধিকার লিখিত 'পূর্ণতার সাধন' (The way of Perfection) নামক উপদেশাবলীর বঙ্গানুবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উপদেশগুলি মর্মস্পর্শী। প্রতি অধ্যায়ের প্রারম্ভে লেখক নানা হিন্দুশাস্ত্র হইতে প্রাসঙ্গিক উক্তিসমূহ উদ্ধৃত করায় হিন্দু আধ্যাত্মিক সাধনার পট-ভূমিতে খ্রীষ্টীয় মরমী সাধনা বুঝিতে সুবিধা হইবে। খ্রীষ্টান ও অ-খ্রীষ্টান উভয় পাঠকের নিকট পুস্তকটি সমাদৃত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ
বেদান্ত সোসাইটি, স্যানফ্রান্সিস্‌কো

শ্রীশ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের স্মৃতিকথা—প্রকাশক : সম্পাদক, রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম, বারাসত, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ৯৪ ; মূল্য দুই টাকা।

বিভিন্ন সময়ে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ভক্তগণকে যে সব সারগর্ভ উপদেশ দিয়াছিলেন, সেগুলির কতকাংশ চার জন ভক্তের দিন-লিপিতে লিখিত হইয়াছিল ; আলোচ্য গ্রন্থখানি সেই স্মৃতিগুলিরই মুদ্রিত রূপ।

দীর্ঘকাল ধরিয়া মহাপুরুষগণের সঙ্গলাভ কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে, কিন্তু অল্পক্ষণের জন্যও ভাগবত জীবনের সান্নিধ্যলাভ মহাভাগ্যে হয়—

'ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।'

স্মৃতিকথা যথাযথরূপে প্রকাশ করা দুরূহ। গ্রন্থে লিপিবদ্ধ দীর্ঘ ও ক্ষুদ্র উভয় স্মৃতিই পাঠক-চিত্তে স্থায়ী রেখাপাত করিতে সমর্থ। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া এই ধারণা হইবে যে, পুণ্য জীবনের স্মৃতিকথা হৃদয়-মন পবিত্র করিয়া এক অপার্থিব আনন্দের সন্ধান দেয়।

ভক্তগণ জানিয়া আনন্দিত হইবেন, এই পুস্তকের সমগ্র আয় বারাসত শ্রীরামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমের শ্রীশ্রীঠাকুরসেবায় ব্যয়িত হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

বারাণসী: রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৬৩-৬৪ খৃষ্টাব্দের ৬৩তম কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত আলোচ্য বর্ষে উল্লেখযোগ্য সেবাকার্য :

(১) অন্তর্বিভাগীয় সাধারণ হাসপাতালে ২,২৮১ জনকে ভরতি এবং ৬৩২ জনের অস্ত্র-চিকিৎসা করা হইয়াছে। দৈনিক গড়ে ৮৭টি শয্যা রোগীদের দ্বারা অধিকৃত ছিল।

(২) বাহিরের রোগীর চিকিৎসা-বিভাগে (শিবালা শাখাসহ) ৫৮,৬৩৬ জন নূতন ও ১,৭৬,২৯৪ জন পুরাতন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। রোগীর সংখ্যা দৈনিক গড়ে ৬৪৪। এই বিভাগে মোট ৪২,২৬৬ জন রোগীকে অস্ত্র-চিকিৎসা করা হইয়াছে।

(৩) বৃদ্ধ ও আতুর নিবাসে—যাহাদের কোন সংস্থান নাই এইরূপ ১২ জন পুরুষ ও ২৩ জন মহিলাকে রাখা হইয়াছিল।

(৪) সাহায্যদান বিভাগ হইতে ১০৭ জন অসহায় বৃদ্ধ ও মহিলাকে মোট ২,৭৯৪·০২ টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

(৫) সাময়িক ও বিশেষ সাহায্য-বিভাগ হইতে বিপন্ন ১০৫ জন ভ্রমণকারীকে খাদ্য বা অর্থ-সাহায্য করা হয়—মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৩৯৮·৫০ টাকা। ইহা ছাড়া ৮৯টি কম্বল বিতরণ করা হয়।

(৬) দৈনিক গড়ে ৫০৩ জন শিশু, প্রসূতি ও বৃদ্ধ-আতুরকে ১,১২৪ পাউণ্ড গুঁড়া দুধ হইতে দুধ প্রস্তুত করিয়া বিতরণ করা হইয়াছিল।

(৭) শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তীর উদ্বৃত্ত তহবিলের আয় হইতে রচনা-প্রতিযোগিতা, লাইব্রেরির বই এবং স্কুলের দরিদ্র শিশুদের বই ইত্যাদিতে ২৩১৲ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। ১০৪ জন দরিদ্র শিশুকে মোট ৪৭০ খানি পুস্তক দেওয়া হইয়াছে।

(৮) হাসপাতালে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষাগার এবং এক্স-রে ও ইলেক্ট্রোথেরাপি বিভাগে পরীক্ষা ও চিকিৎসাদি যথাযথ অনুষ্ঠিত হয়।

বহু বিশিষ্ট চিকিৎসক সেবাশ্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট। রোগীদের সেবা-শুশ্রূষার অধিকাংশ কার্যই মিশনের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এবং সহৃদয় জনগণের সাহায্যে পবিত্র কাশীধামে এই সেবাশ্রমের মাধ্যমে নরনারায়ণসেবার কাজ সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে।

কলম্বো: সিংহল শাখার প্রধান কর্মকেন্দ্র কলম্বো রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যবিবরণী (১৯৬২, এপ্রিল—১৯৬৪, মার্চ) প্রকাশিত হইয়াছে।

এই আশ্রমে নিয়মিত পূজাপাঠ, সাময়িক উৎসব এবং ধর্মশাস্ত্র অবলম্বনে ক্লাস ও আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শিশুদের নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য ১৯৫২ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রতি রবিবারে ধর্ম-ক্লাস করা হইতেছে; ১৫টি শিশু লইয়া ইহা আরম্ভ করা হয়, বর্তমানে ৪২৫টি শিশু ক্লাসে যোগদান করে; ১৫ জন অবৈতনিক শিক্ষক এই কার্য পরিচালনা করেন।

১৯৬২ খৃষ্টাব্দে স্বামীজীর শতবার্ষিকী উৎসব সিংহলের বিভিন্নস্থানে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

গ্রন্থাগারে ২,৩৪০ খানি সুনির্বাচিত পুস্তক রাখা হইয়াছে ; পাঠাগারে ৯টি দৈনিক ও ২৬টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে ১৫ই অক্টোবর আন্তর্জাতিক কৃষ্টিভবন উদ্বোধন করেন। বর্তমানে এই কৃষ্টিকেন্দ্রের উদ্দেশ্য ত্রিবিধ : (১) দরিদ্র ছাত্রদিগকে স্থান দেওয়া, (২) অতিথিদিগের থাকার ব্যবস্থা করা, (৩) ধর্ম ও কৃষ্টি সম্বন্ধে ক্লাস করা।

পুস্তক-বিভাগে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রকাশিত পুস্তকাবলী বিক্রয় করা হয়। আলোচ্য সময়ে এই বিভাগ হইতে ইংরেজী, তামিল ও সিংহলী ভাষায় স্বামীজী-সম্বন্ধে মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রকাশ করা হইয়াছে।

কাটারাগামা রামকৃষ্ণ মিশন মণ্ডপ ধর্মশালায় তীর্থযাত্রীদিগকে জাতিধর্মনির্বিশেষে সাহায্য করা হইয়া থাকে। এই ধর্মশালায় প্রতিদিন গড়ে ৩০০ জন এবং শনি-রবিবার গড়ে প্রায় ৭০০ জন তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য সময়ে বার্ষিক উৎসবে (জুলাই-আগস্ট) ১৬ দিন পর্যন্ত প্রায় ৯,০০০ তীর্থযাত্রীকে বিনামূল্যে আহার্য ও ৩০,০০০ লোককে সরবৎ দেওয়া হয়।

বাট্টিকালোয়া আশ্রমের উদ্যোগে জেলখানার কয়েদীদিগকে ও কুষ্ঠাশ্রমে রোগীদিগকে ধর্ম-শিক্ষা, ও ৩০০ জন ছাত্রকে ভজনাদি শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এবং বালকদের জন্য একটি ও বালিকাদের জন্য দুইটি অনাথাশ্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে।

জামসেদপুর : রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির ৪৩তম বর্ষের (এপ্রিল, ১৯৬৩—মার্চ, ১৯৬৪) কার্যবিবরণীতে প্রকাশ :

এই কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে শহরের বিভিন্ন স্থানে ১২টি বিদ্যালয় আছে ; তন্মধ্যে ৫টি উচ্চ মাধ্যমিক—৩টি বালকদের ও ২টি বালিকাদের জন্য। বিদ্যালয়গুলিতে আলোচ্য বর্ষে মোট ৮,৬৩৯ জন ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করিয়াছে ; তন্মধ্যে ৪,৬৫২ জন বালক ও ৩,৯৮৭ জন বালিকা। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে খেলাধুলা ও স্বাস্থ্যচর্চার সুব্যবস্থা আছে।

১১টি স্কুল-লাইব্রেরির মোট পুস্তক-সংখ্যা ২১,৭৯৯। সর্বসাধারণের ব্যবহার্য প্রধান গ্রন্থাগারে হিন্দী, বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত ও গুজরাটী ভাষার পুস্তক রাখা হইয়াছে, এই গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ৩,৩৪৮। সাধারণ পাঠাগারে ৩টি দৈনিক, ৪টি সাপ্তাহিক ও ১৭টি মাসিক পত্রিকা লওয়া হয়।

সোসাইটি-পরিচালিত দুইটি ছাত্রাবাসের একটি আশ্রমের জমিতে এবং অন্যটি সাকচীতে সুবর্ণরেখা নদীর তীরে অবস্থিত। ছাত্রাবাস দুইটিতে আলোচ্য বর্ষে গ্রামাঞ্চলের ৪১ জন বিদ্যার্থীর মধ্যে ৪ জন বিনা-খরচে ছিল।

আশ্রমে নিয়মিত পূজা ও সাময়িক উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বর্ষে স্বামীজীর শত-বার্ষিক উৎসব আশ্রমে ও শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিক অনুষ্ঠানের উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা প্রতি বৎসর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় শহরের ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কৃতী ছাত্রকে তিন বৎসরের জন্য ২৫৲ টাকার একটি বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পাটনা : রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ৪২তম কার্যবিবরণী (১৯৬৩ এপ্রিল হইতে ১৯৬৪ মার্চ) প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় ভক্তগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রমটি ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। আলোচ্য বর্ষের কার্যধারা নিম্নরূপ : নানাস্থানে ও আশ্রমে

মোট ২৪৭টি ধর্মীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বামী অদ্ভুতানন্দ অবৈতনিক উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২২৪টি বালক শিক্ষালাভ করে, ইহাদের অধিকাংশই দরিদ্র ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের।

আশ্রমের ছাত্রাবাসে ২৯ জন বিদ্যার্থী ছিল, তন্মধ্যে ১২ জন বিনা খরচে এবং ৭ জন আংশিক ও ১০ জন পুরা খরচে ছিল। তুরীয়ানন্দ গ্রন্থাগারের মোট পুস্তক-সংখ্যা ৭,১৫১; আলোচ্য বর্ষে নূতন সংযোজিত পুস্তক ৩১১; পাঠাগারে ৭ খানি দৈনিক ও ৯৮টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক্ দাতব্য চিকিৎসালয়ে চিকিৎসিতের সংখ্যা যথাক্রমে ৬৯,১৬৩ (নূতন ৭,৭০৮) ও ৫০,০০০ (নূতন ৬,১৪৯)।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ ১৯৬৪, ফেব্রুআরি মাসে পাটনা আশ্রমে শুভাগমন করিয়া সপ্তাহাধিক কাল অবস্থান করেন।

বিশাখাপত্তনম্ঃ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৬৩-৬৪ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। সমুদ্রসৈকতে অতি মনোরম পরিবেশে অবস্থিত এই আশ্রমে নিয়মিত পূজা-পাঠ ব্যতীত আধ্যাত্মিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সাময়িক উৎসবগুলিও সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করা হয়।

আশ্রম কর্তৃক একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার পরিচালিত হইতেছে। পাঠাগারে ২,৩৪৩ খানি পুস্তক আছে এবং ২০ খানি মাসিক ও ৬ খানি দৈনিক পত্রিকা রাখা হয়। শিশুদের জন্য একটি লাইব্রেরি আছে, তাহাতে ছবির বই-ই বেশী রাখা হইয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ করা হয় ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে। বর্তমানে সেখানে ৩৩০টি শিশু পড়ে এবং ১৫ জন শিক্ষক তাহাদের শিক্ষা দেন। আলোচ্য বর্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নূতন ভবন নির্মাণ করা হইয়াছে।

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদিগকে সাহায্য

গত মে মাসে (১৯৬৫) প্রধানতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্র বেলুড়ের অর্থসাহায্যে লখনৌ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম কর্তৃক লখ্‌নৌ-এর গ্রামাঞ্চলে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণকে সাহায্য দান করা হয়। এই রিলিফকার্য অনুষ্ঠিত হয় লখ্‌নৌ-এর মালেসামন (Malesaman), অম্‌রাহী (Amrahi) ও নৌবস্তা (Naubasta) গ্রামে। দুর্গত পরিবারবর্গকে ধুতি, শাড়ি ও কুটির-নির্মাণের দ্রব্যাদি বিতরণ করা হইয়াছে।

আমেরিকায় বেদান্ত

স্যান্ ফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটি**ঃ** নূতন মন্দিরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়; পুরাতন মন্দিরে যথারীতি উপনিষদের ক্লাসাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

জানুআরি, ১৯৬৫ঃ 'মৃতের সৎকার মৃতেরা করুক'; মানুষের মাধ্যমে ঈশ্বরের নিকট উপনীত হও; মানুষ কি একসঙ্গে বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক হইতে পারে? 'যে আমার জন্য জীবন উৎসর্গ করিবে, সে-ই যথার্থ জীবন লাভ করিবে'; মৃত্যুর অস্তিত্ব নাই; বহু ও এক; স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি-পূজা; স্বামী বিবেকানন্দ ও ভবিষ্যৎ মার্কিন সভ্যতা; সন্দেহ—আধ্যাত্মিক সত্যের পথস্বরূপ; শান্তি নয়, সংগ্রাম।

ফেব্রুআরিঃ আত্মসংযম অভ্যাস; আমরা ঈশ্বরকে দেখি, কিন্তু চিনিতে পারিনা; যোগ ও আত্মস্থৈর্য; ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় করিবার উপায়; ঐশ্বরিক প্রেমের গভীরে; মনের উৎকর্ষসাধন;

অনন্তের আহ্বান; মহান্ সমাজগঠনে কর্ম-পরিণত বেদান্ত।

মার্চ: দেবাদিদেব মহেশ্বর; শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব; শ্রীরামকৃষ্ণ মানবজাতিকে যে আধ্যাত্মিক সম্পদ দিয়াছেন; 'দাম্যত দত্ত দয়ধ্বম্'; ঈশ্বরকৃপা; শ্রীচৈতন্যের জীবন ও বাণী; ঈশ্বরের মানবতা ও মানবের ঈশ্বরত্ব; ঈশ্বরের নাম-মাহাত্ম্য; অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রশমনের উপায়; মনই গুরু।

এপ্রিল: সত্যের সাধনা; সমস্ত জগৎ, সর্বদেবতা, সকল প্রাণী আত্মা হইতে উদ্ভূত; ঐশ্বরিক প্রেম; ঈশ্বর—কালের সীমা হইতে ও কালের পারে; পুনর্জন্ম; আধ্যাত্মিক শক্তিরূপে ভক্তি; অনাসক্তি অভ্যাস; স্বার্থত্যাগের দ্বারা পূর্ণতালাভ।

উৎসব-সংবাদ

ময়মনসিংহ: গত ১৫ই এপ্রিল (১৯৬৫) ময়মনসিংহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম-প্রাঙ্গণে রর ১৩০তম জন্মদিবস উপলক্ষে এক সভার অনুষ্ঠান করা হয়। সভায় প্রায় ৮।৯ শত লোকের সমাগম হয়; সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শ্রীমনোরঞ্জন ধর মহাশয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দে, শ্রীজ্যোতির্বিনোদ দাস, শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র দাস ও শ্রীসুরেন্দ্রকিশোর ভৌমিক বক্তৃতা দেন এবং সভাপতি মহাশয় কর্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনান্তে সভার কার্য শেষ হয়।

পরদিন ১৬ই এপ্রিল সারাদিনব্যাপী শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডী ও গীতা-পাঠ রামনামকীর্তন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি পাঠ ও 'কথামৃত' পাঠ প্রভৃতি হয়। বেলা ২টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত প্রায় দু-তিন হাজার লোককে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বালিয়াটী (ঢাকা): শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার হইতে ১৬ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার পর্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিন অপরাহ্ণে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ভজন-সঙ্গীত, দ্বিতীয় দিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও নগরকীর্তন এবং শেষ দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, চণ্ডী ও গীতা পাঠ, ভজন, দরিদ্রনারায়ণসেবা, অবৈতনিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে পারিতোষিক বিতরণ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। দুই সহস্র দরিদ্র-নারায়ণ ও প্রায় ৫০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। ধর্মসভায় শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বসু রায়চৌধুরী (সভাপতি) ও অন্যান্য বিশিষ্ট বক্তা শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর জীবন ও বাণীর মনোজ্ঞ আলোচনা করেন।

বরাহনগর (কলিকাতা ৩৬): শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২৮শে মে হইতে ৩১শে মে, ১৯৬৫ (বাংলা ১৪ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২) পর্যন্ত চারদিনব্যাপী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব ও আশ্রমের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন সকালে পূজা, ভজনাদি ও পণ্ডিত হরিকুমার চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ বাচস্পতি কর্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত পঠিত হয়। অপরাহ্ণে বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারিগণ বেদপাঠ করিবার পর স্বামী পুণ্যানন্দ মহারাজ যুগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেন। পরে স্বামী পুণ্যানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ, অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার এবং স্বামী জীবানন্দ স্বামীজীর জীবন ও বাণী অবলম্বনে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। সভাপতি মহারাজ ছোট ছোট গল্পের মাধ্যমে ধর্মকথা আলোচনা করেন। তৎপর শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় "ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ" লীলাগীতি অনুষ্ঠিত হয়।

পরদিন ২৯শে মে অপরাহ্নে আশ্রমের বার্ষিক উৎসব ও বিদ্যালয়সমূহের পুরস্কারবিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সনৎকুমার বসু মহাশয়। প্রধান অতিথি, বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ মন্দিরের অধ্যক্ষ শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায় পুরস্কার বিতরণ করেন। সভাপতি ডঃ বসু মহাশয় মহৎ আদর্শ অবলম্বন করিয়া মহৎ কর্মানুষ্ঠানে ব্রতী হইতে ছাত্রগণকে আহ্বান জানান। আশ্রমের সেক্রেটারি স্বামী নির্জরানন্দ আশ্রমের কার্যাবলীর বিবরণ পাঠ করেন। রাত্রে বিশ্বশ্রী মনোতোষ রায়ের পরিচালনায় তাঁহার কৃতী ছাত্র ভারতশ্রী বিশ্বনাথ দত্ত প্রমুখ ব্যায়াম-বীরগণ ব্যায়াম প্রদর্শন করেন।

তৃতীয় দিন প্রাতে প্রাক্তন ছাত্রদের পুনর্মিলন উৎসবের পর 'মধুরম্' কীর্তন সম্প্রদায় কর্তৃক মাথুর-পালাকীর্তন গীত হয়। অপরাহ্নে কৃপাময়ী কালীকীর্তন সম্প্রদায়ের কালীকীর্তন, শ্রীজহর ও শ্রীমানস মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীতের পরে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী আদীশ্বরানন্দ ও স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণে স্বামীজীর নির্দেশিত পন্থা অনুসরণ করিবার জন্য উদাত্তকণ্ঠে দেশবাসিগণকে সচেতন করিয়া দেন। রাত্রে শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী সুললিতকণ্ঠে রামায়ণ গান করেন।

উৎসবের শেষ দিনে আশ্রম-বালকবৃন্দ সাফল্যের সহিত 'কেদার রায়' নাটকটি মঞ্চস্থ করে।

উৎসবের কয়দিন প্রত্যহ পাঁচ ছয় হাজার করিয়া ভক্তসমাগম হইয়াছিল।

মালদহঃ গত ৩রা জুন বৃহস্পতিবার হইতে চারদিনব্যাপী স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন আশ্রমে বাৎসরিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী, বাণী এবং সাধনা-সমন্বিত এক চিত্র-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার মহাশয় এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এই প্রদর্শনী দেখিবার জন্য প্রত্যহ সহস্রাধিক দর্শক আসিতেন। উৎসবের দ্বিতীয় দিন ৪ঠা জুন শুক্রবার হইতে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬॥ টায় সভানুষ্ঠান হইত। প্রত্যহ সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছেন অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী মিত্রানন্দ মহারাজ। অধ্যক্ষ মজুমদার মহাশয় এবং প্রধান অতিথি শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে প্রত্যহ মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী-প্রদর্শিত নিষ্কাম কর্মসাধনা ও পবিত্র ধর্মজীবন যাপনের যে আদর্শ, তাহাই এযুগের পক্ষে উপযোগী—একথাই বক্তাদ্বয়ের ভাষণে স্পষ্ট হইয়া উঠে। প্রত্যহ রাত্রে শ্রীপ্রেমানন্দ দে সরকার কর্তৃক রামায়ণগান হয়। উৎসবের শেষ দিন সকালে বিশেষ পূজা ও ভজনাদি হয় এবং অপরাহ্নে প্রায় দুই হাজার ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। ঐদিন অপরাহ্ন ৫॥ ঘটিকায় আশ্রম-পরিচালিত বিবেকানন্দ শিশু সঙ্ঘের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা এবং পুরস্কারবিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহের দূরবর্তী গ্রামসমূহ হইতে প্রত্যহ তিন-চার হাজার করিয়া জনসমাগম হইত।

মেদিনীপুরঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের উদ্যোগে গত ১৫ই, ১৬ই ও ১৭ই মে বুদ্ধ-পূর্ণিমা উপলক্ষে উৎসবানুষ্ঠান হয়। ১৬ই মে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী সেবাশ্রমে অনুষ্ঠিত সভায় ভগবান বুদ্ধদেব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পরদিন সকালে বিদ্যাভবনের ছাত্র ও শিক্ষকদের সভায় এবং সন্ধ্যায় স্থানীয় কলেজে তিনি স্বামীজীর আদর্শ সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

স্বামী যুক্তাত্মানন্দের দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত ৯ই জুন, বেলা ১-৫৫ মিঃ সময় বৃন্দাবন সেবাশ্রমে স্বামী যুক্তাত্মানন্দ ৬৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন; বহুমূত্রজনিত 'কোমা' ও জ্বরে তিনি ভুগিতেছিলেন, রক্তবমিও হইতেছিল; শেষে স্ট্রোক' হয়। আংশিক পক্ষাঘাতে তিনি দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী ছিলেন।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে জয়রামবাটী আশ্রমে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট তাঁহার সন্ন্যাস-দীক্ষা হয়। শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে (উদ্বোধন) দীর্ঘকাল তিনি পূজারীর কাজ করিয়াছিলেন; জগন্নাথে বেশ কয়েক বছর তপস্যাও করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মা জগজ্জননীর পাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

স্বামী নির্বিশেষানন্দের দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের বিষয়, স্বামী নির্বিশেষানন্দ গত ২৮শে জুন ভোর ৪টার সময় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭১ বৎসর। পেটের ব্যথা, পায়ের শোথ এবং হৃদরোগে তিনি ভুগিতেছিলেন। শেষের দিকে শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ হইয়াছিল। সেই অবস্থায় তাঁহাকে কিষেণপুর হইতে কনখল সেবাশ্রমে লইয়া আসা হয়। এখানেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করিয়াছিলেন। ঐ বৎসরই তিনি ব্রহ্মচর্যদীক্ষা লাভ করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট তিনি সন্ন্যাস-দীক্ষা প্রাপ্ত হন। কয়েক বৎসর করিয়া তিনি গদাধর আশ্রম, বৃন্দাবন সেবাশ্রম ও কিষেণপুর আশ্রমে কর্মী ছিলেন। তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ চরণে মিলিত হইয়াছে। ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

টালিগঞ্জ (কলিকাতা): ইন্দ্রাণীপার্কে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রের উদ্যোগে গত ১০ই এবং ১১ই এপ্রিল ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ আবির্ভাব-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম দিন প্রত্যুষে মঙ্গলারতি, কীর্তন সহযোগে পল্লী-পরিক্রমণ, পূজা ইত্যাদির পর অপরাহ্ণে আয়োজিত ধর্ম-সভায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ, ভক্তিমূলক গান ও শ্রীধনঞ্জয় ভট্টাচার্য কর্তৃক উদ্বোধনসঙ্গীত পরিবেশিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী জীবানন্দ। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীঅধীর মুখোপাধ্যায় মহাশয়। স্বামী আদীশ্বরানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। সভাপতি তাঁহার ভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। সভাশেষে প্রায় ১০০০ নরনারী হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় দিন 'হাওড়া (কাসুন্দিয়া) মায়ের মন্দির' কর্তৃক 'যুগাচার্য' পালাকীর্তন শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষ মুগ্ধ করে। ঐদিন 'মহামানব' চলচ্চিত্রও প্রদর্শিত হয়।

কল্যাচক (মেদিনীপুর): শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতির উদ্যোগে কল্যাচক বিবেকানন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গত ৫ই মার্চ, ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩০তম জন্মোৎসব প্রতিপালিত হয়। ঐদিন বিকাল ৫ ঘটিকায় স্থানীয় বিদ্যালয়সমূহের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ভক্তদের উপস্থিতিতে স্থানীয় সাব্-ইন্সপেক্টর

শ্রীবাণীকণ্ঠ মিশ্র মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। পরে প্রার্থনানুষ্ঠান ও প্রসাদবিতরণ করা হয়।

এই উপলক্ষে ১৬ই ও ১৭ই এপ্রিল উক্ত বিদ্যালয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, পাঠ, হোম, ভোগারতি, প্রসাদবিতরণ ও ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ই এপ্রিল বিকাল ৪ ঘটিকায়, উক্ত বিদ্যালয়ে স্বামী অন্নদানন্দ প্রথমবার্ষিকী 'শ্রীরামকৃষ্ণ মেলা' উদ্বোধন করেন।

সন্ধ্যায় তাঁহার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত ও শ্রীসুশান্ত দাস, স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। পরে অধ্যাপক শ্রীসেনগুপ্ত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

১৭ই এপ্রিল সন্ধ্যায়, স্বামী অন্নদানন্দ, শ্রীতারাপদ মাইতি ও শ্রীজ্যোতির্ময় নন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। ইহার পর শ্রীনন্দ গীতাপাঠ করেন।

দোমড়া (বর্ধমান) : গত ইং ২৫শে এপ্রিল দোমড়া রামকৃষ্ণ আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ১৩০তম জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রভাতে মঙ্গলারতি ও পরে পূজা হোম ইত্যাদি সম্পন্ন হয়।

প্রসাদ বিতরণ ও নারায়ণ সেবা আরম্ভ হয় ১২ ঘটিকায়। প্রায় দুই হাজার নরনারী বসিয়া ও পাঁচশো জন ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। ৪৷৷০ ঘটিকায় স্বামী মহেশ্বরানন্দজীর সভাপতিত্বে একটি জনসভা হয়। বর্ধমান জিলা পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রীনারাণচন্দ্র চৌধুরী প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। তিনি এবং বক্তা শ্রীরথীন্দ্রমোহন চৌধুরী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। রাত্রিতে স্থানীয় যাত্রাদল কর্তৃক নিমাইসন্ন্যাস নাটক অভিনীত হয়।

মারনাই (পশ্চিম দিনাজপুর) : শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ কর্তৃক মারনাই গ্রামে গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ হইতে দিবসদ্বয়ব্যাপী উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ৬ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে শোভাযাত্রা সহকারে উৎসবের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। পূর্বাহ্ণে ঠাকুরের পূজা, ভোগ সন্ধ্যা-রাত্রিকের পর ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূত জীবন ও বাণী বিষয়ে স্বামী পরশিবানন্দ বক্তৃতা করেন। তৎপর মালদহের শ্রীহালদার মহাশয়ের মধুর কণ্ঠে রামায়ণ-কীর্তন হয়। পর দিবস শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা হোম ভজনান্তে আড়াই হাজারের অধিক নরনারীকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর যুগাচার্য বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর বাণী ও জীবনী সম্বন্ধে ছায়াচিত্রযোগে স্বামী পরশিবানন্দ ভাষণ দেন। উভয় দিনই পার্শ্ববর্তী সাত-আটটি গ্রামের সহস্রাধিক শ্রোতা সভায় ও কীর্তনে উপস্থিত ছিলেন।

পাণ্ডুরাজার ঢিবি

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক পাণ্ডু-রাজার ঢিবির ব্যাপক খননকার্যের ফলে বাংলা দেশের অতি প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে অনেক বিষয় জানা গিয়াছে। ইহা দ্বারা অজয় উপত্যকায় প্রথম বসতির অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে।

খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে পাণ্ডু-রাজার ঢিবির শহর সুসমৃদ্ধ ছিল। জানা যায়—প্রথম পর্যায়ে রাজার ঢিবিতে বসবাসকারী লোকেরা সুদূর অতীতেও ধান চাষ করিতেন। এখানে যে চালের ছাপ পাওয়া গিয়াছে, তাহা পৃথিবীতে এখনও পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে পাণ্ডুরাজার ঢিবির সভ্যতার সময় বিদেশের সঙ্গে এখানকার জলপথে যোগাযোগ ছিল। চিত্রিত মৃৎপাত্রের সংগ্রহ, গামলা ও অন্যান্য সুন্দর সুন্দর দ্রব্য, প্রস্তর ও হাড় দ্বারা নির্মিত তীরের ফলা প্রভৃতি তিন হাজার বৎসর পূর্বের অজয় উপত্যকার সভ্যতার পরিচয় বহন করে। এই স্থানের মানুষের জীবনযাত্রাপদ্ধতি সুরুচিসম্মত ছিল।

পাণ্ডুরাজার ঢিবির তৃতীয় যুগে রক্তবর্ণ প্রস্তর নির্মিত গৃহতলবিশিষ্ট মনোরম গৃহগুলি হইতে পরবর্তী যুগের পরিচয় পাওয়া যায়। লৌহ ও প্রস্তরযুগের এবং তাম্র-প্রস্তর যুগের দ্রব্যাদিও দেখা গিয়াছে। এতদ্‌ব্যতীত পোড়ামাটির মূর্তি, লৌহনির্মিত তরবারি, পোড়ামাটির সীলমোহর প্রভৃতি পুরাতত্ত্ববিষয়ক বহু দ্রব্যও পাওয়া গিয়াছে

রুশ ভাষায় মহাভারত

রুশ ভাষায় মহাভারতের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের কাজ শুরু হইয়াছিল আলেক্সি বারান্নিকভ-এর উদ্যোগে, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে। এই প্রচেষ্টার ফলে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে মহাভারতের আদিপর্বের এবং ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে সভাপর্বের যথোপযুক্ত টীকা, ব্যাখ্যা, নির্ঘণ্ট প্রভৃতি সহ পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

অষ্টাদশপর্ব মহাভারতের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ দীর্ঘসময়সাপেক্ষ ; মাত্র দুই পর্ব অনূদিত হইয়াছে। তাই, গ্রিগরি ইলিয়ন ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে সমগ্র মহাভারতের সারানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন ; নাম দিয়াছেন "প্রাচীন ভারতের বীরদল"। আঠারোটি পর্ব হইতে প্রধান ঘটনা ও আখ্যানগুলি সবই তিনি লইয়াছেন। এই অনুবাদ-গ্রন্থটি রাশিয়ায় এত জনপ্রিয় হইয়াছে যে, গত সাত বছরে ইহার তিন লক্ষ কপি বিক্রয় হইয়াছে।

এ গ্রন্থখানি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য। কিশোরদের জন্য একটি সরল সংক্ষিপ্ত ও সুখপাঠ্য অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন দুজন সোভিয়েট তরুণ—এদুয়াদ্ তিওমর্কিন ও এরমান।

রাশিয়ায় অবশ্য মহাভারতের আংশিক অনুবাদ সুরু হইয়াছে বহু পূর্বে—১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে মহাভারতের অন্তর্গত গীতার প্রথম রুশ অনুবাদ সেণ্টপিটার্সবুর্গ হইতে প্রকাশিত হয়।

পরে উনবিংশ শতাব্দীতে এই কাজে প্রথম ব্রতী হন মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের অধ্যাপক পাভেল পেত্রফ। তিনি যে আংশিক অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে নলোপাখ্যানই খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল। পরে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে এই নলোপাখ্যানেরই আর একটি অনুবাদ প্রকাশিত হয় (মূল সংস্কৃত হইতে নয়, লাতিন অনুবাদ হইতে)। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে কবি ভাসিলি জুকভস্কি (জার্মান অনুবাদ হইতে) নলোপাখ্যানেরই ছন্দানুবাদ প্রকাশ করেন। নলোপাখ্যান ও আরো কয়েকটি উপাখ্যানের আর একখানি পদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন ইসনাতি কোগাভিচ্, ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে।

ইহা ছাড়া মহাভারতের বিভিন্ন অংশের অনুবাদ হইয়াছে বিভিন্ন সময়ে। বোরিস স্মিরনফ অনুবাদ করিয়াছেন কর্ণের কাহিনী ও সাবিত্রীর উপাখ্যান। ব্লাদিমির কালিয়ানফ ও সেমিঅন লিপকিন অনুবাদ করিয়াছেন জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ।

দিব্য বাণী

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা (ত্রিসর্গো মৃষা)
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥—শ্রীমদ্ভাগবত, ১।১।১

যাঁহা হতে লভে জন্ম, যাঁর মাঝে স্থিত হয়,
লয় পায় পুনরায় এ বিশ্বজগৎ,
সত্তা যিনি অদ্বিতীয়, যাঁর সত্তা লয়ে হয়
সত্তাবান সব কিছু বিশ্বচরাচরে;
ব্রহ্মার-ও বিধাতা বলি' সর্বজ্ঞ, সম্রাট সম,
সর্বজ্ঞান-উৎস-মুখ, যিনি স্বপ্রকাশ,
জ্ঞানীর-ও দুর্বোধ্য বেদ উদ্ভাসিত হ'ল যাঁর
কৃপাবলে আদিকবি ব্রহ্মার অন্তরে;
যাঁর নিত্য মহিমায় ছিন্ন হয় মায়াজাল,
—ধ্যান করি সদা সেই পরম সত্যেরে ॥
যবে দেখি মরীচিকা, কাঁচ দেখি' ভাবি নীর,—
ভ্রমে সত্যবস্তুকেই দেখি অন্যরূপে;
শূন্য না প্রত্যক্ষ হয়, ভুল-দেখা পারে শুধু
সত্যকেই দেখাইতে বিকৃত আকারে।
একমাত্র সত্যবস্তু যিনি এই ত্রি-সংসারে,
সত্ত্ব-আদি গুণের প্রভাবে বিশ্বরূপে
প্রতিভাত হন যিনি, জড়-আদি অগণন
বস্তু বলি' নিত্য মোরা ভ্রম করি যাঁরে,
যাঁর নিত্য মহিমায় ছিন্ন হয় মায়াজাল,
—ধ্যান করি সদা সেই পরম সত্যেরে ॥

কথাপ্রসঙ্গে

কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিতেছেন। উপদেশ দিতেছেন বেদান্ত এবং অন্যান্য শাস্ত্রে নিহিত হিন্দুধর্মের উচ্চ তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে, সে তত্ত্বগুলিকে উপলব্ধি করিবার উপায় সম্বন্ধে। ঋষিরা, সত্যদ্রষ্টারা বেদান্তোক্ত সত্যগুলি প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন; প্রাচীনকালে সাধারণতঃ লোকালয় হইতে দূরে, নির্জন পরিবেশে, তপোবনে শান্ত ধ্যানের মাধ্যমে এই সত্যগুলি তাঁহাদের হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছিল। এই সত্য-পরিবেশনের ক্ষেত্রও ছিল প্রধানতঃ তপোবন; রাজপ্রাসাদে, যজ্ঞশালায়, জ্ঞানিগণের সভায় বা অন্যত্রও তাহা পরিবেশিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু হইয়াছে নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব, শান্ত পরিবেশে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে পটভূমিতে এই সত্য পরিবেশন করিতেছেন, তাহা এক সম্পূর্ণ বিপরীত পরিবেশ। প্রচণ্ড কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রে, যুদ্ধক্ষেত্রে, যেখানে হত্যা করার ও হত হওয়ার সম্মুখীন হইতে হয় পদে পদে, যেখানে মনের সবটাই বহির্মুখী হইয়াই, কর্মে নিবদ্ধ হইয়াই থাকিবার কথা—সেইখানে এই উচ্চ তত্ত্বগুলি আলোচিত হইতেছে, সত্য প্রত্যক্ষও হইতেছে।

যে বিষয়গুলি সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ করিলেন, চিত্ত স্থির প্রশান্ত না হইলে, চিত্তের গভীর প্রদেশে ডুবিয়া না গেলে তাহা বলা যায় না; এবং সমপরিমাণ অন্তর্মুখীনতা না আসিলে শ্রোতাও উহা ধারণা করিতে পারে না। কুরুক্ষেত্রের কর্মোদ্বেল পরিস্থিতির মাঝখানেই চিরপ্রশান্তিতে ডুবিয়া গেলেন তিনি, এবং অর্জুনকেও লইয়া গেলেন সেখানে। লোকালয়ের কর্মকোলাহল হইতে বহুদূরে, তুষারমণ্ডিতশির হিমাচলের ক্রোড়ে দেওদার-ছায়াচ্ছন্ন কোন নির্জন প্রদেশে সমাসীন, ধ্যানে অবগাহনোন্মুখ যোগীর চিত্ত যে প্রশান্ত পরিবেশ পায়, শ্রীকৃষ্ণ নিজের ও অর্জুনের অন্তরে সেই প্রশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করিলেন রণাঙ্গনে থাকিয়াই।

রণাঙ্গনে রণবেশে সজ্জিত অবস্থায় গীতা-কথন এবং সেই অবস্থায় অর্জুনের শুধু মানসিক স্থৈর্যলাভ নয়, বিশ্বরূপদর্শন-রূপ প্রত্যক্ষ অনুভূতিলাভ—সমগ্র গীতার মর্মবাণী যেন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে ইহারই মধ্যে। বিশ্ব-সমুদ্রের উপরিভাগ বাত্যাবিক্ষুব্ধ উত্তাল তরঙ্গ-মালায় সদাচঞ্চল, আর সে সমুদ্রের গভীরতায় চিরপ্রশান্তি—গীতোক্ত আদর্শ কর্মযোগীর মন একই কালে স্পর্শ করিয়া থাকে উভয়কেই। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় "Intense activity with intense rest."

অর্জুন মহাবীর, মহাসাহসী; শক্তিরও অভাব নাই তাঁহার। বিশেষ করিয়া কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সময় তাঁহার শক্তির কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না। এমন কি, ইচ্ছা করিলে মুহূর্তমাত্রে সব শত্রু নাশ করিবার মত, গোটা পৃথিবী পুড়াইয়া ফেলিবার মত শক্তিও তাঁহার ছিল। কাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহা খুব ভাল করিয়া জানিয়াই তিনি রণে নামিয়াছেন, তথাপি যুদ্ধারম্ভের ঠিক পূর্বে তাহাদের চাক্ষুষ করিয়া তাঁহার হৃদয় দুর্বল হইয়া পড়িল। কর্তব্যের অনুরোধে অনেক কিছু সহ্য করিতে হয়, ঠিক কথা; কিন্তু হৃদয় কতখানি সহ্য করিতে পারে? পিতামহ ভীষ্ম—যাঁহার স্নেহচ্ছায়ায় থাকিয়া তাঁহারা মানুষ হইয়াছেন,

গুরু দ্রোণাচার্য, জেঠতুতো ভাই এবং অন্যান্য আত্মীয়—ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইলে ইহাদের হত্যা করিতে হইবে; জয়লাভের পর ইহাদের রক্তমাখা অন্ন খাইয়া ইহাদের রক্তমাখা রাজ্য উপভোগ করিতে হইবে! স্নেহমমতায় আচ্ছন্ন অর্জুন হৃদয়ের এই দুর্বলতাকে, আত্মীয়বধরূপ কর্তব্যসাধনে অপারগতাকে যুক্তির আবরণে ঢাকিতে চাহিয়াছিলেন। সজল নয়নে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন যে, এরূপ করা অপেক্ষা বনে গিয়া ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করাও শ্রেয়। শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, ইহাদের হত্যা করিয়া এ রাজ্য কেন, স্বর্গরাজ্যও তাঁহার কাম্য নয়।

অর্জুন রাজকুমার—দুর্যোধন যে অন্যায় আচরণ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহারই প্রতিকারকল্পে যুদ্ধ করা অর্জুনের কর্তব্য। এ কর্তব্যে ব্যক্তিগত ভাল-লাগা না-লাগার, ব্যক্তিগত স্নেহ-মমতার কোন স্থান নাই। এই যুদ্ধ করা উচিত কি না, এই লইয়া উদ্যোগ হইতে বহু আলোচনা হইবার পর যুদ্ধ করাই যে উচিত তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। অর্জুন প্রথম হইতেই শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি যাহা করা উচিত বলিয়া নির্দেশ দিবে, তাহাই করিব।' তাই শেষ মুহূর্তে অর্জুনের মন দুর্বলতায় আচ্ছন্ন হইয়াছে দেখিয়া, এবং মনুষ্যত্ব প্রভৃতির দোহাই দিয়া যুক্তির আবরণে তিনি সে দুর্বলতাকে ঢাকিতে প্রয়াসী হইয়াছেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ গর্জন করিয়া উঠিলেন, "'যুদ্ধ করব না'—অনার্যের মত একি কথা বলছ এখন? অর্জুন! নিজেকে ক্লীবের পর্যায়ে টেনে নিয়ে যেওনা—এই তুচ্ছ হৃদয়-দৌর্বল্য দুহাতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শক্ত হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াও।"

শ্রীকৃষ্ণ বহু উপদেশ দিলেন। বহুভাবে নানাদিক দিয়া অর্জুনকে বুঝাইলেন। সাধারণ জাগতিক যুক্তি দেখাইয়া বুঝাইলেন: এখন যদি যুদ্ধ না করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া যাও, লোকে তোমার মনের কথা বুঝিবে না—বলিবে, মহাবীর অর্জুন ভয়ে যুদ্ধ করিলেন না; তোমার মত মাননীয় ব্যক্তির পক্ষে এই অপযশ মৃত্যু-তুল্য। তাছাড়া তুমি একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; তুমি যেরূপ আচরণ করিবে, সাধারণ লোকের কাছে পরে তাহাই আদর্শরূপে পরিগণিত হইবে; সেদিক দিয়াও তোমাকে যথার্থ ক্ষত্রিয়ের আদর্শে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া চলিতে হইবে।

তারপর পারলৌকিক দৃষ্টিকোণ হইতে যুক্তির অবতারণা করিলেন: যাহারা মৃত্যুর পর স্বর্গাদি উচ্চতর লোকে যাইয়া জাগতিক সুখ অপেক্ষা উচ্চতর সুখ উপভোগ করিতে চায়, তাহাদেরও কর্তব্য এখন যুদ্ধ করা; এই ধর্ম-যুদ্ধই স্বর্গের দ্বার খুলিয়া দিবে।

তবে, অর্জুনের কাছে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ভোগ-সুখের মূল্য যে বিশেষ কিছু নাই, তাহা তিনি জানিতেন। জানিতেন, এ সবেরও ঊর্ধ্বে যে পরমধাম রহিয়াছে, অর্জুন জীবনের সেই চরম লক্ষ্যে পৌছিতে চান, চরমসত্য লাভ করিতে চান। নিজ হৃদয়-দুর্বলতা ও শ্রীকৃষ্ণের ভর্ৎসনা—এই দুই-এর মাঝখানে বিভ্রান্ত অর্জুন নিজ মুখেই শ্রীকৃষ্ণকে সেকথা বলিয়াছিলেন, 'যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে'--আমি প্রেয়কামী নই, ভোগের আপাতমধুরতা আমাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না—'যে পথ শ্রেয়লাভের পথ, যে পথে চলিলে পরম কল্যাণ লাভ করিতে পারিব, সেই পথের নির্দেশ দাও আমায়।' শ্রীকৃষ্ণ তাই সুর সর্বোচ্চ পর্দায় তুলিলেন, সর্বোচ্চ জ্ঞানের কথা বলিয়া

অর্জুনকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ইহলোক, পরলোক, সর্বলোকের অতীত প্রদেশে অস্তিত্বের মহত্তম তীর্থে যাঁহারা পৌঁছিতে চান, এই যুদ্ধ তাঁহাদের সেই মহান যাত্রাপথেও সহায়তা করিবে। আর হাসিয়া একথাও বলিয়াছিলেন যে, 'যুদ্ধ করিব না' বলিলেও নিস্তার নাই; যে চরমসত্যে অর্জুন পৌঁছিতে চাহিতেছেন, তাহারই ইচ্ছায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে, তাহারই ইচ্ছা বিশ্বনিয়ন্ত্রী প্রকৃতি রূপে প্রকাশিত হয়। সেই প্রকৃতির অঙ্গুলি-হেলনেই, প্রাকৃতিক নিয়মের বশেই (জড়-জগতের পরিচালক নিয়ম এবং কর্মফল-সংস্কারাদি সূক্ষ্মজগতের পরিচালক নিয়ম) শুধু জড় জগৎ নয়, বিশ্বের স্থূল-সূক্ষ্ম সবকিছুই—আমাদের মন-বুদ্ধি প্রভৃতিও চালিত হয়; এগুলি প্রকৃতির হাতের যন্ত্র মাত্র; প্রকৃতি এই যন্ত্রগুলির সাহায্যে তার ইচ্ছানুরূপ কাজগুলি করায়, ঘটনাগুলি ঘটায়, ঘটনাগুলিকে ঘটাইবার অনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করে; আমরা মন-বুদ্ধি প্রভৃতির সঙ্গে নিজেকে নিবিড়ভাবে জড়াইয়া রাখি বলিয়াই ভাবি—আমরাই বুঝি নিজের ইচ্ছায় এই সব করিতেছি—'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥' শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, বিশ্বনিয়ন্তার যদি ইচ্ছা হইয়া থাকে অর্জুনরূপ যন্ত্রের মাধ্যমে ধর্মস্থাপনের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এই যুদ্ধ ঘটাইবেন, তবে অর্জুনের সাধ্য কি যুদ্ধ না করিয়া থাকা! যুদ্ধ তাঁহাকে করিতেই হইবে।

অধ্যাত্মজগতের আরো একটি সত্য, ঈশ্বরের অবতারত্ব, শ্রীকৃষ্ণ এই সময় অর্জুনের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন যে, যাহা হইতে এই জগতের সব কিছু সৃষ্ট হইয়াছে, যিনি বিশ্বের স্থূল সূক্ষ্ম সব কিছু জুড়িয়া রহিয়াছেন, সেই চরম সত্যই জগৎকল্যাণের জন্য দেহধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপে আসিয়াছেন; বিশ্বনিয়ন্ত্রী ইচ্ছা আর শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা একই। শুধু যে এইবারই তিনি এভাবে আসিয়াছেন তাহা নয়, যখনই ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখনই তিনি আসেন; তিনি এবং অর্জুন পূর্বেও আসিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, 'আমার সেসব কথা মনে আছে, তুমি ভুলে গেছ—তান্যহং বেদ সর্বাণি, ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।' কিন্তু ইহাতেও আশানুরূপ ফল ফলিল না। অর্জুনের মনকে সংশয়লেশশূন্য করিবার জন্য—যুদ্ধরূপ নৃশংস কর্তব্য সাধনের মধ্য দিয়াও যে ভগবানলাভ পর্যন্ত হওয়া সম্ভব, তাহা হৃদয়ে গাঁথিয়া দিবার জন্য যুক্তিবিচারের পারে মনবুদ্ধির অতীত প্রদেশে অর্জুনকে উন্নীত করিতে হইয়াছিল; স্বজ্ঞার সিংহদ্বার খুলিয়া দিয়া, অতীন্দ্রিয় সত্যের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিমল আলোকধারায় স্নাত করাইয়া অর্জুনকে সর্ব-সংশয়-বিনির্মুক্ত করিতে হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের মুখে চরম সত্য সম্বন্ধে ও শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব সম্বন্ধে—বহু কথা শুনিবার পরও অর্জুন বলিয়াছিলেন, "তুমি যা বললে তা সবই সত্য বলে আমি বিশ্বাস করি—'সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব', তবু এই অমৃতোপম কথা তোমার মুখে আরো শুনতে চাই—তোমার বিভূতির কথা আরো বল।" শ্রীকৃষ্ণ আবার তাহা বলিলেন। কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা কোন-কিছুকে যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করার ফলে যে-বিশ্বাস উৎপন্ন হয় তাহা, আর প্রত্যক্ষউপলব্ধি-সঞ্জাত বিশ্বাস এক জিনিস নয়; সাক্ষাৎ উপলব্ধির ফলে 'ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।' অর্জুন তাই তাহার পরও বলিয়াছিলেন, "তুমি যা বললে তা ঠিকই; তবু, জ্ঞান-ঐশ্বর্যাদি-সমন্বিত তোমার ঈশ্বরীয় রূপটি সাক্ষাৎ দেখতে চাই—'দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম।'"

শ্রীকৃষ্ণ তখন বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধরথের উপরই অর্জুন এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি লাভ করিয়াছিলেন

এতকাণ্ডের পর অর্জুন সব শেষে সর্বান্তঃ-করণে বলিয়াছিলেন, 'স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ'—আমি নিঃসংশয় হইয়াছি, মনের স্থৈর্য ফিরিয়া পাইয়াছি; এখন তুমি যেরূপ বলিবে, সেরূপ করিব—'করিষ্যে বচনং তব।'

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গড়িতে চাহিয়াছিলেন জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগের সমন্বয়ে সর্বাঙ্গ-সুন্দর আদর্শরূপে। তাঁহার এই সমন্বয়কার উপদেশ তাই সমন্বয়ের বাণীতে পরিপূর্ণ। অবশ্য কর্তব্যকর্ম করিতে অনিচ্ছুক অর্জুনকে কর্মনিরত করিবার জন্যই এত কথা।

কর্মের কৌশল

কর্ম না করিলে মানুষ কোন উন্নতিই লাভ করিতে পারে না। কর্মরত থাকিলে আলস্যাদি তামসিক ভাব কাটিয়া যায়, কর্ম মানুষের মধ্যে প্রাণের প্রাচুর্য আনে, রাজ-সিকতার বিকাশ ঘটায়। তখন তাহার পক্ষে জাগতিক উন্নতি করা সম্ভব। স্বর্গাদি উচ্চলোকপ্রাপ্তির ইচ্ছা যাঁহারা করেন, তাঁহাদেরও রাজসিকতার বিকাশ ঘটাইয়া অনলসভাবে যাগযজ্ঞ-তপস্যাদি কর্ম করিতে হয়। আবার যাঁহারা ইহলোক, পরলোক কোন লোকে কোন ভোগ করিতে চান না, রাজসিকতার দ্বারা তামসিকতা কাটাইবার পর রাজসিকতাকেও সংযত করিয়া ভাবের উচ্চতম স্তরে উঠিতে চান এবং সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ ঘটাইয়া উহারই সহায়তায় ভগবানলাভ করিতে চান—কর্ম তাঁহাদেরও সহায়ক। ঠিকমত ভাব লইয়া করিতে পারিলে ভাবাতীত অবস্থায়, চরম সত্যে পৌছিবার দ্বারও কর্ম উন্মুক্ত করিয়া দেয়। ইহাই গীতার মূল কথা। যুদ্ধরূপ অতি অপ্রিয় কর্তব্য কর্ম ত্যাগ করিয়া রাজকুমার অর্জুন যখন বনগমন পূর্বক ভিক্ষান্নে উদর পূরণ করিতে চাহিয়াছিলেন, আপাতদৃষ্টিতে তাঁহার এই আচরণ মহৎ ও আধ্যাত্মিক-ভাব-প্রসূত বলিয়া প্রতীত হইলেও শ্রীকৃষ্ণ ইহা সমর্থন করেন নাই—ইহাকে হৃদয়ের দুর্বলতা-প্রসূত বলিয়াছেন, আর্যসংস্কৃতি-বিরোধী ভাব বলিয়াছেন। নিজের মনের মত কাজ পাইলে সকলেই উহা সাগ্রহে সুষ্ঠুভাবে সমাধা করিতে পারে; মন যে কাজ চায় না, কর্তব্যরূপে সম্মুখে আসিলে সে কাজও যিনি সমপরিমাণ উৎসাহ লইয়া সমাধা করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ কর্মযোগী, তিনিই রাজসিকতাকে সংযত করিয়া সাত্ত্বিকভাবের বিকাশ ঘটাইতে পারিয়াছেন; কর্মযোগসহায়ে চরমসত্যলাভের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন তিনিই। জীবনের উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, কুড়েমির প্রশ্রয় দিয়া জড়বৎ হইয়া থাকা অপেক্ষা কাজ করা শতগুণে শ্রেয়—'কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।' নিষ্কর্মা হইয়া থাকিলে জীবনের উন্নতিসাধন তো দূরের কথা, বাঁচিয়া থাকাও যায় না—'শরীর-যাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ।'

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, মনে ত্যাগের ভাব পূর্ণভাবে বজায় রাখিয়া কর্তব্যের জন্য নিজের ভাল-লাগা না-লাগা পর্যন্ত বিসর্জন দিয়া যোগস্থ হইয়া কর্ম করিলে সে কর্ম, যুদ্ধের মত বীভৎস কর্মও মানুষের ভগবানলাভের পথে সহায়কই হয়—বিরোধী হয় না কখনো।

ত্যাগ বলিতে বাহিরের ত্যাগের চেয়ে 'মনে ত্যাগ'-এর উপরই তিনি জোর দিয়াছেন বেশী। মনে ভোগের ইচ্ছা থাকিলে বহির্বিষয় ত্যাগ করিলেও উহাতে ত্যাগের ফললাভ হয় না; মনের ত্যাগই আসল ত্যাগ; উহা দ্বারাই

ত্যাগের ফল লাভ করা যায়। দৈহিক ক্লেশের ভয়ে বা মোহবশে কর্মত্যাগ করাকে ত্যাগ বলে না। ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কর্তব্যবোধে যে কর্ম করিতে পারে, কর্মে রত থাকিয়াও সে ব্যক্তি কর্মের শুভাশুভ ফলে লিপ্ত হয় না, ত্যাগের ফলই লাভ করে। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া অনাসক্ত হইয়া কর্ম করা মানে যে কোনও রূপে দায় সারা নয়, শ্রীকৃষ্ণ সে কথাও বলিয়াছেন; বলিয়াছেন, যাঁহারা কর্মের ফল শুভ হইলে আনন্দে উদ্বেলিতচিত্ত হন, ফল অশুভ হইলে দুঃখে ম্রিয়মাণ হন, তাঁহারা যতখানি উৎসাহ লইয়া কর্ম করেন, সত্ত্বগুণাশ্রিত নিষ্কাম ব্যক্তিও কর্ম করেন ততখানি বা ততোধিক উৎসাহ লইয়াই—তিনি 'মুক্তসঙ্গঃ,' 'সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যো-নির্বিকারঃ', অথচ 'ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ'।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে রাজ্যের কল্যাণের জন্য, রাজ্যে ন্যায় ও ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য রাজ-কর্তব্য সাধন করিতে বলিয়াছিলেন—মনে পূর্ণ ত্যাগের ভাব লইয়া। অধর্ম ও অন্যায় তখন ভারতের রাজশক্তির একাংশে এত প্রবল হইয়াছিল যে প্রকাশ্য রাজসভায় একজন রাজকুলবধূকে টানিয়া আনিয়া বিবস্ত্রা করার চেষ্টা করিতেও কুণ্ঠাবোধ করে নাই। এই আসুরিক-শক্তিধরদের বিনাশ ছাড়া দেশে ন্যায় ও ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার অন্য আর কোন পথ ছিল না। আর তাহার জন্য দেবতুল্য ভীষ্ম-দ্রোণাদিকেও বধ না করিয়া উপায় ছিল না। সেজন্য ভারতের ভাগ্যবিধাতা যুধিষ্ঠির-অর্জুনাদির মত শুধু শৌর্যবীর্যের নয়, আধ্যাত্মিকতারও অতি উন্নত আধারদের দিয়া এই কর্ম করাইয়াছিলেন।

ভীষ্ম-দ্রোণাদির প্রতি অসীম শ্রদ্ধাবান অর্জুনের পক্ষে ইহা নিজেরই হৃদয় নিজহস্তে ক্ষতবিক্ষত করার মত। অনাসক্তির মূর্ত-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ শুধু অর্জুনকে দিয়াই এ কার্য করান নাই, লোককল্যাণার্থে নিজের হৃদ্‌পিণ্ড নিজেই উৎপাটন করিয়া এই আদর্শের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। মহাপ্রায়াণের পূর্বে তিনি নিজ আত্মজদের বিনাশ চোখের সামনে ঘটিতে দিয়াছিলেন, শক্তি থাকা সত্ত্বেও প্রতিকারের জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই। কারণ তিনি দেখিয়াছিলেন, মহাশক্তিধর তাঁহার বংশধরগণ অত্যাচারী ও ভোগপরায়ণ হইয়া উঠিতেছেন, তাঁহাদের রাখিয়া গেলে ভারতে অকল্যাণ আসার যে পথ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ফলে রুদ্ধ হইয়াছে, সেই পথই পুনরুন্মুক্ত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ যোগকে 'কর্মের কৌশল' বলিয়াছেন; কর্ম করিয়াও কিভাবে কর্মবিরত ব্যক্তির মতই কর্মফলের দ্বারা অসম্পূর্ণভাবে অস্পৃষ্ট থাকা যায়, তাহারই কৌশল। যোগস্থ হইয়া থাকা মানে কেবল অরণ্যে বা মন্দিরে নিমীলিতনেত্রে ধ্যানস্থ হইয়া থাকা নয়, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, কর্মতৎ-পরতার মধ্যেও যোগস্থ হইয়া থাকা যায়, প্রশান্তিতে ডুবিয়া থাকা যায়। এই অবস্থা লাভের প্রচেষ্টায় প্রথমাবস্থায় কর্মসঞ্জাত সুখ-দুঃখ, মানাপমানাদি দ্বন্দ্বগুলি আসিয়া মনের উপর রেখাপাত করিবামাত্র সজাগ থাকিয়া মন হইতে তৎক্ষণাৎ সেগুলি মুছিয়া ফেলিতে হয় সত্য, কিন্তু প্রচেষ্টা ফলবতী হইলে এগুলি আর মনকে স্পর্শই করিতে পারে না। ভাল লাগিতেছে বলিয়া বিনা প্রয়োজনে গায়ে পড়িয়া কোন কাজ টানিয়া আনিতে নাই, কাজ আসিয়া পড়িলে অপ্রিয় হইলেও তাহা এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতে নাই। জীবনের পথে চলিতে চলিতে সম্মুখে উপস্থিত কর্তব্যগুলিকে যোগস্থ হইয়া করিবার চেষ্টা করিলে জাগতিক বিষয়েও সবচেয়ে বেশী লাভবান হওয়া যায়। আবার জগতের অতীত প্রদেশে দ্বন্দ্বাতীত আনন্দলোকে, অমৃতলোকে উপনীত হইবার পথও প্রশস্ততর

হয়। আমরা জীবনপথের যেখানেই দাঁড়াইয়া থাকি না কেন, যে কর্মই করি না কেন, আমাদের কাছে কখনো সুখ কখনো দুঃখ, কখনো মান কখনো অপমান, কখনো লাভ কখনো লোকসান আসিবেই। জীবনে অবাঞ্ছিত দুঃখাদি আসিবার পথ রোধ করিবার চেষ্টা আদিম কাল হইতেই মানুষ সাধ্যমত করিয়া আসিতেছে, শিল্পবিজ্ঞানাদির ক্রমবর্ধমান উন্নতির ফলে আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি-শক্তিও ক্রমবর্ধিত হইতেছে, তথাপি আজপর্যন্ত এগুলি আসার পথ আমরা রোধ করিতে পারি নাই, কোনদিন পারিবও না। কারণ একটি পথ রোধ করিলে অন্য পথ দিয়া উহা আসে, বা নূতন পথ সৃষ্টি করে। দুঃখের স্থূল কারণ যদি গেল, মনের দুঃখানুভূতিশক্তি সূক্ষ্ম হইয়া উঠিল। সুখ বাড়াইবার প্রচেষ্টার সঙ্গে দুঃখও বাড়িয়া যায়। একটিকে বাদ দিয়া অন্যটিকে গ্রহণের চেষ্টা বৃথা। আমরা যাহা চাই, বিচ্ছেদহীন আনন্দ, তাহা লাভের একমাত্র পথ সুখদুঃখের পারে যাওয়া। আর তাহার উপায় সুখ এবং দুঃখকে সমভাবে গ্রহণ করার চেষ্টা করা—সুখ যখন আসে তখন মনকে অতি উল্লসিত হইতে, এবং দুঃখ আসিলে তাহাতেও মনকে অবসন্ন হইতে না দেওয়ার চেষ্টা করা সুখ-দুঃখাদিতে মনের এই সাম্য বজায় রাখিয়া কর্ম করার নামই যোগস্থ হইয়া কর্ম করা। সুখ-দুঃখ, মানাপমানাদির তরঙ্গাঘাতে সকলেরই জীবন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারে ভীষণভাবে আন্দোলিত হয়; যোগস্থ হইয়া কর্ম করিবার প্রচেষ্টা এই অনিবার্য বিষম পরিস্থিতিতে স্থিরবুদ্ধিতে যাহা করণীয় তাহা সম্পন্ন করিয়া অনর্থক উদ্বেগকে দূরে রাখিবার সামর্থ্য আনিয়া দেয়—জাগতিক জীবনকেও অধিকতর উপভোগ্য করিয়া তোলে।

কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনের মত বিষম কর্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের জীবনের প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে অভয়বাণীর অমৃতসিঞ্চন করিয়া গিয়াছেন। আমাদের মনে সন্দেহ জাগিতে পারে, দুঃখমিশ্রিতই হউক আর যাহাই হউক, কিছু সুখ তো আমরা সাধারণ অবস্থায় জীবন হইতে পাইতেছি; পরমানন্দ লাভের আশায় এটুকু সুখবোধকেও তুচ্ছজ্ঞান করিয়া যোগস্থ হইয়া কর্ম করিতে যাইয়া কোন দৈবদুর্বিপাকে বা অন্য কারণে মাঝপথে যদি ছাড়িয়া দিতে হয়, তাহা হইলে তো উহার ফল লাভ হইবে না। শস্য পাইবার আশায় ধান চাষ শুরু করিয়া অনাবৃষ্টিতে গাছ মরিয়া গেল বা স্বেচ্ছায় চাষ বন্ধ করিয়া দিলাম; সেক্ষেত্রে শস্য তো আর পাওয়া যাইবে না, তাছাড়া কোন ত্রুটি হইলে বিপরীত ফলও তো হইতে পারে। এক্ষেত্রেও তাহাই হইবে না তো? জীবনের গোনা দিনগুলির মধ্যে কয়েকটি বৃথা-শ্রমে পণ্ড হইবে না তো? ছিন্ন এক টুকরা মেঘ যেমন উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে মহাকাশে হারাইয়া যায়, ইহকাল-পরকাল উভয় হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শেষে আমাদের জীবনও সেইরূপ সীমাহীন ব্যর্থতায় বিনষ্ট হইবে না তো? শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুনের সখা হইলেও পিতার ন্যায় স্নেহমাখা কণ্ঠে বলিয়াছেন, 'না বাবা, তা কি কখনো হয়? নিশ্চিত জেনো, যে কল্যাণকারী, যে শুভকর্মে রত, তার বিনাশ নাই কোনকালে। এই ধর্মাচরণের জন্য প্রচেষ্টা যতটুকু করা যায় ততটুকুই ফলপ্রসূ হয়—একবিন্দু প্রচেষ্টাও বৃথা যায় না; ভুলভ্রান্তির জন্য কোন অনিষ্ট ঘটার সম্ভাবনাও নাই এতে। এই নিষ্কামকর্মরূপ ধর্মাচরণ অতি অল্প পরিমাণ করলেও তার ফলে মানুষ মহাভয়ের হাত হতে নিষ্কৃতি পায়'—

'নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥'
'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।'

"পৃথিবীতে আমাদের সকলেরই জীবন এক বিরামহীন সংগ্রাম। অনেক সময় আমরা আমাদের দুর্বলতা ও কাপুরুষতাকে ক্ষমা ও ত্যাগ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাই।... আমরা তো জানি আমাদের জীবনেই কতবার আমরা আলস্য ও ভীরুতার জন্য সংগ্রাম ত্যাগ করিয়াছি, আর আমরা সাহসী—এই মিথ্যা বিশ্বাসে নিজেদের মনকে সম্মোহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি।"

"'হে ভারত, ওঠ, হৃদয়ের এই দুর্বলতা, এই নিবীর্যতা ত্যাগ কর! উঠিয়া দাঁড়াও, সংগ্রাম কর।'[১] —এই তাৎপর্যপূর্ণ শ্লোকটি দ্বারাই গীতার সূচনা।...

...আমরা যতই পক্ষিসুলভ মমতার নিকটবর্তী হই, ততই ভাবাবেগে নিমজ্জিত হই। ইহাকে আমরা ভালবাসা বলি। আসলে ইহা আত্মসম্মোহন। জীবজন্তুর মত আমরাও আবেগের অধীন। বৎসের জন্য গাভী প্রাণ দিতে পারে—প্রত্যেকটি জীবই পারে। তাহাতে কি? অন্ধ পক্ষিসুলভ ভাবাবেগ পূর্ণত্বে লইয়া যাইতে পারে না। অনন্ত চৈতন্যলাভই মানবের লক্ষ্য। সেখানে অবেগের স্থান নাই, ইন্দ্রিয়গত কোন কিছুর স্থান নাই; সেখানে আছে কেবল শুদ্ধ বিচারের আলো—মানুষ সেখানে আত্মস্বরূপে অবস্থিত।"

"'যাঁহার প্রত্যেকটি কর্মপ্রচেষ্টা বন্ধনহীন, ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ও স্বার্থরহিত, সত্য-দ্রষ্টাগণ তাঁহাকেই জ্ঞানী বলিয়া থাকেন।'[২] যতক্ষণ স্বার্থবোধ থাকিবে, ততক্ষণ আমাদের নিকট প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হইবে না। নিজের অহঙ্কার দ্বারা আমরা সব কিছুকে রঞ্জিত করি। বস্তুগুলি নিজস্ব রূপেই আমাদের নিকট উপস্থিত হয়; আমরা তাহাদিগকে আবৃত করি। আমাদের মনবুদ্ধির তুলি দিয়া ভিন্নভাবে তাহাদের চিত্রিত করি।...বস্তুর স্বরূপ আমাদের দ্বারাই আবৃত রহিয়াছে, গুটিপোকার মত নিজেদের চারিদিকে জাল সৃষ্টি করিয়া আমরা তাহাতে আবদ্ধ হই। গুটিপোকা তাহার নিজের জালে নিজেই আবদ্ধ হয়। আমরাও ঠিক তাহাই করিতেছি। যখনই 'আমি' শব্দটি উচ্চারণ করি তখনই (গুটি তৈয়ারীর জন্য সূতা) একটি পাক খাইল। 'আমি ও আমার' বলা মাত্র আর এক পাক খাইল। এইরূপে চলিতে থাকে...।"

— স্বামী বিবেকানন্দ (গীতা প্রসঙ্গে)

১ গীতা ২।৩ ২ গীতা ৪।১৯

কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্

স্বামী ধীরেশানন্দ

করারবিন্দেন পদারবিন্দং
মুখারবিন্দে বিনিবেশয়ন্তম্।
শ্রীমদ্‌যশোদাংকগতং প্রসন্নং
বালং মুকুন্দং শিরসা নমামি॥

ভাগ্যবতী মাতা যশোদার অংকশায়ী ও করকমলদ্বয়দ্বারা অরবিন্দসদৃশ চরণের অঙ্গুষ্ঠ স্বীয় মুখপদ্মবিবরে স্থাপনকারী, আনন্দবিগ্রহ, বালমূর্তি, মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণকে আমি ভূলুণ্ঠিত-মস্তকে বারংবার প্রণাম করি।

শ্রীগোবিন্দপাদার্পিতচিত্তা কোন ভাগ্যবতী গোপাঙ্গনা আপন সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

শৃণু সখি! কৌতুকমেকং
নন্দনিকেতাঙ্গনে ময়া দৃষ্টম্।
ধূলিধূসরিতাঙ্গো
নৃত্যতি বেদান্তসিদ্ধান্তঃ॥

হে সখি! শোন, নন্দের গৃহাঙ্গনে আমি এক পরম আশ্চর্য বস্তু দর্শন করিয়াছি। দেখিলাম, সেখানে সর্ববেদান্তসিদ্ধান্ত সচ্চিদানন্দঘন নির্বিশেষ পরব্রহ্ম স্ব-মায়ায় বালবিগ্রহধারণকরতঃ ধূলি-ধূসরিতাঙ্গে মনোহর নৃত্যাদি ক্রীড়া করিতেছেন।

অন্য গোপী বলিতেছেন—

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্
অখিলদেহীনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে
সখ! উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে॥
(ভাগঃ ১০ পূঃ৷৩১।৪)

হে প্রাণসখা! তুমি কেবল গোপিকানন্দন নহ, তুমি সর্বপ্রাণীর অন্তর্যামী পরম পুরুষ। ব্রহ্মাদি দেবগণের ভীতিব্যাকুল প্রার্থনায় ভূভার হরণ করিবার জন্য, হে নাথ! তুমি যাদবকুলে আবির্ভূত হইয়াছ।

গোপীগণের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম। স্বমায়ায় তিনি নরাকারে অবতীর্ণ। গোপিকা-গণের এরূপ কথন কি কেবল প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেমিকের প্রগাঢ় প্রেমজনিত নিরর্থক উচ্ছ্বাস মাত্র?

গীতামুখে শ্রীকৃষ্ণ নিজেও বলিতেছেন—

'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহহম্' (১৪।২৭)—আমি বেদান্তোক্ত শুদ্ধ নির্গুণ ব্রহ্মের ঘনীভূত বিগ্রহ, প্রতিমা। পুনরায় বলিতেছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ (৯।১১)

আমি পরমেশ্বর, অন্তর্যামী - আমার এই স্বরূপ জানিতে না পারিয়া অজ্ঞানান্ধ মূঢ় ব্যক্তিগণ আমাকে ক্ষুদ্র মনুষ্যমাত্র কল্পনা করিয়া থাকে।

অনেকেই এরূপ ভাবিতে পারেন। ভাবিতে পারেন, ইহা নিছক আত্মস্তুতি মাত্র। সামান্য, সাধারণ মনুষ্য নিজের মহত্ত্ব প্রকট করিবার জন্য নিজেই নিজের স্তুতি করিয়া থাকে ও তদনুগামি-গণও তাহার প্রশংসায় মুখর হয়। অনেকে ভাবিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণ নিজে এবং তাঁহার অতুলনীয় রূপ- ও গুণ-মুগ্ধা ব্রজাঙ্গনাগণও হয়ত তাহাই করিয়াছেন। কঠোর সমালোচক হয়ত বলিবেন—'দম্ভ ও দর্প মানবের সাধারণ দুর্বলতা। আর ভক্তগণের কথা? নির্বিচার ভক্তি ও ভালবাসায় চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়। যথার্থ বিচার-দৃষ্টি প্রতিবন্ধ হয়। সুতরাং কোন্ ভক্ত কি বলিয়াছে তাহাই প্রমাণবাক্যরূপে গ্রহণ করা সমীচীন নহে'—ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণের জীবনী-

সহায়ে এই বিষয়ে একটু গভীর আলোচনা করিয়া দেখিলে এরূপ ধারণা আর থাকিবে না।

শ্রীকৃষ্ণ কি সাধারণ বা সর্বোচ্চ মানব, অথবা অবতার অথবা সাক্ষাৎ ভগবান্? ভারতের সর্বত্র তিনি ভগবদ্‌জ্ঞানে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। ইহা কি অন্ধপরম্পরামাত্র? এই বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্। তিনি অবতার বা সর্বোচ্চ মানবমাত্র নহেন। তাঁহাকে সাধারণ মানবমাত্র বলা তো ধৃষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

মানুষ যতই জ্ঞানলাভ, যোগাভ্যাস বা কর্ম করুক না কেন, তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে না বা পারিবে না। শ্রীকৃষ্ণচরিত্র সর্বদিকে আদর্শ, তিনি লীলাপুরুষোত্তম।

'ভগবান্' শব্দটির অর্থ কি? অভিধানে 'ভগ' শব্দের অর্থ এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়—

ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতম্॥

—অর্থাৎ ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টি পরিপূর্ণ গুণ 'ভগ' শব্দদ্বারা সূচিত হইয়া থাকে। অতিদুর্লভ এই গুণ সমুদয় একাধারে যাঁহাতে প্রকৃষ্টরূপে বিকশিত, তিনিই ভগবান্। মানুষে ইহাদের দুটি-একটির প্রকাশ ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। সকলগুলির একত্র-সমাবেশ কখনও দেখা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে পূর্বোক্ত গুণগুলির পরিপূর্ণ প্রাকট্য দৃষ্টিগোচর হয় কিনা, উহাই এক্ষণে আমাদের বিচার্য।

প্রথমতঃ (১) **ঐশ্বর্য** ঃ—শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বিবিধ ঐশ্বর্যশালী পুরুষ আজ পর্যন্ত ধরাবক্ষ অলঙ্কৃত করে নাই। তাঁহার ন্যায় ঐশ্বর্য কোন মানবে হওয়া অসম্ভব। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার জীবন অলৌকিক ঐশ্বর্যপরিপূর্ণ। জন্মকালে তিনি স্বীয় জনক-জননীকে যে ঐশ্বর্য দেখাইয়াছিলেন তাহা দর্শনকরতঃ প্রিয়-পুত্রকে তাঁহারা পরমেশ্বরজ্ঞানে স্তুতি করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। শৈশবে ও বাল্যে অবলীলা-ক্রমে সর্বলোকবৈরী অগণিত দানব-বিনাশ তাঁহার অমানবী শক্তির—ঐশ্বর্যের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। গিরিগোবর্ধন ধারণকরতঃ তিনি ভীত ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন; অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে ব্রহ্মার গর্ব খর্ব করতঃ বাল্যকালেই তিনি স্বীয় ঐশ্বর্য সর্বজনসমক্ষে প্রকটিত করিয়াছিলেন।

তাঁহার অতুলনীয় রূপও একটি ঐশ্বর্য। অমন রূপ মানুষের হয় না। 'সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ' (ভাঃ ১০।৩২।২)—সাক্ষাৎ কামদেবেরও মনোমোহনকারী অলৌকিক দৈহিক রূপ লইয়া তিনি আসিয়াছিলেন। সে স্নিগ্ধ রূপের আলোকে সকলেই আকৃষ্ট হইত। কামগন্ধ-বিহীন সেই দিব্যরূপসুধা পান করিয়া সকলে দেবজনদুর্লভ প্রেমলাভকরতঃ অমৃতত্বের অধিকারী হইত। এই রূপে আকৃষ্ট হইয়া গোপীগণের কামও বিশুদ্ধ প্রেমে পরিণত হইয়াছিল। ('গোপ্যঃ কামাৎ'……ভাঃ ৭।১।৩০)। ঐ রূপসাগরে নিমগ্ন হইয়া সকলে প্রাণে পাইয়াছিল পরম আনন্দ, শান্তি ও কৃত-কৃত্যতা। ব্রজবাসিগণ তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত। তিনি ছিলেন তাহাদের ক্রীড়াসঙ্গী।

গোপীগণসহ পূর্ণিমারজনীতে জ্যোৎস্না-বিধৌত যমুনাকূলে তিনি যে অলৌকিক রাসনৃত্যলীলা করিয়াছিলেন, উহাও তাঁহার যোগৈশ্বর্য ও পূর্ণতার পরিচয় প্রদান করে। উহা কামজর্জরিত-চিত্ত প্রাকৃত জনের নিন্দিত কামবিলাসমাত্র কখনই নহে। এই লীলাদর্শনে স্বয়ং কামদেবও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

'সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধ সৌরতঃ'

(ভাঃ ১০।৩৩।২৫)—

পূর্ণ ঊর্ধ্বরেতা হইয়া তিনি রাসনৃত্য-লীলা করিয়াছিলেন। এই লীলায় কাম তাঁহাকে স্পর্শই করিতে পারে নাই। দুর্বল মানব এই অবস্থা কল্পনাও করিতে পারে না। শাস্ত্রে 'অসিধার' ব্রতের উল্লেখ আছে। সর্বগুণান্বিত যুবা পুরুষ সর্বসুলক্ষণা যুবতী স্ত্রী সহ যদি কামভাব পরিত্যাগকরতঃ সদা প্রসন্নচিত্তে বাস করিতে পারে, তাহাকে 'অসিধার' ব্রত কহে। নিয়ত ঘূর্ণ্যমান শাণিত তরবারির নিকট অক্ষত দেহে অবস্থানের ন্যায় এই 'অসিধার' ব্রত অতি দুঃসাধ্য। প্রতি পদেই বিপদের সম্ভাবনা। সহস্র 'অসিধার'-ব্রততুল্য এই রাসলীলা। মহাযোগী ব্যতীত আর কে এইরূপ করিতে

একই কালে বহু সহস্র গোপীগণসহ বিহার—ইহা কি কোন মনুষ্যে সম্ভব? রাসলীলা কালে যোগমায়ার ঐশ্বর্যে ষোড়শ সহস্র গোপী ও রাখাল তিনি সৃষ্টি করিলেন। রাসলীলা অন্তে রাত্রিশেষে কিছুই অবশেষ থাকে নাই। বিনা উপাদানে যোগমায়াবলে তিনি ঐ বিচিত্র সৃষ্টি করিলেন—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণ মহা যোগৈশ্বর্যবান।

বাল্যকালে শ্রীকৃষ্ণ যে সকল অলৌকিক কর্ম করিয়াছেন উহা তাঁহার ঐশী শক্তিরই বিকাশ; ভেল্কিবাজি নহে। তৎকালে মহাজ্ঞানী মহাপুরুষগণও তাঁহার ঐশ্বরীয় লীলায় বিশ্বাস করিতেন। ভীষ্ম তাঁহাকে স্তুতি করিয়াছেন—

নমস্তে ভগবন্ কৃষ্ণ লোকানাং প্রভবাপ্যয়ঃ।
ত্বং হি কর্তা হৃষীকেশ সংহর্তা চাপরাজিতঃ॥

(মহাভাঃ শাঃ পঃ ৫১।২ রাজধর্ম)

—হে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ! তুমি সর্বলোকের উৎপত্তি ও প্রলয়ের অধিষ্ঠান, তোমাকে নমস্কার। হে হৃষীকেশ! তুমিই জগতের সৃষ্টি- ও সংহার-কর্তা। তুমি অপরাজেয়। আবার—

এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাদাদ্যো নারায়ণঃ পুমান্।
মোহয়ন্ মায়য়া লোকং গূঢ়শ্চরতি বৃষ্ণিষু॥

(ভাগঃ ১।৯।১৮)

—আপন মায়ায় সকলকে মোহিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণের মধ্যে বিচরণ করিতেছেন। ইনি ভগবান্, সাক্ষাৎ আদি নারায়ণ।

নারদাদি মহর্ষিগণও শ্রীকৃষ্ণের ঐশী ঐশ্বর্যে পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। দুর্যোধনও তাঁহাকে শ্রেষ্ঠজ্ঞানে স্তুতি করিয়াছেন। যথা—

স হি পূজ্যতমো লোকে কৃষ্ণঃ পৃথুললোচনঃ।
ত্রয়াণামপি লোকানাং বিদিতং মম সর্বথা॥

(মহাভাঃ উঃ ৮৮।৫)

—বিশাললোচন শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভুবনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, পরমপূজনীয়, ইহা আমি উত্তমরূপে অবগত আছি।

শ্রীকৃষ্ণ লোকোত্তরপুরুষ এ বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন।

পুণ্য ভারতভূমি তখন অধর্ম ও অত্যাচারের লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ সকলের নিপীড়নে কাতর হইয়া বিশ্বস্রষ্টার চরণে মূক আর্তি জানাইতেছিল—ইহাও শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। তখন তিনি অধর্মের প্রভাব দূর করিতে প্রশস্ত কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। মধুর গোকুল ও বৃন্দাবনে তখন কেবল বংশীবাদনেই তিনি কালাতিপাত করিতে পারিলেন না। তাঁহার বৃন্দাবনলীলা ফুরাইল। অত্যাচারী নৃপতি-বর্গের উচ্ছেদার্থে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের আয়োজন হইল এবং বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে দিয়াই তিনি এ কার্য করাইলেন। স্বীয় ঐশী শক্তি দ্বারাই এ কার্য সম্পাদন করিলে আমরা তাঁহার

পরিপূর্ণ চরিত্রটি দেখিতে পাইতাম না; সখা ও ভক্ত অর্জুনের মহিমাও পূর্ণরূপে খ্যাপিত হইত না।

ঐশী ঐশ্বর্যের বিকাশ শ্রীকৃষ্ণের জীবনে ভূরিভূরি দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার তিরোধানের পর বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন যাদব রমণীগণের রক্ষণেও সমর্থ হইলেন না। স্বকীয় গাণ্ডীব ধনুটি পর্যন্ত তিনি উত্তোলনে অসমর্থ, প্রভূত অস্ত্রবিদ্যা বিস্মৃত। কৃষ্ণের শক্তিতেই তিনি এতকাল এত যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছিলেন। সে শক্তি স্বধামে গমন করিয়াছেন—তাই অর্জুন শক্তিহীন। রথের অগ্রভাগে শংখচক্রগদাপদ্মধারী যে শ্রীকৃষ্ণ-মূর্তি অর্জুন সদা দর্শন করিতেন, তাহাও তাঁহার লোচনপথ হইতে তিরোহিত। যুদ্ধক্ষেত্রে কত অলৌকিক উপায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহার বিবরণও আমরা মহাভারতে পাইয়া থাকি। ইহা তাঁহার মানবীয় শরীরে ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ।

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের অমানবীয় ঐশ্বর্যে দৃঢ়-বিশ্বাসী ও তজ্জন্য তাঁহাতে একান্ত অনুরক্ত। স্বয়ম্বর-সভায় লক্ষ্যবেধকালেও দেখিতে পাই, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া ধনুর্গ্রহণকরতঃ লক্ষ্যবেধপূর্বক পাঞ্চালীকে লাভ করিলেন—

প্রণম্য শিরসা দেবমীশানং বরদং প্রভুম্।
কৃষ্ণং চ মনসা কৃত্বা জগৃহে চার্জুনো ধনুঃ॥
(মঃ আঃ ১৮১।১৮)

মৃত গুরুপুত্রের পুনর্জীবনদান ও অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে উত্তরার গর্ভস্থ নিহত শিশু পরীক্ষিৎকে পুনরুজ্জিবীকরণ—এ সকলও শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক ঐশ্বর্যের পরিচায়ক।

জয়দ্রথবধকালে সহসা যোগবলে সূর্যমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া অর্জুনকে দিয়া তিনি জয়দ্রথ-বধ করাইলেন; অর্জুনের প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইল—

ততোঽসৃজৎ তমঃ কৃষ্ণ সূর্যস্যাবরণং প্রতি।
যোগী যোগেন সংযুক্তো যোগীনামীশ্বরো হরিঃ॥
(দ্রোণ-পর্ব ১৪৬।৬৭, ৬৮)

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধান্তে অর্জুন প্রথম রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন, তৎপশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবামাত্রই সমগ্র রথ ভস্মীভূত হইয়া গেল। দ্রোণ ও কর্ণের দিব্যাস্ত্রসমূহের অব্যর্থ প্রভাব বাসুদেব এতদিন স্বীয় ঐশী শক্তিদ্বারা প্রতিহত করিয়া রাখিয়াছিলেন। স্বকার্যসমাপনান্তে সে শক্তি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ নিজের মধ্যে উপসংহার করিয়া লইবামাত্র রথ ভস্মে পরিণত হইল—

স দগ্ধো দ্রোণকর্ণাভ্যাং দিব্যৈরস্ত্রৈ মহারথঃ।
অথাদীপ্তোঽগ্নিনা হ্যাশু প্রজজ্বাল মহীপতে॥
(শল্যপর্ব ৬২।১৩)

রথসহ অর্জুনও বিনাশপ্রাপ্ত হইতেন; তাই তিনি অর্জুনকে প্রথমে নামিতে দিয়া নিজে পরে নামিলেন।

পাণ্ডবগণের বনবাসকালে দ্রৌপদীর প্রার্থনায় সহসা উপস্থিত হইয়া পাত্রসংলগ্ন শাককণা ভক্ষণকরতঃ দুর্বাসাশাপভয় হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন—

স্থাল্যাঃ কণ্ঠেঽথ সংলগ্নং শাকান্নং
বীক্ষ্য কেশবঃ॥
উপযুজ্যাব্রবীদেনামনেন হরিরীশ্বরঃ।
বিশ্বাত্মা প্রীয়তাং দেব স্তুষ্টশ্চাস্ত্বিতি যজ্ঞভুক্॥
(বনপর্ব ২৬৩।২৪,২৫)

এইরূপ বহু ঘটনায় নিঃসন্দিগ্ধরূপে ইহাই প্রতিভাত হয় যে শ্রীকৃষ্ণ অচিন্তনীয় যোগৈশ্বর্যবান্। তাঁহার সমগ্র জীবনই অমানবীয় ঐশ্বর্যপরিপূর্ণ। ক্ষুদ্র মনুষ্যের তো কোন কথাই হইতে পারে না, অবতারাদি পুরুষেও ঐশ্বর্যের এরূপ সর্বাঙ্গীন প্রকাশ কোথাও দেখা যায় না। এখন আমারা তাঁহার বীর্যবিষয়ে আলোচনা করিব।

২। **বীর্য ঃ**—শারীরিক বলও শ্রীকৃষ্ণের অপরিসীম ছিল। বহু বলী, দুরাচারী অসুরগণকে তিনি অপরের সাহায্য বিনা একাই নিধন করিয়া স্বীয় অতুলনীয় দৈহিক শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। কংসের রঙ্গভূমিতে প্রবেশকালে মত্ত নিধন ও তাহার দন্তোৎপাটন করিয়া যখন তিনি সেখানে প্রবেশ করিয়াছিলেন তখন ভোজপতি ও অন্যান্য রাজন্যবর্গের সাক্ষাৎ প্রতীতি হইয়াছিল যে সম্মুখে দণ্ডদাতা কাল উপস্থিত—

'মৃত্যুর্ভোজপতেঃ' 'অসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা'
(ভাঃ ১০।৪৩।১৭)

বালক অবস্থাতেই তাঁহার এরূপ অমানবীয় তেজ ও শক্তির বিকাশ যে, কেহই তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না। অবলীলাক্রমে তিনি সেই সভাগৃহেই কংসকে নিধন করিলেন। রাজসূয় যজ্ঞসভায় শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ পূজালাভদর্শনে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া শিশুপাল তাঁহাকে সর্বজনসমক্ষে অশেষ নিন্দাবাদ করিতে লাগিল—

ক্লীবে দারক্রিয়া যাদৃগন্ধে বা রূপদর্শনম্।
অরাজ্ঞো রাজবৎ পূজা তথা তে মধুসূদন॥
(মহাভাঃ সভাঃ ৩৭।২৯)

—অর্থাৎ ক্লীবের পক্ষে কি বিবাহ শোভনীয়? অন্ধ কি রূপদর্শন করিতে পারে? তদ্রূপ হে মধুসূদন! রাজা না হইয়াও তোমার এরূপ রাজবৎ পূজা অশোভনীয়

ধৃষ্টতা যখন চরমে উঠিল তখন স্বীয় বীর্যপ্রকাশকরতঃ শিশুপালকে শ্রীকৃষ্ণ বধ করিলেন। সেই সভাতেই শ্রীকৃষ্ণের অসীম শারীরিক বল ও বেদজ্ঞানের বিষয়ে পিতামহ ভীষ্ম বলিয়াছিলেন—

পূজ্যতায়াঞ্চ গোবিন্দে হেতু দ্বাবপি সংস্থিতৌ।
বেদবেদাঙ্গবিজ্ঞানং বলঞ্চাপ্যধিকং তথা॥
নৃণাং লোকে হি কোঽন্যোঽস্তি
বিশিষ্টঃ কেশবাদৃতে॥
(মহাভাঃ সভাঃ ৩৮।১৮,১৯)

—অর্থাৎ গোবিন্দের সর্বজন-পূজ্যতার দুইটি কারণ; প্রথমতঃ তাঁহার বেদ-বেদাঙ্গের জ্ঞান ও দ্বিতীয়তঃ তাঁহার শারীরিক বল। কিন্তু বলবান্ হইয়াও শক্তির অপব্যবহার তিনি কখনও করেন নাই। নিরর্থক রক্তপাতের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। শান্তির দূত হইয়াই তিনি পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। সর্বত্র শান্তিরক্ষার্থ তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। অন্য সর্বচেষ্টা ব্যর্থ হইলে কেবল তখনই তিনি বলপ্রয়োগ করিতেন। মহাবীর অশ্বত্থামা বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার সুদর্শনচক্র ভূমি হইতে উত্তোলন করিতে সমর্থ হন নাই। অথচ সেই গুরভার চক্র তিনি অবলীলাক্রমে ব্যবহার করিতেন। এইরূপে দেখা যায় যে তিনি অমানবীয় দৈহিকশক্তিসম্পন্ন ছিলেন।

৩। **যশ ঃ**—শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় যশস্বী দেখা যায় না। তাঁহার যশসৌরভে সমগ্র জগৎ আমোদিত। তাঁহার দিব্য জীবন- ও লীলাকীর্তনে ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা মুখর। সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞানে তিনি সর্বত্র পূজিত হইতেছেন। আবহমানকাল ধরিয়া এই পৃথিবীতে কত বীর, কত রাজা, কত রাজনীতিজ্ঞ ও বিদ্বান্ জন্মগ্রহণ করিয়া সমুদ্রের জলবুদ্বুদের ন্যায় বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কথা কে মনে রাখিয়াছে? তাঁহাদের শৌর্য, বীর্য, বুদ্ধি ও বিদ্যার কথা মনে করিয়া আজ কেহই তো আকৃষ্ট হয় না? শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় যশোলাভ কোন মানবের ভাগ্যে সম্ভব হইতে পারে না। কুরুক্ষেত্র সমরপ্রাঙ্গনে দুঃখমোহাকুল প্রিয়সখা অর্জুনের প্রতি তাঁহার যে 'গীতা'-উপদেশ—তাহা সমগ্র মানবজাতির প্রতিই তাঁহার অপূর্ব দান। মোক্ষগ্রন্থ গীতাই তাঁহার নাম জগতে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

ধর্মজগতে গীতার স্থান অতি উচ্চে। নানা ভাষায় অনূদিত হইয়া একমাত্র এই একখানি গ্রন্থই দেশ-বিদেশে শ্রীকৃষ্ণের বিমল যশ বিস্তার করিয়াছে, যাহা অন্য কোন মানব বা অবতারের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

৪। **শ্রী**:—রাজার অধিক ধন ও ঐশ্বর্য-সম্পন্ন ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। সম্পূর্ণ অনাসক্তভাবেই তিনি সে সব ভোগ করিয়া গিয়াছেন। বাল্যসখা দরিদ্র সুদামাকে তিনি অতুলনীয় ধনের অধিকারী করিলেন (ভাঃ ১০।৮১।৩৩); যাদবগণের বাসের নিমিত্ত সমুদ্রমধ্যে অপূর্ব দ্বারকানগরী নির্মাণ করাইলেন। পার্থিব ধনাদিতেও তাঁহার ভাণ্ডার সদা পূর্ণ ছিল। এ বিষয়েও কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিল না।

৫। **জ্ঞান**:—জ্ঞানবিজ্ঞানের অপূর্ব ভাণ্ডার মোক্ষগ্রন্থ 'গীতা'ই শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক দিব্য জ্ঞানের সম্যক্ পরিচয়। গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী। জ্ঞান- ভক্তি- কর্ম- ও যোগ-মার্গের এরূপ অভাবনীয় সমাবেশ অন্য কোন গ্রন্থে বিরল দৃষ্ট হয়। ইহা সর্বজন-সুবিদিত যে, কোন গ্রন্থোক্ত জ্ঞানেতেই গ্রন্থকারের জ্ঞান-ভাণ্ডার নিঃশেষিত হইয়া যায় না। তদ্রূপ গীতোক্ত জ্ঞানেতেই শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানবিজ্ঞান সীমিত, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে। তাঁহার জ্ঞানের সীমা ছিল না। উজ্জয়িনীতে গুরুগৃহে বাসকালে মাত্র ৬৪ দিনে তিনি বিদ্যার ৬৪ কলায় সম্পূর্ণ পারদর্শী হইয়াছিলেন (ভাঃ ১০।৪৫।৩৫)। অস্ত্রবিদ্যায়ও তিনি অতি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং এ বিষয়ে সেই কালে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। কূটনীতিতেও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। পিতামহ ভীষ্মকে বধ করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় পরিপূর্ণচিত্ত অর্জুনকে উত্তেজিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি নিজেই রথচক্রধারণ করিয়া যুদ্ধার্থ ধাবিত হইলেন। অর্জুন কখনই আচার্যবধ করিবেন না—ইহা বুঝিতে পারিয়া পুনঃপুনঃ ব্রহ্মাস্ত্রপ্রয়োগকারী ধর্মজ্ঞানরহিত আচার্য দ্রোণকে বধ করাইবার উদ্দেশ্যে অশ্বত্থামাবধ-বার্তা প্রচার করাইলেন। এই সকলই তাঁহার কূটনীতির সাক্ষ্য দেয়। কৌরবসভায় সন্ধিপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে প্রত্যাবর্তন-কালে তিনি রাজ্যের লোভ দেখাইয়া কর্ণকে পাণ্ডবপক্ষে যোগদানের পরামর্শ দিয়াছিলেন। 'ভীষ্ম সেনাপতি থাকাকালে আমি যুদ্ধ করিব না'—কর্ণের এরূপ প্রতিজ্ঞা শুনিতে পাইয়া যুদ্ধ-প্রারম্ভে কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনেও তিনি কর্ণকে পাণ্ডবপক্ষে আনিবার শেষ চেষ্টা করেন। এইরূপে দেখা যায়, ভেদনীতিতেও তিনি কুশল ছিলেন। ক্ষত্রিয়কুলসংহারী সমর আরম্ভ হয়, ইহা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। মহাবীর কর্ণের বলে বলী দুর্যোধন কর্ণের অভাবে হতোৎসাহ ও যুদ্ধবিরত হইয়া শান্তিপ্রয়াসী হইবে, এই বিশ্বাসেই তিনি ভেদনীতি গ্রহণপূর্বক শান্তির জন্য শেষ চেষ্টা করিলেন। সাম, দান, ভেদনীতি ব্যর্থ হইলে অবশেষে বাধ্য হইয়া দণ্ডনীতির আশ্রয় লইলেন ও পাণ্ডবগণকে যুদ্ধার্থ প্ররোচিত করিলেন। কৌরবসভায় দূতরূপে আগত শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন—

কুরূণাং পাণ্ডবানাং চ শমঃ স্যাদিতি ভারত।
অপ্রণাশেন বীরাণামেতদ্ যাচিতুমাগতঃ॥
(উদ্যোগ পর্বঃ ৯৫।৩)

—হে রাজন্! আমি এই প্রার্থনা লইয়াই আসিয়াছি, যাহাতে ক্ষত্রিয়কুলের সংহার না হয় এবং কুরুপাণ্ডবগণের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়।

কিন্তু ধৃষ্ট দুর্যোধন জবাব দিলেন যে বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রপরিমিত ভূমিও দেওয়া হইবে না (উদ্যোঃ পর্বঃ ১২৩।২৫)। তখন আর অন্য উপায় রহিল না।

কংসবধের পর কংসের শ্বশুর জরাসন্ধ পুনঃ পুনঃ মথুরা অবরোধ করিলে দুর্যোধনাদি সকলেই সে পক্ষে যোগদান করিয়াছিল।
তেজ, বুদ্ধি ও বলপ্রয়োগে সে আক্রমণ সকল প্রতিহত করিয়াছিলেন। উভয় পক্ষেই অশেষ লোকক্ষয় হইতেছিল। তখন ভীমের দ্বারা সময়ান্তরে জরাসন্ধ বধ করাইবেন সংকল্প করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণ সহ ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে নবনির্মিত দ্বারকাপুরীতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। লৌকিক দৃষ্টিতে ইহা তাঁহার কাপুরুষতা, ভীতিপ্রসূত পলায়নবৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা নহে। কারণ, পরবর্তী কার্যপরম্পরা ইহাকে তাঁহার সমরনীতি-কুশলতা বলিয়াই প্রমাণ করিয়া থাকে। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সাময়িক পশ্চাদপসরণ ভাবী সর্বসংহারী আক্রমণের পূর্বাভাস বলিয়াই সমরবিশেষজ্ঞগণের অভিমত। শ্রীকৃষ্ণ একাধারে জ্ঞানী, নীতিমান্, রণকুশল, রাজনীতিজ্ঞ ও পরমযোগী। কূট-রাজনীতি হইতে আরম্ভ করিয়া অত্যুচ্চ সমাধিতত্ত্ব পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁহার অবাধ গতি। একাধারে এরূপ অলৌকিক গুণরাজির সমাবেশ কি কোন মানবে সম্ভব হইতে পারে?

৬। **বৈরাগ্য**ঃ—বৈরাগ্যের অভূতপূর্ব মহিমায় শ্রীকৃষ্ণের জীবন চিরমহিমান্বিত। বিষয়ের প্রতি পরিপূর্ণ অনাসক্তির পরিচয় তাঁহার জীবনে আমরা সর্বত্র পাইয়া থাকি। কংসবধের পর মথুরারাজ্য স্বীয় করতলগত হইলেও উহা তিনি তুচ্ছবোধে ত্যাগ করিলেন ও কংসপিতা উগ্রসেনকেই রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে দ্বারকাতে রাজ্যস্থাপন করিয়া সেখানেও তিনি নিজে রাজা হন নাই; উগ্রসেনকেই রাজা করিলেন। সহদেবপ্রদত্ত বহু ধনরত্ন নিজে গ্রহণ না করিয়া উহা রাজসূয় যজ্ঞ করিবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করেন (মহাভাঃ সভাঃ ২৪।৪২; ৩৩।১৩)। ময়দানবকে দিয়া যুধিষ্ঠিরের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে অপূর্ব সভাগৃহ নির্মাণ করাইয়া দিলেন। অনুরুদ্ধ হইয়াও নিজের জন্য কিছুই চাহিলেন না (মহাভাঃ সভাঃ ১।১০, ১১)।—এই সকলই তাঁহার আসক্তিহীনতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। তাঁহার অনাসক্তির আর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ—তাঁহার নির্বিকার সান্নিধ্যে যদুবংশনাশ। তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে সমগ্র যদুবংশ ধ্বংস হইয়া গেল। পরমপ্রিয় আত্মীয়স্বজন সকলেই বিনাশপ্রাপ্ত হইলেন। এই স্বকুলনাশ প্রতিরোধে নিজে সমর্থ হইয়াও তিনি উহার রক্ষার্থ কোন চেষ্টাই করিলেন না। ভবিতব্য বলবান্। দেখিলেন ঐশ্বর্যমদিরাপানে উন্মত্ত, তাঁহারই আশ্রিত যদুকুল পৃথিবীর ভারস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার নিজেরও ধরাধাম হইতে বিদায় লইবার কাল অত্যাসন্ন। অতঃপর এই যাদবগণ সকলের ভীতিস্বরূপ হইয়া পড়িবে ও সাধুজন নিগৃহীত হইবে। তাই অসংযত ভোগ ও ঐশ্বর্যের চরম পরিণতি যে বিনাশ—এই সত্যটিও তিনি মহাপ্রয়াণের পূর্বে দেখাইয়া গেলেন। তাঁহার সম্মুখেই যাদবকুলকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়াও শ্রীকৃষ্ণ ধীর, শান্ত, নির্বিকার। সর্বাবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণ অবিচলিত। সতত-চঞ্চল ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে থাকিয়াও তিনি সদা আত্মসমাহিত। পরমপ্রিয় ব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া আর তিনি দ্বিতীয়বার সেখানে পদার্পণ করেন নাই। মাধুর্যরসের লীলাস্থল শ্রীবৃন্দাবন ও ক্রীড়াসঙ্গী গোপ-গোপিকাগণ তাঁহার কত প্রিয় ছিল! তাহাদের পরস্পর প্রীতি কত গভীর ছিল! কিন্তু জগৎকল্যাণার্থ যখন তিনি বৃহত্তম কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য যাত্রা করিলেন, তখন সে সব কোথায় পড়িয়া রহিল! উহা যেন মন হইতে মুছিয়া গেল। সে

প্রসঙ্গও আর করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ ত্যাগী।

আদর্শ গৃহস্থ-জীবনও যাপন করিয়া তিনি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। ভাগবতে দেখিতে পাই তাঁহার দৈনন্দিন কার্যসূচী। নিত্য নিয়মিত জপ, সন্ধ্যাবন্দনা, হোম, অতিথিসেবা, ব্রাহ্মণপূজন—এ সকলে তাঁহার কখনও ব্যতিক্রম হইত না। ভগবদারাধনা ব্যতীত শুধু কর্মদ্বারা কখনও মানবজীবন সার্থক হয় না—ইহাই তিনি জীবনে দেখাইলেন (এ বিষয়ে মহাভাঃ শান্তিপর্ব ৫৩।২, ৭, ৮ শ্লোকও দ্রষ্টব্য)। কর্ম ও উপাসনা একত্র অনুষ্ঠেয়। পরমপ্রিয় সখা ও শিষ্য অর্জুনকেও তিনি গীতামুখে এই কথাই বলিয়াছেন—'মামনুস্মর যুধ্য চ'—(৮।৭)। অর্থাৎ হে অর্জুন! তুমি আমাকে সদা স্মরণ কর ও আপন কর্তব্যকর্মও অনলসভাবে করিয়া যাও। এইরূপে সদা আমাতে অর্পিত-চিত্ত তুমি অন্তে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। এই উপদেশ নিজেও পালন করতঃ তিনি আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

লাক্ষাগৃহদাহের পর পাণ্ডবগণের প্রচ্ছন্ন বাসস্থল বিরাটনগরীর কুম্ভকারগৃহেও নিজে আসিয়া সকল বিষয় জানিয়া গেলেন এবং লৌকিক শোকপ্রকাশও করিয়া গেলেন। লোকাচারও পালনীয় ইহাই তিনি দেখাইলেন। সেই সময় 'আমি কৃষ্ণ' এই বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদানকরতঃ যুধিষ্ঠির ও কুন্তীদেবীকে চরণস্পর্শ-পূর্বক প্রণাম করিতেও তিনি ভোলেন নাই। লোকমর্যাদা-রক্ষার কি সুন্দর দৃষ্টান্ত!

তাঁহার হৃদয় ছিল করুণার আগার। দুঃখী, নিপীড়িতগণের দুর্দশা, দ্রৌপদীর ব্যাকুল ক্রন্দন তাঁহার চিত্তকে একান্তভাবে ব্যথিত করিয়াছিল। রাজসভায় কুলবধূ দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা তৎকালীন নৈতিক অবনতির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, কর্ণ—ইঁহারাও কি তাহার কোন প্রতিবিধান করিতে পারিতেন না? কিন্তু দ্রৌপদীর আকুল আর্তি তাঁহাদের চিত্তেও করুণার উদ্রেক করিতে পারে নাই। অবশেষে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ অসহায়া নারীর মানরক্ষা করিলেন।

এইরূপে ঐশ্বর্য, বীর্যাদি ছয় গুণের চরম, পরিপূর্ণ সমাবেশ শ্রীকৃষ্ণের জীবনেই পরিলক্ষিত হয় বলিয়া নিঃশংকচিত্তে বলা যাইতে পারে যে **শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্**। পূর্বোক্ত ছয়টি 'ভগ' বা গুণ পরিপূর্ণরূপে যাঁহাতে আছে তিনিই ভগবান্—শুধু মানব বা অবতার মাত্র নহেন। শ্রীকৃষ্ণচরিত্র ব্যতীত এরূপ সর্বগুণের মিলনক্ষেত্র আর কোথায়? মানুষ ভগবান্ সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা অধিক আর কিছু স্বীয় পরিচ্ছিন্ন মনবুদ্ধি-সহায়ে কল্পনাতেও আনিতে পারে না। তাই শ্রীমদ্ভাগবতকার যথার্থই বলিয়াছেন—'**কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্**'।

অতএব গোপিকাগণের শ্রীকৃষ্ণে ভগবদ্জ্ঞান অথবা তাঁহার স্বমুখে স্বীয় ঈশ্বরত্বখ্যাপন কেবল নিছক ভাবোচ্ছ্বাস বা দম্ভমাত্র নহে। উহা যথার্থ।

আচার্য শংকরের পদানুগ, জ্ঞানী, দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ, শংকরোত্তরযুগে অদ্বৈতবেদান্তদর্শন-রাজ্যের একচ্ছত্রাধিপতি সম্রাট্, 'অদ্বৈতসিদ্ধি'-গ্রন্থকার স্বামী শ্রীমধুসূদন সরস্বতীও শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ পরব্রহ্মজ্ঞানে আপন হৃদয়ের শ্রদ্ধাপূত অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছেন—

> বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ,
> পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
> পূর্ণেন্দুসদৃশমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ,
> কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥
> (গীতা, টীকা—১৫ অঃ)

—বংশীবিভূষিত করযুগল, নবজলধরসদৃশ বর্ণ,

পীতাম্বরধারী, রক্তবর্ণবিম্বফলতুল্য অধরোষ্ঠ, পূর্ণচন্দ্রতুল্য সুন্দর বদন, কমলনেত্র শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষা অধিক, উৎকৃষ্ট আর কোন তত্ত্ব আমি জানি না।

আবার বলিয়াছেন—

পরাকৃতনমদ্বন্ধং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতিঃ।
সৌন্দর্যসারসর্বস্বং বন্দে নন্দাত্মজং মহঃ॥
(গীতা; টীকা—১৪ অঃ)

—আশ্রিতভক্তগণের সর্ববন্ধবিনাশকারী, সর্বসৌন্দর্যঘনমূর্তি, নন্দ-নন্দন, নরাকৃতিধারী জ্যোতির্ময় পরব্রহ্মকে আমি বন্দনা করি।

আলৌকিক দিব্য লীলাবিগ্রহধারী শ্রীভগবানের নাম, গুণ ও মনোহর চেষ্টাদি চিন্তনে কাহার না চিত্ত আকৃষ্ট হয়? প্রষ্টা, শ্রোতা ও বক্তা সকলকেই শ্রীবাসুদেবকথা সমভাবে পবিত্র করিয়া থাকে। ভগবানের অনন্ত মহিমা, অতি উৎকৃষ্ট লীলাবিলাস এবং অপার করুণায় মুগ্ধ হইয়া আত্মারাম মুনিগণও তাঁহাতে ভক্তিপূর্বক মনোনিবেশ করিয়া থাকেন—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥
(ভাঃ ১।৭।১০)

ভাগবতকার বলিতেছেন যে অজ্ঞানাদি-বন্ধনরহিত, অপরোক্ষজ্ঞানী, আত্মারাম মুনিগণও যে শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তি অর্পণ করিয়া থাকেন, ইহা কিছু আশ্চর্যের বিষয় নহে; কারণ অনন্তকল্যাণগুণসাগর ভগবান্ শ্রীহরির আকর্ষণ দুরতিক্রমণীয়। এই আকর্ষণই যুগে যুগে সর্বদেশে সকলকে বিষয়ভোগবিমুখ করিয়া টানিয়া লইয়াছে, তাহাদিগকে ভগবৎপ্রেমে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ বাদরায়ণ শ্রীবেদব্যাসও এই আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন। তিনিও ইহার সর্বতঃপ্রসারী প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। সর্ববেদবিভাগ, মহাভারত, ব্রহ্মসূত্র ও পুরাণাদি রচনা করিয়াও যখন ব্যাসদেব চিত্তে অপূর্ণতা ও অসন্তোষের অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিলেন, তখন দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে বলিলেন—'হে মহর্ষে! আপনি সব কিছুই করিয়াছেন কিন্তু পরমহংসগণের পরমপ্রিয় শ্রীভগবানের নির্মল যশকীর্তন যথেষ্ট করেন নাই। ধর্মাদি পুরুষার্থের বর্ণনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের মহিমাবর্ণন করেন নাই। ইহাই আপনার চিত্তগত অসন্তোষের কারণ। আপনি সর্বজীবের বন্ধনমুক্তির জন্য সমাধিমার্গে শ্রীভগবানের লীলাসমূহ স্মরণকরতঃ প্রেমের সহিত উহা কীর্তন করুন। উহাতে জীবের পরম কল্যাণ সাধিত হইবে এবং আপনারও চিত্তে শান্তি আসিবে।'—(ভাঃ ১।৫।৯,১৩)

দেবর্ষি নারদের আদেশে ব্যাসদেব শ্রীভগবল্লীলাগুণগানতৎপর হইয়া জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য ও প্রেমের অপূর্ব গাথা শ্রীমদ্‌ভাগবত রচনাকরতঃ পরিতৃপ্ত হইলেন। উহার পুনরাবৃত্তিকরতঃ ভগবল্লীলারসামৃতপানে তাঁহার চিত্ত মগ্ন হইল। আজন্মসন্ন্যাসী, মায়ানির্মুক্ত, পরমহংসাগ্রণী, প্রিয়পুত্র শুকদেবকেও তিনি এই দেবদুর্লভ অমৃতের স্বাদগ্রহণ করাইলেন। পিতার নিকট পরমনিবৃত্তিপরায়ণ শুক শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিলেন।

যদৃচ্ছাক্রমে পৃথিবীবক্ষে আত্মারাম শুক জড় ও মূকের ন্যায় বিচরণ করিয়া বেড়ান। কোন নির্দিষ্ট আশ্রয় তাঁহার নাই। আত্মারাম, আত্মতৃপ্ত, আত্মক্রীড় শুক দেহবোধ পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়া বায়ুতাড়িত শুষ্কপত্রখণ্ডের ন্যায় প্রারব্ধ-বেগে ইতস্ততঃ পর্যটন করিতে করিতে গঙ্গাতটে সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন যেখানে শৃঙ্গীঋষির শাপগ্রস্ত, সপ্তাহকালমাত্রাবশিষ্ট-পরমায়ু, অনশনব্রতী মহারাজ পরীক্ষিৎ সর্ব-বিষয়ভোগপরিত্যাগকরতঃ নির্বিঘ্নচিত্তে মোক্ষ-

সাধন পরমার্থজ্ঞানলাভের আশায় অগণিত ঋষিমুনিজনপরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট। পরীক্ষিতের ভাগ্যাকাশে যেন সহসা বিমল পূর্ণচন্দ্রোদয় হইল। তিনি আশু মোক্ষসাধন-জিজ্ঞাসু হইয়া শুকের চরণে নিপতিত হইলেন।

আচার্য শংকর বলিয়াছেন—

আচার্যস্যাপি অয়ং নিয়মঃ যন্ন্যায়প্রাপ্তসচ্ছিষ্য-
নিস্তারণমবিদ্যামহোদধেঃ। (মুঃ ১।২।১৩)

—অর্থাৎ বিধিবৎ উপসন্ন, যোগ্য, সৎশিষ্যকে সংসাররূপ অবিদ্যাসাগর হইতে উদ্ধার করা আচার্যের অবশ্য-কর্তব্য।—ইহাই সনাতন রীতি। বর্তমান ক্ষেত্রেও এই রীতির ব্যতিক্রম হইল না। গ্রীষ্মসন্তপ্তা ধরিত্রীই প্রকৃতির অব্যভিচরিত নিয়মানুসারে বর্ষার স্নানসুখে পরিতৃপ্তা হইয়া থাকে। মহারাজ পরীক্ষিতের চিত্তে অশান্তির দাবানল জ্বলিতেছিল, কৃপাজলধর শ্রীশুকের অশ্রান্ত উপদেশবারি-বর্ষণে সে অগ্নি নির্বাপিত হইল। মহারাজ সদ্য ব্রহ্মনির্বাণ লাভকরতঃ কৃতকৃত্য হইলেন। শ্রীমদ্ভাগবতামৃত স্বভাবতই মধুর, শ্রীশুকমুখ-নিঃসৃত এই অমৃত মধুরতর। ভাগবতকার তাই করুণাবিগলিতচিত্ত হইয়া জগদ্বাসী সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন -

অসারে সংসারে বিষয়বিষসঙ্গাকুলধিয়ঃ
ক্ষণার্ধং ক্ষেমার্থং পিবত শুকগাথাতুলসুধাম্।
কিমর্থং ব্যর্থং ভো ব্রজত কুপথে কুৎসিতপথে
পরীক্ষিৎ সাক্ষী স্যাৎ শ্রবণগতমুক্ত্যুক্তিকথনে॥
(ভাঃ মাহাঃ ৬।১০০)

—অসার এই সংসারে হে বিষয়বিষ-জীর্ণ বিক্ষিপ্তচিত্ত মানব, আপন ভাবী কল্যাণের জন্য ক্ষণার্ধও শ্রীশুকমুখনিঃসৃত বাসুদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই অতুলনীয় চরিতামৃত পান কর! কেন বৃথা বিপথে কুমার্গে ভ্রমণকরতঃ কষ্ট পাইতেছ? এই অলৌকিক ভগবচ্চরিত্র শ্রবণের ফল—মুক্তি। এই বিষয়ে মহারাজ পরীক্ষিৎ সাক্ষী।

এক্ষণে তিরু অনন্তপুরমের (ত্রিবান্দ্রাম) শ্রীমন্দিরনিবাসী ভগবান্ শ্রীপদ্মনাভ স্বামীর একনিষ্ঠ ভক্ত মহারাজ শ্রীকুলশেখর আলোয়ার-কৃত 'মুকুন্দমালা' হইতে উদ্ধৃত একটি শ্লোকের মাধ্যমে এই আলোচনার উপসংহার করিতেছি—

কৃষ্ণ ত্বদীয়ে পদপংকজপিঞ্জরান্তে
অদ্যৈব বিশতু মে মানসরাজহংসঃ।
প্রাণ-প্রয়াণসময়ে কফবাতপিত্তৈঃ
কণ্ঠাবরোধনবিধৌ স্মরণং কুতস্তে॥

—হে দীনবন্ধু, ভক্তবৎসল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ! তোমার চরণকমলরূপ পিঞ্জরে আজই আমার চিত্তরূপ বিহঙ্গ প্রবেশ করুক, অর্থাৎ এই মুহূর্ত হইতেই আমার চিত্ত তোমার চিন্তায়, তোমার ধ্যানে নিমগ্ন হউক। কারণ এইরূপে দীর্ঘকাল নিরন্তর ও সৎকারসহকৃত চিন্তনে অভ্যস্ত না হইলে অন্তকালে যখন বায়ু, পিত্ত ও কফের বিকারে কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া আসিবে তখন তোমাকে চিন্তা করার অবসর কোথায়?

মিলনান্ত

শ্রীদিলীপকুমার রায়

বঁধু, তোমার পানে কি শুধু আমরাই ধাই পথহারা পান্থ,
চঞ্চল উদ্‌ভ্রান্ত ?
তুমিও কি ভালোবাসো না
নিতি বিছায়ে স্নিগ্ধ ছায়াখানি তব তুমিও কি কাছে আসো না,
যবে আমরা আতপ-ক্লান্ত ?

তুমি যদি উদাসীন,
তবে বাহুবন্ধনে বেঁধে করো কোন্ প্রেমলীলা প্রেমহীন,
ওগো নিঠুর, যুগযুগান্ত ?

কত অতৃপ্ত বাসনা,
কত সোনার-হরিণ-মরীচিকা, কত মরুবুকে তৃষাদাহনা
হয় পরশে তোমার শান্ত !

নদী যবে ধায় উছলি',
তার বাজে না কি বুকে যুগে যুগে তব সিন্ধুর নীল মুরলী,
ওগো সুন্দর, নীলকান্ত ?

মিছে কাজে রেখে জড়ায়ে,
করো কেন এ-ছলনা বন্ধু, বলো না মায়ার খেলায় ভুলায়ে ?
নয় বিরহ কি মিলনান্ত ?

স্বামী বিবেকানন্দের ভারত ও ভারতের বৈদেশিক নীতি

শ্রীমনকুমার সেন

নিউইয়র্কে স্বামী নিখিলানন্দজীর কাছে যেদিন কথাপ্রসঙ্গে শুনলাম ওয়াশিংটনে তথা আমেরিকায় ভারতীয় দূতাবাসের কোন অনুষ্ঠানে আমাদের বেদান্ত-কেন্দ্রের সন্ন্যাসীদের বড় একটা ডাক পড়ে না, সংস্কৃতি-বিষয়ক কোন বিষয়ে তাঁদের উপস্থিতির আবশ্যকতা অনুভূত হয় না, তখন এক মুহূর্তে আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল--কেন আমাদের সংখ্যাতীত ও সোচ্চার শান্তির ঘোষণা সত্ত্বেও, ভারতের বৈদেশিক নীতি বা বিদেশে স্বাধীন ভারতের মর্যাদা রাজনীতি-নিরপেক্ষভাবে সর্বজনীন শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণ করতে পারেনি। ওদেশে তো, শুনলাম, প্রেসিডেন্টের উপস্থিতিতেও ওঁরা গির্জার যাজকদের দিয়ে প্রারম্ভিক শান্তিবচন উচ্চারণ করিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করে থাকে।

এর পরেই নিউইয়র্কে স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত প্রথম ও মূল বেদান্ত-কেন্দ্রের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী পবিত্রানন্দজীর সঙ্গেও দীর্ঘ সময় আলোচনা করার সুযোগ হয়েছিল। তিনিও প্রসঙ্গতঃ অত্যন্ত খেদ প্রকাশ করেছিলেন—আধ্যাত্মিকতাই ভারতের প্রাণের উৎস; কিন্তু বর্তমানে ভারতের জীবনের সর্বক্ষেত্রেই অধ্যাত্মবাদকে কেন্দ্রবিন্দু করা হচ্ছে কই? ভারতের রাজনীতিতে অধ্যাত্মবাদকে কেন্দ্রবিন্দু করা হয় নাই। অথচ আমরা বলে থাকি, মহাত্মা গান্ধীর পথই অনুসরণ করা হচ্ছে; আধ্যাত্মিকতা বাদ দিলে তা সম্ভব কি? সীমিত অধ্যাত্মবাদটুকু গ্রহণ করতে বাধা কোথায়?

পাঠকদের মধ্যে কেউ যেন 'ধর্ম'কে 'আধ্যাত্মিকতা'র স্থানে বসিয়ে আমার বক্তব্যে ভুল না বোঝেন, ধর্ম-নিরপেক্ষতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে কোন বিশেষ একটি ধর্মের রাষ্ট্র গড়ে তোলার পক্ষে আমি ওকালতি করছি, এরূপ মারাত্মক ভ্রমে যেন না পড়েন।

ধর্ম বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি আধ্যাত্মিকতা লাভের একটি বিশেষ পথ; তাকে অতিক্রম করেই আধ্যাত্মিকতা। আধ্যাত্মিকতা সর্বজনীন, সর্বব্যাপক। সে যে কতখানি অতিক্রান্ত, কতখানি সর্বব্যাপক, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস তার এক চিরলক্ষ্য মূর্ত প্রতীক। শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দু নন, মুসলমান নন, খৃষ্টান নন, পার্শী নন, জৈন নন; আবার সবই। সব ধর্ম এই একটি মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সব ধর্মের মানুষ এই একটি ধর্মসাধকের মধ্যে তাঁদের মনের মতো করে ধর্মের সুসঙ্গত, সহজ, অন্তরঙ্গ, মানবজীবনের বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য উপকরণগুলো পেয়েছে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বধর্মের, সকলের। ধর্মসাধনায় এই সর্বাত্মক সিদ্ধির ফলেই শ্রীরামকৃষ্ণ আধ্যাত্মিকতার প্রতিমূর্তি, পরমপুরুষ, যুগাবতার। সর্বজনীন সত্য, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বব্যাপী সত্য যখন এইভাবে তাঁর মধ্যে অবতরণ করল, তখন সব অনুষ্ঠান, ধর্মের সব কর্মকাণ্ড তিনি অতিক্রম করে গেছেন। মাতৃরূপী সেই সর্বজনীন সত্যের পায়ে ধর্মাধর্ম সব অঞ্জলি দিয়ে তিনি বসে আছেন। এই অভিনব সত্যের স্ফুরণের আধার, আধ্যাত্মিক পৌরুষের বিশ্ববিজয়ী উত্তরাধিকারী স্বামী বিবেকানন্দ। 'হিন্দু সন্ন্যাসী' বলে তাঁকে নিয়ে কেউ গর্ব করেন করুন—সেটা হবে তাঁর আংশিক, অস্পষ্ট পরিচয়। হিন্দু-ধর্মের মূলীভূত সর্বাত্মক আধ্যাত্মিক আবেদনকে লক্ষ্য করে

যদি তাঁকে হিন্দু সন্ন্যাসী বলা হয়, তাতে অবশ্য কোন প্রমাদ থাকবে না। আসল কথা হল, জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ধর্মের গণ্ডী অতিক্রম করেই শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সর্বধর্মের প্রতিনিধিস্বরূপ হতে পেরেছিলেন। 'অতিক্রম' করার অর্থ নিশ্চয়ই অবহেলা বা বর্জন করা নয়। যা আছে তাকে সম্পূর্ণ জয় করার, অধিগত করার পরই আসে অতিক্রম্য সীমা। আমরা দেশ অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক আদর্শের অনুধ্যান করি; তার একটিমাত্রই মানে হতে পারে—তলায় যে মাটি এবং ওপরে যে আকাশকে অবলম্বন করে আমাদের আজকের সীমিত জীবন, তাকেই অন্তহীনা ধরিত্রী ও অসীম আকাশের অবলম্বনে এক মহাজীবনে ছড়িয়ে দেবার জন্য আমাদের অভিযান। মানবসভ্যতা এই একাত্মতা, অভিন্নতা, দেশ-জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সর্বজনীন উপলব্ধির পথেই এগিয়ে চলেছে। আর একাত্মতার সাধনাই আধ্যাত্মিকতা। এই একাত্মতার অসীম শক্তি ও আকুলতাই স্বামী বিবেকানন্দকে ঘুরিয়ে নিয়েছে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে, দেশ থেকে বিদেশে—সুদূর আমেরিকায় ও লণ্ডনে। ভদ্রলোকের দয়াবুদ্ধি নিয়ে নয়, সেবকের অসীম নম্রতা নিয়ে মুচি-মেথর-মুদ্দোফরাস, সমাজের নিম্নতম ধাপ পর্যন্ত প্রেম-করুণার ভাণ্ডার নিয়ে তিনি হাজির হয়েছেন। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, নিরক্ষরের কান্না তাঁকে প্রতি মুহূর্ত অস্থির করে রেখেছে, আর জাতিধর্ম-নির্বিচারে এই সমগ্র সমাজের বেদনার বোঝা নিজের হৃদয়ে ধারণ করে তার সমাধানের প্রত্যাশাতেই ছুটে গিয়েছেন তিনি আমেরিকায়। বছর তিরিশেকের এক ভারতীয় যুবক আজ থেকে প্রায় ৭২ বছর আগের অসম্ভব রকম বিপদ-আপদ ও প্রতিবন্ধকতাকে তুচ্ছ করে সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন, বিভিন্ন ধর্মমতের মিলনবার্তা ঘোষণা করার বিস্ময়কর প্রজ্ঞা ও পৌরুষ দেখিয়েছিলেন, শিকাগোতে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসভায় শ্রেষ্ঠ বিজয়মাল্য ধারণ করে কোটি কোটি বিদেশীর হৃদয় জয় করেছিলেন: আমাদেরই দেশের ইতিহাসের এই অভূতপূর্ব রোমাঞ্চকর গাথা—যা প্রাক্‌স্বাধীন ভারতকে দিয়েছে বিস্ময়কর বলিষ্ঠতা—স্বাধীন ভারতের নীতিকে সত্যই প্রভাবিত ও সমুন্নত করেছে কি? ঘরে বা বাইরে এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর খুঁজে পাওয়া কঠিন।

এই যে সর্বাত্মক ধ্যান, এটিই আধ্যাত্মিকতা, এটিই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রবর্তিত ব্যবহারিক বেদান্ত। অধ্যাত্মবাদের এমন একটি সর্বব্যাপক সহজ জ্ঞান —শ্রীরামকৃষ্ণের আগে আমারা পাইনি, আর তার প্রয়োগও দেখিনি স্বামী বিবেকানন্দের আগে। বনের বেদান্তকে সর্বত্যাগী প্রতিমারূপে চিত্রিত করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, আর সর্বাহংকারমুক্ত সেবা দিয়ে তাকে ঘরে ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বিবেকানন্দ। আর তাঁদেরই চরণচিহ্ন ধরে এসেছেন মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি একই বার্তা নিয়ে। 'সকলে সুখী হউক'—বেদ-উপনিষদের এই মহামন্ত্রকে জীবন্তরূপে তুলে ধরলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতিতে সেই আদর্শকে সাকার করে তুলবার প্রচেষ্টাতেই মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতির কর্মসাধনা—সত্য, প্রেম ও করুণার তিন মৌল সূত্রে গ্রথিত গঠনমূলক কার্যক্রম। প্রতিটি মানুষের যে অন্তর্নিহিত দেবত্ব ও পূর্ণতার কথা স্বামীজী বারবার ঘোষণা করেছেন, তার পরিপ্রকাশের প্রয়াসই ব্যবহারিক বেদান্ত।

ভারত সরকার ধর্ম-নিরপেক্ষ; ইহা ভালই। কিন্তু ভারতবর্ষের রাজশক্তি কি আধ্যাত্মিকতা-নিরপেক্ষও থাকবে? তাহলে তো ভারতের প্রাণশক্তিকে, ভারতের শত শত শতাব্দীর গৌরব-মর্যাদাকে বিসর্জন দিতে হয়। চোখ মেলে

চাইলেই নজরে পড়বে, জড়বাদী বা বস্তুতান্ত্রিক আদর্শের এত প্রচার সত্বেও আজও ভারতের জনসাধারণ আধ্যাত্মিকতা-বর্জিত প্রশাসনকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। কারো যদি সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে, তিনি আধ্যাত্মিকতা-বিরোধী চ্যালেঞ্জ নিয়ে হাজির হয়ে জনমত যাচাই করে দেখতে পারেন!

এই আধ্যাত্মিকতাই যখন ভারতের মৌলিকতা, তার সর্বনীতির সার, সর্বজগতের কল্যাণের মন্ত্রও যখন এটি, আর এই মন্ত্রেরই দর্শন যখন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ব্যবহারিক বেদান্তে, তখন ঘরে বাইরে তাকে সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠরূপে অনুসরণ করতে এত কুণ্ঠা কেন? তার উপযুক্ত শিক্ষাদর্শ আজও প্রবর্তিত হ'ল না!

কোন দেশের বৈদেশিক নীতি তার স্বদেশের নীতি-নিরপেক্ষ হতে পারে না। হলে তার ধার বা ভার কোনটাই থাকে না। বস্তুতঃ দেশের অভ্যন্তরে অনুসৃত নীতির সবলতা বা দুর্বলতা, মৌলিকতা বা কৃত্রিমতাই দেশের বাইরে অনুসৃত নীতির জনক। বিশেষ করে আজকের বৈজ্ঞানিক যুগে,—যখন ইচ্ছে করলেও কোন দেশের লৌহ-যবনিকার অন্তরালে থাকবার উপায় নেই, এক দেশের ঘাত-প্রতিঘাত যখন অন্যদেশে পৌঁছুবেই এবং কোন দেশেরই একক, অন্য-নিরপেক্ষ, প্রচ্ছন্ন জীবন যাপনের সুযোগ নেই—তখন কোন দেশের আভ্যন্তরীণ নীতির বলিষ্ঠতা ও ফলপ্রসূতা দিয়েই সেই দেশের বৈদেশিক নীতিকে লোকে যাচাই করবে, বিচার করবে, আভ্যন্তরীণ নীতির মৌলিকতা বা কৃত্রিমতা অনুযায়ী সেই দেশের বৈদেশিক নীতি বরাবর বলিষ্ঠ স্বীকৃতি ও সম্মান কিম্বা উপেক্ষা ও বিদ্রূপ লাভ করবে এটাই স্বাভাবিক।

একটা সর্বজনীন শান্তির ভিত্তির ওপর দাঁড়ানোই ভারতের বৈদেশিক নীতির আদর্শ। আন্তর্জাতিক প্রত্যেকটি বিরোধ বা সমস্যার বিচারও সে যথাসম্ভব তার গুণাগুণের ভিত্তিতেই করতে চায়। কিন্তু এইটুকুই নয়, প্রাণবান মৌলিকত্ব চাই সেখানে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঘাত-প্রতিঘাত, বাদ-বিসম্বাদ আছে বলেই শান্তিবাদী যুদ্ধবিরোধী ভারতের কোথাও কদর, কোথাও অনাদর—মোটের ওপর কতটা সম্মান। কিন্তু বহির্জগতের শ্রদ্ধা ও মর্যাদাও আমাদের অর্জন করতে হবে। শান্তির সময়ে শান্তিশক্তি পরিপোষণের কার্যক্রম না থাকলে আন্তর্জাতিক শ্রদ্ধা ও মর্যাদা অর্জন করা অসম্ভব। অর্থাৎ শান্তির একটি শাশ্বত নীতি রাজনীতি বা আন্তর্জাতিক ঘটনা-নিরপেক্ষভাবে অনুসরণ করতে হবে, যে-নীতি প্রতিদিন সাধারণ মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে, মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ ঘটাবে। লোকচক্ষুর অন্তরালে ক্রমবর্ধমান হয়ে মানুষের অন্তরের এই দেব-শক্তি একদিন এক সার্বভৌম অপরাজেয় শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে যুদ্ধকে অসম্ভব করে তুলবে। শান্তিবাদী ভারতবর্ষের বৈদেশিক নীতিতে, বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসগুলির কার্যকলাপে প্রতিদিনের এই প্রত্যয়শীল আচরণ নিশ্চয়ই একান্ত কাম্য।

বৈদান্তিক পটভূমি ও কর্মবিন্যাসের দুর্ভাগ্যজনক অভাবহেতুই, চরম লজ্জা ও বেদনার মধ্যে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা-কালে আবিষ্কার করলাম,—ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েও এমন ভারতীয় ছাত্র থাকা সম্ভব যিনি শিকাগোতে অনুষ্ঠিত ধর্ম-মহাসভা ও সেই মহাসভায় প্রচারিত স্বামীজীর উদাত্ত আহ্বান সম্বন্ধে অজ্ঞ! কিন্তু প্রতিবছর এই যে হাজারে হাজারে ছাত্রছাত্রীর ও অন্যশ্রেণীর ভারতীয় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যান শিক্ষাসূচী বা সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের কার্যসূচী নিয়ে,

তাঁরা কোন্ সংস্কৃতিকে বহন করে নিয়ে যান, কোন্ ভারতের দৌত্য করেন? বেদান্তকে বাদ দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির কোন্ পাঠ দিয়ে তাঁদের পাঠানো হয় বিদেশে? তাঁদের প্রত্যেকেই ভারতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, যা কিছু মহৎ ও বৃহৎ অল্পবিস্তর তারই প্রতিনিধিত্ব করবেন, এটাই তো প্রত্যাশিত! সেই দৌত্য গড়ে তুলবার মতো কোন কার্যক্রমেই ভারত ছাড়বার আগে কিম্বা ভিন দেশে পৌঁছুবার পরে ভারতীয় দূতাবাসের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা প্রয়োজন। সত্য বটে, অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিও যাচ্ছেন এবং স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষিত ভারতকে, ভারতের উচ্চতর জীবনাদর্শকে বিদেশের জনসাধারণের সামনে তুলে ধরছেন। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা হাজারেও একজন নয়। বিদেশগমনে নির্বাচিত ভারতীয়দের ভারতীয় সংস্কৃতির সুযোগ্য দূতরূপে গড়ে তুলবার জন্য বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থার অভাবহেতু এটি ঘটছে। নিছক বিদ্যার অহমিকা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি-ডিপ্লোমার তকমা নিয়ে যাঁরা যাচ্ছেন তাঁদের পক্ষে অতি সহজেই আমেরিকা প্রভৃতি দেশের অপচয়বহুল, ব্যসনকেন্দ্রিক জীবনে হাবুডুবু খাওয়া এবং দেশীয় ধর্ম-সংস্কৃতিতে জ্ঞান ও প্রত্যয়শীলতা না থাকায় সস্তা দেহসর্বস্ব জীবনযাত্রার আবেদনে সহজেই ভেসে যাওয়া স্বাভাবিক। এরূপ ক্ষেত্রে বিদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির দূত না হয়ে বিদেশের সংস্কৃতির দূত হয়েই এদেশে ফিরে আসতে হবে তাঁদের। বিদেশ থেকে নিশ্চয়ই আমরা দুহাতে বিজ্ঞানের আশীর্বাদ নিয়ে আসব, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানের ভাণ্ডার ভরে আনব কি? 'ঈশ্বরকে জানার নামই জ্ঞান, আর সব অজ্ঞান', 'ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু' শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের এই জীবন-দর্শনে সরকারী বা বেসরকারী ভারতীয় দূতগণের প্রত্যয় কতটুকু? যতটুকু প্রত্যয় ততটুকুই হবে তাঁদের বিদেশযাত্রার সাফল্য, ততটুকুই ভারতের লাভ, ততটুকুতেই ভারত-মার্কিন, ভারত-বৃটেনের সম্পর্কে স্থায়ী সুফল। ভারতের বৈদেশিক নীতিকে যদি আমরা এতখানি মৌলিকতায় ও জীবনসত্যের গভীরে বিন্যস্ত না করতে পারি, তাহলে বৈদেশিক সম্পর্কে ভারতের রাজনীতি থাকবে কিন্তু ভারতীয় রাজনীতির স্বরূপ তাতে প্রতিবিম্বিত হবে না। স্বামীজীর আমেরিকা ভ্রমণ ও শিকাগো ধর্মসভায় সমগ্র মানবতার উত্থানকল্পে ধর্মসমন্বয়ের বাণী উচ্চারণের পর ভারতের বৈদেশিক সম্পর্কে যে আলোকোজ্জ্বল নবযুগের অভ্যুদয় হয়েছে, মর্যাদাসম্পন্ন ইতিহাস-সচেতন কোন ভারতবাসী তাকে উপেক্ষা করে বা বাদ দিয়ে বৈদেশিক নীতি ও কর্মপদ্ধতি রচনা করতে চাইবেন কি?

স্বদেশের সনাতন জীবননীতিকে আশ্রয় করে একটি পূর্ণাঙ্গ বৈদেশিক নীতির কাঠামো তৈরী করার কল্পনা অসম্ভব নয়। মনে হয়, আপাততঃ আমরা একটু নিশ্চয়ই করতে পারি: ভারতের বিদ্যার্থী, শিক্ষক-অধ্যাপক, সাহিত্যিক-সাংবাদিক ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবী, সমাজ-সেবক ও শিল্পী—যাঁদেরই ভারত সরকারের কিম্বা বিদেশী সরকারের বৃত্তিতে বা আমন্ত্রণে বিদেশযাত্রার অনুমতি দেওয়া হবে, ভারতের কয়েকটি আধুনিক সংস্কৃতি-কেন্দ্র বেছে নিয়ে সেখানে তাঁদের পূর্বাহ্নে যথোপযুক্ত পাঠগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হবে; দ্বিতীয়তঃ, বিদেশে পৌঁছুবার পরই স্থানীয় ভারতীয় দূতাবাস তাঁদের প্রত্যেককে যথোচিত প্রীতি ও সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করে সর্বাগ্রে স্থানীয় ভারতীয় সংস্কৃতি-কেন্দ্রে কিছু সময় দুইদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির তুলনামূলক অধ্যয়নের সুযোগ করে দেবেন।

পাঞ্চজন্য

শ্রীভবতোষ শতপথী

দুখিনী জননীর উষ্ণ আঁখিজল,
তীব্র হলাহল কলহ-কোলাহল,
শিয়রে বিভীষিকা, অতি জঘন্য !
বাজেনা আজো কেন, পাঞ্চজন্য !

অসহ যন্ত্রণা, অগ্নিবৃষ্টি !
বিভেদ-বিষময় অশুভ সৃষ্টি !
লুব্ধ লোকালয় যেন অরণ্য !
বাজেনা আজো কেন, পাঞ্চজন্য !

লুপ্ত হবে বুঝি পুণ্যকর্ম
সত্য সনাতন মানব ধর্ম
আত্মসম্মান, সুলভ পণ্য !
বাজেনা আজো কেন, পাঞ্চজন্য !

পাপের পদাঘাতে ভীষণ লজ্জা
শ্রান্ত বসুমতী, ধূসর সজ্জা
ব্যর্থ বিলাসিতা, সতত ঘৃণ্য !
বাজেনা আজো কেন, পাঞ্চজন্য !

ধ্বনিত দিকে দিকে অসার গর্জন
হিংস্র হুংকারে কাঁপিছে ত্রিভুবন !
কাতর হাহাকার ! দুঃখ দৈন্য !
বাজেনা আজো কেন, পাঞ্চজন্য !

কালের সহচর তাথৈ নৃত্যে
মৃত্যু-শিহরণ জাগায় চিত্তে
প্রীতির বন্ধন ছিন্নভিন্ন !
বাজেনা আজো কেন, পাঞ্চজন্য !!

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী*

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

[অনুবাদিকা : অধ্যাপিকা শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত]

আমরা শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর চ—এ আমাদের পরম সৌভাগ্য। তেমনি তাঁদের ভক্ত হবার দায়িত্বও আছে। কারণ তাঁরা ঠিক মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভক্তের জন্য আসেন নি, এসেছিলেন সকলের জন্য। শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে কোন সম্প্রদায়গঠন চলে না। তিনি 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' এসেছেন। ঠাকুর বলেছিলেন—'এমন সব লোক এখানে আসবে যাদের ভাষা পর্যন্ত আমি জানি না।' সত্যই আজ দেশে বিদেশে নানা ভাষাভাষী বহু ব্যক্তি তাঁর বাণী সাগ্রহে শোনেন। কি তাঁর বিশেষ বাণী? কোন্ মূল্যবোধ তিনি আমাদের দিয়েছেন?

প্রথমতঃ মনে রাখতে হবে তাঁর মধ্যে কোন সঙ্কীর্ণতা নেই--তিনি অসীম উদার। সেজন্য, একজন সাধারণ হিন্দু শুধু মুখে 'শ্রীরামকৃষ্ণের জয়' বললেই যে তাঁর ভক্ত হতে পারবে তা নয়। তাকে এই উদারতার মন্ত্র গ্রহণ করতে হবে, তবেই সে ঠিক ঠিক ঠাকুরের ভক্ত হতে পারবে। তাকে সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা হতে মুক্ত হতে হবে। এ দেশে সাধারণতঃ সঙ্কীর্ণতা উদ্ভূত হয় দু'টি উৎস হতে—এক, সম্প্রদায়গত ধর্ম হতে, দুই, জাতিভেদের বিধান হতে। ঠাকুরের নিকট আসতে হলে এই উভয়প্রকার সঙ্কীর্ণতাই ত্যাগ করতে হবে। এই হচ্ছে সাধনা। সাধারণ হিন্দু মনে করে জপ-পূজা-ধ্যান প্রভৃতি অনুষ্ঠানই সাধনা। এ সবও সাধনা সন্দেহ নেই। কিন্তু হৃদয়কে উদার করে তোলা আরও বড় সাধনা—এটি ছাড়া জপ-পূজা-ধ্যান কিছুই সার্থক হয় না। স্বামীজী বলেছেন—'ধর্ম আমাদের আকাশের মত উদার করে তোলে'। শ্রীশ্রীঠাকুরের দ্বারা প্রবর্তিত এই নূতন সাধনায় আজ আমাদের দীক্ষিত হতে হবে। এ যদি পারি, তাহলে আমরা বিপুল শক্তির অধিকারী হতে পারব।

পুনরায়, শ্রীশ্রীঠাকুরের যে ঠিক ঠিক ভক্ত সে কখনও অস্পৃশ্যতা অনুসরণ করতে পারে না —তিনি এত অসীম উদার। কিন্তু দেখেছি, তাঁর ভক্ত বলে পরিচয় দেয় এমন ব্যক্তিও গোপনে অস্পৃশ্যতা মেনে চলেছে। এরূপ ব্যক্তি ঠাকুরের যথার্থ ভক্ত হবে কি করে? ঠাকুরের যে উদারতার বাণী তা হল অগ্রগতির শ্রেষ্ঠ বাণী, বহুকাল পরে স্বাধীন ভারতের প্রগতিধর্মী শাসন-তন্ত্র তাঁরই উদারতার বাণীকে লিপিবদ্ধ করেছে তার অস্পৃশ্যতা-বর্জন সম্বন্ধীয় অনুচ্ছেদে।

ঠাকুর মা ও স্বামীজীই আজ প্রকৃত অগ্রগতির পথপ্রদর্শক। তাঁদের অনুসরণ করতে গেলে বাড়ীর দাসদাসীকেও মনুষ্যত্বের মর্যাদা দিতে হবে, তাদের সঙ্গে ব্যবহারে একথা সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, তারাও মানুষ। কিন্তু আমরা তা কদাচিৎ করে থাকি। স্মরণ রাখতে হবে, সঙ্কীর্ণতা ভারতের জাতীয় ধর্ম ও জাতীয় ঐতিহ্যের বিরোধী। এ যুগের অবতারপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ এই জাতীয় ধর্ম ও ঐতিহ্যের মূর্ত

* ১০ই মে, ১৯৬৫ তারিখে বালিগঞ্জ মহিলাসংসদের প্রতিষ্ঠাদিবসে প্রদত্ত ইংরেজী ভাষণের অনুলিপি হইতে।

প্রতীক, তিনি ভারতের প্রাণপুরুষ। আমরা মনে করি এই যুগাবতারকে শুধু 'শ্রীরামকৃষ্ণের জয়' বলে রব তুললেই প্রসন্ন করা যাবে। তা হয় না। তিনি আমাদের সর্বপ্রথম যে মূল্যবোধ দিয়েছেন তা হল—উদার হতে হবে, সব সঙ্কীর্ণতা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে হবে। অসীম আকাশের মতো উদারতা—এই হল তাঁর প্রথম বাণী

তিনি আমাদের যে দ্বিতীয় বাণী দিয়েছেন, তা হল সেবার বাণী। ভগবান যীশু, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—সকলেই এই একই উদ্দেশ্যে এসেছিলেন —সেবার বাণী প্রচার করতে। বলেছিলেন—'যদি তোমরা আমাকে ভালবাস তাহলে ওই দরিদ্র এবং পদদলিতদেরও ভালবাস, সেবা কর।' সকল ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে খৃষ্টধর্মাবলম্বীরাই এই সেবাধর্ম সর্বাপেক্ষা অধিক অনুসরণ করে চলেছে। ভগবদ্-গীতারও মূলকথা :—

'যে তু ধর্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥'

যারা তাঁর বাণী শুনবে, তারা তাঁকে সর্বক্ষণ সর্বতোভাবে অনুসরণ করতে প্রয়াস পাবে শুধু মন্দিরে গিয়ে ঘণ্টা বাজালেই তাঁর পূজা হয় না, প্রত্যেক কর্মকেই উপাসনা করতে হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই জোর দিয়ে বলেছেন: 'শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ'—"যারা শ্রদ্ধাবান হয়ে ও আমার প্রতি ভালবাসায় আমাদ্বারা উক্ত অমৃততুল্য ধর্ম উক্ত প্রকারে অনুষ্ঠান করে তারাই আমার প্রিয় ভক্ত।" তাঁর ভক্ত হতে হলে জীবন দিয়ে তাঁর বাণী অনুসরণ করতে হবে, জীবনে অনুক্ষণ সর্ব কর্মানুষ্ঠান দিয়ে তাঁকে পূজা করতে হবে।

প্রত্যেক জীবের মধ্যেই তো ভগবান আছেন, শুধু তো মন্দিরে দেববিগ্রহের মধ্যে নয়। কিন্তু এ কথা আমরা মনে রাখি না। আমরা হাজার হাজার বছর ধরে এ বাণীর বিপরীত কার্যই করে এসেছি। এ বিষয়ে পথ প্রদর্শন করতেই এবার ঠাকুর এসেছিলেন। সর্বক্ষণ স্বার্থপরতা ও ঐহিকতাকে অনুসরণ করে সামান্য একটু দয়া ছুঁড়ে দেওয়া (যা আমরা সাধারণতঃ করে থাকি)—তাও তাঁর ধর্ম নয়, তা ঐহিকতাই ; তার উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ পুণ্যফল অর্জন, যাতে বিনিময়ে কিঞ্চিৎ সুখ লাভ হয়। সেজন্যই ঠাকুর সেবা-ধর্মের অমৃতবাণী শোনালেন।

স্বামীজী বলেছিলেন—"ভারতের জাতীয় আদর্শ হল ত্যাগ ও সেবা।" 'কাঁচা আমি'কে ত্যাগ করে 'পাকা আমি'কে ধরা—ঠাকুরের ভাষায় এই হল ত্যাগ। ত্যাগের পর আসে সেবা। শ্রীশ্রীমা বলেছেন, 'ঠাকুরের বিশেষত্ব এই যে, তিনি হলেন ত্যাগের প্রতিমূর্তি'। এ ত্যাগ একদিন স্বাভাবিক ভাবে আমাদের জীবনে আসতে পারে প্রেম ও সেবার পথে। শ্রীশ্রীমা জলন্ত দৃষ্টান্ত নিজ জীবনে স্থাপন করে গেছেন। জ্ঞান-যোগী জোর করে সব ত্যাগ করতে প্রয়াস করে, ভক্তিযোগী তাকে প্রেমের পথে স্বাভাবিক করে তোলেন। স্বামীজী তাঁর ভক্তিযোগে বলেছেন, 'ত্যাগ ভালবাসার মাধ্যমে মধুরতম মূর্তি ধারণ করে।' শ্রীশ্রীমা সেইটি দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। মা ছিলেন বিশ্বের মা, সকলের মা—সকলেরই জন্য হৃদয়ভরা ভালবাসা নিয়ে এসেছিলেন তিনি। এবং এই ভালবাসার দ্বারাই বিধর্মী ডাকাত আমজদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য মহাপুরুষ স্বামী সারদানন্দ—উভয়কে তিনি সমদৃষ্টিতে দেখেছিলেন। বিশ্বের সকলের জন্য হৃদয়ভরা ভালবাসায় ত্যাগ তাঁর স্বভাব-ধর্ম ছিল তিনি নিজের জন্য কখনও কিছু চান নি।

ভারতে যুগ যুগ ধরে কিন্তু মেয়েরা বড়ই সঙ্কীর্ণতার মধ্যে ডুবে ছিল। তারাই অস্পৃশ্যতা-

রূপ সঙ্কীর্ণতার বিধিকে বেশী করে অভ্যাস করেছিল। কিন্তু তাদের পক্ষে এ বড়ই বিপরীত আচরণ। নারী হল মাতা—ভালবাসা তার স্বভাবধর্ম। কিন্তু অনেক সময়ই বাড়ীতে পরিচারকদের প্রতি তাদের হৃদয়হীন ব্যবহার নজরে পড়ে। এ সকল সঙ্কীর্ণ ব্যবহার আজ ছাড়তে হবে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা সেজন্যই এসেছিলেন। তাঁরা এসেছিলেন ধর্মের জন্য, এসেছিলেন নাগরিকতার আদর্শ স্থাপনের জন্য। মনে রাখতে এ দেশে আজ ছোটবড় সকল মানুষ এক স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীন নাগরিক—তারা সকলেই আজ সমান মর্যাদা ও সমান অধিকারে প্রতিষ্ঠিত। আমরা যদি এই সাম্যের আদর্শ ঠিক ঠিক ধরতে পারি, তাহলেই ভারত হবে সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল রাষ্ট্র। সেজন্য আমি মনে করি যখনই এমনই করে স্ত্রী-পুরুষ ভক্তগণ একত্র সমবেত হন, তাঁরা যেন স্মরণ করেন যে তাঁদের ধর্ম এক জীবন্ত ও বাস্তব ধর্ম। এই বাস্তব সাম্যের ধর্মই তাঁদের অনুসরণীয়। তা শুধু নয়, এ তাঁদের দায়স্বরূপ।

এই বাস্তব সাম্যধর্মের অনুশীলনই শ্রীশ্রী-ঠাকুরের ভক্ত হবার অভিজ্ঞান। আমাদের মধ্যে এই অভিজ্ঞান দেখা যায় কি? দুঃখের বিষয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একবার মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরদর্শন করলাম, মুখে দুবার তাঁর নাম উচ্চারণ করলাম, তারপর প্রসাদ খেলাম—আর আমরা মনে করি যে তাঁর বড় ভক্ত হয়ে গিয়েছি। কিন্তু চরিত্রের কোন পরিবর্তন তো হল না। তা হলে হল কি? মনে রাখতে হবে শ্রীশ্রীঠাকুর হলেন যুগপ্রবর্তক, নূতন যুগের উপযোগী ভাবধারা দিতে এসেছিলেন। সেজন্য তাঁকে যারা অনুসরণ করতে চাইবে, তাদের নিজ নিজ জীবনে তাঁর বাণী অনুযায়ী ত্যাগ ও সেবার আদর্শ মূর্ত করে তুলতে হবে। তাদের উদার হতে হবে, শক্তিমান হতে হবে। তবেই তারা ঠিক ঠিক ঠাকুরকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে পারবে, ঠিক ঠিক নিজেদের তাঁর ভক্ত বলে পরিচয় দেবার অধিকার অর্জন করতে পারবে।

মনে রাখতে হবে ধন জন সম্পদ—এসবে সকলের সমান অধিকার। মনে রাখতে হবে এসব তো চিরদিনের নয়, দু'দিনের, অতএব এসব সকলের সেবায় লাগুক। ভগবান বুদ্ধের বাণী স্মরণ করুন। তিনি বলেছিলেন—'তুমি যখন উপাসনা করছ, তখন যদি কেউ হঠাৎ বিপদ বা দুঃখে প'ড়ে তোমার কাছে আসে, তাহলে উপাসনা ছেড়ে তার দুঃখ দূর করতে ব্রতী হওয়াই তোমার কর্তব্য।' কিন্তু কেউ সে কথা মনে রাখে না। আমি তো দেখি আজ যারা ভক্ত বলে পরিচয় দেয় তারা এবিষয়ে সবচেয়ে বেশী অমনোযোগী। সভাগৃহে দেখেছি, কোন কোন ভক্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সময় স্বার্থপরের মত নিজে ভাল আসনখানি পাবার জন্য অত্যন্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেন—সেখানে অন্যের যে অধিকারটুকু আছে তা কিছুতেই স্বীকার করেন না। আরও বেদনার কথা, কোন যুক্তি তাঁরা শুনতে প্রস্তুত নন, যথেচ্ছ আচরণই তাঁদের প্রিয়। প্রতিদিন এমনি করে আমরা ঈশ্বরের নামে, ঠাকুরের নামে ক্রমশঃ আরও স্বার্থপর হয়ে উঠছি। এসব কি ভক্ত হবার লক্ষণ? আমরা ভুলে যাই, শ্রীশ্রীঠাকুর অতি কঠিন, অতি যন্ত্রণাদায়ক গলক্ষতরোগে আক্রান্ত হয়েও মুহূর্তের জন্যও নিজ সুখসুবিধা বা আরামের কথা চিন্তা করতে পারেননি, সমস্তক্ষণ কেবল দুঃখী আর্ত মানুষদের দুঃখ দূর করবার কথাই চিন্তা করে গিয়েছেন এবং এজন্য তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করেছেন। মা-ও জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত সকলের সেবা করে গিয়েছেন। আমাদের সেই আদর্শেই অনুপ্রাণিত হতে হবে,

এইরূপ অপূর্ব সেবাব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। মানুষের সেবার মাধ্যমে সর্বদা ঈশ্বরের সেবা করতে হবে—শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তের এই হল আদর্শ।

দেশের নারীদের বিশেষ করে আজ এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে হবে। নিজ সন্তানদের এই মহান আদর্শে দীক্ষিত করবার দায়ও তাঁদের। ঠাকুর কিরূপ অসাধারণ সেবাব্রতী ছিলেন তার আর একটি দৃষ্টান্ত দেখুন। একবার দক্ষিণেশ্বরে একটি বাবু বেড়াতে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে ফুলবাগানে বিচরণ করতে দেখে তিনি মনে করলেন—এ বুঝি বাগানের মালী। তাঁকে ডেকে তিনি তাই বললেন, 'ওহে হু'টি ফুল তুলে দাও তো।' ঠাকুর এমন অভিমানশূন্য যে তাতে কিছু মনে করলেন না, সানন্দে ফুল তুলে তাঁকে দিলেন। পরে সেই ব্যক্তি জেনে পরম বিস্মিত হলেন যে যাঁকে তিনি মালী মনে করে ফুল তুলতে বলেছিলেন, তিনি আর কেউ নন, বহুজন-পূজ্য স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। এমনই ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের আত্মহারা অভিমান-শূন্য আশ্চর্য সেবাপরায়ণতা—তাঁকে কে কি বলল বা মনে করল তা খেয়াল নেই, প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণ করাতেই তাঁর আনন্দ, তাঁর তৃপ্তি। ঠাকুর মা ও স্বামীজীর পুণ্য জীবনে এরূপ বহু বহু দৃষ্টান্ত আছে।

এইরূপ সেবার মাধ্যমে নিজ দেহ-মনের সবচেয়ে সুন্দর ব্যবহার করা হয়। তাই ভক্তের লক্ষণ এই সেবা। হনুমানজীর কথা স্বামীজী প্রায়ই বলতেন। হৃদয়ে রামনাম আর অনুক্ষণ সেবায় নিজেকে বিস্মৃত হয়ে যাওয়া—এই হল রামায়ণের অন্যতম মহান চরিত্র হনুমান। ভক্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শ এই ভক্তরাজ হনুমান।

আমরা দেখছি শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজী উদারতা ও সাম্য, ত্যাগ ও সেবার মন্ত্রের মাধ্যমে জগতে শ্রেষ্ঠ অগ্রগতির আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। বক্তৃতা করে এ আদর্শ কাউকে বিশ্বাস করানো যাবে না। যদি বিশ্বাস করাতে হয় তা হলে এই আদর্শকে আমাদের জীবনে জীবন্ত করে তুলতে হবে, আমাদের প্রতিমুহূর্তের আচরণে তাকে বাস্তব করে তুলতে হবে। বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য তাদের পিতামাতাকে এ আদর্শ নিজ চরিত্রে ও আচরণে সব সময় ফুটিয়ে তুলতে হবে—তবে তারা বিশ্বাস করবে ও বুঝবে এ আদর্শের তাৎপর্য। সেজন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শ প্রচারের জন্য প্রয়োজন লেখার নয়, প্রয়োজন বক্তৃতার নয়—প্রয়োজন জীবনের, প্রয়োজন বাস্তব আচরণের, প্রয়োজন চরিত্রের; এ কথা ভুললে চলবে না।

আমি মনে করি, এ বিষয়ে নারী ভক্তদের বিশেষ দায়িত্ব আছে। মায়ের স্বতঃস্ফূর্ত অপার ভালবাসা—যা তাদের স্বভাবধর্ম, আজ তাই নিয়ে তাদের সমাজ-জীবনে দাঁড়াতে হবে। একটি ছোট সাধারণ গৃহে কয়েকটি শিশু-সন্তানের মা—নারীর আজ এই একমাত্র পরিচয় নয়। সে আজ এক উন্নতিশীল অগ্রগামী স্বাধীন দেশের সর্বঅধিকারযুক্ত নাগরিক। তার চারপাশে আজ সঙ্কীর্ণ গৃহ-গণ্ডী ভেঙ্গে গেছে—যে সহজ সারল্যের পরিবেশ তাকে এতকাল ঘিরে রেখেছিল, তা আর নেই। জীবনের সর্বক্ষেত্রে বৃহত্তর ও জটিলতর পরিবেশে আজ তার ডাক পড়েছে। সেই বৃহত্তর জীবনের ক্ষেত্রে আজ তার মায়ের আসনখানি পাততে হবে। তার মাতৃহৃদয় দিয়ে শুধু তার ছোট্ট গৃহ-খানিকে নয়, বিশাল সমাজকে, বিরাট দেশকে স্পর্শ করতে হবে—ভালবাসতে হবে, সেবা

করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আজ তার দায়িত্ব শত শত গুণ বেড়ে গিয়েছে। তার অধিকার যেমন বেড়েছে, ভালবাসার পরিধি বেড়েছে, দায়িত্বও তেমনি বেড়েছে—আজ তার বিপুল দায়। আজ আমাদের ঘরের মাকে অনেক বড় মা হতে হবে। তবে সকলে সুখী হবে, এ দেশের সব দুঃখ-দুর্দশা দুর হবে। স্বামীজী বলেছিলেন, 'আমার দেশের একটি কুকুরও যতক্ষণ অভুক্ত থাকবে, ততক্ষণ তাকে অন্ন দেওয়াই আমার ধর্ম, আর যা কিছু সব অধর্ম।' সেই মহাবাণীতেই দেশের নারী-সমাজকে দীক্ষিত হতে হবে।

অনিকেত

শ্রীশিবশম্ভু সরকার

জগৎটারে ছুঁয়ে আছে
　　নয় জগতের কেউ!
নদীর তীরে হঠাৎ আসা—
　　দেখছে নদীর ঢেউ!

কথা তো তার বস্তু ছেড়ে
ঐ আকাশে গেছে বেড়ে
জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে
　　চারপাশে নেই কেউ!
নদীর তীরে হঠাৎ আসা—
　　দেখছে নদীর ঢেউ!

কারো কাছে চায় না কিছু
　　নেয় না দিলেও মণি—
রিক্ত দেহে, সিক্ত মনে
　　শোনে রসের ধ্বনি!

যে যাবে গো দ্যুলোকেতে
সে ছুঁয়েছে মৃত্তিকাতে
এক লহমার স্পর্শ শুধু
　　—বুঝলো তারে কেউ!
নদীর তীরে হঠাৎ আসা—
　　দেখছে নদীর ঢেউ!

রামায়ণ-প্রসঙ্গ

[পূর্বানুবৃত্তি]

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

সীতা-নির্বাসন

রাম রাজা হইলেন এবং প্রজাগণ রাম-রাজত্বে সুখে বাস করিতে লাগিলেন—কোন কোন পণ্ডিতের মতে রামায়ণকাহিনী এখানেই সমাপ্ত। তুলসীদাস তাঁহার রামচরিত-মানসে উত্তরকাণ্ড লিপিবদ্ধ করেন নাই। জার্মান পণ্ডিত Winternitz-এর মতে সমগ্র উত্তরকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত। নানাদিক দিয়া বিচার করিলে এ সিদ্ধান্ত অস্বীকার করা যায় না। উত্তরকাণ্ডের প্রায় সমগ্র অংশ রাবণের জন্ম, দিগ্বিজয়, ইন্দ্রজিৎ, হনুমান প্রভৃতির জন্ম ও বীরত্ব কাহিনী এবং অন্যান্য পৌরাণিক উপাখ্যানে পূর্ণ। বহুস্থলে ঘটনাগুলি অসম্বদ্ধ, মূল আখ্যানের সহিত সংস্রব নাই। ঐ সকল উপাখ্যান ভাবগত, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণেও দৃষ্ট হয়। পণ্ডিতগণের মতে উত্তরকাণ্ডের ভাষাও অন্যান্য কাণ্ডের ভাষা হইতে পৃথক।

আবার একদিক দিয়া উত্তরকাণ্ডকে সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া কঠিন। প্রথমতঃ রামায়ণ যে সপ্তকাণ্ড ইহা অবিসম্বাদিত। দ্বিতীয়তঃ সীতার বনবাসকাহিনী মূল আখ্যানের সহিত অসম্বদ্ধ নহে। উত্তরকাণ্ডে মূল আখ্যানের সহিত আর একটি কাহিনী সংযুক্ত হইয়া আছে—শূদ্র শম্বুকের কঠোর তপস্যার ফলে এক ব্রাহ্মণপুত্রের অকালমৃত্যু এবং রামচন্দ্র কর্তৃক শম্বুকবধ।

শূদ্রক উপাখ্যানে বর্ণাশ্রমধর্মের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ'—অর্থাৎ গুণ ও কর্ম অনুসারে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছিল। শূদ্র শম্বুকের ব্রাহ্মণের ন্যায় তপস্যার অধিকার ছিল না। অতএব সে উগ্র তপস্যা আরম্ভ করিলে দেশে প্রবল অনাচার দেখা দেয় এবং একটি ব্রাহ্মণপুত্রের অকাল মৃত্যু ঘটে। শূদ্রের তপস্যার ফলে ব্রাহ্মণপুত্রের অকালমৃত্যু যুক্তি দ্বারা মানিয়া লওয়া কঠিন। তবে ইহা সহজেই অনুমেয় যে, রামায়ণ এবং তৎপরবর্তী যুগে বর্ণাশ্রমধর্মের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইত। প্রত্যেক বর্ণ স্বধর্ম পালন না করিলে সমাজব্যবস্থা অস্বীকার করা হয়, ফলে সমাজে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি দেখা দেয়। বলা যাইতে পারে, সমাজ-ব্যবস্থা অস্বীকারের ফল কতদূর ক্ষতিকর হইতে পারে তাহা বুঝাইবার জন্যই ব্রাহ্মণপুত্রের অকালমৃত্যুর অবতারণা এবং রামচন্দ্রকর্তৃক সমাজদ্রোহীর যথোচিত শাস্তি-প্রদান। যে ভাবে অতর্কিতে রামচন্দ্র শূদ্রককে বধ করেন, তাহা কোনক্রমেই তাঁহার পক্ষে গৌরবজনক নহে।

সীতার বনবাস মূল আখ্যানের সহিত সম্পূর্ণ সংযুক্ত, সুতরাং প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া কঠিন। রাজা রামচন্দ্র সস্ত্রীক ভ্রাতৃবর্গের সহিত সুখে প্রজাপালনে রত ছিলেন। একদিন রাজকার্য-অবসানে আমাত্যবর্গের নিকট প্রসঙ্গ-ক্রমে জানিতে চাহেন—তাঁহার সম্বন্ধে প্রজাবর্গের মনোভাব কিরূপ। আদর্শ নৃপতিরূপে অযোধ্যার পুরবাসিগণ তাঁহার প্রতি আস্থাশীল কিনা এ বিষয়ে অনুসন্ধান কর্তব্য। অনুসন্ধানের ফলে ভদ্রক নামক অমাত্যের নিকট জানা গেল,

প্রজাগণ হাটে, দোকানে, চত্বরে প্রাঙ্গণে এবং পথে নানারকম জল্পনা করিয়া বেড়ায়। রামের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আছে। সেতুবন্ধন, রাবণ-বধ প্রভৃতি রামের কার্যসকল তাহারা দেবতারও অসাধ্য বলিয়া মনে করে; রাক্ষসদিগের সহিত ভল্লুক ও বানরদিগকে স্ববশে আনা তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব, সীতা উদ্ধারপূর্বক অপবাদ পরিহার—এ সবই উত্তম বলিয়া তাহারা মনে করে। কিন্তু সীতা বহুকাল রাক্ষসরাজের অন্তঃপুরে বাস করিয়াছিলেন; তাঁহার সম্বন্ধে প্রজাগণ বড়ই কঠোর সমালোচনা করিয়া থাকে :

কীদৃশং হৃদয়ে তস্য সীতাসম্ভোগজং সুখম্।
অঙ্কমারোপ্য যা পূর্বং রাবণেন হৃতা বলাৎ॥
লঙ্কাং চাপি পুরীং নীতামশোকবনিকাং গতাম্।
কথং রক্ষোবশং প্রাপ্তাং রামঃ কুৎসয়তে ন তাম্॥
অস্মাকমপি দারাণাং সহনীয়ং ভবিষ্যতি।
যচ্ছীলো হি ভবেদ্রাজা তচ্ছীলা চ প্রজা ভবেৎ॥
এবং বহুবিধা বাচো বদন্তি পুরবাসিনঃ।
বৈদেহ্যাঃ কারণে রাজন্ তথা জানপদো জনঃ॥

পূর্বে রাবণ যাকে সবলে ক্রোড়ে তুলিয়া হরণ করিয়াছিল, সেই সীতার সহিত মিলনে রামের অন্তরে কিরূপ সুখোদয় হইয়াছে! লঙ্কানগরীতে নীত, রাক্ষসগণের অধীনে যিনি অশোককাননে বাস করিয়াছিলেন, সেই সীতাকে রামচন্দ্র কেন ঘৃণা করেন না? যদি আমাদের পত্নীগণের এইরূপ দশা উপস্থিত হয়, তবে আমাদেরও উহা সহ্য করিতে হইবে, কারণ প্রজাগণ সর্বদাই রাজার অনুগামী।

ভদ্রক করজোড়ে বলিল,—মহারাজ, পুরবাসীরা নগরে ও জনপদে সর্বদা এইপ্রকার বহুবিধ কথা বলিয়া থাকে।

ভারতবর্ষে নারীর সতীত্বের আদর্শ বরাবরই অতি উচ্চ। অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা সীতার বিশুদ্ধতা প্রমাণ অযোধ্যার প্রজাবর্গের সম্মুখে হয় নাই, তাই সীতাকে পুনর্বার রাজান্তঃপুরে স্থানদান তাহাদের মনঃপূত হয় নাই। তাহাদের মতে জানকীকে পরিত্যাগ করাই রামচন্দ্রের কর্তব্য। রামচন্দ্র পূর্বেই বলিয়াছেন, শুভাশুভ যাহাই হউক তাঁহার সম্বন্ধে প্রজাগণের মনোভাব ভদ্রক যেন অসঙ্কোচে ব্যক্ত করে। প্রজাগণের সন্তোষবিধান রাজার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন, তখন রাজকর্তব্য পালনের জন্য, প্রজাগণের সন্তোষ বিধানের জন্য সর্বস্ব ত্যাগে প্রস্তুত। প্রয়োজন হইলে তিনি প্রিয় ভ্রাতৃবর্গ, প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পত্নী, এমন কি, স্বীয় প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিবেন। হায়! রামচন্দ্র জানিতেন না, অচিরেই এই কঠোর কর্তব্য পালনের আহ্বান আসিবে। কৈকেয়ীর মুখে নিদারুণ সংবাদ শ্রবণমাত্র তিনি সানন্দে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনবাসের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিশুদ্ধ হইতে বিশুদ্ধতরা, অকলঙ্ক জানিয়াও পতিব্রতা, একনিষ্ঠা পত্নীকে ত্যাগ করা! অথচ নিজমুখে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন সর্বস্ব পরিত্যাগের। অন্তর উৎপাটিত করিয়া সে প্রতিশ্রুতি তাঁহাকে রক্ষা করিতে হইবে। রাজকার্যে ব্যক্তিগত সুখের স্থান কোথায়! হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে, চিরজীবনের মতো সুখ-শান্তি বিসর্জন দিতে হইবে, পতিব্রতা পত্নীর প্রতি ঘোর অবিচার করা হইবে—সবই সত্য, কিন্তু উপায় নাই। মনস্থির করিয়া রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণকে ডাকিয়া সব জানাইলেন। রামচন্দ্রের অন্তরাত্মা জানে, সীতা অপাপবিদ্ধা। কিন্তু লোকাপবাদ ও উচ্চকুলের মর্যাদা স্মরণ রাখিয়া সীতাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভ্রাতৃবর্গের নিকট রামচন্দ্র দেবতার ন্যায়, রামের আদেশ তাঁহাদিগের নিকট দেবাদেশ—কিন্তু কী ভয়ঙ্কর এ আদেশ! অন্তঃসত্ত্বা জানকীকে বনবাসে রাখিয়া আসা—ইহা কি

সম্ভব! কিন্তু রামচন্দ্রের জীবনে অসম্ভবকেই তো সম্ভব করিতে হইয়াছে! চির অনুগত লক্ষ্মণকে রামচন্দ্র নির্দেশ দিলেন—সীতা পূর্বেই তাঁহার নিকট গঙ্গাতীরে ঋষিদের আশ্রমসমূহ দেখিবার অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছিলেন, লক্ষ্মণ তাঁহাকে গঙ্গার অপর পারে তমসার তীরে রাখিয়া আসুন।

সরলা সীতা লক্ষ্মণের সহিত রথে আরোহণ করিবার সময় একবারও ভাবেন নাই, রাজপুরী হইতে চিরবিদায় লইতেছেন। বনগমনের প্রস্তাবে উৎফুল্ল হৃদয়ে তিনি মহার্ঘ বস্ত্র, আভরণ প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। বনবাসকালে মুনিপত্নীদিগকে কোন উপহার দিতে পারেন নাই, এখন মনোসাধ পূর্ণ করিয়া তাঁহাদের বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি দান করিবেন। রথ দ্রুত-গতিতে চলিয়া শীঘ্রই রাজধানী অতিক্রম করিল। কিছুক্ষণ পরেই সীতার হৃদয় এক অজানা আশঙ্কায় ভরিয়া উঠিল। আসিবার সময় রামচন্দ্রের নিকট বিদায় লওয়া হয় নাই। নানা অশুভ চিন্তা হৃদয় অধিকার করিল। লক্ষ্মণকেও বিষণ্ণ দেখাইতেছে কেন! অবশেষে লক্ষ্মণকে বলিলেন, বনগমন না করিয়া তিনি রাজধানী ফিরিয়া যাইবেন। সেকথা শুনিয়া লক্ষ্মণ তাঁহাকে কোন প্রকারে আশ্বাস দিয়া নিরস্ত করিলেন। গোমতীতীরস্থ আশ্রমে এক রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন দ্বিপ্রহরে তাঁহারা ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইলেন এবং নিষাদগণ কর্তৃক সুসজ্জিত নৌকায় পরপারে উপনীত হইলেন। অনেকক্ষণ হইতে লক্ষ্মণ নিঃশব্দে অশ্রুবিসর্জন করিতেছিলেন, এখন অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে করজোড়ে বলিলেন—আর্য আমাকে এই কার্যে নিয়োগ করিয়া চিরকালের জন্য লোকনিন্দার পাত্র করিলেন, মৃত্যুও ইহা অপেক্ষা বাঞ্ছনীয়। দেবি, প্রসন্ন হউন, আমার অপরাধ লইবেন না—কথা শেষ করিয়া লক্ষ্মণ ভূপতিত হইলেন।

উদ্বিগ্ন সীতা বারবার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, রামচন্দ্রের কোনপ্রকার অমঙ্গল ঘটে নাই তো! রাজধানীতে সকলে কুশলে আছেন তো!

অবশেষে লক্ষ্মণ জানাইলেন, রামচন্দ্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; নগরে ও জনপদে দেবীর নিদারুণ অপবাদের কথা সভামধ্যে শ্রবণ করিয়া লোকনিন্দাভয়েই ইহা করিয়াছেন, অন্য কোন কারণে নয়।

সহসা এই নিষ্ঠুর সংবাদ শ্রবণে সীতা মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন। পরে আত্মসংবরণ করিয়া অশ্রুজলে ভাসিয়া বলিলেন,

কিন্নু পাপং কৃতং পূর্বং কো বা দারৈর্বিয়োজিতঃ।
যাহং শুদ্ধসমাচারা ত্যক্তা নৃপতিনা সতী ॥

—হায়! জানি না পূর্বে কি পাপ করিয়াছিলাম, অথবা কাহার পত্নী-বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিলাম—যার ফলে সতী এবং বিশুদ্ধাচারপরায়ণা হইয়াও মহারাজ কর্তৃক পরিত্যক্তা হইলাম।

প্রিয়জনবিরহে একাকিনী তিনি কিরূপে বাস করিবেন? কী আহার করিয়াই বা জীবন ধারণ করিবেন? রাজা কর্তৃক কেন পরিত্যক্ত হইলেন—লোকের এই প্রশ্নের কী উত্তর দিবেন? তাঁহার গর্ভে রামচন্দ্রের সন্তান রহিয়াছে, রামচন্দ্রের বংশ লোপ পাইবে—এই আশঙ্কাতেই তিনি গঙ্গায় আত্মবিসর্জন করিতে পারিতেছেন না, নতুবা জীবনধারণে আর কি প্রয়োজন ছিল!

পূর্বেই বলা হইয়াছে, পণ্ডিতগণের অনুমান রামায়ণের এই অংশ প্রক্ষিপ্ত। উত্তরকালের কোন কবি মূল কাহিনীর সহিত এই অংশের সংযোজনা করিয়াছেন। ঘটনা যাহাই হউক, বহুদিন যুক্ত হইয়া সীতার বনবাসকাহিনী সত্য বলিয়াই গৃহীত হইয়া আসিয়াছে। এ বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন। রামচন্দ্র যে লোকাপবাদভীত ছিলেন বা সমাজ-ব্যবস্থা মানিয়া চলিতেন, তাহা লঙ্কায় সীতা-

উদ্ধারের পর তাঁহাকে পরিত্যাগ ও অগ্নিপরীক্ষার অনুমোদন হইতেই বুঝা যায়। অতএব প্রজা-বর্গের কঠোর সমালোচনার ফলে সীতাকে বনবাস দেওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কারণ রামচন্দ্র ভ্রাতৃবর্গকে বলিয়াছিলেন, লোকাপবাদ মরণ হইতেও ভয়ঙ্কর। বিশেষতঃ তাঁহা হইতে ইক্ষাকুবংশে কোন কলঙ্ক যেন আরোপিত না হয়। তথাপি অন্তর্বত্নী পত্নীকে বিজন অরণ্যে পরিত্যাগ কোনক্রমেই ন্যায়সঙ্গত ভাবা যায় না। বর্তমান যুগ বলিবে, রামচন্দ্র তো সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে পারিতেন! অধুনা সেই দৃষ্টান্ত স্থাপিত হইয়াছে। রামচন্দ্র ব্যক্তিগত সুখকে প্রাধান্য দেন নাই। সীতা-বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে নিজ জীবনের সুখশান্তি চিরদিনের মতো বিসর্জন দিয়াছিলেন। স্মরণ রাখিতে হইবে, সেই বহু বিবাহের যুগে (রাজা দশরথের প্রধান তিন মহিষী ব্যতীত আরও বহু পত্নী ছিল) তিনি আর বিবাহ করেন নাই। সীতার স্মৃতি ধ্যান করিয়াই বাকী জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তদানীন্তন বিধি অনুযায়ী রাজা রামচন্দ্র বহু যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। সপত্নীক হইয়া ঐ সকল অনুষ্ঠান করা শাস্ত্রের বিধি। তাই তিনি সীতার স্বর্ণময়ী প্রতিকৃতি বামভাগে স্থাপন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পত্নীসহ পুনর্বার বনবাসে যাইলে শ্রীরামচন্দ্রের গৌরব কী বৃদ্ধি হইত? বিশেষতঃ তিনি নিশ্চিত জানিতেন, বাল্মীকি ঋষির আশ্রমে সীতা উপযুক্ত আশ্রয়লাভ করিবেন।

নারীর পাতিব্রত্য এদেশে চিরকাল অতিশয় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। পতিই নারীর দেবতা, বন্ধু, গুরু ইত্যাদি বহুতর শ্লোক পুরুষগণ কর্তৃক নানা কাব্য, পুরাণ এবং স্মৃতিশাস্ত্রে বিন্যস্ত হইয়াছে। সীতার মুখ দিয়াও ঐ সকল কথা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু সীতার মহিমা, সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষা প্রভৃতি পাতিব্রত্যের আদর্শ অপেক্ষা অনেক উচ্চ। প্রকৃতপক্ষে এই সকল লোকোত্তর-চরিত্র মহীয়সী নারীর হৃদয়ের উচ্চতার ধারণা করা আমাদের মতো সাধারণের পক্ষে সম্ভব নহে বলিয়াই বোধ হয়।

শ্রীকৃষ্ণ সখীবৃন্দের সহিত শ্রীরাধাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, বৃন্দাবন হইতে মথুরার দূরত্ব কতটুকুই বা—অথচ তিনি আর একদিনও শ্রীরাধার সংবাদ লইতে আসিলেন না। বিরহে কাতরা শ্রীরাধা পুনঃ পুনঃ অচেতন হইয়া পড়িয়াছেন, মুমূর্ষু-প্রায় দিন কাটাইয়াছেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে কটূক্তি করেন নাই বা মথুরাতে গিয়া তাঁহাকে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করেন নাই। নবদ্বীপশুদ্ধ লোক সুন্দরী যুবতী পত্নীকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য চৈতন্যদেবের নিন্দা ও সমালোচনা করিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখ হইতে একটিবারও তাঁহার বিরুদ্ধে অপ্রিয়বাক্য শোনা যায় নাই। স্বামীর উচ্চাদর্শ পালনে দূর হইতে সহযোগিতা করাই ধর্ম ও কর্তব্য বলিয়া তিনি মনে করিয়াছেন। ব্যক্তিগত সুখকে সর্বোচ্চ স্থান দিলে উহা অসম্ভব হইত। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধেও কেহ কেহ একই অভিযোগ করিয়াছেন অর্থাৎ তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া স্ত্রীর প্রতি সাধারণ লোকের ন্যায় যথোচিত ব্যবহার করেন নাই। শ্রীশ্রীমা কিন্তু বলিতেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সাধারণ ও অসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক।

রামচন্দ্র কর্তৃক নির্বাসিতা সীতা একবারও তাঁহাকে কটূক্তি বা দোষারোপ করেন নাই। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলিয়াছেন,

'মহামহিমময়ী সীতা, স্বয়ং শুদ্ধা হইতেও শুদ্ধতরা, সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত আদর্শ সীতা চিরকালই এইরূপ পূজা পাইবেন। যিনি বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রদর্শন না করিয়া সেই মহাদুঃখের জীবন যাপন করিয়াছিলেন, সেই নিত্যসাধ্বী, নিত্যবিশুদ্ধ-স্বভাবা আদর্শ পত্নী সীতা, সেই নরলোকের, এমন কি, দেবলোকের পর্যন্ত আদর্শভূতা মহনীয়চরিত্রা সীতা চিরদিনই আমাদের জাতীয় দেবতারূপে বর্তমান থাকিবেন।'

মহীয়সী সীতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে করিতে লক্ষণ চলিয়া গেলেন। কবির লেখনীতে সে দৃশ্য করুণ কিন্তু উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—

ফিরাইলা বনপথে অতি ক্ষুণ্ন মনে
সুরথী লক্ষ্মণ রথ, তিতি চক্ষু জলে :—
উজলিল বনরাজী কনক-কিরণে
স্যন্দন, দীনেন্দ্র যেন অস্তের অচলে।
নদীপারে একাকিনী সে বিজন-বনে
দাঁড়ায়ে কহিলা সতী শোকের বিহ্বলে :
"ত্যজিলা কি, রঘুরাজ! আজি এই ছলে
চিরজন্মে জানকীরে ?…"

সেই বিজন অরণ্যে রক্ষাকর্তা কে? বাহ্যজ্ঞান-শূন্য পাষাণনির্মিত মূর্তির ন্যায় সীতা লক্ষ্মণের গমনপথের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সেবা

শ্রীগৌরপদ দাশ

বরাহনগর মঠে প্রাতঃস্নান সমাপনে
ঠোঙাতে সন্দেশ লয়ে হরষিত শুদ্ধ মনে
ঠাকুরের সেবা লাগি—নিরঞ্জনানন্দ যান—
পূজার সময় হল—অতি দ্রুতগতি ধান।
হেনকালে দীন নারী কোলে লয়ে শিশু তার।
পথ বাহি যায় চলি একমনে আপনার।
সন্দেশের ঠোঙা হেরি সুকোমল শিশুমন
খাইবার তরে হায় হয়ে ওঠে উচাটন।
মাতা কয়, 'অমঙ্গল হবে এ সন্দেশ খেলে,
ঠাকুরের পূজা হবে'—মানেনা অবুঝ ছেলে।
নিরঞ্জনানন্দ স্বামী শুনিতে পাইয়া কানে
ছেলেটিকে দিলা সব অবিলম্বে হৃষ্ট মনে।
দীন-নারী করে মানা, স্বামীজী কহিলা তায়,
'ও খেলেই ঠাকুরের খাওয়া হবে, সুনিশ্চয়।'

দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়ায় স্বামীজী*

ব্রহ্মচারিণী উষা

[অনুবাদক—শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়]

দক্ষিণ পাসাডেনায় ৩০৯ নং মণ্টেরে রোডে বিগত ভিক্টোরিয়াযুগের একটি ত্রিকোণাকৃতি বসতবাটী দাঁড়িয়ে আছে। এর এক পাশে গ্যাসঘর, এবং তিনটি বাড়ী পরেই পাসাডেনার সদর রাস্তা—তীরবেগে মোটর গাড়ী ছুটে চলে সেখানে। তবুও সাদা রংএর দালানটির মর্যাদা ও আকর্ষণ অক্ষুণ্ণ রয়েছে। ধ্যান করতে, অতীতের কাহিনী শুনতে বা বাড়ীটির পিছনদিকের ক্ষুদ্র বাগানটিতে বেড়াতে প্রতি বৎসর দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়া বেদান্তসমিতির বন্ধু ও সভ্যগণ সেখানে সমবেত হন। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই সেকেলে স্থানটির ওপর তাঁদের আকর্ষণ কেন, তা বুঝতে হলে আমাদের ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে পৌছতে হবে; স্বামী বিবেকানন্দ এর ছ-বছর আগে চিকাগো আন্তর্জাতিক ধর্মমহাসভায় ভাষণের মাধ্যমে যে কাজটি আরম্ভ করেছিলেন, সেই কাজে অনুপ্রেরণা দানের জন্য তখন আমেরিকায় পুনরায় পদার্পণ করেছেন।

দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যাভিমুখে যাত্রা করে ইংলণ্ডে অল্প কয়েক দিন থেকে স্বামীজী আমেরিকায় আসেন। নিউইয়র্কে পৌছিলে স্বামীজীকে ফ্রান্সিস লেগেট ও তাঁর পত্নী বেটী-র গ্রামের বাড়ী ক্যাটস্কিল পর্বতে রিজলী ম্যানরে নেওয়া হয়। স্বামীজীর সন্ন্যাসী গুরুভাই তুরীয়ানন্দজী ও অভেদানন্দজী এবং ভগিনী নিবেদিতাও উপস্থিত ছিলেন। বেটী লেগেটের ভগিনী কুমারী জোসেফিন ম্যাকলাউডও ছিলেন। (কুমারী ম্যাকলাউড স্বামীজীর আমেরিকার বন্ধুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত। তিনি জো, জয়া, ইয়াম এবং পরে তান্তিন নামেই পরিচিতা ছিলেন। স্বামীজী তাঁকে জো বলে ডাকতেন এবং এই প্রবন্ধে তাঁর ঐ নামই ব্যবহার করা হবে।) অন্যান্য বন্ধুবর্গ এবং লেগেট দম্পতীর সন্তানদের নিয়ে সে দলটি পূর্ণ হল, স্বামীজীই ছিলেন তার মধ্যমণি

পরবর্তীকালে জো তার স্মৃতি থেকে বলেছেন যে, একদিন এক অপরিচিতা মহিলার নিকট হতে সংবাদ আসে, বেটী ও জো-র এক-মাত্র ভাই টেলর লসএঞ্জেলেসে শ্রীমতী এস. কে. ব্লজেট নাম্নী এক মহিলার গৃহে গুরুতর পীড়িত। টেলরকে শুশ্রূষা করতে জো-র তৎক্ষণাৎ রওনা হবার কথা হয়। রেল ষ্টেশনে যাবার জন্য গাড়ীতে উঠবার সময় স্বামীজী জোকে আশীর্বাদ করে বলেন, 'আমার জন্য কয়েকটি ক্লাসের ব্যবস্থা ক'রো, তবেই আমিও আসব।

লসএঞ্জেলেসে একুশ নম্বর রাস্তায় একটি গোলাপ-লতায় ঢাকা কুটিরে জো তাঁর ভাইএর সাক্ষাৎ পান। টেলরের শয্যার উপর দিকে স্বামীজীর প্রমাণমাপের ছবি ঝুলতে দেখে জো সম্পূর্ণ বিস্মিতা হন। টেলরের অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক বুঝে জো শ্রীমতী ব্লজেটের গৃহে তাঁকে পীড়িত অবস্থায় থাকার অনুমতি দিতে অনুরোধ করেন। গৃহকর্ত্রী শুধু যে অনুমতি দিলেন তাই নয়, অধিকন্তু জোকেও তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানালেন।

* "Vedanta and the West" পত্রিকায় (সংখ্যা ১৫৮) "Swamiji in Southern California" শীর্ষক ইংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদ।

জো তখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার ভাইএর শয্যার উপর দিকে যাঁর ছবি ঝুলছে ঐ লোকটি কে ?'

শ্রীমতী ব্লজেট বলেন, 'পৃথিবীতে ঈশ্বর বলে যদি কেউ থাকেন তবে ঐ ব্যক্তিই সেই ঈশ্বর।'

'আপনি তাঁর সম্বন্ধে কি জানেন ?'

সত্তরোর্ধ্বা বৃদ্ধা মিসেস ব্লজেট স্মরণ করে বললেন, "আমি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চিকাগো ধর্মসভায় উপস্থিত ছিলাম। সেখানে যখন ঐ যুবকটি দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতাগণ'—সাত হাজার লোক অজানা কোনও কিছুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে উঠে দাঁড়াল; সভাশেষে যখন শত শত স্ত্রীলোককে তাঁর নিকট পৌঁছবার জন্য বেঞ্চ পার হয়ে এগিয়ে যেতে দেখলাম, আমি মনে মনে বলেছিলাম, 'দেখি বাছা, যদি তুমি এই আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পার, তবে বুঝব তুমি সত্যই ঈশ্বর।' "

জো মিসেস ব্লজেটকে বললেন যে তিনি এই লোকটিকে চেনেন এবং প্রকৃতপক্ষে নিউইয়র্কের ক্যাটস্কিল পর্বতে ষ্টোনরিজ নামক ক্ষুদ্রগ্রামে সম্প্র তাঁকে ছেড়ে এসেছেন। জো গৃহকর্ত্রীর নিকট প্রস্তাব করলেন, 'আপনি কেন তাঁকে এখানে আমন্ত্রণ করেন না ?'

'আমার কুটিরে ?'

জো বললেন, 'তিনি আসবেন।'

টেলর তিন সপ্তাহের মধ্যেই দেহত্যাগ করেন। টেলরের মৃত্যুর তিন সপ্তাহ পরে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে স্বামীজী লসএঞ্জেলেসে এসে শ্রীমতী ব্লজেটের অতিথি হন।

২৭শে ডিসেম্বর ৯২১ ডবলিউ, ২১নং ষ্ট্রীট, লসএঞ্জেলেস হ'তে স্বামীজী এক পত্রে লেখেন যে, গৃহকর্ত্রী চিকাগোর একজন স্থূলাঙ্গী, বৃদ্ধা ও অত্যন্ত রসিকা ভদ্রমহিলা। তিনি আরও লেখেন, 'তিনি আমার চিকাগো বক্তৃতা শুনেছিলেন এবং খুব মাতৃভাবাপন্না।' ঐ পত্রেই লেখেন যে দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়ার দৃশ্য তাঁর মনে রেখাপাত করেছে—'ঐ স্থানে ঠিক উত্তর ভারতের ন্যায় শীত, মাত্র কয়েক দিন একটু বেশী গরম; এখানে গোলাপ আছে এবং সুন্দর পামও আছে; মাঠে যব। আমি যে কুটিরে বাস করি তার চারিদিক গোলাপ ও অন্যান্য বহু রকমের ফুলে ভরে রয়েছে।'

জো তাঁর প্রকাশিত স্মৃতিকথায় শ্রীমতী ব্লজেটের গৃহে তাঁর ও স্বামীজীর অবস্থান সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন—"এই ছোট কুটিরটিতে তিনটি শয়নকক্ষ, একটি রান্নাঘর, একটি খাবার ঘর এবং একটি বসবার ঘর। প্রত্যহ প্রাতে আমরা রান্নাঘরের অদূরে স্নানাগার থেকে স্বামীজীকে সংস্কৃত আবৃত্তি করতে শুনতে পেতাম। তিনি অবিন্যস্ত-কেশে বাইরে আসতেন এবং প্রাতরাশের জন্য প্রস্তুত হতেন। শ্রীমতী ব্লজেট সুস্বাদু পিষ্টক ভেজে রাখতেন এবং আমরা রান্নাঘরের টেবিলে বসে তা খেতাম। স্বামীজীও আমাদের সাথে বসতেন। শ্রীমতী ব্লজেটের সঙ্গে তিনি কি মধুর বাক্যালাপই না করতেন! কেমন ব্যঙ্গোক্তি ও রসিকতা—শ্রীমতী পুরুষদের শয়তানির কথা বলতেন, আর তিনি তখন বলতেন স্ত্রীলোকদের ততোধিক ব্যভিচারের কথা। শ্রীমতী ব্লজেট কদাচিৎ তাঁর বক্তৃতা শুনতে যেতেন; বলতেন যে, যখন আমরা ফিরে আসব তখন আমাদের সুস্বাদু আহার্য দেওয়াই তাঁর কর্তব্য। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে স্বামীজী দেহত্যাগ করলে শ্রীমতী ব্লজেট তাঁর গৃহে স্বামীজীর অবস্থানের কথা স্মরণ করে জোকে এক পত্রে লেখেন, 'আমি সেই অবিস্মরণীয় শীতকালের নাতিদীর্ঘ সুখময় এবং সহজ স্বাধীনতা ও সহৃদয়তার মধ্যে কাটানো দিনগুলি সর্বদা স্মরণ করি। আমাদের

সুখী ও সৎ না হয়ে উপায় ছিল না।...আমি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে অল্প সময়ই দেখেছি, তবুও এই অল্প সময়েই বহু প্রকারে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে স্বামীজীর চরিত্রের শিশুসুলভ দিকটা—যা সব সময় সৎস্বভাবা রমণীগণের মধ্যে মাতৃভাবের উদ্রেক করে। তাঁর নিকটে যাঁরা থাকত তাদের উপর তিনি এরূপভাবে নির্ভর করতেন, যাতে সহজেই তিনি তাদের খুব আপনার করে নিতেন। যদিও, যে বিষয়গুলি পৃথিবীর মতই প্রাচীন, সে সব বিষয়ে প্রায় অফুরন্ত জ্ঞানের অধিকারী তিনি ছিলেন, একজন ঋষি এবং দার্শনিক ছিলেন, তবুও মনে হত পাশ্চাত্যবাসীদের যা বৈশিষ্ট্য—ব্যবসায়-বুদ্ধি—তা তাঁর বিন্দুমাত্র ছিল না। দৈনন্দিন জীবনে, ঘরোয়া ব্যাপারে তুমি তাঁকে সর্বদা দেখাশুনা করছিলে; যদিও আপাতদৃষ্টিতে সে সব তুচ্ছ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু কোন কোন খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁকে ঠিক পথে চালাবার প্রয়োজন ছিল।...

একদিন আমি আমার কাজে ব্যস্ত এবং স্বামীজীও তাঁর চাপাটি এবং তরকারি তৈরীর কাজে ডুবে আছেন; এমন সময় আমি তোমার কথা তুললাম। তাতে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ! আমাদের সকলের মধ্যে জো-র প্রাণই সমধিক মাধুরীমণ্ডিত।' বক্তৃতা শেষে শ্রোতারা তাঁকে চারিদিক হতে সাগ্রহে এমন ভাবে ঘিরে ধরত যে, তিনি তাদের কাছে হঠাৎ বিদায় নিতে বাধ্য হতেন, এবং ঘরে ফিরে এসে স্কুল থেকে ছুটি পাওয়া বালকের মতো রান্নাঘরে ছুটে গিয়ে বলতেন, 'এখন আমরা রান্না করব।'...হায়, সেই সুখকর দিনগুলি, যাদের তুমি 'চায়ের-আসর'-দিন নাম দিয়েছিলে! আমরা কেমন হাসতাম! তোমার কি মনে আছে, কেমন করে তিনি মাথায় পাগড়ি বাঁধেন আমাকে একদিন তাই দেখাচ্ছিলেন এবং যে সময় তুমি তাঁকে তাড়াতাড়ি করতে অনুনয় করেছিলে; কারণ তাঁর এক বক্তৃতায় যাবার সময় হয়ে এসেছিল। আমি বলেছিলাম, "স্বামীজী, তাড়াতাড়ি করবেন না। ফাঁসির আসামী রাস্তায় জনতাকে বধ্যভূমিতে পৌঁছবার জন্য ঠেলাঠেলি করতে দেখে ডেকে বলেছিল, 'তাড়াহুড়ো করো না, আমি যতক্ষণ সেখানে না পৌঁছাই তামসা আরম্ভ হবে না।' আমিও আপনাকে নিশ্চয় করে বলতে পারি, আপনি সেখানে না যাওয়া পর্যন্ত চিত্তাকর্ষক কিছু ঘটবে না।" এই কথায় তিনি এত খুশী হন যে পরে প্রায়ই তিনি বলতেন, 'আমি সেখানে না পৌঁছলে তামসা আরম্ভ হবে না'—এবং বালকের ন্যায় হাসতেন।

এই মাত্র আমার একটি প্রাতঃকালের কথা স্মরণ হল। দুরধিগম্য ভাবমণ্ডিত আননে ও নতনয়নে জ্ঞানী হিন্দুটি বসেছিলেন; তাঁর কথা শুনতে আমাদের বাড়ীতে বেশ কিছু শ্রোতা সমবেত হয়ে অপেক্ষা করছিল। ধ্যানশেষে তিনি মিসেস লেগেটের দিকে চোখ তুলে সরল শিশুর ন্যায় প্রশ্ন করেন, 'কি বলব?' মার্জিতরুচি, শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান নরনারীপূর্ণ শ্রোতৃমণ্ডলীকে আনন্দদানে সূক্ষ্ম ক্ষমতার অধিকারী হয়েও এই প্রতিভাবান ব্যক্তি বিষয়বস্তু নির্বাচনের জন্য জিজ্ঞাসা করছেন! আমার মনে হল এই প্রশ্নের মধ্যে শ্রীমতী লেগেটের নির্বাচনের উপর তাঁর অপরিসীম আস্থার ভাব নিহিত আছে। অতি প্রত্যুষে, তুমি এবং তোমার ভগ্নী যখন ঘুমিয়ে থাকতে, দিনের একটা আকর্ষণীয় অংশ তোমরা হারাতে। স্নানের জন্য তিনি স্নানাগারে ঢুকতেন এবং শীঘ্রই পবিত্র আবৃত্তিরূপে শোনা যেত তাঁর উদাত্ত স্বর। সংস্কৃত ভাষা আমার জানা নাই, তবু আবৃত্তির তাৎপর্য আমি উপলব্ধি

করতাম। আমার নিকট এই প্রাতঃকালীন স্তোত্রগুলি মহান হিন্দুর মধুরতম স্মৃতি। সাধারণ সেকেলে রান্নাঘরে তুমি ও আমি স্বামীজীকে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবস্থায় দেখেছি।

সাধারণ সভায় স্বামীজীর বক্তৃতা খুব কমই শুনেছি: আমার বার্ধক্য এবং গৃহকর্ম হেতু মার্থার ন্যায় গৃহে আবদ্ধ থাকা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। যে মহিলারা অসময়ে মন্তব্য করে নিজেদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পছন্দ করেন, স্বামীজীর একটি বক্তৃতায় তাঁদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করেছিলেন, 'স্বামীজী আপনার দেশে কারা সন্ন্যাসীদের ভরণপোষণ করে? আপনি তো জানেন সেখানে বহু সন্ন্যাসী আছে।' বিদ্যুৎবেগে স্বামীজী উত্তর দিয়েছেলেন, 'ভদ্রে, আপনার দেশে যারা ধর্মযাজকদিগকে ভরণপোষণ করে, তারাই—স্ত্রীলোকেরা!' শ্রোতারা হেসে ওঠেন এবং স্বামীজী বক্তৃতা করতে থাকেন। তুমি কি সেই বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলে? অন্য এক সময় যখন তিনি চিকাগো ম্যাসনিক টেম্পলে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। একজন খ্যাতনামা ধর্মযাজক বলেছিলেন, 'হে সন্ন্যাসী, আপনি ধর্মমতে বিশ্বাস করেন, নয় কি?' স্বামীজী বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, যতক্ষণ তার প্রয়োজন আছে। গাছের জন্য একটি ওকের বীজ পোঁতার পর শূকর ও ছাগলের উৎপাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তার চারিদিকে একটি ছোট বেড়া দেওয়া হয়। কিন্তু যখন ঐ বীজটি একটি দীর্ঘ ও বিস্তৃত মহীরুহে পরিণত হয়, তখন আর ঐ বেড়ার প্রয়োজন থাকে না।' তিনি কখনও দ্বিধাগ্রস্ত হতেন না, তিনি ছিলেন যেকোনও পরিস্থিতির জন্যই সদাপ্রস্তুত।

লসএঞ্জেলেসে আসার অল্প পরে স্বামীজী বক্তৃতা দিতে সুরু করেন। স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনী অনুসারে দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়ায় দশ সপ্তাহ থাকাকালীন হয় লসএঞ্জেলেসে, নতুবা পাসাডেনায় স্বামীজী প্রায় দৈনিক একটি করে বক্তৃতা দিতেন। এখানে তাঁর সবগুলি বক্তৃতা রক্ষা করা হয় নাই, কিন্তু যেগুলি আছে সেগুলি তাঁর প্রত্যাদিষ্ট বাণীচয়ের অন্তর্ভুক্ত। ইডা আনসেল (উজ্জলা নামে পরিচিতা; সে স্বামী বিবেকানন্দকে দর্শন করে ও পরে স্বামী তুরীয়ানন্দের শিষ্যা হয়) স্বামীজীকে বলতে শুনেছিল যে তিনি ক্যালিফর্ণিয়ায় তাঁর সর্বোচ্চ শিক্ষা দিয়েছেন।

২৩৩ নং দক্ষিণ ব্রডওয়ে লসএঞ্জেলেসে ব্ল্যান্চার্ড হলে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর তিনি 'বেদান্তদর্শন' সম্বন্ধে প্রথম বক্তৃতা করেন। দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়ার 'একাডেমী অব সায়েন্সের' পৃষ্ঠপোষকতায় অ্যামিটি চার্চে তাঁর পরবর্তী বক্তৃতা হয়—বিষয়বস্তু ছিল ব্রহ্মাণ্ড।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুআরি তারিখের লসএঞ্জেলেস ইভিনিং এক্সপ্রেস পত্রিকা থেকে জানা যায় যে স্বামীজী ব্ল্যান্চার্ড হলে দ্বিতীয় বক্তৃতা করেন ২রা জানুআরি। বিষয় ছিল ভারতের ইতিহাস। এই বক্তৃতা সম্বন্ধে সংবাদ-পত্রের বিবরণ মোটেই প্রতিভার পরিচয় দেয় না, তবুও এখানে এর অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল, কারণ শ্রোতাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর মাতৃভূমি সম্বন্ধে কিরূপ অজ্ঞ ছিল তার কতকটা পরিচয় এতে পাওয়া যাবে।

বক্তা বলেছিলেন, 'ভারতবর্ষ একটি দেশ নয়, কিন্তু ধর্ম দ্বারা ঐক্যবদ্ধ এক বিশাল জাতিপুঞ্জ সমন্বিত মহাদেশ। কলম্বাস যখন ভারতে পৌঁছবার সহজ পথের সন্ধানে বহির্গত হয়ে আমেরিকা আবিষ্কার করেন, তখনও

সেখানে লোকের বাস ছিল। ভারতের লোকসংখ্যা বিশ কোটি এবং সমস্ত দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে পূর্ণ। বৃষ্টিপাত প্রচুর; ফলে জমি খুব উর্বর। দেশটি যদিও খুবই সমৃদ্ধ, তবু বহু লোক একপ্রকার শস্য খেয়েই জীবনধারণ করে; আমিষ-খাদ্য গ্রহণ করে না।

দেশের প্রাচীন প্রথাগুলি রক্ষিত হয়েছে, এবং সে জাতি আবার শতশত জাতিতে পুনর্বিভক্ত। দেশে দরিদ্রতম ব্যক্তি এবং সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী শাসক—একই জাতিভুক্ত হতে পারে।' বক্তা বলেন, এই ব্যবস্থাই জনসাধারণের উন্নয়নের সহায়ক, এবং ইহাই প্রকৃত গণতন্ত্র।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুআরি স্বামীজী 'কর্ম ও তার রহস্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। (দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়ার বেদান্তসমিতির দপ্তরে উক্ত বক্তৃতার টাইপরাইটারে মুদ্রিত প্রতিলিপিতে নির্দেশ আছে যে লসএঞ্জেলেসের প্যাইন হলে এই বক্তৃতা হয়।) এই বক্তৃতায় স্বামীজী বলেন, কর্মের উপায় ও উদ্দেশ্য উভয়ই সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বুঝিয়ে দেন, আমরাই উপায়। আমরা যদি সৎ ও পবিত্র হই, তবেই পৃথিবী শুভময় ও পবিত্র হতে পারে। স্থতরাং এস আমরা নিজেদের পবিত্র ও পূর্ণ করে তুলি।

৩৩০½ দক্ষিণ ব্রডওয়েতে 'আমরা নিজেরাই' এই বিষয়ে স্বামীজীর পূর্বদিবসে প্রদত্ত একটি বক্তৃতার বিবরণী ৬ই জানুআরি লসএঞ্জেলেস টাইমস্ পত্রিকা প্রকাশ করে। সংবাদপত্রের রচনার উদ্ধৃত অংশ থেকে ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, এই ভাষণটি 'স্থবিদিত রহস্য' আখ্যায় স্বামী বিবেকানন্দের সম্পূর্ণ বাণী ও রচনায় পরে প্রকাশিত হয়

৭ই জানুআরি রবিবার অপরাহ্ণে পুনরায় ৩৩০½ দক্ষিণ ব্রডওয়েতে স্বামীজী ভাষণ দেন। লসএঞ্জেলেস টাইমস ৮ই বিবরণী দেয় যে, তাঁর বক্তৃতাকালে 'ঘরটি একেবারে ভরে গিয়েছিল, শ্রোতাদের ঠাসাঠাসি করে বসতে হয়েছিল।' ঐ পত্রিকায় যে সকল পঙ্‌ক্তি ছাপা হয়েছিল (ভাষণের প্রায় একচতুর্থাংশ) তা থেকে সহজেই সনাক্ত করা যায় যে এটি তাঁর 'ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট' সম্বন্ধে বিখ্যাত বক্তৃতা। স্বামীজী সেদিন সেণ্ট জন অনুসারে যীশুর জীবনী পর্যালোচনা করে বলেন, 'ঈশ্বরপুত্রের মাধ্যমে ব্যতীত কোন মানবই ঈশ্বরকে কখনও দেখেনি।' এবিষয়ে আরও উৎসাহের সহিত তিনি বলেন, ইহা সত্য যে তোমাদের, আমার এবং আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দরিদ্র, সর্বাপেক্ষা নীচ ব্যক্তিরও দেহের মধ্যে সেই ঈশ্বর রয়েছেন, এমন কি, ঈশ্বর তাদের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হন। আলোর-কম্পন সর্বত্র বিদ্যমান, সর্বব্যাপী; কিন্তু আলো দেখতে হলে লণ্ঠনের মধ্যে বাতিটি জ্বালাতে হয়। বিশ্বের সর্বত্রপরিব্যাপ্ত ঈশ্বরকে দেখা যায় না, যতক্ষণ না তিনি মূর্তিমান-ঈশ্বররূপ আচার্য, দেবমানব ও অবতারগণের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ না করেন।' তাঁর বক্তৃতার মধ্যে স্বামীজী যীশুকে এভাবে চিত্রিত-করেছেন—'তিনি ছিলেন প্রাচ্যের প্রকৃত সন্তান, গভীর বাস্তব দৃষ্টি সম্পন্ন; তিনি এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর উপর আস্থা না রেখে মুক্তির একমাত্র পথ পবিত্রতা ও ত্যাগই প্রচার করতেন। যীশুর ভাষায় স্বামীজী শ্রোতাদিগকে স্মরণ করিয়ে দিলেন—'ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদেরই অন্তরে'। সকলকে নিজ দেবপ্রকৃতি উপলব্ধি করতে প্রণোদিত করলেন তিনি।

জো এই বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি পরে

বলেছেন যে, যত বক্তৃতা তিনি শুনেছেন এইটিই 'বোধহয় তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত বক্তৃতা।' বলেছেন যে, এই বক্তৃতাকালে মনে হচ্ছিল যেন স্বামীজীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত শ্বেতবর্ণের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, খ্রীষ্টের ভাববিমুগ্ধতায় ও শক্তিতন্ময়তায় এতখানি মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর স্মৃতিকথা চলতে থাকে, "স্পষ্টভাবে এই জ্যোতির্মণ্ডল দেখতে পেয়ে আমি এতই প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েছিলাম যে, ফেরার পথে তাঁর সঙ্গে ভয়ে কথা বলি নাই; কারণ আমার মনে হয়েছিল, তাঁর মনে তখনও যে উচ্চ চিন্তা ছিল, কথা বললে তাতে ব্যাঘাত ঘটবে। হঠাৎ তিনি আমায় বললেন, 'কিরূপে এটা রান্না করতে হয়, আমি তা জানি।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি রান্না করার কথা বলছেন?' একটি ব্যঞ্জন কিভাবে রান্না করতে হয়, তাহা তিনি বললেন; আরো বললেন যে, তাতে মালবেরী পাতা দিতে হয়।" জো পরে ব্যাখ্যা করেছিলেন "তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে বোধ হয় একটি হল সম্পূর্ণ অহংরাহিত্য, আত্মগুরুত্ববোধের একান্ত অভাব। মনে হয়, তিনি অন্য লোকের (অন্তর্নিহিত) শক্তি, বীর্য ও গরিমা প্রত্যক্ষ করতেন, এবং তাঁর সান্নিধ্যে এসে লোকে অনুভব করত যে তার মধ্যেও সেই সাহস সঞ্চারিত হচ্ছে—তাঁর সান্নিধ্যে এসে প্রত্যেকেই সতেজ ও প্রাণবন্ত হয়ে এবং সে ভাব ধারণ করে থাকার মত শক্তিমান হয়ে ফিরে যেত। সুতরাং যখন লোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে, 'তোমার অধ্যাত্মিকতার মাপকাঠি কি?' আমি সর্বদা উত্তর দিয়েছি, 'একজন সাধুব্যক্তির সান্নিধ্যে যে নির্ভীকতা সঞ্চারিত হয়, তাই।'"

৮ই জানুআরি লসএঞ্জেলেসে স্বামীজী 'মনের শক্তি' সম্বন্ধে বলেন। তিনি বলেন, 'মানুষের অন্তরে প্রচণ্ড শক্তি প্রচ্ছন্ন রয়েছে। রাজযোগ-বিজ্ঞান প্রয়োগে এই শক্তির বিকাশ সম্ভব এবং মানুষ এইরূপে পূর্ণতার দিকে তার অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে পারে।' এই বক্তৃতার শেষে স্বামীজী বলেন যে, আন্তরিক হয়ে যাঁরা এই বিদ্যা শিক্ষা করতে উৎসুক আছেন, তিনি তাঁদের শিক্ষা দিতে প্রস্তুত।

নবচিন্তাধারার একটি শাখা 'হোম অব ট্রুথে'-র একটি প্রশাখা ছিল লসএঞ্জেলসে। স্বামীজী তথায় পর্যায়ক্রমে কতকগুলি বক্তৃতা করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসে 'ইউনিটি' নামক সাময়িক পত্রিকার খবরে বলা হয়েছে যে, স্বামীজী আটটি বক্তৃতা করেছিলেন, এবং সেগুলির প্রত্যেকটিই 'অতীব চিত্তাকর্ষক' ব'লে বিবেচিত হয়েছিল। এই পত্রিকার বিবরণী অনুসারে 'স্বামীজীর মধ্যে মুক্ত স্বভাব-শিশুর সৌন্দর্য ও চিত্তাকর্ষকতা মিলিত হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতির বিদ্যা ও আর্চবিশপের মর্যাদার সঙ্গে। লসএঞ্জেলেসের পত্রিকাগুলি যেভাবে স্বামীজীর কাজের পরিচয় দিচ্ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে 'ইউনিটি' বুঝায় যে, যীশুখ্রীষ্ট যে শিক্ষা দিয়েছেন তদপেক্ষা উন্নততর ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য এই হিন্দু প্রচারক পাশ্চাত্যে আসেননি; তিনি শুধু দেখাতে এসেছেন যে বাস্তবিক পক্ষে একটি মাত্র ধর্মই আছে; 'এবং আমরা যা বিশ্বাস করি বলে প্রকাশ করি তার ব্যবহারিক প্রয়োগই আমাদের পক্ষে সর্বাধিক কল্যাণকর।'

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের খৃষ্টমাসের দিন 'হোম অব ট্রুথ'-এ স্বামীজী 'পৃথিবীতে খ্রীষ্টের দৌত্য' বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

হোমে তাঁর অন্য একটি বক্তৃতার নাম দেওয়া হয়েছিল 'ব্যবহারিক আধ্যাত্মিকতার

ইঙ্গিত।' এই উপলক্ষে স্বামীজী যাকে 'একটি ক্ষুদ্র বোমা ছোড়া' বলতেন, তাই করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন—এর অর্থ স্বামীজী সহসা ধাক্কা দিয়ে শ্রোতাদিগকে আরামপ্রদ চিরাচরিত আত্মপ্রসাদ ও কুসংস্কারের আবর্ত থেকে বাইরে নিয়ে আসতেন। সেদিন স্বামীজী বলেন, তোমরা যাতে ভাল মানুষ হতে পার তার জন্য 'রাস্তার স্ত্রীলোক-রূপী খ্রীষ্ট, জেলের চোর-রূপী খ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হচ্ছেন।' সামঞ্জস্যের নিয়মই এরূপ। সকল চোর এবং হত্যাকারী, সকল অসাধু, দুর্বলতম ও সর্বাপেক্ষা অধিক দুরাত্মা, শয়তান—এরা সকলেই আমার খ্রীষ্ট! ঈশ্বর-খ্রীষ্ট ও পিশাচ-খ্রীষ্ট—উভয় খ্রীষ্টই আমার কাছে পূজ্য। সৎ ও সাধুর চরণে প্রণাম, দুরাত্মা এবং শয়তানের চরণেও। তারা সকলেই আমার শিক্ষক, সকলেই আমার আধ্যাত্মিক গুরু, সকলেই আমার ত্রাণকর্তা।··· রাস্তার স্ত্রীলোককে আমি অবজ্ঞা করতে বাধ্য হই, কারণ সমাজের নির্দেশ! যে রমণীর পেশা অন্যান্য স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষার কারণ-স্বরূপ,—সেই রমণী আমার কাছে 'ত্রাণকর্তা।' কাকে দোষারোপ করব? কাকে প্রশংসা করব? ঢালের দুইদিক অবশ্যই দেখতে হবে।'······ (ক্রমশঃ)

রাখালরাজ

আনন্দ

একদা কোন্ অরুণ-রাগ-আবীর-রাঙা নদীর কূলে
বালকদল মিলিল আসি নিবিড়ছায়া তমাল মূলে।
মনের যিনি অনেক দূরে, ধ্যানেতে যাঁরে যায় না ধরা
তাঁহারে পেয়ে রাখালরূপে ময়ুরপাখা মাথায় পরা
মনের সুখে করিল খেলা, তাঁহারে অতি আপন ভাবি,
অজানা কোন্ পরশ পেয়ে তমালবন উঠিল কাঁপি॥

ক্ষুধায় তাঁরে কাতর হেরি বনের ফল আনিল কত,
মুকুটে তাঁর সাজায়ে দিল বনের ফোটা কুসুম যত।
বুঝিল নাকো, নিশীথ-দিবা সবার তিনি মেটান ক্ষুধা,
তাঁহারি পদ-পরশ লভি সরস হয় স্বরগ-সুধা।
বুঝিল নাকো, তাঁহারি রূপ-সাগর-জলে সিনান করা
আঁধার-ধরা-দুয়ার ঠেলি উজলি ওঠে সূর্য, তারা।

বুঝিল শুধু, তাদেরি মতো বালক এক এসেছে বনে,
আপনজন সবারে ঠেলি বসেছে জুড়ে সকল মনে;
পুরানো ধরা সরম মানি সরিয়া গেছে অনেক দূরে,
তাঁহারি সুখ-সুবিধা দিয়ে নতুন ধরা উঠেছে গ'ড়ে॥
বুঝিল নাকো, তবুও তারা পরাণভরি লভিল যাহা
শতেক যুগ বুঝেও তবু জ্ঞানীরা খুঁজে পায় না তাহা॥

'শ্রীম' সমীপে

ভক্ত রমেশচন্দ্র সরকার

২২শে মাঘ, ৬ই ফেব্রুআরি, ১৯১৯

৺সরস্বতীপূজার দিন ভাবতন্ময়তা

আজ সমস্ত কলিকাতা শহর আনন্দে মুখরিত। আজ সরস্বতীপূজা উপলক্ষে, মাষ্টার মহাশয়ের মনে পড়িল যে, ৩০ বৎসর পূর্বে তিনি কামারপুকুরে ঐ পুণ্যদিবসে গিয়াছিলেন। সেই চিন্তায় তাঁহাকে কিছুক্ষণ তন্ময় দেখিলাম। স্কুলবাড়ী হইতে শ্রীম'র সঙ্গে ঠাকুরবাড়ীতে আসিবার রাস্তায় এক স্কুলগৃহে সরস্বতীপ্রতিমা দর্শনে শ্রীম বসিয়া পড়িলেন, একেবারে ধ্যানস্থ। শীতকাল, ঠাণ্ডা পড়িতেছে, রাত হইয়াছে, বাহিরে ঠাণ্ডায় (বারান্দায়) বসিয়াছেন। ঠাণ্ডায় তাঁহার স্নায়ুশূল বেদনা বাড়ে। সেদিকে দৃষ্টি নাই।

যাহা হউক পরে ব্যথার জন্য বালির পুঁটুলির তাপ দিয়াছিলেন। ঐটুকু সেবার অধিকার পাইয়া মন আনন্দে ভরিয়া গেল। সেদিন একটু তালমিছরি লইয়া গিয়াছিলাম, তাহাতে দুইবার thanks, thanks বলিলেন। উপস্থিত ভক্তদের উহা হইতে কিছু কিছু দিলেন। বলিলেন, ভক্তদের খাওয়াইলে যথার্থ পূজার ফল পাওয়া যায়।

কিছু আগে বেলুড় মঠ হইতে তিনজন ব্রহ্মচারী তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের তিনি পাইয়া খুব খুশী। আজ আমিও খুব আনন্দ পাইয়াছি—তাঁহার স্নেহ ভালবাসা পাইয়া ধন্য হইয়াছি।

২৩শে মাঘ, ৬ই ফেব্রুআরি, ১৯১৯

আজ বেলা ১১টায় শ্রীম'র বাড়ী গিয়াছি। আজ বেলুড় হইতে একটি ছাত্র Ivanhoe নামক পুস্তক লইবার জন্য তাঁহার নিকট গিয়াছে।

আমি—আপনি ঠাকুরের কথামৃত কখন লিখতেন? রাত্রি জেগে কি লিখতে হত? খুব পরিশ্রম হত; না?

শ্রীম—পরিশ্রম ছাড়া কোন্ কাজ হয়? হ্যাঁ, রাত্রে লিখতাম। শুনে এসে পরদিনও লিখেছি, ধ্যান করে করে।

তারপর চণ্ডীখানি লইয়া খুঁজিতে লাগিলেন। হঠাৎ উহা খুঁজিয়া পাইয়া বলিতে লাগিলেন, "এই দেখ, তাঁর কাজ তিনিই করলেন।" "মেধাসি দেবি বিদিতাখিল-শাস্ত্রসারা" ইত্যাদি পড়িয়া বলিলেন—

একি আর আমি করেছি! ঠাকুরের কাজ ঠাকুরই করেছেন। তিনিই মেধারূপে, ইচ্ছা-শক্তিরূপে আমার ভিতর আবির্ভূত হয়ে লিখিয়েছেন। তিনিই কর্তা ও কারয়িতা। আমরা বুঝি আর না বুঝি।

Ivanhoe বইখানিতে মলাট পরাইতে বলিলেন ও দেখাইয়া দিলেন। আমি শিখিয়া লইলাম কেমন করিয়া মলাট পরাইতে হয়। ভাবিতেছি এখানে থাকিলে অনেক শিক্ষা হয়। অমনি বলিলেন, "দেখ, এটি শিখে গেলে।" তারপর প্রায় ২॥ টার সময় বিদায় লইয়া শ্রীশ্রীরাজামহারাজের দর্শনমানসে সেদিন উঠিলাম।

২৪শে মাঘ, ৭ই ফেব্রুআরি, ১৯১৯

বৈকালে গিয়াছি। শ্রীম বলিতেছিলেন—war (যুদ্ধ) ও Epidemic (ইনফ্লুয়েঞ্জা) বুঝিয়ে দিলে যে, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।

একটি ছেলে B.A. পাশ করলে, বিয়ে করলে। অবশেষে ঐ epidemic, মারা গেল।

ঠাকুর আমায় শিখিয়েছিলেন—যতদিন না 'আমি' যায় ততদিন মা, মা, বলে ডাকতে। এই বলিয়া বলিলেন—

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"
(গীতা)

২৫শে মাঘ, ৮ই ফেব্রুআরি, ১৯১৯

আজ শ্রীম সন্নিধানে সন্ধ্যার সময় গিয়াছি। আরও ৪।৫টি ভক্ত উপস্থিত।

শ্রীম—ঠাকুরের কি উদ্দীপন। ভগবানে কত টান। আহা, কি দিনই সব গেল। কলকাতায় এসে একদিন দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যাওয়ার জন্য কি ব্যাকুল! জলের মাছ যেমন ডাঙ্গায় ছটফট করে। এদিকে থাকতে পারতেন না। চারিদিকে কামিনী-কাঞ্চন। দক্ষিণেশ্বরে মা-কালীর স্থানে ওসব নেই। সকলেই মা-কালীর সেবক। ঐ সেবকদের দেখে তাঁর মা-কালীর উদ্দীপন হত।

একদিন সেখানে একটি মেথর তাঁর সম্মুখে হাত জোড় করে প্রণাম করে বলল, 'আমার কি কিছু হবে?' ঠাকুর বললেন, 'হবে না? সেকি! তুই মায়ের সেবক, দেবমন্দিরের সেবা কচ্ছিস। অবশ্য হবে।'

হঠাৎ একদিন দেখি, দক্ষিণেশ্বরের পথে ঝাড়ু দিচ্ছেন, আর বলছেন, 'মা এই পথ দিয়ে বেড়াবেন।' কথা বলতে বলতে তন্ময়তা, আবার মা, মা। মাঝে মাঝে যে ভক্তদের সঙ্গে কথা বলতেন—তা তাঁদের মঙ্গলের জন্য। ঠাকুর বলতেন, 'ভগবানে মন থাকাই normal (স্বাভাবিক), আর না থাকাটাই abnormal (অস্বাভাবিক)। যেমন বাঁশ, এর সোজা হয়ে থাকাই normal অবস্থা, gravitation-এর (মাধ্যাকর্ষণ) দরুণ যে নুয়ে পড়ে, উহা স্বাভাবিক নয়। ঠাকুরের কথা নিতে হয়। তিনি চৈতন্যদেবকে অবতার বলেছেন, অতএব ঐ বিশ্বাসটি আমাদের পাকা হওয়া উচিত।

একদিন তিনি বললেন (সমাধি হতে নেমে নিজের বুকে হাত দিয়ে), এখান থেকে একজন বেরুল, বেরিয়ে বললে, 'আমি যুগে যুগে অবতার।' ভগবান নিরাকার আবার সাকারও। তিনি অবতার হয়ে আসেন। ঠাকুর যখন বলে গেছেন, তখন সত্যই, কি বলো?

জনৈক—তীর্থে গেলে কি কিছু হয়? না শুধু ঘোরাই সার?

শ্রীম—'আমার ওতে কিছু হবে না, আমার ভক্তি নেই'—এ সব ভাব ভাল নয়। আত্মবিশ্বাস চাই। আর শাস্ত্রে ও তীর্থাদিতে বিশ্বাস করতে হবে। ঠাকুর বলতেন, লঙ্কা-মরিচ না জেনে খেলেও ঝাল লাগবে। সে লঙ্কার গুণ, যে খায় তার নয়। সেইরূপ তীর্থে গেলে, মহাপুরুষ-সঙ্গ হলে আপনা হতেই তাঁদের প্রভাব এসে যায়, নতুন সংস্কার তৈরী হয়। তীর্থ ত অন্য কিছু নয়; যেখানে সাধু-সঙ্গ এবং দেবতা ও অবতারদের পবিত্র নিবাস—তাঁদের influence (প্রভাব) সেখানে আছেই।

২৭শে মাঘ, ১০ই ফেব্রুআরি, ১৯১৯

আজ শ্রীম'র নিকট প্রায় বেলা ১২টার সময় গিয়াছি। প্রায় সমস্তদিন ব্রহ্মচারীর নিকট ছিলাম। কারণ গত রাত্রিতে spirit lamp-এ ব্রহ্মচারীর মুখ ও কপাল পুড়িয়া গিয়াছিল। এই ব্যাপারে শ্রীম ভাবের সহিত বলিলেন, 'যার কেহ নাই, তার হরি আছেন।'

সন্ধ্যার পর শ্রীম কথা কহিতেছেন - তীর্থ ও অবতারের কথা। সরযূ, শ্রীরামচন্দ্র, তুলসীদাসের

রামায়ণের বর্ণনাপ্রসঙ্গে, আবার ভাগীরথী-তীরে নবদ্বীপে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ প্রসঙ্গে, শেষে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কথা বলিতেছেন, 'অবতারের প্রতি অনুরাগকে ভক্তি বলে। কি ভাবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয় ঠাকুর একদিন আমাদের সম্মুখে দেখালেন। হাত জোড় করে ঠাকুর কাতর ভাবে বলছেন: মা, আমি দেহসুখ চাইনা, শতসিদ্ধি চাইনা, অষ্টসিদ্ধি চাইনা; চাইনা মা লোকমান্য, যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয়। যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই। একটি ভক্তকে লয়ে গিয়ে মায়ের সম্মুখে plead (প্রার্থনা) করছেন, বলছেন গানের সুরে, 'ভবদারা ভয়হরা নাম শুনেছি তোমার।'

ঠাকুরের ভগবানে ব্যাকুলতা দর্শন করতে কত লোক আসতো। একজন আগুন জ্বালালে দশজন পোয়াতে আসে। ভারত পুণ্যভূমি। অবতারের ভূমি। সব তীর্থে তীর্থে পুণ্যস্থানে সকলের মন ভগবানের দিকে ঝুঁকে রয়েছে। চোখ রাখলেই দেখতে পাবে।

ঠাকুর একটি ছেলের বৈরাগ্য দেখে বললেন, এখানে যখন তোর এত ভয় ও বাধা, তুই না হয় ৺জগন্নাথদর্শনে যা। ছেলেটি তাই করল। ঠাকুরের তখন গলায় ঘা, কাশীপুরের বাগানে; কথা কইতে কষ্ট হয়। তার বাপ এসে উপস্থিত, ছেলের খোঁজে। ঠাকুর গলায় হাত দিয়ে আস্তে আস্তে নিজে নিজে বলছেন—…। ঠাকুরের কষ্ট হবে ভেবে পিতা আর কিছু বললেন না।

২৮শে মাঘ, ১১ই ফেব্রুআরি, ১৯১৯

আজ উদ্বোধনে শ্রীশ্রীশরৎমহারাজ ও বলরামবাবুর বাড়ীতে শ্রীশ্রীমহারাজকে দর্শন করিয়া বৈকালে শ্রীম'র নিকট গিয়াছি। নির্ভরতার কথা উঠিল—

ম—ভগবান ভার নেন ও নিচ্ছেন পথে কত পশুপক্ষী বেড়ায়, কে তাদের ভার নিয়েছেন? মানুষ? নিজেরই ভার নিতে পারে না!

দুঃখ-ভার সব সহ্য করা চাই। ঠাকুরের হাতটি ভেঙ্গে গেল। ভক্তেরা কেহ কেহ হাতটি ঢেকে রাখতো—সাধারণ লোক দেখে যদি ভাবে, এত বড় মহাত্মারও হাত ভাঙ্গে! ঠাকুর কিন্তু হাতটি খুলে লোককে দেখাতেন, বলতেন, 'দেখ গো, আমার হাত ভেঙ্গে গেছে।' আহা, মানুষকে কষ্ট সহ্য করতে শেখাবার জন্য তাঁর এই দুঃখবরণ। আর গান গেয়ে বলতেন, 'আমি ঐ খেদে খেদ করি, তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি'। তিনি কিন্তু ইচ্ছা করলে উহা সেরে যেতো। কিন্তু সচ্চিদানন্দময়ী মাকে ছেড়ে হাড়-মাসের খাঁচায় তিনি মন দিতে পারতেন না।

বেলুড় মঠের শ্রীশ্রীঠাকুরের বাগান হইতে কিছু শিম তাঁহার সেবায় পাঠাইয়াছিল। উহা রান্না করিয়া শ্রীম ঠাকুরকে নিবেদন করেন। ঐ শিম-প্রসাদ আমাদের একটু একটু দিলেন। বেলুড় মঠের প্রতি কি শ্রদ্ধা! উহাই ধ্যান, সাধুদের বিষয় শোনা ও বলা।

আমি নিজের মনের অবস্থার কথা ভাবিয়া শ্রীম'কে একদিন বলিয়াছিলাম, 'চারিদিকে বিপদ, মনে ভয় হয়, শেষে পাগল হয়ে যাব নাকি?'

শ্রীম—বালাই, ওরূপ কেন ভাববে!

২৯শে মাঘ, ১২ই ফেব্রুআরি, বুধবার

ত্রয়োদশী, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-দিবস।

আজ প্রায় দেড়টার সময় শ্রীম'র বাড়ী

গিয়াছি। কিছু পরে ঘরের মধ্যে গিয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর পত্রখানি সম্পূর্ণ তাঁহাকে দেখাইলাম। চিঠিতে লেখা ছিল: ঠাকুরকে দর্শন করিবার চেষ্টা করাই প্রকৃত কাজ। সেই চেষ্টা সকলের আসেনা বলিয়াই জীব সেবা দ্বারা মনকে পবিত্র করে (করিতে হয়)। সকলের সঙ্গে (বোকার মত) সরল ব্যবহার করা উচিত নহে। দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া ব্যবহার করা উচিত। যত গুপ্ত থাকা যায় ততই ভাল।

শ্রীম শুনিয়া বলিলেন, 'এই চিঠিদ্বারা জীবের কত উপকার হবে। বেশী লোকের সঙ্গে মিশতে গেলে রজোগুণ হয়, নানা ঝঞ্ঝাট। ভাগবতে একটি গল্প আছে, একজন বিয়ে করার জন্য কন্যা দেখতে কন্যার বাড়ী গেল। বাহির হতে দেখলে বাড়ীতে কেউ নেই, শুধু কন্যাটি আছে; চাল ঝাড়ছে। তার হাতে অনেক গাছা চুড়ি আছে। শব্দ হচ্ছে। মেয়েটির লজ্জা হল। চুড়ির ঝনঝন শব্দ একটা আপদ ভেবে, এক গাছা করে ভেঙ্গে ফেলতে লাগল। শেষে যখন এক গাছা রইল, আর শব্দ নেই। বহুলোক একত্র থাকলে এই শব্দ, এই ঝনঝনানি গণ্ডগোল আছেই। এই দেখে তার বিবাহ করার ইচ্ছা হল না। সংসার তুষানল। তাই হরির নামই সম্বল। ব্রহ্মচারী সেদিন পুড়ে যেতে 'হরিবোল, হরিবোল' করে উঠলো। যার কেউ নেই তার হরি আছেন।

বালিগঞ্জের ভক্ত—আপনারা খুব fortunate (ভাগ্যবান)। ঠাকুরকে স্পর্শ করেছেন, দেখেছেন, তাঁর কথা শুনেছেন, তাঁর সেবা করেছেন।

শ্রীম—না, ঠাকুর বলেছেন তাঁর ঐশ্বর্য তাঁর সন্তানেরা সবাই পাবে। তাঁর ঐশ্বর্য হচ্ছে বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম। ঠাকুরকে চিন্তা করলেই ভিতরে শুভ সংস্কার হয়।

ভক্ত—বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা বড় একটা ধর্মকথা বলেন না। তাই সেখানে গিয়ে সুবিধে হয় না।

শ্রীম—সন্ন্যাসীদের দর্শন ও তাঁদের চরণধূলি ধারণ করলেই হল। কথা হোক বা না হোক। বড়লোকের নাতি, সে এতটুকু ছেলে, ৺দুর্গাপূজা দেখতে গিয়েছে। যেই ঝনঝন করে টাকা ফেলে প্রণাম করলো, তখন তার কত সম্মান। এঁরা ঠাকুরের সম্পর্কে সন্ন্যাসী কিনা, তাই এত সম্মান।...

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কথা

-মিশনের উদ্দেশ্য, শিবজ্ঞানে জীব-সেবা। উহা পরোপকার নহে। নিজেরই উপকার। তবে ওতে সমাজের কিছু সুখ-সুবিধা হবে স্বভাবতঃ। ভক্ত যে ভগবানকে ডাকে, সে ভগবানের গুণে। ভগবানই ভক্তকে ডাকায়। সেটা ভক্তের গুণ নয়। তিনিই হচ্ছেন compelling force (প্রেরক শক্তি)—তাতেই তোমরা সৎকাজ সব করছ। তিনিই সব হয়েছেন।

একজন ভক্ত—তা ত সত্যই।

শ্রীম—ও আপনি মুখে বলছেন, ধারণা করা শক্ত। ঠাকুর বলেছিলেন, মা-ই সব করাচ্ছেন। এখন দেখছি তাই সত্য। এখনও ঠাকুরের মূর্তি ধ্যান, তাঁর ভাব সব ধ্যান করলে তাঁকেই (যেমন আমরা তাঁকে জীবিত অবস্থায় দেখেছি) চিন্তা করা হয়। ফল একই। ঠাকুর একজনকে বলেছিলেন—'একটু কিছু করলেই কেউ বলে দেবে—এই, এই।'

ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন একটি ভক্তকে বলতে, 'তাকে বোলো, সে যেন আমার চিন্তা করে।' এতে প্রকারান্তরে আমাকেও বলে দেওয়া হল—'তুমিও কোরো।' ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করলে সব ঠিক হয়।

ভক্ত—ঠাকুর বলেছিলেন, 'অমুকের হবে, অমুকের হবে'—তাকি হয়েছে? আপনাদের তা হলে হয়েছে?

শ্রীম—তা হবে বৈ কি? কারও এজন্মে, কারও বা পরের জন্মে। কারও বা দু'জন্ম পরে হবে। ···ঠাকুর কত ভক্তকে অভিমানছলে গান গেয়ে গেয়ে মার কাছে introduce (পরিচয়) করে দিতেন। তাঁর যেন দায়!

ভক্ত—গুরুর কি দরকার আছে?

শ্রীম—যুগাবতার এলে অত বাঁধাবাঁধি নিয়ম নেই; তবে গুরুলাভ হলে আরও আঁট হবে।

২রা ফাল্গুন, ১৫ই ফেব্রুআরি, ১৯১৯
শুক্রবার, মাঘী পূর্ণিমা।

শ্রীম'র নিকট একজন ব্রহ্মচারী আসিলেন। শ্রীম ব্রহ্মচারীকে দিয়া পুণ্য দিনে এক ভক্তকে গঙ্গাজল পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার বাড়ীতে আজ ব্রহ্মচারীজী ভিক্ষাগ্রহণ করিলেন।

ব্রহ্মচারী—ভক্তটি বলেছেন, আপনি ঠাকুরের কথা প্রথম প্রচার করেছেন।

শ্রীম ঠাকুরের কথা ঠাকুর প্রচার করেছেন। "অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে" (গীতা)। এমন দিনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন।

শ্রীম আজ শ্রীচৈতন্যের ভাবে মাতোয়ারা। একজন ভদ্রলোক আসিলেন, ল' পড়েন।

শ্রীম—How do you do? (কেমন আছেন?)

ভদ্রলোক—Thanks, I am doing well. (ধন্যবাদ, ভাল আছি)

শ্রীম—Can you follow Bengali talks? (বাংলা কথা বুঝতে পারেন?)

ভদ্রলোক—Oh yes (নিশ্চয়), আমি তো সেদিন আপনায় বলেছি।

শ্রীম—আজ নবদ্বীপে মহানন্দের দিন। এই বলিয়া গান ধরিলেন, "গৌরপ্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়। তার হিল্লোলে পাষণ্ডদলন, ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে যায়॥ মনে করি কূলে দাঁড়িয়ে রই। গৌরচাঁদের প্রেম-কুমীরে গিলেছে গো সই॥" I like to stand on the shore, but crocodile of love has swallowed me. Do you Know Gouranga of Nabadwip?

শ্রীম তাঁহাকে গান গাইতে বলিলেন।

ভদ্রলোক—আমার অভ্যাস নেই।

শ্রীম—Everything must have its beginning. You begin from here or from nowhere. (সব জিনিসের আরম্ভ আছে। আপনি (গান) এখানেই আরম্ভ করুন, না হলে কোথাও হবে না।

ভদ্রলোক—আপনি কি পরমহংসদেবের নিকট যেতেন? আপনি কি তাঁর disciple (শিষ্য)?

শ্রীম—তাকি বলা যায়! আমি তাঁর দাসানুদাস। মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ। তিনি কি কেবল একজনের জন্য এসেছিলেন? তিনি humanity-র (মনুষ্যজাতির) জন্য এসেছিলেন। আমরা সকলেই তাঁর সন্তান। তিনি অবতার।

আমি তখন উত্তরের কামরায় খলে ঔষধ মাড়িতেছিলাম—শ্রীম খাইবেন। সব কথা শুনিতে পাই নাই। দুই একটি কথা শুনিলাম।

ভদ্রলোক—যোগ কি?

শ্রীম—Scattered mind-কে (ছড়ানো মনকে) একটি point-এ (বিন্দুতে) Concentrat করার (গুটিয়ে আনার) নাম যোগ।

ভদ্রলোক—প্রাণায়াম?

শ্রীম—ওসব ভগবানকে ডাকতে ডাকতে আপনি হয়। বায়ু স্থির হয়ে যায়। যেমন বরযাত্রীদের procession (শোভাযাত্রা) দেখতে দেখতে বায়ু স্থির হয়। ভক্তিতে ওসব আপনি হয়। Artificial way-র (অস্বাভাবিক উপায়ের) প্রয়োজন হয় না।

ভদ্রলোক—হঠযোগ?

শ্রীম—ওসব দরকার নেই, ঠাকুর বলতেন। কলিতে অন্নগত প্রাণ। ওসব শরীরের কাণ্ড কিনা? কলিতে যে অন্নগত প্রাণ। ···নির্জনে বাস করলে সব problem (সমস্যা) solved (মিটে যায়) হয়।

সমালোচনা

সাংস্কৃতিকী (প্রথম খণ্ড): শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়: বাক্‌সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ২৩৪; মূল্য টা ৫.৫০ প.

সাহিত্যপাঠের সার্থকতা নানাভাবে আমাদের জীবনে দেখা দেয়। অনুভূতির অভিনবত্ব, ভাষার ইন্দ্রজাল, কাহিনীর বৈচিত্র্য, মননের সমৃদ্ধি—নানা কারণে এক একটি গ্রন্থ আমাদের জীবনে এক এক ধরনের স্বাদ সঞ্চার করে। সৃজনমূলক ও মননমূলক সাহিত্যের মধ্যে সাধারণতঃ আমরা প্রথমোক্ত শ্রেণীর সাহিত্যকেই বেশী মর্যাদা দিয়ে থাকি। কিন্তু মননমূলক সাহিত্যও যে বিপুল মর্যাদা লাভ করে, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, রামেন্দ্রসুন্দর প্রভৃতি সাহিত্যরথীদের প্রবন্ধসাহিত্য তার প্রমাণ। জাতীয় অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধাবলী বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের ওই শ্রেষ্ঠ পূর্বসূরীদের সুযোগ্য উত্তরসাধনা।

মননের ক্ষেত্রে তাঁর মূল অবলম্বন ভাষাতত্ত্ব। এই ভাষাতাত্ত্বিক প্রেরণাই মানবসংস্কৃতির বহুবিচিত্র ধর্ম, সাহিত্য ও জীবনধারার এক অন্তরঙ্গ পরিচয়লাভের প্রেরণায় পরিণত হয়ে আচার্য সুনীতিকুমারের প্রবন্ধাবলীতে বিশ্বচেতনার স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে। তাঁর সাম্প্রতিক প্রবন্ধাবলীর মনোজ্ঞ সংকলন 'সাংস্কৃতিকী' বাংলার সংস্কৃতিচর্চাকে ভারত ও বিশ্বসংস্কৃতির পটভূমিকায় স্থাপন করেছে। বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ প্রকাশের জন্য 'বাক্‌সাহিত্য'-প্রকাশসংস্থা অভিনন্দন লাভ করবেন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় এ প্রবন্ধসংগ্রহের "তাও", "সুফী অনুভূতি ও দর্শন", "মণিপুর-পুরাণ" প্রবন্ধতিনটি "উদ্বোধনে" প্রকাশিত।

আচার্য সুনীতিকুমার তাঁর অগাধ চিত্তসম্পদের অজস্র মণিকণা পাঠকদের উদ্দেশে যত অনায়াসে অপূর্ব প্রাঞ্জল ভাষায় উপহার দিয়েছেন, তার তুলনা এ যুগের বাংলাসাহিত্যে অতি সামান্যই মেলে। কারণ, বিশ্বপরিক্রমা যত সহজসাধ্য, বিশ্বমনা হওয়া তত সহজ নয়। ভারতে বা ভারতের বাইরে যেখানেই আচার্য চট্টোপাধ্যায় পরিভ্রমণ করেছেন, সেখানেই যেন দেশ ও জাতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের প্রাণের কথাটি ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আশ্চর্য যথার্থ্যের সঙ্গে অনুভব করতে পেরেছেন। তার ফলে আচার্য চট্টোপাধ্যায়ের সংস্কৃতিচেতনা সবরকমের একদেশদর্শিতামুক্ত, গভীরতম প্রজ্ঞার পরিচায়ক, সেই সঙ্গে প্রাণরসসমুজ্জ্বল।

আলোচ্য গ্রন্থে বারোটি প্রবন্ধ সংকলিত—তার মধ্যে 'সংস্কৃতি' নামে প্রথম প্রবন্ধটিতে বাংলায় সংস্কৃতি শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে যে তথ্য রয়েছে তা আজকের দিনে বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইংরেজী Culture-এর প্রতিশব্দরূপে 'সংস্কৃতি' কথাটির ব্যবহার ভারতীয় ঐতিহ্যসম্মত এবং অতিশয় যথার্থ প্রয়োগ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শিল্পস্তুতি সম্বন্ধে উক্তিটির অংশ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়— আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি, ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে। [এই শিল্পসমূহ হইতেছে আত্মার সংস্কৃতি; এগুলির দ্বারা যজমান নিজেকে ছন্দোময় করে।] (সাংস্কৃতিকী পৃঃ ৮।)

ভারতীয় সংস্কৃতির তিনটি মূলসূত্র আচার্য চট্টোপাধ্যায় নির্দেশ করেছেন—সমন্বয়, তত্ত্বানুসন্ধিৎসা, অহিংসা। সেই সঙ্গে তিনি এও বলেছেন--"সংস্কৃতি জীবনের সঙ্গে জড়িত—সেইজন্য এর চরমরূপ কোন এক সময়ে চিরকালের

জন্ম ব'লে দেওয়া যেতে পারে না। জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা আর সংস্কৃতিও গতিশীল ব্যাপার।"

স্বাধীন ভারতবর্ষের পরিবর্তমান সাংস্কৃতিক-রূপের দিকে তাকিয়ে মনে হয় জাতীয় উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে বিজাতীয় সংস্কৃতির নকলনবিশী করাটাই আমাদের এ যুগের চিন্তাহীন নেতৃত্বের সবচেয়ে বড়ো ত্রুটি। জাতির নিজস্ব সত্তাকে ভুলে গিয়ে সাংস্কৃতিক বিপর্যয় ডেকে আনলে ভারতবর্ষ তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তো হারাবেই, পরের ধনে ধনী হওয়ার বিলাসিতাও মরীচিকার মতো আমাদের মৃত্যুমুখে এগিয়ে নেবে। স্বামীজী তাই এই পরানুকরণ ও পরমুখাপেক্ষিতা সম্বন্ধে আমাদের বারংবার সাবধান করে দিয়েছেন। বিশ্বসংস্কৃতি-রচনায় অগ্রসর ভারতবর্ষকে তার আত্মসংস্কৃতির মৌলিকতা বজায় রেখেই অগ্রসর হতে হবে। এ বিষয়ে আমাদের বর্তমান রাজনীতি, শিক্ষানীতি বা শিল্পনীতি যে খুব অনুকূল একথা বলা চলে না। সুখের বিষয়, 'সংস্কৃতিকী' গ্রন্থটিতে আত্মসংস্কৃতিতে প্রতিষ্ঠিত সর্বতোভাবে ভারতীয় এক মনীষারই বিশ্ববীক্ষার উদাহরণ রয়েছে।

'যবদ্বীপের মহাভারত' এবং 'রামায়ণ', প্রবন্ধদুটি বৃহত্তর ভারতে এ দুই মহাকাব্যের প্রভাব ও রূপান্তর সম্বন্ধে সংহত আলোচনা। 'রামায়ণ' প্রবন্ধটিতে ভারতসংস্কৃতির যুগ-যুগান্তবাহী ক্রমবিকাশে বঙ্গসংস্কৃতির যোগ সম্বন্ধে একটি মন্তব্য উদ্ধৃত না ক'রে পারলাম না—"সীতা মহীয়সী বীরাঙ্গনা, কিন্তু আমরা 'জনমদুখিনী' বাঙ্গালীঘরের লাজুক বধূ সীতাকেই জানি, তাঁহার পুণ্যচরিত্র আকুলচিত্তে পূজা করি—এবং এই জনমদুখিনী অথচ স্বামীর প্রেমে গরবিনী এবং স্বামীর আদর্শে ধন্যা ও অনুপ্রাণিতা রামঘরণী সীতাকে, নূতন করিয়া গৌরাঙ্গ-জায়া বিষ্ণুপ্রিয়ারূপে ও রামকৃষ্ণপত্নী সারদাদেবীরূপে পাইয়াও আমরা ধন্য হইয়াছি।" (পৃঃ ৪৩)

"কুরল্" তামিলসংস্কৃতির অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থ। বঙ্গসংস্কৃতির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের এই প্রাচীনতম ভাষা ও সংস্কৃতির যোগসম্বন্ধে এখনও অনেক আলোচনার অবকাশ রয়েছে। তেমনি "কোলজাতির সংস্কৃতি" সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ্যা মানবিকতার প্রসারে ও বিশ্বমানববোধের ক্ষেত্রে কতখানি সহায়ক হয়ে উঠেছে সেকথাও স্মরণীয়। "কুরল্" এবং "কোলজাতির সংস্কৃতি" প্রবন্ধদুটি বাংলায় স্বল্প-আলোচিত বিষয়ের উপরে সুন্দর আলোকপাত।

"তাও" এবং "সুফী অনুভূতি ও দর্শন" প্রবন্ধদুটি আধুনিককালের তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনা হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর ধর্মচিন্তায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান চীনের "তাও তে কিঙ"—মহাগ্রন্থে "'তাও' হইতেছে জগতের এবং জাগতিক চেষ্টার অন্তর্নিহিত এক এবং অদ্বিতীয় শক্তি। 'তাও' নিজ অব্যক্ত স্বরূপে অনাদি ও অনন্ত, অপরিবর্তনীয়" (পৃঃ ১০৫)। ভারতের ব্রহ্মবাদের সঙ্গে এই তাওধর্ম এবং সুফীধর্ম গভীরভাবে সংযুক্ত। কে কিভাবে প্রভাবিত তা বিস্তৃত আলোচনার বিষয় হলেও সব ধর্মের অন্তর্নিহিত আদর্শগত ঐক্যের উদাহরণরূপে এ দুটি প্রবন্ধই অবশ্যপঠনীয়।

"অল্-বীরূনী ও সংস্কৃত" এবং "দরাপ খাঁ গাজী"—প্রবন্ধদুটি ভারত-ইতিহাসে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের সার্থক প্রকাশ। ভারতসংস্কৃতি বলতে ইসলামপূর্ব সংস্কৃতিকেই যাঁরা একমাত্র মনে করেন, তাঁদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ। ইসলাম ও ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সংঘাতে ও সমন্বয়েই বর্তমান ভারতসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। তাই মধ্যযুগের সংস্কৃতিচর্চার ইতিহাস অনুসন্ধান

বর্তমান ভারতবাসীর অবশ্যকরণীয়। প্রবন্ধ-দুটিতে ভারতসংস্কৃতির সঙ্গে সংস্কৃতের অচ্ছেদ্য যোগাযোগ দু'ভাবে দেখা দিয়েছে। অল্-বীরুনীর (একহাজার খৃষ্টাব্দ) সংস্কৃতচর্চা এবং দরাপ খাঁ গাজীর সংস্কৃতে গঙ্গাস্তোত্ররচনায় কালের সুদূর ব্যবধান সত্ত্বেও ভারতীয় মানসের অভিব্যক্তিরূপে সংস্কৃতের সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধ বর্তমান ভারতের ভাষাসমস্যার ক্ষেত্রেও অনুধাবনীয়

"মণিপুর-পুরাণ" প্রবন্ধটিও ভারতের একটি প্রান্তীয় প্রদেশের নিজস্ব সংস্কৃতির ও ভারতসংস্কৃতির ভাববিনিময়ের তথ্যে সমৃদ্ধ। বাংলা বৈষ্ণবসাহিত্য ও দর্শনের অনুরাগীবৃন্দ মণিপুর সংস্কৃতিসম্বন্ধে বিশেষভাবে সজাগ হলে বাংলাসাহিত্য তথা মণিপুরীসাহিত্য—দুয়েরই মহৎ উপকার, সন্দেহ নেই। 'শিল্পকলা' প্রবন্ধটিতে শিল্পের তত্ত্বগত আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনের কৃত্রিমতা সম্বন্ধে আচার্য চট্টোপাধ্যায় আমাদের সজাগ করতে চেয়েছেন। বাস্তবিক অবনীন্দ্রনাথ-হ্যাভেল-নিবেদিতা-কুমারস্বামী-প্রণোদিত ভারতশিল্প-আন্দোলন কেন যে এত অল্পসময়ে প্রেরণানিঃস্ব হয়ে পড়লো, তার একটি মূল কারণ অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে বর্তমান জীবনবোধের সমন্বয়ের অভাব। অতীত আদর্শের ধ্যানধারণাকে কেবল অনুকরণের মধ্য দিয়েই লাভ করা যায় না। যে জাগ্রত চলমান জীবনধারাকে প্রাচীন ভারতীয় শিল্প অনুসরণ ও অভিব্যঞ্জিত করেছিল, এ যুগের তথাকথিত ভারতশিল্প সেই বহমান বর্তমানের সঙ্গে যোগ রাখতে পারল না। সাহিত্যে নকল আর্যামির মতো চিত্রকলায় নকল আর্যামিও অল্পদিনেই বৈশিষ্ট্য হারালো। নন্দলাল বসু বা যামিনী রায়ের মতো শিল্পীদের রচনায় ঐতিহ্য ও বর্তমানের যে সংযোগ সাধিত হয়েছে, অধিকাংশ ভারতশিল্পবাদীদের চিত্ররচনায় তার বদলে অনড় অতীতের গভীরতাহীন অনুকরণাত্মক প্রচেষ্টাই প্রাধান্যলাভ করেছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালের বিমূর্তশিল্পনীতি যেভাবে খেয়ালখুশির পথে পা বাড়িয়েছে, তার পাশে ভারতশিল্পের নম্র শান্ত রেখায় অন্তরের অতল গভীরতার রূপায়ণপ্রচেষ্টা আজও আমাদের শ্রদ্ধেয় আদর্শ। চাই সেই ধ্যান ও নিষ্ঠা, যার বলে অবনীন্দ্রনাথের 'উমা' বা নন্দলালের 'শ্রীচৈতন্য' বা 'সতীর দেহত্যাগের মতো ছবি আপনি অন্তর থেকে বিকশিত হয়। ভারতশিল্প আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ নন্দলালে, কারণ একমাত্র তিনিই শুধু পুরাণে বা ইতিহাসে আবদ্ধ না থেকে দৈনন্দিন জীবন-ধারার নানা বিচিত্র প্রকাশে ভারতশিল্পের নব নব প্রকাশসম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করেছেন।

'রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা' প্রবন্ধটি এ যাবৎ রবীন্দ্রসাহিত্যে জীবনদেবতা তত্ত্ব নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। তথ্যসমৃদ্ধি, রসগভীরতা এবং একাত্ম-উপলব্ধির সমন্বয়ে এ প্রবন্ধটি সাহিত্যালোচনার সার্থকতম নিদর্শন। 'জীবনদেবতা'র মূল কল্পনায় বৈদিক ও গ্রীকসাহিত্য এবং সুফী অনুভূতির যে উৎসসন্ধান আচার্য চট্টোপাধ্যায় উপস্থাপিত করেছেন, তার সঙ্গে আর একটি তথ্যও বোধ হয় যোগ করা চলে—সেটি কবি বিহারীলালের কাব্যপ্রেরণা 'সারদা'-কল্পনা। বিহারীলালকে রবীন্দ্রনাথ গুরু বলে স্বীকার করতেন। সেকথার যদি কোন তাৎপর্য থাকে তবে ওই 'সারদা'-কল্পনায়—যে 'সারদা' নিখিল সৌন্দর্য, প্রেম ও সাধনার অধিষ্ঠাত্রী, তাঁরই রূপান্তর রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা।

'সাংস্কৃতিকী' আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক অথবা জাতীয়—যে কোন ধরনের গ্রন্থাগারের পক্ষেই পরম মূল্যবান সংযোজন।

এমন গ্রন্থ সত্যই দুর্লভ যা মানুষের অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারের অপরিমেয়তার কথা এত সার্থক-ভাবে আমাদের মনে করিয়ে দেয়, 'সাংস্কৃতিকী' তেমনি একটি প্রকাশ। অথচ ভাগ্যগুণে পাঠকমাত্রেরই কাছে একান্ত সুলভ।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

অঘটনের ঘটা : শ্রীদিলীপকুমার রায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭। পৃঃ ২৬২ ; মূল্য : ছয়টাকা।

"ভগবৎকরুণার দিব্য বাস্তবতা আমাদের এ বস্তুতান্ত্রিক যুগেও ঝাপসা হয়নি, সত্যযুগেও তার কান্তি যেমন উজ্জ্বল ছিল আমাদের এ-কলিযুগে ঠিক তেমনিই উজ্জ্বল আছে এবং এ সত্য যাঁরাই করুণার দেখা পেতে চেয়ে সাধনা করেছেন তাঁরাই উপলব্ধি করেছেন।"—এই মূল বক্তব্য আশ্রয় করে 'অঘটন আজো ঘটে' গ্রন্থের অনুবৃত্তি 'অঘটনের ঘটা' সাহিত্যের ক্ষেত্রে ধর্মপিপাসুজনের আগ্রহের বস্তু হয়ে উঠবে নিঃসন্দেহে। সম্ভব-অসম্ভবের কৃত্রিম সীমারেখা উত্তীর্ণ হয়ে চিরন্তনের লীলা উপলব্ধি করেন যাঁরা, তাঁদের জন্যই 'অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।' নিঃসন্দেহে লেখকও সেই মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানদের সহচর।

তবু এই "ধর্মোপন্যাস"টিতে সাহিত্যসম্ভাবনার দিকটি অনবহিত থাকায় এর সম্পূর্ণ উন্মীলন ঘটেনি। জীবনস্মৃতিজাতীয় রচনার শিথিলভঙ্গী উপন্যাসের পক্ষে অসার্থক প্রয়োগ। অথচ মূলকাহিনীটির যথাযথ ও পরিমিত প্রকাশে এর বক্তব্য আরো উজ্জ্বলতা লাভ করতো—এই আমাদের ধারণা।

সমগ্র কাহিনীর অলৌকিক তাৎপর্যটি নয়নাভিরাম প্রচ্ছদে আশ্চর্য ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। সেই সঙ্গে সমগ্র গ্রন্থে ভগবৎ-শরণাগতির শান্ত সৌরভ পাঠকচিত্তকে আবিষ্ট রাখে। বোধ করি, এ জাতীয় গ্রন্থের সেই সবচেয়ে বড়ো সার্থকতা।

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

আশ্রম (ষোড়শ বর্ষ—১৩৭১) :—সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীপীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক —স্বামী পুণ্যানন্দ, রামকৃষ্ণ বালকাশ্রম, রহড়া, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ১০৪।

রহড়া বালকাশ্রমের এই পত্রিকাখানি বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে শিক্ষক ও ছাত্রগণ কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতায় সমৃদ্ধ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সুনির্বাচিত উল্লেখ-যোগ্য রচনা : সেবা নহে—পূজা, পুণ্যতীর্থ জয়রামবাটী, বিশ্বপ্রিয় সেক্সপীয়র, আশুতোষ ও তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা, বইটি পড়ে দেখো, Education and Politics, চন্দ্রলোকের বিচিত্রবার্তা। আশ্রম-সংবাদে ও কয়েকটি ছবিতে আশ্রম-পরিচালিত শিক্ষায়তনগুলির ক্রমোন্নতি পরিস্ফুট।

ত্রয়ী (সপ্তম প্রকাশ—১৯৬৫) : সম্পাদক —অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়। রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫৪ + ৫৮।

বর্তমানে শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবশ্যকর্তব্য বলিয়া শিল্পশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতেও স্বীকৃত। শিল্পমন্দিরের আলোচ্য দ্বিভাষিক (ইংরেজী ও বাংলা) পত্রিকাটিতে শিল্প-বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ, যথা : ABC of Automatic Controls, Inductance and Mechanical Inertia প্রভৃতি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পত্রিকাটির অলঙ্কার-স্বরূপ। অন্যান্য ইংরেজী প্রবন্ধ এবং বাংলা গদ্য ও পদ্য সাহিত্যিক মানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই রচিত।

স্বামী বিশ্বানন্দ মহারাজের দেহত্যাগ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ২৫শে জুলাই, ১৯৬৫, রাত্রি ১১-৩০ মিনিটে (ইউ. এস. এ.-সময়) ৭১ বৎসর বয়সে আমেরিকার চিকাগো শহরে স্বামী বিশ্বানন্দ মহারাজ দেহত্যাগ করিয়াছেন। হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হওয়ার দরুণ গত ৭ই জুন তাঁহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল; কিঞ্চিৎ সুস্থ হইবার পূর্বেই তিনি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। উহা হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভের পূর্বেই তাঁহার একটি স্ট্রোক (stroke) হয়, তাহাতেই তাঁহার জীবনাবসান ঘটে।

স্বামী বিশ্বানন্দ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু প্রবীণ সন্ন্যাসীর সঙ্গ ও স্নেহলাভে ধন্য হইয়াছিলেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন।

প্রথমে মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে কর্মিরূপে ও পরে বোম্বাই শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষরূপে তিনি দীর্ঘকাল শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি চিকাগো কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত হইয়া আমেরিকায় প্রেরিত হন এবং জীবনের অবশিষ্টকাল সেখানেই অতিবাহিত করেন।

ভারতে ও আমেরিকায় অবস্থানকালে তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা ও সাধু-জীবনের দ্বারা তিনি বহুলোককে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন।

তাঁহার আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বোম্বাই-এ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠা

বোম্বাই শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে (খার, বোম্বাই ৫২) প্রস্তরনির্মিত নূতন মন্দিরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা ও সর্বজনীন প্রার্থনাভবনের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে গত ৩০শে জুন, ১৯৬৫ বুধবার হইতে ৪ঠা জুলাই, রবিবার পর্যন্ত পাঁচদিনব্যাপী উৎসব বিবিধ অনুষ্ঠানসূচী সহায়ে শুচিসুন্দর পরিবেশে আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ এই মন্দিরের শুভ উদ্বোধন করেন।

৩০শে জুন বুধবার পূজা, ভোগরাগ ও অধিবাস অনুষ্ঠিত হয়। ১লা জুলাই বৃহস্পতিবার পুরাতন মন্দিরে মঙ্গলারতি ও ভজনের পর সকাল ৬ টা হইতে ৭ টার মধ্যে শোভাযাত্রা সহকারে নূতন মন্দির পরিক্রমণ করা হয়। শোভাযাত্রাটি বিশেষ দর্শনীয় হইয়াছিল। শোভাযাত্রার পুরোভাগে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের পূতাস্থি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের প্রতিকৃতি লইয়া স্বামী নির্বাণানন্দ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ প্রভৃতি মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসিগণ অগ্রসর হন; তৎপরে ধূপধুনা ও চামরহস্তে সন্ন্যাসিগণ ও পরে ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণের নামকীর্তন ও জয়ধ্বনি করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকেন। বৈদিক প্রার্থনা ও ভজনসঙ্গীতে একটি পবিত্র পরিবেশ সৃষ্ট হয়। শোভাযাত্রাটি বারত্রয় মন্দিরপ্রদক্ষিণান্তে মন্দিরে প্রবেশ করিবার পর স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের মর্মর মূর্তির পাদপদ্মে অর্ঘ্যাদি দান করিলে আনুষ্ঠানিক ভাবে শ্রীমন্দিরের শুভ উদ্বোধন সুসম্পন্ন হয়।

অতঃপর নূতন মন্দিরে ষোড়শোপচার পূজা, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীশ্রীচণ্ডী, শ্রীমদ্ভাগবত ও উপনিষৎ পাঠ, হোম ও ভোগরাগ, এবং নূতন মন্দিরের পার্শ্বে নির্মিত সুসজ্জিত মণ্ডপে বাস্তু-পূজা ও যজ্ঞাদি হয়। সন্ধ্যায় আরাত্রিক ও ভজনকীর্তন এবং রাত্রে শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজা হইয়াছিল।

এই দিন সকালে নূতন মন্দিরের শুভ উদ্বোধনের পর পুরাতন মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের নবনির্মিত মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ।

২রা জুলাই শুক্রবার উষাকাল হইতেই পুণ্য কৃত্যাদি শুরু হয়, মঙ্গলারতি ও ভজন, শ্রীশ্রীচণ্ডী-পূজা ও পাঠ এবং সপ্তশতী হোম, ভোগরাগ ও আরতি যথারীতি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে।

অপরাহ্নে আয়োজিত ধর্মসভায় আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজীর প্রারম্ভিক ভাষণের পর সভাপতি মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ স্বামী মহেশ্বরা-নন্দজী মহারাজ 'সনাতন ধর্মের মূলতত্ত্ব ও শ্রীরামকৃষ্ণ' সম্বন্ধে হিন্দীতে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে জ্ঞান ও ভক্তির চরম বিকাশ ও তাঁহার সর্বধর্মসমন্বয় তাঁহাকে সর্বদেশে, সর্বকালে চিরপূজ্য করিয়াছে—এই ভাবটি সভাপতির ভাষণে সুপরিস্ফুট হয়।

স্বামী রঙ্গনাথানন্দজীর ইংরেজী বক্তৃতা শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করে। অন্যান্য বিশিষ্ট বক্তার ভাষণও সময়োপযোগী হয়। প্রশস্ত প্রার্থনাভবনটি শ্রোতৃবৃন্দের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল। সভান্তে আরাত্রিক ও ভজনের পর প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীরবিশঙ্করের সেতার ও বিশিষ্ট গায়ক

বিনায়ক রাও পট্টবর্ধনের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বিশেষ উপভোগ্য হয়।

রাত্রে স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক গুজরাতী ভাষায় 'নচিকেতা' ও 'হৈমবতী উমা' নাটক অভিনীত হয়। 'নচিকেতা' নাটকে নচিকেতার অভিনয় সকলের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। সভা ও অভিনয়ের জন্য বিরাট প্যাণ্ডেল ও সুন্দর মঞ্চ নির্মিত হইয়াছিল।

৩রা জুলাই শনিবার উষাকালে মঙ্গলারতি, ভজন ও বৈদিক প্রার্থনা, পূর্বাহ্নে পূজা ও ভোগারতি এবং মধ্যাহ্নে সাধুসেবা অনুষ্ঠিত হয়। সাধুসেবায় স্থানীয় বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন আখড়ার সাধুগণ আমন্ত্রিত হন। সমবেত প্রায় শতাধিক সাধুকে মাল্যচন্দনে ভূষিত করিয়া সংবর্ধনা করা হয় এবং বস্ত্র ও দক্ষিণা প্রদান করা হয়। সাধুগণ গীতার পঞ্চদশ অধ্যায় আবৃত্তি করিয়া পরিতৃপ্তি সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এতগুলি সাধুর একত্র সমাবেশ বোম্বাই শহরে সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

অপরাহ্নে গুজরাতী ও মারাঠী ভাষায় কথকতা এবং সান্ধ্য আরাত্রিকের পর নাটক অভিনীত হয়।

উৎসবের শেষ দিন ৪ঠা জুলাই রবিবারের অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: পূর্বাহ্নে সাধুসম্মেলন, মধ্যাহ্নে দরিদ্রনারায়ণ-সেবা, অপরাহ্নে ধর্মসভায় বিশিষ্ট বক্তাগণের মনোজ্ঞ ভাষণের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকে ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা এবং রাত্রে নাট্যাভিনয়। দুই দিন রাত্রে 'শিবপুর কল্পনামঞ্জিল পার্টি' কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যজীবন অবলম্বনে রচিত পূর্ণাঙ্গ নাটকের অভিনয় বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল।

উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে আগত প্রায় ৭৬ জন সাধু সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের উপস্থিতিতে গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্ট হইয়াছিল।

বোম্বাই-এ এই সময় অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ ও আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় জনসাধারণ বিপুলভাবে ও আন্তরিকতা সহকারে উৎসবে যোগদান করেন। মন্দিরের শুভ উদ্বোধনের সময় শ্রীভগবানের অসীম কৃপায় আকাশ সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত ও নির্মল ছিল, আবহাওয়া অত্যন্ত অনুকূল হইয়াছিল।

বোম্বাই-এ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নবনির্মিত মন্দিরপ্রতিষ্ঠা ও সর্বজনীন প্রার্থনাভবনের শুভ উদ্বোধনের ফলে স্থানীয় জনসাধারণ প্রকৃত ধর্মভাব ও আধ্যাত্মিকতা লাভে প্রচুর সহায়তা ও উদ্দীপনা লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।

ভজনসঙ্গীতে ও কালীকীর্তনে, যাগযজ্ঞ-হোমাগ্নির পবিত্র গন্ধে, পূজা-উপাসনা ধ্যানধারণা শাস্ত্রপাঠ ও ধর্মসভার মাধ্যমে যে আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল সৃষ্ট হইয়াছিল, বোম্বাই-এর অধিবাসিগণের ও প্রত্যক্ষদর্শিগণের চিত্তে তাহার পুণ্য স্মৃতি সুদূর ভবিষ্যতেও অম্লান থাকিবার যোগ্য।

শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের জন্মতিথি উদ্‌যাপন

বারাণসী: গত ২৬শে জুলাই সোমবার বারাণসী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপার্ষদ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের শুভ জন্মতিথি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। এতদুপলক্ষে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদবিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

সন্ধ্যায় আয়োজিত সভায় স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দজী পূজ্যপাদ মহারাজের পুণ্য জীবন ও বাণীর আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন:

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ছিলেন গুরুগতপ্রাণ। তাঁহার গুরুভক্তি অতুলনীয়। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসানের পর তিনি তাঁহার অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণের মতো হিমালয় প্রভৃতি স্থানে তপস্যায় যান নাই, শ্রীগুরুর সেবাকেই জীবনের সর্বস্ব করিয়া লইয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহারই আহ্বানে তিনি মাদ্রাজে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারা প্রচারে গমন করেন এবং নিজ জীবন ও আদর্শ দ্বারা শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব ও আদর্শ যথার্থভাবে প্রচার করিয়া ৫০ বৎসরের পূর্বেই ইহলীলা সংবরণ করেন।

কার্যবিবরণী

কনখল: সুন্দর স্বাস্থ্যকর পরিবেশে হরিদ্বারের সন্নিকটে অবস্থিত কনখল সেবাশ্রমটি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রাচীন সেবাশ্রমগুলির অন্যতম। ইহা স্বামীজীর স্থূলশরীরে থাকাকালেই 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'কে বাস্তব রূপ দিবার উদ্দেশে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সেবাশ্রমের ৬৩ তম বর্ষের (এপ্রিল, '৬৩—মার্চ, '৬৪) কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

অতি সাধারণভাবে এই সেবাশ্রমের শুভ সূচনা হইলেও নানা অবস্থার মধ্য দিয়া আসিয়া বর্তমানে ইহা একটি আধুনিক পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালে পরিণত হইয়াছে। এখানে জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সকলেই সুচিকিৎসা লাভ করিয়া থাকেন; বিশেষতঃ অসহায় দরিদ্রগণ ও হরিদ্বার, হৃষীকেশ প্রভৃতি তীর্থাঞ্চলের নিঃসম্বল সাধুগণ এখানে সেবাচিকিৎসাদি লাভ করিয়া রোগমুক্ত হন।

আলোচ্য বর্ষে ৫০টি শয্যাযুক্ত (free bed) অন্তর্বিভাগীয় হাসপাতালে ১,১৬৬ জন রোগী ভরতি হয় এবং ১,০৩৬ জন আরোগ্য লাভ করে।

বহির্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৯২,৩১৫ (নূতন ২২,৬৬৯); অস্ত্রচিকিৎসা ৭০৭, দন্তচিকিৎসা ২৭৪, চক্ষুকর্ণাদি চিকিৎসা ১,৭৬৮, এক্সরে ও ইলেক্‌ট্রোথেরাপি বিভাগে ১,১৯৩ ও ৭৭১। ল্যাবরেটরিতে ৩,২৮০ নমুনা পরীক্ষা করা হইয়াছে। বহির্বিভাগে গড়ে দৈনিক রোগীর সংখ্যা ৪০০।

রোগীদের গ্রন্থাগারের পুস্তক সহ সেবাশ্রম গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ৫,২৮৩; পাঠাগারে ৬টি সংবাদপত্র এবং ৩৮টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়।

১৯৬৩ ও ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের বিভিন্ন সময়ে স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে সভা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে ৩,০০০ দরিদ্রনারায়ণের সেবা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চেরাপুঞ্জি: রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৫৯-১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। চেরাপুঞ্জিতে একটি উচ্চ বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, তিনটি নার্সারি ও প্রাইমারি স্কুল সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। আশ্রমে নিয়মিত প্রার্থনা-ভজনাদি হয় ও বিভিন্ন ধর্মের মহাপুরুষগণের জন্মতিথি পালন করা হয়।

উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫০৩ (ছাত্রী ২৩০); পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। এ পর্যন্ত এই স্কুল হইতে ২৪০ জন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। উচ্চ বিদ্যালয়ের শিল্পবিভাগে সীবন, বয়ন, টাইপরাইটিং, ফটোগ্রাফি প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ১৯৬৩-৬৪ খৃষ্টাব্দে ছাত্রাবাসে ১০৯ জন ছাত্র ছিল, তন্মধ্যে ১০০ জনকে আংশিক ব্যয়ে থাকিবার সুযোগ দেওয়া হয়।

চেরাপুঞ্জিকে কেন্দ্র করিয়া উত্তর-দক্ষিণে ২০ মাইলের মধ্যে শেলা, শোবর, নংওয়ার, লাইডু, ওয়াকালিয়র প্রভৃতি ৪০টি গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশই প্রাথমিক পর্যায়ের—প্রাইমারি ও নার্সারি স্কুল, ৮টি মধ্যইংরেজী বিদ্যালয়; দুইটি স্থানে শিল্পবিভাগ ও ছাত্রাবাস আছে। চেরাপুঞ্জি হইতে ১৩ মাইল দূরবর্তী শেলায় প্রতি বৎসর প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা আনন্দ ও উদ্দীপনা সহকারে অনুষ্ঠিত হয়।

আসামের পার্বত্য অঞ্চলে সার্থকভাবে শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপক প্রচেষ্টার জন্য চেরাপুঞ্জি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বর্তমানে এই কেন্দ্রের মাধ্যমে সর্বসমেত ২,১২৮ জন ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করিতেছে।

রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম

গত জুলাই মাসের প্রথম দিকে ব্রহ্মদেশে রেঙ্গুনস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের পরিচালনা-ভার ব্রহ্মসরকার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। এখন হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সহিত উহার আর কোন সম্বন্ধ রহিল না। রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটির ভার এখনও মিশনের হস্তেই রহিয়াছে।

স্বামী কূটস্থানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অতিশয় দুঃখিত চিত্তে জানাইতেছি যে, গত ২৪শে জুলাই বিকাল ৪-৪৫ মিনিটের সময় ভেলোর (Vellore) হাসপাতালে স্বামী কূটস্থানন্দ ৬১ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কয়েক বৎসর যাবৎ নানাবিধ রোগে ভুগিতেছিলেন।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে তিনি কৃতকার্যতার সহিত সঙ্ঘের সেবাদি করেন। গত কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি দক্ষিণভারতে নেত্রম্পল্লী (Nattarampalli) কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ছিলেন।

তাঁহার আত্মা ভগবৎপদে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে ডক্টর জ্যোতির্ময় ঘোষ

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও সাহিত্যসেবী ডক্টর জ্যোতির্ময় ঘোষ গত ১৯শে জুন ৭০ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতাস্থ সত্যেন দত্ত রোডের বাসভবনে পরলোক গমন করেন; দুই মাস যাবৎ তিনি অসুস্থ ছিলেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহিত নানাভাবে যুক্ত ছিলেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে যশোহরের ঘাষিয়ারায় তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার ছাত্রজীবন ও কর্মজীবন উভয়ই সমুজ্জ্বল ছিল। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং এডিনবার্গ হইতে পি-এইচ-ডি লাভ করেন।

১৯২১ হইতে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন; তৎপরে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক হন। ১৯৪৪ হইতে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হুগলী মহসীন কলেজের অধ্যক্ষ থাকিবার পর তিনি কলিকাতা প্রেসি-ডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপকও ছিলেন।

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সহিত ডক্টর ঘোষ যুক্ত ছিলেন এবং ন্যাশনাল একাডেমি ও সায়েন্স অব ইণ্ডিয়ার ফেলো হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা কমিটির সভ্য ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একজন উপদেষ্টা ছিলেন।

সাহিত্যজগতে তিনি 'ভাস্কর' নামে সুপরিচিত। উদ্বোধনে ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত।

তাঁহার রচিত গ্রন্থরাজির মধ্যে উল্লেখযোগ্য: গণিতের ভিত্তি, কথিকা, ভজহরি, এ জার্নাল ওয়ার্ড বুক, লেখা, মজলিস, ম্যাট্রিকুলেশন এলজেব্রা, এ ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড বুক।

তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

ভারতে বিজ্ঞানচর্চা

সমগ্র ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গকেই সর্বা-পেক্ষা বিজ্ঞান-সচেতন রাজ্য বলিয়া মনে হয়।

পশ্চিমবঙ্গে—প্রধানতঃ কলিকাতায় সর্বা-পেক্ষা অধিক সর্বভারতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক সমিতি আছে। ইহাদের সংখ্যা ৪১। বিজ্ঞান-চর্চায় উৎসাহদানের জন্য ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে 'রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব ক্যালকাটা' প্রতিষ্ঠিত হয়; ইহাই ভারতের প্রথম বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র। ভারতের বৃহত্তম বৈজ্ঞানিক সমিতি—'দি ইনষ্টিটিউশন অব ইঞ্জিনীয়ার্স' কলিকাতাতেই অবস্থিত। এই সমিতির সদস্য-সংখ্যা ৪২,৮৮৭।

পশ্চিমবঙ্গের পরেই মহারাষ্ট্র এবং তাহার পরেই দিল্লীর স্থান। মহারাষ্ট্রে ৩১টি এবং দিল্লীতে ২৯টি বৈজ্ঞানিক সমিতি আছে।

স্বাধীনতালাভের পর ভারতে বৈজ্ঞানিক সমিতিগুলির সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে।

—ইউ এন আই

ভ্রম-সংশোধন

বর্তমান সংখ্যায় ৪১১ পৃঃ ৭ম লাইন: 'আমরা আতপ-ক্লান্ত' স্থলে 'যবে আমরা আতপ-ক্লান্ত' হইবে।

গত শ্রাবণ সংখ্যায়:

৩৫৩ পৃঃ ১৭ লাইন: 'বন্দ্যোপাধ্যায়' স্থলে 'গঙ্গোপাধ্যায়' হইবে।

৩৬২ পৃঃ ২য় কঃ ২য় লাইন: 'রাক্ষসগণের' স্থলে 'ব্রাহ্মণগণের' হইবে।

৩৬৮ পৃঃ ১২ লাইন: 'আম্বির' স্থলে 'আম্বিয়া' হইবে।

শ্রীশ্রীদুর্গা

[বেলুড় মঠে পূজিতা]

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি।

ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব ॥

—শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১।৩৫

দিব্য বাণী

[ব্রহ্মার দুর্গা-স্তব

শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১।৭৩—৮২]

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারঃ স্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা॥
অর্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবজননী পরা॥

দেব পিতৃ সর্ব যজ্ঞে মন্ত্র তুমি, স্বর-স্বরূপিণী,
নিত্যা, অবিনাশী তুমি, সুধাময়ী, ওঙ্কার-রূপিণী।
শাশ্বত, নির্গুণ তুমি, ব্রহ্মময়ী, বাক্যের অতীতা,
ত্রিদশ-জননী তুমি, গায়ত্রী, বিশ্বের আদি মাতা।

ত্বয়ৈব ধার্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা॥
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥

বিশ্ব সৃজিয়াছ তুমি, ধরি আছ সর্ব চরাচর,
পালন করিছ সবে, অন্তকালে করিছ সংহার।
সৃষ্টিকালে সৃষ্টিরূপা তুমি মাতা, জগৎব্যাপিনী,
স্থিতিকালে স্থিতিরূপা, অন্তকালে সংহার-রূপিণী।

মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী॥

ব্রহ্মবিদ্যা তুমি দেবি, মায়ারূপা অবিদ্যাও তুমি ;
তুমি স্মৃতিরূপা ; মহাবিস্মৃতি, অজ্ঞান, সেও তুমি ;
দেবশক্তি-রূপা তুমি, আসুরী শক্তিও তুমি মাতা—
ভাল-মন্দ সব তুমি, বিশ্বস্বরূপিণী, বিশ্ব-ধাতা।

প্রকৃতিস্ত্বং হি সর্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।
কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা ॥
ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরা ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা।
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ ॥

সর্বভূতে ত্রিগুণের বিভিন্ন বিকাশবিধায়িনী
পরমা প্রকৃতি তুমি, সবার প্রকৃতি-স্বরূপিণী।
মোহময়ী নিশা তুমি, মহারাত্রি জগৎ-অন্তিকা,
প্রলয়-রজনী তুমি— কালরাত্রি— সর্বসংহারকা।
তুমি লক্ষ্মী, তুমি লজ্জা, তুমি তুষ্টি, তুমি পুষ্টি, ক্ষমা,
বুদ্ধি-বোধ-রূপা তুমি, মহেশ্বরী, শান্তি অনুপমা।

খড়্‌গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা।
শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুসুণ্ডীপরিঘায়ুধা ॥
সৌম্যাঽসৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী।
পরা পরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী ॥

শঙ্খ-চক্র-গদা-শূল-ধনুর্বাণ-অস্ত্রসুশোভিনী,
ভুসণ্ডী-পরিঘ-ধরা ভীমা তুমি, সংহার-রূপিণী।
দেবতার প্রতি তুমি সৌম্যভাব কর প্রদর্শন,
অসুরের প্রতি ধর রুদ্রমূর্তি অতীব ভীষণ।
সুন্দর যা কিছু আছে, তা'হতেও তুমি সৌম্যতরা,
সর্বোত্তমা, ব্রহ্মশক্তি, তুমি পরাৎপরা।

কথাপ্রসঙ্গে

শক্তিরূপিণীর জাগরণ

যিনি বিশ্বের জড়শক্তি, প্রাণশক্তি, চিন্তা, বুদ্ধি, প্রেরণা প্রভৃতি সর্ববিধ শক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়া আমাদের জীবনের পথে চালনা করিতেছেন, যিনি পাপাত্মার হৃদয়ে অসদ্বৃত্তিরূপে প্রকাশিত হইয়া তাহাকে অকল্যাণের পথে এবং সজ্জনের হৃদয়ে সদ্বৃত্তিরূপে প্রকাশিত হইয়া তাহাকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করেন, সেই মহাশক্তিরূপিণী বিশ্ববিধাত্রী জননী আজ ভারতের এই সঙ্কট-সময়ে হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টানাদি-নির্বিশেষে ভারত-সন্তানদের ভারতীয় জাতিরূপে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তাহাদের অন্তরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় হইবার প্রেরণারূপে জাগ্রতা হইয়াছেন—ভারতের পক্ষে ইহা পরম কল্যাণকর সন্দেহ নাই।

অপরিমেয় শক্তিরূপে তিনি আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে প্রচ্ছন্ন আছেন। সেই শক্তির স্ফুরণই প্রাণবত্তার এবং তাহার অপ্রকাশই নির্জীবতার লক্ষণ। কল্যাণবৃত্তির সঙ্গে যখন এই প্রাণবত্তার বিকাশ ঘটে তখন তাহা দৈবশক্তি—কেবল জগতের কল্যাণের জন্যই তাহা নিয়োজিত হয়। আর অকল্যাণবৃত্তির সঙ্গে স্ফুরিত হইলে আসুরিক শক্তিরূপে জগতে মহা অনর্থ সৃষ্টি করে।

এই শক্তির বিকাশেই তেজবীর্যের স্ফুরণ হয়; এই শক্তিই আবার আধ্যাত্মিক শক্তিরূপে প্রকট। অধ্যাত্মশক্তিরূপে অন্তরে বিকশিত হইয়া বিশ্বজননী তাঁহার সন্তানদের উচ্চ হইতে উচ্চতর জীবনে উন্নীত করিয়া পরিশেষে তাহাদের জীবন-মৃত্যুর অতীত প্রদেশে লইয়া যান।

ভারতের কাছে মা এই উচ্চজীবনের দ্বার চিরউন্মুক্ত রাখিয়াছেন। শান্তিপ্রিয়তা, ক্ষমা, অপরের কল্যাণকামনা—ভারতীয় জাতির সহজাত সম্পদ। সাত্ত্বিকভাবকেই শক্তির উচ্চতম বিকাশ বলিয়া, সাত্ত্বিকভাবময় জীবনাদর্শকে সর্বোচ্চ জীবনাদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে আমাদের বেগ পাইতে হয় না কখনো।

আর এই জন্য একটি অন্তর্দ্বন্দ্বও আমাদের মনে মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় হইবার প্রয়োজনের মুহূর্তেও এরূপ হওয়া মানবতাবিরোধী ভাবিয়া ভারত বহুবার উহা হইতে বিরত হইয়াছে। কিন্তু অন্যায়কারীর কাছে উহা গৃহীত হইয়াছে দুর্বলতা বলিয়াই।

পরম কল্যাণের কথা, ভারত আজ এই দুই ভাবের সমন্বয়ের পন্থা খুঁজিয়া পাইয়াছে। আত্মরক্ষার জন্য ভারতকে আজ যুদ্ধে লিপ্ত হইতে বাধ্য হইতে হইয়াছে, কিন্তু বিপক্ষের জনসাধারণের প্রতি ভারতের মনে সহানুভূতি অটুট রহিয়াছে। ভারতের রাষ্ট্রনেতাগণ বারবার সেকথা ঘোষণা করিয়াছেন, যুদ্ধরত ভারতের সামরিক শক্তি কোথাও অসামরিক এলাকা বা নিরীহ জনগণের উপর ইচ্ছাকৃত আঘাত না হানিয়া এই সদিচ্ছার বাস্তব প্রমাণও দিয়াছেন। মানবতা এবং তেজবীর্যের এই সমন্বিত ভাবই ভারতের নিজস্ব ভাব। ইহার মধ্যে আবিলতা কোথাও নাই, অন্তরের ভাবকে ছদ্মবেশ পরাইয়া দেখাইবার প্রচেষ্টাও নাই। ভারতের এই মনোভাব বিশ্বে কাহারও অবিদিত নয়। ভবিষ্যৎ ভারত বিশ্বের নিকট হইতে অধিকতর শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম অর্জন করিবে সন্দেহ নাই।

স্বামী সারদানন্দ 'ভারতের শক্তিপূজা'য় বলিয়াছেন, "বলিপ্রদান বা সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগ ভিন্ন শক্তিপূজা অসম্পূর্ণ, ফলও তদ্রূপ।... হৃদয়ের শোণিতদান, যে উদ্দেশ্যে পূজা সে উদ্দেশ্যে আপনার শরীর-মন সম্পূর্ণ উৎসর্গ না করিলে কোনপ্রকার শক্তিপূজাতেই ফল-সিদ্ধি অসম্ভব।" ভারত-সন্তানগণ সর্ববিধ স্বার্থত্যাগ করিয়া দেশমাতৃকার চরণে আত্ম-নিবেদন করিতেছে—শক্তিরূপিণী মায়ের মহা-পূজায় নিরত হইয়াছে। মা তাহাদের পূজায় প্রসন্না হইয়াছেন—সারা দেশবাসীর অন্তরে তাহাদেব তেজবীর্যের, আত্মনিবেদনের ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে, দেশবাসীকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করিয়াছে এবং সব চেয়ে কল্যাণের কথা, ধর্মনির্বিশেষে সকল ভারতবাসীকে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছে। শক্তিপূজা আন্তরিক হইলে তাহার ফল এরূপ না হইয়া পারে না। জনসাধারণের চিত্তে আদর্শের বাস্তব-রূপায়ণের প্রভাব অপরিসীম। আজাদ-হিন্দ্ বাহিনীর বীরদের বিচারকালে যেদিন নেতাজীর নেতৃত্বাধীনে তাহাদের বীরত্বের কথা, দেশ-মাতার পূজায় তাহাদের আত্মনিবেদনের কথা বাস্তব ঘটনারূপে সর্বসাধারণের জ্ঞানগোচর হইয়াছিল, সেদিন ভারতের সর্বশ্রেণীর লোকের চিত্তে আত্মবিশ্বাসের যে বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিয়াছিল, সমকালীন সকলেরই নিকট তাহার বিপুলতা সুবিদিত।

শক্তিরূপিণী বিশ্বনিয়ন্ত্রী যেন তেজবীর্যরূপে, স্বার্থত্যাগরূপে, সঙ্ঘবদ্ধতারূপে ভারতবাসীর অন্তরে তাঁহার প্রকাশকে চির-অম্লান রাখেন। আর সেই সঙ্গে ভারতের দেবশিশুদের পৈতৃক সম্পদ সাত্ত্বিকতা-প্রসূত কল্যাণবৃত্তিরূপে তাহাদের হৃদয়াসনে চিরকাল যেন সুস্থিরা হইয়া অধিষ্ঠান করেন—আত্মরক্ষা বা অন্যায়ের প্রতিকারকল্পে অনিবার্য পরিস্থিতি ছাড়া আর কোন কারণে অন্যত্র ভারত যেন শক্তিপ্রয়োগ না করে। সনাতন ভারত অতীতে কখনো তাহা করে নাই, মায়ের কৃপায় ভবিষ্যতেও করিবে না।

চলার পথ চিরদিনই বন্ধুর। কিন্তু তাহারই উপর দিয়া, উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া ভারতের অগ্রগতি পরিণামে অপ্রতিরোধ্য হইবেই—দেশমাতৃকার সেবায় উৎসর্গীকৃত-প্রাণ, জাগরণ ও অভয়ের মূর্তবিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের এ অভয়বাণী শুনাইয়া গিয়াছেন। দীর্ঘ সহস্র বৎসরের নিদ্রায় অভিভূত ভারতের জাগরণের জন্য দেশের অসংখ্য সুসন্তান 'হৃদয়ের শোণিত দান', 'আপনার সমগ্র শরীর-মন সম্পূর্ণ উৎসর্গ' করিয়া গিয়াছেন, বর্তমানেও করিতেছেন। মা পূজায় প্রসন্না হইয়াছেন, জাগ্রত হইয়া বিশালকায় জাতি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে—"জাগ্রত ভারত আর নিদ্রাভিভূত হইবে না, পৃথিবীর কোন শক্তিই আর তাহাকে দাবাইয়া রাখিতে পারিবে না।"

মায়ের পূজা

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন: ছোট ছেলেকে মা খেলনা দিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছেন। ছেলে তাহা পাইয়া ভুলিয়া আছে, খেলা করিতেছে। মা নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহকর্মে রত। খেলা যখন আর ভাল লাগে না, খেলনা ফেলিয়া দিয়া ছেলে যখন মায়ের কাছে যাইবার জন্য 'মা-মা' বলিয়া কাঁদিতে থাকে, মা তখন সব কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসেন, ছেলেকে কোলে তুলিয়া লন।

জগজ্জননী আমাদের বিষয়রূপ খেলনা দিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছেন, আমরাও নাম-যশ, ধন-সম্পদাদি লইয়া খেলায় মাতিয়া

আছি। এসব যখন আর ভাল লাগে না, আমারা তখন মায়ের কাছে ফিরিয়া যাইতে চাই। এই ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রচেষ্টাই হইল মায়ের পূজা। তা সে মূর্তি গড়িয়া বাহ্যপূজানুষ্ঠানই হউক, বা মনে মনে মায়ের সচ্চিদানন্দসাগর-উদ্ভূত চিন্ময়ী মূর্তি চিন্তা করিয়া প্রাণকে ধূপরূপে, কাম-ক্রোধাদিকে বলিরূপে, মনকে অর্ঘ্যরূপে তাঁহার চরণে নিবেদন করিয়াই হউক। বহির্বিষয়ে আসক্ত, বহির্বিষয়ে বিক্ষিপ্ত মনকে গুটাইয়া আনিয়া মায়ের পাদপদ্মে স্থাপন করিতে—খেলা ভুলিয়া মায়ের কাছে যাইতে—যাহা কিছু সহায়ক, তাহা সবই মায়ের পূজা।

আমাদের 'আমি' বলিতে, আমাদের দেহ-মন-বুদ্ধি বলিতে, আমাদের খেলনা জগৎ বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, তাহা সবই হইল আসলে 'মা'! তিনি নিজেই এই জগৎ-রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন; আমরা যাহা কিছু দেখি, শুনি, চিন্তা করি, অনুভব করি—সবই মা, সবই মায়ের এক একটি রূপ—"নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্।" আমরা এই সত্য প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, তাই তাঁহাকে নানারূপে দেখি, আর তাঁহাকে বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনা ভাবিয়া তাহাতে জড়িত হই। ইহারই নাম খেলা; আর সত্যদৃষ্টিলাভের পথে আগাইয়া যাওয়াই মায়ের কোলে ফিরিয়া যাওয়া।

যাঁহাকে জগতের চরম সত্য বলা হয়, নিজেকে বিচিত্র বিশ্বরূপে প্রকাশ করিবার শক্তি তাঁহার আছে। সেই শক্তিবলে তিনি যখন নিজেকে বিশ্বরূপে প্রকাশিত করিতে চান বা করেন, তখনই আমরা তাঁহাকে 'মা' বলি। যখনই নির্গুণ নিষ্ক্রিয় সচ্চিদানন্দ-সাগরে ইচ্ছা-তরঙ্গের প্রথম বিকাশ হয়—'একোঽহং বহু স্যাম্', তখনই তিনি 'মা'। তখন হইতে যতক্ষণ বহুত্বের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ চলে, যতক্ষণ তিনি নিজ শক্তির প্রকাশ ও প্রয়োগ করেন, ততক্ষণই তিনি 'মা'। এই মা-ই নিজেকে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বররূপে, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের মূর্ত কর্তা রূপে প্রকাশ করেন—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরেরও জননী তিনি—"বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ। কারিতাস্তে…।" আবার মা যখন আমাদের খেলাঘর ভাঙ্গিয়া দেন, বিশ্বজগৎকে, আমাদিগকে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে—সব কিছুকে তখন মা মিশাইয়া নেন নিজের মধ্যে; ছেলেদের লইয়া, সৃষ্টির সব কিছুকে লইয়া মা নিজেও মিশিয়া যান তাঁহার শাশ্বত স্বরূপে—নিষ্ক্রিয় নির্গুণ সত্তায়, ব্রহ্মে। আমরা কি তখন থাকি না? মা থাকেন না? মা তাঁহার বহু সন্তানকে সেখানে লইয়া গিয়াছেন, সেখানকার কথা আমাদের কাছে বলিবার জন্য আবার ফিরাইয়াও আনিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকেও লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছেন, সবই থাকে; কিভাবে থাকে, সে থাকা কেমন, তাহা অবশ্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তবে এটুকু বলিয়াছেন, আমরা যাহাকে 'থাকা' বলি, 'থাকিয়া আনন্দ করা' বলি, সে থাকার চেয়ে মায়ের শাশ্বত স্বরূপে মিশিয়া থাকা আরো স্পষ্টভাবে থাকা, সে আনন্দের চেয়ে মায়ের শাশ্বত স্বরূপে মিশিয়া থাকার আনন্দ কোটিগুণ বেশী। আর মা? বলিয়াছেন, মা-ও থাকেন বৈকি, তখন চরম সত্তার সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া থাকেন; ব্যবহার না করিলেও শক্তিমানের মধ্যে শক্তি থাকেই। সাপ যখন চলিতেছে, তখন আমরা তাহার মধ্যে শক্তির বিকাশ দেখিতে পাই; সাপ যখন স্থির হইয়া শুইয়া থাকে, তখন তাহার মধ্যে

শক্তির বিকাশ দেখিতে পাই না সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কি একথা বলা চলে যে তাহার চলার শক্তি তখন নাই? সব দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব একথা বলিয়াছেন।

বাহিরে মূর্তিপূজার, এবং হৃদয়ে চিন্ময়ী মূর্তিতে মানসপূজার মতই, ধ্যান-যোগাদি সহায়ে আমাদের 'আমি'-কে বলি দিয়া মায়ের শাশ্বত নির্গুণ স্বরূপে মিশিয়া যাওয়ার প্রচেষ্টাও মায়ের পূজা—শ্রেষ্ঠ পূজা। শ্রেষ্ঠ পূজা, কারণ মায়ের কোলে ফিরিয়া যাওয়ার পথে 'আমি'-র বলি-ই হইতেছে শ্রেষ্ঠ উপায়। 'আমি'-কে মার কাছে বলি দেওয়া মানে 'আমি'-র চারিদিকে মন বুদ্ধি প্রভৃতির যে বেড়াখানি আমাদিগকে মায়ের শাশ্বত স্বরূপের সঙ্গে আলাদা করিয়া রাখিয়াছে, 'স্বার্থ-সাধ-মান' চূর্ণ করিয়া নির্মমভাবে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা।

এই 'আমি' খেলনা ও খেলাঘরের সঙ্গে নিজেকে যত বেশী জড়াইয়া ফেলে, ততই তাহার চারিদিকের বেড়া দৃঢ়তর হয়। নিত্য নূতন খেলনা পাইবার ইচ্ছা—বাসনা—তাহাকে মায়ের কথা তত বেশী করিয়া ভুলাইয়া দেয়। আবার এই চাওয়া যতক্ষণ আছে, দুঃখের হাত হইতে, অতৃপ্তির হাত হইতে রেহাই নাই কাহারো। আনন্দময়ী মা সর্বত্রই আছেন, তবু আনন্দের আশায় সেকথা ভুলিয়া খেলার ভিতর আনন্দ খুঁজিতে যাইয়া বারে বারে আঘাত খাইয়াও আমাদের হুঁশ হয় না, আমরা খেলা ছাড়িতে চাই না। ভাবি, এর পরের খেলাটি একটানা আনন্দের অবলম্বন হইবে নিশ্চয়ই। একটা ছাড়িয়া আর একটা খেলনার পিছনে আশায় আশায় ছুটি আমরা. 'কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরম্' 'আশাপাশ-শতৈর্বদ্ধাঃ'। এভাবে শুধু একটি জন্ম নয়, জন্মের পর জন্ম ছুটি। একটি জন্মের শেষে সে জন্মের খেলার স্মৃতিটুকু সূক্ষ্মাকারে, সংস্কারাকারে পোঁটলা বাঁধিয়া সঙ্গে লইয়া পরজন্ম আরম্ভ করি।

এই সংস্কারের বোঝা মাথায় লইয়া দিনে দিনে তাহার ভার বাড়াইতে বাড়াইতে চলিতে চলিতে কোন সার্থক জন্মে. কোন শুভলগ্নে আমরা হঠাৎ সচেতন হই আমাদের প্রচেষ্টার ব্যর্থতায়। খেলাকে তখনই সত্যই ছেলে-খেলা বলিয়া মনে হয়। তখন যযাতির মত বুঝিতে পারি ভোগের দ্বারা ভোগের ইচ্ছা কমে না কখনো, বাড়িয়াই চলে, অতৃপ্তির আগুনে ইন্ধন জোগাইয়া তাহা হৃদয়কে পুড়াইয়া ছারখার করে—"ন যাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে।" আর জীবনপথচারী 'আমি'কে এই চাওয়ার বোঝা, সংস্কারের বোঝা বাড়াইবার মূল কর্তা জানিয়া তখন কবির ভাষায় বলিয়া উঠি, 'আমি যত ভার তুলেছি মাথায় সকলি হয়েছে বোঝা…এ-বোঝা আমার নামাও…ভারের বেগেতে চলেছি কোথায়, এ যাত্রা মোর থামাও!'

জীবনে তখনই শুভ মুহূর্তের উদয় হয়। খেলা আর ভাল লাগে না তখন। তখন চোখ তুলিয়া অসত্য হইতে সত্যের দিকে, সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব হইতে চির-আনন্দের দিকে—মায়ের দিকে চোখ ফিরাই আমরা।

তখনই আমরা মায়ের পূজামণ্ডপে প্রবেশ করি। জীবনে তখনই ওঠে ঝড়, বাধে সংঘর্ষ, বাধে সংগ্রাম। একদিকে উজান পথে চলার তীব্র ইচ্ছা, অপর দিকে সে পথ হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য লক্ষ লক্ষ জীবনপথে সঞ্চিত খেলাঘররূপ জগতের স্মৃতির, সুখ-স্মৃতির আকুল প্রচেষ্টা। এই সংগ্রামেরই

নাম সাধনা, এই সংগ্রামের পথই ধর্মপথ, এই সংগ্রাম করাই হইতেছে যথার্থ ভগবদারাধনা, মায়ের পূজা—'পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার।' বারে বারে জয়-পরাজয় আসে এ সংগ্রামে। মাঝে মাঝে মনে হয়, জয় বুঝি অসম্ভব; মনে হয় এ খেলাঘর ছাড়িয়া মায়ের কোলে ফিরিয়া যাওয়ার পক্ষে, দেহ-মন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে দীর্ঘকাল-বিজড়িত 'আমি'র বেড়া ভাঙার পক্ষে, মহাসাগরের বুকে সদা-আন্দোলিত তরঙ্গের আন্দোলন-ইচ্ছা ও তরঙ্গত্ব ছাড়িয়া মহাসাগরত্ব লাভের পক্ষে এই 'আমি'র মধ্যে সীমিত শক্তি কত নগণ্য! কিন্তু দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া আন্তরিকভাবে যে লাগিয়া থাকে, 'অনন্তবীর্যা' মা তাহাকে শক্তি দেনই—"সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।" আর এই মহাপূজায়, এই সংগ্রামে সীমিত 'আমি'-র শক্তির তুচ্ছতা বোধে আসা মাত্র শক্তির জন্য আমরা মায়ের মুখের দিকে না চাহিয়া পারিও না। দীর্ঘকাল পূর্বে শারদীয়া সংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকায় 'ঘট ভরিতে'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম। তাহার ভিতরকার কয়েকটি কথা এখনো মনে গাঁথিয়া আছে—'মায়ের পূজা করিবার ইচ্ছায় পূজার অন্যান্য আয়োজন সারিয়া ঘট ভরিতে আসিয়া জীবনের চোরাবালিতে পা আটকাইয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় অসহায় ভাবে দাঁড়াইয়া এখন মা-মা বলিয়া ডাকা ছাড়া আর যে কি করিতে পারি, তাহা তো বুঝিতে পারিতেছি না!' এ অবস্থায় 'চরাচর-জগদ্ধাত্রী' 'সৃষ্টি-স্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতা' মাকে ডাকা ছাড়া মানুষ আর করিবেই বা কি?

মা অন্তরেই প্রচ্ছন্ন আছেন, আমরা দেখিতে পাই না। মনেপ্রাণে ডাকিতে পারিলে হৃদয়পদ্ম আলো করিয়া সন্তানের জন্য 'সদাদয়ার্দ্রচিত্তা' মা আসেন, প্রকাশিত হন। তাঁহার চরণের স্পর্শ পাইয়া 'দেব্যা বাহন-কেশরী'র মত অমিত শক্তি লইয়া এই সীমায়িত 'আমি' মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। তখনই শুরু হয় সংগ্রামের শেষ পর্যায়। পরাজয়ের প্রশ্ন আর ওঠে না তখন, পরমানন্দে নাচিতে নাচিতে সে তখন ছুটিয়া চলে বিজয়ের পর বিজয়ের তালে।

সংগ্রামশেষে, পূজাশেষে মায়ের কৃপায় সে শুদ্ধ 'আমি'র 'জলের ওপর আঙুল দিয়ে কাটা দাগের' মত মায়ের সঙ্গে পার্থক্যের অতি ক্ষীণ একটু রেখা রাখিয়া দেয় মায়ের কোলে বসিয়া অন্তর-বাহির সর্বত্রই তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার স্থূল-সূক্ষ্ম সর্ববিধ জগতের খেলাঘরের খেলা (তখন যথার্থই) উপভোগ করিবার জন্য, বা মায়ের ইচ্ছায় তাঁহার কাজ করিবার জন্য। আর না হয়, মায়েরই কৃপায় পার্থক্যের শেষ রেখাটুকুও মুছিয়া ফেলিয়া তাঁহার সঙ্গে মিশিয়া যায় তাঁহার শাশ্বত স্বরূপে—'অখণ্ডম্', 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্' 'নির্বিশেষং', 'সদসদ্-বিহীনম্' ভাবাতীত সচ্চিদানন্দ-সাগরে।

"'মা, মা'—শেষে দেখে, মা আমার জগৎ জুড়ে! সব এক হয়ে দাঁড়ায়। এই ত সোজা কথাটা!"

—শ্রীশ্রীমা

আগমনী

শিবদাস

মানস আকাশে জ্ঞান-আনন্দ-সূর্য
ভক্তি-শেফালিদলে ছুঁয়ে যায় হর্ষে,
অমিয়-পরশে তার আঁখি মেলি ঊর্ধ্বে
স্নিগ্ধ সুরভিকণা দিকে দিকে বর্ষে।
তোমার চরণ-ধ্যানে বিগলিত ঝর্ণা
মর্মে বহিয়া চলে অপরূপ-বর্ণা।
বুকে তার ক্ষণে ক্ষণে শতধারে ঝলসি
অপরূপ রূপরাশি নাচি চলে উলসি;
কূলে কূলে লীলা-ছলে শিলাতলে আসিয়া
মূর্ছিত ভাবরাশি ওঠে সদা ভাসিয়া;
ধৌত গগন কোলে স্মৃতিময় অভ্র
দ্যুলোকের শোভা রচে সুবিমল, শুভ্র।
উচ্ছল জলরাশি অবিরাম ঝরিয়া
কলতানে বোধনের ঘট দেয় ভরিয়া—
হাসি' তারে ছুঁয়ে যায় আনন্দ-সূর্য।

দৈত্য-বিনাশী করে ধরি রণ-তূর্য
এস রণ-রঙ্গিণী প্রলয়ের ছন্দে,
প্রলয়-পিপাসু চিত সে মূরতি হেরিয়া
চরণে পড়িবে লুটি ভাসি মহানন্দে।
অক্ষয় দুর্লভ পদরেণু পরশে
দুর্জয় অনুরাগ দেখা দিবে হরষে;
প্রলয়-ঝঞ্ঝা-মাঝে যে চিরশান্ত
চকিতে পশিবে সে যে কৃপাণের প্রান্ত।
লুণ্ঠিত রিপুদলে হেরি হৃত-সর্ব
তাণ্ডব-নর্তনে ফিরি মোর গর্ব
তপ্ত রুধির-ধারে অঞ্জলি ভরিয়া
সিঞ্চিত করপুটে লবে তোমা বরিয়া।
আনন্দ-প্রেম-গান-মুখরিত গগনে
বরাভয় কর তুলো সেই শুভলগনে—
আগমনী-গানে মিশে যাবে রণ-তূর্য।

"কিমেতন্মুনিসত্তম ?"

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

"হে মুনিশ্রেষ্ঠ, ইহা কি ব্যাপার ?"

রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি একই সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়া দ্বিজবর মেধসমুনিকে এই প্রশ্ন করিতেছেন। চণ্ডী-গ্রন্থের উপক্রম। সঙ্কটটি সকল মানুষের কাছেই কোনও না কোনও সময়ে উপস্থিত হইতে পারে—ধনী-দরিদ্র, বিদ্বান-মূর্খ, অভিজাত-নিম্নজাতি বিচার করিয়া আসে না। উহা বাহিরের কোনও সঙ্কট নয়—অন্তর্জীবনের সঙ্কট—বুদ্ধির দ্বন্দ্ব—জ্ঞাতের সহিত অজ্ঞাতের সংঘর্ষ। মানুষ তো বটেই, "পশুপক্ষিমৃগাদয়:"—ভূচরখেচর জীব-জন্তুও এই দ্বন্দ্ব হইতে নিস্তার পায় না। তবে তাহারা এই দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে অবহিত নয়, কেননা তাহাদের বুদ্ধি এই দ্বন্দ্বকে বুঝিবার উপযোগী বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই। জীবনিবহের ক্রম-বিকাশের সিঁড়িতে মানুষ বুদ্ধির দিক দিয়া বেশ উপরের ধাপ অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এই উপরের ধাপে বসিবার বহুতর সুবিধাগুলি যেমন সে ভোগ করিতে পারে, তেমনি উহার অসুবিধাগুলিও তাহাকে স্বীকার করিতে হয়। পালাইবার উপায় নাই। রাজা সুরথ ও বণিক সমাধিকে একই কালে যে দ্বন্দ্ব অভিভূত করিয়াছিল উহা ঐ অসুবিধাগুলির অন্যতম—বুদ্ধির সঙ্কট—বিবেকের সংঘর্ষ—অন্তর্জীবনের দুর্বোধ্য প্রহেলিকা।

"কিমেতন্মুনিসত্তম ?" (চণ্ডী, ১৷৪২) হে বনবাসী জ্ঞানতাপস, বড় বিপদে পড়িয়া আপনার শরণ নিলাম। না, প্রাণ-সঙ্কট নয়, ক্ষুধার জ্বালা বা সাংসারিক শোকতাপও নয়। সেগুলি পার হইয়া আসিয়াছি, সহ্য করিতে পারিয়াছি, কর্মের ফল বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। কিন্তু বর্তমান সঙ্কটের প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা। ইহা বুদ্ধিকে গুলাইয়া দিতেছে, আত্মবিশ্বাস শিথিল করিতেছে, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে সংশয় তুলিতেছে। সমগ্র আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অবাস্তবতায় লইয়া যাইতেছে।

হে মুনিবর, শুনুন তবে খুলিয়া বলি। আমার নাম সুরথ। আমি ছিলাম রাজা—শুধু দু-চারটি পরগনার ভুঁইয়া নয়, "সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে"—বিপুল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি। ধর্মশাস্ত্রের বিধানানুসারে প্রজাপালন করিতেছিলাম। রাজ্যলক্ষ্মীর প্রসাদ সর্বত্র বিস্তারিত। জ্ঞানত: কোনও অন্যায় করি নাই। এমন শান্তিময় সমৃদ্ধিময় সর্বজনের কল্যাণকর রাজশাসন বহুকাল ধরিয়া চলাই তো সঙ্গত ছিল। কিন্তু চলিল কি? না। ঈশান কোণে হঠাৎ কালো মেঘ দেখা দিল। উঠিল ঝড়—অচিন্তিত দুর্ভাগ্যের ঝড়। সেই ঝড়ে সব কিছু ধূলিসাৎ হইল। অজাতশত্রুর তো শত্রু থাকা উচিত নয়। তবুও অকস্মাৎ নানা দিক হইতে শত্রুর আবির্ভাব হইল। যাহা হউক, যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া তাহাতেই উদ্যত হইলাম। সেনাবল আমার কম ছিল না। তথাপি পরাজয় ঘটিল। ঘটা উচিত নয় তবুও ঘটিল। কয়েক সহস্র বিদেশী সৈনিক আমার বিপুল বাহিনীকে পরাভূত করিল। রাজ্যের বহুলাংশ শত্রুরা দখল করিল। ভাবিলাম রাজধানী এবং তাহার চারিপাশের এলাকায় অবশিষ্ট সৈন্যদের দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিয়া সেখানেই রাজশক্তি রক্ষা করিব। কিন্তু হায়,

তাহাও সম্ভবপর হইল না। শত্রুরা সেখানেও হানা দিল। উপরন্তু নিজের বিশ্বস্ত পাত্র-মিত্র অমাত্যেরা শত্রুর সহিত যোগ দিল; রাজ-সিংহাসন গেল, রাজকোষ গেল, রাজগৌরব গেল।

কোনও মতে একটি ঘোড়ায় চড়িয়া একাকী পলায়ন করিয়া গহন বনে আশ্রয় লইলাম।

হে মুনিবর, আজ যে রাজা কাল সে যদি পথের ভিখারী হয়, তাহাতে ভারতবর্ষে লোকে দুঃখ প্রকাশ করে কিন্তু বিস্মিত হয় না। ভারতের নর-নারী কর্মবিধানে বিশ্বাসী। ভগবানের সংসারে অন্যায় কিছু ঘটে না। কর্ম-ফলে আমারও বিশ্বাস ছিল; সেজন্য এত বড় ভাগ্যবিপর্যয়ে মুষড়াইয়া পড়ি নাই। ভাবিলাম সুখ সম্ভোগ তো বহুদিন করিয়াছি, এখন যদি চপলা লক্ষ্মী বিরূপা হন তাহাতে নালিশ করিবার কিছু নাই। পূর্বকৃত কোনও দুষ্কর্মের ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে অপ্রতিরোধ্যকে সহ্য করিয়া যাওয়াই ভাল।

বনে ঘুরিতে ঘুরিতে হে মহর্ষি, আপনার আশ্রম দেখিতে পাইলাম। কী আশ্চর্য শান্ত পরিবেশ! আপনার সহৃদয় আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। ধনজন অমাত্য বিভবে পরিবৃত থাকিয়া জীবনের অধিকাংশ কাল কাটিয়াছে। ঐশ্বর্যহীন, সাংসারিক লেনদেনহীন, সরল অনাড়ম্বর তপোবনের জীবন কত মধুর, কত শান্তিময় হইতে পারে তাহার কিছু আস্বাদ পাইয়া আনন্দাভিভূত হইলাম, ভাবিলাম অহো ভগবৎ-কৃপা! যত কিছু কষ্ট পাইয়াছি, অপমান লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছি, এখানকার এই তপোবনের নিরুদ্বেগ চিত্তপ্রসাদের তুলনায় তাহা কিছুই নয়। ভাবিলাম এই চিত্তপ্রসাদকে যে কোনও প্রকারে স্থায়ী করিতে হইবে। সংসারের উর্ধ্বে সংসারাতীতকে উপলব্ধি করিয়া মনুষ্যজীবন সার্থক করিতে হইবে।

এক দিন—দুই দিন—তিন দিন বেশ কাটিল। সূর্যোদয়ের পূর্বে তপোবনবাসীদের বেদপাঠ হৃদয়তন্ত্রীতে তুলিত অপূর্ব অনুরণন। হোমাগ্নিতে আহুত ঘৃত পুরোডাশের দিব্যগন্ধ সমগ্র দেহমনকে সাত্ত্বিকভাবে আমোদিত করিত। ঋষিবালকদের কমনীয় মুখশ্রী অন্তরে এক স্নিগ্ধ স্বর্গীয় প্রফুল্লতা উদ্বুদ্ধ করিত। আরণ্যতটিনীতে পুণ্যস্নান, মধ্যাহ্নে বাহুল্যহীন আহার, শাস্ত্রচর্চা, উপাসনা—এই সকল দিন-চর্যার মধ্য দিয়া মন এক অভিনব আনন্দলোকে বিচরণ করিতেছিল।

হায় রে মানুষের আশা, হায় রে তাহার সঙ্কল্প! আসিল চতুর্থ দিন। অন্তরাকাশে সেদিন যেন সূর্য মেঘে আবৃত। তপোবনে রহিয়াছি কিন্তু মন সেদিন আর তপোবনে নাই। মন ছুটিয়া গিয়াছে পিছে-ফেলিয়া-আসা রাজধানীতে, রাজপ্রাসাদে, প্রমোদভবনে, রাজকোষে, দার-পুত্র-স্বজন-বান্ধবের মণ্ডলীতে। জানি সেখানে দরদী বন্ধু আর কেহ নাই, তবু তাহাদেরই মুখগুলি মানসপটে ভাসিতেছে। জানি, যে রাজত্ব হারাইয়াছি তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না, তবু সেই রাজত্বেরই স্বপ্ন সারা চিত্ত জুড়িয়া জটলা করিতেছে। আসিল পঞ্চম দিন। পাগল মন আরও পাগল হইয়াছে। দুশ্চিন্তার পর দুশ্চিন্তায় মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন। আচ্ছা, যাহারা একদিন আমার অনুগত ছিল তাহারা তো এখন বিজেতা শাসকের আজ্ঞাবাহী। আমার কথা কি তাহাদের এখন মনে পড়ে? নূতন রাজার শাসনে প্রজাবৃন্দ কেমন আছে এখন? রাজ-পুরীর চুনকাম কি খসিয়া গেছে? অশ্বশালায় আমার বহু আদরের তেজীয়ান ঘোড়াগুলি কি দানাপানি পাইতেছে? সেই সর্বদা মদক্ষরণকারী শূর নামক বিশালকায় হস্তীটি

শত্রুগণের কবলে পড়িয়া শুকাইয়া মরিতেছে না তো? আর অতি আয়াসে বহুকাল ধরিয়া সঞ্চিত আমার সেই বিপুল ধনভাণ্ডার উচ্ছৃঙ্খল-ভাবে ব্যয়শীল বর্তমান মালিকরা বেপরোয়া শূন্য করিয়া ফেলিতেছে না কি? এইরূপ কত না চিন্তা কত না আশঙ্কা চিত্তকে ব্যাকুল করিতে লাগিল। হাসিব কি কাঁদিব? জানি, আলোক অন্ধকারে লীন হইয়াছে, তবুও কেন আলোকের আশা? জানি, স্বার্থপরতার কূপে ভালবাসার অতল সমাধি ঘটিয়াছে, তবুও কেন একদা-প্রিয়জনের প্রেতাত্মাকে আঁকড়াইতে যাওয়া?

নিজের অন্তর্দ্বন্দ্ব লইয়া যখন এমনই ব্যাকুল তখন হে মুনিবর, আপনার আশ্রমের সীমানায় বনপথে এই মহাজনের সঙ্গে দেখা। পথচারীর বড় শ্রান্ত ক্লান্ত দুঃখপীড়িত চেহারা দেখিয়া আপনার জ্বালা ভুলিয়া ইঁহার প্রতি সমবেদনা অনুভব করিলাম। শুধাইলাম, মহাশয় আপনি কে? এই সুন্দর বনে আপনার আগমনের হেতু কি? আমার মিষ্ট কথায় ইনি বড় তুষ্ট হইলেন মনে হইল। বুঝিলাম ইনি শুধু ক্ষুধাতৃষ্ণা-পীড়িত নন নিদারুণ প্রেম-বঞ্চিতও বটেন। অন্তরের রুদ্ধ আবেগ সামলাইয়া কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ইনি নিজের কাহিনী যাহা বলিলেন তাহার নিষ্কর্ষ এই :— বেশ ধনী বংশে ইঁহার জন্ম! জাতিতে শ্রেষ্ঠী। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বিপুল সম্পত্তি ব্যতীত নিজে ব্যবসাবাণিজ্য করিয়াও বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। লক্ষ্মীশ্রীমণ্ডিত গৃহ স্ত্রীপুত্র-আত্মীয়-স্বজনে পরিপূর্ণ। সংসারে সুখের পানপাত্র উপচিয়া পড়িতেছে। হঠাৎ ঈশান কোণে কালো মেঘ দেখা দিল। উঠিল ঝড়। সম্পদই হইল কাল। বিত্তলোভে কল্যাণী বনিতা, প্রাণপ্রিয় আত্মজগণ, অপর আত্মীয় বান্ধব সকলেই জোট করিয়া বিপক্ষতা আরম্ভ করিল। তাহাদের দাবীর অন্ত নাই। অবশেষে ছলে বলে কৌশলে সকল কর্তৃত্ব, সকল অধিকার তাহাদেরই করতলগত হইল। অপমান, লাঞ্ছনা, নিপীড়ন সহিয়া ইনি সংসারে বীতরাগ হইয়া যেদিকে দুই চোখ যায় সেইদিকে চলিতে চলিতে অবশেষে এই বনে উপনীত।

হায়রে, নিষ্কৃতি কি আছে? আমার মনের আঙ্গিনায় যাহা ঘটিয়াছে ইঁহার মনেও শুরু হইল সেই মনের তাণ্ডব কারসাজি। মন প্রশ্ন তুলিল, আহা, বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছি অবধি ছেলেদের খবর জানি না। তাহারা এখন কেমন আছে, একবারটি যদি খবর পাইতাম খবর সংগ্রহের কোনও উপায় কি নাই? তাহার পর ব্যাকুলতা জাগিল—আহা, বহুদিনের জীবনসঙ্গিনী সেই প্রিয়তমা পত্নী—তিনি কি আমাকে একেবারেই ভুলিয়া গেছেন?—কিন্তু তিনি যে আমার অর্ধাঙ্গিনী, তাঁহাকে ভুলি কি করিয়া? দুর্ভাবনার পর দুর্ভাবনা উঁকি মারিতে লাগিল :—আহা অমন যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন প্রাসাদোপম বাড়ীটি ছাড়িয়া আসিয়াছি—যাহার প্রতিটি ইঁট ছিল আমার এক একখানি বুকের পাঁজর—উহার এখন কি অবস্থা? ঝাঁটপাট পড়িতেছে? ভৃত্যগণ বাধ্য আছে তো? বন্ধুবান্ধবগণের জমায়েৎ পূর্ববৎ চলিতেছে তো? আমার কথা কি তাহাদের একটুও মনে পড়িতেছে না?

রাজা সুরথ মেধস মুনিকে বলিয়া চলিলেন,—মহাত্মন, এই বৈশ্যপ্রবরকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,

যৈর্নিরস্তো ভবাঁল্লুব্ধৈঃ পুত্রদারাদিভির্ধনৈঃ।
তেষু কিং ভবতঃ স্নেহমনুবধ্নাতি মানসম্॥

(চণ্ডী ১।২৭)

"ধনলোভী আপনার স্ত্রী এবং পুত্রগণ

আপনাকে বহু কষ্ট দিয়া বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। অথচ তাহাদেরই জন্য আপনার মনে এখন এত স্নেহ উথলাইয়া উঠিতেছে কেন?"

বৈশ্যবর আমার কথা শুনিয়া একটু থমকাইয়া গেলেন। পরে বলিলেন, তাই তো, এই 'কেন' প্রশ্ন আগে তো ভাবিয়া দেখি নাই। সত্যই এ বড় আশ্চর্য ব্যাপার। পিতৃস্নেহ, পত্নীপ্রেম, বন্ধুপ্রীতি এ সবের যাহারা কোনই মূল্য দেয় নাই সেই অতি নিষ্ঠুর, অধার্মিক, স্বার্থান্ধ আত্মীয়গণের জন্য আমার মন কেন এত উতলা হয়? তাহাদের অভিসন্ধি চেষ্টা সবই তো জানি, তবুও তাহাদের প্রতি কেন এই মায়া? যাহাদের বিষনিশ্বাসে জীবন শুকাইয়া গেল তাহাদেরই বিরহে কেন এখন মমতার নিশ্বাস পড়ে?

কিমেতন্নাভিজানামি জানন্নপি মহামতে।
যৎ প্রেমপ্রবণং চিত্তং বিগুণেষ্বপি বন্ধুষু॥
তেষাং কৃতে মে নিঃশ্বাসো দৌর্মনস্যঞ্চ জায়তে॥

চণ্ডী ১।৩২,৩৩

হে মুনিবর, এখন দেখুন, আমাদের উভয়েরই অবস্থা সমান। বিবেক বুদ্ধি বিচার মানসিক দৃঢ়তা সব যেন লোপ পাইতে বসিয়াছে। শ্রেয়ঃ কি তাহা জানি, আপনার এই তপোবনে তাহা চোখেও দেখিতেছি, অথচ প্রেয়ের আকর্ষণে হৃদয়ে দারুণ বিপ্লব উপস্থিত। দোটানায় পড়িয়া উভয়েই আমরা জীবন্মৃত। অন্তরের দুর্বলতা ও দীনতা আবিষ্কার করিয়া আমরা লজ্জায় মরিয়া যাইতেছি। এখন আমাদের উভয়েরই মনে এই প্রশ্ন জাগিয়াছে, কিমেতৎ—ইহা কি ব্যাপার? কেন মানুষ বুঝিয়াও বুঝেনা, জানিয়াও জানেনা? কেন সে এত দুর্বল, এত ভ্রান্ত, এত মোহগ্রস্ত? কেন? কেন? কেন? কিমেতৎ মুনিসত্তম? হে মুনিশ্রেষ্ঠ, এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান আপনার ন্যায় জ্ঞানী-পুরুষই দিতে পারেন বলুন, ইহা কি ব্যাপার?

সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি একই অন্তর্দ্বন্দ্বে দিশাহারা হইয়া মেধস মুনির নিকট যে জিজ্ঞাসা উপস্থিত করিয়াছিলেন, সমগ্র চণ্ডীগ্রন্থের লক্ষ্য তাহারই আধ্যাত্মিক সমাধান। জগৎসংসারের সর্বস্তরেই একটি পারস্পরিক বিরোধিতা বর্তমান। জন্ম ও মৃত্যু, আলোক ও অন্ধকার, উল্লাস ও বেদনা, আশা ও নৈরাশ্য, উন্নতি ও অবনতি, জ্ঞান ও অজ্ঞান, ভালবাসা ও ঘৃণা, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ। সৃষ্টিপ্রবাহ এই দ্বন্দ্বকে অনবরত সঙ্গে লইয়াই চলিতেছে। বিশ্ববিধাতা সংসারের নিয়মের মধ্যেই এই দ্বন্দ্বকে ঢুকাইয়া রাখিয়াছেন। উহাকে বাদ দিয়া সৃষ্টি দাঁড়াইতে পারে না। ইতর প্রাণীর এই দ্বন্দ্বকে বুঝিবার ক্ষমতা নাই। তাহাদের জীবনে উহা স্বাভাবিক ভাবে অনুপ্রবিষ্ট। সুখ-দুঃখ, নিরাপত্তা-বিপদ, উত্থান-পতন ইতর প্রাণীর কাছে আসে, উহাদিগকে অভিভূত করে। সে কোনও প্রশ্ন তুলে না। শতসহস্র মানুষও ইতর প্রাণীরই মতো ঐ দ্বন্দ্বকে বিনা প্রশ্নে মানিয়া লইয়া হাসে কাঁদে, উঠে পড়ে, বাঁচে মরে। সংসারের নিয়মকে বিনা প্রশ্নে স্বীকার করিয়া চলার নামই মোহ। ইতর প্রাণী এবং বহুতর মানুষের মধ্যে মোহগ্রস্ততার ক্ষেত্রে বিশেষ তফাৎ নাই। বরং কখনও কখনও ইতর প্রাণী এ বিষয়ে মানুষের অপেক্ষা ভাল। মানুষের মতো সে জঘন্য স্বার্থপর নয়। পক্ষান্তরে মানুষ কখনও কখনও একান্তই পশ্বাধম।

বিশ্ববিধাতা সংসারে এই পারস্পরিক বিরোধিতা কেন আনিয়াছেন, এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য বিদ্যাভিমানীরা ঝুড়ি ঝুড়ি বই লিখিয়াছেন। কিন্তু কোন কেতাবেই ইহার সুসমাধান পাওয়া যায় নাই। শব্দের শৃঙ্খলে সমস্যাটিই অধিকতর জটিল হইয়া উঠিয়াছে। না, সংসারের প্রচলিত কোন যুক্তিতর্ক নীতি দর্শন দিয়া এই কেন প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে না। সমাধান—দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করিয়া দ্বন্দ্বাতীত সত্যে উপনীত হওয়া। মানুষ তাহা পারে, কেননা মানুষেরই ভিতরে সেই দ্বন্দ্বাতীত সত্য বিরাজ করিতেছে। মানুষ সমকালে সংসারী ও অসংসারী। সাংসারিত্বকে ডিঙাইয়া নিজের অসংসারী স্বরূপে দাঁড়াইতে পারিলে একমুহূর্তে সকল জিজ্ঞাসার সমাধান হইয়া যায়।

জগৎসংসারের দ্বন্দ্বময়তাকে যে পর্যবেক্ষণ করিতে পারে সে ধন্য। রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি ধন্য—কেননা তাঁহারা এই দ্বন্দ্বকে ধরিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কিমেতৎ ? "ইহা কি ব্যাপার ?" পক্ষান্তরে বিদ্যাবাচস্পতিরা প্রশ্ন করেন, কথমেতৎ ? "কেন ইহা হয় ?" তাঁহাদের প্রশ্ন সর্বনাশা প্রশ্ন—কেননা ঐ প্রশ্নের উত্তর নাই, ঐ প্রশ্ন প্রশ্নটিকেই জটিলতর করিয়া তুলে। কিমেতৎ প্রশ্ন সার্থক প্রশ্ন। এই প্রশ্ন হইতেই মানুষের গভীর আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হয়। কিমেতৎ প্রশ্ন হইতেই মানুষের অন্তরে জাগে বিবেক, বৈরাগ্য, সত্যনিষ্ঠা, শম, দম, আত্মজিজ্ঞাসা, তত্ত্বানুভূতি ; জাগে ভক্তি, শরণাগতি ; আখেরে সম্ভবপর হয় মোহমুক্তি।

অন্তর্জীবনের সঙ্কট, বুদ্ধির দ্বন্দ্ব, জ্ঞাত-অজ্ঞাতের সংঘর্ষকে সে-ই ভয় পায়, যে প্রেয়কে আঁকড়াইয়া রাখিতে চায়। কিন্তু শ্রেয়ের স্বপ্ন যে দেখিয়াছে সে উহাদিগকে ভয় পায় না। উহারা তাহার আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষাকে বলবান করে। সে জানে উহাদিগকে তুচ্ছ করিয়া তাহাকে অপরিবর্তনীয় ভাগবত সত্যে পৌঁছিতে হইবে—যেখানে আলোক-আঁধার নাই, আকর্ষণ-বিকর্ষণ নাই, জন্মমৃত্যু নাই। সেই সত্যে পৌঁছিয়া সে নূতন করিয়া প্রশ্ন তুলে—কিমেতৎ ? অন্তর হইতে উত্তর পায়—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। যাহা কিছু অনুভূত হইতেছে সবই ব্রহ্ম।

সঙ্কল্প

(গান)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

আমি   চাইব…
তোর   কৃপার পরশ চাইব…
তুই   কাছেই আছিস্, তাই পারে তোর বাইব—
তোর   আশিস-বানে অপার টানে আমার তরী বাইব…
তুই   লুকিয়ে কোথায় থাক্‌বি—যখন তোরই স্বরে গাইব—
তোর   মন্ত্র-রাগে ছন্দ তোরি…প্রেম-সোহাগে জীবন-ভোরই গাইব?
কেবল   তোরেই যখন চাইব?

আশা   বুন্‌ব—
নিশায়   আশার উষাই বুন্‌ব…
তোর   চরণ যদি না-ই মেলে তায় গুন্‌ব…
তোর   আগমনী-চরণ-ধ্বনি মুখর মেলায় শুন্‌ব…
তায়   বাইরে যদি না-ই শোনা যায়—এ-অন্তরে শুন্‌ব—
যদি   তুই মা সেথায় দিস্ উঁকি—সেই রাগ-অঝোরে শ্রবণ ভরে শুন্‌ব…
রাতেও   রঙীন সুরই বুন্‌ব।

সবি   সইব—
যদি   আসে বেদন সইব—
আর   আলোক-বিলয় করব না ভয়, বইব—
তোর   অভয়-বলে অবহেলে সব পরাজয় বইব…
মেঘ   বাদল রাতে তোরি সাথে উছল কথা কইব—
মা তুই   একলা-পথের দোসর হ'লে মৌন ছলে অতল কথা কইব—
আমি   সেই আশে সব সইব।

"আমি ইয়াঙ্কিদের ভালবাসি"

স্বামী গম্ভীরানন্দ

এক

স্বামীজীকে পাই আমরা ধর্মাচার্য, বক্তা, লেখক, দার্শনিক ইত্যাদি রূপে। একটা সাধারণ মানবসুলভ দিকও যে তাঁহার ছিল, তাহা আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই। তিনি ছিলেন ক্ষমতাশীল গুরু, স্নেহময় ভ্রাতা, প্রেমময় বন্ধু; আর হাস্যরসোজ্জ্বল সারল্যমণ্ডিত বালকসুলভ ছিল তাঁহার চরিত্র। ধর্মকার্যে যখন তিনি নিরত থাকিতেন, তখন সে কার্যের ভিতর দিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তিধারা অপরের কল্যাণার্থ কার্পণ্যশূন্যরূপে নিঃস্যন্দিত হইত; হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ করিয়া তিনি স্বীয় ব্রত উদ্‌যাপিত করিতেন। ফলে তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। তখন শরীর-মনকে একটু অবসর দিবার জন্য সাধারণ মানুষেরই ন্যায় অনাবিল চিত্তবিনোদন, হাস্যকৌতুক ইত্যাদিতে রত হইতেন; তখন যেন আজে বাজে কথায়, হিজি বিজি কাজেই তাঁহার স্ফূর্তি! হয়তো একখানি হাস্যরসময় 'পাঞ্চ'-পত্রিকা বা ঐরূপ কোন প্রবন্ধাদি লইয়া পড়িতে বসিতেন এবং হাসিতে হাসিতে চোখে জল আনিয়া ফেলিতেন। তিনি নিজে জানিতেন যে তাঁহার স্বাভাবিক ঝোঁক হইতেছে গম্ভীর দর্শন ও ধর্মচিন্তার দিকে; তথাপি দেহধর্ম মানিয়া মাঝে মাঝে স্বভাবতই অনাবিল আনন্দের সন্ধানে ফিরিতেন। যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন ও ভালবাসিতেন তাঁহারাও তাঁহাকে বালকপ্রায় ক্রীড়ারত দেখিলে আনন্দ পাইতেন। আমেরিকার ভক্তদের লইয়া এই মানবলীলাই এখানে আমাদের অনুধ্যেয়।

ভাল মজার গল্প শুনিলে তিনি আহ্লাদে আটখানা হইতেন। আর এরূপ গল্প তিনি কখনও ভুলিতেন না। প্রয়োজনমত উহার পুনারাবৃত্তি করিয়া অপরকে হাসাইতেন। ক্যাম্ব্রিজের শ্রীযুক্তা ব্রীড্ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে যখন অ্যানিস্কুয়ামে শ্রীযুক্তা ব্যাগলীর গৃহে অতিথিরূপে অবস্থান করিতেছিলেন, স্বামীজীও তখন সেখানে থাকায় উভয়ের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠতা জন্মে। শ্রীযুক্তা ব্রীডই স্বামীজীকে সর্বপ্রথম বরফের উপর স্লেজ-যানে চড়াইয়াছিলেন।[১] তিনি ভগিনী নিবেদিতাকে পরে লিখিয়া জানাইয়াছিলেন:

"আমাদের মধ্যে অচিরে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল।...তিনি অ্যানিস্কুয়ামে একবার মাত্র বক্তৃতা দেন।...তখন তিনি বিশ্রাম উপভোগ করিতেছিলেন।...তিনি আমার দিকে ফিরিয়া বলিতেন, 'একটা গল্প শোনান না?' আমার মনে পড়ে, তিনি এক চীনার গল্প শুনিয়া খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন। সে শূকর-মাংস চুরি করিয়া ধরা পড়ে। বিচারক যখন বলিলেন যে, তাঁহার ধারণা ছিল চীনারা শূকরমাংস খায় না, তখন সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে বলিয়াছিল, 'ওঃ, আমি তো এখন মেলিকান (আমেরিকান) মহাশয়; আমি ব্রাণ্ডি খাই, আমি শূকরমাংস খাই, আমি সব

১। ইঁহার স্বামী চর্মব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে স্বামীজী লীন শহরে ইঁহাদের বাড়ীতে অতিথিরূপে থাকিয়া সেখানে বক্তৃতা করেন। ইনি ক্যাম্ব্রিজেও থাকিতেন।

খাই।'[২] কতবার আমি বিবেকানন্দকে ফিস-ফিস করিয়া বলিতে শুনিয়াছি, 'আমি মেলিক্যান!' তোমার মত যাহারা স্বামীজীর সহিত অত পরিচিত নহে তাহাদের কাছে এইসব কথা তুচ্ছ মনে হইবে। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি, তাঁহার সম্বন্ধে কোন কিছুই তোমার নিকট তুচ্ছ বা না-বলার মত বাজে নয়।

"আমি কানাডা দেশে রেড্ ইণ্ডিয়ানদের অধ্যুষিত 'সংরক্ষিত স্থানে' তিন বৎসর বাস করিয়াছিলাম। এই রেড্ ইণ্ডিয়ানদের গল্প শুনিতে স্বামীজী কখনও ক্লান্তিবোধ করিতেন না। আমার মনে আছে, একটা গল্প তাঁহার নিকট খুব মজাদার ছিল। একজনের স্ত্রী মারা গেলে তাহার শবাধারের জন্য সে কয়েকটি পেরেক চাহিতে ধর্মযাজকের নিকট আসিল। ঐজন্য অপেক্ষা করিতেছে, এমন সময় সে আমার রাঁধুনীকে জিজ্ঞাসা করিল, রাঁধুনী তাহাকে বিবাহ করিবে কি না। স্বভাবতই রাঁধুনী রাগ ও বিরক্তি প্রকাশ করিল। তাহার এই বিষাদময় প্রত্যাখ্যানের উত্তরে পুরুষটি বলিল, 'দুদিন পরেই দেখা যাবে।' পরের রবিবারে সে যখন আসিয়া আমাদের গেটের একটা থামের উপর বসিল, তখন আমাদের মনে বড় কৌতূহল জাগিল। সে টুপিতে বাঁকা করিয়া একটা পালক গুঁজিয়াছে। এবং চুলে এত তেল মাখিয়াছে যে উহা গাল বাহিয়া গড়াইতেছে। দৈবক্রমে (ঐ গল্প যখন বলি) ঠিক ঐ সময়েই নিজের একখানি তৈলচিত্রের জন্য স্বামীজীকে চিত্রকরের গৃহে গিয়া মাঝে মাঝে বসিতে হইত; ছবিখানি কতদূর হইল দেখিবার জন্য আমরাও শিল্পীর কার্যালয়ে গেলাম। আমি ঘরে ঢুকিতে যাইয়া দেখি একটু তেল চিত্রখানির গাল গড়াইয়া পড়িতেছে। স্বামীজীও উহা দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ওটা রাধুনীকে বে করতে তৈরী হচ্ছে।'...স্বামীজীকে তো তুমি জানই—কী অপূর্ব হাস্য-রসিকই না ছিলেন তিনি!"

দুইটি গল্প ছিল তাঁহার সর্বাধিক প্রিয়—একটির বিষয় ছিল আদমখোরদের দেশে খৃষ্টান পাদ্রীর আগমন, এবং অপরটির ছিল সৃষ্টিবিষয়ে ভাষণদানকারী ময়লা-রঙের পাদ্রী। গল্পদুইটি তাঁহার মুখে বিবৃত হইয়া হাসির তরঙ্গ উঠাইত। প্রথম গল্পটি এই:—এক সুদূর আদমখোরদের দ্বীপে এক নূতন পাদ্রী আসিয়াছেন। তিনি দলের সরদারের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল কথা, আমার পূর্ববর্তীকে তোমাদের কেমন লাগিয়াছিল?" উত্তর আসিল "ও: ভারী সুস্বাদ!" আর ময়লা রঙের প্রচারকের গল্পটি এই: তারস্বরে প্রচারক বলিয়া চালিয়াছেন, "জানো? ভগবান তখন আদমকে তৈরী করছিলেন—আর তিনি তৈরী করছিলেন কাদা দিয়ে। যখন ভগবান তাকে তৈরী করে ফেলেছেন, তখন তিনি তাকে একটা বেড়ার গায়ে লাগিয়ে রাখলেন শুকাবার জন্য—।" পাদ্রী বলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় শ্রোতাদের মধ্য হইতে এক বিজ্ঞ ব্যক্তি চেঁচাইয়া উঠিলেন, "পাদ্রীমশায় একটু থামুন তো! ঐ যে বেড়ার কথাটা বললেন, (সৃষ্টির আদিতে) ওটা আবার এল কোত্থেকে? ওটাকে তৈরী করল কে?" পাদ্রী তীক্ষ্ণস্বরে উত্তর দিলেন, "ওহে স্যাম জোনস্, শোন শোন! হাঁকপাক করে এসব আজে বাজে প্রশ্ন করা ছেড়ে দাও দেখি। তুমি যে দেখছি সব ধর্মতত্ত্ব ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে!"

সাধারণ মানুষের ধারণা যদিও অন্যরূপ, তথাপি ইহা সত্য যে মহাপুরুষেরা সব সময়ই

২। Me Melikan sir, me eat blandy, me eat polk, me eat everything.

গম্ভীর হইয়া থাকেন না। এইভাবে মনকে সম্পূর্ণ হালকা করিয়া ফেলাতেও স্বামীজীর তেমনি শক্তি প্রকাশ পাইত, যেমন পাইত তাঁহার প্রতিভা ও অধ্যাত্মানুভূতির স্ফুরণে। ধর্মাচার্যের জীবনের অনুভূতিসমূহের সন্ধান পাইতে আমাদের মনে যেমন অনুসন্ধিৎসা জাগে, তেমনি জাগে তাঁহার ব্যক্তিগত হাবভাব, রুচি, জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলী ও মানবীয় দিক সম্বন্ধে সবকিছু জানিবার ঔৎসুক্য। মহাপুরুষদের নিকটসংস্পর্শে যাঁহারা আসেন, তাঁহারা তাঁহাদের এই মানবসুলভ অথচ অতিমানব গুণাবলীর জন্যও তাঁহাদিগকে ভালবাসেন। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ও অনুরাগীদের সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। তাঁহারা সর্বদা চেষ্টা করিতেন তাঁহার মনে আনন্দোৎপাদন করিতে, এবং দেখিতেন যে এই প্রচেষ্টার ফলে তাঁহার ধর্ম-সম্বন্ধীয় বাণীর প্রকাশও স্পষ্টতর হইত। তাঁহার পাশ্চাত্যদেশীয় নিকটতম বন্ধুদের মধ্যে যাঁহাদের অবস্থা ভাল ছিল তাঁহারা তাঁহার বিশ্রাম ও চিত্তবিনোদনের প্রয়োজন বোধ করিয়া অন্ততঃ স্বল্পকাল কর্মবিরতি উপভোগের জন্য তাঁহাকে স্বগৃহে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন। সেসব জায়গায় তাঁহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চলিতে ফিরিতে দেওয়া হইত। তিনি কথা বলিতে চাহিলে তাঁহারা চুপ করিয়া বসিয়া একমনে শুনিতেন। তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের চর্চা করিতে চাহিলে নির্বিবাদে তাহা করিতে পারিতেন। তিনি নীরবে ধ্যানমগ্ন হইলে তাঁহারা সে নির্জনতা ভঙ্গ করিতেন না। এমনও হইত যে, বহুদিন মৌন থাকিয়া তিনি অকস্মাৎ ভগবদালাপনে মুখর হইয়া উঠিতেন; অন্য সময় আবার এমন সব গল্পগুজব করিতেন, যাহাতে চিন্তা করিতে হয় না। অনেক ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক শক্তিস্পন্দনসহ সর্বত্রপ্রসারী ও ভাবগাম্ভীর্যে অতলস্পর্শী প্রাণমাতানো ভাষণ-শেষে তিনি আহ্লাদে ভরিয়া উঠিয়া বলিতেন, "আঃ, ভগবান বাঁচালেন; এটা শেষ হয়ে গেছে।" এমনি করিয়া প্রজ্ঞাদৃষ্টির অত্যুচ্চ আকাশভেদী উর্ধ্বগমন রোধ করিয়া তিনি অকস্মাৎ শিশু-জনোচিত সারল্যের ভূমিতে অবতরণ করিতেন।

পাশ্চাত্যদেশীয় নিকট বন্ধুদের কাছে কোন কিছু তিনি গোপন রাখিতেন না, মনের কথা খুলিয়া বলিতেন। অনেককে নিজের ইচ্ছানুরূপ নামে ডাকিতেন। শ্রীযুক্ত হেল ও তাঁহার পত্নী ছিলেন তাঁহার নিকট 'ফাদার পোপ' (পোপ বাবা) ও 'মাদার চার্চ' (মা গির্জা); শ্রীমতী ম্যাকলাউড ছিলেন 'ইউম' বা 'জো জো'; শ্রীযুক্ত ফ্র্যান্সিস লেগেট ছিলেন 'ফ্রাঙ্কিন্‌সেন্স' (গুগ্‌গুল) ইত্যাদি। বন্ধুরা কোন উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করিলে তিনি আনন্দোচ্ছল-নয়নে সাগ্রহে উহা দেখিতে থাকিতেন এবং স্বদেশীয় রীতিতে হাতে করিয়া খাইতে খাইতে বলিতেন, "এমন করে না খেলে তৃপ্তি হয়?" প্রথম প্রথম এইরূপ ব্যবহারে অনভ্যস্ত পাশ্চাত্যেরা আঁৎকাইয়া উঠিতেন; কিন্তু পরে ইহার তাৎপর্য বুঝিয়া তিনি ঐরূপ করিলেই বরং তাঁহারা অধিকতর আনন্দ পাইতেন। তিনি যখন তাঁহাদের গৃহমধ্যে ঢুকিয়া স্বগৃহোচিত স্বাচ্ছন্দ্য অনুভবপূর্বক তাড়াতাড়ি গলার কলার খুলিয়া ফেলিতেন, পায়ের বুট ছাড়িয়া ফেলিতেন এবং গৃহমধ্যে ব্যবহার্য চটিজুতায় পা গলাইয়া দিতেন, তখন গৃহবাসীদের খুব আমোদ হইত। আর জামার আস্তিনের কাপ (Cuff) তো ছিল তাঁহার দৃষ্টিতে অতি জঘন্য। তাঁহার স্বাভাবিক সন্ন্যাসীর মন মাঝে মাঝে সামাজিক কৃত্রিম রীতিনীতি ও আদবকায়দার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। অর্থের প্রতি তাঁহার এক স্বাভাবিক ঔদাসীন্য

ছিল। তাঁহার আমেরিকান শিষ্যেরা কতবারই না দেখিয়াছেন, বন্ধুরা তাঁহার আপন ব্যবহারের জন্য অর্থ দিলেও তিনি আঁৎকাইয়া উঠিতেন এবং উহা ভিখারী বা অভাবগ্রস্ত লোককে অকাতরে দান করিতেন; অথবা এমনও হইত যে, তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ অর্থে শিষ্যবর্গকে বা বন্ধুবান্ধবকে উপহার দিবার উপযুক্ত কিছু কিনিয়া ফেলিতেন। সহস্রদ্বীপোদ্যানের কার্যশেষে যখন তাঁহাকে বেশ একটা মোটা টাকা দেওয়া হয়, তখন সেই টাকার গতি ঐরূপই হইয়াছিল। তাঁহার নিকট অর্থ বড় ছিল না, বড় ছিল মানুষ। তিনি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দাবী করিতেন; তাহা না পাইলে তিনি স্বনির্ধারিত স্বাধীন মার্গেই চলিতেন। কেহ মুরুব্বিয়ানা করিবে, ইহা তিনি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। এক সময়ে কার্যব্যবস্থা ও পরিকল্পনা বিষয়ে জনৈকা বিত্তশালিনী মহিলা স্বামীজীকে স্বমত গ্রহণ করাইতে উদ্যত হইলে তিনি সব ব্যর্থ করিয়া দিলেন। তখনকার মতো ঐ মহিলা চটিয়া গেলেও পরে সহাস্যে স্নেহভরে বলিতেন, "আমি তাঁর জন্য যত মতলব আঁটি, তিনি শেষ মুহূর্তে সব ভণ্ডুল করে দেন; তিনি নিজের খেয়ালেই চলবেন! তাঁর স্বভাব যেন চীনা-মাটির আসবাবের দোকানে প্রবিষ্ট পাগলা ষাঁড়ের মতো।" সেবা বা আনুগত্যের প্রেরণায় তিনি সব কিছু করিতেই প্রস্তুত থাকিলেও বলপূর্বক তাঁহাকে দিয়া কেহ কিছু করাইবে, ইহা তাঁহার নিকট অসহ্য ছিল। আবার যখন তাঁহার প্রত্যয় জন্মিত যে, কোন ব্যক্তি ভগবন্নির্দেশে কোন ভগবৎকার্য সম্পাদনে নিযুক্ত আছেন, তখন বিরক্তির কারণ ঘটিলেও তিনি ঐ ব্যক্তির প্রতি অশেষ ধৈর্য প্রদর্শন করিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপে ল্যাণ্ডসবার্গ (কৃপানন্দ)-এর নাম করা যাইতে পারে।

অনেক সময় তিনি বলিতেন, "শরীরটা একটা ভয়ানক বন্ধনবিশেষ।" অথবা, "আমার ইচ্ছা হয়, যাতে আমি নিজেকে চিরকালের মত লুকিয়ে ফেলতে পারি", আর সকলেই অনুভব করিত যেন তাঁহার মুক্ত আত্মা রক্ত-মাংসের বন্ধনে পড়িয়া আকুল আর্তনাদ করিতেছে। এই সব মুহূর্তের অনুপ্রেরণাবশেই তিনি "খেলা মোর হলো শেষ" (My play is done) "সন্ন্যাসীর গীতি" ইত্যাদি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন; এবং এই ভাবই বহু পত্রেও প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা বুলকে লিখিত একখানি পত্রে আছে, "আমার একখানি নোটবুক আছে যা আমার সঙ্গে সঙ্গে সারা দুনিয়া ঘুরে এসেছে। তাতে সাত বছর আগেকার এই লেখাটি পাচ্ছি, 'এখন এমন একটা নিরিবিলি কোণ চাই, যেখানে শুয়ে পড়ে মরতে পারি।' কিন্তু এইসব কর্ম বাকী ছিল। আশা করি আমার প্রারব্ধ শেষ হয়েছে। এখন এটা একটা মায়ার খেলা বলে মনে হচ্ছে যে, আমি শিশুবৎ এটা করা ওটা করার স্বপ্ন দেখছিলাম। আমি ওসব থেকে মুক্ত হয়ে যাচ্ছি। সম্ভবতঃ আমাকে এদেশে নিয়ে আসার জন্য এসব উন্মাদসদৃশ স্বপ্নের প্রয়োজন ছিল; আর এ অভিজ্ঞতার জন্য আমি ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ।" এইজাতীয় ভাব যখন আসিত, তখন শিষ্যদের ভয় হইত—হয়তো বা তাঁহার লীলাবসানের দিন আগতপ্রায় এবং তিনি দেহমুক্ত হইবেন। অতএব তাঁহাকে নিম্নতর ভূমিতে বিচরণ করিতে দেখিলেই তাঁহারা স্বস্তিবোধ করিতেন।

স্বামীজীর মানুষভাবের একটি দৃষ্টান্ত ডেট্রয়েটের এক ঘটনায় পাওয়া যায়। একদিন তিনি তাঁহার এক অনুগত ভক্তের গৃহে যান এবং স্বাভাবিক সারল্য, আত্মীয়তাবোধ ও

স্বাচ্ছন্দ্য অনুসারে বলেন যে, তিনি সেদিন কিছু ভারতীয় খাদ্য প্রস্তুত করিবেন। গৃহস্বামী সহজেই সম্মত হইলেন। তারপর সকলে দেখিয়া অবাক হইলেন যে, তিনি পকেট হইতে ছোট ছোট মোড়কভর্তি রকমারি মশলা প্রভৃতি বাহির করিতেছেন। এইসব তিনি সুদূর ভারতবর্ষ হইতে আনাইয়াছিলেন। স্বামীজী তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যদের গৃহে গিয়া রন্ধন করিলে তাঁহারা খুব আনন্দিত হইতেন। এইসব বিষয়ে তাঁহারা সাহায্যও করিতেন এবং এইভাবে কিছুটা সময় নিকট আত্মীয়তা-সুলভ অনাবিল আনন্দে কাটিত। তরকারীতে তিনি মাঝে মাঝে বেশী গরমমশলা প্রভৃতি দিতেন বলিয়া পাশ্চাত্যদের পক্ষে খাওয়া কঠিন হইত; আবার কখনও কখনও রান্না করিতে করিতে এত দেরী হইয়া যাইত যে ততক্ষণে অতিথিরা ক্ষুধায় অস্থির হইয়া পড়িতেন। অবশ্য খাইতে বসিয়া আনন্দের উৎস খুলিয়া যাইত; আর ভারতীয় মশলা মুখে দিয়া পাশ্চাত্যদের কিরূপ মুখভঙ্গী হয়, ইত্যাদি দেখিবার জন্য স্বামীজী উৎসুক হইয়া থাকিতেন। এইসব খাদ্য তাঁহার কর্মক্লান্ত স্নায়ুমণ্ডলীর পক্ষে তৃপ্তিপ্রদ হইলেও তাঁহার পরিপাকশক্তির পক্ষে খুব উপযুক্ত ছিল না; অথচ তিনি বলিতেন যে, এইগুলিতে তাঁহার উপকারই হয়। এইজাতীয় ছেলেমানুষী অপরের ভালবাসাই আকর্ষণ করিত।

সহস্রদ্বীপোদ্যানের একটি ঘটনা শ্রীযুক্তা ফাঙ্কি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন "আমার নাম লইয়া একদিন একটা মজার ঘটনা ঘটিল। সেদিন আমরা সকলে গ্রামের দিকে বেড়াইতে গেলাম, এবং পথে দেখিলাম একটি তাঁবুতে একজন লোক ফুঁ দিয়া কাঁচের সব জিনিস তৈয়ার করিতেছে। দেখিয়া স্বামীজীর ভারি আমোদ হইল এবং তিনি ঐ লোকটির কানে কানে কি বলিলেন। তারপর তিনি বলিলেন, 'এসো গ্রামের মাঝ-রাস্তা ধরে একটু বেড়িয়ে আসি।' যখন বেলোয়াড়ীর তাঁবুতে ফিরিলাম, তখন ঐ ব্যক্তি কয়েকটি রহস্যজনক মোড়ক স্বামীজীর হাতে তুলিয়া দিল। পরে দেখা গিয়াছিল উহাতে আমাদের প্রত্যেকের জন্য উপহারস্বরূপ একটি করিয়া স্ফটিকের বল আছে আর উহার ভিতরে প্রত্যেকের নামের সঙ্গে লিখিত আছে 'বিবেকানন্দের প্রীতিসহ প্রদত্ত।' বাস-গৃহে ফিরিয়া আমরা মোড়কগুলি খুলিলাম। আমার নামটা বানান করা হইয়াছিল, ফুঙ্কী (Funke স্থলে Phunkey) বলিয়া। আমরা তো হাসিয়া লুটোপুটি, কিন্তু এমন স্থানে যেন তিনি না শুনিতে পান। তিনি তো কখনো লিখিতভাবে আমার নাম দেখেন নাই; কাজেই এইরূপ হইয়াছিল! শীতের দিনে আগুনের ঠিক কাছে শান্তভাবে বেশ আরামে বসিয়া তিনি অনেক সময় ছেলেবেলার গল্প শুরু করিয়া দিতেন, অথবা কোন হাস্যরসময় পুস্তক বা সাময়িক পত্র লইয়া সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা পড়িয়া শেষ করিতেন। খবরের কাগজ হাতে লইয়া চিরাচরিত অভ্যাসানুরূপ কেবল শিরোনামগুলি পড়িয়া ছাড়িয়া দিতেন। এই ছিল তাঁহার চিত্ত-বিনোদনের উপায়। কিন্তু যে কোন মুহূর্তে তাঁহার অন্তর্নিহিত ঋষি বা মহাপুরুষের স্বরূপ ইহারই মধ্যে ঝলকিয়া উঠিত। জনৈক শিষ্য স্বামীজীর মহত্ত্ব ঠিক ধরিতে পারিতেন না, কারণ তাঁহাকে তিনি প্রায়শঃ এইজাতীয় আমোদ-প্রমোদের মধ্যেই পাইতেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন তিনি ঠিক মানুষটির পরিচয় পাইলেন। স্বামীজী আনন্দে বিহ্বল আছেন, এমন সময় শিষ্যটি ধর্মসম্বন্ধীয় একটি প্রশ্ন

করিবামাত্র স্বামীজীর চেহারা বদলাইয়া গেল; হাসিঠাট্টার জায়গায় অকস্মাৎ অধ্যাত্মতত্ত্বের বন্যা প্রবাহিত হইল। শিষ্যটি বলেন, 'স্বামীজী তখন যে চৈতন্যভূমিতে অবস্থানপূর্বক আমোদআহ্লাদ করিতেছিলেন, তাহা হইতে যেন নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া পরিবর্তনশীল ব্যক্তিত্বের পশ্চাদ্বর্তী উচ্চ হইতে উচ্চতর বহু চৈতন্যভূমি সম্বন্ধে আমাকে সচেতন করিয়া দিলেন।" কিন্তু এক ভূমি হইতে অন্য ভূমিতে —প্রজ্ঞাকে হাস্যকৌতুক হইতে হঠাৎ অধ্যাত্ম-বিষয়ে সঞ্চালিত করাতেই যে তাঁহার শক্তি সীমাবদ্ধ ছিল, এরূপ নহে। তিনি একই সময়ে উভয়ভূমিতে অবস্থান করিতেও পারিতেন। কার্যতও দেখা যাইত যে যদিও তিনি তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রকটতর সাধারণ স্তরে বিচরণ করিতেছেন বলিয়া মনে হইত, তথাপি দ্রষ্টার মনে ঐ সঙ্গে এ বোধও জাগরিত থাকিত যে, এই ক্রীড়াচঞ্চল দৃশ্যমান অংশের নিম্নে অতলস্পর্শী অগাধ সমুদ্র বিদ্যমান।

চাপরাশ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আমি তোমার ভৃত্য—মনে দৃঢ় এ বিশ্বাস,
তোমার নামের সঙ্গেতে লই প্রতিটি নিশ্বাস।
আজও তো কই পেলাম না চাপরাশ?

তোমার দেওয়া চাপরাশে মোর দাবী।
পেলাম না যে কেন?—তাহাই ভাবি!
তক্‌মা দিয়ে বাড়িয়ে দাও আনন্দ উল্লাস।

অতি বড় গৌরবের ওই ছাপ—
হবে কিনা হবে আমার লাভ?
ঐ যে আমার সান্ত্বনা ও পরম আশ্বাস।

তপস্যা ও সিদ্ধি আমার ওই।
উহার কথাই ভাবি এবং কই,
ঐ যে "বত্রিশ সিংহাসনে" চাপতে আমার আশ।

"যত মত তত পথ"

ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সংক্ষিপ্ত কয়েকটি শব্দে যে সকল গভীর তথ্য নির্দেশ করেছেন, তার মধ্যে 'যত মত তত পথ' এই সঙ্কেতটি সব চেয়ে প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। তার কারণ এই ভাবটির অভিনবত্ব এবং বর্তমান কালে এর প্রয়োজনীয়তা; কারণ এক ধর্মের সহিত অপর ধর্মের এবং একই ধর্মের বিভিন্ন শাখার মধ্যে যে প্রকার বিবাদ-বিসম্বাদ, যুদ্ধ এবং তার ফলে পৃথিবীতে যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে এবং ধ্বংসের তাণ্ডবনৃত্য চলেছে, ইতিহাসের পাতায় তা লেখা রয়েছে; তা পড়তে পড়তে সময় সময় মনে এমনও সন্দেহ জাগে যে, মোটের উপর ধর্ম মানুষের উপকারের জন্য নয়, অপকারের জন্যই সৃষ্ট হয়েছিল। সুতরাং ঠাকুর যখন নিজে পরীক্ষানিরীক্ষা করে প্রচার করলেন, 'যত মত তত পথ', তখন একটা আশার আলো দেখা দিল যে হয়ত এর ফলে জগতে ধর্মের দ্বন্দ্ব ধীরে ধীরে লোপ পাবে। কিন্তু তা যে হয়নি বোধ হয় তার একটি প্রধান কারণ, এই সংক্ষিপ্ত বাক্যটির প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা খুব সহজ নয় এবং এ সম্বন্ধে মনে যে সংশয় জাগে তার সবগুলির নিরসন করবার বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নি।

কথাটির সাধারণভাবে গৃহীত অর্থ এই যে, পৃথিবীতে যত ধর্মমত প্রচলিত আছে—সে সকলই সত্য এবং ভগবানের কৃপালাভের (বা তাঁর কাছে পৌছবার) ভিন্ন ভিন্ন উপায় মাত্র। মানুষ যে ধর্মমতই অনুসরণ করুক, সে পরম ও চরম কাম্য লাভ করবেই।

প্রথমেই মনে এই প্রশ্ন জাগে—তাহলে কি বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে ভাল-মন্দ, ছোট-বড় কোন ভেদাভেদই নাই? বেদান্তমতের উপর প্রতিষ্ঠিত শঙ্করাচার্যের প্রচারিত ধর্ম, আর যে গাছের চার দিকে পাথরের বেদী বেঁধে পূজা ক'রে ধর্মপালন করে তার ধর্ম—এ দুয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই? এর অবশ্য উত্তর দেওয়া খুব কঠিন নয়। বলা যায় যে দুটোই পথ—তবে একটি পথ সরল ও সংক্ষিপ্ত—সহজেই গন্তব্য স্থলে পৌছানো যায়—অপরটি ধরে এগুলে পৌঁছতে অনেক দেরী হবে, হয়ত অনেক কষ্ট হবে। এ উত্তরও মনকে পুরোপুরি খুশী করতে পারে না। কারণ যদি নিশ্চিত জানি যে একজন বাঁকা পথে চলেছে এবং তাঁর গন্তব্য স্থানে পৌছতে অযথা অনেক দেরী হবে, তাহলে কি এটা আমাদের উচিত নয় যে অপেক্ষাকৃত সোজা পথের সন্ধান দিয়ে (অবশ্য ব্যক্তিগত সামর্থ্য ও প্রকৃতির দিকে নজর রেখে) তার কষ্টের লাঘব করা?

কিন্তু এর চেয়েও গুরুতর প্রশ্ন ওঠে, যখন দেখি ধর্মের নামে এমন সব আচার অনুষ্ঠিত হয়েছে যা জগতে সর্বজনস্বীকৃত নীতির বিরোধী। দৃষ্টান্তস্বরূপ হিন্দুদের সতীদাহপ্রথা, খৃষ্টানদের ইনকুইজিশন (Inquisition) অর্থাৎ যারা প্রচলিত গোঁড়া ধর্মের প্রথা ও নীতি অস্বীকার করে তাদের পুড়িয়ে মারা প্রভৃতির নাম করা যায়। এরও অবশ্য একটা উত্তর দেওয়া যায় যে, প্রতি ধর্মের যেটুকু সার তথ্য সেটাই পালনীয়—তার সঙ্গে যে কুসংস্কার জড়িত হয়েছে সেটা ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু ধর্মের

কোনটুকু সার আর কোনটি কুসংস্কার, তা নির্ণয় করার উপায় কি? যখন সতীদাহ প্রথা রহিত করবার জন্য আইন হল, তখন বহু গণ্য-মান্য হিন্দু প্রতিবাদ করলেন যে সতীদাহ হিন্দুধর্মের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ এবং এটি বন্ধ করলে হিন্দু ধর্ম লোপ পাবে—অন্ততঃ তার মর্মে গুরুতর আঘাত লাগবে। দশ হাজারের বেশী লোক এই মর্মে সরকারের নিকট যে দরখাস্ত করে, তার মধ্যে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের মত বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিও ছিলেন।

এমন কতকগুলি ধর্মমত এদেশে কিছুদিন পূর্বেও খুবই প্রচলিত ছিল—কিছু কিছু এখনও আছে—স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ মিলনই যার কেন্দ্রস্বরূপ গণ্য করা হত এবং যা আদালতের বিচারের ফলে বন্ধ হয়ে গেছে। এই সব অনুষ্ঠানের সমর্থনে অনেক দার্শনিক তথ্য প্রচারিত হয়েছে। অথচ এগুলি অধিকাংশ লোকের নীতি ও রুচিতে এত বাধে যে তারা এগুলি 'ধর্মমতের' আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে নারাজ—অন্ততঃ তা করতে মনে খুব ব্যথা পায়।

এর চেয়েও বড় কথা এই যে, বড় বড় ধর্মের মধ্যেও এমন অনেক কিছুকে মূলতত্ত্ব বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, যা সাধারণ লোকে তো দূরের কথা, শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্য স্বয়ং বিবেকানন্দও অগ্রাহ্য বলে ঘোষণা করেছেন তিনি বলেছেন:

'যখন প্রত্যেকেই দাঁড়িয়ে উঠে বলে—আমার ধর্মের যিনি গুরু (Prophet) তিনিই জগতের একমাত্র ধর্মগুরু—তা ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় ধর্মগুরু নেই—তখন বুঝতে হবে যে তার কথা মিথ্যা—সে ধর্মের 'ক-খ' ও (alpha) জানে না।'

এইরূপ ধর্মের দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি এই প্রসঙ্গেই ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে বলেছেন:

এই ধর্মের মূল তত্ত্ব (Watch-word) হল এই যে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এবং মুহম্মদ তাঁর একমাত্র প্রেরিত দূত (ও জগতের ধর্মগুরু)—(Prophet)। এ ছাড়া আর যা কিছু তা কেবল যে মন্দ তা নয়, তাকে এখনি ধ্বংস করতে হবে। পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক, যে পুরাপুরি উক্ত মতে বিশ্বাস করে না, তাকে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে মেরে ফেলতে হবে। এই উপাসনার সঙ্গে যার মিল নেই, তা তৎক্ষণাৎ ভেঙ্গে ফেলতে হবে। যে বইতে অন্য রকম কথা থাকবে তা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত পৃথিবীতে পাঁচশ বছর রক্তের স্রোত বয়ে গেছে। এই হল মুসলমান ধর্ম।

স্বামীজীর উক্তি যে ঐতিহাসিক সত্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তা হলে কি ইসলাম ধর্মকে অন্যতম পথ বলে গ্রহণ করার সময় এই মূলতত্ত্বসহ গ্রহণ করতে হবে? খৃষ্টানদের দুই সম্প্রদায়—রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যাণ্ট—এই ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে পরস্পরের প্রতি যে বীভৎস আচরণ করেছে—তা ইসলামের ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া থেকে পরিমাণে কম হলেও একই প্রকৃতির। তাদের সেই ধর্মমত এখনও অক্ষুণ্ন আছে এবং জগতের কোটি কোটি লোকে আজও সেই ধর্মমতই অবলম্বন করে আছে। সুতরাং এই সব মতগুলিকে ভগবানলাভের ভিন্ন ভিন্ন পথ বলে গ্রহণ করার সময় সামগ্রিক ভাবে তা করতে হবে, ভাল মন্দ বিচার করবার কিছু নেই—স্বয়ং স্বামীজীর নজীরও একথার বিরুদ্ধেই যায়।

এই সব কথা চিন্তা করলে 'যত মত তত পথ' এই সূত্রটির প্রকৃত অর্থ কি তা নির্ণয়

করা কঠিন হয়, সন্দেহ জন্মে, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে 'মত' কোন অংশটুকু ? এবিষয়ে একটি বিস্তৃত ভাষ্য দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। যাতে কেউ এ কাজ করতে, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে অংশটুকু ভগবানকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে সহায়তা করে, সর্বসাধারণের চোখের সামনে তা তুলে ধরতে অগ্রসর হন, সেই ভরসাই আমাকে এ লেখায় প্রবৃত্ত করেছে।

স্বামীজীর লেখার মধ্যে এর কোন ভাষ্য আমার চোখে পড়ে নি; তবে একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে বলে মনে হয়। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন যে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে যে সকল মহাপুরুষ জন্মেছেন তাঁদের মধ্যে কোন প্রভেদ লক্ষ্য করা যায় না। ধর্ম মত বা তর্কের বিষয় নয়। যাঁরা দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছেন, অর্থাৎ ভগবানকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেছেন, তাঁদের উদার মতই আলোর সন্ধান দেবে। অর্থাৎ সেইটাই প্রকৃষ্ট ধর্মমত, তা সে অন্যান্য ধর্মমত হতে যতই আলাদা বলে মনে হোক না কেন। এ থেকে এরূপ অনুমান করা যেতে পারে যে 'যত মত তত পথ' বাক্যের অর্থ এই নয়, যেহেতু সকল প্রচলিত ধর্মমতই ভগবানকে পাবার পথ, সুতরাং তা সর্বাংশে সত্য এবং গ্রহণের না হোক শ্রদ্ধার যোগ্য। এর ইঙ্গিত বোধ হয় এই যে, যুগে যুগে মহাপুরুষেরা এবং সিদ্ধ পুরুষগণ যেসব ধর্মমত অবলম্বন করে কাম্যবস্তু লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন, সেগুলি ভিন্ন হলেও সত্য; এই অর্থেই 'যত মত তত পথ'—এই বাক্যটি গ্রহণ করতে হবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ইসলাম, খৃষ্টান, এবং হিন্দুধর্মের বৈষ্ণব, তান্ত্রিক, প্রভৃতি সব মতেই সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন; সুতরাং এর সবগুলিই সেই পথ, যা অবলম্বন করে লোকে ভগবানের দিকে এগুতে পারে। কিন্তু সে পথ বা মত বলতে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের পাতায় লেখা সেই অংশটুকুই বোঝায়, যেটুকু বিভিন্ন ধর্মের মহাপুরুষ ও সাধকদের জীবনের সঙ্গে মিলে যায়; তাঁদের জীবনই এর একমাত্র নির্দেশক।

অবশ্য আমার এই ব্যাখ্যাটি অনুমান মাত্র; যোগ্যতর ব্যক্তি এ বিষয়ে আলোচনা করে 'যত মত তত পথ' এই সূত্রের ভাষ্যরচনায় প্রবৃত্ত হলে অনেকের উপকার ও সংশয়চ্ছেদ হবে বলে আমার বিশ্বাস।

কথামৃত

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

যিনি এক অদ্বিতীয় তাঁর এ সংসার
লীলায় বৈচিত্র্যময়! সে বিচিত্রতার
প্রাণময় মহাসত্য ঘোষিলে জগতে:
"যত মত তত পথ।" তাহার আলোতে
দেখিলাম স্বাধীনতা সর্বকল্যাণের
অন্তহীন মহাউৎস! মানবমনের
আকূতি গভীরতম মুক্তিরই লাগিয়া!

পৃথিবীর অগণিত তৃষাতুর হিয়া
তোমার বাণীতে পেলো মুক্তির অমৃত!
মৈত্রীর সৌধের ভিত্তি হইবে রচিত
যে দৃঢ় ভিত্তিতে তার নাম স্বাধীনতা!
রুচিগত ভাবগত স্বাতন্ত্র্যের কথা
তাই তুমি প্রচারিলে অপূর্ব ভঙ্গীতে!
সেই স্বাতন্ত্র্যের জয়ধ্বনি কথামৃতে!

দুর্গোৎসব—কৌলিক ও সাম্প্রতিক সর্বজনীন

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

বাঙালীর দুর্গোৎসব প্রথা কতদিনের তা আমার ঠিক জানা নেই। কেউ কেউ বলেন তিন-চারশ' বছরও আগের কথা। তখনো মুসলমান সাম্রাজ্য ছিল। তখন বাঙলা বিহার উড়িষ্যা আসাম সব নিয়ে এক বিস্তৃত সুবা বা প্রদেশ ছিল, সবাই জানেন।

কিন্তু এই ধরনের দুর্গাপ্রতিমা পূজা তখনো অখণ্ড বৃহৎ বঙ্গেও বাংলাভাষী অঞ্চলেই ছিল দেখা যায়। যদিও উড়িষ্যায় আসামে বিহারে নেপাল অবধি শক্তিপূজা ছিল, পীঠস্থানে পীঠভাবে, শিলাময়ী দেবীরূপে, অষ্টধাতু দেবী-রূপে, ঘটে, পটে, নানা প্রতীকেও—কিন্তু সে দেশগুলিতে ৺দেবীমাতার এই বৎসরান্তিক মৃন্ময়ী প্রতিমা পূজার প্রথা ছিল না। যদিও সে পূজা তান্ত্রিক মতে—'যা দেবী সর্বভূতেষু' 'মাতা' 'ধাত্রী' 'শান্তি' 'ভ্রান্তি' সবরূপে বিশ্বময় বিরাজমানা—যে পূজা গান্ধার থেকে, কন্যাকুমারিকার সাগরকূল থেকে হিমালয় তিব্বত অবধি এখনো রয়েছে; যে জননী মাতা ও শক্তিরূপিণী, হয়ত প্রকৃতিরূপিণী কিন্তু সপরিবার মাতৃমূর্তি নন, দুর্গা দুর্গতিনাশিনী নন। তাই দেখা যায়, আমাদের বাংলাদেশের বাঙালীর এই পূজার কল্পনা আহ্বান বিসর্জন কিন্তু একেবারে আরেক রকম অনুভূতি, ধারণাও ভাবময়।

এ এক আশ্চর্য সর্বশক্তিময়ী সর্বময়ী বিশ্বজননীর ঋদ্ধি-সিদ্ধি-বিদ্যা-শৌর্য-ঐশ্বর্য-মঙ্গলময়ী আনন্দময়ী মাতৃমূর্তির সপরিবার আবাহন উপাসনা ও পূজা।

এক দেশব্যাপী ব্রত-পার্বণ-উৎসবময় ভাবলোকে মাতৃমূর্তির আবির্ভাব। মানুষের মনের সব আকাঙ্ক্ষা-আশা-রূপ-গুণ-গৌরবময়ী মূর্তিতে বিশ্বমাতার বিশ্বরূপদর্শন যজ্ঞ।

গণেশে সিদ্ধি, কার্ত্তিকে শৌর্য, লক্ষ্মীতে ঐশ্বর্য, সরস্বতীতে জ্ঞানবিদ্যা আর মা নিজে দশপ্রহরণধারিণী বরাভয়দাত্রী, সঙ্গে মঙ্গলময় শিব দেবাদিদেব।

এই আশ্চর্য কল্পনাময় মাতৃমূর্তির অর্চনা আর কোন প্রদেশেই ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না—উত্তর দক্ষিণ পশ্চিম কোনো দিকেই।

সম্ভ্রমময় পূজায় নির্ভয় আনন্দে যেন গৃহজননীর মত জগজ্জননীকে আবাহন; আবার কখনো আগমনী-ভাবে কন্যারূপিণীও হন সে জননী; এই হ'ল বাংলাদেশের শক্তিপূজার বৈশিষ্ট্য।

আমার মনে পড়ে প্রথম দুর্গোৎসব দেখা—তখন বোধহয় ১৩০৫ সাল, আমার বয়সও ৫।৬ হবে। সে কথা কয়েক বছর আগের 'উদ্বোধনে' বেরিয়েছিল।

সে দুর্গোৎসব দেখি জয়পুরে রাজস্থানে তখনকার রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে।

মনে হয়েছিল সে কি বিশাল প্রতিমা। দশপ্রহরণধারিণী দেবীর দিকে আশ্চর্য চোখে শিশুমুখ উঁচু করে চেয়ে রইলাম। প্রথম দেখায় সে আশ্চর্য অনুভূতি আজো মনে আছে স্পষ্টভাবে।

সেকালে বিদেশে প্রতিমা গড়াবার জন্য বাংলাদেশ থেকে কুম্ভকার নিয়ে যাওয়া হত। তিনমাস থাকতেন তাঁরা পূজাবাড়ীতে কর্মী ও অতিথি রূপে।

দেশীয় পারিভাষিক শব্দে 'একমেটে' 'দোমেটে' (প্রথমবার মাটি দেওয়া, দ্বিতীয়বার মাটি দেওয়া) তারপর রং, গর্জনতেল, আয়ুধ, প্রতীক, শেষ পঞ্চমীর রাত্রে চক্ষুদান; বসন-ভূষণে সাজানো। 'চক্ষুদান' দেখার জন্যই বা কি কৌতূহল! ঘুমে চোখ জড়িয়ে যাওয়া শিশুরাও বসে আছে। চক্ষুদান কেমন দেখবে। শিল্পীর তুলিতে একটীর পর একটী চোখ আঁকা হয়। সেও তিনমাস ধরে শিশুদের বড়দের উৎসব।

এখনকার কলকাতার মত দাম দিয়ে যে কোনো আঙ্গিকের খুশীমত গড়নের 'মাতৃমূর্তি' কিনে নিয়ে ঠাকুরদালানে অথবা বারোয়ারী মণ্ডপে সাজানো নয়; দিক্‌বিদিকে নানাভাবে বসিয়ে দেওয়া নয় অনায়াসে। (অবশ্য বাড়ীর পূজায় প্রতিমার আকার বদলানো হয় না। হয়নি।) তার নিষ্ঠা সম্ভ্রম আনন্দে দিনের পর দিন কল্পনার আনন্দময় আকাশ ছিল আরেক রকমের। পূজা ও শরণাগতি, কল্পনা ও ভক্তিভাব সেখানে একত্র হয়েছে। আর দুমাস আগে থেকে বৈষ্ণব ভিখারীর মুখে আগমনী গান সুরু হয়ে যায় দেশের পর্বে পর্বে—"যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী"।

এই হল কৌলিক পূজা, গৃহস্থ বাড়ীর পূজা। যেখানে এখনো ঐ পুরোনো নিষ্ঠার সম্ভ্রম-আনন্দের কল্পনার সুরটুকু আছে।

এখন এসেছে বারোয়ারী পূজা, সর্বজনীন পূজা নাম নিয়ে। সেকালেও বারোয়ারী পূজায় নানারকম ভাবে মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা ছিল। 'হুতোমের নক্‌সা'য় এবং সংবাদপত্রে সেকালের কথায় তার কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়।

যেমন পূজামণ্ডপের প্রত্যন্ত প্রদেশে সাহেব খাওয়ানো, বাইনাচ, বন্ধুবান্ধব নিয়ে হৈ হৈ করা ভোজ ছিল। অন্যদিকে থাকত বৃহৎ প্রাঙ্গণতলে রাত্রে যাত্রা, গান, কীর্তন। চণ্ডীপাঠ সারাদিন নানা ভক্তমুখে। আর গৃহিণীদের প্রায় অনেকেরই, গৃহস্বামীরও কারুর কারুর—উপবাসক্লিষ্ট কর্মক্লান্ত দেহে ভক্তি-সম্ভ্রম-নিষ্ঠাসহ নিখুঁতভাবে আচার-অনুষ্ঠান পালন করে পূজার আয়োজন, যোগাড় দেওয়ার তদারক করা। বিরাট মহানৈবেদ্য মার দুপাশে। তার মত জলপান ফল মূল। তেমনি ফুল-বিল্বপত্রের স্তূপ ডালা ভরা। ব্রাহ্মণবাড়ী হলে মায়ের সর্বোপচারে অন্নভোগ, অন্য বাড়ীর পূজার কাঁচা তরকারী কাটা কুটনো শাক সুক্ত ভাজা থেকে অম্ল অবধি দেওয়ার প্রথা আছে। এখনো এসব একইভাবে গৃহস্থবাড়ীতে নিবেদিত হয়। মানসিক পূজায় নানাজনের ডালা আশে পাশে। বড়দের পাশে ছোটরা দাঁড়ায়, তারাও শিখে নেয়।

আর ছিল নবমীর দিন ব্রাহ্মণ ভোজন, পল্লীবাসীদের খাওয়ানো, এবং বিজয়ার পর একাদশীতে কাঙালী ভোজন সযত্নে অন্ন ব্যঞ্জন দই মিষ্টি অথবা খিচুড়ি বোঁদে জিলাপী দিয়ে। কখনো বা নবমীতেও এ ভোজন করানো হ'ত।

এ প্রথা কৌলিক ভাবে এখনো কলকাতায় ও গ্রামে গৃহস্থবাড়ীতে পালন করা হয়। অবশ্য 'নমো নমো' ভাবে, 'রেশনে'র কৃপায়। শোভাবাজারের রাজবাটীতে, পাথুরেঘাটার মল্লিক শীল পরিবারে, বিখ্যাত লাহা পরিবারে, ঠাকুর পরিবারেবর হিন্দু শাখায় (যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর), (ছাতুবাবু) দেব পরিবারে প্রভৃতি নানা বিখ্যাত অবিখ্যাত পরিবারে এখনো কৌলিক প্রথার খানিকটা বজায় আছে। যেখানে সাটিনের সুট পরা ময়ূরে চড়া কার্তিক, লালপাড় ধুতি পরা গণেশজী, রক্তাম্বরা লক্ষ্মী সরস্বতী মা দুর্গা—সেকালের মতই একই

চালচিত্রের তলায় বিরাজিতা। চালচিত্রের উপরের ছবিগুলিও একই রকমের সেকালের মতই।

এইসব বাড়ীর পূজার দালানের সামনের বিস্তৃত অঙ্গনে এখনো রাত্রিভোর নানা অভিনয় হয় তিনদিন ধরে। অবারিত দ্বার সকল শ্রেণীর নরনারীর কাছে। সে অভিনয় গ্রামের পাড়ার বাড়ীর ছেলেদের করা। বেশীর ভাগই পৌরাণিক পালা।

*

সেই প্রথম পূজা দেখার পর আবার যে দুর্গোৎসব দেখি, সে হল পাটনায় বারোয়ারী পূজা। তখন সর্বজনীন কথাটার সৃষ্টি হয়নি। তখন খানতিনেক প্রতিমা পাটনায় (বাঁকিপুরে) পূজা করা হত। সে কিন্তু একটি মাত্র বারোয়ারী, তাতে শুধু আরতি ও পুষ্পাঞ্জলিই মনে পড়ে। সেও তখন ১৩১৬।১৭ সালের সময়, আর পরে। পূজার আনুষ্ঠানিক বিধিব্যবস্থা কিছুই জানা ছিলনা। 'বারোয়ারী' নামটিও বঙ্কিমচন্দ্রের বইতেই পড়া তখনো।

তার অনেক পরে ১৩২৮ সালে গ্রামের নিজেদের বাড়ীতে কুল-ক্রমাগত গৃহস্থবাড়ীর কৌলিক পূজাই আমার প্রথম কৌলিক আনুষ্ঠানিক পূজা দেখা। যে পূজা ১২৫৪।৫৫ সালে আরম্ভ হয়।

সেদিন প্রথম দেখেছিলাম মায়ের মণ্ডপে একটা বৃহৎ পরিবার; একটা বৃহৎ গ্রামবাসী নরনারী এবং অদেখা না-চেনা চেনা আত্মীয়স্বজন কিভাবে পূজামণ্ডপে অনায়াসে সমবেত হন। আর আপনার লোকের মত হয়ে যান দেবকার্য-সূত্রে ও নানা কর্ম-সূত্রে। কেননা সে একটা চারদিন ধরে মহাযজ্ঞের ব্যাপার। রন্ধনশালার ব্যাপারও তো চারদিনব্যাপী যজ্ঞবিশেষ।

তার সঙ্গে নৈবেদ্যের ঘরে ফল কোটা চাল ধোয়া নৈবেদ্য সাজানো যেমন মঙ্গল আরতির সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয়, রন্ধনশালায় হাঁড়ি হাঁড়ি ডালভাতও চড়ে যায় গৃহিণীদের দ্বারা, ব্রাহ্মণ দ্বারা। ভাত রান্না আর ফরসা নতুন কাপড়ে ঢালা হতে থাকে। যারা তরকারী কুটছে তাদেরও আর হাতের অবকাশ নেই। যাঁরা আছেন তাঁরা খাবেন। যাঁরা আসবেন তাঁরা খাবেন। অনাহূত রবাহূত নগদী পাইক কর্মচারীরাও খাবেন। সাধারণ মানুষ পাড়ার যার খুসি সে আসবে। পাতা পেতে বসে শাকসব্জী ডাল চচ্চড়ী মাছ অম্ল দিয়ে ভাত খেয়ে নেবে। তরকারী কম পড়ল? আবার কুটে দিই সকলে মিলে।

ওদিকে নৈবেদ্যের ঘরে মহানৈবেদ্য সাজানো হচ্ছে—পাচ সের চালের নৈবেদ্য। ছোট নৈবেদ্যও অনেকগুলি। মঙ্গলহাঁড়িতে মোটা সলতে জেলে অখণ্ডদীপ জ্বালা রয়েছে। পাছে তেল কমে যায়, নিবে যায়, সকলে সতর্ক। বোধনষষ্ঠী থেকে বিজয়া অবধি জ্বলবে প্রদীপ। দেখলাম, যাঁরা রান্নাঘরের দিকে আছেন তাঁদের যেমন সেখানকার দায়িত্ব ছেড়ে আসবার উপায় নেই, যাঁরা নৈবেদ্যের ঘরে আছেন তাঁদেরও নড়বার অবকাশ নেই, যতক্ষণ না তিথি অনুযায়ী পূজা সমাপ্ত হচ্ছে। কিন্তু সমাপ্তিতেও শেষ হয় না। তখনি তার মাঝে চণ্ডী পাঠ সুরু হয়ে যেত। যে শুনতে বসে সে আর একটা অংশ শেষ না হওয়া অবধি ওঠে না—"নবযৌবনসম্পন্না" "জটাজুটসমাযুক্তা" "নানালঙ্কারভূষিতা" মায়ের রূপ চোখের সামনে রয়েছে, মনের সামনেও স্তব শুনতে শুনতে ফুটে ওঠে। সংস্কৃত না বোঝা মানুষের মনেও তার ঝঙ্কারময় ভাষা অপূর্ব লাগত।

মনে আছে, একদিন অন্য সরিকের পূজা। আমার খানিকটা অবসর আছে; বাড়ীরই ছেলে একজনের পর একজন চণ্ডীপাঠ করছেন। হঠাৎ শুনলাম, "গর্জ্জ গর্জ্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহং।"

কি কৌতুকময় মনে হয়েছিল মায়ের উক্তিটি, প্রথম শোনার দিনে! প্রথম দেখা প্রথম শোনা এমনিই মনে থাকে।

মহাষ্টমীর দিন তো অষ্টমীপূজা, সন্ধি-পূজা, সন্ধ্যা-আরতি সারাদিনের ব্যাপার। মধ্য রাত্রে সন্ধিপূজা হলে সারা রাত্রিই সমারোহ, পূজার ব্যাপার।

অনুষ্ঠানে আচারে উৎসবে আনন্দে ভোজে যাত্রাগানে—সকলে মিলে-যাওয়া একটী পূজামণ্ডপে, গৃহস্থ পূজা বাড়ীতে; এই হল গৃহস্থবাড়ীর পূজা।

দেখি, দূর সম্পর্কের সাধারণ মানুষ ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সকলে সকলকে চিনছে। চিনতে হয়। কথা কইছেন। কথা কইতে হয়। কেউ পিসিমা কেউ জ্যেঠিমা কেউ খুড়িমা দিদিমা ঠাকুমা মামীমা মামা কাকা পিসে জ্যেঠা ভাই বোন নানা সম্পর্কের—না চিনে উপেক্ষা করে যাওয়ার সুবিধা ও প্রথা নেই গ্রামের সামাজিকতায়, পূজার দালানে। সহরে ধনী দরিদ্রের ভেদ, একটু ছেদ পড়ে। যেটা বিয়েবাড়ীতে হয়, পূজাবাড়ীতে ঠিক তা করা চলে না। সেটী চারদিনের দেবালয়, মহাদেবীর মণ্ডপ; সকলের সমান অধিকার পূজায়। সবাই প্রসাদ-কণিকার প্রত্যাশী, ভোজের নয়। সেখানে অহংকারের প্রবেশ নিষেধ।

এছাড়া জমীদার-বাড়ীতে পূজা উৎসব হলে সেখানে প্রজারা সকলে নতুন কাপড় পেতেন। দেওয়ার প্রথা ছিল। পান-ভোজন তো ছিলই। রাত্রে যাত্রাগানেও তারা যেমন সহযোগী, তেমনি শ্রোতাও হ'ত। হয়ও। এবং গৃহস্থ-বাড়ীর বা পারিবারিক এই সব পূজায় এখনো উগ্র গণতন্ত্র দেখা দেয়নি। কর্তা ও গৃহিণী একজন করেই আছেন। শহরে এখন মাত্র ত্রিশবছরেই কালের পটপরিবর্তন হয়ে গেছে—সমাজ-জীবনেও যেমন, বারোয়ারী বা সর্বজনীন মণ্ডপের পূজাতেও তেমনি। মানুষের উপকরণের প্রয়োজন অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে। ছোট বড় দরকারের শেষ আর নেই। সে দরকার দরকারী হোক বা না হোক।

আমোদ-প্রমোদ বিলাস-ব্যসনের উৎসবের রূপ যুগে যুগে বদলায়। তাকে যুগধর্ম বলেই মেনে নিতে হয়। মহাভারতের যুগ, বিক্রমাদিত্য-কালিদাসের যুগ, অবলুপ্ত মধ্যযুগ, মোগল যুগ, সকল যুগেই উৎসব-প্রমোদের বিলাস-ব্যসনের নিজ নিজ কাল অনুযায়ী রূপ ছিল। একালেও ইংরেজ আমলের আগে ও পরে সে তার নানা রূপ প্রভাব বৈচিত্র্য নিয়ে দেখা দিয়েছে। পুরাতন কিছু মিলিয়েও গেছে।

তবু একাল ভাল, কি সেকালের সব ভালো তা বলতে পারা শক্ত। কেন না সেই সব কাল্পনিক সেকাল ও সেকালের উৎসব ব্যসন তো আমাদের দেখা নেই। একালেও এসেছে বিচার-বিশ্লেষণ সেকালের ধরনের।

তবে যেটুকু ইতিহাসে জানা যায়, যেটুকু কালের প্রভাব এই শতক ও গত শতাব্দীর মানুষের মাঝে দেখা গেছে, তাতে কিছু মানুষের মনে সংশয় দেখা দিয়েছে। একালে তাঁদের মনে হচ্ছে, মানুষ যেন লঘুচরিত্রের হয়ে উঠেছে। কোনো মহৎ আদর্শবাদের স্বপ্ন আর সে দেখে না। আপাত প্রয়োজন, আপাত খ্যাতি, আপাত প্রমোদের পিছনে

আবাল-বৃদ্ধ আমরা ছুটে চলেছি যা' উনিশ শতকে এভাবের ছিল না।

তাই যখন দুর্গোৎসবের, সরস্বতীপূজার উৎসবের প্রাঙ্গণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে কিম্বা পূজা দেখতে দাঁড়াই, মনে হয় আমাদের যেন সাধারণ মানুষের মনে পূজার নিষ্ঠা, সম্ভ্রম, ক্রটি-বিচ্যুতির ভাবনা ভয় আর নেই! জাগে না। সব পূজাই আমাদের প্রমোদে পরিণত হয়েছে। তাতে গুরুজনের ভয় নেই। বিজ্ঞজনের নির্দেশগ্রহণ নেই। নিষ্ঠা নেই। সেবা নেই।

সর্বোপরি প্রসাদ-দান, শিশু-দরিদ্র-সেবা নেই। কাঙালী-ক্ষুধিতকে একদিনের জন্যও অন্নদান নেই এ উৎসবে। পুণ্যলোভ নেই। তার আড়ালে সংস্কারও নেই; করুণাও নেই।

এ উৎসব শুধু 'আলো', 'শব্দ', 'গতি'র উৎসব! মোটর-বিহারী ধনী ও সম্পন্ন মানুষদের এনে নিয়ে হালকা-মনের পল্লী-বালকের যুবকের আত্মকর্মপ্রচার-উৎসবময় ৺পূজার খেলা।

জনসাধারণের কাছে সংগৃহীত চাঁদা জনসাধারণের সেবায়, পাড়ায় বস্তির শিশুদের প্রসাদদানেও যদি কিছুটা ব্যয় করা হ'ত, দেখলে অনেকেই খুসী হতেন।

আসলে জনতার কাছে সংগ্রহ করা অর্থের তো হিসাব-নিকাশের, ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য-অপুণ্য কাজের দায় নেই। তাঁরা চাঁদা দেন নিরুপায় হয়ে। আর উদ্যোক্তাদেরও কোনো আদর্শ নেই সামনে। এই হল ওপর থেকে দেখা এ কালের পূজা।

যেটা বিগতকালে ছিল কর্তব্য, উচিত-অনুচিত-বোধের লোকভয়ের সদিচ্ছার ব্যাপার, একালে তা নেই। একালে বালকদের মনে সেভাব জাগে না। (জাগানো হয়নি?)। কিন্তু কালের মাপকাঠিতেই কাল প্রবাহিত হচ্ছে তো!

আমরা কিছু মানুষ দর্শক হয়ে ভাবছি মাত্র 'একাল-সেকাল', 'মহৎ আদর্শ'—মানুষের কল্যাণ-কথা কত কি!

সহসা স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি মনে পড়ে যায়, 'ভালো থাকলে মন্দ থাকবেই......' ('দেববাণী')।

কিন্তু সেতো হল অনেক উচ্চ স্তরের কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তি মনে পড়ে। মেয়েদের বলছেন, "পূজার যোগাড় করবে। ফুল-বেলপাতা বাছবে। চন্দন ঘসবে। মন ঠিক থাকবে"......('কথামৃত')। আনুষ্ঠানিক কাজ করা মানে মঙ্গল কর্মে রত থাকা। যেন স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষা দেওয়া চমকৎকার করে। হাতের মঙ্গল কাজ মনকেও সেখানেই নিয়ে যায়, শুদ্ধ করে। সহসা তারপর মনে হ'ল, হয়ত এই যুগধর্ম। এই আমোদ-প্রমোদ হৈহৈ-এর মাঝেও এই উদ্যোগপর্বেই ক্রমে মাতৃমূর্তির আরেক রকম প্রকাশ দেখতে পাওয়া যাবে নিশ্চয়।

*

একবার সরস্বতী-পূজার দিন একটী ছেলেকে বলেছিলাম, 'আলো-সভা-গানে মাইকে এত খরচ করলে, তা পাড়ার ছোট বড় ঘরের শিশুগুলি ঠাকুর দেখতে এলে তাদের একটু করে বোঁদে জিলাপী নারকোল নাড়ুর প্রসাদ দাও তো কেমন হয়? না হয় চাঁদা একটু বেশী নেবে। না হয় প্রতিমা নিয়ে প্রতিযোগিতা না করলে অন্য দলের সঙ্গে। কত হাসি মুখ দেখতে পাবে।'

ছেলেটি একটু ভাবল। বললে, 'আচ্ছা, পরের বছর করবার চেষ্টা করব।' পরের বারে আমি

অন্যত্র ছিলাম, জানিনে কি করেছিল। কিন্তু তার কথাটি বেশ ভালো লেগেছিল। মনে হ'ল মাথার ওপর 'পাকাচুলের' কেউ থাকলে এরা হয়ত পূজার জন্য সংগৃহীত অর্থ কিছু সৎকাজে খরচ করতে শেখে।

*

তবু এ আলোচনা সমালোচনা নয়। শুধু যেন আত্মগত ভাবনা, যা বয়স্ক দর্শকের মনে জাগে।

সত্যই এই আমাদের বাংলাদেশের ও বাঙালীর সবচেয়ে বড় সর্বজনীন উৎসব। যাকে শুধু ৵পূজা বললেই বোঝা যায়। কার 'পূজা', কোন্ 'পূজা', কোন্ মাসে 'পূজা'—পারিবারিক সর্বজনীন—যেকোনও দেশেই হোক না কেন, সে 'পূজা'—'পূজা', এই আমাদের পূজা (পূজো), আমাদের দুর্গোৎসব! মহামায়ার মহাপূজা। যাতে ব্রাহ্মণের চণ্ডীপাঠ থেকে 'বেশ্যার দুয়ারের মাটী'টুকুও চাই!! সবাই জানে কোন্ তিথি কবে, সন্ধিপূজা কখন—এমনি সর্বজনীন সর্বময়ীর পূজা। মনে হল আমাদের ছোট্ট সীমাময় জীবন আর মন নিয়ে ভাববার কি আছে বা! "সকলই তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।"

তবু 'ইচ্ছাময়ী' আমাদের এই সর্বজনীন আনন্দ-উৎসকে কল্যাণের পথ দেখিয়ে দিন। মনে মনে বার বার নিবেদন আসে।

মায়ের মহিমা

সেখ সদর উদ্দীন

মন্দিরে নয়, তীর্থেও নয়, কোথায় জননী থাকে?
সারাটা ভুবনে নয়ন মেলিয়া দেখেছি আমার মাকে!
দেখেছি সবুজ তৃণ-লতিকায়, দেখেছি যে নীলিমায়,
ভোরের পাখীর কূজনে দেখেছি, কুসুমের মহিমায়।
মায়ের মহিমা ভুবনে ভুবনে হৃদয়ে হৃদয়ে লেখা,
চেয়ে যে দেখে না সেজন কখনো পায় না মায়ের দেখা।
শিশিরের বুকে দেখেছি আবার সূর্যের বিশালতা—
সদ্য-ফোটা এ হৃদয়পদ্মে তাঁহারই আসন পাতা।
ভিতরে-বাহিরে সব ঠাঁই তাঁরে চোখ খুলে দেখা চাই,
মায়ের ভজন-পূজন তবেই সার্থক হবে ভাই!

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মজীবনের ভাবধারা

ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সাধারণ মানুষের ধর্মভাব কিরূপ, সাধারণ ও বিশিষ্ট ধার্মিক ব্যক্তিদের ধর্মজীবনের ধারা কিরূপ, আর শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মজীবনের ভাবধারার কি বৈশিষ্ট্য, তাহা প্রদর্শন করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এ বিষয়টি আলোচনা করিলে প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ ধর্মজীবন কাহাকে বলে, তাহা বুঝা যাইবে এবং মানুষের ধর্মজীবনের আদর্শ সম্বন্ধেও কিছু আলোক পাওয়া যাইবে।

সাধারণ মানুষের ধর্মজীবন ঈশ্বরবিশ্বাস ও সাধুচরিত্রে নিবদ্ধ বলা যায়। তাঁহারা আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন অর্থাৎ ঈশ্বর আছেন ইহা বিশ্বাস করেন, যদিও ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন স্পষ্ট ধারণা নাই। তাঁহারা সাধুচরিত্রের লোক এবং সামাজিক সদাচার পালন করেন। তাঁহারা মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, পরপীড়ন, পরস্বাপহরণ প্রভৃতি কুকার্য অর্থাৎ অধর্ম আচরণ করেন না। লোক-দৃষ্টিতে ও সাধারণ বিচারে এইসব লোককে ধার্মিক বলা হয়। তাঁহাদের ধর্মজীবনকে আস্তিক্যবুদ্ধি ও নৈতিক আদর্শে প্রতিষ্ঠিত বলা যায়।

সাধারণ ধার্মিক ব্যক্তিদের ধর্মজীবন কতকটা অন্যরূপ। যাঁহারা নিজ নিজ ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ ও নির্দেশ পালন করেন, তাঁহাদেরই ধার্মিক ব্যক্তি বলা হয়। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র অনুসারে বেদ-বিহিত কর্মানুষ্ঠান করার নামই ধর্ম। যে হিন্দু প্রতিদিন সন্ধ্যাবন্দনা তর্পণ পূজাপাঠাদি নিত্য কর্ম, গ্রহণে গঙ্গাস্নানাদি নৈমিত্তিক কর্ম করেন এবং স্বর্গ ও অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষ লাভের জন্য যাগযজ্ঞাদিরও অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে আমরা পরম ধার্মিক ব্যক্তি বলিয়া গণ্যমান্য করি। যে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী নিত্য বাইবেল পাঠ করেন এবং সপ্তাহের প্রথম দিন রবিবারে ও বিশেষ বিশেষ পর্বদিবসে গির্জায় উপাসনা করেন, তাঁহাকেও সকলে ধার্মিক ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করেন। এরূপ ধার্মিক ব্যক্তিদের ধর্মজীবন শাস্ত্রোপদিষ্ট সাময়িক ও স্বল্পকালস্থায়ী কর্মানুষ্ঠানে নিবদ্ধ।

সাধু ও সন্ন্যাসিগণ লোকসমাজে বিশিষ্ট ধার্মিক ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। তাঁহাদিগকে বিশিষ্ট ধার্মিক ব্যক্তি বলিবার কারণ এই যে, তাঁহাদের মধ্যে যে ত্যাগ-বৈরাগ্য ও একনিষ্ঠ ঈশ্বরানুরাগ দেখা যায়, তাহা অন্যশ্রেণীর ধার্মিক ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যায় না। তাঁহারা বিবেক, বৈরাগ্য, শমদমাদি ও মুমুক্ষুত্ব এই চারিটি সাধন-সম্পদ্ অর্জন করিয়াছেন। ঈশ্বরই একমাত্র নিত্য বস্তু, তদ্ভিন্ন সকল বস্তুই অনিত্য—এরূপ বিবেক-বুদ্ধি তাঁহাদের জন্মিয়াছে। তাঁহারা ইহলোক ও পরলোকের সকল বস্তুর ভোগবাসনা ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা শম অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় সংযম, দম অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয় সংযম, উপরতি অর্থাৎ সন্ন্যাস, তিতিক্ষা অর্থাৎ শীত-গ্রীষ্মাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা, সমাধি অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা ও শ্রদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচার্য-বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস —এই ষট্ সম্পত্তি অর্জন করিয়াছেন। সাধু-সন্ন্যাসীরা মোক্ষলাভের আন্তরিক ইচ্ছা পোষণ করেন এবং সে-জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন। তাঁহারা নিত্য নিয়মিতভাবে ধ্যান, জপ, পূজার্চনা ও তপস্যা করেন।

বর্তমানকালে সাধু-সন্ন্যাসীদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর সাধু-সন্ন্যাসী আছেন, যাঁহারা সংসার ও সমাজ ত্যাগ

করিয়াছেন। তাঁহারা লোকালয় হইতে দূরে থাকেন এবং আকাশবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ দৈবক্রমে প্রাপ্ত ভিক্ষান্নের উপর নির্ভর করিয়া অরণ্যে কিংবা পর্বতে তপস্যানিরত থাকেন। আর এক শ্রেণীর সাধু-সন্ন্যাসী আছেন, যাঁহারা লোকালয়ের বাহিরে কোন নির্জন প্রদেশে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজার্চনা ও জপধ্যান করেন এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিয়া দিনাতিপাত করেন। এই দুই শ্রেণীর সাধুদের ধর্মজীবন প্রায়শঃ নিজ মোক্ষলাভের জন্য কঠোর তপস্যায় নিয়োজিত ও অতিবাহিত হয় বলিয়া মনে হয়। তৃতীয় শ্রেণীর সাধু-সন্ন্যাসিগণ সংসারত্যাগী হইয়াও লোকসমাজের অদূরে বাস করেন এবং প্রধানতঃ নানাবিধ লোককল্যাণকর কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহারা ত্যাগ ও বৈরাগ্যের সহিত নিষ্কাম্-কর্মের সমন্বয় ও সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলেন। তাঁহারা দেশ-বিদেশে মঠ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতেছেন; সেবাশ্রম, অনাথাশ্রম, দাতব্য চিকিৎসালয়, স্কুল-কলেজ, সভা ও সংস্কৃতি-ভবন প্রভৃতি স্থাপন করিয়া জ্ঞানদান ও শিবজ্ঞানে জীবসেবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। নিষ্কামভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে নিরভিমান হইয়া এসব লোকহিতকর কর্ম করিলে ভগবদ্গীতায় উপদিষ্ট কর্মযোগের অনুষ্ঠান করা হয় এবং তাহাতেই ভগবান্লাভ ও মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, নতুবা এসব কর্ম পুনরায় সংসার-বন্ধনের কারণও হইতে পারে। এই শ্রেণীর সাধু-সন্ন্যাসীদের ধর্মজীবন 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' অর্থাৎ নিজের মোক্ষ ও জগতের হিতার্থে নিয়োজিত বলা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মজীবনের ভাবধারা পূর্বোক্ত সকল প্রকার ধর্মজীবন হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র বলা যায়। তাঁহার ধর্মজীবনে তিনটি ভাব দেখা যায়—সাধকভাব, দিব্যভাব ও গুরুভাব। এই ভাবগুলির পর্যালোচনা করিলে শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মভাবের কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে।

সত্যনিষ্ঠা ধর্মভাবের প্রধান প্রতিষ্ঠা ও সাধকভাবের প্রধান অবলম্বন। যে সাধকের জীবন সত্যে প্রতিষ্ঠিত, কেবল তিনিই সত্যস্বরূপ ভগবানকে লাভ করিতে পারেন; সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হইলে সত্যদর্শন বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মজীবনের সকল ভাবের মধ্যেই অটল সত্যনিষ্ঠা দেখা যায়। তিনি বলিতেন যে, 'সত্য কথাই কলির তপস্যা'। তিনি শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্য, ভালমন্দ, জ্ঞান-অজ্ঞান সর্বস্ব অর্পণ করিয়াও 'মা! এই নাও তোমার সত্য, এই নাও তোমার অসত্য'—এ কথাটি বলিতে পারেন নাই। বাল্যকালেই শ্রীরামকৃষ্ণের সত্যনিষ্ঠার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তখন তাঁহার নাম গদাধর। নবম বর্ষ বয়সে গদাধরের উপনয়ন-সংস্কার হয়। উপনয়নের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার শেষে উপবীতধারী ব্রহ্মচারীকে তাঁহার মাতাই প্রথম ভিক্ষা দেন—ইহাই প্রচলিত প্রথা। কিন্তু গদাধরের জন্মকালে যে ধনী কামারনী তাঁহার মাতা চন্দ্রা দেবীর সহায়তা করিয়াছিল, তাহার প্রার্থনামত সেই প্রথম ভিক্ষা দিবে এরূপ প্রতিশ্রুতি গদাধর তাহাকে পূর্বে দিয়াছিলেন। ধনী ব্রাহ্মণেতর জাতি বলিয়া গদাধরের অগ্রজ রামকুমার ইহাতে আপত্তি করিলেন। তখন গদাধর দৃঢ়তার সহিত বলিলেন যে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলে তিনি মিথ্যাবাদী হইবেন এবং যজ্ঞোপবীত ধারণের অযোগ্য হইবেন। অবশেষে গদাধরের প্রতিশ্রুতি রক্ষা হইল এবং ধনী তাঁহাকে প্রথম ভিক্ষা দিয়া ধন্যা হইল। শ্রীরামকৃষ্ণের সত্যনিষ্ঠা সকল কার্যে ও ব্যবহারে প্রমাণিত হইত। তিনি বলিতেন—"সত্যকে আঁট করে ধরে থাকলে ভগবান্ লাভ হয়। সত্যে আঁট না থাকলে ক্রমে

ক্রমে সব নষ্ট হয়ে যায়। আমি এই ভেবে, যদি কখন বলে ফেলি যে বাহ্যে যাব, যদি বাহ্যে নাও পায় তবুও একবার গাড়ুটা সঙ্গে করে ঝাউতলার দিকে যাই। ভয় এই—পাছে সত্যের আঁট যায়।" এরূপ অবিকম্পিত সত্যনিষ্ঠা বর্তমান জগতে অতি বিরল।

শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ বৈরাগ্য ও তপশ্চর্যার তুলনা জগতের ইতিহাসে মিলে না। গভীর রাত্রে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের উদ্যানের উত্তর সীমানায় অবস্থিত জঙ্গলে তিনি তপস্যা করিতেন। তিনি বলিতেন যে, মানুষ জন্মাবধি ঘৃণা, লজ্জা, মান, অপমান, মোহ, দম্ভ, দ্বেষ ও পৈশুন্য অর্থাৎ খলতা এই অষ্টপাশে আবদ্ধ হইয়া সংসারে আসক্ত হয়। সংসারবন্ধন ছিন্ন করিতে হইলে অষ্টপাশ হইতে মুক্ত হইয়া তপস্যা করিতে হয়। সেজন্য তপস্যা করিবার সময় তিনি পরিধেয় বস্ত্র এবং যজ্ঞোপবীত পর্যন্ত ত্যাগ করিতেন, পাছে উপবীত তাঁহার মনে জাত্যভিমান জাগ্রত করে। নীচজাতীয় ভিক্ষুকদের ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করিয়া এবং তাহাদের ভোজনস্থান ধৌত করিয়া তিনি তাঁহার ব্রাহ্মণত্বে অভিমানশূন্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি কেবল কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা বলিতেনই না, এ ত্যাগ তাঁহার মনে-প্রাণে ও অস্থি-মজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট ছিল। টাকা স্পর্শ করিলে তাঁহার দেহে যন্ত্রণা উপস্থিত হইত এবং দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকল হইয়া পড়িত। তাঁহার ত্যাগ, বৈরাগ্য ও তপস্যা অভূতপূর্ব ও অশ্রুতপূর্ব।

শ্রীশ্রীজগন্মাতার দর্শনলাভের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের যে আগ্রহাতিশয্য, আন্তরিক চেষ্টা ও ব্যাকুলতা, তাহার দৃষ্টান্ত কদাচিৎ দেখা যায়। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি আহারনিদ্রা প্রায় ত্যাগ করিয়া তিনি শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকট কত কাতর প্রার্থনা করিয়াছেন, কত আকুল ক্রন্দন করিয়াছেন এবং তাঁহার দর্শন না পাইয়া কি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন। পরিশেষে যেদিন তিনি কালীমন্দিরে পূজা সমাপনান্তে শ্রীশ্রীজগন্মাতা দর্শন দিলেন না বলিয়া তাঁহারই বলির খড়্গ লইয়া আত্মবলি দিতে উদ্যত হইলেন, সেই দিন সেই ক্ষণে শ্রীশ্রীজগন্মাতার বিশ্বব্যাপী জ্যোতির্ঘন মূর্তি দর্শন করিলেন এবং মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

এই দিব্যদর্শনের পর শ্রীরামকৃষ্ণ দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার দিব্যভাবের দুইটি দিক্ আছে। একদিকে তাঁহার সর্বকালে ও সর্ববস্তুতে ব্রহ্মদর্শন হইতে লাগিল। আর একদিকে তাঁহার ধর্মজীবন শ্রীশ্রীজগন্মাতার শিশুসন্তানের জীবনে পরিণত হইল। এখন এই দুই দিকের কথার কিছু আলোচনা করিব।

এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, শ্রীশ্রীজগন্মাতার দর্শনই শ্রীরামকৃষ্ণের ব্রহ্মদর্শন। তিনি শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে সচ্চিদানন্দময়ীরূপে দর্শন করেন। তাঁহার নিকট সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ও সচ্চিদানন্দময়ী কালী একই তত্ত্ব। তিনি বলিতেন, 'কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী, একই বস্তু'।

উপনিষদের এক মহাবাক্য হইতেছে—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' অর্থাৎ এইসবই ব্রহ্ম। শ্রীরামকৃষ্ণের ব্রহ্মোপলব্ধি এই বাক্যের সার্থকতা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন করিয়াছে। কোন কোন অদ্বৈতবাদীর ন্যায় তিনি জীবজগৎকে অসত্য বা মিথ্যা বলেন না। তিনি সকল বস্তুকেই জগন্মাতার চিন্ময় রূপ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং সকল বস্তুতেই তাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন। তাঁহার অনুভূতিতে ঘর-দুয়ার, খাট-বিছানা, ঘটি-বাটি সবই চিন্ময়। তিনি বলিতেন—'দেখলাম সব চৈতন্যে জ'রে আছে'। এই অবস্থায় কালীমন্দিরের

উদ্যানের দূর্বাদলের উপর তিনি চলিতে পারিতেন না। কেহ তাহার উপর দিয়া চলিলে তাঁহার বুকে ব্যথা লাগিত, তিনি অনুভব করিতেন যে, তাঁহার বুকের উপর কেহ চলিতেছে। এক সময় কালীবাড়ীর একটি বিড়ালকে তিনি মা-কালীর প্রসাদী লুচি খাওয়াইয়াছিলেন। ইহাতে প্রসাদের পবিত্রতাহানি হইয়াছে এই আশঙ্কায় মন্দিরের কর্মচারীরা তাঁহার বিরুদ্ধে রানী রাসমণির নিকট অভিযোগ করে। কিন্তু তিনি বিড়ালকে শ্রীশ্রীজগন্মাতার একটি রূপ এই জ্ঞানে খাওয়াইয়াছেন ইহা জানিতে পারিয়া রানী রাসমণি তাঁহার কোন কার্যের সমালোচনা করিতে কর্মচারীদের নিষেধ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের এরূপ অবাধিত ও সার্বত্রিক ব্রহ্মানুভূতির দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়া যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রহ্মভূত পুরুষ হইয়াও শ্রীশ্রীজগন্মাতার একান্ত সন্তানরূপে জীবন যাপন করিয়াছেন। মাতৃভক্ত শিশু তাহার সকল কাজে ও সকল অবস্থায় মা ছাড়া আর কিছু জানে না, তাহার সকল সুখ-দুঃখের কথা মাকে বলে, মায়ের আদেশ বা অনুমতি ব্যতীত কোন কাজ করে না, সব সময় মায়ের কাছে কাছে থাকে, মাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণও তেমনি শ্রীশ্রীজগন্মাতার চিরসান্নিধ্যে থাকিতেন এবং মায়ের একান্ত ভক্ত ও নির্ভরশীল সন্তান-রূপে আচরণ করিতেন। মায়ের সঙ্গে কথোপকথন, মায়ের সঙ্গে বিচরণ, দিনে ও রাতে মায়ের ভজন-পূজন, সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহার ধর্মজীবনের প্রধান কর্ম হইয়াছিল। ঈশ্বরীয় কথা ব্যতীত অন্য কথা তাঁহার ভাল লাগিত না, বিষয়-সম্পত্তির কথা তিনি শুনিতে পারিতেন না, বিষয়ী লোকের সঙ্গ সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি সর্বদা ঈশ্বরীয় কথা বলিয়া, ঈশ্বরের নাম-গুণ কীর্তন করিয়া ভক্তসঙ্গে প্রেমানন্দে মাতোয়ারা থাকিয়া দিন কাটাইতেন। আর যদি কখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হইতেন, তবে তাহার মীমাংসার জন্য কালীমন্দিরে মায়ের কাছে ছুটিয়া যাইতেন এবং মায়ের বাণী শুনিয়া নিঃসন্দিগ্ধ মীমাংসায় উপনীত হইতেন। তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা হলধারী একদিন তাঁহাকে বলেন—'কালী কেবল ভয়ঙ্করা সংহারশক্তি, তাঁহার পূজা কর কেন?' একথা শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ কালীমন্দিরে ছুটিয়া গেলেন এবং সজলনয়নে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মা! হলধারী শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত, সে বলছে তুমি নাকি শুধু ভীষণা সংহারশক্তি, একথা কি সত্য?' তৎক্ষণাৎ মায়ের পূর্ণ স্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রকাশিত হইল। তিনি আনন্দে অধীর হইয়া হলধারীর নিকট ফিরিয়া গেলেন এবং বলিলেন—'না, মা সবই, তিনি কেবল ভীষণা নন্, তিনি সকল গুণের আশ্রয়ভূতা, আনন্দস্বরূপিণী।' অদ্বৈত-বেদান্তী তোতাপুরী যখন শ্রীরামকৃষ্ণকে অদ্বৈত সাধনায় ব্রতী হইতে উপদেশ করেন, তখন তিনি প্রথমে মা-কালীকে জিজ্ঞাসা করিয়া ও তাঁহার অনুমতি লইয়া ইহাতে সম্মত হন। তন্ত্র-সাধনার পূর্বেও তিনি মা-কালীর অনুমতি লইয়াছিলেন। এ যেন মায়ের মত না লইয়া মাতৃভক্ত ছেলের কোন কাজ করা চলে না। পিতৃবিয়োগের পর শ্রীনরেন্দ্রনাথ (উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ) অত্যন্ত আর্থিক অভাবে পড়েন এবং তাঁহার পোষ্যবর্গের অন্নবস্ত্রের কষ্ট হইতে থাকে। এই দারুণ অভাব দূর করিবার জন্য নিরুপায় হইয়া নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে কিছু করিলেন না, তাঁহার মায়ের নিকট প্রার্থনা করিতে বলিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মা ছাড়া আর কিছু

জানিতেন না, কখন কখন তিনি তাঁহার নিজের পৃথক্ অস্তিত্বও ভুলিয়া যাইতেন।

এই যে মায়ের উপর একান্ত নির্ভরশীলতা, এই 'নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু'-ভাব অর্থাৎ 'আমি কিছু নয়, মা! তুমিই সব' এই ভাব শ্রীরামকৃষ্ণের গুরুভাবের মধ্যেও অম্লান ও অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি সর্বদাই বলিতেন—'ঈশ্বর লোকশিক্ষার জন্য নিজে গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। সচ্চিদানন্দই গুরু।'

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মজীবনের ভাবধারা পর্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে, ধর্মজীবনের সারকথা সপ্তাহে একবার অথবা প্রতিদিন একাধিকবার শাস্ত্রোপদিষ্ট বাহ্যিক কর্মানুষ্ঠানমাত্র নয়। প্রকৃত ধর্মজীবনের সারকথা হইল সর্বত্র ঈশ্বরদর্শন এবং সর্বদা ঈশ্বর-সান্নিধ্যের অনুভূতি ও তদনুযায়ী আচরণ। ইহাই ধর্মজীবনের আদর্শ। প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি নিরন্তর বোধ করেন যে, তিনি সদাই ঈশ্বরের সন্নিকটে আছেন আর ঈশ্বরও সদাই তাঁহার অন্তরে থাকিয়া তাঁহাকে মুক্তিপথে লইয়া যাইতেছেন। এরূপ ব্যক্তির ধর্মজীবনকে ধর্মময় জীবন বলা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মজীবন প্রকৃতপক্ষে ধর্মময় জীবন। আমাদের শিক্ষার জন্য তিনি ধর্মজীবনে ষোল আনা টান দেখাইয়া গিয়াছেন, যদি আমরা এক আনা টানও আনিতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মময় জীবনের এক আনা কেন, এক কণাও পাইলে আমরা ধন্য হইব, আমাদের মানবজীবন সার্থক হইবে।

"বিজ্ঞানীর অবস্থায় রেখেছে।"

"শুধু ঈশ্বর আছেন, বোধে বোধ করলে কি হবে? ঈশ্বর দর্শন হলেই যে সব হয়ে গেল, তা নয়।"···
"রাজাকে কেউ কেউ দেখেছে। কিন্তু দু একজন বাড়ীতে আনতে পারে, আর খাওয়াতে পারে।"

*

"কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের পরও আছে। জ্ঞানের পর বিজ্ঞান।"
"বিজ্ঞান—কিনা তাঁকে বিশেষরূপে জানা। কাষ্ঠে আছে অগ্নি, এই বোধ—এই বিশ্বাসের নাম জ্ঞান। সেই আগুনে ভাত রাঁধা, খাওয়া, খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান। ঈশ্বর আছেন এইটি বোধে বোধ, তার নাম জ্ঞান; তাঁর সঙ্গে আলাপ, তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা—বাৎসল্যভাবে, সখ্যভাবে, দাসভাবে, মধুরভাবে এরই নাম বিজ্ঞান। জীবজগৎ তিনি হয়েছেন এইটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান। একমতে দর্শন হয় না—কে কাকে দর্শন করে। আপনিই আপনাকে দেখে।"
"বিজ্ঞানীর কিছুতেই ভয় নাই। সে সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকার করেছে।"

-শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ*

স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ

শাস্ত্রে ঐকান্তিক ভক্তির কথা আছে, কিন্তু অবতারপুরুষ বা তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের জীবন না দেখলে এই একনিষ্ঠ ভক্তি যে কি তা বোঝা যায় না। সাধারণ মানুষের জীবনে ভক্তি দেখা যায়, কিন্তু সে ভক্তি ভক্তির পরাকাষ্ঠা নয়। নারদীয় ভক্তিসূত্রে আছে, 'তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি, সুকর্মীকুর্বন্তি কর্মাণি, সচ্ছাস্ত্রীকুর্বন্তি শাস্ত্রাণি'—একনিষ্ঠ ভক্তগণের দ্বারা তীর্থের মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কর্ম সুকর্মে পরিণত হয়, কর্মের আদর্শ কি তা তাঁদের জীবন দেখলেই জানা যায়, তাঁরাই শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করেন, শাস্ত্রবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য তাঁদের জীবনেই পরিস্ফুট হয়। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের জীবন এরূপ অনন্যভক্তিময় একটি ভাগবত জীবন, যার অনুধ্যানে এই ভক্তিসূত্রটির যাথার্থ্য উপলব্ধ হয়।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ছিলেন গুরুগতপ্রাণ। তাঁর গুরুভক্তি অতুলনীয়। গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দ্বারা তিনি যে অত্যুজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করেছেন তা চিরদিন সকলকে অনুপ্রাণিত করবে। শ্রীশ্রীঠাকুর যখন কাশীপুর উদ্যান-বাটীতে অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন, তখন তিনি তাঁর সেবাকেই জীবনের একমাত্র কর্তব্য জ্ঞান করতেন; তাঁর অপর গুরুভাইরা শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা এবং শাস্ত্রপাঠ ধ্যানভজন ইত্যাদি নিয়ে থাকতেন, কিন্তু তাঁর নিকট শ্রীগুরুর সেবাই ছিল ধ্যানভজন পূজাপাঠ সব কিছু। তিনি কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুর সেবায় সর্বদা রত থাকতেন। মন প্রাণ ঢেলে সেবা করা বলতে কি বোঝায়, যাঁরা তাঁর গুরুসেবা দেখেছেন, তাঁরাই অনুভব করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসানের পর তাঁর অন্যান্য গুরুভাইরা হিমালয় প্রভৃতি স্থানে তপস্যায় গিয়েছিলেন, কিন্তু শশীমহারাজ তখনও শ্রীগুরুর সেবাকেই জীবনের সার করে নিয়েছিলেন। তিনি কোথাও তপস্যা করতে গেলেন না, তীর্থাদি দর্শনেরও প্রয়োজন বোধ করলেন না; শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি স্থাপন করে তাঁর ধ্যান ও পূজাতেই একনিষ্ঠভাবে নিরত হলেন। ঠাকুরের প্রতিকৃতি তাঁর নিকট প্রতিকৃতিমাত্র ছিল না—ছিল জীবন্ত দেবতা। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবনের সর্বস্ব; সেই জীবনদেবতা তাঁর সম্মুখে সদাবর্তমান, কখনও তাঁর অদর্শন ঘটত না। বরাহনগর ও আলমবাজার মঠে তাঁর ঠাকুরপূজা দর্শনের বস্তু ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরকে বিধি অনুযায়ী পূজা করেই তিনি সন্তুষ্ট হতেন না, তাঁকে জীবন্ত জেনে তদনুরূপ সেবা করতেন ও তাঁর ধ্যানে ডুবে যেতেন। গ্রীষ্মে নিজের কষ্ট হলে তিনি পাখা নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বাতাস করতেন এবং নিজে গলদ্‌ঘর্ম হতে থাকলেও তাতেই আরামবোধ করতেন। আত্মবৎ গুরু এবং ইষ্টের সেবার কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তার নিদর্শন এ জগতে দুর্লভ। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের জীবনে এই আত্মবৎ গুরুসেবা ও ইষ্টসেবার চরম সার্থকতা দেখা যায়। তিনি রামকৃষ্ণময় ছিলেন—শয়নে স্বপনে নিদ্রায় জাগরণে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর চিত্তে সদা জাগ্রত থাকতেন।

* গত ২৬শে জুলাই বারাণসী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে প্রদত্ত ভাষণ অবলম্বনে।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন প্রথমবার আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন মাদ্রাজের ভক্তগণ সেখানে একটি মঠস্থাপনের জন্য অনুরোধ করলে তিনি বলেছিলেন, 'আমি তোমাদের কাছে আমার এমন এক গুরুভাইকে পাঠাব, যিনি তোমাদের সর্বাপেক্ষা গোঁড়া ব্রাহ্মণের চেয়েও গোঁড়া, অথচ পূজা শাস্ত্রজ্ঞান ও ধ্যানধারণাদিতে অতুলনীয়।' স্বামীজীর মনে রামকৃষ্ণানন্দের কথাই তখন উদিত হয়েছিল। আলমবাজার মঠে এসে স্বামীজী রামকৃষ্ণানন্দকে বলেন, 'ভাই শশী, ঠাকুরের কাজে তোমায় মাদ্রাজে যেতে হবে।' জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও সঙ্ঘনেতার আহ্বানকে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরেরই নির্দেশ মনে করলেন এবং দ্বিরুক্তি না করে স্বামীজীর আদেশপালনে তৎপর হলেন। আলমবাজার মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা-পূজা ছেড়ে তিনি মাদ্রাজে গেলেন।

মাদ্রাজে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি স্থাপন করে পূজাদি আরম্ভ করেন এবং নানাস্থানে বক্তৃতা ও ক্লাসের মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবপ্রচারে যত্নপর হন। ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য তুচ্ছ করে সর্বসাধারণের মধ্যে কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা সঞ্চারিত করবেন, সেই দিকেই তাঁর অতন্দ্র দৃষ্টি সদা নিবদ্ধ থাকত। তিনি গীতা উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্র সহজ ও সরলভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে ব্যাখ্যা করতেন। শ্রোতার সংখ্যা কম কি বেশী সেদিকে তাঁর দৃষ্টি থাকত না, তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে শোনাচ্ছেন মনে করেই শাস্ত্রাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা করতেন।

অনেক সময় শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভোগ নিবেদনের মতো বস্তুর অভাব হত। একদিন ভোগ দেবার মতো বিশেষ কিছুই ছিল না; স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বাইরে গিয়েছিলেন, ঘর্মাক্তকলেবরে ফিরে এসে অভিমানে ঠাকুরকে বললেন, 'আমায় পরীক্ষা হচ্ছে? আমি তোমায় সমুদ্রের তীর থেকে বালি এনে ভোগ দেব এবং তাই প্রসাদ পাব। পেট না নিতে চায়, আঙুল দিয়ে ঠেলে সে প্রসাদ গলায় ঢোকাব।' শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় সেদিন ততদূর অগ্রসর হতে হয়নি, গৃহদ্বারে করাঘাতের শব্দে সচকিত রামকৃষ্ণানন্দ দরজা খুলে দেখেন, ঠাকুরের ভোগের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহ জনৈক ভক্ত সম্মুখে দণ্ডায়মান!

একরাত্রে মশার কামড়ে ঘুম ভেঙ্গে গেলে রামকৃষ্ণানন্দ দেখলেন, মশারির মধ্যে মশা ঢুকেছে; তাঁর মনে হল ঠাকুরের তো মশায় নিদ্রার ব্যাঘ্যাত হচ্ছে, তাই তিনি তৎক্ষণাৎ মশা তাড়াতে চললেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা তাঁর কাছে ছিল জীবন্ত দেবতার সেবা! ঠাকুরঘরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতি স্পষ্ট অনুভব করতেন; পুষ্পচয়ন, পূজা, আরতি, প্রণাম প্রভৃতি কার্যে এত বিভোর হয়ে পড়তেন যে, উপস্থিত ভক্তদের মধ্যেও সে ভাব সঞ্চারিত হত।

শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ রামকৃষ্ণানন্দ অনন্যা ভক্তির উজ্জ্বল আদর্শ রেখে গেছেন। ঠাকুরঘরে, সভাসমিতিতে, ভক্তগণের সহিত মেলামেশায়—সর্বক্ষেত্রে অনন্যা ভক্তিই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ও কর্মপ্রচেষ্টার উৎস। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবপ্রচারে তাঁর অনলস প্রচেষ্টার ফলে দক্ষিণ ভারতে যে বীজ উপ্ত হয়েছিল, তা আজ ফলপুষ্পসমন্বিত বিরাট মহীরুহে পরিণত। দাক্ষিণাত্যে সর্বসাধারণের মুখে মুখে শ্রীরামকৃষ্ণসন্তান আদর্শ সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণানন্দের নাম। মাদ্রাজে প্রতিবৎসর রামকৃষ্ণানন্দের জন্মোৎসব মহোৎসাহে অনুষ্ঠিত হয়।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে তাঁর দেহাবসান ঘটলেও তাঁর আদর্শ এখনও সজীব—তাঁর অনুপ্রেরণা এখনও জীবন্ত।

মাতৃ-উপাসনা

স্বামী জীবানন্দ

'মা' নাম উচ্চারণ করলেই মন পবিত্রতায় ভরে ওঠে। এমন কেউ নেই, মা-ডাক যার অন্তর স্পর্শ করে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'মাতৃভাব শুদ্ধভাব।' মা সন্তানের হৃদয়মন অধিকার করে আছেন। শিশুর মুখ দিয়ে প্রথম এই মা-নামই উচ্চারিত হয়। অনাহারে অনিদ্রায় কত কষ্ট করে শিশুকে মা পালন করেন। মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে শিশুর মধ্যে সঞ্চারিত হয় মায়ের স্নেহ ভালবাসা করুণা। তাই শিশু মাতৃগতপ্রাণ। অসহায় শিশুর মা-ই একমাত্র আশ্রয়। বড় হয়েও বিপদেআপদে অসুস্থ অবস্থায় বিদেশে মায়ের কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে।

ঈশ্বরকে মাতৃভাবে উপাসনা করা অনেক সহজ, শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেই মাতৃভাবে সাধনা করতে পারে। পুত্র কন্যা সকলেরই মায়ের উপর সমান অধিকার। মাতৃভাব তাই নরনারী-নির্বিশেষে সকলেরই অন্তর স্পর্শ করে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মাতৃসাধনার অপূর্ব তত্ত্ব আছে। সাধনার চরম উৎকর্ষ উপলব্ধিতে। যিনি নিজের ইষ্টকে নিজের মধ্যে এবং সকলের মধ্যে সর্বত্র উপলব্ধি করেন, তিনিই জীবনে কৃতকৃত্য হয়েছেন। সর্বব্যাপিনী মাকে যিনি অন্তরে-বাহিরে উপলব্ধি করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ মাতৃসাধক।

সন্তানের মনে কামনা-বাসনা থাকে, সে তো সব ত্যাগ করে একেবারে বাসনাশূন্য হ'তে পারে না। কামনা আর কিসের? ধন জন মান—এই সব পার্থিব জিনিসেরই তো! চণ্ডীপাঠের পূর্বে তাই জগজ্জননীর কাছে এইসব চাওয়ার বিধান আছে (অর্গলাস্তোত্র):

বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

যদি কিছু চাইতে হয়, চাওয়া ভাল মায়ের কাছেই; মা—নিজের মা। মায়ের উপর জোর চলে, আবদার চলে, নির্ভয়ে অগ্রসর হওয়া যায়। সন্তান যতই অযোগ্য হোক না কেন, মা তাকে পায়ে ঠেলেন না—স্নেহ থেকে বঞ্চিত করেন না। তিনি যখন সৃষ্টি করেছেন, পালন করার ভার তো তাঁরই। যতক্ষণ বাসনা রয়েছে, অসদুপায়ে বিদ্যা অর্থ যশ অর্জন করার চেয়ে রাজরাজেশ্বরী মায়ের কাছে এ-সব চেয়ে নেওয়া অনেক ভাল। মাকে ডাকা হবে, তার সঙ্গে বাসনাপূরণের জন্য প্রার্থনাও হবে।

কিন্তু এই যে সাংসারিক সুখ-সমৃদ্ধিলাভের জন্য প্রার্থনা, শত্রুনাশের জন্য প্রার্থনা—এ তো নিকৃষ্ট প্রার্থনা। বিষয়-বাসনা ত্যাগ না করতে পারলে, মন সম্পূর্ণ বাসনাশূন্য না হ'লে মাতৃদর্শনলাভ অসম্ভব—এ-কথা সত্য। কিন্তু আন্তরিকতা থাকলে মায়ের কৃপায় পার্থিব সুখভোগের উপকরণগুলি পরিণামে আর প্রার্থনীয় থাকে না, সামান্য কাচখণ্ডের মতো বা মাটির ঢেলার মতো অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায়! পুতুল আর কতদিন ভাল লাগে? যাঁর দেওয়া পুতুল এখন তাঁকেই যে চাই! এই অবস্থায় অর্থার্থী ভক্তের হৃদয়ে সকাম ভক্তির স্থলে অহৈতুকী ভক্তির আবির্ভাব হয়।

আবার মায়ের কাছে যে পার্থিব বস্তু প্রার্থনা

করে, সে সদ্ভাবে নিজের পুরুষকার-সহায়ে বিদ্যা ধন মান ইত্যাদি অর্জন করতে প্রয়াসী হয়, অবশ্য মা-ই তাকে সৎপথে চলবার বুদ্ধি ও শক্তি দেন। সে এমন কোন কাজে লিপ্ত হয় না, যাতে অপরের ক্ষতি হ'তে পারে। তার জীবন-যাপনে থাকে সৎচিন্তা, সদাচার, সৎকর্ম। অসৎপথে চলবার প্রবৃত্তি তার চলে যায়। অবশ্য জগজ্জননীর কাছে যদি চাইতেই হয়, তবে ভক্তি জ্ঞান বিবেক বৈরাগ্য—এই সব চাওয়াই উচিত।

'রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি,
দ্বিষো জহি'

—এই যে প্রার্থনা, একে নিকৃষ্ট প্রার্থনাও বলা যায় না। উচ্চস্তরের সাধকও এ প্রার্থনা করতে পারেন, অবশ্য অর্থটি অন্যরকম করতে হবে। মা, আধ্যাত্মিক রূপ দাও, আধ্যাত্মিক জয় ও যশ দাও। কি সেই আধ্যাত্মিক রূপ, জয় আর যশ?—মাতৃচিন্তা ঘনীভূত হয়ে যেন আমার মধ্যে রূপায়িত হয়, আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে যেন সর্বত্র বিজয় হয়, যেন শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করি। মা, শত্রু নাশ কর—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য—এই রিপুদল বিনাশ কর। এ তো নিকৃষ্ট প্রার্থনা নয়, পার্থিব রূপের আকাঙ্ক্ষা আমার নেই, ভস্মেই তার পরিণতি! ভক্তি জ্ঞান বিবেক বৈরাগ্য মায়ের কাছে না চাইলে কার কাছে চাওয়া যাবে? এ-সব না পেলে সাধন-জীবন ফলপ্রসূ হবে না।

এমন সাধকও আছেন, যিনি জগতের সকলের কল্যাণের জন্য মায়ের কাছে প্রার্থনা করেন—তিনি যে উচ্চস্তরের সাধক, তাতে আর সন্দেহ কি? সমস্ত জগদ্বাসী সুখী হোক, সকলের সর্বপ্রকার মঙ্গল হোক—এই তাঁর প্রার্থনা, দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজন হ'লে তিনি ধনসম্পত্তিও প্রার্থনা করতে পারেন। আর একরকম সাধক আছেন, যিনি কিছুই চান না; শুধু মাতৃনামেই তাঁর আনন্দ।

শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা যে কি তা প্রকৃত সাধকের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে:

'মা! এই লও তোমার ধর্ম, এই লও তোমার অধর্ম; আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই লও তোমার পুণ্য, এই লও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও; এই লও তোমার জ্ঞান, এই লও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও!' ধর্মাধর্ম ছেড়ে অমলা অহৈতুকী ভক্তি প্রার্থনাই শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা!

অনন্তভাবময়ী মা অন্তর্যামিনী রূপে সন্তানের অন্তর জানেন; প্রয়োজনবোধে যাকে যা দিতে হবে, তিনি তা দেবেন। প্রবৃত্তিমার্গের মধ্য দিয়ে, কি নিবৃত্তি-পথ অবলম্বন করিয়ে কল্যাণ করবেন, তিনিই জানেন।

মা সন্তানকে সর্বদা রক্ষা করছেন। সন্তানের দশদিকে মা বিভিন্ন মূর্তি ধারণ করে বিভিন্ন প্রহরণ নিয়ে বিরাজিতা, তাই সাধক প্রার্থনা করেন:

প্রাচ্যাং রক্ষতু মামৈন্দ্রী আগ্নেয্যামগ্নিদেবতা।
দক্ষিণেঽবতু বারাহী নৈঋর্ত্যাং খড়্গধারিণী॥
প্রতীচ্যাং বারুণী রক্ষেৎ বায়ব্যাং মৃগবাহিনী।
উদীচ্যাং পাতু কৌবেরী ঐশান্যাং শূলধারিণী॥
ঊর্ধ্বং ব্রহ্মাণী মে রক্ষেৎ অধস্তাৎ বৈষ্ণবী তথা।
এবং দশ দিশো রক্ষেৎ চামুণ্ডা শববাহনা॥

শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মায়ের অবস্থিতি। চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা হস্ত পদ সবই বিশেষ বিশেষ মূর্তিতে মা রক্ষা করছেন। সর্বাঙ্গে মায়ের অনুভূতি—প্রত্যেক লোমকূপটিতে পর্যন্ত। কী অপূর্ব আনন্দানুভূতি! সাধক মাতৃভাবে ভরপুর হন।

মা-ই এই জগৎ ধারণ করে রয়েছেন, সৃষ্টি পালন এবং সংহারও তাঁরই খেলা!

'ত্বয়ৈব ধার্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা ॥'

মা যে শুধু অন্তরে এবং শরীরের সর্বত্র ব্যাপ্ত রয়েছেন, আর অন্যত্র তাঁর অস্তিত্বের অভাব, তা নয়। মা সর্বব্যাপিনী—সর্বভূতে বিরাজিতা। এমন কোন স্থান নেই, যেখানে তিনি না রয়েছেন। তিনি চৈতন্যরূপে সর্বভূতে বিরাজ করছেন। বুদ্ধি নিদ্রা ক্ষুধা ছায়া শক্তি তৃষ্ণা ক্ষমা জাতি লজ্জা শান্তি শ্রদ্ধা কান্তি লক্ষ্মী বৃত্তি স্মৃতি দয়া তুষ্টি ভ্রান্তি প্রভৃতি রূপে তিনি অবস্থান করছেন।

সাধারণ মানুষ সুখই চায়, দুঃখ কেউ চায় না। যে সাধক মনে করতে পারেন দুঃখও মায়েরই দান, তিনিই প্রকৃত সাধক। মৃত্যুরূপে সংহন্ত্রীরূপে সেই মা! যিনি জনয়িত্রী, পালয়িত্রী তিনিই সংহন্ত্রী!

স্বামীজী তাই বলছেন—

মৃত্যু তুমি রোগ মহামারী বিষকুম্ভ ভরি
বিতরিছ জনে জনে।

সাধকের যখন অন্তরে-বাহিরে সুখে-দুঃখে শুভে-অশুভে মায়ের অনুভূতি হয়, তখনই তিনি অনাবিল আনন্দের অধিকারী হন। এই আনন্দ লাভ করতে হ'লে চাই—নিরন্তর সংগ্রাম। স্বামীজীর আহ্বান—

জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন,
ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার
প্রেতভূমি চিতামাঝে ॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়
তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান,
নাচুক তাহাতে শ্যামা ॥

"বলিপ্রদান বা সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগ ভিন্ন শক্তিপূজা অসম্পূর্ণ, ফলও তদ্রূপ। ছাগ-মহিষ-বলি ত অনুকল্প মাত্র। হৃদয়ের শোণিত দান, যে উদ্দেশ্যে পূজা সে উদ্দেশ্যে আপনার সমগ্র শরীর মন সম্পূর্ণ উৎসর্গ না করিলে কোন প্রকার শক্তিপূজাতেই ফলসিদ্ধি অসম্ভব।"

"যে কোন উদ্দেশ্যেই হউক, শক্তিপূজায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, বৃথা শক্তিক্ষয় নিবারণ করিতে হইবে, সর্বশক্তির আকর অন্তরস্থ আত্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া তাঁহা হইতে শক্তি অবতরণের পথ পরিষ্কার রাখিতে হইবে।"

"সর্বদেশে সর্বকালে সর্বফলসিদ্ধির সম্বন্ধেই এই নিয়ম প্রবর্তিত। শক্তিক্ষয় নিবারণ, আত্মনিহিত মহাশক্তির ধ্যান এবং আত্মবলিদান।"

—স্বামী সারদানন্দ (ভারতে শক্তিপূজা)

স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীরামকৃষ্ণ শরণং

Sri Ramakrishna Ashram
Khar Road
Bandra P. O. Bombay.
26. 1. 25

শ্রীমান প— ও সু—,

তোমাদের ২ জনের পত্রে (রাজেন) বিদ্যানন্দ স্বামীর দেহত্যাগ-সংবাদে বড়ই মর্ম্মাহত হইলাম। অবশ্য সে মায়ের ছেলে, মায়ের কাছেই গিয়াছে, তার আর সন্দেহ নাই। তবে তোমার মনে খুব কষ্ট হইয়াছে, তার আর সন্দেহ কি। বহুকাল একত্রে মায়ের কাছে বাস, সে স্বর্গসুখ এই ভূতলে, আমি তাহা খুব বুঝিতে পারি। মার অহৈতুকী দয়া তোমাদের উপর বর্ষণ হইত, এখনও হইতেছে। আত্মার সম্বন্ধ চিরকাল অবিচ্ছিন্ন থাকে। মা চিরকাল আছেন, তোমরাও চিরকাল তাঁর কাছে আছ, ছিলে ও থাকবে। দেহের পরিণাম এই রকমই, ইহা অনিবার্য্য, দিন কতকের জন্য একটা লীলা মাত্র—এই ভাবটীই মনে স্থিরনিশ্চয় করিয়া রাখিতে হইবে। ঠাকুরের, মায়ের, স্বামীজীর, মহারাজের, বাবুরাম মহারাজ প্রভৃতি সকলেরই স্থূল দেহ নাই সত্য, কিন্তু আমরা এখন শরীরে আছি কি ভরসায়? কেবল এই বিশ্বাস, এই ধারণায়ঃ আমরা যেমন সত্য, তাঁরাও সেইরূপই সত্য; নতুবা ঠাকুরের দেহত্যাগের পর আমরা সকলেই দেহত্যাগ করিতাম। ...... তাঁরা প্রত্যক্ষ আছেন, যেমন আমরা আছি—দেহ থাক আর নাই থাক। আর অধিক কি লিখিব, এই সব ভেবে দেখো। আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ তোমরা সকলে জানিবে। আমি আগামী February মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে খুব সম্ভব মঠে পৌছিব। আমি মান্দ্রাজ হইতে ১২ই জানুয়ারী এখানে আসিয়াছি। খুব সম্ভব এখানে শীঘ্রই ঠাকুরের একটী স্থায়ী আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন হইবে তাঁর ইচ্ছায়। ইতি—

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

'শ্রীম' লিখিত দুইটি চিঠি

(১)

শ্রীশ্রীগুরুদেব

শ্রীচরণভরসা

Cal : 24th Novr. 09

Dear Brother,

Thanks for your interesting note.

শ্রীশ্রীঠাকুর হরিনাম, গৌরাঙ্গের নাম গুণ কীর্তন সর্বদা করিতেন ও করিতে বলিতেন। এ যুগে তাঁহাকে চিন্তা করিলে ও ডাকিলে সমস্ত হয়, কিন্তু অন্য নাম করিলে তাঁহারই নাম করা হয়। তিনি এক বই দুই দেখিতেন না। আমাদেরই ভেদবুদ্ধি। তিনি জানিতেন যে, সকলেই মাকে ভিন্ন ২ নাম করিয়া ডাকিতেছে—মুসলমান, খৃষ্টান পর্য্যন্ত।

অন্য মূর্ত্তিকে ফুল দিয়া পূজা করিলে তাঁরই পূজা করা হয়।

My love and namaskar to you all.

M.

I shall be very happy to hear of the progress made by your Sabha.

M.

(২)

শ্রীশ্রীগুরুদেব

শ্রীচরণভরসা

Cal : 9th Jan : 1910

Dear N—Babu,

Thanks for your kind note.

তাঁহার একটী প্রধান উপদেশ আমাদের প্রতি—'সাধুসঙ্গ কর'- হয় সাধুসঙ্গ, নয় নিঃসঙ্গ। সাধুসঙ্গ সর্বদা হওয়া দুষ্কর, তাই সাধুর শিরোমণি অবতারকে ধ্যান চিন্তা করা—নির্জনে—গোপনে—ব্যাকুল হয়ে। আর প্রার্থনা ভক্তির জন্য, জ্ঞানের জন্য, দর্শনের জন্য।

With love and namaskar,

M.

শক্তিউপাসনা

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

সৃষ্টির মূল কারণ আদ্যাশক্তি বা পরমা-প্রকৃতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে দর্শনশাস্ত্রগুলি একমত, যদিও তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। সাংখ্যদর্শনোক্ত প্রধান বা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি সাক্ষীস্বরূপ নির্গুণ চৈতন্য হইতে পৃথক হইলেও জগৎপ্রপঞ্চের কারণ। পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সাধনের মূলে প্রকৃতিই বিদ্যমান। অদ্বৈতবেদান্ত মতে সৃষ্টির কারণ আদ্যাশক্তির সত্তা ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে। এক, অদ্বিতীয়, নিত্য, শুদ্ধ, চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই মায়া নামক অনির্বচনীয় শক্তিসহায়ে ঈশ্বর বা জগৎকারণ। শক্তিযোগে তিনি সক্রিয়, সগুণ; শক্তি যখন অব্যক্তভাবে ব্রহ্মে বিলীন তখন তিনি নির্গুণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অনুপম সরলভাষায় ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—যেমন অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তি। 'কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী, একই বস্তু। যিনিই নির্গুণ তিনিই সগুণ; যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কোন কাজ করছেন না, এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি, পুরুষ বলি—যখন তিনি এই সব কার্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। যেমন অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তি।

'যিনি কালী তিনিই ব্রহ্ম। যাঁরই রূপ তিনিই অরূপ। যিনি সগুণ তিনিই নির্গুণ। ব্রহ্ম-শক্তি, শক্তি-ব্রহ্ম অভেদ। সচ্চিদানন্দময় আর সচ্চিদানন্দময়ী। যিনি নিরাকার তিনিই সাকার। সাকার রূপও মানতে হয়। কালীরূপ চিন্তা করতে করতে সাধক কালীরূপেই দর্শন পায়। তারপর দেখতে পায় যে, সেই রূপ অখণ্ডে লীন হয়ে গেল। যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তিনিই কালী। আদ্যাশক্তির সাহায্যে অবতার-লীলা। অবতার তবে কাজ করেন। সবই মার শক্তি।

'সেই আদ্যাশক্তি ব্রহ্মজ্ঞান দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হয় নচেৎ নয়। বন্ধন আর মুক্তি—এই দুই-এর কর্তাই তিনি।...ব্রহ্ম আর মায়া। জ্ঞানী মায়া ফেলে দেয়। মায়া আবরণস্বরূপ। ভক্ত কিন্তু মায়া ছেড়ে দেয় না। মহামায়ার পূজা করে। শরণাগত হয়ে বলে—মা, পথ ছেড়ে দাও! তুমি পথ ছেড়ে দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হবে। সেই মহামায়া দ্বার ছেড়ে দিলে তবে অন্দরে যাওয়া যায়—তবে সেই নিত্য সচ্চিদানন্দ পুরুষকে দর্শন হয়। তাই মহামায়ার দয়া চাই। তাই শক্তির উপাসনা।'

শক্তির উপাসনাও বিভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, 'বেদে যাকে ব্রহ্ম বলেছে—তাঁকেই আমি মা বলে ডাকছি।'

শক্তির প্রকৃত স্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; তাঁহার শক্তিউপাসনার রহস্য সাধারণ সাধকের অবিদিত। শক্তির মর্ম যিনি যেমনভাবে উপলব্ধি করেন তাঁহার উপাসনাও সেইরূপ। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম, ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি। ভোগ ও অপবর্গ উভয় সিদ্ধির জন্যই সাধক মহামায়ার শরণাগত হন। শক্তিরূপিণী মহামায়াও আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া কখনও সাধককে প্রার্থিত বস্তু ঢালিয়া দেন—ঐশ্বর্য, বিদ্যা, শক্তি। কখনও বা সাধক তাঁহার চকিত দর্শন লাভ করিয়া সিদ্ধিলাভের জন্য উন্মাদ হইয়া পড়েন। কন্যারূপে তিনি রাম-

প্রসাদের বেড়া বাঁধার কাজে সাহায্য করেন। আবার শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় অলৌকিক পুরুষের নিকট তিনি নিত্য আনন্দময়ী মূর্তিতে বিরাজমান। 'মা পাঁইজোর পরিয়া বালিকার মত আনন্দিতা হইয়া ঝম্ ঝম্ শব্দ করিতে করিতে মন্দিরের (দক্ষিণেশ্বর) উপর তলায় উঠিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আপন কক্ষে বসিয়াছিলেন…সে শব্দ তাঁহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিল। দ্রুতপদে কক্ষের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, সত্যই মা মন্দিরে দ্বিতলের বারান্দায় আলুলায়িত কেশে দাঁড়াইয়া কখন কলিকাতা, কখন গঙ্গা দর্শন করিতেছেন।'[১] আমাদের বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী মন বলিয়া উঠিবে ইহা কি সম্ভব! কিন্তু যাঁহার নিকট সৃষ্টির মূলীভূত চৈতন্যাত্মক ব্রহ্মস্বরূপিণী মহামায়ার স্বরূপ কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যক্ত হইয়াছে তাঁহার নিকট সবই সম্ভব। আর শ্রীশ্রীজগদম্বার চিন্ময়ী আনন্দঘন মূর্তি সর্বক্ষণ যাঁহার হৃদয়মন অধিকার করিয়া রাখিয়াছে, যিনি সর্বক্ষণ ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন তাঁহার নিকট স্থূল আর সূক্ষ্মে পার্থক্যের অস্তিত্ব কোথায়?

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, 'শাক্ত শব্দের অর্থ জান? শাক্ত মানে মদভাঙ নয়, শাক্ত মানে যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি বলে জানেন এবং সমগ্র স্ত্রীজাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন।'

এ দেশে সাধারণতঃ শক্তি জননীরূপেই পূজিত। জননীর প্রসন্নতা অর্জনই সাধকের কাম্য। আবার বাঙালীর ভাবুকতা সেই অনন্তশক্তিরূপিণী মহামায়াকে কন্যারূপে কল্পনা করিয়াছে। প্রতি বৎসর মহার্ঘ বসন-ভূষণে সজ্জিত করিয়া বিবিধ উপচারে পূজা করিয়া তিনদিন পরে চোখের জলে ভাসিয়া তাঁহাকে বিদায় দেয়—পুনরাগমনায় চ। চণ্ডীতে শক্তি-উপাসনার কথা বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

শত্রু কর্তৃক পরাভূত রাজ্যসম্পদভ্রষ্ট রাজা সুরথ গভীর অরণ্যে মেধা ঋষির আশ্রমে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। মনে কিন্তু শান্তি নাই। পরিত্যক্ত রাজধানী, সঞ্চিত ধনরাশির চিন্তায় সর্বদাই ম্রিয়মাণ। বিষণ্ণচিত্তে জীবন-সংগ্রামে পরাজয়ের কথাই ভাবিতেছেন এমন সময় বৈশ্য সমাধি আসিয়া উপস্থিত। স্ত্রী ও পুত্রগণ তাঁহার ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াছে। বিত্তহীন ও স্বজন-বন্ধুগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তিনিও বনবাসী হইয়াছেন, কিন্তু সেই স্নেহহীন পত্নী ও পুত্রগণের প্রতি মমতাশূন্য হইতে পারিতেছেন না। তাহাদের চিন্তাই অহরহ সমগ্র হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছে। অনন্তর উভয়ে একত্র মেধাঋষির নিকট গমন করিলেন। রাজা সুরথ প্রশ্ন করিলেন—স্ত্রী-পুত্র-রাজ্যাদি বিষয়ে দোষদর্শন করিয়াও তাহাদের প্রতি চিত্তের এই আসক্তির কারণ কি! আমরা উভয়েই জানি, রূপরসাদি বিষয়-মাত্রই দোষযুক্ত, তথাপি কি হেতু এই মোহ আমরা ত্যাগ করিতে পারিতেছি না?

ঋষি উত্তর দিলেন—উহাই মহামায়ার প্রভাব, মহামায়াপ্রভাবেণ:

'জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥'

—বিবেকহীন সংসারিগণের কি কথা? দেবী ভগবতী মহামায়া জ্ঞানিগণেরও চিত্ত বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া মোহগ্রস্ত করেন

কে সেই দেবী মহামায়া, তাঁহার স্বরূপই বা কী! উত্তরে ঋষি বলিলেন—

'নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎ সমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥'

—সেই মহামায়া নিত্যা ও সর্বব্যাপিনী। এই

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, পৃঃ ১১৭।

জগৎপ্রপঞ্চ তাঁহারই বিরাট মূর্তি। যিনি নিত্য ও সর্বত্র পরিব্যাপ্ত তাঁহার আবার জন্ম কি প্রকারে সম্ভব? প্রকৃতপক্ষে তিনি জন্ম-মৃত্যুরহিতা। তবে তাঁহার বহু প্রকার আবির্ভাবের বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ কর।

অতঃপর ঋষি রাজা এবং বৈশ্যের নিকট সেই আদ্যাশক্তির বিচিত্র লীলাকাহিনী বর্ণনা করিলেন। অসুরনাশিনী ভগবতী বারে বারে অসুর সংহার করিয়া দেবতাগণকে অভয় প্রদান করিয়াছেন, জগতের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। কাহিনী শেষ করিয়া ঋষি বলিলেন—সেই দেবী ভগবতীই এই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি- স্থিতি- ও প্রলয়-কারিণী। তিনিই আবার তত্ত্বজ্ঞানপ্রদায়িনী।

'তমুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্।
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা॥'

—হে মহারাজ, সেই পরমেশ্বরীর শরণাগত হও। ভক্তিপূর্বক আরাধনা করিলে তিনি ইহলোকে অভ্যুদয়, পরলোকে স্বর্গসুখ এবং মুক্তি প্রদান করেন।

রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি উভয়েই দেবীর আরাধনায় মগ্ন হইলেন। কখনও নিরাহারী কখনও অল্পাহারী হইয়া সংযতচিত্তে প্রত্যহ দেবীসূক্তপাঠ, তাহার ভাবার্থ অনুধ্যান, তপস্যা ও বিবিধ উপচারে দেবীর পূজা করিয়া তিন বৎসর কাটিয়া গেল। অবশেষে প্রসন্না দেবী দর্শন দিয়া বলিলেন—তোমাদের প্রার্থনা আমি পূর্ণ করিব

রাজা সুরথের অন্তর হইতে রাজ্যাকাঙ্ক্ষা দূর হয় নাই। সুতরাং তাঁহার প্রার্থনা হইল শত্রুবিনাশ পূর্বক হৃতরাজ্যের উদ্ধার। বৈশ্য সমাধির হৃদয়ে বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল—

'সোঽপি বৈশ্যস্ততো জ্ঞানং বব্রে নির্বিণ্ণমানসঃ।
মমেত্যহমিতি প্রাজ্ঞঃ সঙ্গবিচ্যুতিকারকম্॥'

—পুত্র-মিত্র-কলত্রাদিতে মমত্বই তো সংসার-বন্ধনের কারণ! অতএব দেবী তাঁহাকে সেই তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করুন যাহা দ্বারা স্ত্রী-পুত্র-ঐশ্বর্য 'আমার'- এবং দেহাদি 'আমি'-রূপ সংসারাসক্তি যেন দূর হয়। দেবীও তাঁহাদের অভীষ্ট পূর্ণ করিলেন। যুগে যুগে রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি এইভাবে দেবীকে আরাধনা পূর্বক প্রার্থনা করিয়া আসিতেছেন। সুরথ রাজার সংখ্যাই অধিক। তাঁহারা প্রার্থনা করিতেছেন,

'বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥'

—হে দেবি, আমার কল্যাণ বিধান কর, আমাকে বিপুল ঐশ্বর্য প্রদান কর। হে দেবি, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, আমার শত্রু নাশ কর।

শুভ সংস্কার ও বিচারের ফলে মুষ্টিমেয় সমাধি-দলের হৃদয়ে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। ঋষিবাক্য স্মরণ হয়: সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে—সেই তিনি প্রসন্না হইলে মানুষকে মুক্তিলাভের জন্য অভীষ্ট বর প্রদান করেন। জাগতিক অনিত্য বিষয়ে আসক্তি তো কেবলই দুঃখদায়ক! 'আমি' ও 'আমার' বুদ্ধি ক্রমাগত বন্ধন সৃষ্টি করিয়া চলে। একদিন অতর্কিত আঘাত আসিয়া সব সুখ-স্বপ্ন ছিন্ন করিয়া দিবে। তবে লাভ কী বৃথা কল্পনার পশ্চাতে ছুটিয়া! অতএব তাঁহারা অনন্যচিত্ত হইয়া জগৎপ্রপঞ্চ-পরিব্যাপ্ত শক্তিরূপিণী মহামায়ার নিকট প্রার্থনা করেন সংসার হইতে মুক্তিলাভের জন্য।

এইভাবেই চলিয়া আসিতেছে দেবীর আরাধনা—শক্তির উপাসনা। বস্তুতঃ ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতেই শক্তিউপাসনা প্রচলিত। বিশেষতঃ বাংলাদেশ শক্তি-

সাধনার পীঠস্থান। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সাধক শক্তিউপাসনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া মনোমত অভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শক্তিউপাসনা কেবল বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষে প্রচলিত তাহাও বলা যায় না। পৃথিবীর সর্বত্র শক্তির উপাসনা চলিতেছে। বিভিন্ন তাহার রূপ, বিচিত্র তাহার পদ্ধতি। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলিয়াছেন, 'শক্তির কৃপা না হ'লে কি ছাই হবে। আমেরিকা ইউরোপে কি দেখছি? শক্তির পূজা, শক্তির পূজা। তবু এরা অজান্তে পূজা করে, কামের দ্বারা করে। আর যারা বিশুদ্ধভাবে, সাত্ত্বিকভাবে, মাতৃভাবে পূজা করবে, তাদের কি কল্যাণ না হবে?'

প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে সম্বৎসর ধরিয়াই মহামায়ার উপাসনা চলে। দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী রূপে। একই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ। জগদ্ধাত্রীরূপে যিনি জগৎ ধারণ করিয়া আছেন, লক্ষ্মীরূপে তিনিই ঐশ্বর্যদান, সরস্বতীরূপে বিদ্যাদান, দুর্গারূপে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ করেন, আবার কালীরূপে তিনিই বর ও অভয় প্রদান করেন। 'আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা'—ভক্তিপূর্বক আরাধিতা হইয়া তিনি ইহলোকে অভ্যুদয়, পরলোকে স্বর্গসুখ এবং মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন।

রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি সংযতচিত্তে তিন বৎসর শক্তির আরাধনা করিয়া নিজ নিজ অভীষ্ট লাভ করিয়াছিলেন। আমরা প্রতি বৎসর শক্তির আরাধনা করিতেছি, প্রতি বৎসর অত্যুজ্জ্বল আলোকিত সুসজ্জিত মণ্ডপে মহাসমারোহে বিচিত্র সজ্জায় ভূষিত দেবীপ্রতিমাকে স্থাপন করিয়া পূজা করিতেছি, তবে আমাদের কল্যাণ হইতেছে না কেন? কারণ আমরা 'বিশুদ্ধভাবে, সাত্ত্বিকভাবে, মাতৃভাবে' পূজা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। শক্তির পূজা করিতেছি শক্তির স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া। শক্তি কেন প্রসন্ন হইবেন! দেশ তাই শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। দারিদ্র্য-দুঃখ-ভয়-হারিণীর প্রসন্নতা নাই—তাই দারিদ্র্য-দুঃখ-ভয়ে আচ্ছন্ন দেশবাসী জীবন্মৃত অবস্থায় উপনীত।

জগতে মোক্ষকামীর সংখ্যা অতি অল্প। ভব-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষায় তাঁহারা নিত্য সঙ্গোপনে শক্তিউপাসনায় রত। কিন্তু সমাজের বিরাট অংশের প্রার্থিত বস্তু ধর্ম-অর্থ-কাম। উহা লাভ করিবার জন্যই তাঁহারা শক্তির উপাসনা করিবেন। শাস্ত্রও তাহাই অনুমোদন করেন। শক্তিরূপিণী মহামায়া আবার আসিতেছেন। সংযতচিত্তে তিনদিন ধরিয়া লক্ষ লক্ষ লোক বিশুদ্ধভাবে, সাত্ত্বিকভাবে, মাতৃভাবে সেই মহামায়ার উপাসনায় যোগ দিন। শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও আর্তি লইয়া বলুন—'দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা সর্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা'—হে দারিদ্র্য-হারিণি, হে দুঃখবিনাশিনি, হে ভয়নাশিনি, সকলের কল্যাণবিধানার্থ সর্বদা দয়ার্দ্রচিত্তা তুমি ব্যতীত আর কাহাকেও তো দেখি না!

নিরন্তর দারিদ্র্য, দুঃখ, শোক, ভয়ে পীড়িত, জীবন্মৃত অবস্থায় কাল না কাটাইয়া সুস্থ, সবল, প্রাণবান্, শক্তিমান্, শ্রীমান্ হইয়া বাঁচিয়া থাকিয়া সমাজের সুখ, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ সাধনের জন্যই সেই আদ্যাশক্তি পরমা প্রকৃতির নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে,

'বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥'

—হে দেবী, 'আমার কল্যাণ বিধান কর, আমকে বিপুল ঐশ্বর্য প্রদান কর। হে, দেবী, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, আমার শত্রু নাশ কর।

গোপন কথা

শ্রীনরেন্দ্র দেব

ঈশ্বরে সন্দেহ কোনোদিন কোরোনা,
অবিশ্বাসের পথ ভুল করে ধোরোনা।
ওপথে ছুটছো তুমি দেখে লোকে হাসবে,
সন্দেহবাদী হ'য়ে অকূলে কি ভাসবে?

তার চেয়ে মানা ভালো ভগবান রয়েছে,
ইচ্ছায় যাঁর এই ত্রিভুবন হয়েছে।
প্রমাণ তো পাবে তার চারিদিকে ছড়ানো,
কত প্রাণী, কত জীবে, তরু তৃণে জড়ানো।

নাই বা সে দেখা দিক, থাকুক না লুকিয়ে;
তা'বলে কি মন থেকে দেবে তাকে চুকিয়ে?
আঁধার আকাশে সে কি চাঁদ বাতি জ্বালে না?
প্রভাতে কি পূবদিকে সোনা রোদ ঢালে না?

বাতাস কে ব'য়ে আনে?—কেউ তাকে দেখেছে?
তৃষ্ণার জল কে সে নদী ভ'রে রেখেছে?
ফুলে ফলে তৃণদলে মাটিকে কে সাজালে?
প্রেমে বাঁশী কে প্রাণে যৌবনে বাজালে?

বিদ্যুৎ চমকায়, হাঁকে বাজ খেয়ালে?
ঘিরেছে কে নানাদিক পাহাড়ের দেয়ালে?
সাগরেতে অবিরাম ঢেউ কেন উঠছে?
ছুটে এসে ধুয়ে বালি কার পায়ে লুটছে?

চেয়ে দেখো চারিদিকে কী অবাক সৃষ্টি!
ধরা ভরা ঝরে কার করুণার বৃষ্টি?
হতাশ হোয়োনা ভেবে দেখা তাঁর পেলেনা।
বিশ্বাসে মেলে সবই সহজে যা মেলেনা।

ছায়াপথ পানে চেয়ে বসে বসে ভাবছি
ঈশ্বরে ভুলে মোরা কোন্ পথে নাবছি?
একবার দেখা পেলে শুধাতাম—কে তুমি?
সৃজন করেছো কেন মনোরম এ ভূমি?

তবু কেন শোকে দুখে মানুষেরা পুড়ছে?
বন্যায় ভাসে দেশ, ঝড়ে গ্রাম উড়ছে?
পাহাড়ের চূড়ো কেন ঢেকে রাখো বরফে?
তোমার নামটি লেখা বলো কোন হরফে?

নাই দিক উত্তর, কাঁদবোনা হতাশে,
শোনে নাকি মাঝে মাঝে মানুষের কথা সে!
একান্ত মনে যদি ডাকি তাঁকে একাকী
রহিতে কি পারে দূরে না দিয়ে সে দেখা কী?

নারী না পুরুষ তিনি কাজ কি সে খবরে?
ধ্যানযোগে দেখা দেয় সমাধির গহ্বরে।
দেখে সে বিশ্বরূপ বিস্মিত হবে কী?
চরণে লুটায়ে শির পদধূলি লবে কী?

"কল্যাণগুণগণঃ।"

ডক্টর রমা চৌধুরী

"কল্যাণগুণগণঃ"—পরব্রহ্ম বা পরমেশ্বর অনন্ত, অসংখ্য, অচিন্ত্য শুভ-গুণের আধার—এই ভাবে ভক্ত শ্রীভগবানকে ধারণা করে পেয়েছেন মনে কতই না শান্তি। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি দার্শনিক নীরব থাকবেন কেন? তিনি স্বতই প্রশ্ন তুলবেন: পরব্রহ্ম সত্যই সগুণ, না নির্গুণ? ভক্তির দিক থেকে আমরা যাই ভাবিনা কেন, যুক্তির দিকের কথাটা কি? সত্যই ব্রহ্মের সগুণত্ব যুক্তিসঙ্গত কি না?

এস্থলে, রামনুজ-নিম্বার্ক-প্রমুখ ত্রিতত্ত্ববাদী বৈদান্তিকগণ স্থিরবিশ্বাস-ভরে বলবেন যে, ব্রহ্ম নিশ্চয়ই সগুণ। তাঁর অসংখ্য গুণের মধ্যে জীব-জগৎ অন্যতম; এবং সেজন্য জীব-জগৎ তাঁর স্বগত-ভেদ; অর্থাৎ তাঁরই অন্তর্ভুক্ত, অথচ তাঁর সঙ্গে এক ও অভিন্ন নয় কোনোক্রমেই।

এই থেকেই সূত্রপাত হল সীমাহীন বিপত্তির: জীব-জগৎ যদি ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্তই হয় তাহলে তারা পুনরায় ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন হবে কিরূপে? কারণ, ব্রহ্মের ভিতরে ব্রহ্ম ভিন্ন কোনো কিছু থাকবে কিরূপে? এর উত্তরে ত্রিতত্ত্ববাদিগণ বলেছেন যে, জীব-জগৎ ব্রহ্ম থেকে স্বরূপতঃ অভিন্ন। তাহলে তারা আর ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন রইল কিরূপে? রইল গুণের দিক থেকে—এই ত একমাত্র সম্ভাব্য উত্তর এস্থলে। কিন্তু বিপত্তির নিষ্পত্তি তো হলনা কোনরূপেই। স্বরূপতঃ অভিন্ন; গুণতঃ ভিন্ন; অথচ, পরিশেষে জীব-জগৎ ব্রহ্মভিন্ন। তাহলে তো গুণই হয়ে দাঁড়াচ্ছে গুণের অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ—কি অসম্ভব কথা এটি!

এক্ষেত্রে রামানুজ-নিম্বার্কাদি স্বগত-ভেদবাদিগণ ও ত্রিতত্ত্ববাদিগণের একমাত্র আশা হল তাঁদের অভিনব "ব্যক্তিত্ববাদ" (Concept of Individuality)। এই মতানুসারে, জগতের প্রত্যেক বস্তুই একটি স্বতন্ত্র, বিশেষ, একক "ব্যক্তি" (Indivldual)। অর্থাৎ, সে যা, পৃথিবীতে অন্য কিছুই অন্য কেউই ঠিক তা নয়—সে সে'ই, একমাত্র সে'ই, সর্বদা, সর্বস্থানে, সর্ববস্থাতেই সে'ই—সে'ও অন্য কিছুই নয়, অন্য কিছুও সে নয় সুনিশ্চিত; যেমন দুটি মটরের দানা, বা দুটি জলবিন্দু, বা দুটি বালুকণা, বা দুটি ফুলের পাপড়ি, বা দুটি তৃণ। আপাত-দৃষ্টিতে দুটিই যেন একেবারে এক ও অভিন্ন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রথমটি দ্বিতীয়টি থেকে ভিন্ন, যেহেতু প্রত্যেকটিই হল এক একটি স্বতন্ত্র, বিশেষ বস্তু বা "ব্যক্তি" (Individual)। নাহলে আমরা তাদের 'প্রথম' 'দ্বিতীয়' ইত্যাদি বলে গণনা করি কেন? এস্থলে, আমাদের একেবারেই মনে হয় না যে, প্রথমটি ও দ্বিতীয়টি একে অপরের পুনরাবৃত্তিই মাত্র; উপরন্তু আমরা প্রথমটি ও দ্বিতীয়টিকে পরস্পর ভিন্ন বলেই মনে করি।

তাহলে স্বরূপতঃ অভিন্ন এবং গুণশক্তি-কার্য-আকার-পরিমাণতঃ ভিন্ন হলে তো কথাই নেই; এমন কি স্বরূপতঃ অভিন্ন এবং গুণ-শক্তি-কার্য-আকার-পরিমাণতঃ আপাতদৃষ্টিতে অভিন্ন হলেও (উপরের উদাহরণ দেখুন), পৃথিবীতে কোন দুই বস্তুই, কোনো দুই ব্যক্তিই সম্পূর্ণ অভিন্ন নয়। উপরন্তু, প্রত্যেকেরই এক একটি অতি নিজস্ব, স্বতন্ত্র, বিশেষ সত্তা বা "ব্যক্তিত্ব" (Individuality) আছে বলে, প্রত্যেকেই

প্রত্যেকের থেকে ভিন্ন। এই হল ত্রিতত্ত্ববাদী বৈদান্তিকগণের অভিনব "ব্যক্তিত্ববাদ।"

এই প্রসঙ্গে, বৈশেষিক-দর্শনের সুপ্রসিদ্ধ "বিশেষবাদে"র কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। বৈশেশিক-দর্শনানুসারে সপ্ত "পদার্থ" আছে, যথা, দ্রব্য-গুণ-কর্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়-অভাব। এদের মধ্যে, "বিশেষ" নামক পদার্থের উপরই এই দর্শন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলেই এর নাম "বৈশেষিক দর্শন"।

এই "বিশেষ" কি? এই "বিশেষ" হল দুই সত্তার মধ্যে শেষ, অনিবার্য প্রভেদ। যথা একটি "ঘট" একটি "পট" থেকে ভিন্ন। কিন্তু এই প্রভেদকে "বিশেষ" বলা হয় না, যেহেতু "ঘট" ও "পটের" স্ব স্ব স্বরূপ-গুণ-শক্তি-কার্য-আকার-পরিমাণাদি পার্থিব চিহ্ন থেকেই তাদের মধ্যে প্রভেদ জানা যায় অনায়াসেই। কিন্তু ধরুন দুটি জলের পরমাণু। মনে হয় যেন তাদের মধ্যে কোনো প্রভেদই নেই। যেহেতু সাধারণ পার্থিব প্রভেদসূচক যে সব চিহ্ন—যেমন, গুণ-শক্তি-কার্য-আকার-পরিমাণাদি—সে সব পরমাণুর কিছুই নেই। তাহলে দুই পরমাণু, একই মহাভুতের দুই পরমাণুর মধ্যে প্রভেদের কারণ কি? কারণ হল এই "বিশেষ"। এই "বিশেষের" জন্যই "প্রথম জল-পরমাণু", "দ্বিতীয় জল-পরমাণু" ইত্যাদি ক্রমে আমরা গণনা করি, পরস্পরকে ভিন্ন বলে গ্রহণ ক'রে; এরূপে, পৃথিবীর কোনো দ্রব্যই, কোনো বস্তুই, কোনো তত্ত্বই সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন নয়—এমন কি, আকারবিহীন ক্ষুদ্রতম পরমাণুও নয়।

এই হল ত্রিতত্ত্ববাদী বৈদান্তিকগণেরও "ব্যক্তিত্ববাদ"। এই তত্ত্বানুসারেই তাঁরা নির্ভয়ে বলেন যে, ব্রহ্ম-জীব-জগৎ এই তিনটি স্বতন্ত্র সত্তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হতে না পারেন কিন্তু পরিশেষে স্বতন্ত্র; শাশ্বতভাবেই স্বতন্ত্র; সর্বকালেই, সর্বক্ষেত্রেই, সর্বাবস্থাতেই স্বতন্ত্র; বন্ধ-মোক্ষ উভয় কালেই, উভয় ক্ষেত্রেই, উভয়াবস্থাতেই স্বতন্ত্র। এরূপে ব্রহ্ম ব্রহ্মই, জীবও নন, জগৎও নন; জীব জীবই, ব্রহ্মও নয়, জগৎও নয়; জগৎ জগৎই, ব্রহ্মও নয়, জীবও নয়। কারণ মোক্ষ-কালেও, জীব-জগৎ সমস্ত ভিন্নতা ত্যাগ ক'রে ব্রহ্মে নিঃশেষে বিলীন হয়ে যায় না কোনোদিনও—ব্রহ্ম থেকে ভিন্নই থেকে যায় চিরকাল। সেজন্য, স্বরূপতঃ অভেদের কথা প্রারম্ভে যতই বলা হোক না কেন, পরিশেষে ত্রিতত্ত্ব: ব্রহ্ম-জীব-জগৎ তিনটি চিরভিন্ন তত্ত্ব: ব্রহ্ম-তত্ত্ব, জীব-তত্ত্ব, জগৎ-তত্ত্ব। এই হল রামানুজ-নিম্বার্কাদির "ত্রিতত্ত্ববাদ।"

কিন্তু এরূপ "ব্যক্তিত্ববাদ" যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ "ব্যক্তিত্বের" একমাত্র অর্থ হতে পারে "স্বরূপ-স্বাতন্ত্র্য।" "স্বরূপ" ব্যতীত "ব্যক্তি" আর অন্য কি? কিছুই নয়। "স্বরূপ"কে সম্পূর্ণ বর্জন করে কেবলমাত্র "গুণ-শক্তি-কার্য-আকার-পরিমাণাদি"কে ব্যক্তিত্বের উপাদান বলে গ্রহণ করা অযৌক্তিক নিশ্চয়ই। এই মতানুসারে জীব, এমন কি বদ্ধ-জীবও, ব্রহ্ম থেকে স্বরূপতঃ অভিন্ন; পুনরায় জীব, এমন কি মুক্ত জীবও ব্রহ্ম থেকে গুণ-শক্তি-কার্য-আকার-পরিমাণতঃ ভিন্ন। তাহলে এস্থলে এই অদ্ভুত কথাই বলা হচ্ছে যে, স্বরূপতঃ অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও "ব্রহ্ম", "জীব" ও "জগৎ" তিনটি চিরস্বতন্ত্র "ব্যক্তি" (Individual), সত্তা, তত্ত্ব, যা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে এই "ত্রিতত্ত্ববাদের।"

ত্রিতত্ত্ববাদী বৈদান্তিকগণ সর্বদাই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, বস্তুর বস্তুত্ব, সত্তার সত্তাত্ব, তত্ত্বের তত্ত্বত্ব বিসর্জন দিতে অনিচ্ছুক। তাঁরা সগৌরবে, উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, "মোক্ষ" জীবত্বের বিনাশ নয়, বিকাশ। খুবই ভাল কথা। কিন্তু তাহলে তাঁরা পূর্বাঙ্গেই

জীবের স্বরূপের বিনাশ ঘটিয়ে রাখলেন কেন জীব-স্বরূপকে ব্রহ্ম-স্বরূপের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক করে দিয়ে, জীব-স্বরূপকে ব্রহ্ম-স্বরূপে সম্পূর্ণ মিশিয়ে দিয়ে? "জীব-স্বরূপই" যদি এই ভাবে চলে গেল, মিশে গেল অন্য এক ভিন্ন ব্রহ্ম-স্বরূপে, স্বীয় স্বতন্ত্র স্বরূপ বিসর্জন দিয়ে, তাহলে আর "জীবত্বের" অবশিষ্ট রইল কি? "স্বরূপ" চলে গেলে, তার "গুণ-শক্তি-আকার-পরিমাণাদি" রইলই বা কোথায়, রইলই বা কি করে, এবং তা দিয়ে আমরা করবই বা কি?

বস্তুতঃ, রামানুজ-নিম্বার্কাদির ত্রিতত্ত্ববাদের মূলীভূত দোষ হল এই যে, তাঁরা জ্ঞানেই হোক, বা অজ্ঞানেই হোক, সর্বদাই "গুণ-শক্তি-কার্য-আকার-পরিমাণাদিকে" "স্বরূপের" উপরে স্থান দিয়েছেন; এবং ব্রহ্মের সঙ্গে জীব-জগতের "স্বরূপের" অভিন্নতাকে স্বীকার করে নিয়েও, সানন্দে, সাগ্রহে, খোলা মনে স্বীকার করে নিয়েও, তাঁদের নিজেদেরই মূলীভূত তত্ত্বানুসারেই স্বীকার করে নিয়েও, "গুণ-শক্তি-কার্য-আকার-পরিমাণাদির" ভিন্নতাকে অযৌক্তিকভাবে আঁকড়ে ধ'রে, তাঁদের এই অভিনব "ব্যক্তিত্ববাদ", স্বগতভেদবাদ, ত্রিতত্ত্ববাদের প্রপঞ্চনা করেছেন।

সেজন্য ভক্তির দিক থেকে যাই হোক না কেন, যুক্তির দিক থেকে তা আর গ্রহণযোগ্য হবে কি করে?

অবশ্য, ভক্তির দিক থেকে, ত্রিতত্ত্ববাদের মহিমা অপার; এবং ত্রিতাপদগ্ধ জনগণের প্রাণে অমৃত-বারি সিঞ্চনে এর দ্বিতীয় আর নেই।

তোমার আসন

শ্রীশান্তশীল দাশ

কোথায় তোমার আসন পাতা?
　কোথায় তোমার আসনটি নাই?
কোথায় তোমায় পূজবো বল?
　কোথা বল মুখটি ফিরাই?

অনেক আলোর প্রসাদ পেয়ে
　যারা নানান আড়ম্বরে
সাজায় তোমার পূজার আসন,
　আসবে তুমি তাদের ঘরে?

নেইকো যাদের পূজার বেদী,
　অন্তরেতে সাজায় আসন,
বিমুখ তুমি সেই আসনে?
　করবে না সে-পূজা গ্রহণ?

তোমার হাতেই বিশ্ব গড়া,
　স্রষ্টা আছ সৃষ্টি মাঝে;
যেথায় আলো, যেথায় কালো—
　তোমার আসন সবখানে-যে।

অনেক দিয়ে যারা তোমায়
　পূজা করে, সে-পূজা নাও,
রিক্ত হাতে স্মরণ করে
　যারা, তুমি নাও সে-পূজাও।

তোমার আসন কোথায় যে নেই—
　আকাশ ব্যেপে, ধূলির কণায়,
যেমন ক'রে যে-কেউ ডাকে,
　সে-ডাক তোমার কাছে যে যায়।

একবারও ভাবি না কো

বনফুল

আকাশে উজ্জ্বল রবি, বাতাসেতে প্রসন্ন পরশ,
মোহময় পরিবেশে সন্ধ্যা-উষা আসে হাস্যমুখী,
ধন-জন-গৌরবেতে চিত্তে জাগে কত না হরষ
মনে হয় আমি কত সুখী।

আকাশেতে আসে ছুটে মত্ত ঝঞ্ঝা অশনি-হুঙ্কারে
মৃত্যু-দীর্ণ শ্মশানেতে অট্টহাস্যে নাচে জ্বালামুখী
ধন-জন-গৌরবের অন্ত হয় একটি ফুৎকারে
মনে হয় আমি কত দুখী।

ক্ষুদ্র বল্মীকের মতো পুনরায় রচি নব স্তূপ
নব ধন, নব জন, খুঁজি পুন নবীন বৈভবে
আশার প্রদীপ জ্বালি' আলোকিত করি অন্ধকূপ
মনে হয় ফের সব হবে।

একবারও ভাবি না কো, মায়া সব, লীলা অসৎ-এর
পান্থশালায় আছি, যাত্রী আমি অনন্ত পথের।

দুই জানালা

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

সকালের এই রোদ এসে পড়েছে আমার টেবিলে। কী আশ্চর্য মমতাময়, কী অপরূপ সোনা-ঝরা রূপ।

ভাদ্র শেষ হলো আজ, বর্ষা শেষ। কাল থেকে আশ্বিনের এলাকা।

লিখছি। লেখায় কাটকুট অনেক। পড়ছি। আবার খুলে রাখছি বইয়ের পাতা।

কিছুতে কি বলা যায়? যে কথা এই রৌদ্র বেয়ে ঐ নীল আকাশের পরতে পরতে ছড়িয়ে দেওয়ার মত কথা, যে কথা এই জানালা বেয়ে উধাও মেঘের সঙ্গী হওয়ার মত কথা!

কলম নামিয়ে বসে আছি। আলোর মত সময় ছুটে চলেছে। অথবা নদীর মত সময়।

হঠাৎ দেখি, দক্ষিণের জানালায় ঘন মেঘের নিবিড় কালিমায় ঝল্‌সে উঠছে বিদ্যুতের খড়্গ। চোখ ফেরাই। উত্তরের জানালা। স্বচ্ছ আকাশের বুকে শাদা মেঘের নৌকা।

আমার সমস্ত অন্তর জুড়ে প্রশ্ন উঠলো: আমার দুটি জানালায় জীবনের দুটি রূপ, আহুতি দেব কোন দেবতাকে?

তারপর অনেকরাতে দুটি জানালাভরা কৃষ্ণরাত্রি।
আশ্বাস পেলাম। তিনি এক।
সকাল হলো। প্রণাম করলুম। তিনি বিচিত্র।

মাতৃরূপা

শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

ভক্তিমার্গ-সাধনায় সাধক মানবীয় সম্পর্ক-সূত্রের অনুরূপ অবলম্বন করে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হবার প্রয়াস করে থাকেন। সেজন্য তাঁরা সর্বশক্তিমান, জগতের আদিকারণ ঈশ্বরকে পিতারূপে, মাতারূপে, সন্তানরূপে, দয়িতরূপে, সখারূপে কল্পনা করেছেন। সর্বপ্রকার মানবীয় সম্পর্কের মধ্যে মাতার সঙ্গেই আমাদের সম্বন্ধ নিকটতম। মাতা আমাদের একান্ত অসহায় অবস্থায় পরমযত্নে লালনপালন করেন; তিনি কখনও সন্তানের দোষ-গুণ বিচার করেন না; কখনও তাঁর স্নেহের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না; কোন কারণেই তিনি সন্তানকে পরিত্যাগ করেন না। তাঁর স্নেহের পশ্চাতে কোন প্রত্যাশাও থাকে না; তাঁর অহেতুক অপার স্নেহ-মমতা সর্বদা সন্তানকে ঘিরে থাকে। সেজন্যই সম্ভবতঃ অতি প্রাচীনকাল হতেই ধর্মসাধকদের নিকট এই মাতৃরূপ সাধন বিশেষ প্রিয়। মাহেঞ্জোদারো হতে প্রাপ্ত মূর্তি প্রভৃতি নিদর্শন দেখে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে খৃঃ পূঃ পাঁচ হাজার বৎসর আগেও মানুষ ঈশ্বরকে জগৎ-পালিনী মাতারূপে উপাসনা করত।[১] তদবধি এই সুদীর্ঘকাল ধরে সৃষ্টি-স্থিতি লয়কারিণী সর্বব্যাপিনী বিশ্বজননী মাতৃশক্তির পূজা অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলে এসেছে।

প্রথম হতেই তাঁকে মহাশক্তিরূপে কল্পনা করা হয়েছে। কল্পনা করা হয়েছে তিনি পরমেশ্বরী, সকল দেবগণকে ধারণ করে আছেন, সমস্ত ধনসম্পদ তিনিই প্রদান করেন, জীব-জগতে সকলপ্রকার ক্রিয়া তাঁর দ্বারা সম্পন্ন হয় —এমন কি অন্নগ্রহণ করা হয় তাঁর শক্তির দ্বারা, চক্ষু তাঁর শক্তির দ্বারা দর্শন করে, নিঃশাস-প্রশ্বাস তাঁর দ্বারাই চালিত ("ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।' ইত্যাদি - দেবীসূক্ত)। তাছাড়া তিনি অরাতি-নাশিনী, নিজ তেজ দ্বারা শত্রু নিধন করেন, তিনিই বিপদহন্ত্রী, ত্রাণকারিণী ("তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্। দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ॥"—ইত্যাদি শ্লোক-দুর্গাসূক্ত)।

পরে তাঁকে বিশ্বের মূলীভূত কারণ ("বিশ্বস্য বীজং")[২] বলে অভিহিত করা হয়েছে। এবং বলা হয়েছে তিনি মাতৃরূপিণী, একমাত্র তাঁর দ্বারাই জগৎ পরিপূর্ণ ("ত্বয়ৈকয়া পূরিত-মম্বয়ৈতৎ")[২], সুতরাং তিনি শক্তিরূপা আবার মাতৃরূপাও। তিনিই আদ্যাশক্তি জগন্মাতা।

শুধু হিন্দুধর্মমতে নয়, পৃথিবীর আরও অন্যান্য ধর্মমতেও এই মাতৃরূপার কথা পাওয়া যায়। লেডী জুলিয়ান ম্যাকোরেস অব নরউইচ (পঞ্চদশ শতাব্দী) নামে খ্যাত একজন খৃষ্টধর্মাবলম্বী মরমীয়া সাধিকা তাঁর অনবদ্য রচনা 'Revealation of Divine Love'-এ সুস্পষ্ট বলেছেন, "ঈশ্বর যেমন আমাদের পিতা, তেমনি আমাদের মাতাও বটে।" তাঁর মতে 'মঙ্গলময় মহাশক্তিমত্তা, জ্ঞান ও সর্বধন্য প্রেম এই সকল তাঁতেই অবস্থিত, এবং তিনিই সেই বস্তু যা মানুষকে ভালবাসায়।' মহাযান বৌদ্ধতন্ত্রেও

১ Dr R. C. Majumdar—Ancient India —Pt. 1, Page 20.

২ শ্রীশ্রীচণ্ডী—ইন্দ্রাদিকৃত স্তোত্র

'কোটিশ্রী' বা 'সপ্ত কোটি বুদ্ধ-মাতৃকা চলণ্ডী দেবী'র উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩]

আমাদের দেশের ধর্মচিন্তা ও সাধনায় এই মাতৃরূপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। যুগ-যুগান্ত ধরে ভক্ত-সাধকদের গানে দার্শনিকদের আলোচনায়, সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের প্রার্থনায় এই মাতৃরূপা ওতপ্রোত-ভাবে বিরাজ করছেন। এই মাতৃরূপের কল্পনা করতে গিয়ে বহু সাধক-কবি রসোত্তীর্ণ অমর সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের ধর্মসাধনা কাব্য-সাধনার রূপ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সাধক-কবি রামপ্রসাদ সম্বন্ধে সমালোচক যথার্থ তাই বলেছেন, "রামপ্রসাদ বিশ্বকবি, কেন না তাঁহার কাব্যে ও সাধনায় যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া তিনিই প্রকাশ পাইয়াছেন।"

ঈশ্বরের মাতৃমূর্তির সমস্ত মাধুর্য রামপ্রসাদ প্রভৃতি সাধক-কবিদের গানে প্রকাশ পেয়েছে। আদ্যাশক্তি জগন্মাতা যেন তাদের ঘরের আপন মা। তাঁর কাছেই তাদের অভাবঅভিযোগ জ্ঞাপন, মানঅভিমান-খেলা এবং আবদার দাবী উপস্থাপন। দারিদ্র্য-দুঃখ নিবেদন করতে গিয়ে অপূর্ব ভক্তিরসমণ্ডিত করে রামপ্রসাদ আরাধ্যা জননীকে নিজের সমপর্যায়ে টেনে এনে বলেছেন :

"আমি তাই অভিমান করি
আমাকে করেছো গো মা সংসারী
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি
ওমা তুমিও কোন্দল করেছ, বলিয়ে
শিব-ভিখারী।"

এই আপন মায়ের উপর এঁদের একান্ত নির্ভরতা লক্ষণীয়। মা ছাড়া জগতে আর কেউ নেই, তাঁদের তিনিই আশ্রয়, সহায়– সব কিছু। এঁদের কথা :

"মা যদি সন্তানে মারে
(তবু) শিশু কাঁদে 'মা মা' বলে
ঠেলে দিলে গলা ধরে
ছাড়ে না মা যতোই বকো।"

এই মা যে আপনার, তাঁর দেওয়া দুঃখ-আঘাত সত্ত্বেও তিনিই সব। আপন মার মত তাঁর উপর অভিমানও করেছেন তাঁরা—"ভূতলে আনিয়ে মাগো করলি আমায় লোহাপেটা।" মায়ের কাছে যখন মুক্তি প্রার্থনা করেছেন তখনও তার জন্য ভিক্ষা না করে আপন মা জেনে দাবী, জন্ম-অধিকার জানানো হয়েছে :

"আমি দুর্গা দুর্গা বলে যদি মরি
আখেরে এ দীনে না তার কেমনে
জানা যাবে গো শঙ্করী।"—এখানে জননী অচিন্ত্যশক্তি-রূপিণী হয়েও নিজেকে অনেক খর্ব করে ভক্তের নিকট প্রকাশ করেছেন। জগদীশ্বরী জননীর এ হল মধুরতম প্রকাশ।

কিন্তু এ দেশের মাতৃসাধকদের আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁরা আরাধ্যা জননীর মাধুর্যভরা স্নেহ-কোমল মূর্তিটিরই শুধু ধ্যান করেননি। সর্বশক্তিস্বরূপিণী ঈশ্বরী, যিনি জগৎকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে পালন করছেন, আবার নির্বিচারে তাকে বিনাশও করে থাকেন—তাঁর সত্যরূপে তিনি ভীমা-ভয়ঙ্করাও। তিনি দনুজ-দলনী, শত্রু-নাশিনী দুর্গা; তিনিই নরমুণ্ডমালিনী সংহার-মূর্তি কালী; তিনিই নিজ ছিন্নকণ্ঠের রুধির-পান-মত্তা ছিন্নমস্তা। মৃত্যু ও ভীষণ সংহার যাঁর আনন্দ-লীলা, তিনিই এঁদের ধ্যানে আনন্দময়ী! রামপ্রসাদ গেয়েছেন :

"দিবানিশি ভজরে মন অন্তরে করালবদনা
আনন্দে আনন্দময়ী হৃদয়ে কর স্থাপনা।"

---

৩ স্বামী অভেদানন্দ—দুর্গাপূজা, শারদীয়া বিশ্ববাণী, ১৩৭২, পৃঃ ১।

সংহার-শক্তিও মাতৃ-মূর্তির অভিজ্ঞান—এখানেই এই সাধকদের ধারণার চমৎকারিত্ব। চিন্তা করে দেখলে দেখা যাবে এঁরা অত্যন্ত বাস্তব-বাদী। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের চক্রাকার আবর্তন, জন্ম-মৃত্যুর অবিরাম খেলা, অবিচ্ছিন্ন ক্ষয়-ক্ষতি-ধ্বংসের ধারা—এইত প্রকৃত জগৎ-প্রবাহের পরিচয়। এই অবিরাম মৃত্যুর প্রবাহ যতই ভয়ঙ্কর হোক, এ অনস্বীকার্য। এই সব নির্ভীক বাস্তববাদীরা এই নগ্ন সত্যকে মেনে নিয়ে বলেছেন :

"শ্মশান ভালোবাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি,
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি।"

মায়ের এই ভয়ঙ্করী মূর্তির শ্রেষ্ঠ উপাসক স্বামী বিবেকানন্দ; তাঁর ধ্যানে মায়ের করাল মূর্তির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। সেজন্য তাঁর 'Kali the Mother' এবং "নাচুক তাহাতে শ্যামা" —এই দুইটি কবিতায় তাঁর কল্পনাশক্তির কাছে সকল সাধক-কবির কল্পনাশক্তি পরাজিত। এ দুটি কবিতায় মৃত্যু-তাণ্ডবের যে বর্ণনা আছে, ভাষায় তার চেয়ে অধিক প্রকাশ অসম্ভব। কথিত আছে প্রখ্যাত শিল্পী রণদা উকীল তাঁর মুখে এ বর্ণনা শুনে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। এই কল্পনাতীত তাণ্ডব-নৃত্য-পরা কালীর করালীরূপ দর্শন করে 'Kali the Mother' কবিতাটি রচনাশেষে তিনি নিজেও নাকি বাহ্যসংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলেন।

এই কবিতাদুটিতে তিনি আশ্চর্য চিত্রকল্প-সৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। অত্যন্ত জীবন্ত এই চিত্রকল্পগুলির মাধ্যমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেই ভয়ঙ্কর ছবি। প্রলয়-ঘোর অন্ধকারের মধ্যে কালী মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা করে চলেছেন। এই অন্ধকারের ভীষণতাকে জীবন্ত করে তুলেছে দুটি অপূর্ব চিত্রকল্প :—"স্পন্দিত ধ্বনিত অন্ধকার" আর, "অন্ধকার উগরে আঁধার"। সেই মহাঘোর অন্ধকারের মধ্যে সাক্ষাৎ প্রলয়মূর্তি। ঝঞ্ঝাবায়ু ধ্বংসকার্যে কি ভীষণ দ্রুতগতি, তার স্পষ্ট ছবি এঁকেছেন নিম্নোক্ত চিত্রকল্পে :

"লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দীশালা হতে,
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি ফুৎকারে উড়ায়ে চলে
পথে।"[৪]

সেই সঙ্গে যোগদান করেছে মহাঘোর গর্জন করে ভয়াল সমুদ্র, তার আকাশচুম্বী তরঙ্গমালা সমস্ত সৃষ্টিকে অতলে তলিয়ে দিতে চায়। মধ্যে মধ্যে তীব্র বিদ্যুৎ-ঝলকানি মৃত্যুর ভীষণ কালিমাকেই প্রকট করে তুলেছে—আরও একটি আশ্চর্য চিত্রকল্প সৃষ্টি করে বিবেকানন্দ এ ছবিটিও আমাদের সামনে জীবন্ত করে তুলেছেন :

"......ঘোররূপা হাসিছে দামিনী
প্রকাশিছে দিকে দিকে তাঁর মৃত্যুর কালিমা-
মাখা গায়।"

এ সকল চিত্র এত জীবন্ত, তার কারণ নিছক কবিত্ব-শক্তি নয়, প্রত্যক্ষ দর্শন এখানে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। বিবেকানন্দ সম্মুখে জীবন্ত দেখছেন কালীর করালী-মূর্তি; দেখছেন সত্য সত্য "মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে"; দেখছেন "তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতি পদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে" তাই এমন আর একটি চিত্রকল্প এল যাতে কালী প্রতিভাত হলেন মহা-অমঙ্গল-মূর্তি রূপে, সে চিত্রকল্পটি হল :

—লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর! দুঃখরাশি জগতে
ছড়ায়,
নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে—"

বিবেকানন্দের ধ্যানের মাতৃমূর্তি তাই দয়াময়ী নন; বরাভয়প্রদা, শত্রুনাশিনী ত্রাণ-কারিণী নন; তিনি অশুভ-অমঙ্গল-মূর্তি, নিষ্ঠুরা, ভয়ঙ্করা। তিনি আমাদের সুখ দেন না,

---

৪ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক 'Kali the Mother' কবিতার অনুবাদ—'মৃত্যুরূপা মা'।

রক্ষা করেন না; বরঞ্চ দুঃখ ও মৃত্যু দেন রাশি রাশি। "মৃত্যু তুমি, রোগ মহামারী বিষকুম্ভ ভরি বিতরিছ জনে জনে"—এই তাঁর স্বরূপ। এই অমঙ্গল-মূর্তির সুস্পষ্ট দুঃসাহসিক স্বীকৃতি—এই হল বিবেকানন্দের চিন্তার বৈশিষ্ট্য। জগতের মাতৃসাধনার ইতিহাসে তাঁর অবদান এই অপার দুঃসাহসিকতা। তাঁর মতে এই মৃত্যুরূপাকে যারা 'দয়াময়ী'নামে অভিহিত করে, তারা ভীরু, নগ্ন সত্যকে তারা ভয় পায়, নিরাবরণ সত্যস্বরূপ করালরূপিণী মাকে তারা দূরে ঠেলে রাখে, তাই জননীকে তারা পায় না। তাই তাদের কাপুরুষতাকে বিদ্রূপ করেছেন দুঃসাহসী বীর সাধক বিবেকানন্দ:

"মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়,
নাম দেয় দয়াময়ী।
প্রাণ কাঁপে, ভীম অট্টহাস, নগ্ন দিক্‌বাস,
বলে মা দানবজয়ী॥"

যারা তাঁকে পাবে, তাদের মধ্যে সুখ-অনুসন্ধানের লেশমাত্র থাকলে চলবে না, তাদের সব 'স্বার্থ-সাধ-মান' চূর্ণ করে হৃদয়কে শ্মশান করতে হবে। এই মৃত্যু, এই 'দুঃখ রাশি রাশি,' এই মহা অমঙ্গলকে যারা সাহসের সঙ্গে বরণ করতে পারে, তাঁকে তারাই পায়:

"সাহসে যে দুঃখ-দৈন্য চায়,
মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে।
কাল-নৃত্য করে উপভোগ,
মাতৃরূপা তারই কাছে আসে।"

বিবেকানন্দের অভিনব ধারণার এটাই আশ্চর্য দিক যে মহা-অমঙ্গল-মূর্তি করালী কালীই তাঁর কাছে পরমস্নেহময়ী জননী। বিবেকানন্দের মতে তিনি দয়াময়ী নন, কিন্তু তিনি স্নেহময়ী। কারণ হৃৎপিণ্ড দলিত মথিত করে তিনি মুছে দেন সকল কলুষ, চূর্ণ করে দেন সব স্বার্থ-সাধ-মান, নাশ হয় অহং-এর। সেজন্য এসব ধ্বংসলীলা তাঁর স্নেহেরই দান। নিবেদিতার "Kali the Mother" রচনায় খুব সুন্দর করে এই ধারণাটিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কবিত্বময় ভাষায়: "Strong, fearless, resolute—when the sun sets and the game is done, thou shalt know well, that I Kali, the giver of manhood, the giver of womanhood and withholder of victory, are thy Mother."—"ওরে বাছা! শক্ত হয়ে, দৃঢ় হয়ে থাক, ভয় পাস না, যখন সূর্য অস্ত যাবে, খেলা শেষ হবে, তখন দেখবি যে আমি তোর সত্তাকে সৃষ্টি করেছি—পুরুষকে পুরুষত্ব, নারীকে নারীত্ব দিয়েছি, যে আমি তোকে জীবনে জয় হতে বঞ্চিত করেছি—সেই আমিই তোর মা।" সুতরাং বিবেকানন্দের মতে কণ্ঠে মুণ্ডমালা, কটিদেশে নরকরোটি, ভীষণ সর্বনাশী কালীমূর্তিই এক অপার স্নেহময়ী জননী-মূর্তি। সেজন্য তাঁর মতে মাতৃসাধকের প্রকৃত সাধন মৃত্যুর সাধন—"To seek death not life, to hurl oneself on the sword's point, to become one with the terrible". নিবেদিতাকে এই মৃত্যুদীক্ষায় দীক্ষিত করে তিনি আশীর্বাদ করেছিলেন—"তুমি তাঁর নিত্যদাসী হও।" সেজন্য নিবেদিতার দক্ষ রূপমণ্ডনে তাঁর ধ্যানের কালী সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছেন—"কালীবিগ্রহ এক দেবীর মূর্তন-প্রয়াস নয়, বরঞ্চ একে বলতে পারি আমাদের জীবনের গোপন রহস্যের উচ্চারণ।......কালী নীলবর্ণা। প্রায় কালো; যেন একটা বিরাট ছায়া; জীবন ও মৃত্যুর নিষ্করুণ সত্যের মতন নগ্ন। কিন্তু তার (সাধকের) কাছে এ শুধু একটা ছায়ামূর্তি নয়। এই ভয়ঙ্করীর গভীরতম অন্তঃস্থলে পৌঁছয় তার অবিচল দৃষ্টি, আর চেনার আনন্দোচ্ছ্বাসে সে তাকে ডাক দিয়ে

ওঠে 'মা'।" গুরুর প্রত্যক্ষ দর্শনকে অপূর্ব বাঙ্ময় করে তুলেছেন এখানে নিবেদিতা। ছায়াময়ীর অপরূপ আলোকময়ী মূর্তি দেখেছিলেন বলে বিবেকানন্দের প্রিয় সঙ্গীত হয়েছিল :

"—— মা কি আমার কালো রে
কালোরূপে দিগম্বরী হৃৎপদ্ম করে আলোরে।"

এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি-সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ। কালীরূপের বিচিত্র প্রকাশের একটি সামগ্রিক চিত্র তিনিই আমাদের দিয়েছেন :—"তিনি (কালী) নানাভাবে লীলা করছেন। তিনিই মহাকালী নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। মহাকালী নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পৃথিবী তখন ছিল না, নিবিড় আঁধার, তখন মা নিরাকারা মহাকালী—মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন। শ্যামাকালীর অনেকটা কোমলভাব—বরাভয়দায়িনী। গৃহস্থ বাড়ীতে তাঁরি পূজা হয়। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয়—রক্ষাকালী করতে হয়। শ্মশানকালীর সংহার-মূর্তি—শব-শিবা, ডাকিনী-যোগিনীর মধ্যে শ্মশানের উপর থাকেন। রুধিরধার, গলায় মুণ্ডমালা, কটিতে নরহস্তের কোমরবন্ধ।"[৫] বিচিত্র রূপের রসিক শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর দৃষ্টিতে মায়ের বহু বিচিত্ররূপ—তিনি মঙ্গল, তিনিই অমঙ্গল; তিনি সৃষ্টি করেন, বিনাশ করেন, আবার রক্ষা করেন, অভয় দেন।

চণ্ডীতে এই মহাশক্তি মাতৃরূপাকে আবার 'ভ্রান্তিরূপা', 'ছায়ারূপা' বলেও স্তুতি করা হয়েছে। বলা হয়েছে 'পরমাসি মায়া', বলা হয়েছে তিনি মায়ার দ্বারা জগৎকে সম্মোহিত করে রেখেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সুন্দর করে বিষয়টি ব্যক্ত করেছেন—"তাঁর মায়াতে সংসারী জীব কামিনীকাঞ্চনে বদ্ধ, আবার তাঁর দয়া হলেই মুক্ত।......তিনি লীলাময়ী! এ সংসার তাঁর লীলা। তিনি ইচ্ছাময়ী, আনন্দময়ী! লক্ষ্যের মধ্যে একজনকে মুক্তি দেন।"[৬]

এই অচিন্ত্য শক্তির খেলা সম্বন্ধে নানা অভিমত আছে। বেদান্তমতে মায়া অবস্তু, তার কোন অস্তিত্ব নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দর্শনমতে এ হ'ল অনস্বীকার্য বাস্তব সত্য—"A statement of fact"। জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, আলো-ছায়াময় জগৎ অত্যন্ত বাস্তব, প্রতিমুহূর্তের সত্য—এর কোনটাই অসত্য নয়, অনস্তিত্ব নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ এর অপূর্ব এক ভাষ্য দিয়েছেন—"বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, জীব-জগৎ—এ সব শক্তির খেলা। বিচার করতে গেলে এ সব স্বপ্নবৎ; ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু; শক্তিও স্বপ্নবৎ অবস্তু। কিন্তু হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হলে শক্তির এলাকা চাড়িয়ে যাবার জো নেই। 'আমি ধ্যান করছি', 'আমি চিন্তা করছি'—এ সব শক্তির এলাকার মধ্যে, শক্তির ঐশ্বর্যের মধ্যে। তাই ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। এককে মানলেই আর একটিকে মানতে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি—অগ্নি মানলেই তার দাহিকাশক্তিকে মানতে হয়, দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না, আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকাশক্তি ভাবা যায় না।...কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী।" শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যানের কালী তাই "সাকার আবার নিরাকার।"[৭] সেজন্য তাঁর মত "যাঁর নিত্য, তাঁরই লীলা। তাই আমি নিত্য, লীলা সবই লই। মায়া বলে জগৎ-সংসার

৫ কথামৃত, প্রথম ভাগ, ২।৪

৬ কথামৃত, প্রথম ভাগ, ২।৫

৭ কথামৃত, প্রথম ভাগ, ২।৪

উড়িয়ে দিই না। তা হলে যে ওজনে কম পড়বে।"[৮] এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব বাস্তবদর্শিতা প্রমাণিত এবং মাতৃরূপধ্যানের অভিনবত্ব প্রকাশ পেয়েছে। 'কালী-ব্রহ্ম সার' জেনে "সাকার আবার নিরাকার"—সর্বরূপে তাঁকে তিনি দেখেছেন এবং ইচ্ছাময়ীর কৌতুক-লীলারস পরমানন্দে উপভোগ করেছেন।

সুতরাং এই জগৎ-সংসার তার ভাল-মন্দ, দুঃখ-সুখ, ধ্বংস-মৃত্যু—সব নিয়েই আনন্দ-লীলা। জীবনের উপান্তে এসে বিবেকানন্দও তাঁর মৃত্যুরূপা মার মধ্যে এক লীলা-কৌতুক-ময়ীর সন্ধান পেয়েছেন, সেজন্য ভাল-মন্দ সব তখন সমান হয়ে গিয়েছে তাঁর দৃষ্টিতে। এই সময় নিবেদিতাকে লেখা একটি চিঠি—'তুমি কখনও মন্দকে উপভোগ করেছো, হাঃ হাঃ বোকা মেয়ে সবই ভাল! যত সব বাজে। ভাল-মন্দ দুই-ই আমার উপভোগ্য। আমিই ছিলাম যীশু, আমিই ছিলাম জুডাস ইস্ক্যারিয়ট, দুই-ই আমার খেলা, আমার কৌতুক।" লীলাকৌতুকময়ী মায়ের কাছে তিনিও একটি কৌতুকপরায়ণ শিশুতে পরিণত হয়েছেন। শিশু ভাল-মন্দ-ভেদ জানে না, সবই তাকে সমান আনন্দ দেয়। তখন তাঁর ভয়ঙ্করী অমঙ্গলমূর্তি মা-ই অপার শান্তিময়ী হয়ে দেখা দিয়েছেন। সেই সময়ের অপর একটি চিঠিতে তাঁর এই অনুভূতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে: "আমার সামনে অপার শান্তিসমুদ্র দেখতে পাচ্ছি। সময়ে সময়ে তা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করি, সেই অসীম অনন্ত শান্তিসমুদ্র—মায়ার এতটুকু বাতাস বা ঢেউ পর্যন্ত যার শান্তিভঙ্গ করছে না।" এককালে মৃত্যুরূপা মা যত জীবন্ত ছিলেন, আজ শান্তিরূপা মা তত জীবন্ত। সেইজন্য আর কোন চাওয়া নয়, এখন চাই মায়ের শান্তিময় স্নেহ-ক্রোড়; ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছার কাছে নিজেকে শান্তভাবে সম্পূর্ণ সমর্পণ—আর কিছু নয়। মায়ের শান্তিময় কোলের আহ্বান তাই তাঁকে অধীর করে তুলেছে, তিনি ঐ চিঠিতেই বলছেন—"যাই মা যাই, তোমার স্নেহময় বক্ষে ধারণ করে যেখানে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, সেই অশব্দ, অস্পর্শ, অজ্ঞাত অদ্ভুত রাজ্যে অভিনেতার ভাব সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র দ্রষ্টা বা সাক্ষীর মতো ডুবে যেতে আমার দ্বিধা নেই।" তখন শুধু ভাল-মন্দ সমান নয়, জীবন-মৃত্যুও সমান—এ উভয়ই তখন সেই শান্তিময়ী অমৃতময়ী মায়ের ছায়ামাত্র। শান্ততেজের সঙ্গে বিনা দ্বিধায় মৃত্যুর সিংহদ্বারে প্রবেশের জন্য তখন তিনি উদ্যত।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধ্যানে মাতৃরূপা তাই অনন্ত বিচিত্ররূপিণী। "অন্ত নেই তাঁর, অন্ত নেই"—এই যেন তাঁদের অন্তরের কথা। সেই অন্তহীন বিচিত্ররূপিণীর উদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ তাই পরমবিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হয়ে গাইতেন:

"মা, কে তোমারে জানতে পারে
তুমি না জানালে পরে।
বেদ-বেদান্ত পায় না অন্ত
ঘুরে মরে অন্ধকারে॥"

৮ কথামৃত, প্রথম ভাগ

আমি সেই আত্মা*

স্বামী বিবেকানন্দ

[অনুবাদ : শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত]

আজ সন্ধ্যায় বক্তৃতার বিষয় 'মানুষ'—প্রকৃতির সহিত তুলনায় মানুষের পার্থক্য। দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রকৃতি শব্দটি কেবলমাত্র বাহ্যপ্রকৃতিকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত; ইহার অন্য প্রয়োগ প্রায় ছিলই না। দেখা যাইত, বাহ্যপ্রকৃতির সবকিছু নিয়ম-শৃঙ্খলা মানিয়া চলে; উহারা পুনরাবৃত্ত হয়—পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে তাহা আবার ঘটে, এমন কোন ঘটনা নাই যাহা মাত্র একবার ঘটিয়াছে। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা হইল যে প্রকৃতি সর্বত্র ও সর্বকালে একরূপ। প্রকৃতির ধারণার সহিত একরূপতা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত: এই একরূপতাকে বাদ দিয়া বাহ্যপ্রকৃতিকে বুঝিতে পারা যায় না। আমরা যাহাকে 'নিয়ম' বা 'বিধি' বলি, তাহার ভিত্তি এই একরূপতা।

ক্রমশঃ 'প্রকৃতি'-শব্দ ও একরূপতার ধারণা অন্তর্জগতেও—জীবন ও মনের ঘটনাবলীর উপরও প্রযুক্ত হইতে লাগিল। যাহা কোন কিছুকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত করে, তাহাই প্রকৃতি। চারাগাছ, প্রাণী, ও মানুষের প্রকৃতি বলিতে উহাদের গুণ বা ধর্ম বুঝায়। মানুষের জীবন নির্দিষ্ট প্রণালী ধরিয়া চলে; তাহার মনও তাহাই করে। চিন্তারাজির উৎপত্তি হঠাৎ হয় না; উহাদের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের একটি নির্দিষ্ট প্রণালী আছে। অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, বাহ্যপ্রকৃতি যেমন প্রণালীবদ্ধ, অন্তঃপ্রকৃতি অর্থাৎ মানুষের জীবন এবং মনও তেমনি বিধিবদ্ধ।

যখন আমরা মানুষের মন ও অস্তিত্ব সম্পর্কে নিয়ম বা বিধির কথা বিবেচনা করি, তখন স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, স্বাধীন ইচ্ছা ও স্বাধীন অস্তিত্ব বলিয়া কোন কিছু থাকিতে পারে না। পাশব প্রকৃতি কিভাবে বিধি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা আমরা জানি। পশুরা কোন স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী চলে বলিয়া মনে হয় না। মানুষের সম্বন্ধেও একথা খাটে; মানবপ্রকৃতিও বিধিবদ্ধ। মানবমনের বৃত্তিগুলি যে বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহাকে কর্মের নিয়ম বা কর্মসূত্র বলে।

শূন্য হইতে কোন কিছুর উৎপত্তি কেহ কখনও দেখে নাই; মনে যদি কিছু জাগে, তাহাও কোন কিছু হইতে অবশ্য উদ্ভূত হইয়াছে। আমরা যখন স্বাধীন ইচ্ছার কথা বলি, তাহার অর্থ, ইচ্ছা কোন কিছু দ্বারা উদ্ভূত হয় নাই। কিন্তু ইহা সত্য হইতে পারে না; ইচ্ছা জাত হইয়াছে; এবং যেহেতু ইহা জাত হইয়াছে, ইহা স্বাধীন হইতে পারে না ইহা বিধিবদ্ধ। আমি যে আপনার সঙ্গে কথা বলিতে ইচ্ছুক এবং আপনি আমার কথা শুনিতে আসিয়াছেন, ইহাও একটি বিধি। আমি যাহা কিছু করি বা ভাবি বা অনুভব করি, আমার প্রত্যেক আচরণ বা ব্যবহার, আমার প্রত্যেক গতিবিধি—সবই কারণোদ্ভূত, সুতরাং স্বাধীন নয়। আমাদের জীবন ও মনের এই নিয়ন্ত্রণকেই কর্মের বিধি বা কর্মসূত্র বলে।

* ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ স্যানফ্রান্সিস্কোতে প্রদত্ত 'I am that I am' নামক বক্তৃতার সারাংশ।

যদি প্রাচীন কালে পাশ্চাত্য সমাজে এরূপ তত্ত্ব প্রবর্তিত হইত, তাহা হইলে তুমুল হইচই পড়িয়া যাইত। পাশ্চাত্যের মানুষ ভাবিতে চায় না যে, তাহার মন বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারতের প্রাচীনতম দর্শন যখন এই নিয়ম-বদ্ধতার কথা প্রচার করে, ভারতবাসীরা তখনই উহা গ্রহণ করিয়াছিল। মনের স্বাধীনতা বলিয়া কিছু নাই; উহা থাকিতে পারে না। এই শিক্ষা ভারতীয় মনে কোন উত্তেজনা সৃষ্টি করিল না কেন? ভারত ইহা শান্তভাবে গ্রহণ করিল; ইহাই ভারতীয় মনীষা বা চিন্তার বৈশিষ্ট্য; এখানেই ভারতীয় ভাবধারা জগতের অন্যান্য ভাবধারা হইতে স্বতন্ত্র।

বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি দুইটি পৃথক্ বস্তু নয়; ইহারা প্রকৃতপক্ষে এক। প্রকৃতি সমস্ত বাহ্য-দৃশ্যের সমষ্টি। যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু গতিশীল, তাহারই অর্থ 'প্রকৃতি'। বস্তু ও মনের মধ্যে আমরা পার্থক্যের গভীর সীমারেখা টানি; আমরা ভাবি, মন বস্তু হইতে একেবারে পৃথক্। প্রকৃতপক্ষে ইহারা একই প্রকৃতি, এক-অর্ধ অপরার্ধের উপর সর্বদা ক্রিয়াশীল। নানাপ্রকার সংবেদনের আকারে বস্তু মনের উপর চাপ দিতেছে। এই সংবেদনগুলি শক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। বাহিরের শক্তি ভিতরের শক্তির উদ্দীপক। বাহিরের শক্তিতে সায় দেওয়ার অথবা বাহিরের শক্তি হইতে দূরে থাকার ইচ্ছার ফলে অন্তরস্থ শক্তি যে রূপ নেয়, তাহাকেই আমরা চিন্তা বলি।

বস্তু ও মন দুই-ই প্রকৃতপক্ষে শক্তি ছাড়া আর কিছু নয়; এ-দুটিকে যদি ভালভাবে বিশ্লেষণ কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, মূলতঃ উহারা এক। বাহিরের শক্তি ভিতরের শক্তিকে যে ভাবেই হউক উদ্দীপিত করিতে পারে—ইহাতেই বুঝা যায় যে, কোন স্থানে ইহারা পরস্পর মিলিত হয়—ইহারা নিশ্চয়ই অবিচ্ছিন্ন, এবং সেজন্য এ-দুটি মূলতঃ একই শক্তি। যখন তোমরা বস্তুগুলির মূলে গিয়া পৌঁছাও, তখন সেগুলি সরল ও সাধারণ হয়। যেহেতু একই শক্তি এক আকারে বস্তুরূপে এবং অন্য আকারে মনরূপে প্রকাশিত হয়, তখন বস্তু ও মনকে পৃথক্ বলিয়া চিন্তা করিবার কোন কারণ নাই। মন বস্তুতে রূপান্তরিত হয়, বস্তু মনে রূপান্তরিত হয়। চিন্তাশক্তি স্নায়ু- ও পেশী-শক্তি হয়, পেশী- ও স্নায়ু-শক্তি চিন্তাশক্তি হয়। বস্তু অথবা মন যেরূপেই প্রকাশিত হউক না কেন, এই সব শক্তি প্রকৃতি।

সূক্ষ্মতম মন ও স্থূলতম বস্তুর মধ্যে পার্থক্য শুধু পরিমাণের। অতএব সমগ্র বিশ্বকে মনও বলা যাইতে পারে, বস্তুও বলা যাইতে পারে; বস্তু বা মন যাহাই বলা হউক না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। তোমরা মনকে জড় বস্তুর সূক্ষ্ম অবস্থা, অথবা শরীরকে মনের স্থূলীভূত রূপ বলিতে পার; কোন্‌টাকে কি বলিবে, তাহাতে বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই। জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের মধ্যে বিরোধের জন্য যে-সকল অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে, সেগুলির কারণ ভুল চিন্তা। প্রকৃতপক্ষে এই দুই-এর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। আমার ও নিম্নতম শূকরশাবকের মধ্যে পার্থক্য শুধু মাত্রার। শূকরশাবকের মধ্যে শক্তির প্রকাশ কম, আর আমার মধ্যে শক্তির প্রকাশ বেশী। কখন বা আমার অবস্থা অপেক্ষাকৃত খারাপ, শূকরশাবক আমার চেয়ে ভাল।

মন অথবা বস্তু—কোন্‌টি প্রথমে আসে, ইহার আলোচনা করিয়া কোন লাভ নাই। মনই কি প্রথম—যাহা হইতে বস্তু আসিয়াছে? অথবা বস্তুই কি প্রথম—যাহা হইতে মন

আসিয়াছে? এ-সকল তুচ্ছ প্রশ্ন হইতে বহু দার্শনিক যুক্তি উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা অনেকটা 'ডিম আগে না মুরগী আগে?'—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার মতো। দুই-ই আগে, এবং দুই ই শেষে—মন ও বস্তু, বস্তু ও মন। যদি বলা যায়, বস্তুর অস্তিত্ব প্রথমে এবং বস্তু ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া মন হয়, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বস্তুর পূর্বে মনের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই ছিল। যদি না থাকিত, বস্তু কোথা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে? মনের পূর্বে বস্তুর অস্তিত্ব আছে, বস্তুর পূর্বে মনের অস্তিত্ব আছে। ইহা আগাগোড়া 'মুরগী ও ডিমের প্রশ্নের'ই মতো।

সমগ্র প্রকৃতি কার্য-কারণ-নিয়ম বা নিমিত্তের দ্বারা সীমাবদ্ধ, এবং দেশ-কালের অন্তর্গত। দেশের বাহিরে আমরা কিছু দেখিতে পারি না, তথাপি দেশ কি তাহা আমরা জানি না। কালের বাহিরে আমরা কিছু অনুভব করিতে পারি না, তথাপি কাল কি তাহা আমরা জানি না। নিমিত্তের ভাষায় না বলিলে আমরা কিছু বুঝিতে পারি না, তথাপি নিমিত্ত কি তাহা আমরা জানি না। দেশ কাল ও নিমিত্ত—এই তিনটি প্রত্যেক দৃশ্যবস্তুর মধ্যে অনুস্যূত আছে, কিন্তু এগুলি দৃশ্যবস্তু নয়। দেশ-কাল-নিমিত্ত যেন ছাঁচের মত; কোন কিছু সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলে পূর্বে তাহার প্রত্যেকটিকে এই ছাঁচে ঢালিয়া লইতে হইবে। দেশ-কাল-নিমিত্তের সহিত সংযুক্ত সত্তার নাম জড়বস্তু। দেশ-কাল-নিমিত্তের সহিত সংযুক্ত সত্তার নাম মন।

এই তত্ত্বটি অন্যভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে। নাম ও রূপের সহিত সত্তা যুক্ত হইলে যাহা হয়, প্রত্যেকটি বস্তু হইল তাহাই। নাম ও রূপ আসে এবং যায়, কিন্তু সত্তা চিরদিন একই রূপ থাকে। সত্তা, নাম ও রূপের সমবায়ে এই ঘটটি সৃষ্ট হইয়াছে। এটি ভাঙ্গিয়া গেলে এটিকে আর তোমরা ঘট নামে অভিহিত কর না, ইহাতে ঘটের রূপও দেখ না। ইহার নাম ও রূপ লুপ্ত হয়, কিন্তু ইহার সত্তা থাকিয়া যায়। বস্তুর যাবতীয় পার্থক্য নাম ও রূপের দ্বারা সৃষ্ট। এগুলি সত্য নয়, কারণ ইহাদের অস্তিত্ব লুপ্ত হয় আমরা যাহাকে প্রকৃতি বলি, তাহা অবিনাশী ও বিকারহীন সত্তা নয়। দেশ, কাল ও নিমিত্তই প্রকৃতি। নাম ও রূপই প্রকৃতি। প্রকৃতিই মায়া। মায়া মানে নাম ও রূপ—যাহার ছাঁচে প্রত্যেকটি বস্তুকেই ঢালা হয়। মায়া সত্য নয়। মায়া সত্য হইলে আমরা ইহার বিনাশ অথবা পরিবর্তন ঘটাইতে পারিতাম না। সত্তা হইতেছে মন-বুদ্ধির অতীত চরম সত্য, আর মায়া হইতেছে মন-বুদ্ধি-গ্রাহ্য পরিদৃশ্যমান জগৎ-প্রপঞ্চ। আমাদের যে আসল 'আমি', কোন কিছুই তাহার বিনাশ ঘটাইতে পারে না; পরিদৃশ্যমান 'আমি'-টি সদা পরিবর্তনশীল ও নশ্বর।

আসল কথা, যাহা কিছুর অস্তিত্ব আছে, তাহারই দুইটি অবস্থা আছে। একটি বিশ্বাতীত, নিত্য, বিকারহীন ও অবিনাশী অবস্থা, অপরটি পরিবর্তনশীল ও নশ্বর। মানুষ স্বরূপতঃ সত্তা, আত্মা। এই আত্মা কখনো পরিবর্তিত বা বিনষ্ট হয় না; কিন্তু ইহাকে একটি রূপের আচ্ছাদনে আবৃত ও একটি নামের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া আমাদের মনে হয়। এই নাম ও রূপ বিকারহীন বা অবিনাশী নয়; নাম-রূপ চিরপরিবর্তনশীল ও নশ্বর। তথাপি মানুষ এই পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যেই—দেহে ও মনে—নির্বোধের মত অমরত্ব খোঁজে, শাশ্বত একটি দেহ পাইতে চায়। এরূপ অমরত্ব আমার কাম্য নয়।

প্রকৃতি ও আমার মধ্যে সম্বন্ধ কি? প্রকৃতি

নাম ও রূপ, অথবা দেশ, কাল ও নিমিত্তের প্রতীক; আমি প্রকৃতির অংশ নই, কারণ আমি মুক্ত, অমর, অপরিণামী ও অনন্ত। আমার স্বাধীন ইচ্ছা আছে কি নাই—এই প্রশ্ন আসে না, আমি যে-কোন ইচ্ছারই অতীত। ইচ্ছা যেখানেই থাকুক, ইচ্ছা কখনও স্বাধীন নয়। ইচ্ছার কোনওরূপ স্বাধীনতা নাই। যে সত্তা নাম-রূপের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আসিয়া ইচ্ছারূপে পরিণত হয়, স্বাধীনতা আছে সেই সত্তার; ইচ্ছারূপে পরিণত হওয়ামাত্র নাম-রূপ উহাকে নিজেদের দাস করিয়া ফেলে। সেই সত্তা, আত্মা যেন নিজেকে নাম-রূপের ছাঁচে ঢালিয়া গড়িয়া তুলে এবং সঙ্গে সঙ্গে বদ্ধ হইয়া পড়ে; অথচ ইহার পূর্বে সে মুক্ত বা স্বাধীন ছিল। তথাপি ইহার মূল স্বভাব এ অবস্থাতেও থাকিয়া যায়। এজন্যই ইহা বলে, 'আমি মুক্ত, এসব বন্ধন সত্ত্বেও আমি মুক্ত'; আর ইহার সে স্মৃতি কখনো লোপ পায় না।

কিন্তু আত্মা যখন ইচ্ছারূপে পরিণত হইয়াছে, তখন সে আর মুক্ত বা স্বাধীন নয়। প্রকৃতি সূতা ধরিয়া টানে, আর তখন তাহাকে প্রকৃতি যেমন নাচাইতে চায় সেভাবেই নাচিতে হয়। তুমি ও আমি এভাবে বছরের পর বছর নাচিয়াছি। আমরা যাহা কিছু করি, দেখি, অনুভব করি ও জানি—তাহা সবই, আমাদের সকল চিন্তা ও কার্য, প্রকৃতির আদেশানুযায়ী নৃত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। কোন কিছুতেই ইহার কোন স্বাধীনতা ছিল না এবং নাই। নিম্নতম হইতে উচ্চতম সকল চিন্তা ও কার্য নিয়ম-শৃঙ্খলিত; অবশ্য এই সবের সঙ্গে আমাদের প্রকৃত স্বরূপের কোন সংশ্রবই নাই।

আমাদের যথার্থ স্বরূপ সকল নিয়মের অতীত। দাসত্ব ও প্রকৃতির সহিত সমভাবাপন্ন হও, এবং নিয়মানুগ হইয়া চল—নিয়মের বশবর্তী হইয়াই তুমি সুখী হইবে। কিন্তু যতই তুমি প্রকৃতি ও উহার আদেশকে মানিয়া চলিবে, ততই বেশী করিয়া বদ্ধ হইয়া পড়িবে। যতই তুমি অজ্ঞতার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া চলিবে, ততই তুমি বিশ্বের সব কিছুর অধীন হইবে। প্রকৃতির সহিত এই সামঞ্জস্য, এই নিয়মানুগামিতাই কি মানুষের যথার্থ-স্বরূপ ও ভাগ্যের সহিত সঙ্গতি-সম্পন্ন? কোন্ খনিজ পদার্থ কোনকালে বিধি বা নিয়মের সহিত বিবাদ করিয়াছে? কোন্ বৃক্ষ অথবা চারা গাছ কখনো কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে? এই টেবিলটি প্রকৃতি ও নিয়মকে মানিয়া চলে; কিন্তু ইহা সর্বদা টেবিলই থাকিয়া যায়, তাহা অপেক্ষা ভাল হয় না। মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করে। সে অনেক ভুল করে, অনেক কষ্ট পায়। কিন্তু পরিণামে সে প্রকৃতিকে জয় করে এবং নিজের মুক্তি উপলব্ধি করে। যখন সে মুক্ত হয়, তখন প্রকৃতি তাহার দাস হয়।

বন্ধন সম্বন্ধে আত্মার সচেতনতা এবং শক্তি-প্রকাশে সচেষ্ট হওয়াকেই 'জীবন' বলে। এই সংগ্রামে সফলতাকেই বলে ক্রমবিকাশ। সর্ব প্রকার দাসত্ব দূর করিয়া পরিণামে জয়লাভ করাকেই 'মুক্তি', 'মোক্ষ' বা 'নির্বাণ' বলে। বিশ্বে সবই মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিতেছে। যখন আমি প্রকৃতি, নামরূপ ও দেশ-কাল-নিমিত্ত দ্বারা বদ্ধ থাকি, তখন আমার যথার্থ স্বরূপ কি তাহা জানিতে পারি না। কিন্তু এই দাসত্বের মধ্যেও আমার যথার্থ স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় না। আমি বন্ধনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি, বন্ধনগুলি একে একে ছিন্ন হয়—আমার স্বাভাবিক মহত্ত্ব সম্বন্ধে আমি সচেতন হই। তারপর আসে পূর্ণ মুক্তি! তখন নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও পূর্ণ জ্ঞান লাভ করি—জানিতে পারি যে আমি অনন্ত আত্মা, আমি প্রকৃতির প্রভু, তাহার দাস নই। সকল ভেদ ও সমবায়ের অতীত, দেশ কাল ও নিমিত্তের অতীত সেই ব্রহ্ম আমি, 'আমি সেই আত্মা'!

ধর্ম-সমন্বয় ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

অধ্যাপক রেজাউল করীম

"ইমিটেশন অব ক্রাইষ্টের" লেখক টমাস এ কেম্পে তাঁর এই বিখ্যাত গ্রন্থের একস্থানে বলেছেন, "সকলেই শান্তি চাই, কিন্তু যে সমস্ত কাজ করলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তা খুব কম লোকেই চাই।" ঠিক তেমনি আমরা বলব যে ধর্মসমন্বয়ের কথা অনেকেই বলেন, কিন্তু যে সব কাজ করলে ধর্মসমন্বয় সম্ভব হতে পারে তা খুব কম লোকেই করে। প্রশ্ন এই, কি সব বিষয় ধর্মসমন্বয়ের সহায়তা করতে পারে? উত্তরে বলব উদারতা, পর-মতসহিষ্ণুতা, সকল ধর্ম মূলতঃ সত্য এই কথায় বিশ্বাস-স্থাপন এবং সকল ধর্ম বিভিন্ন পন্থায় একই লক্ষ্যের দিকে চলতে বলে—এই বোধ হচ্ছে ধর্মসমন্বয়ের সহায়ক। এই সব উদার মত সমাজে এমন একটা পরিবেশ রচনা করতে পারে যার ফলে সকল ধর্মাবলম্বী লোক পরস্পরের মধ্যে পরম প্রীতি, প্রেম ও সৌহার্দ্যের সহিত পাশাপাশি বসবাস করতে পারে।

যাঁরা প্রকৃত মহাপুরুষ তাঁরা ধর্ম সম্বন্ধে এই প্রকার উদার মত পোষণ করে ও প্রচার করে ধর্মসমন্বয়ের জন্য সাধারণ মানুষের মনকে তৈয়ার করে দেন। তাঁদের আদর্শ ও জীবনদর্শন অনুসরণ করতে পারলে পৃথিবীতে একদিন যথার্থ ধর্মসমন্বয় সম্ভব হবে।

প্রায় সব সমাজে এক শ্রেণীর লোক আছে যারা মনে করে যে প্রত্যেকের ধর্মই পরস্পর-বিরোধী। তাদের দৃষ্টিতে দুটি ধর্মসম্প্রদায়ের লোক পরস্পরের প্রতি যথার্থ বন্ধুভাবাপন্ন হতে পারে না। তারা অত্যন্ত সংকীর্ণভাবে ধর্মকে দেখে। তাই তারা মনে করে এক সম্প্রদায়ের নিকট যা ধর্ম তা অপরের নিকট অধর্ম। বিভিন্ন ধর্ম যেন শত্রুতার ভাব নিয়ে উদ্ভূত হয়েছে। আর চিরকাল ধরে এই শত্রুতার ভাবকে অক্ষুণ্ণ রাখাই যেন ধর্ম। কিন্তু বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে সঠিক ধারণা ও উপলব্ধি থাকলে কখনই এরূপ মনে হবে না, বরং এই মনে হবে যে সমস্ত ধর্ম মূলত: এক ও একই উৎস থেকে আগত এবং তারা একই উদ্দেশ্য সাধন করে ও একই লক্ষ্যে মানুষকে নিয়ে যায়।

সুদূর অতীতকালে অনেক মহাপুরুষ ধর্ম সম্বন্ধে এই প্রকার উদার মত পোষণ করতেন; তাঁরা সকল মানুষের নমস্য। আধুনিক যুগেও এমন মহাপুরুষের অভাব ঘটেনি। মাত্র একশত বত্রিশ বৎসর পূর্বে এরূপ একজন মহাপুরুষ বাংলার মাটিতে জন্মেছিলেন, যিনি ধর্ম সম্বন্ধে যে মহান আদর্শ স্থাপন করে গেছেন, উদারতার যে মহৎ নিদর্শন রেখে গেছেন তা সকল দেশের সকল মানুষের অনুকরণীয়। সেই মহাপুরুষের নাম শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। তিনি বর্তমান যুগে সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রতীক। তিনি নিজের জীবনের উদার আচরণের দ্বারা ধর্মসমন্বয়ের এমন এক উচ্চ আদর্শ স্থাপন করেছেন, যা সত্যই বিস্ময়কর। অনেক সাধক ধর্ম সম্বন্ধে বহু উদার উক্তি করেছেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবনের বিভিন্ন স্তরে সকল ধর্ম-মতকে ফুটিয়ে তুলে সমন্বয়ের এমন এক আশ্চর্য নজির স্থাপন করেছেন, যা কেউ কখনো পারেন নি। তিনি সকল ধর্মের সার সত্যকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। ধর্মের তিনি যে ব্যাখ্যা করেছেন, যে বিশ্লেষণ দিয়েছেন, তা

অভিনব ও বৈপ্লবিক। "আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায়"—এই নীতি তাঁর মধ্যে যে ভাবে বিকশিত হয়েছে, তেমন ভাবে আর কারও মধ্যে হয় নি। সেইজন্য বিনা প্রতিবাদে বলতে পারি যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এ যুগে সমন্বয়াদর্শের বাস্তব রূপ।

প্রশ্ন উঠবে ধর্মসমন্বয় বলতে কি বুঝায়? বিভিন্ন ধর্মের সার সত্য ও মূলনীতিগুলি সংগ্রহ করে, তাদের মধ্যে সংযোগ ও সামঞ্জস্য স্থাপন করে একটা অভিনব ধর্ম খাড়া করার নাম ধর্মসমন্বয় নয়। এরূপ করার উদ্যম যে হয়নি তা নয়। কিন্তু যাঁরা এরূপ করতে গেছেন তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ সম্রাট আকবরের 'দীন-ই-ইলাহী'র নাম উল্লেখ করব। ধর্মসমন্বয় বলতে আমরা অন্য জিনিস বুঝি। "সব ধর্মেই মুক্তি মোক্ষ বা নির্বাণ আছে।" ধর্মের যে কোন একটা পন্থা বা পথ অবলম্বন করে জীবনচর্যা করলে ঈশ্বর বা পরমার্থ লাভ হয়। এই বিশ্বাস থেকে সকল ধর্মের প্রতি যে উদার মনোভাব জাগ্রত হয়, তাই হল ধর্মসমন্বয়ের গোড়ার কথা। ধর্মমতের জন্য পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রয়োজন। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক উদারতা ও সহিষ্ণুতার সহিত অপর ধর্মকে দেখবে, উপলব্ধি করবে, কোন ধর্মমতের নিন্দা করবে না। প্রীতি ও ভালবাসার সহিত অপরের প্রতি আচরণ করবে। এবং এইভাবে এমন একটা সুস্থ পরিবেশ রচনা করবে, যার ফলে সকল ধর্মাবলম্বী লোক পার্থক্য সত্ত্বেও নিরাপদে বসবাস করতে পারবে। পরস্পরের সহিত প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্থাপন করবে, মিলিত হবে, বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবে, অন্তর দিয়ে পরস্পরকে ভালবাসবে। এইভাবে এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি হবে, যার ফলে প্রত্যেকে উপলব্ধি করবে যে মানুষ বিভিন্ন পথ অবলম্বন করে চললেও একই লক্ষ্যে একই বিধাতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে কিন্তু কোন এক ধর্মাবলম্বী লোক যদি মনে করে যে, তার ধর্মই একমাত্র সত্য আর অপর ধর্ম মিথ্যা, তবে সে কখনই উদার স্বাস্থ্যপ্রদ পরিবেশ রচনা করতে পারবে না। এক ধর্ম যদি অপর ধর্ম সম্বন্ধে অনুদার সঙ্কীর্ণ পক্ষপাতমূলক ধারণা পোষণ করে, তবে পৃথিবীতে শান্তির আবহাওয়া থাকবে না। তবে ধর্মের নামে আসবে অশান্তি, মারামারি, দাঙ্গা, হাঙ্গামা। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, পৃথিবীতে কম দেশের লোক ধর্ম সম্বন্ধে উদার মত পোষণ করছে। তাই যুগে যুগে পৃথিবীতে ধর্মের নামে কত যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়ে গেছে। বর্তমান যুগে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব মানুষের সামনে ধর্মের একটা উদার আদর্শ স্থাপন করে দেখিয়েছেন যে, বিভিন্ন ধর্মকে একটি সাম্প্রদায়িক ধর্মে পরিণত না করেও ধর্মসমন্বয় সম্ভব। সকল ধর্মাবলম্বী লোক উদারতার সহিত পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে পাশাপাশি বসবাস করতে পারে।

বিভিন্ন ধর্মের মৌলিক নীতির মধ্যে এমন কোন বিরোধ নাই যা তাদের একত্র মিলিত হবার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে, পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনের পথে অন্তরায় হতে পারে। সমাজে এমন এক অবস্থার কথা কল্পনা করতে হবে যখন বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় কি ঐহিক, কি আধ্যাত্মিক সকল বিষয়ে একই ক্ষেত্রে মিলিত হতে পারে, প্রত্যেকে ভিন্ন পন্থায় নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারে। মন্দিরে ঘণ্টা-ধ্বনিসহ পূজা অর্চনা হবে, গীর্জা থেকে উপাসনার জন্য ঘণ্টাধ্বনি হবে, মসজিদ থেকে আজান-ধ্বনির মধ্যে প্রার্থনা হবে। এইসব ধ্বনি ধীরে ধীরে ব্যোম-চরাচরে ব্যাপ্ত হবে এবং তাদের সম্মিলিত ধ্বনি ঈশ্বরের দরবারে উপনীত হবে। পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কোথাও কোন বিরোধ

থাকবে না, ঝগড়া-বিবাদ হবে না। প্রেমের দ্বারা, প্রীতির দ্বারা তাদের পরস্পরের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। ধর্মকে যাঁরা এইভাবে দেখেন তাঁরাইতো সত্যকার মহাপুরুষ! তাঁরা নিজেদের জীবনে সকল ধর্মের আদর্শ ও ক্রিয়া-কাণ্ডকে বাস্তবে পালন করে দেখিয়েছেন যে ধর্মসমন্বয় সম্ভব। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধক। অতীত কালে ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে এই প্রকার মিলন এবং ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য স্থাপনের সার্থক চেষ্টা হয়েছিল। বরাবর যদি এই প্রচেষ্টা অক্ষুন্ন থাকত, তবে তা গোটা ভারতের পক্ষে অত্যন্ত শুভকর হত। দেখা গেছে যে, ভারতে হিন্দু-মুসলমান দীর্ঘকাল একই সঙ্গে বসবাস করার ফলে তাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা ক্ষেত্রে মিলনের সেতু রচিত হয়েছিল। মধ্যযুগে যে সব মহাপুরুষ ও মহান সাধকগণ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সমন্বয়-সাধনের জন্য চেষ্টা করেছিলেন, এবার তাঁদের কয়েকজনের নামোল্লেখ করব। প্রথমেই মনে পড়ে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা। ধর্মের ব্যাপারে তাঁর মত উদার ও সমদর্শী মানুষ খুব কম ছিলেন। হিন্দুর মত মুসলমানও তাঁর উদার শিক্ষায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে-ছিলেন। এই সব মুসলমানের মধ্যে কেউ নিজ ধর্ম বিসর্জন দেননি। তবুও চৈতন্যদেবের প্রেম ধর্ম ও আধ্যাত্মিক সাধনার প্রভাবে ক্রমে নিজেদের জীবনকে উন্নত করেছিলেন। যবন হরিদাস আসলে ছিলেন ইসলাম-ধর্মাবলম্বী, তিনি চৈতন্যদেবের অন্যতম বিশ্বস্ত ভক্ত ও শিষ্য ছিলেন।

মহাত্মা-রামানন্দ ধর্মসমন্বয়ের আর একজন সাধক ছিলেন। তিনি জাতিভেদ মানতেন না। তিনি ভগবৎপ্রেমকে ক্রিয়াকাণ্ডের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, "যে ব্যক্তি ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করে, সে ক্রমে নিজেই ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়।" ভক্তিমার্গে কোন জাতিভেদ নাই। সেযুগে সমন্বয়াদর্শের তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক। রামানন্দের প্রিয় শিষ্যের নাম কবীর।—কবীরের উদার ধর্মমতের জন্য সকল সম্প্রদায়ের লোক তাঁকে শ্রদ্ধা করত। তিনি হিন্দু-মুসলমানের সম্মুখে প্রেম-ধর্মের আদর্শ উপস্থাপিত করেন। কবীরের 'দোহা' আজও সর্বত্র পরম আদরে গৃহীত ও শ্রেষ্ঠনীতি বলে স্বীকৃত। কবীরপন্থীদের মধ্যে হিন্দু যেমন ছিল, তেমনি ছিল মুসলমান। কবীরপন্থীরা তাদের নিঃশ্বাসের সহিত ঈশ্বরকে স্মরণ করত। সাধক রবিদাস ও নামদেব ছিলেন কবীরের সমসাময়িক লোক। এঁরা উভয়েই কবীরের শিক্ষার দ্বারা বহু পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন। শিখগুরু নানক আর একজন সমন্বয়সাধক পুরুষ। জাতিভেদ দ্বারা বিপর্যস্ত পাঞ্জাবে তিনি সমন্বয়ের বাণী প্রচার করে একটি নূতন জীবনদর্শন প্রচার করলেন। সমাজে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথা ও সাম্প্রদায়িকতার তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। বহু মুসলমান তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এইসব মুসলিম শিষ্যগণ মনে করতেন যে, নানক একজন সুফীর নিকট মিষ্টিসিজম্ বা মরমীবাদ শিক্ষালাভ করেন। তাঁর কতিপয় শিক্ষানীতি বাগদাদে আরবী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। সেই মুসলিম-প্রধান দেশে দীর্ঘকাল ধরে নানকের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত একটি 'দরগাহ' বিদ্যমান ছিল।

মহাত্মা দাদূ আর একজন বিখ্যাত সমন্বয়-সাধক। তিনিও বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে একটি সমন্বয়সাধনের জন্য চেষ্টা করতেন। কবীরের মতই তিনি আচার-অনুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব দিতেন না। তাঁর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন শেখ বাহারজি, শাহবাহারজি এবং

বাজ্জাবজি। সুদূর আসামে এইরূপ একজন সন্ত মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে; তাঁর নাম শঙ্করদেব। তিনি বৈষ্ণবভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁর মতবাদ ছিল অত্যন্ত উদার ও সংস্কারমুক্ত। আসাম অঞ্চলে তিনি একজন প্রধান সমন্বয়-সাধক। গৌড়ের সনাতন গোস্বামী একজন হিন্দু সাধক ছিলেন। তিনিও উদার ও সকল ধর্মের প্রতি সমদর্শী ছিলেন। তিনি একটি নূতন দল গঠন করেন, তার নাম 'দরবেশিয়া'। বৈষ্ণব ও বাউল মতবাদের উপর সামঞ্জস্য করে এই দরবেশিয়া দল গঠিত হয়। দরবেশিয়া দলের সাধু ও ভক্তেরা হিন্দুদের মত মালা ও মুসলমানের মত তসবিহ্ জপ করতেন; মুসলিম কবীরের মত আলখাল্লা ব্যবহার করতেন। তাঁদের সঙ্গীতে হিন্দু ও মুসলিম সাধু-সন্তদের নাম থাকত। তাঁরা ঈশ্বর ও আল্লাহ্ উভয় শব্দ ব্যবহার করতেন

এইসব সমন্বয়সাধক সাধু-সন্তদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে তাঁরা ধর্মকে একেবারে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখতেন ও বিচার করতেন। সুতরাং তাঁদের মধ্যে কোনরূপ গোঁড়ামি ছিল না। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর-প্রাপ্তির পথ বহু ও বিভিন্ন। ঈশ্বরলাভ করতে গেলে সর্বপ্রকার ভেদ-জ্ঞান দূর করতে হবে এবং একান্তভাবে সাধনা করে যেতে হবে। তাঁরা আচারবিচার ও ক্রিয়াকাণ্ডের উপর জোর দিতেন না; তার পরিবর্তে চিত্তশুদ্ধি চরিত্রউন্নয়ন ও প্রেমের উপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে ধর্মের তত্ত্বমূলক বিষয়ের সহিত নৈতিক বিচারের সমন্বয়সাধন করতে চেয়েছিলেন। এইসব মহান লোক-শিক্ষকদের প্রভাবে সমাজ থেকে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কঠোরতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছিল।

মধ্যযুগের ও এই সময়কার মুসলিম লেখকদের বহু রচনা হিন্দু ভাব, হিন্দু উপমা; ও হিন্দু চিন্তায় পূর্ণ ছিল। মুসলিম লেখকগণ ভারতবর্ষে প্রচলিত ভাষায় এইসব লিখতেন। কোন কোন হিন্দু কবি মুসলিম পদ্ধতিতে এবং মুসলিম লেখক হিন্দু পদ্ধতিতে কাব্য রচনা করতেন। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধীরে ধীরে যে একটা সমন্বয় হচ্ছিল, তাঁরা তার বিরুদ্ধাচরণ ত করেননি, বরং তাকে সমর্থন করতেন। কবি আমির খসরু সে সময়কার একজন উচ্চস্তরের কবি ছিলেন। তাঁর আবির্ভাবকাল ত্রয়োদশ শতাব্দী। আমির খসরু ধর্ম বিষয়ে এত উদার ছিলেন যে গোঁড়া মৌলবীগণ তাঁকে প্রতিমাপূজক বলে নিন্দা করতেন। তাঁদের অভিযোগের উত্তরে তিনি বলেন—

"প্রেম থেকে আমার জন্ম। আমার জন্য ইসলামের দরকার নাই। আমার সমস্ত শিরায় আছে পবিত্র উপবীত। আমার কোন সুতার দরকার নাই। লোকে বলে খসরু প্রতিমাপূজা করে; আমি বলি—হ্যাঁ, তা আমি করি। জগতের লোকের আমার কোন দরকার নাই।" আবার আমির খসরু অন্য কবিতায় হজরত মহম্মদের ও ইসলামের অন্যান্য মহাপুরুষদের অজস্র প্রশংসা করে কবিতা লিখেছেন।

১৫৬৫ সালে 'কামাল' নামক একজন কবির আবির্ভাব ঘটে। তাঁর কবিতায় দেখি হিন্দু-মুসলিম সাধু-সন্তগণ একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। তিনি একটি কবিতায় লিখেছেন: "রামের নামে আমার সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়ে আছে। লক্ষ্মণের নাম আমাকে পথ-নির্দেশ দিয়েছে। আর কৃষ্ণের নামে আমি ভবসমুদ্র পার হব।"

এই সময় আর একজন কবি আবির্ভূত হন,

তাঁর নাম মালিক মহম্মদ জয়সী। তিনি ভারতের কাহিনীকে রূপকভাবে প্রকাশ করেছেন। তাঁর বিখ্যাত 'পদ্মাবৎ' কাব্যে তিনি বলেন, আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে সংগ্রামের ভিতর দিয়ে অহরহ একটা সামঞ্জস্য ঘটে যাচ্ছে। তিনি এই কাব্যে রূপকের সাহায্যে এই সংগ্রাম ও সমন্বয়ের কথাটা ফুটিয়ে তুলেছেন। রাজ্জাব ছিলেন দাদুর প্রধান শিষ্য। তিনি রামভক্ত ছিলেন। এই সব লেখক ও সাধকদের কেহই নিজ ধর্ম ত্যাগ করেননি। তবুও উদারতার সহিত অপর ধর্মকে দেখতেন এবং তাদের সহিত সমন্বয়সাধনের জন্য চেষ্টা করতেন। উপরে লিখিত এইসব দৃষ্টান্ত থেকে পাঠকগণ বুঝতে পারবেন যে, কাউকে ধর্মান্তরিত না করেও এবং নিজ নিজ ধর্মে মতি রেখে ও উদারতার সহিত অপর ধর্মকে দেখার ফলে এদেশে একদা নিঃশব্দে ধীরে ধীরে ধর্মসমন্বয়ের ধারা প্রবাহিত হয়েছিল। মধ্যযুগের পরেও হয়ত এই ধারা অক্ষুণ্ণ থাকত, যদি এদেশে ভীষণ আকারে রাজনৈতিক বিপর্যয় না ঘটত। বিদেশী শাসন প্রবর্তিত হবার পর সাম্রাজ্যিক স্বার্থে বিদেশী শাসকগণ যে পন্থা অবলম্বন করলেন, তা সমন্বয়ের সহায়ক হল না। অল্প দিনের মধ্যে সমন্বয়ের ধারা বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের এই বাংলাদেশে একজন মহাপুরুষ আবির্ভূত হন, যিনি অতি অদ্ভুতভাবে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করলেন। সেই মহাপুরুষের নাম শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। বর্তমান যুগে তাঁকে সমন্বয়ের অগ্রদূত বলা যেতে পারে। তিনি বিভিন্ন ধর্মের অন্তরদেশে প্রবেশ করে এক অনির্বচনীয় আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ করলেন এবং অভিনব পন্থায় সমন্বয়সাধনের ইঙ্গিত দিলেন। কেমন করে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সাধক সাধনার বলে আধ্যাত্মিকতার চরম শিখরে উপনীত হলেন, সে ইতিহাস অত্যন্ত বিস্ময়কর। তিনি প্রথমে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন পদ্ধতিতে সাধনা করলেন এবং উপলব্ধি করলেন, সমস্ত পন্থায় ঈশ্বরলাভ করা যায়। অন্তর বিশুদ্ধ হলে নিষ্কাম সাধনা করলে সব মতেই সত্য পাওয়া যায়। কিন্তু কেবলমাত্র হিন্দু পদ্ধতি পালন করেই তিনি ক্ষান্ত থাকলেন না। তিনি দেখতে চাইলেন, ভিন্ন ধর্মগুলির পদ্ধতি ঠিকভাবে পালন করলে ঈশ্বরদর্শন হয় কিনা। তাই তিনি একে একে অন্যান্য ধর্মের নিয়মাবলী ও বিধিব্যবস্থাগুলি পালন করলেন। খৃষ্টানের মত উপাসনা করলেন, মুসলমানের মত প্রার্থনা করলেন। প্রত্যেক ধর্ম অনুসারে যখন তিনি সাধনভজন করতেন, তখন ঠিক সেই সম্প্রদায়ের মত পোষাক পরিধান এবং তাদের মতই আহারাদি করতেন। এইভাবে বিভিন্ন ধর্মমত অনুসারে চলার পর তিনি দিব্যদৃষ্টি লাভ করে উপলব্ধি করলেন, সব পদ্ধতি ঠিক এবং সকলের গতি একই লক্ষ্যে। তারপর তিনি যুগান্তরকারী ঘোষণা করলেন, "যত মত তত পথ"। ধর্মের এই সব পথকে একই সরোবরের বিভিন্ন ঘাটের সহিত তুলনা করলেন। তুমি যে-কোন ঘাট দিয়েই যাওনা কেন একই সরোবরে পৌছবে। ঘাট বিভিন্ন হতে পারে, কিন্তু সরোবরের জলের কোন তারতম্য নাই। ঠিক সেইরূপ সেই অক্ষয় অব্যয় নিরঞ্জন ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে ঘাটরূপ বিভিন্ন ধর্মের মাধ্যমে। বর্তমান যুগের ধর্মবিরোধ দ্বারা জর্জরিত সমাজে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই সমন্বয়ের আদর্শ নূতন পথ-নির্দেশ দিবে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সন্দেহাতীত ভাবে দেখালেন যে, একজন সত্যানুসন্ধানী মানুষ একই সঙ্গে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ ইত্যাদি সবই হতে পারে

সেজন্য চাই উদারতা, চাই নিষ্ঠা, চাই সত্যানুসন্ধিৎসা, একাগ্রতা ও অবিরাম সাধনা। এ সবের অভাবে কিছুই হবে না। "যত মত তত পথ" এই আদর্শের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধর্মচিন্তায় একটা নূতন ভাবের ইঙ্গিত ছিল। এতে ধর্মবিরোধ দূর হবে, ধর্মসমন্বয় সম্ভব হবে। মধ্য যুগ থেকে যে সাধনা আরম্ভ হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণে তা চরম পরিণতি লাভ করেছে। আজ জগৎ জুড়ে তাঁর ভক্ত শিষ্যগণ সর্বত্র তাঁরই ধর্মসমন্বয়ের আদর্শকে বাস্তব রূপ দেবার সাধনা করে চলেছেন। প্রার্থনা করি জগৎ থেকে চিরতরে ধর্মবিরোধ দূর হয়ে যাক। মানবসমাজ সত্য-প্রেম-প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হোক। জগতে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হোক।

মাতৃরূপিণী শক্তিকে

শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত

মাতৃরূপে ডাক দিয়ে পেতে চাই একান্ত নিকটে,
নীলকান্ত অন্ধকারে জ্যোতির্ময়ী রূপ দেখতে চাই,
বহুব্যাপ্ত বিভূতির রেখায় তরঙ্গ ফোটে আকাশের পটে,
আলোকের তৃষ্ণা নিয়ে বুক ভ'রে সেদিকে তাকাই!

তোমারি আনন্দ নিয়ে আকাশের বিদ্যুৎলহরী
কী রূপ দেখায়ে চলে?···চকিত বিস্ময়ে চেয়ে থাকি;
সমুদ্র-বলয়ে জাগে উচ্চচূড়া গম্ভীর যে-ছবি,
তাতেও তোমারি স্পর্শ, মনের পরতে তাই আঁকি।

বিশ্বের অনন্ত শক্তি সে তো তুমি, জননী-রূপিণী;
সাধনা নাই বা থাক, মাতৃনামে আছে অধিকার;
আগমনী শুধু থাক, বিজয়ার যে-বেদনা জানি—
তাতে শুধু চোখে জল: তুমি যে মা অনন্ত চাওয়ার!

অবিনাশী সময়ের পাতা হাতে তুমি দাও বর,
'বন্দিতাঙ্ঘ্রি যুগে দেবি,' জয় আর সৌভাগ্য সুন্দর।

পরমাণু-তত্ত্ব ও বস্তুর প্রকৃতি

ডক্টর শ্রীবিশ্বরঞ্জন নাগ

আপাতদৃষ্টিতে আমাদের চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা বিরাট বিশ্বের প্রতিটি জিনিসই সম্পূর্ণভাবে আলাদা। পুরোপুরি বিশ্বকে জানা তাই মনে হয় অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু একটু বিশেষভাবে বিচার করলে দেখা যায়, বাহিরের চেহারা আলাদা হ'লেও কিছু কিছু মিল কতকগুলি বস্তুতে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। যেমন ধরা যাক ছুরি, কাঁচি, আলমারী, চেয়ার, টেবিল, আর্সি, জলের গ্লাস, দোয়াত, কলম, ক্যালেণ্ডার ইত্যাদি। এমনিতে দেখতে গেলে এগুলি সবই ভিন্ন ভিন্ন জিনিস, প্রত্যেকটি জিনিসেরই একটি বিশেষ চেহারা আছে। একটু বিশেষভাবে ভাবলে কিন্তু দেখা যায়, বাইরের চেহারায় বিশেষত্ব থাকলেও এগুলি লোহা, কাঠ, কাঁচ ইত্যাদি কতকগুলি আসল বস্তু থেকে তৈরী। আবার লোহা, কাঠ বা কাঁচের প্রকৃতি নিয়ে যদি আরো পরীক্ষা করা যায় তো দেখা যাবে, বিশ্বের যা কিছু জিনিস আছে তাদের সবগুলির আসল বস্তুকে দুটো শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। এক শ্রেণীতে পড়বে সেই সব জিনিস যাদের নিজস্বতা কোন ভাবেই নষ্ট করা যায় না। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়বে সেই সব জিনিস যাদের তাপ, আলো বা বিদ্যুতের সাহায্যে ভাঙ্গলে তারা অন্য এমন ধরনের বিশেষ জিনিসে পরিবর্তিত হবে, যাদের প্রথম শ্রেণীর মধ্যে ফেলা যায়। প্রথম ভাগের জিনিসকে বলা হয় মৌলিক পদার্থ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের জিনিসগুলিকে যৌগিক পদার্থ। লোহা, তামা, হাইড্রজেন, অক্সিজেন, পারদ, গন্ধক—এগুলি সব মৌলিক পদার্থ। সাধারণভাবে এদের বর্ণ বা অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব। লোহা সাধারণ অবস্থায় কঠিন পদার্থ এবং বিশুদ্ধ হ'লে সাদা রং-এর। উচ্চমাত্রায় তাপ দিলে লোহা কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় পরিণত হ'তে পারে, রং-ও লাল হ'তে পারে কিন্তু তার লৌহত্ব পুরোপুরি বজায় থাকে। লোহার প্রায় সবরকমের রাসায়নিক গুণ সব অবস্থাতেই অপরিবর্তিত থাকে (১নং চিত্র)। যৌগিক পদার্থ হ'ল দুই বা তার বেশী মৌলিক পদার্থের যোগফল, তাই তাদের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য মৌলিক পদার্থের মত অতটা স্থায়ী নয়। জল একটি যৌগিক পথার্থ। সাধারণভাবে জল তরল। তাপমাত্রার পার্থক্য ঘটিয়ে জলকে বরফে বা বাষ্পে পরিণত করা যায়। এ দুই অবস্থায় জলের নিজস্ব প্রকৃতি বজায় থাকে। যে সব রাসায়নিক গুণের বিচারে জলকে অন্যসব জিনিস থেকে আলাদা করা হয়, বরফ বা বাষ্পাবস্থায় সে সব গুণ অপরিবর্তিত থাকে। যখন জলের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালান হয়, তখন কিন্তু জল পুরোপুরি বিশ্লিষ্ট হয়ে নূতন ধরনের পদার্থে পরিণত হয়—পাওয়া যায় অক্সিজেন ও হাইড্রজেন গ্যাস নামে দুইটি মৌলিক পদার্থ, যাদের প্রকৃতি সবদিক থেকে জল থেকে আলাদা (১নং চিত্র)। এভাবে সব যৌগিক পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা করে
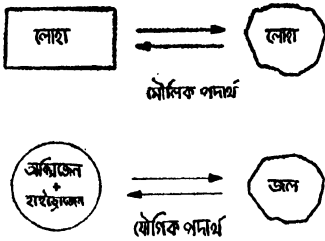
১নং চিত্র
মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ

দেখা গেছে যে, মোটামুটি সারা বিশ্বে যে অসংখ্য বিচিত্র জিনিস রয়েছে তাদের মূল বস্তু হ'ল, আজ পর্যন্ত যতটা জানা গেছে, ১০৩টি মৌলিক পদার্থ। এই মৌলিক পদার্থগুলি সব বিভিন্ন। এদের রাসায়নিক বা বাহ্যিক গুণ সবই আলাদা। সব মৌলিক পদার্থগুলির বিশেষত্ব জানলে একভাবে বলা যায় সারা বিশ্বের প্রকৃতি জানা হ'ল।

বিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরে এই মৌলিক পদার্থগুলিকে খুঁজে বেড়িয়েছেন। কোনও মৌলিক পদার্থকে চেনা যায় তার গুণাগুণ থেকে। গুণাগুণ বলতে বোঝায় পদার্থটির রং, ঘনত্ব, গ'লে যাওয়ার তাপমাত্রা, কঠিনত্ব ইত্যাদি। আবার কোন মৌলিক পদার্থকে চেনবার একটি বিশেষ উপায় হ'ল অন্যান্য জানা মৌলিক পদার্থের সাথে মিলিত হয়ে পদার্থটি কী কী যৌগিক পদার্থ তৈরী করে সেটা জানা। প্রধানতঃ এই রাসায়নিক গুণ থেকেই মৌলিক পদার্থগুলিকে বিশেষভাবে জানা সম্ভব। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক গুণের বিচার করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বহুদিন আগেই দুটি বিশেষ নিয়মের সাথে পরিচিত হন।

একটি নিয়ম হ'ল—দুটি মৌলিক পদার্থের মিলনে যখনই কোন যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয়, সব সময়েই দেখা যায় তারা একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে মিলিত হয়। যেমন ধরা যাক জল। প্রকৃতিতে
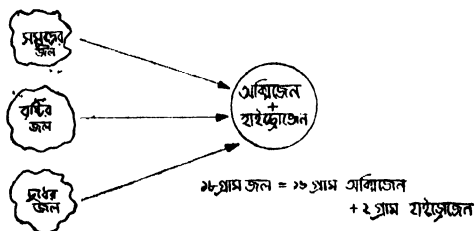
২(ক) চিত্র

রসায়ণের দুটি নিয়ম

২(খ) চিত্র
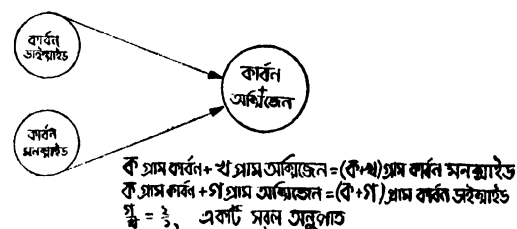
নানা অবস্থায় জল পাওয়া যায়—বৃষ্টিতে, পাহাড়ে-জমা বরফে, নদীতে, সমুদ্রে, দুধে বা বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীজ বস্তুতে। এই সবরকম জলের গুণ এক। আবার যদি যে-কোন ধরনের জলকে বিশ্লিষ্ট ক'রে এর অক্সিজেন ও হাইড্রজেন আলাদা করা যায় তো দেখা যাবে, সব রকমের জলেই একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে এই গ্যাসদুটি মিলিত হয়ে জল তৈরী হয়েছে (২ক)। দ্বিতীয় নিয়মটি হ'ল—যদি দুটি মৌলিক পদার্থ মিলিত হয়ে একের অধিক যৌগিক পদার্থ তৈরী করে, তবে এই বিভিন্ন রকমের যৌগিক পদার্থে নির্দিষ্ট পরিমাণের একটি মৌলিক পদার্থের সাথে দ্বিতীয় মৌলিক পদার্থটির যে যে পরিমাণের মিলন ঘটে, তাদের মধ্যে একটা সহজ

আনুপাতিক সম্পর্ক বর্তমান থাকে। যেমন ধরা যাক কার্বন-মনোক্সাইড ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড এই দুটি যৌগিক পদার্থই কার্বন ও অক্সিজেনের মিলনে তৈরী। কার্বন-মনোক্সাইডে যদি ক-গ্রাম কার্বন খ-গ্রাম অক্সিজেনের সাথে মিলিত হয়, এবং কার্বন-ডাইক্সাইডে যদি ক-গ্রাম কার্বন গ-গ্রাম অক্সিজেনের সাথে মিলিত হয় তো দেখা যায়, খ : গ এটি একটি সরল অনুপাত (২খ) ; এই দুটি নিয়ম বহুভাবে পরীক্ষিত হ'য়ে সব সময়ে সত্য ব'লে প্রমাণিত হয়েছে। কেন এই নিয়মদুটি হ'ল—মৌলিক পদার্থের কি এমন গুণ যার জন্য এই নিয়মদুটি স্বাভাবিকভাবে আসে? বিজ্ঞানীরা এই নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা করেছেন।

সর্বপ্রথমে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের ড্যাল্টন একটা সহজ ব্যাখ্যা বার করলেন। ড্যাল্টন বললেন—যদি কোন মৌলিক পদার্থকে ক্রমান্বয়ে ভাঙ্গা হয় তো দেখা যাবে, সব মৌলিক পদার্থই কতকগুলি খুব ক্ষুদ্র পদার্থের সমষ্টি (৩ ক)। এই ক্ষুদ্র অংশগুলির নাম দেওয়া হ'ল অ্যাটম বা
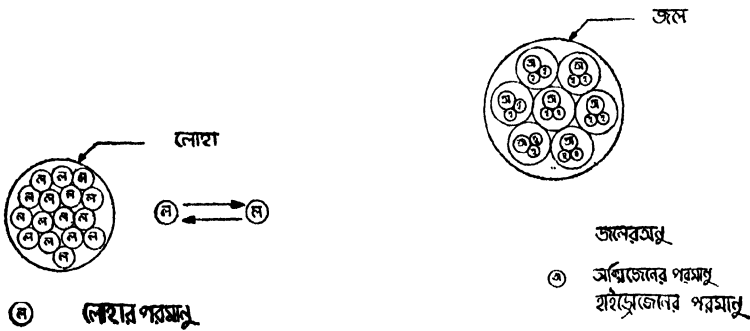
৩(ক) চিত্র ড্যাল্টনের পরমাণু-তত্ত্ব ৩(খ) চিত্র

পরমাণু। ড্যাল্টন এই পরমাণুর কয়েকটি গুণ অনুমান করেছিলেন। কোন মৌলিক পদার্থের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র অংশ হ'ল পরমাণু এবং সে পদার্থের সব পরমাণুই একরকমের—এদের ধ্বংস করা যায় না, ভাঙ্গা যায় না। বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুও বিভিন্ন। যখন দুটি মৌলিক পদার্থ মিলিত হয়ে যৌগিক পদার্থ তৈরী করে, তখন মৌলিক পদার্থদুটির পরমাণুগুলিই মিলিত হয়। একটি মৌলিক পদার্থের নির্দিষ্টসংখ্যক পরমাণু অপরটির নির্দিষ্টসংখ্যক পরমাণুর সাথে মিলিত হয়ে যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ তৈরী করে, যার নাম দেওয়া হ'ল অণু (৩ খ)। ড্যাল্টনের এই পরমাণুর তত্ত্ব থেকে আগের বলা রাসায়নিক নিয়মদুটির খুব সহজ ব্যাখ্যা সম্ভব হ'ল! পরমাণুগুলি নির্দিষ্ট সংখ্যায় পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয় ব'লে, এবং কোন পরমাণুর ভর (mass) সবসময়েই এক থাকে ব'লে, কোন যৌগিক পদার্থে মৌলিক পদার্থদুটির ভরের অনুপাতও সব সময়ে এক থাকবে। আবার পরমাণুকে ভাঙ্গা সম্ভব নয় ব'লে, কোন মৌলিক পদার্থের একটি, দুটি বা তিনটি পরমাণুই অপর মৌলিক পদার্থের একটি পরমাণুর সঙ্গে মিলিত হতে পারে। কাজেই একটি নির্দিষ্ট ভরের মৌলিক পদার্থ অপর একটি মৌলিক পদার্থের যে যে পরিমাণের সঙ্গে মিলিত হয়ে কয়েকটি বিভিন্ন যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করবে, সেই পরিমাণগুলির মধ্যে সহজ সম্পর্ক থাকাই স্বাভাবিক।

রাসায়নিক গুণকে সহজে বুঝবার চেষ্টা থেকেই বিজ্ঞানে প্রথমে পরমাণুর কথা এলো। এটা মনে রাখা দরকার যে, ড্যাল্টনের এই পরমাণু-তত্ত্ব নিতান্তই একটি অনুমান। পরমাণু মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। কোন বৈজ্ঞানিক উপায়েই পরমাণুর অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব নয়। এমন কোন পরীক্ষা নেই, যা দিয়ে পরমাণুকে মানুষ তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করতে পারে। তবুও বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের মিলনের রাসায়নিক নিয়মদুটিকে সহজে বোঝা সম্ভব ব'লে বিজ্ঞানে পরমাণুর অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়া হ'ল। ডাল্টনের বহু আগে গ্রীস দেশের ডেমোক্রিটাসও বলেছিলেন যে কোন পদার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর সমষ্টি। কিন্তু এই মতবাদ দর্শন-হিসাবে গ্রাহ্য হ'লেও বিজ্ঞানে স্বীকৃত হয়নি। শুধু রাসায়নিক নিয়মদুটি বোধগম্য হ'ল বলেই ডাল্টনের পরমাণু-মতবাদকে মানুষ বৈজ্ঞানিক সত্য ব'লে স্বীকৃতি দিল। পরবর্তীকালে পদার্থবিদ্যার নানা রকম পরীক্ষার ফলে এই পরমাণুর বিশেষ প্রকৃতি এবং প্রকৃত রূপ প্রকাশ পেল।

উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে এবং বিংশ শতকের প্রথমভাগে পদার্থবিজ্ঞানীরা পরীক্ষাগারে নানারকম নূতন নূতন তথ্যের সাথে পরিচিত হন। সাধারণভাবে কোন গ্যাস বিদ্যুৎ পরিবহন করে না। কিন্তু খুব নিম্ন-চাপের গ্যাসে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। আবার দেখা যায়, এই অবস্থায় এক ধরনের রশ্মিও বার হয় যা তড়িৎগুণ-সম্পন্ন এবং সে তড়িৎগুণ ঋণাত্মক (Negative)। ড্যাল্টনের পরমাণু-তত্ত্ব থেকে এর ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এই তত্ত্বানুযায়ী পরমাণু অবিভাজ্য এবং এর গুণ অপরিবর্তনীয়। কাজেই উচ্চ-চাপের গ্যাসের যা প্রকৃতি, নিম্ন-চাপে তা পরিবর্তিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। রাদারফোর্ড সর্বপ্রথমে উপরের তথ্যদুটির এক ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন এক নূতন অনুমান থেকে। তিনি বলেন, পরমাণু কোন বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ হ'লেও পরমাণুর মধ্যেও দুটি অংশ আছে। তড়িৎ-প্রবাহ চালানো হ'লে এই দুটি অংশ আলাদা হয়ে যায়। একটি অংশ হ'ল ঋণাত্মক-তড়িৎগুণসম্পন্ন এবং অন্য অংশ হ'ল ধনাত্মক-তড়িৎগুণসম্পন্ন (৪ ক)।
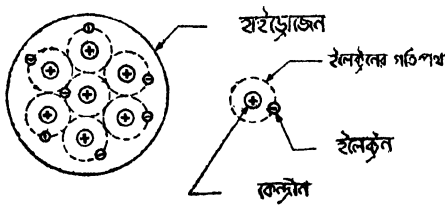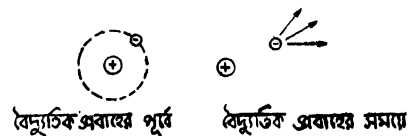
৪(ক) চিত্র ৪(খ) চিত্র

রাদারফোর্ডের পরমাণু-তত্ত্ব

ঋণাত্মক-তড়িৎগুণসম্পন্ন অংশটি আবার খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তড়িৎকণার সমষ্টি—এই তড়িৎকণাগুলি হ'ল ইলেকট্রন। তড়িৎপ্রবাহ মূলতঃ এই ইলেকট্রনগুলিরই প্রবাহ (৪খ)। রাসায়নিক মিলনের সময়ে ইলেকট্রনসমূহ ধনাত্মক অংশের সাথে একসঙ্গে থাকে ব'লে সবরকমের পরীক্ষায় দুটি অংশকে আলাদাভাবে ধরার উপায় নেই।

রাদারফোর্ডের এই পরমাণুতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে পরমাণুর মোটামুটি চেহারা দাঁড়ালো অনেকটা এ-রকম—পরমাণুর কেন্দ্রে আছে একটি অংশ যার আয়তন পরমাণুর পুরো আয়তনের খুব

ক্ষুদ্র অংশ; কিন্তু এই অংশেই পরমাণুর ভরের প্রায় সবটা জমে আছে। এই কেন্দ্রীনের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে ইলেকট্রনসমূহ, যাদের আয়তন খুব ছোট এবং ভরও খুব কম (৪ক)। মোটামুটিভাবে তাই বলা যায়, আমাদের এই দৃশ্যতঃ স্থূল পৃথিবী আসলে শূন্য। যে ধাতুর জিনিসটিকে কঠিন ও বিশেষভাবে বাস্তব মনে হয়, যদি সঠিকভাবে দেখবার ক্ষমতা থাকত তো আমরা দেখতাম এই স্থূল বাস্তব জিনিসটা শূন্যের মাঝে ছড়িয়ে থাকা কতকগুলো কেন্দ্রীন ও ইলেকট্রনের সমষ্টি।

পরমাণুতে অবিভাজ্যতা-রূপ যে বিশেষ বাস্তব গুণটি আরোপিত হয়েছিল, রাদারফোর্ডের পরে বিজ্ঞানীদের সে ধারণা বাতিল করতে হ'ল। পরমাণুর অবিভাজ্যতা, অবিনশ্বরতা, নিজস্বতা —এই সব গুণগুলি এসে আশ্রয় নিল কেন্দ্রীনে। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে কেন্দ্রীন সম্পর্কে আরও বিশদভাবে যখন জানা গেল, তখন দেখা গেল এই বিশেষ বাস্তব গুণগুলি কেন্দ্রীনেরও নেই। বর্তমানে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কেন্দ্রীনও কতকগুলি আরও ক্ষুদ্র কণার সমষ্টি; এবং পদার্থের তারতম্য হয় এই ক্ষুদ্র কণাগুলির সংখ্যার তারতম্য অনুসারে (৫নং চিত্র)। সারা বিশ্বে যা কিছু
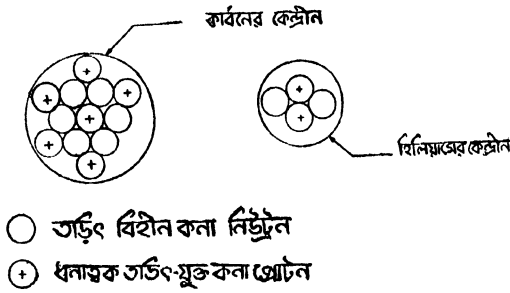
৫ নং চিত্র

কেন্দ্রীনের প্রকৃত স্বরূপ

পদার্থ আছে, আপাতদৃষ্টিতে সেগুলি বিভিন্ন হলেও পরমাণুতত্ত্বের দিক দিয়ে দেখতে গেলে সেগুলি সব আসলে একই। শূন্যের মাঝে খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জায়গায় কতকগুলি কণা জমে যাওয়ায় বিভিন্ন জিনিস তৈরী হয়েছে। মানুষের পৃথিবীকে বিশদভাবে জানার চেষ্টা তাই এই ক্ষুদ্র কণাগুলিকে জানার চেষ্টায় পর্যবসিত হয়েছে। এই ক্ষুদ্র কণাগুলি ঠিক কী এবং এদের প্রকৃতি কী, মোটামুটিভাবে তা জানা সম্ভব হলেও এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা ঠিক দাবী করতে পারেন না যে, তাঁরা এই কণা-তত্ত্ব পুরোপুরি জেনেছেন। কণাগুলি ঘনীভূত শক্তি, কোন কোন ক্ষেত্রে তড়িৎগুণসম্পন্ন এবং পরস্পরের সাথে নানাভাবে মিলিত হতে পারে—এইটুকুই জানা গেছে। এমনটা হ'তে পারে যে, যখন এই কণাগুলির প্রকৃতি বিশদভাবে জানা যাবে, তখন দেখা যাবে এরাও শূন্যের একটা বিশেষ চেহারা। তড়িৎশক্তি ও শূন্যের সমন্বয়েই যেন সারা বিশ্ব তৈরী হয়েছে—বিশ্বের প্রকৃতি সম্বন্ধে পরমাণু-তত্ত্ব আমাদের এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছে দেয়।

শক্তিতত্ত্ব ও সাধনা

অধ্যাপক শ্রীচিত্তরঞ্জন গোস্বামী

বিশ্বচরাচরে এক বৈ দুই নেই। জগৎ জীব ব্রহ্ম তিনে মিলে এক। একই বহু হয়েছেন। বলা হয়ে থাকে, নিজেকে দেখার জন্যে লীলার জন্যে ব্রহ্ম নিজেকে এই সৃষ্টিরূপে প্রকাশ করেছেন—একোঽহং বহু স্যাম্। কিন্তু সৃষ্টির অনন্ত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও মূল উপাদান একই, সবই ব্রহ্ম—ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্।

সৃষ্টির অতীত নিস্পন্দ নীরব যে অবস্থা যেখানে বাক্য পৌঁছায় না, মন নেই, 'ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাক্ গচ্ছতি নো মনঃ।'—এর কোন বর্ণনা কেউ দিতে পারেন না; তাকে কাজ চলার মত করে বলা যায় নির্বিকল্প ব্রহ্ম; এখানে কিছুই না থাকলেও সবই আছে, অপ্রকটভাবে। এ শূন্য নয়, এ ফাঁকা নয়, এ বিজ্ঞানঘন, এ-ই একমাত্র অস্তি—একমেবাদ্বিতীয়ম্। কিন্তু অনন্ত ব্রহ্মের এটিই একমাত্র পরিচয় নয়; আর এক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রহ্ম পরমপুরুষ, কোটি ব্রহ্মাণ্ডের জনক ও ঈশ্বর। তাঁর পূর্ণতায় অজস্রভাবে নিজেকে তিনি ছড়িয়ে দিচ্ছেন; দিয়ে যে তিনি সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছেন বা হারিয়ে যাচ্ছেন তা নয়—পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।

এই পরম পুরুষ স্বীয় অনন্ত শক্তিতেই দেশে কালে অন্তহীনভাবে নিজেকে প্রকাশ করছেন। তাঁর এই যে প্রকাশশীল শক্তি, তাকেই বলা হয়ে থাকে আদ্যাশক্তি। পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতির দ্বৈতভাবটি ব্রহ্ম-মায়া, ঈশ্বর-শক্তি, পুরুষ-প্রকৃতি প্রভৃতি নানাভাবে ব্যক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু মনে রাখতে হবে মূলতঃ দুটিতে এক তত্ত্ব—শক্তি পুরুষেরই। নৈর্ব্যক্তিক নিবিকল্প অবস্থায় শক্তি এই পুরুষ বা ব্রহ্মের সঙ্গে মিশে এক হয়ে থাকেন। সমস্ত সৃষ্টি-ব্যাপার কিন্তু আদ্যাশক্তিরই ক্রিয়া, তাঁরই এক্তিয়ার-ভুক্ত (অবশ্য পুরুষ পেছনে আছেন)। সৃষ্টি স্থিতি লয় সব কিছুর মূলে এই পরমা প্রকৃতি। কিন্তু যদি পরম সত্তা ও চেতনারই প্রকাশ হয় এই বিশ্বসংসার, তবে তার এই চেহারা কেন? জরা মৃত্যু অচেতনা মূঢ়তা এসব কোথা থেকে এল? এ ব্রহ্ম-মায়ারই লীলা। এক নিজেকে বহুরূপে প্রসৃত করেছেন নিজের একত্বকে ক্রমে ক্রমে ঢেকে; শেষটায় নিজেকে এত দূরে এনে ফেলেছেন যেখানে একত্বের বোধ ত দূরের কথা, কোন প্রকার সম্বিৎই দেখা যায় না, কিন্তু সেখানেও তিনি রয়েছেন গুহাহিত হয়ে। ইটকাঠও মূলতঃ চৈতন্যময়; যাঁরা বিশ্বচেতনায় প্রতিষ্ঠিত তাঁরা ইটকাঠেও সুপ্তচেতনাকে দেখেন, তার সঙ্গে গূঢ়ভাবে ঐক্য বোধ করেন। আত্ম-অবগুণ্ঠনের মধ্যে এসে ব্রহ্মের আবার নিজেকে ফিরে পাওয়া—এই হল বিশ্বলীলার ছন্দ। তাই জড়ে দেখা দিল প্রাণ, প্রাণে জাগল মন; কিন্তু মনও আছে আলো-আঁধারী রাজ্যে বহুত্বের কবলে, তার মধ্যে আর সবের সঙ্গে ঐক্যবোধ প্রত্যক্ষ নয়।......

মূল সত্য এক। একেকে ধরতে পারলেই সত্যে পৌঁছানো যায়। কিন্তু একের উপলব্ধি বহুকে যে মুছে দেবে এমন কোন কথা নেই। বিশ্বাতীত তুরীয় অবস্থায় অবশ্য বহুর প্রতীতি নেই; কিন্তু যাকে বলা যায় আত্মিক উপলব্ধি বা বিশ্বানুভূতি তাতে মূল একত্ব ও একের বহুরূপে

প্রকাশ উভয়কেই সমন্বিতভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। এই উপলব্ধিকেই গীতায় বলেছে 'সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি' (নিজের মধ্যে সবাইকে ও সকলের মধ্যগত নিজেকে)।

জীব জন্মজন্মান্তরের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের দিকেই এগিয়ে চলেছে—এ অতি পরিচিত কথা। এর অর্থ হল আমরা জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে ক্রমে খণ্ড বিচ্ছিন্ন 'আমি'র সীমা কাটিয়ে বিস্তৃতি ব্যাপ্তি ও আত্ম-উত্তরণের পথে চলেছি—অপরা প্রকৃতির কবল থেকে মুক্ত হয়ে পরা প্রকৃতির আলো শান্তি ও আনন্দের অধিকার লাভ করছি। ভেদবোধকে কাটিয়ে অভিন্নতার দিকে থাকার যে সচেতন প্রয়াস, তাকেই বলে সাধনা ; প্রকৃতির নিয়মে যেখানে বহুজন্ম লাগতে পারে, সেখানে সচেতন সুশৃঙ্খল প্রয়াসে এক জন্মেই সত্যোপলব্ধি সম্ভব।

বলেছি জগদ্ব্যাপার সম্পূর্ণভাবেই মায়া বা আদ্যাশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন। দেবদেবীরা সেই শক্তিরই অঙ্গবিশেষ। অবতার-পুরুষেরাও এই মায়াবলম্বনে দেহধারণ করে আসেন এই মহামায়ার রাজ্যে কাজ করতে। বৈদিক ঋষিরা বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেবদেবীর স্তুতি করলেও মহামায়াই যে মূল সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। বেদেও এই মহামায়ার কথা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের দেবীসূক্তের (১০ম মণ্ডল) একটি শ্লোক :

"অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং
দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ ॥"

(ব্রহ্মদ্বেষী সেই হিংসাপরায়ণকে হনন করবার জন্যে রুদ্র যখন ধনু গ্রহণ করেন, তখন তাহাতে জ্যা আরোপণ করে আমারই শক্তি। আমিই আমার নিজজনের জন্যে সংগ্রাম করি। এই আকাশ এই পৃথিবী সর্বত্রই আমি অধিষ্ঠিতা আছি।) কেনোপনিষদে ইন্দ্রাদি দেবগণ আকাশে যে তেজঃপুঞ্জের আবির্ভাব দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন এবং পরে বুঝেছিলেন যে তাঁর শক্তিতেই তাঁরা শক্তিমান হয়েছেন, সেই তেজোরূপী ব্রহ্ম তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন আদ্যাশক্তি উমারূপে — 'বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীম্'। গৌরী, কালী, মহেশ্বরী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি সেই আদিভূতা সনাতনীরই রূপভেদ।

সংসারের যা কিছু আখেরে সব নির্ভর করে এই পরমা শক্তির উপর। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে সব সাধনাই শক্তিসাধনা ; উচ্চতর চেতনা বা জ্ঞান লাভ তাঁরই প্রসাদ লাভ—প্রসাদ বা কৃপা ব'লে অনুভব করি আর না করি। কিন্তু তবু বিশেষ সাধনাই শক্তিসাধনা বলে পরিচিত। শক্তিসাধক শক্তিকেই চান—চান একান্তভাবে বিশ্বেশ্বরীর সন্তান হিসাবে তাঁরই যন্ত্র হয়ে বিশ্বের কাজ করতে, সর্বপ্রকার অজ্ঞানতা ও আসুরিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে। এই জগদ্ব্যাপার মায়ের, তাই সংসারের দিকে পেছন ফেরা তাঁর লক্ষ্য নয়। কিন্তু মায়ের যোগ্য সন্তান হতে হলে জ্ঞান চাই, বন্ধন-মুক্তি চাই। নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধি নিয়ে আসে তাই এই আত্যন্তিক মুক্তি ; নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম সমস্ত শক্তির আকর ; তাই এই মুক্তিই দেয় শ্রেষ্ঠ যোদ্ধার অধিকার। আবার ভক্তিও শক্তিসাধকের সাধ্য, কারণ সে শুধু মাকেই জানে, মার চরণেই তার সব কিছু নিঃশেষে সমর্পিত। মায়ের যন্ত্র হয়ে মায়ের যোগ্য সন্তানগণ তাই মায়ের নির্গুণ স্বরূপ উপলব্ধির পরও, ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পরও ফিরে আসেন তাঁর কাজ করতে—মা ফিরিয়ে আনেন।

এ সৃষ্টি শক্তিরই লীলা, তাই সৃষ্টিব্যাপারে

ক্ষণে ক্ষণে দরকার হয় মহামায়ার বিশেষ প্রকাশের। অসুর-নিধনের জন্য দেবতাগণ মহামায়ার শরণাপন্ন। মহাভারতে ভীষ্মপর্বে আছে, অদূরে সৈন্যমধ্যে শক্তিরূপিণী দুর্গাকে দেখিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন তাঁকে বন্দনা করতে—জয়-বিধাত্রী তিনিই। মহারথি অর্জুন রথ থেকে নেমে কৃতাঞ্জলিপুটে দেবীর যে বন্দনা করেছিলেন, তার দুটি শ্লোক :

ত্বং ব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যানাং মহানিদ্রা চ দেহিনাম্।
স্কন্দমাতর্ভগবতি দুর্গে কান্তারবাসিনী ॥১১
স্তুতাঽসি ত্বং মহাদেবি বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা।
জয়ো ভবতু মে নিত্যং তৎপ্রসাদাৎ
রণাজিরে ॥১৩

—ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবত, স্কন্দপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি বিভিন্ন পুরাণে অনুরূপ উদ্দেশ্যে শক্তিপূজার কথা আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীর কাহিনী সর্বজন-পরিচিত। ঐতিহাসিক কালেও রাজন্যবর্গের ধর্মযুদ্ধযাত্রার পূর্বে শক্তি-আরাধনার কথা পাওয়া যায়। শিবাজীর ভবানীপূজা এযুগের জন-নেতাদেরও প্রেরণা জুগিয়েছে। তাঁর সম্পর্কে সচেতন নয়, এমন অনেক যোগ্য আধারের মধ্যে দিয়েও আদ্যাশক্তি কাজ করে থাকেন।

শক্তিমান দিব্য কর্মী হওয়া সত্যই কঠিন। এদিক থেকে শক্তিসাধনা কঠিনতম সাধনা। একান্তে নীরবতা ও ভক্তির সাধনায় বিঘ্ন অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু কর্মীকে ঘোরতর কর্মের মধ্যেও অন্তরে রাখতে হবে নিশ্চল নীরবতা এবং ভক্তির অবিরাম ধারা। স্থূল প্রকৃতির যতকিছু আবর্জনা সব উঠে এসে সাধকের পথকে পঙ্কিল করে তুলবে, কঠিন সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে মায়ের সাহায্যে তাঁকে আত্মজয় করতে হবে। মা-ই দেখিয়ে দেবেন কোথায় লুকিয়ে আছে কোন জঞ্জাল ও বিপদ; তাঁরই শক্তিতে তা জয় করা যাবে যদি রাখা যায় আন্তরিকতা ও সংকল্পের দৃঢ়তা।

"রামপ্রসাদ বলে, ভয় করিনে,
মা'র অভয় চরণের জোরে।"

এই আত্মজয়ের পদ্ধতি-প্রকরণ নিয়ে গড়ে উঠেছে বিরাট তন্ত্রশাস্ত্র।

এই ত গেল বিশেষ অধিকারীর কথা। সাধারণ সংসারী মানুষের কি করণীয়? বলতে গেলে কর্মনিরত সংসারী মানুষের সব সাধনাই শক্তিসাধনা। তাকে বুঝতে হবে—তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও প্রচেষ্টায় বিশ্বজোড়া মহামায়ার ইচ্ছাই কার্যকরী। লাভক্ষতির উৎকট প্রবেগকে প্রশমিত করে যদি বিশ্বেশ্বরীর দেওয়া কাজ হিসাবে কর্তব্য হিসাবে নিজ নিজ কর্ম—ঘরের এবং বাইরের—করা যায়, তবে অস্থিরতা কমে আসে, বিবিক্ততা দেখা দেয়, কাজও সুষ্ঠুতর হয়। যাঁর কাজ তাঁকে তা সমর্পণের অভ্যাসে ক্রমে সঙ্কীর্ণতা কাটতে থাকে, চিত্তের ব্যাপ্তি আসে। এই বোধ জাগে যে একান্ত করে বিচ্ছিন্ন ভাবে আমার বলতে কিছু নেই, বিশ্বজোড়া এক অখণ্ড কর্ম-চেতনার প্রবাহে আমি একটি ক্ষুদ্র বিন্দু মাত্র। আলাদা হতে গেলেই মিথ্যাকে ভুলকে বরণ করা হয়, ফল হয় দুর্ভোগ; আর বিশ্বজনীনতার মধ্যে নিজেকে এক করে ডুবিয়ে দিতে পারলেই আসে প্রসারতা সমুচ্চতা ও বিশ্ববিধান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান, ক্রমে মায়ের কৃপায় বিশ্বাতীত অবস্থায়ও পৌছান যায়।

সাধারণ সংসারী মানুষ আর উচ্চাধিকারী শক্তিমান কর্মী এই নিয়ে সমাজ দেশ ও রাষ্ট্র। কাজেই শুধু ব্যক্তিগতভাবে শক্তিসাধনার কথাই কেন ভাবব? সমষ্টিগতভাবে কি সে সাধনা সম্ভব নয়? বস্তুতঃ সমষ্টির মধ্যে এই

সাধনার ভাব না আসলে সাধারণ স্তরে ব্যক্তির সাধনার উপযুক্ত পরিবেশই রচিত হতে পারে না। তাই আমাদের দেশে স্বামী-স্ত্রী মিলে ধর্মসাধনাই বিধি। তাই প্রাচীনকালে ধর্মরক্ষাই ছিল রাজার কর্তব্য, পরমার্থলাভের দিকে লক্ষ্য রেখেই ঋষিরা দিতেন সমাজজীবনের ব্যবস্থা।

দেবতাগণ, রাজন্যবর্গ, গণনেতারা চিরকাল সমষ্টির কল্যাণের নিমিত্ত শক্তিসাধনা করেছেন। এই সেদিন বঙ্গভঙ্গের সময়ে যাঁরা দেশের কাজে নেমেছিলেন, বিশেষভাবে যাঁরা বিপ্লবে লিপ্ত হয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন যে আকারেই হোক, এই শক্তিরই উপাসক। সংসারকে সমাজকে যদি সুন্দর করে তুলতে হয়, যদি অজ্ঞানতা মূঢ়তা ও আসুরিকতার কবল থেকে দেশকে বিশ্বকে মুক্ত করে মহত্তর মানবসভ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তবে চাই শক্তিসাধনা— সমগ্র সমাজের সমষ্টিগতভাবে শক্তির উপাসনা আমাদের শক্তি চাই—বাহুর শক্তি, প্রাণের শক্তি, বুদ্ধির শক্তি, কিন্তু তার চেয়েও বেশি দরকার অধ্যাত্মশক্তির। মহামায়ার নির্দেশ অন্তরে উপলব্ধি করে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্র-সমাজ-গত সমুদয় কর্ম করার সাধনা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। বাংলার লক্ষ্মী সরস্বতী কালী ও দুর্গাপূজা, মহারাষ্ট্রের ভবানী-পূজা, মহীশূরের দশেরার বিজয়োৎসব আর সমগ্র উত্তরভারত জুড়ে রামনবমী-পালন ও রাবণের কুশপুত্তলিকা দগ্ধ করা -এই সমস্ত অনেকাংশে ব্যর্থ, যদি এসব থেকে শক্তিলাভের প্রেরণা নিজের ও সমাজের মধ্যেকার অসুর-নিধনের সংকল্প জাতির মধ্যে সোচ্চার হয়ে না ওঠে।

আগে চল

(গান: ইমন্-ভূপালী—দাদ্‌রা)

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ

(শোন) বিবেকানন্দের আকুল আহ্বান
জাগো ওগো সব ভারত সন্তান।
প্রকৃতি-নিয়ম উত্থান পতন
এ যে জাগরণ বিধির বিধান।
ওঠো জাগো অবাধ গতি তোমার
থাক চলিতে তবে পাবে "বরান্"।
অদম্য উদ্যম তব অসীম উৎসাহ
আনিয়া দিবে তোমায় মহাপ্রাণ॥
কুল পবিত্র (হবে) জননী কৃতার্থা।
সার্থক জনম হবে (তব) মহীয়ান॥

"ত্যাগের মহিমাজ্যোতিঃ লয়ে শান্ত ভালে"

শ্রীনরেশচন্দ্র মজুমদার

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "Religion is the manifestation of divinity already in man." মানবের অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রকাশই ধর্ম। তিনি আরও বলিয়াছেন, "Every soul is potentially divine." প্রতিটি আত্মারই সম্ভাবনা রহিয়াছে, দেবত্বে উদ্ভাসিত হইবার। স্বামীজী বলিয়াছেন যে পরমেশ্বর সমস্ত আত্মার সমষ্টি (The sumtotal of all souls), তাঁহাকে উপলব্ধি করার অর্থ নিজেরই সমগ্র সত্তার উপলব্ধি বা পরম বোধি।

পরম বোধি লাভ হইলে দুঃখ ও সুখের অতীত অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ হয় এবং নির্ভয় হওয়া যায়। বিশ্বাত্মা ঈশ্বর অপরিমেয় শক্তির আধার, তাঁহার সহিত আন্তরিক যোগসাধনে আত্মিক মানসিক ও শারীরিক শক্তি এবং কান্তি পরিপুষ্ট হয়, সর্বতোমুখী প্রতিভার বিকাশ হয় এবং ইহলৌকিক জীবন-সংগ্রামে জয় হয়। অন্তরে পরমাত্মার নিখিল-সৃষ্টিব্যাপিত্বের আভাস পাইলে প্রাণে সার্বজনীন ভালবাসার সঞ্চার হয়— "সকলেতে আমি, আমাতে সকল, আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ কেবল।" এককথায় মানুষের মধ্যে যাহা কিছু মহত্তম, তাহার সম্যগ্ বিকাশের একমাত্র পথ আত্মোপলব্ধি। ইহাই manifestation of divinity, অর্থাৎ ধর্ম।

কেবল উত্তম বচন, মেধা ও বহু অধ্যয়ন দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। চিন্তায় বাক্যে ও কর্মে সত্য আচরণ, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্যের বলে যাঁহারা যতি ও ক্ষীণদোষ হন, কেবলমাত্র তাঁহারাই আত্মদর্শনে সক্ষম। অধ্যাত্মসাধনায় অধিকারি-ভেদ আছে। পুলিপিঠার মধ্যে যেমন কোনটির ভিতর ক্ষীরের পুর, কোনটির ভিতরে নারিকেলের পুর, আর কোনটির ভিতরে মাষকলায়ের পুর দেওয়া থাকে, তেমনি মানুষের মাঝেও নিত্যসিদ্ধ, কৃপাসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধের থাক আছে।

জন্মজন্মান্তরের সংস্কারবলে যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ, তাঁহারা শৈশব হইতেই অনিত্য সংসারের সব ব্যাপারে উদাসীন থাকেন এবং যথাসত্বর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আজীবন নির্জনে তপস্যা করেন। দেহান্তে তাঁহারা নির্বাণ বা অন্যবিধ মুক্তিলাভ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে, ইঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদিগের কথা মানুষ কোনও কালে জানিতে পারে না; মাত্র কয়েকজন জনসমাজে আত্মপ্রকাশ করেন শুধু লোকশিক্ষা দিবার জন্য। যাঁহারা গুরুর কৃপায় আত্মদর্শন বা সিদ্ধিলাভ করেন, অথবা সিদ্ধিলাভের পথে বহুদূর অগ্রসর হন, তাঁহারাও সাধুসন্তরূপে অনেকে নির্জনে ধ্যানধারণা করিয়া এবং অনেকে কোনও না কোন সঙ্ঘে যোগদান করিয়া ধ্যানজপ, জীবসেবা ও লোকসেবা করিয়া জীবন কাটান। শেষোক্তদিগের জীবন, "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।" এই শ্রেণীর সাধুগণ সভ্যজগৎ জুড়িয়াই আছেন। অনেকে আবার স্বীয় আশ্রমবাসী, কেহ কেহ ভ্রাম্যমাণ। ইঁহারা সকলেই সকল শ্রেণীর মানুষের আধ্যাত্মিক মুক্তির পরম সহায়ক এবং জাগতিক উন্নতির বলিষ্ঠ প্রেরণাদাতা— অনেক স্থলে অতি সুযোগ্য সহকর্মী।

কোটি কোটি সাধারণ মানুষ যেন

মাষকলাইএর পুর দেওয়া কোটি কোটি পুলিপিঠা। কঠোর সাধনাবলে ইঁহাদের এক-আধজন ইহজন্মে এবং বাকী সকলে জন্মজন্মান্তরে আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। নানা বর্ণাঢ্য বৈষয়িক জৌলুসই হউক, অথবা মোহের ধূম্রজালই হউক, এরূপ কোনওটির অন্তরালে ইঁহাদের প্রত্যেকের পূর্ণজ্ঞান প্রচ্ছন্ন। তথাপি যেন সময় সময় তাঁহাদেরও অনেকের মনের অবচেতনায় একটু আলোর ঝলক, দিব্য জ্ঞানের একটুখানি আভাস দেখা দেয় ইহাই তাঁহাদের জীবনযাত্রার পরম পাথেয়। যাঁহাদের মনের জোর খুবই বেশী তাঁহারা হয়তো নাস্তিক হইতে পারেন, কিন্তু সাধারণ মানুষ দুঃখ- ও সুখ-দাতা সগুণ ব্যক্তি-ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। ব্যক্তি-ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট রাখিয়া তাঁহারা সংসারে বাঁচিয়া থাকার চেষ্টা করেন, তাই তাঁহাকে ইন্দ্র, বরুণ, অহুরমজ্‌দা, জিহোহ্বা, স্বর্গীয় পিতা, রাব্‌-অল্‌-আলামিন (সৃষ্টির প্রভু) এবং আরও শত শত নাম দিয়া পূজা করেন। অন্তরে ঈশ্বরানুভূতির জন্য তাঁহাদের চেষ্টা কিঞ্চিন্মাত্র! বাহ্যপূজাই তাঁহাদের সম্বল। বহিরাচারের নিয়মশৃঙ্খলা এবং শাস্ত্রবিচারাদি লইয়াই মানবসমাজ স্মরণাতীতকাল হইতে বিবর্তিত হইতেছে! এই ভাবেই শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, ইহুদী, খৃষ্টান, ইসলাম, প্রভৃতি নামধেয় গণধর্মসকল গড়িয়া উঠিয়াছে।

প্রত্যেক গণধর্মীয় সমাজে জাত এমন সাধুসন্ত আছেন, যাঁহারা সাধনার উচ্চমার্গে আরূঢ়। তাঁহাদের পথ আলাদা। তাঁহারা নিয়মের পরপারে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহারা সন্ন্যাসী। নানাদেশাগত জলধারা যেমন সমুদ্রে বিলীন হয়, তেমনি সমস্ত কামনা, মমতা ও বহির্মুখী বৃত্তিসকল তাঁহাদের প্রকৃতিবিকৃতি-শূন্য ভাবনাতীত ভাবে বিলীন হইয়াছে। কেহ কেহ পরম অনুভূতির সবটুকু লাভ করিয়াছেন এবং অন্যেরা সাধনের বিভিন্ন পর্যায়ে অগ্রসর হইতেছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় ইঁহারা হইতেছেন "বাহাদুরি কাঠ"। সাধারণ মানুষ ইঁহাদের আশ্রয়ে ভবার্ণব উত্তীর্ণ হইতে পারেন। ইঁহাদের সহায়তায় তাঁহারা চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া ধ্যানভাবে পৌঁছিতে পারেন—"ধ্যান-ভাবস্তু মধ্যমঃ।" জন্মান্তরের সুকৃতি থাকিলে ক্বচিৎ সাধারণ মানুষও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন—অন্ততঃ ভক্তির পথে "দাসোঽহং" ভাবে অনেকেই তাহা পারেন। গুরুর কৃপা হইলেই কিন্তু "পারগামী লোঅ নিভয় তরই" (পারগামী লোক নির্ভয়ে উত্তীর্ণ হয়)।

ইহলৌকিক সহায়তা লাভের জন্য ত্যাগী পুরুষগণের নিকট মানুষের যে ঋণ, তাহাও অপরিশোধ্য। সন্ন্যাসিগণ জীবন্ত আদর্শ। তাঁহারা সংযতেন্দ্রিয়, জনদরদী, প্রজ্ঞাবান, সচ্চরিত্র এবং অক্লান্তকর্মা। বৌদ্ধমঠ, খৃষ্টীয়মঠ, বৈষ্ণবমঠ এবং শ্রীরামকৃষ্ণমঠের সন্ন্যাসিবর্গের জীবন্ত আদর্শে জগতের মানুষ উপকৃত হইতেছে। ইঁহাদের ব্যক্তিত্বের সঞ্চারিত বল জনচরিত্রের মান অবনত হইতে দিতেছে না। সংসারে অবশ্য ভালর সঙ্গে মন্দও কিছু মিশিয়া থাকে; একশ্রেণীর লোক আসল ত্যাগীদের অনুকরণ-প্রসূত বাহ্য আচরণ ও বাহ্যাবরণকে নিজ ভোগলালসার তৃপ্তির জন্য ব্যবহার করে; তাহাদের কথা এখানে উল্লেখের অযোগ্য।

ভগবৎসান্নিধ্যপ্রাপ্ত সন্ন্যাসিকুল সর্বত্র সমদর্শী। ধরায় যেমন তাঁহাদের একান্ত আপনজন কেহ নাই, তেমনি তাঁহাদের পরও কেহ নয়। সবাকার ঘরে ঘরে তাঁহাদের ভাণ্ডার। দশজনের নিকট হইতে সম্পদ আহরণ করিয়াই তাঁহারা সহস্রজনের সেবা

করেন। তাঁহাদের এরূপ কর্মের জীবন্ত আদর্শ জনসাধারণের প্রাণে যে রেখাপাত করে, তাহাতে তাহাদের সুপ্তবিবেক জাগ্রত হয় এবং অন্তরের প্রসার হয়। বিশ্বমানবের মহামিলনের পক্ষে এই সেবাকার্যের মূল্য এত অধিক যে U. N. O. বা League of Nations-এর কার্যাবলী ইহার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। মানবের জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু-রূপ দুঃখ দূর করিবার উদ্দেশ্যে শাক্যকুমার সিদ্ধার্থ আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বিপুল ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন—"আজিও জুড়িয়া অর্ধজগৎ ভক্তিপ্রণত চরণে যার।" ফাদার ড্যামিয়েন কুষ্ঠরোগীদের সেবা আজীবন করিয়া কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়াই শরীরপাত করিলেন। বর্তমান কালেও দেখি যে রেভারেণ্ড দীনবন্ধু এণ্ডরুজ, রেভারেণ্ড সাণ্ডারল্যাণ্ড প্রভৃতি ইংরেজ সাধুগণ প্রাণ ঢালিয়া ভারতবাসীর সেবা করিয়া গিয়াছেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ আর্ত-পীড়িতের সেবা করিয়াই জীবন কাটাইয়াছেন। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের প্রতিই ইঁহাদের কল্যাণহস্ত প্রসারিত—"জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

সন্ন্যাসিগণ লোকশিক্ষক। প্রাচীনভারতের সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞান তপোবনবাসী ঋষি-মানস-সঞ্জাত। ভারতের বৌদ্ধ বিহারগুলি ছিল শ্রেষ্ঠ শিক্ষাতীর্থ। মহাস্থবির শীলভদ্র, অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষকশ্রেষ্ঠগণ জগতে অমর। চীন, জাপান, শ্যাম, কম্বোজ, ব্রহ্ম, সিংহল, প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধ বিহারগুলি ছিল লোকশিক্ষার পীঠস্থান। আজও নাকি ব্রহ্মদেশের প্রতি গ্রামে ফুঙ্গী সাধুগণ সামান্য অন্নবস্ত্রের বিনিময়ে গ্রাম্য বালক-বালিকাগণকে প্রাথমিক শিক্ষা দিয়া থাকেন। মধ্যযুগের ইউরোপে খৃষ্টীয় সন্ন্যাসীদের মঠগুলিতে শিক্ষাদান করা হইত। এখনও ইউরোপের নানাস্থানে রোমানক্যাথলিক সাধুগণ শিক্ষায়তন পরিচালনা করেন। রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ পরিচালনা উচ্চশিক্ষা, মধ্যশিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার বহু প্রতিষ্ঠান আজ গড়িয়া তুলিয়াছে—ছাত্রগণকে প্রাচীন যুগের আদর্শানুসারে পরা ও অপরা উভয় বিদ্যায় পারদর্শী হইবার পথ খুলিয়া দিয়াছে।

ইতিহাসের আপন গতিতে সমাজের অনেক কিছুর সাথে গণধর্মেরও রূপান্তর ঘটে। তাহাতে অনেক সময় আচারসর্বস্বতা ও পশ্চাৎগামিতা ঘটে এবং কুসংস্কারের জঞ্জাল জমা হয়। ইহাতে মানবসমাজে নানা অবাঞ্ছিত অবস্থার উদ্ভব হয়। এই সময় যে মহাপুরুষগণ গণধর্মের সংস্কারসাধন করেন, তাঁহারা সাধারণতঃ সংসারত্যাগী সাধু। সত্য নিত্য ও অপরিবর্তনীয়, কিন্তু তাহার ব্যবহারিক ব্যাখ্যা যুগে যুগে নূতন করিয়া করিবার প্রয়োজন হয়। মহাপুরুষগণ তাহাও করেন। ভারতবর্ষীয় সমাজ ও নানা সম্প্রদায়ের লোকধর্ম চিরকাল সন্ন্যাসীদের দ্বারা রক্ষিত ও বিকশিত হইয়া আসিতেছে। বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, শ্রীচৈতন্যদেব, দয়ানন্দ সরস্বতী ও স্বামী বিবেকানন্দ বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হইয়া যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ও প্রচারবলে সনাতন ধর্মকে পরিমার্জিত, গতিশীল ও ক্রিয়াশীল রাখিয়াছেন। আজকাল বিজ্ঞানের বিস্ময়ের পর বিস্ময় সৃষ্টি ও মহাকাশে জয়যাত্রার যুগে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, ধর্মের কোনও প্রয়োজন সত্যই এখনও রহিয়াছে—কি না। স্বামী বিবেকানন্দের রচনা ও বক্তৃতাবলীতে এই প্রশ্নের তর্কাতীত মীমাংসা পাওয়া যায়। তাছাড়া মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির এই আংশিক বিকাশও তো manifestation of

perfection. ইহা তন্ময়তা আনে। অশান্তিময় জগতে আজ সব মহাদেশের মানুষ স্বামীজীর বাণী গ্রহণ করিতেছে।

সন্ন্যাসিগণ মানুষকে অভীঃমন্ত্র দেন। লালসাশূন্য এবং ভক্তিযুক্ত হইলে, বিশেষতঃ আত্মদর্শন হইলে মন নির্ভয় হয়। দুঃখকে তখন দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না। স্বামী বিবেকানন্দ নিজ জীবনে অজস্র দুঃখ ও কষ্ট অবলীলাক্রমে সহ্য করিয়াছিলেন এবং ভীষণ বিপদেও অকুতোভয় ছিলেন। তাঁহার আমেরিকায় যাত্রা ও তথায় ভ্রমণকালে যে গুরুভক্তি, বিশ্বাস ও আত্মশক্তির পরিচয় মিলিয়াছে, তাহা জগতের ইতিহাসে তুলনাহীন। ইতিপূর্বেই যাঁহারা খ্যাতিলাভ করিয়াছেন এমন অনেক অর্থবান ও সহায়সম্পদশালী মানুষ বিদেশে গিয়া বিরাট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু পরাধীন দেশের এক সহায়সম্বলহীন যুবক ভূমণ্ডলের বিপরীত গোলার্ধে অবস্থিত, সম্পূর্ণ অপরিচিত, শ্বেতচর্ম ও বৈভবের জন্য গর্বিত এক সুদূরবর্তী দেশে গিয়া, শীতে ও অনাহারে মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া, তথাকার একশ্রেণীর খৃষ্টধর্মযাজক-সমাজ ও বৈরভাবাপন্ন ভারতীয়দের সাথে লড়িয়া যে বিশ্বজয় করিয়া আসিতে পারে, তাহার অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত স্বামী বিবেকানন্দ। সেই বীর সন্ন্যাসী বলিয়াছেন যে দুর্বলতাই পাপ, দুর্বলতাই মৃত্যু। তিনি মানুষকে দেহে মনে সবল ও আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হইতে বলিয়াছেন। "The old religions said that he was an atheist who did not believe in God, but the new religion says that he is an atheist who does not believe in himself."..."Muscles of iron and nerves of steel with a well intelligent brain and the world is at your feet."

লক্ষ লক্ষ মানুষে দেবত্বের সার্থক প্রকাশ যদি ঘটে, তবেই সর্বতোভদ্র মানবসমাজ গঠিত হইতে পারে। এইরূপ আধ্যাত্মিক সমাজতন্ত্র বা গণতন্ত্র গড়িয়া তোলাই স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ। দ্বান্দ্বিক জড়বাদ বলে যে, মানুষ প্রাকৃতিক বিকারজাত ও অস্থিমাংসময় সপ্রাণ চলমান মূর্তি। কিন্তু এই সকলের অভ্যন্তরে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিন্ময় সত্তা রহিয়াছে তাহা যদি দেহে মনে সার্থকরূপে বিকশিত হয়, তবে শ্রেণী-সংগ্রাম ব্যতীতই শোষণহীন সর্বাঙ্গসুন্দর ও সর্বতোভদ্র সমাজ গড়িয়া উঠিতে পারে। স্বামীজীর এই তত্ত্ব সমাজতন্ত্রের আধুনিকতম ধারণাকে অতিক্রম করিয়া প্রগতির পথে বলিষ্ঠ বেগের সঞ্চার করিয়াছে.

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দিব্য আবির্ভাব অমৃতলোকের যে সংবাদ আনিয়াছে এবং যাহা স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্র নির্ঘোষে বিশ্বমানব-সমাজে আনন্দের আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে, তদ্দ্বারা একদিন সমস্ত মানুষ দিব্যভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করিবে।

"সেদিন প্রভাতে নূতন তপন
নূতন জীবন করিতে বপন ;
এ'নহে কাহিনী, এ'নহে স্বপন,
আসিবে সে'দিন আসিবে।"

ভারতের বিস্মৃত সন্তান—জিপসী

শ্রীমতী মিনতি সেন

জিপসী নামটার সঙ্গে বেশ একটা রহস্য জড়িয়ে আছে—বিচিত্র এদের চালচলন, বিচিত্রতর এদের ইতিহাস। সব মিলিয়ে এরা নিজেদের চারপাশে এমন একটা আবরণ সৃষ্টি করেছে, যা বহুদিন ধরে সাধারণ ব্যক্তি, ঐতিহাসিক, ভাষাতত্ত্ববিদ্—সকলেরই কৌতূহল উদ্রেক করে আসছে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই জিপসী দেখা যায়। বিভিন্ন দেশে এদের পেশা বিভিন্ন—সঙ্গীত, নৃত্য, অশ্ব-পরিচালনা ইত্যাদি; প্রায় সব রকম কাজেই এদের দক্ষতা দেখা যায়।

জিপসীদের সম্বন্ধে আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের কৌতূহলের একটি প্রধান কারণ হচ্ছে, অনেকের মতে এদের আদি বাসস্থান এই ভারতবর্ষ। জিপসীদের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অন্ততঃ জনা-ছয়েক ব্যক্তি এ বিষয়ে একমত। সম্প্রতি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা আয়োজিত একটি বৈজ্ঞানিক অভিযানের ফলে এই তত্ত্ব আরো সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই অভিযাত্রী-দলের কয়েকজন সদস্য কারাকোরাম অঞ্চলে এমন একাধিক প্রমাণ পেয়েছেন, যার ফলে তাঁরা একথা দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে সংস্কৃতভাষী একটি বিশেষ জাতির এরা বংশধর এবং ভারতবর্ষ থেকে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে এরা পারস্যদেশে পৌঁছেছিল। সেদেশে গিয়ে জিপসীদের জীবননির্বাহের বিশেষ অসুবিধা হয়নি। কারণ সঙ্গীতচর্চা থেকে শুরু করে অশ্বপ্রতিপালন, বিভিন্ন ধাতুর ওপর সূক্ষ্ম কাজ প্রভৃতি নানারকম জীবিকার মাধ্যমে এরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। সেইজন্য পারস্য ও তার কাছাকাছি বহু দেশের নবাব, সম্রাট, জমিদার ইত্যাদি অভিজাত সম্প্রদায়ের কাছ থেকেও এরা প্রচুর সহায়তা পেয়েছে। পারস্যে বেশ কিছুদিন থাকার পর যাযাবর-প্রকৃতির এই জিপসীদের একটি দল আবার বেরিয়ে পড়ে নতুন দেশের সন্ধানে। সিরিয়ার মধ্য দিয়ে এরা হাজির হয় আরমেনিয়ায়; সেখানে আবার দু'টি শাখায় বিভক্ত হয়ে একদল ককেশাস পর্বত পার হয়ে প্রথমে সার্বিয়া ও পরে রাশিয়ায় পৌঁছোয় এবং দ্বিতীয় দলটি যায় তুরস্কের দিকে। তুরস্ক থেকেও একটি দল রুমানিয়া ও হাঙ্গেরীতে এবং অপর একটি দল ক্রীট্ দ্বীপে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। কালক্রমে এদের বিভিন্ন শাখা আরব দেশ থেকে লোহিত সাগর বরাবর এগিয়ে প্যালেস্টাইন ও মিশরে, সেখান থেকে লিবিয়া ও স্পেনে এবং ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যে পৌঁছায়। ইংলণ্ডে জিপসীদের সর্বপ্রথম দল এসে উপস্থিত হয় ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে উত্তর আমেরিকায় এবং পরে দক্ষিণ আমেরিকাতেও এদের দেখা যায়। অর্থাৎ গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েই পৃথিবীর প্রায় সব দেশে জিপসীরা ছড়িয়ে পড়ে।

প্রায় দেড় হাজার বছর আগে ভারতবর্ষ থেকে বেশ কিছু সংখ্যক লোক যে পারস্যে গিয়েছিল, তার একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায়। কবিফিরদৌসি-লিখিত একটি বিবরণ থেকে জানা যায়, আনুমানিক ৪২০ খৃষ্টাব্দে পারস্য-

সম্রাট বেহ্রাম ওর প্রায় ১০ হাজার গায়ক বা চারণকে ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর রাজ্যে। তাদের বসবাসের জন্য তিনি জমি, বলদ ইত্যাদিও বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু চাষবাসের প্রতি তারা মনোযোগ না দেওয়ায় সম্রাট্ বিরক্ত হয়ে নিজের রাজ্য থেকে তাদের বিতাড়িত করেন। বাধ্য হয়ে তারা যাযাবরবৃত্তি গ্রহণ করে এবং তাদের জাতীয় পেশা সঙ্গীত ও নৃত্যের সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে। আরব দেশীয় ঐতিহাসিক হামজাও এ বিবরণ সমর্থন করেছেন। ১৩২২ খৃষ্টাব্দে ক্রীট্ দ্বীপে অবস্থানকালে ফিজ্ সাইমিয়ন্ নামে এক ব্যক্তি সেখানে এমন একদল লোককে দেখেছেন, ঘুরে বেড়ানোই যাদের পেশা এবং যাদের সঙ্গে সে দেশের বা তার কাছাকাছি অন্য কোন অঞ্চলের অধিবাসীদের বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নেই। আবার ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে জার্মানীতে প্রায় ৩০০ লোকের একটি ভ্রাম্যমাণ দল দেখা গিয়েছিল; সুপুরুষ হলেও এদের রং সেখানকার অধিবাসীদের তুলনায় কালো ছিল এবং সাজ-পোষাকও ছিল ভিন্ন ধরনের। এরা সকলেই যে ঘরছাড়া এই জিপসীদের-ই একটি শাখা, তাতে সন্দেহ নেই এবং এদের গতিবিধি দেখে একথাও বুঝতে দেরী হয় না যে আফ্রিকা অতিক্রম করে ইউরোপের দক্ষিণ প্রান্তীয় দেশগুলির মধ্য দিয়ে এরা ছড়িয়ে পড়ে সেখানকার বিভিন্ন অঞ্চলে। ভারতবর্ষ থেকে আগত এই যাযাবরদের বংশধরেরা সেখানে ZUTH নামে পরিচিত। অনেকের মতে এদের আদি বাসস্থান পাঞ্জাব এবং সেখানকার অধিবাসী জাঠ থেকে-ই এ নামের উৎপত্তি।

নৃতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক প্রমাণগুলি ছাড়া ভাষার দিক থেকেও জিপসীদের সঙ্গে এদেশের বহু ভাষার সাদৃশ্য দেখা যায়। যেমন জলকে এরা বলে পানি, আগুনকে আক (আগ-এর অপভ্রংশ), চুলকে বাল, চোখকে আকি (আঁখির অপভ্রংশ), হাতকে অস্ত্ (হস্তের অপভ্রংশ), কাঠকে কাস্ট্ (কাষ্ঠ শব্দ থেকে আগত) ইত্যাদি। ইউরোপের একাধিক ভাষাতত্ত্ববিদ্ এ-রকম প্রায় তিন হাজার শব্দ সংগ্রহ করে সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার সঙ্গে জিপসীদের ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা পরিষ্কার প্রমাণ করে দিয়েছেন।

জিপসী এবং এ দেশীয় প্রাচীন আর্যদের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যেও বেশ কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। জিপসীদের ধর্মাচরণের প্রধান প্রতীক "ক্রশুল" (ত্রিশূল ?)। তারা বিশ্বাস করে, এই "ক্রশুল" হস্তান্তরের দ্বারা এদের ধর্মবিশ্বাসও এক ব্যক্তির কাছ থেকে অন্য ব্যক্তিতে আরোপ করা চলে। "বেং" (ব্যাং ?)-আরাধনা জিপসীদের অন্যতম ধর্মানুষ্ঠান; এদের ইতিহাস, উপকথা, প্রবাদবাক্য প্রভৃতিতে এই বেং-এর প্রচুর উল্লেখ দেখা যায়। বেং-উপাসনা আর কিছুই নয়, এদেশের মনসাপূজা বা সর্প-উপাসনারই একটু পরিবর্তিত রূপ। ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে জিপসীরা আশ্চর্যজনকভাবে নিস্পৃহ; তারা বিশ্বাস করে, মানুষের "কর্ম" তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে; এদিক দিয়ে গীতার তত্ত্বের সঙ্গে জিপসীদের জীবন-দর্শনের এক অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়। জিপসীদের আদি বাসস্থান যে ভারতবর্ষ এবং তারা ভারতীয়দেরই একটি শাখা, বহু জিপসীও একথা স্বীকার করে। ভারতবর্ষ থেকে আগত ব্যক্তিদের এরা সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা জানায় এবং ভারতীয়দের কাছে অনেক জিপসীকে একথাও বলতে শোনা গিয়েছে, "তু ম্যয় এক্ রক্ত" ("তুমি আর আমি একই রক্ত")।

ইহুদিদের পর জিপসীরাই বোধহয় একমাত্র জাতি, যাদের ওপর এক অজ্ঞাত কারণে অকথ্য অত্যাচার করা হয়েছে, ইউরোপের কোন দেশই এর ব্যতিক্রম নয়। শিকারী কুকুরদের সাহায্যে এক একটি অঞ্চল থেকে এদের বিতাড়িত করা হয়েছে, হাজারে হাজারে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হয়েছে, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পার্লামেন্ট এদের বিরুদ্ধে আইন পাশ করেছে; এমন কি শুনতে পাওয়া যায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিটলারের দল শুধু একটি মাত্র সহরেই প্রায় ৩০ হাজার জিপসীকে গ্যাস-চেম্বারে হত্যা করেছে। এত অত্যাচারে নিশ্চিহ্ন হওয়া তো দূরের কথা, ইউরোপের প্রায় ৬০ লক্ষ জিপসী-অধিবাসী নিজস্ব বিশেষ ভাবধারা ও জীবনযাত্রা অবিকৃত রেখে সগৌরবে মাথা তুলে রয়েছে। এর মূলে আছে এদের অননুকরণীয় সঙ্গীত ও নৃত্য; জিপসী নাচ ও গান পৃথিবীর সর্বত্র, বিশেষ করে ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যে প্রচুর সমাদর পেয়ে আসছে কয়েক শতাব্দী আগে থেকে-ই। এ সম্বন্ধে অনেক গল্প ও কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়। স্কটল্যাণ্ডের রাজা জেম্‌স্ জিপসী সঙ্গীতের অন্যতম অনুরাগী ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী সম্রাট্ ত্রয়োদশ লুই-এর দরবারে নিয়মিত জিপসী নৃত্য ও সঙ্গীত অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত ছিল। গত শতাব্দীর প্রথম দিকে ভিয়েনা সহরে হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ সম্রাটের দরবারে বিহারী নামে এক জিপসী তার সঙ্গীত পরিবেশন করে। শুনতে পাওয়া যায়, দরবারের বহু গুণমুগ্ধ অভিজাত মহিলা এই সঙ্গীতকারের সান্নিধ্যলাভের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। বর্তমানে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জিপসী সঙ্গীতকলার সমাদর ক্রমশঃ বেড়ে-ই চলেছে; মস্কো সহরে শুধুমাত্র জিপসী সঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্য পরিবেশনের জন্যই একটি বিশেষ নাট্যশালা গড়ে উঠেছে।

পৃথিবীর বহু দেশে জিপসীদের সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা ও অনুসন্ধান হয়েছে, এখনো হচ্ছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতের বিস্মৃত সন্তান এই জিপসীদের সম্পর্কে তাদের আদি বাসস্থান এই ভারতবর্ষেই আজো পর্যন্ত তেমন কিছু চর্চা দেখা যায়নি। আমাদের মনে হয়, এ নিয়ে যদি বিস্তৃত আলোচনা বা গবেষণা করা হয়, তবে কেবল যে জিপসীদের বিষয়েই জানা যাবে, তা নয়, ভারত-ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাত তথ্যের কথা আমরা জানতে পারবো, সন্দেহ নেই।

সমালোচনা

TULASĪDĀSA—Chandra Kumari Handoo. Publisher : Orient Longmans Limited, 17 C. R. Avenue, Calcutta-13. Pp. 300+xxiv, Price Rs. 18·00.

বইখানি বিদুষী লেখিকার কয়েক বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যানুরাগীদের কাছে লেখিকা অপরিচিতা নন। মঠ-মিশনের পত্র-পত্রিকায় এঁর সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়ে থাকে। বস্তুতঃ বর্তমান বইটির কয়েকটি প্রধান অংশ ঐ-ভাবে 'প্রবুদ্ধ ভারত' প্রভৃতি পত্রিকায় আগে প্রকাশিত হয়েছে।

বইটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমাংশে গোস্বামী তুলসীদাসের জীবনী (পৃঃ ১—৭৪); শেষাংশে তাঁর কাব্যাদর্শ এবং অমর কীর্তি 'রামচরিত-মানস' ও অন্যান্য রচনাবলীর বিস্তৃত আলোচনা এবং উদ্ধৃতি রয়েছে (পৃঃ ৭৫—২৭৫)। জীবনী এক-চতুর্থাংশে শেষ হলেও, ভক্তসাধকের সাধনা ও কাব্যপ্রতিভার বিভিন্ন দিকের অনুশীলন, তাৎপর্যপূর্ণ উদ্ধৃতি, বিশেষ শব্দার্থ ও নির্দেশিকা, সংশ্লিষ্ট পুস্তক-পরিচিতি, সর্বোপরি শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের প্রাক্-কথন ও স্বামী প্রভবানন্দজীর ভূমিকা—সব নিয়ে এই বই নিঃসন্দেহে বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণে সফল হবে। অহিন্দী ভাষীদের জন্য এরূপ একখানি সশ্রদ্ধ-বিশ্লেষণমূলক জীবনীর বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আরও প্রয়োজন ছিল তুলসীদাসের অমর সৃষ্টি রামচরিতমানস রচনার আধ্যাত্মিক পটভূমিকার উপর যথেষ্ট আলোকপাত করার। তা সিদ্ধ হয়েছে।

তুলসীদাসের জীবনের ঘটনাবলীর প্রধান সূত্র বাবা বেণীমাধব দাস রচিত 'মূল গোঁসাই চরিত'—নানা অলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। কিন্তু তা হলে কি হবে? কতকটা দিনপঞ্জীর আকারে লিখিত রয়েছে বলে, বিশেষ করে তুলসীদাসের তীর্থ-ভ্রমণকাল ও তালিকার বিবরণ ও-থেকে পাওয়া যায়। গোস্বামীজীর চারধাম পরিক্রমা, কৈলাস ও মানস-সরোবর দর্শন, এবং কাশীধাম ও অযোধ্যায় তাঁর দুশ্চর তপস্যা, শ্রীরামচন্দ্রকে ইষ্ট-রূপে দর্শন ও সিদ্ধিলাভ—এ সবের একটি সুন্দর চিত্র লেখিকা পাঠক-পাঠিকার মানস-নেত্রের সামনে তুলে ধরেছেন। উত্তর প্রদেশের বান্দা জেলার রাজাপুর গ্রামে তুলসীর জন্ম। শৈশব ও কৈশোর ছিল দারুণ দুঃখময়। তারপর বৈষ্ণব সাধুর আশ্রয় পান। কাশীধামে ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর দেহান্তর ঘটে। প্রাচীন মতে তাঁর জন্ম ১৪৯৭ খ্রীঃ অব্দে, বেঁচেছিলেন ১২৬ বছর এবং রামচরিত-মানস রচনা করেন বৃদ্ধ বয়সে (৭৭ বছর)—এই তিনটি বিষয় এবং তাঁর অলৌকিক অনুভূতি প্রভৃতি সম্বন্ধে আধুনিক হিন্দী সাহিত্য-রথীরা ভিন্ন মত পোষণ করেন। বৃদ্ধবয়সে অমন রচনা কী করে সম্ভব? আর অতদিন বাঁচাও কি সম্ভব? (বাঙালী পাঠকমাত্রই জানেন, 'চৈতন্যচরিতামৃত' নামক আর একখানি অতুলনীয় গ্রন্থ কৃষ্ণদাস কবিরাজ আশি বছরেরও অধিক বয়সে রচনা করেছিলেন)। লেখিকা নিপুণভাবে প্রাচীন মত সমর্থন করেছেন; অলৌকিক অনুভূতির যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন।

রামচরিত-মানস (বা তুলসী-রামায়ণ) বাঙলা কৃত্তিবাসী-রামায়ণ এবং তামিল কাম্ব-রামায়ণের মত জনপ্রিয় বললে কিছুই বলা হলো না। ভারতের প্রায় অর্ধেক নরনারীর ভক্তি-পুত চিত্তে ইহা যে আসন অধিকার করে আছে,

তা জগতের ইতিহাসে দুর্লভ। বাল্মীকি-রামায়ণের অনুকৃতি হয়েও 'মানস'এর স্বকীয়তা সর্বত্র স্বীকৃত। সংস্কৃতে সুপণ্ডিত হয়েও তুলসী-দাস কথ্য হিন্দীতে (অওধী) সাত-কাণ্ডে 'মানস' রচনা সমাপ্ত করেন। এবিষয়ে তিনি নাকি প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন। ('মানস' ছাড়াও বিনয়-পত্রিকা, দোঁহাবলী ও কবিতাবলী নামে তাঁর আরও প্রথম শ্রেণীর কাব্য রয়েছে।) সিদ্ধ-ভক্তের রচনা মানুষের অন্তর কতখানি স্পর্শ করে 'মানস' যুগ যুগ ধরে তার সাক্ষ্য বহন করবে। তুলসী সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Vincent Smith-এর উক্তি! "...That Hindu was the greatest man of his age in India and greater even than Akbar himself, inasmuch as the conquest of the hearts and minds of millions of men and women affected by the poet was an achievement infinitely more lasting and important than any or all the victories gained in war by the monarch." (P. 127)

বইখানির ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদ ও অন্যান্য ছবি সবই সুন্দর হয়েছে। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। —**স্বামী সত্যঘনানন্দ**

মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর—সুধা সেন। প্রকাশক শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড, জিজ্ঞাসা, ১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। ১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯। পৃষ্ঠা ২৮৫ +[১৬]; মূল্য ৮৲ টাকা।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা সাহিত্য সরস, সজীব, সমৃদ্ধ; বাংলা ভাষার প্রায় আদি যুগ হইতে কত যে গদ্য, পদ্য, উপন্যাস, নাটক, সঙ্গীত রচিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই! শ্রীচৈতন্য বাংলার প্রাণ-পুরুষ—ভাব ও ভাষা উভয় দিক দিয়াই, তাইতো কবির যথার্থ উক্তি:

'বাঙালীর হিয়া- অমিয় মথিয়া
নিমাই ধরেছে কায়া

শ্রীভগবানের লীলাকথার প্রতিটি পদে অপূর্ব মাধুর্য—'স্বাদু স্বাদু পদে পদে', এই কথার যথার্থতা কতখানি, তাহা 'মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর' পুস্তকখানি পাঠ করিলে সম্যক্ উপলব্ধি হইবে।

মাসের পর মাস ধরিয়া 'উদ্বোধন' পত্রিকায় এই গ্রন্থের অধিকাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। আজ গ্রন্থাকারে নিবন্ধগুলি একত্র সন্নিবেশিত দেখিয়া আমরা আনন্দিত। গ্রন্থখানি বৈষ্ণব-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজনরূপে বিবেচিত হইবে, সন্দেহ নাই।

ভাষার সরলতা, সাবলীল প্রকাশভঙ্গী এবং সর্বোপরি ভক্তিভাব দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের রূপ গুণ-লীলা-মাধুর্যের কাহিনী অনবদ্যভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বইটি পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়িতে ইচ্ছা হইবে না। যেখানে পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তিতর্কের আলোচনা (যথা: 'সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব', 'শ্রীমন্মহাপ্রভুকৃত শিক্ষাষ্টকের রূপায়ণ'), সেখানেও রচনাকে প্রাণস্পর্শী করিবার দক্ষতা সমভাবেই বিদ্যমান।

সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের নিকট সর্বত্রই পুস্তকখানি সমাদৃত হইবার যোগ্য

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

সিঙ্গাপুর ঃ রামকৃষ্ণ মিশন ১৯২৮ প্রতিষ্ঠিত হইয়া সুদূর বিদেশে আধ্যাত্মিক ও সাধারণ শিক্ষাবিস্তার এবং সামাজিক উন্নয়ন ও সমাজসেবা করিয়া আসিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের এই শাখার প্রধান কর্মকেন্দ্রটি সিঙ্গাপুরে নরিস রোডে (9 Norris Road) অবস্থিত। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের সুমুদ্রিত কার্য-বিবরণীতে এই কেন্দ্রের ক্রমোন্নতি পরিস্ফুট।

প্রতি সপ্তাহে ক্লাস ও বক্তৃতা এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ধর্মসম্বন্ধীয় শিক্ষা দেওয়া হয়।

'বিবেকানন্দ তামিল বিদ্যালয়' এবং 'সারদাদেবী তামিল বিদ্যালয়'—সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত এই বিদ্যালয় দুইটিতে ২৮৯ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করে। তামিল ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হইলেও ছাত্রছাত্রীরা জাতীয় ভাষা (Malay) এবং ইংরেজী শেখে; প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

লাইব্রেরিতে ইংরেজী, তামিল, মালয়ালম, হিন্দী ও বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের ৪,৫৭৪ খানি বই আছে, আলোচ্য বর্ষে ৩০৬ খানি নূতন পুস্তক সংযোজিত হয়। পাঠাগারে ৮টি দৈনিক ও ৫২টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। গ্রন্থাগার ও পাঠাগার উভয়ই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। শিশুদের জন্য একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার ও পাঠাগার করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ছাত্রাবাসে ৫২টি ছাত্র ছিল। ছাত্রাবাসটি মনোরম প্রাকৃতিক পার্বত্য পরিবেশে (179 Bartley Road) অবস্থিত। বিদ্যার্থীরা নিয়মিত প্রার্থনা-ভজনাদি ও খেলাধুলার মাধ্যমে মানুষ হইতেছে। ৬ হইতে ১৭ বৎসরের বালকবৃন্দ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে।

আলোচ্য বর্ষে স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী অতি মনোজ্ঞভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। এই উপলক্ষে কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধাত্মানন্দ জাপানের বিভিন্ন শহরে ১৫টি বক্তৃতা দেন।

১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুআরি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ সিঙ্গাপুর কেন্দ্রে শুভাগমন করিয়া কিছুদিন অবস্থান করেন; তাঁহার অবস্থানকালে এখানে একটি বিশেষ আনন্দপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্ট হয়।

আমেরিকায় বেদান্ত

সেণ্টলুই : বেদান্ত-সোসাইটির বার্ষিক (এপ্রিল, '৬৪—মার্চ, '৬৫) কার্যবিবরণী : কেন্দ্রাধ্যক্ষ—স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ।

(১) রবিবারে ধর্মালোচনা : সোসাইটির উপাসনা-মন্দিরে গ্রীষ্মকালে ৮ সপ্তাহ ব্যতীত স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শন অবলম্বনে বক্তৃতা দেন। নানা ধর্মীয় ও শিক্ষা-মূলক প্রতিষ্ঠান হইতে অনেকে ইহাতে যোগদান করেন।

(২) ধ্যান ও কথোপকথন : প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গীতা-ব্যাখ্যা হয় এবং আগ্রহশীল ব্যক্তিগণকে ধ্যানাভ্যাস শিক্ষা দেওয়া হয়; ছাত্রগণ এবং বিভিন্ন ধর্মপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষায়তনের সভ্যগণ যোগ দেন।

(৩) উৎসব : শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী

ব্রহ্মানন্দ মহারাজের পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে পূজা, ভজন ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রসাদ-গ্রহণের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে ভারত সরকার কর্তৃক স্বামীজীর জীবন ও বাণী অবলম্বনে প্রস্তুত প্রামাণিক চলচ্চিত্র দেখানো হয়। এতদ্ব্যতীত গুড ফ্রাই-ডে, শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ও খৃষ্টজন্মদিবস পালিত হয়।

(৪) অতিরিক্ত সভা: সোসাইটির উপাসনা-মন্দিরে অতিরিক্ত দুইটি সভার (একটি উচ্চ-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য) আয়োজন করা হইয়াছিল। উভয় সভাতেই স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ জিজ্ঞাসিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

(৫) নানাস্থানে বক্তৃতা: সেণ্টলুই-এর বাহিরে যথা কার্লেটন, নর্থফিল্ড, মিনেসোটা, মিজুরি, কলম্বিয়া প্রভৃতি স্থানের বিভিন্ন চার্চ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে এবং শিক্ষায়তনে আমন্ত্রিত হইয়া স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

(৬) গ্রন্থাগার: সোসাইটির সদস্যবৃন্দ গ্রন্থাগারে পুস্তকসমূহের যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিতেছেন।

(৭) পরিদর্শকবৃন্দ: আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন স্থানের ৪০ জন বিশিষ্ট অতিথি বেদান্ত-সোসাইটি পরিদর্শন করেন।

(৮) নূতন সোসাইটি প্রতিষ্ঠা: সেণ্টলুই বেদান্ত-সোসাইটির উদ্যোগে ক্যানশাস শহরে (মিজুরী) বেদান্ত-সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ক্যানশাস শহরের একজন ভক্ত সোসাইটির জন্য গৃহ দান করিয়াছেন।

নিউইয়র্ক: রামকৃষ্ণ-বেদান্ত কেন্দ্র।

এই কেন্দ্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছে:

এপ্রিল, ১৯৬৫: পৃথিবীতে শান্তি; ধর্মে-ধর্মে দ্বন্দ্ব কেন? মৃত্যুই কি পরিসমাপ্তি? অমরত্বের অর্থ ও ইহা লাভের উপায়; স্বপ্নের বেদান্ত-সম্মত ব্যাখ্যা।

মে: কর্তব্য ও স্বাধীনতা; অন্তর্জীবনের নীতি; বুদ্ধের বাণী; মানবীয় অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ; শরণাগতি অভ্যাস।

জুন: ধ্যানের অন্তরায়; বেদান্তে যুক্তির স্থান; ভক্তিপথ; হিন্দুধর্মের দুইটি প্রধান ধারা।

এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবত ও ভগবদ্গীতা অবলম্বনে কয়েকটি ক্লাস করা হইয়াছিল।

বক্তৃতা-সফর

গত এপ্রিল ও মে মাসে স্বামী প্রণবাত্মানন্দ রামকৃষ্ণ আশ্রম—পূর্ণিয়া, বেলা রামকৃষ্ণ কলোনী, সীমাপুর, কিশনগঞ্জ, ঠাকুরগঞ্জ, মনিহারী, রামকৃষ্ণ আশ্রম—তপন, দাউদপুর, তেলিঘাটা, সর্বমঙ্গলা, কাটিহার রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ও কাটিহার শহরের বিভিন্ন স্থানে 'ভারতে শক্তিপূজা', 'হিন্দু-ধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ', 'মাতা সারদাদেবী ও ভারতীয় নারীজাতির আদর্শ', 'জাতীয় জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা' এবং 'যুগাচার্য বিবেকানন্দ ও ভারতীয় সংস্কৃতি' সম্বন্ধে মোট ২৪টি বক্তৃতা দিয়াছেন। তাহার মধ্যে ২৩টি ছায়াচিত্রযোগে (৬টি হিন্দী ভাষায়) প্রদত্ত হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে মোক্ষদামোহন দাশগুপ্ত

বিশিষ্ট ভক্ত মোক্ষদামোহন দাশগুপ্ত গত ২৫শে জুন বৈকাল ৫টায় বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করেন। গত ১৬ই জুন তিনি 'লু'-আক্রান্ত হন, ১৭ই জুন তাঁহাকে সেবাশ্রম হাসপাতালে ভরতি করা হয়। তিন দিন পরে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন। মৃত্যু-কালে তাঁহার বয়স ৭৮।৭৯ বৎসর হইয়াছিল। সাধু ও ভক্তগণ তাঁহার দেহ মণিকর্ণিকায় সৎকার করেন।

তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তিনি চির-অবিবাহিত থাকিয়া ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার জন্মস্থান শ্রীহট্ট (Sylhet) সদর মহকুমার অন্তর্গত ভুলালীনামক গ্রাম (বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত)। তিনি বি.এ,বি.টি. পাস করিয়া প্রথমে শ্রীহট্ট সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক হন, পরে উক্ত বিদ্যালয়ে ও অন্যান্য সরকারী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কার্য করেন। তিনি শ্রীহট্ট রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন; তাঁহার অর্থানুকূল্যে এই আশ্রমের স্থায়িত্ব সম্ভব হয়।

সরকারী কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি ৺কাশীধামে আসেন এবং দীর্ঘ ২০ বৎসর কাল কঠোরতার সহিত কাশীবাস করেন। তিনি নিত্য অদ্বৈত আশ্রমে আসিয়া শাস্ত্রাদি শ্রবণ করিতেন।

তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ ! শান্তিঃ !! শান্তিঃ !!!

সিনথিটিক রবার ফ্যাক্টরী

ভারতে কৃত্রিম উপায়ে রবার উৎপাদনের প্রথম ও একমাত্র কারখানাটি উত্তর প্রদেশের বেরিলী সহরের বারো মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার উৎপাদন-শক্তি বৎসরে ৩০,০০০ টন।

পূর্বে ভারত হইতে প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রকৃতিজাত রবার বিদেশে রপ্তানী হইত। স্বাধীনতালাভের পর রবারের প্রয়োজন বহুল পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ায় কৃত্রিম উপায়ে উহা উৎপাদনের জন্য এই কারখানাটি নির্মিত। এই কারখানায় উৎপন্ন রবারের শতকরা পঁয়ষট্টি ভাগ টায়ার-নির্মাণের জন্য এবং বাকী অংশ অন্য কাজের জন্য ব্যয়িত হয়।

ভারতের আকরিক লৌহ

ভারতে লৌহ উৎপাদনের অবিশুদ্ধ উপাদানের (Ore) পরিমাণ পৃথিবীর মোট পরিমাণের চারিভাগের একভাগ, প্রায় দুই হাজার একশো কোটি টন। ইহা হইতে উপযুক্ত পরিমাণ বিশুদ্ধ লৌহ উৎপাদন করিবার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা অবশ্য এখনো হইয়া উঠে নাই। বর্তমানে পৃথিবীর মোট উৎপন্ন লৌহের শতকরা দুইভাগ মাত্র ভারতে উৎপন্ন হইতেছে।

রাশিয়ায় বুদ্ধের শায়িত মূর্তি আবিষ্কার

রাশিয়ায় (Dushanbe) ভগবান বুদ্ধের এগারো মিটার লম্বা একটি শায়িত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন ঐ অঞ্চলে ৬ষ্ঠ হইতে ৭ম শতাব্দীর মধ্যে স্থাপিত বৌদ্ধমঠে উহা প্রতিষ্ঠিত ছিল।

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ

জন্ম : ১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৮৮ মহাসমাধি : ৬ই অক্টোবর, ১৯৬৫

শান্তা মহান্তো নিবসন্তি সন্তো বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ।
তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনানহেতুনাঽন্যানপি তারয়ন্তঃ॥

—শঙ্করাচার্য (বিবেকচূড়ামণিঃ—৩৭)

(শান্ত মহৎ হেন সদাত্মা রয়েছেন বহুজন
বসন্তসম লোক-কল্যাণ করিয়া ফিরেন যাঁরা,
স্বয়ং যাঁহারা ভীম ভবাব্ধি করিয়া উত্তরণ
দেহ ধরি' রন আরো বহুজনে পার করিবার তরে,
অহেতুক-কৃপা-পরবশ হয়ে, করুণায় হয়ে হারা।)

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজীর মহাসমাধি

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নবম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ ৭৭ বৎসর বয়সে গত ২০শে আশ্বিন (৬ই অক্টোবর) বুধবার সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটের সময় মহাসমাধি লাভ করিয়াছেন। দীর্ঘদিন হইতে তিনি অসুস্থ ছিলেন। জুলাই মাসের শেষভাগে চিকিৎসার সুবিধার জন্য তাঁহাকে বেলুড় মঠ হইতে কলিকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে আনা হইয়াছিল। চিকিৎসকগণের সর্ববিধ প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া এখানেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

কলিকাতা বেতারকেন্দ্র হইতে সন্ধ্যাকালীন স্থানীয় সংবাদে তাঁহার দেহত্যাগের সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের বহু সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী, বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং কয়েক শত ভক্ত সেবাপ্রতিষ্ঠানে সমবেত হইয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

রাত্রি সাড়ে দশটার সময় তাঁহার পূতদেহ সেবাপ্রতিষ্ঠান হইতে বাগবাজারে অবস্থিত শ্রীশ্রীমায়ের বাটী (উদ্বোধন) হইয়া বেলুড় মঠে লইয়া যাওয়া হয়। রাত্রি ১১ টার সময় শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের ঘরের সম্মুখস্থ রাস্তায় তাঁহার পূতদেহবাহী গাড়ী থামিলে মাল্য ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদান এবং কর্পূরারতি করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এখানেও বহু ভক্ত তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সমবেত হইয়াছিলেন।

পরদিন ২১শে আশ্বিন (৭ই অক্টোবর) সকালে তাঁহার পূতদেহ পুষ্পমাল্যশোভিত পালঙ্কে করিয়া মঠের পুরাতন মন্দির সংলগ্ন প্রাঙ্গণে আনিয়া রাখা হইলে প্রথমে সাধু-ব্রহ্মচারিগণ ও পরে শেষ দর্শনের জন্য সমবেত কয়েক সহস্র নর-নারী তাঁহাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিও আসিয়াছিলেন।

বেলা দশটার সময় তাঁহার পূতদেহ স্বামীজীর ঘরের সম্মুখস্থ গঙ্গার ঘাটে লইয়া যাইয়া স্নান-আরাত্রিকাদি সমাপনের পর যথাক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের, শ্রীশ্রীমায়ের, শ্রীশ্রীস্বামীজীর ও শ্রীশ্রীরাজামহারাজের মন্দিরের সম্মুখে লইয়া যাওয়া হয় ; পরে শেষকৃত্যের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে বাহিত হইয়া সাড়ে দশটার সময় চিতাগ্নিতে আহুত হয়।

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের সান্নিধ্যে থাকিয়া যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণমিশন-পরিচালিত সেবাকার্যের মাধ্যমে নিজ নিজ আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের দুর্লভ সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার পূর্বাশ্রমের নাম ছিল শ্রীনির্মলকুমার বসু। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর (১লা পৌষ, ১২৯৫ সাল), শনিবার, শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে শান্তিপুর হইতে প্রায় মাইল তিনেক দূরে অবস্থিত নদীয়া জেলার বাঘ-আঁচড়া নামক গ্রামে তিনি সম্ভ্রান্ত বসুপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নয়-দশ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতা শ্রীহরিপ্রসাদ বসুকে কার্যব্যপদেশে বীরভূম জেলায় বোলপুরে চলিয়া আসিতে হয়। তাঁহার বাল্যজীবনের অবশিষ্টকাল বোলপুরেই অতিবাহিত হইয়াছিল। সেখান হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু এই সময় টাইফয়েড রোগাক্রান্ত হইয়া তিনি বোলপুরে ফিরিয়া যান। সেখান হইতে বায়ু-পরিবর্তনের জন্য মুঙ্গেরে আসিয়া মুঙ্গের কলেজে ভর্তি হন। মুঙ্গের কলেজ হইতে এফ. এ. পাস করিয়া তিনি পুনরায় কলিকাতা আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান হইতেই ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজীতে অনার্সসহ কৃতিত্বের সহিত বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২য় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বি. এ. পরীক্ষাতেও বাংলা সাহিত্যে প্রথমস্থান অধিকার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বঙ্কিম পদক' লাভ করিয়াছেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে পাঠকালে তিনি কলেজসংলগ্ন ইডেন হিন্দু হোস্টেলে থাকিতেন। এইকালেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। এই সময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতকার 'শ্রীম'-র এবং বেলুড় মঠের শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের সঙ্গলাভের ফলে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং সঙ্ঘে যোগদান করিবার ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। স্নাতকোত্তর পাঠ্যাবস্থায় ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন। ইহার পূর্বে, বি. এ. পরীক্ষার পরই তিনি সঙ্ঘে যোগদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আত্মীয়গণের বাধাদানের জন্য সে চেষ্টা সফল হয় নাই। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা, এবং ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর নিকট হইতে সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে তিনি জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম দর্শন লাভ করিয়াছিলেন।

সঙ্ঘে যোগদান করিবার পর ১৯১০ খৃষ্টাব্দেই মাধবানন্দজী মহারাজ হিমাচল-ক্রোড়ে অবস্থিত মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে (আলমোড়া জেলা, উত্তর প্রদেশ) কর্মিরূপে প্রেরিত হন। তিনি দুই বৎসরকাল সেখানে ছিলেন। সেখান হইতে মঠে ফিরিয়া ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ হইতে প্রায় আড়াই বৎসরকাল শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বাংলা মুখপত্র 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদনায় স্বামী সারদানন্দজী মহারাজকে সহায়তা করেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মায়াবতী আশ্রমে পুনরায় গমন করেন এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ (President) মনোনীত হইয়া ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই কালের মধ্যে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় অদ্বৈত আশ্রমের শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই সময় প্রবুদ্ধভারতে তাঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হয়। এই সময়েই 'সমন্বয়' নামক একটি অধুনালুপ্ত হিন্দী পত্রিকা তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন ; ইহার সম্পাদনাও তিনিই করিতেন। এই কাজে হিন্দী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কবি নিরালাজী তাঁহার সহায়ক ছিলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তিনি সমগ্র মঠ ও মিশনের অন্যতম পরিচালক (Trustee & member of the Governing Body) নিযুক্ত হন।

আমেরিকার স্যানফ্রান্সিস্কো সহরে অবস্থিত বেদান্তকেন্দ্রের পরিচালক স্বামী প্রকাশানন্দের দেহত্যাগের পর ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি স্যানফ্রান্সিস্কো গমন করিয়া ঐ কেন্দ্রের পরিচালনাভার গ্রহণ করেন। দুই বৎসর পরে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহকারী সচিবের কর্মভার গ্রহণের জন্য তাঁহাকে বেলুড় মঠে ফিরাইয়া আনা হয়। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সচিবের (General Secretary) কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে তিনি সমগ্র সঙ্ঘের সহকারী অধ্যক্ষের এবং এই বৎসরই ৪ঠা আগস্ট অধ্যক্ষের পদে বৃত হন। দেহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি অধ্যক্ষ থাকিবার কালেই বিশ্বব্যাপী বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

স্বামী মাধবানন্দজীর আদর্শ সন্ন্যাস জীবন ও কঠোরতা বরণের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত ও সকলের মধ্যে উচ্চজীবনের প্রেরণা জাগাইত। তাঁহার পাণ্ডিত্য, প্রতিটি কাজই নিখুঁতভাবে করিবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, কর্তব্যে গভীর নিষ্ঠা, তাঁহার সহজ ব্যবহার ও সরলতা সকলেরই শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম আকর্ষণ করিত। নৈতিক ও উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল অনবদ্য। সর্বাবস্থায় তাঁহার ধৈর্য ও ক্ষমা অটল থাকিত। সঙ্ঘের সাধু-ব্রহ্মচারিগণের দোষত্রুটি তিনি সর্বদা ক্ষমাসুন্দর চক্ষে, সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখিতেন। তাঁহার নিঃস্বার্থ ভালবাসা সাধু ভক্ত সকলেরই হৃদয় সমভাবে স্পর্শ করিত। অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থার মধ্যেও গত ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি বিজয়ার চিঠি স্বহস্তে লিখিয়াছেন। দেহত্যাগের ১৫ মিনিট পূর্ব পর্যন্ত তাঁহাকে বিজয়ার প্রণাম নিবেদন করিতে সমাগত সকলেরই জন্য দ্বার অবারিত ছিল। তাঁহার মধ্যে হৃদয় ও মস্তিষ্কের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল বলিয়া সঙ্ঘের সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন ও তাঁহার আদেশপালনে সর্বান্তঃকরণে প্রস্তুত থাকিতেন। ফলে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সচিব থাকাকালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কর্মের বিস্তার ও উন্নতির ক্ষেত্রে প্রভূত তৎপরতা ও সাফল্য পরিলক্ষিত হয়।

সাহিত্যসৃষ্টিতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের অবদানও যথেষ্ট। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে 'সমন্বয়' পত্রিকার সম্পাদনাকালে তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত এবং স্বামীজীর বাণী ও রচনা হইতে বহুলাংশ হিন্দীতে, এবং পরে ভগিনী নিবেদিতার "The Master as I Saw Him" গ্রন্থের বাংলা (স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি) অনুবাদ করিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের বহু প্রসিদ্ধ প্রামাণিক গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদও তিনি করিয়াছেন। তাহার মধ্যে সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী সহ ভাষাপরিচ্ছেদ এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদের শাঙ্কর ভাষ্যের ইংরেজী অনুবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাধারণ সচিব হিসাবে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মজীবনের ও পরে অধ্যক্ষ হইয়া ইহার অধ্যাত্মজীবনের কর্ণধাররূপে তিনি ভারতে ও বিদেশে বহুস্থানে পর্যটন করেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে তিনি তিনবার গিয়াছিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি স্যান-ফ্রান্সিস্কো কেন্দ্রের অধ্যক্ষরূপে গমন করেন। দ্বিতীয়বার গিয়াছিলেন ক্যালিফোর্ণিয়ায় সাণ্টা বারবারা কেন্দ্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠাকল্পে, ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে। তৃতীয়বার স্বাস্থ্যের জন্য গমন করেন ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে। প্রথম দুইবারের, বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় বারের যাত্রায় তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ কেন্দ্র, যুক্তরাজ্যের লণ্ডনস্থ কেন্দ্র এবং ফ্রান্সের গ্রেজ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। ভারতের ও বিদেশের কেন্দ্রগুলি পরিদর্শনকালে তত্রস্থ কর্মিগণ তাঁহার নিকট হইতে উচ্চ অধ্যাত্ম-জীবনের অনুপ্রেরণা ও কর্মের নির্দেশলাভ করিয়াছিলেন; অধ্যক্ষরূপে ভ্রমণকালে বিভিন্ন স্থানে বহুব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষালাভেরও সুযোগ পাইয়াছিলেন।

তাঁহার অদর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের, আধ্যাত্মিকতার ও নিঃস্বার্থ সেবার জগতে এবং পণ্ডিত-মহলে যে ক্ষতি হইল, তাহা অপূরণীয়। তাঁহার আত্মা ভগবৎপাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে। ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

* * *

মহাপ্রয়াণের পর ত্রয়োদশ দিবসে, গত ১লা কার্তিক (১৮ই অক্টোবর) সোমবার বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা, হোম, ভজন-কীর্তন ও ভোগরাগাদি হইয়াছিল। বহু সাধু-ব্রহ্মচারী ভক্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি এইদিন মঠে সমবেত হইয়াছিলেন। বিকালে শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজীর সহপাঠী ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদারের সভাপতিত্বে বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে একটি সভা হয়। সভায় মাধবানন্দজীর উচ্চ অধ্যাত্মজীবন, অভিমান-রাহিত্য, গভীর নিঃস্বার্থ ভালবাসা প্রভৃতি বিষয়ে স্বামী ভূতেশানন্দ, স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ, ডাঃ শ্রীমহেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীঅমিয়ভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং সভাপতি মহাশয় চিত্তস্পর্শী আলোচনা করেন। ডাঃ মুখার্জী ও ডাঃ চ্যাটার্জী মাধবানন্দজী মহারাজের চিকিৎসা করিয়াছিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা এবং হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবর্গকে আমরা ৺বিজয়ার আন্তরিক শুভেচ্ছা নিবেদন করিতেছি।

জগজ্জননী কালিকা

জগতে শক্তি যে মূলতঃ একটিই—বিভিন্ন শক্তি যে একই শক্তির বিভিন্ন পরিবর্তিত রূপ, জড়জগতে জড়বিজ্ঞান আজ একথা প্রমাণ করিয়াছে। বিদ্যুৎশক্তিই তাপশক্তি, আলোকশক্তি প্রভৃতি রূপে রূপান্তরিত হয়; আবার তাপ, আলোক প্রভৃতি শক্তিকে রূপান্তরিত করা যায় বিদ্যুৎশক্তিতে। যে শক্তি কয়েকটি জড়কণাকে জুড়িয়া দিয়া নূতন জিনিস সৃষ্টি করে, সেই শক্তিই তাহাকে একত্র ধরিয়া রাখে। আবার কণাগুলিকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া জিনিসটিকে বিনষ্টও করে সেই একই শক্তি।

জড়জগৎ-পরিচালক অচেতন শক্তি সম্বন্ধে এই বিজ্ঞানসম্মত তথ্যের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া প্রাণশক্তি, চিন্তাশক্তি প্রভৃতির দিকে তাকাইলে বহুজনের প্রত্যক্ষ করা এই সত্যকে অন্ততঃ যুক্তির দিক দিয়া সম্ভব বলিয়াই আজ স্বীকার করিতে হইবে—সব শক্তিরই যাহা চরম রূপ তাহা একটিই; এবং সেই শক্তি যেমন অচেতন বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে, তেমনি হইয়াছে প্রাণশক্তি, চিন্তাশক্তি প্রভৃতিতেও। অর্থাৎ যে শক্তিবলে একটি পুষ্প হইতে এককণা পরাগ স্থানচ্যুত হয়, সেই শক্তিই গ্রহ-উপগ্রহকে নিজ নিজ কক্ষপথে ধরিয়া রাখে; সেই শক্তিই সূর্যের মধ্যে পরমাণুকে ভাঙ্গিয়া-গড়িয়া অফুরন্ত তাপ- ও আলোক-শক্তির উদ্ভব ঘটায়, সেই শক্তিবলেই নীহারিকা হইতে কোটি কোটি সূর্যের, নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়; কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্রকে ভাঙ্গিয়া নীহারিকায় পরিণত করে সেই শক্তিই। সেই শক্তিবলেই আবার চিন্তাতরঙ্গ উদ্ভূত হইয়া সুখদুঃখ-অনুভূতিময় অগণিত আবর্তের সৃষ্টি হয়; সেই আবর্তের চারিদিকে লক্ষ লক্ষ জড়কণাকে টানিয়া আনিয়া জীবদেহ সৃষ্টি করিয়া আবার তাহাকে ভাঙ্গিয়াও দেয় সেই শক্তিই।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে শক্তির এই চরম রূপ চৈতন্যময়। সেই চিন্ময়ী শক্তিই মাতৃরূপে আরাধিতা হন। বিশ্বের সব কিছুরই জন্মদাত্রী বলিয়া তিনি 'মা'। মায়ের সঙ্গে পালনের ভাবও অতি-জড়িত। আর সেই মাতৃরূপা শক্তির সঙ্গে বিনাশের ভাবের সংযোগও অপরিহার্য বলিয়া তাঁহার কালিকামূর্তিতেই ঈশ্বরের লীলামূর্তির সর্বাঙ্গসুন্দর প্রকাশ। মা-কালী যেমন "সুখপ্রসন্নবদনা", "স্মেরাননসরোরুহা" "অভয়ং বরদং চৈব দক্ষিণোর্ধ্বাধঃপাণিকা," তেমনি আবার "করালবদনা" "ঘোরা" "সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গবামাধোর্ধ্বকরাম্বুজা"।

জগজ্জননীর এই রূপ যুক্তিসিদ্ধ কল্পনামাত্র নয়; তন্ত্র-সাধনাকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব মহামায়ার এই রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—"এক অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রীমূর্তি গঙ্গাগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া ধীর পদক্ষেপে পঞ্চবটীতে আগমন করিলেন, ক্রমে দেখিলেন ঐ রমণী পূর্ণগর্ভা; পরে দেখিলেন ঐ রমণী তাঁহার সম্মুখেই সুন্দর কুমার প্রসব করিয়া তাহাকে কত স্নেহে স্তন্যদান করিতেছেন; পরক্ষণে দেখিলেন, রমণী কঠোর করালবদন হইয়া ঐ শিশুকে গ্রাস করিয়া পুনরায় গঙ্গাগর্ভে প্রবিষ্টা হইলেন।"

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "কালী ও কালীর সর্বপ্রকার কার্যকলাপকে আমি কতই না অবজ্ঞা করিয়াছি! আমার ছ-বছরের মানসিক দ্বন্দ্বের কারণ ছিল এই যে, আমি তাঁহাকে মানিতাম না। কিন্তু অবশেষে তাঁহাকে আমায় মানিতে হইয়াছে।...যে কারণে আমাকে মানিতে হইল, তাহা একটি গোপন রহস্য, এবং উহা আমার মৃত্যুর সঙ্গেই লুপ্ত হইবে।...আমার পক্ষে ইহা বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই যে কোথাও এক বিরাট শক্তি নিশ্চয়ই আছেন, যিনি নিজেকে কখন কখন নারীরূপে কল্পনা করেন ও তাঁহাকে লোকে 'কালী' এবং 'মা' বলিয়া ডাকে।"

সৃষ্টির অতীত প্রদেশে, যেখানে সৃষ্টির কিছুই নাই, সৃষ্টি আছে কি নাই তাহা ধারণা করিবার মত মনও নাই, সেখানে ঈশ্বরের যাহা স্বরূপ তাহা কাজেকাজেই চিন্তার অতীত, তাহা "বোঝে প্রাণ বোঝে যার।" কিন্তু যতক্ষণ আমরা ঈশ্বরের সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছি, মনের সীমানায় তাঁহাকে ধরিতেছি— এ অবস্থা রহিয়াছে, যতক্ষন তাঁহাকে জগৎকর্তা বলিতেছি, ততক্ষণ তাহাকে সৃষ্টি-বিনাশাদি বিরুদ্ধভাবের আধাররূপে দেখিতেই হইবে। (অবশ্য সত্য উপলব্ধির পথে যত আগাইয়া যাওয়া যায়, 'বিনাশ'কে ততই বন্ধনমুক্তি বলিয়া উপলব্ধি হয়।) সত্যকে তাহার যথার্থরূপে দেখাই ভাল, আপস করিয়া কোন লাভ নাই। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "আমরা যেন ভীষণকে ভীষণ জানিয়াই আলিঙ্গন করি—তাহাকে যেন কোমলতর হইতে অনুরোধ না করি।"

সাধারণতঃ আমরা কিন্তু এটি করিতে চাই না। ঈশ্বরকে মা বলিতে আপত্তি নাই; তিনি জন্মদাত্রী পালনকর্ত্রী মা—এটি আমরা সহজেই গ্রহণ করি মনেপ্রাণে। কিন্তু তাঁহাকে "মৃত্যু তুমি রোগমহামারী বিষকুম্ভ ভরি বিতরিছ জনে জনে"—একথা বলিতে মন সহজে রাজী হয় না। আবার তাঁহার ইচ্ছায় সবকিছু ঘটিতেছে, একথা মোটামুটিভাবে আমরা স্বীকার করিলেও সুখের সময় আমরা সকলেই প্রাণ খুলিয়া ভাবিতে পারি তাঁহার ইচ্ছাতেই সব হইতেছে, কিন্তু দুঃখের সময় দুঃখকেও তাঁহারই দান বলিয়া মনেপ্রাণে হাসিমুখে গ্রহণ করি কয়জন? "মা, তুমি বিশ্বপালিনী হয়ে এসো!"—এ প্রার্থনা আমরা সকলেই করিতে পারি, কিন্তু কয়জন বলিতে পারি "মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!"

কিন্তু যদি সত্যলাভ করিতে হয়, সুখদুঃখ-জন্মমৃত্যুর, মনোহারিত্ব-বিভীষিকার উত্তাল-তরঙ্গসঙ্কুল সৃষ্টি-সমুদ্রের পারে চিরআনন্দের, চিরজীবনের উপকূলে পৌছিতে হয়, তাহা হইলে জীবনের মত মৃত্যুকেও, সুখের মত দুঃখকেও সমদৃষ্টিতে দেখিবার প্রয়াস করা ছাড়া আর অন্য পথ নাই। বরং বলা যায়, সুখের চেয়ে দুঃখকে বরণ করিতে পারিলেই সত্যলাভের পথে অগ্রসর হওয়া যায় দ্রুততর গতিতে; অগ্রসর যে হইতেছি, তাহাতে নিসংশয় হওয়া যায়। সুখের সময়, যখন জীবন উপভোগের জন্য যাহা চাই তাহা সবই পাইতেছি, 'মন্দাক্রান্তা তালে' 'জীবন-তরী' বহিয়া চলিতেছে, তখন মনে একটি প্রসন্নভাব থাকেই। উহা সুখসঞ্জাত অথবা সুখ-দুঃখের পারের দিকে অগ্রসর হওয়ার দরুন অন্তর হইতে স্বতঃস্ফূর্ত, তাহা নিজে নিজে নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু দুঃখের সময়, জীবনের সব স্বপ্ন যখন শূন্যলীন হইয়া বিপর্যয়কে ডাকিয়া আনে, সেই সময়ও মনে প্রসন্নভাব বজায় রাখিতে পারিলে সংশয়ের আর অবকাশ থাকে না যে

সত্যলাভের পথে আগাইয়াই চলিয়াছি। "সাহসে যে দুঃখদৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে, কালনৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।" "ভীষণের পূজা কর, মৃত্যুর উপাসনা কর। বাকী সবই বৃথা; সমস্ত চেষ্টাই বৃথা। ইহাই শেষ উপদেশ। কিন্তু ইহা কাপুরুষের এবং দুর্বলের মৃত্যুবরণ নয় বা আত্মহত্যাও নয়—ইহা শক্তিমানের মৃত্যুবরণ, যিনি সব কিছুর অন্তরতম প্রদেশ খুঁজিয়া দেখিয়াছেন ও জানিয়াছেন যে, ইহা ছাড়া দ্বিতীয় কোন সত্য নাই।"

এই সত্য দুঃখজয়ী, মৃত্যুঞ্জয়ী সত্য, চিরঅস্তিত্ব ও চিরআনন্দময় সত্য। এই সত্যোপলব্ধির পথেই আমরা সকলেই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে চলিয়াছি। মা-ই আমাদের হাত ধরিয়া লইয়া চলিয়াছেন। এই 'মা'-কেই 'প্রকৃতি' বলা হয়। সত্যলাভের ইচ্ছারূপে তিনিই অন্তরে উদিত হইতেছেন, মানবদেহধারী গুরুরূপে পথের নির্দেশ দিয়া সে পথের চিরসাথী হইতেছেন—"তিনি যেন আত্মবিস্মৃত জীবাত্মার হাত ধরিয়া তাঁহাকে জগতে যত প্রকার ভোগ আছে ধীরে ধীরে সব করাইলেন…। ক্রমশঃ তাঁহাকে নানাবিধ শরীরের মধ্য দিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে লইয়া যাইতে লাগিলেন, শেষে আত্মা নিজ হারানো মহিমা ফিরিয়া পাইলেন, নিজ স্বরূপ পুনরায় তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তখন সেই করুণাময়ী জননী যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথেই ফিরিয়া গেলেন এবং যাহারা জীবনের মরুতে পথ হারাইয়াছে, তাহাদিগকে আবার পথ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।"

"চৈতন্যের সহিত শক্তির নিত্য মিলন সর্বত্র প্রত্যক্ষ করিয়াই বিশেষ বিশেষ শক্তিশালী পদার্থে এবং সমগ্র জগতে ভারতের ঋষিগণ শবশিবার আরাধনা করিয়াছিলেন। অভ্রভেদী পর্বতমালা, সাগরবাহিনী নদনদী, ঊষার রক্তিম ছটা, সন্ধ্যার তিমিরাবগুণ্ঠন—সকলই তাঁহাদের নিকট সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিনা দেবীর প্রতীকস্বরূপ হইয়া তাঁহার সৌম্যাৎসৌম্যতরা মূর্তি প্রকাশ করিত। অমানিশার সূচীভেদ্য অন্ধকার, মৃত্যুর নিষ্ঠুর ছবি, শ্মশানের কঠোর উদাসীনতা, কালের সংহার-ছায়া—সকলই আবার সেই করালবদনার ভিতর কোমল-কঠোর ভাবের এককালীন একত্র সমাবেশ নয়নগোচর করাইয়া তাঁহাদিগকে মোহিত করিত।"

স্বামী সারদানন্দ (ভারতে শক্তিপূজা)

কালিকা

আনন্দ

গগনে গগনে বাজিছে ডঙ্কা
খড়্গ উঠিছে তুলে,
রক্ত চরণে শত শত প্রাণ
অঞ্জলি দেয় তুলে।
রুদ্র সেথায় ডমরু বাজায়
অম্বর ভরে ত্রাসে,
হরষে তোমার করাল বদন
ঝলসে অট্টহাসে।
ভৈরবী, তোর সেরূপ দেখিয়া
সৃষ্টি পলায় লাজে
ভ্রূকুটি-কুটিল সংহার শুধু
বিশ্বের বুকে রাজে।
সৃষ্টিরে যারা চিনিয়াছে শুধু
স্থিতির সঙ্গ চায়,
তোমার করাল বদন হেরিয়া
দূরে পলাইয়া যায়—

ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে লইয়া
তাদের হৃদয়ে আসি'
স্বার্থ-অসুরে বিনাশ করিয়া
সরিয়া দাঁড়াও হাসি'।
শেখাও জননী, যেথায় সৃষ্টি,
যেথায় স্থিতির মেলা
সেথায় তোমার ভৈরব রূপ
নিত্যই করে খেলা।
শেখাও জননী, সৃষ্টি-স্থিতির
বিনাশের পরপারে
তোমার নিত্য প্রেম-নির্ঝর
ঝরিতেছে শতধারে
সেই নির্ঝর-সন্ধান লাগি'
ও-রাঙা চরণে আজি
অঞ্জলি ভরি' তুলি' ধরিতেছি
রক্ত কুসুমরাজি।

"আমি ইয়াঙ্কিদের ভালবাসি"

স্বামী গম্ভীরানন্দ

দুই

আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে সার্ধ দুই বৎসর কাজ করিবার পর স্বামীজী একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দীর্ঘ ট্রেন-ভ্রমণের পরে কয়েক-দিন ধরিয়া মনে হইত যেন মাথার ভিতরে বিকট শব্দে গাড়ীর চাকাগুলি ঘুরিতেছে। আর মধ্যে মধ্যে মনে হইত যে স্নায়ুগুলি একেবারে অবসন্ন —যেন তিনি স্নায়ুরোগগ্রস্ত। ভারতে অবস্থান-কালীন কঠোর সাধনা এবং পাশ্চাত্য দেশে অকাতরে ধর্মপ্রচারের শ্রম এত মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছিল যে শরীরের পক্ষে তাহা আর সহ্য করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। বন্ধুরা ভয় করিতে-ছিলেন, শরীর হয়তো একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং ফলতঃ ভাঙ্গিয়াও পড়িতেছিল। তথাপি তিনি নিজে ঐ দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া অধিকতর কষ্টসাধ্য কার্যে নিযুক্ত হইতেছিলেন। যাঁহারা তাঁহার বাণীগ্রহণে আগ্রহশীল, তাঁহাদের কল্যাণার্থে তিনি দেহমন সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিয়াছিলেন; অতএব তাঁহার থামিবার উপায় ছিল না।

দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে যাইবার পূর্বে স্বামীজীর আর যেসব চরিত্রগত ও উপদেশগত বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার অনেকটাই আমাদের নিকট অজ্ঞাত, এবং অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইবে। তাঁহার শিষ্যবৃন্দের একজন বলিয়াছিলেন, "দিবসের প্রতিদণ্ডে কত নবীন ভাব, নূতন মানবীয় আনন্দ, মানবের দেবত্ব ও আত্মার অসীমত্ব সম্বন্ধে কত নবালোকপ্রদ চিন্তা, কত অভিনব অফুরন্ত আশা, কত অজ্ঞাতপূর্ব চমকপ্রদ পরিকল্পনা তাঁহার ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন করিয়া বিচ্ছুরিত হইত!" অপর এক শিষ্য বলিয়াছিলেন, "শুধু বেড়াইবার জন্য তাঁহার সঙ্গে রাস্তা ধরিয়া চলিতে গেলেও দেখা যাইত, অকস্মাৎ নিছক রঙ্গরস হইতে অচিন্ত্যপূর্ব চমৎকার চিন্তারাজ্যে বা শক্তিকেন্দ্রে উপস্থাপিত হইয়া গিয়াছি।" আর একজন লিখিয়াছিলেন, "তিনি সর্বদা এই বোধ জাগাইয়া দিতেন যে তাঁহার সবটুকুই যেন বিদেহ আত্মা; তাঁহার গরিমময় বরবপু দুর্নিবার বলে প্রত্যেকের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে থাকিলেও এইরূপ বোধ অব্যাহত থাকিত।" আরও একজন শিষ্য বলিয়াছিলেন, "স্বামীজীর উপস্থিতি অপরের উপরে যে কিরূপ অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিত, তাহা আমার পক্ষে বলা অসাধ্য। তিনি আপনার প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিতেন; এবং যখন তিনি সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত গুরুগম্ভীরভাবে কথা বলিয়া যাইতেন, তখন আমার এই কথাটি প্রায় অসম্ভব মনে হইলেও শ্রোতাদের মধ্যে কেহ কেহ সত্য সত্যই বোধ করিতেন, তাঁহারা যেন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহার চিন্তা ও বুদ্ধির অতি সূক্ষ্ম ধারা তাঁহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইত। আমি এমন এক ব্যক্তির কথা জানি, যিনি স্বামীজীর সহিত একদিন আলোচনায় অবতীর্ণ হইয়া এরূপ স্নায়বিক আঘাত পাইয়াছিলেন যে তাঁহাকে কয়েকদিন শয্যাগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ছিল একাধারে গম্ভীর অথচ ভয়-ভক্তি-সঞ্চারক। তাঁহাতে এমন শক্তি ছিল যে তিনি ইচ্ছা করিলে অপরের ব্যক্তিত্বকে সত্য সত্যই নস্যাৎ করিয়া দিতে পারিতেন।"

অনেক ক্ষেত্রে এরূপ ঘটিত যে, বিরোধী

পক্ষকে তিনি যখন নিজমত সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া বলিতে বাধ্য করিতেন, তখন সে যত বলিতে যাইত ততই আপন যুক্তিজালে জড়াইয়া বিভ্রান্ত ও বিব্রত হইয়া পড়িত; অথচ এই জাতীয় যে সব ব্যক্তি তাঁহার তেজোদীপ্ত শক্তিপ্রভাবে বিবশ হইয়া পড়িত, তাহারাই আবার তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে অকাট্য সাক্ষ্য দিতে অগ্রসর হইত। তাহারা বলিত, "ইঁহার মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিপ্রত্তি ও মাধুর্যের অত্যাশ্চর্য সন্নিবেশ ঘটিয়াছে; ইনি একাধারে শিশু ও ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ।" বস্তুতঃ এই বিষয়ে এত ঘটনা আছে যে বলিয়া শেষ করা যায় না। স্বামীজী নিজেও বক্তৃতাকালে বোধ করিতেন এবং সময়বিশেষে অপরকেও বলিতেন যে, তিনি শুধু বক্তৃতামাত্র দেন না, ঐ কালে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে একটা অধ্যাত্মসূত্র স্থাপন করেন এবং সেই সূত্রাবলম্বনে বক্তার শক্তি শ্রোতৃমধ্যে সঞ্চারিত হয়। স্বামীজী আপনাকে আক্ষরিক অর্থে শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে বিলাইয়া দিয়া তাঁহাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন করিতেন।

তাঁহার বক্তৃতাগুলিকে বুদ্ধিপ্রসূত না বলিয়া দৈব-প্রেরণা-লব্ধ বলা উচিত। ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার 'আচার্যদেবকে যেমন দেখিয়াছি' গ্রন্থে স্বামীজী নিজে বক্তৃতা প্রদান বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, "তিনি বলিয়াছিলেন, রাতে তাঁহার নিজের ঘরে এক অশরীরী স্বর তাঁহার পর-দিবসের বক্তৃতার কথাগুলি তাঁহাকে শুনাইয়া জোরে জোরে বলিতে থাকিত; এবং পরদিন বক্তৃতামঞ্চেও দাঁড়াইয়া তিনি দেখিতেন, ঐ কথাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করিয়া চলিয়াছেন। কখনও কখনও শুনিতেন, দুইটি স্বর পরস্পর আলোচনা করিতেছে। কখনও মনে হইত, কোন সুদূর হইতে যেন ঐ স্বর দীর্ঘ বীথিকাবলম্বনে তাঁহার কর্ণে আসিয়া পৌঁছিতেছে; হয়তো পরে ক্রমে নিকটে আসিতে আসিতে উহা উচ্চরবে পরিণত হইত। 'এটা ধরে নিতে পার', তিনি বলিতেন, 'অতীতে দৈবপ্রেরণা শব্দটি যে অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকুক না কেন, সেটা এরকম কোন কিছুই হবে।' " ভগিনী নিবেদিতা আরও লিখিয়াছেন, "আবার জাহাজে বসিয়া তিনি বিবাহ-সম্বন্ধে একটা স্বপ্নের কথা আমাদের বলিয়াছিলেন: ঐ স্বপ্নে আমি শুনিয়াছিলাম, দুইটি অশরীরী বাণী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিবাহের আদর্শ লইয়া বিচার করিতেছে, এবং ঐ বিচারের সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, উভয় আদর্শের মধ্যে নিজস্ব এমন একটা কিছু সত্য আছে, যাহা হারাইলে জগতেরই ক্ষতি হইবে।" ঘটনাটির প্রতি লক্ষ্য রাখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, স্বামীজী সদিচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া মাঝে মাঝে পাশ্চাত্য ব্যবস্থার সমালোচনা করিলেও উহার ভাল দিকটাও সাদা চোখেই দেখিতেন এবং স্বীকারও করিতেন।

স্বামীজী একসময়ে ইচ্ছামাত্র রোগ সারাইতে পারিতেন। কিন্তু এই শক্তি তাঁহার আছে জানিয়াও তিনি সচরাচর উহা ব্যবহার করিতেন না। অতএব উহা তেমন সুবিদিত নহে। এইটুকু তাঁহার জীবনীতে লিপিবদ্ধ আছে যে, জনৈকা আমেরিকান স্ত্রীলোকের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তিনি তাঁহার 'হে-ফিভার' নামক জ্বর সারাইয়াছিলেন। অনেক দিন পরে ঐ স্ত্রীলোকটি স্বামীজীর একজন শিষ্যকে পত্র লিখিয়া এই ঘটনা প্রকাশ করেন, "বন্ধুটির বাটীতে বাসকালে আমি জ্বরে পড়িলাম। সে বড় বিষম জ্বর। আমায় যন্ত্রণায় ছটফট করিতে দেখিয়া স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার অসুখ সারাইয়া দিব?' আমি বলিলাম, 'তা যদি পারেন

তো বড় সুখের বিষয় হয়।' এই কথা শুনিয়া তিনি আমার সম্মুখে আসিয়া বসিলেন এবং আমার হাতদুখানি তাঁহার হাতের তালুর উপর রাখিতে বলিলেন। আমি ঐরূপ করিলে তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার হাতদুইটি শীতল হইয়া আসিল, এবং মনে হইল তিনি যেন কাঠের মতো শক্ত হইয়া গিয়াছেন। কতক্ষণ পরে (অল্প কি অধিক বলিতে পারি না) তিনি চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন এবং উঠিয়া দ্রুতগতি গৃহের বাহিরে চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম যে আমার জ্বর একেবারে ছাড়িয়া গিয়াছে।"

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২০ শে মে তারিখের এক পত্রে এইরূপ ব্যাপারের সূক্ষ্মতত্ত্ব উল্লেখ করিয়া স্বামীজী স্বামী সারদানন্দকে লিখিয়াছিলেন, "এবার একটি আশ্চর্য বিষয় বলি, শোন। যখন তোমাদের কাহারও কোন পীড়া হইবে, তখন সে নিজে বা অপর কেহ তাহার মূর্তিটিকে বেশ করিয়া মনে মনে ধ্যান করিবে ও সঙ্গে সঙ্গে ভাবিবে, 'সে নীরোগ, তাহার কোন অসুখ নাই।' দেখিবে, সে নিশ্চয় সারিয়া উঠিবে। যাহার পীড়া হইয়াছে তাহাকে না জানাইয়াও বা সে শত শত ক্রোশ দূরে থাকিলেও এই উপায়ে তাহাকে আরোগ্য করা যায়। কথাটা মনে রেখো।" স্বামীজীর ভ্রাতা শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার 'লণ্ডনে বিবেকানন্দ' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে স্বামীজী চিন্তাশক্তি-বলে তাঁহারও জ্বর সারাইয়াছিলেন (১ম খণ্ড, ৬১—৬২ পৃষ্ঠা)।

এই সব গুরুগম্ভীর কথা ছাড়িয়া স্বামীজী হাস্যকৌতুকের ভিতর দিয়া কিরূপে আমেরিকানদের হৃদয় জয় করিতেন তাহারই সম্বন্ধে দুই একটি ঘটনা বলি। স্বামীজী নিজে হাস্যরসিক ছিলেন, হাস্যরস-পরিস্থিতিও বেশ উপভোগ করিতেন ও সানন্দে তাহতে যোগ দিতেন, যদিও সেজন্য হয়তো একটু-আধটু অসুবিধায়ও পড়িতে হইত। আমেরিকায় এক চিত্রকর-দম্পতি ছিল, তাহারা বেশ আনন্দে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইত এবং উভয়ের মধ্যে কে কত দ্রুত ও ভাল ছবি আঁকিতে পারে এই বিষয়ে পাল্লা চলিত। একসময়ে তাহারা স্বামীজীর প্রতি আকৃষ্ট হয়; তখন মাঝে মাঝে বাইসাইকেলে চড়িয়া যন্ত্রপাতিসহ তাঁহার নিকট আসিত ও দুইজন দুইদিকে বসিয়া কে কত দ্রুত অথচ হুবহু আঁকিতে পারে, এই লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করিয়া দিত। এদিকে আড়ষ্টভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকা একটু কষ্টদায়ক হইলেও স্বামীজী তাহাদের আমোদে মন খুলিয়া যোগ দিতেন (লণ্ডনে বিবেকানন্দ ১৪০ পৃঃ)।

আমেরিকায় লোকে নাপিতের দোকানে চুল-দাড়ি কামাইলেও নখ প্রায়শঃ নিজেরাই কাটে। হেলদের বাড়ীতে থাকাকালে একবার পায়ের নখ বাড়িয়া যাওয়ায় স্বামীজী হেল-কন্যাদের একজনের নিকট একখানি কলম-কাটা ছুরি চাহিলেন। মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হইবে?' স্বামীজী নখকাটার কথা বলিলে সে যন্ত্রপাতি আনিয়া ও স্বামীজীর জুতা-মোজা খুলিয়া বেশ যত্ন সহকারে পায়ের নখ কাটিয়া দিল এবং আবদার করিল: নাপিতের দোকানে এ পরিশ্রমের মূল্য তিন-চারি ডলার; তাহাকে অন্ততঃ এক ডলার পারিশ্রমিক দিতে হইবে। স্বামীজীও অমনি সহাস্যে জবাব দিলেন, মহাপুরুষের পাদস্পর্শ সৌভাগ্য-বশে ঘটে; পোপের পা ছুঁইতে হইলে অর্থ দিতে হয়। পরিশ্রম করিয়া অর্থপ্রাপ্তির বদলে উল্টা আবার অর্থদণ্ড দিতে হইবে শুনিয়া

মেয়েটি হঠাৎ কোন পাল্টা জবাব দিতে পারিল না; সে হাসিতে হাসিতে নাচার ভঙ্গীতে ঘর হইতে চলিয়া গেল (ঐ, ১২৭ পৃঃ)।

গুডউইন বলিতেন, তিনি গরীবের ছেলে; তাই পূর্বে রোজগারের ধান্দায় অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইউনাইটেড স্টেট্‌স্ ইত্যাদি দেশে ঘুরিতে হইয়াছিল; কিন্তু এই ভাবে জীবন-ধারণের উপায় পাইলেও এবং দ্রুতলিখন-ব্যপদেশে অনেক বড়লোকের সান্নিধ্যলাভ ঘটিলেও তিনি প্রকৃত ভালবাসা কাহারও নিকট পান নাই। পরিশেষে স্বামীজীর অকৃত্রিম স্নেহমমতায় ধরা পড়িয়া তিনি অর্থোপার্জনের চেষ্টা বর্জন করেন। স্বামীজী তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন এবং তাঁহার সহিত হাসিঠাট্টাও করিতেন। গুডউইনের পূর্বে এক মস্ত দোষ ছিল, জুয়াখেলা; আর উহাতে তিনি প্রায়ই হারিতেন। স্বামীজী ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, 'তোমার নাম গুডউইন না হয়ে হওয়া উচিত ছিল ব্যাডউইন।' আর তখন গুডডইন মাথা নীচু করিয়া বলিতেন, 'না আমার নাম গুডউইন, ব্যাডউইন নয়,' (দুর্ভাগা নয়, সুভাগা)।

বিদেশ-বাসের শেষ বৎসরে স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের কথা অধিকতর খোলাখুলিভাবে বলিতেন; তাঁহার কথাবার্তায় শ্রীগুরুর উপর একান্ত বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব প্রকাশ পাইত। আবার এই গুরুভক্তিরই দৃঢ়ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বপ্রেমের সুরটিও সহজেই ধরা পড়িত। ৯ই সেপ্টেম্বর (১৮৯৫) তিনি আলাসিঙ্গাকে লিখিয়াছিলেন: 'আমার জীবনের ব্রত কি, তা আমি জানি, আর কোন দম্ভপূর্ণ স্বাজাত্যাভিমান আমার নাই। আমি যেমন ভারতের, তেমনি সমগ্র জগতের।...... কোন্ দেশ আমার উপর বিশেষ দাবী রাখে? আমি জাতিবিশেষের ক্রীতদাস নাকি?...... আমার পেছনে এমন একটা শক্তি দেখছি, যা মানুষ দেবতা বা শয়তানের শক্তির চেয়ে অনেক গুণ বড়।.... আমি কোন প্রকার রাজনীতিতে বিশ্বাসী নই! ঈশ্বর ও সত্যই জগতে একমাত্র রাজনীতি, আর সব বাজে।' ৪ঠা অক্টোবর স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিয়াছিলেন, 'তিনি যে রক্ষে করছেন দেখতে পাচ্ছি যে।... একি আমার জোরে, না তিনি রক্ষা করছেন?' ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দেরই একদিন তিনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিয়াছিলেন, 'এদেশ হতে শীঘ্র দেশে যাওয়ায় কোন লাভ নাই। বলি, প্রথমতঃ এদেশে একটু বাজলে দেশে মহধ্বনি হয়; তারপর এদেশের লোকেরা মহাধনী ও ছাতিওয়ালা। দেশের লোকের পয়সাও নাই, ছাতি একেবারেই নাই। ক্রমশঃ প্রকাশ্য! তিনি কি শুধু ভারতের ঠাকুর? ঐ সঙ্কীর্ণ ভাবের দ্বারাই ভারতের অধঃপতন হয়েছে। তার বিনাশ না হ'লে কল্যাণ অসম্ভব...... কোণ থেকে না বেরুলে কোন বড় ভাব হৃদয়ে আসে না। স্বামীজীর মতে শ্রীরামকৃষ্ণকে গ্রহণ করা মানেই উদারতা বরণ করা। এই উদারতার ভিত্তির উপরই তাঁহার আমেরিকার কাজ সংস্থাপিত হইয়াছিল।

আমেরিকায় থাকাকালে তিনি নানাবিধ পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন। বিবিধ কারণে ঐগুলি কার্যে পরিণত না হইলেও উহা হইতে তাঁহার চিন্তাধারা বুঝিতে পারা যায়। এককালে তিনি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় বা সার্বভৌম মন্দিরের দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন, ইহার আভাস আমরা তাঁহার বাল্টিমোর ভ্রমণ উপলক্ষে পাইয়াছি।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে এক পত্রে তিনি আর একটি পরিকল্পনার কথা শ্রীযুক্তা বুলকে

জানাইয়াছিলেন : ক্যাটস্ কিল পর্বতে প্রকাণ্ড জমি কিনিয়া তিনি তাহাতে সাধনক্ষেত্র রচনা করিবেন এবং পাশ্চাত্য ভক্তগণ গ্রীষ্ম-কালে তথায় যাইয়া ইচ্ছানুরূপ কুটীর নির্মাণ করিয়া বা তাঁবু খাটাইয়া সাধনায় রত হইবেন। কিছুদিন এই ভাবে চলিয়া পরে স্থায়ী আশ্রম স্থাপিত হইবে, এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি নিজে অর্থব্যয় করিবেন। বলা বাহুল্য, উভয় অভিপ্রায় অসিদ্ধ রহিয়া গিয়াছে।

ফলতঃ যে কয়টি মাস স্বামীজী আমেরিকায় ছিলেন, সব সময়ই তিনি আমেরিকার অধ্যাত্ম-জীবনের উন্নতিকল্পে ব্যক্তিগতভাবে নানা কার্যে লিপ্ত ছিলেন এবং বৃহত্তর কার্যধারার কথাও ভাবিতেছিলেন। অবশ্য আমেরিকানরা সকলেই তাঁহার বন্ধু ছিল না ; পারিলে তাঁহার সর্বনাশ করিতে পারে, এরূপ ব্যক্তিও সে দেশে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু মান-অপমানের কথা না ভাবিয়া স্বামীজী অভীষ্টসাধনে রত হইয়াছিলেন এবং সাফল্যও পাইয়াছিলেন। ইহার প্রমাণস্বরূপ আমরা দেখিতে পাই যে, পাদ্রীরা ও রমাবাঈ-মণ্ডলী যখন তাঁহার শত্রুতাচরণে ব্যস্ত, প্রায় সেই সময়েই তিনি বহু বন্ধু লাভে সমর্থ হন। ঐকালেই তিনি দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিতাগ্রণী উইলিয়াম জেমস-এর সহিত শ্রীযুক্তা ওলি বুলের গৃহে পরিচিত হন। অধ্যাপক নৈশ ভোজনে আসিয়াছিলেন। আহারের পর তিনি ও স্বামীজী অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপি চুপি আলাপ করিতে থাকেন, এবং রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত এই আলোচনা চলিতে থাকে। এই দুই বিশেষ প্রতিভাবান ব্যক্তির মধ্যে এতক্ষণ কি কথাবার্তা হইয়াছিল,—জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া পরে ওলি বুল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা স্বামীজী অধ্যাপক জেমসকে আপনার কেমন মনে হ'ল ?" স্বামীজী বলিলেন, "অতি চমৎকার লোক, অতি চমৎকার লোক," 'চমৎকার' কথাটি বেশ জোর দিয়া উচ্চারণ করিলেন। পরদিন স্বামীজী ওলি বুলের হস্তে একখানি পত্র দিয়া বলিলেন, "আপনার হয়তো এটা পড়বার আগ্রহ হবে।" ওলি বুল পত্রখানি পড়িলেন এবং দেখিয়া অবাক হইলেন যে, অধ্যাপক ঐ পত্রে স্বামীজীকে 'গুরুজী' (মাষ্টার) বলিয়া সম্বোধনপূর্বক দিন-কয়েক পরে স্বগৃহে ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন। অধ্যাপক জেমসের গ্রন্থেও স্বামীজীর উল্লেখ আছে ; তিনি স্বামীজীকে বৈদান্তিক-শিরোমণি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার 'ভ্যারাইটি অব রিলিজিয়াস এক্স-পিরিয়েন্স' নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে তিনি অদ্বৈত মতানুসারে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কথা লিখিতে গিয়া স্বামীজীর নাম করিয়াছেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ 'দি এনার্জিজ অব মেন'-এ তিনি এমন একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের কথা বলিয়াছেন, যিনি স্নায়ুরোগ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য রাজযোগ অভ্যাস করিয়া তাহার ফলে শুধু আরোগ্যলাভ করেন নাই, বুদ্ধি এবং অধ্যাত্মানুভূতিতেও উৎকর্ষের অধিকারী হইয়া-ছিলেন। অনেকের বিশ্বাস, স্বামীজীর শিক্ষাধীনে রাজযোগ অভ্যাস করিয়া জেমস স্বীয় জীবনে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই স্বীকারোক্তি।

মনে রাখিতে হইবে, ধর্ম-ভিন্ন অপরাপর ক্ষেত্রেও স্বামীজীর সহিত বহু মনীষীর মিলন ঘটিয়াছিল। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ধর্মমহাসভার অব্যবহিত পরে প্রসিদ্ধ বৈদ্যুতিক আবিষ্কারক অধ্যাপক এলিসা গ্রে ও তাঁহার স্ত্রী স্বামীজীর সম্বর্ধনার্থ চিকাগোর হাইল্যাণ্ড পার্কে অবস্থিত মনোরম বাসভবনে স্বামীজীকে নিরামিষাহারীদের এক ভোজনসভায় নিমন্ত্রণ করেন। এই সময়েই বিদ্যুৎ-কংগ্রেসের

অধিবেশন চলিতেছিল। অন্যান্য নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন, স্যার উইলিয়াম থমসন (পরে লর্ড কেলভিন) অধ্যাপক হেল্‌ম্‌হোলৎজ্‌ এবং অ্যারিটোন হোপট্যালিয়া। স্বামীজীর বিদ্যুৎ-বিষয়ক জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া ইঁহারা তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং বিজ্ঞানবিষয়ক শ্লেষযুক্ত সরস টিপ্পনিগুলিতে আমোদিত হইয়াছিলেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কের ডাঃ গার্ণসীর গৃহে অবস্থানকালে ডাঃ লাইম্যান এ্যাবট-এর সহিত তাঁহার আলাপ হয় এবং সমকালেই তিনি 'আউটলুক' পত্রিকার সম্পাদক-মণ্ডলীর সহিত নৈশভোজনে নিমন্ত্রিত হন। অপরাপর বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত পরিচয়ের কথা আমরা যথাস্থানে বলিয়া আসিয়াছি। মানুষের প্রতি একটা স্বাভাবিক টানই ছিল এইসব মেলামেশার কারণ; সর্বক্ষেত্রে মানুষই ছিল তাঁহার স্বজন। তিনি স্বয়ং সম্মানপ্রার্থী ছিলেন না, অপরের বন্ধুত্বলাভের জন্য কোন হীনবৃত্তি অবলম্বনেও প্রস্তুত ছিলেন না। বরং অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার স্পষ্ট নির্ভীক বাক্য বন্ধুবিচ্ছেদের কারণ হইয়া পড়িতেছে জানিয়াও তিনি সত্যভ্রষ্ট হইতেন না।

লোকরঞ্জনের জন্য সাধারণ বক্তা বা প্রচারক যে দাসসুলভ মনোবৃত্তি অবলম্বন করেন, স্বামীজী তাহা না করিয়া বরং স্পষ্ট ভাষায় আমেরিকান সমাজের দোষোদ্ঘাটন করিতেন। ইহাতে প্রথমতঃ অনেকে বিরক্তি বোধ করিলেও পরে তাহারা তাঁহার সত্যবাদিতা ও সারল্যের প্রশংসাই করিত। ক্ষেত্রবিশেষে সমালোচনার মাত্রা যে একটু অধিক হইয়া পড়িত না, এরূপ নহে। আর ইহাতে স্বামীজী নিজেও দুঃখিত হইতেন। বিশেষতঃ একদিনের ঘটনার জন্য তিনি খুবই অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। সেদিন বস্টনের এক বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে তিনি 'মদীয় আচার্যদেব' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। স্বামীজী নিজে ছিলেন বৈরাগ্যমণ্ডিত সন্ন্যাসী, আর তিনি বলিতে যাইতেছিলেন, ত্যাগিশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবলী। অথচ তিনি সম্মুখে দেখিতে পাইলেন এমন অনেক শ্রোতা যাহারা ইহলোক-সর্বস্ব ধর্মে আস্থাহীন ও ভোগ-বিলাসকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মনে করে। স্বতঃই তিনি ভাবিলেন, ইহারা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের কি বুঝিবে, আর ইহাদের সম্মুখে এই অপূর্ব বৈরাগ্যাদর্শ-স্থাপনেরই বা মূল্য কি? এইরূপ বিরুদ্ধ চিন্তার বশবর্তী হইয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃত চরিত্র বিশ্লেষণ ও তাহার মূল্যায়নমাত্রে নিরত না থাকিয়া আমেরিকান সভ্যতার অপকৃষ্ট দিকটাকে এমন নির্মমভাবে কষাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন যে, ইহাতে বিরক্ত হইয়া শত শত ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ সভা হইতে চলিয়া গেলেন স্বামীজী কিন্তু ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া ঐ ভাবেই বক্তৃতা শেষ করিলেন। পরদিন এই বক্তৃতার বিবরণ-প্রসঙ্গে কোন কোন সংবাদপত্রে প্রশংসা থাকিলেও সমালোচনাও যথেষ্ট প্রকাশিত হইল; তবে সব কাগজই একবাক্যে তাঁহার নির্ভীকতা, অকপটতা ও সারল্যের প্রশংসা করিল। স্বামীজী নিজে যখন সংবাদপত্রে মুদ্রিত স্বীয় বক্তৃতা পাঠ করিলেন, তখন তিনি অনুতপ্ত হইলেন এবং এই ভাবে অপরের নিন্দা করার জন্য অশ্রুমোচন করিতে করিতে বন্ধুদের বলিলেন—"আমার গুরুদেব মানুষের দোষ দেখিতেন না; নিজের সর্বাধিক নিন্দুকের প্রতিও তিনি প্রেম ব্যতীত অন্য ভাব পোষণ করিতেন না। আমার গুরুদেবের কথা বলিতে গিয়া অপরের নিন্দা করিয়া এবং তাহাদের মনে আঘাত দিয়া আমি গুরুদ্রোহের অপরাধ করিয়াছি। সত্য

বলিতে কি, আমি শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝিতে পারি নাই, এবং আমি তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলার অনুপযুক্ত।"

এখানে একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। স্থলবিশেষে যদিও তিনি ইচ্ছাপূর্বক বা ভাবাবেগে আমেরিকার সমাজের যুক্তিযুক্ত সমালোচনা করিতেন, তথাপি ইহা সম্পূর্ণ অলীক যে, তিনি আমেরিকার নারীসমাজের নিন্দা করিয়াছেন। মিশনারীরা স্বার্থোদ্ধারের জন্য অবশ্য এমন অসম্ভব কথারও অবতারণা করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর বক্তৃতা, রচনা, পত্রাবলী প্রভৃতি পাঠ করিলেই দেখা যাইবে তিনি তাহাদের প্রতি কত কৃতজ্ঞ ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ছিলেন। জগতের মাতৃজাতির প্রতি তাঁহার হৃদয়ে ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন ভাব স্থান পাইত না; বিশেষতঃ নানাভাবে নারীদিগের নিকট লব্ধ উপকাররাশির কথা প্রকাশ করিতে গিয়া তাঁহার মুখ ও লেখনী যেন উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাইত না। মাতৃভক্ত স্বামী বিবেকানন্দের পক্ষে ইহাই ছিল স্বাভাবিক।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে শ্রীযুক্তা ওলি বুলের গৃহে বাসকালে তিনি যে সব বক্তৃতা দেন তাহার মধ্যে তাঁহার 'ভারতীয় নারীর আদর্শ' নামক ভাষণটি ভাষা, ভাবাবেগ, বাগ্মিতা ও চিন্তার অভিনবত্বে আমেরিকার নারীসমাজের নিকট বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ওলি বুলের ঐকান্তিক আগ্রহে এই বক্তৃতাটি বস্টনের উপকণ্ঠে কেম্ব্রিজের মহিলাদের সম্মুখে প্রদত্ত হয়। বক্তৃতায় তিনি ভারতীয় নারীজীবনের বিভিন্ন দিক প্রদর্শনপ্রসঙ্গে যখন মাতৃভাবের ব্যাখ্যায় ব্যাপৃত হইলেন, তখন একদিকে যেমন ভারতীয় সমাজের একটি মূলতত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হইল, অপর দিকে তেমনি বিবেকানন্দের অপূর্ব মাতৃভক্তিও যেন মূর্তি ধারণ করিল এবং বিশ্বের নারীসমাজের প্রতি তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধা জনসাধারণের সমক্ষে সুপ্রকটিত হইয়া পড়িল। রমাবাঈ-চক্রের যে সকল ব্যক্তি এবং যে সব মিশনারী ভারতীয় স্ত্রীসমাজের সামাজিক অবহেলার চিত্র অঙ্কিত করিতে শতমুখ হইতেন, এই বক্তৃতাটিতে গৌণভাবে তাহাদিগকেও উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দেওয়া হইল। সভায় উপস্থিত সম্ভ্রান্তবংশীয়া সুশিক্ষিতা নারীগণ এই বক্তৃতায় এইরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা সমবেতভাবে স্বামীজীর অজ্ঞাতসারে যীশুখৃষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে বিবেকানন্দ-জননী ভুবনেশ্বরী দেবীকে এই পত্রখানি লিখিয়া পাঠান এবং সেই সঙ্গে তাঁহাকে মেরী-ক্রোড়ে উপবিষ্ট শিশু যীশুর একখানি চিত্রও উপহার দেন:

বিবেকানন্দ-জননী সমীপেষু,

"ঠাকুরানী, আজ মেরীপুত্র যীশুর জন্মদিন; সেই মহাপুরুষ জগতে যে অমূল্য রত্ন বিতরণ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া আজ চতুর্দিকে আনন্দের রোল উঠিতেছে। এই শুভক্ষণে আমরা আপনাকে অভিবাদন করিতেছি; কারণ আপনার পুত্র এক্ষণে আমাদের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। কয়েকদিন পূর্বে তিনি এখানে 'ভারতীয় মাতৃত্বের আদর্শ' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে বলেন যে, এখানকার আবালবৃদ্ধবনিতার কল্যাণার্থ তিনি যাহা কিছু করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা কেবল আপনার শ্রীচরণাশীর্বাদে। সেদিন যাঁহারা তাঁহার কথা শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা মনে করেন, তাঁহার জননীকে অর্চনা করিলে দিব্যশক্তি ও আত্মোন্নতি লাভ হয়

"হে পুণ্যচরিতে, আপনার জীবনের কার্যসমূহ আপনার সন্তানের চরিত্রে প্রতিফলিত। সেই মহৎ কার্যের মাহাত্ম্য সম্যক উপলব্ধি করিয়া আমরা আপনার প্রতি আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি; অনুগ্রহপূর্বক উহা গ্রহণ করুন। আশা করি এই ক্ষুদ্র শ্রদ্ধা-উপহার সকলকে স্পষ্টতঃ স্মরণ করাইয়া দিবে যে, ভগবান হইতে জগৎ উত্তরাধিকারসূত্রে যে মাতৃভাব ও একপ্রাণতা লাভ করিয়াছে, তাহার বাস্তব প্রতিষ্ঠা অচিরে অবশ্যম্ভাবী।"

এই বক্তৃতা বিষয়ে শ্রীযুক্তা ওলি বুল লিখিয়াছিলেন ঃ

"...তিনি বেদ, সংস্কৃতসাহিত্য ও নাটকাদি হইতে এই সকল আদর্শের উদাহরণ উদ্ধৃত করিলেন এবং বর্তমান কালের যে সকল রীতিপদ্ধতি ভারতীয় নারীর উন্নতির অনুকূল ও সহায়ক, তাহা প্রদর্শন করিয়া সর্বশেষে অতীব শ্রদ্ধাসহকারে স্বীয় জননীর উদ্দেশে হৃদয়ের ভক্তিঅর্ঘ্য নিবেদন করিলেন। তিনি বলিলেন যে, জননীর নিঃস্বার্থ স্নেহ ও পূতচরিত্র উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হওয়াতেই তিনি সন্ন্যাসজীবনের অধিকারী হইয়াছেন। এবং তিনি জীবনে যা কিছু সৎকার্য করিয়াছেন, সমস্তই সেই জননীর কৃপা-প্রভাবে।"

স্বামীজীর জীবনের বিশেষত্বই এই ছিল যে, তিনি যেখানেই যাইতেন, সেখানেই অবকাশ ঘটিলে মুক্তকণ্ঠে স্বীয় জননীর প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেন। একবার যে বন্ধুগৃহে স্বামীজী থাকিতেন, সেই গৃহেই একই কালে কয়েক সপ্তাহ বাস করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এমন এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, "তিনি তখন তাঁহার মায়ের কথা বলিতেন। আমার মনে আছে, তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার মাতার সংযমশক্তি ছিল অপূর্ব, এবং তিনি অপর কোন মহিলাকে একটানা তাঁহার মতো দীর্ঘকাল উপবাস করিতে দেখেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার মা এক সময় সুদীর্ঘ চৌদ্দদিন উপবাসে কাটাইয়াছিলেন। স্বামীজীর শিষ্যগণ প্রায়ই তাঁহাকে বলিতে শুনিতেন, "মা-ই তো আমাকে এই প্রেরণা দিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র ছিল আমার জীবন ও কার্যের চিরপ্রেরণাস্থল।" বস্তুতঃ কথাবার্তা ও ভাষণাদি অবলম্বনে স্বামীজী তখন আমেরিকান সমাজে মাতৃভাবেরই প্রচার করিতেছিলেন।

আমেরিকার বর্ষীয়সী মহিলাদের প্রতিও স্বামীজীর আচরণ ছিল বালকসদৃশ; তাঁহারা ছিলেন তাঁহার মা। এই সরল শিশুর সম্মুখে তাই তাঁহারাও একটা মাতৃজনোচিত স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেন। শ্রীযুক্তা লেগেট বলিয়াছিলেন, "সারা জীবনের অভিজ্ঞতা-মধ্যে আমি এমন দুইজন মাত্র জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তির দর্শন পাইয়াছি, যাঁহাদের সম্মুখে মানুষ নিজের মর্যাদা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করিয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দমনে চলাফেরা করিতে পারে—একজন ছিলেন জার্মান সম্রাট এবং অপরজন স্বামী বিবেকানন্দ।

আর ছিল শত কার্য ও মেলা-মেশার মধ্যেও তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ও ব্রহ্মনিষ্ঠা। আমেরিকান কোন কোন সংবাদপত্রে যে তাঁহাকে 'আভিজাত্যসম্পন্ন সন্ন্যাসী' বলা হইত, তাহা সত্যই বটে; পাশ্চাত্য দেশে স্বামীজীর কার্যাবলীর অনুধ্যান করিলে মনে হয়, তিনি যেন এক প্রবল, সমুজ্জ্বল ও পবিত্র অগ্নিশিখাসম ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। চিন্তায় দার্শনিকশ্রেষ্ঠের গাম্ভীর্য ও মৌলিকতা, দৃষ্টিতে ঋষিতুল্য সত্যসন্ধ অভ্রান্তি, কার্যে সিংহসদৃশ সাহস ও বিক্রম এবং ভাব-সংক্রামণে অবতারকল্প অসীম শক্তি

লইয়া অনুরাগী ও ভক্তিমান শিষ্যবৃন্দ পরিবৃত স্বামীজী বর্তমান যুগে যেন এক নবীন জ্ঞান-ভক্তি-যোগালঙ্কৃত বোধিসত্ত্বরূপে জগৎকল্যাণে নিরত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, তিনি ঈশ্বরকোটি, সপ্তর্ষির লোক হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, লোককল্যাণ-সাধনার্থ যুগাবতারের পার্ষদরূপে। লোকশিক্ষার জন্য ভগবান তাঁহাকে জগতে রাখিয়া গিয়াছিলেন। বস্তুতঃ চিকাগো ধর্ম-মহাসভার পরবর্তী ভাষণাদির অনুধাবন স্বতঃই মনে হয়, ইনি ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, করিলে ইঁহার বাণী বুদ্ধিপ্রসূত নহে, প্রত্যুত অনুভূতি-সম্ভূত এবং তাহা অপরের প্রমাণস্থল। তাঁহার হস্ত সর্বদা সম্প্রসারিত হইত অপরের কল্যাণ-সাধনে, তাঁহার কণ্ঠে নিনাদিত হইত শ্রীভগবানের মুখে তাঁহার অঙ্কিত থাকিত ভগবৎ-প্রেমিকসুলভ স্নেহমমতা। তিনি বলিতেনও, "আমি ইয়াঙ্কিদিগকে ভালবাসি।" আমেরিকা-বাসীরা তাঁহার মধ্যে পাইয়াছিল এমন এক ব্যক্তিকে, যিনি সর্বদা ভগবদ্ভাবে বিভোর, ভগবান যাঁহার হাত ধরিয়াছিলেন অথচ জগৎকে দিবার মতো যাঁহার যথেষ্ট সম্বল ছিল, এবং তিনি দিয়াও ছিলেন সব উজাড় করিয়া।

আমেরিকায় ভালভাবে কাজ করিতে হইলে তথাকার জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় আবশ্যক এবং তথাকার সামাজিক রীতিনীতি অন্ততঃ অংশতঃ মানিয়া লওয়া প্রয়োজন—ইহা স্বামীজী জানিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "যেখানে যেমন, সেখানে তেমন।" স্বামীজী তাই আমেরিকানদের সহিত একটা হার্দিক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য তাহাদের আদবকায়দা, আচার-বিচার ইত্যাদি বেশ করিয়া পর্যবেক্ষণ করিতেন ও শিখিয়া লইতেন। ভদ্রলোকের সহিত তাঁহাদেরই দেশীয় কায়দায় ভদ্রভাবে ব্যবহার করিতে হইবে—ইহাই ছিল তাঁহার ধারণা। পোষাক-পরিচ্ছদেও তিনি সর্বদাই অনুরূপ দৃষ্টি রাখিতেন। এই জন্যই আমেরিকায় অনেকে বলিত, "সন্ন্যাসী হইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ানোই তাঁহার ধর্ম হইলেও তিনি বড় ঘরের ছেলে—আদবকায়দা সব আগেরই মতো আছে, কিছুই ভুলেন নাই।" কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও মনে রাখা উচিত যে, কার্যব্যপদেশে ও প্রীতির আকর্ষণে তিনি আমেরিকান জীবনের প্রতি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আনুগত্য স্বীকার করিলেও, মৌলিক ক্ষেত্রগুলিতে তিনি তাঁহার ভারতীয় শাশ্বত বৈশিষ্ট্য ও সন্ন্যাসজীবনের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতেন। এই আভিজাত্য তাঁহাকে আমে-রিকানদের নিকট অধিকতর শ্রদ্ধেয় ও প্রীতি-ভাজন করিয়া তুলিত। ফলতঃ তিনি প্রতি-ক্ষেত্রেই ছিলেন আচার্য—অপরকে সুপথে পরিচালিত করাই ছিল তাঁহার কর্তব্য, পরি-চালিত হইতে তিনি মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হন নাই।

কান্তকবি ও ভক্তিসাধনা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

একশো বৎসর আগে শ্রাবণ মাসে কান্ত কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাংলা দেশে। সে-মাসে আরো কত মানুষই কালস্রোতে ভেসে এসেছিল কোন্ অচিন লোক থেকে—যারা কবে ভেসে উধাও হয়ে গেছে সেই একই স্রোতে!—যে-ক্ষুদ্র চিহ্ন ব'য়ে এনেছিল কালের জোয়ার, ভাঁটায় সে-চিহ্ন মুছে গেছে, তারা ফিরে গেছে সেই অচিন লোকেই, কিম্বা হয়ত মোড় নিয়ে লুপ্ত হ'য়ে গেছে আর কোনো এক অজানা লোকে।

কিন্তু এক একজন মানুষ আসে তাদের কীর্তি মুছেও মোছে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন প্রায়ই তাঁর শিষ্যদের: "ওরে এসেছিস যদি একটা দাগ রেখে যা।" কান্ত কবি—রজনীকান্ত—এমনিই একটা ধন্য দাগ রেখে গেছেন তাঁর গানে, কবিতায়, ছড়ায়, নক্সায়—সর্বোপরি তাঁর ভক্তজীবনের। এ-দাগ রেখে যেতে পারেন কেবল তাঁরাই যাঁদের স্বধর্ম ভক্তি, বা বলা যেতে পারে—যাঁদের ভগবান বরণ ক'রে কাছে ডেকে নিয়েছেন ভক্তের টিকা ললাটে পরিয়ে

রজনীকান্তকে ভক্তেরা ভালোবেসেছিলেন তাঁর ভক্তরূপে। অবশ্য এ ছাড়া তাঁর আরো রূপ ছিল—নীতিবাদী, দেশভক্ত, হাস্যরসিক, ইত্যাদি; সে সব রূপের কথা নিশ্চয়ই আরো অনেকে বলবেন তাঁর শততম জন্মস্মৃতিবার্ষিকী বাসরে। আমি বলতে চাই বিশেষ ক'রে তাঁর এই ভক্তরূপের কথা, যার সঙ্গে আমার প্রেমের পরিচয় হয়েছিল সুদূর শৈশবেই বলব।

খুব স্পষ্ট মনে আছে—আমাদের সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ীতে তাঁর দিনের পর দিন এসে পিতৃদেবের নানা গান ও গল্পগাছা শোনা, তথা আমাদের তাঁর স্বরচিত নানা গান শোনানো। পিতৃদেবকে (দ্বিজেন্দ্রলাল) তিনি "গুরুদেব" বলতেন। বিশেষ ক'রে পিতৃদেবের হাসির গান তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল হাসির গান রচনায়। আরো অনেককেই দিয়েছিল কিন্তু তাঁদের কীর্তি নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে প্রতিভার অভাবে। সদানন্দ রজনীকান্তের গীতিপ্রতিভা ছিল সত্য। অবাল্য তিনি গভীরভাবেই সাহিত্য ও কবিতা ভালোবেসে এসেছিলেন। মাত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসরে তাঁর মৃত্যু হয়। আর কয়েক বৎসর বেঁচে থাকলে তাঁর গীতিপ্রতিভা আরো উজ্জ্বল পরিণতি লাভ করত সন্দেহ নেই। সাহিত্যে কীর্তির ছাপ রেখে যেতে হ'লে কিছুটা সময় লাগে কেননা সুদীর্ঘ সাধনা বিনা শিল্পে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। রজনীকান্ত নানা কারণে—বিশেষ ক'রে অর্থাভাবে পড়ার দরুন—তাঁর সহজাত শক্তিকে আবাদ করতে পারেননি আরো নিখাদ সোনা ফলাতে। কিন্তু তবু দাগ রেখে গেছেন আমাদের সাহিত্যে অল্প বয়সেই। এ-কৃতিত্ব সামান্য নয়। তাঁর কবিতার ভাষা ছন্দ ভঙ্গি আরো শুদ্ধ হ'য়ে উঠতই উঠত যদি তাঁর অকালমৃত্যু না হ'ত। একথা বলছি তাঁর প্রতিভাকে ছোট করতে নয়, তাঁর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার 'পরে জোর দিয়ে তাঁর প্রতিভার স্বকীয়তার গুণগান করতেই। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি মাত্র তিনটি কাব্যগ্রন্থ লিখে প্রকাশ

করেছিলেন: বাণী, কল্যাণী ও অমৃত। এর মধ্যে প্রথম দুটিতেই তাঁর নানামুখী স্বকীয়তার পরিচয় মেলে, প্রতিভারও স্পষ্ট ছাপ পাওয়া যায়—যদিও সে-প্রতিভার আরো নিখুঁৎ বিকাশ হ'তে পারত যদি তিনি আর দশ পনেরো বৎসরও সাহিত্যসাধনা করতে পারতেন ভক্তির মন্ত্রদীক্ষায়। কিন্তু না পারা সত্ত্বেও ভক্ত সাধক তথা সাহিত্যিকদের তিনি অনেক কিছুই দিয়ে গেছেন যা মহনীয়, বরণীয়, উপভোগ্য। রবীন্দ্রনাথ কবি সত্যেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুর পরে তাঁর কীর্তি সম্বন্ধে যে-তর্পণ করেছিলেন সে-তর্পণ কান্ত কবির সম্বন্ধেও উপলক্ষেও অঙ্গীকার করা চলে:

তুমি বঙ্গভারতীর তন্ত্রী 'পরে
একটি অপূর্ব তন্ত্র এনেছিলে পরাবার তরে।
সে-তন্ত্র হয়েছে বাঁধা। আজ হ'তে
বাণীর উৎসবে
তোমার আপন সুর কথনো ধ্বনিবে মন্দ্ররবে,
কখনো মঞ্জুল গুঞ্জরণে।

মনে পড়ে কান্ত কবির উদাত্ত স্তোত্র:

সেথা আমি কি গাহিব গান?
যেথা গভীর ওঙ্কারে সাম-ঝঙ্কারে কাঁপিত
দূর বিমান।...*
আর কি ভারতে আছে সে-যন্ত্র,
আর কি আছে সে-মোহন মন্ত্র,
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ,
আর কি আছে সে প্রাণ?

মানুষ কোনো সৃষ্টিই করতে পারে না, যার সুরে তার প্রাণের তন্ত্রী সাড়া না দেয়। কান্ত কবির ছিল সরল, মহৎ প্রাণ। স্বভাবে ছিলেন তিনি উদার, নম্র, শ্রদ্ধাবান্, ভক্তিমান্। তাঁর নানা গানের নানা চরণেই ঝংকৃত হ'য়ে উঠেছে তাঁর এই মধুর স্বভাব, অটল বিশ্বাস, উজ্জ্বল আদর্শবাদ—যেমন এই গানটিতে ঝংকৃত হয়ে উঠেছে।

সুন্দরের ভক্ত ছিলেন তিনি মনে প্রাণে, তাই এমন মধুর "গুঞ্জরণ" তাঁর গানে শুনতে পাই—এ গানটি তিনি যে কী সুন্দর গাইতেন—আজো কানে বাজে:

তব চরণনিম্নে উৎসবময়ী শ্যাম ধরণী সরসা
ঊর্ধ্বে চাহ, অগণিত-মণি-রঞ্জিত-নভো-
নীলাঞ্চলা
সৌম্য মধুর দিব্যাঙ্গনা, শান্ত-কুশল-দরশা।
দূরে হের চন্দ্রকিরণ-উদ্ভাসিত গঙ্গা
নৃত্য-পুলক-গীতিমুখর-কলুষহর-তরঙ্গা;
ধায় মত্ত হরষে সাগরপদপরশে.
কূলে কূলে করি' পরিবেশন মঙ্গলময় বরষা।
ফিরে দিশি দিশি মলয় মন্দ, কুসুমগন্ধ বহিয়া,
আর্যগরিমা-কীর্তিকাহিনী মুগ্ধ জগতে কহিয়া,
হাসিছে দিগ্‌বালিকা কণ্ঠে বিজয়মালিকা
নবজীবন-পুষ্পবৃষ্টি করিছে পুণ্য-হরষা।

আধুনিক ছান্দসিকেরা এ-গানটিতে ছন্দপতন হয়েছে বলবেন হয়ত, কারণ তাঁরা সংস্কৃত গুরুস্বরের উদাত্ত ধ্বনি প্রায়ই যথাযথ পড়তে পারেন না। কিন্তু রজনীকান্ত যখন এ-গানটি গাইতেন তখন শ্যা, চা, নী, দূ, হে, স্তা, গী, ধা, সা, বে, হা, বা এবং মা টেনে দুমাত্রা ধ'রে সুরে এমন সুন্দর ফুটিয়ে তুলতেন যে, কান মন উভয়ই মুগ্ধ হ'ত। এ-মুক্ত দল-গুলিকে একমাত্রা ধরলে সুর কিছুতেই সেভাবে ছাড়া পেতে পারত না যেভাবে এখানে পেয়েছে—তাছাড়া ছন্দপতন তো হ'তই। এ-বৈয়াকরণিক প্রসঙ্গ তুললাম—সংস্কৃত গুরুস্বরের তিনি অনুরাগী ছিলেন ব'লেই তার সুপ্রয়োগ করতে পেরেছিলেন এই কথাটি পেশ করতে। তাঁর আরো নানা অনবদ্য গানেই এই

* অতুলপ্রসাদও "বিমান" শব্দটিকে ভুল ক'রে আকাশ অর্থে প্রয়োগ করেছিলেন তাঁর একটি গানে—সম্ভবতঃ মিলের খাতিরে।

দ্বিমাত্রিক গুরুস্বরের সুপ্রয়োগ পাই। কিন্তু সে অন্য কথা। কান্ত কবি মাঝে মাঝেই আমাদের বাড়ীতে এসে গাইতেন তাঁর একটি অপূর্ব গান, যা পরে প্রখ্যাত হ'য়ে ওঠে নানা গুণী তথা ভক্তের কণ্ঠে :

তুমি নির্মল করো মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক মোর মোহ-
কালিমা ঘুচায়ে।

এ গানটি শুনে পিতৃদেব এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে আমি তাঁকে শোনাতাম প্রায়ই, আজও গাই মাঝে মাঝেই—এযে বিশুদ্ধ সাধনার গান অনবদ্য বিনতির আত্মনিবেদনে মহিমময় :

পরের অন্তরা আভোগগুলি উপমায় আন্তরিকতায় ছবিখানি হয়ে ফুটে উঠেছে :

লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে,
আমি জানি না কখন ডুবে যাব কোন্ অকূল
গরল পাথারে!
প্রভু বিশ্ববিপদহন্তা তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা
তব শ্রীচরণতলে নিয়ে এসো মোর মত্ত বাসনা
গুছায়ে।

মানুষ যখন প্রলোভনে দোলে পতনের মুখে, তখন যে এমনি আকুল হ'য়েই ডাকে বিশ্ববিপদ-হন্তাকে—পতনের পথ রোধ ক'রে দাঁড়াতে। আর ডাকলে তিনি সাড়াও দেন যদি ডাকার মতো ডাকা যায়—যেমন ডাকতেন কান্ত কবি তাঁর সরল ভক্তির আকুল উচ্ছ্বাসে।

আরো আছে। বলিনি এ সাধনার গান? যখন মানুষ কোনো মতেই তার আত্মাভিমানের হাত থেকে নিষ্কৃতি না পেয়ে দেখে চোখের সামনে আলো কালো হ'য়ে আসছে, বিশ্বাস টলমল ক'রে উঠেছে—"তুমি আর কি ভগবান জিজ্ঞাসায়—তখন অন্তরগহনে এক প্রত্যয় ব'লে ওঠে, আমরা দেখতে চাই না ব'লেই অন্ধভাবে বরণ করি :

আছ অনলে অনিলে চিরনভোনীলে
ভূধরে সলিলে গহনে,
আছ বিটপিলতায় জলদের গায়
শশিতারকায় তপনে।
আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া ব'সে আঁধারে,
মরি যে কাঁদিয়া,
আমি দেখি নাই কিছু বুঝি নাই কিছু
দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।

এ-গানটি শুধু আমার নয়, বহু সাধকেরই অতি প্রিয় গান। এর মধ্যে যে রয়েছে একটি গভীর ইঙ্গিত—পরম প্রাপ্তির। যখন সংশয়ে মন আঁধার হ'য়ে এসেছে, কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা চিনতে ভুল হ'য়ে প্রাণ পড়েছে অকূল পাথারে তখন সংশয়ী মানুষ ডাকবে কাকে? না, তাঁকেই যিনি সর্বত্র আছেন ও আমাদের ডাকছেন তাঁর চরণচ্ছায়ায়, কিন্তু হায়রে, আমরা যে আমাদের অবোধ অভিমানের ঠুলিতে চোখ বেঁধে আছি, তাইতো তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না, বুঝতে পারছি না। তখন একটি মাত্র পথ আছে চোখের ঠুলি খসাবার: আত্মাভিমান জলাঞ্জলি দিয়ে চোখের জলে ঠাকুরকে ডাকা: "আমি দেখি নাই কিছু বুঝি নাই কিছু দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে—মলিন মর্ম মুছায়ে।" শুধু বরণ করা, শরণ চাওয়া—তাহ'লেই চরণ পাওয়া যায়, মোহের পর্দা খ'সে পড়ে, আর অমনি দেখতে পাওয়া যায় :

আছ অনলে অনিলে চিরনভোনীলে
ভূধরে সলিলে গহনে…

এ-গানের কি তুলনা আছে? কান্ত কবি এমন নিখুঁৎ গান বেশি রচনা করেন নি বটে—সবশুদ্ধ দশবারোটি হবে, কিন্তু এই কয়টি গানের সুর ভক্ত প্রাণ ভুলতে পারবে না—নানা পরীক্ষায়ই এদের উদাত্ত মন্দ্ররবে ভরসা পাবে যে, তিনি জীবনে দেখা না দিলেও মরণের পরপারে ঠাঁই

দেবেনই দেবেন। তাই তাঁকে যে সত্যি চায় সে বঞ্চিত হ'তেই পারে না—গীতার ভাষায় ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি :

কেন বঞ্চিত হব চরণে ?
আমি কত আশা ক'রে ব'সে আছি, পাব জীবনে
না হয় মরণে।
আহা তাই যদি নাহি হবে গো
পাতকি-তারণ-তরীতে তাপিত আতুরে না তুলে
লবে গো,
হ'য়ে পথের ধুলায় অন্ধ এসে দেখিব কি খেয়া
বন্ধ ?
তবে পারে ব'সে "পার করো" ব'লে পাপী কেন
ডাকে দীনশরণে ?

কী মধুর ! প্রাণ জুড়িয়ে যায়। এরই তো নাম আকুল জিজ্ঞাসা, পরম আত্মনিবেদন, তাঁর করুণার অঙ্গীকার চোখের জলে। এ-গান কথা গেঁথে গেঁথে লেখা যায় না—অন্তর যখন আঁধারে তাঁর পায়ে মাথা ঠোকে পথ খুঁজে না পেয়ে—তখনই "তিমির-দুয়ার খোলে", তিনি বলেন : প্রশ্নের উত্তর তো প্রশ্নেরই বেদনায় দিয়েছি আমি যখন তুমি বলছ (প্রে—দ্বিমাত্রিক গুরুস্বর) :

আমি শুনেছি হে তৃষাহারী,
তুমি এনে দাও তারে প্রেম-অমৃত
তৃষিত যে চাহে বারি,
তুমি আপনা হইতে হও আপনার,
যার কেহ নাই তুমি আছ তার—
একি সব মিছে কথা ? ভাবিতে যে ব্যথা
বড় বাজে প্রভু মরমে।

"বাজে"—কেন না শূন্যবাদী কুতার্কিক সংশয় স্বভাব-আস্তিকের কানে কানে নানা কুযুক্তি দিয়ে তাকে নাস্তিক্যে দীক্ষা দিতে চেষ্টা করে। তাই সংশয় হ'য়ে দাঁড়ালো আসুরিক বৃত্তির প্রধান অমাত্য। সে বলে মুচকে হেসে : "কেন মিথ্যে নাস্তি-র কাছে হাতজোড় করছ ভাই ? যা হবার নয় তা কি কখনো হয় ? ভগবানের করুণা যদি থাকত তাহ'লে কি যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ মানুষ এত দুঃখ পেত ? তিনি যদি সত্যি 'তৃষাহারী' হ'তেন তাহ'লে কি কোটি কোটি অসহায় দুর্ভাগা অমৃততৃষ্ণা জপ ক'রে পেত বড় জোর এক আধ বিন্দু জল—যাতে তৃষ্ণা মেটে না ? 'দীনশরণ' যদি থাকতেন তো এত নিঃস্বের কি বারবারই অনাহারে মরা হ'ত ?"...ইত্যাদি। কিন্তু অন্যদিকে অন্তরাত্মার মাঝে বন্দী দেবতা বলেন : "তাঁর লীলা আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধির কাছে দুর্বোধ্য। কিন্তু তবু আমি জানি যে বিশ্বাসকে বরণ করলে আমার তৃষ্ণা তিনি মিটিয়ে দেবেনই দেবেন, শরণ চাইলে তিনি দীনশরণ হ'য়ে দীনের কাছে ধরা দেবেনই দেবেন।" ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথাই বলেছিলেন হৃদয়কে : "ওরে হৃদয়, যার কেউ নেই, সেই ভাগ্যবান্, কারণ তিনি তারই।")

এই গানটির বরেণ্য প্রেরণায়ই একদা আমি আলো পেয়েছিলাম, তাই দেখতে পেয়েছিলাম যে আমি সুধা চাই তিনি সুধার ক্ষুধা হ'য়ে আমার অন্তরে নিজেকে জানান দিচ্ছেন ব'লেই, লিখেছিলাম গভীর আনন্দে যে তাঁর বাঁশি

গায় সে : যে অকূল পাথারে ঝাঁপ দেয়
স্মরি' কাণ্ডারী
না জেনেও জানে সে আঁধারে : "সুধাও ক্ষুধার
অভিসারী"।

তারপর এই শাশ্বত সত্যটিকে আরো ফলিয়ে তুলতে চেয়ে আনন্দঝংকৃত বিরহবেদনার প্রশ্নের মধ্যে দিয়েই (কান্ত কবির মতন) পেয়েছিলাম সেই পরম কারুণিক চিরসাথীর উত্তর সাড়ার আরো স্পষ্ট অঙ্গীকার :

তোমার পানে কি শুধু আমরাই ধাই পথহারা
পান্থ,

চঞ্চল উদ্‌ভ্রান্ত ?
তুমিও কি ভালোবাসো না ?
নিতি বিছায়ে স্নিগ্ধ ছায়াখানি তব তুমিও কি
কাছে আসো না—
যবে আমরা আতপ-ক্লান্ত ?
তুমি যদি উদাসীন,
তবে বাহুবন্ধনে বেঁধে করো কোন্ প্রেমলীলা
প্রেমহীন—
ওগো নিঠুর যুগযুগান্ত ?
কত অতৃপ্ত বাসনা,
কত সোনার-হরিণ-মরীচিকা, কত মরুবুকে
তৃষাদাহনা
হয় পরশে তোমার শান্ত !
নদী হবে ধায় উছলি',
তার বাজে না কি বুকে যুগে যুগে তব সিন্ধুর
নীলমুরলী,
ওগো সুন্দর, নীলকান্ত ?
মিছে কাজে রেখে জড়ায়ে
কেন করো এ-ছলনা বন্ধু, বলো না মায়ার
খেলায় ভুলায়ে ?
নয় বিরহ কি মিলনান্ত ?

প্রাণে অধীর প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে গানে গভীর সাড়ার ইঙ্গিত দেওয়া—এ-ভঙ্গি ভক্তিসাধকদের কাব্যে প্রায়ই পাওয়া যায়। কান্ত কবিরও নানা কবিতায় আছে। একটি গান বড় মর্মস্পর্শী, গাইতে গাইতে মন ভ'রে যায়, আভাস মেলে এক অপরূপ নিশ্চিন্তির, মনে হয়—প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই যেন ভরসার বান ডেকে যাচ্ছে সংশয়মরুকে নিশ্চিহ্ন ক'রে। পরাভক্তির এ একটি বড় মধুর আত্মপ্রকাশের ভঙ্গি। কান্ত কবি যখন গাইতেন, তাঁর চোখে জল ভ'রে উঠত, কণ্ঠে বেজে উঠত এক গভীর স্পন্দন পরম নৈশ্চিন্ত্যের :

যদি মরমে লুকায়ে রবে, হৃদয় শুকায়ে যাবে
কেন প্রাণভরা আশা দিলে গো ?
তব চরণশরণ তরে এত ব্যাকুলতাভরে
কেন ধাই যদি নাহি মিলে গো ?
পাপী তাপী কেন সবে তোমারে ডাকিয়া কবে
মনোব্যথা তুমি না শুনিলে গো ?
যদি মধুর সান্ত্বনাভরে, তুমি না মুছাবে করে
কেন ভাসি নয়নসলিলে গো ?
আনন্দে অনন্ত প্রাণ করিছে বন্দনা-গান
অবিশ্রান্ত অনন্ত নিখিলে গো।
সকলি কি অর্থহীন ! শূন্য শূন্যে হবে লীন ?
তবে কেন সে-গীতি সৃজিলে গো ?
এতই আবেগ প্রভু, ব্যর্থ কি হইবে কভু
একান্ত ও-চরণে সঁপিলে গো ?
যদি, পাতকী না পায় গতি, কেন, ত্রিভুবনপতি,
পতিতপাবন নাম নিলে গো ?

প্রতি যুগেই একটা না একটা স্রোত আসে, যাকে বলা যায় নতুন সৃষ্টি। পুরাতনের মধ্যেকার নিত্য সুর এ নব-আগমনীর সুরে ঢাকা পড়ে না, কিন্তু নতুন ভঙ্গির অভ্যাগমে এক অভিনব স্বাদ মেলে দেশকাল পাত্র ভেদে। একই ঋতু বার বার আসে বটে, কিন্তু তবু আসে প্রতিবারই নব নব ছন্দে। ভক্তিসাধনার নানা ঋতুর পর্যাবর্তন সম্বন্ধেও এই কথা। ভক্ত সব দেশেই আবহমানকাল চেয়ে এসেছেন ভগবানের সান্নিধ্যের আদরের সাড়া, কিন্তু তার আকুল প্রাণের ডাক নিজেকে জানান দিয়েছে প্রতি যুগেই এমন একটা নতুন মিড়ে, যে-মিড় তার পূর্বসূরীদের ভক্তিকীর্তনে বাজে নি। বেদে একেই বলেছে ভগবানের একাধারে "সনাতন তথা পুনর্নব" রূপ। তাই তাঁর লীলা চির-পরিচিত হ'য়ে থাকে নিত্যনূতন। হাফেজের একটি গজলে আছে (গজল উভধর্মী—মানব-প্রণয়ী ও দেবসুন্দর দুই বন্ধুকেই সম্ভাষণ করতেন পারসিক ভক্তেরা) :

মুৎরিবে খুষনভা বেগু তাজাবতাজা নওবনও।
বাদরে দিলকুষা বেজু তাজাবতাজা নওবনও।

আমার "সাঙ্গীতিকী"-তে আমি এর অনুবাদ করেছিলাম :

তোমার কলকণ্ঠে গুণী, যেন শুনি নিতুই নব গান।
ঢালো তোমার নিতুই নব রঙিন সুধা,
উছল করো প্রাণ।

ভক্তও ভগবানকে এই ভাবেই ডাকেন নিতুই নব রঙিন ডাকে তাঁর কাছ থেকেও নিতুই নব রঙিন সাড়া পেতে। এ যে না হ'য়েই পারে না। শ্রীঅরবিন্দ আমাকে একবার লিখেছিলেন : "মানুষ যে ভগবানকে চায় সেটা হ'ল ভগবানের মানুষকে চাওয়ার সাড়া।" উপনিষদেও এই কথাই আছে : যা এখানে—তাই সেখানে। মানুষ কি কোনদিনও নিত্যনব সৃষ্টির এই মহাব্রত অঙ্গীকার করতে পারত—যদি ভগবান্ নিজে সে ব্রত উদ্‌যাপনের ভার না নিতেন তাঁর করুণার ধূপ দীপ ফুল সুর রং রেখা ছন্দ জুগিয়ে? কান্ত কবির ভক্তিসঙ্গীতে তাই পদে পদেই পাই এযুগের নানা স্বকীয় আত্মপ্রকাশের ভঙ্গিমা পুরাতনের মর্যাদা রেখেও নূতন সুরে তালে ছন্দে।

এর মধ্যে একটি সুর—কৃতজ্ঞতা। একটি গানে কান্ত কবি এমন প্রাণকাড়া সুরে গেয়েছেন কৃতজ্ঞতার অঙ্গীকার—যে অঙ্গীকার আমাদের আগের যুগের ভক্তদের গানে ফুটে ওঠে নি এমন নিটোল হ'য়ে। আমরা বার বার পাই কত কী, কিন্তু বার বারই পাওয়ার দাম না দিয়ে তাঁর দানের অমর্যাদা করি। কিন্তু তিনি যে ক্ষমাসুন্দর, তাই বার বারই প্রতিহত হয়েও পিছু নিতে ছাড়েন না। ভাবরূপটি অনবদ্য। যতবারই কান্ত কবির এ-গানটি গাই, মনে জেগে ওঠে ঠাকুরের অহেতুক করুণার কথা, মধুর লাবণ্যরসে নিষিক্ত হ'য়ে মনে কৃতজ্ঞতার সৌরভ ছেয়ে যায় :

আমি অকৃতী অধম ব'লে তো আমায়
কম ক'রে কিছু দাও নি!
পরে যা দিয়েছ তার অযোগ্য ভাবিয়া
কেড়েও তো কিছু নাও নি!
তব আশীষ-কুসুম ধরি' নাই শিরে,
পায়ে দ'লে গেছি চাহি নাই ফিরে,
তবু দয়া ক'রে কেবলি দিয়েছ, প্রতিদান কিছু
চাও নি।

আমি ছুটিয়া বেড়াই না জানি কী আশে,
সুধাপান ক'রে মরি যে পিয়াসে,
তবু যাহা চাই সকলি পেয়েছি তুমি তো কিছুই
পাও নি।

আমায় রাখিতে চাও গো, বাঁধনে আঁটিয়া,
শতবার যাই বাঁধন কাটিয়া,
ভাবি ছেড়ে গেছ, ফিরে চেয়ে দেখি—
এক পাও ছেড়ে যাও নি।

এই কৃতজ্ঞতা কান্ত কবির ভক্তচরিত্রের একটি বাদী সুর ছিল বললেও অত্যুক্তি হবে না। কত গানে ও কবিতায়ই যে তাঁর সরল অথচ তেজস্বী হৃদয়ের এই সজল অথচ সবল কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠেছে :

আমি তো তোমারে চাহি নি জীবনে
তুমি অভাগারে চেয়েছ।
আমি না ডাকিতে হৃদয়মাঝারে নিজে এসে
দেখা দিয়েছ।
চির-আদরের বিনিময়ে সখা, চির-অবহেলা
পেয়েছ
(আমি) দূরে ছুটে যেতে দুহাত পসারি'
টেনে কোলে তুলে নিয়েছ।
"ওপথে যেও না, ফিরে এস" ব'লে কানে কানে
কত কয়েছ!
(আমি) তবু চ'লে গেছি, ফিরায়ে আনিতে
পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ।

(এই) চির-অপরাধী পাতকীর বোঝা
হাসিমুখে তুমি বয়েছ।
(আমার) নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে
বুকে ক'রে নিয়ে রয়েছ।

কী সুন্দর সরলতা! অথচ এ-সরলতা অজ্ঞান নয়, পূর্ণ সচেতন। আমি না চেয়ে পেয়েছি—তার দাম দিই নি ব'লে অপরাধী হয়ে যেন আরো গভীর বেদনায় দাম দিতে শিখেছি তোমার অপার করুণায়। মানুষ ঘা খেলে মান করে, রাগ করে, অনুযোগ করে। কান্ত কবিও করতেন নিশ্চয়ই—কিন্তু প্রথমটায়, যখন তিনি সংসারী মানুষ। তার পরই সচেতন হ'তেন সাধকের জাগৃতিতে—অমনি তাঁর ভক্তি এসে নামঞ্জুর ক'রে দিত সব খেদ ক্ষোভ অনুযোগ অভিযোগ, তিনি গেয়ে উঠতেন পরম অনুতাপে—গভীর অঙ্গীকারে:

ওমা, কোন্ ছেলে তোর আমার মতন কাটায়
জীবন ছেলেখেলায়?
খেলায় বিভোর হ'য়ে কে আর পরশরতন
হারায় হেলায়?
আমার মতন কে অবাধ্য?
যার সংশোধন মা তোর অসাধ্য—
তুই "আয়" ব'লে যাস কোলে নিতে "দূর হ"
ব'লে ঠেলে পালায়!
তোর বুকের দুধ যে খেয়ে বাঁচি,
আমি কেমন ক'রে ভুলে আছি
আমি এমন তো ছিলাম না আগে
(বড়) সরল ছিলাম ছেলেবেলায়।

এ-গানটির সঙ্গে আমার নিজের ভক্তিসাধনার নানা স্মৃতি জড়িত। তাই বলি—অবান্তর হবে না যখন।

ছেলেবেলায় কে না সরল থাকে? সংসারের নানা পাকে প'ড়ে নানা আশা চূর্ণ হবার আগে, নানা স্বপ্ন ভঙ্গ হওয়ার আগে, বিশ্বাস ক'রে বার বার প্রবঞ্চিত হয়ে দুঃখ পাওয়ার আগে, বিশেষ ক'রে নিয়তির নানা অপ্রত্যাশিত নিষ্করুণতার চাপে দিশাহারা হ'য়ে খানিকটা "সিনিক" মতন হ'য়ে দাঁড়াবার আগে মানুষ সরলই থাকে। কিন্তু তবু দেখা যায় নানা মহৎ মানুষ বহু ঘা খেয়েও তাঁদের সরলতা হারান না। পিতৃদেব দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন এই জাতের মানুষ। (তাই হয়ত কান্ত কবির সঙ্গে তাঁর গভীর স্নেহবন্ধন গ'ড়ে উঠেছিল, তিনি তাঁকে গুরুদেব সম্বোধন করতেনও ঐ একই কারণে—ভক্তির ক্ষেত্রে উভয়েই ছিলেন সমানধর্মী ব'লে।) আরো কয়েকজনকে দেখেছি—যদিও বেশি নয়—যাঁরা মনে ধীর প্রবীণ হ'য়ে ওঠা সত্ত্বেও প্রাণে চির-নবীন সরল ভক্তি বজায় রাখতে পেরেছেন। কিন্তু এঁদের মধ্যেও রজনীকান্ত ছিলেন দেখবার মতো সরল। শ একবার আইনষ্টাইনের অভ্যর্থনাসভায় বলেছিলেন: "There are great men who are great among small men. There are great men who are great among great men, and that is the sort of man we are honouring tonight.* কান্ত কবির এ-গানটি গাইতে গাইতে আমার মনে হ'ত বারবারই যে, কান্ত কবি শুধু যে অভক্তদের মধ্যেও ভক্ত ব'লে চিহ্নিত হ'তে পারতেন তাই নয়, ভক্তদের মধ্যেও বিশিষ্ট ভক্ত, সরলদের মধ্যেও বরেণ্য সরল ব'লে গণ্য হবার দাবি করতে পারতেন। হাসপাতালে ক্যান্সারে রুদ্ধবাক্ হ'য়ে ১৩১৭ সালে তিনি গভীর রাতে একটি গান লিখেছিলেন—উদ্ধৃত করি একথার ভাষ্যরূপে:

---

* Thirty Years With G. B. S. by Blanche Patch (Chapter The Mystic.)

কত বন্ধু, কত মিত্র, হিতাকাঙ্ক্ষী শত শত
পাঠায়ে দিতেছ হরি মোর কুটীরে নিয়ত।
মোর দশা দেখি তারা
ফেলিয়াছে অশ্রুধারা
(তারা) যত মোরে বড় করে
আমি তত হই নত।
(তারা) একান্ত তোমার পায়
এজীবন ভিক্ষা চায়,
বলে "প্রভু ভালো ক'রে দাও তীব্র গলক্ষত।"
শুনিয়া আমার হরি,
চক্ষু আসে জলে ভরি',
কত রূপে দয়া তব হেরিতেছি অবিরত!
তুমি জানো অন্তর্যামী,
কত যে মলিন আমি,
রাখো ভালো, মারো ভালো চরণে শরণাগত।

এ তো শুধু গান নয়—এ যে সাধনা, ভক্তি-সাধনা, শরণাগতির মন্ত্রদীক্ষা! অনবদ্য ছন্দে ভগবানের স্তব লিখতে পারেন এমন কবি দেখা যায় (যদিও খুব বেশি নয়) কিন্তু সরলতা ও ভক্তি এ দুয়ের মণিকাঞ্চন যোগ না হ'লে তীব্র যন্ত্রণায়ও মন মুখ এক ক'রে এমন প্রার্থনার সুর বেজে উঠতে পারে না (বাণী) :

সম্পদের কোলে বসাইয়ে হরি
সুখ দিয়ে এ-পরীক্ষে!
(আমি) সুখের মাঝে তোমায় ভুলে থাকি,
(অমনি) দুখ দিয়ে দাও শিক্ষে।

তাই মনে হ'ত আমার বারবারই তাঁর নানা ভক্তি-উচ্ছল গান গাইতে গাইতে যে, কান্ত কবি শেষ দিন পর্যন্ত ছিলেন সরল। পেশায় উকীল হ'লেও নেশা ছিল তাঁর গান যার শেষ লক্ষ্য ছিল সরল একমুখী ভক্তি। তাই সংসারে এসেও তিনি শেষ পর্যন্ত র'য়ে গিয়েছিলেন অসংসারী, সমাজে থেকেও ভক্ত, সুখের কোলে মানুষ হ'য়েও চিরবৈরাগী। নৈলে কি তিনি বাঁধতে পারতেন এমন ঐকান্তিক অমৃততৃষ্ণার গান :

কবে তৃষিত এ-মরু ছাড়িয়া যাইব
তোমারি রসাল নন্দনে?
কবে তাপিত এ-চিত করিব শীতল
তোমারি করুণা-চন্দনে?
কবে তোমাতে হয়ে যাব আমার আমি হারা?
তোমারি নাম নিতে নয়নে ব'বে ধারা?
এ-দেহ শিহরিবে, ব্যাকুল হবে প্রাণ
বিপুল পুলক-স্পন্দনে?
কবে ভবের সুখ দুখ চরণে দলিয়া,
যাত্রা করিব গো শ্রীহরি বলিয়া,
চরণ চলিবে না, হৃদয় গলিবে না
কাহারো আকুল ক্রন্দনে।

যত দিন যায় ততই তাঁর মন বৈরাগ্যকেই বরণ করে, কিন্তু সে নির্ভেজাল বৈরাগ্য—শুধু সংসারে বিতৃষ্ণা নয়—সেই সঙ্গে ঈশ্বরে অনুরাগ। (পরমহংসদেব বলতেন এরই নাম সত্যিকার বৈরাগ্য—ঈশ্বরে অনুরাগ না থাকলে সাময়িক বিতৃষ্ণার নাম দিতেন তিনি মর্কট বৈরাগ্য) তাই গেয়েছিলেন :

আমায় পাগল করবি কবে?
(কবে) মা মা বলতে অবিরত ধারে
দুনয়নে ধারা ব'বে?
(আমার) পাগল মনের যত কথা
মা তোরি সঙ্গে হবে
(আমার) প্রাণ রবে তোর চরণতলায়
দেহ রবে ভবে।

কিন্তু বড় আধারের পরীক্ষাও বড়। ভাগবতে ভগবান্ বলিকে বলেছিলেন : "যাকে আমি কৃপা করি তাকে আগে নিঃস্ব করি—ব্রহ্মন্! যমনুগৃহ্ণামি তদ্বিশো বিধুনোম্যহম্।" নইলে কি ভক্তরাজ রামপ্রসাদকেও অভিমান করতে হ'ত :

মায়ের এমনি বিচার বটে, যেজন দিবানিশি
দুর্গা বলে, তার কপালেই বিপদ ঘটে!

কান্ত কবি ছিলেন বিশুদ্ধ ভক্ত। তাই ঠাকুর তাঁকে এমন নিদারুণ পরীক্ষায় ফেললেন —যে-পরীক্ষায় পাস করা চাট্টিখানি কথা নয়। অত্যধিক গান করার ফলে তাঁর কণ্ঠে হ'ল দারুণ ব্যাধি—কর্কটরোগ—ক্যান্সার। আমার পিতৃদেব তাঁকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন। দেখে এসে চোখের জল ফেলেছিলেন, আজও মনে আছে। বলেছিলেন: "ওরে! এ-ঘোর কলিতেও ভক্ত জন্মায় রে জন্মায়!—দেখে এলাম যা দেখবার মতো, যা কালেভদ্রে চোখে পড়ে: ঐ দারুণ রোগ কিন্তু মুখে কী নির্মল হাসি রে! কথা বলার শক্তি নেই, কিন্তু প্রণাম করল আমাকে তেমনিই প্রসন্ন মুখে! করুণা যার কাছে সত্য নয় সে এ পারে না রে, পারে না।"

এই ধরনের উচ্ছ্বাস সত্যিই প্রকাশ করেছিলেন পিতৃদেব। বলেছি, কান্ত কবি তাঁকে "গুরুদেব" সম্বোধন করতেন। শিষ্যকে মৃত্যুশয্যায় দেখে এসে পিতৃদেব বলেছিলেন: "এমন ভক্তের গুরু হওয়াও ভাগ্যের কথা রে!"

কে অস্বীকার করবে? যে-গুণী অসহ্য যন্ত্রণায় নির্বাক্ হ'য়েও গান বাঁধে:

আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছে
গর্ব করিতে দূর…
যত বাধা ছিল সবারে দয়াল
করেছে দীন আতুর।

জীবনের পথচলায় শোকে তাপে দুঃখে সুখে নানা ওঠাপড়ার মধ্যে ভক্তির সুর থেকে থেকে বেজে ওঠে অনেকেরই প্রাণে—কিন্তু ভক্তিকে সত্যি সাধনা হিসেবে নিতে পারে কজন? কজনের গানে জগন্মাতার ডাক বেজে ওঠে এমন প্রাণকাড়া সুরে:

কোলের ছেলে, ধুলো ঝেড়ে, টেনে নে কোলে
ফেলিস নে মা, ধুলো কাদা মেখেছি ব'লে।
সারা দিনটা ক'রে খেলা, ফিরেছি মা
সাঁঝের বেলা,
(তখন) মনে হ'ল মায়ের কথা নয়নের জলে।

এ-পারা সহজ পারা নয়। গড়পড়তা মানুষও ভগবানকে চায়। স্কটের অবিস্মরণীয় কবিতাটিকে একটু বদলে লেখা যায়:

Breathes there the man
with soul so dead
Who never to himself hath said:
The Lord's my Home,
my Native land?

না, প্রতি হৃদয়েই ঠাকুর আছেন—তাঁকে হাজার চেপে রাখলেও তাঁর প্রেম অনির্বাণ স্ফুলিঙ্গের মতো থেকে থেকে ঝিকমিকিয়ে ওঠেই ওঠে, মন না ভেবেই পারে না (কান্ত কবির সুরে): "আমি জানি তুমি আমারি দেবতা, তাই আমি হৃদে বরি হে।" মানি। কিন্তু সাধারণতঃ এ-বরণ পূর্ণ বরণ নয়। কারণ সাধারণতঃ মানুষ "দেবতা"-কে চায় আর পাঁচটার সঙ্গে জুড়ে তবে। অর্থাৎ, এ ও তা চাই, তার মধ্যে ভগবানও একটি। এর নাম ভক্তিসাধনা নয়। ভক্তিকে বহুলালন করলে তবেই হৃদয়ের অতলে অনাদৃত প্রেমের স্ফুলিঙ্গ গনগনে আগুন হয়ে উঠে অহংকে পুড়িয়ে ফেলতে পারে, আর তখনই কেবল মানুষ বলতে পারে: "আমি দেখি বা না দেখি বুঝি বা না বুঝি—সতত শিয়রে জাগো" (কান্ত কবি—কল্যাণী)।

ভগবানকে এই যে চাওয়ার মতো চাওয়া—আর পাঁচটার মধ্যে নয়, সব বজায় রেখে নয়, সব ছেড়ে, সব ছাপিয়ে—কি না শুধু তাঁকে চাওয়া নয়—আর কিছুই না চাওয়া—এরই নাম ভক্তিসাধনা। এই সাধনাকেই বরণ করেছিলেন কান্ত কবি—যে-ভক্তির কথা বলেছিলেন নারায়ণকে সমুদ্রে মজ্জমান প্রহ্লাদ (কান্তকবির আসন্ন মৃত্যুলগ্নে বাঁধা গানের সঙ্গে এ-প্রার্থনার আদল আছে):

ধর্মার্থকামৈঃ কিং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
সমস্তজগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিরা ত্বয়ি॥
ধর্ম-অর্থ-কাম-সিদ্ধি-বর নাথ সে কি চায়
মুক্তি চির-আজ্ঞাধীন তার,
নিখিল বিশ্বের নিত্যনিধান তোমার পায়
বিরাজে অচলা ভক্তি যার?

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ও আমাদের ভবিষ্যৎ

ডক্টর শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

সভ্যতার একটি ধর্মই হল এগিয়ে চলা। বিজ্ঞানের ধর্মও ঠিক তাই। তাই আজ সভ্যতার সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্বন্ধটা এমন অঙ্গাঙ্গী। আজ এদের একেকে বাদ দিয়ে অপরের অস্তিত্ব কল্পনা করা চলে না। আগে চলতো। বিজ্ঞান যখন শৈশবে এবং সভ্যতা যখন অপরিণত অবস্থায়, তখন চলত। তখন বিজ্ঞানবুদ্ধিকে আশ্রয় না করেও মানুষ শুধুমাত্র দৈহিক শক্তির সাহায্যে বেঁচে থাকার জন্যে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করত। কিন্তু যেদিন মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখল, সেদিন থেকেই নতুন যুগের সূত্রপাত। সেদিনই বিজ্ঞানের সঙ্গে সভ্যতার গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেল। আজ হাজার চেষ্টাতেও সে বাঁধনকে আলগা করার উপায় নেই। তাই আজ সভ্যতা সম্বন্ধে কিছু ভাবতে গেলে বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে ভাবতে হবে, আলাদা করে নয়।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা চলছে এখন। সভ্যতাও কি তবে ওই পথে? তাই যদি হয় তো আর ভাবনা কি! আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তোলার আবশ্যকতাই বা কোথায়? নিশ্চিন্ত হয়ে তবে আমরা ভাবতে পারি, বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সভ্যতাও জয়-যাত্রার পথে এগিয়ে চলেছে; আমাদের ভবিষ্যৎ আশাপূর্ণ ও আনন্দময়। কিন্তু সত্যই কি তাই?

বিজ্ঞান-জগতের হাল-চাল অনুসন্ধান করে এ জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজা যাক। তবে গোড়াতেই বলে রাখি, 'আমাদের ভবিষ্যৎ' বলতে এখানে শুধুমাত্র আমাদের কথা বলছি না। বলছি, পৃথিবীর সকল মানুষের কথা। আর ভবিষ্যৎ বলতে শুধু আজকের পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নয়, অনাগত কালের সকলের ভবিষ্যৎ।

তুলনামূলক বিচারের সাহায্য নিলে এই রকম একটা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা সহজ হয়। এখানে তুলনা চলতে পারে অতীত পৃথিবীর সঙ্গে বর্তমান দুনিয়ার। অতীতের দুর্বল মানুষ আজ যে অমিত শক্তির অধিকারী, এর মূলে তো বিজ্ঞান। বিজ্ঞান-বিদ্যার অগ্রগতির ফলেই মানুষ দূরকে নিকট করেছে, অসম্ভবকে সম্ভব করেছে, জীবনকে করেছে সুন্দর। এর চেয়েও বড় কথা, বিজ্ঞানবুদ্ধিরই জয়যাত্রার ফলে মানুষের পরমায়ু তিন গুণ বেড়ে গেছে। আগে যে মানুষের গড় আয়ু ছিল ২০ বছর, এখন তারা গড়ে ৬০ বছর বাঁচে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতি না হলে এমন অত্যাশ্চর্য ব্যাপার সম্ভব হোত না! আর শুধু কি তাই! সেকালের তুলনায় জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে আজকের মানুষের ধারণাও কত ব্যাপক ও সুস্পষ্ট। বিজ্ঞানের সাহায্যেই দূরের নক্ষত্রলোকের খবর পেয়েছে মানুষ, গ্রহলোক সম্বন্ধে আহরণ করেছে নূতন তথ্য। এজন্যে পদার্থ- ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের কাছে আমরা ঋণী। এ ছাড়া পারমাণবিক জগৎ সম্বন্ধে আরও কত খবর সংগ্রহ করেছি আমরা। বিজ্ঞান-শক্তির সাহায্যে অজানার রুদ্ধ-দুয়ার উন্মুক্ত করে নিত্য নূতন জ্ঞানলাভ করেছি। বিজ্ঞানের আলোকোজ্জ্বল রাজপুরীতে বসে আজ আমরা অনেক সময় ভুলে যাই, আমাদের পূর্বপুরুষরা হিংস্র জন্তুর কবল থেকে

আত্মরক্ষার জন্যে অন্ধকার গুহায় রাতের পর রাত কাটিয়েছে, সামান্য একটু খাদ্যের অন্বেষণে বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেরিয়েছে দিনের পর দিন।

তবে তো দেখছি, বিজ্ঞানবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সভ্যতাও জয়যাত্রার পথে এগিয়েছে। অতীতের সঙ্গে বর্তমান পৃথিবীর তুলনা করলে সভ্যতার এই অগ্রগতি সম্বন্ধে কোনোরূপ সংশয় থাকে না। আর অসংখ্য বিজ্ঞানীর অক্লান্ত সাধনার কথা স্মরণ করলে আপনা থেকেই আমাদের মাথা নত হয়ে আসে। ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থসিদ্ধির তাগিদে নয়, শুধুমাত্র সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে বিজ্ঞানীরা যুগ যুগ ধরে সে অপরিসীম লাঞ্ছনা ও সুদুঃসহ অত্যাচার সহ্য করেছেন, সভ্যতার ইতিহাসে তার তুলনা নেই। সত্য কথা বলেছিলেন বলে ব্রুনোকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, ল্যাভয়সিয়ঁকে হত্যা করা হয়েছিল গিলোটিনে। হেমলক বিষ খাইয়ে সক্রেটিসকে হত্যা করার কথা সকলেই জানেন। আর জানেন গ্যালিলিওকে কারারুদ্ধ করে রাখার কথা। ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের দিকে আপনভোলা ওই মানুষগুলোর কোনো খেয়ালই নেই। প্যাভলভ নিজে না খেয়ে গবেষণার জিনিসপত্র কিনতেন। নিউটনের খাবার প্রায় দিনই যেত কুকুর ডায়মণ্ডের পেটে। আর্কিমিডিস সমুদ্রের তীরে বসে অঙ্ক নিয়ে এত তন্ময় ছিলেন যে বিপক্ষদলের সেনাপতির প্রতি সম্মান না দেখালে যে বিপদ ঘটতে পারে, সেদিকে তাঁর হুঁসই ছিল না। এজন্যে মূল্য দিতে হয়েছিল তাঁকে। সেনাপতির নির্দেশে তাঁর দেহ ঐখানেই দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল।

তাহলে দেখছি, বিজ্ঞানীরা সত্য-প্রতিষ্ঠার জন্যে সাধনা করেছেন; এমন কি জীবন পর্যন্ত দিয়েছেন। যে প্রচেষ্টার মূলে এমন আত্মত্যাগ নিহিত, তা কখনও মানুষের অকল্যাণ ডেকে আনতে পারে না। কথাটা মেনে নিতে পারলে সুখী হতুম; কিন্তু মানতে যে পারলুম না, এজন্যে বিজ্ঞানবুদ্ধির অপপ্রয়োগই দায়ী, বিজ্ঞানীরা নন। বিজ্ঞানশক্তি যেদিন বিজ্ঞানীর হাত থেকে রাষ্ট্রের অধিকারে এল, সেদিন থেকেই ঘটল সর্বনাশ। প্রাচীন গ্রীসে সর্বনাশ ঘটেছিল; সর্বনাশ ঘটেছে আধুনিক পৃথিবীতে।

বিজ্ঞানশক্তির পরস্পর-বিরোধী দু'টি চিত্র আজ আমাদের সামনে উন্মুক্ত। একটি চিত্রে আছে কল্যাণ-সাধনার প্রয়াস; অপরটিতে অকল্যাণের ভয়াবহতা। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝা যাক। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের কথা স্মরণ করুন। ঐ একই বছরে বিজ্ঞানরাজ্যে দু'টো পরস্পর-বিরোধী ঘটনা ঘটেছিল। এক দিকে পারমাণবিক বোমা ফাটিয়ে হিরোসিমা ও নাগাসাকির কয়েক লক্ষ লোককে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়া হল; অপরদিকে মৃত্যুপথ-যাত্রীদের বাঁচাবার জন্যে পেনিসিলিন আবিষ্কার করায় আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিংকে দেওয়া হল নোবেল পুরস্কার। এ থেকে কি বুঝব আমরা? কোন্‌টিকে বিজ্ঞানবিদ্যার স্বরূপ বলে ধরে নেব? এর উত্তর হল, দ্বিতীয়টিকে। পেনিসিলিন মুমূর্ষু মানুষের কাছে নতুন জীবনের বার্তা এনে দিয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানী আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং গড়বার সাধনা করেছেন, ভাঙবার নয়; এবং এ সাধনাই বিজ্ঞানের সত্যিকারের সাধনা, অপরদিকে সেনাপতির যে মূঢ়তার জন্যে আর্কিমিডিস নিহত হয়েছিলেন, ঠিক সেই ধরনের মূঢ়তাই হিরোসিমা ও নাগাসাকির হত্যাকাণ্ডের জন্যে দায়ী। এজন্যে বিজ্ঞানীকে দোষ দিলে আর্কিমিডিসের আত্মত্যাগকে অস্বীকার করতে হয়। নিউটন

ও গ্যালিলিওর মতো সত্যসন্ধানী পরহিত-ব্রতীকে বলতে হয় স্বার্থপর।

কিন্তু তা তো নয়। বরং এ পৃথিবীর মনীষীদের মধ্যে সবচেয়ে কম স্বার্থপর বিজ্ঞানীরা। মাইকেল ফ্যারাডে এমন কথা কোনোদিন বলেন নি যে বিদ্যুৎশক্তিকে শুধুমাত্র আমার নিজের কাজেই লাগাব। বেতার-যন্ত্র নিয়ে নিজেরা ব্যবসা করব, এমন কথাও জগদীশচন্দ্র বসু বা মার্কনী কখনও বলেন নি। রঞ্জেন বলেন নি, এক্স্-রশ্মি শুধুমাত্র আমারই একচেটিয়া সম্পত্তি। বরং উল্টো কথাই তাঁরা বলেছেন; নিজেদের জানা সত্যকে সকলের কল্যাণে প্রয়োগ করতে দিয়েছেন। তাই আমি-আপনিও বৈদ্যুতিক আলো জ্বালাই, রেডিও শুনি, অসুখ হলে পেনিসিলিন নিয়ে থাকি।

এমন কি পেনিসিলিন কী করে তৈরি হয়, তা-ও জানি আমরা। আমরা বেতার-যন্ত্রের গঠন-পদ্ধতি জানি; জানি টীকা-রহস্য। কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্র কী করে তৈরী হয়, তা আমরা জানি নে। আমরা জানি নে, কেমন করে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে শত্রুপক্ষের ঘাঁটিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়। জানি নে বলে দুঃখ নেই কিছু, কিন্তু প্রশ্ন, কেন জানি নে? পেনিসিলিন তৈরির ফরমুলা জানি, আর পরমাণু ভাঙার কৌশল জানি নে কেন? মনে হয়, এই না-জানার মূলে আছে মানুষের চিরন্তন এক দুর্বলতা। মানুষ যখনই শক্তিকে ধ্বংসের কাজে প্রয়োগ করতে চেয়েছে, তখনই আশ্রয় নিয়েছে ছল-চাতুরীর, কপটতার। এই কপটতার দহন ভিতরে ভিতরে তাকে দুর্বল করে দিয়েছে। তখন সে চেয়েছে নিজের অপকৌশলের রহস্যটুকু অপরের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে। বলা বাহুল্য, এ লুকোচুরি বিজ্ঞানবিদ্যার ধর্ম নয়। বিজ্ঞানীর ধর্ম একেবারে আলাদা। নিষ্কাম কল্যাণ-ধর্মে বিশ্বাসী এরা। নিজের জানা সত্যকে সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দিয়ে এদের পরিতুষ্টি। অতএব, অকুণ্ঠিতচিত্তে বলা চলে, পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে আজকের পৃথিবীতে যে কাণ্ড চলেছে, তার সঙ্গে সত্যিকারের বিজ্ঞান-ধর্মের কোনো মিল নেই। তা একান্তই স্বার্থান্বেষী রাষ্ট্রধর্ম-প্রসূত।

এই রাষ্ট্রশক্তি বিজ্ঞানবুদ্ধিকে ক্ষমতা-বিস্তারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে; এবং এরই ফলে পৃথিবীর অগণিত সাধারণ মানুষ আজ আতঙ্কিত ও দিশাহারা। শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের কাছে ভবিষ্যৎ আজ এক বিরাট জিজ্ঞাসারূপে দেখা দিচ্ছে। অনাগত কালের দিকে তাকিয়ে ওরা আজ প্রশ্ন করছে, পৃথিবীর আয়ু কি তবে ফুরিয়ে এল? একেবারে নিশ্চিত ধ্বংসের মধ্যেই কি এতদিনের এত সাধকের সাধনায় গড়া এই সভ্যতার পরিসমাপ্তি? এ যুগের বিজ্ঞানবিদ্যার দ্বিমুখী জয়যাত্রার মধ্য থেকে এর উত্তর খোঁজা যাক। এ যুগের বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি প্রধানতঃ দু'টো দিক দিয়ে সূচিত হচ্ছে,—(১) পারমাণবিক গবেষণার দিক, (২) রকেট-বিজ্ঞানের দিক। পরমাণু ভাঙার মধ্যে যে প্রচণ্ড শক্তির সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা, তাকে কল্যাণের কাজে লাগালে পৃথিবীর চেহারা বদলে যাবে। যান-বাহন, কল-কারখানা সব দিক দিয়েই উন্নতি হবে দ্রুত। কিন্তু যদি সেই শক্তিকে ধ্বংসের কাজে লাগান হয়, তবে সর্বনাশ অবধারিত। শান্তিপ্রিয় মানুষরা তবে গামা-রশ্মির দহনে জ্বলে-পুড়ে মরবে; আর সভ্য-দুনিয়ার ধ্বংস-স্তূপের উপর শক্তিপ্রিয়দের যে বিজয়-নিশান উড়বে, তাকে অভিবাদন জানাতে মুষ্টিমেয় দু'চার জন আহত পঙ্গু ছাড়া আর কেউ উপস্থিত থাকবে না।

পৃথিবীর ওই মুমূর্ষু চেহারার কথা ভেবে আজকের মানুষ আতঙ্কিত।

কিন্তু এই গেল একদিক। বিজ্ঞানের জয়-যাত্রার আর একটি দিকও আছে। দূরকে নিকট করবে বলে, অজানাকে জানবে বলে মানুষের যে সাধনা আদিম যুগে শুরু হয়েছিল, তার সঙ্গে জয়যাত্রার এ পথটির যোগসূত্র আছে। শুধুমাত্র ভূ-লোকের খবর নিয়েই তুষ্ট হল না মানুষ, সে চাইল বিশ্বলোকের খবর নিতে। তাই পরিচিত এই গ্রহলোকে বসে মানুষ স্বপ্ন দেখল অপরিচিত মঙ্গলগ্রহে পাড়ি দেবার। মহাশূন্যে অভিযান চালিয়ে চাঁদকে জয় করার পরিকল্পনা করল। উদ্ভাবিত হতে লাগল নিত্য নূতন ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মিত হল। সেই উপগ্রহ প্রদক্ষিণ করল পৃথিবীকে। গড়া হল অদ্ভুত শক্তিশালী রকেট। সেই রকেট চাঁদে পৌঁছুল; মাত্র কয়েক হাজার মাইল দূরে থেকে মঙ্গলগ্রহের ছবি তুলল। সন্দেহ নেই, এগুলো সব সুসংবাদ। প্রতীক্ষা করে আছি আরও ভাল সংবাদের আশায়। ভাবছি, এমন দিন নিশ্চয় আসবে যখন আরও নিকট থেকে মঙ্গলগ্রহের ছবি উঠবে; এবং তারপর টেলিভিসনের ছবি নিয়ে খুশী থাকতে হবে না আর, মানুষ নিজের হাতে মঙ্গলগ্রহের ছবি তুলবে; নিজে গিয়ে দাঁড়াবে ওই গ্রহের ওপর। এইভাবে একে একে হয়তো অনেক অজানা গ্রহের খবর আমরা পাব। কালক্রমে অনেক অজ্ঞাত লোকে পদচিহ্ন অঙ্কিত হবে মানুষের। কিন্তু প্রশ্ন, এইভাবে বিশ্বজগতের কতটুকু জানা সম্ভব? বিশ্বলোকের কতটা দূর অবধি পাড়ি দিতে পারবে আগামী কালের মানুষ? সূর্য একটি নয়, লক্ষ লক্ষ। গ্রহ কয়েকটি নয়, কোটি কোটি। লক্ষ লক্ষ সূর্যলোক আছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। সেই সব সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে লক্ষ লক্ষ গ্রহ। এমন সূর্যও অনেক আছে, যাদের আলো এখনও এসে পৃথিবীতে পৌঁছয় নি। আলো সেকেণ্ডে চলে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। আমাদের পরিচিত সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছুতে সময় লাগে মাত্র সাড়ে আট মিনিট। অথচ সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব অল্প কিছু নয়, ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। যে সূর্য থেকে এখনও আলো এসে আমাদের কাছে পৌঁছয় নি, পৃথিবী থেকে তার দূরত্বটা একবার কল্পনা করুন। এদিকে রকেটকে যত জোরেই আমরা চালাই না কেন, আলোর চেয়ে বেশি গতিবেগ লাভ করা কোনোদিন কোনো কিছুর পক্ষেই সম্ভব নয়। ধরা যাক, আলোর গতিবেগে রকেট চালালো আগামী দিনের মানুষ। কিন্তু তা হলেও বিশ্বজগৎকে পাড়ি দেওয়া সম্ভব হবে না। ব্রহ্মাণ্ডের অনেক কিছুই চির-রহস্যে আবৃত থেকে যাবে। কেন না, আগেই বলেছি, সবচেয়ে দ্রুতগামী বস্তু আলোর গতিই হচ্ছে সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল; এবং এমন সূর্য বা নক্ষত্র অনেক অছে, যাদের আলো এখনও পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় নি। তাহলে দেখছি, মানুষের ক্ষমতা সীমিত। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পাড়ি দেওয়া মানুষের পক্ষে কোনো-দিনই সম্ভব হবে না। কিন্তু সম্ভব না হলেও বলব, গ্রহান্তরে পাড়ি দেবার প্রচেষ্টা অভি-নন্দনের যোগ্য। সম্ভব তো আরও অনেক কিছুই হবে না। মৃতকে জীবিত করা সম্ভব হবে না; ল্যাবরেটরীতে প্রাণ তৈরী করা সম্ভব হবে না। কিন্তু তাই বলে মানুষ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে কেন!

সুখের কথা, হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকে হার মেনে নেবার প্রবৃত্তি মানুষের জীবন-ধাতুতে নেই। তাই মহাশূন্যের শত বিঘ্ন সত্ত্বেও এরা গ্রহান্তরে পাড়ি দেবার উদ্যোগ-আয়োজন

করছে। এই প্রচেষ্টাকে সেলাম করতেই হবে। অকুণ্ঠিতচিত্তে বলতে হবে, বোমা ফাটিয়ে মারামারি করার চেয়ে রকেট ছুটিয়ে অজানা লোকে পাড়ি দেবার প্রয়াস অনেক ভাল।

কিন্তু প্রশ্ন, আগামী দিনের মানুষ সে সুযোগ পাবে কি? পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে লড়াই ততদিন অবধি কি স্থগিত থাকবে? আর্কিমিডিসের আত্মত্যাগ ও আইনষ্টাইনের সত্য-সাধনা কি ব্যর্থ হবে? যে কারণে সোনা লোহার চেয়ে ভারী, সে কারণেই কি সত্য স্বার্থের উপর জয়ী হবে? যে কারণে বুধ গ্রহের বিসম কক্ষপথের মধ্যেও একটা শৃঙ্খলা বর্তমান আছে, ঠিক সে কারণেই কি অশুভ স্বার্থবুদ্ধির উপর শুভ শুদ্ধবুদ্ধির জয় হবে?

কে তোমারে চায়?

শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী

মায়ার আবর্তে পড়ি অনিত্য এ বিশ্বমাঝে
মুগ্ধ ছলনায়
মোহের কজ্জলে আঁখি মিথ্যারে দেখিছে সত্য
পলে পলে হায়!
কে তোমারে চায়?

দেহসুখ-ধনমান-প্রতিষ্ঠা-সম্ভোগ-নেশা-
তরঙ্গ-দোলায়
মানস-তরণীখানি অবিরাম নেচে ধায়
আশায় আশায়!
কে তোমারে চায়?

দুঃসহ বেদনে কভু নিদ্রিত হৃদয় জাগে
তব করুণায়,
বারেক তোমারে খোঁজে, আবার ফিরিয়া যায়
বাসনা-দোলায়!
কে তোমারে চায়?

তুমি যারে দাও ডাক প্রেমের পাগল সুরে
মন্ত্রিত বীণায়;
ভোগের বাসনা সব তুচ্ছ হয় তার কাছে—
সে তোমারে চায়।

সন্ন্যাস-জীবনে শাস্ত্রচর্চার প্রয়োজনীয়তা

জনৈকা সন্ন্যাসিনী

যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব মনুষ্যজীবনকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিবার জন্য। তাঁহার আগমন মানবজীবনের সকলক্ষেত্রে, সর্বদিকে, সর্বভাবে তাহাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অনুপম ভাষায় নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাই মানব-জীবনের আদর্শ পূর্ণাঙ্গ রূপ—

"নরেন্দ্র খুব ভাল; গাইতে, বাজাতে, পড়াশুনায়, বিদ্যায়; এদিকে জিতেন্দ্রিয়, বিবেক-বৈরাগ্য আছে, সত্যবাদী। নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর, নিরাকারের ঘর, পুরুষের সত্তা। এত ভক্ত আসছে, তার মত একটিও নাই। খুব আধার —কোন কিছুর বশ নয়—আসক্তি, ইন্দ্রিয়সুখের বশ নয়।"

হিরণ্ময় পাত্রে অমৃতরক্ষার ন্যায় জগদ্গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের ন্যায় মনোমত আধার পাইয়া তাহাতে লোককল্যাণরূপ প্রিয়চিকীর্ষা অনুপ্রবিষ্ট করান। সুতরাং মানব-জীবনের চরম আদর্শরূপে সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান।

সন্ন্যাসজীবন সম্বন্ধে শ্রীস্বামীজী কি বলিতেছেন তাহা কিছু আলোচনা করিলে আশাকরি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি বলিতেছেন—" 'ন ধনেন ন চেজ্যয়া ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ। আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—এই হচ্ছে সন্ন্যাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সন্ন্যাস না হলে কেহ কদাচ ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে না—একথা বেদবেদান্ত ঘোষণা কচ্ছে। যারা বলে—এ সংসারও করব, ব্রহ্মজ্ঞও হব তাদের কথা আদপেই শুনবি নি। ওসব প্রচ্ছন্ন-ভোগীদের স্তোকবাক্য। এতটুকু সংসারের ভোগেচ্ছা যার রয়েছে—এতটুকু কামনা যার রয়েছে—এ কঠিন পন্থা ভেবে তার ভয় হয়, তাই আপনাকে প্রবোধ দেবার জন্য বলে বেড়ায়—'একূল ওকূল দুকূল রেখে চলতে হবে।' ও পাগলের কথা উন্মত্তের প্রলাপ—অশাস্ত্রীয়, অবৈদিক মত। ত্যাগ ভিন্ন মুক্তি নাই। ত্যাগ ভিন্ন পরাভক্তি লাভ হয় না। ত্যাগ—ত্যাগ—'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'। গীতাতেও আছে—'কাম্যানং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।'"

"সংসারের ঝঞ্ঝাট ছেড়ে না দিলে কারও মুক্তি হয় না। সংসারাশ্রমে যে রয়েছে, একটা না একটা কামনার দাস হয়েই যে সে ঐরূপে বদ্ধ রয়েছে ইহা উহাতেই প্রমাণ হচ্ছে। নৈলে সংসারে থাকবে কেন? হয় কামিনীর দাস—নয় অর্থের দাস—নয় মান, যশ, বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের দাস। এ দাসত্ব থেকে বেরিয়ে পড়লে তবেই মুক্তির পন্থায় অগ্রসর হতে পারা যায়। যে যতই কেন বলুক না, আমি বুঝেছি, এ সব ছেড়েছুড়ে না দিলে, সন্ন্যাসগ্রহণ না করলে, কিছুতেই জীবের পরিত্রাণ নাই—কিছুতেই ব্রহ্মজ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই।"

মানবজীবনের লক্ষ্য হইতেছে—এই ত্যাগব্রত অবলম্বনে ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া। সন্ন্যাসগ্রহণই পরম পুরুষার্থ। স্বামীজী নিষ্কাম কর্মযোগকেই সন্ন্যাসীর করণীয় বলিয়া বেশী জোর দিয়াছেন। তাই স্বামীজী বলিতেছেন—"সন্ন্যাসীরা কর্মহীন নয়। তারাই হচ্ছে কর্মের fountain-head." "যথার্থ সন্ন্যাসীরা নিজেদের মুক্তি পর্যন্ত উপেক্ষা করেন—জগতের ভাল কত্তেই তাঁদের জন্ম।" "বহুজন-

সুখায়, বহুজনহিতায় সন্ন্যাসীর জন্ম। সন্ন্যাস গ্রহণ করে যারা ideal ভুলে যায়—'বৃথৈব তস্য জীবনম্'। পরের জন্য প্রাণ দিতে, জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ কত্তে, বিধবার অশ্রু মুছাতে, পুত্রবিয়োগবিধুরার প্রাণে শান্তি দান কত্তে, অজ্ঞ ইতরসাধারণকে জীবনসংগ্রামের উপযোগী কত্তে, শাস্ত্র-উপদেশ বিস্তারের দ্বারা সকলের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল কত্তে, জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্মসিংহকে জাগরিত কত্তে জগতে সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে।"

স্বামীজী নিজ জীবনে তথা সংঘজীবনে এই আদর্শ প্রতিফলিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাণী হইতে পুনরায় উদ্ধৃত করিতেছি—"ত্যাগই হচ্ছে আসল কথা—ত্যাগী না হলে কেউ পরের জন্য যোলআনা প্রাণ দিয়ে কাজ করতে পারে না। ত্যাগী সকলকে সমভাবে দেখে—সকলের সেবায় নিযুক্ত হয়। বেদান্তেও পড়েছিস্, সকলকে সমানভাবে দেখতে হবে।...সকলকে এই কথা শোনা—তোমাদের ভিতর অনন্তশক্তি রয়েছে, সে শক্তিকে জাগিয়ে তোল।"

"সন্ন্যাস ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান হতেই পারে না। অন্তর্বহিঃ উভয়প্রকার সন্ন্যাস অবলম্বন করা চাই। 'তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ'—বাহ্যচিহ্ন না করে তপস্যা করলে দুরধিগম্য ব্রহ্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয় না। বৈরাগ্য না এলে, ত্যাগ না এলে, ভোগস্পৃহা ত্যাগ না হলে কি কিছু হবার যো আছে? সর্বদা বিচার করবি—এই দেহ গেহ, জীবজগৎ সকলি নিঃশেষ মিথ্যা স্বপ্নের মত। সর্বদা ভাববি দেহ একটা জড় যন্ত্র মাত্র। এতে যে আত্মারাম পুরুষ রয়েছেন, তিনিই তোর যথার্থ স্বরূপ। মনরূপ উপাধিটাই তাঁর প্রথম ও সূক্ষ্ম আবরণ। তারপর দেহটা তার স্থূল আবরণ রয়েছে। নিষ্কল, নির্বিকার স্বয়ংজ্যোতিঃ সেই পুরুষ এইসব মায়িক আবরণে আচ্ছাদিত থাকায় তুই তোর স্ব-স্বরূপকে জানতে পারছিস্ না। এই রূপরসে ধাবিত মনের গতি অন্তর্দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। মনটাকে মারতে হবে। দেহটা স্থূল—এটা মরে পঞ্চভূতে মিশে যায়। কিন্তু সংস্কারের পুঁটুলি মনটা শীগ্‌গির মরে না। বীজের ন্যায় কিছুকাল থেকে আবার বৃক্ষে পরিণত হয়। আবার স্থূল দেহ ধারণ ক'রে জন্মমৃত্যুপথে গমনাগমন করে। এইরূপ যতক্ষণ না আত্মজ্ঞান হয়। সেজন্য বলি, ধ্যানধারণা ও বিচার বলে মনকে সচ্চিদানন্দসাগরে ডুবিয়ে দে। মনটা মরে গেলেই সব গেল—ব্রহ্মসংস্থ হলি।"

"এই ব্রহ্মজ্ঞ হওয়াই চরম লক্ষ্য, পরম পুরুষার্থ। তবে মানুষ তো আর সর্বদা ব্রহ্মসংস্থ হয়ে থাকতে পারে না। ব্যুত্থানকালে কিছু নিয়ে ত' থাকতে হবে। তখন এমন কর্ম করা উচিত যাতে লোকের শ্রেয়োলাভ হয়। এইজন্য বলি, অভেদবুদ্ধিতে জীবসেবারূপ কর্ম কর। কিন্তু বাবা, কর্মের এমন মারপ্যাঁচ যে মহা মহা সাধুরাও এতে বদ্ধ হয়ে পড়েন। সেইজন্য ফলাকাঙ্ক্ষাহীন হয়ে কর্ম করতে হয়। উদ্দেশ্য ব্রহ্মজ্ঞানলাভ।"

সন্ন্যাসজীবন যাহা মানুষকে চরমতম লক্ষ্যে পৌছাইয়া দেয়, তাহার সম্বন্ধে গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে সন্ন্যাসযোগ অধ্যায়ে বলিতেছেন—

"জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥"

অর্থাৎ যিনি দুঃখ ও দুঃখের সাধনকে দ্বেষ করেন না এবং সুখ ও সুখের সাধনকে আকাঙ্ক্ষা করেন না, সেই রাগদ্বেষাদিশূন্য কর্মযোগীকে নিত্যসন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে। নিত্যসন্ন্যাসীর অর্থ যিনি কর্মে নিরত থাকিয়াও সদা নিষ্কাম ও অনাসক্ত। কারণ হে মহাবাহো, রাগদ্বেষাদি

দ্বন্দ্বহীন ব্যক্তি সংসারবন্ধন হইতে অনায়াসে মুক্ত হন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সন্ন্যাস-জীবন অর্থে—দুঃখকষ্টক্ষোভবাসনাময় জীবন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আনন্দময় হইয়া থাকা। পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করা অথবা সেই উদ্দেশ্যে জীবন অতিবাহিত করা।—"সন্ন্যাসের অর্থ সংক্ষেপে মৃত্যুকে ভালবাসা। আত্মহত্যা নয়—মরণ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া নিজেকে সর্বতোভাবে তিলে তিলে অপরের মঙ্গলের জন্য উৎসর্গ করা। সমগ্র পৃথিবী এক অখণ্ড সত্তা, তুমি এই বিপুল বিশ্বের একটি নগণ্য কণা মাত্র, অতএব নিজের এই ক্ষুদ্র আমিটিকে বাড়াইয়া তুলিবার চেষ্টা না করিয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের সেবায় উহাকে নিয়োজিত কর। গভীর ভাব-প্রবণতার সহিত প্রচণ্ড কর্মতৎপরতার সমন্বয়—প্রকৃত মনুষ্যত্ব, সুদৃঢ় শক্তিমত্তার পাশাপাশি নারীহৃদয়ের কোমলতা।"

জনৈক প্রাচীন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সন্ন্যাসীর মতে—"জীবের আত্মারাম স্বরাট, মুক্ত হইবার উপায়কে বলে সন্ন্যাস। এই শব্দটি অস্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। অস্ ধাতুর অর্থ ক্ষেপণ অর্থাৎ ছুঁড়িয়া ফেলা। সম্ – নি – অস্+ঘঞ্ = সন্ন্যাস। সম্যক্‌রূপে, নিঃশেষে (মন হইতে বাসনা) ছুঁড়িয়া ফেলা। আমরা সাধারণতঃ যাহাকে সন্ন্যাস বলি, তাহা সন্ন্যাস অবস্থা লাভ করিবার একটি গৌণ উপায় মাত্র, যেমন বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিক্ষালাভের একটি গৌণ উপায়। সন্ন্যাস অবস্থালাভের মুখ্য উপায় অনাত্মসংশ্রব সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা। আজকাল নানা কারণে সমাজে সন্ন্যাস সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা থাকায় প্রকৃত সন্ন্যাস সাধন সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছে। দেহমন প্রস্তুত করিয়া, দীর্ঘকাল নিরন্তর চেষ্টা না করিলে সন্ন্যাস মনে ধারণা হওয়াও অসম্ভব। অবিদ্যামায়ার আবরণ উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য শুদ্ধচিন্তা ও শুদ্ধকর্ম অবলম্বন করিতে হইবে। বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞানভক্তি এবং ইহাদের ফলস্বরূপ মুক্তিলাভের বাসনা ব্যতীত অন্যসব বাসনা পরিত্যাগ করিতে হইবে। ঈশ্বরপ্রীতির জন্য জীবনের সকল কাজ নিয়ন্ত্রিত করাই শুদ্ধকর্ম। যে কর্ম করিলে মনে কোনও দ্বিধা বা অশান্তি হয় না—তাহাই শুদ্ধ-কর্ম। শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশমত 'বড় মানুষের বাড়ীর ঝি'-র ন্যায় কাজ করাই শুদ্ধকর্ম।"

স্বরূপলাভের বা আত্মজ্ঞানলাভের চারিটি উপায় সাধক-সমাজে চিরকাল প্রচলিত আছে। প্রথম—কর্মযোগ, দ্বিতীয়—জ্ঞানযোগ, তৃতীয়—রাজযোগ, চতুর্থ - ভক্তিযোগ।

যুগযুগান্তর ধরিয়া ভারতে মুনিঋষিরা, অধ্যাত্মসাধনা ও সিদ্ধি সম্বন্ধে যে সব গবেষণা করিয়াছিলেন, তাহা নানা সম্প্রদায়ে নানাভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া অবস্থিত ছিল। এমনকি সাধনা-সমূহ পরস্পরবিরোধী মনে করিয়া সাধকগণ পরস্পর নিন্দাকলহ ও শত্রুতা করিতেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে সর্বপ্রকার সাধনা একত্র সুশৃঙ্খলভাবে সমন্বিত হইয়াছে। পরম-পূজনীয় স্বামী বিবেকানন্দ তাহা লক্ষ্য করিয়া সাধকগণের নিকট 'সমন্বিত যোগসাধনা'র বার্তা প্রচার করিয়াছেন। স্বামীজী প্রচার করিয়াছেন, কোনও যোগই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহে; সাধকগণের দেহমনের বিকাশবৈষম্যে বাহির হইতে মনে হয় এক একজন সাধকে এক একটি ভাবের বিশেষ প্রকাশ; তাহাই লক্ষ্য করিয়া আমরা কাহাকেও জ্ঞানী, কাহাকেও যোগী, কাহাকেও ভক্ত, কাহাকেও কর্মী মনে করিয়া থাকি। কিন্তু সকল পন্থায়ই জ্ঞান ভক্তি যোগ ও কর্মের যথোচিত সমাবেশ থাকে।

এখন আমরা বিশেষ করিয়া সন্ন্যাসসাধনে শাস্ত্রচর্চার স্থান লইয়া আলোচনা করিব। কিন্তু

সেইসঙ্গে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে অন্যান্য যোগগুলিরও সন্ন্যাসজীবনে পূর্ণ প্রয়োজনীয়তা আছে।

বেদের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ন্যাস-জীবনের প্রয়োজনীয়তা ও তাহা সুসম্পন্ন করিবার উপায়রূপে শাস্ত্রচর্চা কিভাবে পরবর্তী যুগে ধীরে ধীরে সুসম্বদ্ধ হইয়াছে, তাহা অল্পকথায় আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

ঋগ্বেদের গৃহ্যসূত্রে পাই—ব্রহ্মচারী প্রতিদিন স্বাধ্যায় করিবে এবং যাহারা সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিবে, তাহাদের বেদবিদ্যায় পারদর্শী হওয়া চাই। আরণ্যক অংশ জ্ঞানকাণ্ড, যাহা ঋষিদের উচ্চচিন্তা ও বেদবিদ্যা আলোচনার তথা উপলব্ধির ফল, তাহাতেও দেখি স্বাধ্যায় এবং ধ্যানকে বিশেষ স্থান দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন সংহিতা ও উপনিষদেও আমরা স্বাধ্যায়ের উল্লেখ দেখিতে পাই। অথর্ববেদে দেখি ব্রহ্মচারী উপনয়নের পর স্বাধ্যায় করিতেছে, সংহিতা ও যজুর্বেদে দেখিতেছি, ব্রহ্মচর্যপালন, স্বাধ্যায় এবং শ্রদ্ধাসহকারে গুরুসেবার কথা আছে। ঐতরেয় ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে দেখা যায়—ব্রহ্মচারীর সত্যবাদিতা, ধর্মপালন ও আচার্যের প্রতি সশ্রদ্ধ সেবার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হয়।

সন্ন্যাসজীবনে জ্ঞানচর্চা একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। যেমন বৈদিকযুগে তেমনি পৌরাণিক ও বৌদ্ধ যুগেও ইহা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। মহামুনি পতঞ্জলি, সাধকের জীবনে কি কি বিশেষ প্রয়োজন তাহা দেখাইয়া নিয়ম-পালন বা সাধনা সম্বন্ধে সাধনপাদে বলিতেছেন—শৌচসন্তোষ-তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ। স্বাধ্যায় অর্থে মোক্ষশাস্ত্রপাঠ—ইহা হইতে বিষয়চিন্তা ক্ষীণ ও পরমার্থে রুচি বর্ধিত হয়।

মহাভারতে বিভিন্ন আশ্রমের উল্লেখ দেখা যায়, যেখানে বিশ্ববিখ্যাত আচার্যের নিকট পাঠ-গ্রহণ করিবার জন্য বহু দূরদেশ হইতে ছাত্রগণ আগমন করিতেন; ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিয়া অভিপ্রায়মত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া জীবন সার্থক করিতেন। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতেছি নৈমিষারণ্যে মোক্ষাভিলাষী ঋষিগণ লোমহর্ষণ-পুত্র সূতের নিকট পরমহংসাগ্রণী শ্রীশুকদেব-মুখনিঃসৃত ভাগবতকথা শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। রামায়ণেও দেখিতে পাইতেছি, অযোধ্যা বিদ্যাশিক্ষার একটি প্রধানকেন্দ্র ছিল। তথায় "মেখলিনাম মহাসঙ্ঘ" নামে ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসীসঙ্ঘ ছিল। নগরের বহির্দেশে বহু আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল—নগরবাসিগণ তথায় সন্ন্যাসী আচার্যগণের নিকট বিদ্যার আলোচনা, তর্ক ও উপদেশাদি গ্রহণ করিবার জন্য সমবেত হইতেন। মোক্ষধর্মের সুলভা-জনক সংবাদে আছে—

"অথ ধর্মযুগে তস্মিন্ যোগধর্মমনুষ্ঠিতা।
মহীমনুচ্চারেকা সুলভা নাম ভিক্ষুকী॥"

সেইযুগে মিথিলায় ব্রহ্মবিদ্যার অতিশয় চর্চা ছিল। জনকবংশীয় জলদেব, ধর্মধ্বজ, করাল প্রভৃতি নৃপতিগণ সকলেই আত্মজ্ঞ ছিলেন। তৎকালে মহর্ষি পঞ্চশিখ সন্ন্যাস লইয়া বিদেহাদি দেশে বিচরণ করিতেন। মহারাজ ধর্মধ্বজ জনক তাঁহার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। কাশীরাজ অজাতশত্রু আত্মজ্ঞ ছিলেন। মিথিলার এরূপ খ্যাতি ছিল যে বিবিদিষু ও বিদ্বান্ ব্যক্তিরাও প্রায়ই বিদেহরাজ্যে যাইতেন। কৌষিতকী উপনিষদে অজাতশত্রু বলিতেছেন—"জনক জনক ইতি বা উ জনা ধাবন্তীতি।" অর্থাৎ আত্মবিদ্যার জন্য 'জনক জনক' বলিয়া লোকেরা মিথিলায় দৌড়ায়। জনকের রাজসভায় ব্রহ্মবাদিনী গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবিষয়ে কথোপকথন তাঁহাদের বিপুল শাস্ত্রজ্ঞানের

পরিচায়ক। পাতঞ্জল যোগদর্শনের ভূমিকায় স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য বলিতেছেন: "প্রাচীন মুমুক্ষু সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংখ্য ও যোগ এই দুই সম্প্রদায় বহুকাল প্রচলিত ছিল। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন বা সমাধি ব্যতীত কোনও প্রকার আত্মজ্ঞান সম্ভব নহে। ভারতে ঋষিযুগে যখন ধর্মযুগ ছিল, তখন মনীষী মুমুক্ষু ঋষিরা বিশুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত জ্ঞান ও বিশুদ্ধ শীল অবলম্বন করিতেন। কালক্রমে ভগবান বুদ্ধদেব উৎপন্ন হইয়া মোক্ষধর্মে পুনশ্চ বলসঞ্চার করিলেন। বুদ্ধদেবের মহানুভবতার দ্বারা মোক্ষধর্ম অনেক পরিমাণে সাধারণ্যে প্রচারযোগ্য হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরাও কালক্রমে বিকৃত হইলে আচার্যবর শংকর আসিয়া মোক্ষধর্মের ক্ষীণদেহে পুনঃ বলপ্রদান করেন। শ্রীস্বামীজীও বলিতেছেন—"ভগবান্ বুদ্ধদেব হ'তেই যথার্থ সন্ন্যাসাশ্রমের সূত্রপাত হয়েছিল। তিনিই সন্ন্যাসাশ্রমের মৃত কঙ্কালাস্থিতে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন। ভগবান্ বুদ্ধের ন্যায় ত্যাগী মহাপুরুষ আর জন্মায়নি।"

(ক্রমশঃ)

অর্ঘ্য

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমায়
আপনার ঘরে পর করে দাও
পরের দুয়ারে আনি
পরাণ ভরিয়া দাও প্রেমময়
পরের দুখের বাণী।
অনাথ আতুর আশ্রয়হীন
অনাহারে যারা কাঁদে নিশিদিন
তাদের অশ্রুসাগরে ডুবায়ে
রাখ এ হৃদয়খানি।
দাও পরমেশ, দাও সে নিমেষ
তাদের মলিন মুখে
ফুটায়ে তুলিব মধুর হাসিটি
লইব তাদের বুকে।
আমি যে আমার নহি একেলার
শত ফুলে গাঁথা একখানি হার
সকলের তরে জীবন আমার
অর্ঘ্য বলিয়া মানি।

যুগ-সারথি শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

"কাল-স্রোতে ভেসে যায় জীবন-যৌবন-ধন-মান।" তবু মৃত্যুর ছায়ায় রঙীন জল-বুদ্বুদ নিয়ে ভুলে আছি। মাঝে মাঝে দুঃখ এবং শোক এসে বুদ্বুদটাকে ফাটিয়ে দেয়। বাস্তবের রূঢ় আঘাতে ক্ষণকালের জন্যে আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়। দারুণ রোগ-যন্ত্রণায় ছটফট করছে একমাত্র প্রাণাধিক পুত্র। তার জীবন নিয়ে যমে মানুষে টানাটানি চলেছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। শেষে একদিন শক্তি-পরীক্ষায় মানুষের হার হয়। মৃত পুত্রের দেহ জড়িয়ে ধ'রে মা কাঁদে। বাপ নিঃশব্দে অশ্রু-মোচন করে। সংসার আলুনি বোধ হয়। নিদারুণ শোকের ছায়ায় জীবন বিস্বাদ লাগে! বাহিরের কোন-কিছুর উপরে সুখের জন্যে একান্তভাবে নির্ভর করা যে কতবড়ো মূঢ়তা—সেকথা বার বার মনে আসে। পার্থিব সমস্ত-কিছুর অনিত্যত্বের কথা চিন্তা ক'রে শোকাহত মানুষের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়, অসতো মা সদ্গময়। ছায়া থেকে ছায়ার পিছনে ছুটে ছুটে আমি ক্লান্ত। মরীচিকাকে তৃষ্ণার জল মনে ক'রে তপ্ত মরুবালুরাশির উপর দিয়ে কোথায় ছুটে চলেছি! আমার এ যাত্রা থামাও, বন্ধু, থামাও! যা 'শূন্যদিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা', ক্ষণে ক্ষণে যা মিলিয়ে যায় বিলুপ্তির অন্ধকারে তাকে শাশ্বত সুখের উৎস মনে করবার সর্বনেশে মূঢ়তা থেকে আমাকে বাঁচাও! কালের দংষ্ট্রা যাকে স্পর্শ করতে পারে না, যা অসীম, যা অতীতে ছিল, এখন আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে সেই সত্যনারায়ণের পদপ্রান্তে নিয়ে যাও আমাকে এই অনিত্যের মোহ থেকে মুক্ত ক'রে। অন্ধকারের অজানায় নিঃশেষে মিলিয়ে যাবার ভয়ে আর্ত মানুষ কোন্ অসীমের দিকে বাহুদুটি প্রসারিত ক'রে দিয়ে মৃত্যুর ছায়ায় প্রার্থনা করেছে: মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়, আমাকে মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাও। মৃত্যুকে অতিক্রম করবার পথ আমার জানা নেই। অজ্ঞানের এই অন্ধকার থেকে আমাকে সত্যের সেই জ্যোতির্লোকে পৌঁছে দাও যেখানে পৌঁছালে মৃত্যুজয়ের পথ আমি জানতে পারি। জিজ্ঞাসু মানুষের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এসেছে: তমসো মা জ্যোতির্গময়। অন্ধকার থেকে আমাকে জ্যোতিতে নিয়ে যাও।

পার্থিব সুখের প্রতি একটা আসক্তি মানুষের স্বভাবে যেমন সত্য, অসীমের জন্যে তার যে ক্ষুধা রয়েছে সেই ক্ষুধাও তেমনি তার স্বভাবে একটা বিপুল সত্য! মানুষের মর্মের গভীরে অসীমের জন্যে যদি পিপাসা না থাকতো, বিত্তের মধ্যে সে তৃপ্তি খুঁজে পেতো, অল্পেই সে খুশী হোতো! কিন্তু বাইরে থেকে যাদের জীবনকে নিতান্তই জান্তব জীবন ব'লে মনে হয় তাদেরও ভিতরে ভিতরে ব'য়ে চলেছে একটা চাপা কান্নার অন্তঃ-সলিলা ফল্গুধারা! একটা প্রচ্ছন্ন হতাশার বোঝা তারা নিঃশব্দে বহন ক'রে চলেছে অন্তরের মধ্যে। পাখীর মধ্যে, পশুর মধ্যে তো সুদূরের জন্যে এই কান্না নেই! এ অতৃপ্তি কেবল মানুষেই! তার স্বভাবে জটিলতার সত্যিই কোন অন্ত নেই! মানুষকে দেখেছি ক্রোধে উন্মত্ত হ'য়ে প্রতিবেশীকে লাঠিয়ে মারতে। তাকেই আবার দেখেছি করুণাঘন মূর্তিতে। তাকে বর্বর বললে, জৈবস্তরের জীব বললে

তার সম্পর্কে জ্ঞানের শেষ কথা বলা হোলো না। তার প্রকৃতিতে পৃথিবীর কাদামাটির পঙ্কিলতা আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু এটাই সমগ্র সত্য নয়। মানব-প্রকৃতিতে আসক্তির, ভয়ের এবং ক্রোধের পঙ্কিলতার পাশে কি নক্ষত্রলোকের দীপ্তিও নেই? কামকাঞ্চনৈকলক্ষ্য ভোগাসক্ত ধুলামাটির মানুষের আত্মায় অসীমের ক্ষুধা যদি নাই থাকতো তবে দস্যুর বাঁশ কবির বাঁশরি হ'য়ে কখনোই বাজতো না, চণ্ডাশোক ধর্মাশোকে কখনোই পরিণত হোতো না, বিল্বমঙ্গলের মন নারী-মায়া থেকে মুক্তি পেয়ে কখনোই ভগবানের দিকে ছুটতো না এবং জগাই-মাধাই গৌরাঙ্গের পাদপদ্মে কখনোই লুটিয়ে পড়তো না!

অবতার-পুরুষদের স্বপ্নবিলাসী কিছুতেই বলা যেতে পারেনা, যদিও তাঁরা আশাবাদী নিশ্চয়ই। বাস্তববাদী হয়েও, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও মানুষ সম্পর্কে অনন্ত আশা পোষণ করবার কারণ আছে। যেমন যুগের অন্যতম চিন্তাবীর বার্ট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russel) বলেছেন:

> Sometimes, in moments of horror, I have been tempted to doubt whether, there is any reason to wish that such a creature as man should continue. It is easy to see man as dark and cruel. But this is not the whole truth and is not the last word of wisdom.

> কখনো কখনো আমার ভীতিবিহ্বল চিত্তে সংশয় এসেছে, মানুষের মতো এমন একটা জীবের ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয় কি না! মানুষের আচরণ দেখে তাকে নিষ্ঠুর এবং কুটিল মনে করা সহজ! কিন্তু এটা তো সমগ্র সত্য নয়, জ্ঞানের চরম কথাও নয়।

আত্মকেন্দ্রিক অহংসর্বস্ব মানুষের চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে সেই চিন্তাকে ভগবানের দিকে প্রবাহিত করা যায়। এই কাজটি করবার জন্তেই ঠাকুরের আবির্ভাব। অসংখ্য মানুষ নারী-মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে, কাঞ্চনকে ভালোবেসে, নামযশের লোভে মৃত্যুর জালে জড়িয়ে রয়েছে। উট কাঁটা ঘাস খায়। মুখ দিয়ে দর্‌দর্‌ ক'রে রক্ত ঝরে, তবুও সে কাঁটা ঘাস খেতেই থাকে। সংসারী মানুষগুলো উটেরই মতো। এত কষ্ট পাচ্ছে, তবুও পার্থিব সুখের মরীচিকাকে অনুসরণ ক'রে চলেছে। পরমানন্দঘনমূর্তি অনন্ত ঈশ্বরের দিকে কিছুতেই মুখ ফেরাবে না। যুগে যুগে যেমন তিনি আবির্ভূত হয়েছেন মানুষের চিত্তকে ঈশ্বরমুখী করবার জন্তে যাতে সে ভব-রোগ থেকে মুক্তি পায়, তেমনই তিনি আবির্ভূত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ নিয়ে যাতে জীব তাঁর অন্বেষণে ব্রতী হয়—যাঁকে পেলে তার আর-কিছুতে লোভ থাকে না, সব পিপাসার অবসান হ'য়ে যায়।

বিষমতৃষ্ণায় আর্ত অসংখ্য মানুষ ছায়া থেকে ছায়ার পিছনে দৌড়ে দৌড়ে মৃত্যুর জালের মধ্যে ক্লান্তির দুর্বহ বোঝায় ভারাক্রান্ত জীবন বহন করছে—এই দৃশ্য অদ্বৈতাচার্যের করুণ হৃদয়কে সেদিন খুবই বিচলিত করেছিল। হায়, কেমন ক'রে মানুষকে উপলব্ধি করানো যাবে—নাম-যশ কখনো তাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না! বিত্তের ক্ষমতা নেই তাকে তৃপ্ত করবার! রূপ দিয়েও তার অন্তরের শূন্য পূর্ণ হবার নয়! নিউইয়র্কের বেদান্ত সোসাইটীতে স্বামীজী আজ থেকে পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্বে যা বলেছিলেন তা অদ্বৈতাচার্যের যুগে যেমন সত্য ছিল, রামকৃষ্ণের যুগেও তেমনই সত্য! স্বামীজীর ঐ ভাষণের মধ্যে ছিল:

What then can satisfy man? Not gold. Not joy. Not beauty. One Infinite alone can satisfy him, and that Infinite is Himself.

ভূমৈব সুখম্। অসীমের মধ্যেই মানুষের তৃপ্তি! যার মধ্যে রয়েছে অনন্তের জন্যে একটা মজ্জাগত ক্ষুধা, সে যখন অল্পের মধ্যে, অনিত্যের মধ্যে সুখের অন্বেষণ করে, তখন নৈরাশ্য এবং ক্লান্তি ছাড়া আর কি অর্জনের সে আশা করতে পারে? ঈশ্বর সত্যনারায়ণ, নিত্যনারায়ণ। তিনি অনন্ত। তিনি সত্য বলেই তাঁর মধ্যে অসীমের পিয়াসী আত্মার শাশ্বত আনন্দ! নারদীয় ভক্তিসূত্রে বলা হয়েছে: ঈশ্বরকে ষোলআনা মন দিয়ে ভালোবাসতে পারলে তবেই মানুষ—সিদ্ধো ভবতি, অমৃতো ভবতি, তৃপ্তো ভবতি। অর্থাৎ মানুষ ভক্তি লাভ ক'রে সিদ্ধ হয়, অমৃতত্ব লাভ করে ও তৃপ্ত হয়। ভক্তকুলের শিরোমণি করুণ-হৃদয় অদ্বৈতাচার্য 'বিচার করেন লোকের কৈছে হিত হয়।' বিচারের পথে তিনি নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করলেন, অনিত্য বিষয়-সুখে যারা ম'জে আছে আর কামনার আগুনে দগ্ধ হচ্ছে তারা সংসার থেকে ঈশ্বরের দিকে মুখ ফেরালে তবেই পরিতৃপ্ত হ'তে পারে। কিন্তু রূপের মোহ, কাঞ্চনের মোহ, খ্যাতির মোহ—এই সব আকর্ষণকে জয় ক'রে ঈশ্বরের জন্যে কাঁদা কি সহজ কথা? 'ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।' ধনে জনে আমার কোন প্রয়োজন নেই, সুন্দরী স্ত্রী বা পাণ্ডিত্য আমি কামনা করি না, ঈশ্বরকে আমি সমস্ত মন দিয়ে ভালোবাসতে চাই: এই বৈরাগ্যের পথ দুর্গম। আর ভক্তির পথ দুর্গম বলেই ঈশ্বরকে ভালোবেসে যাঁরা তৃপ্তি লাভ করেছেন সেই ভাগ্যবান পুরুষেরাও সুদুর্লভ। কিন্তু ভগবান নিজে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে যদি 'আপনি আচরি ভক্তি করেন প্রচার' তবে তো ত্রিতাপদগ্ধ জীবের একটা উপায় হ'তে পারে! অদ্বৈতাচার্য করুণকণ্ঠে তাই ভগবানকে ডাকতে লাগলেন। ভক্তের আকুল আহ্বানে ভগবান নেমে এলেন। ভক্তকবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লিখেছেন,

সেই রাধার ভাব লইয়া চৈতন্যাবতার।
যুগধর্ম নাম প্রেম কৈল পরচার॥

ঐ গ্রন্থের অন্যত্র রয়েছে:

এই মত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার।

যুগধর্ম ভগবৎপ্রেম প্রচারের জন্যে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি—এই সত্যপ্রচারের জন্যে কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণেরও আবির্ভাব। ভক্তের আকুতি নিয়ে ভগবানের জন্যে কেমন ক'রে কাতরকণ্ঠে ডাকতে হয়—নিজ নিজ জীবনে আচরণের মাধ্যমে তার দৃষ্টান্ত স্থাপন ক'রে গেলেন উভয়েই। দুই অবতারেই ভক্তির জন্যে প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রার্থনা করেছেন, 'ধন-জন-রূপ-পাণ্ডিত্য কিছুতেই আমার দরকার নেই। হে ঈশ্বর, জন্মে জন্মে তোমাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি হোক।' ঠাকুরও ফুল হাতে ক'রে প্রার্থনা করলেন: 'মা, এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার ভালো, এই নাও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও!' নারদীয় ভক্তিসূত্রে ভক্তির সাধনার উপরেই জোর দেওয়া

হয়েছে। গৌরাঙ্গ অবতারে এবং রামকৃষ্ণ অবতারে ঐ একই কথা: ওঁ তদেব সাধ্যতাম্, তদেব সাধ্যতাম্। নাম-মাহাত্ম্যের উপরে ঠাকুরও খুব জোর দিয়েছেন। ঠাকুর বলেছেন সুন্দর একটি উপমা দিয়ে: "চৈতন্যদেব বলেছিলেন, ঈশ্বরের নামের ভারি মাহাত্ম্য। শীঘ্র ফল না হতে পারে, কিন্তু কখনও না কখনও এর ফল হবেই হবে। যেমন কেউ বাড়ীর কার্নিসের উপর বীজ রেখে গিয়েছিল। অনেক দিন পরে বাড়ী ভূমিসাৎ হয়ে গেল, তখন সেই বীজ মাটিতে পড়ে গাছ হ'লো ও তার ফলও হ'লো।"

যুগধর্ম নাম-প্রেম প্রচার ছাড়া রামকৃষ্ণ অবতারের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল এবং সেই উদ্দেশ্যটি ছিল যুগের কর্ণকুহরে সকল ধর্মকে মূলতঃ সত্য বলে ঘোষণা করা। এই পরম ঘোষণার ভিত্তি ছিল তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধি। শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বে আর কেউ ভারতবর্ষে একে একে খ্রীষ্টান, মুসলমান এবং বৈষ্ণব হয়ে সাধনা করেন নি। বিবেকানন্দ বলেছেন, No one ever before in India became Christian and Mohammedan and Vaisnava by turns!

ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে স্বামীজী বারবার বলেছেন Religion is experience, ধর্ম হচ্ছে সেই সচ্চিদানন্দের জীবন্ত উপলব্ধি! এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েই তপোবনের ঋষি একদা ঘোষণা করেছিলেন, "জেনেছি তাঁহারে মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে জ্যোতির্ময়।" 'বেদাহম্।' ঈশ্বরকে সরাসরি এই জানার ব্যাপার যেখানে নেই সেখানে মেধা থাকতে পারে, শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় সুগভীর পাণ্ডিত্য থাকতে পারে কিন্তু ধর্ম নেই। ধর্মের তত্ত্বের প্রথম এবং শেষ কথা হ'লো সেই পরমানন্দঘনমূর্তি অনন্ত ভগবানের মাধুর্যের আস্বাদন। শ্রীচৈতন্য যখন বললেন, "আমি তো বাউল, আন কহিতে আন কহি। কৃষ্ণের মাধুর্যস্রোতে আমি যাই বহি॥" তখন তাঁর কণ্ঠে ধর্মের এই চরম তত্ত্বকথাটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল।

সব ধর্মই মূলতঃ অভ্রান্ত—এই সার্বজনীন সত্যকে যুগের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে পৃথিবীতে যাঁর আবির্ভাব তিনি প্রতিটি ধর্ম-মতকে উপলব্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই ক'রে নেবার জন্যে কঠিন সাধনায় ব্রতী হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ খ্রীষ্টান হলেন। খ্রীষ্ট-ধর্মমতে সাধনা ক'রে সিদ্ধির শিখরে তিনি পৌছালেন। উপলব্ধি করলেন, খ্রীষ্টীয় মতকে অনুসরণ করেও ভগবানের মাধুর্যস্রোতে ভেসে চলা সম্ভব। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপরে দাঁড়িয়ে রামকৃষ্ণ ঘোষণা করলেন, 'আমি নিজে সাধনা ক'রে জেনেছি, খ্রীষ্টান ধর্ম সত্য।' এমনি ক'রে একে একে কত বিচিত্র সাধনার পথেই না তিনি পর্যটন করেছেন! মুসলমান হলেন—মুসলমানের মত কাপড় পরলেন, পেঁয়াজ রসুনও বাদ গেল না। ঐ ইসলামীয় সাধনার পথও শ্রীরামকৃষ্ণকে উপলব্ধির অনির্বচনীয় আনন্দরস আস্বাদন করালো। এর আগে ভৈরবী গুরুর ভূমিকা নিয়ে নব নব সাধনার পথে শ্রীরামকৃষ্ণকে হাত ধরে নিয়ে গেছেন এবং যত মত তত পথ, এই সত্য-উপলব্ধির ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেছেন। আবার অদ্বৈত সাধনার পথে নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে যাওয়ার অবর্ণনীয় অনুভূতি! যিনি সকল ধর্মই মূলতঃ সত্য, এই যুগধর্ম প্রচারের প্রয়োজনের তাগিদে নবযুগের কর্ণধারের ভূমিকা নেবার জন্যে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন, মা তাঁকে নির্বিকল্প

সমাধির গৌরীশৃঙ্গে পৌঁছে দেবার সব ব্যবস্থাই আগে থেকে ঠিক ক'রে রেখেছিলেন। যথাকালে তোতাপুরী এসে দক্ষিণেশ্বরে হাজির হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি অরূপের সাধনার ক্ষুরধার দুর্গম পথে দাঁড় করিয়ে দিলেন। রামকৃষ্ণ উপবীত ত্যাগ করলেন। ব্রাহ্মণের এবং পুরোহিতের মর্যাদার প্রতীক শুভ্র উপবীত পরিহারের অর্থ সমস্ত অভিমান বর্জন ক'রে নবজীবনের জন্যে প্রস্তুতি। নিজের শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ গৈরিক বসন পরলেন। পূর্বতন আমি-র যখন বিন্দু-বিসর্গও অবশিষ্ট রইলো না, এতদিন জগজ্জননীর সঙ্গে দ্বৈতভাবের যে সূক্ষ্ম স্বর্ণসূত্রগুলিতে তিনি আবদ্ধ ছিলেন সেগুলিও ছিন্ন করবার জন্যে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ প্রস্তুত হলেন, তখন তোতাপুরী তাঁকে অদ্বৈত সাধনায় দীক্ষিত করলেন। সাধনার শেষ শিখরে আরোহণের পথ শ্রীরামকৃষ্ণের মতো সাধককুলশিরোমণির পক্ষেও সহজ ছিল না। যিনি কামিনী-কাঞ্চনের আসক্তিকে নিঃশেষে অতিক্রম করেছিলেন, অহং-এর শেষকণাটিকে পর্যন্ত চিতাগ্নিতে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন, নাম-রূপের পারে যেতে তিনি কিন্তু হিমসিম খেয়ে গেলেন। নির্বিকল্প সমাধিতে পৌঁছানোর পথ রোধ ক'রে মা দাঁড়িয়ে রইলেন। রোমা রলাঁর ভাষায় She barred the way to the beyond. তারপর এলো সেই অপরূপ মুহূর্তটি যখন ধ্যানের আকাশে মায়ের রূপ জেগে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞান-খড়্গে সেই রূপকে দু'টুকরো ক'রে দিলেন। নির্বিকল্প সমাধির অমৃত-সাগরে মন নিমিষে তলিয়ে গেল। সেই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করবার নয়। 'হাঁড়ির মাছ গঙ্গায় ছেড়ে দিলে যেমন হয়'—এই রকমের ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধির আনন্দের আভাষ দিয়েছিলেন।

ঈশ্বরের জন্যে মন সত্যসত্যই ব্যাকুল হলে তিনিই সব 'জোটপাট' ক'রে দেন। কোথা থেকে ভৈরবী এলেন, কোথা থেকে 'ন্যাংটা'ও এসে গেলেন। সাধনার কোন রাস্তাই শেষ পর্যন্ত বাদ গেল না। সব ধর্মই মূলতঃ সত্য—এই যুগবাণী অকুণ্ঠ ভাষায় জগৎকে শোনাবার জন্য কি এই experimental realisation of religion-এর (নিবেদিতার ভাষায়) একান্তই প্রয়োজন ছিল না? আমাদের অনেক বিশ্বাসই প'ড়ে-পাওয়া-চৌদ্দ-আনার মতো খুড়ী-জেঠীর কাছ থেকে শৈশবে শোনা অনায়াসলব্ধ একটা অন্ধবিশ্বাস মাত্র। সেই বিশ্বাসের সঙ্গে তপস্যালব্ধ উপলব্ধির কোন সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু পূর্বেই স্বামীজীর ভাষা উদ্ধৃত ক'রে বলা হয়েছে: Religion is experience. হিন্দুদের মধ্যে যত সম্প্রদায় আছে এবং তাদের মধ্যে যত মতবাদ প্রচলিত তাদের একমাত্র লক্ষ্য সত্য। এই সত্য অপৌরুষেয় (revealed) নয় যাকে নির্বিচারে শিরোধার্য করতে হবে; পরন্তু হিন্দুদের কাছে পরম সত্য এমন-কিছু যাকে সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করা চাই। নিবেদিতার ভাষায় সত্য যতক্ষণ revealed truth to be accepted ততক্ষণ তা আমার কাছে কখনও সত্য ব'লে পরিগণিত হ'তে পারে না। সত্য হচ্ছে accessible truth to be experienced. সব ধর্মই সত্য একথা নিঃসংশয়ে জোরের সঙ্গে ঘোষণা করবার জন্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিজ্ঞানসম্মত পথগুলি পর্যটন করতে হলো!

হায়, ধর্ম তো কারও হাতের মুষ্টিভিক্ষা হ'তে পারে না! সচ্চিদানন্দের মাধুর্যস্রোতে ভেসে চলার সেই অবর্ণনীয় অনুভূতি কে কাকে পাইয়ে দিতে পারে? হুইটম্যানের Leaves of Grass-এর সেই বিখ্যাত লাইনদুইটি:

Not I, not any one else can travel
that road for you,
You must travel it for yourself.

ঠাকুর তাই কৃপার উপর নির্ভরের কথা যেমন বারম্বার বলেছেন তেমনি বলেছেন, 'ব্যাকুল হয়ে কিছু কর্ম ক'রে যেতে হয়।' বলেছেন, 'পুকুর-পাড়ে শুধু ব'সে থাকলে কি মাছ পাওয়া যায়? চার করো, চার ফেলো, গভীর জল থেকে মাছ আসবে, আর জল নড়বে।' সব মনটা কুড়িয়ে ঈশ্বরের দিকে না দিলে তো তাঁকে পাওয়া যাবে না। 'বই হাজার পড়, মুখে হাজার শ্লোক বল, ব্যাকুল হ'য়ে তাঁতে ডুব না দিলে তাঁকে ধরতে পারবে না।' বিবেকানন্দের ভাষায় To know God no philosophy is necessary. ভগবানকে জানা নানা দর্শন-শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জনের ব্যাপার মোটেই নয়। ওটা স্রেফ ছড়িয়ে-পড়া মনকে কুড়িয়ে এনে অনুক্ষণ ভাবনার দ্বারা তাঁর স্মরণ-মননের ব্যাপার! তাঁর চরণপদ্মে মন নিঃস্পন্দিত হওয়া চাই। 'মন্মনা ভব'—অর্থাৎ আমাকে সর্বকালে স্মরণ করলে তবেই 'মামেব এষ্যসি' আমার কাছে আসবে। সমগ্র গীতায় এর মতো মূল্যবান কথা খুব কমই আছে। অর্থাৎ ঈশ্বরকে পাওয়ার প্রথম এবং শেষ শর্ত নিয়ত তাঁকে চিন্তা করা। আর মনকে শাসনে আনা তো বাতাসকে শাসনে আনার মতোই একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু গীতায় বলা হয়েছে, অভ্যাস-যোগের দ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মনকে ঈশ্বরের পাদপদ্মে জড়ো করা যায়। ঠাকুর-ও তাই বললেন: 'উপায়—অভ্যাসযোগ। ঈশ্বরচিন্তা অভ্যাস করলে শেষের দিনেও তাঁকে মনে পড়বে।'

সংসারে নানা প্রলোভনের টানে মন নানা দিকে বিক্ষিপ্ত হবার আশঙ্কা পদে পদে। তাই তো ঠাকুর নির্জনে তাঁকে ডাকার উপরে বারম্বার এত জোর দিলেন! নির্জনে কঠিন সাধনাকে সহায় ক'রে ঈশ্বরকে আপনার মধ্যে উপলব্ধি করাই ধর্ম; তাই এ যুগের অন্যতম মনীষী Whitehead মন্তব্য করেছেন: Thus religion is solitariness, and if you are never solitary, you are never religious. নির্জনে নিঃসঙ্গচিত্তের ধ্যান-ধারণাকে এড়িয়ে গিয়ে গুরু কানে মন্ত্র দিলেই ভগবান পাবো, এমন হ'তেই পারে না।

ব্রাহ্মণী আর তোতাপুরী শ্রীরামকৃষ্ণকে পথের সন্ধান দিলেন। সবিকল্প বা নির্বিকল্প সমাধির অনুভূতি আস্বাদন করানো তাঁদের সাধ্যের ছিল অতীত। পঞ্চবটীর নির্জনে আধ্যাত্মিক অভিযানের পর অভিযানে সাফল্য অর্জনের কৃতিত্ব শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের। সেই উপলব্ধি ছিল সাধকের একক চিত্তের তপস্যাসাপেক্ষ।

যত মত তত পথ—এই মহাসত্যকে আবিষ্কার করবার জন্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে কলম্বাসের ভূমিকা নিয়ে কত অজানা সমুদ্রেই না পাড়ি দিতে হয়েছিল! সব ধর্মই মূলতঃ সত্য—এই অমৃতবাণী প্রচারের কতই না প্রয়োজন হয়েছে আজ! বিজ্ঞান ভৌগোলিক দূরত্বকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়েছে। বিভিন্ন ধর্মমতের, বিভিন্ন জাতির মানুষগুলি আজ একে অন্যের কত কাছাকাছি এসে পড়েছে! এই শারীরিক নৈকট্য যদি মানুষকে মানুষের সঙ্গে প্রেমে যুক্ত না করে তবে তো টেক্‌নলজির উন্নতি মানবতার শিরে সর্বনাশকে ডেকে আনবে। আর স্বাধীনতাই তো একমাত্র ভিত্তি যার উপরে মানুষ মানুষের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে পৃথিবীতে স্বর্গভূমি রচনা করতে পারে। আমার ধর্মমতের সঙ্গে অন্যের ধর্মমত না মিললে যদি তার দিকে বক্রদৃষ্টিতে তাকাই তবে তো তার সঙ্গে মিলন

সম্ভব নয়। স্বামীজী বলেছিলেন : 'Freedom, Oh Freedom !' is the song of the soul. আমাদের অন্তরাত্মার মহাসঙ্গীত হচ্ছে স্বাধীনতা। স্বাধীনতাই আমাদের জীবনের পরম আকূতি। আমাদের প্রত্যেকেরই রুচিতে, ভাবে, বিশ্বাসে, চাল-চলনে, কথাবার্তায় একটি স্বাতন্ত্র্য আছে। এই স্বাতন্ত্র্যে কেউ হস্তক্ষেপ করতে চাইলে আমাদের মন সেটা মোটেই পছন্দ করে না। তাই প্রত্যেককে তার স্বভাব এবং স্বধর্ম অনুসরণ ক'রে চলতে দেওয়াই ঠিক। ঠাকুরের বাণীর মধ্যে এই স্বাধীনতার জয়ধ্বনি, প্রতিটি ধর্মবিশ্বাসের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। যাদের আচরণ বা রুচি অথবা বিশ্বাস আমাদের থেকে আলাদা, তাদের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনই শুধু পৃথিবীতে নবযুগের প্রবর্তন করতে পারে। আর এই দিক থেকেই রোমা রলাঁ শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছেন : The pilot and guide of the needs of the new age.

'শ্রীম'-সমীপে

ভক্ত রমেশচন্দ্র সরকার

৩রা ফাল্গুন, শনিবার, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৯

বেলা দেড়টার সময় শ্রীম সমীপে গিয়াছি। প্রণাম করিবার পর "Vedanta Kesari" January, 1919 এককপি দিয়া আমায় পড়িতে বলিয়া কিছুক্ষণ একা দুয়ার বন্ধ করিয়া বিশ্রাম করিলেন।

বাহিরে আসিলেন প্রায় ৪টার সময়। পরে ভাবস্থ হইয়া গান গাহিলেন, গানের সুরে যেন মধু বর্ষিত হইতে লাগিল। গানের ভাবটি হইতেছে, শিব সদা রামনামে মগ্ন। একজন ভক্ত আসিলে তাহাকে লইয়া ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতেছেন। আমি ও ব্রহ্মচারী তখন চাঁদার পয়সা গুনিতেছিলাম! শ্রীম স্কুলের কাজের লোক আসিলে অথবা অন্য বৈষয়িক কার্যের ব্যাপার ঘটিলে যাহাতে ভক্তদের সেদিকে মন না যায় তজ্জন্য মাঝে মাঝে দুয়ার বন্ধ করিতেন।

আমি—তিনি আমাদের মায়ায় মোহিত করে রেখেছেন।

শ্রীম—হাঁ, তবু লোকে বলে আমরা সব জানি। অজ্ঞানী হয়ে জ্ঞানের অভিমান করে।

স্কুলের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট আসিয়া কথা কহিয়া চলিয়া গেলেন। পরে ভক্তদের লইয়া রামপ্রসাদী গানের বই হইতে গান গাহিতেছেন—

"এবার আমার উমা এলে
আর উমায় পাঠাব না,
বলে বলবে লোকে মন্দ,
কারুর কথা শুনবো না।"

পুস্তকে প্রসাদের ছবি দেখিয়া তাঁহার জীবনী আলোচনা করিতেছেন আর বলিতেছেন, "আহা! তা হবেনা? ভগবানের ভক্ত যে!"

আর একটি গান—

"সুরাপান করিনা আমি সুধা খাই
জয় কালী বলে।
মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে
মাতাল বলে॥"

"আমায় দাও মা তবিলদারী,
আমি নেমকহারাম নই শংকরী॥"

মা কালী কন্যার বেশে প্রসাদের বেড়া বাঁধিতেছেন—এই ছবি দেখিয়া শ্রীম প্রসন্ন হইয়াছেন, তাই আমাকেও দেখাইলেন। এত তন্ময় হইয়াছেন যে বাহির হইতে দুয়ারে টোকা দিলেও দুয়ার খুলিলেন না। অবশেষে খুব ধাক্কা দিলে তখন বলিলেন, "আর কি করা যায়! খুলে দাও।" এক স্কুলের শিক্ষক আসিলেন। বলিতেছেন, "পরমহংসদেবও অনেক ভক্তকে মা হয়ে দেখা দিয়েছেন। ভগবানকে দর্শন করা যায়। বিশ্বাস হয়? এদেশের লোক হিমালয়ের গহ্বরে ভগবানকে দেখেছেন। এদেশ কত পবিত্র!"

সন্ধ্যাদির পর ভাবে ভরপুর,—বলিতেছেন, "চল দক্ষিণেশ্বরে একটি দেব-মানবকে দেখতে যাই—ভাবনেত্রে। কেউ ভাবে—গাছপালা, নদনদী, পাহাড়, জীবজন্তু, মানুষ—এসব কোত্থেকে এল? অনন্ত হতে আসছে। তাই সবেতে অনন্তকে দেখা সম্ভব। কাল মাঘী পূর্ণিমা গেল। নবদ্বীপে কত ঘটা হয়েছে। এদিক হতে সংকীর্তন-দল আসছে, ওদিক হতে আসছে। শ্রীপঞ্চমীর দিন ঠাকুরের জন্মভূমি প্রথম দেখতে যাই। দিন পনের পরে ঠাকুরের কাছে গেলে বললেন, "কি করে গেলে? কষ্ট হয়েছে? আমি সারলে এক সঙ্গে যাব।"

ভাটপাড়ার ব্রাহ্মণটিকেও মাঘী পূর্ণিমার উৎসব সেখানে কেমন হয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন! এখন ঐ এক চিন্তা। "অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ।" আমায় বলিতেছেন— "বেলেঘাটা ত অনেক দূর, তোমার দেরী হয়ে যাচ্ছে—বেশীক্ষণ থাকা উচিত নয়।"

৪ঠা ফাল্গুন, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার

বেলা ২টার সময় গিয়াছি। তখন শ্রীম বিশ্রাম করিতেছিলেন। ৩টায় দুয়ার খুলিলেন। আজ যখন বাহিরে আসিলেন, দেখিলাম কাঁধে নূতন সাদা উড়ানি ভাঁজ করা। কোন ভদ্রলোক আসিলে তিনি এইরূপ সভ্য হইয়া বসেন।

কাগজওয়ালা, স্কুল-সুপারিনটেণ্ডেণ্ট আসিলেন। পরে আমায় বলিতেছেন, "আর পারিনা, এ রাগ করে ও রাগ করে, নানা ঝঞ্ঝাট।"

আমি—আপনারা বলে টিকে আছেন।

শ্রীম—হাঁ, ঠাকুর আমায় ঠিক রেখেছেন। যেমন সোলাকে যতই জলে ডোবানো যাক্‌না আবার ভেসে উঠে। সংসারে থাকলে দুদিক রেখে চলতে হয়। কেমন তোমার শিক্ষা হচ্ছে। এসব দেখে রাখতে হয় পরে কাজে লাগবে।

এমন সময় জয়রামবাটী হইতে শ্রীশ্রীমায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র আসিলেন।

শ্রীম—(তাঁহাকে) আপনাদের দেখলে আনন্দ হয়।

জলখাবার আসিল। আমি জল দিলাম। তিনি জলখাবার খাইলেন।

শ্রীম—এঁকে একটা এলাচ দাও। তবে ত তোমার এলাচ কেনা সার্থক হবে। জয়রামবাটীর লোক দেখা ভাগ্যের কথা। যে সে লোক নয়। জয়রামবাটীর লোক!

পরে তিনি চলিয়া গেলেন।

শ্রীম—এত এলাচ এনেছ কেন? এত কি হবে? আমি কি চিরকাল অসুখে ভুগবো? [কয়েকমাস তাঁহার শরীর অসুস্থ, মকরধ্বজ মধু ও এলাচির গুঁড়া দিয়া খান] ভাল করে বসো। আগে আসন ঠিক করতে হয়। (মধ্যে মধ্যে গান গাহিতেছেন, "আমায় দাও মা তবিলদারী।" আমাকে লক্ষ্য করিয়া) আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক, আধি-দৈবিক এই ত্রিতাপ আছে। রোগ ব্যামো হ'ল আধ্যাত্মিক, তবে স্থূল শরীরের আবার কাম-

ক্রোধও আধ্যাত্মিক। কিন্তু এগুলি সূক্ষ্ম শরীরে। ছাদ হতে পড়ে গেল, জলে ডুবে গেল, বজ্রাঘাতে মৃত্যু হ'ল ; ইহা আধিদৈবিক। মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ হতে যে দুঃখ আসে, তাকে আধিভৌতিক দুঃখ বলে।

এমন সময় বড় জিতেনবাবু আসিলেন, অতি নম্রস্বভাব, বয়স্ক লোক। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "উপায় কি ?"

শ্রীম—উপায় আবার কি ? তিনিই সব হয়ে রয়েছেন।

এই বলিয়া উপনিষদ্ বাহির করিয়া সুর করিয়া পড়িতে লাগিলেন।

শ্রীম—আহা, ঋষিরা তাঁকে কত ভাবে দেখেছেন। কোথায়ও বলেছেন—যেমন পাখী গাছের ডালে চুপ করে বসে থাকে, আমরা তেমন ভগবানেতে আছি। ঠাকুর বলতেন—মা আমায় একটি অবস্থা করে দিলেন, দেখালেন আধার আধেয় দুই-ই এক।

জিতেন বাবু—ত্যাগ না হলে কিছু হবে না।

শ্রীম—ওসব বড় কথায় কি হবে ? Commonsense-এ (সাধারণ জ্ঞান) এই বুঝি—পাঁচটায় মন থাকলে কোনটা বুঝা যায় না। যেমন সরোবরে যদি ঢেউ থাকে তবে চন্দ্র তারা এ সবের প্রতিবিম্ব পড়ে না। চিত্তসরোবরে নানা বাসনা থাকলে সত্যজ্ঞান হয় না। তাই নির্জনে মন স্থির করতে হয়। ভগবানে মন প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ অভয় হয়।

ভক্ত—এমন অবস্থা কবে হবে, যখন সর্বাবস্থায় তাঁর দিকে মন যাবে, কেবল তাঁকেই চাইব, তাঁকেই ডাকবো।

শ্রীম গান ধরিলেন—

"আয় মা সাধন-সমরে।
দেখি মা হারে কি পুত্র হারে।"

আমরা গানে যোগ দিলাম। এর পর আমি এলাচ দিয়া ঔষধ মাড়িয়া দিলাম। পরে বলিলাম, "এ এলাচ সবটাই আপনার এখানে থাক্। আপনার জন্য এনেছি।"

শ্রীম—না, নিয়ে যাও। মাঝে মাঝে দু' একটি এনে দিও। এখানে থাকলে হারিয়ে যাবে।

কাল

ডাঃ শ্রীশচীন সেনগুপ্ত

নিরলস 'বর্ত্তমান'
শুধু কাজ করে,
ভাল মন্দ কিছুরই সে
ধার নাহি ধারে।

কৃপণ 'অতীত', তার
নাহি অপচয়,
সব কাজ নির্বিচারে
করিছে সঞ্চয়।

প্রতিটি কাজের করি
সূক্ষ্ম সুবিচার
'ভবিষ্যৎ' গড়ে তোলে
কর্মফল তার।

ভক্তির সারকথা

শ্রীমতী জয়শ্রী চক্রবর্তী

ভক্তিপথে ভগবানকে পেতে হলে চাই প্রাণের যোগসাধন! বাইরের সাধনভজনই সব নয়। আন্তরিক নিষ্ঠা ও পরিশুদ্ধ চিত্ত চাই। শরতের মেঘমুক্ত আকাশের মত স্বচ্ছ চিত্ত। এটাই কিন্তু সারকথা। মূল তত্ত্ব। নিবিড় প্রেরণায় ভক্তি জন্ম নেয়। এ তার শৈশবাবস্থা। পরিণত অবস্থায় ভক্তি ভক্তের পৃথক্ অস্তিত্বকেই লুপ্ত করে দেয়, তাকে মিশিয়ে এক করে দেয় ভগবানের সঙ্গে।

ঈশ্বরকে ভালবাসার নামই ভক্তি। ভক্তি জেগে ওঠে তার শতদল মেলে। ভক্তির সেই নির্মল অঞ্জলি তুলে দিতে হবে প্রাণের দেবতাকে। এইভাবে ভক্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারলেই তা বিশুদ্ধ অনাবিল হ'য়ে ওঠবে। খাঁটি না হ'লে, খাঁটি মিলবে কোথায়? সরলতা, পবিত্রতা ও বিশ্বাস সেরা কথা। সহজভাবে তাকে জানতে হয়। বুঝতে হয় মুক্ত আনন্দ-ঝরণায় স্নান করতে হয়।

জল, বায়ু, বৃক্ষ, মৃত্তিকা, শক্তি প্রভৃতি নিয়ে যে জড়জগৎ, তার অন্তর-বাহির প্রাণদেবতার প্রাণের উৎসবে ভরে আছে। মহাজীবনের আনন্দ জেগে আছে সেখানে। ভক্তি সেখানেই ক্ষুদ্র প্রাণের মিলন ঘটায় মহাপ্রাণের প্রয়াগে।

শাস্ত্র-পাঠীর পাঠ শ্রবণে মূর্খ গোয়ালিনী—সংসার-সাগর পেরিয়ে গেল—শুধু সরলতার সাঁতার কেটে। তেমনি মুক্ত মনের খাঁটি সরলতা চাই। তেমনি বিশ্বাস, পবিত্র ভক্তি, পরিচ্ছন্ন নিষ্ঠা চাই। ভক্তি যে-রূপেই দৃশ্যমান হোক না,—তার সারমর্ম এক।

নাম-রূপের জগতেও ভক্ত তাঁকেই দেখতে পায় সব কিছুর ভিতর। ভক্তি যেখানে যে রূপেই থাকনা কেন, ভক্তের প্রাণদেবতা সেখানেই বিদ্যমান। শুধু কি সাধনায় ভক্তি থাকবে? সব কিছুতেই থাকবে ভক্তির প্রাণ—কর্মে ধর্মে ত্যাগে, সেবায় অশ্রুতে আনন্দে, সুখে দুঃখে, এমন কি মৃত্যুতেও। সবের মধ্যেই ভক্তির উৎসধারা ঝরবে! ভক্তির অভাব যেখানে—সেখানে প্রাণের অভাব। আর ভক্তির আসল কথাই হ'ল—আত্মমগ্ন রূপ; তাঁকে আপনার মাঝে খুঁজে বেড়ানো, আবার বিশ্বের সব কিছুর মাঝেও। পরম ভক্ত তার ভক্তির প্রাবল্যে প্রভুর সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায়। তার ভক্তি অনুষ্ঠানকে অতিক্রম করে যায়। অনন্ত সচ্চিদানন্দ-সাগরে কল্পিত সীমারেখা টেনে যে তোমার-আমার অস্তিত্ব, যে সীমারেখা ভক্ত আর ভগবানকে পৃথক্ করে রাখে, ভক্তি পরিণামে সে সীমারেখাটিও মুছে দেয়।

স্বরূপে ভগবানের রূপও নেই, নামও নেই; সেখানে তিনি নির্গুণ, নিরাকার। নাম-রূপ আশ্রয় করে তিনিই সাকার ঈশ্বর হয়েছেন, বিশ্ব হয়েছেন, আবার ভক্ত হয়েছেন। ভক্ত যেরূপে তাঁকে দেখতে চায়, সেরূপ ধরেই তিনি তাকে দেখা দেন। ভক্তের নাম-রূপ ভাব-ভক্তির আধার—ভাবভক্তি ধরে রাখবার একটা পাত্র। এ পাত্র ভগবানের আনন্দে কানায় কানায় ভরে ওঠার পরও যখন ভক্ত আরো আনন্দ পেতে চায়, তখন ভগবান সে পাত্রটিকে সীমাহীন করে দেন—ভক্তকে টেনে নেন নামরূপের পারে, মিশিয়ে নেন নিজস্বরূপে। নামরূপের স্বপ্ন—ভাব-ভক্তির মধুর স্বপ্নও—ভেঙ্গে দিয়ে তিনি তখন দেখিয়ে দেন যে তিনি "শুদ্ধ বোধস্বরূপ, এবং তিনি আমাদের সকলেরই স্বরূপ।" সে স্বরূপ পরমানন্দময়।

ডাঃ আলবার্ট সোয়েটজার

স্বামী তথাগতানন্দ

"There are no heroes of action : only heroes of renunciation and suffering ......Carlyle's Hero and Hero-worship is not a profound book." —Albert Schweitzer.

ইতিহাসের মহাপ্রাঙ্গণ শুধু কি ধূসর? সেখানে কি আমাদের অপদার্থতার, আমাদের সকল কলঙ্কচিহ্নের রক্ত-মাংসের প্রতিমাই আমরা দেখি? না। একথা সত্য যে যুগে যুগে মানুষ তাদের দানবোচিত আচরণের দ্বারা শুভ-বুদ্ধির শস্য-সবুজ ক্ষেতটাকে তছনছ করে দিয়েছে। তবুও একথা সত্য যে মরুর রুক্ষতাই সব নয়, সেখানে মরূদ্যানও আছে। দগ্ধ প্রান্তরের মাঝে মাঝে আছে শ্যামলিমাও। শ্মশানের দগ্ধ অঙ্গারের অক্ষরে আবার কেউ কেউ লেখেন সুশ্যামল কবিতা। ডাঃ সোয়েটজার এই ধরনের একজন মানুষ যিনি এই অভিশপ্ত শতাব্দীর মৃত্যু-জর্জর জীবনে এনেছেন প্রেমের বাণী, শান্তির বাণী। বিষবাণ-দগ্ধ পৃথিবীতে তিনি বিশল্য-করণী রূপেই আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়েছিলেন। অনেক কৃতী পুরুষকে আমরা দেখেছি, অনেক মনীষীর জীবন পৃথিবীকে ধন্য করেছে। অনেক হৃদয়বান ব্যক্তি এগিয়ে এসেছেন মানুষের সেবায়। তবুও ডাঃ সোয়েটজারের মতন ব্যক্তি বোধ হয় একান্ত দুর্লভ। তাঁর আত্মত্যাগের তুলনা নেই। মানুষের প্রতি তাঁর প্রেম যেন এক তপ্ত ক্ষুধা, এক তীব্র পিপাসা —এক অবিচ্ছিন্ন আর্তনাদ। তাঁর অপ্রগল্‌ভ আন্তরিকতা আমাদের মুগ্ধ করে। পরিপূর্ণ প্রেমই পরিপূর্ণ ধৈর্যে রূপান্তরিত হয়।

ছেলেবেলা থেকেই তাঁর দরদী অন্তঃকরণের পরিচয় পাওয়া যায়। একবার একটা বুড়ো ঘোড়াকে নির্মমভাবে প্রহারের দৃশ্য তাঁর সুকুমার মনে ভীষণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই দৃশ্যটা তাঁকে অনেক দিন বেদনা দিয়েছিল। সন্ধ্যা-কালে প্রত্যহ ভগবানকে প্রার্থনা করার সময় তিনি বলতেন: O Heavenly Father, protect and bless all things that breathe, guard them from all evils, and let them sleep in peace. প্রত্যেকটি প্রাণীর প্রতি তাঁর ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা, এবং উত্তরকালে তাঁর জীবন-দর্শনের মূলসূত্র Reverence for life—এই ভাবেই গড়ে উঠে।

সন্ধ্যাকালে তিনি পাখি মারার তাগ করছেন। চার্চের ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে। বালক সোয়েটজার আর তীর ছুঁড়তে পারলেন না। তাঁর মনে হলো: Thou shalt not kill. একটা নিগ্রোর প্রতিমূর্তি তাঁর মনে গভীর ব্যথার সঞ্চার করে। হতাশা-মলিন সেই চেহারার মধ্যে তিনি দেখলেন একটা পুঞ্জীভূত বেদনা যেন রূপ গ্রহণ করেছে। তাঁর কল্পনা-প্রবণ মন এই পাথরের মধ্যে একটা বাণীকে প্রত্যক্ষ করল। সভ্য দুনিয়ার হাতে আফ্রিকার লাঞ্ছনার ইতিহাস তিনি জানতেন।

ত্রিশ বছর বয়সের আগেই তিনি তিনটি বিষয়ে ডক্‌টরেট উপাধি পান—সঙ্গীত, ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনে। এবং একটি বিখ্যাত কলেজের অধ্যক্ষ হন। তাঁর যশগৌরবে সবাই মুগ্ধ হন। সঙ্গীত-পিপাসু মহলে তাঁর স্থান ছিল অতি উঁচুতে। তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর বয়স যখন ২৯, তখন তিনি

একটি মিশনারি পত্রিকায় আফ্রিকার সেবার জন্য ডাক্তারের বিজ্ঞাপন দেখেন। এই বিজ্ঞাপনের শেষের কথাগুলি তাঁর চিত্তকে আলোড়িত করে। শেষের কথাগুলো: "Men and women who can reply simply to Master's call, 'Lord, I am coming,' those are the people whom the church needs." সেবা, প্রেম—এ শব্দগুলো যেন অভিধানের বদ্ধ হাওয়া কাটিয়ে তাঁর জীবনে জীবন্ত হয়ে উঠল। তিনি চাকরি ছেড়ে মেডিকেল স্নাতক হবার জন্য কলেজে ভর্তি হলেন। তাঁর বান্ধবী নার্সের ট্রেনিং নিয়ে নিজেকে তৈরি করতে থাকেন। উত্তরকালে তিনি সুদীর্ঘ দিন স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে আফ্রিকায় সেবা করে গেছেন। ১৯১৩ সালে এই দম্পতী নিজেদের পয়সায় যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম কেনেন। এর জন্য যে টাকার প্রয়োজন তা তিনি গান গেয়ে উপায় করেন। এঁরা ঐ বছরেই সেখানে যান। সেই অনগ্রসর দেশে কাজ করা কি কঠিন তা আমরা বুঝতে পারি। তিনি ব্যক্তির মর্যাদাকে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানাতেন। সমষ্টির প্রত্যেক ব্যষ্টি-চরিত্রটিকে স্বকীয় মর্যাদায় দেখার মধ্যে একটি অভিনব জীবনদর্শন আছে। একেই বলে—'Reverence for life.' শুধু নিছক কর্তব্য পালনের একটি জড় বস্তুরূপে তিনি পরিণত হননি। বাইবেল তাঁর কাছে শুধু নিষ্প্রাণ-অক্ষরের অহল্যা ছিল না। সেগুলি তাঁর নিকট সত্য ও জীবন্ত ছিল। যীশুর অনির্বাণ নির্বাণবাণী তাঁকে উৎসাহিত করত, তাই সেগুলি তাঁর কাছে আদর্শের অগ্নি-দীপ্তিতে জ্যোতির্ময় হয়ে জ্বলত। প্রত্যেকটি রোগী তাঁর অমর্ত্য মহিমার সান্নিধ্যটুকু লাভ করে ধন্য হোত। প্রত্যেকে অনুভব করত আত্মীয়তার রক্তসম্পর্ক। সন্দেহের পৃথিবীতে একটা প্রাণের প্রদীপ তিনি জ্বেলে ধরতেন। নিখিল প্রাণের মধ্যে তিনি যীশুকেই দেখতেন। তাঁর সাধনা, তাঁর ভালবাসা, তাঁর সমগ্র জীবন দিয়ে তিনি যীশুকেই—তাঁর বাণীকেই প্রচার করে গেছেন। 'Making the lore of God credible'—এই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

Lambarence শুধু হাসপাতাল নয় পরন্তু একটি বিরাট আলোকস্তম্ভ, যা আমাদের অন্ধকারময় বৈশ্যযুগকে আলোকিত করতে পারে। সেই সত্যালোকে আমরা আমাদের প্রার্থিত ব্রাহ্মণ্য যুগে পৌছতে পারি। 'When you are in Rome, you must be a Roman' এই বাণীকে তিনি সার্থকরূপ দিয়েছেন। তাঁর হাসপাতালে আধুনিকতার স্পর্শ নেই। সেখানে টেলিফোন নেই, রেফ্রিজারেটর নেই, এমনকি বৈদ্যুতিক আলোর প্রাচুর্যনেই। "The hospital compound is without telephone, has no running water or refrigeration, has electricity only in the main building, which houses the tiny, antiquated operating theatre. Sterilisation is carried out in an outdoor lean-to and the only toilet is an outhouse for the use of the foreign staff.······Each of the doctors and nurses occupies a single room equipped with iron bed, enamel wash-basin and kerosene lamp; meals usually consist of fried bananas and other fruits. The old man stubbornly refuses to go modern." (Times, June 1963)

১৯৫১ সালে তিনি শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পান। মাঝে মাঝে তাঁকে সভ্য সমাজের সংস্পর্শে আসতে হোতো। খানিকটা হাসপাতালের টাকার জন্য। সুদীর্ঘ দিন কঠোর সংগ্রাম করে তিনি জগৎকে যাদিয়েছেন তা চিকিৎসা নয়, সেবা নয়, শুধু তথাকথিত প্রেম নয়, তিনি প্রাণী মাত্রকেই শ্রদ্ধা করতে

বলেছেন। প্রত্যেক প্রাণীকে সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন, কারণ নিখিল প্রাণের উৎসকে তিনি শ্রদ্ধা জানাতেন। যেখানে প্রাণের অভিব্যক্তি সেখানেই তিনি পূজা করেছেন। কাজেই তিনি দিয়েছেন বিশ্বকে, মানুষকে, প্রাণীমাত্রকেই শ্রদ্ধার মন্ত্র। তাঁর আজীবন কঠোর সংগ্রাম সেই আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ। কাজেই তাঁর সংস্পর্শে এসে আমাদের মনুষ্যত্বের উদ্বোধন হয়েছে—এটাই আমাদের বড় কথা। তিনি ছিলেন একজন ঋষি। কারণ তাঁর ধ্যানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এক জ্যোতির্ময় মন্ত্রকে—সেটি Reverence for life. জীবন-শ্রদ্ধারূপ অঞ্জন অনুলেপন করে সেই দৃষ্টিতে জীবনকে তিনি দেখলেন। এ এক অধ্যাত্ম-দ্যুতির প্রকাশ। তাঁর প্রজ্ঞার আলোকে আমরা যদি অনুপ্রাণিত হই তবে জীবনকে জড়রূপে আমরা দেখব না। দেখব চৈতন্যরূপে। মনুষ্যত্বের পূর্ণ মহিমা প্রভাতের অরুণ রেখার মতো অসীম সম্ভাব্যবতার গৌরবে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তাঁর এই আদর্শ আমাদের যুগ-চেতনাকে অনুপ্রাণিত করুক এই প্রার্থনা।

কর্ণায়ন

শ্রীভবতোষ শতপথী

জন্মসূত্রে আশৈশব মহাকাব্যে চির উপেক্ষিত!
বঞ্চিত শিশুর শিরে রৌদ্র-বৃষ্টি-তুষারপ্রবাহ!
হে বৈশাখ, বারংবার রক্তচক্ষু করোনা বিস্তার!
আজন্ম কণ্টক-শয্যা : দারিদ্র্যের দাহদীর্ণদেহ!

দৈবশক্তি দান কর, আর্যপুত্র দুর্জয় অর্জুনে,
হে দেবতা, শুনিবনা কাল্পনিক স্বর্গের বর্ণনা;
অস্ত্র দাও : মন্ত্র দাও, যুক্তি দাও, ইন্দ্রের নন্দনে,
সূতপুত্র কর্ণ কভু, করিবেনা কাতর প্রার্থনা!

মৃত্যুভয়ে, আর্ত নহে : বীরত্বের উদাত্ত-আহ্বান!
সখ্যতায় বশীভূত : নতুবা সে বাধাবন্ধহীন!
কর্ণ করে আত্মত্যাগ, কর্ণ হতে চায় কীর্তিমান!
মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম ক্লান্তিহীন দিগন্তে উড্ডীন!

বাহুবলে অস্ত্রশুদ্ধ দৃঢ়বদ্ধ মূর্ত মানবতা,
সত্যনিষ্ঠ শ্বেতশঙ্খ! আত্মমর্যাদার একাগ্রতা।

সমালোচনা

তিব্বতের পথে হিমালয়ে—স্বামী অখণ্ডানন্দ। প্রকাশক: স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ ১৮১; মূল্য ২·২৫।

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপার্ষদ পূজ্যপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের ভ্রমণকাহিনী যেমন রোমাঞ্চকর ও নানা অভিজ্ঞতায় পূর্ণ, তেমনি উচ্চ অধ্যাত্মভাবোদ্দীপকও। এই ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠকচিত্তকে শুধু মুগ্ধ করে না, সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে দুর্জয় সাহস ও ভ্রমণের কৌতূহল জাগাইয়া দেয়। স্বামী অখণ্ডানন্দজী সতের বৎসর বয়সে একাকী কপর্দকহীন অবস্থায় ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে পদব্রজে হরিদ্বার হইতে রওনা হইয়া ৩/৪ বৎসর তিব্বতের নানাস্থানে কী অসীম সাহসিকতা ও ভগবদ্বিশ্বাস লইয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার সরস লেখনীমুখে প্রাণবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভাবমাধুর্য ও রচনা-পারিপাট্যে বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণ-বিষয়ক পুস্তকাবলীর মধ্যে পুস্তকখানি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। সম্প্রতি প্রকাশিত এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে স্বামী অখণ্ডানন্দজীর হিমালয় অঞ্চলে সমগ্র ভ্রমণের একটি রূপরেখা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

যুগদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীপ্রলয় সেন॥ প্রকাশক—প্রতিমা পুস্তক, ১৩৯-ডি-১ আনন্দ পালিত রোড, কলিকাতা ১৪। মূল্য দু টাকা।

মহৎ মানুষের জীবন চিরকালই আমাদের কাছে মহত্তর পথের দিশারী। তেমনি এক মহত্তম জীবন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের। তাঁর জীবন ও বাণী আলোচনা করে দেশ-বিদেশের খ্যাত-অখ্যাত বহুজনই নিজেদের ধন্য মনে করেছেন। শ্রীপ্রলয় সেন মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন অবলম্বন করে 'যুগদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থখানি রচনা করেছেন। এ কাজ করতে গিয়ে লেখক রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবকালে সামাজিক পরিবেশটি যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি আবার ঠাকুরের বাল্য থেকে শুরু করে সারাজীবনের সকল ঘটনাই যথাস্থানে পরিবেশন করেছেন। জীবনী ছাড়াও গ্রন্থের শেষাংশে লেখক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কিছু কথামৃতও উপহার দিয়েছেন। সবশেষে 'ধর্মভাষ্য' বলে একটি অংশে সেকাল ও একালের ধর্মাচার্যদের মতামত সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন এবং সেই সঙ্গে এই সব মতারণ্যের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুসৃত পথটিও দেখানোর চেষ্টা করেছেন। জ্ঞান-ভক্তি-কর্মের ত্রিবেণী-সঙ্গমে নিত্য অবগাহন করেই না ঠাকুর বলতে পেরেছেন—যত মত তত পথ।

গ্রন্থটি আরও কিছু পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। মুদ্রাকর-প্রমাদ-বাহুল্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক। তাছাড়া গ্রন্থটির তৃতীয় পৃষ্ঠায় লেখকের ভাষ্য—"'জীবে দয়া করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'—রামকৃষ্ণদেবের এই জনসেবার মন্ত্র একদা তাঁর সুযোগ্য শিষ্য বিবেকানন্দের মারফৎ বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছিল।"—কথাটি যথার্থ নয়। লেখাটা স্বামী বিবেকানন্দের। আর, দয়া' নয়, 'প্রেম'। সেই মানব-সেবাদর্শই বিবেকানন্দের।

—শ্রীঅনন্তকুমার রাণা

শ্রীশ্রীরামঠাকুর প্রসঙ্গে॥ শ্রীশ্রীরামঠাকুর সকাশে॥ শ্রীপ্রলয় সেন, প্রকাশক

—প্রতিমা পুস্তক, ১৩৯-ডি-১ আনন্দ পালিত রোড, কলিকাতা ১৪। মূল্য ৫+২·৫০।

শ্রীশ্রীরামঠাকুরের জীবনী ও বাণী অবলম্বন করে দুখানি গ্রন্থ রচিত। সাধক শ্রীশ্রীরাম-ঠাকুরের অলৌকিক জীবনকাহিনী উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে পরিবেশিত হয়েছে। শ্রীশ্রীরামঠাকুর সহস্র ভক্তের বিনম্র হৃদয়ের আসনে উপবিষ্ট।

এদেশ মহাপুরুষদের পদরেণুপূত ভূমি। তাই এদেশে কোনকালেই ভক্তমানুষের অভাব ঘটেনি। সেই ভক্তসমাজে লেখকের এই গ্রন্থদ্বয় বহুল প্রচারিত হোক।

—শ্রীঅনন্তকুমার রাণা

যুগধর্ম—শ্রীপ্রতুলচন্দ্র চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক, প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘ, পোঃ ইটাচুনা, জেলা হুগলী। পৃষ্ঠা ১১৪; মূল্য এক টাকা।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সুধী লেখকের যে ১৪টি সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা একত্র সন্নিবেশিত হইয়া বর্তমান গ্রন্থের রূপ লাভ করিয়াছে। প্রবন্ধগুলিতে গভীর মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। জাতিগঠনে নানা সমস্যার সমাধানে দেশবাসী যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশ লাভ করিবেন। এই গ্রন্থে ভারতে সাম্যবাদ, ভাষাসমস্যা, বাংলার নারীসমাজ, শিক্ষার সঙ্কট, শিক্ষাক্ষেত্রে বেদান্তের ব্যবহারিক প্রয়োগ, ইতিহাসে ধর্মের ভূমিকা, শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবের তাৎপর্য প্রভৃতি বিষয় স্বামীজীর ভাবানুধ্যানে সুষ্ঠুভাবে আলোচিত দেখিয়া আমরা আনন্দিত।

শ্রীম-দর্শন (তৃতীয় ভাগ)—স্বামী নিত্যাত্মানন্দ। প্রকাশক: শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস, জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩। পৃষ্ঠা ৩৩৬; মূল্য ৫৲।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত'-কার শ্রীম (শ্রীমহেন্দ্র-নাথ গুপ্ত) ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণময়। যাঁহাদের তাঁহাকে দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছে, তাঁহারাই জানেন তিনি কিরূপ তন্ময় হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকে উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আলোচনা করিয়া শ্রোতাদের হৃদয়মন ঈশ্বরীয় ভাবে আপ্লুত করিতেন। ভক্তগণের সহিত এই সব আধ্যাত্মিক আলোচনা স্বামী নিত্যাত্মানন্দ তাঁহার ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; তাহাই পর্যায়ক্রমে প্রকাশ করিতেছেন; আলোচ্য পুস্তকখানি তাঁহার ডায়েরীর তৃতীয় খণ্ডরূপে প্রকাশিত। এই পুস্তকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুস্তকে আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি: শ্রীরামকৃষ্ণের পথ সহজ ও স্বাভাবিক, মুক্ত হবে কবে—'আমি মরবে যবে', ঈশ্বরের দর্শনের কথাই ভারতের ইতিহাস, স্বামীজীকে বোঝবার সময় হয় নাই এখনও, আদর্শ গৃহীভক্ত ও আদর্শ সন্ন্যাসী। আশা করি ইতিপূর্বে প্রকাশিত দুই খণ্ডের মত এই খণ্ডটিও ভক্তবৃন্দের সমাদর লাভ করিবে।

সাধক-সোপান: স্বামী বিষ্ণু পুরী। প্রকাশক—ব্রহ্মচারী সত্যব্রত, পরমার্থ-সাধক সঙ্ঘ, ডি ৫৩।১০৫, ছোটী গৈবী, বারাণসী ১। পৃষ্ঠা ৪২৮; মূল্য টাকা ৩·৫০।

বেদান্তমতে মানুষ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ। পাপ-তাপ অনাদি অবিদ্যা বা অজ্ঞানেরই ফল-মাত্র। অজ্ঞান দূর করাই সাধনার মূল কথা।

আলোচ্য গ্রন্থে বিভিন্ন সাধনার মাধ্যমে কিভাবে এই অজ্ঞান তিরোহিত হয়, তাহা সুন্দরভাবে বিবৃত। 'আনন্দের সন্ধানে', 'আনন্দলাভের উপায়', 'মূর্তিপূজা', 'প্রণব উপাসনা', 'অবতারবাদ', 'অভেদবাদ'—গ্রন্থের এই কয়টি পরিচ্ছেদ। সংলাপের ভঙ্গী অনুসৃত

হওয়ায় এবং উপযুক্ত স্থানে ছোট ছোট হৃদয়-গ্রাহী গল্প থাকায় উচ্চতত্ত্ব সহজবোধ্য হইয়াছে।

গ্রন্থটির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, কোন সাধন-পদ্ধতিরই মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া যাহার যে স্থান তাহাই যথাযথ নির্দেশ করা হইয়াছে, বেশী বা কম বলা হয় নাই, কোনটিকে উপেক্ষাও করা হয় নাই। দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের মধ্যে প্রচলিত মতদ্বৈধগুলির উপর যে বিচার উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহা প্রশংসনীয়।

ডক্টর রমা চৌধুরী ভূমিকায় লিখিয়াছেন: 'গ্রন্থটি মুমুক্ষুজনের যে আনন্দ-উৎসের সন্ধান দেবে, তা নিঃসন্দেহ।' আমরাও ইহা সমর্থন করি।

Swami Vivekananda Birth Anniversary Souvenir—1965.

Published by Swami Nirjarananda, Ramakrishna Mission Ashrama, Baranagore, Calcutta 36.

স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত এই স্মরণিকায় কয়েকটি উৎকৃষ্ট ইংরেজী ও বাংলা প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে। 'ধর্মতত্ত্ব' (১লা অক্টোবর, ১৮৭৯), 'সুলভ সমাচার' (৩০শে জুলাই, ১৮৮১) এবং 'Indian Mirror' (28th March, 1875; 20th February, 1876 and 15th June, 1879)—এই সমসাময়িক সংবাদপত্র-গুলিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে প্রকাশিত মন্তব্য একত্র পাওয়া সহজ নয়। আলোচ্য পত্রিকাটিতে এইগুলি সন্নিবেশিত হওয়ায় ইহার মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্মরণিকাটিতে বিষয়সূচীর অভাব অনুভূত হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ (সংসারীদের প্রতি): সঙ্কলক—শ্রীঅজিত ঘোষ, ২৪নং পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা ৯ হইতে শ্রীঅমিয় ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৩২; মূল্য ৩০ প.।

পকেট-সংস্করণ এই পুস্তিকায় আদর্শ গৃহস্থ জীবন যাপনে সহায়ক উপদেশগুলি সঙ্কলন-দক্ষতার পরিচয় প্রদান করে।

উপনিষদ্ অঞ্জলি: (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্: মূল সংস্কৃত ও কবিতানুবাদ)—পুষ্পদেবী, সরস্বতী, শ্রুতিভারতী, ১ ডঃ শ্যামাদাস রো, কলিকাতা ১৯। পৃষ্ঠা ২৩০, মূল্য ৩৲।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ যেমন আকারে বৃহৎ, ভাবসম্পদেও তেমনি অতুলনীয়। এই গ্রন্থ সংস্কৃত গদ্যে লিপিবদ্ধ, মাঝে মাঝে অবশ্য দু-একটি ছন্দোবদ্ধ শ্লোক দৃষ্ট হয়। প্রাচীন সংস্কৃত গদ্যকে কবিতায় অনুবাদ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুধী গ্রন্থকর্ত্রী এই দুরূহ কর্মে হস্তক্ষেপ করিয়া যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। অনুবাদ অধিকাংশ স্থলেই ভাবানুবাদ, এবং স্থানে স্থানে ব্যাখ্যামূলক হইলেও গ্রন্থের মূলভাব ব্যাহত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। ভাষার স্বচ্ছতা ও সাবলীলতা আছে, তবে ছন্দবৈচিত্র্য থাকিলে আরও সুন্দর হইত। মূল্য সুলভ। এই কাব্য-গ্রন্থখানি সর্বসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচারিত হইয়া বাংলার ঘরে ঘরে উপনিষদের মহাবাণী প্রচার করিবে, আশা করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয় পত্রিকা (বিশেষ সংখ্যা, ১৯৬২-৬৩): সম্পাদক—শ্রীহৃষীকেশ চক্রবর্তী। শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয়, ১০৬ নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬৮।

স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত এই বিশেষ সংখ্যাখানি সেই মহাজীবনের উদ্দেশে সার্থক শ্রদ্ধাঞ্জলি। অধিকাংশ রচনাই প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রগণের। লোকোত্তর চরিত্রের অনুধ্যান তরুণদের লেখনীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া আনন্দ হয়। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনা হিসাবে উল্লেখযোগ্য: 'শ্রীবিবেকানন্দস্য জীবনবেদঃ' (সংস্কৃত প্রবন্ধ), 'পরিচয়' (স্বামীজীর দিব্য জীবনের নির্বাচিত ঘটনার নাট্যরূপ), 'ঐ দুটি চোখ' (কবিতা)।

আসামী ও অন্যান্য ভাষায় প্রকাশন :

বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ কর্তৃক ভাষান্তরিত। প্রকাশক : স্বামী ভব্যানন্দ, সম্পাদক শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, শিলং, আসাম।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ : দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৬, মূল্য ৩০ পয়সা।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র ও লীলা-পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ কর্তৃক সঙ্কলিত এই বাংলা অমূল্য পুস্তকখানি সর্বজন-পরিচিত। আসামী ভাষায় ইহার সাবলীল অনুবাদের মাধ্যমে আসামের ভক্তবৃন্দ আত্মজ্ঞান, ঈশ্বর, অবতার, গুরু, সাধনের অধিকারী, ভগবৎ-কৃপা, সিদ্ধ অবস্থা, সর্বধর্মসমন্বয়, যুগধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীর সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন। পুস্তকের প্রারম্ভে শ্রীরামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত জীবনী সন্নিবেশিত।

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আসামী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে :

কর্মযোগ : (স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত—১৯৬৩); পৃষ্ঠা ১৫২; মূল্য টাকা ১·৫০। আসামের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীমহাদেব শর্মা স্বামীজীর কর্মযোগের স্বচ্ছ অনুবাদ করিয়াছেন।

চিকাগো বক্তৃতা : অনুবাদক—শ্রীমহাদেব শর্মা ; পৃষ্ঠা ৫০ ; মূল্য ৬৫ পয়সা।

দেববাণী : আমেরিকায় Thousand Island Park-এ (সহস্র দ্বীপোদ্যানে) প্রদত্ত ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ। অনুবাদক শ্রীমহাদেব শর্মা ; পৃষ্ঠা ৪০ ; মূল্য ৭৫ পয়সা।

ভারতবর্ষের ঋষি-মুনিসকল : অনুবাদক শ্রীমহাদেব শর্মা ; পৃষ্ঠা ৪০ ; মূল্য ৫০ পয়সা।

স্বামী বিবেকানন্দ-বাণীসংগ্রহ : (স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী প্রকাশন—১৯৬৪), "Selections from Swami Vivekananda"-ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ। অনুবাদক : শ্রীমহাদেব শর্মা ; পৃষ্ঠা ২৭৫ ; মূল্য টাকা ৩·৫০।

বর্তমানে সর্বত্র ব্যাপকভাবে স্বামীজীর ভাবাদর্শ প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই সচেতন। আসামবাসীরা, বিশেষ করিয়া আসামের ছাত্রসমাজ অনূদিত পুস্তকগুলির মাধ্যমে স্বামীজীর বলিষ্ঠ ও প্রাণ-প্রদ ভাবের সংস্পর্শে আসিয়া জীবনে নূতন উদ্দীপনা ও প্রেরণা লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ : স্বামী বিবেকানন্দ শতবর্ষজয়ন্তী প্রকাশিত স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ কর্তৃক বাংলা ভাষায় রচিত 'স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থের আসামী ভাষায় অনুবাদ ; অনুবাদক—শ্রীনির্মলেশ্বর শর্মা ; প্রকাশক শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, শিলং। পৃষ্ঠা ১১১ ; মূল্য ১৲।

আসামী ভাষা ছাড়া গ্রন্থটি আরো কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে : উড়িয়া ভাষায় প্রকাশক : শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ভুবনেশ্বর, মূল্য ১৲।

গুরুমুখী ভাষায় প্রকাশক : শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন, নিউ দিল্লী। পৃষ্ঠা ১৭৬ ; মূল্য টাকা ১·৭৫ পয়সা।

হিন্দী ভাষায় প্রকাশক : স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ শতবর্ষজয়ন্তী, ১৬৩, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। অনুবাদক—শ্রীগোপাল চন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রী ; পৃষ্ঠা ১৪৩ ; মূল্য ১৲।

ল'রার বিবেকানন্দ : স্বামী বিবেকানন্দ শতবর্ষজয়ন্তী প্রকাশিত স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ কর্তৃক বাংলা ভাষায় রচিত 'শিশুদের বিবেকানন্দ' গ্রন্থের আসামী ভাষায় অনুবাদ ; অনুবাদক—শ্রীমুক্তিনাথ বরদলৈ ; প্রকাশক—শিলং শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ; মূল্য ১·২৫ টাকা।

আসামী ভাষা ছাড়া গ্রন্থটি আরো কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে :

হিন্দী ভাষায়—'নহে মুন্নোকে বিবেকানন্দ' ; অনুবাদক - শ্রীব্রজনন্দন সিংহ ; প্রকাশক—স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী।

গুজরাটী ভাষায়—অনুবাদক স্বামী চৈতন্যানন্দ ; প্রকাশক—রাজকোট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, গুজরাট। মূল্য ১৲।

ইংরেজী ভাষায়—'Vivekananda for Children'—অনুবাদক—শ্রী কে. সি. সেন ; প্রকাশক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ শতবর্ষ জয়ন্তী, ১৬৩ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য ১৲।

মালয়ালম ভাষায়—অনুবাদক স্বামী মৃড়ানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ত্রিচুড়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

বেলুড় মঠে যথাযোগ্য ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে মৃন্ময়ী প্রতিমায় জগজ্জননী শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর উপাসনা বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকামতে (১লা অক্টোবর সপ্তমী হইতে ৫ই অক্টোবর দশমী পর্যন্ত) পাঁচদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূজার কয়দিন আবহাওয়া ভাল ছিল বলিয়া মঠে পূজা ও প্রতিমা দর্শনের অসুবিধা হয় নাই। ২রা অক্টোবর কুমারীপূজা ও ৩রা অক্টোবর প্রাতঃকালে সন্ধিপূজা যথারীতি ভাবপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শত শত ভক্ত শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর উদ্দেশে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন। বর্তমান পরিস্থিতিজনিত খাদ্যাভাবের জন্য এবার অন্ন-প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। শ্রীশ্রীবিজয়াদশমীর আন্দোৎসবও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

আমেরিকায় বেদান্ত

স্যানফ্রন্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটি**:** নূতন মন্দিরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়; পুরাতন মন্দিরে ঈশোপনিদ্ ও নারদীয় ভক্তিসূত্রের ক্লাস অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

মে, ১৯৬৫**:** শক্তিচর্চা ও নির্ভীকতা; সূক্ষ্ম ও সুদূরপ্রসারী প্রাচীন পদ্ধতি; শরণাগতি; নিঃসঙ্গ কিন্তু একাকী নয়; শ্রীবুদ্ধ ও নির্বাণ; আধ্যাত্মিক অনুভূতি; সাংসারিক কর্তব্য ও অধ্যাত্ম-জীবন; যোগীর জীবন; আধ্যাত্মিক রূপান্তরের পঞ্চশক্তি।

জুন**:** আমাদের জীবনীশক্তিকে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন করা; পবিত্রতার শক্তি; মনের তত্ত্বানুসন্ধান; জীবনের প্রয়োজনীয় প্রশ্নসমাধানে বুদ্ধের উত্তর; আত্মবিশ্বাসী হও; নিশ্চিন্তভাবে জীবন যাপন; কর্তব্য সম্বন্ধে হিন্দুদের ধারণা; অন্তঃস্থৈর্য যা আমাদের প্রয়োজন; ধর্ম সকলের জন্য নয়।

জুলাই**:** স্বামী বিবেকানন্দ ও স্যান-ফ্রান্সিস্কো।

অগস্ট**:** গ্রীষ্মাবকাশের জন্য এই মাসে কোন বক্তৃতা হয় নাই।

সেপ্টেম্বর**:** অতীন্দ্রিয়ত্ব-লাভের উপায়; শরণাগতের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাস-বাণী; সমালোচনামূলক বৃত্তিগুলির আধ্যাত্মিকীকরণ; যোগসহায়ে প্রাচ্য আদর্শে জীবনের পুনর্গঠন।

কার্যবিবরণী

রেঙ্গুন: সমগ্র ব্রহ্মদেশে সুপরিচিত রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটির ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত পরিচিতি:

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রেঙ্গুনে কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্তের দ্বারা ধ্যান ভজন পাঠ ও জনসেবার উদ্দেশ্যে সোসাইটি গঠিত হয়। কয়েক বৎসর নানা অবস্থার মধ্য দিয়া চলিবার পর ১৯২১ খৃষ্টাব্দে সোসাইটি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম কেন্দ্ররূপে অন্তর্ভুক্তি লাভ করে।

বর্তমানে রেঙ্গুনের বোটাটঙ্গ প্যাগোডা রোডে (230 Botataung Pagoda Road) সোসাইটির নিজস্ব ভবনে ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষামূলক কর্মধারা অনুসৃত হয়।

সোসাইটি-পরিচালিত বিরাট গ্রন্থাগারে ৭টি ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের ৪০,৯৭০ খানি গ্রন্থ আছে। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে ৪০,১৭৫ খানি পুস্তক পঠনার্থে প্রদত্ত হইয়াছিল।

পাঠাগারে ইংরেজী, বাংলা, বর্মী, হিন্দী,

গুজরাতী, তামিল, তেলুগু ও উর্দু ভাষার পত্র-পত্রিকা রাখা হয়। ২৫টি দৈনিক ও ১১৬টি সাময়িক পত্রিকা আলোচ্য বর্ষে নিয়মিতভাবে লওয়া হইয়াছে।

পাঠাগারে গড়ে দৈনিক পাঠক-সংখ্যার তুলনা :

বর্ষ	১৯৫৮	'৫৯	'৬০	'৬১	'৬২
পাঠক	২২৫	৩২৫	৩৫০	৩৭৫	৪০০	৪০০

৫৬টি সাধারণ সভা, এবং গীতা, বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ও মহাপুরুষবাণী অবলম্বনে ৩২৯টি ক্লাস অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র দেখানো হয় এবং শহরের নানাস্থানে ও বাহিরে বক্তৃতাদি দেওয়া হয়। বিভিন্ন ধর্মের আচার্যগণের জন্মদিন যথাযথভাবে পালন করা হয়। বর্মী ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণবাণী, চিন্তার শক্তি ও খৃষ্টের উপদেশ প্রকাশ করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে বিবিধ মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামীজীর শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সোসাইটির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংবাদ।

মনসাদ্বীপ : শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৫৯-৬৪ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ২৪ পরগনা জেলার সাগরদ্বীপের একটি গ্রামে আদর্শ শিক্ষাবিস্তারের সার্থক প্রচেষ্টা এই কেন্দ্রের মাধ্যমে করা হইতেছে। প্রতিষ্ঠাকাল হইতে আশ্রমটি দীর্ঘ ৩৫ বৎসর ধরিয়া গ্রামবাসী জনসাধারণকে প্রকৃত শিক্ষিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া আসিতেছে। যখন এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এতদঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারের কোন প্রচেষ্টা ছিল না। প্রথমে আশ্রমে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, পরে উহা ক্রমশঃ মধ্য ও উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। পরে একটি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং কয়েক বৎসর হইল একটি সমাজশিক্ষা কেন্দ্রও আশ্রমে স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যালয়গুলি হইতে অনেক ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চতর শিক্ষালাভ করিয়া সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

নানাবিধ বাধাবিঘ্ন ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থাকিয়া আশ্রম লক্ষ্যে পৌঁছিতে সচেষ্ট। শতকরা ৪০ জন ছাত্রকে আশ্রম হইতে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া অন্যান্য প্রকারেও সাময়িক সাহায্য দান করা হয়। বেলুড় মঠ হইতেও এখানকার কিছু ছাত্র সাহায্য পায়। উপর্যুপরি অজন্মার জন্য সাগরদ্বীপে খাদ্যাভাব ও অন্যান্য অভাব দেখা দেয়। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ও ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের কয়েক মাসে দরিদ্রদের মধ্যে কিছু কিছু 'রিলিফ' দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই সময়ে অর্থ এবং নূতন ও পুরাতন বস্ত্রাদি বিতরণ করা হইয়াছিল।

বিদ্যালয়গুলিতে গড়ে প্রতি বৎসর ৪৫০-৫০০ ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করিবার সুযোগ পায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় সকলেই উত্তীর্ণ হয়। ১৯৬০-৬১ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ-সাহায্যে 'বিবেকানন্দ বিজ্ঞানভবন' নির্মিত হইয়াছে এবং রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার যাবতীয় সাজসরঞ্জাম ক্রয় করা হইয়াছে। জনসাধারণ আশ্রম-পরিচালিত পাঠাগারটির উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিতেছেন। আশ্রম-সংলগ্ন জমিতে ছাত্রাবাসের ও বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ফল, ফুল ও সব্জির চাষ-আবাদ করে। অর্থাভাবের দরুন বড় রকমের ছাত্রাবাস করা সম্ভব হইতেছে না। শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৩-৬৪ খৃষ্টাব্দে স্বামীজীর জন্মশত-বার্ষিকী বিবিধ অনুষ্ঠানসূচী সহায়ে উদ্‌যাপিত হইয়াছিল।

বেলুড় মঠে সাধুসম্মেলন

গত ১৪ই অক্টোবর হইতে ১৬ই অক্টোবর পর্যন্ত বেলুড় মঠে দিবসত্রয়ব্যাপী সাধু-সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কেন্দ্রগুলি হইতে বহু সাধু আসিয়া এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে অশ্রুমতী সেন

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর মন্ত্রশিষ্যা অশ্রুমতী সেন গত ২৯শে ভাদ্র ১৩৭২, নব্বই বৎসর বয়সে কলিকাতায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলায় বিক্রমপুর পরগনার নেত্রাবতী গ্রামে তাঁহার বাড়ী ছিল। তাঁহার স্বামী ৺ ব্রজনাথ সেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, শিক্ষাব্রতী ও শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাঁহারা গ্রামের বাড়ীতে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সাধু ও ভক্তদের সেবায় এই ভক্তিমতী মহিলার বিশেষ অনুরাগ ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মে তাঁহার আত্মার সদ্গতি হউক—এই প্রার্থনা।

ভারতের সংবাদপত্রবিষয়ক তথ্য

প্রেস-রেজিস্ট্রারের ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে দৈনিক পত্রিকা এবং সাময়িক পত্রিকার প্রচারসংখ্যা শতকরা ৬·২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। দশখানি দৈনিক পত্রিকার প্রচারসংখ্যা এক লক্ষেরও অধিক। ইহাদের মধ্যে বাংলা দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার স্থান সর্বোচ্চে, ইহার প্রচারসংখ্যা ১,৬১,৮০৯। শতকরা ৭২·৯ ভাগ দৈনিক পত্রিকার প্রচারসংখ্যা ১০ হাজারের নিচে।

১৪টি সাময়িক পত্রিকার প্রচারসংখ্যা লক্ষাধিক। মাদ্রাজের কুমুদম পত্রিকা ইহাদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, ইহার প্রচারসংখ্যা ৩,০৫,১৪৬। ইংরেজী ভাষায় মুদ্রিত সাময়িক পত্রিকাগুলির মোট প্রচারসংখ্যা অন্যান্য ভাষায় মুদ্রিত সাময়িক পত্রিকাগুলি অপেক্ষা অধিক।

দিল্লী, কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই চারিটি বৃহৎ শহরেই সমস্ত পত্রিকার মোট প্রচারসংখ্যার অর্ধেকের বেশি (শতকরা ৫০·৯) প্রচারিত হইয়া থাকে।

১৪টি প্রধান ভাষা ছাড়াও সিন্ধী, মণিপুরী ও কঙ্কনী ভাষায় দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে বাংলা ভাষায় মোট ৫৬০ খানি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে ৭ খানি দৈনিক ও ১৬৪ খানি সাপ্তাহিক।

দিব্য বাণী

অর্জুন উবাচ

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ —গীতা, ৬।৩৪

হে কৃষ্ণ, মন যে সদা চঞ্চল, প্রবল সে যে, দৃঢ় অতিশয়,
বিক্ষোভ জাগায় সদা দেহেন্দ্রিয়'পর !
সে মনেরে বশে আনা, বাতাসেরে আজ্ঞাধীন করিবার মত
মনে হয় সুকঠিন, অতীব দুষ্কর।

শ্রীভগবানুবাচ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ ৩৫

মন যে চঞ্চল অতি, তাহারে নিগ্রহ করা—সংযত করিয়া রাখা
অতীব কঠিন কাজ, সংশয় কি তায় !
তবু জেনো, হে কৌন্তেয়, বৈরাগ্য সহায়ে আর অভ্যাসের বলে
তাহারেও আপনার বশে আনা যায় !

কথাপ্রসঙ্গে

খাদ্য-সঙ্কট

স্বাধীনতা লাভের পর পরপর কয়েকটি আঘাত আসার ফলে আমাদের দৃষ্টি ক্রমে স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছে। কেবল সজ্জন হইলেই জগতে বাঁচা যায় না, মহৎ-আদর্শনিষ্ঠ সৎ লোকের সংখ্যাধিক্য জগতে আসিতে এখনো অনেক দেরী, জগতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও করিতে হয় নতুবা আঘাতে চূর্ণ হইবার সমূহ সম্ভাবনা - একথা আজ আমরা মনে প্রাণে বুঝিয়াছি। বুঝিয়াছি, নিজের শক্তিবৃদ্ধি না করিয়া অপরের মুখ চাহিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না; বুঝিয়াছি, বহির্জগতে ন্যায়-বিচারের আশা বৃথা, আজিও শক্তিমানদের ইচ্ছা ও প্রয়োজন মত সত্য ও ন্যায় বিকৃতরূপ ধারণ করে। সাম্প্রতিক আর একটি আঘাতে বুঝিয়াছি, উদরপূরণের জন্য অপরের মুখ চাহিয়া থাকাও বিপজ্জনক; ব্যক্তিগত জীবনে যেমন, রাষ্ট্রগত জীবনেও তেমনি—নিঃস্বার্থ সহানুভূতি অতি বিরল।

আশার কথা, নিজেকে শক্তিমান করিয়া তোলার দিকে আমরা বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়াছি। সব চেয়ে বড় কথা, জাতির ইচ্ছাশক্তি অধিকতর বিকশিত ও সুদৃঢ় হইতেছে। ভারতের ভাগ্যবিধাতার কৃপায়, মনে হয়, আত্মরক্ষায় ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রয়োজন হইলে সারা জগৎ বিরোধিতা করিলেও উন্নতশিরে রুখিয়া দাঁড়াইবার মত ইচ্ছাশক্তির অধিকারী আমরা হইয়াছি।

এই দিকটির অগ্রগতি আশার আলোক-সম্পাত করে জাতীয় জীবনের উন্নতির অপর দিকগুলিতেও। এভাবে ক্রমে ক্রমে আমরা সব দিকেই নিঃসংশয় বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অগ্রসর হইব সন্দেহ নাই।

খাদ্যের জন্য দেশকে কষ্টের মধ্য দিয়াই চলিতে হইতেছে; আজ এই বিশেষ সঙ্কটের মুহূর্তে আমরা আত্মসম্মান রক্ষা ও জাতীয় কল্যাণের জন্য অধিকতর কঠোরতাবরণের সঙ্কল্প করিয়াছি। খাদ্য-পরিস্থিতি আজ আমাদের অধিকতর খাদ্য-উৎপাদনে, খাদ্যের অপচয়-নিবারণে ও কঠোরতাবরণে নিবদ্ধদৃষ্টি করিয়াছে। উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণ যাহাতে বর্ধিত হয়, উৎপন্ন খাদ্যের কোনওরূপ অপচয় যাহাতে না হয়, তাহার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। আর সপ্তাহে একবেলা আহার না করার কষ্টকেও— স্বেচ্ছায় বরণ করিতে হইবে। স্বেচ্ছায় না করিলেও অদূর ভবিষ্যতে বোধ হয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও উহা গ্রহণ করা ছাড়া উপায়ান্তর থাকিবে না। খাদ্যের ঘাটতি যে সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে নাকি এভাবে চলিলে পরমুখাপেক্ষী না হইয়াও আমরা সঙ্কটটিকে কোনওরূপে এড়াইয়া যাইতে পারিব। অধিকতর খাদ্য-উৎপাদনে সচেষ্ট হইবামাত্রই খাদ্যের পরিমাণ বাড়িবে না, উহা সময়সাপেক্ষ।

এই সঙ্কট-মুহূর্তে খাদ্যের অপচয়ের মত অপরাধ আর নাই। ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য অপরের সর্বনাশ সাধন করিবার মত লোকের সংখ্যা এখনো কম নয়; এই অবস্থার মধ্যেও আমাদেরই কেহ কেহ গোপনে বিদেশে খাদ্য-দ্রব্য পাঠাইতেছে। খাদ্যভাণ্ডার রক্ষার জন্য ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অবহেলায় প্রচুর খাদ্য নষ্টও হইতেছে। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় অন্যায় উপায়ে অর্থাগমের কতকগুলি সুযোগ আসিয়া-

ছিল। সে সুযোগগুলির সদ্ব্যবহার আমাদের ভিতর অনেকেই করিয়াছিলেন। সেই অভ্যাসের প্রভাব ক্রমবিস্তৃত হইয়াছে এবং এখনও রহিয়াছে। তাছাড়া বর্তমান প্রগতিশীল জগতের বহুবিধ ভাল-মন্দ চিন্তাধারা সর্বত্রই অবাধে প্রবাহিত হইতেছে; গভীরভাবে চিন্তা করিয়া সেগুলির ভালমন্দ সব দিক বিচার না করিয়াই আমরা অনেকেই জাতীয় জীবনের নিজস্ব আশ্রয়ভূমি হইতে নোঙর তুলিয়া সেই স্রোতে জীবনতরী ভাসাইয়া দিয়াছি। ফলে ভালমন্দ-নির্ণয়ের মাপকাঠিও পাল্টাইয়া যাইতেছে। তাহাতেও ক্ষতি হইত না, যদি চরিত্রের দৃঢ়তা থাকিত, যদি প্রবল স্রোতের মুখেও হালটি দৃঢ়হস্তে ধরিয়া থাকিবার শক্তি থাকিত। কিন্তু বহুক্ষেত্রে তাহারও অভাব ঘটিয়াছে। ফলে স্বার্থমাত্রসম্বল বেপরোয়া অন্যায়কারীর সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহার প্রতিকার এখন করিতেই হইবে। যাঁহারা অন্যায়ের পথে দীর্ঘকাল রহিয়াছেন, আইনের প্রয়োগক্ষেত্রে আন্তরিকতা, সামর্থ্য ও সাফল্যের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা ছাড়া তাঁহাদের পথরোধ করার অন্য উপায় বোধহয় এখন আর নাই। কিন্তু দুর্নীতির আগুন তাহাতে ঢাকা পড়িবে মাত্র, নিভিবে না। ঢাকনায় সামান্য ছিদ্র পাইবামাত্র সে পথে উহা বাহির হইয়া পড়িবে। কিন্তু যাহাদের চিত্ত এখনো নমনীয়, যাহারা ভবিষ্যতের নাগরিক, তাহাদের এই দুষ্ট প্রভাবের হাত হইতে বাঁচাইবার চেষ্টাও এই সঙ্গে অবিলম্বে করা প্রয়োজন। যে পথ ধরিয়া চলিলে ইহা করা সম্ভব, অবিলম্বে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা প্রয়োজন। দেশের সব লোককেই সদ্ভাবাপন্ন করিয়া তোলা আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন দেশেই সম্ভব হয় নাই; কিন্তু অন্যায়কারীর সংখ্যা বহুল পরিমাণে কমাইয়া আনা সম্ভব।

জীবনগঠনে
আমাদের কয়েকটি জাতীয় সদভ্যাস

ভাল সকলেই হইতে চায়; খারাপ কেহই হইতে চায় না। দুর্নীতি-প্রবণতা যাহাদের শৈশব হইতেই প্রবলভাবে প্রকট, এরূপ লোকের সংখ্যা অতি অল্প। মানুষ অন্যায় করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধেই—অন্যায় হইতে বিরত থাকার জন্য যে মানসিক শক্তির প্রয়োজন, তাহার অভাবে। ছোট-খাট অন্যায় করিতে করিতে তাহা যেমন অভ্যাসে পরিণত হয়, ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানুষকে অন্যায় করাইতে সেই অভ্যাসের শক্তিই বিবেকের শক্তি অপেক্ষা প্রবলতর হয়, তেমনি ছোট খাট সদভ্যাসও ক্রমে প্রবল ইচ্ছাশক্তির রূপ লইয়া মানুষকে বিবেক-নির্দেশিত পথে সর্বাবস্থায় চলার সামর্থ্য যোগায়। জীবননিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজন ছোট খাট বিষয় লইয়া সদভ্যাস করিতে শিখানো, কয়েকটি সদুপদেশকে অভ্যাসে পরিণত করিতে পারিলেই উন্নত জীবন গড়িয়া উঠে। স্বামী বিজ্ঞানানন্দের নিকট একব্যক্তি উপদেশ চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন; ছেলেবেলায় 'বোধোদয়ে' যে পড়িয়াছেন, 'সদা সত্য কথা কহিবে, পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়,—এইটি আগে জীবনে অভ্যাস করুন, পরে অন্য কথা।'

সাধারণভাবে মানুষের মনের স্বভাবই হইল এই যে, সে নিজের অভিজ্ঞতা ছাড়া অপরের কথা শুনিয়া কিছু গ্রহণ করিতে চায় না। যে কখনো আগুনে হাত দেয় নাই, আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে কি না, সে বিষয়ে তাহার মন হইতে সংশয় সহজে যায় না। অভিজ্ঞতাই জীবন-পরিচালনায় মন্ত্রণাদাতা।

এই অভিজ্ঞতা এজন্মেরও হইতে পারে, পূর্ব জন্মেরও হইতে পারে। যখনকারই হউক, উহা আমাদেরই অভিজ্ঞতা। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, জীবনের আর এক ধরনের যে পরিচালনা-শক্তিকে আমরা 'ইনস্‌টিঙ্কট' বা সহজাত প্রবণতা বলি, তাহাও বারংবার উপলব্ধ অভিজ্ঞতারই ঘনীভূত রূপ। বলিয়াছেন:

পূর্বজন্মার্জিত অভিজ্ঞতা বা সংস্কার ছাড়া পিতামাতা হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ দৈহিক কোন কিছু দ্বারা একই পিতামাতার দুইজন সন্তানের দ্বিবিধ মানসিক গঠনের কোন পরিষ্কার ব্যাখ্যাই দেওয়া যায় না। হাঁসের বাচ্চা জলে নামিয়াই সাঁতার কাটিতে পারে কেন? আমরা ইহার উত্তরে বলি—ইনস্‌টিঙ্কট। একটি শব্দ ব্যবহার করিলেই ব্যাখ্যা হয় না। অভিজ্ঞতা ক্রমে অভ্যাসে এবং অভ্যাস ইনস্‌টিঙ্কটে পরিণত হয়। প্রথম হারমোনিয়াম বাজানো শিক্ষার সময় রীড দেখিয়া দেখিয়া ধীরে ধীরে বাজাইতে হয়। অভ্যাস যখন গভীর হয়, তখন অন্যদিকে তাকাইয়া, এমনকি অপরের সহিত গল্প করিতে করিতে বাজাইলেও আঙুল আপনা আপনি ঠিক জায়গাতেই পড়ে।

স্বামীজী আরও বলিয়াছেন: আমাদের মনের সব ছাপগুলি যখন আমরাই দিয়াছি, ভালমন্দ সব ছাপগুলি যখন আমাদের অভ্যাসেরই ফল, তখন আমরা ইচ্ছা করিলে সেগুলি আবার তুলিয়া ফেলিতেও পারি—অভ্যাস সহায়ে আমরা আমাদের স্বভাব-চরিত্র পরিবর্তন করিতে পারি। অভ্যাস ছাড়া চরিত্র সংশোধন বা গঠনের দ্বিতীয় আর কোন পথ নাই। এই সত্যটি ভারতীয় জীবন-দর্শন-সৌধের একখানি অপরিহার্য ভিত্তিপ্রস্তর। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া যুগযুগ ধরিয়া ভারতীয় জাতি কয়েকটি বিধি-নিষেধ অবলম্বনে জীবন-গঠন করিয়া আসিয়াছে। কতকগুলি অভ্যাস আমাদের জীবনে অপরিহার্য ছিল, সহজভাবে জীবনের মধ্যে সেগুলিকে অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হইত। শিশুকাল হইতে ছোটখাট অভ্যাসের মাধ্যমে তাহা হইত। যেমন, খাবার ব্যাপারে, কোন ফল প্রথমে দেবতাকে নিবেদন না করিয়া খাইতে নাই, গৃহদেবতাকে ভোগ দেওয়ার পূর্বে অন্নগ্রহণ করিতে নাই, একাদশী, পূর্ণিমা-অমাবস্যা প্রভৃতি তিথিতে উপবাস বা স্বল্পাহার করিতে হয়, ইত্যাদি। আপাতদৃষ্টিতে শরীর ও আহারের দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে এইসব বিধি-নিষেধগুলি অভ্যাস করার বিশেষ কোন সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। বড় জোর এটুকু দেখা যায় যে একাদশী পূর্ণিমা প্রভৃতিতে উপবাস বা স্বল্পাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে কিছুটা উপকারক। কিন্তু ইহার সার্থকতা অন্যত্র; প্রতিটি ক্ষেত্রেই মনের খাইবার জন্য লোলুপতাকে সাময়িকভাবে দমন করিতে হয়, যত অল্প পরিমাণই হউক সংযম অভ্যাস করিতে হয়। এই সামান্য অভ্যাসই ক্রমে মনের জোর বাড়াইয়া চরিত্রের সুদৃঢ় ভিত্তি গড়িয়া তোলে।

এই ধরনের বহু সদভ্যাস পূর্বে প্রচলিত ছিল। তাই বহু বিষয়ে অনুন্নত থাকা সত্ত্বেও এবং অধুনা-প্রচলিত শিক্ষার অভাব সত্ত্বেও দেশে সচ্চরিত্র লোকের সংখ্যা এত বিরল হয় নাই। বর্তমান কালে আমরা অনেক বেশী শিক্ষা পাইতেছি, বহুবিধ চিন্তায় মস্তিষ্ক ভরাইয়া তুলিতেছি; সেই আধুনিক চিন্তার আলোকে দেখিয়া এইসব অভ্যাসগুলিকে কুসংস্কার জ্ঞানে জীবন হইতে নির্বাসিত করিতেছি। কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা সংযম-শক্তি বাড়াইবার কোন নূতন পদ্ধতি তাহাদের শূন্যস্থানে বসাইতেছি না!

ভিত্তি দৃঢ় করিবার দিকে নজর না দিয়া সৌধের বাহিরের দৃশ্যমান অংশটিকে ঠেকা দিয়া ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করার চেষ্টা কতখানি ফলবতী হইতে পারে ?

যাঁহারা বিপুল চরিত্র-বলের অধিকারী ছিলেন বলিয়া আমরা জানি, তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবনের মূলে এই সংযম অভ্যাস রহিয়াছে। অগ্নিযুগের যুবকেরা অবিবাহিত থাকিয়া ব্রহ্মচর্য জীবন-যাপনের সংকল্প গ্রহণ করিত, স্বামীজীর বাণী, গীতা প্রভৃতি সদ্‌গ্রন্থ পাঠের অভ্যাস দ্বারা সচ্চিন্তায় মন ব্যাপৃত রাখার চেষ্টা করিত। নেতাজী জেলের মধ্যেও পূজাদি করিতেন, আজাদহিন্দ বাহিনীর পরিচালনা কালেও তাঁহার ধ্যানাভ্যাসের কথা শোনা যায়। মহাত্মাজীর ইচ্ছা করিয়া লবণ-বিহীন আহার্য গ্রহণ, মৌনাবলম্বন প্রভৃতি অভ্যাসের কথা সর্বজনবিদিত। অভ্যাস ব্যতিরেকে মনকে প্রলোভন অগ্রাহ্য করিবার মত শক্তিতে বলীয়ান করা অসম্ভব। কদভ্যাস মনে যে সুখের অভিজ্ঞতার ছাপ দেয়, সদভ্যাস তদপেক্ষা বহুগুণ অধিক আনন্দ আস্বাদন করায়। এই আনন্দলাভের অভিজ্ঞতাই সৎ হইবার ইচ্ছাকে বলবত্তর করিয়া তোলে।

ইচ্ছা-শক্তি বর্ধনের জাতীয় প্রাচীন পদ্ধতিগুলি—যেগুলি সহজ ব্যবহারের ফলে রীতিতে (ট্রাডিশন) দাঁড়াইয়াছিল, সেগুলির পুনঃপ্রবর্তন পরম কাম্য। রীতি অতি সহজে অপরকে নিজপথে চালিত করিতে পারে—অনিচ্ছুককেও বিশৃঙ্খলা ঘটাইবার সুযোগ দেয় না।

পরিস্থিতির চাপে সমাগত সপ্তাহে একবেলা উপবাস রূপ যে কষ্টকে আজ বা দুদিন পরে আমাদের গ্রহণ করিতেই হইবে, যাহা প্রায় অনিবার্য হইতে চলিয়াছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া আমরা আমাদের পুরাতন রীতিপ্রবর্তনের দিকে যদি একটু মনোযোগী হই, ক্ষতি কি ? ইচ্ছা করিলে ভাবটি একটু পাল্টাইয়া ইহাকে একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যাদি পালনের প্রথার পুনঃপ্রবর্তনের রূপ দিতে পারি আমারা—জনৈক চিন্তাশীল ব্যক্তির এই ইঙ্গিতটি তাই খুবই শুভ বলিয়া মনে হইয়াছে। যাঁহাদের একাদশী পূর্ণিমাদিতে বিশ্বাস করিতে বাধা আছে, তাঁহারা নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস-মত মন একাগ্র করার বিষয়ে বিশেষ উপযোগী কয়েকটি পবিত্র দিন বাছিয়া লইয়া সেই দিনগুলি ইহার জন্য গ্রহণ করিতে পারেন।

যাহা আজ আমাদের অবশ্যকর্তব্য-রূপে করিতে হইতেছে, এইভাবে দৃষ্টিভঙ্গী একটু পাল্টাইয়া লইয়া তাহা করিতে পারিলে প্রাচুর্যের দিনেও আমাদের মনে উহার সুফল স্থায়ী হইবে এবং শুভফলপ্রদ বিধি-নিষেধগুলির দিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর অপ্রকাশিত পত্র

(১)

(বলরামবাবুকে লিখিত)

শ্রীশ্রীগুরুদেব
শ্রীচরণভরসা।

কাশীধাম
৪ঠা পৌষ, ১২৯৫

নমস্কার নিবেদনমিদং

আপনার এক পত্র পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম, বিশেষ আপনার শরীর পূর্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ হইয়াছে জানিয়া যৎপরোনাস্তি সুখী হইলাম। বোধ হয় এতদিনে আপনি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। এই সময়ে আপনার একটা change অত্যন্ত দরকার। আপনার সুবিধা যে স্থানে বোঝেন সেই স্থানে যাইবেন। এ সময় N. W.-তে অত্যন্ত শীত, কিন্তু বোধ হয় অপর ২ সময় অপেক্ষা climate এখন খুব ভাল। সারদা পত্রে লিখিয়াছিল যে নরেন এবং নিরঞ্জন বৈদ্যনাথে ২।১ দিবসের মধ্যে যাইবে। কিন্তু আপনার পত্রে জানিলাম যে কোথায় যাইবে ঠিক নাই এবং নরেন কাশীধামে আসিবে। Purna Mukherjee কি বৈদ্যনাথে আর থাকিবে না? আমরা দুই দিবস P. Mukherjee's Bunglow-তে ছিলাম। স্থানটি আমার উত্তম বোধ হইল; যদ্যপি direct ticket Benaras অবধি না লইতাম তাহা হইলে কিছুদিন থাকিবার ইচ্ছা ছিল। তথায় দুই একটি ভদ্রলোকের সহিত আলাপে অত্যন্ত সুখী হইয়াছিলাম। কাশীধামে পৌঁছাইয়া খোকাকে সেই দিবস প্রমদাবাবুর নিকট পাঠাই এবং পরদিবস তাঁহার অনুরোধে আমরা উভয়ে তাঁহার বাটীতে ভিক্ষা করি। তাঁহার সহিত আলাপে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। তিনি অত্যন্ত ভদ্রলোক। অহংকারের লেশমাত্র নাই, অত বিদ্যা এবং ঐশ্বর্য থাকায়ও তাঁহার কিছুমাত্র অভিমান নাই। পরমহংসদেবের সম্বন্ধে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হয়, পরে অপর ২ অন্য কথা হয়। কাশীর বাঙ্গালীটোলায় থাকার ইচ্ছা না থাকায় তিনি পিশাচমোচনে তাঁহার বাগানে একটি উত্তম স্থান দিয়াছেন এবং তথায় আমাদিগকে বাস করিবার জন্য বলেন। কিন্তু তাঁহার খরচ পড়িবে বলিয়া আমরা তাহাতে স্বীকার করি নাই। পরে সত্রে বলিয়া দিয়াছেন এবং অপর সত্রে বলিয়া দিবেন কহিয়াছেন। ২।৪ দিন তাঁহার বাটীতেই ভিক্ষা হয়, পরে এখানে ওখানে একরকম করিয়া চলিয়া যায়। তাঁহার কহত সত্রে একদিন মাত্র গিয়াছিলাম; সে দিবস যত্নের সহিত আহারাদি হইয়াছিল। কিন্তু বোধ হয় তাহা সুবিধা নহে, কারণ তাহাদের কর্মচারী স্পষ্ট বলিল যে ব্রাহ্মণের সঙ্গে যাহারা

বসিয়া খাইবে তাহাদের সুবিধা; আমাদের স্থানাভাব এবং বিশেষ দাতার অনুমতি যে, সন্ন্যাসী প্রভৃতি এক দিবসমাত্র। তবে প্রমদাবাবুর অনুরোধে আমরা ২।৪ দিন বেশী করিতে পারি। তবে এ সত্রে একদিন ও সত্রে একদিন করিয়া একপ্রকার চলিতে পারে। তারকেশ্বরের মহান্তের সত্রে একদিন গিয়াছিলাম, তাহারা যত্ন করিয়া খাওয়াইয়াছিল। তাহারা বলে ১০।১৫ দিন বাদে এখানে আসিয়া ভিক্ষা করিতে পারেন। মহান্তের অনুমতি ব্যতীত প্রত্যহ ভিক্ষায় সুবিধা নয়।

আমরা প্রাতে বাগান হইতে আসিয়া স্নানাদি করিয়া বৈকালে পুনরায় বাগানে যাই। রোজ দেড় ক্রোশ প্রায় হাঁটিতে হয়। প্রমদাবাবু আমাদের যাহাতে কোন কষ্ট না হয় তদ্‌বিষয়ে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। তাঁহার বাগানটি অতি চমৎকার আমাদের পক্ষে বেশ নির্জন এবং লোকজনেরও কোন কষ্ট নাই। চাকর প্রভৃতি আসিয়া সর্বদা অনুসন্ধান নেয় যাহাতে কোন কষ্ট না হয়। তিনিও প্রত্যহ আসিয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। তবে দিনকতক হইল, Lt. Governor প্রভৃতি আসিবে—একারণে দেখা করিতে পারেন নাই, সেই দিকেই ব্যস্ত। সকল সুবিধাই হইয়াছে কেবল সত্রে সুবিধা হইলে উত্তম হইত।

অত্যন্ত শীতের দরুন হৃষীকেশ যাওয়ার কল্পনা দু'মাস ত্যাগ করা গিয়াছে। তবে নিকট ২ স্থান দর্শনে সত্বর যাইব এইরূপ ইচ্ছা আছে। যাহা গুরুদেবের ইচ্ছা তাহাই হইবে। প্রমদাবাবু নরেনের কথা সর্বদা কহিয়া থাকেন। নরেন কাশী আসিয়া থাকিলে উত্তম হয়। এখানকার climate এখন খুব ভাল, বিশেষ সে বাগানের কুয়ার জল খুব হজমী এবং বাগানে থাকিবার বেশ সুবিধা। বংশী দত্তের বাটীতে আমাদের শীতেতে হাড় সেকে দিত কিন্তু বাগানের ঘরে শীত বোধ হয় না, বেশ গরম ঘর।

বরাহনগরের সকলে বোধ হয় ভাল আছে; প্রত্যেককে আমাদের প্রণাম জানাইবেন এবং Girish B. Suresh B. Atul B. প্রভৃতিকে আমার নমস্কার জানাইবেন। ইতি—

নিঃ শ্রীরাখাল

(২)

(কৃষ্ণমোহন রায়কে লিখিত)

শ্রীচরণভরসা।

বৃন্দাবনধাম
১৪ই ফাল্গুন (১২৯৬)

My dear Rai Mohasaya

ভাই তোমার P. C. যথাসময়ে পাইয়াছিলাম, তাহার জবাব দিতে পারি নাই। আমার অপরাধ ক্ষমা করিবে। যাহা হউক, ৺কৃপায় তুমি পীড়া হইতে সুস্থ হইয়া বরাহনগরে পৌঁছাইয়াছ জানিতে পারিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। সুরেশবাবুর পীড়ার সংবাদে বড় দুঃখিত হইলাম। সুবোধ (খোকা) ব্রজগ্রাম কতক দর্শন করিয়া পদব্রজে হরিদ্বার যাইবে, এইরূপ স্থির করিয়াছে। আমার যাওয়া এখন হইবে না ; কারণ অনেক পথ, অত হাঁটিতে পারিব না। শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মতিথিতে কিরূপ হইল, অনুগ্রহ করিয়া লিখিবে। মাতাঠাকুরাণীকে আমার অসংখ্য প্রণাম জানাইবে। বোধ হয় তিনি এতদিন কলিকাতায় আসিয়াছেন। তাঁহাকে কহিবে যেন কৃপা করেন। তাঁহাদের চরণ যেন আমার হৃদয়পদ্মে সর্বদা স্মরণ থাকে, আর আমার অপরাধ যেন ক্ষমা করেন।

বাবুরাম পশ্চিম যাইবার জন্য এত ব্যস্ত কেন ? শরীর অসুস্থ থাকিলে যাইতে দিবে না। তাহাকে নিষেধ করিবে। গুপ্ত কেমন আছে ? তাহাকে আমার নমস্কার ও ভালবাসা জানাইবে। বলরামবাবুর নিকট একছড়া ভাল রুদ্রাক্ষের মালা দিবে, তিনি আমাকে পাঠাইয়া দিবেন। তারক দাদা, শশী, গুপ্ত, বাবুরাম, গোপাল দাদা প্রভৃতি সকলকে আমার প্রণাম জানাইবে। রামচন্দ্র কি ওখানে আছে না চলিয়া গিয়াছে ? অনেক লিখিবার ছিল কিন্তু অদ্য এই পর্যন্ত। আমার অসংখ্য প্রণাম জানিবে। Reply me soon.

Yours affecly
Rakhal.

বিচার ও সমাধি

স্বামী স্বপ্রকাশানন্দ

[আমরা গুরুশাস্ত্র-মুখে জানিতে পারি যে, বেদান্ত-সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে প্রথমেই সাধনার অধিকারী হওয়া আবশ্যক। কারণ অধিকারী না হইয়া বেদান্ত-সাধনা আরম্ভ করিলে কোনই ফলোদয় হয় না। বরঞ্চ নানা প্রকার বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়া সাধকজীবন বিপর্যস্ত হয়। এইজন্য বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা, মুমুক্ষুতা প্রভৃতি গুণসম্পন্ন অধিকারী হইয়া বেদান্ত-সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। এইরূপ হওয়াই বিধেয়। কারণ উপযুক্ত অধিকারীকেই শ্রুতি যথার্থ জ্ঞান দিয়া থাকেন।

বেদান্ত-সাধনার জন্য বিভিন্ন অধিকারী এবং বিভিন্ন সাধনার কথাও আমরা গুরুশাস্ত্র-মুখে অবগত হইয়া থাকি। বেদান্ত-সাধনার তিন প্রকার অধিকারী রহিয়াছেন, যথা উত্তমাধিকারী, মধ্যমাধিকারী, কনিষ্ঠাধিকারী। এই বিভিন্ন অধিকারীদের জন্য বিভিন্ন সাধনাও নিরূপিত রহিয়াছে। এই বিভিন্ন সাধনার মধ্যে আমরা এখানে বিচাররূপ সাধনা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিব। প্রসঙ্গক্রমে সমাধির কথাও উত্থাপন করা হইবে।]

উত্তম অধিকারী ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর মুখে জীব-ব্রহ্মের অভেদ বাক্য অর্থাৎ মহাবাক্য শ্রবণ করিলেই নির্বিচারে শ্রবণের অনন্তর দৃঢ় অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং বিচাররূপ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের তাঁহার আর কোন প্রয়োজন থাকে না। শ্রীগুরুর মুখ হইতে মহাবাক্য শ্রবণ করিলে মধ্যম ও কনিষ্ঠ অধিকারীর সংশয়- ও বিপর্যয়যুক্ত জ্ঞান হইয়া থাকে। তাহাদের সংশয়- ও বিপর্যয়-রহিত হওয়ার জন্য বিচাররূপ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন প্রয়োজন হয়। যদিও মহাবাক্যশ্রবণ-জনিত জ্ঞানকে শাস্ত্রে অপরোক্ষ জ্ঞান বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তথাপি সংশয়াদি থাকে বলিয়া উহা প্রকৃত দৃঢ় অপরোক্ষ জ্ঞান বলিয়া নির্দিষ্ট করেন নাই। মোট কথা, শ্রীগুরুর মুখ হইতে মহাবাক্য শ্রবণ করিয়া যে সাধকের দৃঢ় অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না, সেই সাধকেরই মননাদির প্রয়োজনীয়তা থাকে। বিচাররূপ শ্রবণ-মননাদি সম্বন্ধে শাস্ত্রে অনেক কথা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। মধ্যম ও কনিষ্ঠ অধিকারীর অন্তঃকরণ তত শুদ্ধ নয় বলিয়া মহাবাক্য শুনিয়াও তাহাদের সংশয়াদি থাকিয়া যায়। এই সংশয়াদি নিবৃত্ত করিবার জন্যই মননাদির আবশ্যক হয়। মধ্যম ও কনিষ্ঠ অধিকারীর অন্তঃকরণে মল-বিক্ষেপাদি মলিনতা থাকে বলিয়াই শ্রীগুরু-মুখ হইতে মহাবাক্য শ্রবণ করিলেও ঐ বাক্যের প্রতি সন্দেহাদির উদয় হয়। সন্দেহাদির সঙ্গে সঙ্গেই বিচার আসিয়া উপস্থিত হয়। কারণ সন্দেহাদি নিবৃত্ত করিয়াই যথার্থ জ্ঞান বিচারের দ্বারাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। শ্রীগুরুর মুখ হইতে জীব-ব্রহ্মের অভেদ বাক্য শ্রবণ করা হইয়াছে—তাহা দ্বারা বাস্তবিক ভেদ প্রতিপন্ন হয় কি অভেদ প্রতিপন্ন হয়, ভেদ সত্য কি অভেদ সত্য—ইত্যাদি নিশ্চয়পূর্বক যথার্থ জ্ঞান বিচারের দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। মনন, নিদিধ্যাসনাদি বিচারেরই অন্তর্গত। বিচার ভিন্ন মন সংশয়াদি-শূন্য হইতে পারে না।

বিচারের দ্বারাই মনোবৃত্তি বিজাতীয় চিন্তা, বিজাতীয় বৃত্তির ধারারহিত হইয়া যাহা হওয়ার তাহা হয়। বিচারই সাধনা। এখন এই বিচার বলিতে কি বুঝায়? বিচার বলিতে শ্রীগুরুর মুখ হইতে শ্রুত যে মহাবাক্য, তাহারই বিচার। এই বিচার করিতে গেলেই জীব, জগৎ, ঈশ্বর, শুদ্ধ ব্রহ্ম—এই সমস্তের বিচার আসিয়া উপস্থিত হইবে। সাধকের মোটামুটি এই সমস্ত জানা থাকিলে সাধনার বিশেষ সহায়তা হইয়া থাকে। বিচার মানে তত্ত্ববিচার; অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মের অভেদরূপ যে এক অদ্বিতীয় অখণ্ড চেতন বস্তু তাহার অনুশীলন, তদ্‌বিষয়ক চিন্তা, তদ্‌বিষয়ক আলোচনা, তদ্ভাবে বৃত্তি প্রবাহিত করিবার চেষ্টা প্রভৃতিকেই বিচার বলে।

'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যের মধ্যে 'অহং' ও 'ব্রহ্ম' এবং 'তৎ' ও 'ত্বম্'—এই পদগুলির শোধন করিয়া, অর্থাৎ বাচ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করিলে যে এক অখণ্ড চৈতন্য সত্তা অবশেষ থাকে তাহাই 'আমি'। অধিষ্ঠান-চৈতন্যসত্তাই আমার প্রকৃত স্বরূপ। এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া তদ্ভাবে বৃত্তি প্রবাহিত করার অভ্যাসকেই মহাবাক্য-বিচার বলে। ইহাই হইল মহাবাক্যের তাৎপর্য এবং অতি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। "মহাবাক্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা বা অর্থ গুরু বিদ্যমান না থাকিলে কোন অভিজ্ঞ পুরুষের সমীপে বুঝিয়া লইলে সন্দেহ থাকে না এবং সাধনার পক্ষে সুবিধা হয়।" এইরূপে পঞ্চকোষের বিচারের দ্বারা পঞ্চকোষের অধিষ্ঠান-চৈতন্যই আমি; পঞ্চকোষ আমার নয়, আমি নই; আমি পঞ্চকোষের অধিষ্ঠানমাত্র—এইরূপ বৃত্তি সুস্থির করার চেষ্টাকে পঞ্চকোষের বিচার বলে।

বিচারের দ্বারা বিবেকী সাধক নিশ্চয় করিয়া লয় যে পঞ্চকোষ হইতে এবং জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থা হইতে আত্মা ভিন্ন। এই আত্মাই আমি, আমার প্রকৃত স্বরূপ আত্মা, আমিই অধিষ্ঠান, সাক্ষী, দ্রষ্টারূপে বিদ্যমান। পঞ্চকোষ বা শরীরত্রয় আমি নই, আমার নয়। আমি ইহাদের সাক্ষী-রূপে বিদ্যমান। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই অবস্থাত্রয় আমি নই, আমার নয়; আমি এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী-মাত্র। জাগ্রদাদি অবস্থা শরীরত্রয়েরই হইয়া থাকে। এইরূপে ধীরস্থিরভাবে বিচার করিয়া সাধক নিশ্চয় করিয়া লয় যে আমিই দ্রষ্টা, আমিই প্রত্যক্-চৈতন্যরূপে অবস্থিত। গুরু- ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস আছে বলিয়াও এইরূপ নিশ্চয় হইবারই কথা। দেহেন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠান সাক্ষী-চৈতন্যই 'আমি'। এইরূপ নির্ধারণের পর বিবেকী সাধক দৃশ্যজগৎ সম্বন্ধে সুবিচার করিতে থাকেন। এই নামরূপাত্মক দৃশ্যপ্রপঞ্চ যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, গ্রহণ করিতেছি তাহা সমস্তই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; অতএব এই সমস্তই অনিত্য, অসত্য; কারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থমাত্রই বিকারী, বিনাশী, অতএব সত্য নয়, এগুলির প্রতীতি মাত্র হয়। স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ যেমন জাগ্রতে থাকে না; রজ্জুর জ্ঞান হইলে যেমন মিথ্যা সর্প থাকে না; মরুভূমির জ্ঞান হইলে যেমন মরীচিকা থাকে না; স্থাণুর জ্ঞান হইলে যেমন পুরুষ থাকে না, সেইরূপ ভ্রমকল্পিত এই জগতের অধিষ্ঠান চেতন যে ব্রহ্ম তাঁহার জ্ঞান হইলে এই জগৎ ও জগৎ-জ্ঞান আর থাকে না অর্থাৎ বাধ হইয়া যায়। অধিষ্ঠান চৈতন্যসত্তায় জীব-জগৎ প্রতিভাসিত হয়, এইরূপ শ্রুতিঅনুকূল বিচারের দ্বারা জগতের অনিত্যত্ব ও অধিষ্ঠান-চৈতন্যের সত্যত্ব দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া লইয়া "আমিই সেই ব্রহ্ম" অর্থাৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই বাক্যের

সূক্ষ্ম বিচার পূর্বক জীব-চৈতন্য এবং ব্রহ্ম-চৈতন্য যে একই অখণ্ড চৈতন্য, একই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, এইরূপ অখণ্ড জ্ঞানলাভ হয়।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, বিচারের দ্বারা যে অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, তাহাতে কি চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইয়া যায়, অর্থাৎ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়? এইরূপ নানা প্রশ্ন হইতে পারে বটে। কিন্তু এইসব প্রশ্ন বিচারবান সাধকের পক্ষে থাকে না। কেননা বিচারবান সাধক ইন্দ্রিয়নিরোধ বা অন্য কোন উপায় দ্বারা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হওয়ার চেষ্টা করেন না। তিনি কেবল জীব, জগৎ ও তাহার অধিষ্ঠান ব্রহ্মের বিচারেই চিত্তবৃত্তি নিয়োজিত রাখেন, অন্য কোন বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করেন না। অধিষ্ঠান ব্রহ্মই সত্য, আমিই সেই ব্রহ্ম, নামরূপাত্মক দৃশ্যপ্রপঞ্চ অনিত্য—এই বিচারেই তিনি নিরত থাকেন। এইরূপ সুবিচারের দ্বারা অধিষ্ঠানের জ্ঞান হয়। যেমন ভ্রমবশতঃ ঝিনুকে রৌপ্য-জ্ঞান হইলে উত্তম বিচারের দ্বারাই কল্পিতরৌপ্য নিবৃত্ত হইয়া যায়, সত্য-ঝিনুকেরই জ্ঞান হয়, সেইরূপ এই অনিত্য ভ্রম-কল্পিত জগতের অধিষ্ঠানের জ্ঞান সুদৃঢ় বিচারের দ্বারাই হয়। এই বিচারের সময় ইন্দ্রিয়াদি নিরোধের কোন চেষ্টাই থাকিতে পারে না, কিংবা বাহ্যজ্ঞান-শূন্যতার প্রতিও লক্ষ্য থাকে না, মনোবৃত্তি বিচারেই নিয়োজিত থাকে; বিচারবান সাধকের বিচারই প্রধান। তবে মনোবৃত্তির একটা সূক্ষ্ম অবস্থা হয়—এইমাত্র বলা যাইতে পারে। যেমন কোন একটা শব্দবিষয়ক জ্ঞান আমাদের যখন হয়, তখন আমরা ঐ শব্দ শুনিয়া চিন্তা করি, বিবেচনা করি, বিচার করি। বিচার-বিবেচনা দ্বারাই আমাদের ঐ শব্দবিষয়ক জ্ঞান হইয়া থাকে, অন্য কোন চেষ্টা বা উপায়ে হয় না। সেইরূপ "অহং ব্রহ্ম" এতদ্রূপ জ্ঞান বিচারের দ্বারাই হয়। যে সাধকের অদ্বৈততত্ত্বে অত্যন্ত নিষ্ঠা আছে এবং তৎসাধনে যিনি অতি-উৎসুক অথচ বুদ্ধির প্রখরতা না থাকা বশতঃ বিচার করিতে অসমর্থ এমন সাধক যদি গুরু- ও শাস্ত্র-বাক্যে বিশ্বাসপূর্বক অদ্বৈতসাধনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ঐ সাধকের পক্ষে বিচার প্রধান না হইয়া উপাসনা প্রধান হয়; কারণ বুদ্ধির মন্দতাবশতঃ তীব্র বিচারে তিনি সমর্থ হন না। সেইজন্য উপাসনা প্রধান হইয়া থাকে। এই সাধনায় সাধক কেবল বিচারের উপর নির্ভর না করিয়া ধ্যানভাব অবলম্বনপূর্বক ইন্দ্রিয়-সমূহকে যথাস্থানে স্থাপন করতঃ অন্তঃকরণ-বৃত্তিকে অধিষ্ঠান সাক্ষী-চৈতন্যে স্থিত করিতে অভ্যাস করেন। ইহা অবশ্য সুন্দর উপায়। কিন্তু বিচার এখানে অপ্রধান। সাধক এই ক্ষেত্রে গুরু- ও শাস্ত্র-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ধ্যানভাব অবলম্বন করেন। এই অভ্যাসের বলে তাহার অন্তঃকরণবৃত্তি সাক্ষী-আকারে আকারিত হইয়া সমাধিস্থ হয়, অর্থাৎ তখন তিনি স্বরূপে অবস্থান করেন। বিচার দ্বারা জ্ঞান সমকালে চিত্তবৃত্তির একটা অবস্থা বিশেষ হয়। সমাধির দৃষ্টিতে বিচার করিয়া দেখিলে তাহাকে সমাধিই বলা হয়, তাহা বিচারেরই পরিণত অবস্থা। মাত্র বিচারের দ্বারাই জ্ঞান হইল। ইহাই বিচারবান সাধকের সিদ্ধান্ত। বিচারের গভীর পরিণতি সমাধি। উপরে যে ধ্যানভাব-অবস্থার কথা সামান্যরূপে বলা হইল তাহাকে অহংগ্রহ ধ্যান বা অহংগ্রহ উপাসনা বলে। এই ধ্যান "অহং ব্রহ্মাস্মি" এতদ্রূপেই অনুষ্ঠিত হয়। এখানে ধ্যেয় বস্তু অর্থাৎ ধ্যানের বিষয় হইতেছে নিজ স্বরূপ। এই স্বরূপের সহিত নিজেকে অভেদরূপে চিন্তা বা ধ্যান করিতে হয়; সেইজন্যই ইহাকে

অহংগ্রহ ধ্যান বলে। শ্রীগুরু-বাক্যে অত্যন্ত নিষ্ঠা- শ্রদ্ধা- ও বিশ্বাস-পূর্বক নিরন্তর অভেদ-চিন্তা-ধ্যানের ফলে বৃত্তি স্বরূপে স্থিতি লাভ করে। প্রণব অবলম্বন করিয়া যে ধ্যান-চিন্তা করিতে হয়, তাহাকেও অহংগ্রহ ধ্যান বা উপাসনা বলা হয়। এই প্রণবের উপাসনা বা ধ্যান দ্বারাও জ্ঞান লাভ হয়। অন্বয়-ব্যতিরেকের দ্বারা শরীরত্রয়ের অধিষ্ঠান-চৈতন্যকে পৃথক করিয়া সেই অধিষ্ঠানচৈতন্য-সাক্ষীতে বৃত্তি প্রবাহিত করা, লয়চিন্তন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া দ্রষ্টা বা অধিষ্ঠান-চৈতন্যে বৃত্তি স্থির করা —এই সমস্ত প্রক্রিয়াই বিচার নামে অভিহিত হয়। সাধক নিজ রুচি অনুসারে উহার যে কোন একটি প্রণালী অবলম্বন করিয়া সাধন করিলে অহংকারাদি জগতের বাধ করতঃ স্বীয় স্বরূপে স্থিতি লাভ করিতে পারেন। মনন নিদিধ্যাসন, ধ্যান প্রভৃতি বিচারেরই অন্তর্ভুক্ত। বস্তুর অনুকূল যুক্তিসহ বস্তুর চিন্তা করাকে মনন বলে। আর এই দেহাদি-বিষয়ক চিন্তার উদয় হইতে না দিয়া ব্রহ্মাকারাবৃত্তির স্থিতিকে নিদিধ্যাসন বলে। অন্তরায়রহিত অদ্বিতীয় বস্তু বিষয়ে অন্তঃকরণবৃত্তি প্রবাহিত করাকে ধ্যান বলে। ধ্যান ও নিদিধ্যাসনকে একই বলা যাইতে পারে। মনন, নিদিধ্যাসন বিচার ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিচারের স্থূলতা এবং সূক্ষ্মতা অনুসারে মনন, নিদিধ্যাসনের গভীরতা ও আন্তরিকতা হইয়া থাকে। বিচারের দ্বারা সন্দেহাদি কমিয়া গিয়া বস্তুর সত্যতা যতই দৃঢ় হইতে থাকিবে, ততই বস্তুবিষয়ে মনোবৃত্তির স্থিরতা হইতে থাকিবে। তত্ত্বজ্ঞানলাভের প্রতিবন্ধক যে সংশয়াদি, তাহা বিচার ভিন্ন দূর হইতে পারে না। কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি মিথ্যা নিশ্চয় করিয়া দেওয়া বিচারের স্বভাব। বিচারের দ্বারা বস্তুবিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বৃত্তি তদাকার হইয়া যাইবে অর্থাৎ জ্ঞান হইবে। বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে বৃত্তি তদাকার হইবে না। উপায় একমাত্র বিচার। এখানে বিচার ভিন্ন অন্য কিছুরই অপেক্ষা নাই। বিচাররূপ সুতীক্ষ্ণ অসি দ্বারা সংশয়-বিপর্যয়রূপ দৃঢ় রজ্জু ছিন্ন হইয়া যায়। ভ্রমস্থলে একব্যক্তি উপদেশ লাভ করিলেন, 'তুমি ঐ যে দণ্ডায়মান পুরুষটিকে দেখিতেছ, বাস্তবিক ঐ ব্যক্তি একজন পুরুষ নহে। উহা একটি শাখাপত্রশূন্য দণ্ডায়মান বৃক্ষ। এই স্থলে উপদেশ-বাক্য শুনিবার পর যে পুরুষকে প্রত্যক্ষ করিতেছি, সেই পুরুষ বাস্তবিক শাখাপত্রাদি-রহিত বৃক্ষ অথবা বাস্তবিক পুরুষ এইরূপ সংশয়াদি আসিয়া উপস্থিত হইল। এখন ইহা পুরুষ বা বৃক্ষ, তাহা বিচারের দ্বারাই নিশ্চয় হইবে। বিচারের দ্বারা নিশ্চয় হইয়াই বৃক্ষের জ্ঞান হইবে। বিচারের দ্বারা জানিলাম অল্প অন্ধকারবশতঃ যাহাকে একটি পুরুষ বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা বাস্তবিক পুরুষ নয়, তাহা একটি শাখাপত্রবিহীন বৃক্ষ। এই নিশ্চয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বৃক্ষের জ্ঞান হইয়া গেল। এখানে আর কিছুরই অপেক্ষা রহিল না। মাত্র বিচারের দ্বারাই প্রকৃত জ্ঞান হইল। সেইরূপ ভ্রমবশতঃ আমি-রূপ শুদ্ধ ব্রহ্মে আমি-রূপ মলিন জীব বোধ হইতেছে। বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া দিলেন, 'তুমি বাস্তবিক জীব নও, তুমি শুদ্ধসত্ত্ব ব্রহ্ম।' অভিজ্ঞ ব্যক্তির বাক্য শুনিয়াই সন্দেহযুক্ত জ্ঞান হইল—আমি জীব কি ব্রহ্ম, এই সন্দেহ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিচারও উদিত হইল। বিচারের দ্বারা নিশ্চয় হইল যে জীব অনিত্য, ষড়্‌বিকারযুক্ত, পরিণামী, নাশশীল। ব্রহ্মই নিত্য, সত্য, ষড়্‌বিকারশূন্য, অবিনাশী, অবিকারী। অতএব ব্রহ্মই একমাত্র সত্যবস্তু, এইরূপ বিচারের দ্বারা যখন ব্রহ্মই সত্যবস্তু বলিয়া নিশ্চয় হইল তখনই ব্রহ্মের জ্ঞান

হইয়া গেল। কারণ বিচারের স্বভাবই ব্রহ্মের স্বরূপ বোধ করান। বস্তুর স্বরূপ জানাইয়া দিয়া বিচারও নিজে সরিয়া যায়, আর থাকে না। ঐ বিষয়ে আরও একটু সূক্ষ্ম বিচার আছে তাহা এই: ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য ব্রহ্মাকারা-বৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। শাস্ত্র বলেন, "ব্রহ্মণ্য-জ্ঞাননাশায় বৃত্তিব্যাপ্তিরপেক্ষিতা।"—অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিষয়ক অজ্ঞাননাশের জন্য বৃত্তির গ্রাহ্যতা স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মাকারা অন্তঃকরণবৃত্তি ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানকে নষ্ট করিয়া দেয়। বৃত্তি কিন্তু ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না। বৃত্তির কাজ মাত্র অজ্ঞান নষ্ট করা। ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ—তাঁহাকে আবার কে প্রকাশ করিবে? বৃত্তি নিজেই অজ্ঞানের কার্য। অতএব বৃত্তি অজ্ঞান সরাইয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেও সরিয়া যায়, থাকিতে পারে না। 'জ্ঞাত্বা স্বংপ্রত্যগা-ত্মানং বুদ্ধিতদ্বৃত্তিসাক্ষিণম্। সোঽহমিত্যেব সদ্বৃত্ত্যা অনাত্মন্যাত্মমতিং জহি॥' অর্থাৎ বুদ্ধি এবং বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষিস্বরূপ নিজ প্রত্যগাত্মাকে অবগত হইয়া "আমি সেই"—এই প্রকার সদ্বৃত্তি অবলম্বনকরতঃ অনাত্মাতে যে আত্মবুদ্ধি তাহা ত্যাগ কর। এখন "আমি সেই" এইরূপ সদ্বৃত্তি তখনই ঠিক ঠিক হইবে, যখন বৃত্তিতে অন্য কোন বিষয় স্থান না পাইবে। অর্থাৎ বৃত্তি সংশয়াদি রহিত হইবে। সূক্ষ্ম সদ্‌বিচারের দ্বারাই সদ্‌বৃত্তির উদয় হয়। সম্যক্ বিচারের দ্বারা সংশয়াদি নিবৃত্ত না হইলে বৃত্তিতে বিজাতীয় ভাবের উদয় হইবেই। সূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা বৃত্তি সংশয়শূন্য হইয়া তদাকারে স্থিত হয়, অর্থাৎ জ্ঞান হয়। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত এই হইল যে বস্তুজ্ঞান বাস্তবিক বিচারের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। এখানে বুঝিতে হইবে যে, বৃত্তি অজ্ঞান বা আবরণমাত্র সরাইয়া দিয়া নিজে নষ্ট হইয়া যায়। ইহাই বিচারের পরিসমাপ্তি। তখন স্বরূপই মাত্র অবশেষ থাকেন। সাধারণ কথায় ইহাকেই স্বরূপে স্থিত হওয়া, জ্ঞানলাভ করা ইত্যাদি বলা হইয়া থাকে। এখন এখানে বলা যাইতে পারে যে বৃত্তি যখন সংশয়াদি রহিত হইয়া স্বরূপে স্থিত হইল কিংবা আবরণ নষ্ট করিয়া দিয়া নিজেও লয়প্রাপ্ত বা বিনষ্ট হইয়া গেল, তখন তো সমাধি হইল। হাঁ একথা সত্য বটে, কিন্তু বিচার-দৃষ্টিতে এই সমাধি অন্তঃকরণের একটা অবস্থাবিশেষ। তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য বিচার আরম্ভ এবং তত্ত্বজ্ঞানলাভেই বিচারের পরিসমাপ্তি। বিচারবান সাধক সমাধিকে লক্ষ্য করিয়া বিচার আরম্ভ করেন না। তত্ত্বজ্ঞান উদ্দেশ্যেই বিচার আরম্ভ করেন এবং তত্ত্বজ্ঞান-লাভেই বিচার পরিসমাপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং বিচারের উদ্দেশ্য সমাধি নহে—বিচারের উদ্দেশ্য তত্ত্বজ্ঞান। অনন্তর প্রতিপন্ন হয় যে বিচার-পরিসমাপ্তিতেই সমাধি আসিয়া যায়; অর্থাৎ সমাধি হয়। কারণ পূর্ণ বিচারে যখন অন্তঃকরণবৃত্তি মল-বিক্ষেপ-রহিত হইয়া যায় তখন অন্তঃকরণবৃত্তি ব্রহ্মাকারে অবস্থান করে, স্থিত হয়, স্বরূপে অবস্থান করে বা জ্ঞানলাভ হয় বলা হইয়া থাকে। ইহাই সমাধি। হাঁ, পূর্ণ বিচারান্তে অন্তঃকরণের এমন একটা অবস্থা হয় তখন বাহ্য পদার্থের বোধ থাকে না, থাকিতেও পারে না। কারণ তখন অন্তঃকরণ-বৃত্তি সংশয়াদিরহিত হয়, মল-বিক্ষেপ-পরিশূন্য হইয়া যায়। কি প্রকারে বাহ্য পদার্থের বোধ থাকিবে? বাহ্য পদার্থবোধ থাকিতে বিচারও পূর্ণ হইতে পারে না, বৃত্তিও তদাকারে স্থিত হইতে পারে না, জ্ঞানলাভও হইতে পারে না। অতএব বিচারবান সাধকের পূর্ণ বিচার দ্বারা সমাধি অবস্থা হইয়া থাকে। সমাধি বিচারেরই অন্তর্গত, বিচারের অঙ্গ। প্রসিদ্ধ মাণ্ডুক্য-কারিকাতে উক্ত হইয়াছে যে "আত্মসত্যানু-

বোধেন ন সংকল্পয়তে যদা। অমনস্তাং তদা যাতি গ্রাহ্যাভাবে তদগ্রহম্"—মন যখন আত্মার সত্যতা উপলব্ধি করিয়া সংকল্প পরিত্যাগ করে, অন্য কোন সংকল্প করে না, তখন গ্রহণযোগ্য কোন পদার্থ থাকে না। পদার্থগ্রহণের চিন্তা বর্জিত হইয়া অমস্তা হয় অর্থাৎ সংকল্পপরিশূন্য হয়; মন অমনোভাব প্রাপ্ত হয়। ইহা হইল জ্ঞানের অনন্তরের কথা। জ্ঞান হইলে মনের যে অবস্থা হয়, তাহাই বলা হইল। মন যখন আত্মসত্যতা উপলব্ধি করে তখন আর মনে সংকল্পাদি থাকে না। যে মন আত্মসত্যতা উপলব্ধি করিতেছে, এই সংকল্পরহিত মন সেই মনেরই নিশ্চয় অবস্থাবিশেষ হইবে। তখন এই মন দ্বারা ব্যবহারও হইবে এবং ব্যবহারের তারতম্যও থাকিবে। তত্ত্ব-বিষয়ে মনোবৃত্তির গভীরতা ও অগভীরতাও উপস্থিত হইবে। কখনও মনের গভীরতাবশতঃ পূর্ণ ব্যবহাররাহিত্যও থাকিবে। ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। কারণ জ্ঞানীদের মনো-বৃত্তির বিভিন্ন অবস্থা ও স্তর লইয়াই শাস্ত্রে ব্রহ্মবিৎ. ব্রহ্মবিদ্বর, ব্রহ্মবিদ্বরীয়ান্, ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ প্রভৃতি অবস্থার কথা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এই অবস্থা হইতেই প্রতিপন্ন হয় যে বিচারের দ্বারাও সমাধি অবস্থা নিশ্চয় হইয়া থাকে। ব্রহ্মবিদ্বরাদির মনোবৃত্তির অবস্থা সমাধি ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব বিচারের গভীর পরিণতিই **সমাধি**।

স্বামী প্রেমানন্দ প্রশস্তি

(গান: সাহানা—তেওড়া)

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ

সাধিকা মায়ের (মাতঙ্গিনী) কোলে কে বসেছে আলো করে।
কে শোভে ঐ দেবশিশু চকিতে প্রাণ মন হরে॥
রামকৃষ্ণ-লীলা তরে প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ ধরে।
এলে তুমি সকাতরে প্রেম বিলাতে আপামরে॥
চির-শুদ্ধ-মুক্ত তুমি সিদ্ধ জন্ম-জন্মান্তরে।
পবিত্রতার প্রতিমূর্তি সুবিদিত চরাচরে॥
যুগধর্ম প্রবর্তক বিবেকানন্দ-সহায়ক।
প্রেমানন্দ জীবে শিব সেবে আজীবন ভরে॥

রামায়ণ-প্রসঙ্গ

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

(পূর্বানুবৃত্তি)

উপসংহার

লক্ষ্মণ সীতাকে বনবাসে রাখিয়া শোকার্ত হৃদয়ে প্রস্থান করিলে কতকগুলি মুনি-বালকের নিকট সীতার সংবাদ পাইয়া ঋষি বাল্মীকি বহু সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করেন এবং বনবাসিনী তাপসীগণের নিকট সমর্পণ করেন।

যথাসময়ে আশ্রমেই সীতা যমজপুত্রদ্বয় প্রসব করিলেন। বাল্মীকির তত্ত্বাবধানে পুত্রদ্বয় লালিতপালিত হইয়া কৈশোরে পদার্পণ করিলে ঋষি স্বয়ং স্বরচিত রামায়ণগান বীণা-সংযোগে তাহাদের শিক্ষা দেন। রামচন্দ্র কর্তৃক অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানকালে আমন্ত্রিত হইয়া অন্যান্য ঋষিগণের সহিত বাল্মীকিও অযোধ্যায় আগমন করেন। অন্যান্য শিষ্যগণের সহিত সীতার পুত্রদ্বয় লব ও কুশ তাঁহার সহিত আসেন। ঋষি বালকদ্বয়কে আশ্রমে রাজপথে, রাজগৃহদ্বারে, যজ্ঞস্থলে ও উদার জনসমাজে রামায়ণগান গাহিয়া বেড়াইবার নির্দেশ দেন। কেহ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা যেন বাল্মীকি ঋষির শিষ্য বলিয়া পরিচয় দেয়, এই নির্দেশও দিলেন। ঋষির ইচ্ছা, রামচন্দ্র বালকদ্বয়কে দেখিতে পান। তাই তাহাদের এ-কথাও বলিলেন, ধর্মতঃ রাজা সকল প্রাণীর পিতার ন্যায়, অতএব তাঁহার গৃহদ্বারেই প্রথম গান করা উচিত।

বালকদ্বয়ের সঙ্গীত-শ্রবণে কৌতূহলাক্রান্ত রামচন্দ্র সভামধ্যে সমবেত জনগণের সম্মুখে তাহাদের সঙ্গীতের বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন। অনন্তর সুর-তাল ও বীণা সংযোগে রামচরিত অবলম্বনে মনোহর রামায়ণকাব্য সঙ্গীতে শুনিয়া সভাস্থ সকলেই মুগ্ধ। পরন্তু জটা-বল্কলধারী মুনি-বালকদ্বয়ের সহিত রামচন্দ্রের অদ্ভুত সাদৃশ্যও সকলের চোখে পড়িল। সন্ধান লইয়া রামচন্দ্র জানিলেন, রামায়ণ বাল্মীকি ঋষির রচনা এবং বালকদ্বয় সীতার যমজপুত্র। পুত্রদ্বয় সহিত সীতাকে ফিরিয়া পাইবার আকাঙ্ক্ষা রামহৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠিল। লক্ষ্মণ প্রভৃতিকে বলিলেন, সীতা বাল্মীকি ঋষির সহিত সভা-মধ্যে আগমন করিয়া নিজের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে শপথ করিয়া বলুন। রামচন্দ্র ভাবিলেন, সভামধ্যে প্রজা ও ঋষিমুনিগণের সম্মুখে সীতার বিশুদ্ধতা প্রমাণ হইলে তাঁহার সম্বন্ধে আর কোন সমালোচনা বা নিন্দার অবকাশ থাকিবে না।

পরদিন প্রভাতে ঋষি বাল্মীকির সহিত জনকনন্দিনী সীতা যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করিলেন।

তমৃষিং পৃষ্ঠতঃ সীতা অন্বগচ্ছদবাঙ্মুখী।
কৃতাঞ্জলির্বাষ্পবতী কৃত্বা রামং মনোগতম্‌॥

—বাষ্পাকুললোচনা জানকী মনোমধ্যে রামচন্দ্রের ধ্যান করিতে করিতে করজোড়ে মহর্ষির পশ্চাৎ অনুগমন করিলেন।

সীতা যজ্ঞস্থলে সকলের সমক্ষে শপথ গ্রহণ করিয়া নিজের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করিবেন, এই বার্তা মুহূর্তমধ্যে সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। সুতরাং চতুর্দিক হইতে দলে দলে নাগরিকগণ আসিয়া যজ্ঞক্ষেত্রে সমবেত হইল। যজ্ঞ উপলক্ষ্যে ২ মুনি-ঋষি পূর্বেই সমাগত হইয়াছিলেন। রাজপরিবারের সকলেও

আসিলেন। সীতা যখন তাপসীর বেশে অশ্রুপূর্ণলোচনে বাল্মীকির পশ্চাতে যজ্ঞস্থলে আগমন করিলেন তখন সভামধ্য হইতে 'সাধু, সাধু' ধ্বনি উত্থিত হইল। মহর্ষি বাল্মীকি রামচন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, রামচন্দ্র লোকাপবাদ-ভয়ে সীতাকে তাঁহার আশ্রম সমীপে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, সীতা পবিত্র ও ধর্মচারিণী, পুত্রদ্বয় রামচন্দ্রেরই। শুদ্ধচারিণী সীতা তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী প্রত্যয় দিবেন। অবশেষে বলিলেন, তুমি লোকনিন্দা-ভয়ে সচ্চরিত্রা জানিয়াও প্রিয়তমা পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলে। আমি দিব্যদৃষ্টিপ্রভাবে ঘোষণা করিতেছি তিনি অতীব বিশুদ্ধা।

বাল্মীকির এই কথার উত্তরে রামচন্দ্র করজোড়ে সমবেত জনগণ ও মহর্ষিগণকে শুনাইয়া বলিলেন,

এবমেতন্মহাভাগ যথা বদসি সুব্রত।
প্রত্যয়ো জনিতস্তুষ্টস্তব বাক্যৈরকিল্বিষৈঃ॥
প্রত্যয়শ্চ পুরা দত্তো বৈদেহ্যাঃ সুরসন্নিধৌ।
শপথশ্চ কৃতস্তত্র তেন বেশ্ম প্রবেশিতা॥
সেয়ং লোকভয়াদ্ ব্রহ্মন্নপাপাপি পুরা সতী।
পরিত্যক্তা ময়া সীতা তদ্ ভবান্ ক্ষন্তুমর্হষি॥
জানামি পুত্রকৌ চেমৌ মম জাতৌ কুশীলবৌ।
শুদ্ধায়াং জগতো মধ্যে মৈথিল্যাং প্রীতিরস্তু মে॥

—হে মহাভাগ, হে সুব্রত, আপনার কথা যথার্থ, আপনার বিশুদ্ধ বাক্যে আমার বিশ্বাস এবং সন্তোষ জন্মিয়াছে। বৈদেহী পূর্বেও লঙ্কায় দেবগণের সমক্ষে প্রত্যয়প্রদান ও শপথগ্রহণ করেন, আর সেজন্যই আমি তাঁহাকে গৃহে আনয়ন করিয়াছিলাম। সীতা সাধ্বী এবং পাপশূন্যা জানিয়াও লোকাপবাদভীরু আমি যে ইঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, আমার সেই অপরাধ আপনি মার্জনা করুন। আমি জানি, এই কুশ এবং লব আমারই পুত্রদ্বয়। সম্প্রতি জগতের সমক্ষে মৈথিলীর বিশুদ্ধতা প্রমাণ হইলে আমি প্রীত হই।

মহীয়সী সীতা এ পর্যন্ত সবই সহ্য করিয়া আসিয়াছিলেন। লঙ্কায় তিনি প্রাণ বিসর্জন দিবার অভিপ্রায়েই অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, নিজের বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য নহে। অগ্নি তাঁহাকে স্পর্শ না করায় তাঁহার অকলঙ্ক চরিত্রের মহিমা সকলের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়। যজ্ঞস্থলে সমবেত সকলের সম্মুখে শপথ করিয়া নিজের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি রাজধানীতে পুনঃপ্রবেশ করেন নাই। রাজান্তঃপুরে স্থান লাভ করিয়া নিষ্ঠুর, কুটিল সমাজের সমালোচনার পাত্রী হইয়া জীবনধারণের স্পৃহা তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণে থাকা সম্ভব নয়। তিনি প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন, রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া জীবন ত্যাগ করিবেন।

রামচন্দ্রের কথা শেষ হইলে সমবেত জনতা উদ্গ্রীব হইয়া সীতার প্রতি চাহিয়া রহিল। কাষায়বস্ত্র-পারিহিতা সীতা সমাগত সকলকে দর্শন করিয়া নতনেত্রে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে করজোড়ে বলিলেন,

যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
মনসা কর্মণা বাচা রামমেব যথার্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তাং মে ন রামাৎ কাময়ে পরম্।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥

—যদি রামচন্দ্র ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমি মনেও কখনো চিন্তা না করিয়া থাকি, তাহা হইলে দেবী বসুন্ধরা আমাকে তাঁহার গর্ভে আশ্রয় দান করুন। যদি বাক্য, মন ও কর্মের দ্বারা আমি সতত রামকেই পূজা করিয়া থাকি, তবে দেবী বসুন্ধরা তাঁহার ক্রোড়ে আমাকে আশ্রয় দিন; রাম ব্যতীত অন্য কাহাকেও কামনা করি না, একথা যদি সত্য বলিয়া থাকি, তবে দেবী বসুন্ধরা তাঁহার গর্ভে আমায় আশ্রয় দান করুন।

সহসা এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিল। সীতার কথা শেষ হইবামাত্র তাঁহার সম্মুখস্থ ভূখণ্ড বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং একখানি সুন্দর সিংহাসন সেই ফাটলের মধ্যে দেখা গেল। 'স্বাগতম্' বলিয়া স্বয়ং ধরিত্রীদেবী জানকীকে সেই সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। এই অত্যাশ্চর্য ও অভূতপূর্ব ঘটনা দর্শনে যজ্ঞস্থলে সমাগত ঋষি ও নৃপতিবৃন্দসহ সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত। কেহ কেহ অভিভূতের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, 'হে বৈদেহী, তোমার এতাদৃশ চরিত্র! সত্যই তুমি ধন্য।' তারপর সেই বিস্মিত মুগ্ধ ও স্তব্ধ জনতার দৃষ্টির সম্মুখে ধীরে ধীরে সীতা অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। লোকচক্ষু তাঁহাকে আর অনুসরণে সক্ষম হইল না। পশ্চাতে রাখিয়া গেলেন তাঁহার অনুপম চরিত্র।

বিহ্বল রামচন্দ্র বহুক্ষণ অশ্রুপূর্ণ নেত্রে দণ্ডকাষ্ঠ অবলম্বন পূর্বক অত্যন্ত দীনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে শোক ও ক্রোধে অভিভূত রামচন্দ্র ধরণী বিদীর্ণ করিয়া সীতাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য অধীর হইলে ঋষিবৃন্দ তাঁহাকে বহুপ্রকারে শান্ত করিলেন। পুনরায় বৈদেহীর দর্শনলাভ অসম্ভব। তিনি ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছেন! বৃথা সন্তাপে লাভ কী। সকলই দৈবাধীন। এখন হইতে সীতা ত্রিলোক-পূজিতা হইবেন!

ইহার পরের অংশ সংক্ষিপ্ত। যজ্ঞ সমাপ্ত হইল। সীতাবিহীন রামচন্দ্র সীতার পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যের সম্প্রসারণ সম্বন্ধে জানা যায়, তাঁহার আজ্ঞায় মধু-দৈত্যের পুত্র লবণাসুরকে বধ করিয়া শত্রুঘ্ন যমুনাতীরবর্তী মধুপুরী (পরবর্তীকালে মধুরা বা মথুরা) উদ্ধার করেন এবং শত্রুঘ্নের পুত্রগণ সেখানেই পরে রাজত্ব করেন। ভরত পুত্রদ্বয়ের সহিত সিন্ধুনদের উভয়পার্শ্বের গান্ধার দেশসমূহ জয় করেন। তক্ষশীলা ও পুষ্কলাবতী নামক দুইটি নগর স্থাপিত এবং ভরতের পুত্রদ্বয়ের উপর উহাদের শাসনভার অর্পিত হয়। লক্ষ্মণের পুত্রদ্বয় পশ্চিমে কারুপথ ও চন্দ্রকান্ত দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে কোশল রাজ্যকে বিভক্ত করিয়া লব ও কুশকে যথাক্রমে উত্তর- ও দক্ষিণ-কোশল রাজ্যে অভিষিক্ত করা হয়।

এইরূপে সমগ্র আর্যাবর্তে রাম-রাজ্য সম্প্রসারিত এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। রাবণাদি অসুরবধের পর এবং বানর, রাক্ষস ও ভল্লুক প্রভৃতি অনার্যগণের সহিত মিত্রতার ফলে সমগ্র দাক্ষিণাত্য সন্ত্রাসমুক্ত হইয়াছিল। বোধ হয় এই সময়েই সর্বপ্রথম আর্য-অনার্যের সংগ্রাম রহিত এবং পরস্পরের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয়। রামচন্দ্রের শাসনকালে নিয়মিত বারিবর্ষণের ফলে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইত। নগর ও জনপদ জনাকীর্ণ ছিল। প্রজাগণ সুখে বাস করিয়াছিল।

শেষ জীবনে রামচন্দ্রকে আর একটি আঘাত পাইতে হয়। ছদ্মবেশী কাল রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বলেন, তিনি গোপনে রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাতের অভিলাষী। ঐ সাক্ষাৎকারের সময় যদি কেহ তাঁহাদের দেখে অথবা পরস্পরের আলাপ শ্রবণ করে তবে সে রামচন্দ্রের বধ্য হইবে। রামচন্দ্র সম্মত হইয়া লক্ষ্মণকেই দ্বারদেশে পাহারায় নিযুক্ত করিলেন। দুইজনে আলোচনায় রত এমন সময় ঋষি দুর্বাসা আসিয়া উপস্থিত। ঋষি দুর্বাসার ক্রোধ প্রসিদ্ধ। তিনি তৎক্ষণাৎ রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। লক্ষ্মণ অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন, সেই মুহূর্তে রামচন্দ্রকে সংবাদ না দিলে নৃপতি সহ সমগ্র

রাজ্যের উপর তাঁহার অভিসম্পাত বর্ষিত হইবে। লক্ষ্মণ দেখিলেন সমূহ বিপদ। রামচন্দ্রসহ সমগ্র রাজ্য অভিশপ্ত হওয়া অপেক্ষা স্বীয় জীবননাশ তাঁহার নিকট শ্রেয়ঃ। সুতরাং তিনি রামচন্দ্রকে সংবাদ দিলেন। অতঃপর লক্ষ্মণ-বিসর্জনের পালা। বশিষ্ঠ প্রভৃতি সকলেই বলিলেন, প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গে ধর্মের লোপ হইবে। দশরথ প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থেই রামের বনবাস মানিয়া লইয়াছিলেন। রামচন্দ্র তখন আজীবন সুখ-দুঃখের সঙ্গী, চিরানুগত লক্ষ্মণকে বিদায় দিলেন,

বিসর্জয়ে ত্বাং সৌমিত্রে মা ভূদ্ধর্মবিপর্যয়ঃ।
পরিত্যাগো বধো বাপি সাধূনামমুভয়ং সমম্॥

—সৌমিত্রে, তোমাকে বিসর্জন দিলাম। ধর্মের বিপর্যয় যেন না ঘটে। ত্যাগ অথবা বধ সাধুলোকের নিকট উভয়ই সমান।

লক্ষ্মণ সরযূতীরে গমন করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। ইহার পর রামচন্দ্রও শরীর-বিসর্জনে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল ভরতকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবেন। ভরত সম্মত হইলেন না। রাজ্যে তাঁহার কোনদিনই আসক্তি ছিল না।

সত্যেনাহং শপে রাজন্ স্বর্গলোকেন চৈব হি।
ন কাময়ে যথা রাজ্যং বিনা ত্বাং রঘুনন্দন॥

—মহারাজ রঘুনন্দন, সত্য এবং স্বর্গলোকের দিব্য, আপনাকে ছাড়িয়া আমি রাজ্য কামনা করি না।

অতঃপর রামচন্দ্র ভরত ও শত্রুঘ্নর সহিত অর্ধক্রোশ পথ অতিবাহিত করিয়া পশ্চিম দিগ্-বাহিনী পুণ্যসলিলা সরযূতটে আসিলেন। সমগ্র অযোধ্যা নগরী তাঁহাদের অনুসরণ করিল। সকলের নিকট বিদায় লইয়া সকলের কল্যাণ কামনা করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত রামচন্দ্র দেহ বিসর্জন করিলেন। রাম-চরিত অবলম্বনে রামায়ণকাহিনী শেষ হইল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীরামচন্দ্র সমগ্র ভারতে অবতাররূপে পূজিত। যাঁহারা অবতার-তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না তাঁহারাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, তিনি একজন অসাধারণ মহামানব। অবতার সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি অতিশয় যুক্তিপূর্ণ। তিনি বলিয়াছেন, 'আমরা গোড়াতেই এ-কথা স্বীকার করিয়া লই যে, মানুষের পূর্ণতালাভের জন্য, তাহার মুক্তির জন্য, যাহা কিছু আবশ্যক সবই বেদে কথিত হইয়াছে। নূতন কিছু আবিষ্কার আর হইতে পারে না।...যখনই "তত্ত্বমসি" আবিষ্কৃত হইল তখনই আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পূর্ণ হইল; এই "তত্ত্বমসি" বেদে রহিয়াছে। বাকী রহিল কেবল বিভিন্ন দেশকালপাত্র অনুসারে সময়ে সময়ে লোকশিক্ষা। এই প্রাচীন সনাতন পথে জনগণকে পরিচালনা করা—ইহাই বাকী রহিল; সেইজন্য সময়ে সময়ে বিভিন্ন মহাপুরুষ ও আচার্যগণের অভ্যুদয় হইয়া থাকে।' ইঁহারাই কালক্রমে অবতার বলিয়া গৃহীত ও পূজিত হইয়া থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দের কথায় জগতের অধিকাংশ লোকই ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তিবিশেষরূপ ঈশ্বর-কল্পনা তাহাদের স্বভাবগত। প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, যে বুদ্ধদেব ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া গেলেন, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর হইয়া দাঁড়াইলেন। অতএব, ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। 'আর আমরা জানি, ঈশ্বরের বৃথা কল্পনা হইতে (অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ কাল্পনিক ঈশ্বর মানবের উপাসনার অযোগ্য) শ্রেষ্ঠতর জীবন্ত ঈশ্বরসকল এই পৃথিবীতে সময়ে সময়ে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া বাস করিয়া থাকেন। কোনরূপ কাল্পনিক ঈশ্বর হইতে, আমাদের কল্পনাসৃষ্ট কোন বস্তু

হইতে, অর্থাৎ আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে যতটা ধারণা করিতে পারি, তাহা হইতে তাঁহারা অধিকতর পূজার যোগ্য' (ভারতে বিবেকানন্দ, পৃঃ ২৫২)।

এইভাবেই ভারতবর্ষে যুগে যুগে এই সকল মহাপুরুষগণ মানবের পূজা পাইয়া থাকেন। ইঁহারাই জগৎ-আলোড়নকারী অবতার বলিয়া স্বীকৃত। সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারিগণের বিনাশ ও ধর্মসংস্থাপনের জন্যই অবতারগণের আবির্ভাব। শ্রীরামচন্দ্রের জীবনেও উহা পূর্ণভাবে দেখা যায়। ভরদ্বাজ, শরভঙ্গ, অত্রি, শবরী প্রভৃতি ঋষি ও তাপসীগণ রামচন্দ্রের দর্শন লাভ করিয়াই তপস্যার ফল প্রাপ্ত হন। সৎপথ অবলম্বনপূর্বক যাঁহারা জীবন যাপন করিতে চাহেন, সেই সকল শরণাগত বনবাসী তপস্বিগণকে দুর্বৃত্তের অত্যাচার হইতে মুক্ত করিয়া তিনি অভয় দান করিয়াছেন। মহাবীর, বিভীষণাদি ভক্তগণের হৃদয়ের ভক্তিভাব রামচন্দ্ররূপ পূর্ণচন্দ্রকে অবলম্বন করিয়াই বিকশিত হইয়া জগতে ভক্তের মহিমা প্রচার করিয়াছে। যে সকল অসুর, রাক্ষস প্রভৃতি দুর্বৃত্তগণের অত্যাচার, নিপীড়ন সমগ্র জনস্থানে ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল তাহাদের তিনি যথাযোগ্য দণ্ডদানে বিনাশ করিয়াছেন। অবশেষে ধর্মরাজ্য স্থাপন করিয়া সমগ্র দেশে সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তি স্থাপন করেন।

রাম ও কৃষ্ণাবতারে অন্যান্য অবতারগণের সহিত এক বিষয়ে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। রাম ও কৃষ্ণ সংসার ত্যাগ করিয়া ত্যাগধর্মের মহিমা প্রচার করেন নাই। যদিচ রামচন্দ্রের জীবনে ত্যাগ কিছু কম নহে, কিন্তু তাহা সত্যরক্ষার্থে। রামচন্দ্রের সময়ে সংসারত্যাগী বহু ঋষি ছিলেন যাঁহাদের লক্ষ্য ছিল ব্রহ্মসাক্ষাৎকার। অরণ্যজীবনে ঋষিগণ তাহারই সাধনা করিয়া জনসাধারণের সম্মুখে তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতেন। জীবনের চরম লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভারতবাসী তখন ভোগকেই সর্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। বস্তুতঃ অবতারগণ সনাতন ধর্মই প্রচার করেন, যুগের উপযোগী করিয়া। রামচন্দ্রের জীবনে স্বধর্ম বা বর্ণাশ্রম পালনের সহিত সত্যধর্মের বিশেষ প্রচার—উহাই যুগোপযোগী। রামচন্দ্র আদর্শ নৃপতি। তাঁহার অপূর্ব জীবনে সেই বীরযুগের আদর্শ ও সত্যপরায়ণতার চূড়ান্ত আদর্শ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই সনাতনধর্মের পুনঃপ্রকাশ। তৎকালে ভারতবর্ষের দেশসমূহ নৃপতিশাসিত ছিল। রামাবতারে প্রয়োজন ছিল এমন রাজ্য স্থাপনের যেখানে সকলে স্বধর্মে নিষ্ঠার সহিত রত থাকিয়া জীবনের উদ্দেশ্যলাভে অগ্রসর হইতে পারে। একাধারে আদর্শ পুত্র, আদর্শ পতি এবং সর্বোপরি আদর্শ নৃপতি রামচন্দ্র সর্বতোভাবে প্রজার কল্যাণে নিজকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সীতাকে পর্যন্ত বিসর্জন দিয়াছিলেন। আদর্শ রাজ্য বলিতে রামরাজ্য বুঝায়—যেখানে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, ধর্মরক্ষা ও জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান। মহাত্মা গান্ধী তাই স্বাধীন ভারতে রামরাজ্য-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে জীবনের উচ্চতম আদর্শ স্থাপন এবং ঐ আদর্শে উপনীত হইবার সাধনা বা নিজ জীবনে ঐ আদর্শ প্রদর্শন—অবতার-জীবনে বিশেষভাবে দৃষ্ট হয় এবং উহাই তাঁহাদিগকে সাধারণ মানব হইতে পৃথক করে। রামচন্দ্রের জীবনেও উহার পূর্ণ প্রকাশ।

রামচন্দ্র যে অবতার অথবা একজন অসাধারণ মহামানব, মহাকালই তাহা প্রমাণ করিয়াছে। কতযুগ হইয়া গেল, ভারতের ইতিহাসে কত সাম্রাজ্যের পতন-অভ্যুদয় ঘটিল,

বিজাতীয় বিদেশী সভ্যতার প্রবল তরঙ্গ জাতীয় জীবনের কত পরিবর্তন আনয়ন করিল, কত কীর্তিমান, যশস্বী, নৃপতি, কর্মবিদ্, পণ্ডিত, নীতিবিদ্ স্মৃতির অতলে বিলীন হইয়া গেলেন, রামচন্দ্র কিন্তু তেমনই স্পষ্ট ও উজ্জ্বলভাবে জন-মানসে বিরাজ করিতেছেন। জীবনের সর্বস্তরে তাঁহার প্রভাব অদ্যাপি শিথিল হয় নাই। জ্ঞানী, ভক্ত, শিল্পী, সাধক, সুরকার কবি সকলেই সেই মহিমময় জীবন অনুধ্যান করিয়া নিজ নিজ পূজা-উপচার অর্পণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। উত্তর হইতে দক্ষিণ, পূর্ব হইতে পশ্চিম ভারতকে একত্র করিয়াছে রামচরিত্র অবলম্বনে রামায়ণ-কাহিনী। বহু ভাবমুখী বৈচিত্র্যময় ভারতীয় জীবনে ঐক্য সাধন করিয়াছেন রামচন্দ্র। তাঁহার জীবন অবলম্বন করিয়া সমগ্র ভারতে যে আদর্শ, সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা মূলতঃ আধ্যাত্মিক। দৈনন্দিন জীবনে নরনারী-নির্বিশেষে রামচন্দ্র ও তাঁহার অন্তরঙ্গ গোষ্ঠি-গণের জীবন হইতেই উচ্চাদর্শে জীবনগঠনের প্রেরণা লাভ করিয়াছে

বর্তমানে সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া আদর্শের প্রবল সংঘাত চলিতেছে। কোন দেশের পক্ষেই পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি হইতে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলা সম্ভব মনে হয় না। বিশেষতঃ বৃহত্তর রাষ্ট্রগুলির প্রভাব হইতে নিজকে মুক্ত রাখা কঠিন। যে বিজ্ঞান মানব-জীবনকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সমৃদ্ধি শক্তি প্রদান করিতেছে, প্রকৃতির বিচিত্র রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া কেবল জলে বা স্থলে নহে, অন্তরীক্ষেও আধিপত্য বিস্তারের নেশায় বিভোর করিতেছে—সেই বিজ্ঞানের হস্তে আত্মসমর্পণই কি মানবজীবনের শেষ পরিণতি? মহাকালই তাহা নির্ণয়ে সমর্থ। তবে ইতিমধ্যেই সংশয় দেখা দিয়াছে। জগতের চিন্তাশীল মনীষিবৃন্দ সায় দিতে পারিতেছেন না। চক্র ধীরে ধীরে আবর্তিত হইতেছে।

অন্যান্য দেশের কথা বলিতে পারি না। ভারতবর্ষ এত বিপর্যয়ের মধ্যেও কিন্তু মূল সুরটি একেবারে হারাইয়া ফেলে নাই। পাশ্চাত্য আদর্শে প্রভাবিত বহু শিক্ষিত নর-নারী পুরাতন ভাবগুলির মূল্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেও ভারতের লক্ষ লক্ষ নর-নারী অবতার বা মহাপুরুষগণের প্রতি আস্থা হারান নাই। ভারতের নর-নারীর চিত্ত হইতে কালজয়ী রামায়ণকাহিনী কখনও বিলুপ্ত হয় নাই। বর্তমান বিজ্ঞানযুগেও সমগ্র ভারতে অগণিত ভক্ত-হৃদয়ে রামচন্দ্রের উপাসনা, অনুধ্যান চলিতেছে। সুতরাং একথা বলিলে ভুল হইবে না যে, ব্রহ্মা স্বয়ং আদি কবি বাল্মীকিকে যে বর দিয়াছিলেন তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে :

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি ॥

-যতকাল পৃথিবীতে পর্বত ও নদীসমূহ বিরাজ করিবে, ভারতবাসী রামায়ণকথা হৃদয়ে বহন করিবে।

বৈরাগ্যের শান্ত স্পর্শে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

এ-আলোচঞ্চল লগ্নে শুনি বন্ধু আজ
তোমার বাঁশির ডাক উদাস, সুন্দর।
গায় সে বাঁশরী: এই সুখ-লীলায়িত
প্রাণের উৎসবনাট্যশালা-দীপালিকা
নয় নয় তোমার প্রেমের রঙ্গভূমি।
এ কেবল তোমার অচিন্ত্য অভিনয়,
এ-প্রাণলোকের টানে রাখিতে বাঁধিয়া
মুগ্ধজনে—কাহাকেও রাখিয়া দর্শক,
কাহাকেও নির্বাচিয়া নট, অভিনেতা।
কেন তুমি চাও বিশ্বে এ-লীলাবিহার
জানি না, বুঝি না আজো মনের বিচারে।
আনন্দের ক্ষণে মনে হয় সত্য যাহা,
বেদনার লগ্নে দেখি অবাস্তব, ছায়া।
শুধু জানি—এ-ভুবনে যেথা যত দোল
সবই দোলে তোমার দোলায়। সত্য তুমি
বিশ্বাতীত, সত্য তব কালাধীন মায়া।
গানের সুরও সত্য, সুরের ওপারে
নৈঃশব্দ্যও সম সত্য। জানি, তবু নাথ
আমি চাই সেই ছন্দ যেথা নিরন্তর
প্রেমাননকান্তি তব ঝলে অগুণ্ঠিত
অনির্বাণ স্বর্ণসূর্য আশীর্বাদ সম।

মৃদঙ্গ মুরলী শঙ্খ ঝঙ্কার তোমার
শুনি আমি থেকে থেকে—নানা মধু সুরে
তোমার অনিন্দনীয় বসন্তমঞ্জুল
নিত্য-বৃন্দাবন হ'তে। স্থায়ী নয় তার
আলাপ এ-মর্ত্যে। থেমে যায় অর্ধপথে
বার বার সে আফোটা ফুল সম যেন।
চির-পলাতক সে-লাবণ্য সম্ভাষণ।

তবু জানি আমি—তুমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছ
আমার তন্দ্রালু চিত্ত—উঠেছি চমকি',
পরক্ষণে আবার পড়েছি মোহঘুমে
ঢুলে আমি হায়! তবু কতবার তুমি
আমার এ-ক্লান্ত দেহমনে হে সুন্দর,
গিয়েছ বুলায়ে শান্ত স্নিগ্ধ বৈরাগ্যের
কোমল চামর -- সুগভীর করুণায়
ফিরায়ে আনিতে পদে পদে জীবনের
গতি-উত্তেজনা হ'তে, গাহি' মৃদুস্বরে
"বিনা স্থিতি শুধু গতি-মাদকতা মাঝে
নাই নাই জীবনের পূর্ণ মন্ত্রবাণী।"

তোমাকে চাওয়ার পথে এসেছে কত না
বাধা বার বার! কত স্থূল আত্মাদর,
তীব্র প্রলোভন, দুর্বিষহ দুঃখব্যথা,
সূক্ষ্ম অভিমান! খর কণ্টকবেদনে
ঝরেছে অঝোর রক্ত কত শতবার!
কভু অলক্ষিতে মোহ এনেছে আড়াল
ঢেকেছে কিরণ তব বন্ধু সেইক্ষণে
সহসা নিমেষে! তবু মনে হয় নাথ,
তোমার আনন্দমূর্তি নয়নসম্মুখে
উঠেছে ভাসিয়া যেন স্বপ্নমায়া-মাখা
ঘোর ঘূর্ণাবর্ত মাঝে কেন্দ্রমণি সম।
তাই লক্ষ্য হয় নি বিলুপ্ত যাত্রাপথে—
শুধু বন্ধু, তোমার অহেতু করুণায়।
তাই আজ দীপ্ত এ-নাট্যের রঙ্গ মাঝে
এ-প্রার্থনা জাগে—তুমি রেখো না আমায়
ক্ষণকাম-কামনার পরিধি-বেষ্টনে
মুগ্ধ করি' মোহিনী মায়ায়। যেন পারি

ববিতে দুরভিসার অল্প আশা ছাড়ি'
অনল্লের পানে—যেথা মর্মর তোমার
কাঁপে প্রতি আকাশ-আকুল মনোবনে
প্রতি প্রীতিফুলে যেথা তোমার প্রেমের
অশ্রুত ঝঙ্কার ওঠে কাঁপিয়া কাঁপিয়া
আধচেনা রাগমালা সুধাসম্ভাষণে।

তোমাকে চাওয়ার পথে কত সূক্ষ্ম ছল
আজো আনে অন্তরাল! কত আত্মসুখ
পরার্থের ছদ্মবেশে দেয় নিত্য হানা,
কত লক্ষ্যহারা তৃষ্ণা করে আবরণ
চিরন্তনী দিশা তব বুনিয়া আঁধার,
কত ছদ্মবেশী গর্ব দীপ্ত পৌরুষের
রূপ ধরি' আনে তর্ক সংশয় বিচার,
কুতর্কের যবনিকা বুনি' ঢাকে তব
করুণার অদিগন্ত স্ফটিক-নীলিমা!
যে-বাধা করেছি জয় আজো ক্ষণে ক্ষণে
দাঁড়ায় আবার এসে হায় করি' যেন
বিদ্রূপ আমার আত্মসম্ভ্রমে—সোল্লাসে
বলে যেন: "মূঢ় অসতর্ক! বার বার
স্খলিত হয় যে, সেও কেন গর্ব করে
তার তপস্যার?" আমি হয়েছি লাঞ্ছিত
যতবার দেবদ্রোহী শক্তিদের হাতে,
ঝরায়েছি অশ্রু অনুতাপে—তুমি এসে
কত ছলে অলক্ষিতে স্নেহস্পর্শে তব
মুছায়ে আমার নেত্র—আবার জাগায়ে
দিয়েছ আমার চিত্তে প্রসুপ্ত উৎসাহ,
আত্মঅবিশ্বাস-অন্ধকার মাঝে নাথ
জ্বালায়েছ ফিরে ফিরে মর্মপ্রতিমার
ক্ষুণ্ণ দীপ্তি তোমার দেবতা-প্রসাদের
অদৃশ্য স্ফুলিঙ্গে।

তাই আজ এ-প্রার্থনা
চরণে তোমার বন্ধু করি নিবেদন:
"ছেড়ো না আমারে তুমি যদি মোহবশে
যাই দূরে স'রে। যদি রচি গর্বকারা
এসো তুমি বজ্রমণি-জ্বালায় তাহারে
করিয়া বিলুপ্ত দিতে মুক্তি তব দাসে।
যেন নাথ, রাখি নিত্য স্মরণে আমার:
যেথা দৈবী পূর্ণকান্তি দেয় নি নিটোল
পূর্ণিমার জয়দীক্ষা আঁধারদলনী,
সেথা নাই বেদনার নিত্য রূপান্তর.
চেতনাচিন্ময় অনিন্দ্যের ইন্দ্রজালে।
যেথায় অচ্যুত রাগচ্ছন্দ অপরূপ
ওঠে নি মন্দ্রিয়া বিনির্মল মূর্ছনায়
সেথা পূর্ণ পূজাব্রত আজো নির্বাহিত
হয় নি প্রেমের পৌরোহিত্যে। আজ করো
আমাকে তোমার চিরচরণ-পূজারী
স্মরণের স্তবগানে বন্ধহারা সাধে;
শাশ্বতের উচ্চারণে গাহিব তোমার
নীলমন্ত্র সর্ব-অমাযবনিকাজয়ী।
থেকো না আমায় বন্ধু ভুলি'—দীক্ষা দাও
তোমার অপরাজেয় প্রেমসাধনার—
বরে যার যুগে যুগে যোগী ঋষি কবি
পেয়েছে তোমার নিত্য স্পর্শ ম্লানিহীন.
অহৈতুকী করুণার স্বয়ম্প্রকাশ।

সেণ্ট ফ্রান্সিস ও সাধু নাগমহাশয়*

ব্রহ্মচারী গৌরাঙ্গ

এ জগতে তিন শ্রেণীর 'অহংবান' মানুষ দেখা যায়। প্রথম, যাঁদের 'আমি' খুব বিরাট এবং ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এঁদের 'আমি' দুঃখে বিচলিত হয় না এবং সুখেও উচ্ছ্বসিত হয় না। এঁদের আমিত্ববোধ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু জোড়া। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাঁরা, তাঁদের 'আমি' সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরে নিবেদিত, তাই সে 'আমি'কে তাঁরা নিজেদের বলে দাবী করেন না। তাঁরা 'নাহং নাহং, তুহুঁ তুহুঁ'—এই মন্ত্রে সিদ্ধ। তাঁদের 'আমি' ভগবানের লীলাবিলাস সম্ভোগের জন্য। আর তৃতীয় শ্রেণীর 'আমি'—সাধারণ 'আমি', যে 'আমি'কে 'কাঁচা-আমি' বলে, যে 'আমি' সুখ-দুঃখ, মানাপমানাদি দ্বন্দ্বের দোলায় সদা দোলায়মান।

আমরা দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে দুইজন মহাপুরুষের জীবনের একটি তুলনা-মূলক চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করব। এঁদের একজন হচ্ছেন আদর্শ সন্ন্যাসী এবং অপরজন আদর্শ গৃহী, অথচ উভয়েই পূর্বোল্লিখিত একই থাকের মহাপুরুষ।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইটালীতে যে তুমুল ধর্মান্দোলন হয়েছিল, উহার মূলে ছিলেন সেণ্ট ফ্রান্সিস। তাঁর জন্ম হয় ১১৮২ খৃষ্টাব্দে, ইটালীর অন্তর্গত অ্যাসিসি শহরে। পিতা পিয়ার্টো বারনারডন ছিলেন ধনবান বস্ত্র-ব্যবসায়ী এবং মা পিকা ছিলেন ধর্মশীলা বিনীত-স্বভাবা। পিতা বিদেশে ব্যবসায় উপলক্ষে ঘুরতেন; তখনকার দিনে এই সমস্ত ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন দেশের ধর্ম, আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি-কৃষ্টির কথা অপরাপর দেশের লোকদের কাছে বলতেন; ছোটখাট প্রচারকেরই কাজ করতেন যেন তাঁরা। প্রবাস থেকে ফিরলে পিতার কাছে ফ্রান্সিস বিভিন্ন ধর্মের নূতন নূতন তত্ত্ব শুনতেন। প্রথম জীবনে সেগুলি তাঁর মনের উপর বেশী রেখাপাত না করলেও সেগুলি বীজাকারে তাঁর হৃদয়ে নিহিত ছিল এবং কালে অভাবনীয় সুফল প্রসব করেছিল। খ্রীষ্ট-ধর্মের নিয়মানুসারে মা তাঁকে উপাসনামন্দিরে নিয়ে গিয়ে দীক্ষিত করলেন এবং নাম রাখলেন 'জন'। কিন্তু পিতা বিদেশ থেকে ফিরে তাঁর নাম পাল্টে 'ফ্রান্সিস' করলেন। কারণ ফরাসী দেশের সম্ভ্রান্তদের প্রতি বারনারডনের একটা উচ্চ ধারণা ছিল এবং তিনি চেয়েছিলেন তাঁর ছেলে ফরাসী আদবকায়দায় মানুষ হোক।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতেও ধর্মবিপ্লব দেখা দিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উত্থান হল, কালক্রমে ঐ সব সম্প্রদায়ের নেতাদের লোকান্তরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সম্প্রদায়গুলিও ক্ষীণাকার হয়ে গেল। কিন্তু ঐ কালে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জীবন অবলম্বনে সনাতন হিন্দুধর্মরূপ বিরাট শাশ্বত অশ্বত্থ আবার নবীনভাবে পত্র-পুষ্প-ফলে সুশোভিত হয়ে উঠল। বৈদিক সনাতন ধর্মের দুটি পথ—নিবৃত্তি- ও প্রবৃত্তি-মার্গ। শ্রীরামকৃষ্ণ দুটি পথেই নূতন আলোক-পাত করলেন। প্রথম পথটি অবলম্বন করেছিলেন

* প্রবন্ধটির উপাদান প্রধানতঃ এই গ্রন্থগুলি হইতে হইতে সংগৃহীত :—

১। সাধু নাগ মহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী; ২। St. Francis of Assisi—Swami Atulananda; ৩। St. Francis and Sri Ramakrishna—Sister Devamata.

স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসীগণ এবং দ্বিতীয়টি অবলম্বন করেছিলেন সাধু নাগমহাশয়, বলরাম-বাবু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ আদর্শ গৃহীগণ।

দ্বিতীয় পথের পুরোধা ছিলেন দুর্গাচরণ নাগ। যাঁর সম্বন্ধে পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'পৃথিবীর বহুস্থান ভ্রমণ করলাম, নাগ-মহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখলাম না।' ইঁহার জন্ম হয় ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে, পূর্ববঙ্গের দেওভোগ নামক পল্লীতে। পিতা দীনদয়াল নাগ ছিলেন দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ নিষ্ঠাবান হিন্দু। মা ত্রিপুরাসুন্দরী বাল্যেই মারা যাওয়ায় বালবিধবা পিসীমার স্নেহযত্নে তিনি মানুষ হন।

ফ্রান্সিসের বিদ্যাশিক্ষা শুরু হয় ধর্মযাজকের নিকট। তিনি অল্প পরিমাণ ল্যাটিন ভাষা শিখেছিলেন। ফরাসী ভাষাই তাঁর জীবনের উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল; ফরাসী কবিতা এবং ফরাসী বীরদের বীরত্বের গাথা তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট ও উত্তেজিত করত। লেখনীধারণে তিনি বিশেষ পটু ছিলেন না। পরবর্তী জীবনে তিনি যা বলতেন লোকে লিখে নিত এবং লেখা শেষ হলে তিনি স্বাক্ষরের পরিবর্তে একটা ক্রুশ-চিহ্ন অঙ্কিত করে দিতেন। খেলা-ধূলায় তিনি ছিলেন সকল ছেলেদের নেতা। কথিত আছে, তখনকার দিনে সেখান-কার পিতামাতারা নিজ নিজ সন্তানদের দুর্নীতি-পূর্ণ ছোটখাট কার্যে উৎসাহ দিতেন; ফলে ফ্রান্সিস শীঘ্রই অসৎকার্যে অভ্যস্ত হয়ে উঠেন। পিতা বারনারডন যদিও কৃপণ ছিলেন তথাপি তিনি চাইতেন তাঁর ছেলে দিলদরিয়া ভাবে খরচ করুক এবং আমোদপ্রমোদে সম্ভ্রান্তদের সমকক্ষ হয়ে উঠুক। কিন্তু মায়ের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, জগদীশ্বরের ইচ্ছায় ফ্রান্সিস একজন নিষ্ঠাবান সাধু হবে।

অপরদিকে ধর্মভীরু, সত্যনিষ্ঠ নির্লোভ পিতার শান্তস্বভাব পুত্র দুর্গাচরণের জাগতিক খেলাধূলায় তত মন ছিল না। আকাশে চন্দ্রোদয় হলে সে পিসীমাকে আবদার করে বলত, 'চল মা, আমরা ঐ দেশে চলে যাই, এখানে থাকতে আর ভাল লাগে না।' বাতাসে বৃক্ষ দুললে বলত, 'মা, আমি ওদের সঙ্গে খেলা করব।' পিসীমা-কথিত রামায়ণ-মহাভারতের গল্প সে দুর্ভিক্ষের অন্নের মত গোগ্রাসে গিলত এবং রাত্রে স্বপ্নে অবিকল ঐ সব দেবদেবী দর্শন করত। সত্যের প্রতি তার দৃঢ় নিষ্ঠা ছিল। একদিন খেলাচ্ছলে সঙ্গীরা তাকে একটা মিথ্যা বলবার জন্য জিদ করে কিন্তু সে তাতে অস্বীকৃত হওয়ায় সঙ্গীরা ধান-ক্ষেতের উপর দিয়ে টানতে টানতে তার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত করে দেয়। পড়া-শুনায় তার তীব্র আগ্রহ ছিল। বালকবয়সে দীর্ঘ দশ-বারো মাইল পথ পায়ে হেঁটে ঢাকার একটি স্কুলে সে পড়তে যেত। পরে কলকাতায় ডাক্তারী পড়া শুরু হয়। পিতা চাইতেন পুত্র ধনবান গৃহস্থ হোক কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রী পিসীমা আশীর্বাদ করে বললেন, 'তোর যেন রামে মতি থাকে।'

জনসাধারণকে সকল বিষয়ে অতিক্রম করাটা ফ্রান্সিসের জীবনের একটা প্রধান লক্ষ্য ছিল। বিশ বছর বয়সে তিনি প্রমোদতরঙ্গে ভেসেছিলেন কিন্তু ঐ কালে মাঝে মাঝে তাঁর বিবেক ভীষণ দংশন করত। তিনি মনে করতেন, দুই-চার ঘণ্টার অমিতাচারিতায় যে অর্থ ব্যয় হয় উহাতে তো কত ক্ষুধার্ত দরিদ্রের বহুদিন সুখে-স্বচ্ছন্দে চলতে পারে। কোমল হৃদয়কে আগন্তুক ভাব ও বিষয়ের দ্বারা জোর করে চিরদিনের জন্য কঠিন পাষাণের মত শক্ত করা যায় না। তাই দুঃখপ্রপীড়িত লোক দেখলে স্বেচ্ছাচারী ফ্রান্সিসের কোমল হৃদয়-

তন্ত্রীতে একটা বেদনা বোধ হত। পিতার ব্যবসাকার্যে তিনি নিযুক্ত হন এবং উহাতে সম্যক কৃতকার্যতাও লাভ করেন। কিন্তু অসৎসঙ্গ তাঁর উপর অত্যধিক আধিপত্য বিস্তার করায় তিনি চঞ্চলমনা হয়ে উঠেন; ফলে কর্ম ছেড়ে তিনি সঙ্গীদের সঙ্গে মিশতে শুরু করেন এবং পিতার অসন্তোষের কারণ হন। এই সময় ইটালীর স্বাধীনতা-সংগ্রাম শুরু হয়। ফ্রান্সিস আন্দোলনে যোগ দেন এবং কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। কারাগারে অবস্থানকালে নিজ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানাবিধ চিন্তা ও সংকল্পাদি তাঁর মনোমধ্যে উদিত হত। তিনি ঐ সব স্বপ্ন দেখতেন এবং প্রায়ই বলতেন, 'দেখবেন, আমি একদিন জগৎপূজ্য হব।' এক বছর পরে তিনি মুক্ত হন। কিন্তু সংস্কার যাবে কোথা? উচ্ছৃঙ্খলতা আবার তাঁকে প্রচ্যুত কেলিকন্দুকের মত সোপানের অধোদেশে নিয়ে চলল। সঙ্গে সঙ্গে সেই সুপ্রাচীন নিয়ম দেখা দিল—ভোগের পর রোগ এবং প্রাণসংশয়কালে মানসিক জীবনের মহাপরিবর্তন। স্বাস্থ্য-লাভোন্মুখ রোগীর অনুভবশক্তি সর্বথা তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে, তাই তিনি প্রকৃতির সুন্দর শোভার মধ্যে হৃদয়ের প্রসন্নতা খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু নূতন উপসর্গ দেখা দিল—হৃদয় ক্লেশকর নৈরাশ্যে এবং মহাশূন্যতায় ভরে গেল। অতীতজীবনের আপাতমধুর স্মৃতিগুলি অকিঞ্চিৎকর, হাস্যোদ্দীপক ও বিষময় বলে মনে হল। শূন্যতা এনে দিল আতঙ্ক, এবং ঘৃণা সৃষ্টি করল চরম বৈরাগ্য। এ জগতে যে চরিত্র যত উন্নত—তার হৃদয়ে শূন্যতার বিশালতা যেমন অধিক, উহাকে পূর্ণ করবার চেষ্টাও ততোধিক; সাধকজীবনে এরূপ হৃদয়বেদনা নূতন নহে।

মাতৃসম পিসীমার কি গতি হল? মানুষ কেন জন্মগ্রহণ করে, কেনই বা মরে? মরলেই যদি সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়, তবে ছাই-ভস্ম কিসের এত আমার-আমার? জন্ম-জরা-মৃত্যুপূর্ণ সংসারে কেন এসেছি, মনুষ্যজীবনের কর্তব্য কি?—এই সব চিন্তায় নাগমহাশয় বিভোর হলেন। কলকাতায় গঙ্গাতীরের শ্মশানে বসে একা একা সমাধানের চেষ্টা করতে লাগলেন আপন জীবনজিজ্ঞাসা। মর্মবেদনার নিবৃত্তি কোথায়? গভীর তমিস্রা! লম্বিত শববক্ষে চিতা ধিকি ধিকি জ্বলছে। শ্মশানবাসী অশ্বত্থ ও শ্মশানবাহিনী জাহ্নবী সমস্বরে সুর মিলিয়ে জীবন-মরণের কি এক করুণ গান গাইছে—যদিও সে গানের ভাষা ছিল না তবুও তা ছিল মর্মস্পর্শী। 'অনিত্য, অনিত্য, সকলই অনিত্য'—শূন্যতা এবং জগতের অসারতা ঠিক ফ্রান্সিসের মত নাগমহাশয়ের জীবনে দেখা দিল। কিন্তু এ জগতে মানুষ যতই গতানুগতিকতা ছেড়ে, প্রেয় ছেড়ে শাশ্বত শ্রেয়ের পথে চলতে চেষ্টা করে ততই প্রকৃতি বাধা দিতে থাকেন। মানুষ কত কষ্ট করেই না সুখের আশায় সংসার বাঁধে! পিতা ও পিসীমা জোর করে বিবাহ দিয়েছিলেন কিন্তু বিধিচক্র উল্টো দিকে ঘুরল। 'সংযোগা বিপ্রযোগান্তাঃ' অর্থাৎ মিলনের অন্তে বিচ্ছেদ; কিন্তু এক্ষেত্রে মিলনের পূর্বেই বিচ্ছেদ হল। কিশোরী বধূকে ভগবান সরিয়ে নিয়ে সংসার বন্ধন থেকে নাগমহাশয়কে মুক্তি দিলেন। পুত্রের শূন্য হৃদয়কে পূর্ণ করবার জন্য পিতা পুনরায় বিবাহের প্রস্তাব করলেন। ঈশ্বরানুরাগী বৈরাগ্যবান পুত্র জানতেন, বিবাহ পূর্ণতা নয়, বন্ধন; তাই পিতাকে কত বুঝালেন, 'দেখুন, এই বিবাহ থেকে জীবের যত ক্লেশ হয়। আপনি দয়া করে এ সঙ্কল্প থেকে নিবৃত্ত হোন, আর আমায় বন্ধনে ফেলবেন না। যতদিন আপনার

শরীর আছে, আমি কায়মনোবাক্যে আপনার সেবা করব। ঘরে বৌ এলে যা করবে, আমি তার শতগুণ করব। আমায় অব্যাহতি দিন।'

ফ্রান্সিস ও নাগমহাশয় উভয়ের ক্ষেত্রেই বিষয়ী পিতা চেয়েছেন সংসারে বাঁধতে। ফ্রান্সিস সনাতন রীতি অনুসারে সন্ন্যাসের দ্বারা সংসার-বন্ধন কেটেছেন। আর নাগমহাশয়? ভক্তভৈরব গিরিশের ভাষায়, 'নাগমহাশয়কে বাঁধতে গিয়ে মহামায়া বড়ই বিপদে পড়েছেন। নাগমহাশয়কে মহামায়া বাঁধতে লাগলেন, কিন্তু মায়া যত বাঁধেন, নাগমহাশয় তত সরু হয়ে যান। ক্রমে এত সরু হলেন যে মায়াজালের মধ্য দিয়ে গলে চলে গেলেন।'

মানুষ পুরুষকার অবলম্বন করে যতই উঠুক না কেন, সে পূর্বকর্মফলজনিত দৈবকে সম্পূর্ণভাবে এড়াতে পারে না। নাগমহাশয়ও বিষবৎ-বোধ হলেও পিতৃআজ্ঞায় দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন। আমরা পরে দেখাব, এই বিবাহের পশ্চাতে স্বয়ং ভগবানের গার্হস্থ্য-আশ্রমের একটি আদর্শ ছাঁচ তৈরী করা উদ্দেশ্য ছিল।

পার্থিব ভোগ্যবস্তু কোন মানুষকেই চিরশান্তি দিতে পারে না—ফ্রান্সিসকেও পারেনি। মানসিক অশান্তি দূর করবার একমাত্র উপায় যে আধ্যাত্মিকতা, তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। তিনি বুদ্ধি দ্বারা বুঝেছিলেন যে পার্থিব আমোদপ্রমোদে কিছু নাই; কিন্তু এ 'জগৎরূপ ডাইনীর এমনই কুহক' এবং মানবের দেহমন এতই দুর্বল যে মুহূর্তকালের জন্যও যদি তার হৃদয় থেকে সদিচ্ছা সরে যায় তবে অমনি উহা পূর্বপরিচিত ভোগতরঙ্গে ভাসতে উদ্যত হয়। হৃদয় কখনও শূন্য থাকে না। তাই শূন্যতার আতঙ্ক ও ক্লেশকর বেদনা থেকে বাঁচবার জন্য ফ্রান্সিস পূর্বের ন্যায় আবার ভোগতরঙ্গে জীবনতরী ভাসালেন। এবারকার ভোগের সঙ্গে ছিল বিপুল যশোলিপ্সা। পোপ তৃতীয় ইনোসেন্টের পক্ষে যুদ্ধ করবার জন্য ফ্রান্সিস 'নাইট' উপাধি নিয়ে অত্যুৎকৃষ্ট রণবেশে সজ্জিত হলেন। সগবে বলতেন, 'আমার বিশ্বাস আমি একজন প্রসিদ্ধ রাজপুত্রের পদবীতে শীঘ্রই অধিরূঢ় হব।' বিজয়ের আশায় স্মিতমুখে তিনি অশ্বপৃষ্ঠে উদ্দাম গতিতে ছুটে চললেন রণক্ষেত্রের দিকে কিন্তু পথিমধ্যে প্রবল জ্বর এল, সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাপ্রসূন গেল শুকিয়ে। পরদিবস তিনি ফিরে এলেন। এই আকস্মিক প্রত্যাবর্তনের কারণ কেউ জানে না, তবে সকলের বিশ্বাস এর পশ্চাতে কোন দৈবদর্শন ছিল। জাগতিক দৃষ্টিতে ফ্রান্সিস বিজেতার পরিবর্তে বিজিত হলেন এবং বীর রাজপুত্রের পরিবর্তে ভীরু কাপুরুষ হলেন। অন্যদিকে তিনি জগৎজয়ের পরিবর্তে স্বর্গজয়ের জন্য প্রস্তুত হলেন এবং রাজপুত্রের পরিবর্তে ঈশ্বরপুত্র হবার দৃঢ় সঙ্কল্প করলেন। অদ্ভুত পরিবর্তন। এ জগতে ভাগ্যবানদের পরিবর্তন আস্তে আস্তে হয় না। তীব্র পুরুষকার দ্বারা তাঁরা মুহূর্তের মধ্যে জীবনপটের আমূল পরিবর্তন করে ফেলেন।

বন্ধুগণের সঙ্গে বিলাসিতার পরিবর্তে এল নির্জনপ্রিয়তা, অমিতব্যয়িতার পরিবর্তে এল গরীবের দুঃখমোচন, আমোদ-প্রমোদ ও যশোলিপ্সার পরিবর্তে এল প্রচণ্ড অধ্যাত্মপিপাসা। এল তুমুল অন্তঃসংগ্রাম, পূর্বের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য তীব্র অনুতাপ, গভীর আকৃতি-মিনতি ও হৃদয়-বিদারী সকরুণ ক্ষমাপ্রার্থনা। জন্ম-জন্মান্তরের মনের গ্লানি তো এইরূপ অনুরাগ-অশ্রুতেই ধুয়ে যায়। ফ্রান্সিসেরও ধুতে শুরু করল। একদিন

ভোগোন্মত্ত বন্ধুগণ এইরূপ ভাবান্তর লক্ষ্য করে বলল, 'আরে, ফ্রান্সিস আমাদের সঙ্গ ছেড়ে নিশ্চয়ই কোন সুন্দরীর ধ্যানে মগ্ন।' এরূপ কথা-বার্তায় ফ্রান্সিসের চৈতন্য হলে পর তিনি উত্তর দিলেন, 'হাঁ, ঠিকই বলেছিস। আমি এমন এক দুর্লভ রানীরত্নের চিন্তায় মশগুল—যাঁর রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য ও পবিত্রতার উৎকর্ষ তোরা কল্পনা করতে পারবি না।' এই শ্লেষ-বাক্যের এখানেই শেষ। তাঁর জীবনের পটপরিবর্তন হল। ফ্রান্সিস সংসার ছাড়লেন। তাঁর সেই দুর্বার মন এবার দুর্বার গতিতে নাজারথের দরিদ্র সূত্রধরের প্রতি ধাবিত হল। তিনি দর্শন করলেন, মেরিনন্দন তাঁর সম্মুখীন হয়ে যেন বলছেন, 'ফ্রান্সিস, তুমি আমাকে অনুসরণ কর।'

শাস্ত্র বলেন ত্রিবিধ এষণা—পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা—এই এষণাত্রয়ই মানুষকে সংসারে বাঁধে এবং উহার ত্যাগের মধ্যে রয়েছে প্রকৃত সন্ন্যাসের তাৎপর্য। নাগ মহাশয় গৃহে থেকেও আজীবন সন্ন্যাসের ধর্ম পালন করে গেছেন।

পিতা দীনদয়াল পিণ্ডলোপের ভয়ে ব্যাকুল হয়ে গুরুবংশীয় এক সাধককে দিয়ে পুত্রকে এ বিষয়ে অনুরোধ করেন। এ কথা শোনামাত্র নাগমহাশয় একখানা ইট দিয়ে মাথায় আঘাত করতে করতে বলতে লাগলেন, 'গুরুকুলের সাধক হয়ে আপনি এই অসঙ্গত আদেশ করছেন!' আঘাতের ফলে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগল। সাধক আদেশ প্রত্যাহার করলেন। এ বিষয়ে তাঁর সাধ্বী সহধর্মিণী বলেছেন, 'তাঁর (নাগ মহাশয়ের) শরীরে কি মনে কোনরূপ মানবিক বিকার বা পরিবর্তন কখনও লক্ষিত হয়নি। তিনি অগ্নিমধ্যে বাস করেছেন বটে কিন্তু দিনেকের তরেও তাঁর শরীর দগ্ধ হয়নি।' তিনি বুঝেছিলেন, এ গৃহবাসী সন্ন্যাসীকে বাঁধতে পারে এমন রমণী এখনও জন্মগ্রহণ করেনি। দেবতা চিরদিনই দেবতা। কোন প্রতিকূল অবস্থাতেই তাঁর দেবত্ব নষ্ট হয় না।

নাগমহাশয় সাধারণ মধ্যবিত্তের ঘরে* জন্ম গ্রহণ করেন। অর্থ ছাড়া তো সংসার চলে না, অথচ চাকুরির উপর আজন্ম ঘৃণা। তাই তিনি স্বাধীন ব্যবসা ডাক্তারী আরম্ভ করলেন এবং উহাতে ধন্বন্তরী হয়ে উঠলেন। ন্যায্য অর্থের বিনিময়ে ঔষধ দিতেন, কখনো বেশী নিতেন না। তিনি চিন্তা করতেন: এই যথার্থ ভবাটবী, ছলেবলে টাকা আনতে পারলে তবে সংসারে নাম যশ প্রতিপত্তি লাভ হয়। এমন সংসারে আমার কোন প্রয়োজন নাই। পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট শুনেছিলেন, 'ডাক্তার, উকীল, মোক্তার, দালাল—এদের ঠিক ঠিক ধর্ম লাভ হয় না।' ব্যস্—সঙ্গে সঙ্গে ঘরে গিয়ে ঔষধের বাক্স ও চিকিৎসার পুস্তক গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দেন। পিতা আক্ষেপ করে বললেন, 'তোর কাছে আমার বহু আশা ছিল। তুই যে দরবেশ হতে চলেছিস।'

নাগমহাশয়ের একটা প্রিয় কথা ছিল, 'যত থাকে গুপ্ত তত হয় পোক্ত, যত হয় ব্যক্ত তত হয় ত্যক্ত।' কেউ প্রশংসা করলে শিরে আঘাত করে বলতেন, 'আমি হাঁদা লোক।' গিরিশবাবু তাই সত্যই বলেছেন, 'অহং-শালাকে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে নাগমহাশয় তার মাথা ভেঙে ফেলে দিয়েছেন—তার আর মাথা তোলবার জো ছিল না।' এষণাত্রয়ের ভিত্তিভূমিই যেখানে নেই, এষণাত্রয় সেখানে দাঁড়াবে কোথায়?

এ জগতে ভাগ্যবানদেরই বৈরাগ্যের জোয়ারভাঁটা কম হয়। সংসারে যাঁরা অনিত্যতার জলন্ত ছাপ দেখেন, কোন প্রলোভনই তাঁদের আর ভোলাতে পারে না, লক্ষ্যের দিকে

সোজা এগিয়ে যান তাঁরা। নাগমহাশয়ের মনও ফ্রান্সিসের মত লক্ষ্যের প্রতি ধাবিত হল। ভগবানলাভ করে মানবজীবন সার্থক করব—এ সঙ্কল্প দৃঢ়তর হল। কিন্তু কে পথ বলে দেবে? 'বাবা, মহামায়ার আদেশে তোমাকে মন্ত্রদীক্ষিত করতে এখানে এসেছি'—বলে এগিয়ে এলেন কুলগুরু। দীক্ষার পর চলল বহু উগ্র, উগ্রতর তপস্যা। ভক্তের করুণ প্রার্থনায় ভগবান বড় বিচলিত হন। ফ্রান্সিসের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে ভগবান যীশু যেমন তাঁকে নিজের পথে আকর্ষণ করলেন, তেমনি সমস্ত পথের ও মতের সঙ্গমস্থল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নাগ মহাশয়ের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে তাঁকে তাঁর পথে চালিত করে বললেন, 'সংসারে থাকবে ঠিক পাঁকাল মাছের মত। গৃহে থাকা, তার আর দোষ কি?'

মানুষের যতদূর সম্ভব, মনে হয়, মহাত্মা ফ্রান্সিস ঐশীভাবে ততদূর অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ঈশার জীবন অনুসরণে তাঁর প্রবল ইচ্ছা ছিল এবং ঈশানুসরণেই তাঁর জীবন গঠিত হয়েছে—একথা তিনি সর্বদা বিশ্বাস করতেন। ঐ বিশ্বাসের জন্য অহংকার তাঁকে আজীবন স্পর্শ করতে পারেনি। আমরা দেখব, ভবিষ্যৎ জীবনে অসীম উৎসাহে তিনি ধর্মপ্রচার-কার্যে ব্রতী হলেও অহংভাব তাঁর অন্তরে কখনও স্থান পায়নি।

উভয়ের ধারাবাহিক জীবনের মাঝখানে আমরা উভয়ের দীনতার প্রতি একটু লক্ষ্য করব। দীনতা কি? গুপ্ত অহংকার ও ব্যক্ত দীনতায় পার্থক্য কোথায়? এ জগতে মানুষ-মাত্রেই গুণ আছে, অবশ্য উহার তর তম আছে। এই গুণকে আঁকড়ে মানুষ চায় সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে। সে তার গুণগত ঐতিহ্যের উপর দীনতার যবনিকা ফেলে কৌতূহল সৃষ্টি করে বলে—আমি একজন নগণ্য, দীনহীন ইত্যাদি। এইভাবে ঐ গুণবান ব্যক্তি তাঁর গুণের প্রচারের জন্য ঐরূপ বিরোধী বাক্যের মাধ্যমে ভান করেন। এই আপাত দীনতার দ্বারা ফুটে ওঠে গুপ্ত অহংকার। একেই লক্ষ্য করে পাশ্চাত্য দার্শনিক সোপেনহর বলেছেন, 'দীনতা দাম্ভিকতার চিহ্ন।' আর একরকম দীনতা আছে—মানুষের নিজের উপর আস্থাহীনতা। ইহা ভয়াবহ। ইহা মানুষের জীবনীশক্তিকে পঙ্গু করে দেয়। এই দীনতার প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণ কটাক্ষ করে বলেছেন, 'নিজেকে দীনহীন ভাবলে সে দীনহীন হয়ে যায়।' কিন্তু ঠিক ঠিক দীনতা আসে চরম শরণাগতি বা আত্ম-সমর্পণ থেকে। এখানে ভণিতা নাই, গুণের গরিমা নাই, হেঁয়ালি নাই; এ দীনতা ক্ষমতাহীন ভীরুতা নয়। 'আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী'—এই ভাবের আন্তরিক অভিব্যক্তি এখানে। জগতের সকল মহাপুরুষদের জীবনেই এই দীনতার ছাপ। ফ্রান্সিসের জীবনে দেখি, 'Blessed are the meek' এ কথার পরিপূর্তি; আর, নাগ মহাশয়কে দেখিয়ে, এ প্রবন্ধের প্রারম্ভে বর্ণিত প্রথম থাকের অহংবান স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'এরই ঠিক ঠিক দীনতা - একটুও ভান নেই।'

আমরা এবার ফ্রান্সিসের নবজীবনে প্রবেশ করব। সে সময় ইউরোপে ধর্মযাজকদের চরিত্রহীনতা চরম সীমায় উপনীত হয়েছিল। তাঁরা অতিশয় কোপনস্বভাব, অতিরিক্ত প্রতারণাপরায়ণ, অহংকারী ও অর্থলোলুপ হয়ে উঠেছিলেন। সন্ন্যাসীদের অবস্থা ইহাদের অপেক্ষা কোন অংশে প্রশংসনীয় ছিল না। মঠের ও আশ্রমের মধ্যে মাদকদ্রব্যের দোকান খোলা থেকে এমন কোন গর্হিত কর্ম নেই যে তা অনুষ্ঠিত হত না। পোপ তৃতীয়

ইনোসেণ্ট স্পষ্ট স্বীকার করেছিলেন, অগ্নি ও তরবারির সাহায্য গ্রহণই ধর্মযাজক ও সন্ন্যাসীগণের জীবনে এই ভীষণ ব্যাধির একমাত্র প্রতিকার। বাইবেলের অনুশাসন কেউ মানত না। চরম অধঃপতন এসেছিল।

ধর্মজীবনের ঈদৃশ অধঃপতন ও শোচনীয় পরিণামের মধ্যে আদর্শ চরিত্র ও ধর্মজীবন অতিশয় বিরল হলেও একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। মহাত্মা ফ্রান্সিসের পবিত্র জীবন এইরূপ চরম সময়ে উদ্ভাসিত হয়ে নিজ চরিত্র-প্রভাবে ধর্মহীনতারূপ সমূহ বিপদ বিশৃঙ্খলার মধ্যে জনসাধারণকে আলোকের বর্তিকা দেখাল। তিনি বাইবেলের আক্ষরিক অনুশাসন অবলম্বন করে জীবন গড়তে শুরু করলেন। গৃহ ছেড়ে পিতার ভয়ে সেণ্টড্যামেন নামক একটি গীর্জায় আশ্রয় নিলেন এবং ষোল আনা মন দিয়ে সেই প্রেমঘনমূর্তি মহাকারুণিক ঈশামসির কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা করলেন, 'হে মহান ও মহিমময় প্রভু ঈশা, আপনার অমিত স্বর্গীয় আভা দ্বারা আমার হৃদয়নিহিত অজ্ঞানতিমির দূর করে দিন। ভববন্ধন খণ্ডনকারী দিব্য মূর্তিতে আপনি আমার নয়ন-সম্মুখে আবির্ভূত হন এবং যাতে আমি সমস্ত কর্ম আপনার পবিত্র ইচ্ছানুযায়ী সম্পন্ন করতে সমর্থ হই, আমাকে এইরূপ শক্তি প্রদান করুন।' এই প্রার্থনার পর তাঁর এক দিব্য অনুভূতি হয়েছিল। 'তিনি আমার, আমি তাঁর'—একথার শব্দার্থ ও মর্মার্থ তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করল। ভগবান ঈশার সঙ্গে তাঁর একীভাব পূর্ণতালাভ করল—তিনি এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন।

শাস্ত্র বলেন—যাঁদের মাথায় দাউ দাউ করে বৈরাগ্যের বহ্নি জ্বলে, তাঁরাই জ্ঞানের অধিকারী। তপ্ত রক্তবর্ণ লৌহে জলকণা পড়বামাত্র যেমন সঙ্গে সঙ্গে উপে যায়, তীব্র বৈরাগ্যের কাছে সংসারাসক্তিও তেমনি লোপ পায় সঙ্গে সঙ্গে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই নাগমহাশয়কে দেখে বলেছিলেন, 'এ লোকটা যেন আগুন—জ্বলন্ত আগুন।' ভক্ত ভগবানকে চায়। কিন্তু 'তাঁর (ঠাকুরের) নিকট কিছুই চাইবার প্রয়োজন ছিল না; তিনি মনের ভাব বুঝে তৎক্ষণাৎ মনোভীষ্ট পূর্ণ করে দিতেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ কল্পতরু।'—নাগমহাশয় বলতেন। ঠাকুর একদিন নিজ দেহ দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার এটা কি বোধ হয়?' নাগমহাশয় অমনি করজোড়ে বললেন, 'ঠাকুর, আর আমায় বলতে হবে না। আমি আপনারই কৃপায় জানতে পেরেছি, আপনি সেই।' ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে নাগমহাশয়ের বক্ষ দক্ষিণপদ দ্বারা স্পর্শ করতেই নাগমহাশয়ের ভাবান্তর হল। তিনি দেখলেন—সমস্ত স্থাবর জঙ্গম চরাচরে কি এক দিব্য জ্যোতি উছলে উঠছে।

ভগবান তাঁর ভক্তকে সদা রক্ষা করেন—একথা বিশ্বাসহীন মানুষ বুঝেও বুঝে না। ফ্রান্সিসের এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাছাড়া বীরহৃদয় ঈশানুচরের মধ্যে যিনি নিজেকে পরিগণিত করতে অগ্রসর, তাঁর পক্ষে পিতৃভয়ে পালিয়ে থাকা শোভা পায় না। তিনি পিতার কাছে নিজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করতে চললেন। কিন্তু মলিন শ্রীহীন ছিন্নবসন-পরিহিত দীনহীন মূর্তি নিয়ে প্রবেশ করা মাত্র, বালকেরা 'পাগল পাগল' বলে চীৎকার করে, ঢিল ছুঁড়ে তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলল। এমনকি বালকদের পিতামাতারা পর্যন্ত জানালা দিয়ে তামাসা দেখতে লাগলেন। প্রবাদ আছে—একজন পাগল বহু লোককে পাগল করে তোলে। পিতা বারনারডন পুত্রকে ঐ অবস্থায়

দেখে লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটে এলেন এবং ঘাড় ধরে তাঁকে বাড়ীর একটা ক্ষুদ্র অন্ধকার ঘরে আটক করে রাখলেন। তারপর পিতা কার্যোপলক্ষে বাইরে গেলে মা পিকা তাঁকে ছেড়ে দেন। ছাড়া পেয়ে তিনি আবার সেণ্টড্যামেনে চলে গেলেন। এ জগতে প্রায় সকল মহাপুরুষই সত্যের জন্য পাগল বলে গালমন্দ এমনকি মারধোর পর্যন্ত খেয়েছেন। আমরা পূর্বে দেখিয়ে এসেছি—বালকবয়সে নাগ মহাশয়কে সত্যভঙ্গের উদ্দেশ্যে মেঠো জমির উপর দিয়ে টেনে সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

ফ্রান্সিসকে সংসারে টানবার জন্য পিতা বহু চেষ্টা করলেন কিন্তু কোন ফল হল না। ক্রুদ্ধ পিতা শেষে নিজের মান বাঁচাবার জন্য পুত্রকে দেশান্তরী করতে চাইলেন। কিন্তু তাতেও সুবিধা হল না। অবশেষে পুত্রকে বিষয়াধিকার থেকে বঞ্চিত করবার জন্য প্রথমে বিচারালয়ে পরে ধর্মাচার্যের নিকট নালিশ করলেন। বিচারের দিন এল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখবার জন্য বিচারকক্ষ লোকে লোকারণ্য। ধর্মাচার্য বিচার্য বিষয়টি সর্বসমক্ষে বিবৃত করলেন; তারপর ফ্রান্সিসকে তাঁর যা কিছু ছিল তা সবই ত্যাগ করতে উপদেশ দিলেন। ফ্রান্সিস দ্বিরুক্তি না করে জিনিসপত্র, সামান্য অর্থ এবং এমন কি উলঙ্গ হয়ে নিজের পরিধেয় বস্ত্রখানি পর্যন্ত সর্বসমক্ষে পিতাকে প্রত্যর্পণ করলেন। এইভাবেই তো মানুষ ভগবানের জন্য অষ্টপাশ থেকে মুক্ত হয়।

নাগমহাশয়কেও সংসারে টানবার জন্য পিতার চেষ্টা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছিল। এমন কি দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে অস্বীকৃত হলে পিতা বলেছিলেন, 'আমি শাপ দিয়ে যাব, যাতে তোর ধর্মে না উন্নতি হয়।' নাগমহাশয় পিতাকে বুঝালেন যে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণচরণে অর্পিত, তাঁকে দিয়ে সংসারের কোন কার্য আর হবে না। একদিন বাড়ীর কাছে একটি সতেজ লাউগাছ খাবার জন্য একটি গরু চেষ্টা করছে, কিন্তু বাঁধা থাকার জন্য ততদূরে তার মুখ যাচ্ছে না; দেখে নাগমহাশয় গরুটির দড়ি খুলে দিয়ে বলতে লাগলেন, 'খাও মা, খাও।' ঈদৃশ আচরণে ক্রুদ্ধ পিতা ভর্ৎসনা করে বললেন, 'নিজে তো উপার্জন কর না! সংসারের যাতে হিত হয় সেরূপ করা দূরে থাক এরূপ অনিষ্ট করা কেন?' পরে কথায় কথায় বললেন, 'ডাক্তারি করা তো ছেড়ে দিলি; এখন কি খেয়ে কি করে জীবন কাটাবি?' নাগ-মহাশয় প্রত্যুত্তরে বললেন, 'যা হয় ভগবান করবেন, আপনি সেজন্য ভাববেন না।' পিতা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এখন ন্যাংটা হয়ে চলবি আর ব্যাঙ খেয়ে থাকবি।' নাগমহাশয় কিছু না বলে পরিধেয় বস্ত্রখানি ত্যাগ করে এবং উঠানে পড়ে থাকা একটা মরা ব্যাঙ খেয়ে পিতৃ-আজ্ঞা পালন করলেন। (ক্রমশঃ)

দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়ায় স্বামীজী

ব্রহ্মচারিণী ঊষা

[অনুবাদক—শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়]

(পূর্বানুবৃত্তি)

নিকটবর্তী পাসাডেনা শহরে কখন থেকে স্বামীজী বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন তা জানা নাই। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর পর্যন্ত নিশ্চয়ই তিনি তথায় কাজ করছিলেন। ঐ তারিখে তিনি সারা বুলকে লিখেন, 'আমি পাসাডেনায় খুব পরিশ্রম করছি; আশা রাখি, আমার এখানের কাজে কিছু ফল হবে।'

'স্বামী বিবে কানন্দ [পত্রিকার অনুকরণে] পাসাডেনায় একজন প্রসিদ্ধ অতিথি'—এই শিরোনামায় পাসাডেনার দৈনিক 'ইভনিং স্টার'-এ ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ১৫ই জানুআরি নিম্নরূপ বর্ণনা মুদ্রিত হয়েছিল: 'চিকাগো বিশ্বমেলায় পৃথিবীর ধর্মমহাসম্মেলনে সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ব্যক্তি বোধ হয় মহান ভারতীয় প্রচারক স্বামী বিবে কানন্দ যিনি হিন্দো [পঃ অঃ] ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তাঁর মনোমুগ্ধকর ও অনুপম ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর দেশীয় ধর্মপরিবেশন চিকাগোর জনসাধারণের মধ্যে খুব উৎসাহ সৃষ্টি করে।'

'স্বামী বিবেকানন্দ অদ্য পাসাডেনায় অতিথি এবং অদ্য প্রাতে গ্রীনের অভ্যাগতদের সম্মুখে বক্তৃতা করিবেন।…শনিবার সেক্সপীয়র ক্লাব-ঘরে ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত তাঁকে অভ্যর্থনা করা হবে।'

দুই দিন পরে ঐ একই পত্রিকা এই টুকরো খবর বহন করে: 'গত রাত্রে সেক্সপীয়র ক্লাবে সামান্যসংখ্যক শ্রোতা চিত্তাকর্ষক তরুণ হিন্দু পণ্ডিত ও শিক্ষক স্বামী বিবেকানন্দকে অভিনন্দন জানাতে এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর ব্যাখ্যা শুনতে উপস্থিত ছিল।'

'এই সকল বক্তৃতায় প্রবেশমূল্য নাই এবং সকলকেই সমাদরে গ্রহণ করা হয়। লোকেরা যদি ক্লাসের ব্যবস্থা করতে পারে এবং ভারতে যে ইংরেজী শিল্পবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য স্বামীজী কাজ করছেন, তার সাহায্যার্থে প্রত্যেকে সাধ্যানুযায়ী চাঁদা দেয়, তাহলে স্বামীজী পরবর্তী সপ্তাহে সানন্দে আরো বক্তৃতা দেবেন।'

এই সব বিবরণ এবং অন্যান্য পত্রিকার বিবরণ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে স্বামীজী ১৫ই, ১৭ই ও ১৯শে জানুআরি গ্রীন হোটেলে (৯৯নং দক্ষিণ রেমণ্ড এভেনিউ) ভাষণ দেন। ১৫ই বিষয়বস্তু ছিল 'ভক্তিযোগ বা প্রেমের ধর্ম'। গ্রীন হোটেলের প্রাচীনতর অংশটি, যেখানে স্বামীজী বক্তৃতা করেছিলেন, বহু বৎসর পূর্বেই ভাঙ্গা হয়েছিল; কিন্তু ১৯৬২ খৃষ্টাব্দেও বাড়ীটির এক নবীনতর অংশে হোটেল খোলা ছিল এবং স্বামীজীর সময়ের একটি খিলান দুই অংশকে যুক্ত করে তখনও দাঁড়িয়েছিল।

স্বামীজী ১৬ই ও ১৭ই জানুআরি ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পাসাডেনায় যে সেক্সপীয়র ক্লাবে বক্তৃতা করেন, তা তখন একটি ছোট দালানে (লিঙ্কন এভেনিউ ও ফেয়ার ওকস্ এভেনিউতে স্টিকনী মেমোরিয়েল বিল্ডিং) অবস্থিত ছিল; এখন তার অস্তিত্ব নাই। অবশ্য আগের জায়গা থেকে সামান্য দূরে একটি বাড়ীতে ক্লাবটির কাজ ১৯৬২ খৃষ্টাব্দেও চলছিল।

লস্‌এঞ্জেলেস টাইমসে সেক্সপীয়র ক্লাবে ১৭ই জানুআরি স্বামীজীর বক্তৃতার বিবরণীতে নিম্নলিখিত মনোরম অথচ অদ্ভুত গল্পটি প্রকাশিত হয় :

অদ্য সন্ধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ গেরুয়া পরিচ্ছদে সেক্সপীয়র ক্লাবে অল্পসংখ্যক শ্রোতার নিকটে বক্তৃতা করেন। বেশীর ভাগ শ্রোতাই স্ত্রীলোক। তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এক প্রাচীন উপাখ্যানের বিবরণ দেন, হিন্দুদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যাহা ওতপ্রোত। তিনি শিবের উৎপত্তি এবং উমার পবিত্র ভাবের নিকট তাঁর আত্মসমর্পণের উপাখ্যান বলেন। উমা এখনো সমগ্র ভারতের জননী; তাঁর পূজা, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন এতদূর পর্যন্ত গিয়েছে যে, যে-কোন স্ত্রী-পশুকেও হত্যা করা চলে না (কারণ স্ত্রী-মূর্তি মাত্রই উমার এক-একটি রূপ)। বিবেকানন্দ স্বচ্ছন্দে সংস্কৃত উদ্ধৃত করে সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করে চলেন। অখণ্ড মনোযোগ সহকারে শ্রবণনিরত এক ক্ষুদ্র জনসমষ্টির সম্মুখে তিনি মৃদুস্বরে দুর্বোধ্য ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদের কথা বলে চলেছেন, অ-দীক্ষিতের পক্ষে সেসব কথার গুরুত্ব সামান্যই; ভাষণরত চিত্তাকর্ষক এই তরুণ হিন্দু পণ্ডিতটির শ্যামবর্ণ মুখাবয়ব ধর্মভাব-তন্ময়তার আভামণ্ডিত হয়ে উঠেছিল, একটি গুহ্য নাটকীয় দৃশ্যের কেন্দ্রস্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

স্বামীজীর বক্তৃতায় যে সকল লোক উপস্থিত থাকতেন, তাঁরা দেখে বিস্ময়বিমুগ্ধ হতেন যে স্বামীজী বক্তৃতাকালে কোন চিরকুটের লেখা দেখতেন না; শুধু তাই নয়, 'মুহূর্তের প্রস্তুতি ব্যতীত' তিনি মঞ্চে উঠে দাঁড়াতেন। স্বামীজীর বাণী ও রচনায় অন্তর্ভুক্ত একটি বক্তৃতার বিষয়বস্তু কিরূপে নিরূপিত হয়েছিল তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি এখানে।

১৮ই জানুআরি সেক্সপীয়র ক্লাবে তাঁর আবার বক্তৃতা করার কথা ছিল। এ সময় তিনি শ্রোতাদিগকে বলেন, কি বিষয়ে ভাষণ দেবেন তিনি তা জানেন না; শ্রোতাদেরই বিষয় নির্বাচন করতে বললেন তিনি। প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব নিয়ে একজন শ্রোতা স্বামীজীকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনাদের দর্শনশাস্ত্র কি ফল প্রসব করেছে, আমরা তা জানতে ইচ্ছা করি; আপনাদের দর্শন ও ধর্ম আপনাদের স্ত্রীলোকদের কি আমাদের স্ত্রীলোকদের অপেক্ষা উন্নততর করেছে?'

স্বামীজী একটু পাশ কাটিয়ে ক্ষিপ্র উত্তর দান করলেন, 'দেখ, একেবারে ব্যক্তিগত প্রশ্ন এটি; আমি আমাদের স্ত্রীলোকদের এবং তোমাদের স্ত্রীলোকদেরও পছন্দ করি।'

প্রশ্নকর্তা বিষয়টি অনুসরণ করে বললেন, 'বেশ, আপনি আমাদিগকে আপনাদের স্ত্রীলোক সম্বন্ধে, তাদের আচার ও শিক্ষা সম্বন্ধে এবং তারা পরিবারে কিরূপ স্থান অধিকার করে সে সম্বন্ধে বলবেন কি?' স্বামীজী স্বীকার করলেন, 'হ্যাঁ, আমি সানন্দে তোমাদিগকে সে সব কথা বলব।'

তারপর তৎক্ষণাৎ তিনি ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে আরম্ভ করেন এবং উহার মধ্যে স্ত্রীলোকের স্থান কোথায়, তা বুঝিয়ে দেন। এই ভাষণটি পরে "ভারতীয় নারী" নামে প্রকাশিত হয়।

২৭শে জানুআরি সেক্সপীয়র ক্লাবে 'আমার জীবনোদ্দেশ্য' নামক ভাষণটিও প্রদত্ত হয়। স্বামীজীর বাণী ও রচনায় বর্ণিত হয়েছে যে ঐদিন 'বেদান্তদর্শন' বিষয়ে স্বামীজীর ভাষণ দেবার কথা ছিল; কিন্তু ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট এবং কয়েকজন ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয় তাঁর

কাজ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে কিছু বলতে বলেন। স্বামীজীও তাই বলেন। তিনি বলেন, এবিষয়ে এটিই তাঁর প্রথম বক্তৃতা। শ্রোতাদের নিকট তিনি ভারতবর্ষ, ত্যাগের আদর্শ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা, গুরুর নামানুসারে সংঘ স্থাপন এবং সর্বশেষ তাঁর আমেরিকাতে আগমন ও ভারতীয় জনসাধারণের অর্থ-নৈতিক ও শিক্ষাবিষয়ক মান উন্নয়নের জন্ম তাঁর পরিকল্পনা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

পরদিবস ২৮শে জানুআরি দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়ায় স্বামীজী তাঁর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ভাষণরূপে বিবেচিত বক্তৃতাটি করেন; 'ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট' ব্যতীত এখানে প্রদত্ত তাঁর আর কোন বক্তৃতাই এতখানি জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। রেমণ্ড এভেনিউ ও চেস্টনাট স্ট্রীটে অবস্থিত পাসাডেনার ইউনিভার্সেলিস্ট গীর্জায় 'বিশ্বজনীন ধর্ম উপলব্ধির পন্থা' নামক উক্ত বক্তৃতাটি প্রদত্ত হয়। এই গীর্জা সেক্সপীয়র ক্লাবের পুরাতন অবস্থান থেকে মাত্র একটি বাড়ী পরেই অবস্থিত। ভাষণ প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেন যে, সমগ্র মানবজাতিকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে একই প্রকার চিন্তাধারার মধ্যে আনবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও সর্বদা ব্যর্থই হবে। পৃথিবীর ধর্মগুলি যে বিরুদ্ধধর্মী নয় পরন্তু পরিপূরক, একথা জানিয়ে তিনি বলেন, 'বৈচিত্র্যই জীবনের লক্ষণ, প্রত্যেকটি ধর্মের মধ্যেই মহান সত্যের অংশ বর্তমান'। যে অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে কোনও মানুষ 'একটি পিঞ্জর হাতে নিয়ে ভগবানের সৃষ্ট খাঁচায়-রাখা জীবদের প্রদর্শনীরূপ এই পৃথিবীতে এসে বলে যে ঈশ্বর ও হস্তী এবং প্রত্যেককেই আমার এই খাঁচাটির মধ্যে প্রবেশ করতে হবে, তার জন্য যদি হস্তীটিকে টুকরো টুকরো করে কাটতে হয়, তাতেও ক্ষতি নেই, তবু ঢোকাতেই হবে'—স্বামীজী সেই অজ্ঞতাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেন বলে চলেন, 'একটি আদর্শ ধর্ম প্রত্যেক রকমের মনের খাদ্য জোগাবার মতো প্রশস্ত ও বিশাল হতে বাধ্য: 'দার্শনিককে দর্শনের শক্তি এবং উপাসককে ভক্তের হৃদয় অবশ্যই সে ধর্মকে জোগাতে হবে; সর্বোত্তম প্রতীকোপাসনা যে-সব ভাব জাগাতে পারে, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ধরে যে ধর্মপথে চলেছে, তাকে তা সবই দিতে হবে। কবি যতদূর গ্রহণ করতে সক্ষম, তাকে দিতে হবে ততখানি চিন্তার খোরাক এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ও।' 'আমাদের নীতিবাক্য হবে, বর্জন নয় গ্রহণ'—একথা বলে স্বামীজী তাঁর ধর্মের মত এভাবে প্রকাশ করেন: 'অতীতে যে সকল ধর্ম ছিল সেগুলি আমি সমর্থন করি এবং সেই সব ধর্মের উপাসনাপদ্ধতি যা-ই হোক না কেন, আমি তার প্রত্যেকটি নিয়েই ঈশ্বরারাধনা করি। আমি মুসলমানদের মসজিদে যাব; খৃষ্টানদের গীর্জায় প্রবেশ করে ক্রুশের সম্মুখে নতজানু হব; বৌদ্ধমন্দিরে প্রবেশ করে বুদ্ধ ও তাঁর নিয়মের শরণ নেব। প্রত্যেকের অন্তর যে আলোকে আলোকিত হয় সেই আলোক প্রত্যক্ষ করার জন্য যে হিন্দু ধ্যানমগ্ন, আমি বনে গিয়ে তার পাশে বসে ধ্যানে ডুবে যাব। শুধু এই সব করেই ক্ষান্ত হব না—ভবিষ্যতে যা কিছু আসতে পারে তার জন্যও আমি হৃদয় উন্মুক্ত রাখব।'

সেক্সপীয়র ক্লাবে 'প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্যগুলি' সম্বন্ধে স্বামীজী পর্যায়ক্রমে ভাষণ দেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ৩১ জানুআরি রামায়ণ এবং ১লা ফেব্রুআরি মহাভারত বিষয়ে বক্তৃতা করেন। 'লাইফ অব স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থানুসারে এই পর্যায়ের বক্তৃতায় 'জড়ভরতের গল্প' এবং 'প্রহ্লাদের কাহিনী'ও অন্তর্ভুক্ত

ছিল। পাসাডেনার 'ইভনিং স্টার' বিবরণ দেয় যে সেক্সপীয়র ক্লাবে ৩০শে জানুআরি 'আর্যজাতি' এবং ২রা ফেব্রুআরি 'বৌদ্ধভারত' স্বামীজীর বক্তৃতার তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে ৩রা ফেব্রুআরি স্বামীজী পুনরায় সেক্সপীয়র ক্লাবে 'জগতের মহত্তম আচার্যগণ' নামক তাঁহার বিখ্যাত ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি হিন্দুধর্মের দুটি বিরাট দার্শনিক তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন: ঈশ্বরের অবতারত্ব এবং ব্রহ্মাণ্ডের কল্পান্তিক পুনরাবর্তন তত্ত্ব (একটি নির্দিষ্টকালের ব্যবধানে সৃষ্টির পর প্রলয় এবং প্রলয়ের পর আবার সৃষ্টি।) এই পুনরাবর্তন গতিকে ঢেউএর সঙ্গে তুলনা করে স্বামীজী বলেছিলেন যে, মানবপ্রগতির পথে জাতির এবং ধর্মেরও ইতিহাসে এই আবর্তন বর্তমান। কোন জাতির আধ্যাত্মিক জীবন-তরঙ্গ পতনের পর পুনর্বার উত্থিত হয় এবং 'সে তরঙ্গের শীর্ষদেশে থাকেন একজন জ্যোতির্ময় পুরুষ, ঈশ্বরের বার্তাবহ পর্যায়ক্রমে তিনি নিজে সৃষ্ট, এবং নিজের সৃষ্টিকর্তা; তিনিই শক্তিরূপে ঢেউটিকে তোলেন, জাতিকে উন্নত করেন; আবার যে শক্তি ঢেউটিকে তোলে, সেই শক্তি তাকেও সৃষ্টি করে'...স্বামীজী বুঝিয়ে দেন যে, প্রত্যেক মহান ঈশদূত, সত্যদ্রষ্টা বা ঈশ্বরাবতার এক-একটি বিশেষ কার্যসাধন করে যান, যেগুলির সমষ্টিতে সামঞ্জস্য বিদ্যমান। তাঁরা প্রত্যেকেই একটি মহান ভাব প্রচার করতে এসেছিলেন: কৃষ্ণ—অনাসক্তি ও ঈশ্বরে কর্মফল সমর্পণ; বুদ্ধ—নিঃস্বার্থপরতা; মহম্মদ—সাম্য ও মানব-ভ্রাতৃত্ব; খ্রীষ্ট—প্রভৃতি, 'কারণ স্বর্গরাজ্য করতলগত'। স্বামীজী জোর দিয়ে বলেন যে, আমরা যেন এই সকল মহান ভাব গ্রহণ করি এবং নিজ অনুভূতি দ্বারা সেগুলি পূর্ণ করি। তিনি বলেন, পৃথিবীর আচার্যগণ পূর্ণত্বে পৌছেছিলেন; আমরাও সেই অবস্থালাভের পথে এগিয়ে চলেছি।

যদিও দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়ায় থাকাকালীন স্বামীজীর পত্রাবলীতে বহু বিষয়ে তাঁর চিন্তা ও অনুভূতির নিদর্শন পাওয়া যায়, এই প্রবন্ধে মাত্র অতি সংক্ষেপে তার বর্ণনা দেওয়া যাবে। তিনি অনুভব করতেন যে, তাঁর স্বাস্থ্য যদিও ভেঙ্গে গিয়েছিল, তবু তা পূর্বাপেক্ষা একটু উন্নত হচ্ছিল। জো একজন মহিলাকে খুঁজে বের করেছিলেন, যিনি চুম্বকশক্তি সহায়ে চিকিৎসা করে অসুখ সারিয়ে দেন। জো-কে খুশী করার জন্য স্বামীজী তাঁর চিকিৎসা গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৯৯ খৃঃ ২৭শে ডিসেম্বর স্বামীজী লিখেছেন, "এই আরোগ্য চুম্বক-শক্তিতেই হোক, ক্যালিফর্ণিয়ার 'ওজোন'-এর জন্যই হোক, বা বর্তমান অশুভ কর্মের প্রভাব শেষ হওয়ার জন্যই হোক আমি সেরে উঠছি।" তিনি মনের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তি এবং প্রচুর শান্তি লাভ করেছিলেন। এই সময়ের বহু পত্রে একথাই তিনি উল্লেখ করেছেন। সংঘের কাজের প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অতি সামান্যই বক্তৃতা হতে সমাগম হওয়াতে যদিও স্বামীজী নিরাশ হয়েছিলেন তবুও তিনি ভেবেছিলেন তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা গ্রহণের জন্য ক্যালিফর্ণিয়াই উপযুক্ত ক্ষেত্র। ২২শে ডিসেম্বর লসএঞ্জেলেস থেকে লিখেছিলেন, 'এখানে কয়েকজন লোক খুব উৎসাহী, রাজযোগ পুস্তক এই উপকূলে বাস্তবিক বিশেষ উপকার করেছে।' কয়েকদিন পরে তিনি লেখেন, '...যখন আমি চলে যাব, তুরীয়ানন্দকে ডেকে পাঠাব এবং প্রশান্ত মহাসাগর উপকূলে তাঁকে কাজে লাগাব। এখানে যে একটি বড় কার্যক্ষেত্র বর্তমান, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধিনায়ক হিসাবে নিজের গুরু-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি ও শান্তি লাভের ক্রমবর্ধমান ইচ্ছাকে স্বামীজী তাঁর অন্তরঙ্গদের নিকট প্রকাশ করতেন। সংঘ গঠনাবধি তিনি যে অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন সে পদ তিনি ত্যাগ করতে চাইলেন। তিনি আরও অনুভব করছিলেন যে প্রচারক্ষেত্রে তাঁর কাজ করার প্রয়োজন শেষ হয়েছে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ১৭ই জানুআরি তিনি লিখেছিলেন, 'আমার চাই বিশ্রাম, একমুষ্টি অন্ন, আর কিছু বই—কিছু লেখাপড়ার কাজ করতে চাই আমি।' 'মা এখন স্পষ্ট দেখাচ্ছেন··· আমি মায়ের কোলের শিশু; আমার আবার কী কাজ?···আমি আর বক্তৃতা দিতে পারব না · এর পরের অবস্থা হবে শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় অলৌকিক স্পর্শ, বাণী নয়।'

কিন্তু কাজ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার বাসনা সত্ত্বেও স্বামীজীর ভাব ছিল ঈশ্বরেচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ। ২৪শে জানুআরি তিনি তাঁর শিষ্যা নিবেদিতাকে লিখেছিলেন, 'আমি যে বিশ্রাম ও শান্তি খুঁজছি, আমার বিশ্বাস কখনই তা আসবে না।' 'কিন্তু মা আমার মাধ্যমে পরের মঙ্গল করছেন, অন্ততঃ আমার জন্মভূমির জন্য কিছুটা; আর নিজেকে উৎসর্গীকৃত বলে মনে করলে অদৃষ্টের সঙ্গে মানিয়ে চলা অনেকটা সহজ হয়···মহাপূজা চলছে—একে মহাবলি বলে গ্রহণ না করলে এর অন্য কোন অর্থই কেউ খুঁজে পাবে না। যারা স্বেচ্ছায় মাথা পেতে দেবে, অনেক যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাবে তারা। যারা এর বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করা হয়, আর তাতে কষ্টও বেড়ে যায়। আমি এখন স্বেচ্ছায় মাথা পেতে দিতে কৃতসঙ্কল্প।'

প্রার্থনা

শ্রীক্ষিতীশ দাশগুপ্ত

চূর্ণ কর গর্ব মোর, ব্যর্থ অহংকার
দাও শ্রদ্ধাভক্তি, ঢালো করুণা অপার
তব আগমনী সুর বাজে যেন প্রাণে,
জীবন ভাসিয়া যায় প্রেমের প্লাবনে।

চকিতে দেখি যে তোমা প্রাণের গভীরে
আবার মিলায়ে যাও সুদূর আঁধারে;
আশা-নিরাশার ঢেউ অন্তরে বাহিরে
বারে বারে খুঁজে ফেরে, হে নাথ, তোমারে।

খোঁজা মোর কতদিনে হবে প্রভু শেষ,
কৃপাসিন্ধু, কৃপা কর, অধম-অশেষ।

সন্ন্যাস-জীবনে শাস্ত্রচর্চার প্রয়োজনীয়তা

(পূর্বানুবৃত্তি)

জনৈকা সন্ন্যাসিনী

"শিক্ষাসমুচ্চয়," "বোধিচর্যাবতার" ও "বোধিসত্ত্ব প্রাতিমোক্ষসূত্র" প্রভৃতিতে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের অবশ্য-পালনীয় কতকগুলি সাধারণ নিয়মাবলী আছে, ঐ সকল পুস্তকে বোধিসত্ত্বদিগের কল্যাণমিত্র বা উপদেষ্টা গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে। তাঁহাদিগকে ধর্মপুস্তক অধ্যয়ন, নিয়মিত ধ্যান ও সম্যক্ মনঃসংযোগ করিবার চারিটি বিশেষ উপায় অবলম্বন করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

গুপ্তযুগে প্রণীত সাহিত্য হইতে দেখা যায়, সম্ভ্রান্ত পরিবারের দুহিতাগণ আশ্রমে বাস করিয়া বিদ্যাচর্চা করিতেছে; প্রাচীন ইতিহাস, গল্প-কাহিনী এমন কি কবিতা রচনা করিতেছে। "অমরকোষ" গ্রন্থে উপাধ্যায়া ও উপাধ্যায়ী এবং বৈদিক মন্ত্রের উপদেষ্টা আচার্যার উল্লেখও পাওয়া যায়।

নালন্দা বিহারেও বৌদ্ধ শ্রমণগণ বিদ্যাচর্চা ও তর্কবিতর্কে তাঁহাদের সময় ব্যয় করিতেন। চৈনিক পর্যটক ইৎসিং লিখিতেছেন, দুই প্রকার বিহার বা মঠ থাকিত। যাহারা ভিক্ষু বা শ্রমণ হইত তাহাদের বৌদ্ধ শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতে হইত। আচার্য তাহাদের ত্রিপিটক হইতে অংশবিশেষ পাঠ দিতেন এবং তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেন। ভিক্ষুব্রতাবলম্বী ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র এবং কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিলে সংশোধন করিতেন। প্রত্যহ প্রাতঃকালে আচার্যকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইয়া ধর্মশাস্ত্র হইতে পাঠগ্রহণ করিতে হইত। নৈতিক চরিত্রের উপরে ছাপ না ফেলা পর্যন্ত শিক্ষাদান নিয়মিত চলিত।

"In the Buddhist system, education was imparted in the Vihara or monastery giving scope to a collective life and spirit of brotherhood and democracy among the many resident monks, who came under a common discipline and instruction. It has however to be noted that even the collective monastic life in a Vihara, gave scope for an individual life of study and meditation, provided for in the cell assigned to a monk, also in the particular group to which he was assigned under the personal direction of his tutor or upadhyaya" (The History and Culture of the Indian People.)

বৌদ্ধ বিহারে মঠবাসী শ্রমণগণ যাহাতে সংঘবদ্ধভাবে জীবন কাটাইতে পারেন তজ্জন্য গণতন্ত্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া শৃঙ্খলাবোধ ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরিত করিবার শিক্ষা দেওয়া হইত। উপাধ্যায় বা আচার্যের নির্দেশে ব্যক্তিগতভাবে শ্রমণেরা নির্জনে ধ্যানধারণা ও বিদ্যাচর্চা করিয়া জীবন কাটাইবার সুযোগও লাভ করিতেন।

ইৎসিং লিখিয়াছেন—"Monks were graded for study in the monastery. Their instruction comprised 'giving of recitation, holding examinations, making exhortation and explaining dharma.' There was also specialisation

in different branches of Buddhist canon. The different classes of monks were lodged in separate hostels lest their mixing up should cause disturbance to their different studies." বৌদ্ধমঠে বিদ্যা-চর্চার জন্য সন্ন্যাসিগণের মধ্যে ক্রমবিভাগ ছিল। তাঁহাদের কর্ম ছিল ধর্মসূত্রগুলি আবৃত্তি করা, পরীক্ষা গ্রহণ করা, ধর্মোপদেশ দেওয়া এবং ধর্ম-ব্যাখ্যা করা। বৌদ্ধ অনুশাসনের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তিলাভ করিবার ব্যবস্থাও ছিল। বিভিন্ন শাখায় সন্ন্যাসিগণ পৃথক পৃথকভাবে বাস করিতেন, নতুবা নানাপ্রকার অনুশাসন-পদ্ধতির মধ্যে বিক্ষোভসৃষ্টির সম্ভাবনা হইত।

উড়িষ্যার খণ্ডগিরি, উদয়গিরি ও ললিত-গিরির শিলালিপি হইতে জানা যায়, জৈন সন্ন্যাসিগণ রীতিমত বিদ্যাচর্চা করিতেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এদেশে আবহমান কাল ধরিয়া সন্ন্যাসব্রতাবলম্বিগণ বিদ্যার চর্চা করিয়া আসিতেছেন।

'বিদ্যা' অর্থ, যাহা দ্বারা ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত যাবতীয় পদার্থের সত্যবিজ্ঞান লাভ হইয়া যথাযোগ্য উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়—তাহাই বিদ্যা। স্বামীজীর কথা—Education is the manifestation of perfection already in man. অর্থাৎ জ্ঞান মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ সাধন করে। সেজন্য তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ও জাতিগত জীবনে বিদ্যার অকুণ্ঠ গুণগান করিয়াছেন। বিদ্যা ভিন্ন কোন মানুষই বড় হইতে পারে না, কারণ হৃদয়ের প্রসার না হইলে তাহাকে শিক্ষিত বলা বৃথা। 'কথামৃতে' শ্রদ্ধেয় মাষ্টারমহাশয়কে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'তোমার স্ত্রী বিদ্যাশক্তি, না অবিদ্যাশক্তি ?' শ্রদ্ধেয় মাষ্টারমহাশয় জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর ভেদ জানেন কেবল পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা। সেজন্য তাহাই বলাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। তাঁহার মতে যে বিদ্যা হৃদয়মনকে শুদ্ধ, পবিত্র, উন্নত করে, প্রসারিত করে, ঈশ্বর লাভ করাইয়া দেয় তাহাই বিদ্যা—বাকি সকলই অবিদ্যা। মহান্ শিষ্যও গুরুর মতই পোষণ করেন। জ্ঞানহীন ব্যক্তির পক্ষে সকল অন্যায় কর্ম করা সম্ভব বলিয়া জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা, জ্ঞানের চর্চা ইত্যাদির প্রশংসা শাস্ত্রাদিতে পুনঃ পুনঃ করা হইয়াছে। মহামুনি পতঞ্জলি যোগসূত্রে সাধককে স্বাধ্যায়ের নির্দেশ দিতেছেন। "তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণি-ধানানি।" সাধনা ব্যতীত কিছুই লাভ করিবার উপায় নাই। ঈশ্বরে ভক্তিলাভ করিবার সাধনা করিতে হইলে তপস্যা, স্বাধ্যায়—অর্থাৎ মোক্ষশাস্ত্রপাঠ, বিচার ও আলোচনার দ্বারা ঈশ্বরে ভক্তিলাভ করা যায়। গীতাতে শ্রীভগবান বলিতেছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" যে যেভাবে তাঁহাকে ভজনা করে তিনি সেইভাবেই তাহাকে উদ্দীপিত করেন। শাস্ত্রালোচনা, ভগবদ্‌বিষয়ে মন ব্যাপৃত রাখা, পরস্পর তাঁর বিষয়ে আলোচনা—এই সব উপায়। গীতায় শ্রীভগবান বলিতেছেন—

"মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥

ভগবান্ বা পরমার্থ বিষয় ব্যতীত আর কিছুতেই যাঁহাদের চিত্তবৃত্তি ধাবিত হয় না, যাঁহাদের চক্ষুকর্ণাদি ভগবৎপ্রসঙ্গ ব্যতীত আর কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করে না, অর্থাৎ যাঁহারা ভগবান্ ব্যতীত আর কিছুই চান না, এইরূপ ব্যক্তিরা পরস্পর এবং গুরুশিষ্যে ভগবদ্বার্তালাপ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। স্বাধ্যায় অর্থাৎ মোক্ষশাস্ত্রপাঠ, বিচার ও আলোচনা ইত্যাদির দ্বারা ঈশ্বরে ভক্তিলাভ করা যায়, ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন

এই তিনটির মাধ্যমে আত্মজ্ঞানলাভই সন্ন্যাসীর লক্ষ্য। ব্রহ্মবিদ্যা লাভ ও তাহার সহায়করূপে ব্রহ্মবিদ্যা-চর্চার জন্যই চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাস প্রাচীন হিন্দুরা পরিকল্পনা করেন। সন্ন্যাসের মূল কথাই হইল স্থূল সূক্ষ্ম সর্ববিধ দেহ হইতে 'আমি' বোধ সরাইয়া লইয়া ব্রহ্মস্বরূপের সঙ্গে উহাকে মিশাইয়া দেওয়া। প্রাচীন কালে সন্ন্যাসাশ্রম ছিল Self-knowledge Research Institute. বিশেষ করিয়া সংঘের মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে, স্বামীজী সেকথা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বিদ্যার অভাবে ধর্মসম্প্রদায় নীচ দশা প্রাপ্ত হয়। তাই জপ, ধ্যানাদির সঙ্গে তিনি স্বাধ্যায় ও সদসদ্‌বিচারের উপরও বিশেষভাবে জোর দিয়াছেন। শাস্ত্রচর্চা যে সন্ন্যাস-জীবনে সাধনের একটি বিশেষ অঙ্গ, সে বিষয়ে স্বামী সারদানন্দজী একটি পত্রে লিখিয়াছেন, "আত্মোন্নতি সাধনের একটি পথ কর্ম, একথা নিশ্চয়; কিন্তু কর্ম দ্বারা চিত্তের যে বিক্ষেপ ও চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় তাহা নিবারণের একমাত্র উপায় ঈশ্বরের বা উচ্চবিষয়ের চিন্তা ও চর্চা।...বালক ব্রহ্মচারিগণ যাহাতে গীতা, স্বামীজীর গ্রন্থাবলী প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রসকল সংস্কৃত ও ইংরাজীতে পাঠ ও অর্থবোধ করিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করা কর্তব্য।"

বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া বিদ্যাচর্চার অভাবে হৃদয়ের প্রসারতা ঘটে না। শাস্ত্রচর্চা, উচ্চ বিষয়ের নিয়মিত আলোচনা সংঘজীবনে বিশেষ প্রয়োজন। স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ন্যাসী সন্তানগণের বিভিন্ন জীবনী প্রভৃতি গ্রন্থে আমরা দেখি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে নিয়মিত গীতা, বেদবেদান্ত, উপনিষদ্, বাইবেল, ভাগবত, মহাপুরুষদের জীবনী ও বাণী পাঠ ও আলোচনা হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

শোধন

শ্রীশিবশম্ভু সরকার

ওরে ভাই! কথা তাই—
বাঁধন ছিঁড়তে হবে—
না, না, বাঁধনেরে শুধু
শোধন করিতে হবে!

বাঁধন যা আছে, বাঁধাই থাকুক;
মুদিবে নয়ন? চেয়ে সে দেখুক—
শুধু বল তারে, যেদিকে তাকাও
তাঁরেই দেখিতে হবে—
বাঁধনেরে শুধু শোধন করিতে হবে।

কারাগার আর কারাগার কই
সীমানার মাঝে সীমাহীন ওই
পাঁকের ভুবন হোল নন্দন
পুলকের অর্ণবে!
ওরে ভাই! বাঁধনেরে শুধু
শোধন করিতে হবে!

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে সেবা, সহিষ্ণুতা ও সন্তোষ

শ্রীপুষ্পকুমার পাল

'সেবা', 'সহিষ্ণুতা' ও 'সন্তোষ' মানবচরিত্রের মনোরম বিকাশ। শ্রীশ্রীমায়ের চরিত্রে এই গুণত্রয়ের অনন্য প্রকাশ দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়।

অপরের সুখ, শান্তি বা আনন্দ বিধানের জন্য নিজেকে নিযুক্ত করার নাম সাধারণভাবে সেবা। 'সেবা' শব্দটির মধ্যে নম্রতা ও আত্মদানের প্রকাশ-মাধুর্য আছে। শ্রীশ্রীমার জীবন, সেবার জীবন। তাঁর সমস্ত জীবনটি কল্যাণধর্মী। শ্রীশ্রীমার নিঃস্বার্থ কল্যাণকামনা সেবার মাধ্যমে অপরূপ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

শৈশবেই সেই অপরূপা মাতার সেবাপরায়ণা বালিকা-মূর্তি সকলকে মুগ্ধ করে। পরিশ্রমী 'মুনিষদের' বিশ্রাম অবসরে মা মুড়ি, মিষ্টান্ন ও স্নিগ্ধ জল বিতরণে ব্যস্ত থাকতেন। গৃহপালিত গবাদির সেবার জন্য পুকুরে একগলা জলে দাঁড়িয়ে দলঘাস কাটার ছবিটি এখনও আমাদের মনকে পুলকিত করে। গ্রামে দুর্ভিক্ষ হয়েছে। চতুর্দিকে অন্নাভাব। একমুঠো ভাতের জন্য গ্রামের অতিদরিদ্ররা বিপর্যয়ের সম্মুখীন। তারা ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির। শ্রীশ্রীমার পিতা বিত্তবান ছিলেন না, কিন্তু সে অবস্থায় তাঁর মহৎ হৃদয়ের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তিনি তাঁর সামান্য সঞ্চয় দরিদ্র-সেবায় নিয়োগ করলেন। হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি রান্না করে এই সব নিরন্ন গ্রামবাসীদের পরিবেশন করা হল। অনশনে বা অর্ধাশনে পীড়িত সেই জনগণের কথা মা কথাপ্রসঙ্গে বলেছেন। গরম খিচুড়ি খাবার সময় ক্ষুধার তাড়নায় অপেক্ষা করার মত ধৈর্য অনেকের ছিল না। বস্তুর পার্থক্য নির্ণয়ে অনেকে অক্ষম হয়েছে। গাভীর খাদ্যভাণ্ডে রক্ষিত সিক্ত ভুষি ক্ষুধার জ্বালায় খাদ্য বলে খেতে করেছে।

অন্নপূর্ণারূপে সেই ক্ষুধার্ত জনগণের পাশে বসে পাখা-হাতে উত্তপ্ত অন্ন ঠাণ্ডা করে তাদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন।

গৃহকর্মে সেই বয়সেই শ্রীশ্রীমার সেবার নিদর্শন সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়েছে। গর্ভধারিণীর অসুস্থতা নিবন্ধন সেই বয়সেই মা সুচারুরূপে গৃহকর্ম সম্পন্ন করেছেন। অল্প বয়স, বালিকার ভাতের হাঁড়ি নামাবার শক্তি ছিল না। মা বলেছেন: ভাত তৈরী হলে বাবাকে বলতুম, বাবা নামিয়ে দিতেন।

দাক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমার সেবার জীবন আরো মনোরম। ঠাকুরের ও ভক্ত নরনারীদের সেবায় তিনি তখন নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেছেন। সেই সব-ভোলা মহেশ্বরকে সুস্থ রাখার জন্য মায়ের ক্লান্তিহীন সেবা স্বয়ং ঠাকুর ও অন্যান্যকে মুগ্ধ করেছে। সঙ্কীর্ণ নহবত-ঘরের মধ্যে থেকে সস্নেহে শ্রীশ্রীমা কত ভক্ত সন্তানের কত ভাবে সেবা করেছেন সে কথা স্মরণে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। সদা হাস্যমুখী, শান্ত, সরল সেই গ্রাম্য বালিকা-বধূ! সেবায়, নিরলস পরিশ্রমে ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই এবং প্রতিদানের কোন আকাঙ্ক্ষাও নেই। যে দেখেছে, সেই মুগ্ধ হয়েছে; সেই স্বল্প পরিসরে কর্মরতা মাতার সান্নিধ্য পেয়ে এক অনির্বচনীয় আনন্দের অধিকারী হয়েছে।

আরো পরে, শ্রীশ্রীঠাকুরের অসুখের সময় শ্যামপুকুরের বাটীতে এবং কাশীপুর উদ্যানে

শ্রীশ্রীমার সেবারতা মূর্তির কথা চিন্তা করে কার মনে না সহানুভূতির উদ্রেক হয়? লজ্জাশীলা মাতা নিজের সামান্যতম শারীরিক সুখ-সুবিধার কথা বিস্মৃত হয়ে ঠাকুরের সেবায় একান্তভাবে নিমগ্না। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সর্বস্ব। হৃদয়ে তিনি আনন্দের পূর্ণঘট। তাঁর আরোগ্যলাভের সব সম্ভাবনা প্রায় বিলুপ্ত। চোখের উপর সর্বদা তাঁর যন্ত্রণাকাতর মূর্তি। সেই অবস্থায় তাঁকে প্রফুল্ল রাখতে ও তাঁর শারীরিক কষ্ট লাঘবের জন্য কত আন্তরিক প্রচেষ্টা! এ কথা সত্য, ঠাকুর স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার, কিন্তু নরলীলায় সাধারণ মানুষের মত তিনি রোগ ভোগ করেছেন। রোগের কষ্ট গ্রহণ করতে হয়েছে, শ্রীশ্রীমাও জগজ্জননী জগদ্ধাত্রী; কিন্তু মানবীরূপে তাঁকে সেই পরিবেশে মানসিক যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু মা অনন্যা। এই পরিবেশেও তিনি অবিচলিত, মানসিক দৃঢ়তায় অতুলনীয়। বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোন ক্ষোভ, ক্ষতি বা চিন্তা মনে হয় তাঁকে বিচলিত করেনি। নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে এই অবস্থাতেও তাঁর দৃষ্টি সজাগ। কোমল হৃদয়ের মধ্যে কঠিন দৃঢ়তা। সেবারতা জননীর অপরূপ চিত্র। সে চিত্র দর্শন অথবা স্মরণ মনে সবসময় এক শ্রদ্ধার ভাব আনয়ন করে।

পরে মা জগজ্জননী 'মা'। অসংখ্য অগণিত জনমানবের তিনি 'মা'। ভক্ত সন্তান ও কন্যাদের সেবারতা অনন্যা জননী। সমস্যা-সঙ্কুল গৃহস্থ-জীবনে সামান্যতম সুখবিধানের জন্য কত প্রয়াস! অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনে আধ্যাত্মিক আনন্দ লাভে তাদের সাহায্যের জন্য কত আন্তরিক প্রচেষ্টা! মায়ের পুত্র-কন্যারা দলে দলে মায়ের বাড়ী 'উদ্বোধনে' অথবা মায়ের বাড়ী জয়রামবাটীতে—তাঁর সান্নিধ্যে বসবাস করার জন্য সমবেত হয়েছেন যে যেরূপ আধার, যার যা প্রয়োজন—মা সেবার মাধ্যমে কি অপরূপ ভাবেই না সে প্রয়োজন পরিপূর্ণ করেছেন। সন্তানের যৎসামান্য পরিতৃপ্তির জন্য মা বাড়ী বাড়ী দুধের পাত্র নিয়ে অথবা শাক-সবজির জন্য ঝুড়ি নিয়ে তাই সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়েছেন। জয়রামবাটীতে হাট-বাজার নেই। বিষ্ণুপুরের বড়বাজার ও কতোলপুরের অপেক্ষাকৃত ছোট বাজারের প্রতি এই সব গ্রাম নির্ভরশীল।

সেই অপরূপা জননীর সন্তানদের তুষ্টি-বিধানের জন্য কত একাগ্রতা। তাদের পরিতৃপ্তির জন্য পরিশ্রমের অথবা সামান্যতম সেবিকা হয়ে নিজেকে নিয়োজিত করার মধ্যে মান-অপমানের কোন প্রশ্ন নেই। তিনি মা, তাঁর ভক্ত পুত্র-কন্যারা তাঁর শরীরের রক্তকণিকা-স্বরূপ। তাদের সুখের জন্য, তাদের তৃপ্তিসাধনের জন্য যে-কোন শারীরিক কষ্ট তাঁর কাছে তুচ্ছ। এবিষয়ে একটি ঘটনার কথা শোনা যায়। একদা মায়ের বাড়ীতে একাধিক ভক্ত সন্তানের সমাগম হয়েছে। এক বর্ষণসিক্ত প্রায়ান্ধকার সকাল। গুঁড় গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। দেখা গেল, শ্রীশ্রীমা গ্রামে সংগৃহীত শাকসবজি একটি ঝুড়িতে মাথায় করে নিয়ে খিড়কি দরজা দিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করছেন। সন্তানের পরিতৃপ্তির জন্য সেবারতা জননীর অপরূপ চিত্র!

অথবা ভক্তপ্রবর গিরিশ ঘোষের তৃপ্তির জন্য জয়রামবাটীতে থাকার সময় মাকে নিজ হাতে তাঁর বিছানার চাদর ও বালিশের ওয়াড় পরিষ্কার করতে দেখা গেছে। সে চিত্রও কম মনোরম নয়।

মা জগজ্জননী, তাই সম্পদ বৈভব অথবা রিক্ততা দরিদ্রতা তাঁর চরিত্রে একই রূপ মাধুর্যে

পরিদৃশ্যমান। লোক দেখান নয়, প্রচার নয়, স্বার্থ-কলঙ্কিত নয়, নীরব, স্নেহাশিস-স্নিগ্ধ সেবা। মায়ের সমস্ত জীবন পরের জন্য। কেবল পরকল্যাণের জন্য। যতদিন দেহে প্রাণ ততদিন লোককল্যাণব্রত। সন্তানের কল্যাণে ও তৃপ্তিতে আত্মতৃপ্তি। সেবারতা জননীর সেই শান্ত সরল রূপ মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করে। স্বার্থশূন্য হইয়া সকলের সেবায় সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত করাই শ্রীশ্রীমার কৃপালাভের অন্যতম পথ।

সেবার মত সহিষ্ণুতাও মানবচরিত্রের এক অপরূপ সম্পদ। শ্রীশ্রীমার জীবনে সহিষ্ণুতার রূপ লোকশিক্ষার অনন্য দৃষ্টান্ত। কত ভক্তের কত অস্বাভাবিক ও বিরক্তিকর আতিশয্য অন্যের কাছে অসহনীয় হয়েছে। মায়ের অপার সহিষ্ণুতা সব সময় সেই পরিবেশকে স্নেহসিক্ত ও মধুময় করেছে।

শেষ জীবনে ক্রমান্বয় ব্যাধির প্রকোপে মায়ের শরীর জীর্ণ। উত্থানশক্তি প্রায় রহিত। সে অবস্থায় ভক্ত সন্তানেরা কেহ কেহ মায়ের সন্ন্যাসী সন্তানদের কঠিন ব্যবস্থা সত্ত্বেও গোপনে মায়ের সান্নিধ্যে এসেছেন এবং তাঁদের কাতর প্রার্থনায় মা তাঁদের কৃপা করেছেন। মায়ের ধৈর্য অসীম এবং সহিষ্ণুতা অপার।

এই প্রসঙ্গে শ্রীধাম বৃন্দাবনে থাকার সময় শ্রীশ্রীরাধারমণের নিকট মায়ের সেই প্রার্থনাটি স্মরণ করতে ইচ্ছা হয়। শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন: ঠাকুর, এই কর, যেন আমি কারো দোষ দেখতে না পাই। মায়ের শেষ উপদেশও তাই। "যদি শান্তি চাও, মা, কারো দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো। কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার।" দোষ মানুষের থাকবেই। অন্যের দোষের কথা বলার আগে নিজেকে দোষমুক্ত করতে হবে। কিন্তু এই চরিত্র অনুশীলনে সহিষ্ণুতার অভ্যাস অবশ্য-কর্তব্য। দেখা যায়, শ্রীশ্রীমার চরিত্রে ধরিত্রীর সহিষ্ণুতা। সে চরিত্রের শিক্ষণীয় মাধুর্য, ভালবাসা। সুকৃতিবশে যদি কারো চরিত্রে কিছুমাত্র সদ্‌গুণ সঞ্চিত থাকে, তবে তাকে অন্যের চরিত্রের অভাব দূরীকরণে প্রবৃত্ত হতে হবে। এ অনুশীলনে মানুষ হবে অজাতশত্রু ও প্রকৃত অর্থে সুখী।

মনের বিক্ষিপ্ত অবস্থা দূর করে স্থৈর্য আনয়নে সাহায্যের সহায়ক 'সন্তোষ'। শ্রীশ্রীমা বলতেন, "সন্তোষের চেয়ে বড় জিনিস নেই।" উন্নতির আকাঙ্ক্ষা দোষের নয়, কিন্তু সব অবস্থায় নিজেকে পরিতৃপ্ত বোধ করা কামনা-নিয়ন্ত্রণের প্রকৃষ্ট পথ। কর্মে মানুষের জীবন-প্রণালী নিয়ন্ত্রিত; উদ্যোগ ও অনুশীলনের পরেও সাফল্য অনিশ্চিত। বঞ্চনা মনের সন্তোষকে উৎপীড়িত করতে সক্ষম হয় না। হিংসা-দ্বেষশূন্য চরিত্র অমলিন, প্রশান্ত।

কামারপুকুরে এক অতিবৃদ্ধা বাগদী রমণীর কথা মনে পড়ে। শ্রীশ্রীমার শরীর একবার অত্যন্ত অসুস্থ হয়। তখন মা প্রায় একলাই সেখানে রয়েছেন। বাগদী রমণী তখন বিবাহিতা যুবতী। সে মায়ের অক্লান্ত সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছে। স্নেহময়ী মা তার কষ্ট হবে মনে করে তাকে রাত্রে থাকতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু মেয়েটির বিবেচনায় এ অবস্থায় মাকে একলা রেখে যাওয়া সমীচীন নয়। মার অনুযোগ সত্ত্বেও মেয়েটি তার কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়নি।

আরোগ্যলাভের পর জগজ্জননী সেই বাগদী মেয়েটিকে বলছেন: মা, তুমি আমার কত সেবা করলে; আমার কি আছে যে তোমায় দেব? তবে ঠাকুরের কাছে জানাচ্ছি, তোমার

যেন মোটা ভাত-কাপড়ের কোনদিন অভাব না হয়।

মায়ের আশীর্বাদে সে আনন্দে আছে। এই বৃদ্ধ বয়সে সাধু ও ভক্তের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করেই তার তৃপ্তি। অভাব থাকলেও তার জন্য কোন অভিযোগ নেই। মায়ের কথা মনে রেখে সন্তোষ আশ্রয় করে সর্ব অবস্থায় সে সুখী থেকেছে।

শ্রীশ্রীমার ভাবধারা অপূর্ব। মায়ের সেই শান্ত সহজ সেবা, অপার সহিষ্ণুতা ও সর্ব অবস্থায় প্রসন্নতার অনুধ্যানে চিত্ত স্থির হয়ে আসে। এই গুণত্রয়ের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমার সান্নিধ্য একান্তভাবে অনুভব করা সম্ভব। তার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি আহরণে সন্তানদের একমাত্র অবলম্বন শ্রীশ্রীমার একান্ত কৃপা, স্নেহ ও দয়া।

দীক্ষা

শ্রীমতিলাল দাশ

প্রভু, তুমি পরিয়ে দিলে দীপ্তিময় যে রাজটীকা
জানি হে জানি জীবনে সদা অমল রবে তাহার শিখা।
বুঝেছি প্রভু, আপন জানি
আমারে তুমি নিয়েছ টানি,
গরবে তাই ফুলিছে বুক, দুলিছে হিয়া উতল দোলে—
এনেছ তব দেউল মাঝে, টেনেছ মোরে আপন কোলে।
তোমার পূজা করিবে তুমি, আমারে প্রভু মহৎ করি
আশাতে সেই চলিব নিতি পতাকা তব শিরেতে ধরি।
জানি হে প্রভু, জানি হে আমি
আমার লাগি জগৎ-স্বামী,
রয়েছ চেয়ে করুণাময়, রয়েছ চেয়ে দয়াল তুমি,
তোমারি স্নেহশিশিরপাতে সরস হবে হৃদয়ভূমি!
প্রভু, তুমি আপন হাতে দিয়েছ ভালে যে রাজটীকা
মলিন নাহি হইবে কভু সে কালজয়ী অমিয় লিখা।
রাখিব জেলে দিবস রাতি
প্রদীপ তব অমলভাতি
রাখিব জেলে রাখিব স্বামী, আমার দেহ-ভবন মাঝে
তাহারি আলো ছড়াবো শুধু সকল ঠাঁই, সকল কাজে!

'শ্রীম'-সমীপে

ভক্ত রমেশচন্দ্র সরকার

৫ই ফাল্গুন, সোমবার, ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯১৯

শ্রীম-র স্কুল-বাড়ীতে গিয়া দেখিলাম, দুয়ার বন্ধ। বেলা তিনটার পর দুয়ার খুলিলেন। পরে দারোয়ান স্কুলের খাতাপত্র লইয়া আসিল। এমন সময় ঝড়বৃষ্টি আসিল। জানালা দরজা সব বন্ধ করা হইলে ঘর অন্ধকার হইল।

শ্রীম—আঁধারের মত কি জিনিস আছে? এই বলিয়া গান ধরিলেন—

"নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে, হয়ে গিরি-গুহাবাসী॥
অনন্ত আঁধার কোলে মহানির্বাণ-হিল্লোলে।
চিরশান্তি-পরিমল অবিরল যায় ভাসি॥"

ইত্যাদি

এখন বেলা প্রায় পৌনে চারটা।

শ্রীম-"এইবার তোমরা একটু ধ্যান কর আঁধারে বসে, আমি ভিতরের দুয়ারটাও বন্ধ করে দিই, তাহলে ঘোর অন্ধকার হবে।" এই বলিয়া তিনি পাশের ঘরে গেলেন। আমরা একটু ধ্যান করিলাম।

এইবার বৃষ্টি প্রায় বন্ধ হইয়াছে। ৪টা বাজিয়া গিয়াছে। রাস্তায় জল হইয়া নীচের উঠানে জল ভরিয়া গিয়াছে।

শ্রীম (ব্রহ্মচারীকে) যাও, শিক্ষকদের বলে এসো—ছোট ছোট ছেলেদের এখন বাড়ী যেতে সব ভিজে যাবে, এখন যেন স্কুলের ছুটি দেওয়া না হয়। অল্প অল্প বৃষ্টি এখনও পড়ছে। তোমরা তো পরোপকার কর। ঐ ড্রেনটা বন্ধ হয়ে জল জমা হয়েছে। ওটা একটু খুলে দাও, দৌড়ে নীচে চলে যাও।

আমরা নীচে গেলাম। শ্রীম উপর হইতে জানালা দিয়া সব দেখিতেছেন। আমরা সিঁড়ির ধারে ছেলেদের সহিত কথা কহিতেছিলাম দেখিয়া বলিতেছেন, "ওদের সঙ্গে ওরকম কথা বলা ভাল হয়নি।" ভাবিলাম কি discipline (কড়া নিয়ম-কানুন)! এমন সময় আর একটি ভক্ত আসিলেন। তাঁকেও ঘরের আঁধারের মধ্যে ধ্যান করিতে বলিলেন।

খানিক পরে শ্রীম বাহিরে আসিয়া চেয়ারে উপবিষ্ট হইলেন।

শ্রীম—যোগীরা বলেছেন, মাঝে মাঝে প্রলয় হয়। যোগীরা যখন বলেছেন, তখন কি মিথ্যা হয়? যখন ঝড়বৃষ্টি দেখি তখন প্রলয়ের কথা মনে পড়ে। ঐ উদ্দীপন হয়। দেখ সব যেন মহাসমুদ্রে এক একটি ভুড়ভুড়ি—মানুষ, গরু, গাছপালা, নদী, পাহাড় এই পৃথিবী। তাঁর থেকে হচ্ছে, তাঁতে মিশে যাচ্ছে। দেহ হলেই তার মৃত্যু আছে। সসীম বস্তু মাত্রই মরণের অধীন। (ভক্তটিকে) তুমি বি এ. তে mathematics (অঙ্ক) নাও নি? Anything divided by infinity is equal to zero—এই বলিয়া আবার সেই গান ধরিলেন—"নিবিড় আঁধারে ·····; সমাধি মন্দিরে ওমা কে তুমি গো একা বসি।" তিনি সত্যিই একা বসে আছেন। মা ছাড়া আর কিছু নেই। যখন খুব ঝড়বৃষ্টি, বজ্রপাত, যুদ্ধ, মহামারি হয়, যখন সব শ্মশান হয়ে যায় তখনই ভগবানকে ঠিকঠিক ডাকতে ইচ্ছা হয়। তন্ত্রের ধ্যান এইরূপ—ব্রহ্মময়ী মা ছাড়া আর কিছুই নেই। ঠাকুরকে দেখতুম ঝড়বৃষ্টির সময় খুব আনন্দ। ঐ সময় ঠাকুর জপ করতেন।

একদিন ঐ গান শুনে পরে রাত্রি ৯টার সময় ঠাকুর আমাকে বলছেন, "এখনও মন ঐ (গানের ভাবের) দিকে টেনে রেখেছে।" মা-ই সত্য, আর সব দুদিনের। তিনিই আপনার লোক। তাই তাঁকে দেখবার জন্য প্রার্থনা করতে হয়, "মা দেখা দাও" বলে।

ভক্ত—আপনার লোক বলে আমাদের ধারণা হয় না।

শ্রীম—তা হবে কি করে? না দেখলে কি করে হবে? কিন্তু মা-ই সত্য। মা-ই ব্রহ্ম। তাঁকে দর্শন করে আপনার করাই জীবনের goal (উদ্দেশ্য)। ভক্তি, জ্ঞানবিচার, নিষ্কাম কর্ম, এসব উপায় মাত্র। একদিন গভীর অমাবস্যার রাত্রি, কোনদিকে সাড়া শব্দ নাই। নির্জন। ঠাকুর রাত্রি প্রায় দশটার সময় গান ধরলেন—"সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনোমোহিনী" তারপর আবার গাইছেন, "কখন কি রঙ্গে থাক মা, শ্যামা সুধাতরঙ্গিণি"। পরে বলছেন, সব স্নেহ তাঁর দিকে দিতে পারলে হয়। উপায় নির্জনবাস, সাধুসঙ্গ।

৬ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৯

আজ সাড়ে চারটার সময় শ্রীম-র ওখানে গিয়াছি। "কথামৃত" সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

শ্রীম—এবার ঠাকুর কি করিয়ে দিলেন। আর কোন অবতারে এরূপ হয়নি। কথামৃতটি ঠিক যেন ফটোগ্রাফের ছবি। স্থান, সময়, তিথি এমনকি জোয়ার-ভাটা পর্যন্ত সব এতে বর্ণিত আছে। যদি কেউ একবার দক্ষিণেশ্বর দেখে এসে এ বই পড়ে তবে ধ্যান হয়ে যায়। ঠিক যেন কেউ এসে report দিচ্ছে।

এমন সময় কতকগুলি কলেজের ছেলে আসিলেন। ছেলেরা ভক্ত। বেঞ্চ ঝাড়া হইল। সব বেঞ্চে বসিলেন। তখন রাত্রি সাড়ে সাতটা হইয়াছে। শ্রীম সকলের মুখের নিকট হ্যারিকেন লইয়া দেখিতেছেন। মাষ্টার কিনা! তিনি সাধারণ মাষ্টার নন। "ছেলেধরা মাষ্টার"; শ্রীশ্রীঠাকুর এই নাম তাঁহাকে দিয়াছিলেন। তাই মুখের মধ্য দিয়া সকলের অন্তরটা দেখিয়া লন ও তদনুযায়ী শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি যাহাতে ভক্তি হয় তাহার চেষ্টা করেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

শ্রীম—আপনারা দক্ষিণেশ্বরে ও বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে গিয়েছিলেন?

ভক্তরা—হ্যাঁ, আপনাদের কৃপায় সব দর্শন করে এসেছি।

শ্রীম—তবে তো আপনারা আপনার লোক।

একজন বলিলেন, "শ্রীশ্রীরাজামহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) আমাকে দু'টার সময় যেতে বলেছিলেন। তা শরীর ভাল নেই বলে যাইনি।"

শ্রীম—সন্ন্যাসীরা ওইরূপ করে মানুষ চিনে নেন—দেখেন আপন লোক কিনা। অনেকে ভাবেন, একবার দর্শন হল তো সব হয়ে গেল। রাখাল মহারাজ ঐ রকম করে মানুষ চিনে নেন। হয়তো বললেন, "আমার পেটটা কেমন করছে, আজ নয় অমুক সময় এসো।" মা যদি দূরে এক বাড়ীতে থাকেন তবে কি একদিন দেখা হল না বলে মাকে ছেড়ে দেবে? আমাদের সাধুসঙ্গ বড় দরকার। আমার ইচ্ছে ছিল শ্রীশ্রীঠাকুর যে-সব জায়গায় গিয়েছিলেন সে-সব জায়গায় যাই, সাধুসঙ্গ করি, ইচ্ছা ছিল দক্ষিণেশ্বরে যাই; কিন্তু বুড়ো হয়ে গেছি। হাঁটতে পারি না। কি করি! তবে সাধুদের ধ্যান করি। সাধুদের ধ্যান করলে নাকি সাধুসঙ্গ হয়। সাধু দর্শন করে এসে সাধুদের ধ্যান করতে হয়। আর যদি সাধুদের রাজা অবতারের ধ্যান করা হয় তবে

তো কথাই নেই। পরমহংসদেব অবতার। অবতারের ধ্যান ব্যতীত ভগবানকে ধরবার জো নেই।

স্বামীজী তাই ভক্তিযোগ লিখলেন। তিনিই ঐ কথা বলে গেছেন। তাই মানতে হয়। অত বড় লোক। তিনি ঐ সম্বন্ধে একটি গল্প বলতেন—একজনকে শিব গড়তে বলা হয়েছিল, সে বাঁদর গড়েছিল।

এই বলিয়া তিনি "Bhaktiyoga" বইখানি আনাইলেন ও 'Incarnation' Chapterটি খুলিতে বলিলেন।

শ্রীম— এই বই স্বামীজী আমেরিকায় লিখেছিলেন। speech (বক্তৃতা) নয়। এর বাংলাও নাকি হয়েছে। বাংলা পড়িনি।

বই পড়িয়া শুনাইতেছেন যথা:—We cannot conceive of God except through these human manifestations. There is a story about it. [ঈশ্বরের মানবরূপ-ধারণের (অবতারের) মধ্য দিয়া ছাড়া আমরা ঈশ্বর বিষয়ে ধারণা করিতে পারি না। এবিষয়ে একটি গল্প আছে।]

নিরাকার নিরাকার বললে হবে কি? নিরাকার ভগবান ভাবা যায় কি? ভগবানকে ভাবতে হলে ভেবে বসব আকাশে এক বিরাট সিংহাসনে এক পুরুষ পা ঝুলিয়ে বসে আছেন। আমরা যখন limited (সীমাবদ্ধ), তখন কি unlimited-এর (অসীমের) চিন্তা করতে পারি? এক ছটাক পাত্রে কি চার ছটাক জল ধরে? তাই তিনি অসীম হয়েও সসীম অবতার হয়ে আসেন, যাতে ভক্তেরা তাঁকে চিন্তা করতে পারে। ঠাকুর আমাদের কাউকে কাউকে বলেছিলেন, "আর কাউকে চিন্তা করার দরকার নেই। আমাকে ভাবলেই হবে।" ঠাকুর যখন কাশীপুর বাগানে পীড়িত, তখন একদিন রাত্রি প্রায় একটায় স্বামীজী ছাই মেখে উপরে গিয়ে ঠাকুরকে বলছেন, "একটি গান শুনবেন?" ঠাকুরকে স্তব করবেন, তাই কৌশলে বলছেন, "গান শুনবেন?" গান গেয়ে গেয়ে তাঁর সেই গন্ধর্বনিন্দিত স্বরে ঠাকুরের অবতারত্ব বিষয়ে স্তব করলেন। স্বামীজীর মতন লোক যখন ঠাকুরকে ঈশ্বরের অবতার বলে মেনেছেন, তখন আমাদিগকেও মানতে হয়। ঠাকুর যাদের খুব ভালবাসতেন, ভাল আধার দেখতেন, তাদের কাছে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে বলেছেন, "আমি অবতার, একে ধ্যান করলেই হবে।"

বিবেকানন্দ-স্বামীকে ঐ কথা বলেছিলেন। অর্জুনও শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, "তোমাকে মুনি-ঋষিরা অবতার বলে যখন মেনেছেন, আর তুমি নিজেও বলছো 'আমি অবতার', অতএব আমার তোমাকে সেই পরম পুরুষ বলে বিশ্বাস হচ্ছে।" ভরদ্বাজাদি ঋষিরাও রামকে স্তব করেছেন, "হে রাম, প্রকৃতপক্ষে তুমি অনন্ত সচ্চিদানন্দ। কিন্তু আমাদের জন্য তুমি অবতাররূপে (মানবরূপে) জন্মগ্রহণ করেছো। আমরা সীমাবদ্ধ জীব, তাই তোমার মধ্য দিয়ে ছাড়া অসীমকে ধারণা করতে পারি না। তাই অবতারের প্রয়োজন তাঁর সৃষ্ট জীবের জন্য।"

তরুণ পূজারী*

স্বামী নির্বেদানন্দ

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার প্রধান পূজারীর পদে ব্রতী হয়ে কলকাতার নিকটে একটি নবনির্মিত মন্দিরের কাজের ভার গ্রহণ করেন। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন কলকাতার এক সমৃদ্ধিশালিনী মহিলা, রানী রাসমণি; রানী অনুচ্চকুলজাত ছিলেন বলে শ্রীরামকৃষ্ণের নিষ্ঠাবান মন সে মন্দিরের সীমানার ভেতর বাস করতে চাইল না। ছোট ভাইকে রাজী করিয়ে নিজের কাছে এনে রাখতে রামকুমারকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। যুবক শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তির একটা নিজস্বতা ছিল। কোন ভাব, বিশেষ করে এদেশের ধর্মাচরণের সনাতন কোন ভাব মাথায় একবার ঢুকলে তিনি তা প্রাণপণে আঁকড়ে থাকতেন। কাজেই দাদার প্রস্তাবে রাজী হলেও তাঁর মনে প্রতিবাদ মাথা তুলেই রইল। নিজ ধর্ম যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাও করলেন তিনি। রানী রাসমণির কালীবাড়ীতে দাদার সঙ্গে একত্র বাস করলেও শ্রীরামকৃষ্ণ বহুদিন পর্যন্ত সেখানে দেবীর অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন নাই, জিদ করে গঙ্গাতীরে নিজে রান্না করে খেতেন। নিষ্ঠায় দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। ছোটখাট ধর্ম-বিশ্বাসকেও তিনি জোর করে আঁকড়ে থাকতেন, যতক্ষণ না তার অন্তরে প্রবেশ করে সেটা ত্যাগ করার মত কোন যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজে পেতেন। নিজের কোন বদ্ধমূল ধারণা আধ্যাত্মিকতার পথে সত্যই বাধা সৃষ্টি করছে—একথা মনে হলে সে বিশ্বাসকে গুঁড়ো করে ফেলতেও তাঁর বিলম্ব হত না। সেজন্য তিনি দেশ-প্রচলিত জাতিবিচার প্রথা বহুদিন পর্যন্ত মেনে চলেছিলেন। অবশ্য ধীরে ধীরে মন্দিরে দেবতার প্রকাশে স্থির বিশ্বাস এল তাঁর; জাতিবিচার-সম্পর্কিত দ্বিধার ভাব কাটিয়ে দেওয়া সহজ হল এতে।

পরবৎসর রামকুমারের দেহত্যাগের পর শ্রীরামকৃষ্ণ দেখলেন, তাঁকেই মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের পদে বরণ করা হয়েছে। তাঁর বয়স তখন সবে কুড়ি বছর। এখন থেকে আরম্ভ করে জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীই ছিল তাঁর বাসস্থান ও অধ্যাত্মসাধনার প্রধান পটভূমি। মন্দিরের দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের দ্বিতীয় এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি শুরু হল। মন্দিরের পরিবেশ ও দেব-সেবার অনুষ্ঠানগুলি তাঁর অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করে সেখানে স্পন্দন জাগাতে লাগল।

কুড়ি বছর বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণ যে দেবালয়ের প্রধান পুরোহিতের পদে বৃত হলেন, কলকাতার চার মাইল উত্তরের শহরতলী দক্ষিণেশ্বর গ্রামে সেটি প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন দেবতার উপাসনার জন্য মন্দির-এলাকায় অনেকগুলি মন্দির স্থাপিত আছে। তার মধ্যে সব চেয়ে বড় মন্দিরটি জগন্মাতা কালীর জন্য নির্দিষ্ট বলে স্থানটি আজকাল দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী নামেই পরিচিত। গঙ্গার পূর্বতীরে

*লেখকের মূল গ্রন্থ 'Sri Ramakrishna & Spiritual Renaissance' হইতে অনূদিত।

নদীর কোল জুড়ে অনেকখানি জায়গা নিয়ে কালীবাড়ীর সীমানা। তার উত্তরে ও পূবের কিছুটা অংশ জুড়ে ফুল ও ফলের বাগান। দুটি পুকুরও আছে। দক্ষিণের সীমানা ইট দিয়ে বাঁধানো; তার ঠিক মাঝখানে মনোরম একটি স্নানের ঘাট। চাঁদনি থেকে শুরু হয়ে সারি সারি সুদীর্ঘ ধাপগুলি গঙ্গাগর্ভে নেমে গেছে। চাঁদনিটির উপরে ছাদ, চারিদিক খোলা। চাঁদনির দুপাশে প্রত্যেক দিকে ছ'টি করে দু-সার শিবমন্দির। চাঁদনি ও শিবমন্দিরগুলির সামনে চকমিলানো প্রকাণ্ড বাঁধানো উঠান। উঠানটি চতুষ্কোণ, উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। এই উঠানের মাঝখানে দুটি প্রাসাদোপম মন্দির। একটি দক্ষিণমুখী কালীমন্দির; অপরটির মুখ গঙ্গার দিকে; সে মন্দিরটি রাধাকান্তের। কালী-মন্দিরের ঠিক দক্ষিণে অনেকগুলি স্তম্ভ-বিধৃত প্রশস্ত নাটমন্দির। বাঁধানো উঠানের পশ্চিম ছাড়া আর সবদিক জুড়ে অনেকগুলি ঘর—রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর এবং মন্দিরের কর্মচারী ও অতিথিদের থাকার ঘর। আর একটু এগিয়ে গেলে আজও দেখতে পাওয়া যায়, উঠানের উত্তর-পশ্চিম কোণে, শেষ শিবমন্দিরের ঠিক পরেই, গঙ্গার দিকে অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি বারান্দা-সংযুক্ত একটি বাহুল্য-বর্জিত ঘর রয়েছে। এই ঘরেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর জীবনের বহুলাংশ অতিবাহিত করেছেন।

বাড়ীগুলির বিন্যাসপ্রণালী ও স্থাপত্যশিল্প, এবং কলনাদিনী প্রবাহিণীতীরে সেগুলির অবস্থান—সব মিলে একটি অতি মনোরম শোভা সৃষ্টি করেছে। দ্বাদশ শিবমন্দিরের শ্রেণীবদ্ধ সমাকৃতি চূড়াগুলির পিছনে কালী-মন্দিরের নয়টি গম্বুজ সগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। শিবমন্দিরগুলির মাঝখানে চাঁদনিটি থাকায় শিল্পনৈপুণ্য পরিস্ফুট হয়েছে, চূড়াগুলির একঘেঁয়েমিও কেটে গেছে। ফলে কালীবাড়ীর সামনের দৃশ্যটিতে এসেছে একটি গাম্ভীর্যময় মনোহারিত্ব। গঙ্গাগর্ভের নৌকা-যাত্রীরা এবং গঙ্গার পরপারের পথচারীরা মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সেদিকে।

প্রধান মন্দিরাভ্যন্তরে কৃষ্ণপ্রস্তরময়ী কালী-মূর্তি স্থাপিত। স্বর্ণখচিত বহুমূল্য বসনে ও বিবিধ ভূষণে শোভিত তাঁর অঙ্গ। রৌপ্যময় সহস্রদল পদ্মে শিব শুয়ে আছেন। মা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর অমল ধবল বুকের ওপর। মায়ের মূর্তির ভাব বর্ণনা করা প্রায় দুঃসাধ্য। তাতে ধ্বংসের রক্তহিমকরা আতঙ্কের সঙ্গে স্নেহময়ী জননীর স্নিগ্ধ আশ্বাস মিশে আছে। জগতের সমষ্টীভূতা আদ্য শক্তি তিনি। তিনি সংহারকর্ত্রী; আবার সৃষ্টি এবং পালনও তিনিই করেন। তিনি ভীষণা, আবার মধুরা। গলায় তাঁর মুণ্ডমালা, কটিবন্ধে নরহস্তের মেখলা। মা চতুর্ভুজা। বাঁদিকের নীচের হাতে ছিন্ন নরমুণ্ড, অপর হাতে রক্তসিক্ত খড়্গ। ডানদিকের একহাতে তিনি বরদান করেন, অপরহাতে দেন অভয়। পায়ের তলায় স্বামী-দেবতা শিবকে দেখতে পেয়ে তিনি লজ্জিতা হয়েছেন, এবং ভারতীয় রমণীর মত জিভ বের করে দাঁতে চেপে ধরে হৃদয়ের সে কোমল ভাব প্রকাশ করছেন। তাঁর ত্রিনয়ন দুষ্টের হৃদয়ে হতাশা জাগায়, আবার ভক্তের শিরে স্নেহাশিসও বর্ষণ করে। এভাবে সানুগ্রহ নির্দয় মহিমাবৃতা হয়ে দেবী কালিকা দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর কেন্দ্রস্থলে বৈভবময় মন্দিরতলে দাঁড়িয়ে আছেন। নিত্য সমাগত শত শত ভক্ত ও তীর্থযাত্রীদের কাছে তিনি 'ভবতারিণী' নামে পরিচিতা।

শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে বিশ্বের সমষ্টি

আদি শক্তির প্রতীক মা-কালী ছাড়া মন্দির-সীমানার মধ্যেই আলাদা একটি মন্দিরে ছিলেন দিব্য প্রেম-সৌন্দর্যের প্রতীক শ্রীকৃষ্ণ। আর ছিলেন গঙ্গার দিকের দ্বাদশটি মন্দিরের প্রত্যেকটিতে নির্গুণ চরম সত্যের প্রতীক শিব। তান্ত্রিকদের ভীষণা অথচ মধুরা ঈশ্বরী, বৈষ্ণবদের প্রাণ-মন-হারী দিব্য বংশীধর এবং শৈবদের সর্বত্যাগী আত্মসংস্থ ঈশ্বর—হিন্দু-ভক্তদের এতগুলি বিভিন্ন আদর্শ তাঁর চোখের সামনে একত্র অবস্থান করত। সমগ্র স্থানটি জুড়ে ধ্বনিত হত হিন্দুদের তিনটি প্রধান সম্প্রদায়ের ধর্মভাবের সু-সমঞ্জস সুরের মিলিত ঐকতান। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব ধর্মমতের, সর্ব ধর্মভাবের যে সর্বতঃপ্রসারী অনুভূতি লাভ করেছিলেন, বোধহয় তারই উপযুক্ত পটভূমি নির্মিত হয়েছিল এভাবে। দেবতাদের এই পরিবারে ভবতারিণী বা মা-কালীই ছিলেন সর্বেশ্বরী। শ্রীরামকৃষ্ণের কোমল হৃদয় অধিকার করে তিনিই সেখানকার মহিমময়ী অধীশ্বরী হয়ে উঠেছিলেন।

ভোর থেকে শুরু করে রাত্রি নটা পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ মা-কালীর সেবা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। প্রতিদিন তাঁকে স্নান করাতেন, সাজাতেন, খাওয়াতেন এবং বিশ্রামের জন্য রূপোর খাটে শুইয়ে দিতেন। নিত্যকর্ম ও ভজনাদি তিনি যথাবিধি করে যেতেন, অতি যত্নসহকারে। সুললিত কণ্ঠে পাঠ করতেন স্তব ও মন্ত্রগুলি। সূর্যোদয়ের বহু পূর্বে, এবং সূর্যাস্তের অব্যবহিত পরে দেবীর সম্মুখে বিধিমত ধূপ-দীপ নিয়ে আরতি করতেন তিনি। সে সময় এই অনুষ্ঠানের মাধুর্যের সঙ্গে সুর মিলিয়ে নহবতখানা থেকে ভেসে আসত সানাই-এর মৃদু, মর্মস্পর্শী সুর-লহরী। সুগন্ধি পুষ্প ও সুদৃশ্য মাল্যে মাকে প্রতিদিন সাজাতেন তিনি। দেবসেবার এই সব বিভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটির বিরতি সূচিত হত শঙ্খ- ও ঘণ্টা-ধ্বনিতে। এভাবে সঙ্গীত ও সুগন্ধে তাঁর চারিদিকের আকাশ-বাতাস ভরে উঠতো, পূজাপদ্ধতির অতুলনীয় মাধুর্য চারিদিক থেকে আনন্দ পরিবেশন করে চলত তাঁর সৌন্দর্যবোধের কাছে। আর, সব কিছুর কেন্দ্রে, সব কিছুর ওপরে দাঁড়িয়ে থাকতেন ভুবনমোহিনী জগন্মাতা, এই তরুণ পূজারীর একাগ্রমনা ভক্তি- ও পূজা-লাভেচ্ছু হয়ে, মোহিনী হাস্যে তাঁর সরল চিত্তে আনন্দের বিজলী খেলিয়ে।

"এর ভেতর মা স্বয়ং ভক্ত হয়ে লীলা করছেন।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত

সমালোচনা

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ড ; দ্বিতীয় সংস্করণ) **:** প্রকাশক – স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩। রেক্সিন বাঁধাই : মূল্য মোট—৭০৲ ; প্রতি খণ্ড ৭৲। দশ খণ্ডে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা প্রকাশিত হয় ১৩৬৯ সালে ; এই প্রথম সংস্করণে ৩০,৩০০ সেট ছাপা হইয়াছিল। এক বৎসরের মধ্যে উহা নিঃশেষিত হওয়ায় অনেকের আগ্রহাতিশয্যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। বর্তমান সংস্করণে বিষয়-বিন্যাস পূর্ববৎ। প্রয়োজনবোধে ভাষার কিছু কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে।

দশম খণ্ডের শেষ ভাগে স্বামীজীর সাতটি বক্তৃতা সংযোজিত হইয়াছে।

সর্বসাধারণের, বিশেষত: প্রথম সংস্করণের গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য নূতন বক্তৃতাগুলি 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—পরিশিষ্ট' নামে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৭৫ পয়সা (ডাক মাশুল ৭৫ পয়সা)।

আমরা আশা করি এই বাণী ও রচনার মাধ্যমে বাংলার ঘরে ঘরে, গ্রন্থাগারে ও পাঠাগারে, মহাবিদ্যালয়ে এবং সর্বশ্রেণীর শিক্ষায়তনে যুগাচার্য স্বামীজীর বলিষ্ঠ ভাবধারা অনুসৃত হইবে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (দ্বিতীয় খণ্ড)—শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়। বি ৬।১৫, পীতাম্বর পুরা, বারাণসী ১। পৃষ্ঠা ৪৩৫ ; মূল্য—১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে ৯.৭৫ টাকা।

গ্রন্থকার এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক।

গ্রন্থখানি পাঠ করিলে এই কথাই মনে হয় যে, সুধী গ্রন্থকার একমাত্র গীতাকেই জীবনের সার করিয়াছেন।

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা॥

এই খণ্ডে কেবল গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়টি স্থান পাইয়াছে। ইহাতে গীতার পঞ্চাশাধিক টীকার উদ্ধৃতিসহ বিশদ ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠকবর্গের উপর লক্ষ্য রাখিয়া পুস্তকখানি লিখিত। যিনি যে সম্প্রদায়ের, তিনি সেই সম্প্রদায়ের মতানুসারী টীকা ইহাতে পাইবেন। অধ্যায়-বিবৃতি ও বিশদ ব্যাখ্যায় গ্রন্থকারের চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের অনেক উদ্ধৃতি উপযুক্ত স্থানে দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থটির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য, একসঙ্গে এত অধিকসংখ্যক টীকা-সম্বলিত সুচিন্তিত মত-সহ এইভাবে গীতা-প্রকাশ এই প্রথম। আমরা আশা করি প্রথম খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডটিও পাঠকগণের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

গীতা মাতা কী গোদ মেঁ (পহলাভাগ)—লেখক "শ্রী সীকর"। প্রকাশক **:** হিন্দী ভবন, কালপী। পৃষ্ঠা ১২৭ ; মূল্য ৮০ পয়সা।

সর্বশাস্ত্রময়ী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যত আলোচনা হইবে ততই মানুষের মধ্যে ধর্মভাব, আস্তিক্য-বুদ্ধি ও শ্রদ্ধা জাগরিত হইবে, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আলোচ্য পুস্তকে গীতা-সুধ্যানের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দী ভাষায় এই পুস্তকখানি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসাবে আদরণীয় হইবে। কর্ম জ্ঞান উপাসনা প্রভৃতি বিষয়ে সরল ও সারগর্ভ আলোচনা পুস্তকখানির বৈশিষ্ট্য।

সঙ্গীতমালা—প্রকাশক : স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর (বিহার)। পৃষ্ঠা ৫৬ ; মূল্য ১৲।

এই পুস্তকে বহুকণ্ঠেগীত কতগুলি সঙ্গীত একত্র সন্নিবেশিত ও দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সঙ্গীত-নির্বাচন প্রশংসনীয়। পুস্তকখানির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ গানগুলির সহিত অবাঙালীরাও পরিচিত হইবেন। শিব-সঙ্গীত, কৃষ্ণসঙ্গীত, মাতৃসঙ্গীত, নিরাকারভজন এবং অন্যান্য গানও আছে।

রাধা-মদনমোহন ; সাক্ষী-গোপাল—শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মিত্র, আর কে পাবলিশিং কোম্পানী, ১১।এ গোকুল মিত্র লেন, কলিকাতা ৫। পৃষ্ঠা ৩৮ ও ৪৭ ; মূল্য ২৲ ও ১.৫০।

'রাধা-মদনমোহন' গ্রন্থটি বিষ্ণুপুর ও বাগবাজারের শ্রীশ্রীরাধা মদনমোহনজীউর গল্পের নাট্যরূপ। প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে 'সাক্ষী-গোপাল' নাটকটি রচিত। ভক্তিভাবে লিখিত নাটিকা-দুইটি রসোত্তীর্ণ কি না, তাহা অভিনয়-সাফল্যের উপরই নির্ভর করে।

স্বামী অচলানন্দের জীবনী ও পত্রাবলী—প্রকাশক : সম্পাদক, রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম, বারাসত, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ১১৭ ; মূল্য ২৲।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে 'কেদার বাবা' নামে সুপরিচিত স্বামী অচলানন্দের জীবন ত্যাগ-তপস্যায় ভাস্বর। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে উৎসর্গীকৃত এই মহাপ্রাণ সন্ন্যাসীর জীবন-পরিচিতি আলোচ্য গ্রন্থে সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ। উদ্বোধনে প্রকাশিত 'স্বামীজীর সহিত নয় মাস'—স্বামী অচলানন্দ-কথিত এই হৃদয়গ্রাহী বিবৃতিটি সন্নিবেশিত হওয়ায় পুস্তকের মর্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ৬৬খানি পত্রে বিভিন্ন বিষয় আলোচিত; ভক্তগণ এই পত্রগুলির মাধ্যমে নানাবিধ সমস্যা সমাধানের দিগ্‌দর্শন লাভ করিবেন। চতুর্থ পৃষ্ঠায় লিখিত 'উদ্বোধন'-প্রতিষ্ঠাবর্ষ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ নহে, ১৮৯৯ হইবে ; ভুলটি সংশোধনীয়।

সরল গীতা—শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ। প্রকাশক—শ্রীপ্রভাতকুমার ঘোষ, ৫-এ অক্ষয় বোস লেন, কলিকাতা ৪। পৃষ্ঠা ১০৩ ; মূল্য ২৲।

সহজ ভাষায় গীতার এই অনুবাদ-গ্রন্থখানি যে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে, ইহার দ্বিতীয় সংস্করণই তাহা প্রমাণ করে। বর্তমান সংস্করণে 'অধ্যায়-পরিচিতি' অংশটি নূতন সংযোজিত।

বিদ্যামন্দির পত্রিকা (ত্রয়োদশ সংখ্যা—১৯৬৫) : প্রকাশক—স্বামী অজজানন্দ, সেক্রেটারি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া। পৃষ্ঠা ১২৬।

আবাসিক মহাবিদ্যালয় বিদ্যামন্দিরের এই পত্রিকাখানির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অধ্যাপক ও ছাত্রগণের রচনাগুলির প্রত্যেকটিই সুলিখিত। অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী মহাশয়ের 'মহাভারতের রূপদর্পণ' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধটি মহাভারতের বিষয়বস্তুর প্রতি অপূর্ব আলোক-সম্পাত করিয়াছে। বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দ লিখিত তিনটি প্রবন্ধ এই সংখ্যায় প্রকাশিত : শ্রদ্ধা, In Memorium এবং A Peep into Sri Krishna's Message to Humanity. দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে সারদাপীঠের ভূতপূর্ব সম্পাদক স্বামী বিমুক্তানন্দজীর আদর্শ-নিষ্ঠ জীবন ও সাংগঠনিক কর্মের পরিচিতি রহিয়াছে। অন্যান্য রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : মহাকবি গিরীশচন্দ্র, Albert Schweitzer—A Profile, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ও সিদ্ধি, মহাসিন্ধুর ওপার হতে : একটি প্রশ্নোত্তর।

শিল্পপীঠ পত্রিকা (স্বামী বিবেকানন্দ সংখ্যা): প্রকাশক—স্বামী সন্তোষানন্দ, সেক্রেটারি, রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ, বেলঘরিয়া কলিকাতা ৫৬। মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৫৮।

শিল্পপীঠ পত্রিকার 'স্বামী বিবেকানন্দ সংখ্যা' পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। যুগাচার্য স্বামীজীর বন্দনায় নিবেদিত বহু মূল্যবান প্রবন্ধে পত্রিকাটি সমৃদ্ধ। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজের 'স্বামীজীর কথা' (ভাষণের অনুলিখন), স্বামী তেজসানন্দজীর 'ভারতের শিক্ষাদর্শ ও স্বামী বিবেকানন্দ' পাঠকদের বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। কারিগরী ও সাধারণবিষয়ক প্রবন্ধগুলিও সুলিখিত পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের 'সহরে জল-সরবরাহ' প্রবন্ধটি পত্রিকার অলঙ্কারস্বরূপ। অধ্যাপক ও তরুণ বিদ্যার্থীদের রচনাগুলিতে সুরুচি ও চিন্তাশীলতার ছাপ আছে।

'ক্রীড়াসমীক্ষা', 'আমাদের কথা' ও পত্রিকার চিত্রগুচ্ছের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়।

অভীঃ (আবাসিক মহাবিদ্যালয় পত্রিকা, ১৯৬৪—৬৫): প্রকাশক—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, সেক্রেটারি, রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ৬৫ + ১২।

নরেন্দ্রপুর আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের এই পত্রিকাখানি (তৃতীয় প্রকাশ) বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে লিখিত প্রবন্ধে সমৃদ্ধ ও সুসম্পাদিত। অধিকাংশ রচনাই বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে; প্রবন্ধগুলি পত্রিকাটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়াছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধ: ইংরেজী বিভাগে —Evolution of Shakespeare's Dramatic Art, Swami Vivekananda and National Renaissance, History and Development of Calcutta University এবং বাংলা বিভাগে—আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী, প্রবাসের চিঠি, হপ্তাখানেক (ভ্রমণকাহিনী), আশুতোষ স্মৃতির উদ্দেশে (কবিতা)।

বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধগুলি তথ্যপূর্ণ। চিত্র-সম্বলিত 'College News'-এ মহাবিদ্যালয়টির বিভিন্ন বিভাগের কর্মপ্রচেষ্টার যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ইহার ক্রমোন্নতি পরিস্ফুট।

সমাজশিক্ষা (শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৬৫): নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, লোকশিক্ষা পরিষদ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫৪, মূল্য ৩০ পয়সা।

শিক্ষা ও সেবা সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ এই সংখ্যায় স্থান পাইয়াছে। যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের 'মাতৃভাবে উপাসনা' প্রবন্ধটি এই সংখ্যার অলঙ্কারস্বরূপ। নবসাক্ষর বয়স্কদের জন্য লেখাগুলি সময়োপযোগী।

দীপশিখা (উচ্চতর মাধ্যমিক বিবিধার্থ-সাধক বিদ্যালয় সাময়িক পত্রিকা, ১৯৬৫): প্রকাশক—স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ, সেক্রেটারি, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, আসানসোল। পৃষ্ঠা ৭৮ + ১০।

এই পত্রিকাখানি গল্প, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ, নাটক ও কবিতায় অলঙ্কৃত। ছাত্রদের রচনা-গুলি সযত্নকৃত। জনৈক ছাত্র কর্তৃক অঙ্কিত স্বামীজীর চিত্রটি আকর্ষণীয়।

যুগশঙ্খ (বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সংখ্যা): বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির, মালদহ। পৃষ্ঠা ৫৯।

'যুগশঙ্খের' এই বিশেষ সংখ্যাখানি নানা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সম্পাদনা প্রশংসনীয়। স্বামীজী সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের উক্তি এবং 'আত্মপরিচয়' শিরোনামে স্বামীজীর নিজের

কথা পত্রিকাটিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়াছে। ছাত্রদের লেখাগুলিতে স্বামীজীর ভাবানুধ্যানের পরিচয় পাইয়া আমরা আনন্দিত। প্রত্যেকটি লেখা চিত্রসম্বলিত, পত্রিকাটিতে শিল্পরুচিবোধ পরিস্ফুট।

নিবেদিতা বিদ্যালয় পত্রিকা (১৯৬৫): প্রকাশিকা—প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা, সম্পাদিকা, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়, ৫ নিবেদিতা লেন, কলিকাতা ৩। পৃষ্ঠা ৮৪।

পত্রিকাটির সম্পাদনা আকর্ষণীয়। প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে ধর্ম ও অধর্মের স্বরূপ-জ্ঞাপক শাস্ত্রোদ্ধৃত শ্লোকগুলি। ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী, রবীন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র সেন ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের উক্তি-সংগ্রহ এবং প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম হইতে অনূদিত নিবেদিতার প্রিয় প্রার্থনাবাণী পত্রিকাটির মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে। 'যুগাদর্শ শ্রীসারদা দেবী' প্রবন্ধে শ্রীশ্রীমায়ের ভাবাদর্শ পরিস্ফুট করিবার সার্থক প্রচেষ্টা বিদ্যমান। ছাত্রীদের সুলিখিত উল্লেখযোগ্য রচনা: তপোকেশ্বর (ভ্রমণকাহিনী), The Role of Religion in Life, নির্ঝর (কবিতা), গল্প হলেও সত্য, আমার ভ্রমণ, তেজস্ক্রিয়তা। শিক্ষয়িত্রীদের রচনাগুলিতে চিন্তার গভীরতা আছে।

স্মরণিকা (১৯৬৫): প্রকাশক—বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতি, ১৮।১, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। পৃষ্ঠা ৩০।

স্মরণিকাটি যুগাচার্য স্বামীজীর পুণ্য স্মৃতিতে সার্থক শ্রদ্ধাঞ্জলি। কয়েকটি উৎকৃষ্ট রচনা: স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য জীবনকথা, জীবনাদর্শ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ, The Centenary in the Present World Context.

বিবেকানন্দ জন্ম-শতবার্ষিকী স্মরণী: প্রকাশক—স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব কমিটি, চাকদহ, নদীয়া।

অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ও কবিতার সমাবেশ হইয়াছে এই পত্রিকায়। কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত বহু পত্রিকার মধ্যে এই পত্রিকাখানি একটি বিশিষ্ট স্থান দাবি করিতে পারে।

সম্বোধি (দ্বিতীয় বর্ষ পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা) —সম্পাদক ও প্রকাশক: শ্রীসঞ্জয়কুমার দাশ, জলপাইগুড়ি। পৃষ্ঠা ৮।

আলোচ্য পত্রিকাখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইহাতে কেবল সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলীই প্রকাশিত হয়। বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধ: ভারত তন্ত্র, আমাদের প্রগতির গতি, শিক্ষার মান ও শিক্ষকের মর্যাদা।

জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বিজয়ানন্দ (প্রথম খণ্ড)—মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত। প্রকাশক: আশীষকুমার দাশগুপ্ত, প্রভা প্রকাশনী, ৪১।৫৫ডি রসা রোড (সাউথ), কলিকাতা ৩৩। পৃষ্ঠা ১৭৮; মূল্য ৩·৫০।

কথ্যভাষায় লেখা বইটি সুখপাঠ্য। লেখক যাঁহার জীবন দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার জীবনের বিভিন্ন দিক চিত্তাকর্ষক ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শাখাকেন্দ্রে শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব

এই বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিম্নলিখিত কেন্দ্রসমূহে যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে মৃন্ময়ী প্রতিমায় জগজ্জননী শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর অর্চনা বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে:

আসানসোল, করিমগঞ্জ, কাটিহার, কামারপুকুর, জয়রামবাটী, জলপাইগুড়ি, জামসেদপুর, পাটনা, বারাণসী (অদ্বৈত আশ্রম), বোম্বাই, মালদহ, মেদিনীপুর, রহড়া, শিলচর, শিলং, শেলা (খাসিহিল)।

কার্যবিবরণী

খেতড়ি (রাজস্থান): রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দিরের ১৯৫৯—৬৪ খৃষ্টাব্দের মুদ্রিত কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত খেতড়ি রাজ্য। স্বর্গত পুণ্যশ্লোক খেতড়িরাজ অজিত সিং স্বামীজীর বিখ্যাত শিষ্য ছিলেন; স্বামীজীর মহাজীবন অনুধ্যানে তাঁহার স্মৃতিও অবিস্মরণীয়। খেতড়িতে আশ্রম-প্রতিষ্ঠা বড়ই আনন্দের বিষয়। এই আশ্রমের মাধ্যমে স্বামীজী ও রাজা অজিত সিংহের পুণ্য স্মৃতিগুলি চির-অম্লান রাখিবার সার্থক প্রচেষ্টা হইবে সন্দেহ নাই।

স্বামীজীর পুণ্য স্মৃতিরক্ষার্থে খেতড়ির রাজা বাহাদুর সরদার সিংজী কর্তৃক খেতড়ির 'দিয়ানখানা' ও 'জানানী দেওধী' নামে দুইটি ভবন-দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে এই ভবনদ্বয়েই রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, রাজস্থানে এই কেন্দ্রই রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম কেন্দ্র। ভবন-দুইটির পূর্ণ সংস্কার সাধন করিতে দুই বৎসর লাগে। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে এখানে মিশনের কার্যধারা অনুসৃত হইতেছে। যে ভবনটির উপর তলায় স্বামীজী অবস্থান করিয়াছিলেন, সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের, শ্রীশ্রীমায়ের ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি স্থাপিত হইয়াছে, এবং নিত্য পূজা-উপাসনাদির ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

আশ্রম-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই সাপ্তাহিক গীতাক্লাস, ধর্মসভা ও সংকীর্তনাদি অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রতি বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। জনসাধারণের জন্য একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। খেতড়ির জনপ্রিয় মাতৃমন্দিরটিও (প্রসূতি-ভবন) রামকৃষ্ণ মিশনের হস্তে আসিয়াছে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। চিরাওয়াতেও একটি মাতৃমন্দির ছিল, সেখানে সেই মাতৃমন্দিরের পরিবর্তে একটি নারী-চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে।

স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকীও আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এই উপলক্ষে বিবিধ অনুষ্ঠানের মধ্যে আলোকসজ্জা, কবিসম্মেলন ও বিরাট ধর্মসভা উল্লেখযোগ্য।

আশ্রম-পরিচালকবৃন্দ শিক্ষাবিস্তারকল্পে ও অন্যান্য বিষয়ে বহুবিধ কর্মসূচী গ্রহণের চিন্তা করিতেছেন।

নিউ দিল্লী : রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে সাধারণভাবে এই কেন্দ্রের সূচনা হয় এবং ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে নিজস্ব স্থানে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।

আলোচ্য বর্ষে নিয়মিত ধর্মালোচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচার করা হইয়াছে

তুলসী-রামায়ণ অবলম্বনে ৪৬টি আলোচনা হইয়াছিল, মোট ২৩,৫৬৫ জন শ্রোতা যোগদান করেন।

এই কেন্দ্রের পরিচালনাধীনে গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, অবৈতনিক যক্ষ্মা-ক্লিনিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় আছে।

গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ১৬,৬৮১ (সংযোজিত ১,৩৩৮) ; পঠনার্থে প্রদত্ত পুস্তক-সংখ্যা ১৬,৭৭৩। পাঠাগারে ১৩টি দৈনিক ও ১২৬টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয় ; পাঠাগারে গড়ে দৈনিক উপস্থিতি-সংখ্যা ৩৩৪।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষে ৪৩,৯২৫ জন (নূতন ৭,৯০৯) রোগী চিকিৎসা লাভ করে। যক্ষ্মা-ক্লিনিকে চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,৪১,২১২ (নূতন ২,১৪১) ; অন্তর্বিভাগে ২৫৯ জন রোগীকে পর্যবেক্ষণ করা হয়। অভাবগ্রস্ত ১,৮৬২ জন রোগীকে বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হয়।

মহিলা-সমিতির উদ্যোগে প্রতি রবিবার সারদা-মন্দিরে ৬ হইতে ১২ বৎসরের বালক-বালিকাদিগকে ভজন, ধ্যান এবং নীতিমূলক শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে গড়ে ৫০টি বালক-বালিকা এই ক্লাসে যোগদান করিয়াছিল। সারদা মহিলা-সমিতির সেবা- ও কৃষ্টিমূলক কার্যও প্রশংসনীয় ভাবে অগ্রসর হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ, যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধদেব, গুরুনানক ও আচার্য শঙ্করের জন্মদিন সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। স্বামীজীর জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় ১,০০০ বালক-বালিকা অংশ গ্রহণ করিয়াছিল ; উহাদের মধ্যে ১২০ জনকে পুরস্কার দেওয়া হয়। দিল্লীর বিভিন্ন অঞ্চলে এই কেন্দ্রের উদ্যোগে ও সহযোগিতায় স্বামীজীর শতবার্ষিকী বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

পুরী : রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের (১৯৬১—৬২ হইতে ১৯৬৩—৬৪) কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই কেন্দ্রের কার্যধারা প্রধানতঃ শিক্ষামূলক।

১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে আশ্রম-গ্রন্থাগারটির ৪০ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। বর্তমানে গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ১৭,৭৯৫। বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত, ইংরেজী ও ওড়িয়া ভাষায় পুস্তকাবলী আছে। ১২টি দৈনিক ও ৪১টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। ১৯৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থাগারের মোট পাঠকসংখ্যা ৩৯,৬৪১ ; গড়ে দৈনিক পাঠক-সংখ্যা ১১০। ছাত্রদের জন্য একটি পাঠ্যপুস্তক-লাইব্রেরী করা হইয়াছে, পুস্তকসংখ্যা ১,০৬৫। শিশুগ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ৫৬১। শিশু-গ্রন্থাগারে মধ্যে মধ্যে শিশুদের আবৃত্তি ও বক্তৃতা-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ২০টি ছাত্র লইয়া ছাত্রাবাস আরম্ভ করা হয়। ১৯৬৪—৬৫ খৃষ্টাব্দে ছাত্রাবাসে ৫৬টি ছাত্র ছিল। ছাত্রগণের

অধিকাংশই আদিবাসী ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের।

১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে বিবিধ অনুষ্ঠান সহায়ে স্বামীজীর শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়।

কাঁথি ঃ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের কার্যাবলী তিন ভাগে বিভক্ত : ধর্মপ্রচার, শিক্ষা ও সেবা। ১৯৬১-৬২ হইতে ১৯৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। সেবাশ্রমটি ৫২ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। প্রতি বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়, মহাপুরুষগণের জন্মতিথি-গুলিও যথাযথভাবে উদ্‌যাপন করা হয়।

বিবেকানন্দ ছাত্রাবাসে ১৯৬৩-৬৪ খৃষ্টাব্দে ১৲ জন ছাত্র ছিল, তন্মধ্যে ৮ জন অবৈতনিক। বেলদা শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে ১৩৬ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করিয়াছে।

জনসাধারণ গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিতেছেন ; আলোচ্য সময়ে গ্রামাঞ্চলেও গ্রন্থাগারের কয়েকটি কেন্দ্র করা হইয়াছে।

হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে ১৯৬৪ ৬৫ খৃষ্টাব্দে ৩৩,৪৯৫ জন রোগী চিকিৎসিত হয়।

ছাত্র-ছাত্রী ও দুঃস্থগণকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়।

স্মৃতি-উৎসব

শিলচর : শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে গত ১৮ই অক্টোবর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট পূজাপাদ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের জন্য সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

ভোর ৫টা হইতে মঙ্গলারতি, কীর্তন, শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ভজনাদি চলিতে থাকে। দুপুরে প্রায় আড়াই হাজার নরনারী বসিয়া অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন। বিকাল ৫টায় বিশিষ্ট নাগরিক ও ভক্ত শ্রীধীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক জনসভার অধিবেশন হয়। প্রারম্ভিক বক্তৃতায় আশ্রমাধ্যক্ষ বলেন যে পূজ্যপাদ মাধবানন্দজী মহারাজ সর্বদা নিজেকে আড়ালে রাখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকেই তাঁহার পূতজীবনের মাধ্যমে প্রচার করিয়া গিয়াছেন ; পূজ্যপাদ মহারাজজী নিজ জীবনে যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের নিজ নিজ জীবনে পালন করিলেই এই মহাজীবনের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইবে। তিনি পূজ্যপাদ মাধবানন্দজী মহারাজের দেহত্যাগ-কালীন অপূর্ব সহনশীলতা ও মহাপুরুষ-সুলভ আচরণের কথা বিবৃত করেন। সভাপতি শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত তাঁহার ভাষণে সকলকে শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শে জীবন গঠন করিবার জন্য আহ্বান জানান।

বিবেকানন্দ পাঠচক্র

বেলুড় : রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের ছাত্রগণ যুগাচার্য স্বামীজীর ভাবধারা সুষ্ঠুভাবে অনুশীলনের জন্য বিবেকানন্দ পাঠচক্র (Viveka-nanda Study-Circle) প্রবর্তন করিয়াছে। গত ২৯শে আগস্ট, ১৯৬৫ এই পাঠচক্রের পঞ্চম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-উৎসবে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ সভাপতিত্ব করেন। বেলুড় মঠের বিশিষ্ট সাধুবৃন্দ ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় ছাত্রগণকে উৎসাহিত করিয়া বাণী পাঠান।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে নফরচন্দ্র সেন

গত ২রা কার্ত্তিক (১৯শে অক্টোবর) মঙ্গলবার রাত্রে বিশিষ্ট ভক্ত নফরচন্দ্র সেন মহাশয় হুগলী শহরে বাবুগঞ্জ লেনে তাঁহার বাসভবনে প্রায় ৮৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময় তিনি জ্বরাক্রান্ত হন এবং কয়েকদিন মাত্র অসুস্থ থাকেন। অসুস্থ থাকাকালে তিনি সর্বদা জপ করিতেন। এই ভক্তের যেভাবে শরীরত্যাগ হইয়াছে, তাহা সাধু- ও ভক্তজন-কাম্য। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ইষ্টমন্ত্র জপ করেন। দেহত্যাগের দিন তিনি সহাস্যে যুক্তকর বার বার মাথায় ঠেকাইতে থাকেন।

তিনি শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-পার্ষদগণকে দর্শনের সৌভাগ্যও তাঁহার হইয়াছিল। তিনি শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন, তাঁহার ভবনে মহারাজজী পদার্পণও করিয়াছিলেন। সাধুদর্শনে ও সাধুসেবায় তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। হুগলীতে তাঁহার ভবনটি শতাধিক সাধুর পদধূলি-ধন্য।

তাঁহার আত্মা চির শান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

আঁটপুর: আগামী ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৬৫, পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের জন্মতিথির পরদিবসে তাঁহার জন্মস্থানের উপর নবনির্মিত মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-কার্য অনুষ্ঠিত হইবে। একটি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং সাধারণ পাঠাগারের ভিত্তিস্থাপনও করা হইবে এইদিন।

সালফিউরিক এসিড উৎপাদনের ব্যবস্থা

পাইরাইট অ্যাণ্ড কেমিক্যালস ডেভেলপমেণ্ট করপোরেশন সালফিউরিক এসিড কারখানার যে প্রথম ইউনিট-টি স্থাপন করিবেন, তাহা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

শীঘ্রই ইহার নির্মাণকার্য আরম্ভ হইবে। এই সর্বপ্রথম দেশীয় উদ্যোগে পাইরাইট হইতে সালফিউরিক এসিড উৎপাদন করার কার্যে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। দুই বৎসরের মধ্যে সম্ভবতঃ এই প্রকল্পের কাজ শেষ হইবে এবং প্রত্যেকটি ইউনিট প্রতিদিন চার শত টন করিয়া সালফিউরিক এসিড উৎপাদন করিতে আরম্ভ করিবে। পরে এই উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া প্রতিদিন ১,১০০ টনে দাঁড়াইবে।

বিজ্ঞপ্তি

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর শুভ জন্মতিথি আগামী ২৮শে অগ্রহায়ণ (১৪. ১২. ৬৫) মঙ্গলবার কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে বেলুড় মঠে ও অন্যত্র বিশেষ পূজানুষ্ঠান সহকারে উদ্‌যাপিত হইবে।

স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি আগামী ১৪ই পৌষ (২৯. ১২. ৬৫) বুধবার।

ভ্রমসংশোধন

গত আশ্বিন সংখ্যায় ৫০২ পৃঃ ১ম কঃ ২২ লাইনে 'উকীল' স্থলে 'দাসগুপ্ত' পড়িবেন।

গত কার্ত্তিক সংখ্যায় ৫৮৬ পৃঃ ২য় কঃ শেষ লাইন 'প্রলয় সেন' স্থলে 'রবীন্দ্রনাথ রায়' পড়িবেন।

দিব্য বাণী

তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে॥
সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী॥ —শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১।৫৬-৫৮

মহামায়া—তিনি সৃষ্টি করেছেন এ জগৎ, বিশ্বচরাচর;
মুক্তি পায় সেই জন, প্রসন্না হইয়া তিনি যারে দেন বর।
মুক্তির কারণভূতা ব্রহ্মবিদ্যা-স্বরূপিণী তিনি সনাতনী
ভববন্ধনেরও হেতু, ব্রহ্মা-আদি ঈশ্বরেরও ঈশ্বরী, জননী।

কথাপ্রসঙ্গে

জননী সারদাদেবী

ভারতের 'মা' শব্দটির অন্তর্নিহিত গভীরতা বুঝাইতে গিয়া ভগিনী নিবেদিতা বলিয়াছেন, "যে স্নেহ-বিকিরণ স্বপ্নেও আমাদের ধারণার অতীত, কিন্তু যাহার উজ্জ্বল চিরদীপ্তিকে অন্তরবাহির আপ্লুত করিতে দিয়া আমরা পরিতৃপ্ত হই—সেই ভালবাসাকে লক্ষ্য করিয়াই 'মা' শব্দটি কল্পিত নয় কি ?" "মাতৃত্ব হইতেছে আমাদের মস্তকে চিরবর্ষিত এক আশীর্বাদ, জীবনের সর্বাবস্থায় অলঙ্ঘনীয় এক অস্তিত্ব, আমাদের চিরদিনের নিশ্চিন্ত আশ্রয় স্বরূপ হৃদয়চন্দ্রাতপ, অতলস্পর্শী মাধুর্যপারাবার, অচ্ছেদ্য স্নেহবন্ধন, বিমল পবিত্রতা—এবং আরো কত কি !"

এই মাতৃত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের আবরণে আবৃতা হইয়া আসিয়াছিলেন জননী সারদা দেবী। এই নিশ্ছিদ্র আবরণখানি ছিল বলিয়াই সাধারণ স্তরের সকলেই, এমনকি আমজদের মত লোকও নির্ভয়ে তাঁহাকে অতি আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিয়াছে, পুত্রশোকাতুরা বাগ্দিনী তাঁহার পাশে বসিয়া একসঙ্গে গলা ছাড়িয়া কাঁদিতে পারিয়াছে; তাঁহার আত্মীয়-স্বজন তাঁহার সহিত আত্মীয়ের মত ব্যবহার তো নিশ্চয়ই, সময় সময় অশোভন আচরণও করিতে সাহসী হইয়াছে—সাধারণ সংসারে সচরাচর যাহা ঘটিয়াই থাকে।

কিন্তু যাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি এই আবরণ ভেদ করিতে সক্ষম ছিল, তাঁহারা ইহার অন্তরস্থ শক্তি ও জ্ঞানের কোন কূলকিনারা পাইতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে সাক্ষাৎ জগজ্জননীরূপে

পূজা করিয়াছেন, জপের মালা সহ নিজ অদৃষ্টপূর্ব সাধনার সমস্ত ফল তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়াছেন; এই পূজাই তাঁহার একটানা দীর্ঘ সাধনযজ্ঞে যেন পূর্ণাহুতি। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতকে জাগাইবার জন্য অন্তরস্থ শক্তির উদ্বোধনকল্পে শেষবারের মত বরাহনগর মঠ ত্যাগ-কালে শ্রীশ্রীমায়ের চরণবন্দনা করিয়া তাঁহার আশীর্বাদ লইয়া বাহির হইয়াছিলেন। আমেরিকা গমনকালে শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ লাভের পরও তিনি শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া পত্র দিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ ছাড়া কিছুই হইবার নয়।

এখানেও কিন্তু স্বরূপ প্রকট হওয়া সত্ত্বেও তাহার সহিত মাতৃস্নেহ অপূর্ব সামঞ্জস্যে সমন্বিত। স্বামী বিবেকানন্দের পত্র পাইয়া তিনি ভাবিয়া আকুল হইতেছেন যে, নরেন ছেলেমানুষ, এত দূর দেশে একাকী যাইবে কি!

বিপুল অন্তর্বলের, জ্ঞান ও শক্তির সহিত অপার স্নেহের সমন্বয়ের বলেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের অদর্শনের পর তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিয়াছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের দিক্‌পালতুল্য, শিক্ষিত, তীক্ষ্ণধী সত্যদ্রষ্টা সন্ন্যাসী সন্তানগণকে অদৃশ্যহস্তে পরিচালনা করিয়াছেন, বিষম বিপদের সময় পরামর্শ দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘকে রক্ষা করিয়াছেন; আবার 'ডাকাত বাবা'র মত নৃশংস ডাকাতকেও মুহূর্তমধ্যে আপনার করিয়া লইয়াছেন, অগণিত দুষ্কৃতকারীকে পঙ্কিল জীবন হইতে টানিয়া তুলিয়া অবলীলাক্রমে দিব্যজীবনে আরূঢ় করাইয়াছেন।

এই অনবদ্য জীবন-বিকাশের ভিত্তিভূমি ছিল ভারতীয় নারীত্বের আদর্শের যাহা ভিত্তিভূমি তাহাই—বিমল পবিত্রতা ও ঈশ্বরচিন্তায় নিবিষ্ট একাগ্র হৃদয়। আধুনিক শিক্ষার নামগন্ধহীন অখ্যাত পল্লীজীবনেও এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের যে জীবনগঠন-পদ্ধতির যুগযুগ প্রবাহিত ধারা দৈনন্দিন জীবনধারার সঙ্গে সাবলীল গতিতে মিলিত হইয়া প্রবাহিত হইয়া চলিত, তাহারই অবদান এই মহীয়সী জননী। শিক্ষা বলিতে আমরা বর্তমানে যাহা বুঝি, তাহা তিনি কিছুই পান নাই। অবশ্য অতি সামান্য পড়াশুনা তিনি করিয়াছিলেন; রামায়ণ-মহাভারতাদি পড়িতে পারিতেন, কিন্তু যতদূর জানা যায়, লিখিতে পারিতেন না। অথচ তাঁহার শক্তি ও স্নেহের মত তাঁহার বুদ্ধি এবং জ্ঞানও ছিল পূর্ণ বিকশিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত যে কথা বলিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীমায়ের কথাগুলি পড়িলে মনে হয় তাঁহার পক্ষেও সে কথাগুলি সমভাবে প্রয়োজ্য—"তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত অতি সহজবোধ্য কথাগুলি চিন্তার চেয়েও অধিকতর উচ্চতায় উঠিতে এবং অধিকতর গভীরতায় প্রবেশ করিতে পারিত।"

* * *

এই জাতীয় শক্তিশালী কথার উৎস ভগবদ্ভাবানুভাবিত উন্নত জীবন—তথ্যসমৃদ্ধি বা নিপুণ শব্দবিন্যাসদক্ষতা নহে। পবিত্রতা হইতে জ্ঞান ও শক্তি স্বতঃস্ফুরিত হয়। শ্রীশ্রীমা নিজে বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ না করিলেও ইহার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার জনৈকা বালিকা আত্মীয়াকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবার প্রয়োজন কি, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, লেখাপড়া ও হাতের কাজ শিখিলে নিজেরও কল্যাণ হইবে, যেখানে থাকিবে সেখানকার লোকদেরও বহু কাজে সহায়তাও করিতে পারিবে। স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচলন ছাড়া জাতিকে

উন্নত করা সম্ভব নয়; স্বামীজী ইহা বলিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার, উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তবে স্বামীজী একথা বলিয়া সাবধানও করিয়া দিয়া গিয়াছেন যে, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার করিতে গিয়া যদি এদেশের স্ত্রীজাতির পরম সম্পদ পবিত্রতা-পূত জীবন বিঘ্নিত হয়, তবে সে শিক্ষা না দেওয়াই বরং ভাল, উহাতে বিপরীত ফল হইতে পারে।

বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি কিন্তু তাহাই করিয়া চলিতেছে। বুদ্ধির ছুরিকাখানিকে শাণিত করিয়া শিক্ষিত নরনারীর হস্তে তুলিয়া দিয়া, প্রয়োগের ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতাসহ তাহাদের ছাড়িয়া দিতেছে। কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্র নির্ণয়ের জন্য যে সম্যক্ দৃষ্টির, এবং অপ-ব্যবহারের আশঙ্কার মুহূর্তে হস্তকে সংযত রাখার মত যে মানসিক শক্তির প্রয়োজন, তাহা অর্জনের কোন ব্যবস্থাই করিতেছে না। ফলে সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনে শান্তি অতিমাত্রায় বিঘ্নিত, প্রায় বিপন্ন হইতে চলিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার অগ্রগতির দোহাই দিয়া আজ অনেকেই নিজেকে ও সমাজকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছে। পাশ্চাত্য সমাজ আজ যে বিষে জর্জরিত, আমাদের অমৃতপাত্র ফেলিয়া পাশ্চাত্য চিন্তাশীলদের চোখেই বিষপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত সেই পাত্রটিকে আমরা সাগ্রহে হস্তে তুলিয়া লইতেছি।

জননী সারদাদেবীর জীবন ভারতীয় নারীজাতির আদর্শের উচ্চতম শিখরে উঠিয়া আমাদের জীবনের পাত্র ভরিয়া দিবার জন্য অমৃত-পারাবার রূপে আবির্ভূতা। স্বামীজী বলিয়া গিয়াছেন যে, এই জীবন অবলম্বনে কালে এদেশে আবার সব গার্গী-মৈত্রেয়ীর আবির্ভাব ঘটিবে। পাশ্চাত্যবিদ্যার যত উচ্চ শিখরে ওঠা সম্ভব ততদূর উঠিয়াও, কর্মক্ষেত্রের প্রসার যেদিকে যতখানি প্রয়োজন সেদিকে ততখানি প্রসারিত করিয়াও তাঁহাদের জীবনপাত্র অমৃতেই পূর্ণ থাকিবে—পবিত্রতাস্নিগ্ধ ও ভগবদ্ভাবে চিরভাস্বর থাকিবে। ইহাই আধুনিক ভারতীয় নারীজাতির আকাঙ্ক্ষিত আদর্শ; স্ত্রীশিক্ষাকে ইহার উপযোগী করিতেই হইবে।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সমন্বয়ে গঠিত এরূপ একটি আদর্শ জীবন স্বামীজী গড়িয়া রাখিয়া গিয়াছেন—বিদুষী, তীক্ষ্ণধী, তেজস্বিনী, পবিত্রহৃদয়া ভগিনী নিবেদিতাকে পাশ্চাত্য হইতে এদেশে আনিয়া এবং শ্রীশ্রীমায়ের জীবনাদর্শের ছাঁচে তাঁহার অন্তর্জীবন ঢালাইয়া লইয়া। কর্মের ক্ষেত্রে স্বামীজী তাঁহাকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। বিচিত্র পরিবেশ ও কর্মের মধ্য দিয়া তাঁহার জীবনধারা প্রবাহিত হইয়াছিল; কিন্তু কোন কিছুই সে ধারার স্নিগ্ধতা ও নির্মলতাকে ঈষন্মাত্রও আবিলতালিপ্ত করিতে পারে নাই।

স্বামীজী বলিয়াছেন, "যাঁহাদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণা হন, তাঁহাদের ঘরেই মহৎ লোক জন্মায়।" "জননীগণ উন্নতা হইলে তাঁহাদের কৃতী সন্তানগণের মহৎ কীর্তি দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিবে; এবং তখনই ঘটিবে দেশে সংস্কৃতি, পরাক্রম, জ্ঞান ও ভক্তির পুনরুজ্জীবন।"

*　　　　*　　　　*

যাঁহার অঙ্গুলিহেলনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, যিনি সকলেরই হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা, জননী সারদাদেবী তাঁহার সহিত অভিন্না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন: ও সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে। দেশের জননীগণের হৃদয়ে সদ্‌বুদ্ধিরূপে প্রকাশিতা হইয়া তিনি তাঁহাদের উন্নতা করিয়া তুলুন।

স্বামী সারদানন্দ

হিমাচলের মত ধীর, স্থির, গম্ভীর যে জীবন রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই কর্মপ্রসারকালীন প্রাথমিক অবস্থার সর্ববিধ ঝড়-ঝঞ্ঝায় অটল থাকিয়া তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, সে জীবন সুরু হইয়াছিল শতবর্ষ পূর্বে—১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর, শনিবার, সন্ধ্যার পর (৯ই পৌষ, ১২৭২ সাল, শুক্লা ষষ্ঠী তিথি) ; নব-জাতক শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী নামে ও পরে স্বামী সারদানন্দ নামে খ্যাত হন।

দীর্ঘ ৩০ বৎসরকাল সাধারণ সম্পাদকরূপে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালনা ছাড়া স্বামী সারদানন্দের জীবনের আরো দুটি মহান অবদান—স্বামী যোগানন্দের দেহত্যাগের পর শ্রীশ্রীমায়ের অদর্শন পর্যন্ত তাঁহার সেবারূপ মহাব্রত পালন এবং শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের উপর বিমল আলোকবর্ষী প্রামাণিক গ্রন্থ, বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ প্রণয়ন।

ধর্মপ্রাণ পিতা গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তীর সান্নিধ্যে এবং দেবভক্তিপরায়ণা জননীর স্নেহে শরৎচন্দ্র নামক যে বালকটি কলিকাতার একটি শান্তিময় গৃহে বর্ধিত হইতেছিল, ভবিষ্যজীবনে শিবজ্ঞানে জীবসেবার বিরাট প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মত তাহার হৃদয়ের বিকাশ ঘটিতেছিল তখন হইতেই। জলখাবারের পয়সা বাঁচাইয়া এবং প্রয়োজন মত নিজের ছাতা বা বস্ত্রাদি বিক্রয় করিয়া তখন হইতেই সে আর্তের সেবায় ব্যাপৃত ছিল।

শরৎচন্দ্রের ঈশ্বরে অনুরাগ ছিল আবাল্য। শৈশবে ক্রীড়াচ্ছলে জননীর গৃহদেবতার পূজার অনুকরণ করিয়া, কৈশোরে উপনয়নের পর গৃহদেবতার পূজা এবং যৌবনে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়া হৃদয়ের এই অনুরাগকে তিনি ঈশ্বর-দর্শনের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় পরিণত করিয়াছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে অধ্যয়নকালে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদতলে আসিয়া তাঁহার নির্দেশিত সাধনপথ অবলম্বনে এই আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্যলাভে চিরতৃপ্ত হয়।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর তাঁহার অন্যান্য যুবক ভক্তগণের সহিত বরাহনগর মঠে একত্র হইয়া শরচ্চন্দ্র তাঁহাদের সহিত সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং স্বামী সারদানন্দ নামে অভিহিত হন। মঠের দুশ্চর তপস্যায় ও তীর্থভ্রমণে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইবার পর স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে পাশ্চাত্যে প্রচারকার্যে তাঁহাকে সহায়তা করিবার জন্য তিনি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড এবং সেখান হইতে আমেরিকা গমন করেন। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য হইতে ফিরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং উহার কর্মপরিচালনার জন্য স্বামী সারদানন্দকে ভারতে ফিরিয়া আসিবার আহ্বান জানাইলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ভারতে ফিরিয়া তাঁহাকে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিতে হয়।

এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণের সমকালেই, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে জননী সারদাদেবীর সেবার গুরুদায়িত্বটিও তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সেবাব্রতের যোগ্য উদ্‌যাপন বিষয়ে শ্রীশ্রীমায়ের একটি কথা উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে—"শরৎ যে কদিন আছে, সে কদিন আমার ওখানে (কলকাতায়) থাকা চলবে। ...তারপর আমার বোঝা নিতে পারে, এমন কে দেখি না। ...শরৎটি সর্বপ্রকারে পারে—শরৎ হচ্ছে আমার ভারী।"

এইগুলির সঙ্গেই বিরাট তৃতীয় দায়িত্বটি আসিয়া পড়ে কয়েক বছর পরেই। জয়রামবাটী হইতে শ্রীশ্রীমা যখন কলিকাতায় আসিতেন, তাঁহার থাকিবার সুব্যবস্থা করা কষ্টসাধ্য ছিল; তাঁহার জন্ম একটি স্থায়ী বাসস্থানের অভাব খুবই অনুভূত হইত। এদিকে, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে 'উদ্বোধন' পত্রিকার আফিস ছিল ৩০ নং বোসপাড়া লেন-এ; সেখানকার গৃহস্বামী শীঘ্রই বাড়ী ছাড়িয়া দিতে বলিলে উদ্বোধন পত্রিকার জন্ম একটি স্থায়ী নিজস্ব আফিস গৃহের প্রয়োজনও অনিবার্য হইয়া উঠিল। জমি একখণ্ড বিনামূল্যে পাওয়া গেল কিন্তু বাড়ী করিবার মত অর্থ যথেষ্ট ছিল না। স্বামী সারদানন্দ ঋণ করিয়া গৃহ নির্মাণ করাইলেন এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে শ্রীশ্রীমাকে জয়রামবাটী হইতে লইয়া আসিয়া সেই নবনির্মিত ভবনে অধিষ্ঠিতা করাইলেন। বাড়ীটির দোতলা শ্রীশ্রীমায়ের জন্ম রহিল, একতলায় হইল 'উদ্বোধন আফিস'। প্রবেশপথের পার্শে একতলার একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ছিল স্বামী সারদানন্দের আফিস। এই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বসিয়া জগজ্জননীর "দ্বারীর" কাজ করিতেন তিনি। এই প্রকোষ্ঠে একটি ডেস্ক লইয়া বসিয়া তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদকের কাজও করিতেন। মায়ের বাড়ী করিবার ঋণ শোধের জন্ম এই প্রকোষ্ঠে বসিয়াই লেখা হয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুলাই—শ্রীশ্রীমা স্বস্বরূপে লীন হইলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল স্বামী ব্রহ্মানন্দও দেহত্যাগ করিলেন। মঠের প্রেসিডেণ্ট হইবার জন্ম স্বামী সারদানন্দকে অনুরোধ করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, স্বামীজী তাঁহাকে যে পদে রাখিয়া গিয়াছেন সেই পদেই তিনি থাকিবেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ১৯শে এপ্রিল জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠার পর স্বামী সারদানন্দ স্বধামে প্রত্যাবর্তনের জন্ম প্রস্তুত হইতে লাগিলেন—"মা চলে গেলেন, মহারাজও গেলেন—কোন কাজেই যেন উৎসাহ পাই না···।"

সুদিন-দুর্দিন, সম্পদ-বিপদাদি জীবনের বহু বিচিত্র ঘটনার ছন্দে এই ধ্যান-স্তিমিতলোচন মহেশ্বরের বুকে নৃত্যময়ী হইয়াও প্রকৃতিদেবী বাহ্য বা অন্তর্জগতে ক্ষণেকের জন্মও তাঁহাকে ধৈর্যচ্যুত করিতে পারেন নাই। চিরঅচঞ্চলচিত্ত স্বামী সারদানন্দ ধীর-প্রশান্ত ভাবেই ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট দিব্যধামে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ বাহ্যস্তরে যে ভাব লইয়া তিনি সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই বোধ হয় তাঁহার উপদেশে ফুটিয়া উঠিয়াছে—"যদি কাজই করিতে চাও তবে ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াও। কোন মানুষের মুখ চাহিয়া থাকিও না—আমারও না। কেহ তোমাকে সাহায্য না করিলেও তুমি একলা ঐ কাজ করিয়া দেহপাত করিবে—এইরূপ তেজ, সাহস ও ভগবানে নির্ভরতা লইয়া যদি কাজ করিতে পার তো কর।" গভীরতম স্তরে ছিল "সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন"—যেখানে নিজের কর্মরত 'আমি'-টিও এই সর্বভূতের অন্তর্গত। স্বামী বিবেকানন্দ 'চিরপ্রশান্তির মধ্যে প্রচণ্ড কর্মতৎপরতা'রূপ কর্মযোগের আদর্শের যে সূত্র দিয়া গিয়াছেন, স্বামী সারদানন্দের জীবন তাহারই ভাষ্য।

বৈদান্তিক ঈশ্বরবাদের কার্যকারিতা—নিঃস্বার্থপরতা*

স্বামী সারদানন্দ

যখন একটি দেহ ক্লেশ পায় বা একটি মনে দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন আর আর দেহ ও মনেও সেই তরঙ্গের প্রতিঘাত হইবে। কারণ, তাহারা পরস্পর সংলগ্ন ও সেই একেরই অংশ হইয়া রহিয়াছে। অতএব তোমার মঙ্গলে আমারও মঙ্গল, ও তোমার অমঙ্গলে আমার অমঙ্গল। তোমার উন্নতি ও অবনতি তোমাতেই অবসিত হইতেছে না, তাহার প্রতিঘাত আমাতে ও সর্বজগতে গিয়া লাগিতেছে। সেইরূপ এক জাতির উন্নতি অবনতি অপর জাতিসমূহকে স্পর্শ করে। আমরা বেদান্তের মহান্ সত্য যে দিন হইতে ভুলিয়াছি, সেই দিন হইতেই আমাদের অবনতির দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। স্বার্থের বশীভূত হইয়া আমরা যে স্ত্রী ও শূদ্রজাতির প্রতি অত্যাচার করিয়াছি, তাহার ফলভোগ করিতেছি। সমাজশরীরের এক অংশ রোগগ্রস্ত হইলে অপর অংশও রুগ্ন হয়—পাশ্চাত্যগণ বেদান্ত না পড়িয়াও বহুদর্শিতায় ইহা বুঝিয়াছে ও এখন সেই সত্যটি কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা পাইতেছে। একদেশে মহামারী হইলে অপর দেশে হইবার সম্ভাবনা, অতএব পরের দেশের মহামারী নিবারণের চেষ্টা করিতেছে। স্ত্রীজাতির অবনতিতে, সমাজের অপর অঙ্গ পুরুষজাতিরও অবনতি হইয়া থাকে এবং অপর দেশের অমঙ্গলে নিজেদেরও অমঙ্গল, ইহা বুঝিতেছে। সকলেই সেই বিরাট মূর্তির অঙ্গ, এই মহান্ ভাব বেদান্ত প্রচার করিতেছেন। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, হে অর্জুন, যা কিছু শক্তিমান, যা কিছু শ্রেষ্ঠ দেখিবে, তাহা আমি ; নদীর মধ্যে আমি গঙ্গা, বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বত্থ ইত্যাদি বলিয়া অবশেষে বলিতেছেন, আর আমি কত বলিব, আমি একাংশে সমস্ত জগৎ হইয়া রহিয়াছি। এই বিরাটের পূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা। সাধনভজন সব এক কথায় বলিলে ইহাই বলা যায়—যে স্বার্থত্যাগ। কি জ্ঞানপথ, কি ভক্তিপথ স্বার্থত্যাগ ভিন্ন কোন পথে সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। আপনাকে ভুলিয়া যাওয়া—যে আপনাকে ভুলিতে পারিয়াছে, স্বার্থত্যাগ করিতে পারিয়াছে, তাহার সাধনভজন সব হইয়াছে। ঈশ্বর কি খোসামদের বশ যে, যে তাঁহাকে স্তবস্তুতি করিল, তাহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, আর যে করিল না, তাহার প্রতি বিমুখ হইবেন ? না, তিনি এরূপ নন। একজন ভগবান মানে না, কিন্তু সে স্বার্থশূন্য, পরের সেবা তার ব্রত, ইহাই তার প্রধান সাধন। জানিও, তার ঈশ্বরলাভের বিলম্ব নাই। আর যে দিবারাত্র ঈশ্বরপূজায় ব্যস্ত কিন্তু মহাস্বার্থপর, তার সাধনভজন পণ্ডশ্রম মাত্র। সর্বভূতে ভগবানকে দেখিতে হইবে, সকলেই তাঁর মূর্তি বলিয়া জানিয়া সেবা করিতে হইবে। বেদান্ত ইহাই বলেন, সকলেই বিরাটের অংশ। সেই বিরাট মনের এক এক ক্ষুদ্র অংশ আমরা অধিকার করিয়া বলিতেছি, আমার মন। তুমি একটু লইয়া বলিতেছ, তোমার মন। যেমন গঙ্গার কোন অংশে বেড়া দিয়া আমি একটা নাম দিলাম, ঘোষ গঙ্গা, বোস গঙ্গা ইত্যাদি। সকলেই কিন্তু জানেন বাস্তবিক গঙ্গা এক। সেই এক জল,

*'উদ্বোধন' ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যায় (মাঘ, ১৩০৫ সাল) প্রকাশিত "সারদানন্দ স্বামীর বক্তৃতার সারাংশ (রামকৃষ্ণ মিশন সভা, রবিবার, ২৮শে আগষ্ট)"—শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে (একাংশ) পুনর্মুদ্রিত।

এক তরঙ্গ কেবল নামরূপে প্রভেদ। সমুদ্রের একাংশকে এক নাম দিলাম, অন্য অংশকে আর এক নাম দিলাম, কিন্তু উহা একই সমুদ্র। সেইরূপ মন এক, কেবল উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন বলিতেছি। যখন দুইজনের মন পরস্পরের প্রতি স্বার্থশূন্য ভালবাসায় সংযুক্ত হয়, একভাবে ভাবিত হয়, তখন তাহাদের শরীর পৃথিবীর দুই প্রান্তে থাকিলেও মনের কথা জানিতে পারে, আমরা ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। সেইজন্য আমাদের মন ও শরীর পরস্পর সংলগ্ন রহিয়াছে, ইহা এক মহাসত্য। যখন মনে পাপচিন্তা উদয় হয়, অন্যান্য মনের পাপচিন্তা সেই মনে প্রবাহিত হইয়া তাহাকে আরো পাপে নিমগ্ন করে, আবার কোন সৎ বা ধর্মচিন্তা উদয় হইলে, যত সাধু মহাপুরুষদিগের চিন্তা তাহার মনের উপর কার্য করিয়া তাহাকে আরো উন্নত করিতে থাকে। আমাদের সমস্ত সাধনভজন আমাদিগকে স্বার্থশূন্য করিয়া এই বিরাটের উপলব্ধির দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর করে।

মা

শিবদাস

সাধারণ আর মহা-মানবের যত আছে দেখা, শোনা,
চরাচর-জোড়া বিশাল চিত্তে যত ওঠে কল্পনা,
সব জড়ো করা, তাহারো অতীত অসীম শকতিরাশি
ঘনীভূত হয়ে মানুষ হয়েছে ধরণীর'পরে আসি।
অবারিত তার দৃষ্টি-দুয়ার; দেশকাল-সীমামাঝে,
সীমার বাহিরে জ্ঞানের বস্তু যেখানে যা-কিছু আছে—
চিরনিশ্চল চেতনায় লীন, স্থূলতম, চঞ্চল—
শুভ্র তাহার জ্ঞানের কিরণে সব করে ঝলমল।

কিসের লাগিয়া এসেছো এখানে? নিবিড় তিমির মাঝে
দেখাইবে আলো? দুর্গম পথে কার পদধ্বনি বাজে,
চিরআনন্দ-লোলুপ কাহারা ছোটে পাগলের প্রায়
বিভ্রমময় বিপরীত পথে, শতবার বাধা পায়?
দুর্বল তারা; তোমারে দেখিয়া ভয়ে পলাইবে দূরে—
কাছে এলে বুঝি কোটি সূর্যের প্রভায় মরিবে পুড়ে!

স্নেহ এল তাই বিগলিত হয়ে কলকলতানে ডাকি,
মাতৃত্বের আবরণ দিয়ে সবকিছু দিল ঢাকি।
নাহি আর ভয়, দ্বিধা, সংশয় আসিতে অঙ্ক মাঝে
সকল শাসন তুচ্ছ করিয়া স্নেহের ডঙ্কা বাজে।
যোগ্য ছেলেরা, তারা তো এলই রাতুল চরণতলে,
ঘৃণ্য, অধম—তাদেরও টানিলে স্নেহসুশীতল কোলে।
শত যোজনের ব্যবধান হল নিমেষের মাঝে দূর,
করুণা-পরশে নবজাগরণ-মাধুরীতে ভরপুর
হৃদয়পথ খুলিয়া নয়ন দিব্য জনম লভে,
চিরলাঞ্ছিত, মলিন চিত্ত ভরে ওঠে সৌরভে।

কিসের যাদুর পরশে নিমেষে অসুর দেবতা হয়ে
মনের সকল সঞ্চয় ফেলে তাঁর পানে যায় ধেয়ে?
সে শুধু মায়ের স্নেহের শকতি, এত দৃঢ়, দুর্জয়,
যুগদেবতারও নিষেধ ঠেলিতে নাহি তার কোন ভয়।
অসুর-দলনী এসেছে এবার দুখিনী মায়ের সাজে
স্নেহের অমোঘ অস্ত্র লইয়া দেবাসুর-রণ মাঝে।
অতি পবিত্র, নির্মল চিত-সিংহ-আসনে বসি
যুগাবতারের লইয়াছে পূজা, হইয়াছে খুব খুশী,
শুরু করিয়াছে অসুর-দলন, তুলেছে অভয়-কর,
বিজয়বারতা চারিদিক পানে রটিবেই দেবতার।

সারদাদেবী ও অন্যান্য আত্মীয় সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ*

স্বামী নির্বেদানন্দ

গ্রামের বাড়ীতে আত্মীয়গণের সঙ্গে দীর্ঘ সাত মাসকাল বাস করে শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসের চিরাচরিত জীবনধারার ব্যতিক্রম করেছিলেন নিশ্চয়ই। সন্ন্যাস মানে যা আত্মীয়-অনাত্মীয়ে কোন পার্থক্য রাখে না, যা সর্ববিধ জাগতিক বন্ধন ছিন্ন করে দেয়, এবং নিজ আত্মীয়দের প্রতি সর্ববিধ বাধ্যবাধকতা থেকে চিরমুক্তি দান করে। জীবনে আত্মার পূর্ণ মুক্তিই সন্ন্যাসের তাৎপর্য -- যে জীবনে অতি-নিকট আত্মীয়স্বজনের পূর্বস্মৃতি পর্যন্ত বন্ধন হয়ে থাকবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ তো সত্যদ্রষ্টা, পরমহংস ছিলেন, সন্ন্যাসজীবনের সম্পূর্ণতা তাঁর করায়ত্ত হয়েছিল। তাঁর আত্মা ছিল সর্ববন্ধনমুক্ত, তাকে বেঁধে রাখবার মত সামর্থ্য বোধ হয় কোন কিছুরই ছিল না।

তবু একথা তো অস্বীকার করা চলে না যে, সন্ন্যাসজীবনের প্রচলিত ধারা লঙ্ঘন করে নিজের জন্য নতুন একটা পথ তিনি তৈরী করে নিয়েছিলেন। সন্ন্যাস-গ্রহণকালে যে পারিবারিক বন্ধন একদা স্বহস্তে ছিন্ন করে আসতে হয়, মুক্ত সন্ন্যাসীদের ভেতর কেউ সে বন্ধন পুনরায় বরণ করে নিয়েছেন, একথা শোনা যায় নি কখনো। যেমন, কঠোরী তোতাপুরী ঘরে ফিরে গিয়ে আত্মীয়দের সঙ্গে আবার মেলামেশা করছেন, একথা কল্পনা করা যায় কি? কখনই তা ভাবতে পারা যায় না। তবু বিনা দ্বিধায়, বিনা অনুতাপে শ্রীরামকৃষ্ণ এই কাজই করেছিলেন। কোন সংস্কারকের মনোভাব নিয়ে এ ব্যতিক্রম তিনি করেন নি, সংস্কারের কোন উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। কারণ দেখা যায় নিজ-সন্ন্যাসী শিষ্যদের কাউকেই তিনি এ পথ অনুসরণ করতে বলেন নি। এ তাঁর নিজস্ব অদ্ভুত জীবনধারা, যা সম্পূর্ণ সরল সহজ হয়ে তাঁর সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। নিজের জন্যই বা এ নতুন ধারার প্রবর্তন তিনি করলেন কেন?

অবশ্য বলা যায়, গোঁড়া সন্ন্যাসীদের চেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরে করুণার ভাব অনেক বেশী ছিল বলেই নিজের ওপর আত্মীয়গণের দাবী তিনি মেনে নিয়েছিলেন। অতি কোমলহৃদয় ও প্রেমিক ছিলেন তিনি। তোতাপুরীর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করেন, তখন তাঁর জননী দক্ষিণেশ্বরেই বাস করতেন। ছেলেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে দেখলে মায়ের প্রাণে আঘাত লাগতে পারে ভেবে পুরীজীর কাছে তিনি গোপনে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ত্যাগের জীবন বরণ করার প্রাক্কালেও মায়ের সুখদুঃখের চিন্তা তাঁর এতখানি মন জুড়ে ছিল। তবু অনুকম্পার দোহাই দিয়ে তাঁর আচরণের ব্যাখ্যা এতদূর পর্যন্ত করা যায় বলে মনে হয় না। আত্মীয়তার বিশেষ বন্ধন এবং স্বল্প কয়েকজন পরিজনের প্রতি বাধ্যবাধকতা স্বীকার না করেও তো তিনি জগৎ জুড়ে অবাধে করুণা-বিতরণ করতে পারতেন! এরূপ ভাবা কিছু অসঙ্গত নয়। আর অল্প কয়েকজন আত্মীয়ের কথা ধরলে বলা যায়, স্বামী বা সন্তানের বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ না করেও তো তিনি অনুকম্পা-পরবশ হয়ে তাঁদের প্রতি সদয়

* লেখকের মূল গ্রন্থ Sri Ramakrishna and Spiritual Renaissance হইতে অনূদিত।

ব্যবহার করতে পারতেন! শ্রীচৈতন্য বা ভগবান বুদ্ধ যেমন করেছিলেন। তাঁদের করুণা সম্বন্ধে তো আর সন্দেহ করার কোন কারণ নেই! জ্ঞানলাভের পর তাঁরা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সপ্রেম, সহৃদয় ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু গৃহস্থের ভূমিকায় অভিনয় করতে চান নি কেউ। সন্ন্যাসের নির্দিষ্ট সীমা শ্রীরামকৃষ্ণ কেন যে অতিক্রম করলেন, তা নির্ধারণ করতে গিয়ে তাঁর হৃদয়স্থ করুণাকেই এর কারণ বলে স্থির করলে বাস্তবিকই তা যথেষ্ট হবে না। এর কারণ খুঁজতে গেলে যেতে হবে আরো গভীর প্রদেশে।

পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখে এসেছি, শ্রীরামকৃষ্ণ জগৎকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতেন; মূল অজ্ঞান বা মায়ার শৃঙ্খলে আবদ্ধ সাধারণ লোকের তো কথাই নাই, তোতাপুরীর মত মুক্ত পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গেও এ দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যবধান বিরাট। নিত্য ও লীলা—উভয়ের মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরকে সমভাবে প্রত্যক্ষ করতেন। তাঁর এই ভাবমুখে (ভাব ও ভাবাতীত ভূমির সঙ্গমস্থলে) অবস্থানই সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য আশ্রমদ্বয়ের আপাতবিরোধী জীবন-পরিকল্পনাকে একটি অখণ্ড সামঞ্জস্যের ভাবে গেঁথে দিতে সহায়তা করেছিল; এই অনবদ্য, অনুপম, অভূতপূর্ব সামঞ্জস্য উভয় জীবনধারার আদর্শকে সমান স্বচ্ছতায় ও সমান পরিপূর্ণতায় প্রকট করে তুলেছিল। এ বিষয়ে আলোক-সম্পাত করার মত একটা ঘটনার উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে নিজ জননীর মৃত্যুর পর খাঁটি গৃহস্থের মত একদিন তিনি জল নিয়ে তর্পণ করতে যাচ্ছিলেন; কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টাতেও কিছুতেই তা করে উঠতে পারলেন না। তর্পণের জন্য বদ্ধাঞ্জলি হয়ে জল তুলে নেবামাত্র তাঁর হাতের আঙুল আপনা আপনি ফাঁক হয়ে গিয়ে সব জল হাত থেকে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তাঁর মনে হল, তিনি যে সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীকে মৃত পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করতে নাই! সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ মিশে একীভূত হয়ে গেলে কি রূপ নেয়, তার একটা নিখুঁত চিত্র ফুটে উঠেছে এ ঘটনায়

জগৎকে তার সমগ্র বৈচিত্র্যসহ তিনি গ্রহণ করেছিলেন; কারণ সমস্ত বৈচিত্র্যের অন্তরালে তিনি জগন্মাতার খেলা দেখতে পেতেন, দেখে আনন্দে বিভোর হতেন। জগন্মাতাই তো তাঁর আত্মীয় সেজে নিজেরই নাটকের অভিনয়ে নিজে নেমেছেন! এসব তিনি সাক্ষাৎ দেখতেন; আর নাটকের বিভিন্ন অভিনেতাদের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে, আপন আপন ভূমিকায় তাঁদের স্বচ্ছন্দে অভিনয় করার সুযোগ দিয়ে, এই দিব্য লীলার রস বজায় রাখতে সর্বান্তঃকরণে সচেষ্ট হতেন। মাতা, পত্নী, ভাইপো, ভাইঝি প্রভৃতি বিভিন্ন মুখোসগুলির অন্তরালে মা-কালীকেই দেখতে পেতেন তিনি। কাজেই তাঁর সঙ্গে যার যা সম্পর্ক ছিল, সেটা মেনে চলাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। একজন আদর্শ সন্ন্যাসী হয়েও গৃহস্থের সাজে সেজে রঙ্গমঞ্চে নেমে তিনি নিপুণ অভিনেতার মতই নিজ ভূমিকার অভিনয় করেছিলেন। আত্মীয়গণ তাঁর কাছ থেকে ভালাবাসা, মনোযোগ ও আন্তরিক সেবা যতটা আশা করা যেতে পারে ততটাই পেয়েছিলেন। তবে একথাও সত্য যে, গৃহস্থের ভূমিকায় অভিনয় করার সময়ও এমন কিছু তিনি করতে পারতেন না, অভিনেতার পোষাকের ভিতরকার সন্ন্যাসীটির মর্মে যা আঘাত করতে পারে। তর্পণ করার ব্যাপারে এটা আমরা লক্ষ্য করেছি; নিজ পত্নীর প্রতি আচরণেও আমরা তা দেখার সুযোগ পাব আবার। তাছাড়া, তিনি যে মুক্ত

স্পর্শ করতে পারতেন না, অর্থসঞ্চয়ের চিন্তাতেও তাঁর প্রকৃতি যে প্রতিবাদ করে উঠত, তাঁর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য জনৈক মাড়োয়ারী ভক্ত তাঁকে দশহাজার টাকা দিতে চাইলে তিনি যে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, তাঁর মুখ থেকে যে পরিহাস-ছলেও মিথ্যা কথা বের হত না, ধূর্ত বিষয়ী লোকের সংস্পর্শ যে তাঁর কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর বোধ হত, রমণীমাত্রেই—এমন কি পতিতা রমণীর মধ্যেও তিনি যে মা-কালীকে দেখতে পেতেন, কখনো তার ব্যতিক্রম হত না, এবং ইন্দ্রিয়জগতের স্থূল বিষয় দূর হতেও তিনি যে স্পর্শ করতে পারতেন না—এ সব ঘটনা থেকেই অভ্রান্তরূপে প্রমাণিত হয় যে, গৃহস্থের বহিরাবরণের অভ্যন্তরে তাঁর যে হৃদয়টি ছিল, সন্ন্যাসধর্মাদর্শের সুরের খুব উঁচু পর্দায় তা বাঁধা ছিল স্থায়িভাবে। এভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন হয়ে উঠেছিল সামঞ্জস্যের অতুলনীয় সৃষ্টি—গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস, এ-দুটি বিপরীতমুখী জীবনযাত্রা-প্রণালীর অনন্যসাধারণ আদর্শের সমন্বয়-সৌধ, যার দুটি অংশের প্রত্যেকটিই ছিল তার নিজস্ব ভাবের নিখুঁত আদর্শস্থল। এই অপূর্ব জীবনকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে নিজ নিজ জীবন গঠন পূর্বক পূর্ণতা লাভ করিতে পারেন গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয়েই।

শ্রীরামকৃষ্ণের জননী চন্দ্রাদেবী প্রথম দুই পুত্রের এবং এক পুত্রবধূর মৃত্যুতে একেবারে ভেঙ্গে পড়েন; তোতাপুরীর আগমনের কিছু পূর্বে দক্ষিণেশ্বরে এসে কালীবাড়ীর পবিত্র পরিবেশে তাঁর একমাত্র জীবিত পুত্র শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে তিনি জীবনের বাকী কয়টা দিন কাটাচ্ছিলেন। মথুরবাবু সসম্মানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, নহবতের ঘরে তাঁর স্থায়িভাবে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাঁর জীবনযাত্রার যৎসামান্য প্রয়োজন মথুরবাবুই মিটিয়ে দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রতি সারাক্ষণ দৃষ্টি রাখতেন, বিমল ভালবাসা ও শ্রদ্ধা দিয়ে তাঁর মনের জ্বালা জুড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে কাছে পেয়ে চন্দ্রাদেবী তৃপ্ত হয়েছিলেন; কর্তব্যপরায়ণ পুত্রের কাছ থেকে যা কিছু আশা করা যায়, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে নিজ দেহ-ত্যাগের পূর্বদিন পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে তা সবই তিনি পেয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগিনেয় (খুড়তুতো ভগ্নীর পুত্র) হৃদয় বহুকাল তাঁর সঙ্গে কাটিয়েছিলেন। হৃদয় মামার সেবা করতেন, মামার স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখতেন, মাঝে মাঝে মন্দিরের কাজেও তাঁকে সহায়তা করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ভালবাসায় ডুবিয়ে রাখতেন, তাঁর মঙ্গলের জন্য খুব উৎকণ্ঠাও প্রকাশ করতেন। মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রামলালও এসে দক্ষিণেশ্বরে বাস করতে লাগলেন। যুবক রামলালও খুল্লতাতের কোমল ও সস্নেহ যত্নলাভে বঞ্চিত হলেন না। তাঁকে মাতুল বা খুল্লতাত ভেবেই তাঁর সঙ্গে তদনুরূপ আচরণ করতে অনুমতি দিলেন তিনি হৃদয় ও রামলালকে। তাঁর মন কত উর্ধ্বে উঠে থাকত, তবু আত্মীয়দের প্রতি তাঁর মনোভাবে কখনো কোন অস্বাভা-বিকতা দেখা যেত না। ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যুতে তিনি করুণভাবে বিলাপ করছেন—এ দৃশ্যও দেখা গেছে। গৃহস্থের মত আচরণ করার ব্যাপারে এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হবার সময়ও তাঁর অভ্যন্তরস্থ সন্ন্যাসীটি গৃহস্থের পোষাকের আড়ালে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে লুকিয়ে রাখত।

নিজ পত্নীর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণ কিন্তু আর সব কিছুকেই হার মানিয়ে দিয়েছে। এ আচরণ অদ্ভুত, অদৃষ্টপূর্ব এবং স্পষ্টতই মানবের ধারণার অতীত। একজন পূর্ণ জিতেন্দ্রিয় আদর্শ সন্ন্যাসীকে স্বামীর ভূমিকা গ্রহণ করতে কে আর

করে দেখেছে? এই সমন্বয়সাধন দুটি বিপরীত মেরুপ্রান্তকে একত্র করার মতই অদ্ভুত! এই অতিমানব-দম্পতীর নিষ্কলঙ্ক অন্তরে বয়ে চলত কামগন্ধহীন প্রেমের ধারা। সমস্ত দিক দিয়েই দেখা যায়, বিমল পবিত্র এ দুটি আত্মার মিলন অনন্যসাধারণ; দেহাতীত প্রেমের যে কল্পনা আমরা করে থাকি, তাই যেন রক্তমাংসের শরীরে রূপ পরিগ্রহ করেছে এখানে। এ দুটি পবিত্র হৃদয়ের কোনটিতেই বিন্দুমাত্র লালসারও কোন স্থান ছিল না।

আধুনিক যৌন-মনোবিজ্ঞানের কয়েকটি আবিষ্কার দেখে অনেকের ধারণা জন্মে যে অখণ্ড ব্রহ্মচর্যপালন মানবপ্রকৃতির প্রয়োজনহীন উৎপথগামিত্ব মাত্র। জোর করে যৌনপ্রবৃত্তির দমনকে কয়েকটি মানসিক ব্যাধির কারণ বলে জানা গেছে। কিন্তু প্রবৃত্তিকে জোর করে মনের মধ্যে চেপে রেখে দেওয়া, আর উচ্চতর মনোবৃত্তি সহায়ে মন থেকে তাকে মুছে ফেলা, এ দুটির মধ্যে যে পার্থক্য আছে, সেকথা যেন আমরা না ভুলি। মন থেকে কামেচ্ছা চলে গেলে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়া তো দূরের কথা, শরীর ও বুদ্ধিবৃত্তি তার ফলে প্রভূত পরিমাণে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। পরজীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন যে, দ্বাদশ বৎসর অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করতে পারলে মানুষ অতিমানবীয় শক্তির অধিকারী হয়। আশা করা যায়, আধুনিক বিজ্ঞানের এই নতুন শাখাটি কামপ্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে উন্নীত সম্পূর্ণ সুস্থ লোকদের নিয়ে পরীক্ষা করে এ সত্যটি আবিষ্কার করে ফেলবে এবং তার ফলে এই জাতীয় লোকের মন থেকে ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে অসম্বদ্ধ ধারণা দূরীভূত হবে।

আরো একদল লোক আছেন যাঁরা অতীন্দ্রিয়-বাদে বিশ্বাস করেন। কিন্তু ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা যৎসামান্য। তাঁদের ধারণা, ঈশ্বরীয় অনুভূতি লাভের জন্য অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালনের কোন প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরানুভূতির মধ্যেও বহু স্তর রয়েছে; সব অনুভূতির মূল্য ও তাৎপর্য এক নয়, সত্যের একই পর্যায়ে পড়ে না সবগুলি; কাজেই বেশ বোঝা যায়, বিভিন্ন অনুভূতি লাভের জন্য একই প্রকার মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। ইন্দ্রিয়-সংযমে পূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে না পারলে সর্বোচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক অনুভূতিলাভ অসম্ভব। ফরাসী মহামণ্ডিত রেঁামা রেঁালা বলেছেন, "যৌন-প্রবৃত্তি-সঞ্জাত দৈহিক ও মানসিক অপচয় রোধ করতে পারলে একাগ্র চিত্ত, সঞ্চিত প্রজনন-শক্তি কী যে প্রচণ্ড তেজের উন্মেষ ঘটায়, সেকথা সমস্ত অতীন্দ্রিয়-বাদীরা, অধিকাংশ উচ্চাদর্শবাদীরা, এবং আত্মশক্তির উদ্বোধকদের মধ্যে মহামানবেরা সহজাত প্রবৃত্তিবশেই সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।" পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন যে, ভগবানলাভ করতে হলে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে।

যাই হোক, নিজ পত্নীর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণ ছিল কামগন্ধহীন। একদিন শ্রীরাম-কৃষ্ণের পদসেবা করতে করতে সারদামণি তাঁর সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের কি ধারণা তা জানতে চেয়েছিলেন। তৎক্ষণাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিয়েছিলেন, "যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন এবং সম্প্রতি নহবতে বাস করছেন এবং তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলে তোমাকে সর্বদা সত্য সত্য দেখতে পাই।" ভাবতেও শ্বাস রুদ্ধ হয়, কত সহজভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ পত্নীর মধ্যে জগন্মাতাকে দেখতেন, অথচ গভীর নিশীথে তাঁকে নিজের পদসেবা করার অনুমতি দিয়ে কত নিখুঁতভাবে

স্বামীর ভূমিকায় অভিনয়ও করে চলতেন সেই সঙ্গে। বোধ হয় জগন্মাতা হতে নিজেকে ঈষন্মাত্রও পৃথক ভাবতেন না তিনি; তা না হলে পত্নী সেজে এলেও তাঁকে পাদস্পর্শ করতে দেওয়া কখনো সম্ভব হত না তাঁর পক্ষে। দৃশ্যমান সমগ্র বিশ্বের মধ্যে এবং তাঁর নিজেরও মধ্যে বাস্তবিকই তিনি জগন্মাতার এক অখণ্ড প্রকাশ প্রত্যক্ষ করতেন।

তিনি যে স্বীয় পত্নীর আবরণের ভেতর মা-কালীকে দেখতে পেতেন, একবার তার অতি গভীর স্বীকৃতিও দিয়েছিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মে মাসের অমানিশায় তিনি সারদা-দেবীকে যথাবিধি নিজের সামনে বসিয়ে তন্ত্রনিবদ্ধ ষোড়শীপূজার সমস্ত বিস্তারিত পদ্ধতির অনুষ্ঠানসহ পূজা করেছিলেন। পূজার সময় সারদাদেবী প্রথম থেকেই অতীন্দ্রিয় ভাবে আবিষ্ট ছিলেন; পূজা শেষ হতেই শ্রীরামকৃষ্ণও দিব্যভাবে সমাহিত হয়ে যান। এই দেবদম্পতী এভাবে কিছুকালের জন্য অতীন্দ্রিয় ভূমিতে চলে গিয়েছিলেন, এবং বোধহয় উভয়ের দিব্য মিলন ঘটেছিল পূর্ণ একত্বরূপ জ্ঞানাতীত ভূমিতে উঠে একীভূত হয়ে।

তবু সারদাদেবীকে জগন্মাতারূপে দেখা এবং সেভাবে সত্যই তাঁকে পূজা করা সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে নিজের পত্নীরূপেও দেখতেন। শিষ্যদের কাছে, বিশেষ করে গৃহস্থ ভক্তদের কাছে কখনো কখনো রহস্যচ্ছলে তিনি বলেছেন, 'আমার আবার বিয়ে হল কিজন্যে বল দেখি? একবার ভাব ত, স্ত্রী না থাকলে আমার চলত কি করে, এ দুর্বল শরীরটার দিকে নজর রাখত কে? আমার পেটে কি সয় না সয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে এত যত্ন করে রান্না করে দিত কে?' যাই হোক, পত্নীর প্রতি খুব স্নেহপরায়ণ ছিলেন তিনি, এবং নারীত্বের আদর্শে তাঁকে গড়ে তোলার জন্য বিশেষ মনোযোগ দিতেন। সারদামণি যখনই এসে তাঁর সঙ্গে বাস করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষ যত্ন ও আন্তরিকতা নিয়ে আধ্যাত্মিক ও সাংসারিক সর্ববিষয়ে তাঁকে শিক্ষাদান করেছেন। পত্নীর কাছ হতে তিনি পেতেন অপরিসীম পবিত্র ভালবাসা, একান্ত শ্রদ্ধা ও আন্তরিক সেবা। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের কামারপুকুর-বাসের পর এই দেবদম্পতী দক্ষিণেশ্বরে মাঝে মাঝে মিলিত হয়ে পরস্পরকে ভালবাসা ও ভক্তির অপূর্ব বন্ধনে বেঁধে একত্রে বাস করে-ছিলেন ৮৭২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস হতে শুরু করে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগ পর্যন্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীতে "শ্রীশ্রীমা" নামে পরিচিতা সারদাদেবী দক্ষিণেশ্বরে বাসকালে যে স্বল্প কয়েকরাত্রি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে একই ঘরে রাত্রি যাপন করার অনুমতি পেয়েছিলেন, সে সময়কার নিজ মনের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "সে যে কি অপূর্ব দিব্যভাবে থাকতেন, তা বলে বোঝাবার নয়! কখন ভাবের ঘোরে কত কি কথা, কখন হাসি, কখন কান্না, কখন একেবারে সমাধিতে স্থির হয়ে যাওয়া—এই রকম সমস্ত রাত! সে কি এক আবির্ভাব-আবেশ, দেখে ভয়ে আমার সর্বশরীর কাঁপত, আর ভাবতুম কখন রাতটা পোহাবে! পরে কখন তাঁর সমাধি হয় ভেবে আমি সারারাত জেগে থাকি টের পেয়ে তিনি নহবতের ঘরে আমার বিছানা পাঠিয়ে দেন।"

সারদাদেবীও শ্রীরামকৃষ্ণকে মা-কালীরূপে দেখতেন, এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এভাবটি বজায় রেখেছিলেন; শুনতে যতই অদ্ভুত বলে মনে হোক, এ ঘটনা সত্য। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের সময় অনাথা বালিকার মত তিনি কেঁদে উঠেছিলেন,

"মা-কালী গো, কি দোষে আমায় ছেড়ে গেলে গো?" তবে অভিনয়কালে তিনি স্ত্রীর ভূমিকা পুরোপুরি বজায় রেখে চলতেন। স্বামীর দেহত্যাগে বিধবা হয়েছেন ভেবে তিনি বিধবার বেশ ধারণ করতে আরম্ভ করেছিলেন; পরে নিজ সান্নিধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্য উপস্থিতি অনুভব করার ফলে শেষ পর্যন্ত অবশ্য তা আর করা হয়ে ওঠেনি।

এসব ঘটনায় বুদ্ধি আরো গুলিয়ে যায়, আরো কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ি আমরা। জগন্মাতা, প্রিয়তমা পত্নী ও প্রিয় শিষ্যের সর্বত্রসমভাবাপন্ন সমবায়ে কি বস্তু যে হয়, তা কল্পনায় আনা দুরূহ। আবার জগন্মাতা, প্রেমাস্পদ স্বামী ও গুরুর একত্র সমাবেশ কেমন দেখায়, তা-ও ধারণা করা যায় কি? এসব নিশ্চয়ই মানুষের ধারণাতীত; ভাষা এসব প্রকাশ করতে সম্পূর্ণ অপারগ। এসবের স্বরূপ নির্ধারণ করতে গিয়ে মানুষ নিজ নিজ রুচি অনুসারে 'অসাধারণ', 'অতিমানবিক', 'অস্বাভাবিক', এমন কি 'ঈশ্বরীয়' পর্যন্ত বিশেষণগুলি ব্যবহার করতে পারে; কিন্তু তাতেও বোধ হয়, যে বহুবিধ ভাবের সমন্বয়-সঞ্জাত রাগ এই দেবদম্পতীর দৃষ্টিভঙ্গীকে অনুরঞ্জিত করে তুলেছিল, তার সম্বন্ধে কোন ধারণা সে কামলিপ্ত মানুষের মনে এনে দিতে পারবে না। একটা জিনিস অবশ্য খুবই পরিষ্কার; এই অভূতপূর্ব সমন্বয় যে গৃহস্থ এবং সন্ন্যাসী উভয়ের জন্যই কামবিরহিত জীবনা-দর্শের ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়ে গেছে, এ কথাটা খুবই ভালভাবে বোঝা যায়। এই সমন্বয় গৃহস্থের সংযমের আদর্শকে উন্নত করে দিব্য পবিত্রতার পর্যায়ে তুলে ধরেছে, আর সন্ন্যাসীর দেহজয়ের আদর্শকে প্রলোভনের অগ্নিপরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ করিয়ে কামগন্ধ-হীনতার অত্যুচ্চ শিখরে উন্নীত করেছে। আর এ সমন্বয় বিধান করেছেন দম্পতীর উভয়েই, যাতে স্ত্রী-পুরুষ উভয় শ্রেণীর মানুষই ইন্দ্রিয়জয়ে সিদ্ধকাম হবার জন্য ব্যক্তিগতভাবে প্রয়োজনীয় আলোর সন্ধান পেতে পারে।

অসীমের অভিযান

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র

পারাবার-তলে, তুহিন-শিখরে
সন্ধানী কারে খুঁজে খুঁজে ফেরে?
কিসের নেশায় দুঃসাহসীর
নির্ভীক অভিযান
মহাকাশ বুকে? ছুটে ছুটে ফিরে
জ্ঞানের সীমিত বৃত্তেরে ঘিরে
মর্ত্য-মানব পেয়েছে কি কভু
অসীমের সন্ধান?
তবু চলে তার যুগ যুগ ধরি'
দূর দূর অভিযান।

বাহিরে খুঁজিয়া মেলেনি এখনো
অসীমের সন্ধান।
বাহির হইতে ফিরায়ে আঁখিরে
মানসসায়র-অতলগভীরে
অন্তহীনেরে ধরিবার তরে
ডোবে যেবা প্রাণপণ,
তৃপ্ত তাহার জ্ঞানের পিপাসা—
অসীমে জানার অফুরান আশা,
সীমিত বৃত্ত মুছিয়া ফেলার
দুর্জয় অভিযান।

বস্তু ও শক্তি

ডক্টর শ্রীবিশ্বরঞ্জন নাগ

'বস্তু (Matter) কি ?' এই প্রশ্নের উত্তরে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, দৃষ্টিগ্রাহ্য বা অনুভবযোগ্য অস্তিত্ববান সব পদার্থের অন্তর্নিহিত মূল অংশটিই বস্তু। এই বস্তুর স্বরূপ বুঝতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন বিভিন্ন পদার্থের বস্তুর পরিমাণ বার করবার জন্য কোন মাপকাঠি ঠিক করা। এক ঘনমিটার ও পাঁচ ঘনমিটার আয়তনের দুটি লোহার তালে বস্তুর পরিমাণ যে সমান নয়, এটা সহজেই বোঝা যায়। এও বলা যায় যে, পাঁচ ঘনমিটার আয়তনের লোহার তালে এক ঘন মিটার আয়তনের লোহার তালটির পাঁচগুণ পরিমাণ বস্তু আছে। কোন একক (unit) ঠিক করে এবং জিনিসগুলির আয়তন ও এককের আয়তন তুলনা করে এভাবে একই ধরনের বিভিন্ন জিনিসে বস্তুর পরিমাণ ধারণা করা যেতে পারে। কিন্তু এক ঘন মিটার জল ও এক ঘন মিটার লোহার বস্তুর পরিমাণ তুলনা করা সাধারণভাবে সম্ভব মনে হয় না। বিভিন্ন জিনিসের বস্তুর পরিমাণ নির্ণয় করতে হ'লে এমন কোন গুণ জানা দরকার যা পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে না। পদার্থের আকার, আয়তন, রং, কাঠিন্য, ভার ইত্যাদি বিভিন্ন গুণ নিয়ে আলোচনা করলে সহজেই বোঝা যায় যে পরিমাণের সঙ্গে বস্তুর আকার, আয়তন, রং বা কাঠিন্যের কোন সম্পর্ক নেই; কেননা এই সব গুণই পরিবর্তিত হ'তে পারে। একমাত্র ভারই পদার্থটির বাহ্যিক অবস্থার উপর নির্ভর করে না। তাপমাত্রা, আকার বা অবস্থার পরিবর্তন হলেও ভার একই থাকে। তাই প্রথমদিকে ভারের মাধ্যমেই বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন জিনিসের বস্তুর পরিমাণের তুলনা করতেন। পৃথিবী জিনিসটিকে কত জোরে আকর্ষণ করে, ভার (Weight) হ'ল তারই পরিমাপ। নির্দিষ্টভাবে ভার মাপার জন্য স্প্রীংএর একটি বিশেষ গুণের সাহায্য নেওয়া হয়। স্প্রীংএর গুণ হ'ল এই যে, স্প্রীংএর দৈর্ঘ্য বাড়াতে হ'লে একটি নির্দিষ্ট বল (Force) প্রয়োগ করতে হয়। স্প্রীংএ যখন কোন জিনিস ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তখন স্প্রীংটির যে দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন হয় তা পৃথিবীর আকর্ষণের বল নির্দেশ করে; এই দৈর্ঘ্যের পরিমাপ থেকে বিভিন্ন জিনিসের ভারের পরিমাপ করা যায়। এভাবে ভার মাপা হ'লে দেখা যায়, একই জিনিসের ভার পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম হয়। কাজেই ভারকেও বস্তুর পরিমাণের নির্দেশক বলে ধরে নেওয়া যায় না। সাধারণভাবে মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের কোন গুণ থেকেই কোন জিনিসের বস্তুর পরিমাণ ঠিক করা যায় না।

বল ও বস্তুর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া নিয়ে অনুসন্ধান করে নিউটন বস্তুর গতির কয়েকটি সূত্র আবিষ্কার করেন। এর দ্বিতীয় সূত্র হ'ল : কোন জিনিসের উপর বল প্রয়োগ-করা হ'লে জিনিসটির যে ত্বরণ (Acceleration) হয়, তা বলের সমানুপাতিক। যদি বিভিন্ন জোরের বল প্রয়োগ করে ত্বরণ মাপা হয় তাহলে দেখা যায় ত্বরণ ও বলের ভাগফল একটি ধ্রুবক (Constant)। ধ্রুবকটি বিভিন্ন জিনিসে বিভিন্ন রকম। এই ধ্রুবকের নাম দেওয়া হয়েছে ভর (Mass)। বিভিন্ন জিনিসের ভরের তুলনা করা যেতে

পারে স্প্রীং-এরই সাহায্যে। যে দুটি জিনিসের ভরের তুলনা করতে হবে, সেই জিনিস দুটিকে যদি পর্যায়ক্রমে একটি স্প্রীংএর ওপর এমন ভাবে ধাক্কা দেওয়া যায় যাতে স্প্রীংটির দৈর্ঘ্যের সম-পরিমাণ পরিবর্তন ঘটে, তাহলে তাতে যে গতিবেগ হয় তার অনুপাতই হবে জিনিস দুটির ভরের ব্যস্ত অনুপাত (Inverse ratio)। এভাবে কোন একক ভরের অনুপাতে বিভিন্ন জিনিসের ভরের পরিমাণ ঠিক করা যায়। আবার তুলাদণ্ডের সাহায্যে যখন দুটি জিনিসকে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে সমান উচ্চতায় রেখে তুলনা করা হয়, তখনও প্রকৃতপক্ষে ভরেরই তুলনা হয়। বিভিন্ন পদার্থের দোলক নিয়ে পরীক্ষা করে নিউটন দেখান যে, কোন জিনিসের উপরে পৃথিবীর আকর্ষণের বল বা জিনিসটির ভার পৃথিবী-কেন্দ্র থেকে দূরত্বের উপর নির্ভরশীল হলেও তা ভরের সমানুপাতিক। পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে একই দূরত্বে রেখে যখন তুলাদণ্ড দিয়ে জিনিস দুটির উপর মাধ্যাকর্ষণের বলের তুলনা করা হয় তখন প্রকারান্তরে ভরই মাপা হয়। তাই সাধারণভাবে তুলাদণ্ডের সাহায্যেই ভর মাপা যায়। ভরের একক হিসাবে নির্দিষ্ট হয়েছে প্যারিসে রাখা প্লাটিনাম-ইরিডিয়ামের তৈরী একটি ধাতব খণ্ডের ভর যার নাম হ'ল 'কিলোগ্রাম'। নিউটন এই ভরকেই বলেছেন বস্তুর পরিমাণ। নিউটনের সংজ্ঞানুসারে যখন বলা হয় যে, এক কিলোগ্রাম লোহা ও এক 'কিলোগ্রাম' জলে একই পরিমাণের বস্তু আছে, তখন শুধু এইটুকুই বোঝান হয়ে থাকে যে, ঐ পরিমাণ লোহা ও জলে সমান বলপ্রয়োগ করলে সমান ত্বরণ হবে; সাধারণভাবে এক কিলোগ্রাম লোহা ও জলের ভরের সমতা যে মূল বস্তুর (Matter) পরিমাণেরও সমতা নির্দেশ করছে তা বলা হ'ল না। কিন্তু বিভিন্ন জিনিসের ভর নিয়ে পরীক্ষা করে ভরের কতকগুলি বিশেষত্ব দেখা গেছে যা থেকে সিদ্ধান্ত করা হয় ভর বাস্তবিকই বস্তুর পরিমাণ নির্দেশ করে।

করে দেখা গেছে যে পদার্থের, সব রকমের পরিবর্তনেই পদার্থের মোট ভর অপরিবর্তিত থাকে। প্রধানতঃ দুরকমের পরিবর্তন পদার্থের হ'তে পারে। একরকম হ'ল বহিরঙ্গ রূপের পরিবর্তন। যেমন কঠিন বরফ তরল জলে পরিবর্তিত হয়, আবার তরল জল বাষ্পে পরিণত হয়। দেখা যায় এক কিলোগ্রাম বরফ জল হ'য়ে গেলে সেই জলের ভরও হবে এক কিলোগ্রাম। আবার সেই জল বাষ্প হ'লে বাষ্পের ভরও হবে এক কিলোগ্রাম। বহিরঙ্গ রূপের পরিবর্তনের আর একটি উদাহরণ হ'ল আকারের পরিবর্তন। এক কিলোগ্রাম লোহার একটি চতুষ্কোণ পিণ্ডকে যদি গলিয়ে বর্তুলাকার করা হয় বা গুঁড়িয়ে কণায় পরিণত করা হয় তো দেখা যাবে বর্তুলটির বা কণাসমষ্টির ভরও হবে এক কিলোগ্রাম। পদার্থের দ্বিতীয় ধরনের পরিবর্তন হ'ল রাসায়নিক পরিবর্তন। কার্বন ও অক্সিজেন পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড্ তৈরী করে। যদি ক-গ্রাম কার্বন খ-গ্রাম অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হয় তো দেখা যায় সব সময়েই (ক + খ) গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরী হয়। এমনি যত রকমের রাসায়নিক পরিবর্তন হয় তার সবগুলিতেই দেখা যায় পরিবর্তনের পূর্বের পদার্থগুলির ভর পরিবর্তনের পরের পদার্থগুলির ভরের সমান হয়।

পদার্থের বিভিন্ন পরিবর্তনে ভরের ধ্রুবতা (Conservation of mass) প্রকৃতির একটি মূল নিয়ম। এই নিয়মটি থেকে এই সিদ্ধান্ত

করা যেতে পারে যে, ভর পদার্থের অন্তর্নিহিত মূল বস্তুর পরিমাণই নির্দেশ করে; কেননা এই বিভিন্ন পরিবর্তনে মূল বস্তুর পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকাই স্বাভাবিক। কাজেই বল ও ত্বরণের অনুপাত থেকে বা সাধারণ তুলা-দণ্ডের সাহায্যে নির্ধারিত ভরের স্বরূপ জানতে পারলে বস্তুর স্বরূপও জানা হবে।

পদার্থজগতে বস্তু ব্যতীত প্রকৃতির আর এক ধরনের প্রকাশ দেখা যায়, যার নাম হ'ল শক্তি (Energy)। আলো (Light), তাপ (Heat), শব্দ (Sound), বিদ্যুৎ (Electricity) ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে শক্তির প্রকাশ দেখা যায়। এই বিভিন্ন ধরনের শক্তিকে মোটামুটি দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। এক হ'ল বস্তু-আশ্রয়ী শক্তি। এই পর্যায়ে পড়ে গতিশীল ও ঘূর্ণায়মান বস্তুর শক্তি; শব্দ; তড়িৎজনিত (Charged), চুম্বকজনিত (Magnetic), অবস্থানজনিত (Potential) এবং বস্তুর গঠন (Molecular) বা আকারগত শক্তি (Energy of formation)। দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ে বস্তু-নিরপেক্ষ শক্তি—যেমন আলো, তাপ, বেতার-তরঙ্গ। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের শক্তিগুলি বস্তুহীন জায়গায় বা শূন্যে (Vacuum) প্রকাশিত হ'তে পারে। দুই পর্যায়ের বিভিন্ন শক্তি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এদের প্রকাশ বিভিন্ন হ'লেও মূলতঃ সব শক্তিই এক। এক ধরনের শক্তি অন্য ধরনের শক্তিতে সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হ'তে পারে। প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনায় সব সময়েই এই শক্তির রূপান্তর ঘটছে। এক কথায় বলা যেতে পারে শক্তির রূপান্তরই বিশ্বকে নিত্য নূতন রূপ দিচ্ছে। দেখা যায়, সব রকমের রূপান্তরেই ভরের ন্যায় শক্তিরও মোট পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে। একটি উদাহরণ এই প্রসঙ্গে দেওয়া যেতে পারে। যদি কোন ভারী বস্তুকে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে কোন উঁচু জায়গায় রাখা হয় তাহ'লে বস্তুটির কাজ করার ক্ষমতা জন্মে বা বস্তুটিতে শক্তি সঞ্চারিত হয়। এই শক্তিকে বলা হয় অবস্থান-জনিত শক্তি (Potential Energy)। বস্তুটিকে উচ্চস্থানটি থেকে ছেড়ে দেওয়া হ'লে বস্তুটি পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে গতিশীল হয়। এই গতিশীল অবস্থায় বস্তুটির গতিজনিত শক্তি (Kinetic Energy) হয় এবং পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা কমে যায় ব'লে অবস্থানজনিত শক্তি কমে যায়। যতই বস্তুটি পৃথিবীপৃষ্ঠের দিকে এগোতে থাকে ততই বস্তুটির অবস্থান-জনিত শক্তি কমতে থাকে এবং গতিজনিত শক্তি বাড়তে থাকে। কিন্তু দেখা যায়, এই দুরকমের শক্তির যোগফল সবসময়েই আগেকার অবস্থানজনিত শক্তির সমান থাকে। বস্তুটি যখন পৃথিবীপৃষ্ঠে পৌছায় তখন অবস্থানজনিত ও গতিজনিত শক্তি লোপ পায়। কিন্তু ঐ পৌছানর মুহূর্তে পৃথিবীপৃষ্ঠের সহিত সংঘাতে শব্দ, তাপ ও আলোর সৃষ্টি হয় বা পৃথিবীর ও বস্তুটির আকারের পরিবর্তন হয়ে আকারজনিত শক্তির পরিবর্তন হয়। এই শব্দ, আলো, তাপ ও আকারগত শক্তি যদি মাপা হয় তো দেখা যায় এই শক্তির মোট পরিমাণ প্রথমকার অবস্থানজনিত শক্তির পরিমাণের সমান।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত যতরকম পরীক্ষা হয়েছে, সর্বক্ষেত্রেই দেখা গেছে সবরকম পরিবর্তনে ভরের মোট পরিমাণ এবং শক্তির মোট পরিমাণ ধ্রুব থাকে। তাই বিজ্ঞানে ভরের ধ্রুবতা (Conservation of mass) ও শক্তির ধ্রুবতা (Conservation of energy) প্রকৃতির দুটি মূল নিয়ম বলে স্বীকৃত হয়েছিল। ভর ও শক্তিকে মনে করা হ'ত সম্পূর্ণরূপে আলাদা প্রকৃতির দুরকমের প্রকাশ। ভর

বস্তুর পরিমাণ নির্দেশ করে। শক্তি বস্তুর গতি, অবস্থান বা উচ্চতার পরিবর্তন করে। শক্তি আলো, তাপ বা বেতার-তরঙ্গ রূপেও প্রকাশ পেতে পারে। শক্তি রূপান্তরিত হ'তে পারে এবং বস্তুও রূপান্তরিত হ'তে পারে। কিন্তু বস্তু কখনও শক্তিতে বা শক্তি কখনও বস্তুতে পরিণত হ'তে পারে না। রূপান্তরকালে সবসময় শক্তি অন্যরকমের শক্তিতেই রূপান্তরিত হয়, এবং বস্তু অন্য ধরনের বস্তুতেই রূপান্তরিত হয়।

বস্তু ও শক্তির ধ্রুবতা-সম্পর্কিত এই ধারণা বিংশ শতাব্দীতে আমূল পরিবর্তিত হয়। ধারণার এই পরিবর্তন আসে আইনষ্টাইনের মনীষা থেকে। বস্তু ও শক্তির নিজস্ব আলাদা অস্তিত্ব থাকলেও বস্তু-আশ্রয়ী শক্তি ও বস্তুর ভরের সঙ্গে একটি সম্পর্ক আছে। নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্র থেকে কোন বস্তুর গতিজনিত শক্তি, ভর ও গতিবেগের সম্পর্ক বার করা যায়। দেখা যায় যদি কোন বস্তুর ভর হয় m কিলোগ্রাম, গতিবেগ হয় প্রতি সেকেণ্ডে v মিটার তাহ'লে এর গতিজনিত শক্তি (E) হ'ল $E=\frac{1}{2}mv^2$, নিউটনের সূত্রে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে কোন জিনিসের ভর গতিহীন ও গতিশীল অবস্থায় সমান থাকে। গতিহীন অবস্থায় জিনিসটির কোন শক্তি থাকে না—থাকে শুধু ভর। শুধুমাত্র গতিশীল অবস্থায় জিনিসটির শক্তি থাকে যা গতিবেগ ও ভরের দ্বারা নির্দিষ্ট। এই নিয়মানুসারে যদিও দেখা যায় গতিজনিত শক্তি ভরের উপরে নির্ভরশীল তবুও শক্তি ও ভরের নিজস্বতা বজায় থাকে। আইনষ্টাইনের তত্ত্বানুসারে এই নিজস্বতা আর রইল না, সময় ও দৈর্ঘ্যের মাপ সম্পর্কে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে আইনষ্টাইন দেখলেন যে, বস্তুর ভর বস্তুর গতিবেগ-নিরপেক্ষ নয়। আইনষ্টাইনের তত্ত্বানুসারে যদি কোন বস্তুর গতিহীন অবস্থায় ভর হয় m_0, তাহ'লে বস্তুটির গতিবেগ v হ'লে ভর (m) হবে $m=m_0(1-v^2/c^2)^{-\frac{1}{2}}$, c হ'ল আলোর গতিবেগ। বস্তুটির শক্তি হবে mc^2। আইনষ্টাইনের এই তত্ত্বের সহজ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়, বরং একে গাণিতিক সিদ্ধান্ত হিসাবেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই তত্ত্বানুসারে দেখা যায়, কোন বস্তুর গতিহীন অবস্থাতেও শক্তি আছে যার পরিমাণ হ'ল m_0c^2। শক্তির যতরকমের প্রকাশ জানা ছিল, তা থেকে এই গতিহীন অবস্থার শক্তিকে বোঝা সম্ভব নয়। তাই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে এই শক্তি বস্তুর মূল প্রকৃতির সঙ্গেই জড়িত।

আইনষ্টাইনের এই তত্ত্বানুসারে গতিজনিত শক্তিকে বস্তুর ভরের পরিবর্তন থেকে উদ্ভূত ভাবা যেতে পারে। তাই ভর ও শক্তির নিজস্ব ধ্রুবতা এই তত্ত্বে ভুল ব'লে প্রমাণিত হ'ল। প্রমাণিত হ'ল যে বিশ্বের সব পরিবর্তনে মোট ভর ও শক্তির পরিমাণ যুগ্মরূপে ধ্রুব থাকে। শক্তি যে শুধুমাত্র বিভিন্ন শক্তিতেই রূপান্তরিত হ'তে পারে তাই নয়, শক্তি ভরেও রূপান্তরিত হ'তে পারে। আবার ভরও শক্তিতে রূপান্তরিত হ'তে পারে। এই তত্ত্বানুসারে সিদ্ধান্ত হ'ল বস্তু ও শক্তি অভিন্ন।

বর্তমানে বিভিন্ন পরীক্ষায় আইনষ্টাইনের তত্ত্ব সত্য ব'লে প্রমাণিত হয়েছে। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে, গতিশীল অবস্থায় বস্তুর ভর আইনষ্টাইনের নিয়মানুসারেই পরিবর্তিত হয়। বস্তুর ভর পুরোপুরি বিলুপ্ত হ'য়ে বস্তু-নিরপেক্ষ শক্তি, আলো ও তাপের প্রকাশ হ'তে পারে। আবার বস্তু-নিরপেক্ষ শক্তিরও ভর আছে যা বস্তুর ভরের মতই মাপা সম্ভব। বস্তু ও শক্তির এই অভিন্নতা থেকে 'বস্তু কি?'—এই প্রশ্নের এক ধরনের সমাধান হয়। বলা যায় বস্তুও শক্তির একটি বিশেষ প্রকাশ। শক্তি যেমন আলো- বা তাপরূপে মানুষের অনুভবে আসে তেমনি আবার বস্তুরূপে মানুষের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হয়।

সেণ্ট ফ্রান্সিস ও সাধু নাগমহাশয়

ব্রহ্মচারী গৌরাঙ্গ

[পূর্বানুবৃত্তি]

অন্তরে বিবেক-বৈরাগ্য প্রবল হলে সংসারে থেকে এবং সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়ে— উভয় ভাবেই ভগবান লাভ করা সম্ভব। তবে সংসারে থেকে যাঁরা ভগবান লাভ করেন, অন্তরে তাঁরা সন্ন্যাসীই। সম্পূর্ণ নিরাসক্তি এবং ভগবানে একান্ত নির্ভরতা যাঁদের জীবনে সহজ হয়ে যায়, তাঁদের কোন পথেই ভয় নেই। নাগমহাশয়ের জীবনে আমরা দেখি —অগ্নির লেলিহান শিখা গৃহদাহ করতে এলেও নিশ্চেষ্ট, নির্বিকার ভাব ; সর্পে দংশন করলেও, কোন উদ্বেগ নেই, যেন প্রিয়তমের কাছ থেকে কোন দূত এসেছে। এ হেন শক্তি ঈশ্বরে পূর্ণ নির্ভরতা ছাড়া হয় না। তাই কবি দুঃখময় সংসারপথ বর্ণনান্তে সে পথে চলার উপায় বলেছেন, 'পথ দেখে চল মুখে হরি বল

ফুটিবে না কাঁটা তায় রে ॥'

নাগমহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণকে সন্ন্যাসগ্রহণের অভিপ্রায় জানালে তিনি বলেছিলেন, 'তুমি জনকের মত গৃহস্থাশ্রমে থাকবে। তোমায় দেখে গৃহীরা যথার্থ গৃহস্থ-ধর্ম শিখবে।' আদেশ শিরোধার্য হল। কিন্তু সংসারে যে বড় জ্বালা ও কাঁটার খোঁচা—এর হাত থেকে মুক্তি পাবার উপায়? যিনি পথ জানেন, তিনি ঐ পথে হাঁটবার উপায়ও জানেন। শ্রীরামকৃষ্ণ স্ফুলিঙ্গে ফুৎকার দিয়ে নাগমহাশয়ের মনে দাবানল জ্বালিয়ে দিলেন। উঃ—সে কি ভীষণ জ্বালা! 'হা ভগবান, হা ভগবান'—করে কখনও ধুলায় আছড়ে পড়েন, কখনও কাঁটার উপর পড়ে সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। কেউ যদি জোর করে খাইয়ে দেয় তবে খান। সংসারের অনিবার্য জ্বালাও নাগমহাশয় এভাবে অনুভব করেছিলেন।

ফ্রান্সিস বিচার-কক্ষ থেকে বেরিয়ে বনপথ ধরলেন। পথিমধ্যে একদল দস্যু, 'কে তুমি?' বলে আক্রমণ করল। ফ্রান্সিস উত্তর দিলেন, 'আমি জগদীশ্বরের আদেশবাহক।' ফ্রান্সিসের একমাত্র পরিধেয় ছিল ধর্মাচার্যের প্রদত্ত একটি ঢিলা জামা। দস্যুগণ জামটি কেড়ে নিয়ে তাঁকে একটি তুষারপূর্ণ গর্তে ফেলে দিয়ে বলল, 'জগদীশ্বরের আদেশবাহকের ইহাই উপযুক্ত স্থান।' দস্যুগণ চলে গেল। বহু চেষ্টার পর মরণের মুখ থেকে উঠে শারীরিক কষ্টরূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য আনন্দে ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে করতে তিনি এগিয়ে চললেন এবং অদূরে একটা মঠে গিয়ে উঠলেন। সেখানকার মঠবাসীরা তাঁকে অসহায় মনে করে রান্নার কাজ করিয়ে নিতে লাগলেন। তারপর সেখান থেকে তিনি আবার সেণ্ট ড্যামেনের দিকে চললেন। প্রথমে তিনি গেলেন কুষ্ঠাশ্রমে। সন্ন্যাসী ফ্রান্সিসের চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব নিরন্তর সৎকার্যে ব্যাপৃত থাকা এবং নিজ আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধানে সদাজাগ্রত থাকা; তাই তাঁর উন্নতিও চিরদিন অপ্রতিহত ছিল। তাঁর ধারণাই ছিল যে যাঁরা কোনরূপ পরহিতকর কার্য না করে কেবল আত্মোন্নতি সাধনে চেষ্টা করেন, তাঁরা অতিশয় স্বার্থপর। পূর্বে তিনি অর্থ দিয়ে কুষ্ঠরোগীদের সেবা করতেন কিন্তু এবার?

এবার তিনি এলেন দীন বেশে, রিক্তহস্তে, প্রেম ও সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ে। ঈশানুসরণে গঠিত সেই মহাপ্রাণের বুকে নিশ্চয়ই এই ভাবটি জেগেছিল :

'কো নু স্যাদুপায়োঽত্র যেনাহং সর্বদেহিনাম্।
অন্তঃপ্রবিশ্য ভবেয়ং সততং দুঃখভারভাক্॥'

অর্থাৎ এমন কি কোন উপায় আছে, যাতে আমি সকল প্রাণীর অন্তরে প্রবেশপূর্বক সর্বদা তাদের দুঃখভারের ভাগী হতে পারি? তিনি কুষ্ঠরোগীদের সেবা করতেন; এ সেবার পিছনে রক্ত-মাংসের সম্বন্ধ ছিল না—ছিল পবিত্র নিঃস্বার্থ ভালবাসা। এই ভালবাসার শক্তিই তো জগতে চিরদিন প্রবল।

সংসাররূপ কালসর্প নাগমহাশয়কে দংশন করতে পারে নি। মহামায়া কৃপা করে ঐ সর্পের বিষদাঁত এবং স্বভাবসিদ্ধ দংশন-প্রবৃত্তি নষ্ট করে দিয়েছিলেন। সহজ সরল ভালমানুষ পেলে ধূর্তলোকে খাটিয়ে নেয়, এমন কি মৃত্যুর মুখেও ঠেলে দেয়। পিতৃ-বন্ধুগণ বা পাড়াপড়শীরা নাগমহাশকে দিয়ে হাটবাজার করা, চালের মোট ও কাঠের বোঝা বহন করা, জলতোলা প্রভৃতি নানাবিধ কাজ করিয়ে নিতেন। নাগমহাশয়ের বেলাতেও দেখি, একই ব্যাপার। তাঁর পিতা যাঁদের বাড়ীতে কাজ করতেন, সেই বাবুরা সর্বগ্রাসী মৃত্যুরূপ প্লেগের মুখ থেকে বাঁচবার জন্য ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেলেন; কিন্তু সেই মরণের মুখে গৃহাদি সব কিছু রক্ষা করার জন্য রেখে গেলেন নাগমহাশয়কে। সংসার এই রকমই! তিনি চিকিৎসা করতেন ঠিকই—কিন্তু উহা ব্যবসা ছিল না, ছিল পরোপকার। গরীব-দুঃখীদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা, ঔষধ বিতরণ, পথ্য এবং কায়িক সেবা, এমন কি নিরাশ্রয় রোগীকে গৃহে এনে চিকিৎসা করা সব কিছুই তিনি করতেন। লোকে বলত, 'উনি সাক্ষাৎ মহাদেব, যাকে যা ওষুধ দেন তাতেই তার কল্যাণ হয়।' মুমূর্ষু কুষ্ঠরোগী যেমন ফ্রান্সিসের মুখখানি একবার মাত্র দেখবার জন্য কাকুতি-মিনতি করত, তেমনি অসহায় রোগী নাগমহাশয়কে দেখবার জন্যও ছটফট করত। এ জগতে মানবহৃদয় চিরদিন আন্তরিক সহানুভূতির প্রার্থী। দুঃখক্লিষ্ট মানুষের মধ্যে স্বভাবতই পরস্পরের প্রতি একটা সহানুভূতি জন্মে থাকে। দুঃখক্লেশের মধ্যেই তো বিশুদ্ধ ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়—এ কথা অতি বাস্তব, অতি সত্য। উভয়ের মর্মবেদনোত্থিত অশ্রুবিসর্জনই প্রকৃত ভালবাসার সেতু রচনা করেছিল।

অতি দুষ্কৃতকারীর জীবনে যখন প্রবল ধর্মবিশ্বাসের চাপে আকস্মিক পরিবর্তন দেখা দেয়—মানুষ তা দেখতে ভালবাসে, সহানুভূতিতে হৃদয় ভরে যায়, লোকে অশ্রুপাতও করে। আবার যারা সংশোধিত মানুষটিকে না দেখে তাঁর বিগতকর্ম দেখে, তারা বলে—ওসব বুজরুকি, ঢং; আরও কত কটূক্তি করে। ফ্রান্সিস পথে ভিক্ষায় বেরুলেন। 'ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ' অর্থাৎ ভিক্ষান্নের দ্বারাই তুষ্ট—ইহাই তো সর্বকালের সকল দেশের সন্ন্যাসীদের আদর্শ। প্রথম দিনের ভিক্ষালব্ধ খাদ্যবস্তু দেখে তিনি নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিলেন। সে প্রাচ্য দেশ নয়, যে দেশে ভিক্ষার প্রচলন আছে। হৃদয় নিরুৎসাহ হচ্ছে দেখে, ঈশার প্রতি এখনও পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরতা আসে নাই ভেবে তিনি মরমে মরে গেলেন এবং পরক্ষণেই আত্মতুষ্টি ফিরিয়ে আনলেন। এইভাবে নিত্য-নূতন পরীক্ষা দিতে দিতে তিনি অগ্রসর হতে লাগলেন। তিনি ভিক্ষা করে গীর্জায় তৈল-প্রদীপের ব্যবস্থা করলেন

এবং পাথর ভিক্ষা করে বহু গীর্জার সংস্কার সাধন করলেন।

অপরদিকে, গৃহস্থ ক্ষমতা থাকতে কখনও অপরের দান গ্রহণ করবেন না—ইহাই শাস্ত্রীয় নিয়ম। ভিক্ষা গৃহীর ধর্ম নহে, সন্ন্যাসীর ধর্ম। নাগমহাশয় 'যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ' এই ব্রতের ব্রতী ছিলেন। তিনি এবং তাঁর পিতা যাঁদের অধীনে কাজ করতেন, তাঁদের সঙ্গে একজন ধার্মিক ব্যক্তির মাধ্যমে অদ্ভুত উপায়ে একটি বন্দোবস্ত হয়—ফলে সংসার মোটামুটি চলে যেত। শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন, তাঁর এ ভগবদ্ভাবোন্মত্ত সন্তানের দ্বারা অর্থ উপার্জন সম্ভব নয়, তাই আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, 'গৃহেই থেকো, যেন-তেন করে মোটা ভাত মোটা কাপড় চলে যাবে।' ভক্তের বোঝা ভগবান ছাড়া আর কে বইবে? নাগমহাশয় পিতৃ-শ্রাদ্ধাদিতে এবং অতিরিক্ত অতিথিসেবার জন্য কখনও কখনও ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন; কিন্তু উহা আবার পরিশোধও হয়ে গেছে। স্বামীজী নাগমহাশয়ের পিতৃশ্রাদ্ধে বসতবাটী বন্ধকের কথা শুনে উহা খালাস করে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নাগমহাশয় সন্ন্যাসীদের দান গ্রহণ করতে রাজী হন নি।

ফ্রান্সিসের তপস্যা চলল কঠোরভাবে, প্রার্থনা চলল করুণভাবে—ফলে অহংকারটা সরে গেল। শাস্ত্র বলেন, এই 'অহং'-'মম' বুদ্ধি তাড়ানোর জন্যই তো সাধনা। তিনি দর্শন করলেন, ক্রুশবিদ্ধ ভগবান ঈশা সপ্রেম-নয়নে তাঁর দিকে চেয়ে বলছেন, 'ফ্রান্সিস, যেখানে যার সঙ্গে তোমার দেখা হবে, সকলকেই বলো যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ লাভ করবার সময় আসন্নপ্রায়। রুগ্নলোক দেখলে রোগ থেকে মুক্ত করে দিও। কুষ্ঠরোগী দেখলে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে দিও। এবং যদি দেখ কাকেও ভূতে পেয়েছে এবং সেজন্য সে খুব কষ্ট পাচ্ছে, তবে তার ভূত ছাড়িয়ে দিও। অহেতুক কৃপালাভে তুমি ধন্য হয়েছ, অতএব সাধ্যমত লোকের সেবা ও উপকার করতে কৃপণতা করো না। মন থেকে সঞ্চয়বুদ্ধি একেবারে সমূলে উৎপাটিত করে ফেলো। একথা স্মরণ রেখো, পরিশ্রম করলে শরীররক্ষার্থে যা কিছু প্রয়োজন, তার কিছুরই অভাব হবে না।' ফ্রান্সিস 'চাপরাশ' লাভ করলেন। এতদিন ধরে ভগবানের এই আদেশ-বাণীরই অপেক্ষায় তিনি ছিলেন। এবার তিনি উহার বাস্তব রূপ দিতে সচেষ্ট হলেন।

ঈশামসির এ আদেশ শুধু ফ্রান্সিসের জীবনেই পরিণতি লাভ করেছিল তা নহে, আমরা জানি, উহা নাগমহাশয়ের জীবনেও কি ভাবে ফুটে উঠেছিল। ঈশ্বরের আদেশ তো সকল অধ্যাত্ম-পিপাসু মানবের জন্যই! শ্রীরামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ শরীরধারী নারায়ণ - এ ধ্রুব ধারণা নাগ-মহাশয়ের ছিল। তিনি বলতেন, 'ঠাকুরের আগমন অবধি জগতে বন্যা এসেছে, সব ভেসে যাবে, সব ভেসে যাবে। রামকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ। এমন সর্বভাবের সমন্বয় আজ পর্যন্ত কোন অবতারে হয় নাই।' তিনি যেখানেই যেতেন সকলকে অভয় দিয়ে বলতেন, 'ভয় কি? ভাবনাই বা কিসের? যখন ঠাকুরের রাজ্যে এসে পৌছিয়েছেন তখন আর ভাবনা নাই।' রুগ্ন দেখলে তিনি ঔষধ দিয়ে ব্যাধিমুক্ত করতেন—একথা আমরা পূর্বে বলেছি। তীব্র মানসিক শক্তির দ্বারা তিনি ভবরোগের বৈদ্য শ্রীরামকৃষ্ণের করালব্যাধি নিজ দেহে আকর্ষণ করতে গিয়েছিলেন—এ ছিল এক অলৌকিক

ব্যাপার! শ্রীরামকৃষ্ণ অভিপ্রায় বুঝে ঠেলে দিয়ে বলেছিলেন, 'তা তুমি পারো, রোগ সারাতে পারো।' নিজে শূল-বেদনায় কষ্ট পেতেন, কিন্তু একজন লোক তাঁর সংস্পর্শে এসে শূলরোগ থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। ভূতে পাওয়া লোককে তিনি মুক্ত করেন নি সত্য, তবে বাল্যজীবনে অতিকায় ভূত তাঁকে পথ ছেড়ে দিয়েছে। কোন যুবক আত্মহত্যা করতে গিয়ে নাগমহাশয়ের কৃপায় বেঁচে গেছে। সংসার-মোহরূপ ভূতের আবেশ থেকে তিনি বহু লোককে নিজের জীবন দেখিয়ে আলোকের পথ দেখিয়েছেন। ফ্রান্সিসের মত তিনিও অহেতুক কৃপার অধিকারী হয়েছিলেন। সন্ন্যাসীর সঞ্চয় করতে নাই। কিন্তু গৃহীর? গৃহীকে তো সঞ্চয় করতে শাস্ত্র নিষেধ করেন নি বরং দুর্দিনের জন্য সঞ্চয় করতে বলেছেন। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'গৃহস্থই জীবন ও সমাজের কেন্দ্র। অর্থোপার্জন ও সৎকার্যে অর্থব্যয় করা তাঁর পক্ষে উপাসনা, কারণ যে গৃহস্থ সদুপায়ে ও সদুদ্দেশ্যে ধনী হবার চেষ্টা করছেন—সন্ন্যাসী নিজ কুটীরে বসে উপাসনা করলে উহা যেমন তাঁর মুক্তিলাভের সহায়ক হয়, সেই গৃহস্থের এই প্রচেষ্টাও ঠিক তাই হয়ে থাকে।' কিন্তু নাগমহাশয়ের দ্বারা উপার্জনই সম্ভবপর ছিল না, আবার সঞ্চয়! সঞ্চয় সম্বন্ধে তিনি বলতেন, 'যখন যার যা প্রয়োজন হয়, ভগবান অবশ্য তা পূর্ণ করে দেন। আমাদের ভাবনায় চিন্তায় কিছুমাত্র ফল নাই। ভগবানে নির্ভর করলে একূল ওকূল দুকূলই বজায় থাকে।'

এ জগতের অধিকাংশ লোককেই অধ্যাত্ম উন্নতির প্রতি উদাসীন ভাবে অবস্থান করতে দেখা যায়। ইহার কারণ তাঁরা জানেন না যে এই ধর্মজীবনের মধ্যে অপূর্ব সৌন্দর্য, মাধুর্য, ঔদার্য, পবিত্রতা, শান্তি ও আনন্দ রয়েছে। এই ধর্মজীবনের রসাস্বাদ করিয়ে দেবার জন্য তাই প্রয়োজন অনুভূতিসম্পন্ন মানুষের। এইরূপ মানুষ সর্বদেশে সর্বকালে অতীব বিরল। ফ্রান্সিস তাই অনুভূতি ও অভিজ্ঞান নিয়ে মনুষ্য-সমাজে প্রবেশ করলেন। অ্যাসিসির এক ধনী ব্যক্তি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে এলে তিনি বললেন, 'দেখুন, আমি নিজে যেভাবে জীবন যাপন করছি এবং যা প্রচার করছি তা আমি নিজে ইচ্ছানুযায়ী করছি না, ঈশ্বর আদেশানুযায়ী উহা করে যাচ্ছি।' তিনি বাইবেল থেকে পাঠ করে শোনালেন, 'যদি জীবনে পূর্ণতালাভের অভিলাষ থাকে, তাহলে নিজ সমুদয় সম্পত্তি দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ কর। ইহা যদি করতে পার তবেই প্রকৃত ঐশ্বর্যের অধিকারী হতে পারবে। এস, আর কালবিলম্ব না করে আমার উপদেশানুযায়ী কাজে লেগে যাও।...তোমরা কোন জিনিস কাছে রেখোনা। অর্থ, আহার্য, যষ্টি, এমন কি একখণ্ড কাগজ পর্যন্ত সঞ্চয় কোরোনা এবং একটির অধিক গাত্রাবরণও নিকটে রেখোনা।...দুঃখ ও ক্লেশ অম্লানবদনে সহ্য করবার জন্য প্রস্তুত থেকো। যে নশ্বর দেহের প্রতি যত্ন করবে, সে অধ্যাত্ম উন্নতিলাভে বঞ্চিত হবে। কিন্তু যে আমার উপদেশ পালন করবার জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকবে সে অনন্ত জীবনের অধিকারী হবে।' বাইবেলের এই অংশটুকু ফ্রান্সিস-প্রবর্তিত ধর্মসংঘের মধ্যে আনুষ্ঠানিক মূলসূত্ররূপে গৃহীত হল। মোটকথা Chastity. Poverty and Obedience অর্থাৎ পবিত্রতা, দরিদ্রতা ও আনুগত্য—ইহাই ছিল ফ্রান্সিসের সম্প্রদায়ের তিনটি খুঁটী। ফ্রান্সিসের জ্ঞানগর্ভ ও ভক্তিপূর্ণ সহজ সরল উপদেশ তরুণদের মনে আন্দোলন সৃষ্টি করল। তারা দলে দলে নিঃসম্বল

হয়ে দীনবেশে নগ্নপদে হাসিমুখে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বলতেন, 'আমি দেখলাম, বহুসংখ্যক লোক সন্ন্যাস গ্রহণ করবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করছে।'

নবীন হিতকর ভাবের উপর যতই অন্যায় অত্যাচার হয়, উহা ততই সমাজের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করে—ইতিহাস তো ইহাই সাক্ষ্য দেয়। প্রাচীনপন্থী পুরোহিতগণের ও ধর্মযাজকদের তীব্র কটাক্ষ এবং অশ্লীল আচরণ ফ্রান্সিস ও তাঁর সম্প্রদায়ের উপর মুহুর্মুহুঃ বর্ষিত হতে লাগল। কারণ, যা দূষিত ও দুর্গন্ধযুক্ত, যা সংকীর্ণ ও স্বার্থপরতাপূর্ণ এবং যা দুর্বল ও দোষযুক্ত, তা পবিত্রতার সংস্পর্শে এলে কেঁপে উঠে, নিজেকে বাঁচাবার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে, শেষে শূন্যে বিলীন হয়ে যায়।

ঈশ্বরে বিশ্বাসী, নিরীহপ্রকৃতি ও বিনীত-স্বভাব ভিক্ষুক সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ করে প্রাচীনেরা বলতে লাগলেন, 'তোমরা নিজ নিজ সম্পত্তি নষ্ট করে এখন অপরের অর্থে দিনাতিপাত করতে চেষ্টা করছ—এ তোমাদের কেমন রীতি?' একজন ধর্মযাজক ফ্রান্সিসকে বিপথে ঠেলবার জন্য বললেন, 'হয় আপনি পৌরোহিত্য গ্রহণ করুন; আর না হয়, সন্ন্যাস-গ্রহণ করা আপনার সংকল্প হলে, পূর্বপ্রতিষ্ঠিত কোন সন্ন্যাসী সংঘে যোগদান করুন।' মধ্যযুগে ইউরোপে পুরোহিত ধর্মযাজক ও সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ঘোরতর অধঃপতনের কথা আমরা পূর্বেই বলে এসেছি। খাঁটী সোনাতেও খাদ দেওয়া চলে কারণ উহা জাগতিক বস্তু; কিন্তু পারমার্থিক বস্তু চরম সত্যের বেলা তা চলে না। তাই ফ্রান্সিস চরম সত্যকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরলেন, সত্যের খাতিরে প্রাচীনদের সঙ্গে কোন আপোষ করলেন না; ত্যাগ ও সেবার দ্বারা সংঘের আদর্শকে জীবন্ত করে ভ্যাটিকান নগরীতে পোপের অনুমতির জন্য চললেন।

আধ্যাত্মিকতায় বিন্দুমাত্র সাংসারিকতা নাই—একথা অভ্রান্ত সত্য; কিন্তু সংসার যদি অধ্যাত্মক্ষেত্রে পরিণত হয়, যেমন নাগ মহাশয়ের হয়েছিল, তাহলে সেখানে কেন আধ্যাত্মিকতা থাকবে না? উপরন্তু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারক্ষেত্রে, সন্ন্যাসক্ষেত্রে, মানব-জীবনের সর্বক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতার মহাপ্লাবন এনে দিয়েছিলেন। তাই তিনি বহুবার বলে-ছেন, 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা কর,' 'ভক্তিলাভ করার পর সংসার করা যায়'; '—এর সংসার ধর্মের সংসার, নিত্য ঠাকুর-সেবা আছে।' বলরামের সংসারকে ঠাকুর ৺জগন্নাথের সংসার বলেই নির্দেশ করতেন। 'আমার বলরামের সংসার ভেসে যাবে'—বলে স্বয়ং ভগবান কখনও কখনও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন। সংসারকে এভাবে রূপান্তরিত করা কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয়।

ঈশামসি ফ্রান্সিসকে দিয়ে সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গঠন করলেন, আর শ্রীরামকৃষ্ণ গঠন করলেন নাগমহাশয়কে দিয়ে গৃহীভক্তসম্প্রদায়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ভরসা দিয়ে দিব্যি করে বলেছিলেন, 'ওগো আমি বলছি, মাইরি বলছি, ঘরে থাকলে তোমার কোন দোষ হবে না। তোমায় দেখে লোক অবাক হবে।' স্বামী বিবেকানন্দ নাগমহাশয়কে একবার মঠে থাকবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি উত্তরে বলেন, 'কেমন করে ঠাকুরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করি? তিনি তো আমাকে গৃহে থাকতেই বলে গেছেন।' নাগমহাশয়ের কোন মন্ত্রশিষ্য না থাকলেও তাঁর ভক্তপরিবার বিশাল। গিরিশবাবু বলতেন, 'নাগমহাশয় তাঁর ভক্তগণের উপর স্নেহময়ী জননীর ন্যায় সর্বক্ষণ

সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন।' ফ্রান্সিস যেমন তাঁর আশ্রিতদের স্বর্গীয় পিতার কাছে অর্পণ করতেন, তেমনি নাগমহাশয় ভক্তগণকে বলতেন, 'এতদিন খালে বিলে ছিলেন, এবার রামকৃষ্ণরূপ মহাসমুদ্রে এসে পড়লেন।' কখনও কোন দীক্ষালাভেচ্ছুকে বলতেন, 'ইদানীন্তন কালে ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্তগণই জগতের একমাত্র দীক্ষাগুরু।' নাগমহাশয় বিশেষভাবে কোন কিছু প্রচার করেননি সত্য, কিন্তু তিনি একটি মহান জীবন যাপন করে গেছেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী জনৈক ভক্তকে বলেছিলেন, 'ওদেশে (পূর্ববঙ্গে) গিয়ে আর বক্তৃতা করবার ইচ্ছা বা প্রয়োজন নাই। যে দেশ নাগমহাশয়ের চন্দ্রালোকে আলোকিত সেখানে আমি গিয়ে আর বেশী কি বলবো!' তাতে ভক্তটি বলেন, 'তিনি তো অতি গুপ্তভাবে ছিলেন, সাধারণে কখনও কিছু বলেননি।' স্বামীজী উত্তর দিলেন, 'মুখে নাই কিছু বললেন। নাগমহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষদের চিন্তাতরঙ্গে দেশের চিন্তাস্রোতের গতি ফিরে যায়।' কথাপ্রসঙ্গে তিনি ঠাকুরের উপদেশই লোককে বলতেন। বিবাহপ্রসঙ্গ উঠলে তিনি প্রাচীনকালের মুনি-ঋষিদের পবিত্র বিবাহের আদর্শ দেখাতেন। তিনি ভক্তদের নিজের জীবন দেখিয়ে বলতেন, 'তিনি কল্পতরু, যে যা চায়, ভগবান নিশ্চয় তাকে তা দেন।…ভগবানের পাদপদ্মে কেবল শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধাভক্তির জন্য প্রার্থনা করা উচিত। তবেই জীব সংসারবন্ধন ছিন্ন করে ভগবৎকৃপায় সংসার হতে মুক্ত হয়ে যেতে পারে। সংসারের যে কোন বিষয়ে বাসনা করা যায়, তা থেকে জীবের জ্বালা-যন্ত্রণা আসবেই। কিন্তু যিনি ভক্ত- ও ভগবৎ-প্রসঙ্গে দিন যাপন করেন, তাঁর ত্রিতাপ-জ্বালা অন্তে দূর হয়ে যায়।'

ফ্রান্সিসের সন্ন্যাসজীবন ও প্রচার এবং নাগমহাশয়ের গার্হস্থ্যজীবন ও মৌন প্রচারের উল্লেখ করা হয়েছে। এবার আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে প্রবেশ করব। খ্রীষ্টধর্ম ও হিন্দুধর্মের (বৈদান্তিক ধর্ম) মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য—পাপের ধারণা নিয়ে। চার্চের উপাসনালয়ে নতজানু হয়ে খ্রীষ্টের সামনে তাঁরা বলেন—paccavi, paccavi, paccavi অর্থাৎ I have sinned, I have sinned, I have sinned.—অনুতপ্ত হয়ে খুব আবেগের সঙ্গে 'আমি পাপ করেছি' একথা বলে থাকেন। ফ্রান্সিসের এ পাপবোধ খুব দৃঢ় ছিল যেমন সকল খাঁটী খৃষ্টানদের থাকে। তিনি নিজেকে 'Vile Worm' এবং 'Thine unprofitable servant' বলতেন। নিজের নাম সই করার পূর্বে তার সঙ্গে 'পাপী' শব্দটি যোগ করতে কখনও ভোলেননি। ভগবানের নিকট পাপ স্বীকার এবং তার জন্য অনুতাপ ও ক্ষমাপ্রার্থনা—ফ্রান্সিসের শিক্ষার মধ্যে একটা মহান শিক্ষা ছিল। কিন্তু এ অনুতাপ বাইরে প্রকাশ পেত না। হাজার দুঃখকষ্টের মধ্যেও ফ্রান্সিসের এবং তাঁর সন্ন্যাসীদের খুব হাসিখুশী ভাব থাকত। ফ্রান্সিসের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে Thomas Caleno লিখেছেন, 'তাঁর উপদেশের প্রভাবে গোটা দেশ কেঁপে উঠেছিল, বন্ধ্যাভূমি ফল-পুষ্পে সুশোভিত হয়ে উঠেছিল এবং শুষ্ক দ্রাক্ষালতায় ধরেছিল রসাল আঙ্গুরের মুকুল।'

অপরদিকে বেদান্ত পাপ স্বীকার করেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও দীনহীন ভাব পছন্দ করতেন না, তিনি বলতেন, "যে ব্যক্তি 'আমি বদ্ধ' 'আমি বদ্ধ' বার বার বলে, সে শালা বদ্ধই হয়ে যায়! যে রাতদিন 'আমি পাপী' 'আমি পাপী' এই করে, সে তাই হয়ে যায়।" কিন্তু নাগমহাশয় নিজের প্রতি 'পাপের ঢিপি' 'কীটের কীট'

প্রভৃতি উক্তি করতেন। আমরা পূর্বে নাগমহাশয়ের ভাণহীন দীনতা ও পবিত্রতার বহু কথা বলে এসেছি। স্বয়ং ভগবান যাঁকে উদ্দেশ করে বলেছেন, 'জলন্ত আগুন' 'তোমার তো খুব উচ্চ অবস্থা' ইত্যাদি, এহেন মহাপুরুষের আবার পাপ! তবে নাগমহাশয়ের উপরোক্ত উক্তির সার্থকতা কোথায়? 'নীচু জায়গায়ই জল জমে', গৃহস্থের পক্ষে 'আমি ব্রহ্ম' এ ভাব ভাল নয়, 'সংসারে রেখেছেন তা কি করবে? তাঁকে আত্মসমর্পণ কর।' ইত্যাদি শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত বহু উক্তি উহার সার্থকতা দেখায়। তাছাড়া নাগমহাশয়ের জীবনী পড়লে বোঝা যায় তিনি দাস্যভাবের সাধক ছিলেন। গিরিশবাবু তাই বলেছেন, 'ঠিক দীনতা এলে, ঠিক ঠিক অহং-বুদ্ধির উচ্ছেদ হলে, মানুষের নাগমহাশয়ের মত অবস্থা হয়। এ সকল মহাপুরুষদের পাদস্পর্শে পৃথিবী পবিত্রা হন।'

ফ্রান্সিস ও নাগমহাশয়ের ভালবাসা কেবলমাত্র মনুষ্যজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না—জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতাদিতেও উহা বিস্তৃত ছিল। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। যথার্থ সাধুভাবাপন্ন হলে শক্তি, সিদ্ধি, ঋদ্ধি এসে সাধকদের প্রলোভিত করে এবং দুর্বল সাধকদের বিপথগামী করে দেয়। কিন্তু উভয়েই উহা দৃঢ়ভাবে দমন করেছেন। সন্ন্যাসী ফ্রান্সিস সন্ন্যাসাশ্রমের প্রতি এবং গৃহী নাগমহাশয় গার্হস্থ্য আশ্রমের প্রতি কখনও বিন্দুমাত্র শিথিলতা দেখাননি।

ভোগবাদী পাশ্চাত্যে শারীরিক কৃচ্ছ্রতা বিভীষিকাময়। কিন্তু ফ্রান্সিসের কঠোরতা সীমাহীন। প্রাচ্যে শারীরিক কঠোরতার বহুলতা আমরা দেখি। কিন্তু নাগমহাশয়ের 'ভগবানের জন্য মাথা ফাটিয়ে রক্ত বের করা', 'প্রসাদের সঙ্গে পাতাভক্ষণ,' 'হাড়মাংসের খাঁচাকে আর অন্নজল দিব না' ইত্যাদি কথা ও কাজগুলি সাধারণ দৃষ্টিতে উৎকট বলে মনে হলেও উহাতে কপটতাহীন ভক্তির গভীরতাই প্রকাশ পায়। সাধারণ মানুষ যদি জোর করে লোক-দেখানোর জন্য উহা করে তবে তা হবে পাগলামি! যেমন কথায় বলে—'শুচিতা' ভাল, 'শুচিবাই' ভাল নয়। উভয়ের জীবনে গভীর ধ্যান ও সমাধির অনেক উল্লেখ আছে। উভয়েই ক্ষমতাশীল, সরল ও অদোষদর্শী। উভয়ের শরীরের বর্ণনা যা পাওয়া যায় (নাগমহাশয়ের জীবিতকালের কোন ছবি নাই, যে ছবি দেখা যায় উহা মৃত অবস্থায় তোলা) তাতে মনে হয় প্রথমজীবনে উভয়েই সুন্দর ছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁদের শারীরিক সৌন্দর্য তত ছিল না। উহা মলিন, দৃঢ়, রুক্ষ অথচ পবিত্রতার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ছিল। ইঁহারা 'হাড় মাংসের খাঁচাকে' উপেক্ষা করে অন্তরে সুবাসিত, সুন্দর, সুকোমল ও সুবিমল পুষ্প ফুটিয়েছিলেন এবং উহার পরিমলে জগৎ ভরিয়ে তুলেছিলেন।

'Resist not Evil' অর্থাৎ অশুভের প্রতিরোধ ক'রো না—ইহা সন্ন্যাসীর ধর্ম। ফ্রান্সিস তাই প্রতিকারের চেষ্টা না করে সব কিছু ভগবানের দান বলে গ্রহণ করতেন। অপরদিকে নাগমহাশয় ভাল ভক্ত ছিলেন কিন্তু ভীরু ছিলেন না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি খড়্গহস্ত ছিলেন। শিকারী সাহেবদের বন্দুক কেড়ে নিয়েছেন, মিথ্যাবাদীকে, পরনিন্দাকারীকে মেরেছেন পর্যন্ত। এসব ঘটনার দ্বারা আদর্শ গার্হস্থ্য ধর্মের,—'শূরঃ শত্রৌ বিনীতঃ স্যাৎ বান্ধবে গুরুসন্নিধৌ' অর্থাৎ গৃহী 'শত্রুর সমক্ষে শৌর্যবীর্য অবলম্বন করবে এবং গুরু ও বন্ধুগণের সমীপে বিনীত থাকবে।'—এই উক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

এই দুই মহাপুরুষের দেহত্যাগেরও একটা সুন্দর সাদৃশ্য আছে মানুষের মনের সঙ্গে শরীরও পাল্টে যায়—শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে আমরা ইহার বহু দৃষ্টান্ত পাই। ফ্রান্সিস ক্রুশবিদ্ধ যীশুমূর্তির ধ্যান গভীরভাবে করতেন, যীশুর প্রেম ও করুণা নিজের উপর আরোপ করতেন এবং ক্রুশের বেদনা অনুভব করতেন। মৃত্যুকালে তাঁর হাতে পায়ে বুকে Stigmata অর্থাৎ রক্তাক্ত ক্রুশচিহ্ন দেখা গিয়েছিল। Oscar Wylde উহাকে বলেছেন, 'Wounds of Love' ফ্রান্সিসের জীবনের শেষ কথা: আমি কোকিলের মত মৃত্যুভয়ে ভীত নই। ভগবানের কৃপায় আমি তাঁর সঙ্গে এমনভাবে একীভূত হয়েছি যে জীবনে মরণে সর্বাবস্থাতেই আমি খুশী।

অপরদিকে নাগমহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণের গলরোগ নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি তা দেন নি। উহার পরিবর্তে তিনি সাংঘাতিক শূল-বেদনায় কষ্ট পেতেন এবং নিদারুণ যন্ত্রণার ভিতর বলতেন, 'জয় প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণ, তোমার জয়! ধন্য শূলব্যথা যাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে স্মরণ করিয়ে দেয়।' এভাবে মরণতুল্য যন্ত্রণা হয়ে উঠেছে অমৃতোপম। কলকাতায় একবার তাঁর দুহাতে ভয়ানক ব্যথা ধরে। হাত নাড়তে পারতেন না এবং জোড়হস্তে না থাকলে খুব যন্ত্রণা হত। তিনি বলতেন, সর্বদা জোড়হস্তে থাকতে শিক্ষা দেবার জন্য ঠাকুর তাঁকে এই ব্যাধি দিয়েছেন। সর্বদা জোড়হাতে থাকেন কেন? —এ জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'ভূতে ভূতে তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই।' শেষ সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের জোড়হাতে উপবিষ্ট একখানি ছবি তাঁর সামনে ধরে বলা হয়েছিল, 'যাঁর নামে আপনি সর্বস্বত্যাগ করেছেন—এ তাঁর প্রতি-মূর্তি।' তিনি তাঁর সেই স্বভাবলব্ধ করজোড়ে প্রণাম করে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, 'কৃপা কৃপা, নিজ-গুণে কৃপা।' ইহাই তাঁর জীবনের শেষ কথা।

ফ্রান্সিস জীবনে কখনো চার্চের বিরোধিতা করেন নি। তিনি একাধিকবার মহামতি পোপের কাছে তাঁর সম্প্রদায়ের অনুমোদনের জন্য গিয়াছেন। স্বয়ং পোপ বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'ঈদৃশ জীবন যাপন আমার বিবেচনায় অত্যন্ত কঠোর বলে মনে হচ্ছে।' নাগমহাশয়ও কোনদিন শাস্ত্রীয় বা লৌকিক নিয়ম ভঙ্গ করেন নি। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশমত গার্হস্থ্য জীবন যাপন করে গেছেন। বাইবেলের ধাঁচে গঠিতজীবন ফ্রান্সিস ও তাঁর সম্প্রদায়কে গ্রহণ করতে খ্রীষ্ট জগতের ধর্মগুরু পোপ ইতস্তত: করেছিলেন; জানি না, বর্তমান ও ভাবীকালের গৃহীরা প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ সাধু নাগমহাশয়ের জীবন কি ভাবে গ্রহণ করবেন!

এই দুই মহামানবের জন্মকালের ব্যবধান ছয় শতাব্দীরও অধিক; দেশের ব্যবধান, জাতির ব্যবধান, পরিবেশের ব্যবধান; অধিকন্তু একজন সন্ন্যাসী আর একজন গৃহী। এসব জাগতিক ব্যবধান যতই থাকুক না কেন—মহামানবদের জীবন একই সূত্রে গ্রথিত। সাধারণ মানুষ মহাপুরুষদের মহত্ত্বের দিকে না তাকিয়ে জাগতিক শক্তির তারতম্য বিশ্লেষণে মত্ত হয়। রামরাবণের যুদ্ধের তুলনা রামরাবণের যুদ্ধ। মহাপুরুষদের তুলনা তাঁরা নিজেরাই; আমরা কেবল মাঝখানে থেকে এই দুই অলোকসামান্য মহাপুরুষের জীবনী ও বাণী মন্থন করে খানিকটা অমৃতের আস্বাদন করলাম।

ফ্রান্সিসের সংস্পর্শে এসে বিরাট খ্রীষ্টান জগৎ শান্তি পেয়েছে। নাগমহাশয়কে আলিঙ্গন করে —সাধারণ মানুষের কথা কি—স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব কাশীপুরে বলেছিলেন, 'ওগো এগিয়ে এস,

এগিয়ে এস, আমার গা ঘেঁসে বস। তোমার ঠাণ্ডা শরীর স্পর্শ করে আমার শরীর শীতল হবে।' এই সব মহাপুরুষেরা জগৎসংসারে শান্তি ও আনন্দের হাট বসাতে আসেন। তাঁরা মরণজয়ী। আত্মস্থ মহাপুরুষগণ কেহই মৃত নন, তাঁরা তথাকথিত জীবিত-লোকদের চেয়ে অধিকতর জীবন্ত ও আমাদের অধিকতর নিকটবর্তী।

'আত্মানং বিদ্ধি'

শ্রীদিলীপ দে চৌধুরী

'ঘুমিয়ে স্বপ্ন, জেগেও স্বপ্ন'
মুখেতেই শুধু বলি—
কতটুকু তার অনুভূতি নিয়ে চলি ?

যদি কোনদিন ঠিক ঠিকই বোধ হয়
এতো যে শাস্ত্র, পুথির পাহাড়
কথার বাহার—
দেখবো কিছুই নয়,
থেমে যাবে সব কোলাহল, কলরব
দেখবো রয়েছে নিজেরই মধ্যে সব !

বুদ্ধিতে তারে ধরবে ভেবেছো ?
হায় রে দৃষ্টিহীন—
ছায়ার পিছনে ছুটছো কেবল,
ছুটছো রাত্রিদিন।

গীর্নার তীর্থের আকর্ষণে

স্বামী জীবানন্দ

অজানাকে জানার অচেনাকে চেনার আগ্রহ মানুষের স্বাভাবিক। সময় ও সুযোগ হলেই এ আগ্রহ প্রবল হয়। তাই সোমনাথ ও প্রভাস দর্শন করে ফেরার পথে ভেরাবল পৌঁছে যখন শুনলাম এখান থেকে গীর্নার যাওয়ার খুব সুবিধা, তখন সে আগ্রহ নূতন রূপে জেগে উঠল। সঙ্গীরা কেউ যেতে রাজী হলেন না, কিন্তু উৎসাহিত করলেন সকলেই।

একাই অজানা পথে চললাম। এভাবে একা চলার আনন্দেরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে; নিঃসঙ্গ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও আনন্দ অন্যতর। যেখানে যত নিরপেক্ষতা, সেখানে অভিজ্ঞতা তত বিচিত্র।

ঘোড়ার গাড়ি করে বাস-স্টেশনে উপস্থিত হলাম। বাস ছাড়বার দেরি আছে। জুনাগড় যেতে হবে। সেখান থেকে গীর্নার।

বেলা আড়াইটায় বাস ছাড়ল—গুজরাত স্টেট-ট্রান্সপোর্টের বাস। যতগুলি সিট আছে বসবার, ততজন যাত্রীই নিয়েছে; তার বেশী নেবার নিয়ম নেই এখানে

বাস চলেছে দ্রুতগতিতে, বেলাও চলেছে গড়িয়ে। জানালার পাশে একটি সিটে বসে দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছি। কত রকমের কৃষিক্ষেত্র, পাহাড়ের কোলে কোলে বনজঙ্গল কেটে নতুন নতুন খেতও তৈরী করা হচ্ছে। স্বাধীনতার পর এই অঞ্চলে কৃষিকার্যের উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। শুনলাম গুজরাতের মধ্যে জুনাগড় ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল খুব উর্বরা। চাষের মধ্যে চিনাবাদামের চাষই উল্লেখযোগ্য। মাইলের পর মাইল চলেছে চিনাবাদামের খেত। চিনাবাদাম ফলে বেশী, তাই এর চাষ লাভজনক। জোয়ার ও বাজরার খেতও আছে। কলার বাগানও কম নেই। গাছপালা-ভরা গ্রামগুলি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

পাশের সিটে যিনি ব'সে আছেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ হল, গুজরাতের একটি গ্রামে তাঁর বাড়ি, কৃষিকর্ম করেন। অতি সরল মানুষ, সাধারণতঃ গ্রামবাসীরা যেমন হয়। এখানকার গ্রাম্য কৃষকদের পোশাক অদ্ভুত ধরনের—যেন যাত্রা-দলের পোশাক! এঁদের পোশাক দেখলেই বোঝা যায় এঁরা কৃষক-সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রকৃতি ও পরিবেশ বিশেষ দেশের মানুষকে বিশেষ রঙে রাঙায়, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তাঁর কাছে দুটি লাঠি ছিল, গীর্নার যাচ্ছি শুনে একটি লাঠি দিলেন; দিয়ে বললেন, 'এটি আপনাকে উপহার দিচ্ছি, পাহাড়ে উঠবার সময় কাজে লাগবে।' তাঁর গীর্নার ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও বললেন।

দু'ঘণ্টা চলার পর একটি বড় চৌমাথায় এসে বাসটি থামল, এখানে অনেক যাত্রী নামল, পাশের লোকটিও অভিবাদন জানিয়ে নেমে গেলেন। অনেক লোক উঠল। একজন সাধুও উঠলেন--জটাজুটধারী, হস্তে দণ্ডকমণ্ডলু। সন্ন্যাসী দেখে আমার পাশে খালি সিটটিই অধিকার করলেন। বেশ আলাপী সাধু। 'নমো নারায়ণায়' বলেই আলাপ আরম্ভ করলেন। কত তীর্থ ভ্রমণ করেছেন—কেদার, বদরী, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, গোমুখ, অমরনাথ, কৈলাস, মানস-সরোবর! হিমালয়ের প্রায় সব তীর্থ তাঁর

ভ্রমণ করা হয়েছে, সেই সব তীর্থের পুণ্য স্মৃতি তাঁর প্রাণে অনাবিল আনন্দ দেয়। বললেন—

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥

অযোধ্যা, মথুরা, মায়া (হরিদ্বার), কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা (উজ্জয়িনী), দ্বারাবতী (দ্বারকা)—এই সাতটি মোক্ষদায়িকা তীর্থ-ভূমিও দর্শনের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে।

গীর্নারের যাত্রী শুনে বললেন—

সোরঠ দেশ সুহাবনী সুন্দর গঢ় গিরনার।
বীর সের পর্বত গুফা যোগী তপেঁ নিহার॥

চমৎকার দেশ সৌরাষ্ট্র, গীর্নার দুর্গ সুন্দর। এখানকার লোক সাহসী ও বীর। এখানে বনে সিংহ; পর্বত ও গুহা অসংখ্য; তপস্যারত কত যোগী!

সাধুজী সম্প্রতি গীর্নারের কাছেই তপস্যা করেন। নিঃসঙ্গ দেখে অপরিচিত জায়গায় কোথায় থাকতে হবে বলে দিলেন।

খুব পিপাসা পেয়েছে, ভাল পানীয় জল পাওয়া গেল না। গ্লাসে ভরে বরফ-দেওয়া আখের রস বিক্রী হচ্ছে, তাই এক গ্লাস পান করায় পিপাসার নিবৃত্তি হল।

জুনাগড় স্টেশনে বাস পৌঁছল বেলা সাড়ে পাঁচটায়; ছটায় গীর্নারের বাস। আধ ঘণ্টা ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগলাম, সাধুটিও সঙ্গে আছেন। গুজরাতী ভাষাতেই এখানে সাইন-বোর্ড, বিজ্ঞাপন সব কিছু; ইংরেজীতে লেখা খুবই কম, হিন্দীও কম। আঞ্চলিক ভাষার প্রসারে জনসাধারণ খুবই উদ্যোগী মনে হল। আর একটি লক্ষণীয়—এখানে কেউ অলসভাবে বসে থাকে না, ছোট ছোট ছেলেরা কেমন খবরের কাগজ ফেরি করছে দেখে আনন্দ হয়। শুনলাম এ অঞ্চলে অধিকাংশ সাধারণ পরিবারের পুরুষ মেয়ে—সবাই রোজগার করে। এখানে ভিক্ষুকের সংখ্যা খুবই কম। কিছু দিতে গেলে কেউ এমনি নেবে না, কাজ না করে নিতে চায় না।

এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে গীর্নার। আমাদের বাসটি সারা জুনাগড় শহর ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। প্রাচীন শহর। অনেক কিছু দর্শনীয় আছে। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের অনেক প্রাচীন স্মৃতি ও ধ্বংসাবশেষ দেখবার মতো। অনেক সুন্দর মসজিদ ও সমাধিস্থান। বাস থেকে যা দেখা যায়, দেখতে দেখতে অগ্রসর হচ্ছি। নেমে দেখার সময় নেই। নিকটেই সম্রাট অশোকের শিলালেখ আছে। শুনলাম এই শিলাস্তম্ভে মহামতি অশোক কর্তৃক উৎকীর্ণ ১৪টি আদেশ ঐতিহাসিকদের বিশেষ অনুসন্ধিৎসা জাগায়। সঙ্গের সাধুজী অঙ্গুলিনির্দেশে সব দেখিয়ে কোন্‌টা কি বলে চলেছেন। এমন সঙ্গী পাওয়া সত্যই আনন্দের!

গীর্নার পর্বতের অনতিদূরে দুজনে বাস থেকে নামলাম, সাধুজী বললেন, 'ঐ দেখা যাচ্ছে মঙ্গলদাসের আশ্রম, ঐখানে রাত্রে থাকবেন, খুব ভোরে গীর্নারে যাত্রা করবেন তাহলে কষ্ট হবে না। বিদায় নিয়ে তিনি অন্য পথ ধরলেন।

মঙ্গলাশ্রমে প্রবেশ করলাম। দরজার সন্নিকটে একটি সাধু ইজিচেয়ারে বসে আছেন, পরিধানে শুধু কৌপীন। তাঁর শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত মুখমণ্ডল, মাথা থেকে বক্ষোদেশ পর্যন্ত দীর্ঘ জটা; হাতে হাতঘড়ি। এই বেশে হাতঘড়িটি অশোভনীয় মনে হল। তিনি বহু সাধু ও ভক্ত পরিবৃত হয়ে গল্প করছেন। 'নমো নারায়ণায়' জানালাম। গীর্নারি-যাত্রী জেনে রাত্রে অবস্থানের স্থান নির্দেশ করে দিলেন, রাত্রে আশ্রমেই আহার গ্রহণ করতে বললেন। বিরাট আশ্রম,

শিবমন্দিরে নিত্য পূজার্চনা। এখনো সন্ধ্যা হতে দেরি। তাড়াতাড়ি স্নানাদি সেরে নিলাম, সারাদিনের ক্লান্তি দূর হল। মঙ্গলদাস বললেন, 'কাছেই ভবনাথ-মন্দির, শ্রীশঙ্কর ভবনাথ দর্শন করে আসুন।'

ভবনাথ-মন্দিরে গেলাম। সুন্দর মন্দির, মূর্তিও সুন্দর। মধ্যে শ্রীভবনাথ শঙ্কর, পার্শ্বে জননী পার্বতী ও শ্রীগণেশজী। দর্শন-প্রণামাদি সেরে ফিরে আসছি এমন সময় একজন সাধুর সঙ্গে আলাপ হল। ভবনাথ-মন্দিরের বাহিরে তিনি আশ্রম করেছেন। নাম—সচ্চিদানন্দ সরস্বতী। খুব আন্তরিকতার সহিত চা তৈরী করে খাওয়ালেন। গীর্নার যাব শুনে তিনি বললেন, 'দু-একদিন বাদে আমাকেও গীর্নারে যেতে হবে, এই তীর্থের সঙ্গে আমার পরিচয় বিশ বছরের, মাসে অন্ততঃ একবার পাহাড়ে যাওয়া চাই-ই চাই। 'ভোর পাঁচটায় যাত্রা শুরু করি, দ্বিপ্রহরে ফিরে আসি। প্রায় দশ হাজার সিঁড়ি উঠতে হয়, একা আপন মনে উঠি, অন্ততঃ দশ হাজার বার ঈশ্বরের নাম জপ হয়। কি যে আনন্দ পাই, আপনাকে কী আর বলব!' সন্ন্যাসীর কথা শুনে খুব আনন্দ হল।

সচ্চিদানন্দজী বললেন, 'এখানে দর্শনীয় অনেক কিছু, মোটামুটি আপনাকে বলছি: বামনেশ্বর শিব, মুচুকুন্দ মহাদেব, দামোদর-কুণ্ড, রেবতী-কুণ্ড, হনুমানজী, আরও অনেক দেব-দেবীর মন্দির গীর্নারের পাদদেশে কাছে ও দূরে ভক্তগণ দর্শন করেন। চড়াইপথে ভর্তৃহরি-গুহা, রাজলক্ষ্মী-গুহা, অম্বিকা-শিখর, গোরক্ষ-শিখর, দত্তাত্রেয়-শিখর, নেমিনাথ, মহাকালী, পাণ্ডব-গুহা, ভরতবন, হনুমানধারা, জটাশঙ্কর প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। কিন্তু এত সব দর্শন করা একদিনে সম্ভব নয়, এখানে কিছুদিন থাকতে হয়। আপনার পক্ষে তা সম্ভব নয়, জানলাম। আপনি এক কাজ করবেন, প্রধান রাস্তা ধরে সর্বশেষ দত্তাত্রেয়-শিখর পর্যন্ত উঠবেন, এর মধ্যে প্রধান যা দর্শনীয় সবই পাবেন। তীর্থযাত্রীরা সাধারণতঃ এইভাবেই গীর্নার দর্শন করেন। যাঁরা পরিক্রমা করেন, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র, তাঁরা কিছুদিন এখানে থেকে ধীরেসুস্থে আশপাশের সবকিছু দর্শন করেন। প্রতিবৎসর কার্তিক শুক্লা প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত গীর্নার-পরিক্রমার সময়। রাসপূর্ণিমায় বিরাট মেলা হয়, এসময় বহু তীর্থযাত্রীর সমাগমে স্থানটি জনারণ্যে পরিণত হয়।'

সচ্চিদানন্দ মঙ্গলদাসের আশ্রম পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এসে নমস্কার জানিয়ে নিজের আশ্রমে ফিরে গেলেন। তাঁর আন্তরিকতা ও সৌজন্যে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না।

মঙ্গলাশ্রমে আরতি আরম্ভ হয়ে গেছে। খাওয়ার ঘণ্টা পড়ল রাত্রি সাড়ে ন'টায়। অতিথি অভ্যাগত সকলের সঙ্গে বসলাম। থালায় এক একখানি বড় রুটি ও সামান্য ডাল পরিবেশিত হল। বাজরার রুটি, বাংলাদেশের ১০।১২ খানা রুটি একত্র করলে যা হয়। অর্ধপক্ক রুটি ও অর্ধসিদ্ধ ডাল খেলে বিদেশে নিঃসঙ্গ অবস্থায় অসুস্থ হবার ভয়। সামান্য একটু মুখে দিলাম। সঙ্গে কিছু ফল ছিল, তাই দিয়েই ক্ষুন্নিবৃত্তি করা গেল।

শিবমন্দিরের সামনেই শয়নের ব্যবস্থা। ভোরে উঠে গীর্নার যাত্রার কথা মঙ্গলদাসকে জানিয়ে রেখেছি। ঘুম আর আসতেই চায় না; ভোরের দিকে একটু তন্দ্রা এসেছে এমন সময় ঘড়িতে ঢং ঢং করে চারটে বাজল। শিবমন্দির সম্মার্জনা হচ্ছে, মঙ্গলারতি হবে। প্রাতঃকৃত্য ও স্নানাদি সমাপনান্তে মঙ্গলারতি দর্শন করলাম।

আজ ১২ই জুলাই, ১৯৬৫ সোমবার—জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। শ্রীদুর্গা স্মরণ করে ভোর পাঁচটায় যাত্রা করলাম। কে যেন টেনে নিয়ে চলেছে কোন্ এক অজানার আকর্ষণে! এখনও চারদিক পরিষ্কার হয়নি, আবছা অন্ধকার রয়েছে। এখানে আশ্রমের যাত্রীরাও এখনও যাবার জন্য তৈরী হয়নি, পরে যাবে। মঙ্গলদাসের আশ্রম থেকে গীর্নারের পাদদেশ পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে কয়েকটি বড় জৈন ধর্মশালা ও সন্ন্যাসীদের আখড়া আছে; গতকাল সন্ধ্যায় এগুলি দূর থেকে দেখেছি।

কাছেই একটি দোকানে লোকজন উঠেছে দেখে সেখানে গিয়ে কিছু প্রাতরাশের প্রত্যাশী হলাম, কারণ রাত্রে প্রায় কিছুই খাওয়া হয়নি, তার উপর পাহাড় চড়াই করতে হবে! দোকানদার খুব ভদ্র, সানন্দে চা-পানের ব্যবস্থা করলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'যাত্রীদের সঙ্গে দেখা হবে তো?' বললেন—'এখনও কেউ যায়নি, আপনিই প্রথম। আমরা এই সময়েই যাত্রা করি, এই-ই উপযুক্ত সময় বারোটার মধ্যে এখানে ফিরে এসে বাস ধরতে পারবেন, আমার দোকানের সামনেই ঐ বাসস্ট্যাণ্ড। কোন ভয় নেই। পথে কোন হিংস্র জন্তু নেই। বিদেশী লোকে বলে গীর্নারে সিংহের ভয়। সিংহ আছে সংরক্ষিত বনে—এখান থেকে অনেক দূরে। গীর্নারে বড়জোর দু-একটা খরগোশের দৌড়াদৌড়ি দেখবেন। চমৎকার সিঁড়ি রয়েছে, উঠতে কোন কষ্ট হবে না। কিছু পরে লোকজন পাবেন।' ভদ্রলোকের কথায় খুব উৎসাহ ও সাহস এল।

কিছুদূর অগ্রসর হয়েই সিংহমূর্তিচিহ্নিত বিরাট প্রবেশদ্বার। প্রথম থেকেই সিঁড়ি শুরু। সামনে গীর্নার—বহু-আকাঙ্ক্ষিত গীর্নার! অসংখ্য সাধু ও ভক্তের তপঃপূত গীর্নার স্বমহিমায় দণ্ডায়মান হয়ে যুগ যুগ ধরে তীর্থযাত্রীদের আহ্বান করছে! এই তপঃক্ষেত্রে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ এসেছিলেন ও তপস্যা করেছিলেন। কত সৌভাগ্য, এই তীর্থ দর্শন করতে চলেছি! দেশবিদেশের পর্যটক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিৎ, কবি, শিল্পী, সাধক ও ভক্তদের আকর্ষণস্থল গীর্নারের উদ্দেশে অন্তরের প্রণতি নিবেদন করলাম। 'জয় গীর্নার বিশালকী' বলে অগ্রসর হতে লাগলাম। একটির পর একটি সিঁড়ি অতিক্রম করছি। পাহাড় কেটে কেটে সিঁড়িগুলি তৈরী। এমন প্রশস্ত যে পতনের কোন আশঙ্কা নেই। প্রত্যেকটি সিঁড়ি নিখুঁতভাবে তৈরী। মনে হল দুর্বল ও বৃদ্ধ মানুষও এই সোপানশ্রেণী ধরে ধীরে ধীরে গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারে। সিঁড়িগুলি দেখে খুব আনন্দ হল। একটির পর একটি সিঁড়ি উঠেছে আবার কিছুদূর নেমেছে, এমনি চড়াই-উৎরাই-এর মাধ্যমে পর্বতশীর্ষে অভিযান—অনায়াসসাধ্য আরোহণ! যাঁরা এই সোপান-শ্রেণী প্রস্তুত করেছেন, অভিযাত্রীরা তাঁদের কতই না সাধুবাদ দেন।

আবছা অন্ধকার, তদুপরি চারিদিক কুয়াসাচ্ছন্ন। আশপাশের কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। কাছে কিন্তু সবই দেখা যাচ্ছে। দৃষ্টি সম্মুখে নিবদ্ধ রেখে এগিয়ে যাচ্ছি। কিছুদূর গিয়ে এক মন্দিরে মহাবীরজীর বিরাট মূর্তি দেখলাম—হনুমানজীর সর্বাঙ্গ সিন্দুরলিপ্ত। যিনি রামনামে অটল বিশ্বাস রেখে অক্লেশে সমুদ্র লঙ্ঘন করেছিলেন, সেই মহাবীরকে ভক্তিভরে প্রণাম করলাম। শুরুতেই মহাবীরের দর্শন, বিশ্বাস হল যাত্রা নির্বিঘ্ন হবে।

পথে জনপ্রাণী নেই, আপন মনে চলেছি। সোপানাবলীর দক্ষিণে বামে কত ছোট বড়

মন্দির—কোনটিতে সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্তি, কোনটিতে দেবাদিদেব মহেশ্বরের, কোনটিতে দেবীমূর্তি। সকাল হয়েছে, আর একটুও অন্ধকার নেই। কিন্তু কুয়াসা একই প্রকার রয়েছে! চারদিকে গাছপালা আছে শুনেছিলাম, কিন্তু কুয়াসায় সে-সব কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পাখীদের কলরব শোনা যাচ্ছে, মনে হল তারা প্রভাতে ভগবানের জয়গান করছে।

পিছন ফিরে তাকালাম, কেউ আসছে কিনা দেখতে। কাউকে দেখা গেল না। তবে কি একা অগ্রসর হতে হবে এই ঘন কুয়াসাচ্ছন্ন পথে! ভয় হল। আশা ও উদ্বিগ্নতায় মন আচ্ছন্ন! ফিরে যাই, আর এগিয়ে কাজ নেই। হয়তো কোন বিপদ হতে পারে। মনে পড়ল উপনিষদের কথা—'দ্বৈতাদ্বৈ ভয়ম্', দ্বৈত থেকেই ভয়। এক আত্মাই তো বিরাজমান—সর্বভূতে সমভাবে! সব ভয় চলে গেল।

ঠক্ ঠক্ শব্দ কানে আসছে। তালে তালে অবিরাম ধ্বনি! কিসের শব্দ? ছেনি দিয়ে পাথর কাটার শব্দ? তাও তো নয়! তবে কি? শব্দ ক্রমশঃ নিকটতর হতে লাগল। দেখলাম লাঠি ঠক্ ঠক্ করে চারজন লোক একটি ডাণ্ডি নিয়ে আসছে, ডাণ্ডির মধ্যে একজন প্রৌঢ়বয়স্ক তীর্থযাত্রী, পিছনে পিছনে আরও দু-তিনটি ডাণ্ডি আসছে।

আরও কিছুটা চড়াই-এর পর রামমন্দির পাওয়া গেল। মন্দিরে শ্রীরাম সীতা লক্ষ্মণ ভরতাদির সুন্দর মূর্তি। অনেকখানি চড়াই-এর পর কিছু বিশ্রামেরও প্রয়োজন হয়েছে। এমন সুন্দর স্থানে কিছুক্ষণ কাটানো বড়ই আনন্দের। এখানে জলপানের ব্যবস্থা আছে। এখন সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কুয়াসা অন্তর্হিত। ছোট বড় গাছপালা, বনে নানা রকম পাখী ও দু-একটি খরগোশ দৃষ্টিগোচর হল। চতুর্দিকে পাহাড়ের পর পাহাড় চলেছে। দূরে নিবিড় অরণ্য, নীচে প্রবহমাণ নদী, আরও দূরে জুনাগড় শহর দেখা যাচ্ছে। যেন সব ছবির মতো। প্রকৃতির সৃষ্টিবৈচিত্র্য-দর্শনে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না।

একটি যুবককে দ্রুত আসতে দেখলাম। ছেলেটি কাছে এসে বলল, 'জয় গীর্নার বিশালকী।' স্বাস্থ্যবান বলিষ্ঠ যুবককে দেখে আনন্দ হল। ভাবলাম—তবে তো ভগবানের কৃপায় ভাল সাথী মিলল! ছেলেটি ভদ্র ও বিনয়ী। বয়স ২২।২৩, নাম গণেশপ্রসাদ, বাড়ি বিহারের দ্বারভাঙ্গায়। খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্মী। স্কুল ফাইন্যাল পাস করার পর অর্থাভাবে কলেজে পড়তে পারেনি, পড়াশুনায় আগ্রহ আছে। ছুটিতে তীর্থদর্শনে এসেছে। আর দুজন সঙ্গী পিছনে আসছে—সে একটু এগিয়ে পড়েছে।

তার সঙ্গে গল্প করতে করতে এগিয়ে চলেছি। দেশসেবার কথা উঠল। গণেশপ্রসাদের দেশ-সেবার আগ্রহ আছে বুঝলাম। বললাম—'যদি ঠিক ঠিক দেশের সেবা করতে চাও, তবে স্বামীজীর গ্রন্থাবলী ভাল করে পড়লে যথাযথ দিগ্‌দর্শন পাবে।' গণেশপ্রসাদ বলল, 'সত্যই যুগাচার্য বিবেকানন্দের আদর্শের মধ্যে কোন ভেজাল নেই, সব দিক দিয়ে এমন নিখুঁত আদর্শ আর কোথাও নেই।' একটি বলিষ্ঠ যুবকের মুখে এই কথা শুনে সত্যই আনন্দ পেলাম, বললাম—'গণেশপ্রসাদ, স্বামীজীর বাণী ও রচনা অনুধ্যান কর, দেখবে মহাসমুদ্রের মতো গভীর, সেখানে মিলবে অপর্যাপ্ত রত্নের সন্ধান। স্বামীজীর ভাব পেলে যেখানেই থাক, যাই কর, খাঁটি মানুষ হবে। নিজে স্বামীজীর বই পড়বে, বন্ধুরাও যাতে পড়ে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করবে।' 'নিশ্চয়ই করব' বলে গণেশপ্রসাদ সানন্দে সম্মতি জানাল। কথা কইতে কইতে ১৫০০ ফুট উপরে 'ভৈরো

ঝম্পা' নামে একটি স্থানে এসে দাঁড়ালাম। এখান থেকে হাজার ফুট নীচে গভীর খাদে লাফিয়ে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দিলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়—এইরূপ কিংবদন্তী আছে!

দেখতে দেখতে আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। বৃষ্টিও শুরু হল, বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। এখানে তো আশ্রয় নেই! দূরে গুহায় হয়তো দাঁড়ানো যেতে পারে, কিন্তু সে পথ বিপদসঙ্কুল। অগত্যা এগিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। ঝড় বইছে। ছাতা খোলে কার সাধ্য! এমন জোর হাওয়া যে ফেলে দেবে!

গণেশপ্রসাদ বলল, 'কদিন আগে ঝড়ের জন্যে বহু যাত্রী উপরে যেতে না পেরে মাঝ পথ থেকেই ফিরে গেছে শুনেছি।' আমরা কিন্তু ভগবানকে স্মরণ করে এগিয়েই চললাম। কিছুক্ষণ পরে বাতাসের বেগ ক'মল, বৃষ্টি কিন্তু একেবারে থামল না। অতি সন্তর্পণে পর্বতোপরি বিস্তৃর্ণ প্রাঙ্গণে উপনীত হলাম। এখানে পাহাড় কেটে তোরণ নির্মাণ করা হয়েছে। তোরণের পরে দুর্গের মতো দুর্ভেদ্য প্রাকারবেষ্টিত ষোলটি জৈন মন্দির। এর মধ্যে শ্রীনেমিনাথের মন্দিরই প্রধান। জৈন মন্দির-গুলির নির্মাণকার্য অদ্ভুত, দেখবার মতো জিনিস বটে। স্থাপত্য ও শিল্পকলার উজ্জ্বল নিদর্শন। বহুমূল্য মণিমাণিক্য ও রত্নাদিতে মন্দিরগুলির মধ্যভাগ শোভিত। একটি মন্দিরে আদিনাথের মূর্তি ও একটিতে পরেশনাথের মূর্তি দর্শন করলাম। তীর্থঙ্করদের মূর্তিগুলি প্রাণবন্ত! দেখলে প্রাচীন মহাপুরুষদের উদ্দেশে মস্তক আপনা থেকেই নত হয়ে যায়, অতীত গৌরবে প্রাণ ভরে ওঠে। বিস্তৃর্ণ ক্ষেত্রটির নাম উপর-কোট, উচ্চতা ২,৩৭০ফুট। 'কোট' শব্দের অর্থ দুর্গ। পরিখাগুলির গঠনকার্য দেখলে মনে হয় এককালে এখানে দুর্গ ছিল। এর কাছাকাছি আছে ভীমকুণ্ড, সূর্যকুণ্ড, জৈন ধর্মশালা, কিছু দোকানপাট।

আরও এগিয়ে গিয়ে প্রধান রাস্তার পাশে একটি সাধুর আখড়ায় উপস্থিত হলাম। এখানে একটি কুণ্ড, শিবমন্দির, গঙ্গাদেবীর মন্দির দর্শন করলাম। কুণ্ডে অনেকে স্নান করে শিবের ও গঙ্গাদেবীর পূজা দেয়। সেখানে একজন অতি অমায়িক সাধুর সঙ্গে আলাপ হল। কিছুক্ষণ তাঁর কাছে বসলাম। চা ও গরম ছোলাভাজা দিয়ে আমাদের আপ্যায়িত করলেন। বললাম —'গীর্নারের সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলুন।' সাধুজী বললেন, 'গীর্নার অতি পবিত্র, এ যেন বিভিন্ন ধর্মের মিলনক্ষেত্র। দেশ-বিদেশের বহু ধর্মের লোক এখানে আসেন। এর প্রাচীনত্ব গবেষণার বস্তু। রৈবত, রৈবতক ও উজ্জয়ন্ত নামেও এর প্রসিদ্ধি। শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় ছিলেন, তখন এই পর্বত যাদবগণের ক্রীড়াভূমি ছিল। শ্রীবলরাম ও রেবতীরও লীলাস্থল ছিল এই পর্বত। এটিকে যোগীদের শ্রেষ্ঠ তপোভূমি বলা হয়। এখানে অসংখ্য গিরিগুহা। বহু সাধু এখনো এখানে তপস্যা করেন। খুব বেশী ঠাণ্ডা ও খুব বেশী গরম নয় এ স্থান অথচ নির্জন, জল সুলভ এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাওয়াও খুব কঠিন নয় বলে স্থানটি তপস্যার বিশেষ অনুকূল। ভগবান দত্তাত্রেয় এখানে গুরুরূপে বাস করেন।' আবার বললেন, 'বহু খনিজ পদার্থের আকর এই গীর্নার পর্বত।'

সাধুজী ফেরার পথে তাঁর ওখানে প্রসাদ পেয়ে যেতে বললেন। কিন্তু তাহলে বাস ধরা সম্ভব হবেনা বলে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা দুজনে অগ্রসর হতে লাগলাম। আরও কিছু চড়াই-এর পর অম্বিকা-শিখরে পৌছলাম। এইটিই গীর্নারের প্রথম চূড়া, উচ্চতা প্রায় তিন হাজার ফুট। 'বস্ত্রাপথক্ষেত্র'-সহ গীর্নারের খ্যাতি

দেশবিদেশে প্রচারিত। প্রচলিত কিংবদন্তী এইরূপ : একদা শিব ও গৌরী সকাশে ভগবান বিষ্ণু ব্রহ্মাদি দেবগণ-সহ উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, 'ভগবন্, দৈত্যেরা আপনার বলে বলীয়ান হয়ে স্বর্গরাজ্য অধিকারে উদ্যত, তারা মহা অনর্থের সৃষ্টি করছে। সৃষ্টি রক্ষা হবে কিরূপে? পালনকার্যও অসম্ভব হয়ে উঠেছে।' শুনে মহেশ্বর রুষ্ট হয়ে হঠাৎ অন্তর্হিত হলেন। রোষবশে যথেচ্ছ বিচরণ করতে করতে গীর্নারে এসে পরিধেয় বস্ত্র ত্যাগ করলেন। গীর্নারের যে স্থানটিতে শিব বস্ত্রত্যাগ করেছিলেন, সেই স্থানকে 'বস্ত্রাপথক্ষেত্র' বলা হয়। পার্বতী উজ্জয়ন্ত শিখরে অম্বা নামে বিশেষভাবে বিরাজ করেন বলে ভক্তদের বিশ্বাস। অনেকে বলেন, এটি ৫১ পীঠের একটি পীঠ, এখানে সতীর উদর-প্রদেশ পড়েছিল। অম্বাজীর মন্দিরের পাশে একটি ঝরণা আছে।

অম্বাজীর মন্দির বন্ধ ছিল, শুনলাম মন্দির এখুনি খুলবে ও আরতি হবে। মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত হলে অম্বাজীকে দর্শন করলাম, অপূর্ব মূর্তি, মা মন্দির আলো করে রয়েছেন, মনে হল যেন সকলকে আহ্বান করছেন : কে কোথায় আছ, এস আমার শরণাগত হও, সব সুখদুঃখের অবসান হবে।

স্বামীজীর অম্বাস্তোত্রটি মনে উদিত হল, স্তোত্রে জগজ্জননীর যে-ভাব পরিস্ফুট, ঠিক সেই ভাবটি যেন শ্রীশ্রীঅম্বাদেবীর মূর্তিতে প্রকটিত। আপনা থেকেই মুখ দিয়ে নির্গত হল :

মিত্রে রিপৌ ত্ববিষমং তব পদ্মনেত্রম্
স্বস্থেঽসুখে ত্ববিতথস্তব হস্তপাতঃ।
ছায়ামৃতেস্তব দয়া ত্বমৃতঞ্চ মাতঃ
মুঞ্চন্তু মাং ন পরমে শুভদৃষ্টয়স্তে॥

—মা, তোমার পদ্মনেত্রের দৃষ্টি শত্রু মিত্র সকলের উপর সমভাবে পতিত, সুখী দুঃখী সকলকেই একই ভাবে তুমি স্পর্শ করছ। মা, মৃত্যুচ্ছায়া ও জীবন তোমারই দয়া। হে মহাদেবি! তোমার শুভদৃষ্টিসমূহ আমাকে যেন পরিত্যাগ না করে।

শ্রীশ্রীঅম্বাদেবীর পূজাদি দিয়ে মন্দিরে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর আবার চলা শুরু হল। অল্প উৎরাই-এর পর আবার চড়াই। ক্রমে মুণ্ডিত মস্তকের মতো পরিষ্কার একটি স্থানে উপস্থিত হলাম। এইটি গীর্নারের দ্বিতীয় চূড়া, উচ্চতা ৩,৩৬৬ ফুট। এখানে গোরক্ষনাথের চরণচিহ্নের উপর মণ্ডপ আছে। এখান থেকে ছোটবড় পাহাড়, অট্টালিকা, নদী, ঝরণা, বনজঙ্গল, সরোবর, প্রান্তর, কৃষিক্ষেত্র ও জুনাগড় শহর সুন্দরভাবে দেখা যায়। বৃষ্টি থেমে গেছে, এখন দ্রুত অগ্রসর হওয়া যাবে।

বহুপথ চড়াই-উৎরাই-এর পর আমরা গীর্নারের সর্বোচ্চ শিখর অবধূত দত্তাত্রেয়ের তপস্যাক্ষেত্রে উপনীত হলাম। এখানকার উচ্চতা পাঁচ হাজার ফুটেরও অধিক। চারটি থামের দ্বারা নির্মিত নিরাভরণ একটি ক্ষুদ্র মন্দির এখানে অবস্থিত। মন্দির-পরিক্রমার কোন স্থান নেই। মন্দিরে কোন মূর্তি নেই। মন্দিরমধ্যে বেদির উপর গুরু দত্তাত্রেয়ের শ্রীপাদপদ্ম স্থাপিত।

স্থানটিকে ঘিরে রেখেছে এক অপূর্ব পবিত্রতা ও নিস্তব্ধতা। চারিদিকে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির আবহাওয়া। মন আপনা থেকেই অন্তর্মুখ হতে চায়। মনে হয় মানুষ দেশ-দেশান্তর হতে ছুটে আসে এই পবিত্রতা অনুভব করবার জন্যে। এমনি গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে যে ধ্যানচ্ছবি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তা অনির্বচনীয়। জন্মমৃত্যু, সুখদুঃখ, উত্থান-পতন, পাপপুণ্য, আলোছায়া-ঘেরা সংসারচক্রের আবর্তনের মধ্যেও যিনি সমস্ত বৈচিত্র্য ও চঞ্চলতাকে অস্বীকার করে বিদ্যমান, স্বমহিমায় ভাস্বর সেই

'শান্তং শিবমদ্বৈতম্'-এর ধ্যানে মন যেন লীন হতে চায়।

অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে বসে রইলাম। গণেশপ্রসাদের ডাকে উঠলাম। উঠতে ইচ্ছা করে না, তবু উঠতে হল, নইলে সময়মত পৌছানো যাবে না। কী অদ্ভুত আকর্ষণ স্থানটির! এই শান্ত পরিবেশে এসে পথক্লান্তি যেন কোথায় চলে গেছে! কবি ঠিকই বলেছেন:

উঠিয়া পর্বতচূড়ে ধরণীরে হেরি দূরে
পথের তো দুঃখকষ্ট ভ্রম মনে হয়!

মন্দিরের পূজারী বললেন, 'কাল গুরুপূর্ণিমা, এখানে বিশেষ পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। আজ আমাদের কমণ্ডলু আশ্রমে থাকবেন চলুন।' সময় নেই, আজই ফিরতে হবে, তাই পূজারীর সাদর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে হল।

শ্রীশ্রীদত্তাত্রেয়কে ভক্তিপূর্ণ প্রণতি নিবেদন করে আমাদের প্রত্যাবর্তনের পালা শুরু হল। এখান থেকে নীচে অন্যপথে ব্রহ্মার কমণ্ডলু হ্রদ দর্শনীয়, সময়াভাবে যাওয়া হল না, উদ্দেশে প্রণাম করলাম।

ফেরার পথে গণেশপ্রসাদের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হল। গণেশপ্রসাদ সশ্রদ্ধভাবে বিদায় নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে মিলল। এখন আপন মনে আপন ভাবে এই পুণ্য তীর্থের মাহাত্ম্য স্মরণ করে চলতে লাগলাম। বহুলোক আসছে দেখলাম, স্কুল-কলেজের অনেক ছাত্রও রয়েছে তাদের মধ্যে। বেলা বারোটায় গীর্নারের পাদদেশে পৌছে দেখলাম জুনাগড়ের বাস দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিকটস্থ দোকানে কিছু জলযোগ করে নিয়ে বাসে করে জুনাগড় বাস-স্টেশনে এসে অনেকক্ষণ বিশ্রামের সময় পাওয়া গেল। বৈকালে রাজকোটের বাস ছাড়বে। মানসপটে গীর্নার-ভ্রমণের উজ্জ্বল স্মৃতি নিয়ে সন্ধ্যাকালে রাজকোট শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে উপস্থিত হলাম। সাত ঘণ্টায় পর্বতের শীর্ষে আরোহণ ও পাদদেশে অবতরণ বিশেষ আয়াস-সাধ্য না হলেও সর্বাঙ্গে বেদনা ছিল তিন দিন পর্যন্ত।

ছুটে চলি আমি

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

বিস্মৃত দিনের পানে
চেয়ে চেয়ে ভাবি—
কি যেন হারিয়ে গেছে!
পুরোভাগে নিরুদ্দেশ সীমাহীন পথ!
যত দূর চেয়ে দেখি—
অস্পষ্ট আঁধারে ঢাকা,
মনে হয় দূর ভবিষ্যৎ!
দিক্‌চক্রবাল-পারে—
যেখানে সুনীল নভঃ নত হ'য়ে গেছে
মাঠের সীমায়,
সে সুদূর হ'তে
ইঙ্গিতে কে যেন মোরে ডাক দিয়ে যায়!
বুকে জাগে আশা,
প্রধ্বনিত হ'য়ে ওঠে
যেন কোন্ অকথিত ভাষা
আমার মর্মের মাঝে!
প্রাণের আবেগ নিয়ে
ছুটে চলি আমি—
কি যেন পাওয়ার তরে
দুরন্ত নেশায়!

দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়ায় স্বামীজী

ব্রহ্মচারিণী উষা

[অনুবাদক—শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়]

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্বামীজীর একটি সাধারণ বক্তৃতায়, বোধ হয় পাসাডেনা সেক্সপীয়র ক্লাবে, মীড ভগ্নীত্রয় তাঁকে প্রথম দেখে। তাদের নাম মিসেস ক্যারী মীড ওয়াইকফ, মিসেস এলিস মীড হান্সবরো এবং মিসেস হেলেন মীড। তাদের ভাই উইলিয়াম ছিল একটি ব্যাঙ্কের মালিক ও লসএঞ্জেলেস সমাজে গণ্যমান্য ব্যক্তি। এলিস বেদান্ত-বন্ধুদের নিকট 'শান্তি' নামে পরিচিত হয়েছিল; এই প্রবন্ধে তার ঐ নামই উল্লেখ করা হবে। ক্যারী পরবর্তীকালে স্বামীজীর গুরুভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দের নিকট হতে 'ললিতা' নাম পায়; কিন্তু তাকে 'সিস্টার' নামে উল্লেখ করা হবে; পরবর্তীকালে এই নামেই সে পরিচিত হয়। স্বামী প্রভবানন্দ, দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়ার বেদান্ত-সমিতির সভ্য বা বন্ধুদের কাছে শান্তি বা সিস্টার যা বলেছে, (অন্যরূপ উল্লেখ না থাকলে বুঝতে হবে) স্বামীজী ও মীড-ভগ্নীগণ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত বিবরণগুলি তা থেকেই নেওয়া।

শান্তি স্বামীজীর রাজযোগ পড়েছিল। স্বামীজী এর আগের বার যখন আমেরিকায় এসেছিলেন, সেই সময় এই পুস্তকটি নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয়। স্বামীজীর একটি বক্তৃতার বিজ্ঞাপন দেখে ভগ্নীগণ স্থির করে, তাঁর বক্তৃতা শুনতে যাবে। শান্তি পরে বলেছে যে, স্বামীজীর ভাষণ প্রথম দিন শুনেই সে স্বামীজীকে তাঁর কাজে সাহায্য করতে উদ্‌গ্রীব হয়েছিল। সিস্টারও প্রবলভাবে প্রভাবান্বিত হয়। সে বলেছিল যে স্বামীজী শ্রোতাদিগকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন, তিনি ভাষণ দেবার সময় মেজেতে একটি পিন পড়লেও তার শব্দ শোনা যেত।

সিস্টার ও হেলেন লাজুক ছিল; কিন্তু অপেক্ষাকৃত সাহসী ও উদ্যোগী ছিল শান্তি; সে বক্তৃতার পরে জো-র সাথে দেখা করে এবং খোঁজ নেয়, স্বামীজী পাসাডেনায় কোন ক্লাস নিতে মনস্থ করেছেন কি না? জো প্রস্তাব করে যে, শান্তি নিজেই স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করুক। শান্তি জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'তুমি আমার জন্য কয়েকটি ক্লাসের ব্যবস্থা কর না কেন?' ফলে এই দাঁড়ায় যে শান্তি স্বামীজীর সেক্রেটারী হয় এবং সর্বকনিষ্ঠা ভগ্নী হেলেন তাঁর কয়েকটি বক্তৃতার সাংকেতিক লিপি গ্রহণ করে। হেলেন 'আমার জীবন ও উদ্দেশ্য' ভাষণটির সাংকেতিক লিপি গ্রহণ করেছিল; কাজেই মীড-ভগ্নীগণের নিশ্চয়ই ২৭শে জানুআরি ১৯০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ হয়েছিল। শান্তির কর্মক্ষমতা ও নিশ্চিন্ত প্রকৃতি স্বামীজীর ভাল লাগে। তিনি শান্তি ও হেলেন উভয়কে তাঁর কাজের জন্য কর্মী হয়ে ভারতে যেতে বলেন। কিন্তু তাদের সাহস হয় নাই। শান্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের হেতু—তার কন্যা ডরোথীকে ছেড়ে সে যেতে পারে নাই। স্বামীজী ভগ্নী-ত্রয়কে 'থ্রী গ্রেসেস্' বলে ডাকতেন। তারা তখন দক্ষিণ পাসাডেনায় ৩০৯নং মণ্টের রোডে একটি ভাড়াটে বাড়িতে একত্রে বাস করত।

স্বামীজীকে বাড়ীতে আনার জন্য তাদের খুব আগ্রহ ছিল। কিন্তু তার জন্য বন্দোবস্ত নির্দিষ্ট করতে স্বামীজী উৎসাহ দেন নাই। অবশ্য একদিন প্রাতে মীডদের বাড়ির সামনে একটি ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল। ভগ্নীগণ বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হয়ে দেখল, স্বামীজী গাড়ী থেকে অবতরণ করছেন; দুয়ারের সামনে তল্পিতল্পা নাবিয়ে তিনি জানালেন, "আমি তোমাদের কাছে থাকতে এসেছি। ইহা যথেষ্ট ভদ্রমহিলার ন্যায়।" ঠিক কে যে 'যথেষ্ট ভদ্রমহিলার ন্যায়' তা পরিষ্কার নয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বামীজীর দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়ায় অবস্থানকালীন গতিবিধি জনসমক্ষে পুরোপুরি উপস্থাপিত হয় নাই এবং মনে হয় কখনও হয়ত হবেও না। স্বামী বিবেকানন্দের প্রামাণ্য জীবনীর বর্ণনা অনুসারে তিনি লসএঞ্জেলেস হোম অব ট্রুথে 'প্রায় এক মাস' কাটান এবং লসএঞ্জেলেসে থাকাকালীন মিস্ স্পেন্সারের গৃহে কিছুকালের জন্য অতিথি হন। ঘটনার আরও জটিলতা বাড়িয়েছে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুআরি তারিখের লসএঞ্জেলেস টাইমস্ পত্রিকা; তদনুসারে স্বামীজী এর কাছাকাছি সময়ে দক্ষিণ পাসাডেনার মিসেস জে, সি, নিউটনের গৃহে অতিথি ছিলেন।

আমরা জানি, স্বামীজী ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বরের প্রথম কয়েক দিনের মধ্যে লসএঞ্জেলেসে আসেন, নিশ্চয়ই ৬ই তারিখের মধ্যে তিনি তৎক্ষণাৎ মিসেস ব্লজেটের গৃহে যান। জো-র স্মৃতিকথা অনুসারে সেখানে কয়েক মাস বাস করেন। স্বামীজীর পত্রে নির্দেশ পাওয়া যায়, ২৭শে ডিসেম্বরেও তিনি ব্লজেটের গৃহেই ছিলেন। সিস্টার স্বামী প্রভবানন্দকে বলে যে স্বামীজী মীড-গৃহে ছয় সপ্তাহ বাস করেন। স্বামীজী ২০শে ও ২৫শে ফেব্রুআরির মধ্যে কোন সময়ে পাসাডেনা ত্যাগ করে উত্তর ক্যালিফর্ণিয়ায় গিয়েছিলেন, কাজেই মনে হয় তিনি ১৯০০ খৃষ্টাব্দে জানুআরির দ্বিতীয় সপ্তাহের কাছাকাছি সময়ে ৩০৯ নং মণ্টেরে রোডে এসেছিলেন। জো তার প্রকাশিত স্মৃতিকথায় অবশ্য বলেছে যে, স্বামীজী হোম অব ট্রুথে বহুসংখ্যক বক্তৃতা করেন। কিন্তু তিনি যে সেখানে বাস করেছিলেন, এমন কথা সে উত্থাপন করে নাই। জো-র, স্বামীজীর বা শান্তির ঐ সময়কার পত্রে এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যাতে বোঝা যেতে পারে যে তিনি মিস স্পেন্সার বা মিসেস নিউটনের গৃহে বাস করেছিলেন।

ভগ্নীত্রয়ের অতিথি হয়ে থাকাকালে স্বামীজীর আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব প্রবল ছিল; এ বিষয়ে ভগ্নীত্রয়ের একজন বলেছে যে, তারা বোধ করত যেন যীশুখ্রীষ্টই তাদের সঙ্গে বাস করছেন। তিনি উচ্চতম আধ্যাত্মিক সত্যগুলি শুধু প্রচারই করতেন না, নিজ জীবনে সেগুলি প্রতিফলিতও করতেন। অধিকন্তু দুরূহ আধ্যাত্মিক ভাবগুলি তিনি অত্যন্ত সরলভাবে প্রকাশ করতে পারতেন। শান্তির স্মরণ আছে যে স্বামীজী তাকে বলছিলেন, "দুই স্তরের ঐশ্বরিক অনুভূতি আছে। প্রথমটি হল 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা', এবং দ্বিতীয়টি 'ব্রহ্মই সব হয়ে রয়েছেন'।" এক সময় তিনি সিস্টারকে বলেন, "তুমি সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ।" এইভাবে তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে সে আত্মা, তার অন্তরস্থ ঈশ্বরই একমাত্র সত্যবস্তু। সিস্টার যখন বৃদ্ধা তখনও সে স্মরণ করত কি মর্মস্পর্শীভাবে ও গাম্ভীর্যের সহিত স্বামীজী এই সত্য ঘোষণা করেছিলেন।

যারা একজন দেবমানবের দৈনন্দিন সঙ্গ

লাভের সুযোগ পেয়েছে তারা তাদের বাকী জীবনে তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের বহু আপাত-তুচ্ছ খুঁটিনাটি ঘটনা স্মৃতিপটে অঙ্কিত রাখে। এগুলি ভক্তদের নিকট মূল্যবান কারণ এগুলি স্মরণ করলে সেই সাধুপুরুষের ব্যক্তিত্ব এবং তার সঙ্গে ভক্তদের সম্বন্ধ পুনরুজ্জীবিত হয়। এরূপে সিস্টার তার গৃহে স্বামীজীর অবস্থান-সম্পর্কিত প্রত্যেকটি ঘটনা মূল্যবান জ্ঞানে স্মৃতির মণিকোঠায় সঞ্চয় করে রেখেছে: তাঁকে সামান্য সেবা করার অনুমতি, কোনও বিষয়ে তাঁর মন্তব্য, তাঁর কৌতুক, তাঁর প্রতিদিনের কার্যাবলী সবই। আগ্রহবান শ্রোতাকে তার স্মৃতিভাণ্ডারের অংশীদারও করত সে।

রান্না করা, স্বামীজীর ঘর গুছান এবং বহুবিধ অন্যান্য গৃহস্থালীর কাজ নিয়েই সে ব্যস্ত থাকত। এবং এইজন্যই একদিন স্বামীজী তাকে বলেন, 'মাদাম'—এভাবেই তিনি সিস্টারকে সম্বোধন করতেন—'মাদাম, তুমি এত বেশী কাজ কর যে তাতে আমি ক্লান্ত বোধ করি। যাইহোক, কয়েকজনকে মার্থা হতে হবেই এবং তুমি হচ্ছ একটি মার্থা।'

স্বামীজী মাঝেমাঝে তরকারি কেটে, মটরের খোসা ছাড়িয়ে, মশলা পিষে রান্নাঘরে সিস্টারকে সাহায্য করতেন। তিনি ঝাল দেওয়া খাবার পছন্দ করতেন। যখন তিনি সম্বরা প্রস্তুত করতেন, বহুপরিমাণ ধোঁয়া উঠত যাতে ভগ্নীদের চোখ জ্বালা করত। সুতরাং স্বামীজী সাবধান করে দিতেন: 'ঠাকুরদা আসছেন; ভদ্রমহিলাগণকে স্থান ত্যাগ করতে আজ্ঞা হয়।'

সিস্টারের একবন্ধু একদিন দেখা করতে আসে। মহিলারা এক ঘণ্টারও অধিক কাল আলাপ করে। স্বামীজী তাদের সঙ্গেই বৈঠকখানায় বসেছিলেন এবং সারাক্ষণ সম্পূর্ণ নীরবে ধূমপান করছিলেন। বস্তুতঃ আগন্তুকের ধারণাই ছিল না তিনি কে, কারণ যাবার সময় সে জিজ্ঞাসা করল, 'এই ভদ্রলোক কি ইংরেজীতে কথা বলতে পারেন?' এতে ভগ্নীগণ ও স্বামীজী অত্যন্ত কৌতুক উপভোগ করেন।

সন্ধ্যাকালে ঠাণ্ডায় বাড়ির পশ্চাতে একটি ছোট বাগানে বসে ও ধ্যান করে আনন্দ পেতেন। তৎকালে গৃহের দক্ষিণ-পূর্ব-দিকের পার্বত্য অঞ্চলটির উন্নয়ন কিছুই হয় নাই। ঐস্থানে প্রত্যহ স্বামীজী বেড়াতেন, সঙ্গে থাকত সিস্টারের কুকুর। তাঁর জন্য ভক্তেরা কখনো বনভোজনের ব্যবস্থা করলে তাতেও যোগ দিতেন। এইরূপে একবার বাইরে যাবার সময় গৃহীত একটি ফটোতে দেখা যায়, রামকৃষ্ণ-সংঘের সাধুদের ব্যবহারের জন্য নমুনা রূপে যে টুপিটি তিনি করিয়েছিলেন, সেটি তাঁর মাথায় রয়েছে; তিনি কয়েকজন মহিলার মধ্যস্থলে বসে আছেন—সিস্টার তাঁর পশ্চাতে দাঁড়িয়ে, শান্তি তাঁর দক্ষিণে বসে।

মীড-ভগ্নীদিগকে স্বামীজী বিশেষ স্নেহ করতেন। তিনি বেট্টি লেগেটকে লেখেন, 'ঈশ্বর তাদের মঙ্গল করুন, ভগ্নী-তিনটি দেবদূত নয় কি? এখানে সেখানে এই ধরনের মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার জীবনের সকল নিরর্থকতাকে সার্থক করে তোলে।' স্বামী তুরীয়ানন্দের নিকটে এক পত্রে তিনি এদের 'অকৃত্রিম, পবিত্র ও সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ বন্ধুগণ' বলে উল্লেখ করেন। আর মীডদের গৃহ ত্যাগ করবার পূর্বে তিনি বলেছিলেন: 'তোমরা তিনজন ভগ্নী চিরতরে আমার মনের অংশ-বিশেষ হয়ে গেছ।'

স্বামীজী দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়ায় অবস্থানকালে যারা তাঁর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, যাদের তিনি

তাঁর কাজের সহায়করূপে বেছে নিয়েছিলেন এবং যাদের জীবন তিনি রূপান্তরিত করে দিয়েছিলেন, এরূপ তিনজনকে নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

তন্মধ্যে শান্তি একজন।

স্বামীজী তখনও দক্ষিণ পাসাডেনায় ছিলেন; সে সময় একদিন ওকল্যাণ্ড ইউনিটেরিয়ান গীর্জায় বক্তৃতা করতে আমন্ত্রিত হন। শান্তিকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, সঙ্গে যাবার ইচ্ছা তার আছে কিনা। বলেন, 'আমার সঙ্গে যাবার ইচ্ছা যদি হয়, তাহলে কারও জন্য যাওয়া বন্ধ কোরো না।' সুতরাং শান্তি উত্তর ক্যালিফর্ণিয়ায় যায়। স্যান-ফ্রান্সিস্কোর যে দুইজন মহিলা তাঁর গৃহস্থালীর তত্ত্বাবধান করত, শান্তি তাদের একজন; উপরন্তু শান্তি তাঁর সেক্রেটারীর কাজও করত। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ১৭ই মার্চ তারিখে এক পত্রে স্বামীজী লেখেন, 'মিসেস হান্সবরো, তিন বোনের মাঝেরটি এখানে আছে এবং আমাকে সাহায্য করতে সে শুধু কাজই করছে, কাজই করছে।'

উপসাগরীয় ক্ষেত্রে দুই মাস কাটিয়ে শান্তি বুঝল যে, তার কন্যা ডরোথীর সঙ্গলাভের জন্য তার মন খুব ব্যাকুল হয়েছে। সুতরাং সে দো-টানায় পড়ে গেল—লসএঞ্জেলেসে ফিরে যাবার জন্যও মন টানছে, আবার স্বামীজীর সঙ্গে ক্যাম্প আইর্ভিংএ যেতেও ইচ্ছে হচ্ছে। ক্যাম্প আইর্ভিংএ যাবার জন্য স্বামীজী তখন নিমন্ত্রিত। ক্যাম্প আইর্ভিং টেলের উপকণ্ঠে একটি নির্জন স্থান। স্বামীজী শান্তিকে ক্যাম্পে যেতে বিশেষ অনুরোধ করেন। তিনি তাকে বলেন, 'আমি তোমাকে ধ্যান করতে শেখাব।' সুতরাং সে গেল। ক্যাম্পে ভক্তদের মধ্যে 'উজ্জ্বলা' ছিল। পরে সে স্মৃতিকথায় বলে যে ঐ নির্জন স্থানে থাকাকালে স্বামীজীর প্রয়োজন মেটাতে শান্তি সর্বদা ব্যস্ত থাকত। উজ্জ্বলার স্মৃতিকথায় আছে যে, একদিন প্রাতে স্বামীজী দেখলেন শান্তি রান্নাঘরে আহার্য প্রস্তুত করছে; এদিকে ক্লাসের সময় হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'শান্তি, ধ্যান করতে যাবে না?' উত্তরে সে বলে, 'হ্যাঁ যাব, তবে আগে এই ঝোলটা ফোটাতে হবে, এটা শেষ করে তার পর যাব।' তখন তাকে বলেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে। আমার গুরুদেব বলতেন, সেবা করার জন্য প্রয়োজন হলে ধ্যান ছেড়ে তা করতে পারা যায়।'

এক সময় ক্যাম্পে চব্বিশ ঘণ্টা বৃষ্টি হয়। স্বামীজীর তখন জ্বর; তিনি খুবই অসুস্থ। শান্তি তাঁর জন্য যা করা সম্ভব সবই করেছিল। স্বামীজী পরে জো-কে বলেন, 'ভগ্নীটি এত দরদ দিয়ে আমার শুশ্রূষা করেছে, তুমিও তা অনুমান করতে পারবে না।' ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ৭ই সেপ্টেম্বর জো হেলেন মীডকে পত্রে এইরূপ লিখে। শান্তির আন্তরিক শুশ্রূষা উজ্জ্বলার মনেও গভীর রেখা-পাত করে। একদিন রাত্রে অজস্রধারে বৃষ্টি পড়ছে; শান্তি সেই বৃষ্টির মধ্যেই দাঁড়িয়ে স্বামীজীর তাঁবুর ওপর একখানা অতিরিক্ত ক্যাম্বিসের টুকরো তুলে বিছিয়ে দিচ্ছে; এত যে বৃষ্টি হচ্ছে, সে নিজে যে ভিজে ঢোল হয়ে যাচ্ছে—সেবিষয়ে ভ্রূক্ষেপই নাই। দৃশ্যটিতে তার মনে এত গভীরভাবে দাগ পড়েছিল যে, ৫০ বৎসর পরে এখনও তার মনে তা স্পষ্ট হয়ে আছে।

তারপর ছিল সিস্টার। স্বামীজী যখন ক্যালিফর্ণিয়ায় আরব্ধ কাজ চালাবার জন্য তাঁর গুরুভাই তুরীয়ানন্দকে পাঠান, মীড-ভগ্নীগণ তাঁকে সাগ্রহে গ্রহণ করে এবং সিস্টার তাঁর শিষ্যা হন। একদিন স্বামী তুরীয়ানন্দ সিস্টারকে বলেন: 'তোমাকে একটি কাজ করতে হবে;

কাজটি করতে হবে কিন্তু নীরবে।' প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে সে তার যথাসর্বস্ব স্বামী প্রভবানন্দকে দান করে। তিনি দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়ার বেদান্ত-সমিতির গোড়াপত্তন করেন তার হলিউডের গৃহেই।

পরবর্তী জীবনে যারা সিস্টারকে দেখেছে তারা সকলেই একমত যে, সে একটি সাধিকা ছিল। তার সত্যবাদিতা ছিল আদর্শস্থানীয়; তবু, কারও মনে আঘাত লাগতে পারে এরূপ কিছু করা বা বলা সে সর্বথা বর্জন করে চলতে সক্ষম ছিল। তার প্রবীণতা, শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদদের সঙ্গলাভ, এবং স্থানীয় বেদান্ত প্রচার-কার্যে সাহায্যদান যদিও তাকে স্বতন্ত্র সুবিধার অধিকারিণী করতে পারত, তবু সে ছিল বিনয়ের মূর্তি। এমন কি যখন সে অশীতিপর বৃদ্ধা তখনও সে সরে দাঁড়িয়ে দরজার ভিতর দিয়ে বয়োকনিষ্ঠ লোককে প্রথম যেতে দিত। এই আত্মবিলুপ্তি ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক; কোনও কৃত্রিমতা ছিল না তাতে।

স্বভাবতঃ সিস্টার চুপচাপ থাকত এবং নির্জনতাপ্রিয় ছিল। কিন্তু তার সম্মুখে যখন কেউ বিবেকানন্দের নাম করত, তখন সে এক ভিন্ন ব্যক্তি হয়ে যেত। সে তাঁর কথা বলতে ভালবাসত এবং খুবই উৎসাহের সঙ্গে তা বলে চলত। যে যখন তাঁর কথা বলত তখন বোঝাতে চেষ্টা করত কি অনুপম দেবমানব তিনি ছিলেন! তার ও শান্তির কথা শুনে শ্রোতাদের মনে হত, স্বামীজী যেন এখনো তাদের কাছে জীবন্ত হয়ে রয়েছেন।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সিস্টার নিয়মিত-ভাবে দিনে তিনবার ধ্যান করত। স্বামী প্রভবানন্দ এক সময়ে লক্ষ্য করেন যে, মন্দিরে ঠাকুরকে প্রণাম করার সময় সে বহুক্ষণ সাষ্টাঙ্গ হয়ে থাকে। সেকথার উল্লেখ করলে সে ক্ষমা-প্রার্থনা ক'রে বোঝাতে চেষ্টা করে যে, তার জ্যোতিদর্শন হয় অনেকক্ষণ এভাবে থাকার পর। সে সরল মনে অনুমান করে নেয় যে, যারা কম সময় সাষ্টাঙ্গ হয় তারা তার চেয়ে আধ্যাত্মিকতায় বেশী অগ্রগামী এবং তাদের জ্যোতিদর্শন হয় অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে।

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে ৯০ বৎসর বয়সে সিস্টার দেহত্যাগ করে। শেষ সময় তার মন শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের নিকট চলে যায়, যাঁদের আশীর্বাদ সে পেয়েছিল। তাই জ্ঞান হারাবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সে তিনবার বিবেকানন্দ ও তুরীয়ানন্দের নাম উচ্চারণ করে। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমা

শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ

ক্ষমারূপা তপস্বিনী, জননী আমার
বিশ্ব-মাতৃহৃদয়ের স্নেহপারাবার
ভক্তিপটাবৃত জ্ঞান, স্নিগ্ধ চন্দ্রলেখা
দেখাও জীবনপথে দীপ্ত দীপশিখা !

তোমার অসীম স্নেহ আকাশের পটে
ধরণীর সব ঠাঁই, সর্ব প্রাণ-ঘটে।
দুঃখ-দুর্গে বন্দী যবে সংসারেতে প্রাণ
তুমি মা শুনাও আসি মুক্তি-জয়গান !

চিদানন্দময়ী তুমি, করুণা-রূপিণী
অমিয়-নির্ঝররূপা, অন্তরযামিনী।
ভক্তি-প্রেমস্বরূপিণী, অনন্ত, উদার
হাসমুখে লইয়াছ সন্তানের ভার !

ধরাধামে অবতীর্ণা মহাশক্তি তুমি
আসিয়া করেছ ধন্য এ ভারতভূমি।
দিব্য জ্ঞান শক্তি রূপে প্রাণ পূর্ণ ক'রে
বিকশিত হও মা গো সবার অন্তরে।
অমৃত-সন্তানগণ জাগিয়া আবার
ধরাধামে স্বর্গরাজ্য করুক বিস্তার !

সন্ন্যাস-জীবনে শাস্ত্রচর্চার প্রয়োজনীয়তা

জনৈকা সন্ন্যাসিনী

(পূর্বানুবৃত্তি)

মুণ্ডকোপনিষদের প্রশ্ন, "কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি—" কাহাকে জানিলে এই সকলই জ্ঞাত হওয়া যায়?

গীতায় শ্রীভগবান বলিতেছেন—

"জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥"

অর্থাৎ অপরোক্ষানুভূতির মদ্‌বিষয়ক এই নিঃশেষে উপদেশ দিব। স্বানুভূতির সহিত তাহা লাভ করিলে সংসারে আর অন্য কিছুই জ্ঞাতব্য থাকে না।

শ্রীভগবান বলিতেছেন—

"সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানম্ বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥"

যে জ্ঞান দ্বারা অব্যক্ত হইতে স্থাবর পর্যন্ত বহুধা বিভক্ত সর্বভূতে এক অবিভক্ত আত্মবস্তু দৃষ্ট হন, সেই অদ্বৈত আত্মদর্শনরূপ সম্যক্ জ্ঞানকে সাত্ত্বিকজ্ঞান বলে।

আর্য, অনার্য, স্ত্রীপুরুষ সকলেরই এই আত্মজ্ঞানে বা ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে। সন্ন্যাসী ত' ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিবেন বলিয়াই ত্যাগব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। মনুসংহিতা বলিতেছেন—

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্॥"

ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়সংযম, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ এই দশটি ধর্মের লক্ষণ। শ্রীশংকরাচার্য "বিদ্যার আমি" রাখিয়াছিলেন, অদ্বৈতমত প্রচারের জন্য। তিনি সর্বত্র বেদান্তের জয়ডঙ্কা বাজাইয়াছেন—জ্ঞান বিনা মুক্তি নাই। শ্রুতিও বলিতেছেন—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

আদিত্যবর্ণ পুরুষকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়—মোক্ষের আর অন্য কোন পথ নাই। অস্মিন্ বিদ্বচ্ছরীরে পতিতে স্থিতে বা স মুক্ত ইতি। শ্রুতিরপি সদৈব মুক্ত ইতি। ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি, বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে। শ্রীভগবান বলিতেছেন—

"রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্॥"

অতিগুহ্য অনুভবযুক্ত এই ব্রহ্মবিদ্যা উত্তম, পবিত্র, সাক্ষাৎ ফলপ্রদ, ধর্মসঙ্গত, সহজসাধ্য ও অক্ষয়-ফলযুক্ত। এই জ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যা শাস্ত্র অধ্যয়ন-জনিত বুদ্ধিসীমিত জ্ঞান বা বিদ্যা নহে; ইহা বুদ্ধিরও অতীত প্রত্যক্ষ অনুভূতি। ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী সম্বন্ধে শাস্ত্র তাই বলিতেছেন যে, যিনি কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম পরিত্যাগ করিয়া নির্মলচিত্ত হইয়াছেন, যিনি বিবেক-বৈরাগ্যবান, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী। শাস্ত্রচর্চা মনে বিবেকবৈরাগ্য উদ্দীপ্ত করিবার, মনকে ব্রহ্মাবগাহী হইবার পথে প্রেরণ করার সহায়ক। সন্ন্যাসগ্রহণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্মজ্ঞান লাভ করা। তাহার প্রস্তুতি হিসাবে শাস্ত্রে সাধনচতুষ্টয়ের কথা বলা হইয়াছে। "তত্ত্বজ্ঞানাধিকারীর প্রথম নিষ্কাম

কর্মনিষ্ঠা উৎপন্ন হইবে; তৎপরে অন্তঃকরণের শুদ্ধি, তদনন্তর শমদমাদি সাধনপূর্বক সর্বকর্মের সন্ন্যাস ও তাহার পর বেদান্ত-বাক্যবিচারযুক্ত ভগবদ্‌ভক্তিনিষ্ঠা জন্মিবে। ভক্তি হইলে তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠা এবং তাহা হইলেই ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যার নিবৃত্তিপূর্বক জীবন্মুক্তি বা বিদেহমুক্তিলাভ হইবে। আত্মজ্ঞান—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ব্যতিরেকে হয় না, শ্রুতি বলিতেছেন—আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। প্রাচীনকাল হইতেই সাধকগণের জন্য চারিটি সাধনার কথা শাস্ত্রে বলা হইয়াছে—নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শমদমাদিষট্‌সম্পদ্ এবং মুমুক্ষুত্ব।" বিবেক-বৈরাগ্যাদি সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন না হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। সন্ন্যাসীর কর্তব্য সম্বন্ধে কাশীখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—

"ধ্যানং শৌচং তথা ভিক্ষা নিত্যমেকান্তশীলতা।
যতেশ্চত্বারি কর্মাণি পঞ্চমং নোপপদ্যতে॥"

আত্মধ্যান, শরীর ও মনের শুদ্ধিসাধন, ভিক্ষান্ন ভোজন এবং একান্তবাস এই চারিটিই সন্ন্যাসীর কার্য—পঞ্চম কিছু নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন—"ন্যাংটা বলত, ঘটি রোজ মাজতে হয়, নতুবা ময়লা পড়ে।" ন্যাংটা হইলেন তাঁহার বেদান্ত-সাধনার গুরু পরমহংস তোতাপুরী। তাঁহার কথা—ধ্যান, চর্চা প্রভৃতির নিয়মিত অভ্যাস না থাকিলে মনে বাহ্যবিষয়ের প্রভাব পড়িবার এবং জ্ঞানের উল্লাস সমভাবে না থাকিবার সম্ভাবনা।

চিত্তশুদ্ধির উপায় মুণ্ডকোপনিষদে বলা হইয়াছে—"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়াৎ।" ব্রহ্মলাভেচ্ছু ব্যক্তি কর্মজাল-বিরচিত স্বর্গাদি লোকসমূহকে অনিত্য দুঃখরূপ জানিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। অশুদ্ধ অন্তঃকরণে বৈরাগ্যের আদৌ উদয় হয় না। বিষয়সুখে দোষদৃষ্টি করিতে পারিলেই তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়। বিষয়বৈরাগ্য-বিহীন চিত্ত অতীব মলিন। ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। জন্মে জন্মে নানা ক্লেশ পাইয়া প্রবৃত্তি ক্ষীণ হইতে থাকিলেই পুরুষের প্রভাব লক্ষিত হয়। তখনই আত্মজ্ঞানের জন্য পুরুষার্থ হইয়া থাকে। সৎসঙ্গ বা শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণে যাহাদের সুযোগ হয় না, তাহাদের জীবনে পুরুষার্থ-প্রকাশ ক্লেশসাপেক্ষ। শাস্ত্রোপদেশ-জনিত আত্মবোধের নাম জ্ঞান এবং নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা আত্মার অনুভব বা বিশেষ জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। (গীতা—কৃষ্ণানন্দ)

অন্তঃকরণ শুদ্ধ ও চিত্ত নিষ্কাম না হইলে আত্মজ্ঞানবোধে অধিকার হয় না। মায়াজ্ঞান তিরোহিত হইলে একমাত্র ব্রহ্মচৈতন্যই প্রকাশিত থাকেন। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, সমাধান এই ষট্‌সম্পত্তিসম্পন্ন হৃদয়ে প্রত্যগাত্মার দর্শন হয়। অন্তঃকরণের সম্পূর্ণ শুদ্ধি না হইলে সন্ন্যাস বাঞ্ছিত ফল দান করিতে পারে না। যিনি বিবেকবিচারসহ নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারই জন্য শাস্ত্রে সন্ন্যাস বিহিত হইয়াছে। আত্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধনের নাম সন্ন্যাস। মুক্তিকোপনিষদে আছে—

"বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম
গোপায় মা শেবধিষ্টেঽহমস্মি।
অসূয়াকায়ানৃজবেঽযতায় মা মা ব্রূয়াদ্বীর্যবতী
তথা স্যাম্॥"

একসময় ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্মবেত্তাদিগের নিকট বলিয়াছিলেন—তোমরা আমাকে অতি গোপনে রক্ষা কর। যদি কখনও অন্যের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া গোপনে রক্ষা না করিতে পার তবে বিবেকবৈরাগ্যাদি-সাধনসম্পন্ন অধিকারী

ব্যক্তিকে আমার উপদেশ করিও। অসূয়াযুক্ত, কুটিলপ্রকৃতি, অসংযতমনা ব্যক্তিকে উপদেশ করিও না। কেন না, তাহা হইলে আমি (ব্রহ্মবিদ্যা) শুভফলপ্রসূ হইতে পারিব না।

শ্রীশংকরাচার্য গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের অষ্টা-বিংশতি শ্লোকের ভাষ্যে বলিয়াছেন—"যোগ-যজ্ঞাঃ—প্রাণায়ামপ্রত্যাহারাদিলক্ষণো যোগো যজ্ঞো যেষাং যোগযজ্ঞাঃ। তথাপরে স্বাধ্যায়-জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ, স্বাধ্যায়ো যথাবিধি ঋগাদ্যভ্যাসো যজ্ঞো যেষাং তে স্বাধ্যায়যজ্ঞাঃ। জ্ঞানযজ্ঞাঃ—জ্ঞানং শাস্ত্রার্থপরিজ্ঞানং যজ্ঞো যেষাং তে জ্ঞানযজ্ঞাঃ।" পাতঞ্জল যোগেও স্বাধ্যায়ের কথা বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় যথাযথ অনুষ্ঠিত হইলে চিত্ত আত্মজ্ঞানলাভের যোগ্য হয়। গীতাতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥"

অর্থাৎ জ্ঞানের তুল্য পবিত্র বস্তু আর নাই ; এবং কর্মযোগাদি সিদ্ধিসম্পন্ন না হইলে এই আত্ম-জ্ঞানলাভের অধিকার হয় না। শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ স্বামী বলিতেছেন—যিনি যথাবিহিত উপায়ে নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠান করেন এবং মোক্ষশাস্ত্রের শ্রবণদ্বারা সংসারে আসক্তিশূন্য হইবার জন্য নিয়মিত চেষ্টা করেন, তিনি এই জন্মেই চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া নিদিধ্যাসনরূপ ব্রহ্মাভ্যাসের অধিকার লাভ করিতে পারেন। সাত্ত্বিক-গুণসম্পন্ন হইতে পারিলে যথাসময়ে বৈরাগ্যোদয় হইবেই। এইরূপে ইহজন্মে বা জন্মান্তরে ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভের জন্য সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের প্রবৃত্তি স্বতই উদিত হইয়া থাকে। মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়স্বরূপ আত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য শ্রীভগবান বলিতেছেন—যাঁহারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিয়া বিবেকবিচার দ্বারা সন্ন্যাসী হইয়াছেন, যাঁহাদের বেদান্তশাস্ত্র শ্রবণ-মনন দ্বারা দ্বিধাবুদ্ধি বিনষ্ট হইয়াছে, নিদিধ্যাসনের পরিপাকবশতঃ যাঁহাদের চিত্ত একাগ্র হইয়াছে এবং অদ্বৈত বুদ্ধির দ্বারা যাঁহারা সর্বভূতেই সমান প্রীতিযুক্ত তাঁহারাই ব্রহ্মলাভে সমর্থ।

ঈশোপনিষদ্ বলিতেছেন :—

"যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥"

যে সময় সর্বভূতে আত্মবুদ্ধির উদয় হয় তখন জ্ঞানীর মোহ শোকাদি কিছুই থাকে না। সমস্তই একরূপ দৃষ্ট হয়। এই পরমাবস্থা লাভ করিবার জন্য নিজকেই বস্তুবিবেকবিচারাদিরূপ নৌকাবলম্বনে অজ্ঞানসমুদ্র পার হইতে হইবে আপনার অপেক্ষা প্রিয়বন্ধু আর নাই। গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে বিবেক-বিচার-সহ মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। বিবেকবিচার এবং তজ্জনিত বৈরাগ্য ব্যতীত মুক্তি অসম্ভব। "বিজাতীয়বৃত্তিং তিরস্কৃত্য স্বজাতীয়বৃত্তিপ্রবাহীকরণং নিদিধ্যাসনং"—অনাত্মবিষয়ে চিন্তা ত্যাগ করিয়া চিত্তকে একাগ্র করিয়া ব্রহ্মচৈতন্যে নিবিষ্ট করাই নিদিধ্যাসন। বিবেক, বৈরাগ্য ও ঈশ্বরপ্রণিধান দ্বারাই এই সাধনে অভ্যাস সুদৃঢ় হইয়া থাকে। মনোনাশ অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির নিরোধ এবং বাসনার ক্ষয় ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। পক্ষী উড়িবার সময় যেমন তাহার দুই ডানা ও লেজের ব্যবহার একসঙ্গে করে, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনার ক্ষয় একসঙ্গেই অভ্যাস করিতে হয়। পতঞ্জলিও বলিতেছেন—"অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।" অভ্যাস ও বৈরাগ্যই চিত্তস্থৈর্যের সর্বোত্তম উপায়। "বৈরাগ্যেন বিষয়স্রোতঃ খিলী-ক্রিয়তে। অভ্যাসেন কল্যাণস্রোত উদ্‌ঘাট্যতে।" বিবেক-বিচারসহ বৈরাগ্যের দ্বারা বিষয়াসক্তি

ক্রমে ক্ষয় পাইয়া যায়। প্রত্যক্‌চেতনে মন নিরোধের অভ্যাস করিলে চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। অভ্যাসের গাঢ়তা এবং বৈরাগ্যের দৃঢ়তা হইলেই চিত্তের একাগ্রতা লাভ হয়। এই চিত্তের একাগ্রতা হইতেই সমাধিজ প্রজ্ঞা লাভ হয়। এই বিবেক-বিচার ও বৈরাগ্য সাধনে শাস্ত্রচর্চার সাহায্য অপরিহার্য। লোকে মানচিত্র দেখিয়া গন্তব্যপথ মিলাইয়া মিলাইয়া যেরূপ লক্ষ্যস্থলে পৌছায়, সন্ন্যাসিগণের শাস্ত্রপাঠ ও আলোচনা ইত্যাদি সেইরূপই—গন্তব্যপথ মিলাইয়া দেখিবার জন্য। শ্রীশ্রীঠাকুরের নরেন্দ্রনাথের প্রতি এত আকর্ষণ কেন এবং তাহা ঠিক উচিত কিনা একথা মনে ওঠায় একজন পণ্ডিতকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন। তিনি উত্তরে বলেন, শাস্ত্রে আছে সমাধিস্থ ব্যক্তি ব্যুত্থিত অবস্থায় মনকে নামাইয়া রাখিবার জন্য সত্ত্বগুণী আধারে স্থাপন করেন। তাঁহার উত্তর শুনিয়া, শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের মন নিশ্চিন্ত হয়। সেজন্য সাধক ঠিক পথে চলিতেছে কিনা জানিতে হইলে শাস্ত্রের আলোচনা করা প্রয়োজন। উপলব্ধিবান সাধকের ও তত্ত্বজ্ঞানীদিগের পরমার্থ-বিষয়ে উপলব্ধি ও উচ্চ চিন্তাগুলি শাস্ত্রের মধ্যে নিহিত, তজ্জন্য শাস্ত্র-আলোচনা, শাস্ত্রচর্চা সন্ন্যাসীকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সহায়তা করে।

তবে শাস্ত্রচর্চাকেই সন্ন্যাসজীবনের লক্ষ্য বলিয়া কখনও যেন মনে না করি। আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান মন-বুদ্ধির অতীত। উপলব্ধিই লক্ষ্য—উপলব্ধি না হইলে শুষ্ক শাস্ত্রচর্চা সবই বৃথা। স্বামীজী বলিয়াছেন, 'Realisation is the beginning of religion'. উপলব্ধি না হইলে কিছুই হইল না। শাস্ত্রচর্চা এই আত্মজ্ঞান লাভের সহায়ক মাত্র; অনুভূতিবান ব্যক্তির পক্ষে উচ্চস্তরে মন উঠাইবার উদ্দীপকও। উচ্চ তত্ত্বের আলোচনাকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন সমাধিতে লীন হইতেছে—দৃশ্যের এ বর্ণনা আমরা বহু পাইয়াছি। জ্ঞানলাভ করিতে হইলে পূর্ব পূর্ব উপলব্ধিবান সিদ্ধপুরুষগণের উপলব্ধিসমূহ—যাহা শাস্ত্র-নামে অভিহিত তাহার সাহায্য লইতে হইবে। মায়ার মধ্যে অবস্থান করিয়া মায়াকে অতিক্রম করা অতি কঠিন। সেই জন্য সদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন। এই সতর্ক থাকার জন্যও শাস্ত্রালোচনার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। বিচার, শাস্ত্রাদি অসির মত; ইহা সদা উদ্যত থাকিয়া পথের বাধা চূর্ণ করিয়া পথের চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত প্রলোভনকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া সর্বত্যাগী সাধককে সন্ন্যাসজীবনের চরম লক্ষ্যে পৌছাইয়া দেয়

সমাজ-প্রয়োজন ও ঈশ্বর

ডক্টর শ্রীজয়ন্ত গোস্বামী

ঈশ্বর আছেন কিনা, তাহার সমাধান বুদ্ধি-দ্বারা হয় না—বহু গ্রন্থ অধ্যয়নের পর একথা প্রাণে-প্রাণে বুঝে এর নিসংশয় প্রমাণের জন্য নরেন্দ্রনাথ যখন একজন প্রত্যক্ষদর্শী খুঁজছিলেন, এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে মিলনের পর তাঁর কাছে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনি ভগবানকে দেখেছেন কি?' তখন অতি স্পষ্ট উত্তর পেয়ে তিনি স্তম্ভিত হয়েছিলেন—'হ্যাঁ দেখেছি। তোকে যেভাবে দেখছি, তার চেয়ে আরো স্পষ্ট-ভাবে দেখেছি। আর তুই যদি চাস, তোকেও দেখাতে পারি।' শ্রীরামকৃষ্ণদেব-প্রদর্শিত পথে চলে নরেন্দ্রনাথ নিজেও ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অতিমাত্রায় যুক্তিনিষ্ঠ নরেন্দ্রনাথ নিজে ভালভাবে যাচাই না করে, বা প্রত্যক্ষ না করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন বলেই তাঁর কোন কথা গ্রহণ করেন নি। তিনি বলে গেছেন, এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা সকলেই বলেছেন যে, ভগবানকে সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করার জন্য যে পথ নির্দিষ্ট আছে, সে পথে চলে সকলেই তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

কিন্তু, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায়, 'কে তাঁকে চায় বল?' লোকে স্ত্রী-পুত্র, নাম-যশ, সম্পদ ইত্যাদি লাভের জন্য যতখানি ব্যগ্র, ভগবান লাভের জন্য ততখানি ব্যগ্রতা আছে কয়জনের? জড়বাদ আজ জগতের বহুলাংশ গ্রাস করেছে, জড়বাদাত্মক চিন্তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু যুক্তির নামে সাধারণতঃ আমরা একটি বিষয়কে 'কুসংস্কার' বলে উড়িয়ে দিয়ে অপর একটি কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরি। নরেন্দ্রনাথের মত বিশুদ্ধ যুক্তিকে আমরা ক'জন আশ্রয় করি? যাঁরা ভগবানকে প্রত্যক্ষ করে বলেছেন, 'তিনি আছেন, এই পথ ধরে যাও, তাহলে তুমিও তাঁকে দেখতে পাবে,' তাঁদের নির্দেশিত পথ ধরে গিয়ে উহা সত্য কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার পূর্বে তাঁদের উক্তির সত্যাসত্য সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশের অধিকারই যে আমাদের আসে না—নরেন্দ্রনাথের মত আমরা ক'জন তা যুক্তির আলোকে দেখতে পাই?

প্রবন্ধটি সে দিক দিয়ে লেখা নয়, অন্য এক দৃষ্টিকোণ হতে তাঁকে দেখার চেষ্টা। ঈশ্বরে অবিশ্বাস এবং প্রয়োজনবাদ বর্তমানযুগের এক থাক মানুষের চিন্তায় ওতপ্রোত। বহির্মুখী মনের চিন্তাপ্রসূত এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেও দেখা যায়, ঈশ্বরকে কল্পিত বলে ধরলেও, এবং ঈশ্বরবিশ্বাসকে সংস্কারমাত্র মনে করলেও সমাজ-প্রয়োজনের দিক থেকে তাঁর প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি। ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজনেই ঈশ্বর-বিশ্বাস কতখানি কল্যাণকর, বর্তমান আলোচনা সেই তত্ত্বই বহন করছে।

মানবজীবনের ঐহিক লক্ষ্য দৈহিক তৃপ্তি ও মানসিক শান্তি লাভ। এই প্রবণতা থেকে জন্ম নিয়েছে মানুষের সমাজ সংস্থাপনের প্রবৃত্তি, এমন কি তার অধ্যাত্মচিন্তা। সভ্যতা ও মনুষ্যত্বের বিকাশ ক্রমে ক্রমে দ্বিতীয়টিকে প্রাধান্য দিতে পেরেছে, যদিও বিভিন্ন মতবাদের মধ্য দিয়ে প্রথমটির প্রাধান্যও অস্বীকৃত হয় নি।

মানসিক শান্তির মনোবৈজ্ঞানিক উপাদান সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন প্রকার ধারণা পোষণ করেন। তাঁদের মতে, অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের প্রতি নির্ভরতাই মানবচিত্তে

শান্তি আনে। উদ্বেগের বিনাশ, বস্তুর সঙ্গে কামনাসংস্কারের ভারসাম্য রক্ষা—যা যৌন, আর্থিক বা সাংস্কৃতিক দিক থেকে ব্যক্তি বা সমাজের মধ্যে সংঘটিত হয়—সব কিছুই চিত্তের শান্তির উপাদান।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব বস্তুদৃষ্টি দিয়ে প্রমাণিত হয় না, একথা না হয় মেনে নেওয়া গেল; কিন্তু দেখা যায় বস্তুজগতে ঈশ্বর বা ধর্মবিবর্জিত মস্তিষ্ক সমাজের মূল উদ্দেশ্যকে এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তিক ক্ষেত্রের শান্তিকে নষ্ট করে। বহির্দৃষ্টি নিয়ে দেখলেও দেখা যায়, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস দুই দিক থেকে সমাজে একটি মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে আসছে। তিনি একদিকে আদর্শ-বন্ধু বা অন্তর্যামী এবং অন্যদিকে সর্বোচ্চ বিচারক তথা পুরস্কার- ও দণ্ড-দাতা ব্যক্তিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে শান্তির জন্যে এই অস্তিত্বকে সংস্কাররূপে প্রতিষ্ঠিত করতে অবিশ্বাসী সমাজহিতৈষীরাও আগ্রহী। মানব-জীবনে শান্তি অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে মানুষের সমগ্র বুদ্ধিসীমিত জ্ঞান ও তৎপ্রযুক্ত বিধিনিষেধ ঈশ্বরবিশ্বাসের বিকল্পরূপে মূল্য পেতে পারে না।

মানুষের পরনির্ভরতার আকাঙ্ক্ষা থেকে যেমন সামাজিকতার প্রবৃত্তি, তেমনি তা থেকেই আদর্শ-বন্ধুর কল্পনা। পৃথিবীতে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আত্মকেন্দ্রিক। সেখানে স্বার্থশিথিলতার বৃত্তি কৃত্রিম এবং স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যই স্বাভাবিক। সকলেরই আকাঙ্ক্ষা, নিজ স্বার্থের অনুকূলে অপরে তার স্বার্থ শিথিল করুক। বন্ধুত্বের মধ্যে দিয়ে মানুষ তাই চায়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই কৃত্রিমতাময় প্রচেষ্টা শীঘ্রই চূর্ণ হয় মর্মান্তিকভাবে। আংশিকভাবেই হোক, বা পূর্ণভাবেই হোক এই ব্যর্থতার ফলে মানুষ হয়ে ওঠে দুঃখবাদী। যাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, তাঁকে মানুষের মনঃকল্পিত বলে ভাবেন, তাঁদের মতেও এই অশান্তিময় চিত্তের আশ্রয় তখন তার 'কল্পিত' ঈশ্বরই। এই ঈশ্বর মানুষের কামনা-সংস্কারের পূর্ণ ব্যক্তিরূপ চরিতার্থতা। ইনিই অন্তর্যামীরূপে স্বীকৃত। স্ত্রী পুত্র পরিবার বন্ধু-বান্ধবাদি সকলকে নিয়ে সুবৃহৎ যে সমাজ-মরু, ঈশ্বর তার মধ্যে ছায়াচ্ছাদিত পল্বল-স্বরূপ।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে ঈশ্বরকে আদর্শ পুরস্কার- ও দণ্ড-দাতারূপ পরিকল্পনার মূলে দুটি ক্ষেত্র থাকে। একটি সমাজিক শান্তির প্রয়োজনে, অন্যটি ব্যক্তিগত শান্তির প্রয়োজনে। দৈনন্দিন জীবনে অনুষ্ঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘর্ষের বিচার হয় না। স্বার্থসংঘর্ষে বঞ্চিতপক্ষের অধৈর্য—যা ব্যক্তিগত অশান্তির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অশান্তির বীজ বহন করে, তাকে স্তিমিত রাখতে এই সত্তাকে পরিকল্পিত বলে ধরলেও তার ক্ষমতা অসীম।

সামাজিক প্রয়োজনেই যে প্রেমময় ভগবানের দণ্ডদাতারূপ সত্তার মূল্য স্বীকৃত, এ সম্পর্কে সমাজ ও রাষ্ট্রের শাসন ও তার সীমার প্রতি দৃষ্টি দিলেই তা উপলব্ধি করা সহজ হয়। আদিম মানুষের যখন ভগবানে বিশ্বাস এসেছিল—তখন বোধ হয় প্রথমে এসেছিল ভয় থেকে।

পৃথিবীতে অনুষ্ঠিত কর্মসমূহের ফলাফল লক্ষ্য করে তদনুযায়ী সমাজে কুকর্ম এবং সুকর্ম চিহ্নিত হয়। সাধারণক্ষেত্রে সুকর্ম সমাজহিতের উপাদান বহন করে। সমাজ-হিতের ভিত্তিতে কিছুটা স্থান কাল ও পাত্র প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন বিধিনিষেধ রচিত হয়। সাধারণ সমাজশাসনের ক্ষেত্রে দুর্বৃত্তির জন্যে সামাজিক সুবিধা বিলোপের ভীতি প্রদর্শন অনুভূতিপ্রবণ মানুষের ক্ষেত্রে যথেষ্ট। তাদের কাছে যৌন আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক তিনটি

দিকের সমান প্রতিষ্ঠাই প্রকৃত শান্তি। সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ অনুভূতিপ্রবণ হলে অন্য শাসনের কোনো প্রয়োজন হত না। কিন্তু পৃথিবীতে নৈতিক অসাড় ব্যক্তির প্রাদুর্ভাব কম নয়। এরা দুর্বৃত্তির মাধ্যমে সমাজ-অহিতের বীজ বহন করতে যেমন সক্ষম, তেমনি সমাজে দূষিত ক্ষত সৃষ্টিতেও সক্রিয়। এরা মানবসমাজে জীববৃত্তিপ্রধান। জীববৃত্তিপ্রধান জীবকে শাসনের উপায় দৈহিক পীড়ন তথা মৃত্যুভয়প্রদর্শন। সমাজশাসনের সীমার বাইরে এখানে রাষ্ট্রীয় তথা সামরিক শাসনের প্রয়োজন হয়। পুলিসের ভয়ে সমাজের অধিকাংশ দুর্বৃত্ত দুষ্কর্ম থেকে বিরত হয়। কিন্তু এই শাসনেরও কি সীমা নেই? মনুষ্যসমাজ থেকে বহুদূরে যেখানে রাষ্ট্রের নিম্নতম সামরিক প্রতিনিধির অভাব, সেখানেও তো মানুষ দুষ্কর্মের অনুষ্ঠান করতে পারে। সেই শাসন-বহির্ভূত ক্ষেত্রের জন্যেই ধর্ম তথা আদর্শ দণ্ড-দাতার প্রয়োজন। তিনি "ক্ষত্রিয়েরও ক্ষত্রিয়"। প্রথমেই বলেছি তিনি রয়েছেন, বহুজন তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তবু সেকথা বিশ্বাস না করলেও, তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাসকে 'সংস্কার' মাত্র মনে করলেও, এই দণ্ডদাতার সংস্কার অনেক ক্ষেত্রে উদ্যত খড়্গকে শিথিল করতে সক্ষম।

সমাজের প্রয়োজনেই ধর্ম আদর্শবন্ধুর ও স্বর্গরাজ্যের প্রলোভন দেখিয়ে কিংবা সর্বোচ্চ দণ্ডদাতা বা নরকের ভীতি দেখিয়ে আসছে বহু প্রাচীন কাল থেকে—একথা অবশ্য জীব-বৃত্তিসর্বস্ব কিংবা জীববৃত্তিপ্রধান মানুষের পক্ষেই প্রযোজ্য। ভাববৃত্তি বা বুদ্ধিবৃত্তির উৎ-কর্ষের মধ্যে দিয়ে অবশ্য ভীতিপ্রলোভনশূন্য আত্মিকগতিতে ধর্মের অনুষ্ঠান সাধারণ তৃপ্তিতেই সংঘটিত হয়। এটা সামাজিক ক্ষেত্রের চেয়ে ব্যক্তিক ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ ঘটে। এখানেই আমাদের সাধনা তথা মনুষ্যত্বের বিকাশ। এখানে মানুষ দেহাতীত উচ্চতর স্তরে উন্নীত। এখানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পিত নয়, বাস্তব; এখানে ধর্ম প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে। ধর্ম এখানে সত্যানুসন্ধিৎসা, সত্যলাভেচ্ছা। গীতার নিষ্কামকর্মবাদ প্রকৃতপক্ষে এই স্তরের ধর্মা-চরণ। মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্যে সমাজে পূর্বোক্ত প্রয়োজনবাদ এবং শেষোক্ত অপ্রয়োজনবাদ—উভয়েরই মূল্য আছে। কিন্তু সব কিছুর শেষকথা এই অপ্রয়োজনবাদ, যা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অনুভূতি আনে—

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥
(গীতা-৩।১৯)

সমালোচনা

SWAMI VIVEKANANDA AND HIS MESSAGE—by Swami Tejasananda. Published by Swami Abjajananda; Ramakrishna Mission Saradapitha, Belur Math, Dt. Howrah. Pp. 209; Price Rs. 5/-.

স্বামী তেজসানন্দ রচিত এই গ্রন্থটি স্বামী বিবেকানন্দ শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত 'Swami Vivekananda Centenary Memorial Volume' গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্তমান বর্ষের অক্টোবর মাসে উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

"It may be that I shall find it good to get outside my body—to cast it off like a worn-out garment. But I shall not cease to work! I shall inspire men everywhere, until the world shall know that it is one with God."—যে মহাজীবন হইতে এই ইচ্ছা স্বতঃস্ফূর্ত হইয়াছিল, বিশ্বমানবের কল্যাণ কামনায় উন্নততর মানব-গোষ্ঠী গঠনের জন্য যিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের সমন্বয়সাধনে সচেষ্ট হইয়া উভয়কে বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছেন 'with the golden line of mutual love and respect'—সেই জীবনকথা সর্বদেশের মানুষের কাছেই অন্ধকারে আলোক-বর্তিকা স্বরূপ, সেই মহামানবের বাণী পৃথিবীর সর্বত্রই অমিয়-আশিস্-বর্ষী। গ্রন্থকার এই জীবনকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সুনিপুণ হস্তে, এবং সেই সঙ্গে তাঁহার জীবনের ঘটনাগুলির তাৎপর্য বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন নিজস্ব চিন্তার আলোকসম্পাত করিয়া।

জীবনরূপায়িত না হইলে কোন আদর্শ অপরকে তদনুযায়ী জীবনগঠনে প্রয়াসী করিতে পারে না। ব্যক্তির পক্ষে একথা যেমন প্রযোজ্য, জাতির পক্ষেও তাহাই। বর্তমান যুগের জড়বাদভিত্তিক চিন্তাধারা মানুষকে যে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছে, সেখান হইতে তাহাকে ফিরাইতে পারে আধ্যাত্মিকতার ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান সর্ববিষয়ে উন্নত ভবিষ্য ভারতীয় জাতির জীবন। ভারতের প্রতি স্বামীজীর অনুরাগ এই কারণেই গভীরতর, ভারতকে জাগাইবার জন্য তাই তাঁহার প্রাণান্ত প্রয়াস। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের পর দ্বিতীয় দশকে স্বামী বিবেকানন্দের এই জীবন-চরিত রচনাকালে গ্রন্থকার সর্বপ্রথমে তাই সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহার চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন সর্ববিষয়ে ভারতের মূর্ত জাগরণরূপে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া।

রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভ করিয়া তাহার পর জাতীয় উন্নতির পথে বহুদূর অগ্রসর হইলেও এ পথে স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য এখনও বহুদূরে। এই সুদীর্ঘ পথযাত্রায় দেশমাতৃকার পূজারীগণ, বিশ্বমানবের পূজারীগণ প্রেরণা ও পথের নির্দেশলাভ করিতে পারিবেন এই গ্রন্থখানি হইতে। গ্রন্থটির বহুল প্রচার একান্ত কাম্য।

গ্রন্থটির ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। প্রচ্ছদপটটি নয়ন-তৃপ্তিকর ও সুরুচির পরিচায়ক।

উপনিষৎ-সংকলন (প্রথম খণ্ড—দ্বিতীয় সংস্করণ)—প্রকাশক : স্বামী সন্তোষানন্দ, সেক্রেটারি, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম, বেলঘরিয়া, কলিকাতা ৫৬। পৃষ্ঠা ১৬৮; মূল্য ২'৫০।

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত উপনিষৎ-সংকলনের

পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। এই সংস্করণে প্রত্যেকটি শ্লোকের অন্বয় ও বিশেষ বিশেষ শব্দের অর্থ সংযোজিত হওয়ায় শ্লোক-গুলির মর্মার্থ অনুধাবনে পাঠক-সাধারণের সুবিধা হইবে।

স্বামীজী বলিয়াছেন: "শক্তি—একমাত্র শক্তিই আমাদের প্রয়োজন আর শক্তিরই সুবিশাল আকর আমাদের উপনিষদ্‌সমূহ। বস্তুতঃ সমগ্র পৃথিবীকে অনুপ্রাণিত করিবার মত উদ্দীপনা উহাদের মধ্যে নিহিত। উপনিষদের বাণীদ্বারা সারা জগৎকে সজীব, সবল ও প্রাণবন্ত করিতে পারা যায়। এই বাণী সকল জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত দুর্বল ক্লিষ্ট ও নিপীড়িত জনগণকে তূর্যনিনাদে ডাকিয়া বলিবে—'তোমরা প্রত্যেকে নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হও।' বাস্তবিক, দেহ মন এবং জীবাত্মার সামগ্রিক বন্ধন-মুক্তি বা স্বাধীনতাই উপনিষদের মূল মন্ত্র।"

শক্তি ও বন্ধন-মুক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রার্থনা, শিক্ষা, সৃষ্টি, জীবাত্মা, ঈশ্বর, অবিদ্যা, কর্মফল, জন্মান্তর, ব্রহ্ম, জ্ঞানের ফল, মোক্ষ প্রভৃতি অধ্যায়ে প্রধান প্রধান উপনিষদের বিখ্যাত মন্ত্রগুলি সানুবাদ সন্নিবেশিত হওয়ায় পুস্তকপ্রকাশের উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় সংস্করণে পুস্তকখানির জনপ্রিয়তা আরও বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই।

অবতার-সঙ্গিনী—স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭১; মূল্য ২৲।

শ্রীভগবান জগতে যখন যুগপ্রয়োজনে লোককল্যাণের জন্য আবির্ভূত হন, তখন মহামায়াও তাঁহার লীলাসঙ্গিনী হইয়া আসেন। জীবনের উদ্দেশ্য, ধর্মের লক্ষ্য, কর্ম করিবার কৌশল প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া এবং নিজেদের জীবন দেখাইয়া তাঁহারা যুগোপযোগী আদর্শ স্থাপন করেন।

আলোচ্য গ্রন্থে সতী, সীতা, রাধা, যশোধরা, বিষ্ণুপ্রিয়া ও সারদাদেবীর সচিত্র জীবনকাহিনী সন্নিবেশিত হইয়াছে। ভাষা সহজ, রচনাশৈলী সুন্দর। ছোটদের গ্রন্থাগারে ও বিদ্যালয়ে গ্রন্থখানি অবশ্যপাঠ্য হইবার উপযুক্ত।

সারদা-গৃহ সমাচার (১৩৭১)—সম্পাদক শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী, ইটাচুনা মহাবিদ্যালয় ছাত্রাবাস, পোঃ ইটাচুনা, হুগলী।

ইটাচুনা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস 'সারদা-গৃহের' সমাচার পাঠ করিয়া বিদ্যার্থিগণের আদর্শজীবন-গঠনের প্রতি আন্তরিক অনুরাগের পরিচয় পাইয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। তাহাদের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক—ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব স্মরণিকা (১৩৭১)—সিঁথি রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ, ৭৬-বি, কালীচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা ৫০ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭৫।

সিঁথি রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের উদ্যোগে গত কয়েক বৎসর যাবৎ প্রতিবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে একখানি করিয়া পত্রিকা প্রকাশ করা হইতেছে। এবারের পত্রিকাখানি অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অনেক উন্নত ধরনের—সর্বাঙ্গসুন্দর বলা যাইতে পারে। কয়েকটি বিশিষ্ট রচনা স্মরণিকাটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব

বেলুড় মঠ: গত ২৮শে অগ্রহায়ণ (১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৬৫) মঙ্গলবার পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শুভ ১১৩ তম জন্মতিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রত্যুষে মঙ্গলারতি, তৎপরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে বিশেষ পূজা ও হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্ণে স্বামী বোধাত্মানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা-সভায় সভাপতি মহারাজ ও স্বামী অজজানন্দ কর্তৃক শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবন ও বাণী আলোচিত হইয়াছিল। এই পুণ্য দিনে কয়েক সহস্র ভক্ত মঠে সমবেত হন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী: কলিকাতা বাগবাজার পল্লীর যে বাড়ীতে শ্রীশ্রীমা জীবনের শেষ একদশ বৎসর অতিবাহিত করেন, পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত সেই ভবনে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মোৎসব মহা উৎসাহে ও আনন্দে অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলারতি, ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ, ভজন প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। তিনসহস্রাধিক ভক্ত শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মে ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করেন।

কার্যবিবরণী

মাদ্রাজ: রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস্ হোমের ৬০ তম বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। মাদ্রাজে স্টুডেন্টস্ হোম ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম কেন্দ্ররূপে অন্তর্ভুক্তি লাভ করে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয় এবং ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে টেকনিক্যাল স্কুল ইহার সহিত সংযোজিত হয়। ছাত্রবাসটির তিনটি অংশ: কলেজ, স্কুল ও টেকনিক্যাল বিভাগ। টেকনিক্যাল ও স্কুল বিভাগ সম্পূর্ণ আবাসিক।

১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে কলেজ বিভাগে ২৮ জন ছাত্র ছিল। টেকনিক্যাল ও উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ১০৯ ও ১৫৪।

১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী ও ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে ছাত্রাবাসের ৬০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে হীরকজয়ন্তী-অনুষ্ঠান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মাদ্রাজে আদর্শ শিক্ষাবিস্তার কার্যে এই ছাত্রবাসটির প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত।

মাঙ্গালোর: রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের ১৯৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। মাঙ্গালোরে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে এবং মিশনের কেন্দ্র খোলা হয় ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে। বর্তমানে মিশন কেন্দ্রটির পরিচালনায় রহিয়াছে ছাত্রাবাস ও দাতব্য চিকিৎসালয়।

আলোচ্য বর্ষের প্রথমে ছাত্রাবাসে ৪৪ জন ছাত্র ছিল, তন্মধ্যে ১১ জন কলেজের ছাত্র; ৩৪ জন দরিদ্র ছাত্র বিনা খরচে ও ২ জন আংশিক খরচে থাকিবার সুযোগ লাভ করে। বর্ষশেষে ছাত্রাবাসে ৪১ জন ছাত্র থাকে।

এখানে এলোপ্যাথিক মতে বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়। স্থানীয় দরিদ্র জনসাধারণ এই চিকিৎসালয়টির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। ১৯৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে ৩১,৫৭১ জন রোগী চিকিৎসিত হয়, তন্মধ্যে নূতন ৬,৮০০ জন।

১,৪৪৫ জন রোগীকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়; ল্যাবরেটরিতে নমুনা পরীক্ষিত হয় ৬৩৬টি।

শ্যামলাতাল: শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের বার্ষিক কার্যবিবরণী (এপ্রিল '৬৪—মার্চ '৬৫) আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ৪,৯৪৪ ফুট উচ্চে হিমালয়ের সৌন্দর্যমণ্ডিত পরিবেশে এই আশ্রম ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আলোচ্য বর্ষে সেবাশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়ে বহির্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ১০,১৫০ (নূতন ৭,৪৫৩)। অন্তর্বিভাগে ১২টি শয্যা আছে; ২১৪ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে। এ পর্যন্ত উভয় বিভাগে ২,৪১,২৮৯ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। ১৫ মাইলের মধ্যে কোন হাসপাতাল বা চিকিৎসালয় না থাকায় সেবাশ্রমটি অসহায় ও দরিদ্র পার্বত্যজনগণের একমাত্র চিকিৎসার স্থান।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে গৃহপালিত মূক প্রাণীদের চিকিৎসার জন্য একটি পশুচিকিৎসালয় খোলা হয়। প্রতিষ্ঠাকাল হইতে এ পর্যন্ত ৬২,৪৯০টি পশুর চিকিৎসা করা হইয়াছে। এখানে অস্ত্র-চিকিৎসারও ব্যবস্থা আছে। আলোচ্য বর্ষে ১,৯৫৯টি পশু চিকিৎসিত হয়।

সেবাশ্রমটিকে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসালয়ে পরিণত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ছাত্রদের কৃতিত্ব

বেলঘরিয়া: রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী আশ্রমের দুইজন ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে; একজন দর্শনশাস্ত্রে ও অন্যজন সংস্কৃতে। সংস্কৃতের ছাত্রটি ১৯৬৫ সালের 'ঈশান স্কলারশিপ' লাভ করিবার গৌরবও অর্জন করিয়াছে।

নরেন্দ্রপুর: রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের একজন ছাত্র কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গত বি-এস, সি. পরীক্ষায় রসায়ন-শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

আমেরিকায় বেদান্ত

চিকাগো বিবেকানন্দ বেদান্ত-সোসাইটি: অধ্যক্ষ স্বামী ভাষ্যানন্দ। গত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি প্রদত্ত হয়:

রবিবারের বক্তৃতা: আমিই পথ, সত্য ও জীবন; যখন মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কয়; শান্তি, যাহা বুদ্ধির অতীত; মুক্তির পথ; ভক্তি ও ভাবোচ্ছ্বাস; সত্যকে জানো, সত্যই মুক্ত করিবে।

শনিবারের আলোচনা: গীতার সন্ন্যাস-যোগ; গীতার ধ্যানযোগ; জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। এতদ্ব্যতীত বুধবারে ঈশোপনিষদের ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

সেণ্টলুই বেদান্ত-সোসাইটি: অধ্যক্ষ স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ। গত জুন মাসে নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি দেওয়া হইয়াছিল: অহংভাব ও আত্মা; চেতন, অবচেতন ও অতিচেতন অবস্থা; কর্ম ও ধ্যান; গুরু ও শিষ্য; কর্ম ও কর্মত্যাগ; মৃত্যুর পারে।

এতদ্ব্যতীত প্রতি মঙ্গলবার শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতার ক্লাস অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র: অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ। গত সেপ্টেম্বর মাসে নিম্নলিখিত বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া হয়: মরমিয়াবাদের মূল কথা; হিন্দুধর্ম ও বর্তমান সংশয়। ইহা ছাড়া মঙ্গলবারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ও শুক্রবারে উপনিষদ্ ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

সহস্রদ্বীপোদ্যানে বেদান্ত-অধ্যাপনা

আমেরিকায় নিউইয়র্ক প্রদেশের অন্তর্গত সহস্রদ্বীপোদ্যানে (Thousand Island Park) বিবেকানন্দ-কুটীরে গ্রীষ্মকালে বেদান্ত-অধ্যাপনা অনুষ্ঠিত হয়। এই ভবনের সহিত যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্যস্মৃতি জড়িত। স্বামীজী এখানে ছয় সপ্তাহ অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে এই ভবন নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের পরিচালনাধীনে আসে।

গত ৭ই আগস্ট স্বামী নিখিলানন্দ সহস্র-দ্বীপোদ্যানে আগমন করেন। ১৫ই আগস্ট সপ্তাহব্যাপী বেদান্ত অধ্যাপনা আরম্ভ হয়। স্বামী নিখিলানন্দ ২৩ জন ছাত্রসমীপে ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়টি ব্যাখ্যা করেন। আমেরিকার বিভিন্নস্থান হইতে খৃষ্টধর্মযাজক, শিক্ষক প্রভৃতি সর্বস্তরের লোক এই ক্লাসে যোগদান করেন। ধ্যানাভ্যাস ও প্রার্থনাদিও যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সহস্র-দ্বীপোদ্যানে এই বিবেকানন্দ-কুটীর অতিশয় জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামী বিশ্বানন্দের স্মৃতিসভা

চিকাগো বিবেকানন্দ বেদান্ত-সোসাইটির সম্প্রতি-পরলোকগত ধর্মাচার্য স্বামী বিশ্বানন্দজীর স্মৃত্যর্থে গত ১২ই সেপ্টেম্বর (১৯৬৫) বিকাল চারটায় সোসাইটির হলে একটি সভা আয়োজিত হয়। বর্তমান পরিচালক স্বামী ভাষ্যানন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বৈদিক প্রার্থনা এবং সর্বকালের সকল সাধু মহাপুরুষদের শুভেচ্ছা আবাহন দ্বারা সভার কার্য আরম্ভ হয়। সভাগৃহ এবং পার্শ্ববর্তী অন্যান্য ঘরগুলিও পরলোকগত মহাপ্রাণ সন্ন্যাসী স্বামী বিশ্বানন্দজীর অনুরাগী ভক্ত ও বন্ধুগণের দ্বারা ভরিয়া যায়। নিঃস্বার্থ প্রীতি এবং উদার ব্যবহারের দ্বারা স্বামীজী সকলের মনঃপ্রাণ জয় করিয়াছিলেন।

স্বামী ভাষ্যানন্দ তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণে স্বামী বিশ্বানন্দের গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, সহানুভূতি, শিক্ষাদান ও সহিষ্ণুতার বর্ণনা করেন। তিনি যেভাবে নিরুদ্বেগ তিতিক্ষার সহিত তাঁহার শেষ সময়ের রোগযন্ত্রণা সহ্য করিয়া গেলেন তাহা সত্যই অদ্ভুত। বস্টন বেদান্ত-কেন্দ্রের স্বামী সর্বগতানন্দ তৎপরে স্বামী বিশ্বানন্দজীর অনেক মনোজ্ঞ স্মৃতিকথার উল্লেখ করেন। এই সকল ঘটনার ভিতর দিয়া স্বামী বিশ্বানন্দের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এপিসকোপাল ধর্মযাজক ফাদার টমাস রজার্স বলেন, স্বামী বিশ্বানন্দের নিকট তিনি জীবনের যথার্থ গভীর আনন্দের সন্ধান লাভ করেন। ভগবদ্গীতার আশ্চর্য শিক্ষাও তিনি তাঁহারই মাধ্যমে পাইয়া-ছিলেন। চিকাগো নর্থওয়েস্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর এডমাণ্ড পেরী তাঁহার প্রাণস্পর্শী ভাবে লিখিত বক্তৃতায় স্বামী বিশ্বানন্দের সহিত তাঁহার সংস্পর্শের কথা বর্ণনা করেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন এই বরেণ্য সন্ন্যাসীর নিকট বহুল প্রেরণা লাভ করিয়াছে।

স্বামী ভাষ্যানন্দ উপসংহারে বলেন যে, স্বামী বিশ্বানন্দ দীর্ঘকাল তাঁহার ত্যাগ-তপস্যাময় জীবন দ্বারা চিকাগোর জনসাধারণকে যথার্থ সেবা করিয়া গিয়াছেন। পুঁথির ব্যাখ্যা দ্বারা নয়, ভাব-ভক্তি-জ্ঞান-বৈরাগ্যময় জীবন দেখাইয়া তিনি ভক্তগণের হৃদয়ে একটি স্থায়ী প্রেরণা জাগাইয়া গিয়াছেন। এই স্মৃতিসভাটি সমবেত সকলের হৃদয়ে একটি অপার্থিব স্নিগ্ধ উদ্দীপনা সঞ্চারিত করিয়াছিল।

বিবিধ সংবাদ

আঁটপুরে নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠা

আঁটপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ আশ্রম: ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ লীলা-পার্ষদ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের জন্মস্থানের উপর গত ৩রা ডিসেম্বর শুক্রবার সকাল ৭॥ টার পর স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজ কর্তৃক নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য সুসম্পন্ন হইয়াছে।

প্রতিষ্ঠার পূর্বে শোভাযাত্রা সহকারে মন্দির পরিক্রমণ করা হয়। শোভাযাত্রার পুরোভাগে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের প্রতিকৃতি লইয়া স্বামী নির্বাণানন্দ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী কৈলাসানন্দ ও স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ অগ্রসর হন, তৎপরে বহু সন্ন্যাসী ও ভক্তবৃন্দ গমন করেন।

ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, গীতা ও চণ্ডী-পাঠ, ভোগরাগ ও আরতি, ধর্মসভা, ভজন প্রভৃতির অনুষ্ঠানে ভাবগম্ভীর আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্ট হয়। বহু সহস্র ভক্তের সমাগমে আঁটপুর গ্রাম জনারণ্যে পরিণত হইয়াছিল। সমবেত ভক্তগণ সকলেই দ্বিপ্রহরে প্রসাদ পাইয়াছিলেন।

প্রথম দুইদিন ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী এবং বক্তা স্বামী অচিন্ত্যানন্দ, স্বামী দেবানন্দ, স্বামী সত্যকামানন্দ, শ্রীরমণী-কুমার দত্তগুপ্ত ও শ্রীগৌরচন্দ্র ঘোষ পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজের জীবনী ও বাণীর বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন।

মন্দিরপ্রতিষ্ঠার পূর্বদিন শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের জন্মতিথি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে এবং পরের দুই দিন নানাবিধ কর্মসূচী সহকারে উৎসব পালন করা হইয়াছে। তিন দিন সাফল্যের সহিত নাটক অভিনীত হয়, ইহাতে শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ আনন্দ লাভ করেন।

স্বামীজীর উৎসব

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি: গত ৪ঠা ডিসেম্বর '৬৫, বিবেকানন্দ রোডস্থিত বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দিরে বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে নবযুগের প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দের ১০৩তম জন্মজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ। স্বামীজীর বহুমুখী প্রতিভার উপর আলোকপাত করিয়া বক্তৃতা করেন অধ্যক্ষ শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী ও অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতী। দেশের বর্তমান সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় জীবনে স্বামীজীর আদর্শকে প্রতিফলিত করার প্রয়াসী হওয়া উচিত সকলেরই—তাহার উল্লেখ করিয়া মাননীয় সভাপতি এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। সোসাইটির সম্পাদক শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গতবৎসরের কার্যবিবরণী পাঠের পর সমবেত সুধীমণ্ডলীর নিকট স্বামীজীর স্মৃতিমন্দির সম্পূর্ণ করার জন্য সর্বপ্রকার সাহায্যের আবেদন জানান। সোসাইটির সভাপতি স্বামী জ্ঞানাত্মা-নন্দ তাঁহার সুচিন্তিত ভাষণে দেশের যুবসমাজকে স্বামীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া দেশসেবায় আত্ম-নিয়োগ করিবার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। সভাশেষে শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'বিবেকানন্দ গীতি-আলেখ্য' পরিবেশিত হয়।

পরলোকে যতীন্দ্রকুমার ঘোষ

দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ১৮ই অক্টোবর তারিখে ৬৮ বৎসর বয়সে যতীন্দ্রকুমার ঘোষ পরলোক গমন করিয়াছেন।

'শরৎচন্দ্র ঘোষ এণ্ড কোং'-এর স্থাপয়িতা সলিসিটর যতীন্দ্রনাথ বহুবাজারের প্রাচীন ঘোষবংশে জন্মগ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণ অনাথ ভাণ্ডারের অন্যতম স্থাপয়িতা পূর্ণচন্দ্র ঘোষ তাঁহার পিতা ছিলেন।

অমায়িক মিষ্টভাষী যতীন্দ্রনাথ বেলুড় মঠ হইতে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সভ্য এবং 'শ্রীরামকৃষ্ণ বোধচক্র' ও 'বেঙ্গল ইউথস এসোসিয়েশনে'র সভাপতি ছিলেন। রামকৃষ্ণ অনাথ ভাণ্ডারের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।

মৃত্যুর পূর্বদিন তিনি সকলকে নিজের মৃত্যুকাল জানাইয়া দিয়াছিলেন এবং ঈশ্বরের নাম স্মরণ ও শ্রবণ করিতে করিতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন।

তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

ভারতীয় পদার্থবিজ্ঞানীদের কৃতিত্ব

ভারতে ট্রম্বের আণবিক শক্তিসংস্থার পদার্থবিজ্ঞানীরা একটি মাণ্টিরাম নিউট্রন স্পেক্টরোমিটার প্রস্তুত করিয়া চালু করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। পৃথিবীতে এই ধরনের যন্ত্র এই প্রথম চালু হইল।

তেজস্ক্রিয় পদার্থে অণুর অবস্থান খুঁজিয়া দেখার জন্য নিউট্রন প্রয়োগ করিলে সেগুলি কিভাবে ছড়াইয়া পড়ে এবং তাহাদের শক্তির পরিমাণই বা কত, তাহা মাপিয়া দেখার জন্য মাণ্টিরাম স্পেক্টরোমিটার ব্যবহার করা হয়।

ভারতে ট্রেনচলাচলে নূতন নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা

ট্রেনচলাচল ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ভারতীয় রেলওয়েজ এক অতি আধুনিক পদ্ধতি চালু করিয়াছে। এই ব্যবস্থাকে বলা যায় সেণ্ট্রালাইজড্ ট্রাফিক কণ্ট্রোল (সি. টি. সি) অর্থাৎ একটি কেন্দ্র হইতে ট্রেনচলাচল ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের একটি সেকশনে এই ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থাটি সর্বত্র কার্যকরী করা সম্ভব হইলে একই রেলপথে অধিকসংখ্যক, প্রায় দ্বিগুণ-সংখ্যক গাড়ী চলাচল করিতে পারিবে।

বর্তমানে ভারতে ৩৫,৩৭৫ মাইল রেলপথ আছে। প্রতিদিন ভারতে ১০ হাজার রেল-গাড়ী চলাচল করে এবং এই সব গাড়ী ৬ হাজার ৮ শতাধিক স্টেশন হইতে দৈনিক ৫০ লক্ষের অধিক যাত্রী বহন করে। ভারতে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ৫ লক্ষ টনেরও বেশী মাল গড়ে ৩৪৫ মাইল দূরে রেলপথে প্রেরণ করা হয়। ১৯৬৩-৬৪ খৃষ্টাব্দে ভারতের রেলগাড়ী ১৯ কোটি ২২ লক্ষ টন মাল বহন করে।

কেরোসিনের সাহায্যে মোটর-চালনা

জাপানে টোকিওর অটোমোবাইল টেকনিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট কর্তৃক কেরোসিনের সাহায্যে মোটরগাড়ি চালাইবার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং পরীক্ষা করিয়া সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছে। ১৬০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপে কেরোসিন তৈলকে বাষ্পে পরিণত করিয়া ইহা সম্ভবপর হইয়াছে।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২৯শে পৌষ, (১৩. ১. ৬৬) বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের শুভ ১০৪তম জন্মতিথি বেলুড় মঠে ও অন্যত্র উদ্‌যাপিত হইবে।

আবেদন

(এলাহাবাদে পূর্ণ কুম্ভ)

এলাহাবাদ রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারি জানাইতেছেন, প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর অনুষ্ঠিত প্রসিদ্ধ পূর্ণ কুম্ভ মেলা এইবার আগামী জানুআরি মাসে (১৯৬৬) প্রয়াগ ত্রিবেণীসঙ্গমে অনুষ্ঠিত হইবে। পুণ্য স্নানের দিন পড়িয়াছে: ১৪ই জানুআরি (মকর-সংক্রান্তি), ২১শে জানুআরি (অমাবস্যা) এবং ২৬শে জানুআরি (বসন্ত-পঞ্চমী)। ভারতের সমস্ত প্রান্ত হইতে কুম্ভ মেলায় ৩১ লক্ষেরও অধিক তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়, অগণিত সাধু ও ভক্ত কুম্ভ মেলা দর্শন করিতে আসেন। মেলায় তীর্থযাত্রীদের চিকিৎসাবিষয়ক ব্যবস্থাদি বিশেষভাবে অবলম্বন করিতে হয়।

এলাহাবাদে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের কর্তৃপক্ষ প্রতিবারের ন্যায় এবারও সমবেত তীর্থযাত্রীদিগকে চিকিৎসা-সাহায্য দিবার জন্য মেলা-স্থানে ক্যাম্প করিয়া একটি বহির্বিষয়ক দাতব্য চিকিৎসালয় (An Outdocr Charitable Dispensary) ও একটি প্রাথমিক চিকিৎসা-সাহায্য কেন্দ্র (First-aid) খুলিবেন। ক্যাম্পের একটি অংশে অল্পসংখ্যক তীর্থযাত্রীদের জন্য থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও করা হইবে।

এই কার্য পরিচালনা করিবার জন্য প্রয়োজন কয়েকজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও কম্পাউণ্ডার এবং স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ। ঔষধ, ড্রেসিং-এর জন্য জিনিসপত্র, খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতিও ক্রয় করিতে হইবে। [illegible] আনুমানিক ১৫,০০০ টাকা প্রয়োজন। সহৃদয় জনসাধারণের নিকট আবেদন জানানো হইতেছে যে, তাঁহারা যেন মহৎ সেবাকার্যে অবিলম্বে অকুণ্ঠ সাহায্য দান করেন। অর্থ বা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিত হইলে প্রাপ্তিস্বীকার-সহ সাদরে গৃহীত হইবে:

(১) সেক্রেটারি, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম,
মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ (ইউ. পি.)

(২) জেনারেল সেক্রেটারি, রামকৃষ্ণ মিশন,
পোঃ বেলুড় মঠ (হাওড়া), পশ্চিমবঙ্গ